ব্যবসা ও বাণিজ্যের

১৩৪৪ সালের বর্ষসূচী।

বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

কার্ত্তিক

* বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মুদ্রাকরের ভ্রম বশতঃ কার্ত্তিক মাসের প্রথম হইতে Page mark দিতে ২০ পৃষ্ঠা ভুল হইয়াছে। সেইজন্য চৈত্রের শেষে Page mark ১২৯২ পৃষ্ঠার স্থলে ১৩১২ পৃষ্ঠা হইবে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৭শ বর্ষ | বৈশাখ—১৩৪৪ | ১ম সংখ্যা

নববর্ষের অভিবাদন

ঈশ্বরের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আমরা নববর্ষে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। "ব্যবসা ও বাণিজ্য" সপ্তদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। আমরা সানন্দ চিত্তে আমাদের গ্রাহক ও পাঠকগণকে নমস্কার জানাইতেছি। যাঁহারা এই মাসিক পত্রের সাহায্যে তাঁহাদের ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, যাঁহারা সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইহাকে সমৃদ্ধ করেন, যাঁহারা আমাদের পরামর্শ-দাতা বন্ধু, অথবা দোষ-প্রদর্শনকারী সমালোচক, কিম্বা সম-ব্যবসায়ী সহযোগী, তাঁহাদের সকলকে আমরা প্রীত্যভিবাদন নিবেদন করিতেছি। আশা করি, তাঁহারা চিরদিন আমাদের উপর এমনি সুদৃষ্টি রাখিবেন।

৩২ বৎসর পূর্ব্বে,—আমরা তখন উৎসাহ চঞ্চল, উন্মাদনায় ভরপুর, নব্য-যুবক,—এই বাংলা দেশের পবিত্র যজ্ঞ-বেদীতে স্বদেশ প্রেমের হোমানল শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। পুরোহিত-গণের উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র ধ্বনিত হইল,—'বন্দে মাতরম্'। তাঁহারা ডাকিয়া কহিলেন,—ইন্ধন চাই, আহুতি চাই! শুনিয়া ছুটিয়া গিয়াছিলাম, —আমরা যুবকের দল। সেই আগুন এখনো আমাদের বুকের মধ্যে;—কত বাধাবিঘ্ন ঘটিয়াছে,—কত অত্যাচার উৎপাত গিয়াছে, কতবার ঘোর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই,—এখনো নিরন্তর অন্তরে অন্তরে জ্বলিতেছি সেই আগুনে!

১৯০৫ সালের 'স্বদেশী আন্দোলন' যে দেশ-প্রেমের বন্যা আনিয়াছিল, তাহা কেবল কথায় নহে,—কাজে। ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসের মত তাহা আসিয়াই চলিয়া যায় নাই,—একটা

কর্ম স্বত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ... বাংলা দেশে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, কাপড়ের কল, চামড়ার কারখানা, চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ষ্টীল ট্রাঙ্ক, দিয়াশলাই, শিশি বোতল, বিস্কুট, ইলেক্‌ট্রিক বাল্ব ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি তৈয়ারীর কারখানা প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু এই Industrial renaissance এর যুগ আরম্ভ হইয়াছে সেই ৩২ বৎসর পূর্ব্বে, যখন লাঞ্ছিত নিপীড়িত দেশ সেবকগণ দেশের কল্যাণ কামনায় "ইহাসনে শুষ্যতুমে শরীরং" বলিয়া তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন এবং জাতীয় লজ্জা নিবারণের জন্য এক এক করিয়া কাপড়ের কল সাবানের কারখানা, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠানাদি গঠন করিতে সুরু করিলেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাংলা দেশে যে অগ্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আর থামে নাই,—ক্রমাগত চলিয়াছে। এখন চারিদিকে শুনিতেছি সেই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি,—

> আগে চল্, —আগে চল্ ভাই,
> পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
> বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই।

এই আশার অরুণালোকে আমরা প্রথম জাগ্রত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়াছি। বিপদ বাধা, ঝড় তুফান, দুঃখ দারিদ্র্য অগ্রাহ্য করিয়া আমরা এক লক্ষ্যে অ... হইয়াছি। মাথার উপরে ঈশ্বর,—চতুঃপার্শ্বে আমাদের সুজলা সুফলা স্বদেশ, —সম্মুখে কর্ত্তব্যের পথ। ফলাফল ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া, নিন্দা প্রশংসায় কর্ণপাত না করিয়া, কেবলমাত্র কর্ত্তব্য সাধনের আনন্দে আমরা অবিচলিত পদবিক্ষেপে সম্মুখে চলিয়াছি। কবি যেমন বলিয়াছেন,—

> পথের কাঁটা?—
> সে সব রক্তমাখা চরণ তলে
> একলা দল রে,—
> বজ্রানল?—
> আপন বুকের পাঁজর জালিয়ে দিয়ে
> একলা জ্বল রে।

আমরা সেইরূপ নির্ভয়ে কাঁটা খোঁচা দলিয়া, আগুনে জ্বলিয়া অগ্রসর হইয়াছি। দেবতার পুষ্প বৃষ্টির মত এদেশের উপরে ব্যবসায়ের সম্পদ বর্ষিত হইতেছে। আজ এই কথা স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কিন্তু আমাদের বিরাম নাই,—অবিরাম গতিতে চলিতে হইবে,—সমগ্র জগতের সহিত সমান তালে। আমাদের কিছুই ছিল না,—৩২ বৎসর পূর্ব্বের অবস্থার সহিত তুলনায় অনেক কিছু হইয়াছে সত্য,—কিন্তু পৃথিবীর ব্যবসায় ক্ষেত্রের উন্নতির কাছে তাহা অতি ক্ষুদ্র,—নগণ্য, বিদ্যুতালোকের পার্শ্বে মৃৎ-প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মির মত। সেইজন্য আমাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্যে অধিকতর উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইতে হইবে। আজ পৃথিবীতে মেল ট্রেনের গতিও অগ্রাহ্য হইয়া যাইতেছে। এখন এসেছে এরোপ্লেনের যুগ।—এ যুগে যে গরুর গাড়ীর মত গড়িয়ে গড়িয়ে চলে তার ধ্বংস অনিবার্য্য।

আমরা আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার সাহায্যে বৎসরের পর বৎসর এই অধিকতর উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছি। যে দেশে প্রেমের কবিতা আর গল্প উপন্যাস লইয়া সাহিত্যের সৃষ্টি, সে দেশে ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র প্রচলিত করা এক সময়ে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। শিক্ষা বিস্তারের

সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে অনেক উচ্চভাব প্রবেশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের জঘন্য দিকটাও এমনভাবে আমাদের বহু লেখককে নাচাইয়া মাতাইয়া তুলিয়াছে যে তাহার ফলে আধুনিক সাহিত্য ক্ষেত্র অশ্লীল ছবি ও দুর্নীতি মূলক গল্পের আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে। তাহার বিষাক্ত পুষ্পের আপাত সুগন্ধে ও সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বিভ্রান্ত পাঠকেরা ছুটিয়া চলিয়াছে।

আমরা সেই হোমানলের অর্দ্ধ-দগ্ধ ইন্ধন রূপে তখনও জ্বলিতেছিলাম,—এখনও জ্বলিতেছি। নিত্য আহুতি আমাদিগকে নিবিতে দেয় না। দেখিলাম, বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, কাপড়ের কল, সাবানের কারখানা, শিক্ষা পরিষদ, শিল্প বিদ্যালয়,—এ সমস্তই হইতেছে। কিন্তু ইহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে—এবং আরও নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিতে হইবে। নচেৎ এ সকল অনুষ্ঠান বিদেশী ধনীকদিগের প্রবল প্রতিযোগিতায় বুদ্বুদের মত ভাঙ্গিয়া যাইবে। মানুষের চিত্তকে ফিরাইতে হইবে,—হাল্কা আমোদ-প্রমোদে অরুচি ও ঘৃণা জন্মাইতে হইবে। বিশ্বজগতের ব্যবসায় ক্ষেত্রের নূতন নূতন সংবাদ প্রতিদিন আমাদের দেশবাসীকে জানাইতে হইবে,—শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক উন্নতির সমুজ্জ্বল চিত্র তাহাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিতে হইবে। ইহা ছাড়া আর উপায় নাই;—বুঝিলাম, একমাত্র সাহিত্যের সাহায্যেই এ কার্য্য করা যায়।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার পূর্ব্বেও কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যে মাসিক সাহিত্য প্রকাশিত হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু এই গল্পোপন্যাস প্লাবিত দেশে তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই লুপ্ত হইয়া যায়। যাঁহারা ঐ সকল পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আর্থিক ক্ষতি ও দুরবস্থা দেখিয়া আর কেহ সেই দিকে কোন চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু বিফল মনোরথ হইলেও তাঁহারা যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনও ব্যর্থ হয় নাই। বাস্তবিক, "Failures are but the pillars of success,—বিফলতাই সফলতার স্তম্ভ স্বরূপ"—এই কথা যে অলঙ্ঘনীয় সত্য, তাহা ইঁহাদের দৃষ্টান্তেই প্রমাণিত হয়।

মাসিক সাহিত্যে এই অগ্রগামী কর্ম্মীর দল এক নব যুগের সূচনা করিয়াছিলেন,—তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যের আহ্বানে আমরা ১৭বৎসর পূর্ব্বে "ব্যবসা ও বাণিজ্য" মাত্র চারিটি ফর্ম্মার ক্ষুদ্র আকারে মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশ করি। বন্ধুজনের নিষেধ, প্রবীণদের সাবধান বাক্য, আত্মীয় স্বজনের নিরাশার কথা, নিন্দুকদের টিট্‌কারী,—এ সব দিবারাত্রি কাণে আসিতে লাগিল। ভরসা পাইলাম,—উৎসাহ পাইলাম, আশ্বাস পাইলাম কেবল একস্থান হইতে, যার উপরে আর স্থান নাই;—যে স্থান হইতে প্রেরণা আসিয়া আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে নিত্য জাগ্রত রাখে।

আজ ৪ ফর্ম্মার ক্ষুদ্র নগণ্য পত্রিকা ১৪ ফর্ম্মায় পরিপুষ্ট কলেবরে ব্যবসায় জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" সেই জন্মদিবসকে শুভ দিন বলিয়া অভিনন্দিত করিতেছি। পাঠকদের মতিগতি অনেক ফিরিয়াছে;—আমাদের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধিই তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ। ১২মাসে ১২০০ পৃষ্ঠার উপর পঠিতব্য

বিষয় দিয়াও আমরা পাঠকদের আগ্রহ মিটাইতে পারি না। দেশের পক্ষে ইহা খুব শুভ লক্ষণ। আমরা সেইজন্য বিশেষ চেষ্টায় নিজেদের ছাপাখানা করিয়াছি। বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে আমরা বৃহৎ ছাপাখানার সাজসরঞ্জাম আনাইয়াছি এবং আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতি বসাইয়াছি। আমরা শুধু মাসে মাসে "ব্যবসা ও বাণিজ্য" প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব না। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, বীমা, গৃহস্থালী, স্বাস্থ্য, ইঞ্জিনীয়ারিং, অপচীত বস্তুর ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ ছোট বড় পুস্তক আমরা এই বৎসর হইতে একে একে প্রকাশ করিতে থাকিব। এই পুস্তকগুলি আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার সাহায্যকারী অর্থাৎ সাপ্লিমেণ্ট্ (Supplement) রূপে ব্যবহার করা হইবে। মাসিক পত্রিকায় সাময়িক প্রবন্ধে যাহা বিস্তারিত লেখা যায় না তাহা এই সকল পুস্তকে বিবৃত হইবে।

আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের যুগ আসিয়া পড়িয়াছে। চাকুরীর দিন চলিয়া গিয়াছে। সেকালের বৃদ্ধ লোকেরা প্রণত ব্যক্তিকে "তুমি দারোগা হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। বাস্তবিক এমন সময় গিয়াছে, যখন ২৫ টাকা বেতনের গবর্ণমেণ্ট চাকুরীওয়ালা মর্য্যাদা ও স্বচ্ছলতার সহিত দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন তাহা স্বপ্ন-স্মৃতির মত মনে হয়! আর সে দিন নাই। এখন গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রীর বেতন হইবে আড়াই হাজার টাকা। ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসীদলের যেরূপ প্রাধান্য হইয়াছে, তাহাতে প্রধান মন্ত্রীর বেতন কংগ্রেসের মতানুসারে ৫০০ টাকা হাওয়াও অসম্ভব নহে। যাহা হউক, আমরা শুধু বলিতে চাই, গবর্ণমেণ্টের চাকুরীর লোভ আর যেন কেহ না করেন, কারণ "সে গুড়ে বালি" পড়িয়াছে। এখন ব্যবসা বাণিজ্যের পন্থাতেই দেশের ধন-দৌলত গড়িয়া উঠিবে।

আমরা একথা বলিতেছিনা, দেশের জন সাধারণ সকলেই ব্যবসায়ী হইবে। ব্যবসা বাণিজ্যের ভিতরেও চাকুরী আছে। পরের দাসত্ব বলিয়াই যে চাকুরীর যত দোষ, তাহা নহে। কেরাণীরা একজনের চাকর, কিন্তু ব্যবসায়ীরা শত সহস্র লোকের চাকর। সুতরাং সেই হিসাবে ব্যবসায়ীদের অবস্থা কেরাণী অপেক্ষা উন্নত নহে। কিন্তু দেশের ধন দৌলত বৃদ্ধি করে ব্যবসায়ীরা,—কেরাণীরা নহে। সেই কারণেই ব্যবসায়ীদের সম্মান ও মর্য্যাদা অধিক। বাংলাদেশকে যথার্থই সোনার বাংলা করিয়া তুলিতে পারেন একমাত্র ব্যবসায়ীরাই,—আর কেহ নহে।

আমরা তাই মনে করি, এই নব যুগের সূচনায় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করিবে। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ"—ধন্য তিনি, যাঁর মুখ দিয়ে এই কথা প্রথম বাহির হইয়াছিল। ইহাকেই মূলমন্ত্র ধরিয়া আমরা প্রতিমাসে আমাদের পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত হই। আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রত্যেকটী অক্ষর, লক্ষ্মীরই পদচিহ্ন। কেহই ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না। প্রাচীন বাংলায় একটা চল্‌তি কথা ছিল, "আদার ব্যাপারীর আবার জাহাজের খবরের কাজ কি?" কিন্তু আর এই ভাবটী চলে না। এখন আদার ব্যাপারীরও জাহাজের খবর রাখা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতির

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগত একসূত্রে গাঁথা হইয়া যাইতেছে,—সুতরাং বাজারের "পয়সা-ভাগা" আদা হাজার হাজার টন জাহাজে বোঝাই হইয়া সাগর পারে চালান হয়। সেই জন্য যাঁহারা ছোট কারবারের মালিক, তাঁহাদেরও দুনিয়ার খবর নিতে হয়।

শুধু ব্যবসায়ী কেন,—গৃহস্থ, উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, শ্রমিক, শিল্পী প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষিত লোক, তাঁহাদের সকলেরই "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পাঠ করা প্রয়োজন। ব্যবসায়ের মধ্যে কত রকমের জাল জুয়াচুরী, প্রতারণা, কারচুপী, চালাকী রহিয়াছে, সকল গৃহস্থেরই তাহা জানা দরকার। আমরা আমাদের কাগজে এ-সব খবর মাসে মাসে প্রকাশ করিয়া থাকি। কোথায় কোন জিনিস পাওয়া যায়, দ্রব্যের দোষগুণ, ভালমন্দ বিচার, কাজ-কর্মের ফাঁকি-বাজি, বাজার দর, দেশের কল কারখানার বিবরণ, লিমিটেড কোম্পানী সমূহের ভিতরের কথা এসকল বিষয় জনসাধারণের প্রত্যেকেরই জানা দরকার। সেই জন্য আমরা ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিশেষরূপে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকি। আমরা কাহারও মুখ চাহিয়া কথা বলিনা। জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত দুর্নিবার সত্য স্পষ্টরূপে ও নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করিনা।

অন্যদিকে আমরা গুণের কথাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। দুরভিসন্ধি মূলক প্রচার কার্য্যের দ্বারা কতকগুলি লোক বাংলাদেশের কোন কোন বিশেষ খ্যাতনামা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে যখন নষ্ট করিবার চেষ্টা করে, আমরা তখন তাহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলাম। তাঁহারা এখন বুঝিয়াছেন, আমরা দেশের ভাল করিয়াছি, কি মন্দ করিয়াছি। বাংলাদেশের জাতীয় গৌরবে যেখানেই আঘাত লাগিবার উপক্রম হইয়াছে, আমরা সেইখানেই অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া আপন ইষ্টানিষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছি, ফেউয়ের চেঁচামেচিকে গ্রাহ্য করি নাই। যাঁহারা ব্যবসায় ক্ষেত্রে দুইদিন আসিয়াই একটা "কেষ্ট বিষ্ট" হইতে চান, তাঁহাদের কথার মূল্য আমরা ধরিনা।

নববর্ষের অভিবাদনে,—যেখানে আমরা বিনীত চিত্তে সকলের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি,—সেখানে এ সকল অপ্রিয় প্রসঙ্গ আমরা উত্থাপন করিতাম না। আত্ম-প্রশংসাকে যেমন আত্মহত্যার মত ভয় করিতে আমরা শিখিয়াছি, তেমনি পরনিন্দাকেও পরস্বাপহরণের মত ঘৃণা করিতে আমরা শিখিয়াছি। কিন্তু দেখিতেছি, ভালমানুষেরই বিপদ বেশী। সকলেই নিজের ঢাক নিজে ঘাড়ে লইয়া পিটায়। সেই পিটুনীর চোটে কেবল মাত্র ঢাকই বাজে না,—সঙ্গে সঙ্গে সত্যও ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়।

আজ সকাল বেলা কোন ব্যক্তি কাগজের প্রথম সংখ্যা বাহির করিয়াই লিখিলেন, "আমরাই ব্যবসায় ক্ষেত্রের প্রথম সংবাদ পত্র"— দু'চারিজন বড় লোকের ফতোয়া জোগাড় করাও অসম্ভব হইল না। সকলেই জানেন, এই সকল মার্কামারা বড় লোক নিজহাতে একটী লাইনও লেখেন না। ইহাদের স্তাবকেরা যাহা লিখিয়া লইয়া যায় তাহাতেই ইহারা সই করিয়া দেন, যদি খোসামোদের বহরটা বেশ মনের মতন হয়। দেশের লোকের নিকট এই সকল লোকের মতামতের কোনও মূল্য নাই; কারণ, আসল ব্যাপারটা জানিতে আজ আর কাহারও বাকী নাই। কেহ বা দু'দিন বাজারে ঘুরিয়াই একজন

সবজান্তা ব্যবসায়ের এক্সপার্ট হইয়া উঠিলেন,—তাঁর বচনের চোটে যেন মুখে খই ফোটে।

আমরা এ কথা বলি না যে, আমরাই ব্যবসা-ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম আসিয়াছি। বাংলা দেশের আর্থিক সম্পদ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবসায়ের মধ্য দিয়া যে Spade work অর্থাৎ প্রাথমিক পরিশ্রম আমরা করিয়াছি, গত ১৭ বৎসরের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। আরও অনেকে আমাদের সহযোগী হউন, ইহাই আমাদের কামনা। বাস্তবিক বাংলাদেশের এই নাটক-নবেল প্লাবিত, গল্প উপন্যাস পরিপূর্ণ, অশ্লীল চিত্র কলুষিত সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবসা ও বাণিজ্যের স্বর্ণ-রেণু-বাহী জলধারা আনিতে হইলে এই সম্পর্কীয় আরও বহু সংখ্যক মাসিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রয়োজন;—সুতরাং আমাদের কোন সহযোগীকেই আমরা প্রতিযোগীর চক্ষে দেখি না,—পরন্তু বন্ধু বলিয়াই মনে করি।

কিন্তু সত্যকে পদদলিত করিয়া যাঁহারা সবেমাত্র কাল জন্মগ্রহণ করিয়াই নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় ছাপার হরফে ঘোষণা করেন যে তাঁহারাই ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কাগজ প্রকাশে সর্ব্বপ্রথম অগ্রণী এবং তাঁহাদের কাগজই এই জাতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে আদি ও অকৃত্রিম, তাঁহাদিগের এই মিথ্যা প্রগল্‌ভতার প্রতিবাদ না করিয়া পারি না। এ যেন একটা মিথ্যার যুগ আসিয়াছে। চারিদিকে ঝুটা সংবাদ এবং ঝুটা খবর এমন চালু করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে যে লোকে জলন্ত মিছা কথা বলিতেও আর এতটুকুও ইতস্ততঃ করে না। কিন্তু সময় আসিয়াছে, যখন ডাঙ্কশ মারিয়া এই সকল মিথ্যা প্রচারের মুখোস খুলিয়া দিতে হইবে। সেই জন্য আমরা এত কথা বলিলাম।

যে দৃঢ় সংকল্প ও ভবিষ্যতের আশা লইয়া ১৭ বৎসর পূর্ব্বে কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়াছিলাম,—সেই সংকল্প ও আশাকে দৃঢ়তর এবং উজ্জলতর করিয়া আমরা নববর্ষে কার্য্যে ব্রতী হইতেছি। যৌবনের উন্মাদনায় যে গান একবার গাহিয়াছিলাম,—সেই গান আবার শুনিতেছি,—

উঠ্‌ছে দেখ্‌ ঐ তরুণ তপন
ফুট্‌ছে কত আশার কিরণ
ঐ আশাতে বুক বেঁধে ভাই আয়রে দলেদল্‌
চল্‌—চল্‌—চল্‌

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, তিনি যে কার্য্যের ভার দিয়াছেন, তাহা সম্পাদন করিতে যেন তিনিই আমাদিগকে শক্তি ও সাহস প্রদান করেন,—

"তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান্‌ দুঃখ
সহিবারে দাও ভকতি।
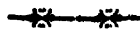
বাঙ্গালীর অক্ষমতা ও শ্রমবিমুখতা।

প্রমাণঃ—

পরিস্কৃত চর্ম্ম ও জুতার ব্যবসায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪। জুতার কারবারের মত স্যুটকেস, এটাচী কেস্ হোল্ড-অল্, ডাক্তারী বাক্স, বেল্ট, বেড বাইণ্ডার, প্রভৃতির মত কারবার অল্প মূলধন লইয়া এবং অল্প কারিগর লইয়া চলিতে পারে। অল্প মূলধনে ঐ প্রকার খুচরা অর্ডারি কাজই চলে কিন্তু তাহাতে যে কোন লোক তাহার সংসার ভরণ-পোষণ করিতে পারে।

৫। আর একটী কারবার আছে তাহাতে এমন কিছু মূলধনের দরকার হয় না। উহা জুতার উপরকার অংশ তৈয়ারী। মাত্র একটী জুতা সেলাইয়ের কল থাকিলেই হয় এবং তাহাও কিস্তিবন্দিতে পাওয়া যায়। এই সাজ প্রস্তুত করিয়া স্বাধীনভাবে দৈনিক ন্যূন কল্পে চার টাকা উপার্জ্জন করা যায়। জুতার সাজ প্রস্তুত করিয়া কত শত চীনা স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। স্বাধীন জাত না হইলে স্বাধীনতার কদর বুঝেনা; তাই পরাধীন, আমাদের এত দৈন্য। চীনারা যে জুতা সস্তায় দিতে পারে তাহার অন্যান্য কারণ ছাড়াও আর একটী প্রধান কারণ আছে, তাহারা তাহাদের স্ত্রী জাতির নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জন ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য পায়। স্ত্রী-পুরুষে ক্ষমতানুযায়ী সমান ভাবে পরিশ্রম করে বলিয়া তাহাদের আমাদের মত এত দরিদ্রতার পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হয় না। অনেক সময় চীনা নারীরা জুতার সাজ প্রস্তুত করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ের জন্য অর্থের সুবিধা করে। ঐ সাজ প্রস্তুত করার জন্য কোন কারিগর রাখিলে ন্যূন কল্পে ৬০৲ টাকাও দিতে হইত। সুতরাং ঐ ৬০৲ টাকাই তাহাদের ব্যবসায়ের জন্য থাকে, অর্থাৎ এই প্রকার সাজের কাজ করিয়া চীনা গৃহিণীরা দৈনিক দুই টাকা করিয়া উপায় করিতে পারে। ইহা ছাড়া তাহাদের সাংসারিক গৃহস্থালীর কাজ আছেই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের নারীদের শিল্প-শিক্ষার জন্য, অনেকস্থানে অনেক প্রকার সাড়া দেখা যাইতেছে এবং কোথাও কোথাও বা দুই একটী প্রতিষ্ঠানও হইয়াছে। ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য যদি অনাথ স্ত্রীলোদিগকে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিবার উপযোগী করাই হয়, তবে তাঁহাদিগকে অর্থকরী শিক্ষা দিবার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে তন্মধ্যে এইরূপ সাজ প্রস্তুত অথবা ঐ প্রকার অন্য কোন শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে অর্থোপার্জ্জন হিসাবে অতিশয় কার্য্যকরী হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এখানে একটী নজীর না দেখাইয়া

থাকিতে পারিলাম না। ভবানীপুর নিবাসী কোন ভদ্র মহিলা মনিব্যাগ তৈয়ারী করিয়া মনোহারি দোকানে বিক্রয় করিয়া গড়ে মাসে ৪০৲ উপার্জ্জন করেন। সময়াভাবে রন্ধন কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি একটী পাচক রাখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বামী একটু অসন্তুষ্ট হওয়াতে তিনি তাঁহার স্বামীকে এইবলিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে
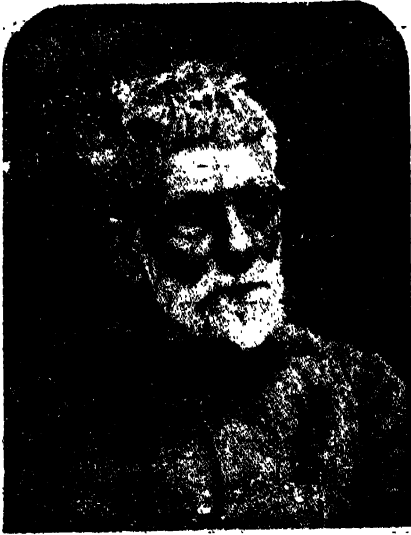
পাচক না রাখিয়া নিজে রন্ধন করিয়া সংসারের যাহা সাশ্রয় করিতেন, পাচক রাখিয়া সেই সময়টা এইরূপে ব্যবহার করিয়া তিনি তাহার তিন গুণ সাশ্রয় করিতেছেন। ঠিক এরূপ ধারণায় অনেক চীনা মহিলা রন্ধনের হাঙ্গামা না করিয়া সেই সময় তাহাদের ব্যবসায়ের কাজ করিয়া অনেক বেশী সাশ্রয় করে। ইহাদের হোটেল হইতে গৃহে খাদ্য পৌছাইবার ব্যবস্থা থাকে।

অধিকাংশেরই এই ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, হোটেলে যাতায়াতের যে সময় নষ্ট হয়, সেই সময়টুকু বাঁচাইবার জন্যই বোধ হয় এই ব্যবস্থা। 'Time is money' ইহার তাৎপর্য্য ইহারা যে ভাল ভাবেই বুঝিয়াছে তাহা সামান্য সামান্য ব্যাপার হইতেই বুঝা যায়। আর একটী মহৎগুণ ইহাদের অধিকাংশের মধ্যে দেখা যায় উহাদের সততা। ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে দুইটী গুণের একান্ত দরকার সেই দুইটী এই জাতিতে বর্ত্তমান। আমার পরিচিত কোন এক ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন এক চীনা দোকানে তাহার মনিব্যাগ ফেলিয়া আসে। সে যেখানে যেখানে উহা ভুলিয়া রাখার সম্ভাবনা সেখানে সেখানে অনুসন্ধান করে। এই প্রকারে চীনার ঘরে অনুসন্ধান করিতে গেলে, চীনা ব্যাগে কত টাকা আছে জিজ্ঞাসা করে। লোকটীর হিসাব ছিল তাহার ব্যাগে কত আছে এবং সে তৎক্ষণাৎ তাহা বলে। লোকটীর কথার সহিত টাকার মিল হওয়াতে চীনা দ্বিধা না করিয়া ব্যাগটী তাহাকে ফিরাইয়া দেয়। ব্যাগে তাহার প্রায় পঞ্চাশ টাকা ছিল। এই প্রকার সততার নানা পরিচয় উহাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত ট্যানারী ব্যতীত কলিকাতা ও শহর তলীতে ছোট বড় প্রায় তিন শত ট্যানারী আছে। ইহার মধ্যে যে সমস্ত ট্যানারীতে ক্রোম চামড়া প্রস্তুত হয় তাহাদের অধিকাংশের মালিক চীনা। কতকগুলিতে শুধু তলার চামড়া প্রস্তুত হয়। তাহাদের মালিক সবই পাঞ্জাবী। আর কতকগুলিতে বার্নিশ করা চামড়া প্রস্তুত হয়, তাহাদের মালিক অধিকাংশই মুসলমান।

বার্নিশ চামড়া এবং তলার চামড়া প্রস্তুত করিতে কলের সাহায্য না হইলেও চলিতে

পারে বলিয়া ঐরূপ কোন কারখানায় যন্ত্রাদি বিশেষ নাই। কিন্তু ক্রোম চামড়া যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না। সেই জন্য চীনাদের অধিকাংশ কারখানায় কল স্থাপিত আছে। এই সমস্ত কারখানা ট্যাংরা, পাগলা ডাঙ্গার দক্ষিণ ভাগ এবং ধাপা অঞ্চলে স্থাপিত। দিনের বেলাও সেই সব লোকালয় বিহীন স্থানে যাইতে ভয় হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোনো কোনো চীনা মালিক কারখানায় সপরিবারে বাস করে। দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় ইহারা যেন সমস্ত ভুলিয়া শুধু অর্থের জন্য দুর্গন্ধ, জলপূর্ণ জনহীন স্থানে পড়িয়া আছে। এইরূপ একনিষ্ঠ পরিশ্রমশীল জাতি সচরাচর দেখা যায় না। যে সমস্ত চীনা কারখানায় সপরিবারে আছে সে সমস্ত কারখানার মালিকের পরিবারবর্গ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কারখানায় কুলিদের কার্য্যের তদারক করে, এমন কি কার্য্যের প্রণালী পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় করে। ততক্ষণ পুরুষেরা অন্যান্য দরকারী কাজ করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া অর্থাগমের সাশ্রয় করে। নেহাৎ যে সমস্ত কাজ পুরুষ ভিন্ন হইতে পারে না, সেই সব কাজ ব্যতীত অন্য সমস্ত কাজই নারীরা করিয়া থাকে। উহাদের কারখানায় উৎপন্ন চামড়াও বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। এই সমস্ত চামড়া চীনা ক্রোম্ বলিয়া বিখ্যাত। অধিকাংশ জুতা (শতকরা ৮০ ভাগ) এই চীনা ক্রোম্ হইতে প্রস্তুত। কম দামের জুতার চাহিদাই বেশী। কাজেই সেই কম দামী জুতা প্রস্তুত করিতে এই চীনা ক্রোম এবং চীনা জুতা প্রস্তুত কারক একান্ত দরকার। এই চীনা ক্রোমের যে শুধু কলিকাতায় কাটতি হয় তাহা নহে। কলিকাতার বাহিরেও ইহা চলতি আছে তবে ভারতের বাহিরে রপ্তানি কখনও হয় না। কারণ, চীনা ক্রোম উৎকৃষ্ট চামড়া নয়।

চীনা ক্রোম্ জুতার উপরকার সাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। জুতার তলাকার জন্য যে চামড়া ব্যবহৃত হয় তাহার কারখানাও কলিকাতায় কম নহে। এই সমস্ত কারখানা টালিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী ৪নং পুলের নীচেই অবস্থিত। ইহাদের মালিক সবই পাঞ্জাবী জাট মুসলমান। "বার্ক ট্যানড্ সোল" তৈয়ারীর ব্যবসায় ইহাদের এক চেটিয়া। একচেটিয়া হইবার একটী কারণ, উহারা অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু। "সোল্ লেদার" প্রস্তুত প্রণালীও অতিশয় শ্রম এবং সময় সাপেক্ষ। সেই শ্রম একমাত্র পাঞ্জাবীরাই সহ্য করিতে পারে বলিয়া উহারা এই ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়াছে। আর কোন সম্প্রদায়কে এ কাজে দেখা যায় না। ইহাদের কারখানায় প্রস্তুত তলায় চামড়া বাজারে ৪নং সোল বলিয়া খ্যাত। কলিকাতার বাজারে যেমন ৮০% জুতার উপকার সাজের চামড়ার জন্য চীনা ক্রোম ব্যবহৃত হয়, ঐরূপ ৮০% ভাগ জুতার তলাকার জন্য এই ৪নং সোল্ ব্যবহৃত হয়। চীনা ক্রোম যেমন ভারতীয় চামড়ার বাজারে প্রতিযোগিতায় সুলভ ঐরূপ এই ৪নং সোল্ও সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। কাজেই জুতার বাজারের সমস্ত সুলভ জুতাই এই চীনা ক্রোম্ ও ৪নং সোল্ দ্বারা প্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই জুতা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়।

আর এক প্রকারের সোল্ লেদারের প্রচলন আছে, উহা জলন্ধর সোল্ নামে খ্যাত।

এই সোল্ লেদার পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর হইতে আমদানী করা হয়। তথায় উহা কুটীর-শিল্প। অধিকাংশ পাঞ্জাবী চামার উহা বাড়ীতে প্রস্তুত করিয়া হাটে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে। এই লেদার হাট হইতে ধনীরা ক্রয় করিয়া মজুত করে। পরে রপ্তানী করে। বাজার দর এবং জিনিষ হিসাবে ৫৫৲—৭৫৲ মণ পর্য্যন্ত বিক্রয় করে। বলা বাহুল্য, কলিকাতায় এই চামড়ার সব ব্যবসায়ী পাঞ্জাবী মুসলমান। মজবুতি হিসাবে এই সোল লেদার খুবই ভাল। জুতা প্রস্তুত করিবার জন্য আর এক প্রকার সোল্ লেদার ব্যবহৃত হয়, উহাকে রোল্ড বা কম্‌প্রেস্‌ড্ সোল্ বলে। ইউরোপীয় দোকান এবং দুই একটী খ্যাতনামা দেশী দোকান ব্যতীত উহার ব্যবহার হয় না, কারণ, উহার দাম খুব বেশী, তবে জিনিষ হিসাবে খুবই ভাল। কিন্তু আমাদের গরীব দেশে সস্তা জুতার চাহিদাই বেশী। কাজেই সাধারণ জুতায় উহা ব্যবহার হয় না। এই প্রকার দামী সোল্ ভারতবর্ষের মধ্যে কানপুর ও মাদ্রাজেই বেশী প্রস্তুত হয়। কলিকাতায় এক বার্ড কোম্পানী করিত। বর্ত্তমানে শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগীয় ট্যানারীতে কিছু কিছু প্রস্তুত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতায় ও সহরতলীতে চামড়া প্রস্তুত ব্যাপারে তিনটি সম্প্রদায়কে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে চীনারা ক্রোম চামড়া প্রস্তুত করে, পাঞ্জাবীরা সোল্ লেদার প্রস্তুত করে। আর এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা বাঙ্গালী মুসলমান। ইহারা পাঞ্জাবী ও চীনাদের মত কোন 'লাইন' আঁকড়াইয়া নাই। ইহাদের কেহ কেহ ভেড়ার ক্রোম পাকাইয়া অন্তরের চামড়া প্রস্তুত করে। কেহ কেহ গরুর ছাল পাকাই করিয়া হুড্ বার্ণিশ্‌ড্ লেদার প্রস্তুত করে। কারণ, ইহার কাটতি খুব বেশী। উহার তৈরী চটিজুতা এক কলিকাতা ব্যতীত আর কোথাও প্রস্তুত হয় না।

অথচ এই চটি জুতার প্রচলন সর্ব্বত্র খুব বেশী। কাজেই এই হুড্ বার্ণিশ প্রস্তুত কারবার কলিকাতায় একটী বড় কারবার। বাংলাদেশে এই হুড্ বার্ণিশের চটীজুতা শুধু পুরুষরাই ব্যবহার করেন, কিন্তু বাংলা ছাড়া পশ্চিমে এবং অন্যান্য দেশে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে খুব বেশী ব্যবহার করেন। যেখানে যেখানে এই চটি জুতার ব্যবহার আছে (ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র) সে সকল স্থানে এক কলিকাতা হইতে এডেন পর্য্যন্ত উহা রপ্তানী হয়। এখানে একটি কথা বলা একান্ত আবশ্যক যে, এই চটিজুতা রপ্তানীওয়ালা সবই পাঞ্জাবী মুসলমান।

পরিশেষে মাত্র দুই একটি কথা বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। ভারতবর্ষে যত প্রকার শিল্পের প্রতিষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে এই ঘৃণিত চর্ম্মশিল্প যে, কাহারও অপেক্ষা হীন নহে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ, যে সমস্ত চর্ম্ম এদেশে একেবারে প্রস্তুত হয় না, তাহা ব্যতীত অন্য চর্ম্ম আমদানী একেবারে বন্ধ। ইহাতে দেশের কিছু অর্থ দেশেই থাকিয়া যাইতেছে, এবং রপ্তানী হইয়া দেশের ধনাগম বৃদ্ধি করিতেছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত বিলাতী জুতা এদেশে আমদানী হইত, আজ কয়েক বৎসর যাবৎ আর তাহা হয় না বলিলেও চলে। কদাচিৎ দুই একটি বিলাতি দোকানে সামান্য রাখিতে দেখা যায়। বিলাতি দোকানের

এবং বিলাতি স্ত্রী, পুরুষের জুতা ৯০% এদেশের প্রস্তুত। সুতরাং এই জুতার তরপ হইতেও বিবেচনা করিলে দেশের যথেষ্ট ধনাগম হইতেছে। কাজেই এই শিল্পকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত শিল্প বলা হইয়াছে। সৌখীন ইংরেজ আমাদের প্রস্তুত জিনিষের মধ্যে এক জুতা ব্যতীত আর অন্য কোন জিনিষ বিশেষ ব্যবহার করেন না। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক চটিজুতা ছাড়া অন্য কোন জুতা প্রস্তুত হইত না। তখন দেশের আপামর সাধারণ অবস্থার জন্যই হউক, বা জুতার মূল্যাধিক্য বশতঃই হউক, জুতা পরিবার সুবিধা ছিল না। পরে এই একনিষ্ঠ কঠোর পরিশ্রমী জুতা ব্যবসায়ী এদেশে জুতার ব্যবসায় আরম্ভ করার ফলে দেশের সর্ব্বসাধারণের পক্ষে জুতা ব্যবহার করিবার সুবিধা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি জুতার আমদানীও বন্ধ হইয়াছে। ইহাতে দেশের কিঞ্চিৎ অর্থাগমের সুবিধা হইয়াছে। তবে চীনাদের দেশে বেশ কিছু টাকা চলিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের লোক যদি চীনাদের স্থলে আসিত, তবে আক্ষেপ হইত না, কিন্তু ভারতবর্ষে চীনাদের মত অধ্যবসায়ী এবং কঠোর পরিশ্রমী লোক দেখিতে পাই না।

সম্প্রতি হরিজন উত্তোলন কার্য্যে ব্রতী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি হইতে তত্রস্থ ভাগাড় ইজেরা লইয়াছেন। তিনি অসামান্য কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় দিয়া কয়েক জন মাত্র বাঙালী যুবক আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছেন। তিনি স্বয়ং রাসায়নিক, এই কারণে চীনা অপেক্ষা ভাল পরিষ্কৃত চর্ম্ম (Tanned Leather) প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এই চর্ম্মে প্রস্তুত জুতা আমাদের খাদি প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় হইতেছে।

যাহাতে পাড়াগাঁয়ে পরিষ্কৃত চর্ম্ম সাধারণে প্রস্তুত করিতে পারে, এই পরীক্ষার জন্য এখানে মূল্যবান যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় না। যদিও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, যে অতি সামান্য বাসা খরচ (৫৲ টাকা মাত্র) দিয়া শিক্ষানবীশদিগকে রাখা হইবে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাহাতে তেমন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ টাকায় কলম পেশা করিয়া আজীবন কাটাইবে কিন্তু "এই ঘৃণিত" কাজ শিখিবে না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত ২।৩ বছরে চীনারা ঢাকা সহরে তাহাদের ব্যবসাক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছে। পূর্ব্বে কয়েকজন মুসলমান দোকানদার পাইকারী হিসাবে কলিকাতা হইতে জুতা আমদানী করিত। কিন্তু চীনারা (স্ত্রী ও পুরুষে) স্বয়ং যাইয়া ১৫।১৬ খানা জুতার দোকান খুলিয়া বসিয়াছে এবং বলা বাহুল্য, সমস্ত বাঙালী দোকানদারগণ ক্রমশঃ উৎখাত হইতেছে। কারণ, এই প্রতিযোগিতায় তাহারা টিকিতে পারিতেছে না।

সর্ব্বশেষে অতি হীন অবস্থা হইতে বহু ক্রোড়পতি হইয়াছেন এমন একজন জুতা ব্যবসায়ীর নাম করিব। চেকোস্লোভাকিয়া দেশের বাটা (Bata) আজ পৃথিবীময় তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছেন। অবশ্য তিনি আর নাই, কিন্তু কলিকাতার নিকটেই নঙ্গীতে ইহাদের বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে ইহাদের দোকান ও শো-রুম। জুতার ব্যবসায়ে বাটা কোং ক্রমশঃ অক্টোপাসের ন্যায় কলিকাতা সহরকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘেরাও করিতেছেন। বাটা প্রথম জীবনে সামান্য জুতার কাজ করিতেন, যোগ্যতা গুণে উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন।*

* এই সংখ্যাতেই জুতা ব্যবসায়ী বিখ্যাত টমাস বাটার আত্ম জীবনী নামক চিত্তাকর্ষক ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ বাহির হইল।

আমরা ফাল্গুন মাসের সংখ্যায় ভারতে বৈদেশিক জিনিষের আমদানীর একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছি। এবারে অনেক গুলি আমদানী জিনিষের বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, এদেশের ধনী ও উদ্যোগী বুদ্ধিজীবিগণ একত্রে মিলিলে এই তালিকায় প্রকাশিত অনেক জিনিষের কারখানাই এদেশে স্থাপন করিতে পারেন। তাহাতে নিজেরা যেমন লাভবান হইবেন তেমনি অনেক বেকার এবং অভাবগ্রস্ত লোকের দুঃখ দূর করিতে পারিবেন।

ঔষধ পত্র :—

আলোচ্য বৎসরে ১কোটী ৯২ লক্ষ টাকার ঔষধ পত্র আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা যদিও এক লক্ষ টাকা কম, তবুও ঔষধ পত্রের মধ্যে পেটেণ্ট ঔষধের আমদানী পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

কাগজ ও পেষ্ট্ বোর্ড :—

আলোচ্য বৎসরে ২কোটী ৭৩ লক্ষ টাকার কাগজ ও পেষ্ট্ বোর্ড আমদানী হইয়াছে। উহা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১০ লক্ষ টাকা বেশী। ২ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকার কেবল সকল রকমের কাগজ আমদানী হইয়াছে। ছাপার কাগজের আমদানী পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৯ লক্ষ টাকা কম হইয়া ৭৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। খবরের কাগজ ছাপিবার কাগজের আমদানী পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৬ লক্ষ টাকা কম হইয়া ৪০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এক কথায় সকল রকম ছাপার কাগজই কম আমদানী হইয়াছে। পেষ্ট্ বোর্ডের আমদানী পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ভারতে পেপার ও পেষ্ট বোর্ডের আমদানীতে কোন্ কোন্ দেশের শতকরা কি রকম ভাগ আছে নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইল :—

দেশ	১৯১৩-১৪	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
	যুদ্ধের পূর্ব্বে		
যুক্তরাজ্য	৫৬·২	৩৩·৭	৩৪·৬
নরওয়ে	৫·১	১৫·২	১১·৫

দেশ	১৯১৩-১৪	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
	যুদ্ধের পূর্ব্বে		
আমেরিকার			
যুক্তরাষ্ট্র	০·৮	২·২	২·২
সুইডেন	৩·২	১২·৭	১৩·২
নেদার ল্যাণ্ডস্	২·৫	৪·৩	৪·৪
জাপান	১·০	৪·৭	৩·৯
জার্ম্মাণী	১৭·৩	৭·৭	৯·৬
য়া	৮·৩	৯·৭	৭·৮
অপরাপর দেশ	৫·৬	৯·৮	১২·৮
মোট	১০০	১০০	১০০

দেশ	১৯১৩-১৪	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
	যুদ্ধের পূর্ব্বে		
এডেন ও তাহার অধীন রাজ্য সমূহ	১৯·১	৭৭·৫	৭৮·০
ইজিপ্ট্	১৩·৯	৩·০	৩·৪
যুক্তরাজ্য	২২·৫	০·১	০·১
স্পেন	১৫·০	০·৬	
জার্ম্মানী	৮·৮	১৫·১	১৬·০
ইতালীয় পূর্ব্ব আফ্রিকা	৮·১	৩·৫	২·১
অপরাপর দেশ	১২·৬	০·২	০·৪
	১০০	১০০	১০০
মোট আমদানী			
টন	৬০৭,৩০০	৩৭২,৭০৩	৩৭৭,৫৫৮

মন্ত দ্রব্যাদি ঃ—

আলোচ্য বৎসরে মন্ত দ্রব্যাদির আমদানী পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

লবণ ঃ—

আলোচ্য বৎসরে ৫২ লক্ষ টাকার বিদেশী লবণ আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে হিসাব ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৩৪-৩৫ সালে ২ লক্ষ টাকার আমদানী বাড়িয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আমদানীকৃত লবণের ওজনের- পরিমাণ হইল ৩৭৮,০০০ টন ; পূর্ব্ব বৎসরে উহা ছিল ৩৭৩,০০০ টন। ভারতে লবণ আমদানী ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের শতকরা কি পরিমাণ ভাগ আছে নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল :—

মসলাপাতি ঃ—

আলোচ্য বৎসরে ১কোটী ৫৫ লক্ষ টাকার মসলা-পাতি আমদানী হইয়াছে ; পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা ১৮ হাজার টাকা কম। তন্মধ্যে ১ কোটী ০২ লক্ষ টাকার হইতেছে সুপারী। লঙ্কা আমদানী হইয়াছে দেড় লক্ষ টাকার, পূর্ব্ব বৎসরে হইয়াছিল সড়ে তিন লক্ষ টাকার। লবঙ্গ আমদানী হইয়াছে ৩১ লক্ষ টাকা, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩ লক্ষ টাকা কম।

কাচ ও কাচের দ্রব্যাদি ঃ—

আলোচ্য বৎসরে ১৩৩ লক্ষ টাকার কাচ ও কাচের দ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছে ; পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা ১১ লক্ষ টাকা বেশী। জাপান হইতে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ মাল আসিয়াছে, তাহার মূল্য হইতেছে ৬৪ লক্ষ টাকা।

মূল্যবান পাথর :—

আলোচ্য বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকার মূল্যবান পাথর ও মুক্তা আমদানী হইয়াছে ; পূর্ব্ব বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল ৭৫ লক্ষ টাকা।

তামাক ও সিগারেট :—

আলোচ্য বৎসরে ৬২ লক্ষ টাকার তামাক ও সিগারেট আমদানী হইয়াছে ; পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা দশ লক্ষ টাকা কম। কেবল সিগারেটের আমদানী পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তামাকের আমদানী ১৪ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। সিগারেট বিলাত হইতেই বেশী আমদানী হইয়াছে ; উহার মূল্য হইতেছে ২১ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে উহার মূল্য ছিল প্রায় ১৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা।

সিমেণ্ট :—

আলোচ্য বৎসরে সিমেণ্টের আমদানী ২ লক্ষ টাকা বাড়িয়া গিয়া ২৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। উহার ওজন-পরিমাণ হইতেছে ৬৭০০০ টন। বেশীর ভাগ সিমেণ্টই (৪৬ হাজার টন) বিলাত হইতে আসিয়াছে, উহার মূল্য হইল ১৮ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে ইহা ছিল ১৪ লক্ষ টাকা। ভারতে উৎপাদিত পোর্টল্যাণ্ড্ সিমেণ্টের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে ; আলোচ্য বৎসরে উহার পরিমাণ হইতেছে ৭৬৪,০০০ টন।

কয়লা :—

আলোচ্য বৎসরে ৯ লক্ষ টাকার বিদেশী কয়লা আমদানী হইয়াছে, উহার ওজন পরিমাণ হইতেছে ৫৭০০০ টন। ১৯৩৩-৩৪ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৫৬০০০ টন কিন্তু আলোচ্য বর্ষে উহার পরিমাণ বাড়িলেও মূল্য বাড়ে নাই।

নিম্নে বিভিন্ন দ্রব্যসমূহের একটি আমদানী-তালিকা দেওয়া হইল :—

দ্রব্য	১৯১৩-১৪	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
	যুদ্ধের পূর্ব্বে লক্ষটাকা	লক্ষটাকা	লক্ষটাকা
ইলেকট্রিক ও অপরাপর যন্ত্রপাতি, এ্যাপারেটাস্ ইত্যাদি	১৮২	৪০২	৪৭৩
রং করিবার ও ট্যান্ করিবার সামগ্রী	১৪১	২৪৬	৩০৮
মসলাপাতি	১৭৩	১৫৬	১৫৫
কাচ ও কাচের দ্রব্য	১৯৫	১২২	১৩৩
মূল্যবান পাথর ও মুক্তা	১০৭	৭৫	৫০
সিগারেট ও তামাক	৭৫	৭২	৬২
সিমেণ্ট	৬৬	২২	২৪
কয়লা	১১	১৪	১২

যন্ত্রপাতির আমদানী—

আমদানী দ্রব্য			১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
			লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
ধাতু কার্য্যের		যন্ত্রপাতি	১৬ ,,	১৪ ,,
খনি	,,	,,	৩২ ,,	৫২ ,,
তৈল	কারখানার	,,	২৭ ,,	২১ ,,
চাউল ও ময়দা	,,	,,	৭ ,,	১০ ,,
কাগজের	,,	,,	১১ ,,	৯ ,,

আমদানী দ্রব্য	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
রেফ্রিজারেটর মেসিনারী	৯ ,,	১১ ,,
করাত ,,	৬ ,,	৩ ,,
সেলাই ও বুননের ,,	৫০ ,,	৮৩ ,,
চিনির কলের ,,	৩৩৬ ,,	১০৫ ,,
চাবাগানের ,,	১২ ,,	২২ ,,
তুলাজাত দ্রব্যের কারখানার যন্ত্রপাতি	২০৩ ,,	২৪১ ,,
পাটকলের মেসিনারী	৩২ ,,	৫৪ ,,
পশম কারখানার ,,	৩ ,,	২ ,,
টাইপ রাইটিং ,,	১০ ,,	১৮ ,,
ছাপা ও লিথো মেসিন	১৫ ,,	১৫ ,,
বেল্টিং যন্ত্রপাতি	৪৬ ,,	৫০ ,,

(ক্রমশঃ)

জার্ম্মাণীর ইকনমিক প্ল্যানের সহিত আমাদের অবস্থার তুলনা

আমাদের দেশ বেকার বহুল ও দারিদ্র্যগ্রস্ত। এই বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য যে শুধুই আমাদের একচেটিয়া সম্পত্তি এ-রকম মনে করবার কোন কারণ নেই, তবে আমাদের এখানে দুর্দ্দশার যে রকম শোচনীয় পরিণাম, সভ্যদেশের অপর কোথাও সে-রকম নয়। রুশিয়ার জনসাধারণ একসময় আমাদেরই মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিল, কিন্তু আজ তাদের অবস্থার উন্নতি সভ্যজগতের বিস্ময় উৎপাদন করে। জার্ম্মাণীতে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেকারের সংখ্যা ভয়ঙ্কর প্রবল ছিল, কিন্তু সেখানকার জবরদস্ত হিটলার গভর্ণমেণ্ট বেকারের সংখ্যা দূরীকল্পে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে আমাদের গভর্ণমেণ্টের তা' দেখে লজ্জা পাওয়া উচিত। জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টও স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু জনসাধারণের উন্নতির ব্যবস্থা তাদের ঢের ভাল, কারণ, জনসাধারণকে তুষ্ট না রাখ্‌তে পারলে তারা যে গভর্ণমেণ্ট উল্টে পাল্টে দেয়।

জার্ম্মাণ কন্‌সাল্‌ জেনারেল জার্ম্মাণীর সামাজিক উন্নতি সম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে যে বক্তৃতা দিয়ে ছিলেন, তার থেকে জার্ম্মাণীর অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

এই কয়েক বছরের মধ্যে জার্ম্মাণীর এই যে অবস্থান্তর, তা' ঘটেছে হিটলারের চেষ্টায়। হিটলার নিজে বলেছেন যে, অর্থনীতির লক্ষ্য থাকা উচিত জাতীয় উন্নতি। জাতীয় উন্নতি মানেই হ'ল জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার উন্নততর প্রচেষ্টাবিধান। সেইজন্যই নাজী গভর্ণমেণ্ট্‌ সাম্যবাদীর দৃষ্টিতে দেখলে সেখানকার অধিবাসীদের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার চালাচ্ছে বটে, কিন্তু সম্রাজ্যবাদী আমাদের গভর্ণমেণ্টের তুলনায় অনেক ভাল কাজও করছে। ভাল কাজ মানে ত আর কিছু নয়, যাতে দেশের জনসাধারণ খেয়ে পরে ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারে তারই ব্যবস্থা করা। আমাদের দেশে কোনক্রমে বেঁচে থাকা ত দূরের কথা, লোকে খালি মরছে ত মরছেই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশ অভিভাবকহীন নয়, কারণ, অভিভাবকরূপে রয়েছেন স্বয়ং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট।

জার্ম্মাণীও ত একটা সাম্রাজ্যবাদী দেশ। দেশের লোকের ওপর সে কম জবরদস্তি চালায় না, অথচ সেখানকার সরকার পর্য্যন্ত লোককে দু'মুঠো খেতে দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। সেখানকার বেকার সমস্যা, অন্নসমস্যা প্রভৃতি দুর্দ্দশা ঘোচাতে সরকার যে সমস্ত আইন প্রণয়ন এবং বিধিব্যবস্থা করে তা' ভেবে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। আর হতভাগ্য আমরা! আমাদের রোগ-শোক-অনাহার-দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য যেন একটা

প্রাকৃতিক অবশ্যম্ভাবী পুনরাবৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের শিক্ষা হারের বিষয় সভ্য জগত কেন, বর্ব্বর জগতকে পর্য্যন্ত লজ্জা দেয়। আমাদের অভিভাবক বৃটিশরাজ কি এগুলো দেখ্‌তে পান্‌ না? দেশ কি কেবল শাসন করবার জন্য? সুন্দর ও সমৃদ্ধ করবার জন্য নয়?

আমরা এত কথা বলতে বাধ্য হ'লাম শুধু জার্ম্মাণীর বিধি ব্যবস্থা দেখে। জবরদস্ত হিটলারী গভর্ণমেণ্ট যদি পারে ত বৃটিশরাজ কেন পারবে না? ভৌগলিক অবস্থার গুণে আর্থিক দিক দিয়ে জার্ম্মাণীর চেয়ে আমাদের অবস্থা অনেক ভাল। আমাদের এখানে প্রকৃতিদত্ত সম্পদ এত বেশী যে গত দু'শো বছর ধরে ইউরোপীয় বণিকগণ আমাদের দেশ শোষণ করেও একেবারে নিঃস্ব ক'রতে পারে নি। পুরুষানুক্রমে আমরা কি কেবল শোষিত হ'তে এসেছি আর শোষিত হয়েই যাব? ট্রেড্‌ ব্যাল্যান্স আমাদের রপ্তানীর অনুকূলে থাকে, তবুও আমরা টাকার মুখ দেখতে পাই না। আমরা অপরাপর দেশের খাদ্য উৎপাদন করে চালান দিই, কিন্তু আমরা নিজেরা থাকি অনাহারে; অথচ জার্ম্মাণীর দেশে তেমন টাকা নেই, দেশের অনেক টাকা তার বেরিয়ে যায় বিদেশ থেকে কাঁচা মাল ও খাদ্য আমদানী করতে, তবুও সে দেশের সরকার বেকারদের ব্যবস্থার জন্য ১৫ কোটি মার্ক মুদ্রা মঞ্জুর করে; রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, খাল খনন, বাড়ী তৈরী প্রভৃতি নতুন নতুন প্রচেষ্টার দ্বারা কর্ম্মহীনদের কাজ দেয়। আর আমাদের দেশে, ১৫ কোটি ত দূরের কথা বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনও প্ল্যান বা কার্য্যপ্রাণালী গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন নাই।

জার্ম্মাণ সরকার তাদের দেশের অধিবাসীদের অভাব দূরীকরণে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন সেটাই দেখা যাক্‌। এ সম্পর্কে ১৯৩৩ সালের ১লা জুন ১ম আইন ও উক্ত সালের ২১শে সেপ্টেম্বর ২য় আইন পাস হয়। উক্ত আইন দুটিই বেকার সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত, ওদুটির প্রধান ধারাগুলি এইরূপ :—

১। সকল প্রকার নূতন প্রচেষ্টা আরম্ভ করবার মানসে সরকার কর্ত্তৃক এক কোটি মার্ক সাহায্য করণ।

২। যে সমস্ত কারখানার যন্ত্রপাতির পুনঃস্থাপনা হ'বে তাদের ট্যাক্স্‌ রেহাই।

৩। জাতীয় শ্রমজীবীদের উন্নতিকল্পে ফাণ্ড্‌ সৃষ্টির একটি স্কীম্‌ গ্রহণ।

৪। যে সমস্ত লোক বিবাহ করতে চায় তাদের জন্য একটী বিবাহ-ভাতা প্রদান।

৫। বাড়ী মেরামত পুনঃস্থাপনা, পরিবর্ত্তন ও প্রসারণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ৬০ কোটি মার্ক বরাদ্দ করণ।

৬। প্রয়োজনানুসারে বাড়ী ও কৃষিক্ষেত্রের ট্যাক্স্‌ রেহাই।

৭। যাদের গৃহ নাই, তাদের গৃহ নির্ম্মাণে সুবিধা দান।

উপরোক্ত ধারাগুলি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'বে যে, জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা দূরীকরণে সাম্রাজ্যবাদী জার্ম্মাণী অনেকখানি চেষ্টা করছে।

মোটরশিল্পের উন্নতিবিধানকল্পেও জার্ম্মাণী নিশ্চেষ্ট থাকে নি। মোটরগাড়ীর বিক্রয় বৃদ্ধি মানসে ১৯৩৩ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখ হ'তে এক আইন প্রবর্ত্তিত হয় যাতে করে সমস্ত নতুন মোটর গাড়ীকে ট্যাক্স্‌ থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। উক্ত সালের ২৩শে জুন তারিখে জার্ম্মাণীর

মোটরের রাস্তা সম্পর্কে এক প্রচেষ্টার ব্যবস্থা হয়। তার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র মোটর চলাচলের জন্য ৬০০০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা তৈরী হবে। রেলের যা রাস্তা আছে তা' ত রইলই, তা' ছাড়া এই অতিরিক্ত মোটর পথের ব্যবস্থা। এতে ক'রে ৫ লক্ষ লোক ছয় বছরের জন্য কাজ পেয়েছে। এই যে সমস্ত পথঘাট নির্ম্মাণ ইত্যাদি প্রচেষ্টা দেশের পক্ষে ওর হয়ত তখনই কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু দেশের লোককে কাজ দেবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ করে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যাতে ভাল হয় সেইজন্য জার্ম্মাণ সরকারের ওগুলি হ'ল প্রাথমিক পরিকল্পনা; এতে করে দেশে অপরাপর প্রতিষ্ঠান সমূহ এসম্পর্কে অগ্রণী হতে পারে। ১৯৩২ সালের শেষের দিকে জার্ম্মাণীতে বেকারের সংখ্যা ছিল ৭০ লক্ষের উপর, উক্ত সব প্রচেষ্টা গ্রহণের ফলে সে সংখ্যা নেমে ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে।

বস্তুতঃ হিট্‌লার গভর্ণমেণ্ট যখন শাসনভার গ্রহণ করেন তখন দেশের সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল বেকার সমস্যা। হিসাব পত্র থেকে জানা যায় যে, জার্ম্মাণীতে তখন বেতন ভোগী সর্ব্বরকমের চাকুরীজীবির সংখ্যা ছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ। আর বেকারের সংখ্যা যে কত ছিল তা' ত পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল দেশের ঐ বেকার বাহিনী। তাদের সাহায্যকল্পে গভর্ণমেণ্ট্ ১৫ কোটি মার্ক মুদ্রা বরাদ্দ করেন।

বেকার সমস্যা সমাধান কল্পে গভর্ণমেণ্টের ত এই ব্যবস্থা। কিন্তু শুধু বেকার সমস্যার সমা-

ধান করেই গভর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত থাকে নি, কৃষি প্রচেষ্টার দিকেও মনোযোগ দিয়েছে। সকলেই জানেন যে, জার্ম্মাণীর কাঁচামালের বড়ই অভাব, খাদ্যও তাকে বিদেশ থেকে আনতে হয়। তাই হিটলার গভর্ণমেণ্ট্ কৃষির দিকেই নজর দিলে। তার লক্ষ্য হ'ল জার্ম্মাণীর কৃষিকার্য্যের পুনরুদ্ধার করা। এই কৃষি কার্য্যের পুনরুদ্ধার হলে জার্ম্মাণীকে খাদ্যের জন্য অনেকাংশে অপরদেশের ওপর আর নির্ভরশীল হ'য়ে থাকতে হবে না।

বেকার সমস্যা সমাধানের বেলায় গভর্ণমেণ্ট যেমন একটা সুস্পষ্ট প্ল্যান বা পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, কৃষি সম্পর্কেও গভর্ণমেণ্ট তেমনি আইনজারী করে কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি, মূল্যের সমতা-রক্ষা, উৎপাদন প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থা করেছেন। তা' ছাড়া কৃষির উন্নতির জন্য সারা জার্ম্মাণীতে "গ্রামে ফিরে যাও" "গ্রামে ফিরে যাও" বলে আন্দোলন উপস্থিত করা হয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল সহরের অত্যধিক লোক সংখ্যাকে গ্রামে ঠেলে দেওয়া। এক একটা সহরে অপর্য্যাপ্ত শ্রমিক এসে পড়েছিল তাতে সেই সেই সহরে বেকারের সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়ে একটা দারুণ সমস্যার সৃষ্টি করল। এখন কৃষি সম্পর্কীয় প্ল্যান্ অনুযায়ী সেই অতিরিক্ত শ্রমিকদের গ্রামে ঠেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল। তা-ছাড়া আইন করে গ্রাম থেকে সহরে শ্রমিক আমদানী বন্ধ করা হ'ল। এছাড়াও সহরের শ্রমিকদের মধ্য থেকে ১ লক্ষ ১০ হাজার বালক শ্রমিককে চাষীদের সাহায্য করার জন্য গ্রামে চালান দেওয়া হ'ল, তারা সব গ্রামে যাওয়ার পূর্ব্বে অবশ্য এসম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল।

এতৎসংক্রান্ত প্রধান আইন পাশ হয় ১৯৩৪ সালের ৩রা জুলাই ও ১৯৩৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। উক্ত আইনের সার মর্ম্ম হচ্ছে—সহরের ঘন বসতির প্রতিকার; গ্রাম থেকে সহরে বসতি উঠে আসা বন্ধ করা; গ্রামবাসীদের বাসগৃহের উন্নতির ব্যবস্থা; দেশের প্রয়োজনানুসারে আনুপাতিক শ্রমজীবী নিয়ন্ত্রণ; ব্যবসার কোন ক্ষতিসাধন না করে বৃহৎ বৃহৎ সহর থেকে শিল্পসমূহকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। কৃষকেরা ভালভাবে জীবন যাপন করতে গেলে তাদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ দরকার। এর মানে এই নয় যে, তারা জমকালো বাড়ীতে বাবুর মত জীবন কাটাবে, এর মানে এই যে, তাদের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য তাদের যোগ্য বাসগৃহ থাকবে। বাসগৃহ উপযুক্ত না থাকলে কৃষকদের কি অবস্থা ঘটে তা' বাংলা দেশের লোক মাত্রই অবগত আছেন। এখানকার চাষীদের চালে খড় নেই; দেওয়ালে মাটী নেই, মেঝে ড্যাম্প বা স্যাঁতাযুক্ত, সুতরাং তাদের স্বাস্থ্যও হয় অনবরত জরগ্রস্ত। এই জিনিসটা বুঝেই জার্ম্মাণ সরকার কৃষকদের বাস গৃহের উপযুক্ত বন্দোবস্তের দিকে মনোনিবেশ করেছে। গৃহ নির্ম্মাণ বাবদ মালিককে খরচের শতকরা কুড়িভাগ দিতে হবে এবং বাদবাকী তাকে সরকারী তহবিল হ'তে ঋণ বাবদ সাহায্য করা হ'বে। ১৯৩৩ সালে এসম্পর্কে ১১ কোটী, ২২ লক্ষ, ৫০ হাজার মার্ক বরাদ্দ করা হয়েছিল। তারপর বহু নতুন বসতি স্থাপিত হয়েছে। এই রকম আরও বাসগৃহের প্রয়োজন আছে, কেন না, জার্ম্মাণী আজ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে অধিকতর মনোযোগ দিয়েছে। সেখানকার নতুন বাসগৃহ নির্ম্মাণের সংখ্যা

হচ্ছে—১৯৩৩ সালে ২০২১১৩, ১৯৩৪ সালে ৩১৯৪৩৯।

এসব ত গেল অর্থনৈতিক ব্যাপার। সামাজিক ব্যাপারেও জার্ম্মাণী অনেক সংস্কার সাধন করেছে। শ্রমিকদের জন্য ইন্সিওরেন্স্ ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছে, তাদের জীবনযাত্রা যাতে একটু উন্নত হয় সেদিকেও সরকারের নজর আছে। ফ্যাক্টরীতে আকস্মিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। শারীরিক অঙ্গহানিতে যারা ভুগেছে (যেমন কাণা কিংবা খোঁড়া) তাদের যথাযোগ্য রক্ষা বিধান আছে।

জার্ম্মাণীর ব্যাপার এই পর্য্যন্ত থাক্। আমাদের কথা হচ্ছে যে, আমাদের অভিভাবক রাজ আমাদের দিকে একটু নেক্-নজর করুন না কেন? জবরদস্ত হিটলার সরকার যদি তাদের দেশের লোকের উন্নতি করতে পারে ত উদার বৃটিশরাজ কি তার কাছে হঠে যাবেন? জার্ম্মাণ সরকারের যে সমস্ত বিষয়ে বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পায়, বৃটিশরাজের বুদ্ধিমত্তা কি সে সমস্ত যায়গায় একবারে ভোঁতা? হিটলার বুঝেছিলেন যে, দেশের লোককে যদি সুখে রাখতে না পারি ত দেশ কিছুতেই নাজী-গভর্ণমেণ্টকে টিকৃতে দেবে না। জার্ম্মাণ সম্রাট কৈজারের মত তাঁকেও যেতে হবে। কারণ, দেশের লোক অসন্তুষ্ট থাকলে গভর্ণমেণ্ট্ টেঁক্‌বে না। এসম্পর্কে বৃটিশ রাজের কি অভিমত জানিনে, কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশেই দেশের লোকের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাওয়ামাত্রই গভর্ণমেণ্টের পতন ঘটেছে, কোন স্বেচ্ছাচার কিংবা নিপীড়নের দ্বারা তা' ঠেকানো যায় নি। আমাদের দেশে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ যে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাচ্ছে তা' কি এই জেনারেল ইলেক্‌শনের ফল দেখে বৃটিশরাজ টের পাচ্ছেন না? যে কংগ্রেস British Constitution এবং বর্ত্তমান কাউন্সিল ধ্বংস করতে চায়, দেশের জন সাধারণ সেই কংগ্রেসকে অসংখ্য ভোটে জয় যুক্ত করেছে। এখনো যদি গভর্ণমেণ্ট চোখ বুজে থাকেন, ত একদিন চোখ খুলে দেখবেন যে শোধরাবার সময় অনেক আগে অতীত হয়ে গেছে।

দেশের "লোককে কি করে সুখে রাখতে হয়," অর্থাৎ দেশকে কি উপায়ে সমৃদ্ধ করতে, হয় সে কথা আমরা বহুবার আলোচনা করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, গভর্ণমেণ্ট সে কথায় কর্ণপাত করেন নি। আজ বেগতিক দেখে তাঁরা বৃত্তিমুলক শিক্ষা, কৃষিঋণ লাঘব ব্যবস্থা, সমবায় আন্দোলন ইত্যাদির দ্বারা দেশের হিত করবার সামান্য চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু দেশজোড়া বিরাট হাহাকারের মধ্যে সে-ব্যবস্থা আর কতটুকু? সমুদ্রের মধ্যে এক বিন্দু বারির মতই নয় কি? দেশের প্রধান সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য ও বেকারাবস্থা। সেইটা দূর করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যদি কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা করেন ত দেশবাসী তাতে আশ্বস্ত হতে পারবে। পূর্ব্বেই বলেছি হিট্‌লার গভর্ণমেণ্ট্ এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছিল। তাই জার্ম্মাণীতে রাস্তাঘাটের সংস্কার, অট্টালিকা নির্ম্মাণ, নূতন নূতন বসতিস্থাপন ইত্যাদি কার্য্য সৃষ্টি করে বেকারদের উপজীবিকার ব্যবস্থা করেছিল। আমাদের গভর্ণমেণ্ট কি এইরূপ একটা ব্যাপার, প্ল্যান বা কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন না? দেশজোড়া হাহাকার ও ক্রন্দনের উৎরোল শুনেও কি তাঁরা চুপ করে

থাকবেন? জার্ম্মাণীর দেখেও কি তাঁদের চোখ ফুট্‌বে না?

জার্ম্মাণীর ব্যাপার থেকে আর একটা জিনিস আমাদের সরকারের ভাববার আছে, সেটা হ'চ্ছে যে, দেশের হিতের জন্য জার্ম্মাণ সরকারের মুক্ত হস্তে অর্থব্যবস্থা। বেকারদের সাহায্যের জন্য ১৫ কোটি মার্কের ওপর তারা ব্যবস্থা করেছে, গৃহহীনদের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বহু টাকা তারা বরাদ্দ করেছে। আর আমাদের অভিভাবক রাজ? বেকারদের জন্য ক' পয়সা তাঁরা ব্যয় করেন? গৃহহীনদের জন্য কিছু সাহায্য কি এ পর্য্যন্ত করেছেন তাঁরা?

মোটকথা, এসম্পর্কে আমাদের আর বেশী কিছু বলবার নেই। আমরা তুলনামূলক আলোচনা থেকে দেখিয়েছি যে দু'টি সরকারের দেশের লোকের হিত করবার ব্যবস্থার মধ্যে কত না প্রভেদ। নাজী গভর্ণমেণ্টকে আমরা জবরদস্ত অত্যাচারী বলে অভিহিত করে থাকি, রাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যাচার সে কম করে না। কিন্তু দেশের লোকের খাওয়া-পরার ব্যবস্থাও সে করে।

আমরা আসল বিষয় যথাযথ বিবৃত করলাম, নইলে গভর্ণমেণ্টের নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখন গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এধারে আকৃষ্ট হ'লেই ভাল হয়।

আর্থিক দুরবস্থা দূরীকরণে জমিদারদের কর্ত্তব্য

খবরের কাগজের সংবাদে প্রকাশ যে ভাগ্যকুলের জমিদার, কুমার প্রমথনাথ রায় মহাশয় একটি আলোচনা সভায় বলেছেন যে, শিক্ষিত বেকার যুবকদের কষ্ট লাঘবার্থে বৃত্তি মূলক কোন ব্যবস্থার জন্য তিনি পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করবেন। ঐ টাকার দ্বারা বেকারদের অল্প মূলধনী ছোট ছোট কারবার সুরু করতে সাহায্য করা হবে।

উদ্দেশ্য মহৎ, সময়োপযোগী ও সাধু। অন্যান্য জমিদারগণ যদি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন ত শোষণকারী জমিদার বলে জমিদার নামের ওপর যে একটা আতঙ্ক আছে তা' দূরীভূত হ'বার একটা ব্যবস্থা হয়। সহস্র সহস্র নিরন্ন উপবাসী প্রজার কাছে অত্যাচারী জমিদার নামে যে একটা বিভীষিকা আছে, এতে করে তার খানিকটা উপশম হয়।

বাস্তবিক পক্ষে জমিদারদের নিকট হইতে আমরা এই রকম জিনিষই আশা করি। জমিদার কথার আর একটা প্রতিশব্দ হ'ল ভূস্বামী। ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই আমরা দেখতে পাব যে, তার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ভূস্বামীদের অমর কীর্ত্তি কলাপ জড়িয়ে রয়েছে। আগেকার যে সমস্ত কাব্য উপাখ্যানাদি লিপিবদ্ধ আছে তার মধ্যেও ভূস্বামীদের ভূয়সী প্রশংসা দেখতে পাই। এ প্রশংসা তাঁদের অযথা করা হয় নি, এ প্রশংসা পাওয়ার তাঁরা সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন।

ইতিহাস আজ গণতন্ত্রাভিমুখী। অর্থাৎ একজনের জয়গানে সমাজ আজ আর সন্তুষ্ট থাকতে পাচ্ছে না, সে চাচ্ছে বহুর জয়গান। ইতিহাসের এই গণতন্ত্রাভিমুখী হওয়াটা ক্রম বিবর্ত্তনবাদের যে একটা আবশ্যক অংশ, এ কথা আমরা স্বীকার করি, আরও স্বীকার করি যে, মানবের কল্যাণের জন্য এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এটাও ভেবে দেখবার যে, ইতিহাসের এই পরিবর্ত্তনেরও একটা মনস্তত্ত্ব আছে। ইতিহাস যখন একের পূজা করে এসেছে, তখন তাকে শুধু মাত্র এক হিসাবে করে নি, একের মধ্যে বহু-র প্রতিনিধিত্বকেই করেছে। ইতিহাসের সেই অসীম ক্ষমতাশালী এক, তখন ছিল বহু-র প্রতিমূর্ত্তি, একের মধ্যে বহু-র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে তা' বহু-কে অন্ন দিয়েছে, বস্ত্র দিয়েছে, মানবের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যে মনের শান্তি, তাও দিয়েছে। এক তখন যেমন শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করত, তেমনি তার বিনিময়ে প্রাচুর্য্যকে নিলিয়েও দিত। ইতিহাসের সেই এক, তখন বলহীন ছিল না, সে ছিল বলশালী, পৌরুষে ভরা।

তারপরে সেই একত্ব যখন সময় গুণে

গণতন্ত্রের রূপ নিলে তখন সভ্যতার ক্ষেত্রে তা' উন্নতির পরিচায়ক হলেও আর্থিক ক্ষেত্রে তা' এক দুর্দ্দিনের সৃষ্টি করলে। ইতিহাসের সামন্ত যুগকে অতিক্রম করে আসা ধনতান্ত্রিক যুগের অবশ্য প্রয়োজন ছিল, কেননা, সভ্যতার ক্ষেত্রে সমাজকে তা' আর এক ধাপ এগিয়ে দিলে। কিন্তু তখন থেকেই সুরু হ'ল আধুনিক যুগ অর্থাৎ আর্থিক জটিলতার যুগ। সেই আর্থিক জটিলতার যুগের আজও জের চলেছে।

এই আর্থিক জটিলতার যুগের মধ্যে দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তি নিহিত রয়েছে, যার সংঘর্ষের ফলে সমাজে মাঝে মাঝে ভয়ানক অশান্তি দেখা দিচ্ছে। এই অশান্তি দূর করতে গেলেই ঐ দুটি বিরোধী শক্তির মধ্যে বিত্তবান শক্তিটিকে অর্থাৎ ক্যাপিট্যালিজম্‌কে অপরটির সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করতেই হবে, নইলে সমস্ত ব্যাপারটা একটা ভুল পথে চালিত হয়ে ক্ষতিকর আর্থিক দুরবস্থা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।

এই আর্থিক দুরবস্থাটাই একটা মারাত্মক ব্যাপার। ইতিহাস যখন সামন্ত যুগ থেকে ধনতান্ত্রিক যুগে বাঁক ঘুরল, তখনো তার পেছনে ঐ আর্থিক দুরবস্থা। অর্থাৎ সামন্ত যুগের চেয়ে যন্ত্র বিপ্লব হেতু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাটাই হ'ল বেশী লাভের, সুতরাং সামন্ত যুগে পড়ে থেকে কে আর লোকসান্ দিতে চায়? বর্ত্তমানে আবার ঐ যে মাঝে মাঝে অশান্তি দেখা দিচ্ছে, তার পশ্চাতে আর্থিক দুরবস্থার ঐ একই কারণ নিহিত রয়েছে। একদল বেকার আজ এমনভাবে জমে রয়েছে যারা জীবনটাকে লোকসান দিতে রাজী নয়, জীবনে তারাও কিছু লাভ করতে চায়।

ইতিহাস যখন একের পূজা ছেড়ে দিয়ে গণের পূজা আরম্ভ করলে, তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে যে, তার পেছনে এক আর্থিক দুরবস্থা নিহিত আছে, কেননা, এই আর্থিক ক্ষেত্র ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই সে গুরুগিরিকে মুখে না মানলেও কাজে মানে। আমাদের এই বাংলার দুরবস্থার বিষয় যদি জানতে চাই তা'হলে দেখব সে তা' সুরু হয়েছে পলাসীর যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের আরম্ভ থেকে। রাজ্য ব্যবস্থায় একটা দারুণ অরাজক অবস্থার জন্য ভূস্বামীরা তাঁদের ভূমির কোন উন্নতি করতে চাইতেন না, ফলে, শুধু প্রজারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, আমাদের আর্থিক অবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড কর্ণওয়ালিশ এ ত্রুটি ধরতে পেরেছিলেন, তাই তাঁর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার আর যত উদ্দেশ্যই থাকুক, প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে যাতে করে ভূস্বামীরা তাঁদের জমির উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু ফল ফল্‌ল উল্টো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার বিপক্ষে রাজস্বের আর্থিক ক্ষতি প্রভৃতি যত গলদই উল্লিখিত হোক্ না কেন, জমির প্রতি জমিদারদের উদাসীনতার মত এমন মারাত্মক গলদ আর কোনটায়ই দেখা দেয় নি। নইলে কর্ণওয়ালিশ সাহেবের উদ্দেশ্য অসাধু ছিল না।

আমাদের এত বড় কথা বলার উদ্দেশ্য এই দেখানো যে, বাংলায় ইতিহাস যে ব্যক্তি-পূজা ছেড়ে দিয়ে গণদেবতার পূজার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তারও পেছনে আছে ঐ দুরবস্থা। কর্ণওয়ালিশ সাহেবের প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা-নুযায়ী জমিদারেরা যদি জমির উন্নতির দিকে মনোযোগী হতেন, এবং বিলাসী না হ'য়ে আদর্শ জমিদারের জীবন যাপন করতেন, তাহ'লে

আজ জমিদারের স্বত্বকে ডুবিয়ে দিয়ে প্রজা-প্রাধান্য স্থাপন করতে চেষ্টা করত না। মানুষ-পূজা লোকে অমনি করে না, পূজা আদায় ক'রে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জ্জন করতে হয়। যে জমিদারদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন অমিত বীর্য্যবান, বলশালী পৌরুষে ভরা; প্রজাদের মঙ্গলের তরে, দানধ্যান ও কল্যাণ কর্ম্মের অজস্র পরিপূর্ণতায়, কীর্ত্তি যাঁদের গগনচুম্বী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁদের উত্তর পুরুষ যদি আজ বিলাসী, অলস ও বীর্য্যহীন হয়ে পড়ে থাকে, ত প্রজাদের কাছ থেকে পূজা পাবে তারা কোন্ অধিকারে? পূর্ব্ব'পুরুষদের যে সমস্ত অমর কীর্ত্তি, শ্যামল-দীঘি প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল, বিশালতায় যা' ভরে থাকত কৃষিক্ষেত্রের জলসেচনের কল্যাণ প্রয়োজনে,—সংস্কারাভাবে উত্তরপুরুষই ত তাদের মজিয়ে দিয়ে রোগের ডিপো আমদানী করলে! তাদের উৎসাহের অভাবে হ'ল না কোন শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, আথিক ক্ষেত্রে অচেষ্টার দরুণ আর্থিক উন্নতি রইল গতিরুদ্ধ হয়ে, লোকে ক্রমশঃ বিত্তহীন হয়ে পড়ল। আমাদের বড়লোকদের টাকা ব্যাঙ্কে জমতে লাগল, তবুও নতুন নতুন শিল্প প্রসারতায় সাহায্য করলে না।

আমাদের আজকের এই যে আথিক দুরবস্থা, এই যে চারিদিকে বেকারের মিছিল, এর কতকটা কারণ হ'ল দেশে নতুন শিল্প-প্রচেষ্টার অভাব। কেরাণীগিরি ও ডেপুটিগিরি কত লোকের আর চাকরী দিতে পারে? স্বাধীনভাবেই হোক্, বা সমবেত ভাবে সমবায় পদ্ধতিতেই হোক্, বৃহৎ শিল্প কিম্বা সামান্য কুটির-শিল্প খুলতে গেলেই টাকার প্রয়োজন। যে সম্প্রদায়ের দু'বেলা আহার জোটে না, তারা যে মূলধন সংগ্রহ করতে অপারগ হবে, একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাদের মূলধন দিয়ে সাহায্য করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বাংলার সহর অংশের কথা ছেড়ে দিলে পল্লী অংশেও বেকারের সংখ্যা কম নয়। দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুরবস্থার কথা পল্লী অঞ্চলেই বেশী শোনা যায়। এই পল্লী অঞ্চলের বিত্তশালী নেতার দল হচ্ছেন জমিদার সম্প্রদায়; সুতরাং তাঁদের উচিত এই দুরবস্থা দূরীকরণে অগ্রণী হওয়া। ভাগ্যকুলের জমিদার মহাশয় যে দৃষ্টান্ত দেখালেন, অন্যান্য সকলের কর্ত্তব্য সেদিকে মনোযোগ দেওয়া। দেশের সমস্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত যুবক আজ ব্যবসাহীন হয়ে অনাহারে মরতে বসেছে। তাদের যদি সামান্য কিছু মূলধন দিয়ে সাহায্য করা যায় ত, তাদের অবনতির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যবসা যদি চালু হয়, তাহলে আরও অনেকে করে খেতে পারবে। এইরূপ সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে বাংলার নষ্ট কুটীর-শিল্পগুলিকে উদ্ধার করা খুব শক্ত নয়।

অতএব বাংলার জমিদারগণের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এবিষয়ে সত্বর অবহিত হন। পল্লীর সম্ভ্রম রক্ষা করার ভার একসময় তাঁদের ওপরই ছিল; তাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বদেশের হিতকল্পে যথেষ্ট কিছু করে গেছেন, যার ভগ্ন কীর্ত্তিকলাপ স্থানে স্থানে আজও দেখা যায়। তাঁদেরই উত্তরপুরুষ হ'য়ে বর্ত্তমান জমিদারদেরও একটা অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য আছে, যেটাকে অবহেলা করা শুধু

অসম্মানের নয়, অপরাধেরও বটে। এটা তাঁদের দৃঢ়ভাবে স্মরণ রাখা উচিৎ যে, তাঁদের স্বত্ব বিলোপের জন্য যে আন্দোলন, তার মূল নিহিত রয়েছে আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে। এই আর্থিক দুরবস্থার দূরীকরণে তাঁরা যদি চেষ্টাবান না হন্ ত শত চেষ্টাতেও তাঁরা নিজেদের স্বত্ব রক্ষা করতে পারবেন না; ওলট পালট হবেই এবং আসবেই।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিনী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভল্যুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে; পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। "বঙ্গবাসী" এইরূপ প্রবাদ-সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাগজে প্রকাশ করতঃ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিতেছেন। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব।

—সম্পাদক

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি ?

*

ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খায়

*

নেড়া বেলতলায় যায় কয়বার ?

*

পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখ্‌লে ডরায়

*

মোটে মা রাঁধে না—তা'র তপ্ত, আর পান্ত

*

না বিইয়ে কানাইএর মা

*

হাত ঝাড়লে পর্ব্বত

*

মা বিয়োলো না বিয়োলো মাসী
ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়াপড়সী ॥

*

উঠন্তি মূল পত্তনেই চেনা যায়

*

বিয়ের সময় ক'নে বলে আমি হাগ্‌ব

*

যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না

*

ওঠ্‌ ছুঁড়ী তোর বিয়ে

*

হাতে দই পাতে দই তবু বলে কই কই ॥

*

ঠাকুর ঘরে কে ?—আমিত কলা খাইনি।

*

বাঁশ বনে ডোম কানা

*

পড়লো কথা সভার মাঝে
যার কথা তার গায়ে বাজে ॥

*

সেধো ভাত খাবি ?—না হাত ধোব কোথা ?

*

যে এল চষে সে রইল বসে
যে এল কোদাল পেড়ে,
তাকে দিল ভাত বেড়ে ॥

*

চৌদ্দশাকের মাঝখানে ওল পরামানিক।

*

পড়্‌লে শুন্‌লে দুধি ভাতি
না পড়্‌লে ঠেঙ্গার গুঁতি ॥

*

বিষ নেই তা'র কুলোপানা চক্কোর

*

নিষ্কর্ম্মা পুরুষের তিনটী দড়
আহার নিদ্রা রাগটী বড় ॥

*

এগুলেও নির্ব্বংশের বেটা
পেছুলেও নির্ব্বংশের বেটা ॥

*

ময়না ময়না ময়না—সতীন যেন হয় না ॥

*

প্রথম পক্ষের মাগ হেলা ফেলা
দ্বিতীয় পক্ষের মাগ গলার মালা
তৃতীয় পক্ষের মাগ ফুলের ছড়ি
চতুর্থ পক্ষের মাগ গলার মাদুলি ॥

*

নাচ্‌তে জানেনা উঠান বেঁকা।

*

ঘর সন্ধানী বিভীষণ।

*

গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল।

*

যার শিল তার নোড়া
তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া ॥

*

বৌ জব্দ শিলে, ঝি জব্দ কিলে
পাড়াপড়সী জব্দ হয়, চোখে আঙ্গুল দিলে

*

যত্ন ক'রে করি ঘর
তবু স্বামী বলে পর ॥

*

মামার বাটীর আব্‌দার।

*

কথায় কথা বাড়ে
জলে বাড়ে ধান
বাপের বাড়ী থাকলে
নারীর নিত্য অপমান।

*

দেখলে নাতির নাতি
হয় স্বর্গে বাতি ॥

*

যার চেয়ে দরদী তারে বলে ডান্।

*

মেঘ হয়ে রোদ হয় তার বড় চড়বড়ানি।
বৌ হ'য়ে গিন্নী হয় তার বড় ফড়ফড়ানি ॥

*

বনেদী ঘরের আস্তাকুঁড়ও ভাল

*

ভাত রোচে না, রোচে মো
চিঁড়ে রোচে পো পো ॥

*

গরজে গয়লা ডেলা বয়

*

ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।

*

হাতি ঘোড়া গেল তল
ব্যাঙ্গা বলে কত জল ॥

*

এই ক'রে ক'রে পাক্‌লো মাথার কেশ
কখনও দেখিনি, জলে ভাসে সন্দেশ ॥

*

পোর নামে পোয়াতি বত্তায়।

*

চালুনি বলে ছুঁচকে, তোর পোঁদে কেন
ছেঁদা ?

*

অনভ্যাসের ফোঁটা, কপাল চড়চড়্ করে

*

এত সুখ তোর কপালে
তবে কেন মোর কাঁথা বগলে ?

*

বেল পাক্‌লে কাকের কি ?

*

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

*

নিজের চরকায় তেল দাও।

*

যার নাম ভাজা চাল
তার নাম মুড়ি ॥
যার মাথায় পাকা চুল
তারই নাম বুড়ী ॥

*

যার কাজ তাকে সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে ॥

*

পড়বে লাঠি বড় ভয়
পড়লে লাঠি সয়ে যায় ॥

*

ভাত দেবার ভাতার নয়
নাক কাট্‌বার গোঁসাই ॥

*

যম জামাই ভাগনা
তিন নয় আপনার।

*

কালো বামুন কটা শূদ্র বেঁটে মুসলমান
আঁসলা ছেলে পুষ্যিপুত্র সব শালা সমান ॥

*

কারুর পৌষ মাস, কারুর সর্ব্বনাশ

*

নরুনমুখী নারায়নী

*

বে ফুরুলে ছাঁদলা তলায় লাথি

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ ।

*

যার বিয়ে তার মনে নেই
পাড়াপড়্শীর ঘুম নেই ॥

*

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে

*

পেটে খেলে পিঠে সয়

*

যত বল্‌তে পার বল কানে দিয়েছি তুলো
যত মার্‌তে পার মার, পিঠে বেঁধেছি কুলো ॥

*

বক আর ঝক কাণে দিয়েছি তুলো
মার আর ধর পিঠে বেঁধেছি কুলো ॥

*

স্বভাব যায় না মলে
ইল্বৎ যায় না ধুলে ॥

*

বাপের বোন পিসি
ভাত কাপড় দিয়ে পুষি
মার বোন মাসি
কাদায় ফেলে ঠাসি ॥

*

বেটা বিওলুম বৌকে দিলুম
ঝি বিওলুম জামাইকে দিলুম
আপনি হলুম বাঁদি
পথে বসে বসে কাঁদি ॥

*

যত হাঁসি তত কান্না
বলে গেছে রামশর্ম্মা

*

এক মাঘে শীত পালায় না ।

*

অগাধ জলসঞ্চারী বিকানি ন চ রোহিতঃ
গণ্ডূষ জলমাত্রেন সফরী ফর্‌ফরায়তে ॥

*

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে
ঘুঁটে বলে তোরও একদিন আছে

*
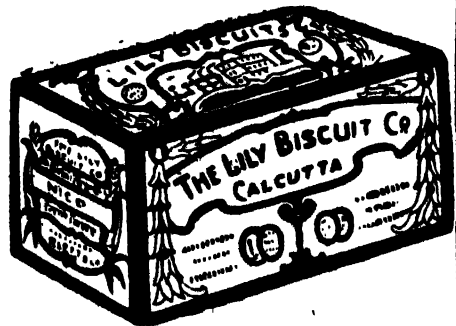
আষ্টে পিষ্টে দড়
ঘোড়ার উপর চড় ॥

*

শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ঢোকা

*

ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়

*

শালগ্রামের শোয়া বসা সমান

*

মাছের মায়ের পুত্রশোক নাই

*

তুক তাক্ ছয়মাস কপালের ভোগ বারমাস

*

ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারি

*

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়

*

চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী

*

বেহায়ার নাহি লাজ নাহি অপমান
সুজনের এক কথা মরণ সমান ॥

*

ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পায় না

*

অতি বাড় বেড়ো না
ঝড়ের আগায় যাবে
অতি ছোট হয়ো না
ছাগলে মুড়ে খাবে ॥

*

যার হাতে খাইনি সে বড় রাঁধুনি
যার সঙ্গে ঘর করিনি সে বড় ঘরণী ॥

*

যে মাছটা পালায় সেই মাছটাই বড়।

*

অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর
অতি বড় সুন্দরী না পায় বর ॥

*

যার সঙ্গে যার মজে মন
কিবা হাড়ি কিবা ডোম ॥

*

চোরের মন বঁচকি পানে।

*

ভাবের ভাবি আঁচলের চাবি

*

সেঁকরার ঠুকঠাক্ কামারের এক ঘা।

*

এক গোয়ালের গরু

*

গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না

*

নেড়া ঘরের মুড়া গিন্নী

*

ছাতা দিয়ে মাথা রাখা

*

উপরোধে ঢেঁকি গেলা

*

নোয়ালে না নোয় বাঁশ
বাঁশ করে টাঁস টাঁস ॥

*

বজ্র আটুনি ফস্কা গেরো।

*

জয় রাধে গোবিন্দ
পেট ভরলেই আনন্দ ॥

*

জুতা ব্যবসায়ী টমাস বাটার আত্মজীবন চরিত

শৈশবের কথা যতদূর স্মরণ হয়, আমার প্রথম কার্য্যক্ষমতা প্রকাশ পায় প্রার্থনা মন্ত্র আবৃত্তিতে। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম আমার ধর্ম্ম পরায়ণা মাতা আমাকে তখন কোলে লইয়া প্রার্থনা মন্ত্র,—"আভে মেরীয়া" (Ave Maria) * এবং প্রতিজ্ঞা বাক্য সমূহ আবৃত্তি করা শিখাইতেন। বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন অথবা বন্ধু বান্ধব কেহ আসিলে তাঁহাদিগকে ঐ প্রার্থনা মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া শুনাইবার জন্য মা আমাকে বলিতেন। আমি এমন সুন্দররূপে তাহা আবৃত্তি করিতাম যে, তাঁহারা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন এবং প্রায়ই আমাকে দুই এক পেনি দিয়া পুরস্কৃত করিতেন।

ছয় বৎসর বয়সের সময় আমি জুতা তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করি। অব্যবহার্য্য এবং ছাঁট কাটের বাদ দেওয়া চামড়া লইয়াই আমার প্রথম কাজ। লাষ্টও আমি নিজে ডিজাইন করিয়া নিতাম *। ঐ সকল টুকরা চামড়ায় তৈয়ারী জুতা বুড়ো আঙ্গুলের চেয়ে বড় হইত না,—কিন্তু তবু তাহা জুতা বটে! লোকের কাছে তার আদর ছিল। ছোট ছেলেদের হাতের কাজে উৎসাহ দিবার জন্যই লোকে তাহা আগ্রহের সহিত ক্রয় করিত।

আমি পূরা একটী দিন খাটিয়া ঐ রকম একজোড়া জুতা তৈয়ারী করিতাম। তার দাম পাওয়া যাইত ৪ হইতে ১০ ক্রুজার। † তাহাতে আমার আনন্দ হইত খুব বেশী। কারণ, তখনকার দিনে ৪ ক্রুজার ইংলণ্ড দেশীয় সুন্দর তাম্র নির্ম্মিত পেনি মুদ্রার মত বড় আকারে

* রোম্যান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানগণ প্রার্থনার সময় যীশু মাতা মেরীর নামে জয়োচ্চারণ করেন। "আভে মেরীয়ার" অর্থ ইহাই। প্রতিজ্ঞা বাক্য গুলিকে বলা হয়, ক্রীড্ Creed. প্রার্থনার সঙ্গে তাহাও আবৃত্তি করা নিয়ম।

* যে কাঠের ছাঁচ ভিতরে পুরিয়া জুতার আকৃতি বা Shape ঠিক করিয়া সেলাই করা হয়, তাহাকে লাষ্ট—Last বলে।

† পুরাতন অষ্ট্রিয়া দেশীয় মুদ্রা। এক ক্রুজার অর্দ্ধ পেনির সমান। অর্দ্ধ পেনি দুই পয়সার সমান। সুতরাং ৪ ক্রুজার দুই আনার সমান হয়।

এবং ১০ ক্রুজার একটা রৌপ্যনির্ম্মিত পেনি মুদ্রার সমান আকারে প্রচলিত ছিল। এই সকল চকচকে-ঝক্ ঝকে মুদ্রাগুলির ঝন্-ঝনি আমার সারা দিনের পরিশ্রমকে সার্থক করিয়া দিত।

ঈষ্টার উৎসবের সময় আমরা ছেলের দল এক রকম খেলা করিতাম,—তাহাতে সমবায় নীতি অনুসারে চাঁদা দেওয়া হইত এবং খেলার শেষে সপ্তাহের পর লাভের অংশ পাওয়া যাইত। আমাদের মধ্যে একজনকে আমরা সর্দ্দার বা

জুতা ব্যবসায়ী টমাস্ বাটা

দলপতি ঠিক করিয়া লইতাম। আর একজন হইত কেশিয়ার,—অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ; তার কাছে টাকা কড়ি হিসাব পত্র থাকিত। অতি প্রত্যুষে উৎসবের স্থানে উপস্থিত হওয়া আমাদের নিয়ম ছিল। যে বিলম্বে যাইত, তাহার নামের পাশে একটা কালো দাগ দেওয়া হইত। আমি ও আমার ভাই প্রত্যহ খুব সকালে ভোর ৪ টায় উঠিয়া উৎসবে যাইতাম, সুতরাং আমাদের নামের পাশে কখনও কালো দাগ পড়ে নাই। আমি প্রতিদিন কেশিয়ারের হিসাব পরীক্ষা করিতাম। লাভের অংশ কে কত পাইবে, আমি নিজে নিজে তার একটা

হিসাব রাখিতাম। কিন্তু আমাদের দলপতি এবং কেশিয়ারের গণনার সহিত আমার মিল হইত না। শেষে দেখিলাম, আমার হিসাবই ঠিক,—প্রত্যেক বালক তাহার ন্যায্য পাওনা অপেক্ষা অর্দ্ধেকেরও কম পাইয়াছে!

দলপতির এবং কেশিয়ারের এই অন্যায় ব্যবহারে আমার কচি প্রাণে যে নিদারুণ ক্ষোভ, ঘৃণা ও উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা আমার এখনও মনে আছে। আমি ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া আমার পিতার নিকট ছুটিয়া গেলাম। তাঁহাকে বলিলাম, এ অন্যায়ের প্রতি বিধান করিতে হইবে। পিতা সস্নেহে আমাকে বুঝাইয়া দিলেন "ইহার কোন প্রতিকার নাই। দুনিয়ার হাল্ চালই এই রকম।" আমি পৃথিবীর লোকের বজ্জাতির ও ধূর্ত্ততার এই পরিচয় পাইয়া কেবল কাঁদিয়াই সারা হইলাম। পিতাও আমার সঙ্গে আক্ষেপ করিলেন। তিনি নিজের তহবিল হইতে টাকা দিয়া আমার ক্ষতি মিটাইয়া দিলেন পিতার স্নেহে আমি একটু সান্ত্বনা পাইলাম।

ইতিমধ্যে আমি সাপ্তাহিক মেলায় ও হাটে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার কার্য্য-ক্ষেত্র প্রসারিত হইল। মেলায় কত জিনিস, কত লোক এবং কত রকমের কারবার দেখিতাম। আমার নিজের হাতের তৈয়ারী জুতা বিক্রয় করিবার আরও অধিক সুযোগ পাইলাম। আমার পিতা এই সকল মেলায় ও হাটে দোকান খুলিয়া বসিতেন। আমি তাঁহার কাজকর্ম্মে সাহায্য করিতাম। খরিদ্দার-দের পায়ের জুতা খুলিয়া দেওয়া, নূতন জুতা পরান এবং কেনা জুতা প্যাক্ করিয়া হাতে তুলিয়া দেওয়া এই সকল টুক্ টাক্ কাজ আমি করিতাম। ইহার জন্য বক্‌শিস্ রকমে আমার কিছু প্রাপ্তিও হইত। কখনও
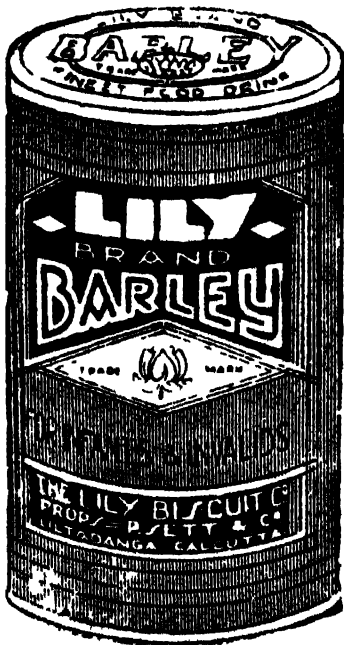
এক পেনি পাইতাম, আবার কখনও বা কিছুই পাইতাম না।

পারিশ্রমিক স্বরূপ আমার যাহা কিছু আয় হইত, তৎসমস্তই আমি পোষ্ট্ আফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতাম। সেই খানে টাকা জমা দিবার নিয়ম ছিল এই,—পাঁচ ক্রুজার (১০ পয়সা) মূল্যের এক একখানি টিকিট কিনিয়া কার্ডে লাগাইয়া রাখা হয়। ঐ রকম ১০ খানা টিকিটে একখানি কার্ড ভর্ত্তি হইয়া যায়। কার্ড্খানি ভর্ত্তি হইলে পোষ্ট্ মাষ্টার উহা হিসাবে জমা করিয়া লন।

আমার যখন ১০ বৎসর বয়স, তখন আমার মাতার মৃত্যু হয়। সেই সঙ্গে আমাদের উপর হইতে একটা সস্নেহ ও সাবধান দৃষ্টি চিরকালের তরে চলিয়া গেল। মা আমাদিগকে সুশিক্ষা দিবার জন্য এবং মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য যেমন যত্ন করিতেন, এমন আর কেহ করে নাই। মা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, তৎদিন বাবাও আমার উপর একটু দৃষ্টি রাখিতেন। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর বাবাও কি-রকম যেন হইয়া গেলেন,—আর আমার শিক্ষার দিকে বিশেষ কোন মনোযোগ দিলেন না। আমাদের মাতার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে পিতা জিলিন গ্রামের পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া আমাদের সকলকে লইয়া নিকটবর্ত্তী এক সহরে বাড়ী করিলেন।

আমার পিতা ছিলেন আ জন্ম একটা দুঃসাহসিক লোক। যেখানে শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন,—সেই দিকে কিসে যেন তাঁকে চুম্বকের মত টানিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু প্রধান দোষ ছিল তাঁর এই যে, তিনি শেষ পর্য্যন্ত কোন কাজে লাগিয়া থাকিতে পারিতেন না। অধ্যবসায়ের অভাবই ইহার কারণ। প্রথম বাধা বিঘ্নের সূত্রপাতেই তাঁহার উৎসাহ উদ্যম কমিয়া যাইত। কোন বিষয়ে কিছু গোল যোগ দেখা দিলেই অমনি তাহা ছাড়িয়া নূতন আর একটা অধিকতর দুঃসাহসিক কার্য্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। নিত্য নব নব আশায় উৎসাহিত এবং উত্তেজিত থাকা,—এই ছিল তাঁর জীবন।

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আমাদের পল্লীগ্রাম সমূহের নৈতিক অবস্থা ভাল ছিলনা। সাধারণ লোকদের মধ্যে তামাক, সিগারেট্ ব্যবহার, মদ্যপান, আড্ডা ইয়ার্কি মারা প্রভৃতি খুব চলিত,—এ সকলকে কেহ কখনও দোষের বলিয়া ত মনেই করিতাম না,—উপরন্তু সন্ধ্যা বেলাতে পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা জমাইয়া সেখানে গল্প-গুজব বদ-ইয়ার্কি এব হৈ-চৈ-করা যুবক ও প্রৌঢ়দের মধ্যে প্রশংসার বিষয় বলিয়া গণ্য হইত। আমার পিতাও এই দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু আমাদিগকে সেই দোষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার ধূমপানের অভ্যাস ছিল,—সন্ধ্যা বেলায় আড্ডায় মজ্লিসে রীতিমত যাইতেন। কিন্তু আমরা যেন তামাক সিগারেট স্পর্শ না করি সে বিষয়ে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন এবং পাড়ার আড্ডাতে যাইতে বারণ করিতেন। শুধু কথায় যে কোন ফল হয় না,—মানব চরিত্রের দুষ্প্রবৃত্তি সমূহকে যে কেবলমাত্র উপদেশের দ্বারা প্রতিরোধ করা যায় না, ইহা আমার পিতা বুঝিয়াছিলেন,—সেই জন্য তিনি যথাসাধ্য কার্য্যের দ্বারা আমাদিগকে সৎপথে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। সঙ্গ-দোষে, দেশের

রীতি অনুসারে এবং দীর্ঘকালের অভ্যাসের দরুণ তাঁহার চরিত্রে যে সকল দোষ নেশার মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল, তাহা একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না; তথাপি তিনি আমাদের সুশিক্ষার জন্য অনেকটা সংযত হইয়া চলিতেন এবং তাঁর দোষ অপেক্ষা গুণাবলীই যেন আমাদের চক্ষে বেশী পড়ে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। পরিশ্রম, উৎসাহ, অর্থোপার্জ্জন, সঞ্চয় এবং সদ্ব্যয় এই সকল বিষয়ে আমরা পিতার নিকট তাঁহার কার্য্য দ্বারাই শিক্ষালাভ করিয়াছি।

কিরূপে সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, তিনি আমাদিগকে তাহা দেখাইতেন। আমরা নিজের পরিশ্রমে যে টাকা রোজগার করিতাম, তাহা আমাদের নিজের কাছেই রাখিতে দিতেন এবং সর্ব্বদা আমরা যাহাতে কিছু রোজগারের সুযোগ পাই সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। ইহাতে একদিকে যেমন আমাদের উপার্জ্জন ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তির স্ফুরণ হইত, অন্যদিকে পিতার নিজেরও অর্থলিপ্সা অনেকটা কমিয়া আসিত। আমরা আমাদের অর্থ যাহাতে অপব্যয় না করি সে দিকেও তিনি সাবধান থাকিতেন।

আমরা দুই ভাই-ই আমাদের পিতার কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম। আমরা বুঝিতাম, সেই কারবারের উন্নতি হইলে আমাদের সকলেরই ভাল খাওয়া পরার সুবিধা হইবে এবং স্বচ্ছলতা, কারবার মন্দা পড়িলে সব দিকে কসা-কসি। সুতরাং আমরা পেটের দায়েই প্রাণপণে খাটিতাম। ১২ বৎসর বয়সেই ব্যবসায় সম্বন্ধে আমার এই পরিষ্কার জ্ঞান জন্মিয়াছিল। আমরা যাহাতে অন্নাভাবে মারা না যাই সেই জন্য কি করিতে হইবে, তাহাও আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ১৪ বৎসর বয়সে আমি আমার পিতার কারবারের বিক্রয়-বিভাগের সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হইলাম। আমি যে আমাদের পরিবারের দারিদ্র্য-দুঃখ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, ইহা তাহারই পরিচয়।

আমাদের পল্লীবাস ছিল জিলিন নামক গ্রামে। এইখানে আমি চারি বৎসর কাল এক পাঠশালায় পড়িয়াছিলাম। যখন আমাদের পিতা পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র নগরে বাসস্থান করেন, তখন আমি এক জার্ম্মাণ সেকেণ্ডারী স্কুলে ভর্ত্তি হই,—ঐ সহরে অন্য কোন বিদ্যালয় ছিল না। ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই জার্ম্মাণ ভাষা জানিত না। আমি ত সেই ভাষাতে একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম। গ্রাম্য পাঠশালায় থাকিতে আমার শিক্ষা হইয়াছিল চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাষায়। সেখানেও আমার লেখা পড়া যে খুব ভাল হইয়াছিল, তাহা নহে। আমার পিতা তখন ফলের ব্যবসা করিতেন। তিনি যে ফলের বাগান জমা লইয়াছিলেন, তাহা পাহারা দিবার জন্য আমাকে অনেক দিন ইস্কুল কামাই করিতে হইত। সুতরাং প্রথম দুইমাস আমার কিছুই পড়া শুনা হয় নাই। ইহার ফলে, পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের পড়াতেও আমার বিশেষ বাধা জন্মিয়াছিল, কারণ, আরম্ভেতেই আমি অনেক বিষয়ে কাঁচা রহিয়া গিয়াছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা য্যাণ্টনিনের পড়াশুনাতে এমন কোন বাধা জন্মে নাই। তিনি পল্লীগ্রামের পাঠশালায় খুব ভাল শিক্ষাই পাইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষি

ফুলের বাগান

এখন বাংলা দেশে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। প্রায় অধিকাংশ Season flower বা ঋতু কালীন ফুল গাছ যাহা এক বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায় তাহা এই সময়েই শুকাইয়া যায়। কিন্তু যে ফুল গাছ গুলি এই সময়ে কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে সেগুলির গোড়ায় উপযুক্ত পরিমাণে জল দিবে। নিয়মিত উহাদের গোড়ায় জল দিতে পারিলে ফুল গাছ গুলি কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। গাছ যতদিন বাঁচিয়া থাকে, ততদিন তাহাদের গোড়ায় জল দেওয়া আবশ্যক।

বর্ষাকালে ভাল ফুল গাছ লাগাইবার জন্য এখন হইতেই জমি ক্রমশ: প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। সারা শীতকালব্যাপী ফুল হওয়ায় জমির উর্ব্বরতা অনেক কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং ঋতুকালীন ফুল গাছগুলি মরিয়া গেলেই জমি গুলিকে বেশ করিয়া খুঁড়িয়া দিবে এবং মরা গাছের সমস্ত শিকড় জমি হইতে তুলিয়া ফেলিবে।

তারপর জমিতে বেশ করিয়া সার দিয়া উর্ব্বর করিয়া রাখিবে। চন্দ্র-মল্লিকা এবং এই জাতীয় অন্যান্য ফুলগাছ এই সময় হইতে বাড়ীতে থাকিবে এবং যে ফুল গাছগুলি এক জায়গায় লাগান হইয়াছিল তাহাদিগকে তুলিয়া একটা উর্ব্বর জমিতে পৃথক পৃথক করিয়া পুঁতিয়া গোড়ায় গোবর বা অন্য কোনরূপ সার দিবে।

এই সময় জিনিয়া, দোপাটী এবং গাঁদা ফুলের বীজ বপন করিতে হয়। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়ার মূল এই সময় বসাইতে বলেন। আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে। বর্ষান্তে বসাইলে ভাল হয়। শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্ব কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরান্থাস্, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুলবীজ বপনের এই প্রকৃষ্ট সময়।

সব্জী বাগান

সব্জীর বাগানে এখন বিশেষ কিছু করিবার

নাই, তবে যে গাছগুলি এখনও বাঁচিয়া আছে তাহাদের গোড়ায় জল দিবে। এই সময় গাছ হইতে সুপক্ক বীজ তুলিয়া বেশ করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। তারপর উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিবার জন্য ভাল বীজগুলি বোতলে বন্ধ করিয়া রাখিবে। যে সকল পেঁয়াজের গাছ বীজের জন্য রাখা হইয়াছে, সেই সকল গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ পূর্ব্বক উত্তমরূপে শুকাইয়া উত্তমরূপে রাখিয়া দাও।

চুপড়ী আলু, খাম আলু প্রভৃতির বীজ রোপন কর, তাহাদের গাছ লতাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দাও, এই সময়ে পদ্মনটে, চাঁপানটে, লালশাক ও ডেঙ্গুয়ার বীজ বপন করিতে হয়। যাবতীয় শাকের বীজ এই সময় লাগাইতে হয়। ভুঁয়ে শশা, তরমুজ ও ফুটীর ক্ষেত্রে নিয়মিত রূপে জল সেচন কর।

এখন পেঁয়ারা গাছের ফসল পাইবার সময়। উহাতে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন কর। সীম, শশা, বেগুন, লাউ, কুমড়া, মক্কা বা ভুট্টা, হরিদ্রা, এরারুট, জেরুসালেম, আর্টীচোখ মানকচু, শকরকন্দ আলু, ডেঙ্গুয়া, চাঁপানটে, শাক, মূলা, বর্ষাতিমূলা, গুড়িকচু, পটল, ঝিঙ্গা, কাকরোল, ধুন্দুল, করলা, ঢেঁড়স, প্রভৃতির বীজ রোপণের ও বপনের এই উপযুক্ত সময়।

এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিংড়াইতে হয়, বেগুন গাছে ভাটি বান্ধিয়া দিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অহরহ বীজ বপন করা চলে, আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়।

শাক আলুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ
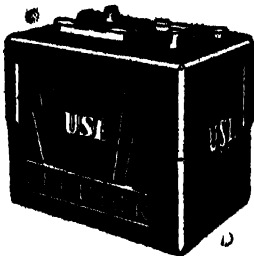
করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জল্‌দি ফসল পাইতে হইলে ভুট্টা বুনিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয়।

লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, পালা, ঝিঙ্গা, শশার বীজ যদি এখনও না বুনিয়া থাকেন তবে আর কাল বিলম্ব না করিয়া এই সময় বপন করুন। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হয়।

জল্‌দি ফুলকপি পাইতে গেলে এই সময় হইতেই পাটনাই ফুলকপি বপন করিয়া চারা তৈয়ার করিতে হয়।

ফলের বাগান

এই সময় ফল গাছের গোড়ায় জল দিবে। লিচু এই সময় প্রায় পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং পাখীতে যাহাতে লিচুফল নষ্ট করিতে না পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে এবং সম্ভব হইলে লিচুগাছ জাল দিয়া ঢাকিয়া দিবে।

বৈশাখের শেষে জ্যৈষ্ঠের প্রথম পক্ষে স্পারা গাছের ফসল পাইবার সময় উহাতে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন কর।

বৎসরের মধ্যে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুইমাসে অত্যন্ত গরম পড়ে। চারিদিক হইতে গরম বাতাস বহিতে থাকে এবং মাটি শুকাইয়া ফাটিয়া যায়। তবে ঝড়ের সঙ্গে কিছু কিছু বৃষ্টি হয়। বলিয়া গাছ পালা প্রভৃতি বাঁচিয়া থাকে। এই দুইমাসের মধ্যে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া ব্যতীত আর বিশেষ কিছু করিবার নাই।

ফলের বাগানের আর বিশেষ কিছু পাট নাই। ফল আহরণই একমাত্র কার্য্য।

কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের চারা কলম করিতে হয় তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হইবে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে, সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। এখন সেখানে বাঁধা কপি ও ফুল কপির বীজ বপন করা যায়।

বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত যে সকল বীজ বপন করা যায় তাহার তালিকা—

(১) সর্ব্বপ্রকার মুক্তকেশী বেগুন, ৵৬ সের বেগুন, ব্লেক (নীল) বেগুন, কাটোয়ার ডাটা, পাটনাই ঝাড়, ডেঙ্গো ডাটা, দেশী ও আমেরিকান পুঁই, পেঁপে, লঙ্কা, ধানীলঙ্কা।

এই সকল বীজ হইতে চারা তৈয়ারী করিয়া জমিতে চারা রোপণ করিতে হয়।

(২) আমেরিকান ও দেশী বরবটী,—ঝিঙ্গা, ভারার বা মাচার শশা। মাটি বা ভুঁয়ে শশা, বর্ষার কুমড়া, চিচিঙ্গা বা হোঁপা, চাল কুমড়া বা ছাঁচি কুমড়া, চাঁপা নটে, বর্ষার লাল শাক, পদ্মনটে, উচ্ছে, করলা, কাঁকরোল বা খাকশা, দেশী ও জাপানী ধুন্দুল, সর্ব্বপ্রকার দেশী সীম, সিঙ্গাপুর লাউ, কাবুলী লাউ, হলুদ কচু, ওল, আম আদা, ঝাল আদা, চিনা বাদাম।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে যে সমস্ত বীজ বপন করিতে হইবে এখন হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, পূর্ব্ব হইতেই উত্তমরূপে ভূমি কর্ষণ করিয়া জমিতে সার প্রয়োগ না করিলে বীজ হইতে সুপুষ্ট গাছ জন্মিবে না

এবং জন্মিলেও সে সকল গাছ হইতে প্রচুর ফসল পাইবার সম্ভাবনা নাই।

যে সকল ফুলগাছে বর্ষাকালে ফুল ফুটিবে এখন তাহাদের গোড়া খুঁড়িয়া উহাতে সার প্রয়োগ করিতে হইবে। শীতকালে ফুল ফুটিবার সময় গাছ জমি হইতে সমস্ত সার রস টানিয়া লইয়াছে; কাজেই এখন পুনর্ব্বার সার প্রয়োগ না করিলে বর্ষাকালে ভাল ফুল ফুটিবে না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে রৌদ্রের প্রতাপ অত্যন্ত প্রচণ্ড থাকে; কাজেই ছোট ছোট ফলের গাছ ও ফুল গাছ শুকাইয়া যায়। এই জন্য ফুল ও ফলের গাছে নিয়মিত ভাবে জল দেওয়া উচিত; প্রাতঃকালই গাছে জল সেচ করিবার প্রকৃষ্ট সময়; দ্বিপ্রহরে গাছে জল দিতে নাই। উহাতে গাছের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। অনেকে বৈকালে গাছে জল দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাকেও খুব ভাল প্রথা বলিয়া মনে হয় না; বরং সন্ধ্যাকালে গাছে জল দেওয়া যাইতে পারে।

এই সময় হইতে গোলাপ গাছের গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে জল ঢালিতে হয়। গাছের গোড়ায় বৃত্তাকারে মাটি খুঁসিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। গোলাপ গাছের গোড়ার মাটি সর্ব্বদা সরস না রাখিলে উহার পুষ্পিত হইবার শক্তি লোপ পাইয়া যায়।

এই মাসে ফুলকপি বাঁধাকপির জড় প্রভৃতি তুলিয়া ফেলিতে হয় এবং আমন ধান্য, পাট, আদা, মুথা, কচু, শশা, ফুটি, স্কোয়াস, পালং, শাঁক আলু, অড়হর, মানকচু, হরিদ্রা, আমআদা, লাউ, ঝিঙ্গা, প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হয়। এই মাসে কলা, পান ও পিপুল চারা প্রস্তুত করিতে হয়।

বাঙ্গালী কৃষকের জ্ঞাতব্য দুই একটী কথা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আদা—জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ করিতে হয়। দোঁয়াস মাটি বিশিষ্ট জমীই চাষের পক্ষে প্রশস্ত। এক বিঘা জমিতে প্রায় ১৴০ মণ বীজ আদার প্রয়োজন। দুই ফুট অন্তর এক একটী বীজ বসান উচিত। এক বিঘা জমিতে সরিষার খৈল ৩৴ মণ ও ছাই ১৴ মণ—এই সার প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট। পৌষ ও মাঘ মাস আদা তুলিবার সময়। উপযুক্তভাবে চাষ করা হইলে এক বিঘা জমিতে ৪০ মণ আদা উৎপন্ন হইবে।

এই সকল বীজ মাদায় বা হাঁপরে বপন করিতে হয়।

(৩) দেশী, ফ্রেঞ্চ ও আউসে মূলা, বর্ষাতি বা আউসে মূলা, গোল ফ্রেঞ্চ ও এণ্ডা মূলা, শাঁক আলু, শোণ ধইঞ্চা, অড়হর।

এই সকলের বীজ জমিতে চাষ দিয়া জমিতে ছিটাইয়া বপন করিতে হয়।

(১)

আসাম হইতে শ্রীরমণী মোহন সেন কলিকাতায় জ্বালানী কাষ্ঠ চালান দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার চিঠি এই পুস্তকের পত্রাবলী শীর্ষক অধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে (৩নং পত্র) যাঁহারা রমণী বাবুর সহিত কারবার করিতে চান, তাঁহারা সোজা সুজি তাঁহার নিকট চিঠি লিখিয়া সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক করিতে পারেন। তাঁহার ঠিকানা এই ;—শ্রীরমণী মোহন সেন; পোঃ ডিগবর চার-আলী ; আসাম।

(২)

নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত চৌমুহণী (আসাম-বেঙ্গল রেলষ্টেশন) হইতে শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র ধর কলিকাতায় ডিম, মুরগী হাস প্রভৃতি চালান দিতে ইচ্ছা করেন! তাঁহার চিঠি এই পুস্তকের পত্রাবলী শীর্ষক অধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। (১নং পত্র)। কলিকাতায় যে সকল ব্যবসায়ী মণীন্দ্র বাবুর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সোজাসুজি তাঁহার নিকট চিঠি লিখিয়া দরদস্তুর জানিতে পারেন।

(৩)

বেরার প্রদেশের অমরাবতী হইতে শ্রীহরিপদ মুখার্জ্জি বি এ, আমাদিগকে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। তাহা আমরা এই পুস্তক পত্রাবলী শীর্ষক অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়াছি; (৬নং পত্র)। তিনি কমলালেবুর খোসা ও বাবলার ছাল প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিতে পারেন। যাঁহাদের প্রয়োজন হয়, তাঁহারা হরিপদ বাবুর নিকট সোজাসুজি চিঠি লিখিতে পারেন।

তাঁহার ঠিকানা,—Haripada Mukherjee B. A.; C/o A. C. Chatterjee Esqr. Asst. Engineer P. W. D. Amraoti (Berar.)

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

পত্র লেখকগণের প্রতি

(যাঁহারা গ্রাহক নহেন)

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাঁহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, অথচ বিনামূল্যে এমন সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন যাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তাঁহাদের মতলব, **"একটি হরিতকীও গুরুদক্ষিণা দিব না,—কিন্তু মন্ত্রটি আদায় করিয়া নিব"।** এই রকমের লেখকদিগকে আমরা জানাইতেছি, ব্যবসায়ীর সন্ধান এবং মাল পত্র বেচা-কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাঁহারা এক একটা মালের জন্য এক এক বারের কারবারে শ' দু'শ হইতে হাজার টাকা পর্য্যন্ত দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ীর সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও

নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্ত ৫।৵০ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হইলেই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার জন্ম পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা মোটা দালালী দিতে অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ, এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,—নেও,—দেও,—ফেল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাঁক তালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,—অথচ তার জন্ম একটী পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ। এই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্ম "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

১৬ বৎসর যাবৎ কার্য্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি, গোড়াতে ফাঁকিবাজীর মতলব, বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে একটা প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্ম আমাদের অনুরোধ, যাঁহারা সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন। যাঁহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-শুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান মুফতি দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল হ এই যে, তাহারা যথেষ্ট লাভবান্ এবং উপকৃত হইয়াছেন আর আমরা লাভবান হওয়া ত দূরের কথা, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাহাদের পেট ভরাইয়াছি। কিন্তু সহের একটা সীমা আছে। এই জন্ম অতঃপর গ্রাহক না হইলে কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।

(যাঁহারা গ্রাহক আছেন)

আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহকগণ আমাদিগকে নানাবিধ ব্যবসায়সংক্রান্ত পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সকল প্রশ্ন করেন তাহার উত্তর ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিনা মূল্যেই প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ঐ সকল পত্রের অধিকাংশই উদ্দেশ্য বিহীন বৃথা প্রশ্নে পরিপূর্ণ। অনেকেই কেবলমাত্র কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্ম কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান। বাস্তবিক কোন কাজকারবারে হাত দিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। তাঁহাদিগকে জানাইতেছি আমরা তাঁহাদের জন্ম বাজারে ঘুরিয়া অশেষ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া নানা রকমের সংবাদ সংগ্রহ করি, যদি তাঁহারা সে সকল কোন কাজে না লাগান, তবে আমাদের শুধু শুধু হয়রান এবং অর্থ ব্যয় করান কেন? তাঁহাদের নিকট অনুরোধ, যেন খামকা আমাদিগকে প্রশ্ন না করেন এবং আমাদের নিকট হইতে যে সন্ধান, সংবাদ অথবা পরামর্শ পাইয়া থাকেন তাহা যেন যথার্থ কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া নিজেরাও লাভবান্ হন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিশ্রমকেও সার্থক করেন।

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মারফতে দিতে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, আমরা সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথক ভাবে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র জোগাড় করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি **আমাদের যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ৫৲ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন।** গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে এই ফি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদিগের কাগজেই বিনা মূল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিকে প্রদান করিব। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক নম্বর পাঠানো চাই।**

১নং পত্র

মহাশয়,

আমি এখানে আজ কিছুদিন যাবত পোল্ট্রী ও ডিমের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছি এবং কলিকাতায় সেই সব চালান দিতে মনস্থ করিতেছি কিন্তু কলিকাতা কোথায় কে এই ব্যবসা করে তাহা জানিতে না পারায় আপনার নিকট উপস্থিত কলিকাতা এবং সহরতলিতে কোথায় কে কি ব্যবসা করে তাহা আপনাদের জানা থাকার কথা। কাজেই আশা করি,আমাকে উক্ত ব্যবসায়ীদের নাম ধাম ইত্যাদি জানাইয়া বাধিত করিবেন। আমি Major Terrys' Poultry & Dairy Farm, Alipore সঙ্গে কাজ করিতেছি কিন্তু তাহারা অতি অল্প সংখ্যক পাখী লইয়া কাজ করে; আমি অন্য কোন ফার্ম্মের খবর জানি না। আমি এখানকার urban কোংর এক জন মেম্বার এবং সেই ব্যাঙ্ক হইতে এই পত্রিকা আনাইতেছি। আশা করি, আমার ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া উত্তর দিবেন।

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র ধর
পোঃ চৌমুহনী, জিঃ নোয়াখালী।

১ নং পত্রের উত্তর

আপনি আমাদের গ্রাহক নহেন। 'আরবান্‌' ব্যাঙ্কের কথা লিখিয়াছেন, তাহারাও আমাদের কাগজ নেয়না। হয়ত দৈবাৎ সেইখানে একখানা 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' পাইয়াছেন। যাহা হউক, নিয়ম অনুসারে আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নয়। তবুও আপনার যাহাতে কিছু সাহায্য হয় সেইজন্য

উত্তর দিলাম। কারণ, আমাদের নিকট এইরূপ পত্র নিত্য আসিতেছে।

আপনাদের ওই অঞ্চল অর্থাৎ নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চটগ্রাম প্রভৃতি জেলার সহর ও গ্রাম হইতে বহু সংখ্যক হাঁস, মুরগী ও ডিমের চালান কলিকাতায় আসে। আসাম বেঙ্গল রেল লাইনের সোনাইমুড়ী, দৌলতগঞ্জ, গুণবতী, নাঙ্গলকোট, হাজিগঞ্জ, আখাউরা প্রভৃতি ষ্টেশনে ঐ সকল মাল গাড়ী বোঝাই হয়। আপনাদের দেশে খোঁজ লইলেই ইহার খবর জানিতে পারেন। কলিকাতায় হগ্ মার্কেটে, বৈঠকখানায়, খিদিরপুরে ও কলেজ স্কোয়ার বাজারে ডিম ব্যবসায়ীদের বড় বড় আড়ত আছে। কলিকাতার সাহেবী হোটেল সমূহে, যেমন ফারপো, গ্রেট ইষ্টার্ণ ও পেলিটি প্রভৃতি হোটেলে যেখানে খুব বেশী পরিমাণে ডিমের ব্যবহার হয়, তাহারাও মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সোজাসুজি ডিম আমদানী করে। কিন্তু ব্যাপার এত সোজা নয় এবং চিঠিপত্রে এসব কারবার হয় না।

আপনাকে একবার কি দুই তিনবার মালপত্রের চালান লইয়া স্বয়ং কলিকাতায় আসিতে হইবে এবং বড় বড় পাইকারী খরিদ্দারগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া ভবিষ্যৎ কারবার চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অথবা কলিকাতায় আপনার একজন এজেন্ট্ রাখিতে হইবে। মালের চালান আসিবার সময় রাস্তায় অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা। ডিমগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, কতক পচিয়া নষ্ট হইতে পারে,—মুরগী, হাঁস খাদ্য অভাবে অথবা অন্য নানা কারণে মারিয়া যায়, এই সকল বিষয়ের যথারীতি তদ্বির করা দরকার। আপনার পত্রের ভাবে বুঝিতেছি, আপনি খুব বড় কারবার করিতে ইচ্ছুক, সুতরাং এ সকল প্রয়োজনীয় দফায় খরচা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আপনার পত্রের মর্ম্ম আমরা এই পুস্তকের ব্যবসায়ের সন্ধান শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত করিলাম।

২নং পত্র

মহাশয়,—

আপনাকে একটী কাজের জন্য অনুরোধ করিতে যাইতেছি; অনুগ্রহ করিয়া উত্তর দিলে বিশেষ বাধিত হইব। আমি একটী বিদেশী লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে এজেন্টের কাজ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু অনেকদিন থেকে দেশী কোম্পানীর কাজ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। আপনার "বীমাবার্ষিকী" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমার মত আরও দৃঢ় হইল। কিন্তু এখন কোন্ দেশী কোম্পানীর কাজ করিব স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সে-কারণ, আপনাকে লিখিতেছি আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটী দেশী কোম্পানী নির্ব্বাচন করিয়া আমাকে জানাইবেন। আপনার পত্র পাইলে আমি তাহাদের সহিত terms ঠিক করিয়া লইব। Ori-ental বাদে অন্যান্য যে সমস্ত কোম্পানী আছে তাহাদের মধ্য হইতে select করিবেন। আর Hindusthan Co-operative সম্বন্ধে ২।১টী প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ঐ কোং প্রতি বৎসরের কাজও খুব ভাল পাইতেছে এবং terms ও সর্ব্বোচ্চ দিতেছে অথচ share holder দিগকে এ পর্য্যন্ত কোন Dividend দিচ্ছে না কেন? ঐ কোম্পানীর মোটের উপর অবস্থা কিরূপ জানিতে ইচ্ছা করি।

নিবেদন ইতি—
শ্রীআশুতোষ সাহা
কুমারখালী, নদীয়া।

২ নং পত্রের উত্তর

আমাদের ১৩৪৩ সালের বীমা বার্ষিকী প্রকাশিত হইয়াছে। আপনি যখন এই লাইনে কাজ করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই তাহা জানিয়া থাকিবেন। যদি সেই পুস্তকখানি একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিতেন, তবে আর আমাদিগকে আপনার পত্র লিখিবার দরকার হইত না।

এজেন্ট এবং বীমাকারিগণ কিরূপে ভাল কোম্পানী নির্ব্বাচন করিবেন, এজেন্টগণ কিরূপে বীমার কাজ সংগ্রহ করিবেন, ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের আর্থিক অবস্থা এবং কাজ-কারবার কিরূপ, তাহাদের ব্যালান্স্ সিট্ ও কার্য্যপরিচালনার সমালোচনা, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় বিস্তারিতরূপে আমাদের এই নূতন বীমাবার্ষিকীতে লিখিত হইয়াছে। সামান্য দুই টাকায় পুস্তকখানি কিনিয়া পাঠ করিলে আপনি এজেন্সী কারবার বিষয়ে যে উপদেশ ও উপকার পাইবেন, তাহার মূল্য দুইশত টাকারও বেশী। সুতরাং আপনাকে আমরা সেই "বীমা বার্ষিকী" কিনিবার পরামর্শ দেওয়া ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারি না।

হিন্দুস্থানের অবস্থা খুবই ভাল,—তাহা উক্ত কোম্পানীর ব্যালান্স্ সিট্ এবং রিপোর্ট পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন,—তাহা আমাদের চৈত্রের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুস্থানের "কম্বাইণ্ড্ পলিসির দেনা বাবদে প্রায় কোটী টাকা এতকাল যাবৎ অংশীদারদের লভ্যাংশ হইতে দেওয়া হইতেছে। এই "কম্বাইণ্ড্ পলিসি" হিন্দুস্থানের এক বিশেষত্ব। বর্ত্তমান ব্যালেন্স সীটে দেখা যায়, উহার পরিমাণ অনেক কমিয়া আসিয়াছে এবং হিন্দুস্থানের চেয়ারম্যান্ তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই দেনার অল্প পরিমাণ যাহা কিছু বাকী আছে, তাহা ১৯৩৭ সালের মধ্যেই

শোধ হইয়া যাইবে। তাহারপর অংশীদার-গণের লভ্যাংশ পাইতে আর কোন বাধা থাকিবে না। হিন্দুস্থানের উন্নতির জন্য অংশীদারদের এই স্বার্থত্যাগ প্রশংসনীয়।

—※—

৩নং পত্র

মহাশয়,

হঠাৎ একদিন আপনাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকা খানা আমার চোখে পড়ে। আমি পড়িয়া অনেক বিষয় অবগত হইয়া শতমুখে আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছি ও দিতেছি। ভগবান আপনাদের উন্নতি এবং মঙ্গল করুন এই প্রার্থনা।

আমি আপনাদের আটা ভাঙ্গা ৩০৲ টাকার কল ও অন্যান্য কল বিক্রী করিবার Agency চাই। আমাকে কাগজ পত্র ও Terms & Commission ইত্যাদি জানাইবেন। পুরাতন একখানা ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকা free পাঠাইবেন। আমি আপনাদের পত্র পাইলে ও দর জানাইলে তেঁতুল ও বিচি দিতে পারিব।

আর একটী কথা বিনীত ভাবে লিখিতেছি যে, আমি কাঠ (জ্বালানী কাষ্ঠ) কলিকাতায় চালান দিতে চাই। গাড়ী ভর্ত্তি করিয়া দিব। প্রতি গাড়ী বা মণ হিসাবে দিলে কি দরে দিতে পারিব দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন। তবেই আমি খরচ ও মূল্য হিসাব করিয়া আপনাদিগকে জানাইব। আশা করি, আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতিতে আমি উপকৃত হইব। আপনার উত্তরের আশায় রহিলাম। যদি শিক্ষিত যুবকগণ আপনাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য বহি পড়িয়া কাজ করে তবে আমার মনে হয় ভারতের বিশেষ কল্যাণ হইবে। ভারতের লোক যতদিন্ মানের দাবী ও অনর্থক বিদ্যার গৌরব অন্তরে পোষণ করিবে ততদিন গোলামিই একমাত্র সার হইবে। আমি আপনাদের দ্বারে অনুগ্রহ প্রার্থী। নিজ গুণে দয়া না করিলে আমার মত লোকের দাঁড়ান অসম্ভব। কাজেই সর্ব্ব প্রকারে দয়া প্রার্থী। ভগবানের নিকট আপনাদের কুশল ও উন্নতি কামনা করি। ইতি—

শ্রীরমণী মোহন সেন, ডিগবয়
চারখালী, আসাম

৩নং পত্রের উত্তর—

আমরা "আটা ভাঙ্গা" কলের এজেন্সী আপনাকে এই সর্ত্তে দিতে পারি যে আপনি নগদ মূল্য দিয়া কল লইবেন এবং শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন পাইবেন।

(২) আপনার জ্বালানী কাষ্ঠ আমরা ক্রয় করিতে পারি না। তবে কলিকাতায় ইহার বড় কারবার আছে। আপনাকে নিজে আসিয়া এখানকার বড় বড় বেপারীদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা ঠিক করিতে হইবে। আপনার পত্রের মর্ম্ম আমরা এই পুস্তকের "ব্যবসায়ের সন্ধান" শীর্ষক অধ্যায়ে প্রকাশ করিলাম। কোন ব্যবসায়ী হয়ত আপনাকে এবিষয়ে সোজাসুজি পত্র লিখিতে পারেন।

(৩) ব্যবসা বাণিজ্যে কাকুতি মিনতির স্থান নাই। এখানে দান খয়রাতি বা দয়া দাক্ষিণ্য চলে না, জানিবেন।

—※—

৪নং পত্র

মহাশয়,

বর্ত্তমানে যে বিষয় লিখিতেছি আশা করি, দয়া করিয়া সে বিষয়ের সঠিক বিবরণ জানাইয়া বাধিত করিবেন। বাজারে যে সব চীনা মাটীর জিনিষ পত্র, সানকী বাটি, বৈয়ম, চায়ের প্লেট, কাপ প্রভৃতি জিনিষ দেখা যায়, তাহা তৈয়ার করিতে কি কি জিনিষ লাগে এবং কি কি জিনিষের সংমিশ্রণে তৈয়ার হয়? মসৃণ সাদা ধপ ধপে করা, নানাবিধ রং করা এবং নির্ম্মাণ ও পোড়াণ কৌশল ইত্যাদি বিস্তারিত লিখিয়া বাধিত করিবেন ও ঐ সকল জিনিষ পত্রাদি কোন ঠিকানায় পাওয়া যাইবে তাহা বিস্তারিত মতে দয়া করিয়া যত সত্বর সম্ভব লিখিয়া জানাইবেন। আশা করি, ইহাতে বঞ্চিত হইব না। বর্ত্তমানে আমরা চীনা মাটির জিনিষ পত্রাদি তৈয়ার করিতে বাসনা করি, এই উদ্দেশ্যেই আপনার নিকট ঐ সকল বিষয় সর্ব্বতোভাবে জানিতে বাসনা করি।

নিবেদক—
শ্রীশচীনাথ রুদ্রপাল
পোঃ নবিয়া, গ্রাম নবিয়া, জিং ফরিদপুর

৪নং পত্রের উত্তর -

চীনা মাটীর জিনিষ পত্র তৈয়ারী কুটির শিল্পের কার্য্য নহে। কুমারেরা সাধারণ মাটির দ্বারা হাঁড়ি, কলসী, সরা, খুরি,—এসব তৈয়ারী করে বটে, কিন্তু চীনা মাটির জিনিষ সেরূপে তৈয়ারী করা যায় না। কেওলিন (Caolin) নামক এক প্রকার খনিজ প্রস্তর চীনা মাটির জিনিষ তৈয়ারী করিবার একটী প্রধান উপাদান। রাজমহল, ভাগলপুর, ছোট নাগপুর মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানের পাহাড়িয়া অঞ্চলে উহা পাওয়া যায়। ঐ কেওলীন সোপ্ ষ্টোন্ এবং আরও নানা প্রকার খনিজ প্রস্তরকে মিহি গুঁড়া করিয়া উহাতে জল মিশাইয়া কাদার মত করিয়া লইতে হয় এই কার্য্য হাতে করা সম্ভব নহে। অবশ্য পোড়ান, রং করা প্রভৃতি কার্য্য হাতে করা যায় বটে, কিন্তু প্রথমে কাদা তৈয়ারী করাই খুব কঠিন কাজ। বিশেষতঃ অল্প সময়ে প্রচুর মাল উৎপাদন করিতে হইলে কলের সাহায্য ভিন্ন উপায় নাই। মাল সস্তা করিতে হইলে, তাহার দরকার। সুতরাং কুটির-শিল্প হিসাবে চীনামাটীর জিনিস তৈয়ারী করা চলেনা। তারপর রং করা, গ্লেজ বা চকচকে করা এ সব বিষয়ে অনেক গুপ্ততত্ত্ব রহিয়াছে। প্রত্যেক কারখানার পরিচালকগণ নিজ নিজ ফরমূলা গোপন রাখেন। আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যে "ফরমূলা ও রিসিপি" শীর্ষক অধ্যায়ে পূর্ব্বে অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছি এবং এখনও মাঝে মাঝে লিখিয়া থাকি। চীনামাটীর জিনিসের যাঁহাদের ছোট কিম্বা বড় কারখানা অর্থাৎ পটারী ওয়ার্কস্ আছে, তাঁহাদেরই উহা কাজে লাগিবে। আপনি যদি কারখানার মত কিছু করিতে চাহেন, তবে দুই একটা চলতি কারখানা আপনার দেখা কর্ত্তব্য। এই শিল্প কার্য্য নিতান্ত সহজ নহে বলিয়াই আমাদের দেশের অনেক কৃতবিদ্য লোক জাপানে, ইংলণ্ডে বেলজিয়ামে যাইয়া তাহা শিখিয়া আসিয়াছেন।

৫ নং পত্র

মহাশয়,

নিম্ন লিখিত সংবাদগুলি জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

(১) মোজার কল কোথায় পাওয়া যায় এবং দাম কত ? (২) মোজার এবং গেঞ্জির কল একত্র পাওয়া যায় কিনা এবং দাম কত। (৩) কুটীরশিল্প হিসাবে কোন্‌টা সুবিধা। (৪) মোজার জন্য সুতা কোথায় পাওয়া যায়। (৫) ঐ কল কিনিলে কি প্রকারে মোজা এবং গেঞ্জি তৈয়ার করিতে হয় তাহা শিখাইয়া দিতে কল বিক্রয়ের লোকেরা আসিয়া দেখাইয়া দেয় কিনা ? কত কম মূলধনে এই কুটীর শিল্পের কারখানা স্থাপন করা যায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ জানাইয়া সুখী করিবেন। এখানে অল্প মূলধনে ঐ কল বসাইবার ইচ্ছা আছে।

ইতি—
জে সি দত্ত
য়্যাসিষ্ট্যান্ট মেডিকেল অফিসার
সেপন হাঁসপাতাল ;
পোঃ মোরান,
আসাম।

৫নং পত্রের উত্তর

(১) ও (২) নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাদের নাম করিয়া চিঠি লিখিলে গেঞ্জী মোজার কলের বিবরণ, দাম প্রভৃতি সমস্তই জানিতে পারিবেন ;—

(1) K. C. Mallik & Sons ; 20 A, Chittaranjan Avenue ; Calcutta (2) Don Watson & Co 19, British Indian Street, Calcutta. (3) Mukherjee & Co, Rampuria Chambers 10, Clive Row, Calcutta (4) The Oriental Machinery Supplying Agency Ltd. 20, Lall Bazar Street Calcutta. (5) Indian Hosiery Machine makers, Ludhiana (Punjab)

(৩) কুটীর শিল্প হিসাবে কোনটী সুবিধা, তাহা আপনি স্থানীয় অবস্থা হিসাবে বিবেচনা করিতে পারেন। আপনাদের সেখানে কোনটীর কাটৃতি বেশী হইবে, তাহার উপরই সুবিধা অসুবিধা নির্ভর করে। অবশ্য তৈয়ারী বিষয়ে

মোজাই অধিকতর সহজ এবং অল্প মূলধনে আরম্ভ করা যায়।

(৪) নিম্ন লিখিত সূতার ব্যবসায়ীদিগকে আমাদের নাম করিয়া চিঠি লিখিলে সূতার মূল্য ও রকমারির বিবরণ সমস্তই জানিতে পরিবেন,—(1) Adamjee Haji Dawood & Co Ltd. Stephen House, 5 Dalhousie Square, Calcutta, (2) Dunbar Mills Ltd. Post Box 12, Calcutta. (3) Indian yarn Trading Co, Ltd, 137, Cotton Street, Calcutta (4) P. N. Mehta & Co, 208, Cross Street, Calcutta. (5) Jhabarmull Satnarian, 149, Cotton Street (6) Japan Cotton Trading Co, Ltd. D-3 Clive Buildings, Clive Street, Calcutta.

(৫) কল বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীরা অভিজ্ঞ লোক পাঠাইয়া আপনাকে গেঞ্জি মোজা তৈয়ারী শিখাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আপনার কলের দামের অনেক বেশী টাকা খরচ পড়িবে। কারণ, ঐ লোকের যাতায়াত খরচা ও শিখাইবার পারিশ্রমিক আপনাকে দিতে হইবে। একটু বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে এই কল চালান শিক্ষা করিতে বেশী দিন লাগেনা। সুতরাং কল কিনিবার সময় আপনি অথবা আপনার কোন লোক আসিয়া যদি কলিকাতায় ঐ কল বিক্রয়কারীদের আফিসে কয়েকদিন যাইয়া কাজটা শিখিয়া নেন, তাহা হইলেই সুবিধা হয়। মূলধনের মধ্যে আপনার কলের দাম ও তার দা'মই প্রধান। তারপর মাল তৈয়ারী হওয়া মাত্রই উহা বিক্রয় হইবে না। যতদিন পড়িয়া থাকে, তাহার দরুণ কিছু অতিরিক্ত টাকা হাতে রাখিতে হয়। এই সব অবস্থা বুঝিয়া আপনি মূলধন স্থির করিবেন। আমাদের মনে হয়, কলের দাম ব্যতীত অন্ততঃ কমপক্ষে তিনশত টাকা হাতে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা উচিত।

৬নং পত্র

মহাশয়,

আপনার বৈশাখ ১৩৩৮ সালের ব্যবসা ও বাণিজ্যে লিখিত কমলা নেবুর খোসা বিষয়ক প্রবন্ধ সম্পর্কে জানিতে চাই, বাজারে কাহারা ইহা খরিদ করে এবং ইহার মূল্য কি রকম হইতে পারে। এই অঞ্চলে বহু সংখ্যক বাব্‌লা গাছ আছে। এ বিষয়েও কিছু উপদেশ দান করিলে বাধিত হইব। ইতি

নিবেদক
শ্রীহরিপদ মুখার্জ্জি বি এ
C/o A. C. Chatterjee Esqr.
Asst Engineer P. W. D.
Amraoti, (Berar)

৬নং পত্রের উত্তর

(১) কমলা নেবুর খোসার চূর্ণ ফেস্ পাউডার (Face powder) প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রী তৈয়ারী করিতে ব্যবহার হয়। ব্রহ্মদেশে ইহার প্রচলন খুব বেশী। আমাদের

দেশে যে সকল ব্যবসায়ীরা স্নো-ক্রীম-পাউডার ইত্যাদি প্রস্তুত করেন, তাঁহারা কমলা লেবুর খোসা চূর্ণ ব্যবহার করেন কিনা, তাহা আপনি চিঠি লিখিয়া জানিতে পারেন। কয়েকটী ফার্ম্মের নাম ও ঠিকানা দিলাম,—

(1) Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, 31 Chittaranjan Avenue, Calcutta

(2) Kalpataru Ayurvedic Works, Kalpataru Palace, Chittarnjan Avenue, (North) Calcutta.

(3) Himani Works, 59 Belgachia Road,

ব্রহ্মদেশের দুইটী ফার্ম্মের ঠিকানা দিতেছি,—

(1) Ever Ready Perfumery Co. 242 Mogul Street P. O. Box No 376, Rangoon.

2. Y. D. Bordiwala 59, Sooratee C. Bazar (Top Floor) Rangoon.

কমলালেবুর খোসা কাঁচা অবস্থায় টুকরা করিয়া কাটিয়া কমলা লেবু ও চিনির সহিত জ্বাল দিয়া মার্ম্মালেড্ প্রস্তুত করা হয়। উহা জাম্-জেলীর মত খুব মুখরোচক এবং উপাদেয় খাদ্য। দেশীয় কোন কোম্পানী ইহা তৈয়ারী করে বলিয়া জানিনা। নিম্নলিখিত ফার্ম্মে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে পারেন,— (1) Bengal Canning and Condiment Works Ltd., Gurudas Dutta Garden Lane, Calcutta.

(2) Great Eastern Preserving Works, 83/C South Road Entally, Calcutta.

(3) Daw Sen & Co. 29, South Road Entally, Calcutta.

(২) বাবলার ছাল মোটা চামড়া কসাই-এর জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ট্যানারী কারখানা সমূহ বাবলার ছাল যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয় করে। নিম্নে কয়েকটী ট্যানারীর নাম ঠিকানা দিলাম ;—

(1) Bengal Tannery Co. 17 Gorachand Road Entally, Calcutta

(2) Indian Tanneries Ltd. 5, Hide Road Kidderpore, Calcutta.

(3) National Tannery Co. Ltd Canal South Road Pagladanga Calcutta.

পুনশ্চ।—আপনার পত্রের মর্ম্ম আমরা এই পুস্তকের "ব্যবসায়ের সন্ধান" শীর্ষক অধ্যায়ে প্রকাশ করিলাম।

তন্তু ও তুলা

শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়

তন্তু-উৎপাদক দ্রব্যের মধ্যে বাঙ্গলার পাট পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু আজ সেই পাটই বাঙ্গালীর কাছে অগ্রাহ্য হইয়া পড়িতেছে। পাটের কথা আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। আমরা আজ তন্তু উৎপাদক দ্রব্যের মধ্যে আর একটি প্রধান দ্রব্যের কথা বলিব, ইহা তুলা।

বাঙ্গলায় আজ তুলা নাই বলিলেই হয়। উৎপাদনের প্রচেষ্টাও নাই। তুলার কথা একটা প্রবন্ধে শেষ হইবার নহে। আমরাও ক্রমে ক্রমে এই সম্বন্ধে বলিব।

পূর্ব্বকালে যখন মস্‌লিন কাপড়ের ব্যবসায়ে বাঙ্গলা বিশেষতঃ ঢাকা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তখন ঢাকা জেলায় তুলা জন্মিত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। কিন্তু সেই দীর্ঘতন্তু কার্পাস আর এখন পাওয়া যায় না। ঢাকার কাপড় বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ আছে তাহা সেকালের সূক্ষ্ম সূত্রের দীর্ঘতন্তু কার্পাস কি না সে বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

সেই স্বদেশী যুগে যখন বোম্বাইকে বন্ধু ভাবিয়া আমরা তাহাদের কাপড়ের কল পুষ্ট করিতে বুকের রক্ত ঢালিতেছিলাম, তখন বাঙ্গলার দীর্ঘতন্তু কার্পাস চাষের জন্য অনেকেই ঝুঁকিয়াছিলেন। কিন্তু ঝোঁক ঝোঁকই মাত্র। সেই ঝোঁককে কার্য্যে পরিণত করিতে বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। তথাপি যাহারা নানা দেশীয় কার্পাস বীজ সংগ্রহ করিয়া দেশে কার্পাস চাষ চালাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহা-দিগের প্রচেষ্টা Experimental হিসাবে ধরা যাইতে পারে। এই সময়ে কলিকাতার মেসার্স ওয়ালেশ এণ্ড কোং Long Staple Cotton Growing Syndicate Ld, নামে এক কোং খুলেন। ঐ কোম্পানী বিধিবদ্ধ ভাবে কার্পাস চাষ প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য খুব ভাল ছিল। তাহারা বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে তুলা চাষ করিবার পরীক্ষাক্ষেত্র খুলিবার জন্য টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাহাদের সর্ত্ত ছিল যে, ব্যাপকভাবে তুলা চাষ করিবার পূর্ব্বে পরীক্ষাকারীকে দুই তিন বৎসর তুলা চাষের পরীক্ষা করিতে হইবে। যে জাতীয় তুলা পরীক্ষা-ক্ষেত্রে সুফল প্রদান করিবে, তাহাই ব্যাপক ভাবে জন্মাইতে হইবে পরীক্ষা-ক্ষেত্রে পরীক্ষাকারী দিবেন, খরচ পত্র কোম্পানী যোগাইবেন। পরীক্ষাকারীকে দশ বৎসরের মত উৎপন্ন সমস্ত তুলা কোম্পানীকে দিতে হইবে।

এই চুক্তিতে বদ্ধ হওয়া তখন আমার মনঃপূত হয় নাই। তাই কোম্পানীর সুবিধা গ্রহণ করি নাই। না করিয়া যে অন্যায়

করিয়াছি আজ তাহা মনে করিয়া আপশোষ করিতেছি। তখন ভাবিয়াছিলাম আমার স্বদেশী প্রচারকারী বন্ধুগণ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন। আমার সে আশা সফল হয় নাই। যাহা হউক কোম্পানীও অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

যদিও পরীক্ষা বাঙ্গলায় সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার কারণ যে বাঙ্গলার জলবায়ু ও ভূমি তূলা চাষের অনুকূল নহে, এমত সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। আমার বিশ্বাস পরীক্ষা উপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। নদীয়া জেলার স্বর্গীয় বিপ্রদাস পাল মহাশয়ের নেতৃত্বে এবং যশোহর জেলার পোড়াদহ কুঠীর পরীক্ষার কথা আমি জ্ঞাত আছি। আমার বিশ্বাস পরীক্ষা-কেন্দ্রের কার্য্য ঠিক ভাবে চলে নাই। পাল মহাশয় কৃষিতত্ত্বজ্ঞ হইলেও তত্ত্বাবধানের যত্ন তেমন করিয়া লইতে পারেন নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস পোড়াদহেও ঐ কথা। অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধান করিলে সম্ভবতঃ উহাই কারণ দেখা যাইবে। বাঙ্গলার জলবায়ু ও মৃত্তিকা যে কার্পাসের অনুপযোগী নহে, তাহাতে আমার আস্থা আছে বলিয়াই ঐকথা বলিতেছি।

বড় লোকের কার্য্যের গতি অনেক সময় ঐ প্রকারই হয়; বিশেষতঃ লিমিটেড্ কোম্পানীর। ডিউক অব ডিভনসায়ার গো-পালনের জন্য পাগল হইয়াছিলেন বলিয়া আজ ইংলণ্ডে দুগ্ধ ব্যবসায় এত উন্নত হইয়াছে।

গোমাতাও পয়স্বিনী হইয়াছে। এদেশে কৃষি-পাগল তেমন কেহ হয় নাই।

তুলা চাষ প্রবর্ত্তনের জন্য এদেশে যাহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং ছাতোয়া এষ্টেটের ম্যানেজার স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের নাম উল্লেখ না করিলে চলিবে না। শুনিয়াছিলাম, আচার্য্য রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে কলিকাতার সন্নিকট কার্পাস চাষের পরীক্ষা চলিতেছে। খদ্দর প্রচারকারিগণ এসম্বন্ধে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহাও অবগত নহি।

কার্পাস সাধারণতঃ উচ্চ ভূমিতে জন্মায়। যশোহর ও নদীয়ার উচ্চস্থানে, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, ত্রিপুরা চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং ঢাকার উচ্চস্থানে তুলা জন্মিতে পারে। চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা অঞ্চলে এখনও কার্পাস জন্মায় এবং উহার ব্যবসায় আছে।

দীর্ঘতন্তু কার্পাস বাঙ্গলায় জন্মান অসুবিধা নহে। তবে বিস্তৃত ভাবে আবাদের পূর্ব্বে বিভিন্ন প্রকার কার্পাসের আবাদ করিয়া কোন্ কার্পাস এই সকল স্থানের উপযোগী হইবে তাহা স্থির করা আবশ্যক।

বাঙ্গলার খাদি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি প্রমুখ বয়নশিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত সমবায়গুলি এবং বাঙ্গালার কাপড়ের কলসমূহ মিলিত হইয়া তুলা চাষের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। বোম্বাই হইতে তুলা বাজারদরে খরিদ করিয়া যে উচ্চমূল্য দিতে হয়, তাহারই জন্য এদেশের খদ্দর যে সস্তা হইতে পারে নাই ইহা একটা সত্য কথা। বাঙ্গলার কলগুলির পক্ষেও ইহা কম কণ্টকময় পথ নহে। বোম্বাই ও নাগপুরের তুলাক্ষেত্রসমূহ, মহাজনদিগের করতলগত। তাঁহারা জাপানে ও চীন দেশে তুলা বিক্রয় করিয়া বেশী লাভ করার জন্য দেশের কলওয়ালা, হস্তচালিত বয়ন ব্যবসায় এবং সূতা কাটার প্রতিষ্ঠান গুলার কাছে অপেক্ষাকৃত সস্তায় বিক্রয় করেন না। ইহাদেরই সুবিধা ও লাভের জন্য গভর্ণমেন্টকে জাপানের কাছে তুলার কণ্ট্রাক্ট হেতু নত হইতে হইয়াছে এবং জাপানী কাপড়কে এদেশে আসিবার পথ তাই তাঁহারা খোলাসা করিয়া দিয়াছেন। আজ বাঙ্গালীকে যদি আত্মনির্ভরপর হইতে হয় তবে তুলার চাষেও মন দিতে হইবে।

পরীক্ষার হিসাবে অল্পবিস্তর তুলার চাষ আমরা করিয়াছি। পৃথিবীতে যত প্রকার তুলার প্রচলন আছে, সকলেরই সহিত আমাদের একটু পরিচয় আছে।

বহু প্রকার কার্পাসের নাম এদেশে প্রচলিত আছে। রাম কার্পাস, দেও কার্পাস, বুড়ি কার্পাস, ভোগা কার্পাস প্রভৃতি নানা প্রকার। আমেরিকার দুই এক রকম কার্পাস এদেশে চাষ হয়, তাহার মধ্যে বোম্বাই অঞ্চলের ব্রোচ কার্পাস প্রধান। বোম্বাই ও নাগপুরে আজ কাল ইহারই প্রচলন বেশী। মিশর দেশের আব্বাসী কার্পাস সিন্ধুদেশে আবাদ হইয়াছিল। ব্যাপক আবাদ এখন আছে কিনা জ্ঞাত নহি। সম্ভবতঃ নাই। প্রধানতঃ কার্পাস দুই প্রকারে আবাদ হয়। এক জাতীয় কার্পাস একবার লাগাইলে ৫।৬ বৎসর পর্য্যন্ত একই ভূমিতে আবাদ চলে। আর এক প্রকার বর্ষে বর্ষে আবাদ করিতে হয়। যে কার্পাস বর্ষে বর্ষে

আবাদ হয় তাহার ফলন খুব বেশী নহে। আবাদ খরচ দিয়া অতি সামান্যই লাভ থাকে। যে গাছ বর্ষাধিক থাকে তাহার আবাদ উন্নতি সাপেক্ষ। আমার নিজের ব্যক্তিগত মত এই। মিশরীয় আব্বাসী কার্পাস উপযুক্ত প্রথায় চাষ করিয়াছিলাম। তবে উহা আমাদের এখানকার উপযোগী নহে, কারণ, উহাতে যে প্রকারে জলের বন্দোবস্ত করিতে হয় তাহার সুবিধা এখানে নাই। বৰ্দ্ধমান জেলায় যেখানে খালের জল পাওয়া যায় সম্ভবতঃ সেখানে চলিতে পারে। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যদি সেচের বন্দোবস্ত থাকে তবে উহা খুব উত্তমরূপে জন্মিতে পারে। আমার পরীক্ষা ক্ষেত্রে উহার আবাদ করিয়া আমি তাহা পরীক্ষার্থ স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিই। তিনি আবার উহা তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত কার্পাস বিশেষজ্ঞ Dr. Fletchu এর নিকট পাঠাইয়া দেন। Dr. Fletchu এর মন্তব্য সহ পত্র দত্ত মহাশয় আমাকে পাঠাইয়া দেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছিলেন যে তুলা গুণোৎকর্ষে মিশরীয় ঐ জাতীয় তুলার তুল্য। উহা দীর্ঘতন্তু।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্বলপুর হইতে এক জাতীয় বর্ষাধিক স্থায়ী কার্পাস সংগ্রহ করেন। উহার তন্তুও দীর্ঘ। আমার পরীক্ষার ফলে অবগত হইয়াছি যে, দীর্ঘতন্তু কার্পাস আবাদ এদেশে চলিতে পারে। ক্রমে ক্রমে আমি সব বিবৃত করিব। আজ এই পর্য্যন্ত থাক।
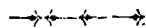
ভারতে কৃষির অবস্থা

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। ভারতবাসী প্রতি বৎসর নিজের ব্যবহারের জন্য এবং বিদেশ হইতে মালপত্র ক্রয় করিবার সামর্থ্য অর্জ্জনের জন্য যাহা উৎপাদন করে তাহার বেশীর ভাগ এই কৃষিকার্য্যের মারফতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবাসীর মধ্যে অধিকাংশ লোকের জীবিকা সংস্থানের উপায়ও এই কৃষিকার্য্য। কাজেই ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে কৃষির স্থান সর্ব্বোচ্চে।

চাষের জমির পরিমাণ

ভারত সরকারের দপ্তর হইতে ভারতে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে ১৯৩১-৩২ সালের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে সেই রিপোর্ট অনুসারে বৃটিশ ভারতে মোট স্থলভাগের পরিমাণ ৬৬ কোটী ৭০ লক্ষ ৫৮ হাজার একর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জমির মধ্যে ৮ কোটি ৮৫ লক্ষ ৬৬ হাজার একর অর্থাৎ মোট জমির শতকরা ১৩.৩ ভাগ বন জঙ্গলে আচ্ছন্ন, ১৪ কোটি ৫৬ লক্ষ ১৪ হাজার একর (শতকরা ২১.৮ ভাগ) হয় এত অনুর্ব্বর যে উহা চাষবাসের অনুপযুক্ত অথবা বাড়ীঘর, জল বা রাস্তাঘাটে আবদ্ধ, বাকী ৯৩ কোটী ২৮ লক্ষ ৭৮ হাজার একর জমি চাষের উপযুক্ত। গত ১৯৩১-৩২ সালে এই জমির মধ্যে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ একর পতিত ছিল, ৪ কোটী ৯০ লক্ষ ৪২ হাজার একর সাময়িক ভাবে পতিত ছিল এবং বাকী ২২ কোটী ৮৮ লক্ষ ৩৬ হাজার একর অর্থাৎ বৃটিশ ভারতের মোট জমির মাত্র ৩৪.৩ ভাগ জমিতে চাষ আবাদ হইয়াছিল। তবে একই জমিতে অনেক সময়ে বৎসরে দুইবার চাষ হয়। সেরূপ জমিকে যদি ডবল হিসাবে ধরা হয় তাহা হইলে এই বৎসরে বৃটীশ ভারতে মোট ২৬ কোটী ২৯ লক্ষ ১ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়াছে একথা বলা যায়।

বিভিন্ন প্রদেশে আবাদী জমি

ভারতের সকল প্রদেশে আবাদী জমির পরিমাণ সমান নহে। কোন প্রদেশ পর্ব্বত ও

বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ; কোন প্রদেশ মরুভূমিতে আচ্ছন্ন; আবার কোন প্রদেশ জলে জলময়। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মোট জমির তুলনায় আবাদী জমির পরিমাণ ভিন্নরূপ। নিম্নে বৃটিশ ভারতের কোন প্রদেশে মোট জমির শতকরা কতভাগে ফসলের চাষ হয় তাহা দেখান হইল:—দিল্লী ৫৯, সংযুক্ত প্রদেশ ৫৩, বাঙ্গলা ৪৯, বিহার ও উড়িষ্যা ৪৭, পাঞ্জাব ৪৬, বোম্বাই ৪১, মধ্য প্রদেশ ও বেরার ৩৯, মাদ্রাজ ৩৭, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ২৭, আজমীঢ়-মাড়োয়ার ২০, আসাম ১৬, কুর্গ ১৪ ও ব্রহ্মদেশ ১১। দিল্লী একটি অতি ক্ষুদ্র প্রদেশ কাজেই উহার কথা বিশেষ ধর্ত্তব্য নহে। ভারতের বড় বড় প্রদেশ গুলির মধ্যে দেখা যায় যে, সংযুক্ত প্রদেশেই আবাদী জমির ভাগ সব চেয়ে বেশী; উহার পরেই বাঙ্গলা এবং তৎপর ক্রমশঃ বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, ও বোম্বাইয়ের স্থান।

আবাদী জমি ও জনসংখ্যা

প্রত্যেক দেশে মাথা পিছু গড়পড়তা আবাদী জমি দ্বারা ঐ দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ, আমাদের ভোগবিলাসের যত সামগ্রী দরকার চরমে তাহা জমি হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে দেশের লোকের হাতে আবাদী জমির পরিমাণ যত বেশী সেই দেশ তত স্বচ্ছল—অন্ততঃ হওয়া উচিত। উপরে বিভিন্ন প্রদেশের আবাদী জমির যে পরিমাণ দেওয়া হইল তাহা হইতেই এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না। এই জন্য বৃটিশ ভারতের কোন প্রদেশে প্রতি ১০০ একর জমির উপর গড়ে কতজন লোককে নির্ভর করিতে হয় তাহা দেখান হইল:—দিল্লী ২৯১, সংযুক্ত প্রদেশ ১৩৫, বাঙ্গলা ২১৩, বিহার ও উড়িষ্যা ১৫২, পাঞ্জাব ৮৫, বোম্বাই ৬৮, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৬১, মাদ্রাজ ১৪০, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১১৩, আজমীঢ় মাড়োয়ার ১৫৭, আসাম ১৫০ কুর্গ ১১৯ ও ব্রহ্মদেশ ৮৪ এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মদেশের মোট জমির শতকরা ১১ ভাগে মাত্র চাষ আবাদ হইলেও ঐ প্রদেশে প্রতি ৮৪ জন লোকের ভাগে ১০০ একর করিয়া জমি পড়িয়াছে। কারণ, ব্রহ্মদেশে বাঙ্গলার ন্যায় এত ঘন বসতি

নাই। পক্ষান্তরে, বাঙ্গলার মোট জমির ৪৯ ভাগ আবাদী হইলেও উহার প্রতি ১০০ একর জমির উপর ২১৩ জন লোককে নির্ভর করিতে হইতেছে। ভারতবর্ষের মধ্যে দিল্লী প্রদেশেই মাথাপিছু জমির পরিমাণ সবচেয়ে কম। কিন্তু দিল্লী রাজধানী বলিয়া উক্ত সহরের অধিবাসিগণকে ধরিয়া জমির হিসাব করা হইয়াছে। সহর ছাড়িয়া দিলে মাথা পিছু গড়পড়তা জমির পরিমাণ অনেক বেশী হইবে। উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা প্রদেশের অধিবাসীদেরই মাথাপিছু গড়পড়তা জমির পরিমাণ সবচেয়ে কম। বাঙ্গালা দেশের লোকের যে আজ দারিদ্র্য এত বেশী হইয়াছে, জমির এই অপ্রাচুর্য্য তাহার অন্যতম কারণ।

বিভিন্ন ফসলের চাষ

১৯৩১-৩২ সালে দো-ফসলা জমি ধরিয়া ভারতে যে ২৬ কোটী ২৯ লক্ষ একর জমিতে ফসলের চাষ হইয়াছে, তাহার মধ্যে আহার্য্য জাতীয় ফসলের চাষ হইয়াছিল শতকরা ৮২.৩ ভাগ জমিতে এবং আহার্য্য নহে এরূপ ফসলের চাষ হইয়াছে—শতকরা ১৭.৩ ভাগ জমিতে। নিম্নে ভারতের মোট আবাদী জমির কত অংশে কি শ্রেণীর ফসলের চাষ হইয়াছে তাহা দেখান হইল :—

আহার্য্য—

খাদ্য শস্য	৭৮.১ ভাগ
মসলা ও চাটনী জাতীয় ফসল	০.৬ "
শর্করা জাতীয় ফসল	১.১ "
ফল ও শাক সব্জী	১.৯ "
বিবিধ খাদ্য শস্য	০.৭ "
	৮২.৩ "

আহার্য্য নহে এরূপ ফসল—

তৈলবীজ	৬.০ "
আঁশ জাতীয় ফসল (পাট, তুলা, শণ ইত্যাদি	৬.৫ "
রং ও ট্যান্ করিবার ফসল	০.২ "
ঔষধি ও মাদক জাতীয় ফসল	০.৯ "
পশুর খাদ্য	৩.৭ "
বিবিধ	০.৪ "
	১৭.৭ "

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বৃটিশ ভারতের মোটমাট আবাদী জমির মধ্যে শতকরা ৭৮ ভাগ জমিতেই খাদ্য শস্যের আবাদ হইয়া থাকে। গত ১৯৩১-৩২ সালে বৃটিশ ভারতে মোটমাট ২০ কোটী ৫০ লক্ষ একর জমিতে খাদ্য শস্যের আবাদ হইয়াছিল। উহার মধ্যে বিভিন্ন শস্যের চাষের হিসাব এইরূপ :—

ধান	৮১২৮৮০০০ একর
গম	২৫৩২০০০০ একর
যব	৬৪৯৫০০০ একর
জোয়ারি	২১৬০৮০০০ একর
বাজরা	১৩৯৪২০০০ একর
রাগি	৩৮৭১০০০ একর
ভুট্টা	৬১০৯০০০ একর
ডাল	১৫৯৩২০০০ একর
বিবিধ খাদ্য শস্য	৩০৪৪৯০০০ "

গত ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় ১৯৩১-৩২ সালে বৃটিশ ভারতে গম, জোয়ারি, রাগি ও ভুট্টার চাষ কম হইয়াছে এবং ধান,

যব, বাজরা, ডাল ও বিবিধ ফসলের চাষ বাড়িয়াছে।

বিভিন্ন প্রদেশের সেচ-কার্য্য

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাঁধ তৈয়ার করিয়া, খাল কাটিয়া এবং কূপ খনন করিয়া অনেক অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে এবং অনেক অনুর্ব্বর জমিকে উর্ব্বরা জমিতে পরিণত করা হইয়াছে। এই বিষয়ে বাঙ্গলা প্রদেশ সবচেয়ে পশ্চাৎপদ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আবাদী জমির শতকরা কত ভাগ সেচকার্য্যের স্থবিধা পাইতেছে তাহা নিম্নে দেখান হইল:—পাঞ্জাব ৫২ ভাগ, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ৪৩, আজমীঢ় মাড়োয়ার ৩৯, সংযুক্ত-প্রদেশ ২৮, মাদ্রাজ ২৭, দিল্লী ২৪, বিহার ও উড়িষ্যা ২৯, বোম্বাই ১৩, আসাম ১১, ব্রহ্মদেশ ৮, বাঙ্গলা ৭, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৪, কুর্গ ৩ ভাগ।

বন-জঙ্গল

বৃটিশ ভারতে যে ৮ কোটী ৮৫ লক্ষ একর জমি বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন তাহার শতকরা ২৫ ভাগ ব্রহ্মদেশে, ১৮ ভাগ মধ্যপ্রদেশে ও বেরার, ১৫ ভাগ মাদ্রাজে, ১১ ভাগ সংযুক্ত প্রদেশে, ১৫ ভাগ বোম্বাইয়ে এবং বাকী ২১ ভাগ অন্যান্য প্রদেশে অবস্থিত।

বনভূমির উপকারিতা

প্রদেশ হিসাবে বিভাগ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অরণ্য-সংস্থানের যথেষ্ট তারতম্য রহিয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :—

প্রদেশের নাম	মোট ভূমির সহিত বনভূমির অনুপাত।
১। বেলুচিস্থান—	১'৪
২। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—	১'৮
৩। বিহার ও উড়িষ্যা—	৩'৪
৪। যুক্ত প্রদেশ—	৩'৯
৫। আজমীর মাড়ওয়ার—	৫'১
৬। পঞ্চনদ—	৮'৬
৭। বোম্বাই—	৯'৯
৮। বঙ্গদেশ—	১৩'৫
৯। মাদ্রাজ—	১৩'৮
১০। মধ্য-প্রদেশ ও বেরার—	১৯'৭
১১। কুর্গ—	৩২'৯
১২। আসাম—	৪৬'৬
১৩। ব্রহ্মদেশ—	৬২'৯
১৪। আন্দামান—	৭০'৩

উপরিউক্ত তালিকায় প্রদেশগুলি অরণ্যের আধিক্যের হিসাবে পর পর সজ্জিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, এক এক প্রদেশ প্রায় জঙ্গলবিহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পক্ষান্তরে, আন্দামানের ন্যায় স্থানে প্রায় সমস্ত জমিই জঙ্গল দ্বারা অধিকৃত। সেইজন্য স্থান-বিশেষে অরণ্য-বন্দোবেস্ত সম্বন্ধে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হয়। কোন স্থানে জঙ্গল কাটিয়া চাষের ও বসবাসের জমি বৃদ্ধি করিতে হয় এবং কোথাও বা অরণ্য স্থাপন ও সংরক্ষণ করিতে হয়।

অরণ্য সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্যই অরণ্য বিভাগের সৃষ্টি। সাধারণ লোকের নিকট অরণ্য রাখা কি কাটিয়া ফেলা একটা অতি সামান্য কাজ, তাহাতে কোন বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু আধুনিক জগতে বন-বিদ্যা কৃষি বিদ্যার সমশ্রেণী অধিকার করে। প্রত্যেক সুসভ্য দেশেই বন-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বড় বড় কলেজ, যন্ত্রাগার, পরীক্ষা ও প্রদর্শনক্ষেত্র আছে, এবং উক্ত স্থানে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিলে তবে কোন ব্যক্তির বনবিভাগে কর্ম্মপ্রাপ্তি ঘটে। আমাদিগের দেশে দেরাদুনে অবস্থিত বনবিদ্যার কলেজ ও মৌলিক গবেষণাগারই বনবিদ্যা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব অধিক দিনের নহে। তার ও ডাক বিভাগের ন্যায় বনবিভাগও লর্ড ড্যালহৌসির সৃষ্টি। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইহা প্রথমে স্থাপিত হয় এবং কয়েক স্থানের জঙ্গল গবর্ণমেণ্ট নিজের তত্ত্বা-

বধানে রাখিয়া উন্নতির চেষ্টা করেন। আপাততঃ জার্ম্মাণী আমাদিগের শত্রু হইলেও সত্যের খাতিরে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতের বনবিভাগের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, একজন জার্ম্মাণী—স্যার ডেটিক ব্র্যাণ্ডিস্। সে সময়ে বনবিভাগের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ প্রধানতঃ জার্ম্মাণী অথবা ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেন। তৎপরে ইংলণ্ডের কুপার্স হিল কলেজে ও অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, এডিনবর্গ ও ডব্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে বনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বর্ত্তমান দেরাদুনে অবস্থিত কলেজ ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে প্রথমতঃ স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজেই বনবিভাগে নিযুক্ত অধিকাংশ দেশীয় কর্ম্মচারী শিক্ষিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বন-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এখনও বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসেন।

ভারতে জঙ্গলের আধিক্য হিসাবে ভারত-বাসী যে অরণ্য-বিদ্যায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ন্যায় উচ্চ-স্তরের বনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার সুবন্দোবস্ত এখনও এতদ্দেশে হয় নাই। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে সবেমাত্র রাজসরকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিতে পারা যায়। ফলাফল বিবেচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাল, সেগুন, শিশু, দেবদারু, চিল, প্রভৃতি আয়কর বড় বড় বৃক্ষের সংরক্ষণ ও বাছাই কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে বটে, কিন্তু আরও যে নানা প্রকার অরণ্যজাত দ্রব্য দ্বারা ধনাগমের উপায় হইতে পারে, সে বিষয়ে রাজসরকারের কিম্বা জনসাধারণের বিশেষ চেষ্টা নাই। ১৯১৯।২০ সালের বনবিভাগের হিসাবে দৃষ্ট হয় যে, উক্ত বিভাগের মোট আয় ৫ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৩ কোটী ১২ লক্ষ টাকা। সুতরাং প্রকৃত আয় ২ কোটী ২০ লক্ষ টাকা। মোট বনভূমির অনুপাতে এই হিসাবে প্রতি বর্গ মাইলে ৬৪৲ টাকা লাভ হয়। অপরাপর দেশের হিসাবে ইহা অতি সামান্য। অরণ্য-বিদ্যার অবহেলাই ইহার অন্যতম কারণ। অরণ্যসকল অধিকতর দক্ষতার সহিত পরিদর্শিত হইলে এবং নানাবিধ অরণ্যজাত দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় অভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইলে, আয় যে চতুর্গুণ হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সরকারী হিসাবে অরণ্যজাত ফসলকে সাধারণতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—মুখ্য ও গৌণ ফসল। মুখ্য ফসলের মধ্যে অবশ্য কাষ্ঠই সর্ব্বপ্রধান এবং ইহা হইতেই সরকারের সর্ব্বাধিক আয় হয়। ভারতের অরণ্যে বৃক্ষের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; এবং জাতি-বাহুল্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতীয় অরণ্যে অন্ততঃ ২৫০০ জাতীয় বৃক্ষ আছে। তবে প্রধান কাষ্ঠ-উৎপাদক বৃক্ষাদির মধ্যে শাল, সেগুন, শিশু, দেবদারু, আবলুষ, চন্দন, রক্তচন্দন' পাদক, পিংকাড়ো, গজ্জন, বকুল, খয়ের প্রভৃতিই অন্যতম। বাঁশ, জালানি-কাঠ ও ঘাস এই বিভাগের অন্তর্গত। এই তিন প্রকারের দ্রব্য হইতে গভর্ণমেণ্টের আয় সামান্য নহে। বন-বিভাগের কর্ম্মচারিবর্গ এই শ্রেণীর ফসলের উৎপাদন মাত্রা যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য সকল সময়ে সচেষ্ট থাকেন। সেইজন্য বৎসরের পর বৎসর মুখ্য ফসল উৎপাদনের অধিক পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইতেছে।

কিন্তু ভারতীয় অরণ্য সমূহের গৌণ অরণ্য ফসলও নিতান্ত নগণ্য নহে। দুই একটী স্থল ব্যতীত এই শ্রেণীর ফসলের ক্রমোন্নতি-সাধন অথবা উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। এমন কি, অনেক স্বভাবজ উদ্ভিদাদি, যাহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং যাহা অন্য দেশে ব্যবসায় ও বাণিজ্যে নিয়োগ করিতে আদৌ কাল বিলম্ব হইত না—সেরূপ দ্রব্যাদিও অবহেলায় বনমধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আপাততঃ যে সকল গৌণ ফসল হইতে বনবিভাগের আয় হয়, সেগুলি যে আয়াসলব্ধ তাহা নহে, কিন্তু সেই সমুদয় ফসল অবৈজ্ঞানিকভাবে আরণ্য জাতি প্রভৃতির দ্বারাই সংগৃহীত হয়। এইরূপ শৈথিল্য ও অবজ্ঞার সহিত সংগৃহীত হইয়াও ইহা হইতে সরকারের প্রায় ১০৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গৌণ অরণ্য ফসল হইতে কিরূপ আয় হয় তাহা নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

	প্রদেশের নাম।	গৌণ্য অরণ্য ফসল হইতে আয়।	বনভূমির বর্গ মাইল প্রতি আয়ের অনুপাত
১।	পঞ্চনদ	২৩,৪৭,১২০৲	২৮২৲
২।	যুক্ত প্রদেশে	৮,৮৮,৯৪৯৲	২১৩৲
৩।	আজমীর মাড়বার	২৩,৮৩৭৲	১৮৬৲
৪।	সীমান্ত প্রদেশে	৩৬,৮৮১৲	১৫৬৲
৫।	মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২২,৩৪,৮১১৲	১১৪৲
৬।	বোম্বাই	১১,৮৩,৫৮৯৲	৯৭৲
৭।	মান্দ্রাজ	১৮,৬৮,৪৩২৲	৯৫৲
৮।	বিহার ও উড়িষ্যা	২,৩৩,৪২২৲	৮৪৲
৯।	বেলুচিস্থান	৪৩,৬১৭৲	৫৬৲
১০।	কূর্গ	২৪,৩৮৪৲	৪৯৲
১১।	বঙ্গ	৩,৫৩,৯৭৪৲	৩০৲
১২।	আসাম	৬,৯৯,৮২৮৲	৩১৲
১৩।	ব্রহ্ম	৮,৫৩,৯০৫৲	৬৲
১৪।	আন্দামান	৫,১৫৭৲	২৲

উপরিউক্ত তালিকার সহিত ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত তালিকার তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অরণ্যের প্রাচুর্য্য থাকিলেই গৌণ অরণ্য ফসল অধিক হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রহ্মদেশ ও আন্দামানের উল্লেখ করিতে পারা যায়। অরণ্যের অনুপাতে এই দুই দেশে শতকরা ৬২·৯ ও ৭০·৩ অংশ জমিতে অরণ্য আছে কিন্তু এই দুই দেশে গৌণ অরণ্য ফসল হইতে আয় বর্গমাইল প্রতি যথাক্রমে ৬৲ ও ২৲ টাকা। পক্ষান্তরে প্রদেশ সমূহের মধ্যে অরণ্যের বাহুল্যে পঞ্চনদ নবম স্থান অধিকার করিলেও গৌণ অরণ্য-ফসল হইতে আয়ের হিসাবে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, জঙ্গলের বিস্তৃতিতে নহে বরং তত্ত্বাবধানের গুণে গৌণ অরণ্য-ফসলের আয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পঞ্চনদ ও যুক্তপ্রদেশে বন-বিভাগে কর্ম্মচারিগণ গৌণ অরণ্য-সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশে যতটা

চেষ্টা করেন, ততটা অন্য কোথাও হয় না। বর্ত্তমান সময়ে অরণ্য বিভাগের উদ্যমে যে সমুদয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তন্মধ্যে তার্পিন ও রজন অন্যতম এবং পঞ্চনদের জাল্লো এবং যুপ্রদেশের ভাওয়ালী এই দুই স্থানে দুইটী প্রধান তার্পিণের কারখানা অবস্থিত। অরণ্য ঘাস ও বাঁশ হইতে কাগজ উৎপাদন, কাষ্ঠ হইতে নানাবিধ কার্য্যে প্রয়োগের জন্য কাষ্ঠ-পিণ্ড—এই সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রস্তাবনা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই, হইলেও তাহা উক্ত দুই দেশে কিম্বা বঙ্গদেশে হইবে।

গৌণ আরণ্য ফসল হইতে যে কত প্রকারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা মোটামুটি কয়েক শ্রেণীর ফসলের উল্লেখ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সংক্ষেপেতঃ শ্রেণীগুলি নিম্নরূপ—

(১) তন্তু; রজ্জু প্রস্তুতের উপযোগী মুঞ্জঘাস, কেয়া, আঁতমোড়া, আকন্দ, বনঢেঁড়স প্রভৃতি; কাগজের জন্য সবই ও অন্যান্য জাতীয় ঘাস ও বাঁশ; ব্রুসের জন্য হেঁতাল, গোলপাতা ইত্যাদি।

(২) ঔষধার্থ ব্যবহৃত উদ্ভিদাদি, মশলা ও গন্ধদ্রব্য; গন্ধতৃণ, রোজা-তৃণ ও চন্দন-কাষ্ঠ আপাততঃ বড় বড় ব্যবসায়ের দ্রব্য। দারুচিনি, ছোট এলাচ, গোল মরিচ, জায়ফলও জঙ্গল হইতে কতক পরিমাণে সংগৃহীত হয়। ঔষধে সুপরিচিত বহু সংখ্যক উদ্ভিদ জঙ্গলে জন্মাইয়া থাকে, মিঠা তেলিয়া, বচ, খোরাসানী আজোয়ান, কুচিলা, কুট প্রভৃতি কতক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু এগুলির এখনও রীতিমত সংগ্রহের ব্যবস্থা নাই।

(৩) খাদ্যদ্রব্য:—আম, কাঁঠাল, জাম, খোবানি, আখরোট, নানা জাতীয় ঘাস প্রভৃতি অনেক দ্রব্য ভারতের নানা স্থানে দরিদ্র আরণ্য জাতি সমূহের সময়ে সময়ে আহার জোগাইয়া থাকে। সাগু ও আরারুটও অনেক পরিমাণে বন্য উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত হয়।

(৪) রঞ্জক পদার্থ:—যন্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য উদ্ভিজ্জ পদার্থের ব্যবহার আজ-কাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু চামড়া রং করিবার জন্য এখনও বাবলা, তাবওয়ার, সোঁদাল ও গরাণ ছাল এবং হরিতকী ও বাবলা ফল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সমস্তই আরণ্য দ্রব্য।

(৫) আঠা ও বৃক্ষাদির নির্য্যাস:—বাবলা আঠা, পলাশ, সিমুল ও বিজাশাল গদ, ধুনা লবান প্রভৃতি ব্যবসায়ের দ্রব্য। চির-বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে তার্পিণ ও রজন প্রস্তুত হইতেছে। গর্জ্জন ও ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ ইন ও খিট্সি তৈল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রবার রবার চাষের চেষ্টা আসাম ব্রহ্মদেশে ও কোচিনে চলিতেছে।

(৬) গৃহসজ্জাদি এবং ইমারৎ ও নৌগঠনের কাষ্ঠাদি:—এই সমুদয় শ্রেণীর দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য নানাবিধ কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। বাঁশ, বেত, উঠলো, মুঁজ নল, প্রভৃতির সাহায্যে যেরূপ টেবিল, চেয়ার, ঝুড়ি, মাদুর, বাক্স, পেটারা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে, এতদ্দেশে এখনও সেরূপ হয় নাই। চীন ও বিশেষতঃ জাপানে এই সমুদয় উপাদান হইতে মনোহর কারু-কার্য্য সম্পন্ন আসবাবাদি নির্ম্মিত হয়।

(৭) বিশেষ কার্য্যাদি :—পেন্সিল, খেলনা, প্যাকিং-বাক্স, ঝুড়ি, ক্রিকেট, টেনিস্, প্রভৃতি ক্রিয়ার সরঞ্জাম, শ্লীপার ও কাষ্ঠপিণ্ড প্রস্তুতের উপযোগী কাঠ ভারতীয় অরণ্য সমূহে যথেষ্ট পরিমাণ আছে; কিন্তু এ সকলের সামান্য অংশ মাত্রই ব্যবহারে আসিতেছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে গৌণ ও আরণ্য ফসলের কেবলমাত্র শ্রেণীরই উল্লেখ করা চলে। আমরা প্রত্যেক শ্রেণীতে যে দুই চারিটি দ্রব্যের নাম করিয়াছি সেগুলি শুধু শ্রেণীর প্রতিভূ। প্রত্যেক শ্রেণীতে ঐ প্রকারের বহু সংখ্যক দ্রব্য আছে এবং সেগুলির নামোল্লেখ করিতে গেলে একটি ছোট-খাট পুস্তিকা হয়। তবে এই স্বল্প তালিকা হইতেই বিবেচক ব্যাক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, গৌণ আরণ্য ফসলের প্রাচুর্য্যতার অনুপাতে উহা কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা নগণ্য। যে সমুদয় ফসল আজকাল অবহেলায় অপচয় হইতেছে, তৎসমুদয়ের ভবিষ্যৎ যে কিরূপ সুমহান, তাহা আমরা জঙ্গলের জনৈক কর্ম্মচারীর উক্তির দ্বারা দেখাইব।

বাংলাদেশের উপযোগী ঘাসজাতীয় গরুর খাদ্য

১। গিনি ঘাস।—

জল জমিতে পায় না এইরূপ সর্ব্বপ্রকার জমিতে গিনি ঘাস জন্মিয়া থাকে। বাংলাদেশে উঁচু জমিতে ইহা ভাল জন্মে। গোবর সার প্রচুর পরিমাণে দিলে ভাল হয় না। না এঁটেল, না বালু এইরূপ মাঝামাঝি জমিতে ইহা অতি উত্তম জন্মায়। গ্রীষ্মকালে জল সেচন করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া যায়।

গিনি ঘাস লাগাইবার পূর্ব্বে জমিতে উত্তমরূপে লাঙ্গল ও মই দিয়া ঘাস বাছিয়া ফেলিবে এবং বিঘাপ্রতি ১৫ গাড়ী (১৫০/ মণ গোবর সার দিয়া ফের চাষ ও মই দিয়া দিবে।

গিনি ঘাস জন্মাইতে হইলে শিকড় সমেত গাছের চারা লাগানই ভাল। সকল সরকারী জেলা ফার্ম্মে এইরূপ চারার ছোবা বিক্রয় হইয়া থাকে। এইরূপ ছোবা হইতে শিকড় সমেত ৬।৮টী চারা ছড়াইয়া লইয়া ২ ফুট অন্তর গর্ত্ত করিয়া তাহাতে লাগাইয়া দিতে হয়, পাশের দিকে ২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া লাগান ভাল। তাহাতে নিড়ানের সুবিধা হয়। গাছ লাগাইয়া গোড়ার মাটী বেশ চাপিয়া দেওয়া উচিত। বর্ষার প্রথমভাগে গাছ লাগান ভাল। গাছ বসিয়া গিয়া যখন সবুজ পাতা বাহির হয় তখন গোড়ায় একটু মাটী উঁচু করিয়া দেওয়া ভাল।

গাছ লাগাইবার এক মাস মধ্যেই প্রথম কাটা পাওয়া যাইবার কথা। কাটিবার সময় ঘাস প্রায় ১ হাত লম্বা হওয়া চাই। বীজ হইলে ঘাস শক্ত ও আঁশযুক্ত হয়। তাহার পূর্ব্বেই কাটা উচিত। মাটী হইতে ২ ইঞ্চি পরিমাণ গাছের গোড়া ছাড়াইয়া ঘাস কাটাই বিধি।

প্রত্যেক বার ঘাস কাটিবার পর জমিতে কোদাল দেওয়া ভাল। লাঙ্গল এবং বিঁদা দেওয়াও যাইতে পারে। দু'বার কাটার পর আবার সার দেওয়া উচিত।

বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানেই এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসেই জলসেচন ব্যতীত ২ ফুট লম্বা ঘাস পাওয়া যাইবে। জলসেচের বন্দোবস্ত থাকিলে মার্চ্চ

হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কাটা যাইতে পারে। সেচ দেওয়া জমি থেকে বৎসরে বিঘা প্রতি ২০০/ মণ ঘাস পাওয়া যায়। উপযুক্ত সার দেওয়া থাকিলে এবং জল দিলে বিঘা প্রতি ৫০০/ মণ পর্য্যন্ত কাঁচা ঘাস পাওয়া যাইতে পারে। ঘাসের ঝোপ ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়ে এবং ৫।৬ বৎসর উত্তম ফসল দিতে থাকে। তাহার পর পুনরায় নূতন করিয়া ঘাস লাগান উচিত। গিনি ঘাস সকল প্রকার গৃহপালিত পশুর অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য।

২। নেপিয়ার ঘাস

সরকারী কয়েকটি কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা দ্বারা যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, সব রকম ঘাসের মধ্যে এই ঘাসের ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গিনি ঘাসের মত এই ঘাসও উঁচু জমির উপযোগী। জল জমিলে এই ঘাস জন্মে না। তবে গিনি ঘাসের মত ইহাতে জল সেচ আবশ্যক হয় না। ইহার অনাবৃষ্টি সহ্য করার শক্তি গিনি ঘাস অপেক্ষা অনেক বেশী।

জমি তৈয়ারী এবং সার প্রয়োগ প্রণালী গিনি ঘাসের অনুরূপ। ভাল ফলন পাইতে হইলে সার অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা বিধেয়।

আকের যেমন কাটিং লাগান হয় ইহারও সেইরূপ কাটিং লাগাইতে হয়। বেশ পাকা গাছ থেকে ১০।১২ ইঞ্চি লম্বা কাটিং কাটিয়া তাহা ২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া লাগান উচিত। কাটিং লাগাইবার সময় ইহা মাটীর মধ্যে কাত্ করিয়া লাগাইয়া মাটী চাপা দিতে হয়, যেন মাথাটী ২ ইঞ্চি জাগিয়া থাকে। একসঙ্গে এক গর্ত্তে তিনটী করিয়া কাটিং দেওয়া ভাল। তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র অধিক ফসল আশা করা যায়। বর্ষার প্রথমভাগে লাগান ভাল। মাটীতে যথেষ্ট রস না থাকিলে জলসেচন দেওয়া ভাল। গাছ লাগিয়া গেলে যখন সবুজ পাতা বাহির হয় তখন গিনি ঘাসের মত গাছের গোড়ায় অল্প মাটী দেওয়া ভাল।

গাছ লাগাইবার এক মাস পরে প্রথম ঘাস কাটা হয় এবং তাহার পর যতদিন বর্ষা থাকে প্রতি ২০ দিন অন্তর ঘাস কাটা যাইতে পারে। ঘাস শক্ত হইবার পূর্ব্বে কাটা উচিত। অর্থাৎ দেড় হাত হইতে দুই হাত লম্বা হইলেই কাটা ভাল। মাটী ঘেঁসিয়া ঘাস কাটা উচিত।

গাছ লাগাইবার পর অপর সমস্ত ক্ষেতের কাজ গিনি ঘাসের মত। ঢাকার পরীক্ষা ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফল হইতে মনে হয় যে জল সেচন ব্যতীত এই ঘাস প্রতি বিঘায় ২৬৬/ মণ জন্মে। আর জল সেচ দিলে ৫০/ মণ পর্য্যন্ত ফলে। ঢাকা ফার্ম্মের দ্বিতীয় উদ্ভিদ্ বিদের নিকট এবং জেলা ফার্ম্ম সমূহ হইতে এই ঘাসের কাটিং পাওয়া যায়। সকল রকম গৃহপালিত পশু এই ঘাস খুব খায়।

মনে রাখিতে হইবে যে, সকল ঘাসেরই ফলন পাইতে হইলে বহুল পরিমাণে সার ব্যবহার করা উচিত। গোবর সার ব্যতীত নিম্নলিখিত কৃত্রিম সার যে কোনটী ব্যবহার করা ভাল। ঘাস ছোট থাকিতে এইগুলি ছিটাইয়া দিতে হয়:—

এমোনিয়াম সাল্‌ফেট	বিঘাপ্রতি	২৬ সের
সোডিয়াম নাইট্রেট	,,	২৬ ,,
ডাই এমোফস্	,,	২৬ ,,
হাড়ের গুঁড়া	,,	২৬ ,,

এই সকল কৃত্রিম সার ব্যবহারে ফলন যথেষ্ট বাড়ে। গোবর সার দেওয়ার উপর এইগুলি দিতে হয়। গোবর সার বাদ দেওয়া চলে না।

৩। সুদান ঘাস—

সুদান ঘাস বাৎসরিক ফসল। ভাল ফলন পাইতে হইলে প্রত্যেক বৎসর বীজ বপন করা দরকার। এই ঘাস গোচরণ ভূমির উপযোগী। জমীতে গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে এবং বীজ হইতে আপনা আপনি গাছ জন্মিয়া থাকে। তবে বাৎসরিক ফসল হিসাবে চায করিলে অধিক ফলন পাওয়া যায়। বর্ষার শেষে রবি ফসল হিসাবে চাষ করিয়া ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলন পাওয়া গিয়াছে। বর্ষার চাষ করিয়াও ফল নিতান্ত খারাপ হয় নাই, তবে রবি মরশুমে ইহা ভাল জন্মায়। এই ঘাস গিনি বা নেপিয়ার ঘাসের মত অধিক ফলন দেয় না, কিন্তু শীতকালে ফলে বলিয়া ইহার আদর আছে। অন্য দুইটী শীতকালে ফলে না।

লাঙ্গল ও মই দিয়া জমি তৈয়ারী করিয়া সার দিবে এবং ঘাস বাছিয়া বীজ বুনিবার মত করিয়া জমি প্রস্তুত করিবে। বীজ লাইন করিয়া বা ছিটাইয়া দুই রকমে বোনা যায়। বিঘা প্রতি তিন-চার সের বীজ লাগে। বীজ বুনিবার পর লাঙ্গল দেওয়া উচিত নহে। হাল্কা মই বা বাঁশের বিদা দিয়া বীজ ঢাকা দেওয়া উচিত। বুনিবার পূর্ব্বে ঘাস বাছিয়া দিলে আর নিড়ানের আবশ্যক হয় না।

বুনিবার দুই মাস পরে প্রথম ঘাস কাটা যাইতে পারে। অক্টোবর বা নভেম্বর প্রথমভাগে বীজ বুনিলে দুই বা তিন বার ঘাস কাটা যাইতে পারে। তবে এরূপ না করিয়া গাছে বীজ জন্মাইবার পূর্ব্বে একবার বেশী করিয়া কাটিয়া লওয়া ভাল, তারপরও এপ্রিল মাস নাগাদ অল্প কিছু ঘাসও পাওয়া যাইতে পারে। বর্ষাকালে বীজ বুনিলে ছয় মাস ধরিয়া অল্প অল্প ঘাস পাওয়া যায়। এই ঘাসের প্রধান গুণ এই যে, কোন খরিপ (বর্ষাকালে) ফসলের পর এই ঘাস বুনিতে পারা যায় এবং পর্য্যায় চাষের মধ্যে এই ঘাসের চাষ রাখা যাইতে পারে। ঢাকা কৃষিক্ষেত্রে এবং ঢাকার প্রয়োজক্ষেত্রে এই ঘাসের ফলন মন্দ হয় নাই। ইহা কাটিয়া তাজা ঘাস হিসাবে খাওয়ান যায় বা সাইলেজ (রক্ষিত খাদ্য) করা যায়, শুক্‌না ঘাস করিয়া রাখা যায় এবং মাঠে গরু দিয়া খাওয়ান চলে।

নিয়মমত চাষ করিলে দুইবার কাটায় বৎসরে গড়ে বিঘা প্রতি ১১৫৲ মণ পর্য্যন্ত কাঁচা ঘাস পাওয়া যাইতে পারে। ইহার বীজ ঢাকা ফার্ম্মের দ্বিতীয় উদ্ভিদ্‌বিদের নিকট পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী—গিনি, নেপিয়ার ও সুদান ঘাস, জোয়ার বা মকাইএর মত ফলন দেয় না বা তাহাদের বদলে চাষ করা চলে না। আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমরা কাঁচা ঘাসের "সাইলেজ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিব।* (ক্রমশঃ)

* বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের বুলেটীন হইতে গৃহীত।

বগুড়া জিলা

বয়ন

রেশম-শিল্প ছাড়া একমাত্র বস্ত্র-বয়ন-শিল্পই হইতেছে এই জিলার কুটির-শিল্প। গাবতলি, শিবগঞ্জ, আদমদীঘি এবং সদর-থানার বিভিন্ন গ্রামে এই বয়ন-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এই শিল্পটির প্রধান প্রধান কেন্দ্রের তালিকা :—

সদর থানা—জোগাইপুর, দাশটীকা, লক্ষ্মীপুর ফুলবাড়ী, কৃষ্টপুর, মানপারা ও রহিমাবাজ।

আদমদীঘি থানা—বামনিগ্রাম, সরস্বতী, মোহনপুর, গুদাম্বা, মুরদপুর, কেশরতা, সাতিগাও, সৌল, নমাইল, রাষকালি, দত্তবারিয়া ও লক্ষ্মীকোল।

গাবতলি থানা—মালিয়াডাঙ্গা, কলাকোপা এবং জয়ভোগ।

শিবগঞ্জ থানা—পঞ্চাদস, পালিকান্দা, সৈদপুর এবং মালাহার।

এই সকল স্থানের মধ্যে সোমাইল, দাশটীকা, বামনি গ্রাম, লক্ষ্মীকোল, মোহনপুর ও সাতি-গাঁওয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিল্পটী কারিগর নামে অভিহিত জোলা এবং মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আদম-দীঘি, শিবগঞ্জ ও সদর থানার অনেক হিন্দু তাঁতিও এই কার্য্য করিয়া থাকে। মুসলমান তাঁতীদের বেশীর ভাগ লোকই কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

এই জিলার তাঁতের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। জনসাধারণ মাকু-সংযুক্ত তাঁতের ব্যবহারই বেশী করিয়া থাকে।

এই রকম তাঁতের সংখ্যা প্রত্যহই বাড়িয়া যাইতেছে। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা কলিকাতা হইতে সূতা ক্রয় করিয়া দালালের সাহায্যে উহা সরবরাহ করিয়া থাকে। কখনও কখনও বয়নকারীরা স্থানীয় হাট হইতে সূতা ক্রয় করিয়া লয়। সাধারণতঃ ১৬ হইতে ৪০ নম্বরের সূতা এবং মাঝে মাঝে ৬০ নম্বরের সূতা পর্য্যন্তও ব্যবহৃত হয়।

আশে পাশের জিলা হইতে এই জিলার অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল। স্ত্রীলোক এবং শিশুরা টানা সূতা এবং সূতার নলি প্রস্তুত করিবার সময় ইহাদের সাহায্য করিয়া থাকে। তাঁতিদের ব্যক্তিগত গড়পড়্তা আয় ১৬ হইতে ২৫ টাকা।

ধুতি, চাদর, খাদি, গামছা লুঙ্গি এবং মশারীর থান প্রভৃতি তৈয়ার হইয়া থাকে। পুরা মাপের কাপড়ের পরিবর্ত্তে গামছা এবং খাদিই বেশী উৎপন্ন করা হয়। গামছার চাহিদা এই জিলায় খুব বেশী। তৈয়ারী মাল স্থানীয় হাটে বিক্রয় করা হয়।

বেশীর ভাগ তাঁতীরই প্রধান অবলম্বন কৃষিকার্য্য। অনেকেই বয়ন কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া কৃষি এবং অন্যান্য লাভজনক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সূতার দাম চাড়িয়া যাওয়ায় এই বয়ন শিল্পের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। পাট ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের লাভজনক মূল্যও বহুল পরিমাণে এই জন্য দায়ী। গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় সাধারণ গৃহস্থদের মধ্যে বস্ত্র-শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য যে চেষ্টা চলিয়াছিল তাহা নিষ্ফল হইয়াছে এবং তাঁত গুলি অকেজো অবস্থায় পড়িয়া আছে। জিলায় সর্ব্বসমেত ১৮টি সমবায় সমিতি আছে। কিন্তু এই সমিতিগুলি গ্রাম্য ব্যাঙ্কের সামিল। সমবায় সমিতির প্রথানুসারে তাঁতিদের জন্য ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সোসাইটি স্থাপন এবং মাকু সংযুক্ত তাঁতের প্রবর্ত্তন শিল্পটিকে অনেকাংশে বাঁচাইয়া তুলিতে পারে।

রেশম

সহরের মালতিনগর নামক স্থানে প্রায় ৭।৮টি হিন্দু পরিবার কর্ত্তৃক এই শিল্পকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। মাত্র ১৬টি তাঁত ব্যবহার করা হয়। এই শিল্প মৃত-কল্প অবস্থায় এখনও চলিতেছে।

শিল্পীরা মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত বেলডাঙ্গার মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কাঁচামাল

সংগ্রহ করিয়া থাকে। রাজসাহীর রেশমের সুতা-নিষ্কাশন-সমিতির নামও এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য। একজন তাঁতি স্বহস্তে প্রায় ৪।৫ খণ্ড সিল্ক-কাপড় প্রতি মাসে বুনিতে পারে। এই সকল কাপড়ের দ্বারা সিল্কের শাড়ী, ধুতি এবং চাদর প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। প্রস্তুত মালের পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ৫,০০০ গজ এবং ইহার মূল্য হইতেছে অন্ততঃ ১৬ হাজার টাকা। উৎপন্ন মাল বগুড়াবাসীদের দ্বারাই ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে শিল্পটী যথেষ্ট উন্নতিশীল ছিল।

মাকু সংযুক্ত তাঁতের প্রচলন হইলে এই রেশম-শিল্পের অপেক্ষাকৃত অনেক উন্নতি হইবে।

ইহা আশা করা যায় যে, পুরানো তাঁতের পরিবর্ত্তে এই প্রকার তাঁতের সাহায্যে শিল্পীরা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মাল উৎপন্ন করিয়া বেশী লাভ করিতে পারিবেন। কাঁচা-মালের দর চড়িয়া যাওয়ায় রেশম-শিল্প জাত উৎপন্ন জিনিসের মূল্যও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। জন সাধারণ বেশী দাম দিয়া এই সকল মাল কিনিতে একেবারেই অক্ষম। সুতরাং তাঁতিরা খুব কম লাভেই তৈয়ারী জিনিষ বিক্রয় করিয়া থাকে। নির্দ্দোষ ভাবে মাকু-সংযুক্ত তাঁতের ব্যবহার করিতে পারিলে শিল্পীরা এই শিল্পটিকে নূতন জীবন দান করিতে পারে।

গুড়

শিবগঞ্জ থানার জয়পুরহাট, গাবতলী এবং পাঁচবিবিতে বহুল পরিমাণে গুড় তৈয়ারী হইয়া থাকে। আবশ্যক যন্ত্র ও উপকরণ প্রভৃতি মেসার্স রেনউইক এণ্ড কোং এবং অন্যান্য ফার্ম্ম হইতে ভাড়া পাওয়া যায়।—দৈনিক ভাড়া দেওয়ার প্রথাও আছে। মালের আধিক্য কৃষকদের জমির আয়তনের উপর নির্ভর করে। প্রতি গৃহস্থের উৎপন্ন মালের পরিমাণ ৫ হইতে ২৫ মণ পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং উহা স্থানীয় হাটে বিক্রয় করা হয়। কৃষকেরা নিজেদের ব্যবহারের জন্যও কিছু কিছু রাখিয়া থাকে।

মাদুর

আদমদীঘি থানার অনেক গ্রামে প্রায় দুই শত পরিবার এই শিল্প-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। নল-খাগড়া খুব ঘন অবস্থায় বাড়িয়া যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখনই এইগুলি তুলিয়া লওয়া হয়। অবসর সময়ে কৃষকেরা মাদুর বয়ন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

মৃৎ-শিল্প

সমগ্র জিলায় প্রায় চারিশত ঘর কুম্ভকার আছে। শেখেরকোল, রামপুরা, মহিশাবন এবং শঙ্করপুর গ্রামে এই কার্য্য বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

কাষ্ঠ

বগুড়া সহরের মিস্ত্রীরা নিজেদের দোকানে কাঠের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, আলমারি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। বাজারেও এই সকল জিনিস বিক্রয়ার্থ আনা হয়। স্থানীয় 'এড্ওয়াড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুলে' ছাত্রদের এই জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়।

পাখা

তালোরের নিকটবর্ত্তী দুপচাঁচিয়া থানায় তালের পাতা হইতে পাখা প্রস্তুত করা হয়। বগুড়া সহরে এবং মফঃস্বলের হাটে এই সব পাখা বিক্রয় করা হয়।

রেশমের দ্রব্যাদির উপর কারু করা (Finishing Process)

৩৭। যে সকল রাসায়নিক প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহা ইহার পূর্ব্বে '২৯।—রেশমের উজ্জ্বলতা সম্পাদন' বিভাগে বলা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া যাহা করিতে হইবে। তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

কাচিয়া কস। করিয়া পরে রং করা হইয়া গেলে পর শেষ কালে ৫ সের জলে ১ তোলা য়্যাসেটিক্ অথবা টার্টারিক য়্যাসিড্ গুলিয়া এই জলের ভিতর ৩০ মিনিটকাল ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। তারপর বাহির করিয়া নিংড়াইয়া লইয়া শুকাইতে হয়।

অর্দ্ধ শুষ্ক হইয়া গেলে। নিম্নলিখিত দুইটী প্রণালীর একটা অবলম্বন করিতে হয়। ইহার প্রথমটীকে সাধারণ প্রণালী ও দ্বিতীয়টীকে ধোবার প্রণালী বলা হইয়া থাকে।

(১) সাধারণ প্রণালী—ধোয়া বা রং করা হইয়া গেলে, রেশমের বস্ত্র (অর্দ্ধ শুষ্ক অবস্থায়) লম্বালম্বি ভাবে ভাঁজ করিয়া একটী কাঠের রোলারে জড়াইয়া রাখিতে হয়। এই রোলারটী একটু বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত থাকে যেন উহাকে দুইভাগে ভিন্ন করিয়া লওয়া যায়। কাপড়টার একদিক প্রথমতঃ ভাঁজ করিয়া একটী খণ্ডের মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে হয়। এখন খুব টান্ টান্ কষিয়া কাপড়টাকে রোলারের সহিত জড়াইয়া যাইতে হয়। জড়াইবার সময় যখনই ভাঁজ এক পরত হইল। তখনই তাহার পূর্ব্ব পরতের সহিত সূতাদ্বারা আঁটিয়া দিতে হয়। এই ভাবে ভাজ শেষ হইয়া গেলে দুই দিকে দুই খণ্ডের মধ্যে বেশ জোর করিয়া দুই খানি খিল আঁটিয়া দিয়া কাপড়টা যেমন শক্ত হইতে পারে, তদনুরূপ শক্ত করিতে হয়। এখন ঐ রোলারে জড়ান কাপড় খানা ঐ ভাবেই শুকাইয়া কয়েকদিন রাখিয়া দিতে হয়। তারপর রোলারের মধ্য হইতে বাহির করিয়া, ভাঁজ করিয়া, ইস্ত্রি করিয়া অথাৎ একটু চাপিয়া দিলেই—বাজারের জন্য বা মালিককে ফেরত দিবার মত প্রস্তুত হইয়া রহিল।

(২) ধোবার প্রণালী—ধোয়া ও রং করা হইয়া গেলে বস্ত্রগুলি এমনভাবে শুষ্ক করিতে হয়, যেন জলীয় অংশ কিয়ৎপরিমাণ বস্ত্রে থাকে। তারপরে ভাঁজ করিয়া, ঐ কাপড়ের উপর এক খানি ভিজা কার্পাসের কাপড় দিয়া সাধারণ নিয়মে ইস্ত্রী করিয়া দিতে হয়। তারপর ভাজ করিয়া, চাপা দিয়া, মাল ফেরত দিবার মত করিয়া রাখিতে হয়।

৩৮। (১) যত প্রকার পশম সাধারণতঃ বাজারে পাওয়া যায় তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। ইহাদের ইংরাজী নাম (ক) উলেন্ (Woollen), (খ) ওয়াষ্টেড

(Worsted), (গ) সডি ও মাঙ্গু (Shoddy and Mungo)।

(ক) সাধারণতঃ যে সকল পশমের আঁশ খাট সেই সকল পশম দ্বারাই উলেন সুতা তৈয়ারি হইয়া থাকে।

(খ) লম্বা আঁশযুক্ত পশম হইতে ওয়ার্ষ্টেড্ এর সুতা তৈয়ারি হইয়া থাকে।

(গ) পুরাতন পশমের দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত পশম দ্বারাই সডি ও মাঙ্গু তৈয়ার হইয়া থাকে।

(২) রং করিবার পূর্ব্বে দ্রব্যগুলি কি ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে—

প্রথমে আধঘণ্টা ধরিয়া গরম জলে ডুবাইয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা হইতে দাও। নিংড়াইয়া লইয়া নিম্নলিখিত প্রকারের জল তৈয়ার করিয়া তাহার ব্যবহার করিতে হইবে।

১নং জল (মোটা ও মধ্যম রকম দ্রব্যের জন্য)

দ্রব্যাদি	½ সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
সাবান	২ তোলা	২০ তোলা
সোডা	১ তোলা	১০ তোলা
জল	১০ সের	২ মণ ২০ সের

২নং জল (সূক্ষ্ম দ্রব্যের জন্য)

দ্রব্যাদি	½ সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
সাবান	২ তোলা	২০ তোলা
এ্যামোনিয়া	২ তোলা	২০ তোলা
জল	১০ সের	২ মণ ২০ সের

হাতে সয় এরূপ গরম (অর্থাৎ ৪৫° সেন্টিগ্রেড্) জলে (উপরোক্ত দ্রব্যে প্রস্তুত) আধ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ। তারপর যথেষ্ট ঠাণ্ডা জল দিয়া নিংড়াইয়া ফেল। তাহা হইলেই দ্রব্যগুলি রং করিবার উপযুক্ত হইল।

৩২। ধুইয়া শাদা করা পশমের কাপড় যদি শাদা অবস্থায় রাখিতে হয় তখন, অথবা যদি কোন পাতলা রং বা চকচকে রং করিতে হয় অথবা যদি পশমের বস্ত্রের পুরাতন রং তুলিয়া নূতন রং করিতে হয়, তাহা হইলে পশমকে ধুইয়া শাদা করিতে হয়। এই সাদা করিবার নানা প্রকার প্রণালী আছে; তন্মধ্যে এখানে একটী মাত্র দেওয়া হইল। সর্ব্বত্র কোন রকম বিশেষ বন্দোবস্ত না করিয়াও এই প্রণালী অবলম্বন করা যায়।

(১) দ্রব্যাদি—

দ্রব্যাদি	½ সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
সোডিয়াম্ হাইড্রোসাল্ফাইট্ বি-এ-এস্-ই (Sodium Hydrosulphite B. A. S. E. Powder Cone)	১½ তোলা	১৫ তোলা
জল	১০ সের	২ মণ ২০ সের

উপরোক্ত পরিমাণ মত হাইড্রোসাল্ফাইট্ উপযোগী মত জলে গলাইয়া আগুনের উপর দিয়া জলটাকে সামান্য গরম করিয়া লও। আগে হইতেই কিছু মেথিলিন্ ব্লু (Methylene Blue) জলে গুলিয়া রাখ। এই জলের কয়েক ফোঁটা ও কিছু এ্যাসেটিক য়্যাসিড্ উপরের গোলার সহিত মিশাও। নীলটা দেওয়াতে একটু নীলাভ হইয়া যাইবে।

(২) কার্য্যপ্রণালী—এই জলের মধ্যে পশমের দ্রব্য ২৪ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখ। এখন ৫ সের জলে ১ তোলা সোডা গুলিয়া এই জল দিয়া কাপড়গুলি ধুইয়া ফেল। ইহার পর যথোপযুক্ত ঠাণ্ডা জলে বস্ত্রগুলি ধুইয়া নিংড়াইয়া শুকাইয়া দাও।

৪০। ডিরেক্ট্ কটন কলার সহযোগে রং করা (Dyeing of woollen materials with Direct Cotton Colours)—রেশমের বস্ত্র রং করার প্রণালী প্রসঙ্গে যে সকল ডিরেক্ট্ রংয়ের কথা বলা হইয়াছে, পশম সম্পর্কেও সেই সকল রংই খাটে।

(১) রংয়ের দ্রব্যাদি :—

দ্রব্য	½ সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
রং	১-২ তোলা	১০-২০ তোলা
		(রংয়ের গাঢ়ত্ব বুঝিয়)
গ্লবার্স্ সল্ট্ (Glauber's Salt)	৪-৮ তোলা	½ সের—১
জল	১৫ সের	৩ মণ ৩০ সের

রংটাকে তাহার ওজনের চারিগুণ পরিমাণ গরম জলে গুলিয়া লও এবং ব্যবহারের পূর্ব্বে ছাঁকিয়া লও।

(২) রং করিবার প্রণালী—রংয়ের জল ও গ্লবার্স্ সল্ট উপযুক্ত পরিমাণ লইয়া মিশাও। তারপর একটু মৃদু জাল দিতে থাক। যখন সামান্য গরম হইয়াছে। (৪০°—৫০° সেন্টিগ্রেড) তখন পশমের দ্রব্যগুলি তাহাতে দিয়া—৩০ মিনিট ধরিয়া কাজ করিতে থাক। এই আধ ঘণ্টার মধ্যে এমন ভাবে জ্বাল দিবে যে, রংয়ের জলটা ফুটিয়া উঠে। ফুটিয়া উঠিলেও সেই অবস্থায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া কাজ করিতে থাক। তারপর আগুন হইতে পাত্রটা সরাইয়া লইয়া দ্রব্যগুলি নাড়িতেই থাক যতক্ষণ না আবশ্যক মত রং হইয়া যায়। তারপর উপযুক্ত পরিমাণ ঠাণ্ডা জলে কাপড়গুলি কাচিয়া নিংড়াইয়া, ছায়ায় শুকাইতে দাও।

রংগোলা যাহাতে বেশ ভাল করিয়া নিংশেষ হইয়া যায়, সেইজন্য উহার মধ্যে ½ সেরের জন্য ২ তোলা বা ৫ সেরের জন্য ২০ তোলা এ্যাসেটীক এসিড রং করা প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, এরূপ সময়ে মিশাইয়া দিতে হয়। ইহাতে রংটা বেশ গাঢ় হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

নানাবিধ আঠা, গঁদ, জুড়িবার সিমেণ্ট প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী

লোহার সিঁড়িতে কিম্বা লৌহ নির্ম্মিত মেজেতে লিনোলিয়াম লাগাইবার আঠা,—

(১) শিরীষ, আইজিংলাস্ এবং ডেক্স্ট্রীন্ (শর্করা বা চিনি) এই তিনটী জিনিস মিশাইয়া জলে গলাইয়া লউন এবং গরম করুন। তারপর উহার সহিত তাবপিন তৈল মিশান। তাহা হইলেই আঠা তৈয়ারী হইবে। জিনিসের পরিমাণ আন্দাজমত ঠিক করিয়া লইবেন। লিনোলিয়ামের কালি গুলিতে আঠা লাগাইয়া সিঁড়ির উপর চাপিয়া বসাইতে হইবে এবং যতক্ষণ না শুকাইয়া শক্ত হইয়া আটকিয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার উপরে খুব ভার চাপাইয়া রাখিতে হইবে।

(২) শিরীষ—	১২ ভাগ
জল—	৩২ ,,
হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড (Hydrochloric acid)—	২ ,,
জিঙ্ক্ সালফেট্ (Zinc Sulphate)—	৩ ,,

প্রথমতঃ শিরীষটাকে জলে গলাইয়া লউন। তারপর উহার সহিত হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড্ এবং জিঙ্ক্ সালফেট্ মিশাইয়া কয়েক ঘণ্টা যাবৎ ফুটিয়ে গরম করুন। ব্যবহার করিবার সময় যাহাতে লিনোলিয়াম লাগাইবেন তাহাতে এবং লিনোলিয়ামের পিছনে আঠাটা মাখাইবেন। লিনোলিয়াম খানি বেশ সমান ভাবে বসাইয়া তাহার উপরে পূর্ব্বের মত খুব ভার চাপাইয়া রাখিবেন, যতক্ষণ না উহা শুকাইয়া আটকিয়া না যায়।

স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু-দ্রব্যের সহিত কাচ জুড়িবার আঠা

স্যাণ্ডারাক ভার্ণিশ— (Sandarac Varnish)	১৫ ,,
ম্যারিন্ গ্লু (Marine Glue)—	৫ ,,
শুকান তৈল (Drying oil)—	৫ ,,
হোয়াইট লেড্ (White lead)	৫ ,,
স্প্যানিশ হোয়াইট (Spanish white)	৫ ,,
তাপিণ তৈল—	৫ ,,

এই সমস্ত জিনিষ মিশাইয়া ঘন আঠার মত করিয়া লইবেন। ইহা খুব শক্ত হয় এবং সহজে খুলিয়া যায় না।

ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের সহিত কাগজ লাগাইবার আঠা ;—

আলুর ষ্টার্চ্চ (Potato Starch)	১০০০ ভাগ
জল—	১২০০ ,,
বিশুদ্ধ নাইট্রিক য়্যাসিড্—	৫০ ,,
নিশাদল চূর্ণ—	২ ,,
ফ্লাওয়ার সালফার— (Flouwer Sulphur)	১ ,,

প্রথমতঃ আলুর ষ্টার্চ্চকে জলে গুলিয়া তাহার সহিত বিশুদ্ধ নাইট্রিক য়্যাসিড্ মিশ্রিত করুন। এই মিশ্রিত দ্রব্যটী গরম জায়গায় ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবেন এবং মাঝে মাঝে ইহাকে বেশ করিয়া ঘুঁটিতে ভুলিবেন না। তারপর উনুনে বসাইয়া জ্বাল দিতে থাকুন। যখন ঘন এবং স্বচ্ছ হইয়া আসিবে তখন বুঝিবেন, ঠিক হইয়াছে। যদি প্রয়োজন হয় একটু জল মিশাইতে পারেন। সর্ব্ব শেষে ইহার উপরে নিশাদল চূর্ণ ও ফ্লাওয়ার সালফার মিহি চালুনীর দ্বারা ছড়াইয়া মিশাইয়া লইবেন।

লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যের সহিত কাপড় জুড়িবার আঠা ;—

প্রথমতঃ সন্ধ্যাবেলায় ৫০০ ভাগ কলোন গ্লু (Cologne Glue) একটী পরিষ্কার পাত্রে পরিষ্কার শীতল জলে ভিজাইয়া রাখুন। সকাল বেলা দেখিবেন, জল শুষিয়া শিরীষটা খুব ফুলিয়া উঠিয়াছে। তখন ঐ পাত্র হইতে অতিরিক্ত জল ঢালিয়া ফেলিয়া ফুলা ও নরম শিরীষকে একটী তামার অথবা এনামেলের পাত্রে রাখিয়া অল্প আঁচে গরম করিতে থাকুন,—আর জল মিশাইবেন না। এই কার্য্যে কাঠ কয়লার আগুন কিম্বা ষ্টীমের ভাপ ব্যবহার করিবেন। শিরীষ গলিয়া যাইবার সময় উহাকে কাঠের হাতা দিয়া হরদম নাড়িবেন। যদি দেখেন যে শিরীষ বেশী রকম ঘন হইয়াছে, তখন জল মিশান (ডাইলিউট—dilute) স্পিরিট দিয়া উহাকে পাতলা করিবেন, কিন্তু জল দিয়া নহে। যখন শিরীষ ফুটন্ত গরম হইয়া উঠিবে, তখন ৫০ ভাগ তিসির তৈল (Linseed oil) উহার সহিত মিশাইয়া খুব নাড়িতে থাকিবেন। এই তিসির তৈল যেন সিদ্ধ করা (Boiled) তৈল হয়। অর্থাৎ উহাতে জলীয় ভাগ থাকিবে না। এইরূপ তৈলকে বাজার চল্‌তি নামে Dry oil, শুক্‌না তৈল অথবা Boiled oil—সিদ্ধ করা তৈল বলা যায়। কিয়ৎক্ষণ ভালরূপে ঘুঁটিয়া তাহার সহিত ৫০ ভাগ কলফোনী (Colophony) চূর্ণ মিশ্রিত করুন। ইহাও খুব নাড়িয়া চাড়িয়া মিশান হইলে কিছুক্ষণ পরে শিরীষকে উনুন হইতে নামাইয়া লউন।

আঠার জোর বাড়াইতে হইলে, অথবা জলে নষ্ট না হইবার মত করিতে হইলে, উহার সঙ্গে ৫০ ভাগ আইজিংল্যাস্ মিশ্রিত করুন। এই আইজিংল্যাস্‌কে পূর্ব্বে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া একটী পাত্রে প্রচুর স্পিরিটের মধ্যে গলাইয়া লইবেন। এই আঠা গরম অবস্থায় ব্যবহার করিতে হয়। যে লোহার উপর কাপড় লাগাইবেন, সেই লোহাকেও গরম করা

উচিত। এক একখানা কাপড়ের ফালি যতটুকু লম্বা চওড়া সেই পরিমাণ জায়গাতে প্রতিবারে আঠা মাখাইবেন। এক সঙ্গে বেশী জায়গায় আঠা মাখাইলে, একখানি ফালি জুড়িতে জুড়িতে সেই সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত মাখান আঠা শুকাইয়া আসে, সুতরাং তাহাতে শেষে আর জোড় ধরে না। কাপড়ের ফালিখানিকে সমানে ছড়াইয়া লাগাইয়া তাহার উপরে কাপড়ের পুঁটলী অথবা মোটা শক্ত বুরুশ দিয়া খুব কতক্ষণ চাপিবেন।

চামড়া ও কার্ডবোর্ড জুড়িবার আঠা

প্রথমে শিরীষকে পূর্ব্ব রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া নরম করিয়া লউন। তারপর একটা "গ্ল্ পটের" মধ্যে (শিরীষ তৈয়ারী করিবার পাত্র বিশেষ) সেই নরম শিরীসটা রাখিয়া তাহাতে কিছু তাপিন তৈল এবং প্রচুর জল মিশাইয়া গরম করুন। এক্ষণে উহার সহিত ষ্টাৰ্চ্চ পাউডার মিশাইয়া খুব ঘন করিয়া লউন। যে পরিমাণ শুকনা শিরীষ লইয়াছেন, তাহার দ্বিগুণ ষ্টার্চ্চ দিবেন। খুব ভালরূপে মিশান এবং লেইয়ের মত হইলে ঠাণ্ডা অবস্থায় ব্যবহার করিবেন।

কাঠ, কাচ, কার্ডবোর্ড, প্রভৃতি জিনিস জুড়িবার আঠা

সিদ্ধ করা শুকনা তিসির তৈল	২০ ভাগ
ফ্লেমিশ গ্লু (ফরাসী দেশীয় শিরীষ)	২০ ভাগ
ভিজা চুন (Hydrated lime)	১৫ "
তাপিন চুর্ণ	৫ "
ফট্‌কিরি	৫ "
য়্যাসেটিক য়্যাসিড (Acetic acid)	

প্রথমে য়্যাসেটিক য়্যাসিডে শিরীষটা গলাইয়া লউন। তারপর উহার সহিত ফট্‌কিরি, চুণ এবং সর্ব্বশেষে তাপিন ও তিসির তৈল মিশ্রিত করুন। এই মশলা গুলিকে খুব ভাল করিয়া মিশাইয়া একটা বোতলে ছিপি বন্ধ অবস্থায় রাখিয়া দিবেন এবং অন্যান্য আঠার মতই ব্যবহার করিবেন।

কাগজের বাক্স তৈয়ারী করিবার আঠা

ক্লোর‍্যাল হাইড্রেট্	৫ ভাগ
সাদা জিল্যাটীন	৮ "
আরবী গঁদ	২ "
ফুটন্ত জল	৩০ "

একটি চীনা মাটির পাত্রে ক্লোর‍্যাল, জিল্যাটিন ও গঁদ মিশ্রিত করুন। তারপর উহার উপর ফুটন্ত জল ঢালুন এবং একদিন যাবৎ তাহা রাখিয়া দিন। এই একদিনের মধ্যে মাঝে মাঝে উহাকে খুব নাড়িয়া চাড়িয়া দিবেন। শীতের সময় এই আঠা জমিয়া শক্ত হইবার সম্ভাবনা; তখন পাত্রটিকে কিছুক্ষণ গরম জলের উপর বসাইয়া রাখিবেন। তাহা হইলেই নরম হইয়া আসিবে।

TISCO

রূপার পাত্রে কোন ঔষধের দাগ লাগিলে একটু মেথিলেটেড্ স্পিরিট ঘসিয়া প্রথমে তুলিয়া ফেলিতে হয়, পরে গরম জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়।

●

নূতন রং করা কামরায় কয়েকটি পেঁয়াজ কাটিয়া রাখিয়া দিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রং এর গন্ধ পেঁয়াজে শুসিয়া লয় এবং কামরাটি গন্ধ শূন্য হয়।

●

রান্না করিতে বা অন্য কোন কারণে হঠাৎ শরীরের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে কিছু বাই-কার্ব্বনেট অব সোডা লাগাইয়া দিতে পারিলে অতি শীঘ্র যন্ত্রণার উপশম হয়। কেরোসিন তৈল ন্যাকড়ায় জড়াইয়া লাগাইয়া দিলেও আরাম বোধ হয়। মেথিলেটেড স্পিরিট দিলে অনেক সময় ফোস্কা পড়াও বন্ধ হইয়া যায়।

●

প্রায় পাঁচ ছটাক পরিমাণ জলে একটা লেবুর রস দিয়া তাহাতে স্পঞ্জ রগড়াইলে উহা শীঘ্র ভালরূপ পরিষ্কার হয়।

●

কাপড়ের উপর লোহার দাগ লাগিলে দাগের উপর লেবুর রস লাগাইয়া কিঞ্চিৎ লবণ ছড়াইয়া দিলে উঠিয়া যায়।

●

কয়লার উপর খুব ঘন সোডার জল ছড়াইয়া দিয়া শুকাইয়া লইবেন। পরে সেই কয়লা পোড়াইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া জলিবে।

●

এক চামচ বোরাক্স (Borax) গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথার চুল ধুইয়া ফেলিলে চুলের আঠা নষ্ট হয় এবং দেখিতে সুন্দর হয়।

●

সিদ্ধ আলু হাত পরিষ্কার করিতে ও চামড়া নরম করিতে সাবানের অপেক্ষা উত্তম বস্তু। যে জলে আলু সিদ্ধ হয় তাহাতে সিল্কের

কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার কার্য্য আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

●

কালি না লাগাইয়া বুট জুতাকে চক্‌চকে করিতে হইলে একখণ্ড লেবু দিয়া ঘষিতে হয়। লেবুর রসটি জুতার উপর শুকাইয়া গেলে উহাকে ধীরে ধীরে নরম ব্রাসের দ্বারা ঘষিলে ইহা চকচকে দেখায়।

●

ঠাণ্ডা চায়ের অল্প জলের সহিত কিছু গরম জল মিশ্রিত করিয়া, উহাতে গরম কাপড় ভিজাইয়া কাঠের উপরে লাগা দাগের উপর ঘষিলে, কাঠের দাগ উঠিয়া গিয়া পরিষ্কার ও উজ্জ্বল দেখায়।

●

চিমনীর কালি পরিষ্কার করিতে হইলে একটি দণ্ডের অগ্রভাগস্থিত কোন পাত্রে একটি জলন্ত অঙ্গার রাখিয়া, উহার উপর কিছু যবক্ষার ছড়াইয়া দিবেন। অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবার পূর্ব্বে দণ্ডটিকে চিমনীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপরে ধরিবেন এবং যতক্ষণ ধূম উত্থিত হইতে থাকিবে ততক্ষণ রাখিবেন।

●

টুপী পরিষ্কার করা

খড়ের টুপী (Straw Hats) ব্যবহার করিতে খয় হইয়া যায়, দাগ লাগিয়া যায় ইত্যাদি নানা কিছু হইয়া থাকে। কিন্তু, উপর ব্যবহার করিয়া এইরূপ টুপীকেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লওয়া যায়। নিম্নে তাহার প্রণালী দেওয়া হইল।

টুপী যদি খড়েরই ঠিক তৈয়ারী হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাতে অন্য কোন রং দেওয়া না থাকিলে, প্রথমে টার্টারিক য়্যাসিড জলে গুলিয়া তাহার দ্বারা একবার টুপীটা ধুইয়া মুছিয়া লইতে হইবে। টার্টারিক য়্যাসিডের জলে য়্যাসিডের ভাগ খুবই কম দিবে, জলের ভাগ যেন বেশী থাকে অর্থাৎ য়্যাসিড জলটা যেন মৃদু হয় (weak solution)। য়্যাসিড জল দিয়া ধুইয়া সাধারণ জল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া দিবে। উভয় ক্ষেত্রেই স্পঞ্জ ব্যবহার করা উচিত। এই প্রকার ধোয়া হইয়া গেলে, একটা ফিতা ও কতকগুলি পিন দিয়া একটা বোর্ডের সঙ্গে টুপীটা আটকাইয়া দিতে হয়, তাহা না হইলে, শুকাইলে পর আর আগের আকৃতিটা থাকিবে না।

দ্বিতীয় প্রণালী :—

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি লইয়া সেই জল দ্বারা স্পঞ্জ সহযোগে খড়ের টুপী ধুইয়া ফেল।

	ওজনে
সোডিয়াম্ হাইপোসালফাইট্	১০ ভাগ
গ্লিসারিন্	৫ "
এ্যালকোহোল	১০ "
জল	৭৫ "

ধোয়ার পর কোন এক ঠাণ্ডা যায়গায় ২৪ ঘণ্টা ধরিয়া রাখিয়া দাও। তারপর নিম্নলিখিত জিনিষ গুলি লাগাও :

	ওজনে
সাইট্রিক এসিড	২ ভাগ
এ্যাল্‌কোহল্	১০ "
জল	৯০ "

পাতলা রকমের একটা আঠার জল করিয়া, তাহা দ্বারা শক্ত করিয়া মোটামুটি রকমের গরম

একটা লৌহা দ্বারা চাপিয়া চাপিয়া ঠিক করিয়া দাও।

তৃতীয় প্রণালী :—

ব্যবহার করিতে করিতে টুপীতে খুব বেশী দাগ লাগিলে, জলন্ত গন্ধকের ধোঁয়া দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়।

প্রথমে পটাশিয়াম কার্ব্বনেট জলে গুলিয়া, তাহার দ্বারা স্পঞ্জ দিয়া টুপীকে বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। তারপর সাধারণ জল দিয়া ধুইয়া ফেল। এখানেও স্পঞ্জ ব্যবহার করিতে হয়। ইহার পর এখন গন্ধকের ধোঁয়ায় এই টুপীটাকে টানাইয়া রাখিতে হয়। এইজন্য নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়।

একটা বড় বাক্স বা ব্যারেল লইতে হয়। বাক্স বা ব্যারেলের নীচে একটা মাটির বা কোন ধাতুর থালাতে কয়েকখানি গন্ধকের খণ্ড লইতে হয়। ঐ খণ্ডের উপর কয়েকটা জলন্ত অঙ্গার ফেলিয়া দিলেই গন্ধকে আগুন লাগিবে। তখন ধোঁয়াগুলি উপরে উঠিতে থাকিবে। উপরের মুখটাতে একটা দড়ি বাঁধিয়া তাহার সহিত টুপীটাকে ঝুলাইয়া দিতে হয়। একটা ঢাকুনী দিয়া বাক্স বা ব্যারেল যাহা ব্যবহার করা যায়, তাহার মুখটা আলগা এমন ভাবে ঢাকিয়া দিতে হয় যে মুখটাও ঢাকা থাকে, অথচ বাহিরের বাতাস একেবারে বন্ধ না হয়। এইভাবে কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিলেই কাজ চলিতে পারে।

টুপীকে এইভাবে গন্ধকের ধোঁয়া দেওয়ার পর, তাহাতে সামান্য পরিমাণ গামের জল দিয়া একটু শক্ত করিয়া লইতে হয়। তারপর সামান্য গরম একটা লৌহা দিয়া পিটাইয়া টুপীটার আকারটা ঠিক করিয়া দিতে হয়।

পানামা টুপী পরিষ্কার করা

ক্যাষ্টিল সাবান (Castille Soap) ও গরম জল দিয়া ধুইয়া দিলেই পানামা টুপী পরিষ্কার হইয়া যায়। ময়লাটা ধুইয়া ফেলিবার জন্য একটা নখ পরিষ্কার করিবার ব্রাস (Nail Brush) ব্যবহার করিতে হয়। এইভাবে ধুইয়া খুব কড়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হয়। দুই তিন ঘণ্টা শুকাইলেই টুপী বেশ ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। এইভাবে ধুইয়া দিলেই যে কেবল টুপীটা নূতনের মত পরিষ্কার হইবে, তাহা নহে, ইহার আকারেরও কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না। প্রথমটা ব্যবহারে টুপীটা একটু শক্ত লাগিবে, কিন্তু ব্যবহার করিতে করিতে বেশ মোলায়েম হইয়া যাইবে।

ধুইবার সময়ে জলে সামান্য কিছু গ্লিসারীন দিয়া দিলে, টুপী আর শুকাইবার সময় মোটেই শক্ত হইবে না; আর সামান্য কিছু এ্যামোনিয়া জলে দিয়া দিলে ধোয়ার পক্ষে খুব সুবিধা হয়। আইভরি সাবান অথবা অন্য যে কোন রকমের শাদা ভাল সাবানই ব্যবহার করা চলে; ক্যাষ্টিল সাবানই যে দিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। জলে ধুইবার সময় যদি দুইবার ধোয়ার দরকার হয়, তাহা হইলে দুইবারই কিছু কিছু গ্লিসারিন মিশান ভাল। এই জলটার মধ্যে একেবারে টুপীটাকে ডুবাইয়া দিতে হয়। তারপর তুলিয়া যতক্ষণ না জলটা বাহির হইয়া যায়, ততক্ষণ আলগা ধরিয়া রাখিয়া জলটা যাহাতে ঝড়িয়া পড়িয়া যায়, সেইরূপ নাড়িতে হয়। আপনা হইতে জলটা ঝড়িয়া পড়িয়া গেলে, একখানি তোয়ালে দ্বারা নিংড়াইয়া বাকী জলটুকু মুছিয়া লইতে হয়। তারপর যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শুকায় ততক্ষণ ঐ তোয়ালেটার উপর রাখিয়া দিতে হয়।

"কি ব্যবসা করিব" ? প্রশ্নের উত্তর

নব বর্ষের অভিবাদনে আমরা জানাইয়াছি, চাকুরীর দিন আর নাই, এখন আসিয়াছে ব্যবসা বাণিজ্যের যুগ। আমাদের এই পত্রিকার প্রারম্ভে ললাট তিলকস্বরূপ মুদ্রিত ঐ যে "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ নামক—" মহামন্ত্র,—জানিনা, কোন্ সময়ে কে রচনা করিয়া ছিলেন, জানিনা, কিরূপে সেই বাণী এই বিচিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান প্লাবিত, কৌপীন-কন্থান্তবাসী দেশের মধ্যে অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ দেখিতেছি, সেই সত্যবাণী সূর্য্যের মত দীপ্তিমান, হিমাচলের মত অচল অটল। বর্ত্তমান ইকনমিক্সের সার কথা, সকল অর্থ শাস্ত্রের মূলনীতি ঐ ক্ষুদ্র শ্লোকটীর মধ্যে নিহিত। যাহাদের ধারণা, ব্যবসা বাণিজ্যের ঢেউ এদেশে পশ্চিম হইতে আসিয়াছে, তাঁহারা এখন তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তন করিতেছেন। আজ সকলেরই মুখে এক কথা,—চাকুরীর যুগ চলিয়া গিয়াছে।

দুনিয়ার সমগ্র ধন দৌলতের সিকিভাগমাত্র আছে চাকুরীতে;—এই হইল আমাদের সেই অজ্ঞাত অর্থশাস্ত্র বিশারদের পাকা হিসাব। ঐ চাকুরীর জন্য আফিসের দরজায় ঠেলা ঠেলি লোকের কাছে খোসামুদি, বাড়ী বাড়ী হাঁটা হাটি করিয়া বেকার যুবকেরা শ্রান্ত ক্লান্ত গলদ্‌-ঘর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছেন। কতগুলি নূতন কাজ করবারের সৃষ্টি হওয়ায় চাকুরীর কিছু সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী প্রতিকার নহে এবং তাহাদ্বারা বহুসংখ্যক বেকারের অন্ন সংস্থানও হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বীমা, ব্যাঙ্কিং, মোটর বাস, সিনেমা, রেকর্ড, প্রভৃতি ব্যবসায়ের নাম উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠানে বেকার সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র চাকুরীর দ্বারাই যৎকিঞ্চিৎ সম্ভব হইয়া থাকে। সেইজন্য একদিকে যেমন দেশের মধ্যে ধনীদের দ্বারা বৃহৎ কারবার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তিগত অল্প মূলধনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক এবং নানা রকমের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এইরূপ কয়েকটী কুটীর শিল্পের কথাই বলিব।

কুটীর শিল্পের আন্দোলনও এদেশে নূতন নহে। প্রায় ৩০ বৎসর হইল এই দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে

শিল্প দ্রব্য তৈয়ারী করা তেমন কঠিন কাযা নয়,—উহার কাটৃতি করাই কঠিন। আমাদের দেশে প্রথমে শিল্প-বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ এক্সপার্ট লোকের অভাব ছিল। সাবান, দিয়াশলাই, পেন্সিল, বিস্কুট, এসেন্স, ষ্টীলট্রাঙ্ক, ট্যানারীর দ্রব্যাদি, চীনামাটীর বাসন, প্রভৃতি নানা রকমের জিনিস তৈয়ারী করিতে কেহ জানিতনা। ক্রমে ক্রমে অনেকেই তাহা শিখিলেন। কেহ বিদেশে যাইয়া শিখিয়াছেন, কেহবা দেশে থাকিয়াই নিজের চেষ্টায় ও কৌশলে শিখিয়াছেন। কিন্তু যখন কারবার খোলা হইল, তখন, মাল বিক্রীর সময়েই মুস্কিল! এমন কি ভাল জিনিসও কাটৃতি করান কষ্টকর হইয়া উঠিল। কুটীর শিল্পে ব্যক্তিগত যে সামান্য মূলধন খাটে, তাহাতে মাল গুদামজাত হইয়া পড়িয়া থাকিলে, খরচা পোষাইয়া উঠাই দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাড়ায় লাভ ত দূরের কথা। এই কারণে ছোট-খাট কুটীর শিল্প সমূহ ধীরে ধীরে প্রচুর মূলধন বিশিষ্ট বৃহৎ কারবারে অথবা লিমিটেড্ কোম্পানীতে পরিণত হইল। এ সুবিধা যাহার ঘটিল না, সে উঠিয়া গেল। সুতরাং একদিকে যেমন ব্যবসা ব শিল্পের উন্নতি এবং দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি হইবার বাধা জন্মিল,—অন্যদিকে বে-কার সমস্যার সমাধানও হইল না।

এই সাময়িক বিফলতা নিরাশার কারণ হইলেও ক্রমে ক্রমে দেশের মধ্যে সেলিং এজেন্সী (Selling Agency) বা মাল কাটৃতি করিবার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে কুটীর-শিল্পের এই অসুবিধা আর থাকিবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের আশায় এখন ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা যায় না। সুতরাং আমাদিগকে এমন-সব কুটীর শিল্প ধরিতে হইবে, যাহাতে মাল বিক্রয়ের ভাবনা নাই। আমরা দেখিতেছি ইতিমধ্যে এমন কয়েকটা কুটীর-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহাতে খরিদ্দারের অভাব ঘটেনা এবং সেলিং এজেন্সী ছাড়াও আপনা-আপনি মাল কাটৃতি হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা গেঞ্জী, মোজা, ফেস্-পাউডার, স্নো-ক্রীম্ হেয়ার অয়েল, এসেন্স প্রভৃতি কয়েকটী প্রসাধন সামগ্রী, বিস্কুট, পাউরুটী,—এই সবের নাম উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু ইহা অতি সামান্য মাত্র। একদিকে আমাদের এত প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে যে, বাঙ্গালী যুবকেরা ইহাতে অল্প মূলধনে নিজেদের জীবিকার সংস্থান করিয়া দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারেন।

আমরা প্রথমতঃ খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ের কথাই বলিতেছি। ইহাতে মাল কাট্তি করিবার ভাবনা নাই। নিত্যকার ক্ষুধা ব্যতীত খাবার জিনিসের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক লোভ বা নেশাও আছে। সুতরাং ভাল জিনিস হইলে, লোকে তাহা কিনিবেই, ইহা একেবারে অবধারিত। মানুষের এই অভাবটী প্রতিদিন নূতন করিয়া জন্মে,— এবং প্রতিদিনই তাহা মিটাইতে হয়। খাদ্য দুই রকম,— প্রয়োজনীয় ও সৌখীন। চাউল, ডাইল, ময়দা, দুগ্ধ, চিনি, তেল; কৃষিজাত শাকসব্জী, প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের কথা আমরা এখানে বলিতেছি না। কারণ এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায় অল্প মূলধনে এবং ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র চেষ্টায় হয় না। কিন্তু প্রয়োজনীয় খাদ্য অপেক্ষা সৌখীন খাদ্যের রকমারি অনেক বেশী এবং তাহার বাজারও খুব বড়। অল্প টাকায়

সামান্য পরিশ্রমেই এই ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়।

নানা প্রকারের জ্যাম্, জেলী, আচার, মোরব্বা, চাট্নী, বিস্কুট, লজেন্স্, চকোলেট্ সংরক্ষিত ফল, মাছ, মাংস, পিক্ল্স্, মার্মালেড্, সস্, বিভারেজ্, ভেজিটেবল বাটার (Vegetable butter), টীনে ভরা গাঢ়দুগ্ধ প্রভৃতি জিনিস বিদেশ হইতে বহুপরিমাণে ভারতে আমদানী হয়। ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রায় ৩ কোটী টাকার সৌখীন বা সংরক্ষিত খাদ্য দ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। তার পূর্ব বৎসর আসিয়াছিল ২ কোটী ৭২ লক্ষ টাকার। সুতরাং দেখা যায় এই আমদানীর পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা নিম্নে ইহার একটু বিস্তৃত বিবরণ দিলাম :—

দ্রব্যের নাম	আমদানীর পরিমাণ মূল্য লক্ষ টাকা
কেক্ বিস্কুট	৩৩
টিনেভরা এবং বোতলে আবদ্ধ খাদ্যদ্রব্যাদি	৫৯
টিনে ভরা সংরক্ষিত মাছ	১১
টিনে ভরা সংরক্ষিত ফল	১১
টিনে ভরা বিবিধ খাদ্য	৩৬
উদ্ভিজ্জ ঘৃত	১২
বার্লি এরারুট জাতীয় পেটেন্ট্ ফুড্ সাগু ও টেপিওকা সহ	১০০
দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত খাদ্য	১৪
টিনে ভরা ঘন দুগ্ধ	৪৮½
হ্যাম ও বেকন্ (শূকরের মাংস)	১১
মিঠাই খাদ্য	১৮
চীজ্ বা পনির	৮
কোকো এবং চকোলেট্	৪
মাখন	৬
জ্যাম ও জেলী	৬
পিক্ল্স্, চাট্নী, সস্, আচার প্রভৃতি	৭
অন্যবিধ খাদ্য	১৬

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, কত লক্ষ লক্ষ টাকা এদেশ হইতে বিদেশীরা লইয়া যাইতেছে এমন সব জিনিস বিক্রয় করিয়া, যাহা এদেশেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়। কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, এই সকল জিনিসের ব্যবসা চলেনা, কারণ ভারতবর্ষে ফলমূল শাকসব্জী এবং নানা বিধ খাদ্যদ্রব্য টাট্কা অবস্থায় সারাবৎসর ধরিয়া বিভিন্ন ঋতুতে এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে লোকে টিনেভরা সংরক্ষিত ফল আর খাইতে চাহেনা। বিশেষতঃ জ্যাম্ জেলী আচার মোরব্বা কাসুন্দী, এসব জিনিস গৃহস্থেরা নিজ নিজ প্রয়োজন মত বাড়ীতেই তৈয়ারী করিয়া লয়, বাজার হইতে কেহ কিনেনা। সুতরাং এই সকল সৌখীন ও মুখরোচক খাদ্যের ব্যবসা চালানো এদেশে সম্ভব নহে।

ভারতীয় বাণিজ্যের আমদানী রপ্তানীর হিসাব, তাঁহাদের এই কথার উত্তর দিতেছে। আমরা দেখাইয়াছি, ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রায় ৩ কোটী টাকার বিবিধ সৌখীন খাদ্য দ্রব্য ভারত বর্ষে আমদানী হইয়াছে। যদি টাট্কা ফলমুলই সকলে ব্যবহার করিত,—যদি গৃহস্থেরা সকলেই নিজ নিজ পরিবারে আচার মোরব্বা চাট্নী

তৈয়ারী করিয়া তবে এই তিনকোটী টাকায় জিনিস ক্রয় করিয়াছে কাহারা? ভারত বর্ষে যাহারা বিদেশী, কেবলমাত্র তাহারাই যে এত টাকার জিনিস কিনিয়াছে, তাহা নহে। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে এই জাতীয় খাদ্য দ্রব্যের আমদানী প্রতিবৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। যে ব্যবসা চলেনা বলিয়া এদেশের লোক হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে, সেই ব্যবসাতেই অন্য দেশের লোকেরা ভারতের লক্ষ লক্ষ টাকা লুটিয়া নিতেছে!

যাহারা বলেন যে আমাদের দেশে এ সকল চাট্‌নী মোরব্বাদির, ব্যবসা চলিতে পারে না, কারণ আমাদের দেশের ঘরে ঘরেই মরসুমের সময় এই সব আচার মোরব্বাদি তৈয়ারী হইয়া থাকে, সুতরাং পয়সা ব্যয় করিয়া কে আবার বাজার হইতে এই সব জিনিষ কিনিবে?—

আমরা বলি যাহারা এইরূপ কথা বলেন তাঁহারা হয় অজ্ঞ, না হয় অন্ধ, আর না হয় আমাদের দেশে অনেকেরই যে না পড়িয়াই পাণ্ডিত্য জাহির করার রোগ আছে তাহারাও এই রোগাক্রান্ত।

প্রথমতঃ—আমাদের দেশে এক স্বর্ণ বণিক ও গন্ধ বনিক সম্প্রদায় ব্যতীত আর কোনও জাতির মধ্যে আচার মোরব্বাদি প্রস্তুত করিবার রীতি **ব্যাপক ভাবে** প্রচলিত নাই এবং কখনও ছিল না। আমরা "ব্যাপক ভাবে" বলিলাম এই জন্য যে প্রত্যেক বেনে পরিবারে আচার মোরব্বা তৈরী করা যেমন একটা গার্হস্থ্য রীতির মধ্যে পরিগণিত, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও সেরূপ প্রচলিত নাই। গ্রামের মধ্যেও দেখা যায় যে দুশো পাঁচশো ঘর বাসিন্দার মধ্যে হয়ত দশ পনের ঘরে আচার মোরব্বাদি তৈরী হয় এবং অপরাপর লোক ইহাদের কাছ থেকেই কখনও কখনও একটু চাহিয়া নিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করে। নরনারী নির্বিশেষে সকলেই এই সব আচার অত্যন্ত তৃপ্তি ও আগ্রহের সহিত খায় বটে, কিন্তু তৈরী করে অনেক কম লোকে।

দ্বিতীয় কথা এই যে আগে প্রত্যেক গৃহের মেয়েরা নানারূপ আচার, মোরব্বা, পিঠে, পুলি, নারিকেলের চিড়া ও জীরা, ক্ষীরের ছাচ, চন্দ্রপুলি, রাজভোগ ইত্যাদি নানা রকম মুখরোচক খাদ্য দ্রব্যাদি তৈরী করিতে শিক্ষা করিত এবং এই সব জিনিষ তৈরী করিতে যাহারা না জানিত সে সকল মেয়েদের ভাল "ঘর বর ও" জুটিতই না, তাহা ছাড়া সকলের নিকটেই তাহারা গঞ্জনা খাইত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের মেয়েদের আমরা এই সকল কাজের প্রতি অবজ্ঞা এবং ঔদাসিন্য প্রকাশ করিতে শিখাইয়াছি এবং উৎসাহিত করিয়াছি। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা তাহাদিগকে গ্রাজুয়েট এবং এডুকেটেড করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। ফলে এই সকল "এড্রু" ও "গ্রাজুরা" আমকাসুন্দী, ঝালকাসুন্দী, লেবুর আচার, আমের আচার, আমের মোরাব্বা, আম তেল, বড়ি, নারিকেলের জিরা, ক্ষীরের ছাচ, চন্দ্র পুলি ইত্যাদি বাঙ্গালীর অতি প্রিয় এবং মুখরোচক খাদ্যাদির কোনটাই তৈরী করিতে ত জানেই না, বরং নামও সব ভুলিতে বসিয়াছে। সুতরাং **বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আর এ যুগে এসব জিনিষ তৈরী হয় না।**

অথচ এই সব জিনিষ খাইবার লোভ যায়

নাই। তাই বাঙ্গালী বাবুদের আজ খোট্টা আচার প্রস্তুত কারীদের দোকানে যাইয়া এই সব জিনিষ কিনিতে দেখি। ইহারা যেরূপ অপরিষ্কার এবং অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এই সকল "কাঁচা খাদ্য" (Uncooked food) তৈরী করে এবং অতি crude অবস্থায় তাহা রক্ষা করে, তাহা দেখিয়াই অনেকে এইরূপ অপরিষ্কার এবং নোংরা দোকান হইতে এই সব জিনিষ কিনিতে চান না। আমরা দেখাইতেছি যে বাংলাদেশের ঘর গৃহস্থালী হইতে আচার মোরব্বা এবং এবং নানারূপ মুখরোচক খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার রেওয়াজ বা প্রথা আমরা তুলিয়া দিয়াছি এবং তাহার অভাব পূরণ করিতেছি খোট্টা আচারওয়ালাদের দোকান থেকে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

তারপর তৃতীয় কথা এই যে এখন লোকে আর পল্লীবাসী নাই। আগে পল্লীতেই বাংলার জনসংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল, এখন পল্লী জনশূন্য করিয়া নরনারী সকলেই সহরে ঠেল্ মারিয়াছে। কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, এলাহাবাদ প্রভৃতি সহরে যে সকল লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছে ইহারা সব আপন আপন পল্লী উজাড় এবং জনশূন্য করিয়া দিয়াই সহরে বাসা গড়িয়াছে। লোকেরা যখন পল্লীতে ছিল তখন আচার তৈরীর প্রধান মাল মসলা সমূহ সব পল্লীর বাগান এবং আসপাশ হইতেই সহজে এবং সুলভে জোগাড় করা যাইত। কিন্তু সহরে সে সব সুযোগ, সুবিধা এবং সস্তায় মাল কিনিবার অবসর কোথায়? পল্লীগ্রামে ঝুড়ি ঝুড়ি কাঁচা আম বিনা পয়সায় লোকের বাগান হইতে একটা ঝড়ের পর কুড়াইয়া আনা যায় এবং তাহাদ্বারা যে আচার হয় তাহা সম্বৎসর খাইয়াও পরিবারের লোক ফুরাইতে পারে না। আর কলিকাতায় পয়সায় দুইটা কাঁচা আম। সুতরাং কলিকাতায় লোকে ইচ্ছা করিলেই বা আচার করিবে কেমন করিয়া।

আমরা এত কথার আলোচনা করিলাম এই জন্য যে লোকে না ভাবিয়া চিন্তিয়া যা মনে আসে তাই বলিয়া যে এক একটা প্রশ্নের প্রতিপাদ্য বিষয় উড়াইয়া দেয়, তাহাই দেখিবার জন্য।

আচার, মোরব্বা, কাসুন্দী, বড়ী, আমসত্ত্ব, আমচুর, কুলচুর, কুলের আচার, চাল্‌তাচুর, লেবুর, আদার, আমের, ওলের আচার ইত্যাদি অসংখ্য রকম জিনিসের Preserved food বিক্রয়ের যে ভারতব্যাপী বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে এবং এই ব্যবসায়ে যে অন্যূন কয়েক কোটী টাকার কেনা বেচা চলিতে পারে সে বিষয়ে আমাদের অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই কলিকাতাতেই মালদহের আমসত্ত্ব ও আমচুর (Mangoe Pearl বা Mangoe Sago)র এত চাহিদা, যে গুণানুসারে প্রতি সের একটাকা হইতে আটটাকা সের দরে বিক্রয় হয় এবং উহা বাজারে পড়িতে পায় না। আমসত্ত্বের সের আট টাকা শুনিয়া অনেক বেকার এবং অলস যুবক হয়ত বিস্মিত হইয়া যাইবেন। কিন্তু তাহা এমন চমৎকার যে আমরাও অনেক সময় এই আট টাকা সের দরের আমসত্ত্বও কিনিয়া থাকি এবং উহার টান্ এত বেশী যে অনেক সময় মাল না পাইয়া দুঃখের সহিত ফিরিয়াও আসি।

মেদিনীপুরের পোস্তদানা দিয়া বড়ীর এমন টান্ যে কলিকাতায় ছোট বড় প্রদর্শনী সমূহে মেদিনীপুরের এই নামজাদা বড়ী আসিলেই শত শত গ্রাহকের ভিড় সেইখানে জমিয়া যায় এবং নিমেষের মধ্যেই উহা নিঃশেষ হইয়া যায়। টান্ অসম্ভব, কিন্তু জোগান্ মোটেই নেই। কারণ মেদিনীপুরের দরিদ্র বিধবা বুড়িরাই এই সব বড়ী তৈরী করে তাদের অভাব মিটাইবার মত, কেহই ব্যাপক ভাবে কিম্বা ব্যবসায় হিসাবে ইহা করে না। কয়েকজন লোকে মিলিয়া সামান্য কয়েক শত টাকা মূলধন নিয়োগ করিয়া এই সামান্য ব্যবসাতে নামিলে এবং ৪।৫ শত বিধবাকে দিয়া তৈরী করাইলে অচিরে প্রচুর লাভবান হইতে পারেন। কিন্তু শুকনা খট্‌খটে করিয়া বড়ী শুখানো, Harmetically Sealing এবং Scientific packing এর আয়োজন করা চাই, নচেৎ মাল নষ্ট হইয়া যাইবে।

যাক আমরা ২।১ টা জিনিষের মাত্র ইঙ্গিত এই খানে করিলাম। বাংলাদেশে যেরূপ অসংখ্য রকমের ফল পাওয়া যায় তাহার যদি এইরূপে সদ্ব্যবহার করা যাইত এবং ব্যবসায়ের আকারে কাজে লাগানো যাইত, তবে কত বেকারের যে অন্ন সংস্থান হইত এবং দেশের ধনবৃদ্ধি হইত তাহা ভাবিলেও মন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া ওঠে।

(আগামী বারে সমাপ্য

একথা সত্যি যে, দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি মানসে আমরা সবাই শিল্প প্রসারতার কামনা করছি, কিন্তু, শিল্প প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে যে আর একটি খনিজ পদার্থের একান্ত প্রয়োজন সে দিকটায় আমরা তেমন করে নজর দিই না। লোকে কথায় বলে যে, বাবা, 'ষ্টীম' না পেলে সব বন্ধ হ'য়ে যাবে! কথাটা খাঁটি সত্যি। আমরা যতই ইলেক্ট্রিকের বড়াই করি না কেন, বর্ত্তমানে বড় বড় কলকারখানা চালাতে গেলেই কয়লার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে, কেননা, আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত ইলেক্ট্রিসিটি তেমন সস্তাও হয় নি এবং কয়েকটি বড় সহর ছাড়া দেশের অন্যান্য বাণিজ্য কেন্দ্রে পাওয়াও যায় না।

শুধু কলকারখানা কেন, আমাদের দেহ-যন্ত্রের জন্য কয়লার প্রয়োজন। একথায় কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, কেন কয়লা কি আমরা খাই নাকি? এর জবাবে বলা চলে যে, কয়লা আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে না খেলেও পরোক্ষভাবে ভক্ষণ করি, অর্থাৎ কয়লার সাহায্যেই প্রধানতঃ খাদ্য দ্রব্য আমাদের পেটে যায়। কয়লার ওপর রাগ ক'রে অনেকে আজকাল ষ্টোভ ধরেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। যাঁদের গৃহ নেই, অর্থাৎ পরিবার নেই তাঁরাই ষ্টোভ ভক্ত, কিন্তু গৃহহীন আর ক' জন হয় কিংবা হ'তে চায়? সুতরাং যদি বলা যায় যে কয়লা, না হ'লে কারও হাঁড়ি চড়বে না তবে সেটা নেহাৎ মিথ্যা বলা হ'বে না।

তা' ছাড়া দেশের জঙ্গল মহল সব গভর্ণমেণ্টের রিজার্ভ ফরেষ্ট: সেখান থেকে বিনা পাশে এবং বিনা পয়সায় একটি কঞ্চি নেবারও হুকুম নেই। লোকের বাগানের পুরানো গাছ পালাও সব সাবাড় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং দূর দূরান্তরেও যেখানে রেল অথবা ষ্টীমার পথে কয়লা নেওয়া যায়, সেখানেও লোকে কয়লা

ব্যবহার করিতেছে, অথবা করিতে বাধ্য হইতেছে, কারণ জ্বালানী কাঠের অভাব।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে যে, এ হেন যে কয়লা, অর্থাৎ যার সঙ্গে আমাদের নিত্যকার হাঁড়ি চড়ার সম্পর্ক, তার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ কোন আশার বাণী শোনান না! লোকে কে না জানে যে, হাঁড়ি চড়লেই অর্থাৎ পেটে কিছু পড়লে তবে নাড়ী ধাতস্থ থাকে; সুতরাং কয়লার সঙ্গে যে আমাদের যে সে সম্পর্ক নয়, সাক্ষাৎ একেবারে নাড়ীর সম্পর্ক—একথা বৈজ্ঞানিকগণ না বুঝলেও দুগ্ধপোষ্য বালকেও বোঝে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে, এক হিসাবে বৈজ্ঞানিকগণ বালকের চেয়েও অধম, তাই তাঁরা কয়লা সম্পর্কে কোন আশার বাণী না শোনালেও কয়লার সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে অনেক আশার কথা শোনান।

রসায়ন শাস্ত্রে এই কয়লা অর্থাৎ অঙ্গারজনিত একটি পদার্থকে বৃহৎ পরিবারভুক্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেজন্য তার গোষ্ঠীর একটি স্বতন্ত্র কোষ্ঠি তৈরী আছে ইংরাজিতে যার নাম হ'ল "অর্গানিক কেমেষ্ট্রি"। ইংরেজ জাতটা বাস্তবিক কয়লাকে শ্রদ্ধা করতে জানে, তাই তারা কয়লা থেকে গ্যাস, আলকাৎরা, ফেনাইল, ন্যাপথালিন প্রভৃতি নানারকমের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী ক'রেও ক্ষান্ত হয় নি, শেষে এই কয়লা থেকে নানারকমের সুগন্ধি দ্রব্যও তৈরী ক'রছে। আর আমরা ঘৃণা ভরে বললুম,—

"অঙ্গারো শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি"

অর্থাৎ শতবার ধুলেও কয়লার ময়লা ছাড়ে না, অতএব তাকে ছুঁয়ো না! ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর পূর্ব্বে আমাদের দেশে কয়লা খনির আবিষ্কারও হয় নি এবং লোকে কয়লার ব্যবহারও জানত না, কাঠ ব্যবহার করত। তার কারণ বোধ হয় উক্ত বিরূপ প্রবাদ বাক্য। আমরা পূর্ব্বে বলেছি যে, বৈজ্ঞানিকগণ কয়লা সম্পর্কে কোন আশার বাণী শোনান না, তাঁরা মাঝে মাঝে জনসমাজকে আতঙ্কিত ক'রে বলেন, "দেড়শো বছরের মধ্যে ভারতের কয়লা সব শেষ হয়ে যাবে", "পাঁচশো বছরের মধ্যে পৃথিবীর খনিতে আর কয়লা নামক পদার্থ থাকবে না" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিকগণকে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কিংবা লণ্ডন ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথবা নিউ ইয়র্ক ইলেকট্রিক কর্পোরেশন কোন ব্রীফ্ দিয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু তাঁরা প্রতিনিয়তই ইলেকট্রিক কোম্পানীদের পক্ষ নিয়ে কয়লার বিপক্ষে আমাদের কর্ণে অনুরূপ বাণী প্রেরণ করেন। এইরূপ সংবাদ রটনায় তাঁহাদের কোনও আর্থিক লাভ হয় কিনা তাহা জানি না, তবে বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক দিগের নিকট হইতে ফতোয়া ক্রয় করিয়া তাহার জোরে Speculator রা আর্থিক জগতে অনেক ওলট্ পালট্ করিয়া থাকেন একথা আমরা জানি।

যাকৃগে, ভূমিকা ছেড়ে দিয়ে এবার কয়লার ইতিহাস আলোচনা করা যাক্।

আমাদের দেশে প্রায় ১৬২ বছর হল কয়লা খনির কাজ সুরু হয়েছে। বীরভূম ও পঞ্চকোট নামক যায়গায় কয়লার সন্ধান পেয়ে মেসার্স বামার ও হিট্লি কোম্পানীর জন্ আসর নামে এক সাহেব ১৭৭৪ সালের ১১ই

আগষ্ট তারিখে কাউন্সিল অব্ রেভিনিউ এর সভাপতি ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌কে এ সম্পর্কে লেখেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট হ'তে অনুমতি প্রাপ্ত হ'য়ে তাঁরা সীতারামপুরের নিকট ইথোরায় এবং নিয়ামৎপুরে দু'টি কয়লা খনির কাজ সুরু করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ যতদিন ছিলেন ততদিন ঐ খনির কার্য্য তাঁর নিকট থেকে আনুকূল্য লাভ করেছিল, কিন্তু তিনি চলে যাবার পর এ সম্বন্ধে আর কেউই উৎসাহ দেখায়নি। ফলে, ১৭৮৮ থেকে ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য পরিলক্ষিত হ'ল না।

মারকুইস্ অব্ হেষ্টিংস যখন এদেশে গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন, তিনি তখন সকলকে এদেশের কয়লা-শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে উৎসাহ দিলেন এবং তজ্জন্যই কয়লা-শিল্পের ব্যাপারটা আবার একটু অপেক্ষাকৃত চাঙ্গা হ'যে উঠল। কিন্তু মাল প্রেরণের অসুবিধার জন্য কারবার তেমন জমল না এবং দেখা গেল যে, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৩ সালের মধ্যে ৪০০ টন কয়লা উৎপাদিত হয়েছে। আজকের উৎপাদনের সঙ্গে সেদিনকার উৎপাদনের তুলনা করলে আকাশ পাতাল প্রভেদ মনে হয়, কেননা, আজকের দিনে বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ হ'ল ২২০ লক্ষ টন; আবশ্যকমত তা' ৩০০ লক্ষ টন-এ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

কয়লার খনি-কারবারে সত্যকারের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন মেসার্স জেসপ্ এণ্ড্ কোং। লছিবাদ ও চাঁচেতে তাঁরাই ভালরকম খনি কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৩৭ সালে উক্ত কারবার গিল্‌মোর হাম্‌ফ্রে এণ্ড্ কোং-এর হাতে যায়। উক্ত গিল্‌মোর হাম্‌ফ্রে কোং কার ঠাকুর এণ্ড কোং-এর সহিত সম্মিলিত হয়ে, বেঙ্গল কোল্ কোম্পানী নামে এক বৃহৎ যৌথ কোম্পানী গঠন করেন। এই ভাবেই রাণীগঞ্জে কয়লা খনির বিস্তার লাভ ঘটে। ১৮৪২ সালে সেখানকার বাৎসরিক উৎপাদন ছিল ৫০ হাজার টন। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান্ রেল্‌ওয়ের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কয়লাখনির প্রসারতা বেড়ে যায়, কেননা, রেলওয়ের তরফ থেকে কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ঐ চাহিদা এত বৃদ্ধি পায় যে ১৮৫৮ সালে কয়লা খনিগুলির উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৬,৩০৬ টন।

আমরা সকলেই বর্ত্তমানে জানি যে ঝরিয়া একটি কয়লা প্রধান যায়গা। ভারতের সমগ্র উৎপাদনের শতকরা ৪১·০৬ ভাগই ঝরিয়া থেকে উৎপাদিত হয়। এই জন্যই মিঃ টি, ডব্লু, এইচ্, হাগ্‌স্ ঝরিয়া সম্পর্কে বলেছিলেন যে, ঝরিয়ার সীমান্তে যে ১২০০ বর্গ মাইল পাহাড়ে যায়গা আছে তার থেকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। পাঠকবর্গ শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, মোটামুটি হিসাবে আজ পর্য্যন্ত ঐ যায়গা থেকে ১২০ কোটী টাকার ওপর কয়লা উৎপাদিত হয়েছে, এবং শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ যায়গার খনি স্বত্ব লাভের মূল্য ছিল মাত্র ২৫,০০০ পাউণ্ড! কিন্তু কেউই তখন কয়েক লাখ মাত্র টাকা খরচ করে ঐ জমি নেবার দিকে ঝুঁকে পড়ে নি।

এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য ছেড়ে দিলেও উক্ত খনিগুলির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে বিচার্য্য। কয়লাসম্পদ ভারতের জাতীয় ধনসম্পত্তির একটি বৃহৎ

সম্পদ। ১৮৮২ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত কয়লা-শিল্পের কার্য্য বেশ চলছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে গভর্ণমেণ্টের হাতে এ শিল্প মারাত্মক রকমের ঘা খায় ; কেননা, গভর্ণমেণ্ট তখন আমাদের দেশ থেকে বিদেশে কয়লা রপ্তানীর পথ কৌশলে বন্ধ করে দেন। ফলে এই হয় যে, ১৯১৯ সালে যেখানে কয়লার উৎপাদন-পরিমাণ ২২৫ লক্ষ টন ছিল, ১৯২০ সালে তা' নেমে ১৮০ লক্ষ টনে দাঁড়াল। এর ফলে গভর্ণমেণ্ট যদিও ১৯২৩ সালে রপ্তানীর ওপর বাটা তুলে নিতে বাধ্য হলেন, কিন্তু ঐ ক'বছরে বিদেশের যে বাজার নষ্ট হয়েছিল, তা' আর পুনরধিকৃত হতে পারলো না। এর কারণ এই যে, বিদেশের বাজারে ভারতীয় কয়লার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা সেখানে নিজের স্থান করে নিয়েছিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা ভারতীয় কয়লা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়ার দরুণ, ভারতীয় কয়লা আর সেখানে মাথা গলাতে পারলে না। শুধু উৎকৃষ্টতায় নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা দামেও সস্তা ছিল এবং সেইজন্যই যে, কলম্বোর বাজারে ভারতীয় কয়লার আধিপত্য একেবারে একচেটিয়া ছিল সেখানেও ভারতীয় কয়লা আর স্থান করে নিতে পারলে না।

কিন্তু বিদেশের ঐ রকম একটা মস্ত বড় বাজার ছেড়ে যাওয়ার ক্ষতি তখন হাতে হাতে অনুভূত হয় নি, কেননা, অদ্ভুত যোগাযোগে তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, কয়লার চাহিদা তখন ভয়ঙ্কর বেড়ে গেল যার ফলে কাল পাথরও কয়লা বলে বিক্রী হতে লাগল। তখনকার হিসাব থেকেই ব্যাপারের গুরুত্বটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হবে। ১৯১৭ সালে খনিওয়ালাদের কাছে এক টন কয়লার গড়ে দর ছিল ৩ টাকা পনেরো আনা। ১৯১৯ সালে তার দাম হ'ল ৫ টাকা। ১৯২১ সালে তা' ৭ টাকা ১২ আনায় বৃদ্ধি পেলে, ১৯২২ সালে তার দর হ'ল ৯ টাকা ১০ আনা (এই সালেই রেকর্ড দর ওঠে)। এই রকম চড়া দর থাকার দরুণই খনিমালিকেরা বিদেশী বাজার হাতছাড়া হওয়ার ক্ষতিটার দিকে তেমন নজর দেন নি। কিন্তু সুদিন বা সুবিধা বেশীক্ষণ থাকে না।

সুতরাং ১৯২৩ সালের পর থেকে যখন দর পড়তে আরম্ভ করল তখনি খনি-মালিকেরা ঘা খেলে। তখনি তারা বুঝলে যে, বিদেশের বাজারটা হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার দরুণ একটা মস্ত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লাও একটা মস্ত বড় প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া কল-কারখানা চালাইবার কাজে কয়লার পরিবর্ত্তে তেলের ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে, পূর্ব্বে যেখানে মাত্র ৭৭ লক্ষ গ্যালন তেল ব্যবহৃত হ'ত, ঐ সময়ে সেই ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৩৬ লক্ষ গ্যালন। এতদ্ব্যতীত, ছয়টি নতুন খনির কাজ আরও আরম্ভ হয়েছিল এবং যে রেলওয়ে কোম্পানী কয়লা খনিওয়ালাদের মস্ত বড় রকম খদ্দের ছিলেন, তাঁরাই নিজেরা জমি ক্রয় করে খনিকার্য্য পরিচালনা করতে লাগলেন। তাঁদের যে পূর্ব্বে কোন খনি ছিল না তা নয়, বস্তুতঃ ১৮৭১ সালে তাঁদের গিরিডীতে একটা কোলিয়ারী ছিল, কিন্তু তা' সত্ত্বেও তাঁদের খনি-মালিকদের নিকট হ'তে বেশ মোটা রকম পরিমাণের কয়লা কিনতে হ'ত।

(আগামী বারে সমাপ্য)

ইণ্ডিয়ান ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর চতুর্থ কনফারেন্স

গত ৭ই মার্চ্চ কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর চতুর্থ কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন, মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার। ৭নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে ন্যাশন্যাল ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর হেড্ আফিস গৃহে এই বিরাট অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রায় ৭০টী বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধি স্বরূপ ৪০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন। এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক দর্শক ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম,—

আচার্য্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, স্যার ছজুরাম চৌধুরী, স্যার ডারসী লিণ্ডসে, মিঃ এস্ কে বসু, কুমার কার্ত্তিক চরণ মল্লিক, মিঃ ডি পি খৈতান, পণ্ডিত সান্তনম্, মিঃ এস বি কার্ডমাষ্টার, মিঃ জে সি ল্যাঙ্গ, মিঃ এইচ্ এল হাম্ফ্রি, মিঃ জে এম্ কার্ডেবিয়ো, রায় বাহাদুর এ সি ব্যানার্জ্জি, ডাঃ এস্ সি রায়, মিঃ জে সি গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, মিঃ এ সি সেন, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, মিঃ এস্ এস্ নাজির, মিঃ বায়রামজি হরমুসজী, মিঃ বিজয় সিং গোবিন্দজী, মিঃ এল্ এস্ বৈদ্যনাথম্, মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার, মিঃ কে এম্ নায়েক, মিঃ জি এল মেহতা, মিঃ কে সি দেশাই, মিঃ এন্ এল পুরী, মিঃ শচীন বাগচী, মিঃ এস্ এম ঘটক, মিঃ পি সি রায়, মিঃ এস এন ব্যানার্জ্জি, মিঃ এস পি বোস্, মিঃ এস সি রায়, মিঃ পি সি দাস, মিঃ এস এল রায়, মিঃ অমর ঘোষ, মিঃ শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, মিঃ তেজেন সরকার, মিঃ আশুতোষ ব্যানার্জ্জি, মিঃ আই বি সেন, মিঃ যোগেশ বসু, মিঃ হরেন ঘোষ, মিঃ সমরেশ চক্রবর্ত্তী, মিঃ করুণা ব্যানার্জ্জি, মিঃ বি মজুমদার, মিঃ শচীন চ্যাটার্জ্জি, মিঃ এস কর, মিঃ সুধাংশু মিত্র, অধ্যাপক জে চৌধুরী, মিঃ ক্ষিতিশ ব্যানার্জ্জি, মিঃ এ কে হালদার, মিঃ চুণীলাল লাহিড়ী, মিঃ পি গুপ্ত, মিঃ পঞ্চানন সরকার, মিঃ অমূল্য চ্যাটার্জ্জী, মিঃ এম ভাগবত, মিঃ টি

গাঙ্গুলী মিঃ পরেশ দাশগুপ্ত, মিঃ ভূপতি মোহন সেন মিঃ এ কে সেন, মিঃ মুতিয়া প্রভৃতি।

কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র স্যার হরিশঙ্কর পাল বিশেষ কারণে উপস্থিত হইতে না পারায় ডেপুটী মেয়র মিঃ আব্দার রহিম সি, আই, ই মহোদয় অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। স্যার হরিশঙ্কর পাল, মিঃ জি এস্ ম্যাগ্রাথে, মিঃ কে এস্ আর আয়ার কন্ফারেন্সের সাফল্য কামনা করিয়া যে সহানুভূতি সূচক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা সভাস্থলে পাঠ করা হয়। অভ্যর্থনা
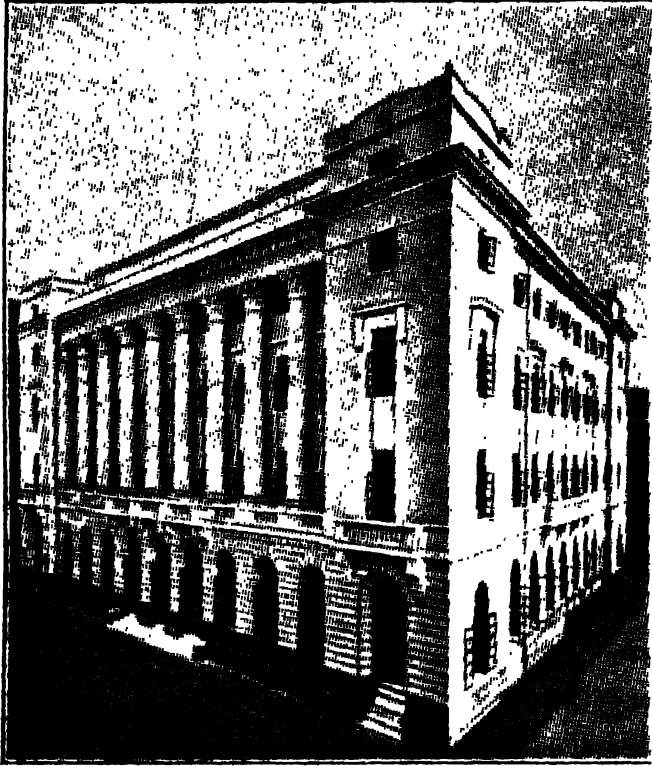
অধিবেশন স্থান—ন্যাশন্যালের প্রাসাদোপম বাড়ীর ত্রিতলস্থ সুবৃহৎ হল

সমিতির চেয়ারম্যানের বক্তৃতা এবং সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পঠিত হইবার পর বীমা ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তি বীমা সংক্রান্ত বিবিধ সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তন্মধ্যে এই কয়েকটী প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) মিঃ এল্ এস্ বৈদ্যনাথম্ এফ্.-আই-এ লিখিত মৃত্যুর হারের তত্ত্ব নিরূপণ (Mortality Experience).

মিঃ বিমল ঘোষ লিখিত জীবনবীমা তহবিল খাটানো (Investment of Life Insurance Funds)

(৩) মিঃ পি সি রায় লিখিত ভারতীয় জন সাধারণের মধ্যে বীমা প্রচারের ভবিষ্যৎ (Prospects of Insurance for masses in India)

(৪) ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল লিখিত বীমা ব্যবসায়ে কার্য্যক্ষেত্র গঠন (Field Organisation of Life Offices)

(৫) মিঃ টি এস্ স্বামীনাথম লিখিত "লাভ বণ্টন" (Distribution of Profits)

(৬) ডাঃ কাবাসটজী লিখিত 'জীবন বীমার দায়ের মূল্য নিরূপণ' (Assesment of Life Insurance Risks)

অতঃপর ৭টী প্রস্তাব কনফারেন্সে গৃহীত হয়,—তাহার সার মর্ম্ম এই,—

(১) লালা হরকিষণ লাল, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, স্যার লালুভাই সামলদাস, এফ ই দীনশা, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এ-এম কাজীজি, ডাঃ এম্ এ আনসারী, রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু, মিঃ এস্ এন মল্লিক সি আই ই, রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, মিঃ আই বি দত্ত, —এই সকল বীমা-ব্যবসায়-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

(২) ভারতবাসীকে ভারতীয় বীমা কোম্পানীতে বীমা করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়।

(৩) গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত বীমা-আইন কোন কোন বিষয়ে দোষ-যুক্ত বিবেচিত হওয়ায় উহার যথাযথ সংশোধনের জন্য গবর্ণমেণ্ট্‌কে অনুরোধ করা হয়।

(৪) পোষ্ট্যাল ইন্‌সুর‍্যান্স তুলিয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়।

(৫) বীমা-সংক্রান্ত ইনকাম ট্যাক্স আইনের সংশোধনের জন্য গবর্ণমেণ্ট কে অনুরোধ করা হয়।

দ্বারদেশে সভাপতির অভ্যর্থনা

(৬) ইন্‌সুর‍্যান্স ফিল্ড ওয়ার্কারদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

(৭) মিউনিসিপালিটী বীমা কোম্পানী এবং এজেণ্টদের উপর যে লাইসেন্স ফি

চার্জ্জ করেন, তাহা তুলিয়া দেওয়া হউক।

এই কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে সপ্তাহকাল ধরিয়া বীমা-ব্যবসায়ী এবং বীমা-কর্ম্মীদের বহুসংখ্যক প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে সকলের মধ্যে ব্যবসায় সংক্রান্ত নানা কথাবার্ত্তা আলাপ আলোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ সভাপতি মহাশয় পেলিটী হোটেলে একটা টী-পার্টি দেন।

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান্ এবং সেক্রেটারী—কোষাধ্যক্ষ

তাহাতে বিশিষ্ট ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজারগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তারপর কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনের দিন ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর উদ্যোগে সকলের জন্য মৌলে-রু হোটেলে এক বিরাট লাঞ্চ বা ভোজ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। ন্যাশন্যালের মিঃ নায়েক, মিঃ এস্, এন ব্যানার্জ্জী এবং মিঃ পঞ্চানন সরকার অভ্যাগতদিগকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। সেইদিন অপরাহ্নে শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয় তাঁহার "রঞ্জনী" নামক প্রাসাদে কন্‌ফারেন্সের সমস্ত প্রতিনিধি-দিগকে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত করেন। তাহাতে বিদেশীয় বীমা কোম্পানীর ম্যানেজারগণ এবং অন্যান্য ব্যবসায় সংক্রান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তারপর যথাক্রমে হিন্দু মিউচুয়ালের সেক্রেটারী মিঃ পি সি রায়, ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্টের মিঃ আই বি সেন, এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার মিঃ এ সি সেন, ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ানের মিঃ এস্ পি বসু, পৃথক পৃথক টি-পার্টি,--য়্যাট্-হোম, লাঞ্চ এবং ডিনারের অনুষ্ঠান করেন। এতদ্ব্যতীত মিঃ ডি পি খৈতান গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক ডিনার পার্টি দেন এবং শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকার পেলিটি হোটেলে পণ্ডিত সান্তনমের অভ্যর্থনায় এক লাঞ্চের অনুষ্ঠান করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান্ শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের বক্তৃতার সার-মর্ম্ম

সভাপতি মহাশয়,—বন্ধুগণ,—

আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ঐকান্তিক প্রীতির সহিত আমি আপনাদিগকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। আমরা এই মহানগরীর ক্রোড়ে আজন্ম প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছি বলিয়াই নহে,—ভারতীয় বীমা-ব্যবসায়ের প্রভাত অরুণ এই স্থানেই উদিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা আমাদের গৌরবের বিষয় এবং আনন্দের কারণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মতিলাল শীল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষাসম্পন্ন ধনশালী ব্যক্তিগণ বাংলাদেশে বীমা-ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন। তারপর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সহিত বীমার কারবার যথার্থরূপে আরম্ভ হয়। ভারতের জাতীয় উন্নতির অন্যান্য পন্থার মত এই দিকেও বাঙ্গালীই সর্ব্বপ্রথমে জয়যাত্রা করে।

সমগ্র জগতে বীমা-ব্যবসায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। মানব সমাজের সেবায় এবং উন্নতি সাধনে বীমার কার্য্য চির গৌরবান্বিত। সেইজন্য এই কনফারেন্সের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব আমি বিশেষরূপে উপলব্ধি করি। বীমা

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কর্ত্তৃক ডেলিগেটদিগের অভ্যর্থনা এবং অভিভাষণ

কর্ম্মিগণের এবং ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে কার্য্যপন্থা অধিকতর সরল হইয়া উঠে।

ভারতীয় বীমা ব্যবসায় প্রথম আরম্ভে নানা বাধা-বিঘ্নে প্রতিহত এবং প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত হইলেও অল্প সময়ের মধ্যেই আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছে। নিম্নলিখিত তুলনা মূলক হিসাবে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে,—

এই হিসাবে দেখা যায়, গত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় বীমা-ব্যবসায় মোটামুটী তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা আমাদের গৌরবের বিষয় এবং সন্তোষজনক হইলেও আমাদের

বৎসর	বীমা কোম্পানীর সংখ্যা	জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ টাকা	মোট প্রিমিয়াম আয় টাকা	মোট চল্‌তি কারবারের পরিমাণ টাকা	সংগৃহীত মোট নূতন কারবারের পরিমাণ টাকা
১৯২৫	৬০	১২৫০০০০০০	২২৫০০০০০	৪৭০০০০০০০	৮১৬০০০০০
১৯৩৪	২১০	৩২০০০০০০০	৬৫০০০০০০	১৩২০০০০০০০	২৯০০০০০০০

দায়িত্বের ভার যে বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; এখন আমাদিকে দেখিতে হইবে এই ক্রমোন্নতির পথে যেন কোন বাধা উপস্থিত না হয়; এই উন্নতি যেন অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকে।

সম্প্রতি খরচের অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ে এক প্রবল বাধার উদ্ভব হইয়াছে। তীব্র প্রতিযোগিতাই ইহার প্রধান কারণ। বহুসংখ্যক দেশীয় কোম্পানী আত্ম-প্রতিষ্ঠার উন্মাদ চেষ্টায় প্রকৃত বিজ্ঞান সম্মত পন্থায় না যাইয়া যে কোন উপায়ে কারবার বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। কেবল মাত্র মোটা টাকার বীমা সংগ্রহ করাই তাঁহাদের লক্ষ্য। অন্যদিকে বিদেশীয় কোম্পানীর বিপুল অর্থ-বল থাকাতে তাঁহারা অতিরিক্ত খরচ করিতে কিছুমাত্র ভয় পান না। এই উভয়বিধ কারণে দিন দিন খরচের অনুপাত বাড়িয়া যাইতেছে। নূতন কারবারের পরিমাণ এবং প্রিমিয়ামের আয় ধরিলে দেখা যায় এখনও বিদেশীয় কোম্পানীর হাতেই বীমা-ব্যবসায়ের সারভাগ রহিয়াছে, ভারতীয় কোম্পানীর ভাগ্যে খোসা ছোবড়া পর্য্যন্ত, তার বেশী কিছু নয়। এই শোচনীয় দুরবস্থা ছাড়াইয়া উঠিতে হইলে আমাদিগকে ভারতবাসীর স্বদেশ ভক্তির ভাবকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতবাসী যেন বীমা ব্যাপারে বিদেশীয় প্রতি পক্ষ পাতিত্ব সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করেন এবং ভারতীয় স্বদেশীয় বীমা কোম্পানীতেই বীমা করেন। ভারতীয় কোম্পানী সমূহ যদি ভাল ভাল বীমা সংগ্রহ করিতে পারে, যদি বীমা ব্যবসায়ের সারাংশ টানিয়া লইতে পারে তবে খরচের অনুপাত আপনা আপনিই কমিয়া আসিবে।

ভারতীয় কোম্পানী জীবন বীমার কারবারে যেমন উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, অন্যবিধ বীমার কারবারে তেমন কিছুই পারে নাই। ১৯২৮ সালে এই বাবদে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল ৪১ লক্ষ টাকা। ১৯৩২ সালে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া ৬৪ লক্ষ টাকা হয়। কিন্তু ১৯৩৪ সালে উহা পুনরায় কমিয়া ৫৪ লক্ষ টাকায় নামিয়া আসে। প্রতিযোগিতা ছাড়াও ইহার অন্য কারণ আছে। শিল্পবাণিজ্যের প্রসার না হইলে এই শ্রেণীর বীমার কারবারের উন্নতি হয়না। ভারতে শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার অতি ধীর গতিতে হইতেছে। যে কয়েকটী ভারতীয় কোম্পানী জীবন-বীমা ব্যতীত অন্যবিধ বীমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকল রকমের বীমার দায়িত্ব লইতে পারেন না। সুতরাং অ-ভারতীয় কোম্পানীর সহিত বড় রকমে পুনর্ব্বীমার কারবার স্থাপন করা আবশ্যক।

বাংলার বাহির হইতে আগত কন্‌ফারেন্সের বিশিষ্ট ডেলিগেটগণ

নিউ ইণ্ডিয়ার হেড আপিশের ম্যানেজার—

মিঃ এস্‌, বি, কার্ডমাষ্টার

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়ালের জেনারেল ম্যানেজার—

মিঃ কে, সি, দেশাই

বাংলার বাহির হইতে আগত কন্‌ফারেন্সের বিশিষ্ট ডেলিগেটগণ

ইন্‌সিওরেন্স্‌ অফিসেছ্‌ এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং লক্ষ্মী ইনসিওরেন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

পণ্ডিত কে, সান্তনম্‌

ওরিয়েন্ট্যালের—

মিঃ এল, এস, বৈদ্যনাথন্‌

এম, এ, এফ, আই, এ

বম্বে মিউচুয়ালের সেক্রেটারী—

মিঃ জে, এম, করুডেইরো

(ইন্‌সিওরেন্স্‌ হেরাল্ড্‌ এবং ইন্‌সিওরেন্স্‌ ওয়ার্ল্ডের সৌজন্যে)

কনফারেন্সের কর্ম্মসচিবগণঃ—

কন্‌ফারেন্সের প্রেসিডেন্ট
শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদ
ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ
এ্যাসিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার
হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার

জয়েন্ট সেক্রেটারী—১
মিঃ এস এন ব্যানার্জ্জী
ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সেক্রেটারী
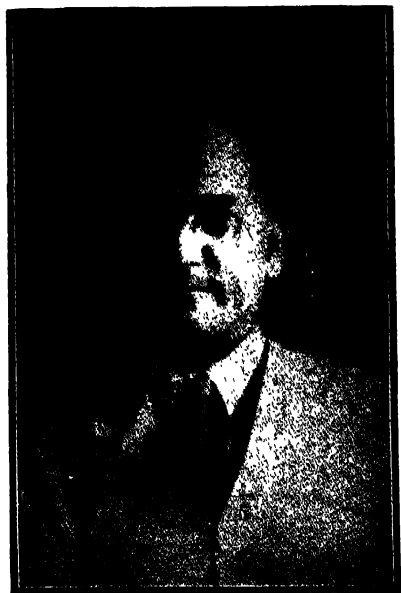
জয়েন্ট সেক্রেটারী—২
মিঃ এস্ পি বোস্
ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ানের সেক্রেটারী

কনফারেন্সের কর্ম্মসচিবগণ—

জয়েণ্ট সেক্রেটারী—৩
মিঃ এস সি রায়
ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট
এবং আসাম্বানের ম্যানেজার

অভ্যর্থনা সমিতির ভাইস্ চেয়ারম্যান
মিঃ এ কে ঘোষ
বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোম্পানীর
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর

অভ্যর্থনা সমিতির ভাইস্ চেয়ারম্যান
মিঃ পি সি রায়—
হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ ইন্সিওরেন্সের
সেক্রেটারী
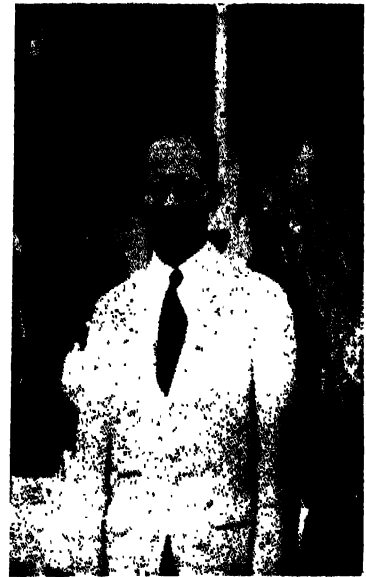
অভ্যর্থনা সমিতির ভাইস্ চেয়ারম্যান
মিঃ এস এস নাজীর—
ওরিয়েণ্টালের কলিকাতা আফিসের
ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী

মাল-চালানী, সম্পর্কিত এবং অন্যবিধ প্রধান শিল্পবাণিজ্য সমূহ বিদেশীয়দের তাঁবে থাকাতে ভারতীয় কোম্পানীর পক্ষে তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা মুস্কিল। এ বিষয়ে বিদেশীয় কোম্পানীদের শীঘ্রই সুবুদ্ধির উদয় হইবে আশা করা যায়।

গত মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর কয়েক বৎসর যাবৎ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী এবং তদ্রূপ অন্যান্য সিকিউরিটী সমূহের সুদের হার বেশী ছিল। সেই সময়ে বীমা কোম্পানী ঐ সকল সিকিউরিটীতে টাকা খাটাইয়া লাভবান্ হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার সুদের হার এত কমিয়া গিয়াছে যে, প্রিমিয়ামের হার ধার্য্য করার জন্য যে পরিমাণ সুদ নিতান্ত না পাইলেই নয়, সেই পরিমাণ সুদও ঐ সকল সিকিউরিটী হইতে পাওয়া যায় না ;—বোনাস্ দিবার জন্য সারপ্লাস ত দূরের কথা! এদিকে সাধারণ লোকে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে টাকা খাটানই পছন্দ করেন। "সোনালী সিকিউরিটী" বলিয়া তার একটা সুনাম আছে। সুতরাং আজকাল বীমা-কোম্পানীসমূহ,—বিশেষতঃ নূতনকোম্পানী সমূহ কি রকম সিকিউরিটীতে টাকা খাটাইবেন তাহা এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই অবস্থায় আর বীমা কোম্পানীর পক্ষে উচ্চহারে বোনাস্ দেওয়া সম্ভব নহে। একথা ঠিক যে, সাধারণ লোকে খুব মোটা রকমের বোনাস্ পাওয়ারই আশা করে এবং এই বোনাসের উপরই কোম্পানীর ভাল মন্দের বিচার হয়। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, লোকের এই আশা পরিপূরণ করিতে গেলে বীমা কোম্পানীরই বিপদ। সুতরাং সোজাসুজি সরল ভাবে কম্‌তি আয়ের অনুরূপ বোনাসের হার কমাইয়া দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত। এ বিষয়ে বড় বড় বীমা কোম্পানীর অগ্রণী হওয়া উচিত।

বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে যাঁহারা বাহিরে কার্য্য করেন, তাঁহাদের শক্তিকে অধিকতর দৃঢ় ও সঙ্ঘবদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। একথা মনে রাখিতে হইবে, এজেণ্টগণই বীমার কারবার গড়িয়া তোলেন,—বীমা কোম্পানী এজেণ্ট তৈয়ারী করে না। বর্ত্তমান সময় দেশের শিক্ষিত যুবকগণ এই বীমা-ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহ দেখাইতেছেন,—ইহা দেশের পক্ষে বিশেষ শুভ লক্ষণ। কিন্তু সংবাদপত্রে বীমা সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনা চলিতেছে, তাহার ফল বীমা ব্যবসায়ের পক্ষে মঙ্গল জনক হইবে না,—আমি এই সাবধান বাক্য উচ্চারণ করিতেছি। যাহারা বীমা সম্বন্ধে কিছুই জানে না,—বুঝে না,—ঐ সব লোক কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও জঘন্য প্রকৃতির খেয়ালে খবরের কাগজে যা—তা লিখিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। নিরপেক্ষ সমালোচনা এবং বিজ্ঞতাপূর্ণ পরামর্শ আমরা সর্ব্বদাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করি। তাহার দ্বারা বীমা ব্যবসায়ের যথার্থ উন্নতিই হয় একথাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু অন্যায় প্রতিযোগিতার ইন্ধন যোগাইবার নিমিত্ত,—অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর আক্রোশ মিটাইবার জন্য নির্জ্জলা মিথ্যা রটনা করিয়া বেড়ান,—ইহা কখনও সহ্য বা উপেক্ষা করা যায় না। সরল বুদ্ধি জনসাধারণ সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিবার সুযোগ পায় না ;—সুতরাং তাহারা কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রচারিত কথাটাই সহজে বিশ্বাস করে। বিশেষ দুঃখের বিষয়, কোন কোন বড় এবং নাম করা কোম্পানীও এই সব দুষ্ট প্রকৃতির

লোকদিগকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সাহায্য করিয়া থাকেন।

বিদেশী কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতা এবং "ঘরের শত্রু বিভীষণদের" দুরভিসন্ধি এই উভয়বিধ বাধার প্রতিকার আমাদিগকে করিতে হইবে। কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্টের আইনের দ্বারা এই প্রতিকার সম্ভবপর নহে। আমাদের নিজের কর্ম্মক্ষমতা এবং ব্যবসায় বুদ্ধিই তাহার প্রধান উপায়। আইন সংশোধন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে নূতন বিল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা অনেকেই এই অল্প সময়ের মধ্যে ভালরূপ পড়িয়া পরীক্ষা ও বিচার করিতে পারেন নাই। তথাপি এখনও ছয় মাস সময় আছে। গভর্ণমেণ্টের আইন বিভাগের কর্ত্তা স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বলিয়াছেন যে, বিলে যাহা প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা যে একেবারে অপরিবর্ত্তনীয় এমন নহে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের সুচিন্তিত মত দিবার যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ রহিয়াছে। গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া আমি এই বিষয়ে সকলকে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি।

কন্‌ফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত বালচাঁদ হীরাচাঁদ মহাশয়ের অভিভাষণের সারমর্ম্ম

ভদ্রমহোদয়গণ,

এবারকার নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে কংগ্রেস পক্ষীয়দের সফলতায় আমাদের আনন্দের বিশেষ কারণ আছে। এতদিন ক্ষমতার অভাবে তাঁহারা যে সকল দেশ-হিতকর কার্য্য করিতে পারেন নাই ;—এতদিন যাহা তাঁহদের কেবল মাত্র জল্পনা কল্পনাতেই আবদ্ধ ছিল,—এখন তাঁহারা তাঁহাদের সেই সকল মতলব কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইবেন। বিশেষতঃ যে-সকল প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য হেতু মন্ত্রী-পরিষদ্ তাঁহাদের দ্বারাই গঠিত হইবে, সেই সব প্রদেশে যথার্থ ক্ষমতা লাভ করিয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধনে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সমূহ যদি এইভাবে গবর্ণমেণ্টের সমর্থন পায়, তবে তাহা অবিলম্বে জনসাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিবে। ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর প্রথম কনফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট স্যার নৌরোজী সাকলাতবালা এই কথারই ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভারতের শিল্পবাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং এবং বীমা ব্যবসায়ের উন্নতির উপরই তাহার স্বরাজ-লাভ নির্ভর করিতেছে।" পাশ্চাত্য দেশে এই প্রকার কনফারেন্সের দ্বারাই জনসাধারণের মধ্যে বীমার আবহাওয়ার সৃষ্টি ও প্রসার হইয়াছে। লণ্ডনের চার্টার্ড ইনসুর‍্যান্স ইনষ্টিটিউট্ এবং তাহার শাখা সমিতি সমগ্র ইংলণ্ডে বিস্তৃত। তাহারই ফলে সেখানকার শতকরা ৪০ জন লোক বীমা-ব্যবসায়ের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট। আমেরিকাকে বলা যায় কনফারেন্সের দেশ। কথায় কথায় এত কনফারেন্স্ ও কন্‌ভেনসান আর কোন দেশে নাই। এই কারণেই আমেরিকার সমস্ত লোকই কোন না কোন প্রকারে বীমার কারবারে জড়িত আছে।

গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতবর্ষে বীমা ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ও সাহায্য না পাওয়ায়, —সেই উন্নতি আশানুরূপ হয় নাই। বর্ত্তমান

সময়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের প্রধান বাধা—বিদেশীয় কোম্পানীর অন্যায় প্রতিযোগিতা। এই অন্যায় প্রতিযোগিতা চালাইবার জন্য বিদেশীয় বীমা-কোম্পানী তাঁহাদের প্রিমিয়ামের আয় হইতে মোটা রকমের টাকা পৃথক্ বরাদ্দ করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনেকে ভারতের ব্যবসায় ক্ষেত্র চাখ্‌তে আসেন —কয়েক বৎসর এদেশে বেশ মোটা টাকা খরচ করিয়া, —জনসাধারণকে লোভ দেখাইয় কারবার ফাঁদিয়া বসিতে চেষ্টা করেন —তারপর কিছুদিন পরে বে গতিক দেখিলে সরিয়া পড়েন। কিন্তু পাত তাড়ি গুটাইবার পূর্ব্বে ব্যবসার সর্ব্বনাশটা করিয়া যান। এই হইল বিদেশীয় কোম্পানীর চরিত্র। আমি নাম করিতে চাহিনা,—আপনারা সকলে এই ধরণের বিদেশীয় কোম্পানীর নাম নিশ্চয়ই জানেন। ইহা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের আইনসচিব মহাশয় যে কিরূপে বলিলেন বিদেশী কোম্পানীরা ব্যবসা মাটী করে না, তাহা বুঝিতে পারিনা। ট্যারিফ বোর্ডের মত একটা পৃথক্ তদন্ত কমিটি যদি ভারতীয় বীমা-ব্যবসায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, তবে নিশ্চয়ই প্রকৃত রহস্য বাহির হইয়া পড়িবে। গবর্ণমেণ্টের আইনের দ্বারা যদি বাস্তবিক বীমা-ব্যবসায়ের উন্নতির কোন উপায় না হয়, তবে তৎসম্বন্ধে খুব উৎসাহ দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

সভাপতি মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদের অভিভাষণ

সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে বীমা সম্বন্ধীয় আইনের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে এমন কোন ধারা পাওয়া যায় না যাহা ভারতীয় ব্যবসাকে বিদেশী কোম্পানীর অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতে পারে। আমার বিশ্বাস, ব্যাঙ্কিং, জাহাজী কারবার (Shipping) এবং বীমা, এই তিনটী জাতিগঠন মূলক ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোকের আয়ত্তে আসা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত বীমা-আইনে আমি ইহার ছায়ামাত্রও দেখিতে পাইতেছিনা।

ভারতীয় বীমা-ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তি, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অ-ভারতীয়ও আছেন, তাহারা ভারতীয় বীমাব্যবসায়কে বিদেশীয় কোম্পানীর অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এক রিপোর্ট দিয়াছিলেন। কিন্তু আইন রচনা করিবার সময়, গবর্ণমেণ্ট সেদিকে মনোযোগ করেন নাই। ডিপজিটের টাকা রেজিষ্ট্রেশন প্রভৃতি সম্বন্ধে আইন কানুন, বেশ ভাল কথা, কিন্তু তাহাতে বড় বড়

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের "রঞ্জনী" নামক প্রাসাদে টি-পার্টি

কোম্পানীর কিছু যায়-আসে না। বাস্তবিক যাহা আসল সমস্যা, প্রস্তাবিত আইন তাহার ধার দিয়াও ঘেঁসে নাই।

ডিপজিট সম্বন্ধে ভারতীয় কোম্পানীর অসুবিধা চিরকালই থাকিবে। যে সকল বিদেশী কোম্পানী ভারতে বীমার কারবার করে, তাহাদের সম্পত্তির পরিমাণ এত বেশী দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা খুব মোটা রকমের ডিপজিট,—যত বেশীই হউক না কেন,—দিতে অসমর্থ হইবে না। আমার মনে হয়, সর্ব্ব-নিম্ন ডিপজিটের পরিমাণ একটা ঠিক রাখিয়া কোম্পানীর মোট সম্পত্তির শতকরা কিয়দংশ ডিপজিট দিবার আইন করা উচিত। কোন কোন বিদেশী কোম্পানী ভারতে খুব

অল্প পরিমাণ বীমার কারবারই করেন,—কিন্তু তাঁহারা বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে ঢাকঢোল পিটাইয়া জাহির করেন যে, তাঁহাদের সম্পত্তির পরিমাণ কোটীকোটী টাকা। জনসাধারণ তাহাতে ভুলিয়া যায়। কিন্তু ডিপজিট সম্বন্ধে এই রকম আইন করিলে ঐ সকল কোম্পানীর চালাকীটা ধরা পড়িয়া যায়।

প্রস্তাবিত আইনের মধ্যে "রেসিপ্রোসিটী" (Reciprocity) বা "পারস্পরিক সম-ব্যবহার" বিষয়ে একটা নিয়ম খাড়া করা হইয়াছে। থিয়েটার যাত্রাগণের শেষে যেমন চুটকী প্রহসন অথবা সং অভিনয় হয়,—এই 'রেসিপ্রোসিটী' আমার মতে সেই রকমের একটা সং। রাক্ষসের সহিত বামনের রেসিপ্রোসিটীর কথা শুনিলে বাস্তবিকই হাসি পায়। ভারতীয় কোম্পানী সুযোগ সুবিধা পাইলেও বিদেশে খুব বড় রকমের বীমার কারবার করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং অ-ভারতীয় কোম্পানীদের পক্ষে ভারতে সর্ব্ববিধ সুযোগ ভোগ করিবার কোন বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

১৯২৩ সালের ভূমিকম্পের পর জাপান গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়াছিলেন, আর কোন নূতন ইনসুরান্স কোম্পানী গঠিত হইতে পারিবেনা এবং কোন বিদেশী বীমা-কোম্পানী জাপানে কারবার করিতে পারিবেনা। এই আইনের ফলে অল্পকালের মধ্যে জাপান সেই সর্ব্বনাশী ভূমিকম্পের ফল এড়াইয়া ধনসম্পদে পৃথিবীর সভ্যজাতিদের মধ্যে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে। আমি ভারত গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ আইন করিতেই অনুরোধ করি। এখন কংগ্রেসদল ব্যবস্থাপক সভায় ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন; আশা করি, তাঁহারা এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন। বীমা কোম্পানীর সংখ্যা বিশেষতঃ জীবন-বীমার কারবার অনেক হইয়াছে। এখন কিছুকাল নূতন কোম্পানীগঠন আইনের দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। আমি আর একটু অগ্রসর

"ভারতের" কেন্দ্রীয় বোর্ডের ডিরেক্টর মিঃ ডি পি খৈতান গ্র্যাণ্ড হোটেলে ডিনার দিয়াছিলেন।

হইয়া বলিতে চাই, ভারতীয় জনসাধারণ যদি ভারতীয় কোম্পানীতে বীমা না করে, তবে তাহা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইক।

ইতিপূর্ব্বে আমি বলিয়াছি, ভারতে বীমা কোম্পানীর সংখ্যা খুব বেশী হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমাদের উচিত, একটু সাবধান হওয়া, আর যেন না বাড়ে। জাপান যেমন করিয়াছিল, আমাদেরও সেই রকম করা উচিত। কতকগুলি ছোটখাট কোম্পানী যদি পরস্পর মিলিত হয়,

তবে তাহাদের শক্তি ও আর্থিক অবস্থা অধিকতর সুদৃঢ় হইতে পারে। জনসাধারণ তাহাদের সারাজীবনের কষ্টার্জ্জিত অর্থ বীমাকোম্পানীর হাতে তুলিয়া দেয়। সুতরাং বীমাকোম্পানীর দায়িত্ব যে কি গুরুতর এবং কর্ত্তব্য যে কি পবিত্র ও মহান্ তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সেইজন্য আমি এই মিলিত হওয়ার প্রস্তাবটী করিতেছি। কেবল বিদেশী কোম্পানীর দোষ দেখাইলে চলিবে না,—আমাদের নিজেরও শক্তি সঞ্চয় করা চাই,—যাহাতে অন্যে আমাদের দোষ ধরিতে না পারে।

লাইট অব এশিয়া ইনস্যুর্যান্স কোম্পানী

১৯১২ সালে ভারতীয় বীমা আইন পাশ হওয়ার পর বৎসরই স্বদেশী যুগের রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক লাইট্ অব এশিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা সাধারণ লিমিটেড কোম্পানীর মত দশ বিশ টাকার কুড়ানো সেয়ারের দ্বারা গঠিত হয় নাই। ইহার কয়েকজন ডিরেক্টর নিজেদের মধ্য হইতেই ইহার সমস্ত মূলধন সংগ্রহ করেন এবং গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী দিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। সুতরাং তাঁহারা কোম্পানীটাকে যক্ষের ধনের ন্যায় বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। লাইট্ অব্ এশিয়ার ডিরেক্টর বোর্ডে এমন সব লোক রহিয়াছেন, যাঁহাদের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। সকল লোকেই তাঁহাদের সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা এবং বিবেক-বুদ্ধি পরিচালিত ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসা করে।

লাইট অব এশিয়ার ডিরেক্টর বোর্ড কিরূপ লোক লইয়া গঠিত তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। প্রথিতনামা সলিসিটর মিঃ ডি এন মিত্র এযাবৎ ইহার একজন ডিরেক্টর ছিলেন। সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অতি উচ্চ বেতনে সলিসিটার জেনারেল পদে নিয়োগ করিয়াছেন। এযাবৎকাল কখনও কোনও ভারতীয় সলিসিটরকে এই দায়ীত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয় নাই। মিঃ মিত্রকে সর্ব্বপ্রথম সলিসিটর জেনারেল নিয়োগ করায় তিনি যে কিরূপ সম্মানিত ব্যক্তি তাহাই সূচিত হইতেছে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে তিনি দিল্লী যাইয়া এই বিশেষ সম্মানিত পদে যোগদান করিয়াছেন।

এই কোম্পানীর তিনটী প্রধান বিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(১) ইহারকোন ম্যানেজিং এজেন্সী নাই।

(২) ইহার কোন ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাই।

(৩) কোম্পানীর সৃষ্টি অবধি এযাবৎ কোন ডিরেক্টর কোন ফি গ্রহণ করেন নাই।

সুতরাং দেখা যায়, নূতন প্রস্তাবিত আইনে ম্যানেজিং এজেন্সী সম্বন্ধে যে সকল বিধি ব্যবস্থা হইয়াছে,—এবং যাহা লইয়া চারিদিকে খুব হৈ-চৈ উঠিয়াছে,— লাইট অব এশিয়াকে তাহা কিছুমাত্র স্পর্শ করিতেছে না।

কোম্পানীর পরিচালনা নূতন ভাবে আরম্ভ হইবার পর আমরা ইহার ক্রমোন্নতি দেখিয়া আসিতেছি। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে, কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিল

এবং সিকিউরিটীর পরিমাণ ক্রমশঃ কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে,—

বৎসর	জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ (টাকা)	গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর মূল্য (টাকা)
১৯৩৩	৪১১১৬	১০৪৫০০
১৯৩৪	৬৮৭৮৯	১০৭০০০
১৯৩৫	৮৩৫৯৫	১১১০০০
১৯৩৬	৯২১৩৬	১৩২০০০

একদিকে যেমন কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিল ও সিকিউরিটীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে অন্যদিকে তেমনি খরচের অনুপাত কমিয়া আসিতেছে। কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় হইবার ইহা একটী প্রধান কারণ।

লাইট্‌-অব-এশিয়া পলিসি হোল্ডারদের দাবীর টাকা অতি শীঘ্র এবং বিনা ঝঞ্ঝাটে প্রদান করিয়া থাকেন। কোম্পানী পুরাতন বলিয়া ইহাকে খুব মোটা রকমের দাবী মিটাইতে হয়। কিন্তু মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ বেশী নহে। কারণ, জীবন নির্ব্বাচনে কোম্পানী বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোম্পানীর বয়স ২৪ বৎসর হইয়া গিয়াছে; সুতরাং মেয়াদী বীমার দাবী ক্রমাগতই মিটাইতে হয়। সাধারণ লোকে দাবীর টাকার পরিমাণ বেশী দেখিলেই চমকিয়া উঠে। কিন্তু তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, মৃত্যু না ঘটিলেও মেয়াদী বীমার দাবী ত পুরাতন কোম্পানীমাত্রকেই প্রতি বৎসর নিশ্চয়ই দিতে হইবে! সুতরাং পুরাতন কোম্পানীর ঘাড়ে এই বোঝা সর্ব্বদাই চাপিয়া আছে।

যাহারা খুব মোটা রকমের কোটী কোটী টাকার করবার করেন সেই কোম্পানীই যে আর্থিক নিরাপত্তার দিক দিয়া ভাল ও সুরক্ষিত এবং ছোট কোম্পানী হইলেই যে তাহা মন্দ বীমা ব্যবসায়ে এমন কোন কথা নাই। সাধারণ লোকে এই কথাটী না বুঝিয়া অনেক সময়ে

লাইট অব এশিয়ার ডিরেক্টর বর্ত্তমানে ভারত গবর্ণমেণ্টের সলিসিটর জেনারেল মিঃ ডি, এন, মিত্র

ভুল করিয়া থাকে। কোম্পানীর ভালমন্দ, বলাবল বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে, তাহার পলিসি হোল্ডারদের দাবী মিটাইবার উপযুক্ত জীবন বীমা তহবিল আছে কিনা, কাজ সংগ্রহের পরিমাণানুযায়ী খরচের অনুপাত কিরূপ, কি রকম সিকিউরিটীতে টাকা খাটান হইতেছে, Selection of life কিরকম ইত্যাদি অনেক কথা আছে। সুতরাং এই হিসাবে একটা ছোট কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা এত সুদৃঢ় হইতে পারে যে, কোন প্রকার আপদ বিপদে তাহাকে টলাইতে পারে না। আবার একটা বড় কোম্পানীর অবস্থা এত দুর্ব্বল হইতে পারে যে, সব সময়েই তাহাকে শঙ্কিত থাকিতে হয়। এই ভাবে বিচার করিয়া আমরা দেখিতেছি লাইট অব এশিয়ার আর্থিক অবস্থা এমন সুদৃঢ় হইয়াছে যে, উহাকে আর কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিবে না।

কোম্পানীর পরিচালন কার্য্যভার পড়িয়াছে, পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সমরেশ চক্রবর্ত্তীর উপর। শিক্ষায়, দীক্ষায়, আলাপ-ব্যবহারে, ব্যবসায় বুদ্ধিতে, সৌজন্যে তিনি সকলের প্রীতি ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার যৌবনের প্রথম উদ্যম, রাজা সুবোধ চন্দ্রের রোপিত বৃক্ষকে ফুলেফলে সুশোভিত করিয়া তুলিবে এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট আশা ও আস্থা আছে। যাঁহারা দেশের মধ্যে বিবিধ কর্ম্মক্ষেত্রে গণ্যমান্য ও যশস্বী হইয়াছেন, দেশের লোকে যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি লাইট্-অব-এসিয়া সম্বন্ধে কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা মুদ্রিত করিলাম।

লাইট অফ্ এশিয়ার সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ দেশনায়কগণের অভিমত

"লাইট্ অফ্ এশিয়া ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেড্" স্বদেশী যুগের দানবীর সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিকের পরিকল্পিত দেশ ও দশের সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম নিদর্শন। রাজা সুবোধ চন্দ্র যেমন একদিকে বাঙ্গালীর শিক্ষাবিস্তারের জন্য অর্থ দান করিয়া 'কলেজ অফ্ ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড্ টেক্নলজি, যাদবপুর' এর ভিত্তি স্থাপন করিয়া বাঙ্গলায় কারুশিল্প গঠন প্রচেষ্টার পুরোবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তেমনি অপর দিকে ১৯১৩ সালে উক্ত ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর পত্তন করিয়া তিনি বঙ্গবাসী জনসাধারণের ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও সঞ্চয়-প্রবৃত্তিকেও জাগাইবার সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।
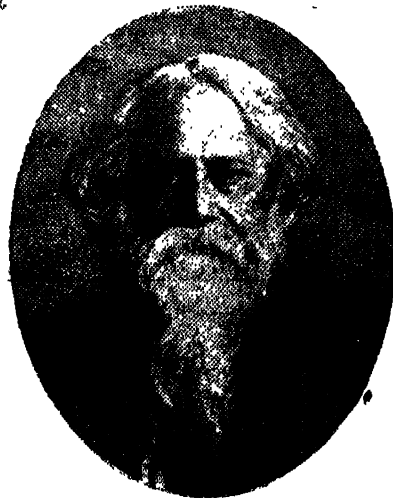
তেইশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা তাঁহার স্বপ্নের বিষয় ছিল, আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, বাঙ্গালী মাত্রেই এখন বুঝে যে, অদৃষ্টের উৎপীড়ন বীমার দ্বারা সহজেই নিবারিত হইতে পারে। সুতরাং রাজা সুবোধচন্দ্রের স্বকীয় প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি; আমাদের আশা এই যে, এই কোম্পানীতে জীবনবীমা করিয়া এবং কোম্পানীর জীবনবীমা কার্য্যের সহায় হইয়া বাঙ্গালী সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার স্মৃতিতর্পণ করিবে।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, লাইট্ অফ্ এশিয়ার ডিরেক্টরগণ সুবোধচন্দ্রের পদানুসরণে উক্ত কোম্পানীর পরিচালনা বিনা পারিশ্রমিকে করিয়া আসিতেছেন। কোম্পানীর কোনো ম্যানেজিং এজেণ্ট নাই, এমন-কি উহাতে শেয়ারহোলডারদের স্বার্থও গৌণ, উহার প্রধান চেষ্টা বীমাকারীদিগের সেবা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎচন্দ্র বসু
নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র

যোগীন্দ্রনাথ রায়
(মহারাজা, নাটোর)
সুন্দরীমোহন দাস
প্রভৃতি।

কার্য্য বিস্তৃতির জন্য লাইট অফ্ এশিয়ার আফিস সম্প্রতি ষ্টিফেন হাউস হইতে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউয়েতে ষ্টেট্স্ ম্যান আপিশের পাশেই স্থানান্তরিত হইতেছে। চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউর এই অংশ বীমা-কোম্পানীসমূহের মহল্লায় সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। ভারত, হিন্দুস্থান, হিমালয়, ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া, হিন্দুমিউচুয়াল প্রভৃতি নামী বীমা কোম্পানীসমূহ এইখানে আপন আপন প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করায় বীমাবাজো এই স্থানের কদর খুব বাড়িয়া গিয়াছে। লাইট অফ্ এশিয়া এইখানে স্থানান্তরিত হওয়ায় কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ব্যবসাবুদ্ধির তারিফ করিতে হয়। এই গৃহপরিবর্ত্তন কোম্পানীর শুভসূচনা করুক ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ব্যবসা ও বাণিজ্যের বীমা বার্ষিকী সঙ্কলন কালে অকস্মাৎ পারিবারিক দুর্ঘটনা বশতঃ আমি প্রায় এক মাস কাল আপিসের কার্য্যাদি কিছুই দেখিতে পারি নাই। সেই সময় বীমা বার্ষিকীর Statistics আদি মুদ্রিত হইতেছিল। মুদ্রাকরের অসাবধানতা বশতঃ মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ভ্যালুয়েশনের ফলাফল ঘোষণা সম্বন্ধে ৫৩ হাজার টাকা সারপ্লাসের ঘরে না দেখাইয়া ঘাটতির ঘরে দেখান হইয়াছে। মেট্রোপলিটান কোম্পানীর বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী প্রবন্ধে ভ্যালুয়েশান সম্বন্ধে সব কথাই সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে কেবল

(১) ৫৩ হাজার টাকা বাড়তির ঘরে না বসাইয়া ঘাটতির ঘরে বসিয়াছে।

(২) আজীবন বীমায় ১৫৲ টাকা বোনাস্ ঘোষণার পরিবর্ত্তে ৫৲ টাকা লেখা হইয়াছে এবং

(৩) ভ্যালুয়েশনের ফলাফল প্রবন্ধে মেট্রোপলিটানের ৩৫ সালের গায়ে যে তারকা চিহ্ন দেওয়া আছে উহার ব্যাখ্যা ফুট নোটে দেওয়া হয় নাই। উহার ব্যাখ্যা হইবে—

"১৯৩৫ সালের ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত মাত্র তিন মাসে কোম্পানীর যে কাজ হইয়াছে তাহাই দেখানো হইয়াছে।"

এতাধিক পরিমাণ অঙ্ক সম্বলিত বিরাট পুস্তকে ভুল থাকা অবশ্যম্ভাবী—একথা আমরা পুস্তকের নানা স্থানে প্রকাশ করিয়াছি। তথাপি মেট্রোপলিটানের ন্যায় বিশ্রুত-কীর্ত্তি কোম্পানীর সম্বন্ধে এরূপ মারাত্মক ভুল প্রকাশিত হইবার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত এবং লজ্জিত হইয়াছি।

সম্পাদক

বীমা রাজ্যের সংবাদ

গত ২৫শে জানুয়ারী কলিকাতা চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউতে ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়ার প্রাসাদ-সম বিরাট ভবনে তাহার নূতন কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করেন। ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান মিঃ চিদাম্বরম্ চেট্টিয়ার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "৩০ বৎসর পূর্ব্বে ৫০০০ টাকারও কম মূলধন লইয়া 'ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়ার পত্তন হয়। আজ তাহার মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৫ লক্ষ টাকার বেশী এবং বার্ষিক আয় হইতেছে ২০ লক্ষ টাকার উপর। বাংলাদেশে ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়ার দশবৎসরও হয় নাই কারবার আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যেই বাংলা দেশে ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়ার হাজার হাজার পলিসি হোল্ডার হইয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আজ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতের বাহিরে এই বিরাট প্রাসাদের মত গৃহ-সম্পত্তির অধিকারী হইতে-পারেন নাই।" মহারাজা ঠাকুর বলেন, "ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়ার যশঃগৌরব নিষ্কলঙ্ক, ইহার বৃহৎ রিজার্ভ ও ট্রাষ্ট্ ফাণ্ড্ ইহার চিরস্থায়িত্বের সূচনা করিতেছে।"

-০-

মাদ্রাজে "মোটর ইন্সুর‍্যান্স্ কমিটীর" নিকট সাক্ষ্য প্রদানকালে সাউথ ইণ্ডিয়ান্ চেম্বার অব্ কমার্সের প্রতিনিধিগণ বলিয়াছেন, প্রাইভেট্ ও সরকারী (পাবলিক) সকল রকম মোটর গাড়ীরই বাধ্যতামূলক বীমা হওয়া দরকার। পাব্লিক বা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট মোটর গাড়ীর বীমাতে তৃতীয়পক্ষ ও আরোহী এই উভয়ের,—এবং প্রাইভেট মোটর গাড়ীর বীমাতে কেবলমাত্র তৃতীয় পক্ষের বিপদের প্রতিকার ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট যে সকল মোটর গাড়ী দেশীয় রাজ্যে বীমা করা আছে, ঐ সকল গাড়ীকে সেই পরিমাণে ব্রিটিশ ভারতেও বীমা করিতে হইবে। তাহা না করিলে, কিম্বা দেশীয় রাজ্য ক্ষতি-পূরণের জামিন না হইলে ঐ সকল মোটর গাড়ীকে বৃটিশ ভারতে চলিতে দেওয়া উচিত নহে। মাদ্রাজ ট্রেড্ অ্যাসোসিয়েশনও বাধ্যতা মূলক মোটর গাড়ী বীমার পক্ষে মত দিয়াছেন। তৃতীয় পক্ষের বিপদের দায়িত্ব যথাসম্ভব কমাইবার জন্য অ্যাসোসিয়েশন মন্তব্য করেন যে, গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা এবং যাহাতে ভিড় না জমে তজ্জন্য প্রশস্ত ফুটপাথ তৈয়ারী করা আবশ্যক। বাধ্যতামূলক বীমার আইন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত।

—০— -

১৯৩২ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মাদুরা সহরে "মাদার ইণ্ডিয়া ইন্সুর‍্যান্স

কোম্পানী" একটা প্রভিডেন্ট্ সোসাইটীরূপে কার্য্য আরম্ভ করে। ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ঐ কোম্পানী পুরাদস্তুর বড় রকমের জীবন বীমা কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে। বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ইহার ডিরেক্টার বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন। এই নূতন কারবারের আমরা কোম্পানীর উন্নতি কামনা করি।

"ইউনিভারস্যাল প্রটেক্টিব ইন্সিওরেন্স কোম্পানী নামে একটি নূতন বীমার কারবার সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কর্পূরতলার মহারাজা, স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজা, পঞ্চকুটের মহারাজা ইঁহারা এই কোম্পানীর পেট্রন বা পিতৃ-স্থানীয় এবং বিখ্যাত ব্যবসায়ী মেসার্স লাধা সিং বেদী এণ্ড্ সন্স এই কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ইহার ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন,—মিঃ দুর্গাপ্রসাদ খৈতান (কলিকাতা), কুমার অজিত প্রসাদ সিংহ রাও (কাশীপুর রাজ, মানভূম) কুমার কমলা রঞ্জন রায় (জমিদার, কাশিম বাজার) শেঠ লক্ষ্মণপ্রসাদ পোদ্দার (ব্যবসায়ী, কলিকাতা) ডাঃ মথুরা দাস (লাহোর)। বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুপরিচিত মিঃ এস্ এল রায় এই কোম্পানীর ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত ১২ই জানুয়ারী (১৯৩৭) কলিকাতার (গলষ্টন্ পার্ক,—দাবাই প্যালেস্) সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার রজত জুবলী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বাংলার গবর্ণর মহোদয় তাহাতে পৌরহিত্য করেন। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ ডি পি খৈতান এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্যার সোরাবজী পোচ্কান ওয়ালা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন। অতঃপর জলযোগ সন্ধ্যা রাত্রিতে সুদৃশ্য বাজী পোড়ান হইয়া গেলে উৎসব সমাপ্ত হয়।

ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এলাহাবাদের চীফ এজেন্সী পুরঃ দস্তুর ব্রাঞ্চ আফিসে উন্নীত হইয়াছে। মিঃ এস এন দাস গুপ্ত ইহার ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

মিঃ সত্যব্রত সান্ন্যাল বি এ, হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর দিল্লী ব্রাঞ্চে যোগদান করিয়াছেন। সম্প্রতি আলীগড়ে তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের এড্ভোকেট্ এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মিঃ বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ বি এল, "ওয়েল্থ্ অব্ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর হইয়াছেন।

দিল্লীতে "তিলক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী" নামে একটী নূতন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্সের দিল্লী ব্রাঞ্চের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মিঃ তনসুকরাজ জৈন এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব এজেন্সী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

মিঃ এইচ্ সি ঘোষ সম্প্রতি হিমালয় এসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী মোট ১৭৪৭০০০০ টাকার নূতন বীমার কারবার করিয়াছেন।

গত বৎসর (১৯৩৬) ওরিয়েণ্টাল ১০২৬৯৫৪৯৬ টাকা মূল্যের ৫৬৩১১টী পলিসি ইস্যু করিয়াছেন। তার পূর্ব্ব বৎসর (১৯৩৫) ৮৮৯৮৯১৪৯ টাকা মূল্যের ৪৮৮৫৮টী পলিসি ইস্যু করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যায়, কোম্পানীর কারবার প্রায় দেড় কোটী টাকা বাড়িয়াছে।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ্ ইনসুর‍্যান্স সোসাইটীর রেঙ্গুন সাব অফিসের ঠিকানা গত ১লা এপ্রিল হইতে হইয়াছে, হিন্দুস্থান লাইফ অফিস, দরবার বিল্ডিং, ১১৮ ফেয়ার ষ্ট্রীট্ রেঙ্গুন —Hindusthan Life office, Durbar Building 118, Phare Street, Rangoon.

গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারী জামসেদপুরে ইণ্ডিয়া ইনসুর‍্যান্স কোম্পানীর নূতন ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে। বিহার-উড়িষা গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মিঃ ডি সি গুপ্ত উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। কোম্পানীর স্থানীয় প্রতিনিধি মিঃ এস সেন গুপ্তের উপরে এই নূতন ব্রাঞ্চ আফিসের কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছে।

অন্ধ্র ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর পক্ষে বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও আসামের চীফ্ এজেণ্ট ছিলেন মেসার্স রায় এণ্ড কোং। সম্প্রতি উক্ত মেসার্স রায় এণ্ড কোং ঐ চীফ এজেন্সীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মিঃ এম্ কে শ্রীনিবাসম্ ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। এখন আর উক্ত কোম্পানীর সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।

ভারত ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব য়্যাকচুয়ারী মিঃ এন্ এস্ মুথুস্বামী আয়ার এম্ এ, বি এল, এ আই এ সম্প্রতি হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সুর‍্যান্স সোসাইটীর হেড আফিসে যোগদান করিয়াছেন।

মিঃ প্রবোধ চন্দ্র গুহ ডমীনিয়ান্ ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইয়াছেন। ঢাকাতে ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানীর যে, নূতন ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে, মিঃ এস্ এল সাহা তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতায় হ্যাপি ইণ্ডিয়া ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানী নামে একটী নূতন বীমার কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার জেনারেল ম্যানেজার হইয়াছেন মিঃ এন্ কে গোভিলা, এবং সেক্রেটারী হইয়াছেন মিঃ এন্ কে চাটার্জ্জি। মাদ্রাজে ভ্যান্‌গার্ড্ ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানী নামে আর একটী নূতন বীমার কারবার খোলা হইয়াছে।

মিঃ এ রাজগোপালম্ বি এ, এ আই এ গবর্ণমেণ্টের য়্যাসিষ্টাণ্ট্ য়্যাকচুয়ারীর পদে বহাল হইয়াছেন।

১৯২৮ সালের ২৮শে জুন তারিখে বোম্বাইয়ের জেঠালাল লালুভাই প্যাটেল নামক এক ব্যক্তি নরউইচ্ ইউনিয়ান লাইফ য়্যাসিওর‍্যান্স কোম্পানীতে ৫০০০ টাকার জন্য তাহার জীবন বীমার প্রস্তাব করেন। ঐ বৎসর (১৯২৮) ৭ই আগষ্ট তারিখে তিনি প্রিমিয়াম দেন এবং ৪০ দিন পরেই অর্থাৎ ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯২৮) তিনি মারা যান। কোম্পানী পলিসি ইস্যু করেন, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮। ঐ পলিসির দরুণ ৫০০০ টাকার দাবী করিয়া মৃত ব্যক্তির পুত্র ত্রিভুনদাস জেঠালাল প্যাটেল বোম্বাই হাইকোর্টে নালিশ করেন। বিবাদী নরউইচ্ ইউনিয়নের পক্ষ হইতে বলা হয়, বীমাকারীকে অথবা তাহার এক্‌জিকিউটার, য়্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর কিম্বা য়্যাসাইনীকেই টাকা দিবার কথা পলিসিতে আছে, অন্য কাহাকেও নহে। বিশেষতঃ মৃত বীমাকারী বীমার প্রস্তাব করিবার সময় তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। এই কারণে বাদীর দাবী অগ্রাহ্য হয় এবং মামলা খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইয়া যায়।

●

রাওলপিণ্ডির একটী বড় কাপড়ের দোকান লণ্ডনের "লয়েড্ ফায়ার ইন্‌সুর‍্যান্স" কোম্পানীতে ৫০০০ টাকায় বীমা করা ছিল। আগুন লাগিয়া দোকান পুড়িয়া যাওয়ায় মালিকগণ বীমা কোম্পানীর নিকট টাকার দাবী করে। কিন্তু কোম্পানীর পক্ষ হইতে তদন্তে প্রকাশ পায় যে, মালিকেরা নিজেই দোকানে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। সুতরাং কোম্পানী টাকা দিতে অস্বীকৃত হয়। উপরন্তু প্রতারণার অভিযোগে দোকানের চারিজন মালিক অভিযুক্ত হইয়া রাওলপিণ্ডির ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে (তিন জন চারি বৎসর করিয়া এবং একজন পাঁচ বৎসর) সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিয়াছে। এই শাস্তির বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে আপীল দায়ের হইয়াছে।

●

বম্বে মিউচুয়াল লাইফ্ য়্যাসুর‍্যান্স্ সোসাইটীর ক্লেইম্ ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বসু যশোহরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী এম্ এ মুতালিবের এজ্‌লাসে গদখালী ইউনিয়ান্ বোর্ডের সদস্য সেখ সিদ্দিক হোসেন, মাত্‌লিয়া নিবাসী ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সেক মোবারকের বিধবা পত্নী বিবি চাবুরেন্নেসার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১০।১২০ খ ধারা অনুসারে এক মামলা দায়ের করেন। বিচারে বিবি

চারুবেন্নেসা খালাস পায়। অন্য দুইজন আসামী দায়রায় সোপর্দ হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী সেখ সিদ্দিক ও ডাঃ ঘোষ যথাক্রমে উক্ত কোম্পানীর এজেণ্ট ও ডাক্তার ছিলেন। মৃত সেখ মোবারক উক্ত এজেণ্টের মারফত ঐ কোম্পানীতে ২,০০০্ টাকার একটি জীবন বীমা করে। ডাঃ ঘোষ মোবারকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোম্পানীকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে বীমাকারীর বয়স, স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাবপত্রে মিথ্যা বিবরণ দিয়াছেন। বীমাকারীর মৃত্যুর পর তৃতীয় আসামী মিথ্যা দাবী উপস্থিত করে। কারণ, বীমাকারীর মৃত্যু সময়ে বীমাপত্র বাতিল হইয়াছিল। অভিযোগে আরও প্রকাশ, প্রিমিয়ামের টাকা দেওয়ার জন্য কোম্পানী অনুগ্রহ করিয়া সময় দেন, সেই সময়ের মধ্যে মৃত্যুর তারিখ ফেলার জন্য ইউনিয়ান বোর্ডের মৃত্যু রেজিষ্টারে মৃত্যু তারিখ বদল করা হইয়াছে।

ম্যানুফ্যাক্চারার্স লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে ১৮ হাজার টাকার দাবীতে শ্রীমতী হরিদাসী দেবী যে মামলা করিয়াছিলেন, (গত কার্ত্তিক মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকায় প্রকাশিত) বিচারপতি মিঃ জাষ্টিস্ লর্ট উইলিয়ম সেই সম্পর্কে একটী বিশেষ আইনী তর্কের মীমাংসা করিয়াছেন। শ্রীমতী হরিদাসী দেবীর স্বামী কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ম্যানুফ্যাক্চারার্স লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে ১৮ হাজার টাকার পলিসি লইয়া জীবনবীমা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নী হরিদাসী দেবী উক্ত পলিসির টাকার জন্য কোম্পানীর নামে নালিশ করিতে বাধ্য হন। কোম্পানীর তরফ হইতে প্রথমতঃ বলা হয় যে, বীমাকারী সত্যভাবে সকল কথা প্রকাশ করে নাই। শেষে পুনরায় কোম্পানী স্বীয় লিখিত উক্তি এমন ভাবে পরিবর্ত্তন করেন, যাহাতে বীমাকারীকে প্রতারণার দায়ে ফেলিতে পারেন। বিচারপতি তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। কোম্পানীর পক্ষ হইতে আবার এক আপত্তি তোলা হইল এই যে, উক্ত পলিসি বিবাহিতা নারীর সম্পত্তি বিষয়ক আইনের ৬ ধারা অনুসারে ইস্যু করা হয়। সুতরাং অফিসীয়াল ট্রাষ্টীকে বাদী ভুক্ত না করাতে মামলা চলিতে পারে না। তদনুসারে শ্রীমতী হরিদাসী দেবী হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন যে, তাঁহার জামাতা শ্রীবটুকেশ্বর চন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে স্পেশ্যাল ট্রাষ্টী নিযুক্ত করা হউক। বিচারপতি মিঃ জাষ্টিস প্যাংক্রিজ এই দরখাস্ত মঞ্জুর করেন এবং তাহার আদেশ মতে বটুকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ট্রাষ্টী নিযুক্ত হন। কিন্তু কোম্পানী তদুত্তরে বলেন, ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিবার কোন ক্ষমতা হাইকোর্টের নাই। অফিসীয়াল ট্রাষ্টী না হইলে চলিবে না। হরিদাসী দেবী তদনুসারে অফিসীয়াল ট্রাষ্টীর নিকট আবেদন করেন। কিন্তু তিনি বলেন, "আমার দশ হাজার টাকা খরচার উপযুক্ত জামিন না পাইলে আমি ট্রাষ্টী হইতে পারি না।" এমতাবস্থায় শ্রীমতী হরিদাসী দেবী হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ জষ্টীস লর্ট উইলিয়ম্‌সের যাঁহার এজলাসে মামলা চলিতেছিল। স্মরণাপন্ন হন। বিচারপতি সম্প্রতি তাঁহার রায় প্রকাশ করিয়াছেন এই,—

বিবাহিতা নারীর সম্পত্তি বিষয়ক আইনের ৬ষ্ঠ ধারা এবং অফিসীয়াল ট্রাষ্টীজ্ আইনের ৭ম ধারার মধ্যে পরস্পর বিরোধী মত দেখা যায়। বাস্তবিক আইনে যে ট্রাষ্টীর কথা বলা হইয়াছে, হাইকোর্টের আদেশে সেই ট্রাষ্টী নিযুক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং অফিসীয়াল ট্রাষ্টী নিয়োগ অথবা তাঁহাকে বাদীভুক্ত করার কোন আবশ্যকতা নাই। মামলা এখন রীতিমত চলিতে পারে।

এই রায় অনুসারে গত ৪ঠা জানুয়ারী মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। অবশেষে মামলার শেষ বিচারে কোম্পানীর বিরুদ্ধে খরচা সহ সম্পূর্ণ দাবীর টাকা ডিক্রী হইয়াছে। বিচারপতি তাঁহার রায়ে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইনসিওরেন্স কোম্পানীসমূহ সুবিধা পাইলে নানা একটা অজুহাতে অনেক সময় বীমাকারীদের দাবীর টাকা এড়াইবার চেষ্টা করেন। জনসাধারণের সাবধান হওয়া উচিত। তাহারা যেন লোভে পড়িয়া পরের হাতে সর্ব্বস্ব তুলিয়া না দেয়। এই মামলাতে যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এমন কিছুতেই বুঝায় না যে, বীমাকারী কোম্পানীকে ঠকাইবার জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সত্য বিবরণ গোপন করিয়াছে। কোম্পানীর তরফের স্বাস্থ্য পরীক্ষক ডাক্তার বীমার প্রস্তাব লইবার সময় বীমাকারীকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় নাই কোম্পানী তাহারই সুযোগ লইয়া মামলায় দাঁড়াইলেন। সুতরাং তাহাতে প্রতারণা প্রমাণিত হয় না।

"কোন বীমা কোম্পানী লিকুইডেশনে গেলে বীমাকারী বা তাহাদের পলিসির দাবীর টাকা অন্যান্য পাওনাদারের আগে পাইতে পারে না,"—বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ জাষ্টিস্ কানিয়া একটী মামলাতে উক্ত প্রকার রায় দিয়াছেন। পেনিনসুলার লাইফ্ য়্যাসুরান্স কোম্পানী লিকুইডেশনে গেলে, পিয়ার মহম্মদ নামক উহার একজন পলিসি হোল্ডার দাবীর টাকা পাইবার দরখাস্ত করে। কোম্পানীর অন্যান্য পাওনাদারগণ তাহাতে আপত্তি জানায়। ভারতীয় জীবন বীমা সম্বন্ধীয় আইনের ৪থ ও ৬ষ্ঠ ধারা আলোচনা করিয়া বিচারপতি মন্তব্য করেন, বীমা কোম্পানী সমূহ যে টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট ডিপজিট্ রাখেন, তাহাকে "লাইফ্ এ্যাসুরান্স্ ফণ্ড" বলিয়া গণ্য করা যায় উহা জীবনবীমার কারবারে নিয়োগ করা যাইবে, আইনে এরূপ নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু তাহাতে বীমাকারী অর্থাৎ পলিসি হোল্ডারগণকে এমন স্বত্ব দেয় নাই যাহাতে ঐ টাকা হইতে তাহাদের পলিসির দাবী টাকা সর্ব্বাগ্রে পাইবার কোন অধিকার আছে।

হাওড়া মোটর কোম্পানী

দৃঢ় সংকল্প, শ্রমশীলতা এবং সাধুভাব বলে মানুষ সর্ব্বকালেই দরিদ্র অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হয়। অনেকের বিশ্বাস, ইহা কেবল অতীত কালেই সম্ভব ছিল, এখন আর তাহা হয় না। রামদুলাল সরকার, বটকৃষ্ণ পাল, মতিলাল শীল, তারক প্রামানিক, রামবিহারী কড়ুরী, ইঁহারা সেকেলে লোক। ছোট কারবারী হইতে বড় ব্যবসায়ী হওয়া আজকাল কাহারও ভাগ্যে ঘটেনা, শক্তিতেও কুলায় না। এ প্রকার ধারণা ভুল। যাহা সত্য, তাহা চিরন্তন। বিধাতার আইন-কানুন বদলাইয়া যায় নাই। এখনও সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উদিত হয়, পশ্চিমে অস্ত যায়। এখনো ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়, সাধুতার পুরস্কার, শ্রমশীলতার সুফল, এবং সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়। এই সব যাইবে কোথায়?

আজ আমরা তার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত দিতেছি, হাওড়া মোটর কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ দে। তিনি দুঃখদারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিয়া সামান্য ২০ টাকা বেতনের কেরাণী হইতে কিরূপে এই বিরাট কারবারের মালিক হইলেন, তাঁহার রোমাঞ্চকর বিবরণ আমরা দুই বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। পাঠকগণ দেখিবেন তাহা নাটক নভেল অপেক্ষাও কিরূপ চিত্তাকর্ষক, এবং বুঝিবেন, Truth is Stranger than fiction,—সত্য ঘটনা কাল্পনিক গল্প হইতেও অধিকতর বিস্ময়জনক। ইহাও বুঝিতে পারিবেন,—এখনো ছোট কারবারী হইতে বড় ব্যবসায়ী হওয়া একেবারেই অসম্ভব নহে।

কলিকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর পূর্ব্ব কোণে নর্টন বিল্ডিংস্ নামক প্রকাণ্ড বাড়ীতে হাওড়া মোটর কোম্পানীর দোকান সকলেই দেখিয়াছেন। ইঁহাদের আফিসে এবং কারখানায় তিন চারিশত লোক কাজ করে। এই সকল কর্ম্মচারীদের জন্য কোম্পানীর তরফ হইতে যেমন নানাবিধ সুব্যবস্থা করা হইয়াছে, এমন অনেক স্থলেই সাধারণতঃ দেখা যায় না। সেখানে কর্ম্মচারীদের জন্য দৈনিক ভাল রকমের জল খাবারের ব্যবস্থা, ষ্টাফ্ বেনিফিট ফাণ্ড্, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড্ প্রভৃতি রহিয়াছে। তাহাতে মনিব এবং কর্ম্মচারীর মধ্যে "অহি-নকুল" সম্বন্ধ দূরীভূত হইয়া একটা সদ্ভাব এবং প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ক্যাপিট্যালিষ্ট্ ও লেবারের মধ্যে যে "দা কুমড়ো" সম্পর্ক,—যাহার ফলে নিত্য অসন্তোষ এবং অশান্তিতে কারবারের ক্ষতি হয়, এ-সব সেখানে কিছু নাই।

সম্প্রতি হাওড়া মোটর কোম্পানীর বৃহৎ কারবার লিমিটেড্ কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে বাহিরে কোনও শেয়ার বিক্রয় হয় নাই। নিজেদের মধ্যেই এই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী সীমাবদ্ধ। তদুপলক্ষে উহার কর্ম্মচারিগণ শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র

নাথ দে মহাশয়কে একখানি মানপত্র প্রদান করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায়, কি যাদু মন্ত্রবলে তিনি একটী ছোট কারবারকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন। একদিকে দৃঢ় সংকল্প ও শ্রমশীলতা, অন্যদিকে কর্ম্মচারীদের প্রতি অগাধ স্নেহ ও সহানুভূতি। এই প্রসঙ্গে উক্ত মানপত্র হইতে আমরা দুইটী পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—

"Far from being Capitalistic in your outlook, you have set before you the ideal of the patriarch of the Howrah Motor Co. and we are glad to say, Sir, that you have fully lived up to that ideal"

এই কথাতেই বুঝা যায়, অতীন্দ্রবাবু কিরূপে তাহার কর্ম্মচারীদের চিত্ত জয় করিয়াছেন।

আমরা হাওড়ামোটর কোম্পানীর এই উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি এবং আশা করি, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র নাথ দে মহাশয় যে উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ করিয়া কোম্পানী ব্যবসায় জগতে চিরদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র দে এবং ফণিভূষণ দে শুধু যে সেই আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিবেন, তাহা নহে, তাহাকে আরও বড় করিয়া তুলিবেন, ইহাই আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। আমাদের দেশের প্রচলিত প্রবাদ ;—

"সর্ব্বত্র জয়মিচ্ছেৎ, তু পুত্রাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্"

পিতা সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, কেবল পুত্রের নিকট পরাস্ত হইতেই চাহেন। অর্থাৎ পুত্র তাঁর চেয়েও বড় হউক পিতার প্রাণের আকাঙ্ক্ষাই এই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, পুত্রেরা পিতার পদাঙ্ক এবং জীবনের আদর্শ এমন ভাবে অনুসরণ করুন যাহাতে আমরা বন্ধুবান্ধবেরা বলিতে পারি তোমাদের জীবনের দ্বারা—

"কুলং পবিত্রং
জননী কৃতার্থা"।

পুস্তক সমালোচনা

সাবান প্রস্তুতের সহজ প্রণালী—

মূল্য আট আনা। ৮২।১ নং হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা (সংহতি কার্য্যালয়) হইতে প্রকাশিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া মলাটে ছাপা হইয়াছে। ৪৮ পৃষ্ঠার মধ্যে এই পুস্তক খানিতে সংক্ষেপে সাবান তৈয়ারীর বিবিধ প্রণালী লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা কুটীর-শিল্পের আকারে ছোট-খাট রকমের সাবান তৈয়ারীর কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পুস্তিকাখানি পড়িয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং অনেক সাহায্য পাইবেন। সাবান তৈয়ারীর উপাদান, ঐ সকল উপাদানের ব্যবহার প্রণালী, সাবানে সুগন্ধ, রং প্রভৃতির জন্য ভেজাল প্রয়োগ, বিনা উত্তাপে সাবান প্রস্তুত পদ্ধতি, সাবান প্রস্তুত করিবার নানাবিধ ফরমুলা, জ্বাল দেওয়া অথবা অর্দ্ধ জ্বাল দেওয়া সাবান তৈয়ারী, স্বচ্ছ সাবান ও জলে-ভাসা সাবান, এই সকল বিষয় এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। বেকার যুবকেরা নাটক, নবেল ও গল্পের পুস্তক না পড়িয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি যদি পাঠ করেন, তবে জীবিকা অর্জ্জনের উপায়ের একটা সন্ধান পাইবেন।

চিকিৎসা সহায়—

ডাঃ শ্রীসূর্য্যকান্ত দাস বি এ (হোমিওপ্যাথ) প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা। টাঙ্গাইল রাজকান্ত ফার্ম্মেসী হইতে ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দাস এম্ ডি, এইচ্ এম্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকখানি চিকিৎসক ও গৃহস্থ উভয়ের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয়। নূতন চিকিৎসা ব্যবসায়ীর পক্ষে রোগীর বিপজ্জনক অবস্থা পূর্ব্ব হইতে পরিষ্কার রূপে বুঝা কঠিন। এই পুস্তকে বিবিধ রোগের খুব খারাপ লক্ষণগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং নব্য চিকিৎসকগণ প্রথম হইতেই সাবধান হইতে পারেন। জিহ্বা, চক্ষু, নাড়ী, শ্বাস প্রশ্বাস, মলমূত্র, দেহের তাপ, প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা কিরূপে রোগের অবস্থা নির্ণয় করা যায়, তাহা বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। লেখা-

পড়া জানা সাধারণ লোকেও তাহা বুঝিতে এবং তদনুযায়ী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। এই পুস্তকের এক পরিচ্ছেদে আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ সকল বর্ণিত হইয়াছে। খাদ্য পরিচয়, পথ্য বিচার, ভিটামিন তত্ত্ব, আনুষঙ্গিক চিকিৎসা, রোগী শুশ্রূষা, দৈবদুর্ঘটনার প্রতিকার প্রভৃতি নানা বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। জলবায়ু ও মাটীর সাহায্যে চিকিৎসার কথাও গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মাটীর সাহায্যে চিকিৎসার বিষয়ে সাধারণ লোককে সাবধান হইতে বলি। কারণ, মাটীর মধ্যে নানাপ্রকার খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য থাকিলেও সহরের মাটী যে সর্ব্ববিধ ময়লা ও আবর্জ্জনার আধার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং সহরের মাটী ঘাঁটাঘাঁটি করা সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক। বায়ুর সাহায্যে চিকিৎসা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যকর স্থান সমূহের পরিচয় দিয়াছেন। বক্ষঃ পরীক্ষা সম্বন্ধে একটী পৃথক পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে, তাহা চিকিৎসকদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল নয়; ছাপার ভুলও অসংখ্য। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকে ছবি থাকা আবশ্যক, তাহাও এই পুস্তকে নাই।

—※—

দীপ নির্ব্বাণ।—শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বিশ্বাস প্রণীত। মূল্য ১৷০ আনা।

ইহা একখানি সামাজিক নাটক হইলেও বীমা সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী মূলক আখ্যান লইয়াই লিখিত। মূল উপাখ্যান ভাগ অতি সংক্ষিপ্ত হওয়াতে প্রকৃত সাহিত্য রস সৃষ্টি হয় নাই সুতরাং রঙ্গ মঞ্চের দর্শক দিগকে হয়ত তেমন আনন্দ দিতে পারিবেনা। আইন সংক্রান্ত ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে বিখ্যাত নাট্যকারদের পুস্তকে স্থান পাইয়াছে,—দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা গিরিশ চন্দ্র ঘোষের "প্রফুল্ল" ও "গৃহলক্ষ্মী" নাটকের উল্লেখ করিতে পারি। তিনি স্বয়ং অভিনেতা ছিলেন বলিয়া মামলা মোকদ্দমার মত শুষ্ক জটিল ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও নাটকের মধ্যে রস সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমাদের আলোচ্য এই 'দীপ-নির্ব্বাণ' নামক নাটকের লেখক একজন বীমা ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা কোম্পানীতে বহুকাল দায়িত্ব পূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় বীমা সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান লাভ হইয়াছে। বাংলা ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা দেখাযায়। সুতরাং বীমা সম্পর্কিত ঘটনা সমূহ অতি সুন্দর রূপে ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে নানাপ্রকার জোচ্চুরী, প্রতারণা ও মামলা মোকদ্দমার ঘটনা নাটক খানির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। লেখক নাট্য সাহিত্যে নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা আশা-করি, তাঁহার চেষ্টা সফল হইবে। নাটক অভিনীত হইবার যোগ্য হইলেই উহা কার্য্যকরী হয়। লেখকের সাহিত্য জ্ঞান এবং বীমা ব্যবসায় জ্ঞানের সহিত যদি অভিনয় জ্ঞান যুক্ত হয়, তবে পুস্তক খানির সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া উঠে।

—※—
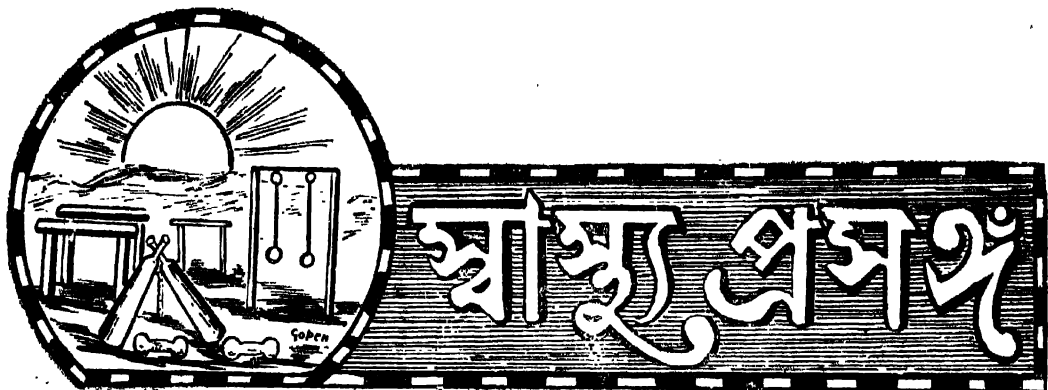
জলপান ও তাহার উপকারিতা

[শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়]

। ১ ।

আমাদের দেহখানিকে জটিল একটি জল প্রণালীর সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। ইহার সকল অংশের সহিত সকল অংশ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নলের দ্বারা সংযুক্ত। এই সকল নলের ভিতর দিয়া দেহের বিভিন্ন পরিত্যাজ্য ও বিষাক্ত পদার্থ বিভিন্ন পথে দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

আমাদের প্রতি চিন্তায়, প্রতি কার্য্যে এমন কি প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত আমাদের দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত দেহকোষগুলি যদি যথা সময়ে দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে না পারে, তবে দেহের ভিতর তাহারা বিজাতীয় পদার্থ গঠন করে। আবার আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকোষ হইতে দৈহিক বৃহৎ যন্ত্রগুলি পর্য্যন্ত দৈহিক কার্য্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে। দেহের বিভিন্ন প্রণালীগুলি দিয়া যদি ঐ সকল পদার্থ বাহির হইয়া যাইতে না পারে, তবে আমাদের দেহ বিপন্ন হয়।

যেমন সহরের নরদমাগুলি ধুইবার জন্য যথেষ্ট জল ঢালা আবশ্যক, তেমনি দেহের এই নরদমাগুলি ধুইবার জন্য যথেষ্ট জল পান করা উচিত। আমরা প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে প্রচুর জল পান করিলে প্রকৃতি দেহসঞ্চিত বিষ মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত বাহির করিয়া দিতে পারে।

আবার আমাদের দেহের ৭০ ভাগই জল। দেহের এই জলীয় অংশ সর্ব্বদাই মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত বাহির হইয়া যাইতেছে। পরিমিত জলপান করিলেই কেবল দেহে এই রসের সমতা রক্ষা হয়। যদি যথেষ্ট পান করা না হয়, তবে প্রকৃতি রক্ত, মাংসপেশী ও দেহের তন্তুগুলি হইতে রস টানিয়া নিতে বাধ্য হয়। **তাহার ফলে দেহ ক্রমশঃ শুষ্ক ও কৃশ হইতে থাকে। দেহে জলীয় পদার্থের অভাব হইলে প্রথমেই কোষ্ঠবদ্ধতা আসে।**

প্রতিদিন নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে, আমাদের না হইতে পারে এমন রোগ নাই। আমাদের শতকরা ৯৯টি অসুখ অল্লাধিক পরিমাণে কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে উৎপন্ন।

দেহে জলীয় পদার্থের অভাব হইলে কোষ্ঠ বদ্ধতার পরই রক্তশূন্যতা আসে। দেহে যে রক্ত থাকে তাহাও বিষযুক্ত ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। তখন যে কোন রোগজীবাণুই আমাদের দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কারণ, সুস্থ রক্তই দেহের সর্ব্বপ্রধান প্রহরী।

এইজন্য প্রতিদিন প্রত্যেক লোকের দেড়সের হইতে দুই সের জল পান করা আবশ্যক। কেহ কেহ শীতকালে যথেষ্ট জল পান করে না। কিন্তু শীত ও গ্রীষ্ম প্রভৃতি সকল ঋতুতেই যথেষ্ট জল পান করা উচিত। প্রয়োজন হইলে গ্রীষ্মকালে কিছু বেশী পরিমাণ জল পান করা যাইতে পারে।

[২]

জলপানের অভাবে যেমন কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে, তেমনি জলপানই কোষ্ঠবদ্ধতার বড় একটি ঔষধ। প্রতিদিন ভোর বেলা এক গ্লাস করিয়া জলপান করিলে, কয়েক দিন পর হইতে কোষ্ঠ অতি সহজে পরিষ্কার হয়।

কেহ কেহ প্রতিদিন চা খাইয়া তবে পায়-খানায় যায়। তাহারা মনে করে, চা খাওয়ার জন্যই তাহাদের পায়খানা হয়। কিন্তু দীর্ঘ দিন চা পানের ফলে ক্রমশঃই তাহাদের বরং কঠিন কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। যদি তাহারা চায়ের পরিবর্ত্তে প্রতিদিন ভোরে শীতল জল পান করে, তবে তাহা দ্বারা তাহাদের সমান ফল হইবে। কারণ, জলপানে অন্ত্রের ভিতর কীটতরঙ্গবৎ গতির সঞ্চার হয় এবং এই গতির ফলেই দেহ হইতে মল বাহির হইয়া যায়।

যাহাদের কিছুতেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, ঘুম হইতে উঠিয়া ভোর বেলা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর অর্দ্ধ গ্লাস করিয়া জল পান করিলে, এই অভ্যাসের দ্বারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবেন। কিন্তু সকল অভ্যাসের মতই জলপানের অভ্যাসও ধীরে ধীরেই করা উচিত।

ভোর বেলা জলপান করাকে আয়ুর্ঋষিগণ ঊষাপান বলিতেন। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইহাতে আমাদের পাক-স্থলীটিই সম্পূর্ণরূপে ধৌত হইয়া যায় এবং পরে যখন ইহার ভিতর ভুক্তবস্তু পৌঁছে, তখন ভুক্ত পদার্থ ও পাচক রসের ভিতর তৃতীয় অন্য কোন পদার্থ থাকে না, কারণ, পাকস্থলীর ভিতর পূর্ব্বদিনের যে সকল ভুক্তাবশিষ্ট পচিয়া থাকে, জল তাহা সম্পূর্ণরূপে ধোয়াইয়া লইয়া যায়। এইজন্য নিয়মিত ঊষাপানে অজীর্ণ, কোষ্টবদ্ধতা পেট ফাঁপা, পাকস্থলীর জ্বালা ও অম্বল প্রভৃতি অতি অল্প দিনে আরোগ্য হয়।

প্রতিদিন প্রচুর জলপান করিলে মূত্র প্রবাহ অব্যাহত থাকে, যথেষ্ট প্রস্রাব হয়, মূত্র দুর্গন্ধশূন্য হয় এবং মূত্রাশয় রক্ত হইতে যে মূত্র ছাঁকিয়া লয়, তাহার সেই কাজ অত্যন্ত লঘু হয়। এই জন্য মূত্রযন্ত্রের ব্যাধিতে জলপান অত্যন্ত উপকারী।

প্রচুর জলপানে রক্ত তরল হয়, সুতরাং দেহের সর্ব্বস্থানে অতি সহজে চলাচল করিতে পারে। হৃৎপিণ্ডও সেই রক্ত অতি সহজে ও কম পরিশ্রমে পাম্প করিতে পারে। এইজন্য যাহাদের হৃৎরোগ আছে, তাহাদের প্রচুর জল

পান করা উচিত। ইহাতে হার্টের কাজ অত্যন্ত লঘু হয় এবং সত্বরই সবল হইয়া উঠে।

জ্বরের সময় শীতল জল পান একান্ত অপরিহার্য্য। জ্বরের সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া, দিনের মধ্যে তিন চার বার স্পঞ্জ করিয়া এবং মাথা ধোয়াইয়া কেবল যথেষ্ট পরিমাণ শীতল জল রোগীকে পান করিতে দিলেই অনেক সময় জর আরোগ্য হয়। জ্বরের সময় রোগীকে এইরূপ ভাবে শীতল জল পান করিতে দিতে হয়, যেন রোগীর প্রস্রাবের বর্ণ স্বাভাবিক জলের মত হয়। জ্বরের সময় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তখন এক গ্লাস শীতল জল পান করিলে হার্টের বিট্ প্রতি মিনিটে ১০ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত কমিয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার রোগেই শীতল জলের সহিত কতকটা লেবুর রস মিশাইয়া দিলে রোগীর অত্যন্ত উপকার হয়।

কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সকল তরুণ রোগেই যথেষ্ট জল পান করা উচিত। কারণ, জল দেহের বহু বিষাক্ত পদার্থ ধোয়াইয়া লইয়া যায়।

বহুমূত্র, বাতব্যাধি ও মেদ বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগেও প্রচুর জলপান করা আবশ্যক। বহুমূত্র রোগে যথেষ্ট জলপান করিলে দেহসঞ্চিত অতিরিক্ত শর্করা মূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত বাহির হইয়া যাইতে পারে। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার বলিয়াছেন, যদি প্রত্যেক লোক প্রতিদিন আট

দশ গ্লাস জল পান করে এবং মাংসাহার পরিত্যাগ করে তবে দুই পুরুষের ভিতর পৃথিবী হইতে বহুমূত্র রোগ উঠিয়া যাইবে।

বাতব্যাধি রোগীরা যথেষ্ট জলপান করিলে তাহাদের দেহ সঞ্চিত য়ুরিক এ্যাসিড্ ও অন্যান্য বিষ দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

কামলা, পিত্তকোষের পাথুরী এবং লিভারের যাবতীয় রোগে জলপান অত্যন্ত ফলদায়ক। আমরা যে জলটুকুই পান করি তাহাই লিভারের ভিতর দিয়া যাইতে বাধ্য। এইজন্য জলপানে লিভারের অত্যন্ত উপকার হয়। স্যার ল্যাণ্ডার ব্রাণ্টন বলিয়াছেন, 'যদি দৈনিক দুই হইতে চার পাইণ্ট করিয়া জল পান করা যায়, তাহা হইলে পিত্ত পাথুরী কখনও হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

পিত্ত পাথরি, মূত্র পাথরি এবং আরও বহু রোগ হইতে কেবল যথেষ্ট জল পান করিয়াই অব্যাহতি লাভ করা যায়। কামলা রোগে দিনে আট দশ গ্লাস জল পান করিলে রোগ অতি সহজে আরোগ্য হয়।

কিন্তু রোগে ও স্বাস্থ্যে জলপান একান্ত অপরিহার্য্য হইলেও, ঠিক ঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী জল পান করা আবশ্যক।

জলপানের সর্ব্বপ্রধান নিয়ম ইহাই যে, আহারের সময় অথবা আহারের অব্যহিত পর কখন ও জলপান করিতে নাই। জল পানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময়, আহারের এক কি দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে এবং আহারের তিন ঘণ্টা পর, যখন ভুক্ত পদার্থ হজম হইয়া যায়, তখন।

আহারের সময় জলপান করিলে পাচক রস সমূহের শক্তি নষ্ট হয় এবং তাহার ফলে খাদ্য দ্রব্য ভালরূপ হজম হয় না। **অনেক সময় আহারের সময় জলপান করিবার জন্য অজীর্ণ অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ জন্মে।**

প্রত্যেক গ্রাস অন্ন খুব ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইলে খাদ্যদ্রব্যের ভিতর লালা ও বিভিন্ন পাচক রস এরূপ প্রচুর পরিমাণে নামিয়া আসে যে, আহারের সময় জলপান আবশ্যক হয় না। **যাহারা সাধারণতঃ চিবাইয়া খায় না, অথবা খুব কম চিবাইয়া খায়, তাহাদেরই আহারের সময় পুনঃ পুনঃ জলপান করিবার আবশ্যক হয়।**

আহারের সময় জলপান না করিলে, পাচক রস সমূহ খাদ্যদ্রব্যের উপর পূর্ণভাবে কার্য্য করিতে পারে এবং তাহাতে খাদ্যদ্রব্য অতি সহজে হজম হয়। উহার ফলে দেহ অতি সত্বর সবল ও পুষ্ট হইয়া উঠে।

কিন্তু আহারের সময় জলপান করিতে হইবে না বলিয়া, পূর্ব্বে ও পরে যথেষ্ট জলপান করা আবশ্যক। যাহারা আহারের পর তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে না পারেন, তাহারা অন্ততঃ এক ঘণ্টা পর জলপান করিবেন। মোট কথা দিনে ও রাত্রে বিভিন্ন সময়ে দেড় সের দুই সের জল পান করা চাইই। কারণ, জলই দেহের পক্ষে জীবন স্বরূপ।

পানীয় জল যে সর্ব্বদা যথাসম্ভব পরিষ্কার হইবে, কেবল তাহাই নয়, পানীয় জল সর্ব্বদাই শীতল হওয়া উচিত।

গরম জল ক্ষণেকের জন্য দেহে সাময়িক উত্তেজনা আনিলেও ইহার প্রতিক্রিয়ার অল্প সময় পরেই সর্ব্বদেহে অবসাদ আসে এবং দীর্ঘ দিন গরম জল পান করিলে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়, কিন্তু শীতল জল যদিও কোন কোন সময় অথবা অবস্থায় ক্ষণেকের জন্য দেহ সঙ্কুচিত করে, তথাপি অল্প সময় পরে যখন সেই অবস্থা কাটিয়া যায়, তখন তাহার প্রতিক্রিয়ায় দেহে উদ্দীপনা আসে এবং সেই ফল দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়। এই সময় শীতল জল পান করা মাত্রই দেহে নবজীবনের আবির্ভাব হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় গরম জল যেমন সর্ব্বদা পরিত্যজ্য, বরফ অথবা বরফ জলও তেমনি পরিত্যাগ করা উচিত।

কখনও এক সময় এক গ্লাসের অতিরিক্ত জল পান করিতে নাই। বার বার এক এক গ্লাস করিয়া জল পান করাই ভাল।

কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়াই চক্ চক্ করিয়া পান না করিয়া দুইটা গ্লাস জলটা দাও কয়েকবার ঢালাঢালি করিয়া তাহার পর পান করিলে খুবই উপকার হয়। কারণ, তাহাতে জলের ভিতর অক্সিজেন মিশ্রিত হইতে পাবে। দুগ্ধ, ঘোল, সরবৎ প্রভৃতিও এই ভাবে পান করা উচিত।

কিন্তু সকল অবস্থায় জল পান একান্ত অপরিহার্য্য হইলেও কোন কোন সময় এবং কোন কোন রোগের পক্ষে বিশেষ সতর্কতার সহিত জল পান করা আবশ্যক। অত্যন্ত শ্রান্তি অথবা ঘর্ম্মের সময় কখনও জল পান করিতে নাই। ঐ অবস্থায় বরফ জল পান করিলে খুব কঠিন রোগ হওয়াও অসম্ভব নয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া বুকে বেদনা হইলে এবং পাকস্থলীর আকার বৃদ্ধি পাইলে জল পান করা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। যাহা মানুষের পক্ষে জীবন স্বরূপ, অবস্থা বিশেষে তাহাই দেহের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে। (স্বাস্থ্য সমাচার)
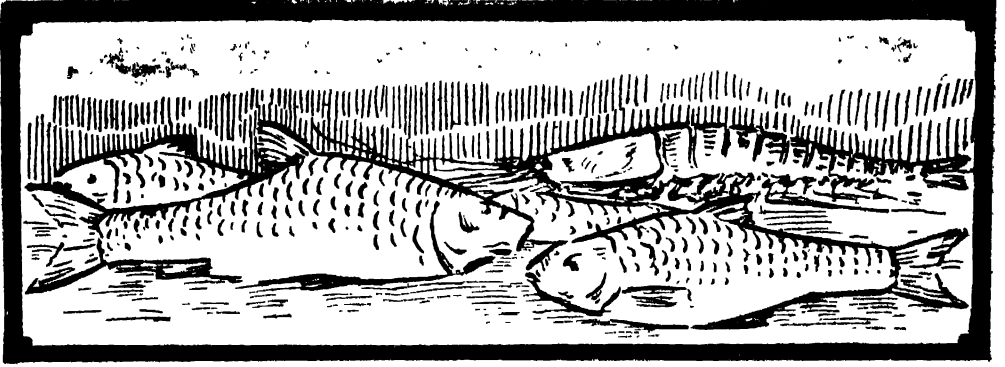
বাঙ্গলায় মাছের চাষের ব্যবসা

ভারতীয় শিল্প কমিশনের সদস্যগণ তাঁহাদের রিপোর্টে বাঙ্গালায় মাছের চাষের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়া বাঙ্গলা সরকারকে এই বিষয়ের উপর জোর দিতে এবং তাঁহাদের ফিসারী ডিপার্টমেণ্টে যাহাতে আরও যোগ্য ও অধিকসংখ্যক লোক নিয়োগ করা হয় তজ্জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিল্প কমিশনের এই সুপারিশ সত্ত্বেও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এই বিভাগ উঠাইয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গালায় মাছের অভাব

বাঙ্গলা প্রদেশের শতকরা ৮০ জন লোক মৎস্যভোজী। খাদ্য হিসাবে মাছ যে খুব পুষ্টিকর জিনিষ তাহাতেও সন্দেহ নাই। সহজপাচ্য বলিয়া উহা মাংস অপেক্ষা অধিকতর উপকারী; কিন্তু বিগত ১৯০৬ সালে মিঃ কে জি গুপ্ত বাঙ্গলায় মাছের চাষ ও উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যখন তদন্ত করেন, সেই সময়েই তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে বাঙ্গলায় প্রয়োজনানুরূপ মাছ পাওয়া যায় না। কলিকাতায় ১৬ লক্ষ লোকের বাস। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে শরীর পুষ্টির জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যহ অন্ততঃ দুই ছটাক করিয়া মাছের প্রয়োজন। সুতরাং কলিকাতায় বৎসরে অন্ততঃ ৪২ হাজার টন মাছের দরকার। সেই স্থলে কলিকাতায় বর্ত্তমানে প্রতি বৎসরে ১০।১২ হাজার টনের বেশী মাছ আমদানী হয় না।

বাহির হইতে আমদানী

বাঙ্গলায় যে মাছের অভাব রহিয়াছে তাহা বাঙ্গলার বাহির হইতে শুকনা মাছ ও টিনের কৌটায় সংরক্ষিত মাছের ক্রমবর্দ্ধমান আমদানী হইতে বুঝা যায়। বিগত ১৯২৩।২৪ সালে বাঙ্গালার বাহির হইতে ৪০৮০ টাকার শুকনা মাছ ও ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৫৯ টাকার টিনে সংরক্ষিত মাছ আমদানী হইয়াছিল। উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৭।২৮ সালে ১২ হাজার ৭৮৩ টাকার শুকনা মাছ ও ২ লক্ষ ২৬ হাজার ১২৪ টাকার টিনে সংরক্ষিত মাছ আমদানী হয়। সম্প্রতি ১৯৩৪-৩৫

সালের বহির্বাণিজ্যের যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে উক্ত এক বৎসরেই ১১ লক্ষ টাকার টীনে ভরা সংরক্ষিত মাছের আমদানী হইয়াছে। এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, বাঙ্গলায় মাছের চাষের উন্নতির কত বিপুল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

বাঙ্গলায় মাছের চাষের সুবিধা

বাঙ্গলায় মাছের চাষের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। এই প্রদেশে পানীয় জলের জন্য অগণিত পুকুর ছাড়া সেচ কার্য্যের জন্যও বহু পুকুর রহিয়াছে। বাঙ্গলায় ২৩ লক্ষ ১০ হাজার একর জলা জমিতে পাটের চাষ হয়। এতদ্ব্যতীত জলা জমির ১২ লক্ষ ৯১ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হয়। এই সব জমিতে মাছের চাষ হইতে পারে। জাপানের অধিকাংশ মাছ ধানের জমি হইতে পাওয়া যায়। যদি বাঙ্গলার জলাভূমির কতকাংশেও মাছের চাষ হয় এবং প্রতি একরে বৎসরে দশটাকার মাছ জন্মান যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালায় বৎসরে আরও ৪০ কোটী টাকার মাছ পাওয়া যাইতে পারে। ইংলণ্ডের ফিসারি সমূহে বৎসরে ২৫ কোটী ১২ লক্ষ টাকার, ফ্রান্সে ১২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকার, জাপানে ৫২ কোটী ৮০ লক্ষ টাকার এবং কানাডাতে ১৬ কোটী ৮০ লক্ষ টাকার মাছ জন্মিয়া থাকে। এই সকল অঙ্ক হইতে বাঙ্গালার মাছের চাষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনুমাণ করা যায়।

বর্ত্তমান চাষ প্রণালীর দোষ

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা দেশে কিছু কিছু মাছের চাষ না হয় এমন নহে; কিন্তু এজন্য অধিকাংশ স্থলে কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই পুকুরের মালিক মাছের পোনা ক্রয় করিয়া তাহা পুকুরে ছাড়িয়া দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন। এরূপ ব্যবস্থায় যে সুফল পাওয়া যাইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। কেননা যে সব পুকুরে পোনা ছাড়া হয় তাহা সময় সময় সংস্কার করিয়া উহার তলদেশ শুকাইয়া লইবার কোন ব্যবস্থা হয় না। উহার ফলে পুকুরের তলদেশ কাদায় ভর্ত্তি থাকে। এই আবর্জ্জনার মধ্যে যে সব জলজ গাছ জন্মে তাহা মাছের চাষের উপযুক্ত নহে—অধিকন্তু পুকুরে মাছের উপযুক্ত যে সামান্য খাদ্য জমা হয় তাহার অনেকাংশ এই সব জলজ গাছ শুষিয়া লয়। এই সব জলজ গাছের মধ্যে মাছের খাদ্যের উপযুক্ত কীটাদিও জন্মিতে পারে না।

পুকুরে নিয়মিত ভাবে মাছের খাদ্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে সারা পুকুরে মাছের যে পরিমাণ খাদ্য থাকা আবশ্যক তাহার এক চতুর্থাংশও অনেক সময়ে মিলে না। এই জন্য পুকুরে পোনা ছাড়া হইলে পুকুরে বড় বড় মাছ ও শিকারী জাতীয় মাছগুলি এই সব পোনার অধিকাংশকে খাইয়া ফেলে এবং অনেক পোনা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত পুকুরে মাছের উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা না হইবে এবং পোনা মাছ বৃদ্ধির পক্ষে উপরোক্ত বিভিন্ন অসুবিধা দূরীভূত করা না হইবে ততদিন পুকুরে মাছের চাষ হইতে সুফল পাওয়ার আশা নাই। বর্ত্তমানে পোনা মাছ ক্রয়ের জন্য অধিকাংশ

অর্থ যে অপচয় হইতেছে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই।

মাছের চাষে লাভ

উপযুক্ত প্রণালীতে মাছের চাষ হইলে উহাতে কি প্রকার লাভ হইতে পারে তাহার একটা হিসাব এখানে দেওয়া যাইতেছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, রোহিত, কাতলা, মৃগেল ও কালবাউশ এই চার প্রকার মাছই পুকুরে খুব বাড়িয়া থাকে। উহার মধ্যে আবার কাতলার বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশী। পুকুরে কাতলার পোনা ছাড়িলে প্রথম বৎসর উহা ৪ ইঞ্চি, দ্বিতীয় বৎসরে ৯ হইতে ১০ ইঞ্চি এবং তৃতীয় বৎসরে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়, দ্বিতীয় বৎসরে প্রত্যেকটী মাছের ওজন এক পোয়া এবং তৃতীয় বৎসরে আড়াই সের পর্য্যন্ত হয়; দুই বৎসর বয়সে প্রত্যেকটী মাছের ওজন গড়ে দেড়সের পর্য্যন্ত দেখা যায় একশত হাত দীর্ঘ ও একশত হাত প্রস্থ কোন পুকুরে যদি এক হাজার কাতলার পোনা ছাড়া যায়, তাহা হইলে দুই বৎসরের শেষে অন্ততঃ ৫ শত মাছ জীবিত থাকে। এই অবস্থায় এই ধরণের একটী পুকুরে মাছের চাষ করিলে কি পরিমাণ লাভ হইতে পারে তাহা দেখা যাউক।

খরচ—এক হাজার পোনার মূল্য ১৫ টাকা, মাছ ধরিবার জন্য জেলের মজুরী ৩০ টাকা, বিবিধ ব্যয় ৫ টাকা—মোট ব্যয় ৫০ টাকা।

আয়—৫০০ মাছের ওজন ৭৫০ সের প্রতি সের চার আনা হিসাবে ১৯০৲ টাকা।

নিট লাভ—(১৯০৲—৫০৲) ১৪০৲ টাকা।

এই লাভের পরিমাণ খুব কম করিয়া ধরা হইয়াছে। যদি প্রত্যেক বৎসর পুকুরে মাছ ছাড়া যায় তাহা হইলে খুব সামান্য শ্রম ও অর্থব্যয়ে বৎসরে ১০০ হইতে ২০০ টাকা লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই লাভ পাইতে হইলে বর্ত্তমানে অন্যান্য দেশে গবেষণার ফলে যে উন্নত প্রণালীতে মাছের চাষ করা হইতেছে তাহা অবলম্বন করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য দেশে মাছের চাষ

বাঙ্গলা দেশে সাধারণতঃ খাল, বিল্ হইতে ছোট ছোট পোনা ধরিয়া তাহা পুকুরে ফেলা হয়। কলিকাতার আশপাশে এবং ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলাতে খাল বিল হইতে কাপড়ের সাহায্যে ভাসমান মাছের ডিম তুলিয়া তাহা অল্পজল বিশিষ্ট খানায় ফেলা হয়। এখানে কয়েক দিনের মধ্যেই ডিম হইতে ছানা বাহির হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর মাছের পোনা বিভিন্ন ঝাঁকে বেড়াইতে থাকে। তখন উহা দিগকে তুলিয়া বিভিন্ন পুকুরে ফেলা হয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং জাপানে অন্য পন্থা অবলম্বিত হয়। এই সব দেশে পৃথক পুকুরে বড় বড় পুরুষ ও স্ত্রী মৎস্য পালন করা হয়। ডিম হইবার সময় অন্য একটী পুকুরে স্ত্রী ও পুং মৎস্যকে একত্র করা হয়। এই সব পুকুরে ভাসমান জলজ উদ্ভিদ্ রাখা হয়। স্ত্রী মৎস্যগুলি ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিলেই এই সব ডিম জলজ উদ্ভিদের আশ্রয়ে ভাসিতে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই ডিম হইতে মাছ বাহির হয় এবং ঐগুলি ১ হইতে ২ ইঞ্চি লম্বা হইলে পুকুর হইতে তুলিয়া অন্য পুকুরে ছাড়া হয়। বাঙ্গলা দেশে

লোকের বিশ্বাস যে পুকুরে বা বদ্ধ জলাতে বড় মাছের পোনা হয় না। এজন্য বাঙ্গলার পুকুরে ছাড়িবার জন্য পোনা মাছ নদী নালা হইতে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাপানের ন্যায় বাঙ্গলা দেশেও স্ত্রী ও পুং মৎস্যকে পৃথকভাবে পালন করিয়া ডিম হইবার সময়ে একত্র করতঃ পোনা পাওয়া যায় কিনা তাহা বাঙ্গলাদেশে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। যাহা জাপানে সম্ভবপর তাহা বাঙ্গলায় সম্ভবপর না হওয়ার কারণ নাই। এই প্রণালীতে সুবিধা এই যে, মাছ বড় হইলে ক্রমাগত অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ডিম পাড়িয়া থাকে। সুতরাং এই পন্থায় একই মাছ হইতে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত এক প্রকার বিনা পরিশ্রম ও বিনা ব্যয়ে পোনা সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

ইন্সিওরান্স প্রসঙ্গ

বাংলা গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হওয়াতে শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অবসর কালে মিঃ এন্ দত্ত জেনারেল ম্যানেজারের পদে কার্য্য করিবেন। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার হিন্দুস্থানকে কি অবস্থা হইতে আজ বীমা জগতের উচ্চ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। কত বাধা বিঘ্ন এবং বিপদ আপদের সহিত নিত্য সংগ্রামে একদিকে তিনি স্বয়ং অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, অন্যদিকে সেই অভিজ্ঞতা ও কর্ম্ম শক্তি হিন্দুস্থানের উন্নতি কল্পে নিয়োজিত করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের যে বিরাট আকৃতি আজ জনসাধারণের চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে, তাহার প্রত্যেক অংশ শ্রীযুত নলীনীরঞ্জন সরকারের কৃতিত্বের পরিচায়ক। হিন্দুস্থানের প্রত্যেক কর্ম্মী তাঁহার নিজ হাতে গড়া। সেই জন্য আজ তাঁহার শূন্যস্থানে যোগ্য ব্যক্তিকে আসীন দেখিয়া আমরা হিন্দুস্থান সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়াছি।

হিন্দুস্থানের বোম্বাই ব্রাঞ্চ মিঃ এন্ দত্তের চেষ্টাতেই গঠিত হয়। আজ পশ্চিম ভারতের বড় বড় বীমা কোম্পানীর সহিত সমান স্পর্দ্ধায় বাঙ্গালীর হিন্দুস্থান যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা একমাত্র মিঃ এন্ দত্তের কর্ম্মকুশলতা, ব্যবসায় বুদ্ধি এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুত

হিন্দুস্থানের অফিসিয়েটিং জেনারেল ম্যানেজার

মিঃ এন্ এন্ দত্ত

নলিনীরঞ্জন সরকার যখন ইউরোপে গিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার স্থলে মিঃ এন দত্ত বিশেষ যোগ্যতা ও সুনামের সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। এবারে মিঃ এন্ দত্ত তাঁহার দক্ষতা, ক্ষমতা এবং কর্ম্মশক্তি দেখাইবার অধিকতর সুযোগ পাইয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি এ সুযোগ গ্রহণ করিয়া হিন্দুস্থানকে উত্তরোত্তর আরও উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন।

কবিরাজি টোটকা

কবিরাজ—শ্রীরাখালদাস মৈত্র— আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

যৌবনকালে মুখমণ্ডলে শিমুলকাঁটার ন্যায় এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক উৎপন্ন হয়। চলিত ভাষায় আমরা উহাকে বয়ঃব্রণ বলি। সংস্কৃত ভাষায় উহাকে যুবানপিড়কা বলে। সাধরণতঃ ১৮ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যুবকযুবতীদিগের মুখমণ্ডলে ও গালে এই রোগ হইতে দেখা যায়। এই রোগে মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় এবং সমস্ত মুখমণ্ডলে বেদনা হয়। বিশেষ করিয়া ওষ্ঠ এবং নাসিকার অগ্রভাগে ব্রণ হইলে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক হয়।

এই রোগের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেকেই অনেক ঔষধ—স্নো, পমেটম, ক্রীম প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াও বিশেষ ফল পান না। যাহাতে এই রোগের কথঞ্চিৎ প্রতিকার হইতে পারে এজন্য আমি কয়েকটী সহজসাধ্য টোটকা ও নিয়মাদি নিম্নে দিলাম। সাধারণতঃ বিলাসী, অসংযমী এবং উষ্ণ প্রধান দেশের ব্যক্তিগণ এই রোগে অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, কুলি মজুর এবং নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে এই রোগ খুব কম।

যাহারা মৎস্য, মাংস, গরমমসলা প্রভৃতি গুরুপাক খাদ্য বেশী আহার করিয়া থাকেন তাহাদের অধিকাংশই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। যে সকল বিদাহী, উত্তেজক ও রুক্ষ খাদ্যে শরীর গরম হয় সেই সকল খাদ্য বর্জ্জনীয়। প্রত্যেক ব্রণ টিপিলে উহার ভিতর সাদা লম্বা পিচ্ছিল ও শক্ত ভাতের মত গ্যাজ বাহির হয়।

১। ওষ্ঠের ব্রণ ছাড়া অন্যান্য স্থানের ব্রণ হওয়া মাত্র টিপিয়া গ্যাজটী বাহির করিয়া ফেলিলে আপনা হইতে উহা শুকাইয়া যায়। ওষ্ঠের ব্রণ গালিলে বিপদজনক হইতে পারে, এজন্য উহা কখনও গালা উচিৎ নহে।

২। প্রত্যহ গরম জলে সাবান গুলিয়া লেবুর খোসা দ্বারা পীড়িত স্থান ঘষিলে ব্রণ

শুকাইয়া যায় এবং নূতন করিয়া আর হয় না।

৩। শঙ্খভস্ম সাবান সহ ফেনাইয়া দশ-পনের মিনিট মুখে ঘষিলে ব্রণ নাশ হয় এবং মুখশ্রী বর্দ্ধিত হয়।

৪। পাতি লেবুর রসে রক্তচন্দন ঘষিয়া ব্রণে পেশন করিলে ব্রণ নির্ম্মূল হইয়া যায়।

৫। নারিকেল হইতে দুধ বাহির করিয়া উহাতে শঙ্খভস্ম মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে ব্রণ, মেচেতা, বসন্তের দাগ প্রভৃতি নাশ করিয়া মুখকান্তি বর্দ্ধিত হয়।

৬। শ্বেতচন্দন ও শটী জল সহ ঘষিয়া ব্রণে লেপন করিলে ব্রণ সারিয়া যায়।

৭। শিমুলকাঁটা দুধে ঘষিয়া চন্দনের ন্যায় হইলে উহা ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণ সারে ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়।

৮। পাতি লেবুর রসে ছোলার দাইলের বেশম গুলিয়া খুব রগ্‌ড়াইলে ব্রণ নাশ হয়।

৯। সোহাগার খৈ ও ময়দা সমভাবে মিশাইয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণ আরোগ্য হয়।

ব্রণনাশক তৈল।

খাটী সরিষার তৈল ৴।০ অগ্নিতে চড়াইয়া উত্তপ্ত এবং নিস্ফেন হইলে গোলমরিচ চূর্ণ ২ তোলা, বড় এলাইচ চূর্ণ ২ তোলা, তেজপত্র চূর্ণ ৩ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ২ তোলা, প্রক্ষেপ দিয়া তৈলের বর্ণ রক্তাভ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া রাখিবেন। এই তৈল ব্রণনাশক ও কান্তিবর্দ্ধক।

প্রাতঃকালে ও বৈকালে এক মুষ্টি সিদ্ধ চাউল ও এক মুষ্টি দুর্ব্বা, অর্দ্ধ পোয়া জলে রগড়াইয়া সেই জল ছাকিয়া অর্দ্ধ তোলা কাশীর চিনি সহ পান করিলে প্রমেহ জনিত প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

*

আগরকরা অর্দ্ধ তোলা ও চাখড়ি অর্দ্ধতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ মুখের মধ্যে বেদনা স্থানে ৪।৫ মিনিটকাল রাখিলেই সান্নিকের বেদনার আশু উপকার হয়।

*

এক পোয়া সরিষার তৈলে ২।৩টা আস্ত (অকর্ত্তিত) জীবন্ত সিঙ্গি মাছ ছাড়িয়া দিয়া খুব কড়া ভাজিয়া সেই তৈল দগ্ধক্ষত স্থানে লাগাইলে অতি শীঘ্র ক্ষত ভাল হয়।

*

খেজুরের কচি পাতা দুই তোলা ৮ গুণ জলে জ্বাল দিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া পর দিবস প্রত্যুষে চারি আনা ওজনের মধু সংযুক্ত করিয়া দিন কতক পান করিলে সকল রকমের ক্রিমির উপদ্রব শান্তি হয়।

*

খয়ের, থানকুনি পাতা ও কর্পূর বাটিয়া লাগাইলে মুখের ঘা ভাল হয়।

*

বকুল ছাল, নিম ছাল, বেল ফুলের পাতা ও কুচির ছাল, জলে সিদ্ধ করিয়া উহা দ্বারা বারংবার কুলকুচী করিলে মুখের ঘা থাকে না।

*

তুলসীর পাতা ও গোল মরিচ সম পরিমাণ উত্তমরূপে বাটিয়া ২ রতি বটি প্রস্তুত করিবে। এক ছটাক অত্যুষ্ণ জলে চা প্রস্তুতের ন্যায় ১০।১৫টা তুলসী পাতা ফেলিয়া উহার ক্বাথ বাহির করিয়া উহাতে ঐ বটী একটি মিশাইয়া ২।৩ রতি পরিমাণ সৈন্ধব লবণ সহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

*

বারংবার তামাক খাওয়ায় যে হুকার জল খুব লাল হইয়াছে সেই জলের সঙ্গে মাটী মিশাইয়া কাদা করিয়া উহার প্রলেপ লাগাইলে প্রলেপ শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে সদ্যদগ্ধ জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

*

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৭শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৪ | ২য় সংখ্যা

'কি ব্যবসা করিব' ? প্রশ্নের উত্তর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সঙ্কীর্ণ চিত্ত এবং সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া ব্যবসা চলেনা। ভারতবর্ষই যে সমস্ত পৃথিবী নহে এবং ভারতীয় লোকেরাই যে পৃথিবীর একমাত্র অধিবাসী নহে এ দু'টীকথা ও বুঝিতে হইবে এবং মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং ব্যবসা করিতে হইলে কেবলমাত্র আমাদের বাংলাদেশের চারিটী অথবা ভারতবর্ষের দশটী খদ্দেরের উপর নজর রাখিলে হইবেনা। আমাদিগকে দেখিতে হইবে,—সমস্ত পৃথিবীর বাজার। ভারতবর্ষেও নানা প্রকার ফলের অভাব নাই, তবে এদেশে অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা হইতে জাহাজ বোঝাই ফলের চালান আসে কেন? ১৯৩৪-৩৫ সালে ৭০ হাজার মণ সংরক্ষিত ফল এদেশে আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের লোকেরা ত গরুকে ভগবতী-জ্ঞানে পূজা করে;—ভগবানের অবতারও গোচারণ করিয়াছিলেন, তবে এদেশে কেন দেনমার্ক, হল্যাণ্ড ইতালি হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ টিনে ভরা দুধের আমদানী হয়? ১৯৩৭—৩৫ সালে এই দুধ আসিয়াছিল প্রায় তিন লক্ষ মণ! মাখন আমদানী হইয়াছিল ৯ হাজার মণ।

ভারতবর্ষের খালে বিলে নদী সমুদ্রে,—বিশেষতঃ বাংলাদেশে ও মাদ্রাজে মাছ ত রহিয়াছে প্রচুর। তবে কেন প্রতি বৎসর ৭০ হাজার মণের উপর টিনে ভরা মাছ বিদেশ হইতে আমদানী হয়? ভারতবর্ষে

খাদ্য হিসাবে শূকরের মাংস প্রচলিত নাই। কিন্তু এদেশে শূকর প্রতিপালনের কারবার আছে। নিম্নশ্রেণীর দোসাদ প্রভৃতি লোকেরাই এই কার্য্য করে। কিন্তু এই শূকরের মাংসের যে বিরাট বাজার পৃথিবীতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা উহারা জানে না। ভারতবর্ষে কতিপয় ইহুদি বণিক এই ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। হাবড়ার কোটীশ্বর ইহুদী ধনী বেলিলিয়স যাঁহার নামে হাওড়ায় বেলিলিওস রোড, বেলিলিয়স্ গার্ডেন ইত্যাদি হইয়াছে সেই, বেলিলিয়স বংশের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল এই শূকরের ব্যবসা।

বরহমপুর গঞ্জাম মান্দ্রাজ সমুদ্রোপকূলের একটী প্রাচীন বন্দর। এইখান হইতে ব্রহ্মদেশে মালের জাহাজ যাতায়াত করে। মান্দ্রাজের কুলী এবং অসংখ্য শূকর এই বন্দর দিয়া ব্রহ্মদেশ ও চীনে রপ্তানী হয়। সমুদয় শূকরের ব্যবসায় পার্শি, ইহুদী এবং ইংরাজ কোম্পানীর হাতে। হিন্দু মুসলমানগণ ধর্ম্মগত সংস্কারের দরুণ এই কারবারে হস্তক্ষেপ করেন না। আমরা কাহারও ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত দিতে চাহি না। তবে কার্য্যক্ষেত্র যে সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে এইমাত্র আমরা দেখাইলাম।

কালক্রমে অনেক সংস্কারই বর্জ্জিত হয়। হিন্দুরা পূর্ব্বে শবদেহ স্পর্শ করিত না,—এই সংস্কার প্রথম যে দিন যিনি নষ্ট করেন,—সেই দিনকে এবং সেই লোকটিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে। চামড়ার কারবার অথবা জুতার দোকান করা হিন্দুদের নিষিদ্ধ ছিল,—এখন উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণ সন্তানেরাও ট্যানারিতে কাজ করিতেছে,—জুতার দোকানের মালিক হইয়াছে। যাহা হউক, প্রয়োজন-বোধ জাগ্রত হইলে সংস্কার আপনা-আপনি ভাঙ্গিয়া যায়।

ভারতবর্ষে বিদেশীয়েরা শূকরের মাংস সর্ব্বাপেক্ষা মুখরোচক এবং অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করে। তাহাদের জন্য ১৯৩৪-৩৫ সালে শূকরের মাংস হইতে প্রস্তুত ২৪ হাজার মণ হ্যাম্ ও বেকন আমদানী হইয়াছে। অথচ ইহার অনেক বেশী শূকরের মাংস ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই বাবতে ১১ লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যায়।

আচার মোরব্বা চাটনী প্রভৃতির কারবার এদেশে আছে বটে,—কিন্তু তাহা অতি অল্প পরিমাণ এবং যা কিছু আছে, তাহাও সমস্ত অ-বাঙ্গালীদিগের হাতে। সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না, এই সব আচার চাটনীর ব্যবসা করিয়া কত লোক লক্ষপতি হইয়াছে। বাঙ্গালী যুবকেরা এই দিকে মনোযোগ করেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই সব সামান্য জিনিসের ব্যবসায়ে কোন লাভ নাই। কিন্তু মুখরোচক খাবার জিনিস যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহার কাটতি প্রচুর বলিয়া তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। **তবে উহাকে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উন্নত প্রণালীতে সংরক্ষণ ও প্যাকিং করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ইহার জন্য খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন নাই। ছোট খাট কয়েক রকমের কল কব্জা লাগে,—এই মাত্র।**

সেইজন্য আমরা বুদ্ধিমান বাঙ্গালী যুবকদিগকে উপদেশ দিতেছি, তাঁহারা এই সব খাদ্য ব্যবসায়ে মনোযোগী হউন। "কি করিব?—কি করিব"—বলিয়া আর বৃথা

আপত্তি জানাইয়া চুপ চাপ বসিয়া থাকিবেন না। বে-কার সমস্যা সমাধানের ভার বেকারদের হাতেই রহিয়াছে। কেবলমাত্র স্থানীয় খরিদ্দারের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। পৃথিবীর বাজারের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা দেখাইয়াছি বিদেশ হইতে ভারতে প্রায় তিন কোটী টাকার সৌখীন খাদ্য দ্রব্যের আমদানী হয়। কিন্তু সেই তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে কি পরিমাণ রপ্তানী হয় তাহা জানিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইবার কথা। সোণার ভারতবর্ষ বলিয়া যে দেশের জগৎ জোড়া সুনাম,—যে দেশের শাস্ত্রের উপদেশ, "অন্নং ব্রহ্ম,-অন্নং বহু কুর্ব্বীত", যে দেশের লোকেরা ভগবানের জগৎ-পালিনী শক্তিকে অন্নপূর্ণারূপে পূজা করে, সেই পূজাপীঠে এখনও প্রতিবৎসর যে দেশে "অন্নকূট" মহোৎসব হয়, যে দেশের লোকেরা ভগবতীর স্তব করিবার সময় বলে "যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু ক্ষুধা রূপেণ সংস্থিতা,—নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমোনমঃ"—সেই দেশের লোকেরা তিনকোটী টাকার খাদ্য দ্রব্য বিদেশ হইতে ক্রয় করে কিন্তু বিদেশে পাঠায় মাত্র ২৭ লক্ষ টাকার খাদ্য। ইহার পরিমাণও প্রতি বৎসর কমিয়া আসিতেছে! নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে তাহা বুঝা যাইবে,—

বৎসর	ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী খাদ্যের পরিমাণ মূল্য লক্ষ টাকা
১৯৩০-৩১	४৯
১৯৩১-৩২	৩৯
১৯৩২ ৩৩	৩২
১৯৩৩-৩৪	২৮
১৯৩৪-৩৫	২৭

পৃথিবীর সকল দেশে সভ্য জাতির সমাজে বহুবিধ সৌখিন ও মুখরোচক খাদ্যের প্রচলন আছে। সেই সব বিভিন্ন রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, কোন দেশের লোক কি রকম খাদ্য ভালবাসে তাহার খোঁজ খবর লইয়া, বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে চিত্তাকর্ষক ভাবে যদি তাহা তৈয়ারী এবং প্যাক করিয়া বিদেশে চালান দেওয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই তাহা বিক্রয় হইবে। বাজারে মাল পড়িয়া থাকিবার অবসর ঘটিবেনা। কলিকাতাতেও ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের এবং বিদেশের বিভিন্নরুচির লোক বাস করেন, তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে আগ্রহের সহিত নিজ নিজ প্রিয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদি কলিকাতাতেই সেই সকল জিনিস তৈয়ারী করা যায়, তবে প্যাকিং করার খরচাও লাগেনা।

বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা কিরূপ দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধি বিবেচনার সহিত তথ্যানুসন্ধান করিয়া কারবার চালায় তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। জার্ম্মাণী হইতে চিরুণী আসে,—তাহার উপরে ছাপমারা বাংলায় লেখা থাকে "পতি পরম গুরু"—"সাবিত্রীসমা ভব"—ইত্যাদি। বাঙ্গালীর মেয়েদের কাছে কোন কথাটী খুব আদরণীয় ও প্রিয়, জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা—তাহা খোঁজ লইয়া জানিয়াছে এবং এই প্রয়োজনীয় সন্ধানটী লইবার জন্য তাহারা হাজার হাজার টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছে। কেবলমাত্র বাংলা দেশের বাজারটী দখল করিবার জন্য তাহারা এত টাকা খরচ করে। ইংলণ্ডের লোকেরা সুতি কাপড় পরেনা। তাহারা পশমী কাপড়ই সর্ব্বদা ব্যবহার করে। কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় গরম দেশের লোকের জন্য

ইংলণ্ডের বস্ত্রব্যবসায়ীরা সুতি কাপড় তৈয়ারী করে এবং কোন দেশের লোকের কি রকম পাড়, জমি, রং পছন্দ সে সম্বন্ধে সর্ব্বদা খোঁজ খবর নেয়। দেশের লোকদের রুচি এবং সামাজিক রীতিনীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সর্ব্বদা নূতন নূতন জমি পাড়ের ডিজাইন বা নক্সা করিবার জন্য মোটা মোটা বেতনে বহু লোক তাহারা নিযুক্ত করে। এই রকমে বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা পৃথিবীর বাজার দখল করিয়া বসে।

অনেক সময়ে ব্যবসায়ীরা নানাপ্রকার কৌশলে নূতন নূতন খাদ্যের ফ্যাসন সৃষ্টি করে। এদেশে আজকাল ওভলটিন, কর্ণফ্লাওয়ার বোর্ণ-ভিটা, ইন্‌ষ্ট্যাণ্ট্ পোষ্টাম্ প্রভৃতি শত শত রকমারি খাদ্য চল্‌তি হইয়াছে। এ সব জিনিস তৈয়ারী করা যে খুব কঠিন কাজ এবং ইহাতে যে খুব উঁচু রকমের বৈজ্ঞানিক বিদ্যার প্রয়োজন তাহা নহে। কেবলমাত্র সংরক্ষণ প্রণালী জানা থাকিলেই হয়। অথচ এই সকল খাদ্য লোকে যেন রাক্ষসী ক্ষুধার তাড়নায় লোফালুফি করিয়া কিনিতেছে। জার্ম্মাণীতে চা পানের রীতি প্রচলিত নাই। সেখানে ভারতীয় চা-ব্যবসায়ী-দের তরফ হইতে লোকদিগকে চা-পানের নেশা ধরানো হইতেছে। এ সংবাদ আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের এই ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছি। কোকো-পান প্রচলিত করিবার জন্য কোন কোন বিদেশী ব্যবসায়ী কলিকাতায় কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছে তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। ঠেলা গাড়ীতে কোকো তৈয়ারী করিবার সমস্ত সাজ সরঞ্জাম লইয়া ফেরিওয়ালারা রাস্তা দিয়া চলিয়া যায় এবং চাহিবা মাত্র সুন্দর পরিষ্কার ভাবে দুধ চিনি দিয়া এক পেয়ালা কোকো তৈয়ারী করিয়া দেয়—দাম নেয় দুই পয়সা মাত্র। এই রূপেই সাধারণ লোকের নেশা ক্রমশঃ জমিয়া উঠে।

এই খাদ্য ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও কতগুলি প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া উঠে। প্যাকিং করিবার জন্য টিন ও কৌটা তৈয়ারীর কারখানা তন্মধ্যে প্রধান। শিশি বোতল, কার্ডবোর্ড বাক্স তৈয়ারী এবং নক্সিদার ছাপার কাজ এই সকল শিল্পের উন্নতিও ইহার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং একজনের অন্ন সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আরও দশজনের জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধা হয়। যাঁহারা আমাদিগকে "কি করিব—কি করিব"? বলিয়া নিত্য প্রশ্ন করেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই সহজ পন্থা দেখাইয়া দিতেছি।

এদেশে আম, জাম, লেবু, লিচু পেয়ারা, পেপে, শসা, তাল, বেল কলা প্রভৃতি অসংখ্য রকমের উপাদেয় ফলের প্রচুর ফলন হয়। আচার, চাট্‌নী, মোরব্বা, বড়ি, সস্ প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার পদ্ধতিও অনেকে জানে, বিদেশে যাইয়া তাহা শিখিতে হইবে না। কেবল মাত্র এয়ার টাইট বা বায়ুশূন্য টিনের কৌটায়, বৈয়মে অথবা বোতলে সুদৃশ্য ভাবে প্যাকিং করিবার কৌশলটী আয়ত্ব করিলেই হয়। আমাদের দেশীয় চিঁড়ে, মুড়ী, খই, চীনেবাদাম, ডাল, কড়াইশুঁটী, প্রভৃতি হইতেও নানা প্রকার মুখরোচক ঘিয়ে-ভাজা খাদ্য তৈয়ারী হয়। বাহিরের সুদৃশ্য প্যাকিং এর চটকে তাহা বিদেশের বাজারেও উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইতে পারে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

নতুন খনিকার্য্য চালানোর জন্য তারা খনি মালিকদের নিকট হ'তে কয়লা কেনা বন্ধ করিলেন। এই সমস্ত ফল একযোগে ফলিবার দরুণ কয়লার দর পড়তে সুরু করলে। মালিকরা ভাবলেন যে, যদি খনির কার্য্য আরও প্রসারিত করে কয়লা কাটবার খরচা কমানো যায়, তবে বুঝি পতনটাকে নিবারণ করা যাবে। কিন্তু সে চেষ্টা করাতে আরও খারাপ ফল ফলল।

এইখানে একটা জিনিস উল্লেখযোগ্য। কয়লার দর ভয়ঙ্কর কমে গেছে বলেই কয়লার খনিসমুদয়ের আজ এই দুরবস্থা, কিন্তু অনেকেই বলবেন যে এর জন্য খনি মালিকেরাই দায়ী।

অর্থ নৈতিক নিয়মানুসরে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের যদি সমতা রক্ষিত না হয় তবেই তার দর ওঠা নামা করে। কয়লার চাহিদা যে ভয়ঙ্কর একথা কেউই অস্বীকার করবে না, অন্ততঃ কয়লা যে আমাদের একেবারে অপরিহার্য্য এটা খাটি সত্যি কথা। সুতরাং খনি-মালিকেরা যদি চাহিদানুযায়ী কয়লা যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাহলে দর পড়ে যাবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তা' তারা করেন না বলেই বোধ হয় আজ এই দুর্দ্দশা।

কিন্তু খনিমালিকরাই যে সম্পূর্ণ দোষী তা' সঠিক বলা যায় না, কেননা, খনি মালিকদের ওপর অতিরিক্ত যোগানের যে অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে খনি-মালিকদেরও কিছু বলবার আছে। তাঁরা বলেন যে, বর্ত্তমানে কয়লা ব্যবসায়ের দুর্দ্দশার কারণ চাহিদার অতিরিক্ত যোগান নয়, পরন্তু চাহিদা ও 'সঙ্গে সঙ্গে' যোগান দিতে পারার ব্যবস্থার তারতম্যই এর কারণ। অন্যান্য ব্যবসার চেয়ে এ ব্যাপারটা একটু ঘোরালো রকমের। যদি বলা যায় যে, মালিকরা চাহিদানুযায়ী যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করবে, তাহলে সেটা সম্ভব হয় না, কেননা, ইচ্ছা করলেই কয়লা পাবার উপায় নেই, তার জন্য সময় লাগে। ধরা যাক আমার খনিতে ২০০ টন কয়লার চাহিদা আছে, আমি সেই অনুযায়ী যোগান

দেওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি। কিন্তু যদি অতিরিক্ত চাহিদা হয়? অতিরিক্ত চাহিদার সময় আমি কি করব? এ ত আর অপর কোন জিনিস নয় যে দু'একদিনের মধ্যে যোগানের ব্যবস্থা করা গেল। এই অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের জন্যই বাধ্য হয়ে, স্বাভাবিক চাহিদার অতিরিক্ত ব্যবস্থাই করে রাখতে হয়। এই অতিরিক্ত ব্যবস্থা যখন বেশী মাত্রায় হ'য়ে পড়ে তখনই আশঙ্কার কথা, বর্ত্তমানে খনি কার্য্য ব্যাপারে সেই আশঙ্কাই দেখা দিয়েছে। সেখানে মূলতঃ চাহিদার অতিরিক্ত যোগান না থাকলেও কার্য্যতঃ তাই হয়ে পড়েছে এবং সেইজন্যই কয়লার দাম আজ এত কমে গেছে।

অপরাপর অনেক ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণটা না জেনেই দ্রব্য উৎপাদিত হ'য়ে থাকে, কিন্তু কয়লার ব্যাপারে চাহিদার পরিমাণটা পূর্ব্বে জেনে তবে কয়লা কাটার ব্যবস্থা করা হয়। একজন চাষী, যে ধান বোনে সে ধানই বুনতে থাকে চাহিদা কি রকম হবে সে কথাটা সে চিন্তা করে দেখেনা। এতে খারাপ ফল যে ফলেনা তা' নয়, তবুও এই রকম ব্যবস্থাই চলে আসছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে কয়লার ব্যাপারে তা' চলে না। খনি মালিকেরা চাহিদার পরিমাণ জেনে তবে কয়লা তোলবার ব্যবস্থা করেন এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা অতিরিক্ত চাহিদার জন্য তাঁদের অতিরিক্ত ব্যবস্থাও বর্ত্তমান থাকে। এই রকম বিভিন্ন কোম্পানীর বিভিন্ন Productive Capacity (উৎপাদন শক্তি) বর্ত্তমান
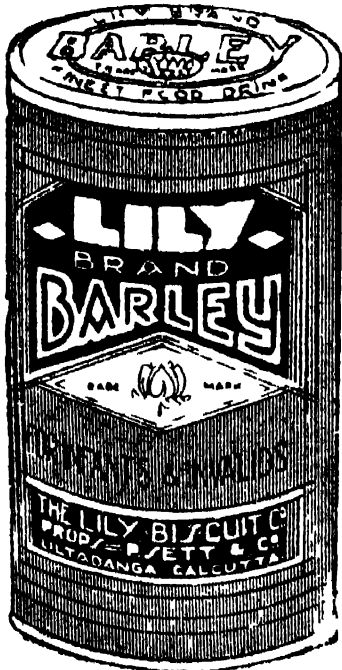
থাকার দরুণ যে যাঁর খুসীমত দরে অর্ডার গ্রহণ করে থাকেন এবং তার ফলেই কয়লার দর আজ এত চরমে নেমে এসেছে।

প্রত্যেক খনিরই সাধারণ কার্য্য ব্যবস্থা ছাড়াও অতিরিক্ত উৎপাদন শক্তি (productive capacity) বজায় রাখতে হয় এবং সেটাই মূলতঃ না হ'লেও কার্য্যতঃ অতিরিক্ত যোগানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাঁড়ায় এবং চাহিদার চেয়ে যোগান বেশী হ'লে দর যে পড়ে যেতে বাধ্য হ'বে এর আর বিচিত্র কি।

উক্ত অতিরিক্ত যোগানের ফলটা একবার দেখুন:—১৯৩৪ সালে ৩২০ লক্ষ টন কয়লা বিক্রী করে দাম পাওয়া যায় মাত্র ৬ কোটী টাকা, কিন্তু ১৯২৪ সালে ৩১০ লক্ষ টন কয়লার দাম পাওয়া গিয়েছিল ১৫ কোটী টাকা। পক্ষান্তরে, চাহিদার তুলনায় যোগান যদি কম হয় তবে যে কী মারাত্মক ফল ফলে তা' কলিকাতা এবং কলিকাতার উপকণ্ঠের অধিবাসীরা সম্প্রতি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা এবং তৎসন্নিকটস্থিত বাজারে কয়লার দর যে এবেলা ওবেলা লাফে লাফে উঠে মণ পিছু দু' আনা হিসাবটা প্রায় টাকায় গিয়ে পৌছেছিল—তার কারণটা অনেকে ভেবেছিলেন বুঝি, বি, এন, আর-এর রেকর্ড স্থাপনকারী ধর্ম্মঘট। কিন্তু আসলে তা' নয়। সকলেই জানেন যে, এ বৎসর প্রচুর পরিমাণে ধান হয়েছিল এবং সেই ধান কাটবার জন্য অনেক কয়লাখনির শ্রমিক চলে গিয়েছিল। আমাদের দেশের লোকের কুড়েমী যে একটী প্রবাদবাক্য স্বরূপ একথা কেউই অস্বীকার করবেন না এবং তারই মর্য্যাদা রক্ষা করে খনির উক্ত শ্রমিকেরা ধানের লোভ ত্যাগ করে তখন আর ফিরে আসতে চায় নি। ফলে, কয়লার যোগান কম হয় এবং তজ্জন্যই কলিকাতা এবং তন্নিকটস্থ ব্যাপারীগণ ইচ্ছামত দর চড়িয়ে দিয়ে গোঁফে চাড়া দিতে থাকে। আর তার ফল ভোগ করি আমরা অর্থাৎ কয়লা ব্যবহারকারিগণ।

অতএব ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে, কয়লার দাম চড়াবার ব্যবস্থা না করলে খনি মালিকদের চলছে না, এবং কয়লার দাম যদি চড়াবার ব্যবস্থা করা যায় ত কয়লা ব্যবহারকারিগণ তাতে দারুণ আপত্তি করবেন। ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিক উভয় পক্ষের স্বার্থের সংঘর্ষ। মালিকেরা তাদের স্বার্থের খাতিরেই বলছেন যে দর না বাড়ালে আমরা মরতে বসেছি এবং কয়লা ব্যবহারকারিগণ রব তুলছেন যে কয়লার দর যদি চড়ানো হয় ত তাঁদের সমস্ত শিল্প ইত্যাদি জাহান্নামে যাবে। উভয়পক্ষের বক্তব্যের মধ্যেই খানিকটা সত্য নিহিত আছে।

এটা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে, আজকের এই সস্তা দামে যদি খনি সম্পদের খানিকটা নিঃশেষ হ'য়ে যায় তবে পরে উক্ত সম্পদের হ্রাস প্রাপ্তি হেতু দর চড়বেই এবং তখন যদি দরটা বেশী রকম চড়ে ত এখন থেকে সেটাকে খানিকটা অবলম্বন করে কয়লা শিল্পকে রক্ষা করাই ত বুদ্ধিমানের কাজ। অপর পক্ষ অর্থাৎ কয়লা ব্যবহারকারীগণ বলেন যে বুঝলুম ত সব, কিন্তু সমস্ত কল কারখানার মূলেই হচ্ছে কয়লা, দর চড়িয়ে দিলে সমস্ত শিল্প ব্যাপার গুলো যে গোল্লায় যেতে বসবে।

শুধু তাই নয়, মধ্যবিত্ত ও গরীব গৃহস্থ শ্রেণী বলবেন যে এই সামান্য আয়েই তাঁদের কুলোয় না, তারও পর যদি কয়লার দাম চড়ে ত তাঁদের না খেয়ে মরতে হবে !

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এমন একটা মধ্য পন্থা নিতে হবে যাতে কোন পক্ষের তেমন ক্ষতি না হয়, অথচ কয়লা শিল্পটি বেশ সচ্ছন্দে টিঁকে থাকতে পারে। সে রকম মধ্য পন্থা আবিষ্কার করা যে ভয়ানক দুষ্কর ব্যাপার একথা সকলেই স্বীকার করবেন। আসলে এরকম ব্যাপারে একপক্ষকে খানিকটা আপাতঃ ক্ষতি স্বীকার করতেই হয় যদিও, সে ক্ষতিটা তার পরে অন্য ধার দিয়ে পুষিয়ে যায়।

কয়লার ব্যাপারে রেল কোম্পানীকেই এই সমস্যার সমাধানের জন্য অগ্রণী হ'তে হবে। কারণ রেল কোম্পানী খনি মালিকদের প্রধান খদ্দের এবং খনি মালিকরাও রেল কোম্পানীর 'ফাষ্ট ঘর'। উভয়ের সঙ্গে উভয়ের স্বার্থ ভয়ঙ্কর ভাবে জড়িত, সুতরাং রেল কোম্পানীর এ দায় ঘাড়ে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি চালাইতে হইলে কয়লা না হ'লে চলে না, তাই তারা ট্যাকের কড়ি খরচ করে কয়লা কেনে ; বিনিময়ে প্রত্যক্ষ ভাবে খনি মালিকদের নিকট হ'তে তারা কিছু পায় না। কিন্তু রেল কিম্বা জাহাজ কোম্পানী গুলির ব্যাপার আলাদা। তাঁদের কয়লা না হলে চলে না ; তাই তাঁরাও গাঁট্রের কড়ি খরচ করে কয়লা কেনেন কিন্তু বিনিময়ে তাঁরাও খনি মালিকদের নিকট হ'তে টাকা পেয়ে থাকেন, যেহেতু তাঁদেরই গাড়ী ও জাহাজ করেই কয়লা বিভিন্ন যায়গায় চালান যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে খনিমালিকদের ও রেল বা জাহাজ কোম্পানীর স্বার্থ পরস্পর বিজড়িত, অপরাপর শিল্পের সঙ্গে সেরকম কোন স্বার্থ-সম্পর্ক নেই।

তাহলেই একথা বলা চলে যে, অপরাপর শিল্পের যখন এ ব্যাপারে কোন স্বার্থ নেই, তখন তারা কেন দায় ঘাড়ে নিতে রাজী হবে ? বরঞ্চ কয়লার দর যদি বৃদ্ধি করবার প্রস্তাব হয় তবে তারা প্রাণপণে সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে, কেননা, তাতে তাদের স্বার্থে আঘাত লাগছে। কাজে কাজেই রেল বা জাহাজ কোম্পানীই এক মাত্র এ ব্যাপারের প্রতীকার করতে সমর্থ হ'তে পারেন।

এখন বিবেচ্য যে কি করে তাঁরা পারেন ? তাঁরা পারেন দু'রকম উপায়ে—

(১) কয়লার একটা যুক্তিযুক্ত দর বেঁধে দিয়ে,

(২) কয়লার 'ফ্রেটের' হার কম করে।

ভারতে উৎপাদিত কয়লার শতকরা ৩২·৭ ভাগই অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ৭১ লক্ষ টন মাল রেল কোম্পানীই ব্যবহার করে থাকেন, সুতরাং তাঁরা যখন একটা মস্ত বড় খদ্দের তখন তাঁদের পক্ষে কয়লার একটা যুক্তিযুক্ত দর বেঁধে দেওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ রেল কোম্পানীর মোট আয়ের এক পঞ্চমাংশ উসুল হয় মালগাড়ী করে এধার ওধার কয়লা চালান দিয়ে। সুতরাং রেল কোম্পানী যেমন টাকা দিয়ে কয়লা কেনেন তেমনি কয়লার 'ফ্রেট' রূপে টাকা পান। সে টাকাটা তাঁদের আয়ের একটা মস্ত বড় অংশ। তাহলেই ফ্রেটের হার-টাও তাঁদের বিবেচনা করা উচিত, বিশেষতঃ তাতে যদি কয়লা শিল্পের উন্নতি দেখা দেয়।

রেল কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কয়লার 'ফ্রেটের' হার যে কি রকম ভয়ঙ্কর তা মাত্র একটি দৃষ্টান্ত থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে। ঝরিয়া কিংবা রাণীগঞ্জ থেকে যদি বোম্বাই-এ কয়লা পাঠাতে হয় তবে টন্ পিছু 'ফ্রেট্' লাগে বার টাকা ছ' আনা। অথচ এক টন কয়লার দর হচ্ছে মাত্র আড়াই টাকা। ভাবুন একবার ব্যাপারখানা! একটন কয়লা পাঠাবার খরচ হ'ল পাঁচ টন কয়লার দামের সমান! এত করে কি করে কয়লার দরের উন্নতি ঘটবে? ঝরিয়ার খনিতে যেখানে কয়লা বিক্রি হচ্ছে ছ' পয়সা মণ, রেল কোম্পানীর কৃপায় তাই আমাদের এখানে হয়ে গেল ছ' আনা মণ। এতে ব্যবসার উন্নতি হ'বে কোন্‌খান্ দিয়ে?

কিন্তু উন্নতি হয়, যদি রেল কোম্পানী ফ্রেটের হার কমিয়ে দেন। ফ্রেটের হার যদি কমে ত' কয়লা ব্যবহারকারীদের নিকট কয়লার দর না বাড়িয়েও খনি-মালিকরা বেশী দাম পেতে পারেন। খনি মালিকদের তখন কর্ত্তব্য হ'বে কয়লার দর সেই পরিমাণ চড়িয়ে দেওয়া যে পরিমাণ ফ্রেটের হারটা কমেছে। তাহলে সাধারণ ক্রেতার নিকট কয়লার দরটা বাড়ল না, অথচ কয়লা ব্যবসায়ীদের বেশ দু'পয়সা লাভ হ'ল। কয়লা ব্যবসায়ীদের লাভ হ'লে শ্রমিকদের সম্পূর্ণ মজুরী বৃদ্ধি না হলেও মজুরী বৃদ্ধি হবার আশা থাকে।

এখন কথা হচ্ছে যে, রেল কোম্পানী হার কমিয়ে দিলে ত তাঁদের লোকসান হবে; সুতরাং তাতে তাঁরা রাজী হবেন কেন? কথাটা ভাববার, কেননা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে কে আর অপরের মঙ্গল করতে চায়? কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যাবে যে রেল কোম্পানীর লোকসানের কোন আশঙ্কা নেই, কেননা, কয়লা-শিল্প ভাল ভাবে চালিত হ'লে কয়লার ট্রাফিক বৃদ্ধি হেতু তাঁদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

এই ত গেল কয়লার দামের কথা। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে মূলতঃ না হোক্ কার্য্যতঃ কয়লার 'ওভার প্রোডাক্‌সন্' ঘটেছে, যার জন্য দর ঐ রকম শোচনীয় ভাবে নেমে গেছে। এই ওভার প্রোডাক্‌সনের পরিমাণ হ'ল প্রায় ৮০ লক্ষ টন। এটার একটা মীমাংসা না করলে মূল্যের কোন স্থিরতা থাকবে না। এর মীমাংসা করতে গেলে কয়লার সাধারণ চাহিদা বৃদ্ধি করা দরকার। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, গভর্ণমেণ্টের বোকামীর দোষে দেশীয় কয়লার বিদেশী বাজার নষ্ট হ'য়ে গেছে। সেটাকে পুনরায় অধিকার করবার সুযোগ দেওয়া গভর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। বিদেশী বাজারকে পুনরায় অধিকার করতে গেলে গভর্ণমেণ্টকে বিদেশের বাজারে দেশীয় কয়লার স্বপক্ষে ঘোরতর প্রচার কার্য্য চালাতে হ'বে।

তা' ছাড়া এদেশেও দেশীয় কয়লার চাহিদা যাতে আরও বৃদ্ধি পায় গভর্ণমেণ্টকে তারও ব্যবস্থা করতে হ'বে। পূর্ব্বেই বলেছি যে, দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা দেশীয় কয়লার ঘোরতর প্রতিযোগী। বোম্বাইয়ের বাজারে এক টন নাটালের কয়লার দাম হ'ল এগারো টাকা পাঁচ আনা, আর আমাদের দেশী কয়লার দাম হ'ল এগারো টাকা চার আনা (যদি ষ্টীমারে করে মাল যায়)। অথচ খদ্দেরগণ মনে করেন যে, দেশী কয়লার চেয়ে নাটাল কয়লা বহুগুণে ভাল। কাজে কাজেই টন পিছু এক আনা সস্তা হ'লেও

দেশী কয়লা খদ্দেরগণ নেবেন না। এইরকম করেই কয়লার বাজার নষ্ট হ'তে বসেছে। এর প্রতিকার গভর্ণমেণ্টের হাতে, গভর্ণমেণ্ট যদি বিদেশী কয়লার ওপর উচ্চহারে শুল্ক বসিয়ে দেন তবে বিদেশী কয়লা আমাদের বাজার মাটি করতে পারে না। দেশী কয়লার চাহিদাও তাতে বৃদ্ধি পায় এবং তাহলেই দেশী কয়লার কার্য্যতঃ যে ওভার-প্রোডাক্‌সন রয়েছে সেটাও নষ্ট হয়।

কয়লার আর একটি প্রতিযোগী হচ্ছে তেল। পূর্ব্বে আমাদের দেশে জ্বালানী তেলের ব্যবহার এত বেশী ছিল না, কিন্তু যতই তেলের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে কয়লার চাহিদাও তত কমে যাচ্ছে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে জ্বালানী তেলের ব্যবহারের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১০ কোটি গ্যালন, এর বেশীর ভাগই বিদেশ থেকে আমদানী হয়। উক্ত তেলের ওপরও যদি সংরক্ষণ শুল্ক বসানো যায় তবেই কয়লা-শিল্পের খানিকটা সুবিধা হ'তে পারে।

মোটামুটি আমরা দেখেছি যে, কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি করলেই কয়লাশিল্পের উন্নতি হ'তে পারে। কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি করবার আরও দু'টি উপায় আছে—

(১) সফ্‌ট কোক্‌ এর (Soft Coke) ব্যবহার প্রচলন করা,

(২) কয়লা থেকে জ্বালানি তেল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ১০ লক্ষ টনেরও কম সফ্‌ট কোক্‌ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেটার ব্যবহারের পরিমাণ ৬০ লক্ষ টনে দাঁড় করানো যেতে পারে। গৃহস্থালী কার্য্যে সফ্‌ট কোকের ব্যবহারের বিরুদ্ধে এই যুক্তি ছিল যে, ওতে রাঁধলে খাদ্য বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে—কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এ আশঙ্কা অমূলক। আসল কথা হচ্ছে যে, অত্যধিক রেল মাশুলের জন্য সফ্‌ট কোক্‌ চারধারে চালান যেতে পারে না। কিন্তু রেল কোম্পানী যদি তাঁদের মন্দা 'সিজ্‌নে' যে মালগাড়ী গুলো খালি পড়ে থাকে তদ্দ্বারা অল্প মাশুলে সফ্‌ট কোক্‌ চালান দেওয়ার ভার নেন্‌ তাহ'লে সুফল ফলে। এতে রেল কোম্পানীর লোকসানের কোনই আশঙ্কা নেই, কেননা, এতে তাঁদের পড়ে থাকা মালগাড়ীগুলো কাজে লেগে গেল। দ্বিতীয়তঃ এতে করে তাঁদের কয়লার ট্রাফিক্‌ বৃদ্ধি পাবে, কেননা, এক টন সফ্‌ট কোক্‌ উৎপাদন করতে দু'টন কয়লার প্রয়োজন।

ভারতের কয়লাশিল্প একটি জাতীয় শিল্প। যে কোন শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া যাক্‌ না কেন, কয়লার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। স্রোতশক্তির (Water Power) দ্বারা শিল্প ব্যাপারে কয়লাকে এড়ানো যেতে পারে বটে, কিন্তু স্রোতশক্তি মাত্র গুটি-কয়েক স্থানে সীমাবদ্ধ। সুতরাং কয়লা ছাড়া আমাদের গতি নেই। আমাদের জাতীয় শিল্প ও সম্পদ আজ যদি অবহেলায় নষ্ট হয় ত আমাদের উত্তর পুরুষ আমাদের দুষ্‌বে সেটা পূর্ব্বপুরুষের পক্ষে গৌরবের কথা নয়। উত্তর পুরুষের নিকট যদি আমরা দায়ী থাকি ত কয়লাশিল্পকে আমাদের রক্ষা করতেই হ'বে। সে বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তি এবং গভর্ণমেণ্ট একযোগে এখন থেকে অবহিত হোন্‌।

সাইলেজ প্রস্তুত করণ

বাংলাদেশে সাইলেজ প্রস্তুত প্রণালী পরীক্ষার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যথোচিত সাবধানতার সহিত প্রস্তুত করিলে বাংলাদেশের সাইলেজ প্রস্তুত হইতে পারে। পাকা গাঁথুনী ঘরে, গর্তে ও গোলার মধ্যে সাইলেজ প্রস্তুত হইতে পারে। যেখানে মাটীতে গর্ত করিয়া সাইলেজ করা হইবে সেখানে সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসের প্রথমভাগে কাজ আরম্ভ করা ভাল, কারণ, সেই সময়ে মাটীর মধ্যস্থিত জল অনেক নীচে নামিয়া যায়। তবে সেই সময়ের আবহাওয়া ও স্থানীয় অবস্থার বিবেচনা করিতে হইবে। যেখানে পাকা ঘরে বা গোলায় সাইলেজ প্রস্তুত হইবে সেখানে বৎসরের যে কোন সময় যখনই ফসল তৈয়ারী হইবে তখনই কাজ আরম্ভ হইতে পারে, কেননা, এই ঘর বা গোলা জমির উপরিভাগে অন্ততঃ জলের সীমার উপরে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাইলেজ বৎসরের সকল সময়ে গৃহপালিত পশুকে তাজা নরম ঘাস যোগাইতে সক্ষম। ইহা সব সময়ে প্রস্তুত করা যায় এবং বৎসরের যে কোন সময়ে খাওয়ান চলে। যখন দেশে তাজা বা শুকনা খাদ্যশস্যের অভাব ঘটে তখন সাইলেজ তাজা ঘাসের মত খাদ্য যোগায়। ঘাস শুকাইয়া খড় হইলে যে পরিমাণ খাদ্য নষ্ট হয় সাইলেজে তাহা হয় না।

নিম্নলিখিত শস্যগুলি সাইলেজ প্রস্তুতের প্রধান উপাদান —

জোয়ার, মকাই (ভুট্টা), মিলেট (বাজরা প্রভৃতি) এবং গো খাদ্যোপযোগী সকল প্রকার ঘাস, বরবটী ও ম্যাসকলাই উপরোক্ত তিনটী খাদ্যশস্যের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া বোনা চলে। এই মিশ্রিত ফসল হইতে ভাল সাইলেজ প্রস্তুত হয় আর মাঠের আগাছাগুলি এই প্রণালীতে মাথা তুলিতে পারে না। যদি ঠিক মত করা যায় তবে খুব মোটা ঘাস এবং খাদ্যোপযোগী আগাছা হইতেও ভাল সাইলেজ হইতে পারে।

সাইলেজ প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্ট ফসল

বুনিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখিতে হইবে :—

(১) শস্যটী গোজাতির মুখরোচক হওয়া চাই।

(২) ইহা সস্তা হওয়া চাই এবং উৎপন্ন করিতেও বেশী পরিশ্রম না লাগে।

(৩) ইহা যেন শীঘ্র শীঘ্র কাটিবার উপযোগী হয় অর্থাৎ জমিতে বেশী দিন না থাকে।

(৪) ইহা যেন সহজেই নাড়াচাড়া যায়।

(৫) ইহা যেন জমির আগাছা নষ্ট করিতে সক্ষম হয় এবং বুনিবার পর যেন জমিতে আর কোন পাইট আবশ্যক না করে।

(৬) উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অধিক হওয়া চাই এবং গাছটী সরস ও তাজা হওয়া চাই।

(৭) ইহা যেন সহজে পরিপাক হয় এবং ইহার খাদ্যোপযোগিতা যেন প্রচুর হয়।

(৮) ফসলটী এমন হওয়া চাই যেন অল্প অনাবৃষ্টি বা অল্প জল জমাতে ফসলের কোনও অনিষ্ট না হয়। এক কথায় নির্ভর করা যায় যে বোনার পর ফসল নষ্ট হইবে না।

১৯২৯ সালে ঢাকা ও রংপুর পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রায় ১,৭০০ মণ সইলেজ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। নানাজাতীয় শস্য এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯২৮ সাল হইতে অধিকাংশ জেলার কৃষিক্ষেত্রে গর্ত্ত করিয়া মাটীর নীচে সাইলেজ প্রস্তুত করার কাজ বেশ ভাল ভাবেই হইতেছে। ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে ঢাকা কৃষিক্ষেত্রে বাঁশের গোলার ভিতর জোয়ার হইতে উত্তম সাইলেজ প্রস্তুত হইয়াছিল। ধান রাখিবার জন্য যে ভাবে বাঁশের গোলা প্রস্তুত হয় এই গোলাও ঠিক সেইভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কেবল গোলাটী ঠিক মাটির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৯২৯ সালে ঢাকা ফার্ম্মে জোয়ার ও কচুরী পানা সমভাগে
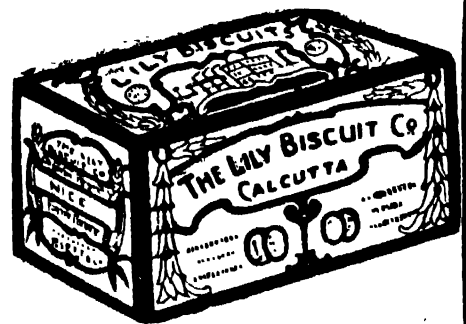
মিশ্রিত করিয়া উত্তম সাইলেজ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

প্রত্যেক বৎসরে একই স্থানে গর্ত্ত করিয়া সাইলেজ করিবার ইচ্ছা থাকিলে গর্ত্তটি ইঁট বাঁধাইয়া লওয়া ভাল। ইহাতে গোড়ায় একটু অধিক খরচ পড়িবে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহাতে অনেক কম মজুর খরচ হইবে এবং খাদ্যও অনেক কম নষ্ট হইবে। এইরূপ গর্ত্ত বহুদিন স্থায়ী হইবে।

সাইলেজ উদ্দেশ্যে যে সকল ফসল চাষ করা হয় সেগুলি পাকিবার পূর্ব্বেই কাটা ভাল; ফুল আসিলেই জোয়ার ও মিলেট কাটার সময় দানাগুলি পাকিয়া শক্ত হইবার আগে মকাই কাটা উচিত। হল্‌দে হইবার আগেই ঘাস কাটার নিয়ম।

গর্ত্ত করিয়া সাইলেজ করা :—উঁচু জমিতে একটী গর্ত্ত কর। পুকুরের পাড়ে উপযুক্ত উঁচু জায়গা সর্ব্বত্রই মিলিবে। গর্ত্তটির আয়তন খাদ্য ফসলের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া যতদূর সম্ভব গভীর হওয়া ভাল। ১০ফুট পর্য্যন্ত গভীর করা যাইতে পারে কিন্তু যেন মাটির নীচে জলের সীমার উপরে থাকে। গর্ত্ত খুঁড়িয়া যে মাটি উঠিবে তাহা কিনারা থেকে বেশ দূরে রাখিবে। গর্ত্তের তলায় কোন অলগা মাটি যেন না থাকে। গর্ত্তের পাশগুলি সোজা খাড়া হইবে।

গর্ত্তে গাছগুলি ফেলিবার আগে উহার তলায় ১ ফুট গভীর করিয়া অকেজো খড় বা অন্য কোন ঐরূপ পদার্থ সাজাইয়া দিবে। ইহাতে সাইলেজের নষ্টের পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে। যে ফসলে সাইলেজ হইবে তাহা কাটিবার উপযুক্ত হইলেই কাটিয়া বরাবর গর্ত্তের নিকট লইয়া আসিবে এবং কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবে। যেন গাছগুলি মাটির উপর অধিকক্ষণ পড়িয়া না থাকে এবং শুকাইয়া না যায়। গর্ত্তে ভরিবার পূর্ব্বে যদি গাছগুলি টুকরা করা দরকার হয়, তবে টুকরা কাটা কলে যতখানি কাজ করিতে পারে সেই পরিমাণ গাছ ক্ষেত থেকে কাটিবে। তাহার অধিক কাটিলে গাছগুলি শুকাইতে থাকিবে এবং সাইলেজ খারাপ হইবে। যখন আস্ত গাছ থেকে সাইলেজ করা হইবে, তখন নিম্নলিখিত প্রথা অবলম্বন করাই বিধেয় :—

নিযুক্ত মজুরের যে পরিমাণ ফসল আনিয়া গর্ত্তে ভরিতে পারিবে তাহার অতিরিক্ত গাছ কাটিবে না। কাটামাত্রই গাছগুলি গর্ত্তে লইয়া যাইবে যাহাতে গর্ত্তটী সাত দিনে ভর্ত্তি হয় তাহার ব্যবস্থা করা করা ভাল। গর্ত্তের মধ্যে কয়েকজন লোক সব সময়ে থাকিবে তাহারা গাছগুলি গর্ত্তের পাড়ে পৌছিলেই যেন গাছগুলি ভিতরে লইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। গাছের বাণ্ডিল খুলিয়া গোড়ার দিক গর্ত্তের দেওয়ালের দিকে রাখিয়া গাছগুলি বিছাইয়া দিবে যেন একদিক উঁচু ও এক দিক নীচু না হয় তদ্বিষয়ে নজর রাখিবে। এইভাবে সাজাইলে দেখা যাইবে যে, মধ্যস্থলটী সব সময়েই নীচু থাকিতে চাহে। অতএব মধ্যস্থলে কিছু গাছ দিবার ব্যবস্থা করিবে তাহাতে সমস্ত স্তরটী সর্ব্বত্র সমান উঁচু হইবে এইরূপ একটী স্তর ছয় ইঞ্চি উঁচু হইলেই আবশ্যকমত জল দিয়া সমস্ত স্তরটী ভিজাইবে, এবং সমস্ত স্থানেই বিশেষতঃ দেওয়ালের কাছে মাড়িয়ে দাবিয়ে দিতে হইবে।

ভাল সাইলেজ পেতে হইলে এই মাড়ান দাবান খুবই আবশ্যক। ইহা না করিলে গর্ত্তে

গাছের ফাঁকে ফাঁকে এত বেশী হাওয়া থাকিবে যে, গাছে ছাতা লাগিয়া পচিয়া যাইবে এবং অখাদ্য হইবে। এইরূপ ভর্ত্তি করিতে করিতে প্রথম দিনে গর্ত্তের এক-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত ভরিবে। এই ভরবার সময় যেন জল দেওয়া ও মাড়িয়ে দাবিয়ে দেওয়া সমভাবে চলে। জল কতখানি দিতে হইবে তাহা কাটা গাছের অবস্থার উপর নির্ভর করে। মোটামুটী গাছের ওজনের দশ ভাগের এক ভাগ জল নির্ব্বিবাদে দেওয়া যাইতে পারে। বেশী জল হইলে তত ক্ষতি নেই, কিন্তু কম জল হইলে সাইলেজ নষ্ট হইবে। পরদিন গর্ত্তটী জমির সমান করিয়া ভরিয়া ফেলিবে। জল দেওয়া ও মাড়ান সমান ভাবে চলিতে থাকিবে। তার পরদিনও এই ভাবে কাজ চলিবে এবং চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে গাছগুলি জমির উপরে গর্ত্তটী যতখানি গভীর ততখানি উঁচু হইয়া উঠিবে। তখন উপরে গাছ দেওয়া একদিন বন্ধ রাখিবে কিন্তু সকালে ও বিকালে কয়েক ঘণ্টা মাড়ান ও দাবান চলিবে। পরদিনে খড়ের চাল যে রকম গড়ানে সেইরূপ করিয়া উপরে গাছ সাজাইবে এবং সর্ব্বোপরি এক ফুট গভীর করিয়া খড় দিয়া ঢাকিয়া দিবে। এবং তার উপর এক ফুট মাটি চাপাইবে, যেন মাথা থেকে নীচে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমানভাবে ঢাকা পড়ে। কয়েক দিনের পর পরীক্ষা করিবে এবং মাটীর বহিরাবরণে কোন ফাট দেখিলেই তখনই তাহা বন্ধ করিয়া দিবে, ইহা না করিলে ভিতরে হাওয়া ঢুকিবে এবং সমস্ত সাইলেজ নষ্ট হইয়া যাইবে।

পাকাঘরে বা গোলায় সাইলেজ প্রস্তুত।

পাকা ঘরে বা গোলায় সাইলেজ প্রস্তুত প্রথা পূর্ব্বোক্তরূপই, প্রভেদ এই যে, গাছগুলি দুই ইঞ্চি লম্বা করিয়া টুকরা করিতে হইবে। এই রূপে কাটা গাছ ঘরে বা গোলায় ভরিতে থাকিবে এবং জল দিয়া মাড়াইতে থাকিবে। এইরূপে ঘর বা গোলা ভর্ত্তি হইয়া আসিলে দুই দিন অপেক্ষা করিবে তাহাতে গাছগুলি আপনার ভারে অনেকখানি বসিয়া যাইবে। তখন আবার টুকরা করিয়া কাটা গাছ চাপাইবে এবং জল দিয়া মাড়িয়া বসাইয়া দিবে এবং সর্ব্বোপরি খড় বা অন্য কোন জল দিয়া উপরে ঢাকিয়া দিবে যেন হাওয়া না ঢুকিতে পারে। গোলার উপরি-ভাগে ছু চালো করিবে এবং মটকাটী বাঁশের বেড়ার উপর অন্তত: পাঁচ ফুট উচ্চ হইবে। সমস্ত গোলার বাহিরে মাটীর লেপ দিয়া ঢাকিয়া দিবে। ঢাকাতে যে গোলা করা হইয়াছিল তাহা মাটির উপর। ধানের গোলার মত উপরে না বাঁধিয়া এইরূপ মাটির উপরই করা ভাল, যাতে হাওয়া আটক হয়। ঢাকা ফার্ম্মের গোলার আয়তন ৬ ফুট এবং তাহাতে ৯০ মণ গাছ ধরে এবং ৭৫ মণ সাইলেজ পাওয়া যায়। আকাটা গাছ সাইলেজ করিলে প্রত্যেক ঘন ফুটে প্রায় ২৫ পাউণ্ড (১২॥০ সের) গাছ লাগে, কাটিয়া সাইলেজ করিলে প্রত্যেক ঘন ফুটে ৩২ পাউণ্ড (১৬ সের) গাছ লাগে।

১২ ফুট লম্বা ৮ ফুট চওড়া এবং ৬ ফুট গভীর একটী গর্ত্তে প্রায় ২৫০ মণ সাইলেজ হইবে। এই সমস্ত অঙ্ক হইতে সহজেই হিসাব করিতে পারিবেন যে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গরুকে খাওয়াইতে বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ গাছ সাইলেজ করিতে কত বড় গর্ত্ত, ঘর বা গোলা আবশ্যক হইবে।

সাইলেজ তৈরী হইতে ৬০ দিন সময় লাগে।

গরুর সংখ্যা কম হইলে সাইলেজ বাহির করিবার সময় কেবলমাত্র অর্দ্ধেক আবরণ খোলাই ভাল। উপরের মাটী সাবধানে সরাইয়া সাইলেজের যে অংশ খারাপ দেখাইবে তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া দিবে। সাইলেজ কাটিতে সাধারণ বড় দাও ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রত্যেক দিন সাইলেজ আবশ্যকমত উঠাইয়া পরে খড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে, নতুবা সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইয়া নষ্ট হইবে। বাতাস লাগিলে সাইলেজে ছাতা ফুটিবে। প্রত্যহ অন্ততঃ ২।৩ ইঞ্চি করিয়া সাইলেজ উঠান আবশ্যক। একবার খোলার পর যতদিন না গর্ত্তটী খালি হয় প্রত্যহই সাইলেজ উঠান উচিত। ধানের খড় বা অন্য কোন শুষ্ক খাদ্য থাকিলে অর্দ্ধেক খড় ও অর্দ্ধেক সাইলেজ কাটিয়া গরুকে খাওয়াইবে তাহাতে বেশী নষ্ট হইবে না।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সব সময়ে মনে রাখিবে :—

১। **ভাল সাইলেজ প্রস্তুত করিতে হইলে**—গাছ সুখাদ্য ও সরস হওয়া উচিত। গাছে প্রচুর রস থাকা আবশ্যক। গাছ কাঁচা ও সরস না থাকিলে জল দিতে হইবে। জল যাহাতে সর্ব্বত্র সমানভাবে পড়ে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

২। **গাছ মাড়াইয়া ভাল করিয়া বসাইয়া দিতে হইবে**—ভিতরে যেন অধিক হাওয়া না থাকে বা ঢুকিতে না পারে। আবরণে ফাট দেখা দিলেই বন্ধ করিতে হইবে। ভিতরে আদৌ হাওয়া ঢুকিতে দিবে না।

৩। **ভাল সাইলেজ না হওয়ার কারণ**— ফসলের অবস্থা অত্যন্ত শুক্না—জলের অভাব — মাড়ান কম— হাওয়া বন্ধ করিতে না পারা।
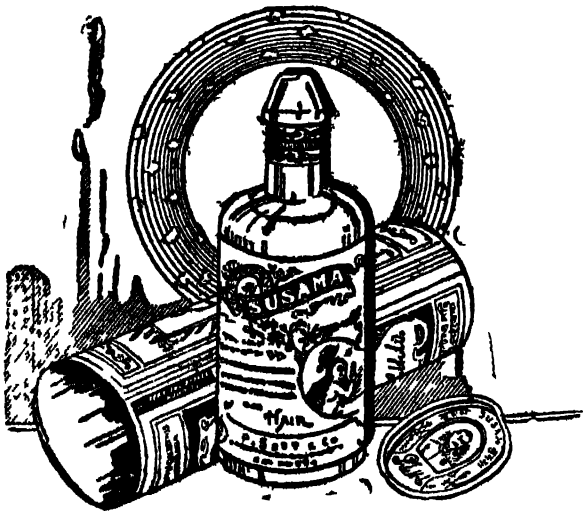
বনভূমির উপকারিতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

Indian Industrial Commission এর অধিবেশনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় মধ্য প্রদেশের Chief Conservator of Forests, মিঃ হিল্ বলিয়াছেন :—"It was in the utilisation of the minor forest products that the greatest possibilities of Commercial development existed. There was a great amount of work still to be done and the prospects were such as to justify fully a large staff of experts. The existing staff could only undertake enquiries into a few of the numerous products avaiable. What was essentially wanted was a body of highly trained practical experts who would make full investigations into single products or groups of products on a large scale to demonstrate their commercial value."

ভাবার্থ :— গৌণ আরণ্য ফসলের সদ্ব্যবহারেই ব্যবসায়ের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি বিধানের সম্ভাবনা। এখনও বিপুল পরিমাণ কার্য্য অসাধিত রহিয়াছে। ঐ সমুদয় কার্য্যের ভবিষ্যৎ এরূপ আশাপ্রদ যে, বহু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা আদৌ অসঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমান কর্ম্মচারিবর্গ অপরিমিত ফসল সমূহের মধ্যে কেবল দুই একটীর তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারেন। কিন্তু একদল উচ্চ শিক্ষিত, ব্যবহার জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ বিস্তৃতভাবে বিশেষ বিশেষ ফসল অথবা ফসল শ্রেণী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধান করেন ও উহাদের ব্যবসায় হিসাবে আবশ্যকতা প্রতিপাদন করেন, ইহাই সর্ব্বাগে বাঞ্ছনীয়। স্থূল হিসাবে ধরিতে গেলে, এখন রাজ-সরকার বন-বিভাগ রাখিয়া প্রধানতঃ কাঠেরই কারবার করিয়া থাকেন। কিন্তু শুধু তাহা করিলেই চলিবে না। গৌণ আরণ্য ফসল সমূহ যাহাতে অপচিত না হইয়া, ব্যবহারে আসিয়া দেশের ধনাগমের পন্থা সুগম করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতৎ সম্বন্ধে শুধু পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা বাতুলের কার্য্য। সরকারের কর্ত্তব্যের ন্যায় জনসাধারণেরও কর্ত্তব্য আছে। সরকারী বিশেষজ্ঞ অথবা কর্ম্মচারিগণ বিশেষ-বিশেষ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তৎসমুদয় যে ব্যবসায়ে লাভজনক হইতে পারে, তাহা প্রতিপাদন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু কার্য্যতঃ এই সমুদয় দ্রব্য লইয়া সরকার যে এক একটা ব্যবসা খুলিয়া বসিবেন, সেরূপ আশা করাই অসঙ্গত। দেশের জনসাধারণও এতদ্বিষয়ে সচেষ্ট হউন, তাঁহারাও যেন প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে পশ্চাৎপদ না হন

বস্তুতঃ কাঁচামাল লইয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় গভর্ণমেণ্টের কতদূর অগ্রসর হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞই বিগত শ্রম-কমিশনে নানারূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। বন-বিভাগের ব্যবহারতত্ত্ববিৎ মিঃ পিয়ারসন বলেন যে, একেবারে নূতন ধরণের কাজ হইলে স্বয়ং, এবং তাহা না হইলে অংশীদাররূপে গভর্ণমেণ্ট কার্য্য করিতে পারেন।

পক্ষান্তরে, Chief Conservator মিঃ হিলের মত এই যে, সরকারের আর্থিকদান অনাবশ্যক। ইহাতে বর্ত্তমান কারবার সমূহের অনিষ্ট হইতে পারে এবং স্বাধীন চেষ্টাও পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তি না পাইতে পারে। উভয় পক্ষের উক্তির মধ্যে যে কতক পরিমাণে সত্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের কতক পরিমাণে পথ প্রদর্শন করা আবশ্যক, কারণ, দেশীয় ব্যক্তিবর্গ এখনও গৌণ আরণ্য ফসল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এই বিষয়ে প্রথমতঃ তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও পরে বিশেষ-বিশেষ কার্য্যে যোগদানের প্রবৃত্তি সঞ্চারণ, এই দুইটিই আপাততঃ মুখ্য কার্য্য। এই দুইটি কার্য্যে শিক্ষিত জনগণ সাহায্য না করিলে শুধু গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় কোন ফল ফলিতে পারে না। সুতরাং সরকারের কার্য্য আংশিক রূপে শিক্ষাপ্রদ এবং অবশিষ্ট ব্যবসায়োপযোগী হওয়া আবশ্যক।

আমরা এতক্ষণ নানাবিধ আরণ্য ফসলের প্রাচুর্য্য ও ব্যবহারাভাবে অপচয়ের বিষয় আলোচনা করিলাম। এক্ষণে উক্ত অপচয় কি প্রকারে নিবারিত হইয়া অরণ্য সমূহ অধিকতর ধনোৎপাদনের উপায় হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা যাউক। বন-বিদ্যা বিষয়ক উচ্চশিক্ষা, বনবিভাগের পুনর্গঠন ও অধিক সংখ্যক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং বর্ত্তমান বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থনীতির প্রশ্নাদির উল্লেখের এস্থলে স্থানাভাব। শুধু, সাধারণের পক্ষ হইতে কোন্ কোন কার্য্যের অচিরে অনুষ্ঠান হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহা আমরা বলিব।

(১) ভারতীয় বনসমূহে ব্যবসায়োপযুক্ত কি কি দ্রব্য পাওয়া যায়, স্থানবিশেষ তাহাদের প্রাচুর্য্য কিরূপ, যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ে কিরূপে তৎসমুদয় সংগৃহীত হইতে পারে—এই সমুদয় বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। আমরা স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে অবগত আছি যে, বন বিভাগের কর্ম্মচারিবর্গ কাষ্ঠ ভিন্ন অন্য কোন আরণ্য পদার্থের সঠিক খবর কদাচিৎ দিতে পারেন। ফলতঃ, ইচ্ছা থাকিলেও কোন ব্যবসায়ী কোন বিশেষ আরণ্য ফসল কাজে লাগাইতে পারে না। সুতরাং যত শীঘ্র উপযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা এই কার্য্য নির্ব্বাহ হয় ততই ভাল।

(২) ব্যবহারিক আরণ্য ফসল বিষয়ক প্রদর্শনাগার প্রতিষ্ঠা।—ব্যবসায়ীর সম্মুখে ব্যবসায়োপযুক্ত দ্রব্যের নমুনা থাকিলে তবে উহার সন্ধান লইতে প্রবৃত্তি হয় এবং এইরূপ অনুসন্ধানই কালক্রমে ব্যবহারে পর্য্যবসিত হয়। প্রত্যেক বড় ব্যবসায়ের কেন্দ্রে এইরূপ এক-একটি প্রদর্শনাগার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। উহাতে শুধুই যে কাঁচামাল থাকিবে তাহা নহে, কাঁচা মালের পার্শ্বে উহা হইতে কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে অথবা হইতে পারে, তাহারও নমুনা থাকা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

(৩) সাক্ষাৎ ভাবে আরণ্য ফসল হইতে আপাততঃ অতি অল্প সংখ্যক শিল্পাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা কোন বিশেষ শিল্প অথবা ব্যবসায়ের জন্য আরণ্য পদার্থ ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে সরকারের যথাসম্ভব সাহায্য করা উচিত। অবশ্য এস্থলে পদার্থ এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, উহা ইতিপূর্ব্বে বিশেষ কোন কাজ আসে নাই। কার্য্যতঃ আমরা দেখিয়াছি যে, কোন বিশেষ ফসল অধিক পরিমাণে ব্যবহারের পথ সুগম না করিয়া দিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ সময়ে-সময়ে বরং বাধাই দিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধুয়া এই যে, ফসল অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিলে উহা একবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। সংগ্রহের সহিত সম-মাত্রায় সংরক্ষণ ও উৎপাদনও যে সম্ভব, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। কোন নূতন জিনিষ বাজারে চালাইতে হইলেই, ব্যবসায়ীকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য কিছু অধিক মাত্রায় লাভ দিতে হইবে। ব্যবসায়ের এ মূলমন্ত্রটা বনবিভাগের কর্ম্মচারিবর্গের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অধিক-কালব্যাপী কিম্বা স্বল্প হারে জমা, সম্ভবমত সামান্য রয়েলটি অথবা অন্য কোন প্রকার বিশেষ সাহায্য প্রদান না করিলে আরণ্য ফসল হইতে নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব।

(৪) আরণ্য ফসল সম্ভূত অনেক ছোটখাট ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়—উপযুক্ত কলকব্জাদির অভাব। আমাদিগের দেশের জল-হাওয়া ও আর্থিক অবস্থার উপযুক্ত স্বল্প মূল্যের কল সব সময়ে পাওয়া যায় না। সেই জন্য যাহাতে বিশেষ বিশেষ প্রকারের ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ের উপযোগী কলকব্জাদি প্রস্তুত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজনীয়। শ্রমসমিতির সভাপতি স্যর টমাস হল্যাণ্ড বোম্বাই সহরে ভারতীয় মহাজন সমিতির নিমন্ত্রণে গিয়া এই কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। এক্ষণে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে আরণ্য দ্রব্যাদি হইতে তৈল, গন্ধদ্রব্য, ঔষধ ও অন্যান্য প্রকারের দ্রব্যাদি প্রস্তুতের পথ অনেকটা প্রশস্ত হইবে।

(৫) বন-বিভাগ হইতে নানা বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে! ইহাদের অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা-বহুল ইংরেজীতে লিখিত। ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণের পক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ যে অবোধ্য, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণও উক্ত গ্রন্থাদির অস্তিত্ব প্রায়ই অবগত থাকিলেও নিতান্ত জটিল বোধে পাঠে বিরত থাকেন। অবশ্য বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর অবগতির নিমিত্ত রচিত গ্রন্থাদি বৈজ্ঞানিক ভাষায় রচিত। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যাহাদিগের দেশের স্বভাবজ দ্রব্যকে ভিত্তি করিয়া এই সমুদয় গ্রন্থ লিখিত এবং যাহাদিগকে উক্ত সমুদয় দ্রব্যের ব্যবহার অবগত করান বনবিভাগের চরম উদ্দেশ্য, তাহাদিগের জাতীয় ভাষা ইংরেজি নহে। কৃষিবিভাগ আজকাল অনেকটা ঠেকিয়া শিখিয়া দেশীয় ভাষায় তথ্যাদি প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বনবিভাগের ও উক্ত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবার সময় আসিয়াছে। বনবিভাগের অনেক বিবরণী ও পুস্তিকার মধ্যে ব্যবসায়ীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বহুবিধ বিষয় আছে। সাধারণের অবগতির জন্য এইরূপ পুস্তিকাদির সারসঙ্কলন করিয়া সহজ ইংরেজী ও প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষায়

প্রকাশিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে দেশে যে ফসলের ব্যবসায় চলিতে পারে, অথবা যে স্থলে যাহার প্রাচুর্য্য অধিক, সেই দেশে স্থানীয় ভাষায় সেই ফসল সম্বন্ধীয় তথ্যাদি সংক্ষিপ্তাকারে প্রচারিত হইলে লোকের অনুসন্ধিৎসা যে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্রিক্ত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অনুসন্ধিৎসা বৃত্তিই সকল শিল্প-বাণিজ্যের মূল ভিত্তি। আমরা অবশ্য ইহা বলি না যে, বনবিভাগের সমস্ত গ্রন্থাদিরই অনুবাদ প্রকাশিত হউক। সামান্য বিবেচনা করিলে কর্ত্তৃপক্ষ নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন যে, বিষয়-বিশেষ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে দ্রুত অবগতির জন্য প্রাদেশিক ভাষায় সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে আমরা এইমাত্র বলিতে চাহি যে, কাঁচা মাল উৎপাদন ও সংগ্রহ আজকাল সভ্যজগতের একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাদের দেশে যাহা কিছু কর্ষিত অথবা বন্য ফসল আছে, সকলেই তৎসমুদায়ের পূর্ণ মাত্রায় সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। আমাদিগকে উৎপাদন করিতে হইবে না; প্রকৃতি আমাদিগের জন্য যাহা উৎপাদন করিয়া দিতেছেন, তাহাই কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিলেও আমাদিগের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।
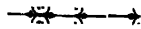
বাংলার চিনি

দেশের শিল্পোন্নতির বা নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য একটা আগ্রহ সাধারণের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে; এবং যাহাতে দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বিদেশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে না হয় তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য নানা প্রকার জল্পনা কল্পনাও চলিতেছে।

লোকের নিত্য ব্যবহার্য্য এবং নিতান্ত আবশ্যকীয় অনেক দ্রব্যই বিদেশ হইতে না আসিলে আমাদের চলে না। এই সব অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য এদেশে যে পরিমাণে প্রস্তুত হয় তাহা দেশের অভাব মোচনের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলিয়া পরের কাছে হাত পাতিতে হয় এবং তজ্জন্য প্রচুর অর্থ বিদেশে চলিয়া যায়। কিন্তু এ অভাব মোচন স্বর্ণপ্রসূ বাংলার পক্ষে মোটেই শক্ত নয়, শুধু চেষ্টা এবং উদ্যমের অভাব।

যে সমস্ত জিনিষের জন্য আমরা অযথা পরমুখাপেক্ষী তন্মধ্যে চিনি একটি প্রধান দ্রব্য। সরকারী রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে ১৯২০-১৯২৪ এই পাঁচ বৎসরের শুধু কলিকাতা বন্দরেই গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় দুই লক্ষ টন চিনি বিদেশ হইতে আসিয়াছে এবং তৎপরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে গড়পড়তায় প্রায় তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টন চিনি প্রতি বৎসর এদেশে আসিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর প্রায় দশ লক্ষ টন চিনি বিদেশ হইতে ভারতে আসিতেছে; অর্থাৎ অন্ততঃ বিশ কোটী টাকা প্রতি বৎসর ভারত হইতে শুধু চিনির জন্য বিদেশে চলিয়া যাইতেছে।

এরূপ অবস্থা কিন্তু চিরকাল ছিল না। চিনি এদেশে চিরকালই প্রস্তুত হইত এবং চিনির জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হইত না, দেশের অভাব দেশেই পূরণ হইত। শুধু তাহাই নয়, যেমন কাপড় প্রভৃতি অনেক জিনিষ বিদেশে রপ্তানি হইত তেমনই ভারতের চিনিও যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশে যাইত।

আমরা সরকারি রিপোর্টেই দেখিতে পাই যে ১৮৬২-৬৩ সালে যশোহর জেলার অন্তর্গত কোর্ট চাঁদপুরে ১৫০টী চিনির কারখানা ছিল এবং ঐ জেলায় কেশবপুর গ্রামে ১২০টি কারখানায় চিনি প্রস্তুত হইত। এতদ্ভিন্ন ঐ জেলারই অন্যান্য স্থানেও চিনির কারখানা ছিল। যশোহরের সর্ব্বত্রই খেজুর গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হইত।

সরকারী রিপোর্ট হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে ১৮৩৩ সালে বাংলা দেশে প্রায় ৯০,০০০ মণ খেজুরে চিনি প্রস্তুত হয়; এবং ১৮৩৬ সালে প্রস্তুত হয় প্রায় এক লক্ষ মণ। ১৮৩৬-৩৭ সালে কলিকাতা হইতে বিদেশে যায় ৩,৬১,৮৮১ মণ চিনি; এবং ১৮৪০-৪১ সালে রপ্তানির পরিমাণ ১৭,০৩,২৬৮ মণ। ১৮৪৮ সালে শুধু খেজুরে চিনিই প্রস্তুত হয় প্রায়

৩,৯৫,০০০ মণ। ১৮৪৯ সালে প্রায় সাড়ে তের লক্ষ মণ চিনি ভারত হইতে ইংলণ্ডে চালান হয়।

নানা কারণে ১৮৪৬ সাল হইতে ভারতে চিনির অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে আরম্ভ করে। ঐ সময় হইতে অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে লোকমত প্রবল হইতে আরম্ভ করে; এবং ঐ বৎসরেই পার্লিয়ামেণ্টে আমেরিকার চিনির ব্যবসায়ে ক্রীতদাস নিয়োগ প্রথা সমর্থন করিয়া আইন প্রণয়ন করা হয়।

এই সমস্ত কারণে এদেশের চিনির ব্যবসায় ক্রমশঃ অসুবিধা হইতে লাগিল। ১৮৫২ সালে এদেশে চিনি এক প্রকার অবিক্রী হইয়া পড়িল। ১৮৫৭-৫৮ সালে বাংলা দেশে প্রায় ৯,৪৫,০০০ মণ চিনি প্রস্তুত হয়। এবং ১৮৭২-৭৩ সালে যশোহর, নদীয়া এবং ২৪ পরগণা এই তিন জেলাতেই ৩,২৯,৪০০ মণ চিনি হয় এবং যশোহরের শুধু দুইটী মহকুমার (মাগুরা এবং ঝিনাদহ) ১,০২,৭৫৫ মণ চিনি তৈরি হয়। ১৮৮১-৮২ সালে যশোহর জিলায় উৎপন্ন চিনির পরিমাণ প্রায় চার লক্ষ মণ।

বাণিজ্য ভিন্ন যে ধনাগম হয় না একথা সকলেই বুঝে এবং বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির জন্য সকলেই সর্ব্বদা চেষ্টিত। যে সব দেশে চিনি প্রস্তুত হইবার সুবিধা আছে সে সমস্ত দেশেই যাহাতে সুবিধায় চিনি প্রস্তুত করা যায় তৎপ্রতি মনোযোগী হইল। এক ভারত ভিন্ন সমস্ত দেশে নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষমতা সেই দেশেরই অধিবাসীর। কাজেই জাভা, মরিসস প্রভৃতি স্থান হইতে বহুল পরিমাণে চিনি ভারতে আমদানী হইতে লাগিল। এই সরকারী সাহায্য পুষ্ট চিনির সহিত প্রতিযোগীতায় ভারত ক্রমশঃই হটিয়া যাইতে লাগিল।

বাংলায় (এবং ভারতের অন্যান্য স্থানেও) যে শুধু কারখানাতেই চিনি প্রস্তুত হইত তাহা নহে সাধারণ চাষী গৃহস্থেরাও নিজে চিনি প্রস্তুত করিত। যশোহর, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলার চাষীরা নিজেরাই খেজুর গাছ কাটিয়া রস সংগ্রহ করিত, সেই রস হইতে নিজেরাই গুড় প্রস্তুত করিত, আবার সেই গুড় হইতে নিজেরাই চিনি প্রস্তুত করিত। এইভাবে ফরিদপুর রাজসাহী প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে আখের আবাদ ছিল সে সমস্ত স্থানে আখের চিনি প্রস্তুত হইত। সে সব স্থানেও চাষীরা আখের আবাদ হইতে চিনি প্রস্তুত পর্য্যন্ত সমস্তই নিজেরা করিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চিনিও এদেশের একটী গৃহ-শিল্প ছিল।

এদেশে "কলকারখানার" প্রচলন অনেক বিলম্বে হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় কলের প্রচলন এদেশে এখনও হয় নাই। অন্যান্য দেশের ন্যায় চিনিও হাতেই প্রস্তুত হইত এইরূপ প্রথার সময়ও বেশী লাগিত এবং খরচাও বেশী পড়িয়া যাইত। তদ্ভিন্ন এদেশের চিনি জাভা প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী চিনির ন্যায় সাদা হইত না। একে খরচা বেশী তায় দেখিতেও তেমন পরিষ্কার নয় কাজেই প্রতিযোগিতায় বিদেশী চিনির নিকট বাংলার চিনি ক্রমশঃ হটিয়া যাইতে লাগিল। সে সমস্ত স্থান পূর্ব্বে চিনির মরশুমের সময় কাজকারবারের কোলাহলে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত, দ্রব্যবাহী শকট প্রভৃতির ভীড়ের জন্য রাস্তা চলা দুষ্কর

ব্যাপার ছিল, চিমনীর ধোঁয়ায় আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইত; আজ যে সমস্ত স্থান নীরব, শুধু হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান।

বাংলা দেশেও যে চিনির কল একেবারে না হইয়াছে এমন নহে। বাংলা দেশে সর্ব্ব প্রথমে চিনির কল স্থাপিত হয় বর্দ্ধমান জেলায়, তারপর যশোহরে আরও চারিটি কল প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার নিকটে কাশীপুরেও একটী কলে কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও কাজ হইয়াছে। এ সমস্ত কলই বিদেশী কর্ত্তৃক স্থাপিত, একটীও বাঙ্গালীর নয়! এই সব কলে প্রকৃত পক্ষে চিনি প্রস্তুত হইত না, চিনি পরিষ্কার করা হইত, দেশীয় কারখানা হইতে ময়লা চিনি খরিদ করিয়া কলের সাহায্যে সেই সব চিনি পরিষ্কার (refine) করিয়া সাদা দানাদার চিনি প্রস্তুত করা হইত এবং ঐ চিনিই লোকে দোবরা বলিত। এইরূপ কল হওয়াতে দেশের কারখানাগুলার অনেকটা সুবিধা হইল বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে চিনি প্রস্তুত করিবার খরচা খুব বেশী পড়িয়া যাইতে লাগিল। তা'ছাড়া দেশীয় কারখানায় প্রস্তুত "আখড়া" এবং "দলুয়া" নামে অভিহিত অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার চিনির সহিত প্রতিযোগিতায়ও কলওয়ালাগণ পারিয়া উঠিল না, সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় সমস্তগুলা কলই বন্ধ হইয়া গেল। পর পর কয়েকটী কল স্থাপিত হওয়ায় গুড়ের চাহিদা খুব বাড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে খেজুরের আবাদও বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে দেশীয় কারখানার সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতে থাকে।

যাহা হউক, দেশীয় সমস্ত শিল্পদ্রব্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় চিনিও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে চিনি আর হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যাহা হয় তাহার পরিমাণ অতীব সামান্য।

এই অবনতির প্রথম কারণ, বিদেশীর প্রতিযোগিতা; দ্বিতীয় কারণ, দেশজাত দ্রব্যের প্রতি দেশের লোকের অশ্রদ্ধা। এমন দিন আসিয়াছিল যে, সর্ব্বসাধারণের ধারণা হইয়াছিল যে যাহা কিছু বিদেশী তাহাই ভাল, এমন কি তথাকথিত শিক্ষিত প্রভুরা মনে করিতেন যে, দেশী জিনিষ ব্যবহার করা অসভ্যতা এবং বিদেশীর অনুকরণে চলাই সভ্যতার নিদর্শন। বলিতে কি, তখনকার দিনের সকলেই বিশেষতঃ—'ভদ্র' বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণ দেশের যা কিছু একেবারে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাজেই অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেশের যা কিছু সবই প্রায় লোপ হইয়া গেল এবং তাহার স্থান বিদেশীয় সমস্ত অধিকার করিল।

যাহা হউক, হাওয়া যেন আবার ফিরিতেছে। দেশের জিনিষের প্রতি অনেকেরই আগ্রহ দেখা যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্পেরও উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কিছুদিন হইতে চিনির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। এখন যেন লোকে বুঝিতেছে যে চিনির ব্যবসায়ে লাভ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। বস্তুতঃই বর্ত্তমানে সকল-প্রকার ব্যবসায় হইতে চিনির ব্যবসায় সমধিক লাভজনক একথা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতায় এদেশের চিনির ব্যবসায় একপ্রকার লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। এই শিল্পটী রক্ষা কল্পে সমস্ত প্রকার আমদানী

চিনির উপর মন প্রতি প্রায় ৭।০ সাত টাকা চারি আনা হিসাবে শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে, এই শুল্ক সাত বৎসর পর্য্যন্ত বহাল থাকিবে, তারপর পুনরায় তদন্ত হইয়া শুল্কের পরিমাণ কিরূপ হইলে এই শিল্প রক্ষা হইতে পারে তাহা স্থির হইবে। এরূপ খুবই আশা করা যায় যে, অন্ততঃ পনের বৎসর শুল্কের দ্বারা চিনি রক্ষিত হইবে। পনের বৎসর সাহায্যের অন্তরালে থাকিতে পারিলে যে কোন শিল্পই আত্মনির্ভরতার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চিনির কাজে লোকসান হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। চাই শুধু উদ্যম, চাই সৎসাহস, চাই বাংলার ধনীদের সহৃদয়তা, আর চাই সাধুতা ও একতা।

বর্ত্তমানযুগ কল কারখানার যুগ। কলের দ্বারা অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প ব্যয়ে কাজ হইতে পারে। শুধু কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা কখনও কলের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠা সম্ভব নয়। সুতরাং গৃহ-শিল্পরূপে কোন লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুত্থান অসম্ভব। যন্ত্রের বিরুদ্ধে বলিবার অনেক কিছু থাকিলেও যন্ত্রের সাহায্য না লইলে উপায় নাই। সময়ের সহিত চলিতেই হইবে। তাহার প্রতিরোধ করা মানুষের সাধ্যাতীত। এই কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় পারে নাই বলিয়াই এদেশের শিল্প সকল একে একে লুপ্ত হইয়াছে।

বহু পূর্ব্ব হইতেই বাংলা দেশে বস্ত্র প্রভৃতির ন্যায় সমস্ত দ্রব্যই হাতে প্রস্তুত হইত এবং বাংলার শিল্প এক সময়ে জগৎ বিখ্যাত ছিল। সে দিনও আর নাই, তাহার পুনরুত্থানও সম্ভব বলিয়া মনে করিবার কারণও ত কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে আর কঙ্কাল আঁকড়াইয়া থাকিয়া কি লাভ? ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কলকারখানা অনেক পূর্ব্বে স্থাপিত হইলেও বাংলা সেদিকে বড় মনোযোগ দেয় নাই। তাই বাংলা সমস্ত বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী। ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি বাঙ্গালী কখনও মন দেয় নাই, তাই বাঙ্গালী চির দরিদ্র, রত্নগর্ভার সন্তান হইয়াও বাঙ্গালী ভিখারী।

মধ্য, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে কয়েকটী চিনির কল আছে, মাঝে কিছুদিন তাহাদের অবস্থা খারাপ হইলেও বর্ত্তমানে সকলেরই যথেষ্ট লাভ হইতেছে। বর্ত্তমানের সুযোগ লইয়া পুরাতন কলগুলি আয়তন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং অনেক নূতন কলও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সম্ভবতঃ এ বৎসরেই অন্ততঃ ১৯।২০ টা নূতন কল স্থাপিত হইবে। কিন্তু এসবগুলাই বিহার, যুক্তপ্রদেশে, পাঞ্জাব এবং দক্ষিণ ভারতে। বাংলায়ও নূতন কল স্থাপিত করিবার চেষ্টা কিছুদিন হইতে চলিতেছে কিন্তু আজিও কোনটাই সফলতা লাভ করিতে পারিল না। শিল্প এবং ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর ন্যায় পশ্চাৎপদ জাতি সারা ভারতে আর নাই।

তুলাজাত দ্রব্য :—

	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
পাকানো দড়ি, সুতা ইত্যাদি	২৫৮	৩১০
জামা কাপড় ও ছিট ইত্যাদি	১৩০৪	১৬৯৩
হোসিয়ারী দ্রব্য	৭৭	৫৮
রুমাল ও শাল	৪	৪
সুতা	৫১	৭১
অপরাপর	৩৫	৪০
মোট	১৭২৯	২১৭৬

উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখা যায় যে, হোসিয়ারী দ্রব্য ছাড়া সমস্ত বিভাগেই ১৯৩৩-৩৪ সালের অপেক্ষা ১৯৩৪-৩৫ সালে আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেলাইয়ের সুতা আসিয়াছে ৫৯ লক্ষ টাকার, ১৯৩৩-৩৪ সালে তাহা আসিয়াছিল ৫১ লক্ষ টাকার। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্য বৎসরে উহা ৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

হোসিয়ারী দ্রব্যের আমদানী পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৯ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে।

কাঁচা সিল্কের আমদানী পূর্ব্ব বৎসর হইতে ১৫ লক্ষ টাকা কমিয়া ৫৭ লক্ষ টাকা হইয়াছে। কিন্তু সিল্ক সুতার আমদানী পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩১ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া ৭৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। সিল্কের জামা কাপড় ছিট্ ইত্যাদির আমদানীর পরিমাণ হইল ১২৫ লক্ষ টাকা। এই সিল্কের ব্যাপারে একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উহার রপ্তানীকার হইতেছে চীন ও জাপান, এবং উহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় জাপানই ক্রমশঃ জয়ী হইতেছে।

কৃত্রিম সিল্কের আমদানীর পরিমাণ হইতেছে ৩৫৯ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে সুতা হইল ১১৮ লক্ষ টাকা ও পিস্ দ্রব্য হইল ১৮৩ লক্ষ টাকা।

পশমের আমদানীর পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৩১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। তন্মধ্যে কাঁচা পশমের পরিমাণ হইল ৪১½ লক্ষ টাকা; পশমী সুতা ২৯ লক্ষ টাকা, বুননের পশম ৩২ লক্ষ টাকা, পশমী পিস্ দ্রব্য ১৮২ লক্ষ টাকা, শাল ১২ লক্ষ টাকা, কার্পেট ও কম্বল ৩ লক্ষ টাকা, হোসিয়ারী

দ্রব্য ১২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

নিম্নে সমস্ত গুলির একটি যুক্ত তালিকা দেওয়া হইল।

আমদানী দ্রব্য	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
সেলাইয়ের সুতা	৫১ লক্ষ টাকা	৫৯ লক্ষ টাকা
হোসিয়ারী দ্রব্য	৭৭ " "	৫৮ " "
কাঁচা সিল্ক	৭২ " "	৫৭ " "
সিল্ক সুতা	৪৭ " "	৭৮ " "
সিল্কের পিস্ দ্রব্য	১৮২ " "	১২৫ " "
কৃত্রিম সিল্ক		৩৫৯ " "
পশমজাত দ্রব্য	২৫৫ " "	৩৮৬ " "

উপরোক্ত সমস্ত তালিকা হইতে দেখা গেল যে, তুলাজাত দ্রব্যের আমদানী প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পাইয়াছে, রেশম বিষয়ে কোনটীর আমদানী বাড়িয়াছে, কোনটির বা কমিয়াছে, পশমের ব্যাপারে আমদানী ভয়ঙ্কর ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ধাতু-দ্রব্য ও যন্ত্রপাতির আমদানী পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৮৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১১৩৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

লৌহ ইস্পাতের আমদানীর পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ৬৩৮ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে।

নিম্নে বিভিন্ন ধাতব দ্রব্যের আমদানীর তালিকা দেওয়া গেল :—

আমদানী দ্রব্য	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
গ্যাল্‌ভানাইজ্‌ড্‌ সিট্‌ ও প্লেট	১১৩'৪	১১০'৯
টিনের সিট্‌ ও প্লেট্‌	২১'৪	১৭
গ্যাল্‌ভানাইজ্‌ড্‌ নয় এমন সিট্‌ ও প্লেট্‌	৩১	৪২'৬
বীম, প্যানেল, পিলার ইত্যাদি—	২১	২৩'৫
টিউব্‌, পাইপ্‌ ও ফিটিং ইত্যাদি—	৭১'৬	৮৮'৮
বল্টু ও নাট্‌ ইত্যাদি—	২১'১	২৮'৬
পেরেক ও ওয়াসার ইত্যাদি	২৮'৩	৩২'১
রেল্‌ ও ফিস্‌প্লট্‌ ইত্যাদি—	৫	৭'৫
বেড়া দেওয়ার সরঞ্জামাদি—		১৮
ওয়্যার নেল্—	২০	২৪

আমদানী দ্রব্য	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
চাকা ও ফালি লোহা ইত্যাদি—	৩৫'৮	৪৫:৩

উপরোক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, টিন্ ও গ্যাল্‌ভানাইজ্‌ড্‌ প্লেট্ ও সিট্ ছাড়া অপর সকল বিষয়েই আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত দু'টি দ্রব্যের আমদানী কম হইবার কারণ এই যে, ঐ দুইটির উৎপাদন ভারতে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত ব্যতীত অন্যান্য ধাতুদ্রব্যের আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে উহাদের পরিমাণ ও মূল্য ছিল যথাক্রমে ৬২০০০ টন ও ৩৯৫ লক্ষ টাকা। ১৯৩৪-৩৫ সালে উহাদের পরিমাণ ও মূল্য দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮৬০০০ টন ও ৪৯৯ লক্ষ টাকা।

নিম্নে কতকগুলি ধাতুর আমদানীর তালিকা দেওয়া গেল :—

আমদানী দ্রব্য	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা।
এ্যালুমিনিয়াম্—	৩২'২৫	৩৮'২৫
পিতল—	১৩৮	১৬৮

আমনানী দ্রব্য	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
তামা—	৮৮	১৪০
সীসা—	৫·৪	৪ ৭
টিন্—	৫৫	৭০
দস্তা—	৩২	৩৫
জার্ম্মাণ সিলভার	১২	১০

উপরোক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমদানী রীতিমত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কল কারখানার যন্ত্রপাতি :—সমগ্র ভাবে ধরিলে আলোচ্য বৎসরে যন্ত্রপাতি পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৩ লক্ষ টাকা কম আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে উক্ত আমদানীর পরিমাণ ছিল ১২৭৭ লক্ষ টাকা, ১৯৩৪-৩৫ সালে উহা দাঁড়ায় ১২৬৪ লক্ষ টাকা। এই সামান্য আমদানী হ্রাসের প্রধান কারণ হইল এই যে, চিনির কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানী যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন দ্রব্যের আমদানীর একটা তালিকা দেওয়া হইল :—

আমদানী দ্রব্য	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
প্রাইম মুভারস্	১২১ ,,	১৪৪ ,,
ইলেট্রিক যন্ত্র	১২৭ ,,	১৬৯ ,,
বয়লার ইত্যাদি	৬৬ ,,	৪৪ ,,

খনিজ তৈল ঃ—

পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে খনিজ তৈলের আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত আমদানীর মূল্য হইল ৬০৭ লক্ষ টাকা।

খাদ্য সম্ভার

১৯৩৩-৩৪ সালে খাদ্যসম্ভার আমদানী হইয়াছিল ২৭২ লক্ষ টাকার, আলোচ্য বৎসরে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ২৮৯ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে বিস্কুট ও কেক হইতেছে ৩৩ লক্ষ টাকার অথচ পূর্ব্ব বৎসরে ইহার আমদানী মূল্য ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। বোতলে প্যাক্ করা খাদ্যসম্ভার আমদানী হইয়াছে ৫৯ লক্ষ টাকার, পূর্ব্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ৫৫ লক্ষ টাকা। ভেজিটেবিল্ ঘি আমদানী হইয়াছে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার উপর, পূর্ব্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ টাকা। "পেটেণ্ট ফুডরূপ খাদ্য ইত্যাদি আমদানী হইয়াছে ৭১ লক্ষ টাকার। কন্‌ডেন্সড্ মিল্ক আমদানী হইয়াছে ৪৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার উপর।

নিম্নে গুটি কয়েক খাদ্য দ্রব্যের আমদানী তালিকা দেওয়া হইল।

আমদানী দ্রব্য	১৯৩৩-৩৪		১৯৩৪-৩৫	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
	হন্দর	লক্ষ টাকা	হন্দর	লক্ষ টাকা
বেকন্ ও হ্যাম	১৫০০০	১২	১৬০০০	১১
পনীর	১০০০০	৮	১১০০০	৮
কোকো ও চকোলেট	৪০০০	৩	৫০০০	৪
মাখন	৫০০০	৬	৬০০০	৬
চাটনী, সস্ ইত্যাদি	৯০০০	৭	১০০০০	৭
জ্যাম ও জেলী	১৭০০০	৬	১৭০০০	৬
অপরাপর		১৫		১৬

ভারতের তুলা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

তুলা ভারতের একটি প্রধান সম্পদ। কাঁচা পাটের পরেই তুলার স্থান। অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যের তুলা প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ১৯২৮-২৯ সনে, ভারতবর্ষ বিদেশে ৬১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার তুলা বিক্রয় করিয়াছিল, জাপান ঐ বৎসর ২৯ কোটি টাকার তুলা এদেশ হইতে কিনিয়াছিল। তাহার পরবর্ত্তী দুই বৎসরে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও মূল্য কমিয়া যায়। ১৯৩১-৩২ সনে রপ্তানী তুলা মূল্য নামিয়া মাত্র ২১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩২-৩৩ সনে তুলার বিক্রয় আরও হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর গড়পড়তা ৫০ লক্ষ গাঁটরী তুলা জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রায় ২৩ লক্ষ গাঁটরী তুলা ভারতীয় কলগুলি কিনিয়া থাকে। (৪০০ পাউণ্ডে অর্থাৎ ৪ মণ ৩৮ সেরে এক গাঁটরী হয়) দেশবাসীর সাংসারিক কাজে (লেপ, তোষক, বালিশ তৈয়ারী, বোরিক্ কটন্ বা ঔষধি তুলা তৈয়ারীতে) আনুমানিক পাঁচ লক্ষ গাঁটরী দরকার হয়। বাকী ২০ লক্ষ গাঁটরী বা ততোধিক পরিমাণ তুলা প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানী হয়।

তুলা আন্তর্জ্জাতিক কৃষি-সম্পদ। অন্যান্য দেশের ফসলের পরিমাণ ও দরের উপর ভারতীয় তুলার দর নির্ভর করে। আমেরিকান মিড্‌লিং নামক উৎকৃষ্ট তুলা অপেক্ষা কিছু কম দরে ভারতের তুলা বিক্রয় হয়।

জাপানই ভারতীয় তুলার বৃহত্তম খরিদ্দার। শিল্প ব্যবসায়ে উৎকর্ষতা হেতু জাপান ভারতীয় তুলাদ্বারা কম ব্যয়ে যেরূপ সূতা তৈয়ারী করিতে পারে—ইংলণ্ড বা অন্যান্য দেশ তাহা পারে না। গত বৎসর ১০৩২-৩৩ সনে জাপান ভারত হইতে ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার গাঁটরী কিনিয়াছিল। ১৯২০ হইতে ১৯৩৩ পর্য্যন্ত ১৪ বৎসরে তাহারা এদেশ হইতে ২ কোটী ৯ লক্ষ গাঁটরী তুলা কিনিয়াছে। উহার মূল্য প্রায় সাত শত কোটী টাকা।

চীনও ভারতীয় তুলা যথেষ্ট কিনিয়া থাকে। গত পাঁচ বৎসর যাবৎ ঐ দেশ ভারত হইতে গড়ে ছয় কোটী টাকার তুলা কিনিয়াছে। জার্ম্মাণীও ১৯৩০-৩১ সন পর্য্যন্ত ভারত হইতে গড়ে প্রায় চারি কোটী টাকার তুলা কিনিয়াছে। সম্প্রতি দুই বৎসর জার্ম্মাণীতে ভারতীয় তুলা আমদানী অসম্ভবরূপে হ্রাস পাইয়াছে।

ইংলণ্ড প্রতি বৎসর ভারতে বহু কোটী টাকার কাপড় ও সূতা বিক্রয় করে। প্রতিদানে ভারত হইতে কিছু তুলাও তাহারা কিনিতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ড আজ পর্য্যন্ত ভারত হইতে খুব বেশী টাকার তুলা কিনে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে ইংরেজ প্রায় সব তুলা কেনে। ভারত হইতে

গড়ে ইহারা মাত্র তিন কোটী টাকার তূলা কিনিয়া থাকে।

১৯৩১-৩২ চারি বৎসরে ইংলণ্ড ও বিদেশ হইতে ১৬৫ কোটি টাকার তূলা কিনিয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র সাড়ে চৌদ্দ কোটি টাকার তূলা অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৮॥০ ভাগ ভারত হইতে কিনিয়াছে। অথচ, ইংলণ্ডজাত সূতা ও কাপড় রপ্তানীর মধ্যে অন্যূন শতকরা ২০ ভাগ ভারতে রপ্তানী হয়। ইংলণ্ড বিভিন্ন বৎসরে সমস্ত দেশে ও ভারতে কি পরিমাণ কাপড় রপ্তানী করিয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইলঃ—

কোটি গজ হিসাবে

বৎসর	সমস্ত দেশে রপ্তানীর পরিমাণ	ভারতে রপ্তানীর পরিমাণ
১৯০৭	৬৬০	২৫৭
১৯১৩	৭০৭	৩২৩
১৯১৯	৩৫২	৮৩
১৯২৩	৪১৪	১৫২
১৯২৯	৩৬৭	১৪৫
১৯৩২	২২০	৩৮

ইংলণ্ড ভারতে যে পরিমাণ কাপড় রপ্তানী করে তাহাতেও অন্যূন ১৫ কোটি টাকার তূলা দরকার হয়। সে তূলাও তাহারা এদেশে কিনিতেছে না।

ভারতীয় কলগুলি সম্প্রতি দেশের তূলা বর্জ্জন করিয়া বিদেশীয় তূলার দিকে নজর দিতেছে। গত পাঁচ বৎসর যাবত প্রতি

বৎসর বিদেশ হইতে ছয় কোটি বা ততোধিক টাকার তুলা তাহারা কিনিতেছে। অবশ্য মিহি স্থতা তৈয়ারীর জন্য তাহাদিগের বিদেশী তুলা কিছু না কিনিলে চলে না। কিন্তু ২০ নম্বর পর্য্যন্ত স্থতা তৈয়ারীতে বিদেশী তুলা দরকার হয় না। এবং ভারতীয় কলগুলি ঐরূপ স্থতাই বেশী তৈয়ারী করে।

জাপানী বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত শুল্ক স্থাপনের প্রতিবাদে জাপ ব্যবসায়িগণ গত জুন মাস হইতে ভারতীয় তুলা বর্জ্জন করিয়াছে। জাপানের সহিত একটা আপোষ মীমাংসা করিতে না পারিলে, ভারতীয় তুলা চাষীর সর্ব্বনাশ হইবে। কেন না, জাপান যে পরিমাণ তুলা কিনে তাহা অন্যত্র বিক্রয় করা যাইবে না।

রেশমী বস্ত্রে রং করার প্রণালী

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

৪১। বেসিক্ রং সহায়ে পশমে রং করা (Dyeing of woollen materials with Basic Colour) সাধারণতঃ নিম্নলিখিত 'বেসিক' রংগুলি ব্যবহার করা হয়। এই রংগুলি কিন্তু আলোর পক্ষে পাকা নহে।

রংগুলি নাইগ্রোসিন্ (Nigrosine), মেথিলিন্ ব্লু (Methylene Blue), মেথিল গ্রীণ (Methyll Green), ম্যালাচাইট্ গ্রীণ (Malachite Green), মেথিল ভায়লেট (Methyl Violet), ক্রাইসোডিন (Chrysodine), বিসমার্ক ব্রাউন্ (Bismark brown), ম্যাজেণ্টা (Magenta), রোডামিন (Rhadamine), অরামিন্ (Aramine), ইত্যাদি

(১) রংয়ের জন্য—

দ্রব্যাদি	½ সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
রং	½-১ তোলা	৫-১০ তোলা
জল	১৫ সের	৩ মণ ৩০ সের

সামান্য একটু গরম জল লইয়া তাহাতে রংটা গুলিয়া দাও। তারপর সূক্ষ্ম একখানি কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লও।

(২) রং করিবার প্রণালী—

যে পরিমাণ জল লাগিবে তাহাদ্বারা এইবার রংয়ের জলটা তৈয়ার কর। জলের মধ্যে এ্যাসেটিক এসিড মিশাও (জলটা যদি ক্ষারযুক্ত Alkaline হয় তাহা হইলে কিন্তু Acid আরও বেশী লাগিবে)। আগে রেশমের বস্ত্রে 'বেসিক কলার' দ্বারা রং করিতে যে ভাবে ক্রমে ক্রমে রংটা এই জলের সহিত মিশাইতে হয়, এখানেও তাহাই কর। বস্ত্রগুলি যখন দিবে, তখন যেন জলটা ঈষদুষ্ণ থাকে। কিন্তু তাহার পরই তাপ বাড়াইতে বাড়াইতে ফুটন্ত অবস্থার কিছু নীচে রাখিবে। অর্থাৎ তাপ যেন কখনও ৮০° সেন্টিগ্রেডের উপরে না যায়। ঐ তাপে বস্ত্রগুলিকে ৪৫ মিনিট ধরিয়া রং করিতে থাক। তারপর ধুইয়া নিংড়াইয়া শুকাইতে দাও দেখিবে যেন আলোতে না দাও।

'বেসিক গ্রীণ' (Basic Green) অর্থাৎ 'মেথিল গ্রীণ (Methyl Green) ও 'ম্যালাচাইট্ গ্রীণ' (Malachite Green) রং করিতে হইলে, পশমের বস্ত্রকে প্রথমতঃ নিম্নলিখিত জলে ধুইয়া পরে উপরের প্রণালীমত রং করিও।

দ্রব্যাদি	½ সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
সোডিয়াম থাইয়ো সালফেট (Sodium Thiosulphate	২ তোলা	২০তোলা
সালফিউরিক এসিড		

(Sulphuric Acid)	১½ তোলা	১৫ তোলা
ফিট্‌কিরি	১½ তোলা	১৫ তোলা
জল	১০ সের	২ মণ ২০সের

উপরি লিখিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও তদুপযুক্ত জলদ্বারা আগে জলটা তৈয়ারি করিয়া লও। তারপর ইহাকে গরম করিয়া ফুটন্ত অবস্থা পর্যন্ত নাও। এই অবস্থায় পশমের দ্রব্যাদি এই জলে ৪৫ মিনিট কাল ধরিয়া কাজ করিতে থাক। তারপর টাটকা জলে ধুইয়া সাধারণ ভাবে রং করিয়া লও।

৪২। এসিড্ যুক্ত রং সহায়ে পশমে রং করা Dyeing of wool with Acid Colour সকল রকমের এসিড্‌যুক্ত রংই পশমের রঙ্গে ব্যবহার করা যায়। কতকগুলি নাম নিম্নে দেওয়া গেল:—কুইনোলিন ইয়েলো Quinoline Yellow, মেটানিল ইয়েলো (Metanil yellow), এসিড্ ইয়েলো জি (Acid yellow G), এসিড্ অরেঞ্জ জি (Acid Orange G), ক্লথ রেড্ বি এ (Cloth Read B. A), গিনি রেড (Guinea Red), কার্ডিন্যাল রেড (Cardinal Red) এসিড্ স্কালেট এফ আর আর (Acid Scarlet F. R. R.), রেডিও রেড জি (Radio Red G.) ব্রিলিয়াণ্ট স্কার্লেট (Brilliant Scarlet), মিলিং রেড (Milling Red), উল রেড বি (wool Red B), এসিড ভায়লেট (Acid Violet) এ্যাজো ভায়লেট ফর্মিল ভায়লেট (Formyl Violet), ব্রিলিয়াণ্ট মিলিং ব্লু বি Brilliant Milling blue B.), উল ব্লু থ্রী আর (Wool Blue 3 R), সলিউবল ব্লু টু আর (Soluble Blue 2 R), এল্কালি ব্লু ৪ বি (Alkali blue 4 B), কুমাশি নেভি ব্লু (Coomassie Navy Blue), ফাষ্ট এসিড্ গ্রীণ (Fast Acid Green), সিয়ানোল্ গ্রীণ (Cyanole Green) ব্রিলিয়াণ্ট মিলিং গ্রীণ (Brilliant Milling Green), রেডিও ব্রাউন (Redio Brown) উল ব্ল্যাক (Wool Black), ন্যাপথিলামিন্ ব্ল্যাক্ (Napthylamine black), এজো মেরিনো ব্ল্যাক (Azo Merino Black), সালফোনসিয়ানিন (Sulphoncyanine)।

রং গোলার

জন্য দ্রব্যাদি	½ সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
রং	½-৩ তোলা (রংযের গাঢত্ব অনুসারে)	৫-৩০ তোলা রংয়ে গাঢ়ত্ব অনুসারে)
সালফিউরু এসিড্ Sulphuric Acid	২ তোলা	২০ তোলা
গ্লবার্স সল্ট (Glaubers Salt)	৫ তোলা	৫০ তোলা
অথবা		
সোডিয়াম বাইসাল্‌ফেট	৪ তোলা	৪০ তোলা
জল	১৫ সের	৩ মণ ৩০ সের

প্রথমে একটা ভিন্ন পাত্রে অল্প কিছু গরম জল লইয়া রংটাকে গুলিয়া লও। তারপর যখন বেশী জলের সাথে মিশাইবে ঠিক তাহার পূর্ব্বে একখানি পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে।

(২) বাকী পরিমাণ জল, রাসায়নিক দ্রব্য এবং উপরের রং গোলা এক সাথে মিশাইয়া বেশ ভাল করিয়া নাড়িয়া দাও। এখন, হাতে সহে এরূপ গরম করিয়া তাহার ভিতরে পশমের দ্রব্যাদি দিয়া ১৫।২০ মিনিট ধরিয়া কাজ করিতে থাক। তারপর তাপ আস্তে বাড়াইয়া প্রায় ফুটন্ত অবস্থায় আন। আনিয়া, ৪৫ মিনিট

ধরিয়া ঐ তাপে রং করিতে থাক। তারপর আগুন হইতে পাত্রটা সরাইয়া লইয়া কয়েক মিনিটের জন্য ঠাণ্ডা হইতে দাও। এইভাবে রংকরা বস্ত্রগুলি প্রচুর পরিমাণ ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া, নিংড়াইয়া শুকাইয়া লয়। যে সকল দ্রব্য আগাগোড়া পশমের তৈয়ারী, সাধারণতঃ সেই সকল বস্ত্রেই এই এসিড্ রং ব্যবহার করিতে হয়। এই রং ধুইলে বা আলোতে রাখিলেও উঠিয়া যাইবে না।

ক্রমশঃ

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

পত্র লেখকগণের প্রতি

(যাঁহারা গ্রাহক নহেন)

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাঁহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, অথচ বিনামূল্যে এমন সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন যাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তাঁহাদের মতলব, **"একটি হরিতকীও গুরুদক্ষিণা দিব না,—গুরু মন্ত্রটি আদায় করিয়া নিব"**। এই রকমের লেখকদিগকে আমরা জানাইতেছি, ব্যবসায়ীর সন্ধান এবং মাল পত্র বেচা-কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাঁহারা এক একটা মালের জন্য এক এক বারের কারবারে শ' দু'শ হইতে হাজার টাকা পর্য্যন্ত দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও

নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্য ৫।৵০ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হইলেই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা মোটা দালালী দিতে অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ, এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,—নেও,—দেও,—ফেল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাঁক তালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,—অথচ তার জন্য একটী পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ। ই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

১৬ বৎসর যাবৎ কার্য্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি, গোড়াতে ফাঁকিবাজীর মতলব, বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে একটা প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য আমাদের অনুরোধ, যাঁহারা সদ্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন। যাঁহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-শুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান মুফতি দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে এই যে, তাহারা যথেষ্ট লাভবান এবং উপকৃত হইয়াছেন আর আমরা লাভবান হওয়া ত দূরের কথা, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাহাদের পেট ভরাইযাছি। কিন্তু সহের একটা সীমা আছে। এই জন্য অতঃপর গ্রাহক না হইলে কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।

(যাঁহারা গ্রাহক আছেন)

আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহকগণ আমাদিগকে নানাবিধ ব্যবসায়সংক্রান্ত পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সকল প্রশ্ন করেন তাহার উত্তর ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিনা মূল্যেই প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ঐ সকল পত্রের অধিকাংশই উদ্দেশ্যবিহীন বৃথা প্রশ্নে পরিপূর্ণ। অনেকেই কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান। বাস্তবিক কোন কাজকারবারে হাত দিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। তাঁহাদিগকে জানাইতেছি আমরা তাঁহাদের জন্য বাজারে ঘুরিয়া অশেষ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া নানা রকমের সংবাদ সংগ্রহ করি, যদি তাঁহারা সে সকল কোন কাজে না লাগান, তবে আমাদের শুধু শুধু হয়রান এবং অর্থ ব্যয় করান কেন? তাঁহাদের নিকট অনুরোধ, যেন খামকা আমাদিগকে প্রশ্ন না করেন এবং আমাদের নিকট হইতে যে সন্ধান, সংবাদ অথবা পরামর্শ পাইয়া থাকেন তাহা যেন যথার্থ কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া নিজেরাও লাভবান্ হন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিশ্রমকেও সার্থক করেন।

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মারফতে দিতে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, আমরা সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথকভাবে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র জোগাড় করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি **আমাদের যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ৫৲ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন।** গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে এই ফি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদিগের কাগজেই বিনা মূল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিকে প্রদান করিব। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক নম্বর পাঠানো চাই।**

১নং পত্র

মহাশয়,

আপনার পত্রিকায় "গুলি সুতার কলের" বিজ্ঞাপন দেখিলাম। আমি উক্ত কল সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত কলের সমস্ত বিষয় সহ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দেন তবে বড়ই অনুগৃহীত ও উপকৃত হইব। আশা করি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমস্ত বিষয় আমাকে জানাইবেন।

১। কলের দাম কত এবং Instalment এ পাওয়া যাবে কিনা?

২। দৈনিক (৮ ঘণ্টা) একটী কলে কত গুলি প্রস্তুত করা যাবে?

৩। এক সের সূতায় কতটী গুলি হইতে পারে এবং এক সের সূতার দাম কত এবং ঐ সূতা দ্বারা প্রস্তুত গুলি বাজারে কত দরে বিক্রয় হইতে পারে?

৪। কিছু সূতার ও গুলির নমুনা পাঠাইবেন।

মোটের উপর আপনি উক্ত কলের এক দিনের অথবা এক মাসের মোটামোটি আয় ও ব্যয়ের একটী হিসাব আমাকে দিবেন।

আশা করি, শীঘ্রই আপনার উত্তর পাইব।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার

ষ্টেশন রোড, ধুবড়ী (আসাম)

১ নং পত্রের উত্তর

১। গুলি সূতার কলের মূল্য ৮০ টাকা। প্যাকিং খরচা স্বতন্ত্র। কিস্তি হিসাবে মূল্য লওয়া হয় না।

২। দৈনিক একটী কলে কম পক্ষে এক হাজার গুলি তৈয়ারী হয়।

৩। এক সের সূতায় ৭০০ গুলি তৈয়ারী হইতে পারে। এক সের সূতার দাম ১।৶০ আনা। বাজারে ৭০০ গুলির খুচ্‌রা দাম ১০৸৶০

৪। সূতার ও গুলির নমুনা পাঠাইতে পারি না। আমাদের আফিসে আসিয়া দেখিতে পারেন।

নিম্নে একটা আনুমানিক এষ্টিমেট্‌ দেওয়া হইল,—

দশ পাউণ্ড সূতার বাণ্ডিলের দাম— ৭৲
এক পাউণ্ড Bleaching Powderএর দাম-১/০
এক পাউণ্ড সোডার দাম— ৴১০

দেড় পোয়া এরোরুটের দাম জ্বালানি খরচ সমেত ৶১০

এক জন মজুর দৈনিক কমপক্ষে এক হাজার গুলি কাটীতে পারে; এক বাণ্ডিল সূতার ৩৫০০ গুলি তৈরী হয় এবং ইহা কাটিতে দৈনিক সাড়ে তিনজনের মজুরী লাগে। প্রত্যেক মজুরের মজুরী দৈনিক একটাকা হিসাবে ৩৫০০ গুলি কাটিতে দৈনিক মজুরী পড়ে— ৩৷০

লেবেল মারা, প্যাক্‌ করা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যয় দৈনিক— ১৲

ঘর ভাড়া, আলো, পাখা, চাকর ইত্যাদি বাবদ দৈনিক ব্যয়— ২৲

অন্যান্য খরচ বাবদ দৈনিক ব্যয়— ১৲

মোট ব্যয় ১৫৲

বাজারে গুলিসূতা পয়সায় একটী করিয়া খুচ্‌রা বিক্রয় হয়। সেই হিসাবে ৩৫০০ গুলির দাম— ৫৪৷৶০

ইহা হইতে পাইকারদিগকে শতকরা ২৫% হারে কমিশন বাদ দিলে পড়ে ১৩৷৶০ তাহা ছাড়া বাজার চলিত দাম অপেক্ষা শতকরা ২৫% টাকা কম দামে মাল বেচিবার জন্য ইহা হইতে আরও বাদ দেওয়া গেল ১৩৷৶০

অতএব বিক্রেয় মূল্য হইতে মোট বাদ গেল— ২৭।৶০

মাল তৈরী করায় মোট খরচ পড়িয়াছে ১৫৲

সুতরাং এক বাণ্ডিলের আয় হইতে মোট খরচা পড়িল— ৪২।৶০

এবং উহার বিক্রয় মূল্য মোট ৫৪৷৶০; সুতরাং প্রত্যেক বাণ্ডিল সূতা হইতে দৈনিক নিট্‌ আয় হয় ১২।৴০; এই হিসাবে একটী গুলিসূতার কল চালাইয়া মাসে ৩৬০৲ টাকারও বেশী আয় হইতে পারে।

২নং পত্র

মহাশয়,

অন্য কয়েকটি কথা জানিবার জন্য আপনাকে লিখিতেছি, আশা করি, দয়া করিয়া উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

১। আমাদের এখানে বর্শিজোরা পাহাড়ে কয়লা বা কেরোসিন তেলের খনি আছে বলিয়া অনুমান হয়। আপনার জানা কোন কোম্পানী এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পারেন কি না জানিতে ইচ্ছা করি, যদি এ রকম কোন কোম্পানীর সন্ধান জানা থাকে তবে দয়া করিয়া শীঘ্র তাঁহাদের ঠিকানা জানাইয়া বাধিত করিবেন। ইচ্ছা করিলে আপনার মধ্যবর্ত্তিতায় তাঁহাদের সহিত আলোচনা চলিতে পারে।

২। দর্জ্জির দোকানের পরিত্যক্ত টুকরা কাপড় পেপার মিলে বিক্রী হয় শুনিয়াছি।

আমি এ অঞ্চলের টুকরা কাপড়গুলি সরবরাহ করিতে ইচ্ছা করি। কোন্ ঠিকানায় এবং মণকরা কত দামে বিক্রী হয় জানিতে ইচ্ছা করি।

৩। কমলা ও আনারস প্রিজার্ভ করিয়া কলিকাতা যোগান দিতে চাই। কোথায় অনুসন্ধান করিব।

৪। আনারসের মোরব্বা এবং চাট্‌নী টিনের ক্যানে বন্ধ করিয়া যোগান দিতে চাই। কলিকাতায় কোথায় বিক্রীর সুবিধা হইতে পারে দয়া করিয়া জানাইবেন।

একখণ্ড ব্যবসা বাণিজ্য পত্রিকা (যাহাতে আনারস, কমলা ইত্যাদি ফল সম্বন্ধে আলোচনা আছে এবং ইণ্ডিয়ান রাণার হাসের কথা আছে) আমার নামে ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। পত্রিকাখানা পুরাতন হইলেও আপত্তি নাই। ইতি—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ নন্দী
পোঃ বালাগঞ্জ, গ্রাম চরভিটা,
জেঃ শ্রীহট্ট।

২নং পত্রের উত্তর

১। কয়লা বা কেরোসিন তেলের খনির আবিষ্কার ও তাহার কার্য্য করা ছোট খাট দশ বিশ লাখ টাকার কোম্পানীর কার্য্য নহে। তাহার জন্য বিরাট্ আয়োজন চাই। দেশীয় কোন কোম্পানীর কেরোসিন তেলের খনি নাই। কয়লার খনির মালিক অনেক বাঙ্গালীও আছেন। যাহা হউক, আমরা আপনার পত্রের মর্ম্ম "ব্যবসায়ের সন্ধান" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করিলাম।

২। দর্জ্জির দোকানের ছাঁট-কাট সম্বন্ধে আমাদের গত মাঘ মাসের (১৩৪৩) 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' পত্রিকায় পত্রাবলী অধ্যায়ে আপনার প্রয়োজনীয় উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিবেন।

৩। ৪। যে সকল কোম্পানী মোরব্বা প্রভৃতির ব্যবসা করেন, তাঁহাদের কয়েকটীর নাম ও ঠিকানা নিম্নে লিখিত হইল। আপনি ঐ সকল ফার্ম্মে চিঠি লিখিয়া সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক করিতে পারেন।

(1) G. F. Kellner & Co Ltd, 32, Chowringhee Road Calcutta. (2) J. N. Madan & Co, 5 Dharamtalla Street, Calcutta. (3) Mukherjee & Co, 20 Bertrain Street, Calcutta. (4) Haragovind Das Tribhuban Das 55 Ezra Street, Calcutta.

এই সকল কোম্পানী খুব বড় রকমের। ভাল প্যাকিং এবং সুন্দর লেবেল প্রভৃতি না থাকিলে এখানে মাল চলিবে না। কলিকাতায় আরও অসংখ্য ছোট খাট দোকান আছে। তাহাদের সহিত কারবার করিতে হইলে আপনাকে এখানে আসিয়া কথাবার্ত্তা ঠিক করিতে হইবে।

৩নং পত্র

মহাশয়,

আমি একটী ৬৫ বৎসরের বুড়া ভদ্রলোক, অনেক অর্থ উপার্জ্জন ও ব্যয় করিয়াছি, আমিও স্বদেশীর ডাকে বাহির হইয়া যাওয়ায় মাননীয় বিপিন চন্দ্র পাল, স্থরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি, কাব্য-বিশারদ ও অন্যান্য গণ্য মান্য লোকদের এবং আপনার প্রাণস্পর্সি বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম।

তাহা আজও মনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। আমার মনে হয়, আপনি সেই "শচীন্দ্র প্রসাদ বসু" যাহার নামটী গত ২৫।৩০ বৎসর যাবৎ প্রাণে ধরিয়া রাখিয়াছি। যদি ভুল বুঝিয়া থাকি তবে ক্ষমা করিবেন।

আমি আই, জি, আর, এস্ কোম্পানীর অধীনে গোয়ালন্দ লাইনে ষ্টেশন মাষ্টারী করিয়া বেতন ও কমিশন ইত্যাদি বাবদ মাসে মাসে বেশ ভাল টাকা পাইয়াছি কিন্তু বেশীদিন আর ঐ ভাবে চাকুরী বজায় রাখিয়া মনে প্রাণে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়া হইয়া উঠে নাই। ১৯১৩ সনের জানুয়ারী মাস হইতে চাকুরী ছাড়িতে বাধ্য হই, সেই সময় হইতেই ঢাকায় আছি। অর্থাভাবে কিছুই করিতে পারি নাই, এখন বৃদ্ধ বয়সে বড়ই কষ্টে পড়িয়াছি; আমার একান্ত ইচ্ছা অল্প টাকায় একটা মোজার কল (যাহারা চুক্তি করিয়া নির্দ্দিষ্ট একটা মজুরী দিয়া তৈয়ারী মোজাগুলি নেয়) খরিদ করিয়া একটি ভাল কাজ জানা লোক দ্বারা মোজা তৈয়ারী করিয়া কিছু কিছু উপায় করি, কিন্তু সেইরূপ ভাল বিশ্বস্ত কোম্পানী পাই নাই; আপনাদের সঙ্গে অনেক কোম্পানীর জানা শুনা আছে। ঐ প্রকার ২।১ টা কোম্পানীকে দয়া করিয়া জানাইলে তাহারা তাহাদের Prospectus পাঠাইবে। অথবা আমাকে জানাইলেও হয়। ইহা ছাড়া অন্য কিছু আমার জন্য অল্প টাকায় ব্যবস্থা করার থাকিলে দয়া করিয়া তাহাও জানাইতে পারেন।

আমি আপনার দ্বারা উপকৃত হইলে তাহা ভুলিব না; আপনার কাগজের গ্রাহক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা কিছুও করা যাইতে পারে। আমার একটী ছেলেও বসিয়া আছে তাহার দ্বারায় ছোট খাট একটা কিছু করান যাইতে পারে।

আমরা এখান হইতে বিজ্ঞাপন দেখিয়া ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারি না, হুজুগে পড়িয়া অনেক ঠকিয়াছি এখন, আর ঠকিবার মত অর্থ নাই, তাই অত চিন্তা। আশা করি, দয়া করিয়া একটা ভাল পন্থা বলিয়া দিবেন। আমরা সন্তান সন্ততিক্রমে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। একটু কষ্ট বা ক্ষতি হইলেও এ উপকারটুকু করিতে ভুলিবেন না। সর্ব্বদা আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি!

নিবেদক
শ্রীরেবতী মোহন ঘোষ
ফরিদাবাদ, পোঃ ঢাকা।

৩নং পত্রের উত্তর

মোজার কল যাহারা আপনার নিকট বিক্রয় করিবে, তাহারা আপনার মাল বিক্রয়ের জন্য কোন চুক্তি করিবে না। মাল বিক্রয়ের বন্দোবস্ত আপনাকেই করিতে হইবে। সকল ব্যবসায়েই ইহা প্রকটী প্রধান বিষয়। আপনি স্থানীয় সেলিং এজেন্সীর সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক করিতে পারেন। বড় বড় কারখানার উৎপন্ন মালপত্র বিক্রয় করিবার অনেক বড় বড় এজেন্ট্ আছেন কিন্তু ছোট খাট কারখানায় তৈয়ারী দশ বিশ জোড়া মোজা অথবা দুই তিন ডজন গেঞ্জী বিক্রয়ের এজেন্সী কেহ লয় না এবং এইরূপ এজেন্সী দিয়াও কোন লাভ নাই। কারণ, এজেন্ট্‌কে কমিশন দিয়া লাভ কিছু থাকে না।

আপনার মত লোকেরা মনে করে, ব্যবসা বাণিজ্য একটা আলাদীনের প্রদীপ। চক্ষের পলকে উহাতে কুঁড়ে ঘরের স্থলে অট্টালিকার

সৃষ্টি হয়। আপনি আজ মোজার কল ঘুরাইয়া ৫০০ জোড়া মোজা তৈয়ারী করিলেন, আর তখনি এজেন্টেরা উহা ৫০০ টাকায় কিনিয়া নিল,—আপনি নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় পকেটে পাঁচ শত টাকা পুরিলেন!—এ ভোজবাজীর খেলা নহে।

আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন,—আপনার ছেলেরা যুবক, তাহাদিগকে খাটিতে শিখান, পরিশ্রম করিতে অভ্যস্ত করুন। লোকের বাড়ী যাইয়া আপনার তৈয়ারী মোজা বিক্রয় করিতে দিন। তারপর কারবার বড় হইলে এজেন্ট ঠিক করুন। তুড়ি মারিয়া কেল্লা ফতে হয় না।

৪নং পত্র

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠিখানি পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। আমার পূর্ব্বের চিঠি না পাওয়ার কারণ বুঝিলাম না। যাহা হউক, আমি সে জন্য বিশেষ লজ্জিত এবং আশাকরি, তার জন্য ক্ষমা করিবেন।

আমি পূর্ব্বের চিঠিখানিতে আপনাদের 'গুলিসূতার' কলের সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছিলাম।

আপনাদের ঐ কল হইতে কি কি প্রকার সূতা প্রস্তুত হইতে পারে? এবং সত্যই কি মাসিক আয় ৩০০৲ টাকা আন্দাজ হইতে

পারে? এ সম্বন্ধে আমি আপনার উপদেশ ও পরামর্শ চাহিতেছি। আশাকরি, আপনি তা' দিতে কার্পণ্য করিবেন না। আমার সংসারে পোষ্য অনেক, কাজেই এই সামান্য দরজীর কারবার হইতে তাহার খরচ কিছুতেই সংকুলান করিতে পারিনা। অন্ততঃ মাসে নেট আয় যদি ২৫০৲ টাকা আন্দাজ হয় তবে একটু ভাল ভাবে থাকা যায়। সুতরাং বন্ধুভাবে, ব্যবসায়ী হিসাবে নহে আমাকে উপদেশ দিবেন, যে, কি করিলে আমার ঐরূপ আয় হইতে পারে।

উপস্থিত কোন অর্ডার লইবেন না। আগামী মাস হইতে আমি আপনাদের কাগজের গ্রাহক হইব। নমস্কার লইবেন।

ইতি—

শ্রীপ্রবোধগোপাল মুখোপাধ্যায়

৪নং পত্রের উত্তর

গুলি সুতার কল সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ১নং পত্রের উত্তরে জানিবেন। আপনি যে পরিমাণ আয় করিতে চাহেন, এই কলের দ্বারা তাহা সম্ভব।

আপনি লিখিয়াছেন, "বন্ধুভাবে উপদেশ দিবার জন্য, ব্যবসায়ী হিসাবে নহে।" আমরা উপদেশ বন্ধু ভাবেই দিয়া থাকি, এবং তাহাতে আমাদের ব্যবসায়িত্ব নষ্ট হয় না। যিনি ব্যবসায়ী তিনি যে বন্ধু হইতে পারেন না, এমন নহে।

৫নং পত্র

মহাশয়,

আপনার ব্যবসা বাণিজ্য পত্রিকা পাইলাম। আমি আশাকরি, আপনাদের আফিশ হইতে সময় সময় কারবারের সুপরামর্শ পাইব। আমি ধান্য, পাট, সরিষা, ও সুতার বেচাকিনা করি। আপনি দয়া করিয়া আমাকে R. P. D. করগেট টীন্, সুতা, মনিহারি, কাপড় ইত্যাদির ক্যাটলগ পাঠাইবেন। গত চালানে কলিকাতা গিয়া ৭০০৲ সাতশত টাকার সুতা আনিয়া ছিলাম। দয়া করিয়া ভাল ভাল কোম্পানীর ঠিকানা ও ক্যাটলগ দিবেন, যেন অন্যথা না হয়। নিবেদন ইতি—

গ্রাহক নং ৫৮৩৮

শ্রীমিছিরাম এনা

পোঃ বাদাইগঞ্জ, আগরাটী

জিঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

৫নং পত্রের উত্তর

আমরা কোন মালের ক্যাটালগ বা মূল্য তালিকা পুস্তক রাখি না। ইহার জন্য আপনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

টীন,—(1) A. N. Hussanally & Co. 20 Strand Road, Calcutta (2) Anandji Haridas & Co. Ltd. Moer baharghat, Lohapatty Calcutta. (3) H. C. Ray & Co., 13 Clive Street Calcutta. (4) S. C. Guin & Bros., 43 Clive Street, Calcutta (5) Seal & Co., 81 Clive Street, Calcutta.

সুতা,—(1) Adamji Haji Dowood & Co Ltd., Stephen House, Dalhousie Sq. East, Calcutta. (2) Gokuldas Damodar Das 85, Cross Street, Calcutta. (3) Indian Yarn Trading Co Ltd., 137 Cotton Street., Calcutta

(4) P. N. Mehta & Co. 208 Cross Street, Calcutta.

মণিহারী;—(1) D. N. Bhattacharya & Sons, 33. Canning Street, Calcutta (2) Gaurchand Pal 71/4 Canning Street, Calcutta (3) H. M. Zakaria 126, Colootola Street, Calcutta. (4) Makhanlal Matilal, Manihari-pati Barobazer, Calcutta.

কাপড় ;—(I) Calcutta Cloth Stores 67।4 Strand Road, Calcutta (2) Mafat Lal Gagal Bhai 193, Harrison Road Calcutta (3) Chamanlal Mangal Das & Co. 31 Armenian Street, Calcutta. (4) Chaturbhuj Gordhan Das & Co. 23, Pollock Street, Calcutta,

৬নং পত্র

সবিনয় নিবেদন এই যে।—

অত্র সামান্য রবার আপনার নিকট পাঠাইলাম, মেহের বাণী করিয়া তাহার দর জানাইবেন, কলিকাতা পৌছাইয়া দিলে মণ প্রতি কি দরে লইবেন তাহা অবশ্য জানাইবেন। আপনার পত্র পাইলে আমি রবারের সংগ্রহ করিতে পারি। এই অঞ্চলে কোন কোন স্থানে রবার পাওয়া যায়। এদেশীয় লোকেরা সর্ব্বদা আমাকে রবার লইবার জন্য বিরক্ত করিতেছে। দর জানা নাই বলিয়া আমি রবার লইতে পারিতেছি না সঠিক রবারের দর জানাইবেন। অধিক কি আর বা করিব, আমরা ভাল আছি। আগতে আপনাদের কুশলাকাঙ্ক্ষী আপনার পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম।

নিং—
মহম্মদ আলেপ খাঁ
পোঃ লুংলে
S. Lushai Hill,
Via Chittagong

৬নং পত্রের উত্তর

আমরা রবার কেনা বেচা করি না। আপনার পত্রের মর্ম্ম এই পুস্তকের ব্যবসায়ের সন্ধান শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল। রাবার ব্যবসায়ীরা আপনার নিকট সোজাসুজি চিঠি লিখিবেন।

আমাদের দেশে এমন অনেক কারখানা আছে, যেখানে নানারকম রাবারের জিনিস তৈয়ারী হয়। ঐ সকল কারখানায় আপনি রাবার সরবরাহ করিতে পারেন। নিম্নে আমরা কয়েকটী কারখানার নাম ও ঠিকানা দিতেছি। আপনি আমাদের নাম করিয়া তাঁহাদের নিকট চিঠি লিখিলে দরদস্তুর সমস্তই জানিতে পারিবেন।

(1) Bengal Water Proof Works 2, Nazarali Lane. Ballygunge, Calcutta. (2) Dunlop Rubber Co. (India) Ltd. 42, Free School Street, Calcutta (3) Young Bengal Rubber Solution Co., 22 Park Lane, Calcutta. (4) India Rubber Goods Manufacturing Co. 47, Murari Pukur Lane, Maniktola, Calcutta. (5) Calcutta Rubber Works 1, Sura Cross Lane Beliaghata, Calcutta. (6) Bata Shoe Co Ltd, P.O. Bata-nagar, 24 Perganas.

(১)

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত চরভিটা (পোঃ বালাগঞ্জ) গ্রাম নিবাসী শ্রীযতীন্দ্রনাথ নন্দী আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন (পত্রাবলী শীর্ষক প্রবন্ধে ২নং পত্র দেখুন) যে, সেখানকার বশিজোড়া পাহাড়ে কয়লা অথবা কেরোসিন তৈলের খনি থাকা সম্ভব। কোন ব্যবসায়ী কোম্পানী এবিষয়ে উৎসাহী থাকিলে তাঁহার নিকট পত্রাদি লিখিয়া সবিশেষ জানিতে পারেন।

●

(২)

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই পাহাড়ের অন্তর্গত লুংলে হইতে মহম্মদ মালেক খাঁ নামীয় জনৈক ভদ্রলোক আমাদিগকে এক খানি চিঠি লিখিয়াছেন। তিনি সেখানকার পাহাড়ের জঙ্গল হইতে রাবার সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান দিতে চান। যাঁহারা রাবার কেনা-বেচা করেন অথবা রবারের কারখানা পরিচালনা করেন, তাঁহারা ঐ ভদ্রলোকের সহিত সোজাসুজি চিঠিপত্র লেখালেখি করিয়া কথাবার্ত্তা ঠিক করিতে পারেন। তাঁহার চিঠি এই পুস্তকের পত্রাবলী শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল (৬নং পত্র দেখুন)।

●

(৩)

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত করিমগঞ্জ সহরের Rowe & Co'র মালিকের নিকট হইতে আমরা একখানি পত্র পাইয়াছি। উক্ত কোম্পানী 'গন্ধমাত্রিকা' এবং তদ্রূপ অন্যান্য বনজ ঔষধ সরবরাহ করিতে পারেন। ইহার জন্য তাঁহারা একজন ভাল দালাল চান। যিনি এই কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তিনি সোজা-সুজি উক্ত কোম্পানীর মালিক Dijendra K. Braja B. Roy এর নিকট পত্র লিখিয়া সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক করিতে পারেন।

●

(৪)

বরিশাল হইতে মিঃ সি সি গুপ্ত আমাদিগকে জানাইয়াছেন, তিনি প্রচুর পরিমাণ "পুরাতন ঘি" সরবরাহ করিতে পারেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত কারবার করিতে চান, তাঁহারা নিম্ন ঠিকানায় তাঁহার নিকট পত্র লিখুন,—
C. C. Gupta Esq. Gupta Cottage Barisal.

ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক অথবা পাঠকদিগের মধ্যে যদি কাহারও কোনও জিনিষ বেচিবার বা কিনিবার দরকার থাকে তবে তাহা আমাদিগকে জানাইলে আমরা বিনামূল্যে আমাদের "ব্যবসায়ের সন্ধান" নামক অধ্যায়ে তাহা আমূল প্রকাশ করিব। ইহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা যথেষ্ট লাভবান হইবেন। নাম, ধাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং চিঠি পত্রাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন।

স্বাস্থ্যোন্নতি ও বেকার সমস্যার সমাধান ব্যবস্থা
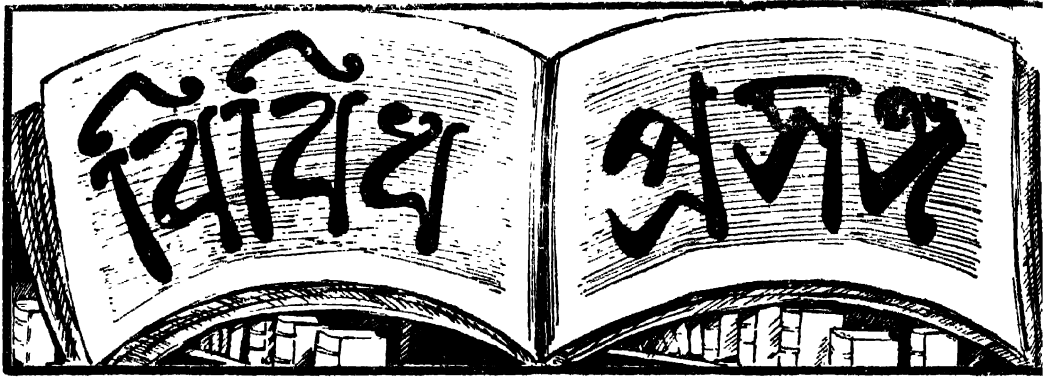
লণ্ডনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এক সরকারী ঘোষণা পত্রে, গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানাদিকে স্বাস্থ্যোন্নতি ও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী তহবিল হ'তে বাৎসরিক চার কোটী চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড কি ভাবে প্রদান করবেন তার একটা ব্যবস্থা পত্র প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত টাকা প্রয়োজনানুসারে চার কোটি নব্বই লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ঐ অর্থ বিশেষ ভাবে বেকার সমস্যা সমাধান ও স্বাস্থ্যহীনতা ও দারিদ্র্য নিবারণকল্পেই ব্যয়িত হ'বে এবং ইংলণ্ড ও ওয়েলস্‌এর যে সমস্ত অঞ্চল অত্যধিক দুর্দ্দশা-গ্রস্ত, সেই সমস্ত অঞ্চলে খুব বেশী রকম টাকা প্রদান করবার ব্যবস্থা করা হ'বে।

বিলাতের গভর্ণমেণ্ট ত তাদের দেশের অধিবাসীদের দুর্দ্দশা দূর করবার জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু আমাদের দেশে? আমাদের দেশও ত বেকার-বহুল এবং আমাদের দুর্দ্দশাও কম নয়। তবে আমাদের জন্য ঐ রকম কোন ব্যবস্থা হয় না কেন? পরাধীন বলেই কি এই ব্যবস্থা? কর্তৃপক্ষ কি বলেন?

ইস্পাতের দর বৃদ্ধি

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রশ্নোত্তর থেকে লৌহের বাজার সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গিয়াছে। সম্প্রতি লৌহের বাজার দর শতকরা ৫০ ভাগেরও ওপর চড়ে গেছে। ব্যবস্থা পরিষদের জনৈক সভ্য বলেন যে টাটা কোম্পানী তাদের ষ্টকে যা' মাল আছে সেইটা চড়া দামে বিক্রী করবার জন্য আর কোন নতুন অর্ডার গ্রহণ করছে না। সেই জন্যই বাজারে টাটা কোম্পানীর যোগান না থাকার দরুণ দর চড়ে গেছে। এসম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য স্যার ইয়ামিন্ খাঁ জানতে চান যে, গভর্ণমেণ্ট এখনো কি লৌহ-শিল্পের ওপর সংরক্ষণ শুল্ক রাখতে চান?

সপ্রু কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে কমিটি গঠন

যুক্ত প্রদেশের সরকার, সপ্রু কমিটির প্রস্তাব সমূহ আলোচনার জন্য এবং এ সম্পর্কে সরকারকে গ্রহণযোগ্য পরামর্শ দেবার জন্য, অযোধ্যার চীফ কোর্টের প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস্ বিশেশ্বর নাথ শ্রীবাস্তবের সভাপতিত্বে অপর এক কমিটি নিয়োগ করেছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কমিটির সদস্য।

যুক্ত প্রাদেশিক সরকারের ডেপুটি লিগাল্ রিমেম্ব্রান্সার রায় বাহাদুর পি, সি, মল্ল, ডাঃ এন্, পি, আস্থানা, ডাঃ জৈকরন্ নাথ মিশ্র, ডাঃ কে, এন্, কাটজু; রায় বাহাদুর বাবু বিক্রমজিৎ সিং; ডাঃ ইকবল্ নারায়ণ গার্ত্তু, এবং লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, আলিগড় ও কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাক্যাল্টি অব্ ল' এর ডিন্ মহোদয়গণ। মিঃ কে, আর, ভাম্‌লে, আই, সি, এস্ কমিটির সেক্রেটারীর কাজ করবেন।

কৃষিজাত দ্রব্য সমূহকে গুণানুসারে ভাগ করণ

গত এসেম্ব্লির অধিবেশনে কৃষিজাত দ্রব্য সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য বিল পাশ হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, কৃষিজাত দ্রব্য সমূহকে গুণানুসারে শ্রেণী বিভাগ করা এবং তদনুসারে

যথাযোগ্য মার্কা প্রদান করা। এই বিলের প্রস্তাবক হচ্ছেন স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী। বিলটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্যার গিরিজাশঙ্কর বলেন যে, দ্রব্য সমূহের শ্রেণী বিভাগ করার মানে হচ্ছে সেগুলিকে গুণানুসারে সাজান, এবং মার্কা দেওয়া মানে হচ্ছে উক্ত গুণানুসারে প্রত্যেক শ্রেণীর একটি নির্দ্দিষ্ট মার্কা প্রদান করা, যাতে করে লোকে সহজেই সেই দ্রব্য সমূহকে সঠিক চিন্‌তে পারে। ক্রেতার পক্ষে এরূপ করলে এই সুবিধা হয় যে, তার কোন ঠকবার ভয় থাকে না এবং বিক্রেতার পক্ষে এই লাভ যে, সে যথাযোগ্য দাম পায়। ইউরোপের অপরাপর দেশে এইরূপ প্রথা চলিত আছে এবং সেইজন্যই ভারতেও এরূপ প্রথা সাফল্য লাভ করবে বলে আশা করা যায়। এসম্পর্কে পরীক্ষা চালাবার জন্য চামড়ার ব্যাপার নিয়ে দিল্লী ও আগ্রায় এবং ডিমের ব্যাপার নিয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ত্রিবাঙ্কুরেও অনুরূপ একটী পরীক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হ'তে চলেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই এর সমাদর করবে।

বিলটির উল্লেখযোগ্য তিনটি ধারা হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ এই পরীক্ষা ব্যাপারে কারও যোগদান করাটা বাধ্যতা মূলক নয়, দ্বিতীয়তঃ তালিকাযুক্ত দ্রব্য সংখ্যা খুব বেশী নয় এবং তালিকার দ্রব্য বাড়াতে গেলে এই সংক্রান্ত স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরামর্শ করেই তা করা হ'বে, তৃতীয়তঃ এতৎসম্পর্কে নিয়মলঙ্ঘনের জন্য যে জরিমানার ব্যবস্থা হয়েছে তা অতীব সামান্য। মার্কা জাল হ'লে তার শাস্তি হচ্ছে মাত্র জরিমানা। কিন্তু শ্রেণী বিভাগের বেলায় কোন জুয়াচুরী করলে কিংবা জুয়াচুরীর চক্রান্ত করলে অথবা কাহারও নিকট চক্রান্তের কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে কারাদণ্ড হ'বে।

সার মহম্মদ ইয়াকুব বিলটি সমর্থন প্রসঙ্গে বলেন যে, উক্ত শ্রেণী-বিভাগ কার্য্য সাধারণ কর্ম্মচারীর ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, পরন্তু, সহানুভূতিশীল উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক সেকার্য্য সমাধা হওয়া উচিত। তা' না হ'লে নিকৃষ্ট শ্রেণীর দ্রব্য উৎকৃষ্ট ব'লে চলে যাবে।

সার জেম্‌স্ হাড্‌সন্ বিলটির সমর্থন প্রসঙ্গে জানতে চান যে, এ সংক্রান্ত খরচ কোথা থেকে মেটানো হবে?

মিঃ আজাহার আলিও বিলটির সমর্থন প্রসঙ্গে উহার প্রচলনের আইনগত ত্রুটির বিষয় ইঙ্গিত করেন।

সার গিরিজাশঙ্কর জবাব প্রসঙ্গে বলেন যে, বিলটির আসল উদ্দেশ্যের যাতে অপব্যবহার না ঘটে সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট-এর নজর আছে। বিলটি কার্য্যকরী করতে যে খরচ আবশ্যক তা' এতৎসংক্রান্ত কার্য্য ব্যাপার থেকে তোলবার ব্যবস্থা করা হ'বে। বিলটির প্রচলন সম্পর্কে হাজার হাজার দ্রব্যের পক্ষ থেকে ত্রুটিহীন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

অতঃপর বিলটি মিঃ জে, ডি, এণ্ডারসনের সংশোধনী ধারা সহ পাস হয়। উক্ত সংশোধনী ধারার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, বিলের ধারাসমূহ সাধারণের মন্তব্যের জন্য প্রথমে প্রচারিত করতে হবে এবং মার্কা সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি কেউ ভুল করে ফেলে তবে তাকে এতৎ-সংক্রান্ত শাস্তি থেকে রেহাই দিতে হ'বে।

পৃথক অর্থনৈতিক সংবাদ দপ্তর

ভারত সরকারের খাস আফিসে উক্ত সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতার পরিচালনাধীনে একটি পৃথক অর্থনৈতিক সংবাদ-দপ্তর সৃষ্টি করবার প্রস্তাব ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ওরই সঙ্গে ডিরেক্টর অব ষ্ট্যাটিস্টিকস্-এর অধীনে একটি কেন্দ্রীয় হিসাব নিকাশ প্রতিষ্ঠান (Statisical Organisation) গড়বার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী কলিকাতাস্থ কমার্সিয়াল ইনটেলিজেন্স এবং ষ্ট্যাটিস্টিক্স্ বিভাগের বর্ত্তমান কাজগুলি উহা গ্রহণ করবে এবং কলিকাতা থেকে দিল্লীতে যে ব্যাপার স্থানান্তরিত হবে।

চিনি-শিল্পব্যাপার সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার জন্য ট্যারিফ বোর্ড পুনর্গঠন করবার পরিকল্পনা কমিটি অনুমোদন করেছেন।

উক্ত অর্থনৈতিক সংবাদ দপ্তরের কাজই হবে গভর্নমেণ্টকে অর্থনৈতিক ব্যাপার সম্পর্কে সকল সংবাদ জানানো যাতে করে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি সংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট আবশ্যকীয় পরামর্শ পেতে পারে।

কমার্সিয়াল ইনটেলিজেন্স এণ্ড ষ্ট্যাটিস্টিকস্ সম্পর্কে উহার ডিরেক্টর জেনারেলকে ১৯৩৩ সালে তাঁহার তত্ত্বাবধানে একটি নতুন ষ্ট্যাটিস্টীক্যাল্ অনুসন্ধান সমিতি গঠন করবার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় ষ্ট্যাটিসটিক্যাল্ অনুসন্ধান ব্যুরোর ব্রাঞ্চ গঠন করা।

কমিটি আরও স্থির করেন যে, সাধারণে কমার্সিয়াল্ ইনটেলিজেন্স্ ও ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল্ ডিপার্টমেণ্ট্ থেকে এতৎসংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ তথ্যাদি পেতে পারবেন। এর জন্য মোটামুটি বাৎসরিক নব্বই হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দ করা হয়।

কমিটি ফরাসী অধিকৃত স্থান পণ্ডিচেরী ও কারিকলের নিকটে 'স্মাগ্লিং'এর বিরুদ্ধে কার্য্য চালাবার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এসম্পর্কে এই বলা হয় যে, উক্ত স্থানসমূহের সীমান্তদেশের দীর্ঘতা ও জটিলতার জন্য উক্ত কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তা ছাড়া বৃটিশ ভারতের শুল্কহার বৃদ্ধির জন্য বাধা আরও বেড়ে গেছে। তজ্জন্য এতৎসংক্রান্ত স্পেশাল অফিসারের রিপোর্ট অনুযায়ী গত আগষ্ট মাস থেকে উক্ত কাজ চালাবার কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ত্তমান বৎসরে তার জন্য খরচ পড়বে ২৮৪,২০০ টাকা।

ভারত ও বৃটেনের মধ্যে বাণিজ্য

কলিকাতায় ভারতীয় চেম্বার্ অব্ কমার্সের একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভার সভাপতির বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ বি, এস, বিরলা অপরাপর ব্যাপারের সঙ্গে উপরোক্ত ব্যাপারেরও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ল্যাঙ্কাশায়ার-এর তরফ থেকে ভারত ও বৃটেনের সঙ্গে লেনদেন বাণিজ্য নীতির কথা শুনে তিনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন, কেননা, ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্যচুক্তির দিকে তাকাইলেই বোঝা যাবে যে, ভারতবাসীদের পুনঃ পুনঃ দাবী সত্ত্বেও ভারতবাসীদের সুবিধাজনক কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নি। পক্ষান্তরে, বৃটিশ বণিকদেরই সুবিধা হয়েছে। ১৯৩২ সালের অটোয়া চুক্তির আমলে

ভারতবাসীদের সমবেত প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিলাতী বস্ত্র শিল্প ও লৌহশিল্পকে পক্ষপাতিত্বমূলক সুবিধা দেওয়া হয়। লেনদেন বাণিজ্যনীতির কোন উল্লেখ না করেই সে সুবিধার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই লেনদেন বাণিজ্যনীতি, অর্থাৎ ল্যাঙ্কাসায়ার গত ৩ বছর ধরে কেন ভারতের তুলা নিচ্ছে, তার কারণ অনুধাবন করা যাক। হিসাব হ'তে দেখা যায় যে ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৫এ ল্যাঙ্কাসায়ারের ভারতীয় তুলা ক্রয়ের পরিমাণ ২ কোটি থেকে ২৷৷০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিল; ১৯৩৫-৩৬এ তা' পৌণে চার কোটিতে দাঁড়ায়। কিন্তু ল্যাঙ্কাসায়ার থেকে ভারতে তুলাজাত দ্রব্যের আমদানীর পরিমাণটা একবার দেখুন। ১৯৩৩-৩৪ সালে ল্যাঙ্কাসায়ার থেকে ভারতে তুলাজাত দ্রব্যের আমদানীর পরিমাণ হচ্ছে পৌণে নয় কোটী টাকা, ১৯৩৪-৩৫ সালে এগারো কোটি টাকা, ১৯৩৫-৩৬ সালে ১৯ কোটী টাকা। সুতরাং সমান লেনদেন নীতি কোথায় বজায় রইল? ভারত ত বৃটেনকে বেশী দিচ্ছে। পক্ষান্তরে পাচ্ছে ঢের কম।

তা ছাড়া, এটা মনে রাখা উচিত যে, ল্যাঙ্কাসায়ার যে তুলা আমাদের কাছ থেকে কেনে, সেটা তার গরজেই কেনে, লেনদেন বাণিজ্যনীতির মর্য্যাদার জন্য কেনে না। কিন্তু ভারত ল্যাঙ্কাসায়ার-এর নিকট হ'তে যে কাপড় চোপড় ক্রয় করে সেটা তার পক্ষে মোটেই অপরিহার্য্য নয়, কেননা, সেই সমস্ত কাপড় ইত্যাদি ভারতেই উৎপন্ন হয় এবং হ'তে পারে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, লেনদেন বাণিজ্য-নীতির ভড়ং দেখিয়ে ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে যে সমস্ত সুবিধা বর্ত্তমানে দিয়েছে সেগুলি শুধু কাঁচামাল সম্পর্কেই প্রযোজ্য এবং উক্ত কাঁচামাল ইংলণ্ডের পক্ষে অপরিহার্য্য। সুতরাং ইংলণ্ড ভারতের স্বার্থের জন্য কোন কিছু দিচ্ছে না, পরন্ত, নিজের স্বার্থের জন্যই প্রদান করছে। ত' সত্ত্বেও ইংলণ্ড যখন তার উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের জন্য সুবিধা পেতে চায় তখন তাকে এ প্রশ্ন ত জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, ভারতের উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য (কাঁচামাল নয়) সম্পর্কেও কি সে তদনুরূপ সুবিধা দিতে রাজী আছে?

ভারতের চিনিশিল্প সম্পর্কে বিরলা বলেন যে, বর্ত্তমানে ইংলণ্ড যেমন ভারতের বাজারে তার কাপড় চোপড় সম্পর্কে অপরাপর দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠছে না, ভারতও তেমনি ইংলণ্ডের বাজারে তার চিনি সম্পর্কে অপরাপর দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হচ্ছে না। সুতরাং ইংলণ্ড যেমন ভারতের বাজারে তার সুবিধা খুঁজছে ইংলণ্ডের বাজারে ভারতেরও সেরূপ সুবিধা প্রাপ্য।

চিনিশিল্প সংক্রান্ত ট্যারিফ্ অনুসন্ধান সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ১৯৩২ সালের সুগার ইণ্ডাষ্ট্রিজ, এ্যাক্ট্ অনুযায়ী চিনিশিল্পকে যদিও ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়া হবে বলা হয়েছিল কিন্তু প্রথমে কার্য্যতঃ ঐ সুবিধা ছয় বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। ট্যারিফ্ বোর্ড্-এর এখন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত আরও কিছুকালের জন্য সুবিধা প্রাপ্তব্য কি না?

ইক্ষু উৎপাদনের উন্নতির এখনো যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। বস্তুতঃ অপরাপর দেশ অপেক্ষা

ভারতের ইক্ষুর দাম শুধু যে বেশী তা' নয়, পরন্তু তা' গুণেও নিকৃষ্ট। সুতরাং এই লক্ষ্য থাকা উচিত যাতে ইক্ষুর মূল্য মণ করা দু'আনায় দাঁড়ায় এবং বর্ত্তমান অপেক্ষা একর পিছু আড়াই থেকে তিনগুণ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাহলে আর চাষীদের লোকসানের ভাগী হ'তে হবে না।

—

বিলাসী চীন

আধুনিক জগৎ বিলাসিতা পূর্ণ জগৎ। সংযম ও সরল জীবনযাত্রার স্বপক্ষে যতই আমরা আন্দোলন চালাই না কেন, লোকে অপরের বিলাস সজ্জা দেখে বিলাসী হয়ে ওঠে। সম্প্রতি চীনদেশের অধিবাসীরা অতিমাত্রায় বিলাসী হয়ে উঠেছে। সেখানকার সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হিসাব নিকাশ থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী হ'তে ১৯৩৬ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এই কয় বছরে চীনা অধিবাসীরা ১০৭,৭০০,০০০ ডলারের বিলাসদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানী করেছে। ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে তামাক জাতীয় দ্রব্য, সিগারেট, লেসের ঝালর, কারুকার্য্যখচিত জামা, কাপড়, অলঙ্কার, সুগন্ধি, সেলুলয়েড, গ্লিসারিন ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য প্রধান।

উক্ত সাড়ে তিন বছরে সবচেয়ে বেশী খরচ হয়েছে তামাক, সিগারেট, মদ, সাম্পেন ও বিয়ার প্রভৃতি দ্রব্যে—তার পরিমাণ হ'ল ৯৫,৫০০,০০০ ডলার। সুগন্ধ দ্রব্য, সাবান, ক্রীম্ পাউডার প্রভৃতিতে খরচ হয়েছে প্রায় ৭,০০০,০০০ ডলার। factory scaleএ আমাদের দেশে যাঁহারা সাবান ও টয়লেট দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন তাঁহারা চীন দেশে তাঁহাদের সুগন্ধি দ্রব্যাদি চালাইবার চেষ্টা করুন না কেন?

———

মেয়ে কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে বিধিনিষেধ

চেকিয়াং প্রদেশের লোকের ধার চমৎকার যায়গা; হ্যাং চৌ-এর মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ সেখানকার সুন্দর সুন্দর মেয়ে কর্ম্মচারীদের নীতি-ব্যবস্থা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। ঐ সমস্ত মেয়ে কর্ম্মচারীরা হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, থিয়েটারে ও যাত্রীদলে পরিচারিকার কাজ করে।

ঐ সমস্ত মেয়েদের সুনীতি রক্ষা ও সহরের সুনাম বজায় রাখবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিধি নিষেধ প্রবর্ত্তন করেছেন—

১। মেয়েদের নিয়োগকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অন্ততঃ ৫০০০ ডলার মূলধন থাকা চাই।

২। যে সমস্ত মেয়েরা নিয়োজিত হবে তাদের বয়স যেন কোন মতে কুড়ি বছরের কম না হয়। ঐ সমস্ত মেয়েরা অন্ততঃ যেন স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

৩। যে সমস্ত মেয়েদের হ্যাংচৌ-এ বাড়ী কিংবা পরিবারাদি নেই, তাদের কিছুতেই নিয়োগ করা চলবে না।

ফল চাষের পর্য্যায়ে পেঁপেরস্থান

কোন বাঙ্গালীকে যদি একথা বলা যায় যে, বংলাদেশ আসলে রস-প্রধান না রূপ-প্রধান এর সঠিক বিচার করে দাও, তাহ'লে ফাঁপরে ফেলা হয় নিশ্চয়। কেননা, এটা তৈলাধার পাত্র' কি পাত্রাধার তৈল-র মত জটিল না হলেও কতকটা দুরূহ বটে। বাংলাদেশের যে একটা নিজস্ব রূপ আছে, একথা তার অতিবড় নিন্দুকও অস্বীকার করবে না। এইরূপ তার প্রকাশ পায় শরতের শ্যামায়মান অপরূপ ধান্য মঞ্জরীর দৃশ্যে, নভোসীমায় সাতরঙ্গা সুদৃশ্য রামধনুর বর্ণচ্ছটায়, হেমন্তের শিশিরার্দ্র জ্যোৎস্নাধারার অপরূপ রজতালিঙ্গনে। এ-সমস্তই হল বাংলার দৃশ্যলোক।

কিন্তু এই দৃশ্যলোকের পেছনেও একটা করে রসলোক লুকিয়ে থাকে। রসহীন রূপের কোন দাম নেই; পলাশ ফুলে চোখ ভরে কিন্তু মন ভরে ওঠে না, কারণ, রসের দিক দিয়ে তা' অন্তঃসারশূন্য। তাজমহলের বাইরের রূপটা হল চোখের খোরাক, কিন্তু এই চোখের খোরাককেও পেরিয়ে গিয়ে একটা মনের খোরাক আছে বলেই তাজমহলের এত দাম।

বাংলাদেশের রসলোক প্রকাশ পেয়েছে তার ফলশস্যে। বাংলাদেশের ফুল আমাদের চোখ ভরায়, কিন্তু ফল আমাদের পেট ভরায়। গণতন্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে ফুলটা হল এ্যারিষ্টোক্র্যাটিক আর ফলটা হল ডিমো-ক্র্যাটিক। ফুলের নিমন্ত্রণ মানুষের বিবাহ সভায় কিংবা প্রমোদোৎসবে, কিন্তু ফলের আহ্বান ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য। ফুল হচ্ছে, অভিজাত মনোবিলাস আর ফল হচ্ছে ক্ষুধিতের দেহরক্ষী।

গণ-র যেখানে সংযোগ সেখানে ব্যবসাটাও ফলাও হয়। অর্থাৎ ফুলের চেয়ে ফলের ব্যবসা বেশী জোর চলে। বাংলাদেশের রাস্তায় রাস্তায় ফলের ঝাঁকা মাথায় ফেরীওয়ালাদের যে-রকম ঘুরতে দেখা যায়, ফুলের ব্যাপারীদের সে-রকম দেখা যায় না। বসন্ত ও সারা গ্রীষ্মের সন্ধ্যাকালে ও প্রথম রাত্রে হয়ত ফেরীওয়ালা 'চাই বেল ফুল' বলে হাঁক দেয় কিংবা বোধ হয়

বর্ষায় বিক্রী করে কেয়াফুলের তোড়া, সে সব মনোরঞ্জন করে শুধু বিলাসী বাবুদের; কিন্তু ফলের কথাটা একবার ভেবে দেখুন দেখি। বারো মাসে তের পার্ব্বণের মত বাংলাদেশে নানারকম ফলের ভীড় ত লেগেই আছে। এই ত গ্রীষ্মকাল, এখন আম, জাম, জামরুল, কাঁঠাল, লিচুর জন্য ত বাঙ্গালীর জিহ্বা দিয়ে জল সরতে আরম্ভ করেছে। নিমন্ত্রণবাড়ীতে বোম্বাই কিংবা ল্যাংড়া আম যদি পাতে না পড়ে ত লোকটা ভাল খাওয়াতে না বলে আমরা বাইরে কুৎসা রটনা করে দিই—এমনি আমাদের ফলের প্রতি মোহ। শুধু তাই নয়, বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে লোক মারা গেলে তার পিণ্ড প্রদানের একটা রীতি আছে, সেখানেও ফল না হলে চলে না।

ফলটা যে আমাদের এত ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে যে, ওটা রসের খোরাক। শাঁসের জন্য ফলের পুষ্টি এটা স্বীকার করি কিন্তু রসের জন্যই ওর আকর্ষণ। শুধু শাঁসের পরিচয় নিয়ে বস্তু পথ্য হয়ে উঠতে পারে কিন্তু মুখরোচক খাদ্য হয় না; এর একমাত্র প্রমাণ এই যে, আমরা 'আগ্রহ' সহকারে কলা খাই কিন্তু ভক্তি করে কাঁচকলা খাইনে। তাই বলছিলাম যে, বস্তু লোভনীয় হয়ে ওঠে শাঁসের গুণে নয়, রসের গুণে। বেলের শাঁসটা বেশী কিন্তু রসটা কম তাই বেলের চেয়ে আমাদের মনটা জামরুলের দিকেই বেশী করে ঝোঁকে। আমরা শাঁক-আলু পরিতৃপ্তি সহকারে খাই, কিন্তু আলু সিদ্ধ করে ভক্ষণ করি। গ্রীষ্মের দিনে শাঁসের চেয়ে রসটা আমাদের ভারী উপাদেয় বোধ হয়। তালের চেয়ে তালশাঁস বেশী মন মজায়, নারকোলের চেয়ে ডাব। লিচু, তরমুজ প্রভৃতির যদি রসটা না থাকতো তাহলে তাদের প্রতি মন টানতো কিনা কে জানে। বেলে আমাদের মনে ধরে না কিন্তু বেলের সরবৎ আমরা অতিরিক্ত পয়সা খরচ করে পান করি। কমলালেবু, ডালিম, বেদানা প্রভৃতির রসের জন্যই না অতো খাতির।

ফল জগতে দ্রব্যগুলিকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা চলে (১) শাঁস প্রধান ও (২) রস-প্রধান। আমরা রসপ্রধান ফলগুলির এতক্ষণ গুণকীর্ত্তন করেছি, কিন্তু এমন ফলও আছে যার স্থান শাঁসের দরবারেও বটে, রসের দরবারেও বটে। পেপে হচ্ছে সেই জাতীয় ফল। কাঁচা অবস্থায় শাঁশপ্রধান বলে ওর স্থান তরকারী এবং চাটনীতে। তরকারীটা হ'ল নিত্য ব্যবহারের অর্থাৎ স্থূল প্রয়োজনের, সুতরাং আমাদের না হলে চলে না। কাজেই শাঁসপ্রধান অবস্থায়ও পেপে আমাদের ভয়ানক কাজ দেয়। রসপ্রধান হিসাবে পেঁপে শুধু মুখরোচকই নয়, অজীর্ণ রোগীর পথ্যও বটে।

কথা উঠবে যে পেঁপে ফল ভারতবর্ষে কো'থেকে এল? এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না, তবে কারও কারও মত এই যে, পর্ত্তুগীজরা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে এই ফল ভারতে এনেছিলেন এবং সেই থেকে ইহা সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এ-ফলের কোন উল্লেখ আছে কিনা তা' আমাদের জানা নেই।

বর্ত্তমানে ভারতে এমন লোক নেই যিনি পেঁপে ফলের সঙ্গে পরিচিত নন্। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতে একটা না একটা পেঁপেগাছ

আছেই আছে। এর কারণ এই যে, পেঁপে গাছটা প্রধানতঃ অযত্নে পালিত হলেও বেড়ে ওঠে। আপনার বাড়ীর কোণে হয়ত একটু ছাই গাদা কিংবা আস্তাকুঁড় আছে, সেইখানেই পেঁপে গাছটা দিব্যি বেড়ে উঠল। এরজন্য অধিক স্থানেরও প্রয়োজন হয় না; একটুখানি সরু ফালি কিংবা একহাত ফাঁকা জমি রয়েছে সেইখানেই বেশ গাছ জন্মে যাবে। তাছাড়া বাড়ীর গিন্নীরা পেঁপে গাছকে ভয়ানক পছন্দ করেন। কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি যে পেঁপের বেশ ভাল তরকারী ও চাটনী হয়; দ্বিতীয়তঃ কাঁচা পেঁপের আটা দিয়ে সমস্ত জিনিষকে খুব' তাড়াতাড়ি সেদ্ধ করা যায়। কাঁচা পেঁপের যে আটা, তার সমস্ত তরকারী কিংবা প্রাণী মাংসের টিস্যুর ওপর একপ্রকার গলিত-করণ-শক্তি আছে বলেই এ জিনিসটি সম্ভব হয়। উক্ত আটাতে 'এ্যানিমাল্ পেপসিন্ সমজাতীয় 'প্যাপেন' নামক একপ্রকার পদার্থ আছে।

ডাক্তারেরা অজীর্ণ রোগগ্রস্ত লোকেদের জন্য উক্ত পেপসিনের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। কেননা, পেপসিন হজমকার্য্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। উদার মতাবলম্বী লোকে এর ব্যবহারে কিছুমাত্র আপত্তি করেন না, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে গোঁড়া লোকেরই সংখ্যা বেশী। তারা কিছুতেই পেপসিন ব্যবহার করতে চায় না, যেহেতু পেপসিন শূকরের পাকস্থলী থেকে তৈরী হয়। কাজেই সমস্যা দাঁড়ালো যে 'নিরামিশ পেপসিন্' কোথায় পাওয়া যায়? পেঁপে ফল সেই সমস্যার সমাধান করে দিলে।

পাকা পেঁপে খেলেও পেপসিনের ফল পাওয়া যায়, কিন্তু অসুবিধার কথা হচ্ছে এই যে, পাকা ফল সব সময় পাওয়া যায় না। শীতকালে ঠাণ্ডার জন্য যখন ফুল নষ্ট হয়ে যায় তখন কয়েক মাস আমরা ফল পাই না। তা-ছাড়া কেউ কেউ পেঁপে খুব ভলবাসেন, আবার কেউ কেউ এমন আছেন যে পেঁপে মোটেই পছন্দ করেন না। ফলেরও আবার নানারকম তারতম্য আছে, সুতরাং যাঁরা পেঁপে ভালবাসেন তাঁরা যে সব রকম পেঁপেই পছন্দ করবেন এমন কোন কথা নেই। কোন কোন পেঁপে বেশ মিষ্টি, কোন কোনটা পানসে, কোন কোনটা আবার তেতো-তেতো। যার মিষ্টি পেঁপে ভাল লাগে তার জন্য সব পেঁপেই মিষ্ট হয়ে জন্মাচ্ছে না, অথচ তেতো এবং পান্সে পেঁপেও তিনি খাবেন না। আবার পেঁপে খাওয়াটাও দরকার।

কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আবার একটা সমস্যার সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু এ সমস্যারও সমাধান ঘটেছে। পেপ্সিন বা প্যাপেনের উপকার লাভের জন্যই লোকের পেঁপে খাওয়া; সেই জন্যই শুক্নো পেঁপের গুঁড়ো হিসাবে প্যাপেন্ বাজারে বিক্রী হ'তে লাগল। টনিক্-মিক্শ্চারের মত আহারের পূর্ব্বে এক দু' চাম্চে খাওয়া চল্‌বে। 'হাইপোডারমিক্' ইন্‌জেক্‌সনেও প্যাপেন্ ব্যবহৃত হয়।

রেশম-শিল্পেও প্যাপেন্ দরকার হয় রেশমের আঁশ নরম করবার জন্য। ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে এই জন্যই বোধ হয় গুঁড়ো প্যাপেন পাঁচ টাকা থেকে ছ' টাকা পাউণ্ড বিক্রী হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি যে পেঁপে গাছের জন্য কোন রকম যত্ন করতে হয় না, বাড়ীর আস্তাকুঁড়েও

এ-গাছ বর্দ্ধিত হয়। গাছের গোড়ায় বেশী জল ঢালবারও দরকার নেই, কেননা, তাতে গাছের এবং ফলের ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। অন্যান্য উদ্ভিজ্জের চাষ করতে গেলে সার প্রদানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কিন্তু পেঁপে চাষের ক্ষেত্রে সারের তেমন প্রয়োজন হয় না। অপরাপর গাছের পক্ষে পোকার ভয় ভয়ানক, কিন্তু পেঁপে গাছের পরমায়ু সাধারণতঃ ৩।৪ বছর, কোন কোন ক্ষেত্রে ৭।৮ বছরও বাঁচতে দেখা যায়।

পেঁপে গাছে খুব তাড়াতাড়ি ফল ধরে। প্রতি গাছ পিছু সাধারণতঃ ত্রিশটা ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, যদিও কোন কোন গাছে একশো'রও ওপর ফল ধরে। এক একর জমির গাছ থেকে ২০,০০০ পেঁপে পাওয়া যায় এবং তার দাম হ'ল ৭০০ টাকা। এ হিসাবে পেঁপে চাষ করলে শতকরা অন্ততঃ ৩৩ টাকা করে লাভ থাকে।

যাঁরা চাষবাসের ব্যবসা করতে চান তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। পেঁপে চাষের জন্য মূলধনের বিশেষ প্রয়োজন নেই। অন্যান্য চাষে যেমন পরিশ্রম ও খরচের আশঙ্কা থাকে, পেঁপের চাষে সে রকম কিছু হাঙ্গামা নেই। শুধু এক একর জমি লীজ নেওয়া কিংবা ক্রয় করার এবং অপরাপর আনুষঙ্গিক খরচের মূলধনই যথেষ্ট। তাহ'লেই উপরোক্ত লাভ অবশ্যম্ভাবী। পেঁপে শুধু খাদ্য হিসাবেই নয়, ঔষধ হিসাবেই বেশী ব্যবহৃত হয়। প্যাপেন্ ও পেপ্‌সিনের জন্যই পেঁপের এত চাহিদা। সুতরাং কারবার নষ্ট হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই।

জুতা ব্যবসায়ী টমাস বাটার আত্মজীবন চরিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সহরের স্কুলে আসিয়া আমি নূতন বিশেষ কিছুই শিখিলাম না; পরন্তু আমাদের জিলিন গ্রামের পাঠশালায় যাহা কিছু শিখিয়াছিলাম, তাহাও ভুলিয়া গেলাম। আমাদের বাড়ীতে পুস্তক অথবা খবরের কাগজ এ সব কিছুই ছিলনা। ছাপান কাগজের মধ্যে ছিল একখানি পাঁজি,—তাহাতে কোন তারিখে কোথায় মেলা হইবে, লেখা থাকিত। এইটী আমাদের কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। তখনকার দিনে ব্যবসায়ী লোকদের পক্ষে পুস্তক অথবা খবরের কাগজ পড়া একটা বিলাসিতা বলিয়া বিবেচিত হইত। উচ্চশ্রেণীর ধনীলোকদেরই উহা শোভা পায়,—ইহাই ছিল সাধারণের ধারণা।

১৪ বৎসর বয়সে আমি স্কুল ছাড়িয়া আমার পিতার দোকানে এপ্রেন্টিস্ রূপে কাজ করিতে লাগিলাম। এই সময়ে এমন একটী ঘটনা হয়, যাহাতে আমার জীবনে, চিন্তায় ও কর্ম্মে পরিবর্ত্তন সূচনা করে। সিরোকা নামে একব্যক্তি আমাদের দোকানে কাজ করিত। তার পুত্র জিলিন্ গ্রামের পাঠশালার ছাত্র। সে একখানি পুস্তক পুরস্কার পাইয়াছিল। ঐ পুস্তক আমাকে পড়িবার জন্য সে দেয়। পুস্তক খানির নাম অতিকষ্টে পড়িলাম,—"Pictorial History of the Czech Nation" অর্থাৎ চেক্ জাতির সচিত্র ইতিহাস। আমি পাতা উল্টাইয়া ভিতরের লেখা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম, ব্যাপার বড় সোজা নয়। প্রথমতঃ আমার বিদ্যা সেই জিলিন গ্রামের পাঠশালার প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, শিশু শিক্ষা পর্য্যন্ত! সহরের স্কুলে জার্ম্মান ভাষাতেই লেখাপড়া করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ পুস্তক খানির ভাষা সাহিত্যিক ধরণের,—যাহা আমরা আমাদের ঐ অঞ্চলে কাহারও মুখে কখনও শুনি নাই। কিন্তু কিরূপে জানিনা,—পুস্তকখানি আমাকে মোহিত করিয়াছিল।

কষ্টে-সিষ্টে পড়িতে লাগিলাম। দুই তিন দিনের মধ্যেই ভাষাটা একটু সরল হইয়া আসিল। আমি ক্রমশঃ সব-ই বুঝিতে সমর্থ হইলাম।

এমন কথা আমি ত পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। এমন জলন্ত ভাবে আর ত কাহাকেও উপদেশ দিতে দেখি নাই। আমি উপলব্ধি করিলাম, লেখক নূতন কথা শুনাইবার জন্য,—এবং তাহা বুঝাইবার জন্য বিশেষ যত্নবান্‌। পাঠক যেন তাঁহার কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে সেই বিষয়ে তিনি সদা সাবধান। জাতীয়তা, রাষ্ট্র এবং ধর্ম্ম এই সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে লেখক যেন পাঠককে তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করেন। অদম্য সাহসী লোকদের বীরত্ব কাহিনী কি জলন্ত ভাষায় তিনি

বাটার জুতার কারখানার একটী দৃশ্য।

বর্ণনা করিয়াছেন। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমি পুস্তক খানি পড়িতে লাগিলাম। উহার ভাষা আমার কাছে এখন সরল হইয়া আসিল। পড়িতে পড়িতে আমি কখনও হাসি,—কখনও কাঁদি। দুপুরবেলা খাবার ছুটীর সময় আমি আমাদের কারখানার নিকটবর্ত্তী মাঠে ঘাসের উপর শুইয়া এত তন্ময় চিত্তে এই পুস্তক খানি পাঠ করিতাম যে, আমার আশে পাশে দিয়া আমার ভাই কিম্বা অন্যান্য কর্ম্মচারীরা চলিয়া যাইত,—আমি কিছুই টের পাইতাম না।

পুস্তক পাঠ আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল বটে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি নিজের ব্যবসাই প্রকৃত এবং শ্রেষ্ঠ—শিক্ষার স্থান। আমার পিতা কারবার ক্রমশঃ বাড়াইলেন। তিনি দেখিলেন, আমিও কার্য্যের এমন উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছি যে মেলাতে, দোকানে এবং নিকটবর্ত্তী সহরে মাল বিক্রয়ের ভার আমার উপরে নির্ভয়ে দেওয়া যায়। এই সময়ে আমাদের পারিবারিক অবস্থা

খুব সচ্ছল হয়। কোন জিনিষপত্তরের অভাব আমাদের ছিলনা। টাকাকড়িও আয় হইত প্রচুর।

আমার পিতা ভিয়েনা সহরের কোন ফার্ম্ম হইতে কাঁচা মাল কিনিতেন এবং এক্‌স্‌চেঞ্জ বিলের মারফৎ টাকা দিতেন। লাভের টাকা তিনি একটা বাক্সের মধ্যে জমা করিয়া রাখিতেন। কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার নিজের মূল্য বুঝিতে পারিলাম কিন্তু আমার ধারণা জন্মিল, আমার পিতার কারবারে আমার কোন কদর নাই। দোকানের কর্ম্মচারীরাও আমাকে হবদম কান মলিয়া শাসন করিত; কারবারের মধ্যে আমার মত চালাক ছোক্‌রার যে কত প্রয়োজনীয়তা তাহা আমার পিতা বুঝেন বলিয়া আমার মনে হইল না। এই সকল কারণে স্থির করিলাম আমি নিজে স্বাধীন ভাবে পৃথক কারবার খুলিব;—নিজের উন্নতির পথ নিজেই দাগিয়া লইব। আমার মাতা মৃত্যুকালে আমার জন্য ২০০ ফ্লোরিন রাখিয়া গিয়াছিলেন। ঐ টাকা 'অনাথ ভাণ্ডারে' (Orphans Fund) জমাছিল। একদা আমাদের পারিবারিক দুর্গতি ও অন্ন কষ্টের সময় আমার পিতা সেই জমা টাকা তুলিয়া আনিয়া খরচ করেন। আমি এখন পিতার নিকট তাহা চাহিলাম। কিন্তু পিতা আমার কথা শুনিলেন না। অগত্যা আমি সেই টাকা ফেলিয়া, নিজের যাহা কিছু তাহাই লইয়া ভিয়েনা চলিয়া গেলাম। সেখানে আমার ভগ্নী য়্যানা কোন পরিবারে ঝি-যের কাজ করিত। সে আমাকে ৩০ ফ্লোরিণ দিল। আমার হাতে যাহা কিছু ছিল,তাহার সহিত এই ৩০ ফ্লোরিণ যোগ করিয়া আমি ভিয়েনার ডিবলিং নামক সহরতলিতে আমাদের এক আত্মীয়ের গৃহে একটা ছোট-খাট কারখানা খুলিলাম। পঞ্চদশ বর্ষীয় কিশোরের সমস্ত উৎসাহ-উদ্যম, আশা-আকাঙ্ক্ষা সেই কারবারটীতে আমি ঢালিয়া দিলাম।

তখন ভিয়েনার গৃহস্থদের মধ্যে "মিকাডো" নামক এক প্রকার সস্তা দামের স্লিপার জুতার ব্যবহার চল্‌তি ছিল। আমি ঐ "মিকাডো" স্লিপারই প্রথম তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এই কাজে আমার লাভ হওয়া দূরে থাক্ বরং ক্ষতিই হইল খুব বেশী। আমার ভিয়েনাতে আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে আমার পিতা তাঁহার কারখানায় এই "মিকাডো" স্লিপার তৈয়ারী আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁর আশা ছিল খুব বড়, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবও ছিল তেমনি বড়। আমি আমার পিতার আশা ও অনভিজ্ঞতা এই দুইটী লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করি। আমার আর এক বোকামি হইল এই যে, প্রথম অল্পপরিমাণ তৈয়ারী মাল কাট্‌তি না করিয়া আমি মূলধনের সমস্ত টাকা ঢালিলাম কেবল মাল তৈয়ারী করিবার জন্য, কাট্‌তির দিকে মোটেই চেষ্টা করিলাম না। ইহাই ব্যবসায়ীর, বিশেষতঃ নূতন ব্যবসায়ীর সর্ব্বনাশী ভুল।

আমি সেখানকার (ভিয়েনা অঞ্চলের) চল্‌তি ভাষা জানিতাম না। তার উপর বাজারে কি রকম জিনিসের চাহিদা, তাহাও আমার অজ্ঞাত ছিল। আমি যে সব মাল তৈয়ারী করিয়াছিলাম, তাহা খরিদদারদের মনোমত না

হওয়ায়, বাজারে বিক্রয় হইল না; গুদামজাত মজুত হইয়া পড়িয়া রহিল।

আমার পিতা পাগলের মত চারিদিকে আমার খোঁজ করিতেছিলেন। কারণ আমাকে ছাড়া তাঁহার দোকানের কাজ চলা অসম্ভব স্থতরাং আমার সাহায্য পাইবার জন্যই তিনি আমাকে খুঁজিতেছিলেন। ইহাতে আমার ভালই হইয়াছে। এদিকে যে আত্মীয়টীর গৃহে আমি দোকান খুলিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন যে, লাইসেন্স না লইয়া আমি সেখানে কারবার চালাইতে পারি না। সেই সম্পর্কে পুলিশের লোকেরা আসিয়া নাকি দুই-চার-বার আমার অনুসন্ধান লইয়া গিয়াছে। লাইসেন্স লইতে হইলে, আমাকে সেই হ্রাদিস্তে Hradiste সহরেই যাইতে হইবে, যেখানে আমার পিতার দোকান এবং বাড়ী ছিল। স্থতরাং অগত্যা আমাকে আবার পিতার নিকটই যাইতে হইল।

পিতার কারবারে পুনরায় যোগ দিয়া আমি আমার পূর্ব্বের কাজ, মাল বিক্রয় বিভাগের ভার হাতে নিলাম। কিন্তু দেখিলাম, মেলাতে মাল বিক্রয়ে আর তেমন স্থবিধাও নাই, লাভও তাহাতে আর বিশেষ কিছু হয় না। এই বিক্রয়-প্রণালীর মধ্যে কতকগুলি দোষ আমি লক্ষ্য করিলাম। বাজারে ব্যবসায়ীরা প্রাগ সহরে মাল বিক্রয় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিত। আমি তাহাদের কথা শুনিয়া খোঁজ লইতে লাগিলাম, প্রাগ সহরটী কোথায়। কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমি একখানি ম্যাপ কিনিয়া আনিলাম এবং তাহার সাহায্যে প্রাগ সহরটীর অবস্থান ঠিক করিয়া লইলাম।

পিতা যখন জানিলেন যে, আমি ম্যাপ এবং রেলওয়ে টাইম্-টেবিল পড়িয়া বুঝিতে পারি, তখন তিনি আমাকে বাহিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাল বিক্রয় করিবার ভার দিলেন এবং পথ-খরচা বাবদ ৫০ ফ্লোরিণ দিলেন। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এক ফ্লোরিণ প্রায় ২ শিলিংএর সমান ছিল। * এই রকম ভাবে বাহিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাল বিক্রয় করিবার সময় আমি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। সারাদিন কিছুই খাই নাই,—সন্ধ্যার পর রোগীর পথ্যের মত একটু রুটীর টুক্‌রা ও শাকের ডাঁটা চিবাইয়া রেল-ষ্টেশনের মুসাফিরখানায় (যাত্রীদের বিশ্রাম ঘর) শুইয়া কাটাইয়াছি। আমার পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল আড়ম্বর শূন্য ও দরিদ্রতাসূচক। সেই শত-তালি দেওয়া কোট্-প্যাণ্টলুন পরিয়া ভদ্র সমাজে যাইবার উপায় ছিল না। ধনী লোকদের সঙ্গে কি রকম ভাবে কথা বলিতে হয়,—কি রকম চাল-চলন তাঁহাদের নিকট দেখাইতে হয়, তাহা আমার কিছুই জানা ছিল না। বাস্তবিক আমাকে দেখিলেই লোকে একটা "পাড়াগেঁয়ে ভূত" বলিয়া মনে করিত, এলো-মেলো উস্ক-খুস্ক মাথার চুল,—ছেঁড়া ময়লা জামা জুতো,—উজবুকের মত কথাবার্ত্তা, এদিকে পেটে বোমা মারলে 'ক' বেরোয় না' বিদ্যা ত ঐ পর্য্যন্ত! খরিদ্দারদের সঙ্গে লেন-দেন কারবারে বিল্ রসিদ প্রভৃতিতে অতি কষ্টে আঁচড় পাঁচড় কাটিয়া, দু-লাইন লিখিতাম,—দশবার কলম ভাঙ্গিয়া কোন রকমে নাম-সই করিতাম;—কিন্তু সেই হিজি-বিজি পড়ে কার সাধ্য! এই সব কারণে বাল্যকালে লেখা পড়া করিতে পারি নাই বলিয়া আমার খুব দুঃখ হইত।

* ৫০ ফ্লোরিণ আমাদের দেশায় ৬০ টাকার কিছু বেশী। এক শিলিং দশ আনার সমান।

অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আমাকে সহানুভূতির চক্ষে দেখিত না। তারা বিদ্রূপ করিয়া বলাবলি করিত—"এ ছোঁড়াটা আবার কে রে? কাজ-কারবার জানে না,—অথচ আমাদের সঙ্গে মেলা-মেশা কর্‌তে আসে!" তাহাদের এইরূপ মন্তব্যে আমি অনেক সময়ে নিজের উপরে বিশ্বাস হারাইতাম। কিন্তু আবার এমন লোকও অনেক দেখিয়াছি, যাঁহারা আমার মত অল্পবয়স্ক বালকের এইরূপ শ্রমশীলতা এবং ব্যবসায়-প্রিয়তা দেখিয়া উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। মোরেভিয়া প্রদেশের একটী ক্ষুদ্র বালক এইরূপে ব্যবসায়ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা গৌরব বোধ করিতেন। যাহা হউক, আমি দুই সপ্তাহকাল বাহিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক টাকার মাল বিক্রয় করিলাম এবং অনেক টাকার নূতন অর্ডারও সংগ্রহ করিলাম। আমার পিতা আমাকে পথ-খরচার জন্য যে ৫০ ফ্লোরিণ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে মাত্র ১৫ ফ্লোরিণ খরচ করিয়া অবশিষ্ট ৩৫ ফ্লোরিণ বাঁচাইয়া পিতাকে ফেরৎ দিয়াছিলাম।

(ক্রমশঃ)
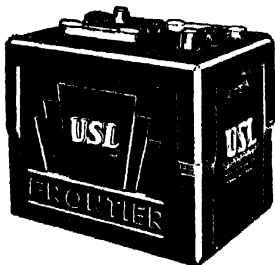
অর্দ্ধ তোলা বেগুনের ফুল, (যে কোন বেগুনের ফুল হইলেই চলিবে) ছয়টা গোল মরিচের সঙ্গে বাটিয়া উহার সহিত সামান্য পরিমাণ পাপ্‌ড়ী খয়ের মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে নাসিকাভ্যন্তরস্থ দুরারোগ্য ক্ষত আরোগ্য হয়।

*

জামার পকেটে জায়ফল (nutmeg) রাখিয়া দিলে বাত রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। বিলাতের বহু খ্যাতনামা জজ কর্ত্তৃক ইহা পরীক্ষিত।

*

নীল রংয়ের কাচ গুটিকা (blue glass beads) ধারণ করিলে ব্রোঙ্কাইটিস প্রভৃতি সর্দ্দিজনিত রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা বহু পরীক্ষিত।

*

বেরী বেরীতে কলার থোড়ের রস বড় উপকারী। উক্ত রস প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে ৴০ ছটাক পরিমাণে সেবন করা উচিত। হাত পা ফুলা থাকিলে উহার উপর আদার রস মালিশ করা দরকার। অবস্থা জটিল হইলে থোড়ের রসের সহিত ২।১ গ্রেণ মকরধ্বজ মিশ্রিত করিয়া সেব্য। লবণ ও জল সেবন যত কমান যায় ততই ভাল।

গরুর টাট্‌কা চোনায় নারিকেল ফুল বাটিয়া অথবা কাগজী লেবুর রস লৌহপাত্রে লইয়া উহাতে ফিট্‌কারী ঘসিয়া চন্দনের মত হইলে উহা দ্বারা চক্ষুর চারিদিকে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা শীঘ্র আরোগ্য হয়।

* * *

গব্যঘৃত গালাইয়া সন্ধ্যার পর ব্রহ্মতালুতে, চক্ষুর পাতার উপর, হাত ও পায়ের তালুতে মালিস করিলে রাতকানা ভাল হয়।

* * *

গরুর টাট্‌কা চোনায় শঙ্খের গুড়া মিশাইয়া দুগ্ধের মত করিয়া যে কাণে পুঁষ হইয়াছে তাহাতে ঢালিয়া দিয়া কাৎ হইয়া শুইয়া থাকিবে; এইরূপ ২।৩ দিন ব্যবহার করিলে কাণের ঘা ভাল হইয়া যায়।

* * *

নিমের পাতা অথবা নিম্বিন্দের পাতা ২০টা এককপোয়া কাঁচা গো-দুগ্ধের সহিত এরূপ ভাবে চটকাইবে যেন পাতার আর কোন চিহ্ন না থাকে। তারপর একটা পাকা বিচেকলা (ডেউয়ে-কলা) উহাতে চটকাইয়া কলার বিচিগুলি ফেলিয়া দিয়া উহাতে এক ছটাক চিনি মিশাইয়া প্রত্যহ খাইলে পাথুরী চূর্ণ হইয়া বিনা ক্লেশে নির্গত হইয়া যায়।

*　*　*

শিশুদের দুগ্ধবৎ বাহ্য হওয়ার পর তাহা সবুজ রং হওয়া এবং তৎসঙ্গে বমি থাক বা না থাক একটি ডালিম ফুল ও আদা ছেঁচিয়া ঐ রস প্রাতে খাওয়াইবে। এইরূপে ২।৩ দিন খাওয়াইলে রোগ ভাল হইয়া যায়।

*　*　*

আদার রসে মুসাব্বর বা আফিম ঘসিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া বসিয়া যায়।

*　*　*

তেলাকুচার পাতা চিনির সহিত বাটিয়া গরম করিয়া ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়। দিবসে দুইবার করিয়া এই প্রলেপ লাগাইতে হয়।

*　*　*

গরুর দাঁত বা হরিণের শিং ঘৃত ও মধুতে ঘসিয়া লাগাইলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

বঙ্গোপসাগরে মাছের ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ

যে কোন দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে তার জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির ওপর। তাই যে দেশের জাতীয় সম্পদ কম থাকে, সে-দেশ নানা রকম উপায়ে তার জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। আবার যে দেশ জাতীয় সম্পদে গৌরবান্বিত, সে-দেশ সেই সম্পদের কার্য্যকরী অনুশীলনের দ্বারা লাভবান হ'তে যত্ন নেয়। আসলে, সম্পদ থাকলেই হ'ল না; তাকে কাজে লাগাবার মত বুদ্ধিবৃত্তি ও অর্থনৈতিক মনোবৃত্তি থাকার প্রয়োজন।

কলিকাতার কোন মাইনিং ইনিষ্টিটিউটে বসে কেউ ফতোয়া যার করে যে মাউণ্ট এভারেষ্টের ওপর অসংখ্য মণি মুক্তার ভাঁড়ার র'য়েছে, সুতরাং ভারতবর্ষ অত্যন্ত সম্পদশালী দেশ,—তাহ'লে তার কথায় কেউ কর্ণপাতও করবে না, কেন না, মাউণ্ট এভারেষ্টের ওপর মণি-মুক্তা কেন, স্বর্ণখনি থাকলেও তার কোন দাম নেই, যতক্ষণ না আমরা সেটা আয়ত্বে আনতে পারছি। সম্পদশীলতার গোড়ার কথাই হচ্ছে দ্রব্যকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হ'বার চেষ্টা করা।

বিহারে লৌহ সম্পদ আবিস্কৃত হ'য়ে কাজে লাগবার পূর্ব্বেও সেখানে উক্ত সম্পদ বর্ত্তমান ছিল, তবুও কেউই তখন বিহারকে লৌহ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী বলে অভিহিত করে নি। এমনও হ'তে পারে যে আমাদের বাংলাদেশের মাটির তলায় কিংবা জঙ্গলে অথবা নদীগর্ভে অনেক সম্পদ রয়েছে যা' আজও আবিস্কৃত হ'য়ে কাজে লাগে নি, কিন্তু তাদের ঐ 'শুধুমাত্র থাকাটাই' বাংলা দেশকে সম্পদশালী হওয়ার গৌরব প্রদান করতে পারে না। সে-গৌরব অর্জ্জন করতে গেলে কার্য্যকরী ব্যবস্থার প্রয়োজন।

জাতীয় সম্পদের গণ্ডী মাত্র একটী শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, তা বহু প্রকার। তন্মধ্যে আদিমভাবে ধরতে গেলে ভূগর্ভস্থ সম্পদ, কৃষি সম্পদ ও জলসম্পদ প্রধান। যে সমস্ত লোক উক্ত আদিম সম্পদ প্রাপ্তির গৌরব অর্জ্জন

করবার প্রাকৃতিক আশীর্ব্বাদ লাভ করতে পারে নি, তারা দেশের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে ধনসম্পদ সৃষ্টি করে সম্পদশালী হয়ে উঠে। এই শেষোক্ত দেশগুলিকে শিল্পপ্রধান বলে অভিহিত করা হয়।

কিন্তু উপরে যে তিনটী সম্পদের উল্লেখ করেছি, তন্মধ্যে খনিজ সম্পদ হল ভয়ানক লাভজনক। ইউরোপের অনেকগুলি দেশ এই বিত্ত গৌরবে গৌরবান্বিত। ভারতবর্ষেরও অনুরূপ গৌরবে উন্নত শীর্ষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু উপবাস-ক্লিষ্ট রিক্ততার বিশীর্ণতায় তার মস্তক একেবারে নুয়ে পড়েছে, অবস্থার যদি পরিবর্ত্তন না ঘটে ত হয়ত কিছুদিন পরে তার মস্তক একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাবে। এর কারণটা এত সুস্পষ্ট যে তা' আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে হয় না।

যে তিনটি সম্পদের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গেল, ভারতবর্ষ সে তিনটিরই ষোল আনার অধিকারী, কিন্তু এই সকল সম্পদ থেকেও তার কোন লাভ নেই, বরং অ-লাভ আছে বিস্তর। ভূগর্ভ থেকে যারা সম্পদ বার করে নিয়ে যাচ্ছে তারা ভারতকে তার কোন দাম দিচ্ছে না, উল্টে আমাদের উত্তর পুরুষদের তারা সম্পদের যোগ্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। দোষ অবশ্য আমাদেরই দুর্ব্বলতার। আমাদের খনিজ সম্পদ সমূহ যদি অনাবিষ্কৃত থাকতো, তা'হলে আমরা গরীব থেকে যেতাম সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের উত্তর পুরুষেরা অমন মারাত্মকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হত না। আজ সেই সমস্ত সম্পদ আবিষ্কৃত হওয়ার দরুণ বিদেশীরা অবলীলাক্রমে আমাদের শোষণ করছে, আর আমরা নিশ্চেষ্ট ভাবে তাই অবলোকন করে জাহান্নমের পথে অগ্রসর হচ্ছি। এধারে আমাদের উত্তরাধিকারীদের যে কোন সম্পদই অবশিষ্ট থাকছে না, সেদিকে আমাদের মোটেই দৃষ্টি নেই।

কিন্তু দোষ যে শুধু আমাদের একলারই, সে-কথাটা দ্বিধাশূন্য হয়ে বলা যায় না। গভর্ণমেণ্টেরও দোষ আছে। দেশের কল্যাণের ভার থাকে রাজ-সরকারের উপর; কিন্তু আমাদের দেশের রাজ-সরকার দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশী হওয়ার দরুণ আমাদের চেয়ে তার নিজের দেশের কল্যাণ তার নিকট সবচেয়ে কাম্য। এইটাই আমাদের দেশের শাসন ব্যাপারের একটা মস্তবড় ট্র্যাজেডি। আমাদের রাজার পক্ষে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের চেয়ে বৈশ্য ধর্ম্মটাই বেশী স্বাভাবিক। নিজেদের এই বৈশ্য ধর্ম্মের প্রতি একটা এমন অনুরাগ এসে গেছে যে, অপরাপর কোন জিনিসের স্থান আর তার পাশে হ'য়ে উঠতে পারে না।

ফলে, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছি। কেন না, আমাদের প্রায় প্রতি ব্যাপারের পাশেই British preference এর আতঙ্ক লুকিয়ে থাকে। আমাদের সরকার এদেশের শিল্পোন্নতির দিকে তেমন করে নজর দেন না। অথচ কাঁচামালে সমৃদ্ধিশালী এদেশের পক্ষে শিল্প প্রচেষ্টা মোটেই তেমন শক্ত নয়। শুধু কাঁচামাল নয়, এদেশে মজুরী ভয়ানক সস্তা। সুতরাং আমাদের দেশকে শিল্প-প্রধান করে তোলা গভর্ণমেণ্টের খুবই কর্ত্তব্য ছিল। গভর্ণমেণ্ট সে কর্ত্তব্য পালন করেন নি। পালন করলে পাছে তাঁদের বিলাতী স্বার্থে আঘাত লাগে এই

আশঙ্কাই বোধ হয় তাঁদের প্রবল। অথচ জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, জার্ম্মাণ সরকার নিজের দেশের শিল্পোন্নতির জন্য কী অসম্ভব চেষ্টাই না করছে। তবুও জার্ম্মাণীকে কাঁচা মাল বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। আর আমাদের দেশের সমস্ত সম্পদ বর্ত্তমান থাকতেও গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতার ফলে দেশে শিল্প কার্য্যের উন্নতি ঘটে না।

গভর্ণমেণ্টের এই উদাসীনতা প্রকাশ পেয়েছে আমাদের মৎস্য সম্পদের প্রতি অমনোযোগে। পূর্ব্বেই বলেছি যে, নদী ও সমুদ্রের মৎস্য, মুক্তা প্রবালাদি সম্পদ দেশের জাতীয় সম্পদ বলে পরিগণিত হয় এবং সকল দেশের গভর্ণমেণ্টেই এ সম্পদকে রক্ষা করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এ সম্পদ এত লোভনীয় যে, ইউরোপের বিভিন্ন জাত সমুদ্রে মাছ ধরার অধিকার সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে সন্ধি-সর্ত্তের ভেতর এ ব্যাপারটার মোকাবিলা করে নিত। ব্যবসার দিক দিয়ে মৎস্য ব্যবসা একটি ভয়ঙ্কর লাভজনক কারবার। আমাদের আহার প্রধানতঃ ভাত ও মাছ। প্রত্যেক দিন আমরা যে কত শত মণ মাছ ব্যবহার করি তার ইয়ত্তা নেই। সুতরাং মৎস্য সম্পদ যে একটি ভয়ঙ্কর প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং ওর ব্যবসা যে একটি লাভজনক ব্যবসা, সেবিষয়ে সন্দেহই থাকতে পারে না।

অথচ সরকার এই প্রয়োজনীয় সম্পদটির দিকে তেমন করে নজর দেন নি। বঙ্গোপসাগরে প্রচুর পরিমাণ মৎস্য সম্পদ বর্ত্তমান। এ-সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে আমরা রীতিমত লাভবান হ'তে পারব।

এই মৎস্য-সম্পদ সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই গবেষণা চলেছিল এবং তখন আলোচনাকারিদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ রাসেল, সার্ হ্যামিল্টন বুকানন, ডাঃ জের্ডণ, মেজর জেনারেল হার্ডউইক ও সার্ আর্থার কটন প্রভৃতি বহু অপরাপর পণ্ডিতবর্গ। কিন্তু মেজর সার্ ফ্রান্সিস্ ডে এ-সম্পর্কে ১৮৮৯ সাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত গবেষণা চালান এবং তৎপরে তা' কিছুদিনের জন্য পরিত্যক্ত হয়।

কিন্তু ১৯০৬ সালের ২৬শে জুলাই বাংলা সরকার কর্ত্তৃক এই প্রদেশের মৎস্য সম্পদ এবং মৎস্যের যোগান সম্পর্কে বিবরণ প্রদানের জন্য সার কে, জি, গুপ্ত আই-সি-এস্ মহাশয় বিশেষভাবে ভারপ্রাপ্ত হ'ন। এ সম্পর্কে তাঁর প্রথম বিবরণ বেরোয় ১৯০৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী এবং তারপরে তিনি এই 'ফিসারী' সংক্রান্ত বিস্তৃত অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অপরাপর স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানকার বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং উন্নত প্রণালীর জ্ঞান সমূহ অপহরণ করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৯০৮ সালে তিনি তাঁর দ্বিতীয় রিপোর্ট্ প্রদান করেন। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁর জ্ঞানসমূহকে কার্য্যকরীরূপ দিতে পারেন নি, কেননা, তাঁকে অন্য কাজে বদলী করা হয়েছিল। তাঁর পদ গ্রহণ করেন ফিসারী কমিশনার মিঃ টি আমেদ মহাশয়। তাঁরই সহকারী ডাক্তার জেন্কিন্স্ নামে একজন বৈজ্ঞানিক বঙ্গোপসাগরের মৎস্য-সম্পদ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার জন্য বিশেষরূপে ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই কাজের জন্য স্যার্ এস্, কে, গুপ্তের-র্ পরামর্শমতে বাংলা

গভর্ণমেণ্ট্ কর্তৃক "দি গোল্ডেন্ ক্রাউন" নামে একখানি জাহাজ ক্রীত হয়। ঐ কার্য্য যদিও ১৩ মাস পরে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল, কিন্তু ডাঃ জেন্‌কিন্স্ যে অনুসন্ধান কার্য্য চালিয়ে গিয়েছিলেন, বাংলার সামুদ্রিক মৎস্য-সম্পদের উন্নতির পক্ষে তা এক বিশেষ প্রয়োজন অবদান।

যাই হোক্ ব্যবসার দিক থেকে কলিকাতার নিউ মার্কেটে এতৎসংক্রান্ত দু'টি দোকান খোলা হয়েছিল এবং সেখানে নানা রকমের সামুদ্রিক মাছের সামান্য পরিমাণ মজুত রেখে এবং সেগুলিকে বেশ রীতিমত বিলিতী নাম দিয়ে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিলিতী নাম দিলে কি হ'বে, সেগুলির সঙ্গে বিলিতী মাছের কিন্তু কোন সম্পর্ক নেই। তাই সে ব্যবসায় কোন ফল হ'ল না।

এখন কথা হচ্ছে যে, বঙ্গোপসাগরের ঐ যে বিরাট মৎস্য-সম্পদ—একে কাজে লাগিয়ে লাভবান হওয়া যায় কি না? এ সম্পর্কে কলিকাতার রোটারী ক্লাবের এক সভায় মিঃ বি, সি, গুপ্ত, আই ই-এস এক বক্তৃতা দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, সুন্দরবনের ধারে নদ-নদী ও সমুদ্রে প্রচুর মৎস্য সম্পদ বিদ্যমান। সুতরাং গভর্ণমেণ্টই হোন্ কিংবা কোন লিমিটেড্ কোম্পানীই হোন্—উভয়ের একজনের এই ব্যবসা পরিচালন করা উচিত। মিঃ গুপ্ত নিজে ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকবার সুন্দরবনে এ ব্যবসা সংক্রান্ত অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন; তাতে তাঁর এই ধারণা জন্মেছে যে, সুপরিচালিত হ'লে এ-ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হ'তে পারে। এ সম্পর্কে ভালভাবে কাজ চালাতে গেলে মাছ ধরবার সেই জাহাজের মধ্যে মাছ জিইয়ে রাখবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের অভাবে মাছ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাছাড়া জাহাজের মধ্যে 'কোল্ড্ ষ্টোরেজ'-এরও বন্দোবস্ত থাকা দরকার। এ সমস্ত যদি না থাকে ত বেশী পরিমাণ মাছ নষ্ট হওয়ার দরুণ খরচের পড়্তা বেশী পড়ায় বাজারে কম দামে মাছ যোগান দিতে পারা যাবে না। তাতে ব্যবসার ক্ষতিই বেশী হবে।

সকল প্রকার মাছের মধ্যে মিঃ গুপ্ত ইলিশ মাছকে খুব উচ্চ স্থান দিয়েছেন, এমন কি পৃথিবীর সব মাছের মধ্যে ইলিশ মাছ শ্রেষ্ঠ বলে তিনি তার প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে এক কোটি টাকা, তা' না হ'লে অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে বৃহৎ শিল্প কারবার হিসাবে এই ব্যবসায়ে নামা দরকার। জাপানীরা এই বৃহৎ কারবারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতা সম্পর্কে দৃঢ় নিশ্চয় হ'য়ে বঙ্গোপ-সাগরের ধারে ধারে কারবার ফাঁদবার চেষ্টা করেছে। তাদের হাতে একবার যদি এ-ব্যবসাটি গিয়ে পড়ে ত' আর রক্ষা নেই, অন্যান্য ব্যাপারের মত এটিতেও জাপানীরা একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে ফেলবে।

এই বিরাট কারবার সুরু করতে গেলে তার জন্য প্রথমেই সকল দিক দিয়ে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। নইলে কোন ফল হ'বে না। আমরা যে ব্যবসা করতে নেমে ফেল মারি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমরা ব্যবসা করতে যাবার পূর্ব্বে নিজেদের ঠিক প্রস্তুত করে নিই না। তার জন্যই অমন মারাত্মক ফল ফলে। মৎস্য-ব্যবসাও

একটা সোজা ব্যবসা নয়; বিশেষতঃ অৰ্দ্ধ কোটি কিংবা এক কোটি মূলধনের যেখানে সম্পর্ক রয়েছে। এ-ব্যবসায় নেমেই যদি আমরা এ-কারবারটিকে ফেল মারিয়ে দিই তাহলে আমাদের কারবার জগতে একটা কলঙ্কপূর্ণ স্থবির-চিহ্ন ফুটে উঠবে। সুতরাং এসম্পর্কে আমাদের পূর্ব্ব থেকেই সাবধান হওয়া দরকার।

মৎস্য-সংক্রান্ত এ-রকম বিরাট ব্যবসা পরিচালিত করতে গেলে আমাদের সর্ব্ব প্রথম এবিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হতে হ'বে। মাছের কারবারে লোকসানের প্রধান কারণ হ'ল মাছ পচে নষ্ট হ'য়ে যাওয়া; সুতরাং সে-ধার দিয়ে আমাদের সতর্ক মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হ'বে। এ-ধার দিয়ে ব্যবসা সুপরিচালিত করতে গেলে কোম্পানীর মাছ ধরবার জন্য নিজস্ব নৌকা-বাহিনী থাকা আবশ্যক। তা' ছাড়া সে মাছ চালান দেবার জন্য তাদের দ্রুতগামী জাহাজ থাকা চাই, যাতে করে, অত্যল্প সময়ের মধ্যে মাছ চারধারে যোগান দিতে পারা যায়। মাছকে টাট্‌কা রাখবার জন্য কোম্পানীর নিজেদের 'রেফ্রিজারেটার্' ইত্যাদি থাকা অতীব প্রয়োজন। এ ছাড়াও মাছ 'প্রিজার্ভ্' করে রাখবার জন্য অপরাপর উপায় ও যন্ত্র কৌশলও অবলম্বন করতে হ'বে। আর কোম্পানীর মাছ ধরা কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে একদল দক্ষ জেলের প্রয়োজন একথা বলাই বাহুল্য।

এবার দেখা যাক, এই বিরাট কারবারে আমাদের কিছু সামাজিক মঙ্গল হ'তে পারে কি না? ব্যবসার ক্ষেত্রে আজ সামাজিক মঙ্গলটাই বড় কথা। কোন লোক ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসা করে যদি প্রচুর লাভবান হয়, তাহ'লে আমাদের তাতে কোন স্বার্থ থাকা উচিত নয়;—আমরা দেখব যে, তার ঐ ব্যক্তিগত লাভালাভের সঙ্গে অপর সকলের লাভালাভ জড়িত রয়েছে কি' না;—অপর সকলে তদ্বারা করে খেতে পারছে কি' না?

আমাদের আলোচ্য মৎস্য-কারবারের বেলায়ও ঠিক তাই। এ-কারবারে যদি কেবল একটি মাত্র লোক লাভবান হয়, তাহলে তা' আমাদের পক্ষে আকর্ষণের বস্তু নয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে এ-কারবারটি হবে একটি বিরাট যৌথ-কারবার। শুধু তাই নয়, এ কারবার যদি চলে ত বহু লোক এর দ্বারা প্রতিপালিত হ'তে পারবে। আমাদের দেশের বেকার যুবকের দল বাবুগিরি ও তথাকথিত মর্য্যাদার মোহ ত্যাগ করে যে স্থানীয় বাজারে মৎস্য বিক্রয় দ্বারা দু'পয়সা পাচ্ছে, এটা ত আমরা আশে পাশে বেশ দেখতে পাচ্ছি। আলোচ্য মৎস্য ব্যবসা যদি টি*ঁকে যায় ত আরও বহু বেকারের জীবিকার উপায় নির্দ্ধারণ হ'বে।

তা' ছাড়া আর একটি দিক দিয়েও আলোচ্য মৎস্য-ব্যবসা আকর্ষণের বস্তু। আমাদের দেশের গভর্ণমেন্টের প্রায়ই রাজস্বের কোন ঠিক থাকে না, এবং আয়-হ্রাসের জন্য তাদের বাজেটে ঘাটতি পড়ে। এই ঘাটতি পূরণ করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট্ যদি গুটিকয়েক লাভজনক ব্যবসা নিজের হাতে নেন, তবে গভর্ণমেণ্টের আয়ের ভাবনাটা কতকটা চাপা থাকে। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সমস্ত লাভজনক কারবারের ভার গ্রহণ করাটাই হ'ল সোস্যালিজমের একটা অঙ্গ। আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্টও রেল, আবগারী

প্রভৃতি ব্যবসার আংশিক বা একচেটিয়া ভার গ্রহণ করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে-ধারে পা বাড়িয়েছেন। বঙ্গোপসাগরে মৎস্য-ব্যবসাটাও যদি গভর্ণমেণ্ট হাতে নেন, তবে তার বাজেট সামঞ্জস্যর পক্ষে অনেকটা সুবিধা হবে বলেই আশা করা যায়। এ-বিষয়ে দেশবাসী এবং গভর্ণমেণ্টকে আমরা সমভাবে অবহিত হ'তে বলি। নইলে, আমাদের নিজস্ব ব্যবসা যদি জাপানীরা অধিকার করে বসে তবে আমাদের কলঙ্ক বাড়বে বৈ কমবে না এবং আমাদের পেটেও হাত পড়বে।

কোথায় কিরূপে বিজ্ঞাপন দিতে হয়

প্ল্যাকার্ড, পোষ্টার, হ্যাণ্ডবিল এসম্বন্ধে আমরা গত চৈত্র মাসের প্রবন্ধে সংবাদ পত্রের সাহায্যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা আলোচনা করিয়াছি। এবারে আমরা প্ল্যাকার্ড, পোষ্টার, হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতির বিষয় বলিতেছি। খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, তাহার কিছুটা স্থায়িত্ব আছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, ও মাসিক সংবাদ পত্রে এই স্থায়িত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ইহাও আমরা পূর্ব্বের প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। কিন্তু প্ল্যাকার্ড পোষ্টার ও হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতিতে-বিজ্ঞাপনের স্থায়িত্বকাল অতি অল্প, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের শক্তি নিতান্ত কম নহে। একটা উপমায় বুঝান যায়; সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন যেন জ্বলন্ত দীপশিখা, এক ভাবে জ্বলিতেছে এবং দর্শকের চক্ষের সম্মুখে ইহার কোন পরিবর্ত্তন নাই।—কেবলমাত্র হাওয়ার দোলন। আর প্ল্যাকার্ড পোষ্টারে বিজ্ঞাপন যেমন তুবড়ীবাজীর ক্ষণস্থায়ী স্ফুরণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকণা, কাহারে সঙ্গে কাহারও যোগ নাই, মাটীতে পড়িলেই নিবিয়া শীতল ও দীপ্তিহীন হয়। এইজন্য প্ল্যাকার্ড পোষ্টারের বিজ্ঞাপনে নিত্য নূতন রকমারি ও চিত্তাকর্ষক বাহার দেখান যায়।

খরচা হিসাবে প্ল্যাকার্ড পোষ্টার প্রভৃতি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন অপেক্ষা সস্তা নহে। প্ল্যাকার্ডে ছাপার ও কাগজের দাম কিছু কম হইলেও কালীর খরচ অত্যন্ত বেশী পড়িয়া যায় এবং ডিজাইন বা নক্সা করিবার মুজুরীও লাগে খুব। কিন্তু ইহাতে সুবিধা এই যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোন একটা বিষয় সর্ব্ব সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া যায়। খবরের কাগজ যাহারা পয়সা দিয়া কিনে, কোন জিনিষের বিজ্ঞাপন কেবল তাহাদেরই নজরে পড়া সম্ভব। আবার যাহারা খবরের কাগজ কিনিয়া পড়ে, বিজ্ঞপনটি যে তাহাদের সকলের চোখেই পড়িবে এমন নয়। কিন্তু প্ল্যাকার্ড বেশ সাইজমত চিত্রাদিশোভিত করিয়া রাস্তার দুই ধারে এবং উপযুক্ত স্থানে লাগাইতে পারিলে সকলেরই চোখে পড়িবে, কাহারও দৃষ্টি এড়াইবেনা। কারণ, রাস্তাদিয়া ত কেহ আর চোখ বুঁজিয়া চলেনা। প্ল্যাকার্ড গুলো যেন ভিড় করিয়া, ঠেলাঠেলি করিয়া নিজ নিজ রূপ দেখাইবার জন্য পথিকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। এইখানেই খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের উপর প্ল্যাকার্ড টেক্কা দেয়। খবরের কাগজ পয়সা দিয়া কিনিতে হয়, পাতা উল্টাইতে হয়, তারপর বিজ্ঞাপন চোখে পড়া-না পড়া সেও দৈবাতের কথা। কিন্তু প্ল্যাকার্ড পোষ্টার ইহারা সেজে-গুজে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, চোখ না বুঁজিয়া থাকিলে

ইহাদিগকে এড়ান যায় না। যাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া প্ল্যাকার্ডে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের আর পয়সা খরচ করিতে হয় না; কেবলমাত্র চোখটী খুলিলেই হইল!

প্ল্যাকার্ডের সাহায্যে কত সহজে জিনিসের নাম প্রচার হয়, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। থিয়েটার সিনেমার অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা সকলেই অতি সাধারণ ব্যক্তি। কিন্তু শুধু প্ল্যাকার্ডের জোরে তাহারা অল্পসময়ের মধ্যে জন সমাজে পরিচিত হইয়া উঠে। আমরা শুনিয়াছি, অনেক নূতন অভিনেতা প্ল্যাকার্ডে নাম তুলিবার জন্য কম বেতনে কাজ করিতেও আপত্তি করেনা। যাঁহারা থিয়েটার সিনেমার নামে নাক সিটকান, এবং এই সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে জঘন্য চরিত্রের লোক বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহাদের কাছেও উহারা অবিলম্বে সুপরিচিত হয়। আমরা এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চাই, প্ল্যাকার্ড পোষ্টারের বিজ্ঞাপন কিরূপে মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার—

চোখের ভিতর দিয়া
মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মন প্রাণ।

সুতরাং অল্পসময়ের মধ্যে যদি কেহ কোন জিনিসকে বাজারে সুপরিচিত করিতে চান, তবে তাঁহাদের প্রথমতঃ প্ল্যাকার্ড ও পোষ্টারের সাহায্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত। কিন্তু যে সকল সহরের রাস্তায় লোক চলাচল বেশী নাই, যেখানে রাস্তার পাশে বাড়ীর দেওয়ালে প্ল্যাকার্ড লাগাইলে সহজে পথচারীদের নজরে পড়েনা, সেইসকল স্থানে প্ল্যাকার্ড লাগাইয়া কোন ফল হয়না। কলিকাতা বোম্বাই, এই রকম বড় বড় সহরেই প্ল্যাকার্ডে খুব কাজ হয়। তারপর সহরেও প্ল্যাকার্ডের রকম বুঝিয়া তাহার স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয়। যেমন ধরুন, বাংলা থিয়েটারের প্ল্যাকার্ড কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে দিয়া কোন লাভ নাই। কোন রক্ষাকবচ বা দৈব মাদুলীর সম্বন্ধে প্ল্যাকার্ড দিতে হইলে কালীঘাট এবং বাগবাজার অঞ্চলই তার উপযুক্ত স্থান। স্নো-ক্রীম ফেস্ পাউডার সুগন্ধি তৈল, সাবান প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রীর বিজ্ঞাপনের জন্য প্ল্যাকার্ড লাগাইতে কেহ যেন মুর্গীহাটা, ক্লাইভ ষ্ট্রীট অথবা বড় বাজার অঞ্চলে না যান, কারণ, তার যোগ্যস্থান থিয়েটার সিনেমা, লেক্-পার্ক প্রভৃতি সৌখীন স্থান সংলগ্ন গৃহস্থ পল্লীর রাস্তা এবং ছাত্র বসতি পূর্ণ কলেজ হোষ্টেল সন্নিকটবর্ত্তী পথ। প্ল্যাকার্ড পোষ্টারাদি লাগাইতে এই রকম বিচার করিয়া দেখিতে হয়।

তারপর, প্ল্যাকার্ডে কথার ছড়াছড়ি না করিয়া নানারূপ চিত্র সজ্জা করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কারণ, সাধারণ পথিক, বিশেষতঃ ভারতের জন সাধারণ, যাদের শতকরা ৫জন মাত্র লেখা পড়া জানে, তাহারা চল্‌তির মুখে তাড়াতাড়ি বেশী লেখা পড়িতে পারেনা। সুতরাং প্ল্যাকার্ডে যাহাতে সোজা ভাষায়, অল্পকথায় এবং সরল বর্ণ-বিন্যাসে (অর্থাৎ যথাসম্ভব যুক্ত অক্ষর বর্জ্জন করিয়া) আসল বিষয়টী প্রকাশ পায়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে চিত্রটী হওয়া চাই খুব ভাব প্রকাশক ও চিত্তাকর্ষক। চিত্র দেখিয়াই লোকে যেন সমস্ত ব্যাপারটী স্পষ্ট বুঝিতে পারে। লোকে নানা কাজের ধান্দায় রাস্তায় চলিবার সময় কোথাও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া যে প্ল্যাকার্ডের মধ্যে

মহাভারতের কাহিনী পাঠ করিবে একথা যেন কেহ মনে না করেন। সুতরাং প্ল্যাকার্ডের ভাষা রচনায় বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। অল্প কথায় আসল কথাটী এমন ভাবে শেষ করা চাই যেন পথিক ক্ষণেকের জন্য দেখিলেও বিদ্যুৎ-স্পর্শের মত তাহা চিরকালের জন্য তার মনে থাকে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্ল্যাকার্ডের চিত্র পরিকল্পনা, রং নির্ব্বাচন, অক্ষরের টাইপ পছন্দ, ছাপার সৌন্দর্য্য এ সব ঠিক করিতে হয়। তাহা না করিলে প্ল্যাকার্ডের খরচা বৃথাই যায়।

প্ল্যাকার্ড লাগাইতে অর্থ ব্যয় এবং তদ্বির তদারকের ঝঞ্ঝাট নিতান্ত কম নয়। রাস্তার পাশের বাড়ীর দেওয়ালগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় সেখানে কি ভিড়, কি ঠেলাঠেলি কি মারামারি! এ বলে "আমায় দেখ" ও বলে "আমায় দেখ"। খুব ভাল রকমে তদ্বির করিতে না পারিলে এত কঠিন প্রতিযোগিতায় প্ল্যাকার্ডকে অন্ততঃ একদিনের জন্যও লোক চক্ষুর সম্মুখে রাখা যায় না। একজন কোন স্থানে ঔষধের বিজ্ঞাপন সম্বলিত একখানি প্ল্যাকার্ড লাগাইয়া গেল, হয়ত তার দুই ঘণ্টা পরেই ঠিক তার উপরে আর একজন আসিয়া থিয়েটারের প্ল্যাকার্ড চাপিয়া দিল। সেইজন্য আজকাল অনেকে কিছু পয়সা খরচ করিয়া জায়গা রিজার্ভ করিয়া রাখেন। প্ল্যাকার্ড লাগাইবার জন্য এই প্রকার রিজার্ভ জায়গাকে হোর্ডিংস (Hoardings) বলে। কলিকাতায় বড় রকমের হোর্ডিংসের কারবার চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত আলোকস্তম্ভ, ইলেক্‌ট্রিক তারের খুঁটি প্রভৃতির গায়ে কিয়স্ক Kiosk অর্থাৎ চৌকা টিনের বাক্স লাগাইয়া তাহার গায়ে প্ল্যাকার্ড আঁটিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতার রাস্তায় আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য একরকম Dust Bin তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার গায়েতেও প্ল্যাকার্ড লাগান হয়। আবার রাত্রি-কালে প্ল্যাকার্ডগুলি সুদৃশ্য আলোকে উদ্ভাসিত করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। অনেক বীমা কোম্পানী, সিনেমা কোম্পানী এবং বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীগণ ঐসকল কিয়স্ক রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছেন।

এই সকল কিয়স্ক ছাড়া কলিকাতায় রাস্তার পাশে দেওয়ালের উপর প্রশস্ত জায়গা প্ল্যাকার্ডের জন্য ভাড়া দিবার কারবার রহিয়াছে। জবাকুসুম, কেশরঞ্জন, কল্পতরু প্রভৃতি বড় বড় বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এবং কোন কোন বিদেশী সিগারেট কোম্পানী ঐসব জায়গা স্থায়ীরূপে ভাড়া নিয়া তাহাতে রকমারি সুচিত্রিত বিজ্ঞাপন দিতেছেন। তাহারা ইহাতে সুফলও পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

প্ল্যাকার্ডের সাইজ কিরূপ হইবে, তাহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়। এক রকম ছোট আকারের প্ল্যাকার্ড দেখা যায়, তাহাতে কম খরচে কাজও বেশ হয়। ঐ সব প্ল্যাকার্ড একটু নীচে লাগান দরকার,—না হইলে লোকে পড়িতে পারে না। কিন্তু তার আবার একটা বিপদ আছে। দুই এক দিনের মধ্যেই ছেঁড়া কাগজ সংগ্রহকারকেরা তাহা টানিয়া তুলিয়া লইয়া যায়। আঠা একটু শক্ত রকমের দিলে, আর কেহ উঠাইতে পারে না। সাধারণতঃ প্ল্যাকার্ড মাঝারি সাইজের হইলে ভাল হয়। তাহাতে অল্প খরচায় চিত্রাদির বাহার ও রকমারি করা যায়। সহজে খুলিয়া পড়িয়া যাইবার ভয় থাকে না,—আঠা খরচাও কম হয়।

ছোটখাট কারবারকে প্রথম পরিচিত করিয়া তুলিতে হ্যাণ্ডবিলের দ্বারা সুফল পাওয়া যায়। ইহা প্রধানতঃ স্থানীয় লোকদের জন্যই ব্যবহার হয়। কোন পাড়াতে একটী নূতন দরজির দোকান হইল,—কেহ বা কোন মহল্লায় একটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান খুলিলেন,—কোন অঞ্চলে নূতন মুদিখানা অথবা কাপড়ের দোকান খোলা হইল;—এসব ঘটনা প্রথমতঃ হ্যাণ্ডবিলের দ্বারাই প্রচার করিতে হয়। তারপর যখন এই সকল কারবার খুব বড় হইয়া উঠিবে, তখন ইহাদের জন্য সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন ও প্ল্যাকার্ড দেওয়া যাইতে পারে। বড় কারবারের বিশেষ কোন বিভাগের বিষয়ও হ্যাণ্ডবিলের দ্বারা প্রচার করা যায়। ধরুন, যেমন বড় বস্ত্র ব্যবসায়ী শীতের মরশুমে গরম কাপড়ের আমদানী করিল, কোন বড় মুদিখানার মালিক ঘিয়ের এজেন্সী লইলেন,—কোন ঔষধের দোকানে চশমা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইল;—এই সকল নূতন পরিবর্ত্তন স্থানীয় লোককে হ্যাণ্ডবিলের দ্বারা জানান যায়। দূরের লোককে জানাইতে হইলে সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হয়।

লোকের হাতে হাতে হ্যাণ্ডবিল বিলাইবার একটু কৌশল আছে। জিনিসটী যে রকম লোকের জন্য তৈয়ারী, ঐ রকম লোক যে পথ দিয়া বেশী চলে সেই পথেই বাছাই করিয়া ছড়াইতে হয়। ছাত্র, কেরাণী, সৌখীন বাবু, মহিলা, প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের লোকের জন্য যে সব বিশেষ বিশেষ জিনিস তৈয়ারী হয়, তাহারা যে যে পথে চলাচল করে বেশী, সেই সেই পথেই এমন ভাবে হ্যাণ্ডবিল বিলাইতে হইবে, যেন প্রয়োজনীয় জিনিসের বিজ্ঞাপনটী ঠিক আসল লোকটীর হাতে গিয়া পড়ে। এজন্য যাহারা হ্যাণ্ডবিল বিলি করে, তাহাদের বেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও লোক চিনিবার ক্ষমতা থাকা দরকার। হ্যাণ্ডবিল ঠিক রীতিমত বিলি হইল কিনা, তাহা তদারক করা অত্যন্ত আবশ্যক। আজকাল যেমন দিন কাল, লোকের সাধুতার উপর আর বিশ্বাস করা যায় না। প্ল্যাকার্ড পোষ্টার সম্বন্ধে তদারক করা অপেক্ষা হ্যাণ্ডবিল বিলান তদারক আরও কঠিন কাজ। কারণ, প্ল্যাকার্ড পোষ্টারগুলি দেওয়ালে লাগান থাকে, একবার বাইসাইকেলে চড়িয়া ঘুরিয়া আসিলেই কাজটা কি রকম হইয়াছে, তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই তদন্ত করা যায়। কিন্তু হ্যাণ্ডবিলের কোন নিশানাই থাকেনা। কখনও কখনও পথিকদের পদনিষপেষনে তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত দেহে ফুটপাথের উপর গড়াগড়ি দিতে দেখা যায়। কিন্তু তাহারা এ দুরবস্থায় পতিত হইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ ক্ষণেকের তরেও যদি কোন যোগ্যব্যক্তির চক্ষের সম্মুখে পতিত হইয়া থাকে, তবেই ট্রেডিলমেসিনের গর্ভে তা'দের জন্ম সার্থক। অনেকের বিশ্বাস হ্যাণ্ডবিল কেহ পড়েনা;—সুতরাং উহাতে যে খরচ করা হয় তাহা একেবারেই বিফল। এরূপ ধারণা ঠিক নহে। হ্যাণ্ডবিলটুকু হাতে পড়িলে একবার চোখ বুলাইয়া সকলেই পড়িয়া নেয়। তারপর হয়ত অনেকে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু হ্যাণ্ডবিলের কথাগুলো তাদের প্রাণে গাঁথিয়া থাকে। সুতরাং হ্যাণ্ডবিলের যেটুকু কাজ, তাহা হইয়া গেল, সন্দেহ নাই। অবশ্য এ-সব খুব সস্তা খোলা রকমের হ্যাণ্ডবিলের ভাগ্যেই ঘটে। কেহ কেহ এমন সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হ্যাণ্ডবিল তৈয়ারী করেন যে তাহা হাতে পাইলে কেহ

ফুট্পাতে ফেলিয়া দিতে চাহেন না,—অন্ততঃ সন্ধ্যাবেলা বাড়ী পৌঁছা পর্য্যন্ত হ্যাণ্ডবিল খানিকে সযত্নে পকেটে রক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপ হ্যাণ্ডবিলের সংখ্যা খুব কম এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা ছাড়া আর কেহ এরূপ ব্যয় বহুল বিজ্ঞাপন দিবার পদ্ধতি গ্রহণ করিতে চাহেন না।

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভলুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে; পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। "বঙ্গবাসী" এইরূপ প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাগজে প্রকাশ করতঃ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিতেছেন। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব।

—সম্পাদক

যারে দেখতে নারি
তার চলন বাঁকা

*

পড়ুক, না পড়ুক পো
নিয়ে তারে সভায় থো

*

মাথা নেই তার মাথা ব্যথা

*

তেল দাও সিঁদুর দাও
ভবি ভোলবার নয়

*

অল্প শোকে কাতর
বেশী শোকে পাথর

*

আপনি শুতে জায়গা পায় না শঙ্করাকে ডাকে

*

কুকুরের পেটে ঘি ভাত হজম হয় না

*

নিদন্তের হাসি, আমি বড়ই ভালবাসি

*

কতরঙ্গ জানে, ঘরে ভাত নেই,—
কুটুম ডেকে আনে

*

কত সখ যায় গো চিতে
বেগুন গাছে আঁকুসি দিতে

*

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে

*

বুকে বসে দাড়ি উপড়ান

*

জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া

*

নিজের বেলা আঁটি শুঁটি
পরের বেলা দাঁত কপাটি

*

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে

*

আসতে ছাগল যেতে পাগল

*

এলে গেলে মানুষের কুটুম
গা চাট্‌লে গরুর কুটুম

*

সাধলে জামাই খায় না
শেষে কিন্তু কুঁড়োও পায় না

*

গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল

*

মশা মারতে কামান দাগা

*

মশা মারতে গালে চড়

*

যার ধন তার ধন নয়
নেপোয় মারে দই

*

মরা হাতী লাখ টাকা

*

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা

*

সেই ত মল খসালি
তবে কেন লোক হাসালি

*

ধরি মাছ না ছুঁই পানি

*

সেজে গুজে রইলুম ব'সে
নিয়ে গ্যালো না কপালের দোষে

*

জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ

*

বসতে পেলে শুতে চায়

*

সাত নকলে আসল ভাস্তা

*

অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি

*

ছেলে ধরতে পারে না
কেউটে ধরতে যায়

*

নষ্ট মেয়ের বুদ্ধি পেয়ো
ক্ষুদে পিঁপড়ের বল পেয়ো

*

হেলে হেলে হেলে
তোমার জিনিষ পেলে

*

পরের সোনা দিওনা কাণে
প্রাণ যাবে তোর হেঁচকা টানে

*

মাঘের শীত বাঘের গায়

*

ঘর থাক্‌তে বাবুই ভেজে

*

ব্যাঙের আধুলি

*

কত সখ যায় গো চিতে
মনের আগায় ফুট্‌কি দিতে

*

আপনার কোলে ঝোল মাখা

*

ভাগাড়ে গরু পড়ে
শকুনির টনক নড়ে

*

গোঁপ খেজুরে মিন্সে

*

গাই নেই ত বলদ দু'য়ে দাও

*

নেই মামার চেয়ে
কানা মামা ভাল

*

ঋণের ও রোগের শেষ রেখো না

*

মন্দ বড় বাতের বাজ
হেলান দিয়াছে আমকল গাছ

*

সর্ব্বস্ব খুইয়ে পাকা শ্বেতখানা করা

*

এলতলা বেলতলা
সেই বুড়ির পোদ্‌তলা

*

সাধে কি বাবা বলি
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়

*

হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না

*

তিলকে তাল করা

*

হাতে হাতে ধরা, বা
হাতে নাতে ধরা

*

জল জ্যান্ত বেঁচে আছে

*

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা

*

আগ নাংলা যেদিকে যায়
পাছ নাংলাও সেই দিকে যায়

*

পালের গোদা

*

শ্রীঅজিত নাথ দাস

বংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী ভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা। অথচ ্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং ক কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে ইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি বাংলা দেশের মুদয় ব্যবসাকেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি যদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealerএর নিকট পনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে রেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। নি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাহারা এই সকল মাল রিদ করেন—তাহা হইলে অতি সহজেই তিনি নানা স্থানের মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার বিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই ভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই, কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department তে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটী প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করিতেছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের কানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি সকলে এ বিষয়ে আমাদিগের তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। যাঁহারা দেশীয় শিল্প জ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা রিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইহাদের যাঁহারা শুভ সঙ্কল্প প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। ধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য পণ্ড না করেন।

ধুবড়ী (আসাম)

E. B. Ry Station Dhubri

১। **আড়ৎদার** :—*

চুনিলাল জুইবাজ।

গোঁসাই দাস পাল।

জিতেন্দ্রলাল চাটার্জি ও হরিচরণ করজাই।

নন্দলাল শ্যামলাল।

বরদাকান্ত রাধাবল্লভ।

রাধাবল্লভ মোহনলাল।

ইহাদের প্রত্যেকেরই গালা মালের দোকান আছে।

২। **ষ্টকিষ্ট**—‡

যুধিষ্ঠির কার্ত্তিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(পাট, সরিষা, ধান, বেত, কলাই রাখে)

ওঙ্কার মল জওলা প্রসাদ।

(মাত্র পাট রাখে)

থান্‌সিং করমচাঁদ।

(পাট, সরিষা, ধান রাখে)

শিউ প্রসাদ রামেশ্বর রাম।

(পাট, সরীষা, কলাই রাখে)

নেত্‌রাম কানাইলাল।

(সরিষা, কলাই, ইহাদের B. O. C কেরোসিন এবং A. M. Co. Agency আছে)

৩। **কাপড় বিক্রেতা**—

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং

লক্ষ্মী ভাণ্ডার

শিউপ্রসাদ রামেশ্বর রাম

টাউন ষ্টোর। (পেট্রোল এজেন্ট, টিম্বার বিক্রেতা, সিমেণ্ট এজেন্সী)

৪। **ষ্টেশনার**—

টাউন ষ্টোর।

দত্ত এণ্ড কোং

পপুলার ষ্টোর

গফুরউদ্দিন ছফুরউদ্দিন।

হাজী আব্‌দুল জব্বর ব্যাপারী।

৫। **জুতার দোকান**—

Flex Agency

হাজী আব্‌দুল জব্বর ব্যাপারী

গফুরউদ্দিন ছফুরউদ্দিন।

৬। **পিতল, কাঁসা, ও তামার বাসন বিক্রেতা**—

রায় এণ্ড সন্স।

যশোদা লাল দে।

প্রভাতচন্দ্র দে।

৭। **"চা" বিক্রেতা (পাইকারী খুচরা)**

The Dhubri Tradnig Co

৮। **ঘড়ি বিক্রেতা**—

ডি, এন ব্রাদার্স

ডি আহাম্মদ।

* যাহারা খরিদ ও বিক্রয়ের সাহায্য করে, ইহাদিগকে পারিশ্রমিক হিসাবে কমিশন কিছু দিতে হয়।

‡ যাহারা নিজেই মূলধন দিয়া যথেষ্ট পরিমাণ খরিদ করিয়া নিজেদের গোলাজাত করে এবং সুবিধা দর পাইলে বিক্রয় করিয়া দেয়।

৯। সাইকেল বিক্রেতা—

এম্ এম্ ব্রাদার্স
ধুবড়ী সাইকেল এণ্ড মটর কোং।
(Dunlop Agent)

১০। গ্রামোফোন এজেণ্ট ও লাইট বিক্রেতা—

ফ্রেণ্ড ব্রাদার্স।

১১। ট্রাঙ্ক বিক্রেতা ও নির্ম্মাতা—

ন্যাশানাল ফ্যাক্টরী (Factory)
দাস ফ্যাক্টরী।

১২। সাবান তৈয়ারীকার—

ন্যাশনাল সোপ ওয়ার্কস।

১৩। বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা—

দে মণ্ডল এণ্ড কোং

১৪। সোডা লেমনেড্ তৈয়ারীকার—

দে, এন, পি, এন, সরকার।

১৫। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিক্রেতা—

যতীন্দ্রমোহন দে। ঢাকা সাধনা ঔষধালয়ের এজেণ্ট। গিরীন্দ্রচন্দ্র দেব। "ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়" এজেণ্ট।

১৬। বিড়ি নির্ম্মাতা—

ঢাকা বিড়ি ষ্টোর। আরো অনেক ছোট ছোট আছে।

১৭। এলোপেথিক ঔষধ বিক্রেতা—

পাল ফার্ম্মেসী।
কামাখ্যা মেডিক্যাল হল।
দয়াময়ী মেডিক্যাল হল।

১৮। হোমিও, ঔষধ বিক্রেতা—

লক্ষ্মী ফার্ম্মেসী। ও চশমা বিক্রেতা
ধুবড়ী হোমিও হল।

এইস্থান হইতে বহু পরিমাণ মাছ নানা স্থানে চালান হয়।

পোঃ গোপালপুর জিলা রাজসাহী
E. B, Ry Station Gopalpur

কলিকাতা হইতে ১৫০ মাইল দূর মাত্র।

এইস্থানে, আম, খেজুরী পাটালীগুড়, নানাবিধ ডাল, শিমুল গাছ, বহু পরিমাণে পাওয়া যায়।

আড়ৎদার—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার।

ইহার নিকট গেলে এবং পত্র দিলে বিস্তারিত জানিতে পারেন।

পোঃ যাত্রাপুর জিলা রংপুর
I. C. R & Ry Steamer Station
Jatrapur.

এইস্থানে বহু পরিমাণে পাট আমদানী হয়। চাটার্জ্জি ব্রাদার্স ও করঞ্জাই কোম্পানী, ইহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলে মাল পাওয়া যাইতে পারে।

পোঃ দক্ষিণসাল মোড়া জিঃ গোয়ালপাড়া
ধুবড়ীতে আসিয়া, নৌকাযোগে যাইতে হয়

এইস্থানে গারো পাহাড়ের তুলা, সরিষা, ও ধান বহু পরিমাণে পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিকট গেলে বা পত্র ব্যবহার করিলে, তাহারা কিছু কিছু

দালালী নিয়া সবই খরিদ করিয়া দিতে পারে।

১। কালিশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

কেশোরাম আগরওয়ালা।

ছক্কার মল কটন মিল নামে একটী তুলা বেল করার মিল আছে।

পোঃ মোঃ কুড়িগ্রাম জিঃ রংপুর

E. B· Ry Station Kurigram

১। কামাখ্যাচরণ, কালীমোহন, মহানন্দ পাল গালামাল, ও কাপড় বিক্রেতা।

২। দত্তরাম রাম প্রতাপ—কাপড়, সাইকেল, বিক্রেতা।

৩। চাটার্জ্জি এণ্ড সন্স গালামাল, তামা, কাসা, পিতল, ও ষ্টেশনারী বিক্রেতা।

৪। *মেউরচাঁদ মগনীরাম, কাপড় বিক্রেতা।

৫। মধুসূদন প্রিয়নাথ চৌধুরী—ষ্টেশনারী বিক্রেতা।

*ইহাদের প্রত্যেকের নিকট পাট পাওয়া যায় ইহারা পাট রাখি করে।

৬। ঠাকুদাস পাল গালমাল ও ষ্টেশনারী বিক্রেতা।

৭। *আসকর খানিমল—গালামাল বিক্রেতা।

৮। হরিচরণ মুরারী মোহর করঙ্গাই—গালামাল ও ষ্টেশনারী বিক্রেতা।

৯। *শ্যামলাল সাহা—গালামাল ও মদগাঁজা বিক্রেতা।

১০। *শ্রীশ চন্দ্র করঙ্গাই—কাপড় বিক্রেতা।

১১। হরিচরণ মুরারীমোহন করঙ্গাই সুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী। ষ্টেশসনারী।

১২। জিতেন্দ্র চন্দ্র ভট্টশালী—স্থানীয় (রংপুরী) তামাক মজুদদার।

ইতি—

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী

পোঃ বিক্রমপুর পাইকপাড়া,
ঢাকা

বিচিত্র-বার্ত্তা

১১ ঘনফুট জলে ১২ ঘনফুট বরফ তৈয়ার হয়।

*

দেবদারু গাছ পৃথিবীর সব দেশে পাওয়া যায়।

*

সাধারণ একটী লোকের ফুসফুসের মধ্যে ৫ কোয়ার্টার বাতাস থাকে।

*

ব্যাং, বাদুর ও সাপ অন্যান্য জীবদের চেয়ে বহুকাল অনাহারে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

*

পোকা মাকড়দের মধ্যে পিপীলিকা সব চেয়ে বুদ্ধিমান, তারপরেই বোল্‌তা মৌমাছি ইত্যাদি।

*

সিংহলের পূর্ব্ব সীমান্তে বাট্টিকালোয়ার নিকট একটি হ্রদের মাছ দলবদ্ধ হইয়া অতি সুমধুর শব্দ করে। প্রত্যহ বিকালে শত শত লোক সেখানে এই মাছের গান শুনিতে যায়।

*

লাইপ্‌সিকে সম্প্রতি নূতন ধরণের ডাকের বাক্স প্রচলন হইয়াছে। চিঠি ও মাশুল ঐ বাক্সের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ চিঠির উপর মাশুলের অঙ্ক ও বাক্সের নম্বর ছাপ পড়ে।

*

শুক্রগ্রহের সূর্য্যের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতে ২২৫ দিন সময় লাগে।

*

নরওয়ে ও সুইডেনে কোন মঠ নাই। সেখানে উহা করা আইন বিরুদ্ধ কার্য্য।

*

লোহার তার এখন এত সূক্ষ্ম তৈয়ার হইতেছে যে উহার দ্বারা এখন রেশমী কাপড়ের মত নরম কাপড় প্রস্তুত হইতেছে।

*

আরবের দক্ষিণাঞ্চলে বিবাহকালে বর ও কনে একভাবে ২টী পৃথক ঘরে বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

*

ফরাসীদেশের হোটেলগুলিতে আজকাল বিবাহের ঘটকালিও তাহাদের ঐ ব্যবসায়ের একটি অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

*

বৃটেনের দূর সমুদ্রে প্রতি বৎসর গড়ে ৫০ হাজার লোক মাছ ধরিয়া ১ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড উপার্জ্জন করে।

*

১৯১৩-১৪ সালে ইংরাজের জাতীয় ঋণ মাথা পিছু ছিল ১০ শিলিং ৮॥ পেন্স, এখন উহা দাঁড়াইয়াছে ৮ পাউণ্ড ৭ শিলিং ৫ পেন্স।

*

হাজার বৎসর পূর্ব্বের আর্ম্মেনিয়ার রাজা-

দিগের রাজধানী আনা সহরে উপস্থিত একজন সন্ন্যাসী বাস করিয়া তাহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।

*

মাইক্রোফোনের আবিষ্কারক ডাক্তার এমিলি গৃহের মধ্যে প্রতিধ্বনী নিবারণ করিবার এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন।

*

চীনা ডাক বিভাগ টেলিগ্রাফে চীনা ভাষা প্রেরণ করিবার জন্য 'ফটো টেলিগ্রাফ' ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেছে।

*

গত বৎসর বৃষ্টল সহরের পোর্টে প্রায় ৭০ লক্ষ কাঁদি আমেরিকার কলা আমদানী হইয়াছে। প্রতি কাঁদিতে গড়ে ১০০টি কলা ছিল।

*

গত শতাব্দী হইতে লণ্ডন সহর যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, এইরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে ২০০০ খৃষ্টাব্দে ইহার লোক সংখ্যা হইবে দুই কোটী।

*

এস্কিমো জাতীয় কয়েক শ্রেণীর লোক মৃত শিশুর সহিত একটী কুকুর কবরিত করে। তাহাদের বিশ্বাস, কুকুর শিশুটির আত্মাকে পর জগতে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।

*

ইংলণ্ডে প্রতি একশত বিবাহের মধ্যে একটি বিবাহ ডাইভোর্স দ্বারা ভগ্ন হয়, এবং প্রতি তিনটি বিবাহভঙ্গকারী পুরুষের মধ্যে দুইটী পুনরায় বিবাহ করে। কিন্তু বিবাহভঙ্গকারিণী-দের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক পুনরায় বিবাহ করিয়া থাকে।

*

ঝঞ্ঝাবাতের পূর্ব্বে সহরবাসীকে সতর্ক করিবার জন্য নিউ ইয়র্ক সহরে এক নূতন যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। সহর হইতে ঝড় যখন ২০০ মাইল দূরে থাকে তখন হইতে একটি ঘণ্টা নিজেই বাজিয়া সহরবাসীকে বিপদের সঙ্কেত দেয়।

*

মোটর দুর্ঘটনা নিবারণ করিবার জন্য কনষ্টান্টিনোপেলে একটি আইন হইয়াছে যে, বোবা লোকেরা পথে চলিবার সময় টুপিতে লাল ফিতা জড়াইয়া যাইবে, কালা লোকেরা পীত ফিতা এবং অন্ধেরা সাদা ফিতা পরিবে।

*

বার্লিনে এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্র পরিত্যক্ত বস্ত্র হইতে সিল্ক প্রস্তুত করে। পথের বাবিস হইতে মেসিনটি দরকারমত বিশিষ্ট বস্তুগুলি টানিয়া লয়। অতঃপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই সকল বস্তু হইতে কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত হয়।

*

জন্ম হইতে হস্তবিহীনা একটি বালিকা মানচেষ্টারের বেথেসডা হোমের যত্নে পদদ্বয়কে হস্তের ন্যায় ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। বালিকাটির বর্ত্তমান বয়স বার বৎসর। সাধারণ মানুষের হাতের মত সে পায়ের আঙ্গুলের সাহায্যে আহার ও লিখন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে।

*

স্পেনের এ্যালমেনড্রালজিয়ো প্রদেশের নারীগণকে পরিধেয় বসনের উপর হইতে নিম্ন প্রান্ত পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যের অনুপাতে কর দিতে হয়। অর্থাৎ পায়ের গোড়ালি যদি কেবল অনাচ্ছাদিত থাকে তাহা হইলে অতি অল্প

নারিকেল চাষ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জই নারিকেলের আদি জন্মস্থান। বাংলাদেশ ভারত মহাসাগরের উত্তর কূলে অবস্থিত বলিয়া ইহার দক্ষিণাংশস্থিত জেলা সমূহে—চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর খুলনা, যশোহর, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর—এই সকল স্থলে প্রচুর নারিকেল গাছ জন্মে। শুধু বাংলাদেশে নয়, বোম্বাই হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত উপকূল ভাগেই নারিকেল চাষ হইয়া থাকে।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সিংহলে এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, নারিকেলের খুব বড় কারবার। বাংলাদেশে যেমন পাট একটা বিশেষ লাভজনক ফসল,—ঐ সকল দেশে তেমনি নারিকেল ফসলে সোণা ফলায়। বাংলাদেশ কিন্তু শত শত বৎসর ধরিয়া এই মূল্যবান ফসল ও ইহার লাভজনক ব্যবসায়কে অনাদর করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। অথচ এই নারিকেলের চাষ ও তাহার ব্যবসায়ের দ্বারা বাংলাদেশেরও সমৃদ্ধিশালী হইবার পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। দেশের বে-কার যুবকেরা "কি করিব,—কি করিব বলিয়া" ঘুরিয়া বেড়ায়, —মূলধনীরা টাকা খাটাইতেছেন অ-কাজে;—গবেষণাকারীদের কাগজপত্র পোকায় কাটিতেছে, চারিদিকে কেবল পলিটিক্সের কচ্‌কচি ও কসরৎ কিন্তু কাজের মত কাজে কাহারও মতিগতি দেখি না। বাংলাদেশে নারিকেল গাছ বিনা যত্নে জন্মে,—বিনা-যত্নে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়,—কিন্তু বাংলাদেশে নারিকেলের চাষ নাই;—নারিকেলের বাগান নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় এবং বিনা চেষ্টায় যাহা-কিছু ফলন হয়, তাহারই সামান্য ঘরোয়া রকমের

---

২০৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত "বিচিত্র-বার্ত্তা"র শেষাংশ

করই দিতে হয়, কিন্তু গোড়ালির উপর যত অনাচ্ছাদিত অংশ বাড়িতে থাকিবে অর্থাৎ বসনের যত ঝুল কমিতে থাকিবে, করের হার তেমনই বাড়িতে থাকিবে।

*

তুরস্কের আদম সুমারীর সময় দেশময় এক অদ্ভুত আদেশ প্রচারিত হয়। প্রত্যেক লোক সেই দিবস নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে ২৪ ঘণ্টাকাল গৃহ হইতে বাহির হইতে পারে না। রাস্তা ঘাটে যান চলাচল নিষিদ্ধ হয়। টেলিফোন ও টেলিগ্রাম লাইনে সংবাদ আদান ও প্রদান বন্ধ হয়, এমন কি বাজার হাট দোকান পত্র সমস্ত সেদিন এই আদেশের ফলে বন্ধ রাখিতে হয়।

বেচা কেনা চলে। সুতরাং ইহাতে বাংলাদেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির কোন সুবিধা নাই। বাস্তবিক ইহার ব্যবসা বড় রকমে চালাইতে হইলে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে চাষ আরম্ভ করা আবশ্যক এবং যাহাতে ফলনের পরিমাণ এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

অনেকের বিশ্বাস বাংলাদেশে উৎকৃষ্ট নারিকেলের ফলন হয় না। গবেষণাকারীরাও তাই বলেন। কিন্তু এ সব অলস ও কর্ম্ম-ভীত লোকের উক্তি। যেমন বলা হয়, বাংলাদেশে ভাল তুলা হয় না,—এ-ও ঠিক সেই রকমের কথা। যাহা হউক, বাংলাদেশের সমুদ্র-উপকূল হইতে তিন চারিশত মাইল দূরবর্ত্তী ভূমিও যে নারিকেল ফলনের যোগ্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার উপর একটু চেষ্টা করিলে,—বীজ নির্ব্বাচন, জমি তৈয়ারী, সার প্রদান, প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী হইলে, বাংলাদেশেই নারিকেলের ফলন এত বেশী হইতে পারে যে, বিদেশেও উহা চালান দেওয়া যায়।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের নারিকেল চাষ বিষয়ে কোন উৎসাহ নাই। তাঁহাদের কৃষি বিভাগের বিবরণ নারিকেলের কথা বর্জ্জিত।

পাটের বাজার নষ্ট হইয়া যাওয়াতে কৃষকদিগকে পাটের চাষ কমাইতে খুব উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, পাটের বদলে অন্যান্য নানাবিধ ফসলের চাষ করিতে তাহাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু নারিকেল চাষের প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। অথচ বাংলাদেশের ফলের মধ্যে নারিকেলই প্রধান। ভারতের

মাদ্রাজ ও বোম্বাই উপকূলে (করমণ্ডল ও মালাবার) সমুদ্র হইতে ২০।৩০ মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে নারিকেল জন্মায় না, কিন্তু বাংলাদেশের উপকূলের ৩০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানেও প্রচুর নারিকেল গাছ জন্মায়। এমন কি জলপাইগুড়ী ও আসামেও নারিকেলের যে ফলন দেখা যায় তাহাও নিতান্ত অল্প নয়। বাংলার ভূমি সামুদ্রিক, সুতরাং বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানে নারিকেলের চাষ হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের বট্যানিক্যাল সার্ব্বে বিভাগের ভূতপূর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী সার জর্জ্জ্ ওয়াট্‌স্ তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

নারিকেলের ফল ও গাছ এত অসংখ্য রকমের কাজে লাগে যে, বাংলাদেশের লোকেরা (অন্ততঃ হিন্দুরা) নারিকেল গাছকে পুত্রস্বরূপ মনে করে এবং প্রাণান্তেও কখনো নারিকেল বৃক্ষ ছেদন করে না। নারিকেল পাতা দিয়া ঘর ছাউনীর কাজ হয়। পাতার শলাগুলির দ্বারা ঝাঁটা, ঝুড়ি প্রভৃতি তৈয়ারী করা যায়। নারিকেলের বাগড়া অথবা গামড়া (যাহাতে পাতাগুলো লাগান থাকে) চিরিয়া শুকাইয়া লইলে তাহা জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা চলে। পাড়াগাঁয়ে উনুন ধরাইতে (বিশেষতঃ বর্ষার দিনে) গৃহস্থদের ঘরে সঞ্চিত শুক্‌না নারিকেল পাতা ব্যবহার হয়। বড় বড় নারিকেল গাছের গুঁড়ি করাত দিয়া চিরিয়া গৃহনির্ম্মাণের জন্য খুঁটী পাইড় প্রভৃতি করা হয়। নারিকেল ফলের মোচার (কচি কুঁড়ি) অগ্রভাগ কাটিয়া তাহা হইতে এক প্রকার রস সংগ্রহ করা হয়। সেই রস হইতে একপ্রকার গুড় ও ভিনিগার তৈয়ারী হইয়া থাকে। ঠিক যেমন তালের রস হইতে তাড়ি ও মিছরী তৈয়ারী হয় সেই রকম। বাংলাদেশে এই প্রকার নারিকেল রসের গুড় তৈয়ারী প্রচলিত নাই, বোম্বাই মাদ্রাজ অঞ্চলে রহিয়াছে। নারিকেল ফলের বাহিরের খোসার ছোবড়া ও আঁশ হইতে দড়ি, পা-পোষ, ম্যাটিং প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় শিল্প দ্রব্য তৈয়ারী হয়। ফলের ভিতরের শক্ত খোসা (যাকে চল্‌তি কথায় নারিকেলের মালা বলা হয়) হইতে পেয়ালা, পান-পাত্র বোতাম, খোঁপার চিরুণী প্রভৃতি নানারকম ছোট-খাট সৌখীন দ্রব্য তৈয়ারী করা যায়। বাংলাদেশে প্রথম স্বদেশী যুগে আমরা নারিকেল মালার তৈয়ারী সুদৃশ্য বোতাম দেখিয়াছিলাম। ধোবার আছাড়ে উহা ফাটিয়া যায় বলিয়াই বোধ হয় তেমন চল্‌তি হয় নাই। বাংলাদেশে নারিকেল মালায় প্রধানতঃ হুঁকার খোল তৈয়ারী হয়। পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা প্রভৃতি সহরে ইহার খুব বড় কারবার আছে। তারপর নারিকেল ফলের শাঁস হইতে যে তৈল নিষ্কাসিত করা হয়, তাহা সকলেই জানেন। এই তৈল হইতে বর্ত্তমান সময়ে ঘৃত ও মাখন জাতীয় নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহা উচ্চ মূল্যে বাজারে বিক্রয় হইতেছে। বাংলাদেশে নারিকেল তৈলের কারখানা নাই। চাষের দ্বারা নারিকেলের ফসল বাড়িলে বাংলাদেশেও নারিকেল তৈলের কারখানা চলিতে পারে।

নারিকেলের এইরূপ প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিয়া উষ্ণমণ্ডলের সকল দেশে এখন ইহার প্রচুর চাষ আরম্ভ হইয়াছে। যদিও সমুদ্রের উপকূলেই নারিকেলের ফলন ভাল হয় তথাপি পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে, যেখানকার মাটী

সমুদ্রের ধারের মাটীর মত বালুকাময় এবং যেখানে প্রচুর রৌদ্র ও বাতাস লাগে সেই স্থানেই নারিকেল গাছ জন্মায় এবং ফলন্ত হয়। আধুনিক উন্নততর প্রণালীতে রীতিমত সার দিয়া এবং যত্ন পরিচর্য্যার সহিত নারিকেলের চাষ করিয়া বর্ত্তমান কালে উষ্ণমণ্ডলের সকল দেশই সমৃদ্ধিশালী হইতেছে। পরীক্ষায় ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, নারিকেল গাছ অল্পযত্নেই খুব জোরাল হইয়া উঠে, এবং ইহার উপর যে খরচা করা হয়, তাহার পরিপূরণে লাভ পাওয়া যায় প্রচুর। সুতরাং নারিকেল চাষে মনোযোগী হইয়া তদ্দরুণ অর্থব্যয় করিতে কোন ব্যক্তিরই কৃপণতা করা উচিত নয়।

আশ্চর্য্য রকমের কতগুলি প্যারাডক্স (Paradax) অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বিপর্য্যয় আমাদের দেশে দেখা যায়। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" কথাটাকে লোকে শাস্ত্রের বচনের মত শ্রদ্ধা করে কিন্তু কার্য্যতঃ "লক্ষ্মী"র অনুসন্ধানে ছুটে চাকুরী ও ভিক্ষার দিকে। গরুকে ভগবতীজ্ঞানে পূজা করে, আমাদের দেশের লোক। কিন্তু গরুর এত অযত্ন ও দুর্দ্দশা পাশ্চাত্য দেশের গোখাদকদের মধ্যেও নাই। নারিকেল গাছকে বাংলাদেশের লোকেরা পুত্র জ্ঞান করে, প্রাণান্তেও বাঙ্গালীরা নারিকেল গাছ কাটেনা একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু নারিকেল গাছের এমন দুরবস্থা আর কোন দেশে নাই। বাপ-দাদা পিতামহরা হয়ত কয়েকটা নারিকেল গাছ লাগাইয়া গিয়াছেন, আর সন্তান সন্ততিরা দুই শত বৎসর ধরিয়া তার ফল কুড়াইয়া খাইতেছেন,—অথচ না আছে তার গোড়ায় সার দেওয়া,—না আছে তার শত্রু পোকামাকড়গুলি নষ্ট করা,—না আছে তার কোন পুত্রের মত স্নেহ পরিচর্য্যা। কাঠ ঠোকরায় তার আগাগোড়া সার ফোঁপড়া করিয়া দিয়াছে, তথাপি সে বৎসরের পর বৎসর ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতে দাঁড়াইয়া অক্লান্তভাবে ফল দিয়া আসিতেছে! এমন অভিশপ্ত দেশের যুবকেরা বিদ্যার বোঝা মাথায় করিয়াও পেটের দায়ে অন্নের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বিদেশীরা কিরূপে সাত-সমুদ্র তের নদী পার হইয়া উদ্যোগী পুরুষ সিংহের মত আসিয়া দেশের ধন ভাণ্ডার অধিকার করিয়া বসে তাহা দেখিয়াও আমাদের দেশের লোকের চক্ষু ফুটেনা। আসামে দার্জ্জিলিঙে যেমন বিদেশী বড় বড় প্ল্যান্টার কোম্পানী সকল চা-বাগান খুলিয়াছেন;— মহীশূরে যেমন তাঁহারা কফির চাষ আরম্ভ করিয়াছেন, তেমনি তাঁহারা মালয়, পিনাং, সিঙ্গাপুর, সিংহল, আন্দামান, কোচিন, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে বিরাট রকমে নারিকেলের চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে সুদূর প্রাচ্যে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে চা-কফি ইক্ষু প্রভৃতির প্ল্যান্টারদের সঙ্গে নারিকেল প্ল্যান্টারেরাও বহু সংখ্যক ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য বাংলাদেশে এখনও আমরা ইহাদের কোন কারবার দেখিতে পাইনা বটে, কিন্তু দিনে দিনে যেমন অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে যে বাংলাদেশেও নারিকেল চাষ ও ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয় প্ল্যান্টারদের হাতে যাইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই;—যেমন পাট গিয়াছে ঠিক তেমনি। অবশ্য পাটের চাষ দেশীয় কৃষকদের হাতেই আছে, যেমন মাখন তোলা দুধের ঘোলের মত। কতগুলি বৃহৎ বৃহৎ কারবার আছে, যাহা

বিদেশীয় মূলধনে গড়িয়া উঠাতে আমাদের আপত্তি হয় না,—যেমন কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রভৃতি খনি সম্পর্কিত কারবার,—চা-কফি প্রভৃতি কৃষি বিষয়ক কারবার। কারণ ইহাদের তৈয়ারী ও বিক্রয়ে এমন-সব বিশেষত্ব আছে, যাহা দেশীয় প্রচেষ্টার বহির্ভূত। কিন্তু সহজ সাধ্য পাট তূলা. ইক্ষু প্রভৃতি চাষের কারবার এবং পৃথিবীর বাজারে তাহাদের উঠ্‌তি-পড়্‌তি সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দেশীয় লোকের হাতে থাকিবে না কেন? নারিকেলও তেমনি, বাংলাদেশে একটা নূতন রকমের ফসল নহে, আমাদের পৌরাণিক ঋষি বিশ্বামিত্রের সময় হইতে আমরা নারিকেলের সন্ধান পাই। আমেরিকার লোকেরা বরব্যাঙ্ক * আলুর চাষে সমৃদ্ধিশালী হইয়া সেই বৈজ্ঞানিকের যাদুবিদ্যাকে সার্থক করিয়াছে, কিন্তু আমরা বিশ্বমিত্রের নারিকেলকে কেবলমাত্র ঘটের উপর বসাইয়া প্রণাম ঠুকি, তাহাতেই কি সেই মহর্ষির মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে? তাহা নয়,—

আমরা নারিকেলকে চাষ ও কারবারের স্থল হইতে বিতাড়িত করিয়া মানব সমাজে ইহার অভিব্যক্তির হেতুভূত সেই মহর্ষির অবমাননাই করিয়াছি। আজ আমাদের কৃষিসম্পদের অভাব,—আর্থিক দুর্ব্বলতা সেই অবমাননার শাস্তি।

কিন্তু আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য যদি এই নারিকেল ব্যবসায়েও বিদেশীর মূলধন নিয়োজিত হয়,—তবে বলিতে হইবে, দুর্ভাগ্য এই জাতির ভাগ্যে কেবল খোসা আর ছিবড়ে, সার শাঁস ভোগ করিবে তারাই।

এইমাত্র ভূমিকার পর আমরা আগামীতে নারিকেলের চাষ, বীজ নির্ব্বাচন, জমি প্রস্তুত, সার দেওয়া, বৃক্ষ পরিচর্য্যা প্রভৃতি বিবিধ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিবরণ প্রদান করিব।

* লুথার বরব্যাঙ্ক আমেরিকার বিখ্যাত উদ্ভিদ্ বিদ্যা বিশারদ। তাঁহাকে লোকে বলিত Wizard Botanist of America আমেরিকার যাদু-কর উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদ্। তিনি জনসমাজের হিতকরে বহুসংখ্যক নূতন উদ্ভিদের অভিব্যক্তি সাধন করিয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ য়্যাসুর‍্যান্স্ কোম্পানীস্ য়্যাসোসিয়েশনের মেম্বারগণ এবং প্রেসিডেণ্টকে সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত ভারত ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানী গত ৯ই মার্চ্চ কলিকাতাস্থ গ্র্যাণ্ড্ হোটেলে এক ডিনার পার্টির আয়োজন করিয়াছিলেন। ভারত ইন্সুর‍্যান্সের ভাইস্ চেয়ারম্যান্ মিঃ দুর্গাপ্রসাদ খৈতান, এবং কলিকাতার ডিরেক্টার-ইন্-চার্জ্জ পরলোকগত ডাঃ এস্ সি রায় সকল বিষয়েব তত্ত্বাবধান করেন।

প্রভিডেণ্ট্ ইনস্যুর‍্যান্স্ কোম্পানীস্ য়্যাসোসিয়েশান (বেঙ্গল) এর আফিস ১৩৭ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট হইতে ২ নং রয়েল এক্স্চেঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা, এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

নেপচুন য়্যাসুর‍্যান্স্ কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চ্ আফিস্ ১২ নং ড্যালহৌসী স্কোয়ার হইতে উইণ্ডসর হাউস্, ম্যাঙ্গোলেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

হিন্দুস্থানের চীফ্ এজেণ্ট্স্ মেসার্স্ এ সি বিশ্বাস এণ্ড্ সন্স্ কোম্পানীর মিঃ পি কে বিশ্বাস গাইবান্ধা মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি গাইবান্ধা দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এ্যাসিওরেন্সের আপিশ ৩০৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউয়ে "হিন্দু মিউচ্যুয়াল হাউসে" স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই নবগৃহে কোম্প্যানীর আরও উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হউক আমরা ইহাই কামনা করি।

মোটর ইন্সুর‍্যান্স্ তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বোম্বাই, বাংলা এবং মাদ্রাজ সহ অধিকাংশ প্রদেশের সাক্ষীগণ বাধ্যতামূলক বীমার পক্ষপাতী। কেবলমাত্র পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ সহ চারিটী প্রদেশ ইহার

বিরোধী। সুতরাং আশা করা যায়, মোটর বীমা বাধ্যতামূলকই হইবে।

—•—

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট্ কোম্পানীর আফিসে প্রভিডেণ্ট্ ইনসুরান্স্ কোম্পানীস্ য়্যাসোসিয়েশন (বেঙ্গল) এর তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ আই বি সেন, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি সকলের মধ্যে একতা স্থাপনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। ১৯৩৭ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন পদে নির্ব্বাচিত হন ;—ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্টের মিঃ আই বি সেন (প্রেসিডেণ্ট্), এশিয়াটিক ইনসুর‍্যান্সের মিঃ সি সি মজুমদার (ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট্) য়্যাসোসিয়েটেড্ ইণ্ডিয়ার মিঃ এস্ কে কর (সেক্রেটারী), বেঙ্গল প্রভিডেণ্টের মিঃ পি চন্দ (য়্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী)

—•—

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ য়্যাসুর‍্যান্স অফিসেস্ য়্যায়োসিয়েশনের নবম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৯ই মার্চ্চ ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ানের আফিস্ গৃহে হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত কে শান্তনম্ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার অভিভাষণের মর্ম্ম এই পুস্তকের অন্যত্র প্রকাশিত হইল। তিনি বর্ত্তমানে প্রস্তাবিত নূতন বীমা আইনের বিশেষ সমালোচনা করেন। ১৯৩৭ সালে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার বিভিন্নপদে নিযুক্ত হইয়াছেন ;—

লক্ষ্মীর পণ্ডিত কে শান্তনম্ (প্রেসিডেণ্ট);
নিউ ইণ্ডিয়ার মিঃ এস্ বি কার্ড মাষ্টার (ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট);
জেনিথের মিঃ বৈরামজী হরমুসজী, (অনারারী সেক্রেটারী)

—•—

এতদিন যাহা অন্ধ্র ইনস্যুরান্স কোম্পানীর চীফ্ এজেন্সী বলিয়া পরিচিত ছিল, এখন তাহা উক্ত কোম্পানীর ব্রাঞ্চ আফিসে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার ঠিকানা হইয়াছে, ৩ নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার কলিকাতা।

—•—

এশিয়া মিউচুয়্যালের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ জে এল সাহা বরিশাল গমন করিলে উক্ত কোম্পানীর বরিশাল ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মিঃ এল্ বি মহম্মদ মনসুর চৌধুরী তাঁহাকে এক টী-পার্টিতে সম্বর্দ্ধনা করেন। সেই পার্টিতে বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এবং বীমাকর্ম্মিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রস্তাবিত বীমা আইন সম্বন্ধে আলোচনাও চলিয়াছিল।

—•—

শেঠ বৈজনাথ বাজোরিয়া এম্ এল্ এ মহাশয় তিলক ইনস্যুর্যান্স্ কোম্পানীর ডিরেক্টার হইয়াছেন। প্রস্তাবিত ইনসুর্যান্স আইন আলোচনার জন্য যে সিলেক্ট কমিটী গঠিত হইয়াছে, শেঠজী তাহারও একজন সদস্য। যুক্ত প্রদেশের বিখ্যাত ব্যবসায়ী লালা গোপাল-রাজস্বরূপ তিলক ইনসুর্যান্সের আর একজন ডিরেক্টার। মিঃ সি, বি, জৈন বি, কম, এই কোম্পানীর সেক্রেটারী হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে ষ্টার্লিং ইনসুর্যান্স কোম্পানীতে কার্য্য করিতেন।

—•—

গত ১৭ই এপ্রিল বেকন ইনসুর্যান্স কোম্পানীর হেড অফিসে (২নং রয়্যাল্ এক্‌চেঞ্জ প্লেস্) উক্ত কোম্পানীর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব হইয়া গিয়াছে। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট মাননীয় মিঃ এস্ সি মিত্র তাহাতে পৌরহিত্য করেন। উক্ত কোম্পানীর যে সকল ফিল্ড্ ওয়ার্কার পুরস্কার পাইয়াছে, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তিনি সময়োপযোগী কয়েকটী কথা বলেন। জলযোগান্তে সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

—•—

মিঃ অমরেশচন্দ্র বসু সোণার ভারত ইনস্যুর্যান্স্ কোম্পানীর এজেন্সী ম্যানেজার ছিলেন। তিনি সম্প্রতি উক্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্যাঙ্গুইন্ ইনস্যুর্যান্স্ কোম্পানীর এজেন্সী ম্যানেজার হইয়াছেন।

গত ১৯শে এপ্রিল ভারত ইনস্যুর্যান্স্ কোম্পানীর কলিকাতাস্থিত ডিরেক্টার ইন-চার্জ্জ্ ডাঃ এস্ সি রায় তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে,—কেবলমাত্র ভারত ইনস্যুর্যান্সের নহে, সমগ্র ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত গভীর দুঃখ ও সহানুভূতি জানাইতেছি। এই পুস্তকের অন্যত্র ডাঃ রায়ের বিস্তৃত জীবন চরিত প্রকাশিত হইল।

—•—

কার্য্যবৃদ্ধি জনিত স্থানের অপ্রতুলতার জন্য ১৯৩৭ সালের ১লা মে তারিখ হইতে লাইট অফ এশিয়ার আপিশ ২নং চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউয়ে স্থানান্তরিত হইবে।

—•—

ইণ্ডিয়া মিউচ্যুয়াল বেনিফিট্ সোসাইটী

ইণ্ডিয়া মিউচ্যুয়াল বেনিফিট্ সোসাইটীর আপিসে এজেণ্ট এবং কর্ম্মীদিগের মধ্যে যাহারা ভাল কাজ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য সম্প্রতি এক পারিতোষিক বিতরণী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর পরিবারের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ এবং পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। সভায় জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রার মিঃ এন্, এন, মজুমদার, প্রবোধচন্দ্র দাস, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, কে, কে, ঘোষ, টি, এইচ, মুখার্জ্জী, এস্, এন্, ঠাকুর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। মিঃ মজুমদার বীমা কোম্পানীর আয় ব্যয় এবং লগ্নীর সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথার অবতারণা করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ থাকিলেও বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়াম হার গঠন এবং তদনুযায়ী আয়ব্যয়ের একটা definite এবং clear cut programme সর্ব্বদা সম্মুখে না রাখিলে এবং কঠোরতার সহিত তাহা অনুসরণ না করিলে বীমা কোম্পানী সমূহকে দাবীর টাকা মিটাইবার সময় যে দারুণ বেগ পাইতে হইবে এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। আশা করি বীমা কোম্পানী সমূহের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এই সাবধান বাণী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

এই উপলক্ষে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পি, কে, মুখার্জ্জী কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার এক চিত্তাকর্ষক বিবৃতি প্রদান করেন। খরচ কমাইবার জন্য সদা সর্ব্বদা তিনি রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করেন এবং অতি অল্প ব্যয়ে এবং অল্প কমিশনে, বিশ্বস্ত, সচ্চরিত্র এবং কোম্পানীর প্রতি আস্থাবান একদল দরদী এজেণ্ট গঠন করিয়াছেন এবং যতদূর সাধ্য কম ব্যয়ে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। আমরা বারান্তরে এই কোম্পানীর ব্যালান্স-সীট ও বার্ষিক রিপোর্ট আলোচনা করিব।

প্রস্তাবিত বীমা আইন সমালোচনায়

মিঃ অমরকৃষ্ণ ঘোষের মন্তব্য

বিগত ১৪ই এপ্রিল নয়া দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান লাইফ য়্যাস্যুর‍্যান্স অফিসেস্ য়্যাসোসিয়েশনের এক জরুরী অধিবেশন হয়। সেই সভাতে যোগদান করিবার নিমিত্ত বাংলাদেশ হইতে মিঃ অমরকৃষ্ণ ঘোষ (বেঙ্গল ইন্স্যুর‍্যান্স য়্যাণ্ড রিয়্যাল প্রপারটী) মিঃ পূর্ণচন্দ্র রায় (হিন্দু মিউচুয়্যাল) মিঃ এস্ পি বসু (ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান) মিঃ কে এম নায়ক (ন্যাশন্যাল লাইফ) প্রভৃতি বীমাকোম্পানী সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নয়াদিল্লীতে গিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত বীমা আইন সম্বন্ধে বাংলাদেশের বীমা ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে যাহাকিছু বলিবার আছে, তাহা উক্ত য়্যাসোসিয়েশনের সম্মুখে প্রকাশ করা এবং যাহাতে বাংলার বীমা ব্যবসায়ের স্বার্থের জন্য ঐ সকল মত গ্রাহ্য হয় সে বিষয়ে চেষ্টা করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মিঃ অমর কৃষ্ণ ঘোষ যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম দিলাম।

মিঃ অমরকৃষ্ণ ঘোষের মন্তব্য

যে সকল কোম্পানীর কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ বেশী নহে, তাহাদের উপর প্রস্তাবিত বীমা আইন খুব কড়াকড়ি করিয়াছেন। এত কড়াকড়িতে ঐ সকল কোম্পানীর পক্ষে টিকিয়া থাকাই মুস্কিল। তিন বৎসরের মধ্যে দুইলক্ষ টাকা ডিপজিট দিতে হইলে অনেক কোম্পানীরই দুর্দ্দশার চরম হইবে। এই ডিপজিট দেওয়ার

মিঃ অমরকৃষ্ণ ঘোষ

সময় যাহাতে তিনবৎসরের অধিক করা হয়, তার জন্য সিলেক্ট্ কমিটীর মেম্বারগণকে অনুরোধ করা হইবে।

আইনে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, বীমা কোম্পানীকে মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ শতকরা (৩৩⅓ টাকা) গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে লগ্নী করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে য়্যাসোসিয়েশনের সভায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, ঐ লগ্নীর পরিমাণ কমাইয়া শতকরা ২৫ টাকা (মোট সম্পত্তির

এক চতুর্থাংশ) করা হউক। বিদেশী কোম্পানীর মালিকদিগকে উহা ভারতীয় পলিসি হোল্ডারদের ট্রাষ্টে লগ্নী করিতে হইবে।

প্রস্তাবিত আইন ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌দের উপর খড়্গ হস্ত হইয়াছে। য়্যাসোসিয়েশনের সভাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ম্যানেজিং এজেণ্ট সম্পর্কীয় ধারাটী একেবারে তুলিয়া দেওয়া হউক। যদি ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌দের উপর কিছু কড়াকড়ি শাসন রাখিতে হয়, তবে তাঁহাদের উপর ভারতীয় কোম্পানী সম্বন্ধীয় আইন প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট; তাহার উপর ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌দের একটা সর্ব্বোচ্চ বেতনের সীমা আইনের বলে ধরা বাঁধা করিয়া দিলেই হয়।

এজেণ্টদের লাইসেন্স লওয়ার নিয়ম করিলে যদিও রিবেট প্রথার উচ্ছেদ হইবে বটে, কিন্তু বীমা সংগ্রহ করাও কঠিন হইবে এবং সমগ্র বীমাব্যবসায়ের উপর তাহার সদ্য ফল হইবে দারুণ বিষময়। এই জন্য য়্যাসোসিয়েশন প্রস্তাব করেন, লাইসেন্স লওয়ার পদ্ধতিটী যেন ক্রমে ক্রমে প্রবর্ত্তন করা হয় এবং লাইসেন্সের নিয়মগুলিও যেন কড়াকড়ি না হয়।

এজেণ্টদের কমিশন শতকরা ৪০ টাকার বেশী হইবে না, এই নিয়মটী আইনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দূষনীয় হইয়াছে। যাহারা বিলের খসড়া রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল আইনের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছেন, প্রকৃত কার্য্য ক্ষেত্রে কোন্‌টা উপযোগী তাঁহারা সে বিষয়ে কিছুমাত্র

চিন্তা করেন নাই। এই আইন পাশ হইলে ছোট খাট কোম্পানীর এজেণ্টও থাকিবে না, কারবারও চলিবে না, কারণ, বড় বড় কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া দাঁড়াইতে ছোটখাট কোম্পানীকে বেশী কমিশন দিয়া এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে হয়। বাস্তবিক এজেণ্টদের কমিশন বীমা কোম্পানীর শুধু একটী দফার খরচ, ডাক্তারের ফিস্, কর্ম্মচারীদের বেতন, আফিসের ঘর ভাড়া, কাগজপত্র ছাপান প্রভৃতি আরও অনেক দফাতে কোম্পানীর বহু টাকা খরচ হয়। সেই দিকে খরচ কমাইবার ব্যবস্থা করা যায় এজেণ্টদের সর্ব্বোচ্চ কমিশনের সীমা নির্দ্দেশ না করিয়া মোট খরচের সর্ব্বোচ্চ সীমা ঠিক করিয়া দিলে। তাহাকে তবু যা-হোক একটা বুদ্ধিমানের প্রস্তাব বলিয়া গণ্য করা যায়।

য়্যাসোসিয়েশনে নির্দ্ধারিত প্রস্তাব সমূহ বাংলা দেশের বীমাব্যবসায়ের স্বার্থের অনুকূলেই হইয়াছে। আশা করা যায়, য়্যাসোসিয়েশানের মন্তব্য সমূহ সিলেক্ট্ কমিটির মেম্বারগণ গ্রহণ করিবেন।

—→—→←—
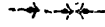
ইণ্ডিয়ান লাইফ য়্যাসুর্য়্যান্স অফিসেস্ য়্যাসোসিয়েসন

নবম বার্ষিক সাধারণ সভা

(৯ই মার্চ্চ, ১৯৩৭)

সভাপতি পণ্ডিত কে শান্তনম মহাশয়ের অভিভাষণের সারমর্ম্ম

অতি অল্পসময়ের মধ্যে আমাদের এই সভা বীমা জগতে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই আমাদের গৌরবের বিষয়। বর্ত্তমান সময়ে ৪০টী বীমা কোম্পানী ইহার অন্তর্ভুক্ত। সভ্য নির্ব্বাচনে একটু কড়াকড়ি না থাকিলে আরও অনেক কোম্পানী ইহাতে যোগদান করিতে পারিতেন। যে কোন বীমা কোম্পানীই আমাদের এই য়্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হইতে পারেন না। কারণে অনেকে আমাদের উপর অসন্তুষ্ট আছেন। কিন্তু আমরা ভালর জন্যই এই নিয়মটী করিয়াছি। ছোট খাট বীমাকোম্পানীকে প্রথম অবস্থায় নানা রকম ঝঞ্চাটে পড়িতে হয়। ভাল রকমে পরিচালনা করিতে পারিলে ঐ সকল বিপদ আপদ কাটান যায়। কোম্পানী একটু সচ্ছল অবস্থায় না পৌঁছিলে এবং দৃঢ়ভিত্তিতে না দাঁড়াইলে আমরা তাহাকে আমাদের সমিতির মেম্বার করি না। আশা করি আমাদের উদ্দেশ্যটীকে কেহ ভুল বুঝিবেন না।

১৯৩৬ সালের নবেম্বর মাসে বীমা

সম্বন্ধীয় আইনের তদন্তের জন্য যে পরামর্শ সমিতি (Advisory Committee) নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার সমক্ষে আমাদের এই সমিতিকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, আমাদের সমিতির মেম্বারের সংখ্যা মাত্র ৪০, সুতরাং উহা প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারে না। আমাদের মেম্বারের সংখ্যা ৪০ এর বেশী কেন হয় নাই, তাহা আমি পূর্ব্বেই আপনাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি আমাদের সমিতির মেম্বার হইবার নিয়মটা সংশোধিত হইবার কথা উঠিয়াছে। তদনুসারে নিম্নলিখিত প্রকারের কোম্পানী সমূহ ইহার মেম্বার হইতে পারিবেন, (১) যাঁহাদের ভ্যালুয়েশন হয় নাই, অথচ যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট পূরা দুই লক্ষ টাকা ডিপজিট্ রাখিয়াছেন এবং প্রথম বাৎসরিক রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন কিম্বা যাঁহাদের দুই লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধন আছে এবং প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। (২) যে সকল কোম্পানীর ভ্যালুয়েশনে কোন ঘাটতি দেখা যায় নাই।

১৯৩৬ সালে ভারতীয় বীমা সম্বন্ধীয় প্রধান ঘটনা পুরাতন বীমা আইন সংশোধন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত স্পেশ্যাল অফিসার মিঃ সেন কর্ত্তৃক আইনের তদন্ত ও রিপোর্ট, এবং পরামর্শ সমিতির (Advisory Committee) অধিবেশন। তৎপরে ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্টের আইন সদস্য কর্ত্তৃক নূতন সংশোধিত আইনের প্রস্তাব পরামর্শ সমিতির কোন রিপোর্ট দিবার ক্ষমতা ছিলনা। আমার মনে হয়, যে প্রণালীতে এই নূতন আইন প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা আগা-গোড়াই ভুল। তথাপি আইন-সদস্য স্যার এন্ এন্ সরকার যে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া খুব শীঘ্র শীঘ্র বিলটীর প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা না করিয়া পারি না। এই তাড়াতাড়ির জন্যই হয়ত বিলটী একেবারে নিখুঁত হয় নাই।

যখন মিঃ সেনের রিপোর্টের কথা প্রকাশিত হইল এবং জানা গেল যে, ঐ রিপোর্ট আলোচনা করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট পরামর্শ সমিতি নিযুক্ত করিতেছেন, তখন বোম্বাইয়ের কতিপয় প্রধান বীমা ব্যবসায়ী মিলিত হইয়া একটী
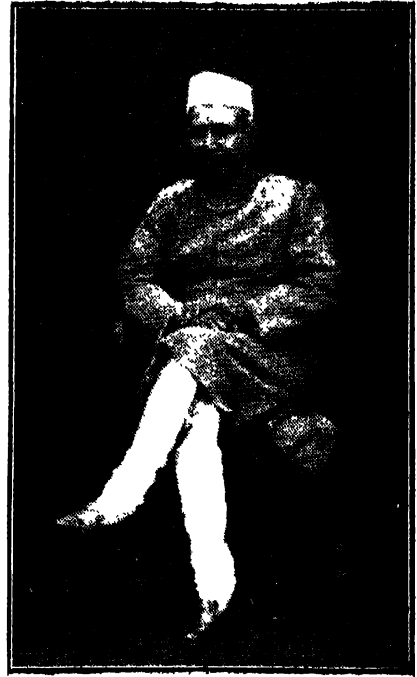
পণ্ডিত কে, শান্তনম্

লেজিস্লেসন সাব্ কমিটী গঠন করেন এবং প্রায় ৬০ টী অধিবেশনের পর সংশোধিত বীমা আইনের একটা খসড়া প্রস্তুত করেন। আমিও সেই কমিটির একজন মেম্বার ছিলাম।

এই খস্‌ড়াটী যাহাতে গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত পরামর্শ সমিতির মেম্বারদের হাতে যথা সময়ে যায়, তাহার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের বীমাব্যবসায়ীদের এই চেষ্টার সুযোগ লইয়া গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ সমিতির দুইজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি বোম্বাই ও বাংলার বীমা ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও মনোমালিন্য সৃষ্টির প্রয়াস করিয়াছিলেন কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহাদের সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। আমাদের সেই লেজিস্‌লেসন সাব কমিটী যে রিপোর্ট ও খস্‌ড়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের স্বার্থের দিক হইতে সকল বিষয় বিবেচনা করা হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন, আমাদের কমিটীর রিপোর্টে ছোট-খাট নূতন কোম্পানীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই। তাঁহাদের এই ধারণা ভুল। "ব্যাঙের-ছাতার-মত আজকাল চারিদিকে যে সমস্ত বীমা কোম্পানী গজাইয়া উঠিতেছে, আমাদের কমিটীর রিপোর্ট সেই সকল কোম্পানীর বিরুদ্ধেই বলিয়াছেন। যে সকল ছোট-খাট নূতন কোম্পানী ইতিমধ্যে কিছুটা কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কমিটী কিছু বলেন নাই; বরঞ্চ তাঁহাদের পরিচালনা কার্য্য যাহাতে অধিকতঃ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়, এবং তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা যাহাতে দিনের দিন ভাল হয়, আমাদের কমিটী সেই বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রচুর আর্থিকবল সম্পন্ন না হইয়া কোন নূতন বীমা কোম্পানীর পক্ষে এখন ব্যবসায়ক্ষেত্রে আসা উচিত নহে,—একথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

প্রস্তাবিত নূতন আইনে ব্রিটিশ-নীতি অবলম্বিত হইবে,—না ক্যানাডার নীতি অবলম্বিত হইবে ইহা লইয়াই গভর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের কমিটীর মতভেদ হয়। ব্রিটিশ নীতি অনুসারে বীমাব্যবসায়ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের উপর গবর্ণমেণ্টের কোন কড়াকড়ি শাসন বা হস্তক্ষেপ নাই;—বীমাকারিগণ নিজনিজ স্বার্থ নিজেরাই রক্ষা করিয়া চলেন। তবে গভর্ণমেণ্ট এই পর্য্যন্ত করেন যে, বীমাকারীগণকে বিভিন্ন কোম্পানীর দোষগুণ ভালমন্দ সম্বন্ধীয় সকল বিবরণ জানাইয়া দেন। ক্যানাডার নীতি ঠিক তার বিপরীত। সেখানকার গভর্ণমেণ্ট মনে করেন বীমা ব্যবসায়ের উপর জাতির সমগ্র অর্থ সম্পদ এবং বিশ্বাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট ইহার উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া পারেন না। এইজন্য ক্যানাডার গভর্ণমেণ্ট সেখানকার বীমা ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নানাবিধ আইন কানুন করিয়া কোম্পানী গুলোকে 'আষ্টে পিষ্টে' বাঁধিয়াছেন। ভারতীয় বীমা আইন সংশোধনে, ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ীগণ এবং জনসাধারণ ইহাই চাহিয়াছিল যেন গভর্ণমেণ্ট বীমা ব্যবসায়ের উপর একটু কড়াকড়ি শাসন করেন এবং যাহাতে বিদেশী কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় কোম্পানী সমূহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করেন। প্রস্তাবিত আইনে গভর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ নীতি অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় নাই। ইহা সুখেরই কথা। বরঞ্চ আমরা চাই, ব্রিটিশ নীতি লঙ্ঘন করিয়া গভর্ণমেণ্ট আর একটু অগ্রসর হইলে ভাল হইত। ক্যানাডার আইনের কতকগুলি ধারা প্রস্তাবিত আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আমাদের মতে, বীমাকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য

ঐ রকম আরও কয়েকটি ধারা লওয়া হইলে ভাল হইত।

আমরা লেজিস্‌লেসন কমিটিতে যে খসড়া আইন তৈয়ারী করিয়াছি তাহার সহিত গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত আইনের অনেক বিষয়ে মিল আছে। দেশী অথবা বিদেশী যে-কোন কোম্পানী যে-কোন রকমের বীমার কারবার করেন, তাঁহাদের সকলের উপর কড়াকড়ি রকমে এবং আরও অধিক তদারক করার যে ব্যবস্থা হইয়াছে,—এমন কি লয়েডের কারবারও যে বাদ পড়ে নাই,—ইহাতে আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। সকল কোম্পানীই রেজেষ্টারী করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, ইহা নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ যুক্ত লাইসেন্সের মত হওয়া উচিত। যদি কোন কোম্পানী অন্যায় আচরণ করে, তবে তাহাকে মেয়াদ অন্তে আর নূতন লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। এইরূপ নিয়ম থাকিলে ভাল হয়। প্রস্তাবিত আইনে বিদেশী কোম্পানীকেও ডিপজিট্ দিতে বাধ্য করা হইয়াছে এবং ডিপজিটের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হইয়াছে, ইহা বেশ ভাল কথা। কোম্পানীর প্রকৃত আর্থিক অবস্থা এবং পরিচালনা পদ্ধতি জানাইবার নিমিত্ত যে সকল বিষয় বিস্তারিত প্রকাশ করা আবশ্যক,—তাহা যাহাতে স্পষ্টভাবে ও নিয়মিত রূপে বাহির হয়, আইনে সেই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হিসাব পত্র পরিদর্শনকারী কর্ম্মচারীদিগকে অতিরিক্ত এবং বিশেষ ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই সকল ব্যবস্থার পক্ষপাতী। বিদেশী কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার উপরে আমরা প্রস্তাব করি, তাহাদিগকে ভারতীয় কারবার সম্বন্ধে পৃথক ব্যালেন্স্ সিট্ ও ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট দিতে বাধ্য করা হউক এবং তাহাদের ভারতীয় কারবারের অতিরিক্ত বোনাস দিতে যেন তাহারা অনুমতি না পায়। গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে শতকরা ৩৩⅓ টাকা লগ্নী করার ব্যবস্থা আমরা পছন্দ করিনা। কারণ, এই সকল সিকিউরিটির মূল্য এত চড়্‌তি পড়্‌তি হয় যে, কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার বিশেষ ক্ষতি করে। আমরা প্রস্তাব করি, ট্রাষ্টী সিকিউরিটীতে শতকরা ৫০ টাকা লগ্নী করিবার নিয়মই যথেষ্ট। বিদেশী কোম্পানীদের সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম করা উচিত যে, তাহাদিগকে ভারতবর্ষে উপযুক্ত ও প্রচুর সম্পত্তি রাখিতে হইবে,—এবং যখন তখন ইচ্ছামত তাহা তুলিয়া লইবার ক্ষমতা থাকিবে না, কারণ, তাহা পলিসি হোল্ডারগণের উপকারার্থে ট্রাষ্ট সম্পত্তি স্বরূপ গণ্য হইবে।

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ৪টী বিষয়ে প্রস্তাবিত আইনের সহিত আমাদের মত ভেদ আছে,—

১। দেশীয় কোম্পানী সমূহকে রক্ষণ-সুযোগ প্রদান।

২। তিন বৎসরের মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্সী তুলিয়া দেওয়া।

৩। কমিশন দেওয়া নিয়ন্ত্রণ

৪। জীবন বীমার কারবারে ভ্যালুয়েশনের "মাপ কাঠি" নির্দ্ধারণ।

প্রথমতঃ দেশীয় কোম্পানী সমূহকে রক্ষণ সুযোগ প্রদানের প্রসঙ্গে কথা উঠে, বাস্তবিক বিদেশীয় কোম্পানী অন্যায় প্রতিযোগিতার দ্বারা কারবার নষ্ট করিতেছে কিনা। মাননীয় আইন সদস্য এ সম্বন্ধে মিঃ সেনের রিপোর্ট এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণের সাক্ষ্যই গ্রাহ্য করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন যে, বিদেশী কোম্পানী বীমার

কারবারকে খেলো এবং সস্তা করিয়া দিতেছে না। আমাদের মতে আইন সদস্য মহোদয়ের এবম্প্রকার ধারণা ভুল। সেইজন্য দেশীয় কোম্পানীকে বাঁচাইবার জন্য আমরা নিম্নলিখিত প্রস্তাব করি,—

১। আগামী ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন নূতন বিদেশী কোম্পানীকে ভারতে বীমার কারবার করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে না।

২। গভর্ণমেণ্টের হাতে যে সকল বীমা আছে সেগুলি দেশীয় কোম্পানীতেই করিতে হইবে।

৩। মিউনিসিপ্যালিটী, লোক্যাল বোর্ড, পোর্ট ট্রাষ্ট, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, প্রভৃতি আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ তাহাদের সর্ব্ববিধ সম্পত্তি দেশীয় কোম্পানীতে বীমা করিবেন।

৪। যে সকল শিল্প গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দান অথবা শুল্ক বাবদে রক্ষণ-সুযোগ পাইয়াছেন, তাহাদিগকে দেশীয় কোম্পানীতে বীমা করিতে হইবে।

৫। সমস্ত বিদেশী কোম্পানীকে ভারতীয় কোম্পানীর সহিত পুনর্ব্বীমার কারবার করিতে বাধ্য করিতে হইবে।

৬। বিদেশী কোম্পানীর পলিসিতে অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

ম্যানেজিং এজেন্সী সম্বন্ধে পরামর্শ সমিতিতে (Advisory Committee) কোন আলোচনা হয় নাই এবং এ বিষয়ে কেহ কোন সুপারিশও করেন নাই। যদিও আমি স্বয়ং কোন ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্মের মালিক, তথাপি আমি ব্যক্তিগত ভাবে ম্যানেজিং এজেন্সীর পক্ষপাতি নহি। কিন্তু আমি বলি, যদি ম্যানেজিং এজেন্সীর কোন দোষই থাকে, তবে তাহা সংশোধন করিয়া লইলেই হয়।

বীমা সংগ্রহ করিবার জন্য কোম্পানী তাহার এজেণ্টগণকে যে কমিশন দিয়া থাকেন, তাহা একটা "ধরা বাধা" সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া অনেকেই পছন্দ করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কি তাহা সম্ভব? কোন কোম্পানী যদি অধিক বীমা সংগ্রহ করিবার জন্য এজেণ্টগণকে অন্য ভাবে টাকা দেন তবে তাঁহাকে আটকাইবে কিসে? আমি ইহা বুঝিতে পারি না। আমার মতে ভ্যালুয়েশনের একটা মাপ-কাঠি ঠিক করিয়া দিয়া কোম্পানীকে অন্যান্য খরচা বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।

পরলোকে ডাঃ এস সি রায়

ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায় গত ১৯শে এপ্রিল সোমবার প্রাতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়ক্রম ৫০ বৎসর হইয়াছিল। ডাঃ রায় দুইটি পুত্র ও ৫টি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন; কিছুদিন হইতে তাঁহার শরীর অসুস্থ যাইতেছিল। ভারত ইন্সিওরেন্সের কাজ লইবার পর তাঁহাকে দিনরাত খুব কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়; তাহা ছাড়াও তাঁহার নিজের অন্যান্য আরও অনেক কাজ ছিল যে জন্য তাঁহাকে শারীরিক এবং মানসিক কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত।

গত ১০ই এপ্রিল শনিবার আমাদিগের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি দার্জ্জিলিঙ্গ চলিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন এবং বুধবারে বন্ধুবান্ধবদিগকে ডায়মণ্ডহারবারে এক বন ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় বরিশাল সেবাসমিতির সভায় তিনি সভাপতির কার্য্য করেন এবং বক্তৃতা দিবার সময় সর্ব্বপ্রথম

জিহ্বায় আড়ষ্টতা অনুভব করেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও নাকি একবার এইরূপ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আর বাড়ে নাই। এবার রবিবার প্রাতেই তিনি সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়েন এবং দক্ষিণ পার্শ্ব অসাড় হইয়া যায়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেন দেখিয়া পীড়া খুব গুরুতর বলিয়া যান। ইহার কয়েক দিন পরে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় দিল্লী হইতে ফিরিয়া

পরলোকগত ডাঃ এস্ সি রায়

আসিয়াই তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। কয়েক দিন অবস্থার একটু উন্নতি দেখা গেলেও ১৮ই প্রাতে রবিবার হইতে তাঁহার অবস্থা আবার খারাপের দিকে যায়। অতঃপর ডাক্তার নীলরতন সরকারকে আনা হয়; তিনি দেখিয়াই বলেন যে, আর কোনও

আশা নাই। সোমবার প্রাতে ৫টার পর ডাক্তার রায় সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রস্থান করেন।

অন্ত্যেষ্টীক্রিয়া

সোমবার অপরাহ্ণে কেওড়াতলা ঘাটে ডাঃ রায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি দাহস্থলে সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত এস্, এন্, বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুত আই, বি, সেন, শ্রীযুত এস্, সি, রায়, শ্রীযুত এস, এল, রায়, শ্রীযুত শচীন্দ্র বাগচী, শ্রীযুত এস, দত্ত, শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অধ্যাপক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক শ্রীযুত এস, কে, রায়, অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ সুবোধ মিত্র, ক্যাপটেন এস, সি, সেন গুপ্ত, শ্রীযুত এ, কে, সেন, শ্রীযুত ডি, খৈতান, শ্রীযুত এস, কে, চৌধুরী, শ্রীযুত এস. এন, রায়, শ্রীযুত কে, এন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত নির্ম্মলকান্তি বসু প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডাঃ রায়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সোমবারে বহু বীমা প্রতিষ্ঠানের কার্য্য বন্ধ ছিল।

সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

বরিশাল জিলার কুলকাটী গ্রামে ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায়ের জন্ম হয়। অল্প বয়সেই তিনি পিতৃ-মাতৃহীন হন। তাহার পিতৃব্য শ্রীযুত চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী তাহাকে প্রতিপালন করেন। বিগত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সুরেশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আর,, জি, করের মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হন। বিগত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি ডাক্তারীর ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দিল্লী, মীরাট, গাজিয়াবাদ প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়াছিলেন। পশ্চিমে থাকিতে ডাক্তার রায় মাছের ব্যবসাতেও লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাতে প্রথম প্রথম প্রচুর লাভ হইলেও অসাবধানতা বশতঃ একটা চুক্তি করায় তাহাতে যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। অতঃপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া বীমার ব্যবসায়ে হস্তার্পণ করেন।

সর্ব্বপ্রথম তিনি কলিকাতার জেনিথ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডে কর্ম্ম আরম্ভ করেন। তাহার পর নিউইণ্ডিয়া কলিকাতায় তাহাদিগের জীবনবীমা বিভাগ খুলিলে ডাঃ রায়কেই তাহারা এই বিভাগের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। নিউ ইণ্ডিয়ার পশ্চাতে বোম্বাইয়ের ধনকুবের ব্যবসায়ীরা থাকায় ডাক্তার রায়ের কাজ করিবার নানারূপ সুবিধা ঘটে এবং প্রথম বৎসরেই তিনি এতাধিক কাজ সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে কোম্পানী প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসরেই এতাধিক কাজ ভারতের কোনও বীমা কোম্পানী সে সময় করিতে সমর্থ হয় নাই। অতঃপর তিনি ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা কর্ম্মকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর হন। ডাঃ রায় বিভিন্ন রাজনীতিক ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি 'ইনসিওরেন্স ও ফাইন্যান্স রিভিউ' পত্রের অন্যতম সম্পাদক এবং বীমা শিক্ষা সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের যুক্তপ্রাদেশিক মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনও তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় সংবাদিক সঙ্ঘের সহকারী সভাপতি এবং

কলিকাতায় ভারতীয় বণিক সমিতির কার্য্য পরিচালনী সভার সভ্য ছিলেন।

ডাক্তার রায়ের এই অকাল মৃত্যুতে শুধু যে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হইল তাহা নহে, পরন্তু তিনি অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন সে গুলিও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

নিউ ইণ্ডিয়ায় থাকিতে তিনি ক্লাইভ "স্ট্রীট" নামক ব্যবসা সংক্রান্ত একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। এই কাগজ বাহির করিবার পূর্ব্বে তিনি আমাদিগের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ সরলতার সহিত একদিন আমাকে বলিলেন

"আমি আপনার ব্যবসা ও বাণিজ্যের অনুরূপ একখানি মাসিক পত্র বাহির করিতে চাই। কাগজখানি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও আপনার মতামত এবং নানা বিষয়ে পরামর্শ চাই। তাহা ছাড়া লাভালাভ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতার বিষয়ও কিছু শুনিতে চাই।"

আমি তাঁহাকে বলিলাম,—

"আপনার কাগজকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করিয়া ভুল করিয়াছেন। উহা প্রকৃত পক্ষে আমার সহযোগী এবং সহকর্ম্মীই হইবে। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি যখন ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রথম প্রকাশ করি তখন বাংলাদেশে এবিষয়ে আর কোন কাগজ ছিল না। তখন দেশের ইতর ভদ্র সকলেই বলিয়াছিলেন যে, এদেশে একপ কাগজ কেহ পড়িবে না। কারণ, যেদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্যের কোনো চর্চ্চা নাই এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা লাভ করে নাই, সে দেশে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কাগজ কে পড়িবে? আমি এই সকল বাধা নিষেধ ও সতর্ক বাণী শুনিয়াও ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই কাগজ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং প্রায় দশ বৎসর কাল ক্রমাগত বহু টাকা লোকসান দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমার এই বিশ্বাস ছিল যে বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। দশ বৎসর ধরিয়া আমার কাগজকে ইহারা উপেক্ষা করিলেও এমন দিন অচিরে আসিতেছে, যখন এই শ্রেণীর কাগজকেই শিক্ষিত বাঙ্গালীরা রক্ষা কবচ রূপে ঘরে ঘরে আদর করিয়া স্থান দিবে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে একখানি দুইখানি এই জাতীয় কাগজ কয় জনের গৃহে আর প্রবেশ করিতে পারে? এই দেশকে ব্যবসাগত প্রাণ বা Business minded করিয়া তুলিতে হইলে এইরূপ একশত খানা কাগজেও তাহার অভাব মিটাইতে পারে না। সুতরাং আপনার প্রস্তাবিত কাগজকে আমি সহযোগী এবং সহকর্ম্মী রূপে গ্রহণ করিয়া আমার উদ্দেশ্য লাভের মহা সহায়ক বলিয়া মনে করিব। বাংলাদেশকে যদি একবার সকলে মিলিয়া ব্যবসায় গ্রস্ত করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে এই জাতীয় বহু কাগজের স্থান করিতে পারিব।

আমার বন্ধু অধ্যাপক বিনয় সরকার আপনার পূর্ব্বেই "আর্থিক উন্নতি" বাহির করিয়া বাংলা দেশের নিকট ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত নানারূপ সংবাদ ও প্রবন্ধাদি পরিবেশন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক সরকারের পশ্চাতে

লাহা পরিবারের ধনকুবের বহু বিদ্বজ্জন পরিপালক ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে "আর্থিক উন্নতি" বাহির করিতে আর্থিক দুশ্চিন্তায় পড়িতে হয় নাই। অধ্যাপক সরকার একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "ডাঃ নরেন্দ্র লাহা না থাকিলে দীর্ঘকাল ইউরোপে বাস করিয়া পাশ্চাত্য দেশের ধন দৌলত এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা দেশের লোককে শুনাইতে না পারিয়া পেট ফুলিয়াই মারা যাইতাম এবং কাজ কর্ম্মের অভাবে না খাইয়া মারা পড়িতাম।

অতঃপর আমি ডাঃ রায়কে একটি সাবধান বাণীও শুনাইয়া ছিলাম। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, New Indiaর কাজ এত বিশাল, এবং তাহার জন্য আপনাকে যেরূপ ব্যস্ত ও ব্যাপৃত থাকিতে হয় তাহাতে ব্যবসা সম্বন্ধে এইরূপ একটি পত্রিকা চালাইবার সময় এবং সুবিধা আপনার থাকিবে কিনা, সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। আমার কাগজের পশ্চাতে, আমি একাগ্র মনে দিন রাত লাগিয়া থাকিয়াও সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল লোকসান দিয়া আসিয়াছি। আজ অনেকে আমার কাগজের সাফল্য দেখিয়া হয়ত মনে করেন যে, কিছু টাকা হাতে করিয়া কাজে নামিলেই হইবে। এবং "সুধীর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে।" যাহারা এরূপ মনে করিবেন তাঁহারা বিষম ভুল করিবেন। ইহার পশ্চাতে প্রাণপণ পরিশ্রম, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সাধনা থাকা চাই, নচেৎ এই কার্য্যে সাফল্য লাভ দুরাশা।

তাহার পর ডাক্তার রায় "ক্লাইভ ষ্ট্রীট" পত্রিকা বাহির করিয়া কৃতিত্বের সহিত তাহা চালাইয়াছিলেন। কিন্তু ন্যূনাধিক দুই বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পত্রিকা তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। এবার ভারত Insuranceএ যোগদান করার পরে, তিনি আবার "ক্লাইভ ষ্ট্রীট" বাহির করিয়াছিলেন। এবার উহা মাসিকের পরিবর্ত্তে সাপ্তাহিক রূপে বাহির হয়, এবং কয়েক সপ্তাহ বাহির করিবার পরেই Dr. Roy কালগ্রাসে পতিত হন। এই Clive St. ছাড়াও তিনি Insurance & Finance Review নামক ইংরাজিতে একখানি বীমা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা বাহির করিতেন এবং Insurance & Finance Directory নামক ইংরাজীতে একখানি বীমা বার্ষিকী বাহির করিতেন। ইহা ছাড়া তিনি কয়েকখানি পুস্তকও লিখিয়া গিয়াছেন। Dr. Roy সকল বিষয়েই একজন Prolific writer ছিলেন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, তিনি বিলাতে গিয়া Industrial & Group Insurance এবং Building Societies সম্বন্ধে Europe এর নানা দেশে যে সকল প্রথা এবং পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সে বিষয়ে নানারূপ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া আসিয়া ছিলেন এবং সেই সকল তথ্য তাঁহার প্রচারিত পত্রিকাদিতে প্রকাশ করিতেছিলেন।

কলিকাতার কয়েকজন বিখ্যাত ধনীর সহায়তায় তিনি, একটি বিল্ডিং সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজনও করিতেছিলেন। এবং সেই সম্বন্ধে আমার সহিত নানারূপ পরামর্শ করিতেন। কিন্তু আচম্বিতে তাঁহার সকল আশা আকাঙ্ক্ষার অবসান হইয়া গেল।

ডাক্তার রায়ের চরিত্রের মধ্যে যে কয়েকটী বিশেষ গুণ আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা এখানে না উল্লেখ করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহার সহিত যতদিন হইতে পরিচয় হইয়াছে—এবং তাহা নিতান্ত কম দিন নহে—আমি কখনও তাঁহাকে রাগিতে দেখি নাই, এবং কখনও কাহারও প্রতি রূঢ় ও কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিতে দেখি নাই। তিনি সর্ব্বদাই হাসিমুখে থাকিতেন এবং কাহারও উপর বিরক্ত হইলে রাগারাগি কিম্বা গালিগালাজ না করিয়া সহজ ভাবেই দৃঢ়তার সহিত তাহা বলিয়া দিতেন। বীমা মহলে, অসাধারণ কাজ সংগ্রহ করিয়া তিনি যে সকলকে তাক্ লাগাইয়া দিতেন, তাহার মূল সূত্র ছিল, তাঁহার সুমিষ্ট ও অমায়িক ব্যবহারের মধ্যে, যাহার জন্য আকৃষ্ট হইয়া ভাল ভাল বীমা কর্ম্মিগণ নানা স্থান হইতে তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিতেন।

তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল সুদূর প্রসারিত, ভাবময়, এবং প্রাণময়। ইংরাজীতে যাহাকে বলে a man of idea and imagination, তাঁহার conception এমন বড় ছিল, যে, যে কাজেই তিনি হাত দিতেন, তাহা কখনও ছোট করিয়া দেখিতে বা ভাবিতে পারিতেন না—এবং সেইজন্য তাঁহার সাহসও ছিল অসাধারণ। গুজরাটীরা যাহাকে বলে—"ভরসা" এবং ইংরাজীতে যাহাকে বলে, a man of courage and determination.

তাঁহার কর্ম্ম করিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। সমস্ত দিন এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় তিনি একই ভাবে কোনরূপ ক্লান্তি অনুভব না করিয়া একটানা কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন।

এইরূপ অমানুষিক পরিশ্রমের ফলেই তাঁহাকে অকালে ইহ সংসার হইতে চলিয়া যাইতে হইল সন্দেহ নাই। মানসিক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ব্যায়ামের কোন ব্যবস্থা না থাকাই আমাদের দেশের বহু কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তির অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। ইংরাজেরা যে যত বড়ই, কিম্বা যে যত ছোটই কাজ করুক না কেন, সকলেই প্রতিদিন নিয়ম মত, কিছু না, কিছু ব্যায়াম করেই। হকি, টেনিস, গল্ফ, অশ্বারোহন, দ্রুত ভ্রমণ, নৌকা চালানো, indoor games ইত্যাদি কোন না কোন শারীরিক ব্যায়ামে ইংরাজ মাত্রকেই প্রতিদিন নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। আর আমাদের দেশের ধনীরা, বাড়ী করা, কিম্বা বাড়ী কেনার সময়ে Tenis court এর ব্যবস্থা রাখিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু এই সারা কলিকাতা সহরে এই সকল বাবুদের Tenis court এ কখনও কাহাকেও tenis খেলিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তাঁহাদের Tenis court এ বাড়ীর গরু বাধা থাকে দেখিয়াছি।

Dr. Roy এর অকাল মৃত্যুর আর একটী কারণ আমার এই বলিয়া মনে হয়—যে তিনি, একই সময়ে বহু ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন, ইংরাজীতে যাহাকে বলে too many irons on fire।

এইরূপ নানা কাজে, একই সময়ে হাত দেওয়ায় তাঁহাকে নানারূপ আর্থিক দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকিতে হইত। এই constant worry & anxiety Dr. Roy র দেহকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছিল। এ বিষয়ে আমি অনেকবার তাঁহাকে সাবধান

সঞ্চয় হীনের দশা

বয়স কালে হরেন বাবুর অর্থ সম্পদ, মান সম্ভ্রম, বন্ধুবান্ধব, সভাসদ, চাটুকার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার কথায় লোকে উঠিত বসিত। তিনি বলিলে লোকের চাকরি জুটিয়া যাইত। তিনি অসন্তুষ্ট হইলে কাহারও রক্ষা থাকিত না। ভোগে, বিলাসে, অভিনব খেয়ালে হরেন বাবুকে প্রাচীন বাদশাহী আদর্শের এক আধুনিক উদাহরণ বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। শুনা যায়, তিনি ছুটির সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইলে বাংলা দেশের মাটী ও জল হাওয়া ব্যতীত আর সকল উপকরণই সঙ্গে লইয়া চলিতেন। সুদূর পশ্চিমে, বাংলার একান্ত নিজের তরি তরকারী ও মৎস্য, অথবা যথাযথ ও নির্দ্দিষ্ট জাতীয় চাল, ডাল, তৈল, ঘৃত, চাকর, ঝি, বাসন, আসবাব, সটকা, তামাক কিম্বা কোন কিছুর অভাব হইলে হরেন বাবু তাহা বরদাস্ত করিতেন না। কন্যার বিবাহ কিম্বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে হরেন বাবুর ফিরিস্তি জার্ম্মান সমরের হতাহতের তালিকার মতই সুদীর্ঘ ও সর্ব্বগ্রাসী হইত। সে আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কিন্তু এখনও সে কথা লোকে কিম্বদন্তীর মতই আওড়াইতে থাকে।

কিন্তু, এ হেন হরেন বাবু আজ চাকরী অবসানে হৃত-সম্পদ এবং হৃত যৌবন অবস্থায় ছোট আদালতের উকিল মহলের "টাউট"। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন বাদী ফরিয়াদীদের উপযুক্ত উকিল সরবরাহ করিয়া দিনান্তে দুই এক টাকা সংগ্রহ করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া যান। ছোট টিনের চালায় স্বপাকে আহার ও ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করেন। কেন? কারণ, কিছুই নহে—শুধু অর্থাভাব। যৌবনে অগাধ অর্থ সম্পদ অপব্যবহার করিয়া হরেন বাবু আজ নিঃসম্বল। কিছু টাকা যাহা ছিল ভাটার মুখে রাতারাতি বড়লোক হইতে গিয়া তথাকথিত ব্যবসায়ে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহার দৌলতে কত লোকের একদিন সুসময় গিয়াছে, আজ তাহারই অভাবের দিনে কাহাকেও কোথাও দেখা যায় না।

গল্পটী কিছু অভিনব নহে। সময়ে বার্দ্ধক্যের পুঁজি ঠিক করিয়া না রাখিলে অনেকেরই এই দশা হয়। শুধু মানুষ কেন, জীবজগতে সঞ্চয়ের মূল্য সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য। উদাহরণ, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি। সময় থাকিতে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখা প্রয়োজন।

জীবন-বীমারও সার্থকতা এই কারণেই। যৌবনে, রোজগারের সময়ে, বিন্দু বিন্দু করিয়া যে অর্থ বীমায় রক্ষিত হয়, অভাবের সময়ে নিজের বা নিজের অবর্ত্তমানে, পরিবারবর্গের নিকট তাহাই প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, শীতল, সরোবরের রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হয়। বীমায় রক্ষিত অর্থ, সকল ভুল, ভ্রান্তি, মোহ, ও অপচয় আশঙ্কার উপরে। জীবিত থাকিলে বীমা বার্দ্ধক্যের সম্বল, মৃত্যু ঘটিলে পরিবারের আশ্রয়। ইহা ব্যতীত পুত্রের শিক্ষা কিম্বা কন্যার বিবাহের জন্যও বিশেষ বীমা করা যায়।

এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত উপদেশ পাইতে হইলে **ভারত ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ**, ভারত ভবন, কলিকাতা, ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। "ভারত" অদ্যাবধি তাহার বীমাকারীদিগকে এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়াছে। চল্লিশ বৎসরের পুরাতন আফিশ। বর্ত্তমানে মোট তহবিল দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। বীমার সর্ত্ত প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা ও লাভজনক। বীমাকারীদের পাওনা শোধ অতিসত্বর ও নির্ঝঞ্ঝাটে করা হয়। বাংলার সর্ব্বত্র এজেণ্ট আছে।

করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বলিতেন "বহু লোক আমার প্রতি নির্ভর করিয়া আছে, যদি আমি তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করিয়া এক একটা কাজে লাগাইয়া দিতে পারি, তবে তাহারাও হয়ত দাঁড়াইয়া যাইবে, এবং আমার টাকাটাও ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু এসব ব্যাপারে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছিল—অর্থাৎ তাহারাও দাঁড়াইতে পারিত না, এবং Dr. Roy এর টাকাও ফিরিয়া আসিত না। লাভের মধ্যে যতদিন এই সকল অনুষ্ঠান চলিত, তাহার রসদ যোগাইবার জন্য Dr. Roy এর ভাবনার অন্ত থাকিত না।

Dr. Roy এর আর একটি চিত্তাকর্ষক বিশেষত্ব ছিল তাঁহার সামাজিক দিক। তিনি নিজে যেমন খাইতে ভালবাসিতেন, তেমনি বন্ধু বান্ধব দিগকেও কোন না কোন বিষয় উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া আদর আপ্যায়নে এবং ভূরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত করিতেন।

ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের সভ্যরূপে তিনি যেভাবে আমাদিগকে সদা সর্ব্বদা সাহায্য করিয়াছেন তাহার তুলনা দেখা যায় না। সঙ্ঘের তরফ হইতে প্রায়ই যে সকল party দেওয়া হয়, তাহার বহু ব্যয় সাপেক্ষ পার্টিগুলির সমুদয় খরচ Dr. Roy কে বলিবা মাত্র আনন্দের সহিত তিনি তাহা বহন করিতেন। পরলোকগত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয়ের একটি তৈল চিত্র প্রস্তুত করিয়া সাংবাদিক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে Albert Hall এ রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং তাহার খরচ প্রায় ১৫০ টাকা হইবে স্থির হয়; এই টাকা উঠিতেছেনা দেখিয়া Dr. Roy উহার সমুদয় খরচ বহন করিয়াছিলেন। Dr. Roy এর অকাল মৃত্যুতে ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘ যে কিরূপ বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

নিষ্ঠা, সাধনা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা এবং সর্ব্বোপরি মানুষ হইবার জন্য দুর্জ্জয় সঙ্কল্প থাকিলে লোকে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কিরূপে উন্নতির শিখরে আরোহন করিতে পারে, Dr. Roy এর জীবন তাহার পরিচয় স্থল। তাঁহার university র কোনও চাপরাশ ছিল না বলিলেই হয়। অথচ নিজের মেধা এবং চেষ্টার ফলে বহু শিক্ষিত লোকের উপর টেক্কা দিয়া গিয়াছেন। একজন অল্প শিক্ষিত, অজানা বাঙ্গালী যুবক কেমন করিয়া সহায় সম্বলহীন হইয়াও, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইয়া আপনার কর্ম্মক্ষেত্র চেনা করিয়া লইয়াছিলেন এবং সেখানে নানারূপ জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা বাংলার যুবকদিগের পক্ষে অনুকরণীয় সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগের এই কঠোর জীবন সংগ্রামে বাঙ্গালী যুবকেরা যেরূপ হটিয়া যাইতেছে এবং সকল বিষয়েই Back Benchers হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে "কুল কাঠির" সহায় সম্বলহীন, উচ্চ শিক্ষা বিহীন, এই বাঙ্গালী যুবকের সংগ্রাম বহুল এবং সাফল্যময় জীবন ইতিহাস অতি সংক্ষেপে ব্যবসা ও বাণিজ্যের পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিয়া বন্ধুর প্রতি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।

বাংলার বস্ত্র শিল্পে শ্রমিক আন্দোলনের হলাহল।

বাংলাদেশে বৃহদাকারের শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার পথে যে সকল প্রবল বাধা বিঘ্ন রহিয়াছে, তাহাদের শক্তি বাড়াইবার জন্য সম্পূর্ণ বিদেশীর অনুকরণে এবং পুরা দস্তুর বিদেশীয় ভাবে। সম্প্রতি দেশের মধ্যে একটা নূতন আন্দোলন জাগিয়া উঠিতেছে।

অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক হইল ভারতে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন হইয়াছে। বাংলা দেশেই এই জাতীয় জীবনের প্রথম সাড়া পড়ে। ৩২ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই বাংলা দেশ নূতন জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় কর্ম্মক্ষেত্রে জাগ্রত হইয়া উঠে। আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলিতেছি না। কৃষি শিল্প ব্যবসা ও বাণিজ্যে আমাদের বাংলাদেশ এই ৩২ বৎসরে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বলিতে কল কারখানা, ব্যাঙ্ক, বীমার কারবার এই সব বুঝায়। ইহাদের মূল হইল টাকা,—প্রচুর টাকা। দুই এক বা দুই একশত টাকা নহে,—জনসাধারণের সমবেত লক্ষ লক্ষ টাকার বিপুল সম্পদ চাই। তাহা না হইলে কোন বৃহৎ কারবার স্থাপিত হইতে পারে না,—দাঁড়াইতে পারে না, এবং চলিতেও পারে না। ব্যক্তিগত মূলধনে যে ব্যবসা গড়িয়া উঠে, তাহা জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে জাতীয় শক্তির সম্পূর্ণ পরিস্ফুরণ হয় না। দেশের জনসাধারণের সমবেত মূলধনে যে ব্যবসায়ের ভিত্তি তাহারই মধ্যে জাতীয় শক্তির বিচিত্র খেলা দেখা যায়।

বাংলার নিভৃত পল্লীর কোন্ বনের ধার দিয়া আদি-অন্তহীন ঐ সুদীর্ঘ রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে;—তার পাশে বসিয়া একটী কুলী ঠুক্ ঠুক্ করিয়া পাথর ভাঙ্গিতেছে। সারা দিনের কাজের পর সে নিকটবর্ত্তী ঘাঁটী হইতে তার প্রাপ্য মজুরী লইয়া ঘরে গেল। ইংলণ্ডের যে জনসাধারণ এই রেল কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়াছে, তাহারা ঐ সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী সাগর নদীর পরপার হইতে যে প্রবল শক্তিতে এই ক্ষুদ্র শ্রমটুকুকেও পরিচালিত করিতেছে,—তাহাই বৃটীশ জাতীয়তা। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী এই জাতীয়তার মর্ম্ম বুঝে না,—জাতীয়তার দরদ করে না।

পরস্পরের উপর বিশ্বাস জাতীয়তার মেরুদণ্ড এবং সমবেত মূলধনের মধ্যেই এই বিশ্বাসের উদ্ভব হয়। সেইজন্য ইংলণ্ডে কোন যৌথ কারবার গড়িয়া উঠিবার বিজ্ঞাপন বাহির হইতে না হইতে তাহার শেয়ার বিক্রয় হইয়া যায়। অতদূরে যাইতে হইবে না। আমাদের বাংলাদেশেই সম্প্রতি দেখা গিয়াছে, যখন চিনির

কল স্থাপন করিবার মরশুম লাগিল, তখন ২৫ লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধনের (Paid-up-Capital) কারবারও দুই সপ্তাহের মধ্যে খোলা হইয়া সমুদয় টাকা সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার একটিও ত বাঙ্গালীর কারবার নয়।

বাঙ্গালীর যে কয়টা চিনির কল পত্তন হইয়াছে, সে সবগুলিই মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত শিশুর মত রোগা পট্‌কা শরীর লইয়া এখনও হামাগুড়ি দিতেছে,—কবে যে দাঁড়াইতে পারিবে তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু পশ্চিমা ব্যবসায়ীদের যে কয়েকটী চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—সবগুলির শেয়ারই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এবং ঐ সকল কারখানা এখন পুরাদমে চলিতেছে। বাঙ্গালীর কারবারের শেয়ার বাজারে বিক্রয় হয় না। চিরদিন এই দুর্ণাম আছে,—পাথরে বরঞ্চ ফুল ফোটান যায়, তথাপি বাঙ্গালী কোম্পানীর শেয়ার বিক্রী করা যায় না। ইহার কারণ কি ?

বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে বিশ্বাস করে না। বাঙ্গালী কোন কারবার গড়িয়া তুলিতে পারে না,—কোন কারবার চালাইতে পারে না এই কলঙ্ক চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। লাহোরের পিপল্‌স ব্যাঙ্ক ফেল পড়িল,—লালা হরকিষণ লালের পতন হইল, কিন্তু তাহাতে পাঞ্জাবীর দুর্নাম ত চিরস্থায়ী হয় নাই। হরকিষণ লালের শবদেহ তাহারা বিরাট শোক যাত্রার সহিত শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল। ব্যবসায়ী বীরের প্রতি তাহারা উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়াছে। পাঞ্জাবীরা ত আত্ম-বিশ্বাস হারায় নাই। তাহাদের শিল্প ব্যবসায় ত ঠিক মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ত সে জন্য কোনও আঘাত পায় নাই! কোন পাঞ্জাবীও ত সেজন্য পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লয় নাই—বরং দেখি পাঞ্জাবী মাত্রই পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কেই টাকা রাখে এবং তাহাকেই সকল বিষয়ে মদ্দৎ দেয়। আমরা কলিকাতায় বসিয়াই তাহা বুঝিতে পারি,—দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর, রসা রোড যখন দেখি পাঞ্জাবীতে ভরপুর,—রাসবিহারী য়্যাভিনিউতে যখন চোখে পড়ে, গ্রন্থ-সাহেব শোভিত বিশাল শিখ মন্দির।

কিন্তু বাঙ্গালীর বেলায় কি দেখিতে পাই ? বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল পড়িল,—তার ফলে বাঙ্গালীর কলঙ্কের দাগ আরও পাকা হইয়া বসিল। বাঙ্গালীর মধ্যে সব-জান্তা লোকের অভাব নাই,— তাহারা বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল,—"আরে, সে আমরা আগেই জানি"। তারই ফলে বাংলাদেশে ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবার লোক ছিল না। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল যদিও বাঁচিয়া গিয়াছে,—বাংলাদেশের আরও দুই একটী ছোট ব্যাঙ্ক যদিও বড় হইয়া উঠিয়াছে,—যদিও বাংলার কোন কোন ব্যাঙ্ক দুইটি কটন মিলকে অর্থ সাহায্য (ফাইনান্স) করিতেছে,—যদিও বাঙ্গালীর চেষ্টায় আরও কয়েকটি কটন মিল, বীমা কোম্পানী, চট্‌কল, চিনির কল,—এসব গড়িয়া উঠিয়াছে,—তথাপি সীতা চরিত্রে লোকাপবাদের মত বাঙ্গালীর দুর্ণাম আর ঘুচিল না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ছিলেন,—সেই ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর জীবন, মৃৎ-প্রদীপের ক্ষীণ শিখার মত ফুৎকারে নিবিয়া গেল,—বাঙ্গালী তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই।

এত বড় আত্মঘাতী বিশ্বাসহারা বাঙ্গালী হইয়াছে;— এত শোচনীয় দাসমনোভাব (Inferiority Complex) বাঙ্গালীর চরিত্রে আসিয়াছে। সেইজন্য বড় কোম্পানী খুলিলে তার শেয়ার বিক্রয় করা কঠিন। স্যার বিনোদ মিত্রের পুত্রগণ উদ্যোগী না হইলে এবং ঐ মিত্র গোষ্ঠীর ধন সম্পত্তির অনেকাংশ নিয়োজিত না করিলে দশ টাকার বিশ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের দ্বারা বাসন্তী কটন মিল গড়িয়া উঠিত না। বঙ্গেশ্বরী কটন মিল এমন আর্থিক দুরবস্থায় পড়িয়াছিল যে, লাহা বংশের ধুরন্ধর কুমার নরেন্দ্র নাথ লাহা উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে ঐ কটন মিলটিকে বাঁচান দুঃসাধ্য হইত। আব্দুল মৌড়াব বাবুরা জিতেন রায়ের মত একজন সুদক্ষ কর্ম্মীকে সঙ্গে নিয়া যথাসর্ব্বস্ব দিয়া ঐ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলের পশ্চাতে লাগিয়া রহিয়াছেন বলিয়াই উহা সাফল্যের সহিত চলিতেছে।

কটন মিলের শেয়ার কিনিতে ত কোন ভয়ই নাই। বাঙ্গালী নিজের মিলের কাপড় পাইতে বোম্বাই আহমদাবাদের কাপড় সহজে কিনেনা, কারণ বাঙ্গলায় এখনও এতটুকু স্বদেশ প্রেম আছে। খাটী বাঙ্গালীর কাপড়ের উপর বাঙ্গালীর দরদ জন্মিয়াছে। সুতরাং কটন মিল চালু হইলে তাহার আর ফেল পড়িবার আশঙ্কা নাই। এত নিশ্চয়তার স্থলেও বাঙ্গালী তাহার নিজের দেশের কটন মিলের শেয়ার কিনিতে চাহেনা। মহালক্ষী, লক্ষীনারায়ণ, চিত্তরঞ্জন এই সকল কটন মিল অতি কষ্টে কাজ চালাইতেছেন,। প্রত্যেক বাঙ্গালী ১০ টাকার একখানি করিয়া শেয়ার কিনিলেও এই সকল কোম্পানী চক্ষের পলকে ফাঁপিয়া উঠিত, এবং বোম্বাই আহমদাবাদের যে কোন বড় মিলের সঙ্গে টক্কর দিয়া চলিতে পারিত। বঙ্গশ্রী কটনমিল আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের নাম করিয়া এত কাল বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে, কিন্তু তেমন সাড়া পায়না; শুক্‌না গাঙ্গে নৌকা ঠেলার মত উহার কাজ মন্থর গতিতে চলিতেছে, কর্ম্মীরাও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়িতেছেন।

একটা বৃহৎ কারবার গড়িয়া তুলিতে প্রথমতঃ শেয়ার বিক্রয়েই বাঙ্গালীর প্রবল বাধা। তারপর কাঁচা মাল সংগ্রহ। কটন মিলের তুলার জন্য বাঙ্গালীকে বোম্বাই আহমদাবাদের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। বাংলাদেশে তুলা উৎপন্ন হয় না, সে দিকে কাহারও চেষ্টাও নাই। কলিকাতায় তুলার বাজার চলে না। যে দেশের তুলার আঁশে ঢাকা সহরে মসলিন তৈয়ারী হইত—যে দেশের তুলার সুতায় ২৫ হাত লম্বা পাগ্‌ড়ী একটা আংটীর মধ্যে পুরিয়া রাখা যাইত,—সেই দেশের লোক আজ তুলার জন্য বোম্বাইয়ের বাজারে ঘুরিয়া মরিতেছে,—আত্মহত্যা আর কাহাকে বলে!—

যে সুতানুটী এবং গোবিন্দপুর নামক দুইটী গ্রাম লইয়া কলিকাতার পত্তন, সেই সুতানুটির প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়,—"গঙ্গার চড়ার উপর সপ্তাহে দুইবার করিয়া সুতারনুটি বা ফেটী বিক্রয় করিবার জন্য প্রকাণ্ড হাট বসিত। নানা দিগ-দেশ হইতে ব্যাপারীরা নৌকা বোঝাই করিয়া সুতারনুটী লইয়া আসিত এবং তাঁতীরা এই হাট হইতে সেই সকল নুটি কিনিয়া লইয়া যাইত। এই জন্যই এই স্থানের সুতানুটী নামকরণ হয়। আজ সে নামও গিয়াছে এবং সুতারনুটীর কারবারও গিয়াছে। আছে কেবল নির্ম্মম স্মৃতি এবং বক্ষপঞ্জরভেদী দারুণ

দীর্ঘশ্বাস। আজ সুতানুটী গোবিন্দপুর মুছিয়া গিয়া তাহার নূতন নামকরণ হইয়াছে,
"ক্যালকাটা"

আমরা আজ দুইবৎসর ধরিয়া তুলার চাষ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য কত প্রবন্ধই না লিখিতেছি, কিন্তু দেশের কৃষিকার্য্য যাহাদের হাতে, তাহারা নিরক্ষর এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী চাকুরীগত প্রাণ। এমন অবস্থায় তুলার চাষ কে করিবে? সুতরাং তুলার জন্য বাঙ্গালীকে বোম্বাই, আহ্মদাবাদ, নাগপুর, হিঙ্গনহাট, বেরার প্রভৃতি স্থানের বাজারের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাংলার মিল সমূহ হইতে এই সকল তুলার বাজার বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া রেল ভাড়ার জন্য বাংলার মিলগুলিকে অনেক টাকা দিতে হয়। রেলওয়ে বোর্ড মাশুল কমাইবার কোনও ব্যবস্থা না করায় বাংলার কয়লার খনি সমূহ যেমন ধ্বংসের পথে বসিয়াছে, তেমনি বাংলার কটন মিলগুলিও তুলা আনিবার ভাড়া সম্বন্ধে কোনও Concession না পাওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছে।

তারপর শ্রমিকের কথা। বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত কলকারখানার জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষিত শ্রমিকের সংখ্যা খুব কম। কারণ বাংলাদেশ কৃষি প্রধান। এখানে চাষের কার্য্যেই লোক নিযুক্ত থাকে বেশী; কারখানায় কাজ করিবার লোক কম পাওয়া যায়। অনেক চাষা অবসর সময়ে কারখানায় কাজ করে। ইহাতেই উহাদের যাহা কিছু শিক্ষা হয়। সুতরাং এইরূপ অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধ-শিক্ষিত (unskilled) কারুজীবিরা (operatives) যে সুতা অথবা বস্ত্র বয়ন করে তাহার মধ্যে wastage বা রদ্দি মালের পরিমাণ থাকে অসম্ভব রকমে বেশী। দেখা গিয়াছে বম্বে আমেদাবাদ অঞ্চলের মিলে যে পরিমাণ wastage বা রদ্দি মাল জমে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী মাল রদ্দি বা নষ্ট হয় বাংলার মিল সমূহে। কারণ এখানকার operatives অর্থাৎ কারিকর ও মজুর মিস্ত্রীরা উহাদের ন্যায় expert বা সুদক্ষ নহে। সেখানকার কারীগরেরা কার্য্য নিপুণ এবং পরিপক্ক বলিয়া কাজ যেমন বেশী করে তাঁহাদের কাজের মধ্যে wastage বা বাতিলের সংখ্যাও তেমনি থাকে খুব কম। Unskilled operatives বা আনাড়ী কারিকর নিযুক্ত করার ফলে দুইদিক দিয়াই বাংলার মিল সমূহ যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে আছে।

এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী তাহার মিলে যে জিনিস উৎপাদন করিল, তাহা বিদেশী মালের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না। রক্ষা—শুল্ক ব্যতীত (protection Tariff) বস্ত্র-শিল্পে ইংরাজ, জাপানী ও ইটালীয়ানদের সম্মুখীন হইবার শক্তি বাঙ্গালী কিম্বা বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের নাই। যদিও দেশভক্তির নেশায় মত্ত হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী বেশী দাম দিয়াও দেশী কাপড় কিনে, তথাপি, চাষী, মজুর এবং দরিদ্র গৃহস্থদের সম্মুখে যখন সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক বিচিত্র রকমারি জাপানী ও বিলাতী কাপড় সস্তা দামে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন দেশ-ভক্তির-নেশা ছুটিয়া যায়। দুটী পয়সার সাশ্রয় কিরূপে হয়, সকলে তখন তাহাই দেখে।

শেয়ার বিক্রয়, কাঁচামাল সংগ্রহ, শ্রমিক নিয়োগ এবং বিদেশীয় প্রতিযোগিতা, এতসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও গত ৩২ বৎসরে

বাংলাদেশে অনেক বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। তার মধ্যে কটন মিলের কথাই আমরা বিশেষরূপে বলিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী, ঢাকেশ্বরী, বাসন্তী, এই চারিটি কল পুরাদমে বাংলাদেশে চলিতেছে। বঙ্গেশ্বরী, লক্ষ্মীনারায়ণ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া মিলেও প্রচুর কাপড় তৈয়ারী হইতেছে, কিন্তু সকলের সুতা তৈয়ারীর বিভাগ, (স্পিনিং ডিপার্টমেণ্ট) এখনও সম্পূর্ণ গড়িয়া উঠে নাই। চিত্তরঞ্জন ও বঙ্গশ্রী এই দুইটী মিলের কলকব্জা বসিতেছে। সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশে কটনমিলের এখনও অতি শৈশবাবস্থা। পূর্ব্বে যে সকল বাধার কথা বলিয়াছি, সেই সকল প্রবল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যে বাংলার কটনমিল এতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং এখনো যে বাঁচিয়া আছে, তাহা বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্য। কিন্তু কতকগুলি মতলব-বাজ লোক আপনাদের পলিটিক্যাল মোড়লী এবং চালবাজী বজায় রাখিবার জন্য এই কটন মিলগুলিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের প্রধান কার্য্য শ্রমিক ধর্ম্ম ঘটের আন্দোলন চালানো। তাতে কটন মিল যায় যাক্,—সহস্র সহস্র লোকের টাকা—যাহার সমষ্টীর ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে সব কটন মিল গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ধ্বংস হয় হউক। আমার তাতে কি? আমিত তাতে একটা কানাকড়িও দিই নাই! এমনি করিয়া জমিদারে প্রজায় ধনী, এবং শ্রমিকের মধ্যে লড়াই লাগাইয়া দিতে পারিলেই আমার আনন্দ! ভারতে এই শ্রমিক আন্দোলন যে কতদূর আত্মঘাতী মূলক এবং সর্ব্বধ্বংশী আমরা এই প্রবন্ধে তাহাই দেখাইব।

(১) বাড়ীতে চাকর রাখিবার সময় আমি আমার আয় অনুসারে যথা সম্ভব অল্প বেতনে লোক খুঁজিয়া লই। ৬ টাকা বেতনে লোক পাইলে আমি আর ৭ টাকা দিতে যাইনা। যে আমার বাড়ীতে ৬ টাকা বেতনে কাজ করিতেছে, সে যদি ৭ টাকা বেতন চায়, আমি তাহাকে বলি,—

"আমার সংসারের সকল দিকের খরচ খরচা খতাইয়া দেখিয়াছি, আমি ৬ টাকার বেশী দিতে পারিনা; তোমার পোষায় থাক,—না পোষায়, চলিয়া যাও।"

সে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমি যে ৬ টাকা বেতনে আর একটা লোককে আনিয়াছি তাহাকে সে বাধা দিতে পারে না।

সে যদি অপর লোককে আমার বাড়ীতে ৬ টাকায় কাজ করিতে আসিলে বাধা দেয় এবং মারপিট করে, তবে সে স্থলে তাহাকে গুণ্ডা এবং অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিবার আমার অধিকার আছে। আমি ৬ টাকা বেতনে যে নূতন লোকটিকে আনিয়াছি, তাহার হয়ত ঐ ৬ টাকাতেই পোষাইয়া যায়। তুমি যে গুণ্ডামি করিতে আসিয়াছ, তোমার লাঠির আঘাতে একদিকে ঐ ক্ষুধার্ত্ত বেচারার ভাতের গরাস-তোলা হাত খানি ভাঙ্গিয়া যায়, আর এক দিকে আমার কাজেও বাগ্‌ড়া পড়ে। এরূপ করার তোমার কি অধিকার আছে? তুমি যেখানে ৭ টাকা পাও, খুঁজিয়া পাতিয়া সেখানে যাও। আমিত তোমাকে জোর করিয়া ৬ টাকায় আমার গোলামী করিতে বলিতেছিনা কিম্বা সে জন্য সে কালের জমিদারদের মত জোর জব্বরও করিতেছি না!

চাকর থাকা এবং চাকর রাখা এই দুইয়ের মধ্যে চাকর মনিবের যে সম্বন্ধ তাহা বর্ত্তমান ইংরাজ শাসনের গুণে absolute freedom of action,—free from any coercive force অর্থাৎ কোনরূপ ভয় ভীতিমূলক বাধা বাধকতা শূন্য, সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা ও মনোভাবের উপর নিভর করে।

আমি তোমাকে এত হিসাবে মজুরী অথবা মাহিনা দিব, ইহাতে তোমার পোষায়, থাক, আর না পোষায় তুমি যেতে পার, আমি অন্য লোকের ব্যবস্থা করিব। কিন্তু তুমি নিজেও কাজ করিবেনা অথচ অন্যে সেই বেতনে কিম্বা তাহার কম বেতনে কাজ করিতে আসিলে তাহাকে Biack begger বলিয়া মারিয়া তাড়াইবে এবং পথে ঘাটে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিয়া তাহাকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া তাহার মুখের রুটী কাড়িয়া লইবে এবং আমাকেও জব্দ করিবে. এটা কোন আইন, ন্যায় বা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার কি ?

যাহা ব্যক্তির পক্ষে সত্য এবং প্রযোজ্য, তাহা সমষ্টির পক্ষেও সত্য এবং প্রযোজ্য। তুমি আমি যে ব্যক্তিগত অধিকার এবং স্বাধীনতা ভোগ করিতে চাই এবং তাহার পথে যদি কেহ বাধা জন্মায় তবে তাহাকে যে কারণে আইনের কবলে ধরাইয়া দিতে চাই, সেই তুমি আমি যখন কোন বৃহদাকারের অনুষ্ঠানে হাত দিয়া বড় রকম আয়োজনে কিছু করিতে যাই, সেখানেও এই মূল নীতি ও সত্য মানিয়া চলিতে হইবে।

আমি যখন কল কারখানা খুলিয়া কয়েক হাজার মিস্ত্রী মজুর নিযুক্ত করিলাম,—তখন তাহাতেও ঐ চাকর মনিবের নিয়মই খাটিবে। এই মিল চালাইয়া আমাকে অংশীদারগণকে লাভের অংশ দিতে হইবে,—দুই তিন বৎসর অন্তর রদ্দি কল কব্জা সব হরদম বদলাইতে হইবে,—মিল মেশিনারী প্রভৃতি দিন রাত ২৪ ঘণ্টা চালাইবার ফলে তাহার যে ক্ষয় হইতেছে তদ্দরুণ Depreciation fund তৈয়ারী করিতে হইবে এবং বছর বছর তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা জমাইতে হইবে,—নচেৎ এই সকল মেসিনারী কয়েক বৎসর বাদে Scrap Iron এর দরে বেচিয়া ফেলিয়া যখন আবার নূতন মেশিনারী কিনিতে হইবে তখন টাকা কোথা হইতে আসিবে ?—ভবিষ্যৎ মন্দার বাজারে আত্মরক্ষা করিবার জন্য স্বতন্ত্র তহবিল গঠন করিতে হইবে এবং রিজার্ভ ফাণ্ডে বছর বছর টাকা রাখিতে হইবে,—বিক্রয়ের উপযুক্ত কমিশন দিয়া বিদেশীয়দের এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইবে,—এত সব হিসাব খতাইয়া আমি মজুরদের পারিশ্রমিকের দর বাঁধিয়া দিয়াছি,—ঠিক যেমন বীমা কোম্পানীর য়্যাক্‌চুয়ারী মৃত্যুজনিত দায়িত্ব, প্রাথমিক খরচা, এজেন্টদের কমিশন, পলিসির রকমারি সর্ত্ত প্রভৃতি নানা দিক দেখিয়া বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার কসিয়া দেন,—এও ঠিক সেই রকম। সুতরাং যখন কোন মজুর বেশী বেতন চায় তখন একজন মজুরের কথা ভাবিলেত চলিবেনা ! ঢাকেশ্বরী, মোহিনী প্রভৃতি প্রত্যেক মিলে ন্যূনাধিক ৪ হাজার করিয়া শ্রমজীবি কাজ করে। জনপ্রতি ৫৲ টাকা মাহিনা বাড়াইলে মাসে ২০ হাজার এবং বৎসরে দুইলাখ চল্লিশ হাজার টাকা এক মাহিনা বাবতেই খরচ বাড়িয়া যায়—অথচ মজুরদের

efficiency বা কর্ম্মপটুতা সম্বন্ধে এতটুকুও উন্নতি তাহারা দেখাইতে পারে নাই—তাহাদের অপটুতার জন্য মিলের wastave বা বাতিল মালের পরিমাণ এতটুকুও কমে নাই। কিন্তু তবু তাহাদের আবদার ও জুলুম এই যে যেহেতু তাহারা সংখ্যায় বেশী এবং দলবদ্ধ সুতরাং তাহারা যতই কেন inefficient বা অপটু ও অপদার্থ হউক না কেন তাহাদের মাহিনা মাথাপিছু এতটাকা করিয়া বাড়াইয়া দিতে হইবে,—মোট কাজের পরিমাণ আরও কমাইয়া দিতে হইবে,—বার্দ্ধক্যে পেন্সন দিতে হইবে—বছরে ২ মাস করিয়া পূরা বেতনে ছুটী দিতে হইবে—এসব দিতেই হইবে—তা' তোমার শক্তিতে কুলাক্ আর না কুলাক্।

এরূপ অবস্থায় কলের মালিক প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচ সংকুলান করিয়া যদি সেই বেশী বেতন দিতে অসমর্থ হন, তখন মজুর কাজ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু অন্য মজুরদেরে আটকাইয়া রাখিবার তার কি অধিকার আছে? নিজেরাও কাজ করিবেনা, অন্যকেও কাজ করিতে দিবে না, এইপ্রকার নীতি কোন্ আইনে সমর্থন করা যায়? শ্রমিক নেতারা যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে খুব লম্ফঝম্প করেন, সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্যাদা এখানে কোথায় থাকে?

(২) মজুরেরা যে এক স্বার্থে দলবদ্ধ হয়, বলিয়া ঘোষণা করা হয় ইহার মধ্যে একটা বিরাট মিথ্যা ও ধাপ্পাবাজী রহিয়াছে। তিন হাজার চারি হাজার মজুর, —ইহারা সকলে একধরণের লোক নহে। আচার-ব্যবহারে, শারীরিক গঠনে, সামাজিক সম্পর্কে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, পারিবারিক অবস্থায়, মানসিক প্রকৃতিতে, জীবনযাত্রা প্রণালীতে,—সাংসারিক প্রয়োজনে,—মজুরেরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রকমের। এমন কি একজন মজুরের স্বার্থের সহিত আর একজনের স্বার্থের কোন মিল নাই। তিন হাজার মজুর, তিন হাজার রকমের। কাহারও ১৫ টাকা বেতনেই বেশ সুখে সচ্ছন্দে কাটিয়া যায়, কাহারও বা ২৫ টাকা বেতন না হইলে চলেনা। এই শেষোক্ত লোকটী নানারূপ পট্টি দিয়া এবং বেশীবেতন পাইবার প্রলোভন দেখাইয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত সন্তুষ্ট-চিত্ত মজুরটীকে নিজের দলে টানিয়া আনে এবং উভয়েরই এক স্বার্থ বলিয়া ঘোষনা করে।

এইরূপে মজুরদের মধ্যে যে ধর্ম্মঘট বাধিয়া উঠে, বাস্তবিক তাহার মধ্যে একস্বার্থের নামগন্ধও নাই। কতগুলি গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক নিরীহ ও সন্তুষ্ট-চিত্ত মজুরদিগকে জোর করিয়া দলে টানিয়া আনে। দেখা যায়, ধর্ম্মঘট কয়েকদিন চলিলেই যখন মজুরদের ঘরে অন্নাভাব হয়, তখন তাহারা পুনরায় কাজে যাইতে চায়;—সেই সময়েই গুণ্ডাদের সঙ্গে মারামারি লাগে। এক-স্বার্থের কথা যে কতবড় মিথ্যা এবং ধর্ম্মঘটের মূল যে কত বড় অধর্ম্মরহিয়াছে, তাহা তখন বুঝা যায়। সকল ধর্ম্মঘটের শেষেই দেখাগিয়াছে, গরীব বেচারাদের প্রাণান্ত,—চাকুরী পায় না, পরিবার পরিজন না খাইয়া মরে,—শেষকালে নাক-কান মলিয়া যে ২০ টাকা বেতন পাইত সে ১৫ টাকায় দাসখত দিয়া আবার চাকুরী লয়। আর তখন শ্রমিক নেতারা দূরে দাঁড়াইয়া "সম্মানের সহিত মিটমাট" হইল (Honourabmle Settlement) বলিয়া বাহবা নেয়;—এইত অবস্থা।

এইত সে দিন বেঙ্গল নাগপুর রেলে কয়েক মাস ধরিয়া ধর্ম্মঘট হইয়া গেল লেবার লীডার মিঃ গিরি এই ধর্ম্মঘটকে প্রতিদিন নানারূপ লুব্ধসন্ধানে এবং গরম গরম বক্তৃতার জোরে জিয়াইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার পরিণামে যাহা হইল তাহা সকলেই জানেন! ধর্ম্মঘটীরা কয়েকমাস নানা কষ্ট পাইয়া শেষে নাক কাণ মলিয়া পুনরায় কাজে যোগ দিতে গেল কিন্তু অনেকের ভাগ্যে অঙ্গীকার মাহিযানা আর জুটিল না কোন বিষয়েই তাহারা তাহাদের দাবীর সরিষা প্রমাণ জিনিষও পাইল না কারণ রেলকর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে যাহা দিবার তাহা পূর্ব্বেই দিয়াছিলেন এবং আর কিছু তাহারা দিতে পারিবেন না একথা দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিয়াছিলেন।

(৩) আমরা জানি বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে চটকলে অথবা কটন মিলে একজন সাধারণ লোক,—যে কিছু মাত্র লেখাপড়া জানেনা,—সে কমপক্ষে ১৬ টাকা হইতে ঊর্দ্ধ ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত প্রতিমাসে উপার্জ্জন করিতে পারে এবং করিয়া থাকে; ইহাদের গড়পড়্তা আয় মাসিক ৪০ টাকা ধরা যাইতে পারে। আজকাল একজন এম্ এ পাশ গ্র্যাজুয়েটের পক্ষে ৪০ টাকা বেতনের চাকুরী পাওয়া অত্যন্ত কঠিন,—এমন কি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যারা লেখাপড়া শিখিবার জন্য বাল্যকাল হইতে হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া বি এ, এম্এ ডিগ্রী পাইয়াছে, তারা ৩০।৪০ টাকার মাসিক বেতনের একটা কাজ পাইলে ত বাঁচিয়া যায়! ইহাদের তুলনায় কারখানার মজুরদের অবস্থা ত ঢের ভাল,—স্বর্গ সুখ বলিলেও হয়। ইহার উপর যদি মজুরদের বেতন আরও বাড়াইতে হয়, তবে সমাজের মধ্যে জীবন যাত্রা প্রণালীর একটা সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য থাকে কোথায়? লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের ছেলেরা ১৫।২০ টাকার চাকুরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর যাদের 'ক-অক্ষর গোমাংস' সেই সব মজুর শ্রেণীর লোকেরা অনায়াসে মাসিক ৩০।৪০ টাকা রোজগার করে,—এমন অসঙ্গত ব্যাপার সমাজে ঘটিতেছে,—আবার তার উপরে ধর্ম্মঘট? ভদ্রলোকের জীবন যাত্রার আদর্শ যে দেশে মাসিক ৪০ টাকা বেতনের উপরে নহে,—সেদেশে পাশ্চাত্যের অনুকরণে মজুর ধর্ম্মঘটকে বলা যায় জাতীয় আত্ম-হত্যা!

(৪) বঙ্গলক্ষ্মী, ঢাকেশ্বরী, মোহিনী, বাসন্তী,—এসকল কটন মিল আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহাতে মজুরদের যত রকমের সুখ-সুবিধা হইতে পারে, তাহার কিছুরই অভাব নাই। গবর্ণমেণ্টের ফ্যাক্টরী আইন মতে মজুরদের জন্যে যে সব বন্দোবস্ত করা দরকার, তাহা ছাড়াও অতিরিক্ত আরও নানাবিধ ব্যবস্থা এই সকল মিলে রহিয়াছে। পরিশ্রমের অবসাদ দূর করিবার নিমিত্ত মাঝে মাঝে আমোদ প্রমোদের আয়োজন,—মজুরদের বালকদের শিক্ষার জন্য স্কুল,—তাহাদের সঞ্চিত টাকা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ব্যাঙ্ক,—সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের জন্য দোকান প্রভৃতি স্থাপন করিয়া মিলের কর্ত্তৃপক্ষ মজুরদের কত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি, মোহিনী মিলের একদল কাবুলী খুব কড়া সুদে মজুরদেরে টাকা ধার দিত। এই কাবুলীদের ঋণ শোধ করিতে মজুরেরা সর্ব্বস্বান্ত হইত। ইহা দেখিয়া মিলের ম্যানেজার, স্পিনিং মাষ্টার প্রভৃতি কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী মিলিয়া একটি

তহবিল করেন। সেই তহবিল হইতে মজুরদিগকে খুব অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দিবর ব্যবস্থা হয়। এইরূপে ক্রমশঃ মোহিনী মিলে কাবুলীর উৎপাত ও অত্যাচার উঠিয়া গিয়াছে। ঢাকেশ্বরী কটন মিল যাঁহারা দেখিয়াছেন,—তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলেন, এমন সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থানে, কটন মিল বাংলাদেশে কেন,—বোম্বাই আহমদাবাদেও নাই। সেখানকার কুলি মজুরেরা বাস্তবিকই স্যানিটেরিয়ামে বাস করে। এই সকল মিলের মজুরেরা ২০ টাকা বেতন পাইবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সুখ সুবিধা ভোগ করে তাহার মূল্য ধরিলে বেতনের হার ২০ টাকার দ্বিগুণেরও বেশী হয়। কিন্তু যে সকল ভদ্রলোকের ছেলেরা লেখাপড়া শিখিয়া ২০।২৫ টাকা বেতনে আফিসে চাকুরী করে, তাহাদের ভাগ্যে ঐ রকম সুখ সুবিধা ভোগ করা ঘটেনা। ঐ সকল সুখ সুবিধা, অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর বাড়ী, ছেলেদের শিক্ষা, আমোদ প্রমোদ, রোগ ব্যাধিতে সাহায্য, এ-সব পাইতে হইলে আফিসের কেরাণীদিগকে তাহাদের ২০।২৫ টাকা বেতন খরচ করিয়াও আরও তার উপরে কিছু ঋণ করিতে হয়। সুতরাং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে জীবন যাত্রার যে সামঞ্জস্যের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা ধরিতে গেলে, দেখা যায়, মজুরেরা কেরাণী বাবুদের অপেক্ষা ভাগ্যবান এবং সুখী।

ইহাতে যে অবস্থা- বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সমাজের কল্যাণকর নহে। একটা অশিক্ষিত মূর্খলোক মাসে ৭০।৭৫ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সকল রকম সুবিধা ভোগ করিতেছে, আর একজন সুশিক্ষিত লেখাপড়া জানা লোক সেই স্থলে মাসিক ২০।২৫ টাকা বেতনে নানা অভাবে অসুবিধায়, অস্বাস্থ্যকর গৃহে, ঋণ-গ্রস্ত অবস্থায় রোগ ব্যাধিতে প্রপীড়িত হইয়া অতিকষ্টে দুঃখময় জীবনভার বহন করিয়া যাইতেছে, এরূপ অসামঞ্জস্যকর মজুরী বণ্টন ব্যবস্থা দেশের এবং সমাজের পক্ষে কখনও মঙ্গলজনক হইতে পারে না।

(৫) বাংলা দেশে শিল্পোন্নতির এই শৈশব অবস্থায়,—যখন সেয়ার বিক্রয়ে বাধা, কাঁচা মাল সংগ্রহে বাধা, শিক্ষিত এবং সুদক্ষ মজুর পাওয়াতে বাধা,—বিদেশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাজারে মাল বিক্রয় করাতে বাধা,—সকল রকমে চারিদিকে, প্রবল বাধা পর্ব্বতের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তখন এই অবস্থার মধ্যে বাঙ্গালী মজুর খ্যাপাইয়া এই পর্ব্বত প্রমাণ বাধাকে আরও প্রবল ও শক্তিশালী করিয়া তুলিলে বাংলার বস্ত্র-শিল্প এবং সকল রকম শিল্পের কারবার যে ধ্বংস হইয়া যাইবে এ কথাটা কি এই সকল শ্রমিক নেতারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন?

বিদেশের অনুকরণ এখানে চলে না। ইউরোপে শিল্পের উন্নতি চরমে উঠিয়াছে,—এত চরমে উঠিয়াছে যে, ঝোপ-ওয়ালা গাছের ছাঁটাইয়ের মত, কোন কোন শিল্পের আংশিক বিনাশ সেখানে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে;—সেখানে মানুষের জীবন যাত্রার মাপকাঠি আমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক বড়;—সর্ব্বোপরি সে সকল দেশ স্বাধীন; —তাহাদের রাজশক্তি শ্রমিক আন্দোলনকে

নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং বিদেশের সঙ্গে ভারতের অবস্থার কোন দিকেই কোন মিল নাই।

বিদেশীরা এত চড়া শুল্ক এবং এত বেশী জাহাজ ভাড়া প্রভৃতি দিয়াও কিরূপে এত সস্তায় এদেশের বাজারে মাল দেয়, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। জাপানে ফ্যাক্টরী আইনের কড়াকড়ি নাই। সেখানে মেয়ে পুরুষ দিনরাত যে-যত পাবে কাজ করে। সুতরাং জাপানী কারখানায় খুব সস্তায় প্রচুর পরিমাণে মাল উৎপন্ন হয়। বিখ্যাত জুতা ব্যবসায়ী বাটা জেকোস্লোভাকিয়াতে যখন প্রথম কারখানা স্থাপন করেন, তখন তাহাতে নিয়ম ছিল, সকাল ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত কারখানা চলিবে,—দু'প্রহরে এক ঘণ্টা খাবার ছুটী। আমাদের দেশের কোন ব্যক্তি বিশেষের অথবা কোন কোম্পানীর কারখানায় কেহ এরূপ মজুর খাটাইবার কল্পনাও করিতে পারেন কি? এদেশে ফ্যাক্টরী আইনের যেমন কড়াকড়ি, তাহাতে ৮ ঘণ্টার উপর সাড়ে আট ঘণ্টা খাটুনী হইলেই অমনি হৈ-চৈ-আন্দোলন সুরু হয়। অথচ ইউরোপীয় এবং জাপানী মজুরেরা ৮ ঘণ্টায় যে কাজ করে, এদেশীয় মজুর তাহা ১২ ঘণ্টায়ও পারে না। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক কন্‌ফারেন্সে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা ভারতে প্রয়োগ করা যায় না। শ্রমিকদের উপর দরদ দেখাইতে গিয়া তাহাদিগকে চিরকালের তরে অপটু, অলস ও ফাঁকি-বাজ করিয়া তোলা জাতির হিতাকাঙ্ক্ষীর কর্ত্তব্য নহে।

একটা গল্প বলিতেছি। একজন ভদ্রলোক তাঁহার চাকরকে লইয়া বাজারে যাইতেছিলেন। খুব রৌদ্র;—ভদ্রলোকটী ছাতা খুলিয়া চাকরটীর মাথায় ধরিয়াছেন। তাঁহার জনৈক বন্ধু বলিলেন,

"কি মশাই, কোথায় চাকর আপনার মাথায় ছাতা ধরবে,—তা' না হ'য়ে আপনিই চাকরের মাথায় ছাতা ধরেছেন? চাকরের জন্য খুব ত দেখ্‌ছি দরদ!"

ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন

"দরদ নয়, মশাই, ওর মাথা খেয়ে দিচ্ছি। আর কোথাও গিয়ে ওকে আর চাকুরী করতে হবে না"।

গল্পটা শুনিয়া অনেকের হাসি পাইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে গুরুতর সত্য নিহিত রহিয়াছে। আমাদের দেশে শ্রমিক আন্দোলনেও সেইরূপ মজুরদের মাথা খাওয়া হইতেছে। একে ত ভারতীয় শ্রমিকদের অপটুতার দুর্ণাম, সমস্ত পৃথিবীময় ছড়াইয়া আছে। Indian Labour inefficient,—ভারতীয় শ্রমিক অপদার্থ, একথা সকলের মুখে শোনা যায়। চীনা ছুতোর মিস্ত্রীকে আমরা রোজ ২॥০ টাকা বেতন দিয়াও খোসামোদ করিয়া রাখি, অথচ সেইস্থলে বাঙ্গালী ছুতোরকে বার আনা মজুরী দিতেও লোকসান মনে হয়। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের কোন ভারতীয় কারখানার ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে হইলে গুণ-পণার বিচার করিবার সময় দেখেন, যে তিনি Indian Labour অর্থাৎ—ভারতীয় মজুরদেরে খাটাইতে পারেন কিনা। এই প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত দুর্নাম আমরা অস্বীকার করিতে পারি কি? এত দিন পর্য্যন্ত মজুরদের উপর অনেকে দরদ দেখাইয়া আসিয়াছেন,—তাদের বেতন বাড়াইয়া দাও,—তাদের থাকার জন্য ভাল বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দাও,—তাদের খাটুনী কমাইয়া দাও,—তাদের রোগ ব্যাধিতে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দাও,—তাদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড করিয়া দাও,—ইত্যাদি বহু

"দেহি-দেহি" আব্দার রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু সেই অনুপাতে মজুরেরা কর্ম্মদক্ষতা কতদূর দেখাইয়াছে? তাহাদের বেতনবৃদ্ধির হারে কর্ম্ম কুশলতা কতদূর বাড়িয়াছে? তাহাদের অপটুতার দুর্নাম কতদূর ঘুচিয়াছে? এসকল প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর শ্রমিকনেতারা দিতে পারেন কি?

জাপানে যে অটোম্যাটিক লুম্ উদ্ভাবিত হইয়াছে,—তাহাতে সেখানকার কটন মিলে একটী জাপানী মেয়ে অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতীত একাকিনী একসঙ্গে ১২ খানি তাঁত চালায়। তাহাতেই জাপানী কাপড় এত সস্তায় ভারতের বাজারে আসে। আজ যদি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য বাংলাদেশের কটন মিলে ঐ রকম তাঁতের প্রচলন হয়, তবে তখনি মজুরদের ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইবে। কিন্তু জাপানে তাহা হয় নাই।—কারণ তাহারা জাতীয়তার গৌরব জানে,—দুর্দ্ধর্ষ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতে হইবে, এ সংকল্প তাহাদের আছে। কিন্তু এদেশের মজুরদের মধ্যে সেই ভাব নাই। তাহারা চায় অল্প খাটিয়া বেশী বেতন, কাজে ফাঁকি দিয়া মুঠোভরতি টাকা! আর নেতারা চান্ একটা আন্দোলন,—তার অর্থ এই যে, "এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই"। যেখানে মূর্খ লোকেদেরে মিথ্যার সাহায্যে সহজে খ্যাপাইয়া তোলা যায়, ইঁহারা সেই দিকেই যান।

(৬) কিন্তু ওই যে বাংলাদেশের হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক "কাজ দাও কাজ দাও" বলিয়া নিষ্ফল চেষ্টায় আপিশের দরজায় দরজায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—হাজার হাজার বে-কার যুবক অন্নাভাবে হাহাকার করিয়া মরিতেছে—কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া এইরূপ অভিশপ্ত জীবন শেষ করিয়া দিতেছে—তাহাদের দুঃখ মোচনে এই সকল লেবার লীডাররা অগ্রসর হন না কেন? এই পুঞ্জীভূত বিরাট দুঃখ দূর করিবার সেখানে ত প্রকাণ্ড ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিয়া একটা কিছু প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে ত কাহাকেও দেখি না। কারণ সেখানে যে তৈরী রুটীতে হাত বাড়ানো চলে না! সেখানে যে ধাপ্পাবাজীর স্থান নাই;—সেখানে যে চালাকির সাহায্যে স্বার্থ সিদ্ধি করিবার উপায় নাই।

যারা নিজের দেশে দু মুঠো ছোলা অথবা ছাতু গুড় খাইয়া, গাছের তলায় অথবা সামান্য কুঁড়ে ঘরে থাকিয়া সুখে দিন কাটাইত,—আজ তারা মাসে ২০।২৫ টাকা রোজগার করিয়া, পাকা বাড়ীতে থাকিয়া, দুই বেলা পেট ভরিয়া ডালরুটী খাইয়া, স্নানে পানে কলের জল ব্যবহার করিয়া, রোগে ব্যাধিতে ডাক্তারের সাহায্য পাইয়া, সন্ধ্যায় বিনা পয়সায় সিনেমা দেখার আনন্দ লাভ করিয়া—এত সুবিধাতেও সুখী হইতেছে না। তাহাদের আরও চাই। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের এই যে হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক,—যারা মাসের পর মাস,—বৎসরের পর বৎসর একটা পয়সার মুখ দেখিতে পায় না,—স্ত্রীপুত্র, ঘর সংসার লইয়া দিনের দিন মরণের দিকেই যাত্রা করিয়া চলিয়াছে, তাদের দুঃখ ইহাদের কাহারও চোখে পড়ে না কেন? আমরা এসম্বন্ধে সারা বৎসর ধরিয়া কতবার আলোচনা করিয়াছি;—এই বে-কার আন্দোলন কিরূপে ধীরে ধীরে নিবিয়া গেল, তাহার করুণ

ইতিহাস আমরা গত মাঘ মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশ করিয়াছি। দেশে তাহার কোন সাড়া পাওয়া যায় না। শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যেমন জলুস, বে-কার সমস্যায় তাহা নাই। সেইজন্য বেকারদের চীৎকার এদেশে অরণ্যে রোদন মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

এক একটা মিল, কারখানা স্থাপন করিয়া হাজার হাজার লোকের অন্নের সংস্থান হইতেছে; একটা মিল স্থাপিত হইলে তাহার সংস্পর্শে আর পাঁচটা Side Industry ও গড়িয়া উঠে; যেমন এই কাপড়ের কলের সঙ্গে রঙ্গের কারখানা, কাপড়ের গাইট বাঁধার জন্য Planking ও লোহার পাতের সরবরাহ, Cardboard Box, নানারূপ ছাপার কাজ, হাজার হাজার লোকের আহার এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য দোকানপাট, মিলের খোরাক জোগাইবার জন্য নানারূপ Mill stores, Machine oil প্রভৃতির জোগান, মিলের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বেচিবার জন্য ফ'ড়ে, দালাল, দোকানদার, মিল এজেণ্ট এবং মিলের পরিত্যক্ত রদি মাল, দাগী কাপড়, cotton waste বিক্রয় ইত্যাদি কত রকমে কত লোক যে প্রতিপালিত হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

এ যেন ঠিক বেগবতী, স্রোতোস্বতী বিপুল কায়া এক নদী—ইহা যে সকল জনপদের মধ্য দিয়া অবিরাম গতিতে চলিয়াছে;—তাহার দুই কুলের তৃষ্ণার্ত্ত নরনারীকে জলদান করিয়া চলিতেছে,—উভয় তীরের জমিকে শস্য শালিনী করিয়া, লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুখে অন্নের গ্রাস তুলিয়া দিতেছে এবং গৃহে গৃহে শান্তি, সুখ এবং আনন্দের বাজার বসাইতেছে; এই নদীর জলধারা যদি কেহ বাঁধ দিয়া শুকাইয়া দেয়, কিম্বা ইহার উৎস মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, তবে দেখিতে দেখিতে শস্য-শ্যামল জনপদসমূহ মরুভূমিতে পরিণত হয়,—গৃহে গৃহে অনাহার এবং অনশনের ফলে কঙ্কালসার নরনারী হাহাকার করিয়া মরে, তাহাদের দেউলে আর সন্ধ্যার বাতি জ্বলে না, গৃহে গৃহে আর শঙ্খধ্বনি শোনা যায় না,—পল্লী-বালকবালিকাদের আর সে ক্রীড়ারত কলকণ্ঠের মধুর ধ্বনি আকাশ বাতাসকে মাতাইয়া তোলে না,—তাহাদের ক্ষেত্ খামার শূন্য, মাঠে গরু নাই, গোলায় ধান নাই, পুকুরে মাছ নাই, বাগানে তরীতরকারী নাই, ঘরের চালে কুটা নাই, পরণে বস্ত্র নাই, পেটে অন্ন নাই, কে যেন সহস্রমুখী আগুনের হল্‌কা ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত দেশটাকে পোড়াইয়া শ্মশান করিয়া দিয়াছে, আর সেই মহাশ্মশানে হাজার হাজার ক্ষুধিত নরকঙ্কাল ধুকিয়া ধুকিয়া মরিতেছে। বহমান নদীর স্রোত এবং উৎস বাঁধিয়া শুকাইয়া দিলে দেশের যেমন দশা হয়, এক একটা মিল এবং কারখানার দরজা বন্ধ হইয়া গেলে তাহার হাজার হাজার কারু ও কর্ম্মীবৃন্দের দশাও ঠিক তেমনি শোচনীয় হইয়া পড়ে।

তাই বলিতেছিলাম যে যাহারা এক একটা মিল ও কারখানা স্থাপন করিয়া এতগুলি Side Industryকে রক্ষা করিতেছে এবং হাজার হাজার লোকের মুখে অন্ন দিতেছে, তাহারাত তবু একটা কিছু খাড়া করিয়া এত লোককে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাদের শ্রমিকদের আব্‌দার যে তাহাদের, আরও দাও, আরও দাও। কিন্তু ওই যে শিক্ষিত বেকার বাহিনীর অন্ততঃ দেড় লক্ষ লোক এই মহানগরীর

রাজপথে অল্পাহারে, অনাহারে, মলিন বস্ত্রে, শুষ্ক মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে হতাশায় বেদনাভরা বুকে মেছে আসিয়া অঞ্জলি-ভরিয়া জলপান করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে, উহারা যে পাঁচটা টাকাও রোজগার করার পন্থা পায় না! উহাদের পশ্চাতে আসিয়া তোমরা লেবার লীডাররা মদৎ দাও না কেন? এই সকল ছত্রভঙ্গ, বিক্ষিপ্ত, ক্ষুধার্ত্ত বেকারদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া দেশের ধনীদের নিকট এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট দৃঢ়তার সহিত বল যে আমরা এই দেশের সন্তান—উপার্জ্জনের যোগ্যতা লাভ করার জন্য দেশের লোক এবং গভর্ণমেণ্ট যে সকল বিদ্যায়তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা আমাদের ভিটামাটী চাটী করিয়া, সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া তাহার চাপরাস্ অর্জ্জন করিয়াছি,—এখন আমাদেরও আপনাদের ন্যায় মানুষের মত বাঁচিবার, আর না হয় পশুর মতও শুধু পেটে খাইয়া থাকিবার অধিকার এবং দাবী আছে। Top-heavy administration এবং নানারূপ কারণ অকারণের অজুহাতে গভর্ণমেণ্ট শূন্য তহবিলের থলি দেখাইবেন, এবং দেশের ধনীদের পুঞ্জীভূত অর্থ কেবল টাকার পিরামিড গাথিয়া তুলিবে, আর তাহার চারিদিকে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত নর কঙ্কাল তাহাদের জয়ধ্বনি করিতে থাকিবে, জগতের ইতিহাসে এরূপ অসহ্য এবং অসামঞ্জস্যকর বিধান বেশী দিন টেঁকে না। এই সকল অসহায় নরনারীর অস্থিপঞ্জরভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পুঞ্জীভূত হইতে হইতে এমন একটা অবস্থা একদিন আসিবেই যখন ওই ষ্টীল ফ্রেমের দুর্গে সুরক্ষিত আষ্টে পিষ্টে বাঁধা ধনীদের লোহার বয়লার ফাটীয়া চুরমার হইয়া যাইবেই যাইবে। ইহা অশুভ, অকাম্য, এবং অবাঞ্ছনীয় হইলেও ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

এই দেশেরই ভবিষ্যদ্দর্শী ভক্ত কবি গাহিয়াছেন,—

"তুলসী,—হায় গরীব কি হায় ছহি না যায়,
মরে চাম্ কি ধোঁক্‌ছে কঠিন লৌ জল্ যায়।"

গরীবের হাহাকার কেহ সহ্য করিতে পারে না। মরা চামড়ার যে হাপর্, সেই হাপরের হায় হায় শব্দে এত বড় কঠিন যে লোহা তাহাও জ্বলিয়া গলিয়া যায়। এটা শুধু উপমা নহে—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। যুগে যুগে যেখানে, সমাজের যে স্তরে, দুঃখ, দৈন্য, দুর্দ্দশা, এবং বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে অথচ তাহার প্রতিকারের জন্য বিলাসী উন্মার্গ-গামী সমাজ একটা অঙ্গুলিও হেলনা করে নাই, সেইখানে এই পুঞ্জীভূত অন্যায় এবং বেদনা প্রবল ভূমিকম্পের মত সে দেশ এবং সমাজকে চক্ষের পলকে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু সেই কালের প্রতীক্ষায় অলসের ন্যায় বসিয়া থাকিলে হয় না।

"কালহ্যয়ং নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বী"

কাল অনন্ত এবং এই পৃথিবীও বিপুলা। এখানে তীরে বসিয়া ঢেউ গুনিলে সমুদ্রে আর স্নান করাই হইবে না। এই কালকে ঘড়ীর স্প্রীংয়ে দম দেওয়ার মত গতি দিতে হইবে; এই সকল বিক্ষিপ্ত বেকার যুবকদিগকে একত্র সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে—যদি এই বেকার বাহিনী অন্যায় এবং অধর্ম্মের পথ ত্যাগ করিয়া, শান্ত সমাহিত ভাবে দৃঢ়তার সহিত ধনীদিগের বদ্ধ দুয়ারে একত্রে আঘাত করিতে পারে—তবে সে দুয়ার

খুলিবেই এবং তাহাদিগের শতাব্দী সঞ্চিত পুঞ্জীভূত অর্থ দেশের, দশের এবং সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হইয়া সমগ্র দেশ এবং জাতিকে যেমন রক্ষা করিবে, তেমনি তাহাদের নিযুক্ত অর্থও বহুগুণে আবার তাহাদের ঘরেই ফিরিয়া আসিবে।

যাহারা এই বিশাল দেশের উর্ব্বর মৃত্তিকার প্রত্যেক কণিকাটি শোষণ করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া বসিয়া আছে,—যাহারা লক্ষ লক্ষ কৃষকের শ্রমলব্ধ অর্থে 'সিংহের ভাগ' বসাইয়া নিজেদের পেট মোটা করিয়া তুলিয়াছে,—যাহারা কেবলমাত্র শতকরা আড়াই টাকা তিন টাকা সুদের লোভে লক্ষ লক্ষ টাকা এমন সব সিকিউরিটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, অথবা এমন সব ব্যাঙ্কে ফেলিয়া রাখিয়াছে,—যেখান হইতে দেশের শিল্পোন্নতির জন্য একটী পাই পয়সাও বাহির হইবে না,—যারা নিজের ক্ষমতায় অথবা পুরুষকারের বলে একটী পয়সাও উপার্জ্জন করিতে পারে নাই—দৈব গতিকে জমির দর বৃদ্ধি পাওয়াতে (unearned increment of land) চক্ষের পলকে লক্ষ টাকার মালিক হইয়াছে;—যারা অনায়াসে একাকী এক একটা কটন মিল, চিনির কল, তুলার কল, চট কল প্রভৃতি স্থাপন করিতে পারে,—অর্থচ যারা দেশের মধ্যে চলতি কল কারখানাগুলির একখানি শেয়ারও কেনে না;—যাদের সংখ্যা আমাদের বাংলাদেশে দু'টী একটি নহে,—শত শত, সেই সকল ধনী লোকদেরে ধরিয়া অন্ততঃ দুই চারিটী কল কারখানা স্থাপন করাও দেখি তোমরা সব শ্রমিক নেতারা,—তবে বুঝি যে, তোমরা সোস্যালিজ্‌ম্ নীতির মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছ,—তবে বুঝিব, যে, হাঁ, সাম্যবাদ এইখানে সার্থক হইয়াছে।

এই রকম দুই চারিটা কলকারখানা এবং কাজ কারবার স্থাপিত হইলেও বাংলাদেশের হাজার হাজার বেকার যুবকের অন্নের সংস্থান হয়,—দেশের জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধি পায়;—বিদেশীরা প্রতিযোগিতায় হটিয়া যায়। যদি ক্ষমতা থাকে,—যদি সোস্যালিজ্‌মের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া থাক,—যদি সত্যই দুঃখীদের জন্য দরদ জাগিয়া উঠিয়া থাকে, তবে দেশের মধ্যে এই আন্দোলনের আগুন জ্বালাও,—ঐ সব টাকার কুমীরদিগকে টানিয়া আন,—গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য কর; তবেই দেখিবে দেশের শিল্পোন্নতি দৈত্যশিশুর মত চক্ষুর পলকে বাড়িয়া উঠিবে। দেশের হাহাকার ঘুচিয়া যাইবে।

তা' না করিয়া যে সকল মজুর এবং কারুজীবি গড়ে ২৫।৩০ টাকা মাহিনা পাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, তাহাদিগের তেলা মাথায় আরও তেল দিবার দুর্ভাবনায় মত্ত না হইয়া যাহারা তেলাভাবে শুষ্ক হইয়া মরিতেছে তাহাদিগের মাথায় তেল দিবার ব্যবস্থা কর, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

যখন দেশের শিল্প বাণিজ্য উন্নতির চরম সীমায় উঠিবে,—যখন সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাধারণ লোকের জীবন যাত্রার আদর্শ অধিকতর উন্নত হইবে,—তখনই মজুরদের আরও অধিক বেতন এবং সুখ সুবিধার কথা বিবেচনা করিবার সময় আসিতে পারে,—তার পূর্ব্বে নহে।

(৭) মজুরদের উপর আমাদের কোন আক্রোশ নাই। মজুরদের সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম আনন্দিত এবং সচ্ছল অবস্থায় রাখা কোম্পানীর মালিকদের **স্বার্থ বলিয়াই** কর্ত্তব্য। কিন্তু

কোম্পানীকে বাজারে সস্তায় মাল দিতে হইবে, নচেৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না,—কোম্পানীর শেয়ার যাহারা কিনিয়াছে, তাহাদিগকে ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ দিতে হইবে, কারণ তাহাদের অর্থেই কল স্থাপিত হইয়াছে—তাহারাও দেশের জনসাধারণ ব্যতীত আর কেহই নহে। বাংলাদেশে বাঙ্গালীর কল কারখানায় বাঙ্গালী ধনীদের শেয়ার অতি সামান্য পরিমাণই আছে। লাহা বংশ, মিত্র গোষ্ঠী, গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়, প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী এবং ভাগ্যকুলের রাজা জানকী নাথ ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রমেন্দ্র নাথ রায়ের মত একাজে সাহস করিয়া অতি অল্প লোকই অগ্রসর হইয়াছেন।

যে সকল ধনীদের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহারা ঘুমাইয়া আছেন। আমরা এমন ধনী লোকের কথা জানি, যাঁহাদের ছয় মাসে যে টাকা বাড়ী ভাড়া বাবদে আদায় হয় তাহাতে একটা কটন মিলের পত্তন হইতে পারে। অথচ জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির দিক দিয়া কিম্বা বহু লোকের অন্নের ব্যবস্থা হইবে এই আনন্দের জন্যও ইহারা একটি পয়সা কোনও কল কারখানায় invest করেন না। মজুর ধর্ম্মঘটে এই সকল ধনীলোকদের কিছুই আসে যায় না। কারণ তাহারা ত এই সব মিলের শেয়ার কেনে না। তাহারা মাসে মাসে নিশ্চিন্তে ব্যাঙ্কের সুদ পায় সুতরাং নিশ্চিন্তে ঘুমায়। কিন্তু ধর্ম্মঘটের ফলে যদি একমাস কল কারখানা বন্ধ থাকে, তবে মারা যাইবে, দেশের জনসাধারণ, যারা অতি কষ্টে দুই শত পাঁচ শত টাকা জোগাড় করিয়া বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী অথবা ঢাকেশ্বরী কটন মিলের শেয়ার কিনিয়াছে। ফল ভোগ করিবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি,—যখন এই সকল কটন মিল ডিভিডেণ্ড দিতে না পারাতে শেয়ার মার্কেটে এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর দুর্নাম রটিবে।

তথাপি যাঁহারা মজুর ধর্ম্মঘটের জলুসে মাতিয়া উঠেন,—মজুরদের দুঃখে যাঁহারের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে,—তাঁহাদিগকে আমরা challenge করিতেছি,—ধনী এবং শ্রমিকদিগের মধ্যে যেরূপ আর্থিক সামঞ্জস্য এবং সুখ সুবিধার ব্যবস্থা ও আদর্শ তাঁহারা প্রচলন করিতে চান, সেইরূপ আদর্শ লইয়া তাঁহারা একটা মিল গঠন করুন! আপনাদের আদর্শে অন্ততঃ একটা কটন মিল, অথবা একটা চিনির কারখানা,—অথবা একটা লোহার কারখানা বাংলাদেশে স্থাপন করুন,—যেখানে মজুরেরা আপনাদেরই নির্দ্ধারিত পন্থায় সর্ব্ব প্রকার সুখ সুবিধা ভোগ করিবে, যেখানে মজুরদের কোন অভাব অভিযোগ থাকিবে না; —যেখানে মজুরে মালিকে সর্ব্বদা সাম্য মৈত্রী এবং সদ্ভাব বজায় থাকিবে,—এক কথায় জগতের কোনও দেশে কোনও জাতি এযাবত যাহা কোথায়ও করিতে পারে নাই আপনারা Industrial worldএ যুগান্তকারী সেই Millenium আনিবেন!— এ যদি করিতে পারেন তবে ত বুঝি যে মুরোদ আছে বটে! গলাবাজি ছাড়িয়া আসুন, এই রকম একটা কাজের মত কাজ করুন। যদি আপনাদের আদর্শ অনুযায়ী কল কারখানা গড়িয়া তুলিতে না পারেন,—তবে গড়া জিনিষ ভাঙ্গিতে যাইবেন না। যাদের একটু বাঁশ, বেত, খড়, খুঁটী যোগাড় করিবার সামর্থ্য বা

ক্ষমতা নাই, তারা তৈয়ারী ঘর বাড়ীতে আগুন লাগাইতে যায় কোন্ সাহসে?

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন,—

"যদি তুমি নূতন কিছু গড়ে দিতে না পার, তবে কাহারও গড়া জিনিস ভেঙ্গো না।"

সেই মহাপুরুষের বাণী অনুসরণ করিয়া আজ আমরা বাংলা দেশের শিল্প বাণিজ্যের হিতকল্পে বলিতেছি,—যদি এক খানা ইটের উপরে আর এক খানা ইট বসাইবার ক্ষমতা না থাকে, তবে বাংলাদেশের এত কষ্টে গড়া,—এত বাধা বিঘ্নের উপরে দণ্ডায়মান,—এত অর্থ ব্যয়ে তৈয়ারী ঐ বঙ্গলক্ষ্মী মোহিনী, ঢাকেশ্বরী, বাসন্তী, বঙ্গেশ্বরী প্রভৃতি কটন মিলের মজুরদেরে অকারণে খ্যাপাইয়া বাংলাদেশের এই জাতীয় সম্পদশ্রীর অপূর্ব্ব সৌধগুলি ভাঙ্গিতে কেহ যেন এক পদও অগ্রসর না হয়। বাংলার চাষী মজুরেরা এই সকল কল কারখানায় খাটিয়া দু'বেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করিতেছে,—তাহাদের সেই মুখের অন্ন কেহ যেন নষ্ট না করে;—তাহাদিগকে মরীচিকার পশ্চাতে ছুটাইয়া যেন কেহ তামাসা না দেখে,—ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর উৎসাহ উদ্যমের সম্মুখে কেহ যেন বাধার সৃষ্টি না করে;—বাংলার জাতীয় গৌরবে যেন কলঙ্কের দাগ না দেয়।

আমাদের এই আহ্বানের উত্তর কি আসিবে, তাহার ইঙ্গিতও আমরা ইতিমধ্যে অনেকটা পাইয়াছি। তথাকথিত শ্রমিক নেতারা,—মজুর খেপানই যাঁদের ব্যবসা,—তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ দুই একটা কাজ কারবারে হাত দিয়াছিলেন, আমরা তাহা জানি। কিন্তু তার পরিণাম ফল কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা কি কাহারও মনে নাই? ইহাদের ব্যবসা চালাইবার বুদ্ধির ফলে কত পাওনাদারকে হাত ধুইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে তাহার হিসাব কেহ রাখেন কি? কত গরীব মজুরের পাওনা টাকা তাঁহারা মারিয়াছেন,—কত দরিদ্রযুবকের ছয়মাসের বাকী বেতনও দেন নাই;—তার ফিরিস্তি আমাদের কাছে রহিয়াছে। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি এইসব লোক অপরকে মিল ফ্যাক্টরী চালাইবার পরামর্শ দিতে যায় কোন সাহসে?

এই সব নেতারা পরের টাকায় মজুরদের বেতন বাড়াইবার উস্কানি খুব দিতে পারে;—নিজেরা কিন্তু রিক্সা কুলীকে চারি আনা ভাড়ার স্থলে অম্লানবদনে দু'গণ্ডা পয়সা দিয়া চলিয়া যায়। বেচারা কুলী তার উপরে একটা পয়সা চাহিলে তাকে চোখ্ রাঙাইয়া শাসন করে। এইসব নেতারা বাজারে যাইয়া দরিদ্র চাষীদের নিকট হইতে দু'পয়সার শাক কিনিতে পাঁচ মিনিট দর কষাকষি করিয়া আধ পয়সা দাম কমায়। সেখানে আর দরিদ্রের প্রতি দরদ নাই,— কারণ তাহা যে নিতান্ত প্রাইভেট্ ব্যাপার, তাহাতে যে "আন্দোলন"—জিনিসটীর অভাব! আন্দোলন না হইলে ত তাঁদের ন্যাতাগিরি চলে না।

সর্ব্বশেষে আমরা আর একটী গুরুতর বিষয়ে শ্রমিক নেতাদের দৃষ্টি আহ্বান করিতেছি। প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করি, চট্‌কলে, কটনমিলে, লোহার কারখানায় যেদিন কুলীদের বেতন দেওয়া হয় সেদিন তথায় এত কাবুলী পাওনাদারের ভিড় হয় কেন? ১৫ টাকা বেতনের মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া ৭০।৮০ টাকা বেতনের মিস্ত্রী পর্য্যন্ত সকলের মাথা যে ঐ কাবুলী পাওনাদারদের কাছে ঋণের দায়ে বাঁধা

রহিয়াছে। তাহাদের বেতনের অর্দ্ধেক টাকা ত ঐ কাবুলীরাই লইয়া যায়। বাকী অর্দ্ধেকের কিছু মুদিখানায় দিয়া ইহাদের অনেকেই ঢুকে তাড়িখানায় এবং মদের দোকানে। তারপর সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া রিক্তহস্তে মদমত্ত অবস্থায় ইহারা ঘরে ফিরিয়া যায়। স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা কার মুখের দিকে চাহিবে? তারপর চলিতে থাকে স্বামীস্ত্রীতে, বাপে বেটায়, ভাইয়ে ভাইয়ে,—ঝগড়া বিবাদ, কোন্দল কোলাহল,—গালাগালি, মারামারি, অশান্তির আগুন!

এই ত আমাদের শ্রমিকদের গৃহস্থালীর আলেখ্য। ইহার প্রতিকার কি? বেতন বাড়াইয়া দেওয়া ত ইহার প্রতিকার নহে,—পরন্তু তাহাতে আরও সর্ব্বনাশ হইবে। বেতনের প্রত্যেকটী পয়সা যাইবে, কাবুলীদের স্বদ দিতে, তাড়িখানায়, মদের দোকানে, আর জুয়ার আড্ডায়। স্বতরাং মজুরদের বেতন যতই বাড়াও না কেন,—তাহাদের দুরবস্থা কখনও ঘুচিবে না। শতছিদ্র পাত্রে জল ঢালিলে কি পাত্র কখনও পূর্ণ হইবে?

সেইজন্য আমরা শ্রমিকনেতাদের বলিতেছি, যদি প্রকৃত মজুর—দরদীই হও, তবে ঐ শতছিদ্র পাত্রের ছিদ্র বন্ধ করিয়া দাও, তাহা হইলে দেখিবে পাত্র অবিলম্বে পূর্ণ হইয়া যাইবে, আর জল ঢালিতে হইবে না।

যে গলাবাজি করিয়া তাহাদের খ্যাপাইয়া তুলিতেছ, তাহার অর্দ্ধেক শক্তিতে বক্তৃতা করিয়া তাহাদিগকে সুনীতি ও সংশিক্ষা দাও। কলকারখানার চতুঃসীমা ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে মদের দোকান, তাড়ি খানা ও জুয়ার আড্ডাগুলি তুলিয়া দাও, এমন ব্যবস্থা কর যেন মজুর দিগকে আর ঋণগ্রস্ত হইতে না হয়,—বাংলাদেশের কলকারখানার দরজায় আর যেন কাবুলীর পাগড়ী ও লাঠি দেখা না যায়। বাংলাদেশের মজুরের কষ্টার্জ্জিত টাকা খাইবে কাবুলীরা?

এই সবই হইল প্রকৃত মজুরদরদী নেতাদের কাজ। তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর নামে জয় ডঙ্কা বাজান;—কিন্তু তিনি যে মদ্য পান নিবারণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং খেজুর গাছ কাটীয়া ফেলিবার জন্য নিজ হস্তে কুঠার লইয়া এক কুঠার বাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা যে সব অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল?—তাহাতে যে কেহ সাড়া দিলেন না। সকলে মিলিয়া গভর্ণমেণ্টকে জোর করিয়া ধরুন,—আবগারী শুল্ক যায় যাক্,—মদের দোকান, তাড়িখানা, আর জুয়ার আড্ডা এসব একেবারে তুলিয়া দিতেই হইবে। আপনাদের আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি এই দিকে নিয়োজিত হউক। তখন দেখিবেন,—এই জীর্ণ শীর্ণ কুলী মজুরদের চেহারা ফিরিয়া যাইবে, তাদের দুঃখময় গৃহস্থালীতে আবার স্বর্গসুখ ফিরিয়া আসিবে।

কলিকাতা করপোরেশনের চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার মিঃ জে সি মুখার্জ্জি গত ১২ই এপ্রিল ছয়মাসের ছুটী লইয়া বিলাত গিয়াছেন। বিশ্রাম সুখ উপভোগ অথবা নষ্ট স্বাস্থ্যের উদ্ধার করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগরে মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য কিরূপ ভাবে নির্ব্বাহ হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার অর্জ্জিত জ্ঞান ও বুদ্ধি কলিকাতা করপোরেশনের উন্নতি কল্পে নিয়োজিত করিবেন। তাঁহার পত্নীও পুত্র-কন্যাগণ সঙ্গে গিয়াছেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, মিঃ মুখার্জ্জি সুস্থদেহে পত্নী-পুত্র-কন্যাগণসহ পুনরায় ফিরিয়া আসুন এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্য পুনরায় গ্রহণ করিয়া তাহাকে উন্নতির পথে পরিচালনা করুন।

মিঃ জে সি মুখার্জ্জির অনুপস্থিতি কালে তাঁহার স্থলে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করিবেন শ্রীযুত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ ডেপুটী চীফ একজিকিউটীভ অফিসারের পদে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং যোগ্য ব্যক্তির উপরই যে চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর কার্য্যভার পড়িয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় অধিকতর সুনামের সহিত, এবং করপোরেশনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদের গৌরব রক্ষা করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। তাহার পরিচয়ও আমরা ইতিমধ্যে পাইয়াছি।

গত ১৬ই এপ্রিল, য়্যাক্টিং চীফ একজিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কামরায় করপোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারিগণকে আহ্বান করেন। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, সকলের সহযোগিতায়

এবং সাহায্যে যাহাতে করপোরেশনের কার্য্য ভাল রূপে চলে, যাহাতে সমালোচকেরা নিন্দা করিবার কোন সুযোগ না পায়, যাহাতে এতবড় সহরটাকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাযায় এবং নগর বাসীরা কোনপ্রকার সুযোগ সুবিধা হইতে যাহাতে বঞ্চিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীযুত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ম্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলেন, নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম দেওয়া হইল ,—

"আমি আপনাদিগকে আজ কেন এখানে আহ্বান করিয়াছি, তাহা হয়ত আপনারা জানেন না। মিঃ জে সি মুখার্জ্জি ছয়মাসের ছুটী লইয়া বিলাতে গিয়াছেন; সেই সময়ে আমার উপর তাঁহার গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যভার পড়িয়াছে, তাহা আপনারা অবগত আছেন। যে সকল গুণ থাকাতে তিনি অসাধারণ ধৈর্য্য ও কর্ম্মকুশলতার সহিত, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও করপোরেশনের কার্য্য সুনামের সহিত এতকাল চালাইয়া আসিয়াছেন, আমি সে সকল গুণের অধিকারী একথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারিনা। তবে আমার ভরসা আছে, আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা পূর্ণ মাত্রায় পাইলে, আমি করপোরেশনের কার্য্য উন্নত এবং অনিন্দনীয় ভাবে পরিচালিত করিতে পারিব। কি প্রণালীতে, কিরূপ পদ্ধতিতে কোন বিভাগের কার্য্য চালাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে আপনাদের সহিত পরামর্শ করাই আমার উদ্দেশ্য, সেইজন্যই আপনাদিগকে আজ এখানে আহ্বান করিয়াছি।

মিঃ মুখার্জ্জির কার্য্যকালে তিনি আমাদের সকলেরই পূর্ণ সহযোগিতা পাইয়াছেন। আমার বিশ্বাস, আমিও তেমনি আপনাদের সাহায্য পরামর্শ এবং সহযোগিতা পুরা মাত্রায় পাইব। তাহা হইলে, মিঃ মুখার্জ্জি যখন ফিরিয়া আসিবেন, তখন এই করপোরেশনকে যে অবস্থায় নিয়াছি, সেই অবস্থায় পুনরায় তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে পারিব।

আপনারা জানেন অসংখ্য বাধাবিঘ্ন এবং অসুবিধার মধ্য দিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হয়। অনেক সময়ে কাজে নিরুৎসাহ আসে। সামান্য ব্যাপার ছাড়া কোন কিছুতে আমাদের শেষ-নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও করপোরেশন ও কমিটীর মেম্বারদিগকে বুঝাইয়া শুনাইয়া মত লওয়াইতে অসমর্থ হই, এমন ঘটনা বিরল নহে। ইহা হয়ত আমাদেরই দোষ, কিন্তু ফলে আমাদিগকে একবারের কাজ দশবার করিতে হয় এবং কাযেও নিতান্ত বিরক্তি জন্মে। অনেক সময় এমনও হইয়াছে, আমরা কমিটীর মেম্বারদের বুঝাইয়া পড়াইয়া ঠিক করিলাম, কিন্তু করপোরেশনের মেম্বারগণ শেষে সব উল্টাইয়া দিলেন, আমাদিগকে পুনরায় নূতন ভাবে সমস্ত কার্য্যটী আরম্ভ করিতে হয়।

আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করি, এত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও আপনারা নিরাশ হইবেন না এবং এই অজুহাতে কার্য্য হইতে বিরত হইবেন না। কেবলমাত্র আফিসের ধরাবাঁধা রুটীনে ফাইল দুরস্ত রাখিয়া নির্লিপ্তের মত কাজ করিয়া যাইবেন না। "হ'ল-ত-হ'ল, না হয় ত ব'য়ে গেল আমার তাতে কি" এইরকম দায়িত্ব শূন্যভাবে কাজ করিবেন না। মনে

রাখিবেন, এত বড় একটা সহরের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর সুখ-সুবিধা, স্বাস্থ্য-সৌভাগ্য, আনন্দ-সম্পদ সমস্তই আমাদের হাতে। আমরা সকলে যদি এক উদ্দেশ্যে পরস্পর সহযোগিতায় কার্য্যকরি তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা কমিটীর সভ্য এবং করপোরেশনের মেম্বারগণকে বুঝাইয়া আমাদের মতানুবর্ত্তী করিতে পারিব।

আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, ঈশ্বর আমাকে যেটুকু সামান্য শক্তি দিয়াছেন, তাহাতে আমি সর্ব্বদা আপনাদের সাহায্য করিব। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপনারা প্রয়োজনমত আমার সহিত দেখা করিতে পারিবেন, এবং আপনাদের যার যাহা অসুবিধা ও অভিযোগ তাহা আমাকে জানাইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। আপনারা মনে রাখিবেন, করপোরেশনের মধ্যে ভারতীয় স্বরাজ,—আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে বলিতে পারি,—বাঙ্গলী স্বরাজেরই মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যদি আমরা করপোরেশনের কার্য্য সুনামের সহিত চালাইতে না পারি, তবে জানিবেন, তাহা আমাদের দুরপনেয় জাতীয় কলঙ্ক স্বরূপ হইবে।

বাহির হইতে অনেক সমালোচনার কথা আমাদের কাণে আসে। শুধু বাহির নয়;—করপোরেশনের ভিতরেও অনেক সমালোচক আছেন। করপোরেশনের সকল কাজেই বিলম্ব, চিঠি পত্রের জবাব পাওয়া যায় না, আফিসে হাজিরা দিবার নিয়ম কড়াকড়ি নাই, বাহিরের কাজকর্ম্ম তদারককারীরা কর্ত্তব্যে অবহেলা করে, আর ডিসিপ্লিন বা সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্ত্তিতা বলিয়া একটা জিনিস, করপোরেশনে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই! এই সকল নানা রকমের অভিযোগ আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাইতেছি। আপনারা সকলে একযোগে চেষ্টা করুন, যেন এই সকল অভিযোগ মিথ্যা হয়। আমি নিজে কখনও মুহূর্ত্তের জন্য আরাম সুখ চাই না। আমি যদি আপনাদিগকে দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ করিতে অনুরোধ করি, তবে জানিবেন, আমি নিজে দৈনিক ১২ ঘণ্টা কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি।

বাহিরে কাজকর্ম্ম তদারক করিবার ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত আছে, তাঁহারা অনেক সময় উর্দ্দি পরিধান না করিয়া রৌদ্রে বাহির হন। এরূপ করা কখনও উচিত নয়। 'উর্দ্দি-পরা' অফিসারের কাজে গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব সহজেই আসে, তাহা আপনারা বুঝিতে পারেন। আপনাদিগকে অনুরোধ, দেখিবেন আপনাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা কেহ যেন, বিনা উর্দ্দিতে কাজে বাহির না হন।

আপনাদিগকে আর বেশীক্ষণ দেরী করাইব না। আশা করি, আপনারা আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া এমনভাবে কার্য্য করি, যেন করপোরেশনের গৌরব অক্ষুন্ন থাকে এবং তাহাকে উন্নত অবস্থায় পুনরায় মিঃ মুখার্জ্জির হাতে আমরা তুলিয়া দিতে পারি।
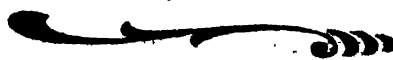
ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৭শ বর্ষ | আষাঢ়—১৩৪৪ | ৩য় সংখ্যা

জুতাব্যবসায়ী টমাস বাটার আত্মজীবন চরিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাগ সহরে মাল বিক্রয়ের সুবিধা আবিষ্কার হওয়াতে আমাদের ভাগ্য খুলিয়া গেল। আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন স্পেনের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়, তেমনি প্রাগ সহরে জুতার বাজার আবিষ্কারের ফলে আমার পিতার কারবারের উন্নতির পথ দেখা দিল; এই উপমাটী কিছু মাত্র অযৌক্তিক বা অতিরঞ্জিত নহে। বাস্তবিক, এই সময় হইতেই আমাদের কারবার খুব বাড়িয়া উঠিল। এতদিন আমাদের কারখানায় সামান্য পরিমাণ মাল তৈয়ারী হইত। কারণ, স্থানীয় প্রয়োজন বেশী ছিলনা। কিন্তু এখন হইতে আমরা এত মাল তৈয়ারী করিতে লাগিলাম যে, তার সীমা-সংখ্যা নাই। আর মাল বিক্রয়ের ভাবনা করিতে হয় না। আমাদের মালের কাটতি আর ছোট খাট মেলায় ও বাজারে সীমাবদ্ধ নহে। পিতা দেখিলেন যে, তাঁহার যৌবনের স্বপ্ন সফল হইয়া আসিতেছে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার পিতা ভবিষ্যতের অনেক জল্পনা কল্পনা করিতেন। তাঁহার হাতে টাকা থাক আর না থাক, এসব অলীক অথচ দুঃসাহসিক স্বপ্নের কিন্তু বিরাম ছিলনা। আমরা যখন খুব দরিদ্র ছিলাম, তখনকার একটী ঘটনা আমি এখানে বলিতেছি। তাহাতে বুঝা যাইবে যে, আমার পিতা কিরকম চরিত্রের লোক ছিলেন এবং কি সব কল্পনা ও মতলব তাঁহার মাথায় খেলিত। আমার পরবর্ত্তী জীবনে বর্ত্তমান সময়ে আমি এক বিরাট ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছি। কিন্তু এখনও মাঝে

মাঝে চিত্তের শান্ত অবস্থায়, সেই ঘটনাটী মনে পড়ে।

এক সময়ে আমার পিতা হ্রাদিস্তে গ্রামের এক মেলাতে জুতার দোকান খুলিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম ব্যবসায়ী আরও অনেক মুচি ঐ রকম দোকান লইয়া সেই মেলাতে গিয়াছিল। একদিন আমার পিতা তাঁহার সমব্যবসায়ী বন্ধুদের সহিত বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিলেন। সম্মুখে কিছুদূরে ইহুদী-মেজ সাহেবের চিনির কারখানার কতকগুলি চিম্‌নি গাদা-করা সাজান ছিল। সেই চিম্‌নীগুলির দিকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া পিতা বলিলেন, "আমার ছেলেরাও একদিন ঐ রকম চিম্‌নীওয়ালা কারখানা করবে"। আমার পিতার কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধুরা সকলে তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিল। শুধু তাই নয়, এই লইয়া ঝগড়া ঝাটি, গালা গালি এমন পাকাইয়া উঠিল যে, আমি দেখিলাম শেষে হাতা-হাতি হইবার গতিক! কারণ, তাহারা আমার পিতার ঘোরতর দারিদ্র্যের উপর কটাক্ষ করিয়া তাঁহার কথাকে "উন্মাদের প্রলাপ" বলিয়া উপহাস করিয়াছিল। পিতা ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। আমি কিছুতেই তাঁহাকে থামাতে পারিনা। আমি বলিলাম, "বাবা, তুমি না বুঝে শুনে অমন কথা বলতে গেলে কেন?" তিনি বলিলেন "ওরাই কি আমায় বুঝে শুনে উন্মাদ বলেছে?" যাহা হউক শেষে পিতার সেই বন্ধুরাই আস্তে আস্তে চলিয়া গেল, যাইতে যাইতে বেশ চোখা চোখা বিদ্রূপের বুলি শুনাইতে তারা ছাড়িল না। আমার পিতা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তেমনি দৃঢ় স্বরেই বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা দেখে নিও, আমার ছেলেদের যদি এম্‌নি চিম্‌নিওয়ালা কারখানা না হয়, তবে আমার নাম নিয়ে কুত্তাকে ডেকে ভাত দিও"।

পিতার বন্ধুরা যে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহারও একটা কারণ আছে। সেবার-কার মেলাতে কাহারও কিছু বেচা কেনা হয় নাই। সুতরাং সকলেরই মন খারাপ। সেদিনটাও ছিল বড় সুবিধার নয়, খুব ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। সবাই শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। সেই জটলাতে সকলেরই ইচ্ছা বন্ধুদের মধ্যে কেহ অগ্রসর হইয়া একটু গরম গরম কিছু পানীয় কিম্বা খাবারের ব্যবস্থা করে। কিন্তু কে মাতব্বরি দেখাইবে, সবারই যে হাত টানাটানি, পকেট খালি। মনের এমন অবস্থায় আমার পিতার সেই কথাটী তাহাদের কাণে উন্মাদের প্রলাপের মত শুনাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ তার ব্যাখ্যা যখন এই দাঁড়ায় যে, "তোমার ছেলেরা চিম্‌নিওয়ালা কারখানা করিবে, তুমি সেই স্বপ্ন দেখছ, আর আজ এই ঠাণ্ডার দিনে দু'পয়সা খরচ করে এক পেয়ালা চা খাওয়াতে পার না"।

ঘটনাটা এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ইহার মধ্যে আমার পিতার চরিত্রের কি দৃঢ়তা, কি দূরদর্শিতা, কি তীক্ষ্ণ ব্যবসায় বুদ্ধি দেখিতে পাইতেছি। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সহিত তখনকার এই ক্ষুদ্র ঘটনার যে এমন একটা চির সম্বন্ধ থাকিয়া যাইবে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। আজ দেখিতেছি, আমার পিতার সেই কথা যাহাকে উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া তাঁহার বন্ধুরা উড়াইয়া দিয়াছিল, সেই কথা মহাপুরুষের অমোঘ ভবিষ্যদ্ বাণীর মত অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে।

তখন আমাদের ও অঞ্চলে চিম্‌নিওয়ালা কারখানা ছিলনা বলিলেই হয়। আমাদের এত বড় জেলার মধ্যে হ্রাদিস্তে ও নাপাজেদ্‌লা এই দুইটী জায়গাতে কেবল দুইটী চিম্‌নী দেখা যাইত। হ্রাদিস্তের ঐ চিম্‌নীওয়ালা কারখানার মালিক ছিলেন, ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ইহুদী বংশের মিঃ মেজ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নাপাজেদ্‌লা কারখানার মালিক ছিলেন, কাউণ্ট বাল্‌ত্তাজী। উচ্চবংশের বড় লোকেরাই চিম্‌নিওয়ালা বড় বড় কারখানার মালিক হইতে পারেন, এই ছিল সাধারণ লোকের ধারণা। আমার মত নীচ চেক্ জাতীয় মুচির ছেলেরা চিমনিওয়ালা বড় কারখানার মালিক হইবে, ইহা একটা দুঃসাহসিক কাজ এবং এক প্রকার সামাজিক অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইত। আমার পিতার কথায় তাঁহার বন্ধুরা যে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাও তাহার আর একটী কারণ।

১৮৯৪ সালে আমি, আমার ভাই য়্যাণ্টনিন এবং আমার ভগ্নী, আমরা এই তিনজন চিরকালের তরে আমার পিতার কারবার পরিত্যাগ করিয়া গেলাম। আমাদের স্বর্গীয়া জননী আমাদের জন্য যৎসামান্য কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই সমস্ত অর্থই পিতা দুঃখ দারিদ্র্যের তাড়নায় খরচ করিয়া ফেলেন। কিন্তু আমরা যখন তাঁহার সহিত আর্থিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া পৃথক হইলাম, তখন তিনি আমাদিগকে আমাদের প্রাপ্য অর্থে বঞ্চিত করিলেন না। দোকানে বেতন বাবদে আমাদের পাওনা এবং আমাদের মায়ের গচ্ছিত টাকা মিলাইয়া সুদসহ তিনি আমাদিগকে দিলেন মোট ৮০০ ফ্লোরিণ (১ ফ্লোরিণ ২ শিলিং প্রায় ১৵০); হাজার টাকার উপর। এই টাকা দিতে আমার পিতাকে কতদূর স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা কেবল যে তাঁহার স্নেহভাজন পুত্রকন্যা ছিলাম তাহা নহে। আমরা ছিলাম তাঁহার ব্যবসায়ের তিনটী প্রধান সহায়। কারবারের সকল বিষয়ে আমাদের সাহায্য হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ব্যবসায়ের মূলধন হইতে আরও ৮০০ ফ্লোরিণ তুলিয়া আমাদিগকে দিতে হইল। একেবারেই তিনি ধনবল এবং জনবল দুই-ই হারাইলেন।

আমাদের উপর তাঁহার স্নেহ মমতা যে কত বেশী ছিল, তাহা এই স্বার্থ-ত্যাগ হইতে বুঝা যায়। সন্তানদের মঙ্গলের বিষয় তিনি সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করিতেন। ইহার জন্য তাঁহার সাহস সংকল্প এবং গর্ব্বাস্থভব কখনও কম ছিল না।

১৮৯৪ সনে আমার ভ্রাতা য়্যাণ্ট্‌নিন্ তাহার নিজ নামে জুতার ব্যবসা করিবার লাইসেন্স্ লয়। আমি আইনতঃ তাহার য়্যাসিষ্টাণ্ট্ বা সহকারী হইলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে এরূপ কথাবার্ত্তা এবং বোঝা-পড়া হইল যে, কারবারের ফল আমরা তিনজনেই সমান ভাগে ভোগ করিব।

আমরা এই নূতন কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম আমরা যেন অধিকতর উন্নত ধরণে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের সকল চেষ্টা ও শ্রম নিয়োজিত করিতাম।

সাধারণ পাড়াগেঁয়ে ও সেকেলে ভাব ছাড়িয়া আমরা আধুনিক উন্নত এবং কড়াকড়ি ভাবে কারখানার কাজ আরম্ভ করিলাম। সকাল

৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত আমাদের কারখানা চলিত। ইহার মধ্যে দুপুর বেলা এক ঘণ্টা মাত্র খাবার ছুটী *। আমরা প্রতি সপ্তাহে মজুরদের বেতন দেওয়ার নিয়ম করিলাম। আমরা নিজেরাও প্রতি সপ্তাহে মজুরদের সঙ্গে বেতন লইতাম। আমাদের মতে ছোটখাট কারখানায় এই রকম নিয়ম করা একান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে কাজকর্ম্ম হিসাব পত্র সব গোলমাল হইয়া যায়;—লাভক্ষতি খতাইবার কোন উপায় থাকে না।

সেকেলে পাড়াগেঁয়ে পুরাণো ধরণে কারখানায় মজুরদের এবং কর্ম্মচারীদের নিয়মিত বেতন দিবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। মালপত্র বিক্রয় হইলে মালিকদের যখন খুসী সুবিধামত বিশেষ বিশেষ প্রিয় কর্ম্মচারীকে ও কারিকরকে কিছু কিছু করিয়া দিতেন। কারখানায় কাজের কোন নির্দ্দিষ্ট ধরাবাঁধা সময়ও ঠিক ছিল না। ভোর ৬টা হইতে আরম্ভ করিয়া একটানা রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত হরদম কাজ চলিত। অবসর মত যার যখন সুবিধা, কিছু খাইয়া লইত। শনিবারে এবং কোন পর্ব্ব উপলক্ষে মেলার পূর্ব্ব দিন সারা রাত্রি ধরিয়া কারখানায় কাজ হইত। ফলে, সোমবারে কারখানা খোলা থাকিলেও কেহ কাজে আসিত না। কারণ, সেদিন তাহাদেব ছুটীর খোঁয়াড়ি চলিতে থাকে। অতিরিক্ত খাটুনীতে মজুরদের মনের অবস্থা এই রকমই হয়। তাহারা কাজকে একটা গুরুতর দায়িত্ব বলিয়া জ্ঞান করে না।

আমাদের বয়স তখন ১৮।২০ বৎসর। এই বয়সের যুবকদের পক্ষে ধনিত্বের গর্ব্ব অনুভব করার জন্য বেশী উপকরণের আবশ্যক নাই। সুতরাং আমাদের কারবারে যাহা আয় হইত, তাহাতে আমরা স্বচ্ছল অবস্থায় ধনী লোকদের মত বেশ উঁচু ষ্টাইলেই থাকিতাম; কোন দিকেই ভোগ সুখের কৃপণতা করিতাম না।

(ক্রমশঃ)

* দিন ১২ ঘণ্টা কাজের মধ্যে এক ঘণ্টা মাত্র খাবার ছুটী,—এই রকম বন্দোবস্ত আমাদের ভারতবর্ষের কোন কারখানায় কেহ কল্পনাও করিতে পারেন কি? এ দেশে ৮ ঘণ্টার বেশী কাজ হইলেই অমনি ফ্যাক্টরী আইনের কবলে পড়িতে হয়,—সেই সুযোগটী মজুরেরাও পুরা মাত্রায় গ্রহণ করে। সে দেশের মজুরদের দানবী শক্তির সহিত ভারতীয় মজুরদের তুলনাই হয় না।

"ব্যবসা ও বাণিজ্য"—সম্পাদক

রেশমী বস্ত্রে রং করার প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের)

৪৩। যে কোন রকমের পশমেরই বস্ত্র হউক বা একদিকে কার্পাসের সূতা ও একদিকে পশমের সূতা দিয়া তৈয়ারি কাপড়ই হৌক—জলে ভিজাইলে অথবা সাবান ও সোডা জলে গুলিলে কতকটা কোঁচকাইয়া যাইবেই। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রথমতঃ পশমের বস্ত্রকে একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে চালনা করিতে হয়। এই প্রণালীকে ইংরাজীতে "ক্র্যাবিং" (Crabbing) করা বলে। সাবান ও সোডা দিয়া সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই ক্র্যাবিং করিয়া লইতে হয়। উহার প্রণালী এইরূপ।

(ক) খুব ফুটন্ত জলে কাপডকে তাড়াতাড়ি ভাবে খুব টানে কিছুক্ষণ রাখ। তারপর ভিজা কাপড়টা একটা কড়িকাঠের সাথে খুব টান করিয়া ঝুলাইয়া রাখ এবং ঐ ভাবেই শুকাইতে দাও। এখন রং করা সম্পর্কে অন্যান্য যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, তাহাতে যদি রংয়ের জল কি অন্য যাহা কিছু গরম করিতে হয়, তাহাতে যদি তাপ সর্ব্বদা ফুটন্ত অবস্থার নীচে (temprature below the boiling point) থাকে, তাহা হইলে আর এই ভাবে ক্র্যাবিং করা কাপড় কোঁচকাইবে না।

ক্র্যাবিং হইয়া গেলে পশমের বস্ত্রগুলি ছিদ্রযুক্ত রোলারের সহিত জড়াইয়া একখানা মোটা কাপড় দিয়া ঢাকা দিয়া বাষ্পের ভাঁপ্‌নাতে রাখিয়া দিতে হয়। এই ভাবে কাজ করিলে আর ভবিষ্যতে মোটেই কোঁচকাইবে না।

(খ) Milling and Felting of Woollen materials—

যখন পশমের দ্রব্য (তাহা খাটী পশমই হৌক) অনেকক্ষণ গরম জলে রাখা যায়, তখন তাহার মধ্যের পশমের সূতাগুলি উঠিয়া নরম হইয়া যায়। ইহাতে সূতাগুলি আকারে ছোট হইয়া যায় বটে, কিন্তু আসলে মোটা হইয়া পড়ে। এই ভাবে সকল গুলি একত্র হইয়া এমন জড়াইয়া যায় যে, তাহাতে সমস্ত মিলিয়া বেশ মোটা একখানি কাপড় হইয়া উঠে। তখন একটা হাতুড়ী লইয়া একখানি তক্তা বা কোন একটা ধাতুর পাতের উপরে রাখিয়া আস্তে আস্তে পিটিয়া দিতে হয়। ইহার পর কাপড়গুলি কয়েকটী রোলারের মধ্য দিয়া চাপিয়া লইতে হয়। ইহাতে কাপড়ের উপরগুলি বেশ চাপ খাইয়া আবার সূতাগুলি যথা বিন্যস্ত হইয়া পড়ে।

এইভাবে কাপড়গুলির কোনটা সম্পূর্ণরূপে বা কতকাংশে ঢাকা পড়িয়া যায়। এই যে

প্রণালী বলা হইল ইহা সাধারণতঃ রং করিবার পূর্ব্বেই হোক বা পরেই হোক কাপড় প্রস্তুতকারীরাই সাধারণতঃ করিয়া থাকে। এই ভাবে কাজ শেষ হইলেই সাধারণতঃ মাল বাজারে ছাড়া হইয়া থাকে; কাজেই এই সম্পর্কীয় বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া হইল না।

পশমের বস্ত্রে যে একেবারে শেষের কাজ করিতে হয় (Finishing Process) সেই সম্পর্কে সাধারণতঃ পশমে যাহারা রং করে তাহারা যে প্রণালী অবলম্বন করে, অথবা ধোবারা সাধরণতঃ যাহা করিয়া থাকে, এখানে সেই প্রণালীই বর্ণনা করা গেল। ইহাতে কোন রাসায়নিক দ্রব্যের আবশ্যকতা নাই, ইহা শুধু যান্ত্রিক ব্যাপার। এই প্রণালীগুলি অবশ্য ইহার পূর্ব্বে রেশমের বস্ত্র সম্পর্কে বলা হইয়াছে। এখানেও আবার তাহারই পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, সাধারণ যাহারা পশমে রং করে তাহাদের অবলম্বিত প্রণালী—

ধোয়া ও রং করা হইয়া গেলেই (গরম ও ভিজা অবস্থায় হইলেই ভাল হয়) কাপড়কে লম্বাভাবে ভাঁজ করিতে হয়, তারপর একটী কাঠের রোলারে (যাহার মধ্যে ফাঁক আছে এরূপ) জড়াইয়া দিতে হয়। প্রথমতঃ কাপড় খানার এক দিক রোলারটার ফাঁকে ঢুকাইয়া দিতে হয়, তারপর বেশ টান রাখিয়া রাখিয়া জড়াইয়া যাইতে হয়; শেষকালটাতে আগের পরত কাপড়ের সাথে সেলাই করিয়া দিতে হয়। এই ভাবে জড়ান হইলে, রোলারটার দুইটী ভাগ ফাঁকে ফাঁকে মিলাইয়া দুই দিকে দুইটা খিল যতটা সম্ভব শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিতে হয়। এই ভাবেই কাপড় খানা কয়েক দিন রাখিয়া দিতে হয় এবং ঐ ভাবেই শুকাইতে হয়। তারপর রোলারের মধ্য দিয়া বাহির করিয়া লইয়া, ভাঁজ করিয়া, চাপিয়া ঠিক করিয়া ডেলিভারি দিবার জন্য প্রস্তুত রাখিতে হয়।

এই গেল এক রকম প্রণালী। ইহা ছাড়া আর এক রকম উপায় আছে, তাহা সাধারণতঃ ধোপারা অবলম্বন করিয়া থাকে।

ধোয়া বা রং করা হইয়া গেলে পশমের দ্রব্যগুলি সামান্য কিছু ভিজা থাকে, এই ভাবে শুকাইতে হয়। তারপর, ঐ কাপড়খানি ভাঁজ করিয়া তাহার উপর একখানা ভিজা কার্পাসের সূতার কাপড দিয়া সাধারণ ভাবে ইস্ত্রি করিতে হয়। তারপর ভাঁজ করিয়া, চাপিয়া দিয়া 'ডেলিভারি' দিবার জন্য প্রস্তুত রাখিতে হয়।

নারিকেল চাষের পদ্ধতি ও লাভালাভ

বাংলাদেশে যাঁরা বাস করেন তাঁরা নারকেলের সঙ্গে অবশ্য পরিচিত। নারকেলের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন কথা যদি কেহ বলে তাহ'লে তাকে বলতে পারা যায় যায় যে বাংলা দেশে সে বাস করে না। এই নারকেল ডাব রূপে যে শুধু তৃষ্ণার্ত্তদের মোহিত করে তা নয়, ব্যবসা ক্ষেত্রে অর্থ-তৃষ্ণার্ত্ত যাঁরা তাঁদের পক্ষে নারকেল প্রচণ্ড লোভের বস্তু। ডাব-নারকেল শুধু মাত্র আহার্য্য নয়, ব্যবসার খোরাকও বটে।

নারকেল গাছ সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে যে ও গাছ বুঝি আপনি বেড়ে ওঠে, ওর জন্য কোন যত্ন নেবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নারকেল গাছ শুধু মাত্র প্রকৃতি লালিত নয়। মানুষের পদার্পনের বাইরে এমন কোন জায়গায় মানুষের সম্পর্কচ্যুত হ'য়ে প্রকৃতির মধ্যে যদি কোন নারকেল গাছ দেখা যায়, তবে তার পরমায়ু সম্বন্ধে বেশী আশা পোষণ করা চলে না। প্রকৃতি কয়েক বছর তাকে বাঁচাতে পারে বটে কিন্তু কিছুদিন পরেই সে গাছটা মরবেই। তা'ছাড়া সে গাছে ফলও ভাল হয় না। মানুষের সাহায্য তার চাই-ই চাই।

সিংহলে নারকেল গাছটা খুব বেশী। বহু প্রাচীন কাল থেকেই এই গাছ সিংহলীদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সঙ্গে একেবারে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত; খাদ্য, পানীয়, আলো, জ্বালানী, গৃহ-ব্যবহার্য্য তৈজসপত্র ও বাড়ী তৈরীর সরঞ্জাম প্রভৃতি সমস্ত কিছুর সঙ্গেই নারকেল গাছের সম্পর্ক বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, সিংহলের রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নারকেলের একটি অতি প্রয়োজনীয় স্থান আছে। সিংহলের শিল্প ঐশ্বর্য্যের জন্য নারকেল বহুলাংশে দায়ী।

রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নারিকেল জাত দ্রব্যের মধ্যে নারিকেল তৈলই প্রধান। ১৯০৬ সালে গড়ে এর বাৎসরিক মূল্য ছিল ২,৬৪৩,৭৪৭ টাকা। তৈলের পরই প্রয়োজনীয় রপ্তানী দ্রব্য নারিকেল ছোবড়া। ঐ ছোবড়া পরিষ্কার করবার জন্য বাষ্প চালিত মেসিন আছে। তা' ছাড়া বহু লোক গৃহ-শিল্প হিসেবে এই ছোবড়া পরিষ্কারের কাজ নেয়। ছোবড়া গুলোকে প্রথমে জলে ভিজতে দেওয়া হয়, তারপর রীতিমত ভেজবার পর সেগুলো শুকোবার ব্যবস্থা করা হয় এবং তৎপরে আঁশ গুলোকে রীতিমত ভাবে পেটা হয়। এ সমস্ত ছাড়া ডাব, নারিকেলের শাঁস এবং তৈল বের করে নিলে যে শাঁসের ছিবড়ে পড়ে থাকে—সে সমস্ত ব্যবসার দিক দিয়ে অত্যন্ত দরকারী।

ব্যবসার দিক দিয়ে এতক্ষণ আমরা নারিকেলের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছি, এবার কি করে নারিকেলের চাষ চলে সেটাই দেখা যাক্।

নারিকেলের জন্ম ও বৃদ্ধির পক্ষে সর্ব্বনিম্ন ৮০° ডিগ্রী উত্তাপের প্রয়োজন। উক্ত উত্তাপের মধ্যে, খুব কম করে ধরলেও যদি ৭০ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয় তাহ'লে তা' চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। নারিকেল গাছ জন্মাবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর জমি হচ্ছে নদী তীরের ভূভাগ যেখানে ঘন ঘন বানের জল পৌছতে পারে না। কাঁকুরে ভূমিও নারিকেল গাছের পক্ষে উপযুক্ত। সারযুক্ত বালি মাটিতেও প্রচুর নারিকেল গাছ জন্মায়। খুব সারযুক্ত মাটিতে গাছের স্বাভাবিক বাড়কে চেলে দেবার ব্যবস্থা করতে হ'বে। সিংহলে দেখা যায় যে চাষী ব্যবসায়ীরা উপরোক্ত সারযুক্ত বালিমাটিতে নারিকেলের চাষ করেই প্রচুর লাভবান্ হয়। নারিকেল গাছেব চাষের পক্ষে পাহাড়ে উঁচু জমি, স্যাঁৎসেতে, কর্দ্দমাক্ত জমি প্রভৃতি ত্যাগ করতে হ'বে।

কি রকম ভাবে নারিকেলের চাষ করলে বেশী ফল ফলে দেখা যাক্। আগেকার যত বাগান আছে তাতে দেখা যায় যে, অপরাপর গাছেব সঙ্গেই নারিকেল গাছ লাগানো থাকতো এবং দেখা যেত যে এক একর জমির মধ্যে দুশো গাছ লাগানো আছে। তখনকার লোকের বিশ্বাস ছিল যে যত বেশী গাছ লাগানো যাবে তত বেশী বুঝি ফল ফলবে এবং তাদের এ বিশ্বাসটাকে কিছুতেই ভাঙ্গা যেত না। নারিকেল গাছের কাছে কাছে যদি মানুষের বসতি না থাকতো তাহ'লে পূর্ব্ব-পুরুষদের উক্ত বিশ্বাস ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'ত। কিন্তু গাছের তলায় এবং কাছাকাছি লোক বসতি থাকার দরুণ ভূমি স্বভাবতঃই সারবান হয়ে উঠতো। ইউরোপীয়রা যখন সিংহলে সর্ব্ব প্রথম নারিকেল চাষের কারবার আরম্ভ করে তখন তারা কতকগুলি ভুল করেছিল। তার জন্যেই প্রথম প্রথম তারা এ কারবারে সুবিধা করিতে পারে নি। ফলে নারিকেলের চাষ বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু তৎপরে নারিকেল তেলের দর বৃদ্ধি প্রাপ্তি এবং গভর্ণমেন্টের অনুকূল প্রচেষ্টার দরুণ আবার নারিকেলের চাষ খুব ভালভাবে চলে। ফলে, দেখা যায় যে, পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, সে-সব জায়গা নারিকেল গাছে ভর্ত্তি হ'য়ে গেছে।

কি রকম বীজ ব্যবহার করলে ভাল গাছ হ'তে পারে সেটাও একটা বিচার্য্য বিষয়; কেন না, ভাল গাছের ওপরই ভাল ফল নির্ভর করে। বেশ ফলন্ত গাছ যাতে সবুজ রংয়ের ডিম্বাকৃতি পুরু খোলের ফল ধরে, সেই রকম গাছের ফলের বীজই ব্যবহার করা উচিত।

চাষের প্রথম ব্যাপার হ'ল চারা তৈরী করা। তারপর সেগুলোকে নিয়ে ইচ্ছামত স্থানে বসিয়ে দিতে হয়। এই চারা তৈরীর জন্য বেশ খোলা এবং হালকা ধরণের জমি চাই। এই জমিতে সারবন্দী ছোট ছোট গর্ত্ত করে রাখতে হয়, তারপর নারিকেল ফল নিয়ে তার বোঁটাটা উঁচু দিকে করে সেই গর্ত্ত ভরে মুখ পর্য্যন্ত মাটি চাপা দিতে হয়। জল দিয়ে গর্ত্তের আশে পাশের ধারগুলো বেশ করে ভরে রাখা দরকার, তারপর সমস্ত জায়গাটার ওপর ২" ইঞ্চি পুরু করে খড় কিংবা ঘাস বিছিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি আবহাওয়া শুকনো থাকে ত মাঝে মাঝে সারা স্থানে জল দিতে হ'বে। এই রকম ভাবে পাঁচ ছ' মাসের মধ্যে চারা বেরিয়ে অন্যত্র বসাবার যোগ্য হ'য়ে উঠবে। যে সমস্ত চারা ঠিক ভাল ভাবে বেরোয় নি, কিংবা যে সমস্ত চারা বেশ পুরুষ্টু নয়, তাদের প্রথমেই বাদ দিয়ে দেওয়া দরকার।

তারপরেই সেই চারাগুলো নিয়ে ক্ষেতে বসাবার পালা। একজন অভিজ্ঞ চাষী এক প্রকার নূতন পন্থার কথা বলেছেন যেটা প্রণিধান যোগ্য। তাঁর মতে চারা গুলোকে নিয়ে একটা ভাল যায়গায় ৫ ফিট অন্তর অন্তর পুঁতে ভাল করে তাতে জল সিঞ্চন করে জমির যত্ন নেওয়া হোক্। যে পর্য্যন্ত না চারা গুলো বেশ সতেজ এবং বাড়ন্ত হয় সে পর্য্যন্ত এই রকম জমির যত্ন নিতে হবে। ইতিমধ্যে, যে জমিতে স্থায়ীভাবে নারিকেল গাছ লাগানো হ'বে, সেটাতে কোন কিছুর চাষ না করে তার ওপর প্রাকৃতিক রৌদ্রজল লাগিতে থাকুক। তারপরে সেই যায়গায় সেই বাড়ন্ত গাছ গুলিকে স্থায়ীভাবে বসাতে হ'বে। এইরকম চাষ-পন্থার সুবিধা এই যে, এতে করে মাত্র একজন লোক বহু গাছের তদারক করতে পারবে, যেটা গাছগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকলে সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, যেখানে স্থায়ী ভাবে গাছ লাগানো হ'বে, সেই জমিটাকে, কিছুকাল খালি ফেলে রাখার দরুণ তার উর্ব্বরতা শক্তি বেড়ে যাবে এবং তাতে করে গাছের পুষ্টির পক্ষে সুবিধা হয়। এই পন্থার মস্ত অসুবিধা এই যে, বড় গাছকে স্থানচ্যুত করে অন্য যায়গায় বসানো ব্যয়সাধ্য এবং গাছকে স্থানচ্যুত করে অন্য যায়গায় বসালে তার বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মায়। কিন্তু নারিকেল গাছের বেলায় এমনও দেখা যায় যে, ১০ বছরের গাছকে স্থানচ্যুত করে অন্য স্থানে বসানো হয়েছে, তবুও তার কোন ক্ষতি হয় নি।

যে স্থানে গাছ বসানো হ'বে সেটা যদি একটা পুরাতন জঙ্গল হয় তাহ'লে ঋতুগত স্বাভাবিক প্রথম বারিপাতের অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে তার সমস্ত বৃক্ষাদি কেটে ফেলতে হ'বে। বৃক্ষাদি কেটে ফেলবার ১৫।২০ দিন পরে সমস্ত কর্ত্তিত গাছে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে এবং পাতা মরে যাবার পর একাজে মোটেই বিলম্ব করা উচিত হয়। যদি অনেক দিনের জঙ্গল হয় তাহলে আগুন ধরিয়ে দিলে ত সমস্ত বৃক্ষাদিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। কিন্তু যদি অল্প দিনের জঙ্গল হয় তাহ'লে আগুন বৃক্ষাদির মূলকে নষ্ট করিতে পারে না এবং সেই জন্যই ছ'মাস না যেতে যেতেই আবার নূতন আগাছার আবির্ভাব সম্ভব হয়। এই আগাছা জমির রস শোষণ করার দরুণ নারিকেল গাছের পুষ্টির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মায়, সুতরাং যাতে না এই আগাছার পুনঃ আবির্ভাব হয় সেবিষয়ে প্রভূত যত্ন নেওয়া দরকার।

গাছ বসানোর সময় জমিতে সারবন্দী লাইন ঠিক করে নেওয়া দরকার। সার বন্দী লাইনে সমান্তর ব্যবধানে গাছ রোপিত হবে। প্রত্যেক গাছের মধ্যবর্ত্তী জায়গায় ঠিক কতখানি ব্যবধান থাকবে তার কোন বাধা বাঁধি নিয়ম নেই, তবে সাধরণতঃ ২৫ ফিটের ব্যবধানই (প্রতি একর জমিতে ৭০ টি গাছ) পোঁতা হয়ে থাকে, কেউ কেউ কেউ ২৮ কিংবা ৩০ ফিট ব্যবধানেরও পক্ষপাতী। বিরাট ক্ষেত্রে লাইন ঠিক ভাবে রক্ষা করা পরিশ্রমের কার্য্য সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে পরিশ্রমটা বৃথা যায় না এবং ক্ষেত্রের শোভা বৃদ্ধি পায়। চতুষ্কোণাকৃতি ভাবে ক্ষেতের চার কোণে চারটে গাছ পুঁতে লাইন ঠিক করার চিরাচরিত প্রথা আছে। ত্রিকোণাকারেও কেউ কেউ গাছ পুঁতে থাকেন একটি বাড়ন্ত গাছের পাতার দৈর্ঘ্য ব্যবধান

রাখলে দু'টি গাছের পাতাগুলির পরস্পর সংঘর্ষের কোন আশঙ্কা থাকে না।

বৃক্ষ রোপণের জন্য যে গর্ত্ত খোঁড়া হ'বে সেটা দু'ফিট গভীর এবং তিন ফিট চওড়া হওয়া চাই। গর্ত্তের উপরের ১৮ ইঞ্চি খুব ভাল মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে।

গাছ রোপণের পর সেটা যাতে ভালভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। সেজন্য, অপর কোন গাছ বা আগাছা জ'ন্মে, যাতে জমির রস সব শোষণ করে নিতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হ'বে। গাছের বৃদ্ধি প্রাপ্তির সাহায্য মানসে জমিতে সার প্রদান

পরিপুষ্ট নারিকেলের চারা

করাও কর্ত্তব্য। মাঠ পরিষ্কার রাখার জন্য যে মাঠকে চেঁচে-ছুলে একেবারে সাফ্ করে রাখতে হ'বে এমন কোন কথা নেই, বরঞ্চ পশুদিগের খাদ্যের জন্য ঘাস গজালে কোন ক্ষতি হয় না। তবে দৃষ্টি রাখতে হ'বে যাতে ভারী আগাছা না জন্মায়। সারের ব্যবস্থা করার সোজা উপায় হচ্ছে প্রত্যেক বৃক্ষের চার পাশে তিন ফিট অন্তরে বৃত্তাকারে দু-তিন ফিট চওড়া এবং তিন ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত খনন করা; তারপর সেই গর্ত্তে সার ঢেলে দিয়ে মাটী চাপা দিয়ে দেওয়া। গাছে ফল না ধরা পর্য্যন্ত এ ছাড়া আর কিছুই করবার প্রয়োজন নেই।

গাছ পোঁতবার কতদিন পরে ফল ধরবে তা' নির্ভর করে ভূমির গুণাগুণ ও গাছের যত্ন নেওয়ার ওপর। জমি যদি খুব ভাল হয় ত পঞ্চম বৎসরেই গাছে ফুল ধরে কিন্তু নবম কিংবা দশম বছরের পূর্ব্বে ফল ধরে না। দশম বছরের পর বিংশতি বছর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ফল ধারণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তারপরে গাছের ফল প্রসারসার প্রদানের তারতম্যের ওপরনির্ভর করে

কিন্তু আমাদের নারকেল চাষ করার যে দেশী প্রথা আছে তা' একটু ভিন্ন ধরণের। দেশীয় চাষীরা নারকেল চাষের জন্য আলাদা করে কিছু খরচ করতে চায় না, পরন্তু, নারকেল গাছগুলোর ফাঁকে যে জমি খালি থাকে তাতে অন্য ফসল লাগিয়ে তার আয়ে সব কিছু সেরে নেয়। তাদের পদ্ধতিটা হচ্ছে লোভের পদ্ধতি, তারা তাড়াতাড়ি লাভ করতে চায়, সুতরাং দশ বছরের অপেক্ষা তাদের সয় না। তাই দশ বছরের মধ্যে অন্য ফসল লাগিয়ে তারা আয়ের পথ সুগম করতে চেষ্টা করে কিন্তু দূরদৃষ্টি-সহকারে ভেবে দেখে না যে, এতে করে নারিকেল ফল কম ফলার দরুণ তারা শেষ পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে থাকে।

লাভের আশা করাটা মোটেই খারাপ জিনিস নয়, বরং এ সব ব্যাপারে ব্যবসা বুদ্ধি থাকাটা প্রয়োজনের। নারিকেল চাষ করলে বছর দশেক তাতে কোন লাভের আশা নেই, সুতরাং ইতিমধ্যে সেই জমির মধ্যে অন্য জিনিসের চাষ করে যদি লাভবান হওয়া যায় ত মন্দ কি। কিন্তু এটা ভেবে দেখা দরকার যে তাতে করে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হ'বে কি না? এমন জিনিসের চাষ করা উচিত নয় যাতে করে আসল মুখ্য চাষের ক্ষতি হয়। সাধারণতঃ কৃষকেরা নারিকেল গাছের মধ্যবর্ত্তী জমিতে কলা, আলু ইত্যাদির চাষ লাগিয়ে থাকে। খুব ভাল জমি না হ'লে কলা ভাল ফলে না, তাছাড়া কলা গাছ প্রচণ্ডভাবে জমির উর্ব্বরা শক্তি ক্ষয় করে। আরও দেখার বিষয় যে কলাগাছের অসংখ্য চারা বেরোয়, তাতে করে শেষ পর্য্যন্ত ৬।৭ বছরের মধ্যে সমস্ত ক্ষেতের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়। তবে কলা গাছের ছায়া নারিকেল গাছ বৃদ্ধির পক্ষে উপকারী। আলুর চাষে অবশ্য ক্ষেতের ক্ষতি হয় না।

এই ত গেল চাষ কার্য্যের দিক। এবার চাষকার্য্যে কি কি বিঘ্ন উপস্থিত হ'তে পারে সে বিষয় পরবর্ত্তী সংখ্যায় লেখা যাবে।

ক্রমশঃ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভলুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। "বঙ্গবাসী" এইরূপ প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের কাগজে প্রকাশ করতঃ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব।

— সম্পাদক

তেলা মাথায় তেল দেওয়া

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা

*

কামারকে ইস্পাত ফাঁকি

*

ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না

*

চক্ষু চড়ক গাছ

*

যখের ধন

*

ভরা গাঙ্গে বান ডাকা

*

সবে ধন নীলমণি

*

সাত রাজার ধন এক মাণিক

*

অভাগা যে দিকে চায়
সাগর শুকায়ে যায়

*

গরু খোঁজা

*

লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা মাগে

*

গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া

*

মাছের তেলে মাছ ভাজা

*

সবুরে মেওয়া ফলে

*

থাক স'য়ে, পাবে র'য়ে

*

আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ

*

মুড়ি মিছরীর একদর

*

উলুবনে মুক্তা ছড়ান

*

চাষা কি জানে মদের স্বাদ
আমটা আমটা লাগে মদ

*

কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নাই

*

চোরকে বলে চুরি করতে
গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে

*

দুরন্ত গরুর চেয়ে
শূন্য গোয়াল ভাল

*

কাক সবার মাংস খায়
কাকের মাংস কেউ খায় না

*

সাপের পাঁচ পা দেখেছে

*

ডুমুরের ফুল

*

আপনি বাঁচলে বাপের নাম

*

চেনা বামুনের পৈতার দরকার কি

*

লাখ টাকায় বামুন ভিখারী

*

ঘোড়ের চালে কিস্তিমাৎ

*

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া

*

চাপ পড়লেই বাপ বলে

*

কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরুবে

*

সদাই নম্বরি চাল

*

কুঁড়ের বাদ্‌সা

*

মাথার ঘাম পায়ে ফেলা

*

অন্ধের নড়ি

*

অশ্লেষা মঘা
এড়াবে তুমি ক'ঘা

*

সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়

*

ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে কুলোয় না

*

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি ?

*

নেই কাজ'ত খই ভাজ

*

শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়

*

ভাজে উচ্ছে ত বলে পটল

*

শ্রীঅজিত নাথ দাস
(রায়বাহাদুর)

ভারতে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী হ্রাস

এমন এক সময় ছিল যখন ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ৬৫ কোটী টাকার কাপড় আমদানী হইত কিন্তু লোকের আর্থিক দুরবস্থার জন্য বস্ত্রের ব্যবহার হ্রাস পাওয়া এবং ভারতের কল ও তাঁতে সমূহে অধিক পরিমাণে বস্ত্র উৎপন্ন হওয়ার জন্য এখন ভারতে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী অনেক কমিয়া গিয়াছে। স্বদেশী বস্ত্রের প্রতি ভারতবাসীর আকর্ষণও বিদেশী বস্ত্রের আমদানী হ্রাস পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

বস্ত্রের ও সূতার সম্পর্কে ১৯৩৩-৩৪ সালে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৯৩১।৩২ সালের তুলনায় ১৯৩২-৩৩ সালে ভারতে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী প্রায় ৭॥ কোটী টাকায় বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৩-৩৪ সালে উহার পরিমাণ ১৯৩২-৩৩ সালের তুলনায় ৯ কোটী টাকারও বেশী হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে ভারতে ১৯ কোটী ১৫ লক্ষ টাকার বস্ত্র, সূতা, গেঞ্জী, মোজা প্রভৃতি আমদানী হয়। ১৯৩২-৩৩ সালে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ২৬ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা হয়। ১৯৩৩-৩৪ সালে পুনরায় উহা কমিয়া ১৭ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে। এবার বিদেশী ও সূতার আমদানী এত কমিয়াছে যে, উহা ১৯৩১-৩২ সালের রেকর্ডকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। ভারতের সবচেয়ে বড় শোষণের পথ যে এইভাবে সঙ্কুচিত হইতেছে উহা নিতান্ত আনন্দের বিষয়। এই বৎসরও বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই অবস্থা বজায় রহিয়াছে। কারণ, গত বৎসর জানুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ১০ মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে যে পরিমাণ কোরা ও ধোলাই কাপড় আমদানী হইয়াছিল এবার তাহা অপেক্ষা কম কাপড় আমদানী হইয়াছে। মাত্র রঙ্গীন কাপড়ের আমদানী কিছু বাড়িয়াছে। বিদেশী সূতার মধ্যেও উক্ত দশ মাসে কোরা রঙ্গীন সূতার আমদানী কমিয়াছে। মাত্র ধোলাই সূতার আমদানী কিছু বাড়িয়াছে।

ভারতবর্ষে বিদেশী বস্ত্র ও সূতার আমদানী হ্রাস পাওয়ার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। কেন না, কাপড়ের কল এবং তাঁত মিলিয়া ভারতে বস্ত্র প্রস্তুতের এত সরঞ্জাম রহিয়াছে যে, ভারতবাসী একটু সামান্য চেষ্টা করিলেই এই ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে। ভারতবর্ষে তুলাও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অন্য যে কোন দেশ হইলে দেশের গভর্ণমেণ্ট দুই এক বৎসরের চেষ্টায় দেশের এই শোষণের পথ বন্ধ করিয়া দিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্টও বস্ত্রশিল্পের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন—দেশের লোকও এই ব্যাপারে তেমন আগ্রহশীল নহে। ভারতে বস্ত্রের আমদানী, রপ্তানী ও উৎপাদনের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, বিগত ১৯১৩-১৪ সালে ভারতবর্ষে প্রতি ব্যক্তি মাথা পিছু গড়ে ১৬'৫ গজ কাপড় ব্যবহার করিয়াছিল। উহার মধ্যে ৯'৭৮ গজ বিদেশ হইতে আমদানী হয়, ৩'৩৮ গজ ভারতের কাপড়ের

কল সমূহে উৎপন্ন হয় এবং ৩'৩৪ গজ ভারতের তাঁত সমূহে উৎপন্ন হয়। ১৯৩২-৩৩ সালে এই অবস্থায় সম্পূর্ণ উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। এই বৎসরে ভারতবর্ষের প্রতি ব্যক্তি মাথা পিছু গড়ে ১৬'১৭ গজ কাপড় ব্যবহার করিয়াছিল। উহার মধ্যে বিদেশী কল সমূহ ৩'৩৪ গজ, দেশী কল সমূহ ৮'৬৪ গজ এবং দেশী তাঁতসমূহ ৪'৭২ গজ কাপড় সরবরাহ করে। ১৯৩৩-৩৪ সালে মন্দার ফলে—ভারতে কম কাপড় ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই বৎসরের মাথা পিছু গড়ে ১৪'১৭ গজ কাপড়ের মধ্যে মাত্র ২'১৪ গজ বিদেশ হইতে আসিয়াছে এবং বাকী ১২'০৩ গজের মধ্যে ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহ ৮'০৩ গজ এবং তাঁত সমূহ ৪ গজ কাপড় সরবরাহ করিয়াছে।

উপরের বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ভারতে বর্ত্তমানে মোটামাটি যত কাপড় ব্যবহৃত হয় তাহার শতকরা ৫৭ ভাগ ভারতের কাপড়ের কল সমূহ এবং ২৮ ভাগ দেশী তাঁত সমূহে উৎপন্ন হয়। বাকী ১৫ ভাগ মাত্র ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী হয়। অবশ্য তাঁত সমূহে যে সূতা ব্যবহৃত হয় তাহারও কতকাংশ বিদেশ হইতে আমদানী হয়। কিন্তু একথা ঠিক যে ভারতবাসী তাহার বস্ত্রের যে প্রয়োজন আছে তাহার খুব কম অংশের জন্যই বিদেশীর মুখাপেক্ষী। একটু চেষ্টা করিলে এবং ভারতের কল ও তাঁত সমূহের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এবং একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইলে বাকী কাপড় অনায়াসেই ভারতীয় সূতায় ভারতীয় তাঁতসমূহে উৎপন্ন হইতে পারে। এজন্য খুব বেশী নূতন কাপড়ের কল স্থাপনেরও প্রয়োজন নাই। কারণ, বর্ত্তমানে ভারতে যে ৩১২টী কাপড়ের কল আছে তাহার কতক-গুলিতে প্রত্যহ ডুল দল কুলীর মারফতে অধিক সময়ে কাজ করিলে সমস্ত তাঁতের পক্ষে প্রয়োজনীয় সূতা ভারতীয় কল সমূহই দিতে পারে এবং ভারতীয় তাঁতীগণ ভারতবাসীর পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্ত্রের শতকরা ৪৩ ভাগই সরবরাহ করিতে পারে।

পূর্ব্বে বস্ত্রের ব্যাপারে ভারতবাসীর পক্ষে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে প্রধান এই একটি অন্তরায় ছিল যে ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহে সূক্ষ্ম সূতা তৈয়ার হইত না। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতের কাপড়ের কল সমূহে উৎপন্ন সূতার পরিমাণ যে বাড়িয়াছে সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম সূতা উৎপাদনের পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সম্পর্কে ১৯১৩-১৪ সালের অবস্থার সঙ্গে ১৯৩৩-৩৪ সালের অবস্থা তুলনা করিলে ভারতবর্ষের উন্নতি কত বেশী হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে। বিগত ১৯১৩-১৪ সালে ভারতবর্ষের কাপড়ের কল সমূহে ৬৮ কোটী ২৭ লক্ষ ৭৭ হাজার পাউণ্ড ওজনের সূতা প্রস্তুত হইয়াছিল এবং এই বৎসর বিদেশ হইতে ৪ কোটী ৪১ লক্ষ ৭১ হাজার পাউণ্ড ওজনের সূতা ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩২-৩৩ সালে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ১০১ কোটী ৬৪ লক্ষ ২২ হাজার পাউণ্ড সূতা তৈয়ার হয় এবং বিদেশ হইতে ৪ কোটী ৫১ লক্ষ ৩ হাজার পাউণ্ড সূতা আমদানী হয়। ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারতীয় কলসমূহে উৎপন্ন সূতার পরিমাণ কমিয়া ৯২ কোটী ১০ লক্ষ ৬১ হাজার পাউণ্ড হইয়াছে বটে, কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানী সূতার পরিমাণও কমিয়া ৩ কোটী ২০ লক্ষ ৫৫ হাজার পাউণ্ড হইয়াছে।

এই গেল উৎপাদন বৃদ্ধির হিসাব। সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুতের ব্যাপারে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি কি প্রকার কাজ করিতেছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

১৯১৩-১৪ সাল

বিদেশ হইতে আমদানী—

১-২০ নং		১২ লক্ষ ৫৪ হাজার পাঃ
২১-২৫ ,,		৮ ,, ৯৬ ,,
২৬-৩০ ,,		৩৬ ,, ৮৬ ,,
৩১-৪০ ,,	২ কোটী	৩৬ ,, ৫৭ ,,
৪০ এর উপর		৭৮ ,, ৫৯ ,,

ভারতীয় কলে প্রস্তুত—

১-২০ নম্বর	৪৯ কোটী	২৬ লক্ষ	৯৩ হাজার পাঃ
২১-২৫ ,,	১২ ,,	৩৯ ,,	৯৫ ,,
২৬-৩০ ,,	৪ ,,	২৯ ,,	৯৯ ,,
৩১-৪০ ,,	১ ,,	৯৭ ,,	৯২ ,,
৪০ এর উপব		২৬ ,,	৯৯ ,,

১৯৩৩-৩৪ সাল

বিদেশ হইতে আমদানী—

১-২০ নম্বর		৩ লক্ষ ২৭ হাজার পাঃ
২১-২৫ ,,		২ ৭ ,, ,,
২৬-৩০ ,,		৫ ,, ৮১ ,,
৩১-৪০ ,,	১ কোটি	৪২ ,, ১৮ ,,
৪০ এর উপর		৫৭ ,, ৯ ,,

ভারতীয় কলে উৎপন্ন—

১-২০ নম্বর	৫৪ কোটী	৭৪ লক্ষ	৩৯ হাঃ পাঃ
২১-২৫ নং	১৩ ,,	৯৩ ,,	৩১ ,,
২৬-৩০ ,,	১১ ,,	৫৪ ,,	৯৬ ,,
৩১-৪০ ,,	৭ ,,	৫৮ ,,	১০ ,,
৪০ এর উপর	৩ ,,	৭৩ ,,	৫৮ ,,

উপরের এই দুইটী তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে, সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুতের ব্যাপারে ভারতের কলগুলি কি প্রকার দ্রুত-গতিতে উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৯১৩-১৪ সালে ৩১ হইতে ৪০ নম্বরের যে পরিমাণ সূতা বিদেশ হইতে আমদানী হইত ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে তাহার ৬ ভাগের ৫ ভাগ সূতা উৎপন্ন হইত। ১৯৩৩-৩৪ সালে বিদেশ হইতে আমদানীর ৪ গুণ সূতা ভারতের কলগুলিতে উৎপন্ন হইয়াছে ১৯১৩-১৪ সালে ৪০ নম্বরের উপরের সূতা ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে বিদেশ হইতে আমদানীর তুলনায় এক তৃতীয়াংশ মাত্র উৎপন্ন হইত। সেই স্থলে বর্ত্তমান আমদানী অপেক্ষা ৭ গুণ বেশী সূতা ভারতীয় কল সমূহে উৎপন্ন হইতেছে।

এই সমস্ত ব্যাপার চিন্তা করিলে মনে হয় ভারতবাসীরপক্ষে বর্ত্তমানে যন্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হওয়া খুবই সহজ। কলওয়ালা, তাঁতী এবং দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ একটু সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে কাজ করিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

মানুষের 'লেলিহান লালসা' ও নারীর অবমাননা

গত ছয় বৎসরের নারীধর্ষণের ইতিহাস

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে বেঙ্গল কাউন্সিলে শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরীর প্রশ্নোত্তরে হোম মেম্বার মাননীয় শ্রীযুক্ত আর, এন রীড্, ১৯২৬ হইতে ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত বাংলায় নারীদের প্রতি যত অত্যাচার হইয়াছিল তাহার একটী বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন :—

কিশোরী বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন

(১) পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কি জানাইবেন, ১৯২৬— ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত কোন্ জেলায় কতটী নারীধর্ষণ হইয়াছিল।

(ক) নারীধর্ষণের সংখ্যা কত ?

(খ) অত্যাচারিতা নারীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ?

(গ) ও মুসলমানের সংখ্যা কত ?

(ঘ) কতটী ব্যাপারে আক্রমণকারী মুসলমান, এবং নারী হিন্দু ?

(ঙ) কতটী ব্যাপারে অত্যাচারী ও অত্যাচারিতা, উভয়েই মুসলমান ?

(চ) কতকগুলি ব্যাপারে আক্রমণকারীরা হিন্দু, এবং অত্যাচারিতা নারী মুসলমান ?

হোম মেম্বার তাঁহার বিবৃতিতে বলিতেছেন :—

(ক) নারীধর্ষণের সংখ্যা

বৎসর জেলা	১৯২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
১। বর্দ্ধমান	৬	১৩	৮	১০	৭	৭
২। বীরভূম	৭	২	৪	৯	১৫	৪
৩। বাঁকুড়া	৪	৩	৪	২	৫	৫
৪। মেদিনীপুর	২৮	১৪	১৩	২২	১৭	১৩
৫। হুগলী	২৬	২৭	২৮	৪৩	৩২	১৯
৬। হাবড়া	৪	১৬	৭	১৩	২৪	১৪
৭। ২৪ পরগণা	৭২	৬৯	৭৭	৬৪	৬৭	৫২

বৎসর	১৯২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
জেলা						
৮। নদীয়া	১২	১৬	২০	১৫	১৮	২১
৯। মুর্শিদাবাদ	১০	১৩	৩	৯	৭	১৭
১০। যশোহর	১৭	১৭	২১	২০	২৩	২৪
১১। খুলনা	১৫	২০	৯	২০	১৫	২৫
১২। ঢাকা	১৭	১১	৯	৯	১১	৬
১৩। ময়মনসিংহ	১৬৯	২০৭	১৮৮	২৫০	১৫৪	২০৪
১৪। ফরিদপুর	৫৫	৬২	৪৫	৫৯	৩৬	৩৪
১৫। বাখরগঞ্জ	১১৪	১২৪	১৭৮	১৬১	১৩০	১২৯
১৬। রাজশাহী	৯	১৩	১৫	১৯	২৫	২৪
১৭। দিনাজপুর	১৪	৮	১৫	২০	২৩	৩৭
১৮। জলপাইগুড়ী	১৮	১৪	২৬	২১	২১	২১
১৯। দার্জ্জিলিং	৭	৮	৪	৫	১০	৫
২০। রংপুর	৪১	৫৯	৫৫	৫৩	৬১	৭৩
২১। পাবনা	৩২	৩৫	৪৪	৩৭	২৭	৩০
২২। বগুড়া	১৪	১০	২৫	১১	৩৯	৩২
২৩। মালদহ	৩৫	১৫	২৮	২৯	১৪	১৮
২৪। চট্টগ্রাম	২০	৩৩	৩৮	৩৪	২৫	২৫
২৫। নোয়াখালী	৩	৬	১৩	১৪	৫	৫
২৬। ত্রিপুরা	১৪	১৬	৩১	২৪	২০	২১
২৭। কলিকাতা	৬৩	৮৪	৭১	৮০	৭৩	৭৫

(খ) অত্যাচারিতা হিন্দু নারী

পূর্ব্বোক্ত জেলা বিন্যাস

অনুসারে	১৯২৬,	'২৭,	'২৮,	'২৯,	'৩০,	'৩১,
১।	৪	১২	৬	৬	৭	৬
২।	৩	১	১	৫	৯	২
৩।	৪	১	২	—	৫	৫
৪।	২৫	১২	১১	২০	১৭	১১
৫।	২০	১৯	১৮	৩১	১৯	১৪
৬।	৩	১৪	৫	৮	২৩	১৪

পূর্ব্বোক্ত জেলা বিন্যাস

অনুসারে	১৯২৬,	'২৭,	'২৮,	'২৯,	'৩০,	'৩১,
৭।	৫২	৪৬	৫৭	৪৬	৪৩	৫৮
৮।	৯	৭	১৪	৮	৮	৭
৯।	২	৮	২	—	৬	৮
১০।	২	৮	৮	৪	১১	৯
১১।	৭	৬	৪	১০	৯	১৩
১২।	৫	৪	১	৪	৪	১
১৩।	২২	৩৫	২৮	৪৩	২৮	৪৪
১৪।	১৫	১৪	১১	১৩	৯	৭
বৎসর	১৯২৬,	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
১৫।	১৭	১৬	৯	১৯	২৫	১৫
১৬।	১	৩	...	১	২	২
১৭।	৭	২	৭	৮	৯	১৩
১৮।	১১	৮	১৪	১৪	১২	১৪
১৯।	৫	৬	৩	৩	৯	৪
২০।	১৫	১৫	১৩	২৩	২৩	১৮
২১।	৮	৮	১০	৯	৫	৬
২২।	৪	২	১০	৩	৮	৫
২৩।	২৩	৮	৮	১৬	৬	৬
২৪।	৪	৫	৪	১০	৮	৪
২৫।	...	১	৩	...	...	...
২৬।	২	২	১২	৪	৪	৬
২৭।	৫২	৬৩	৪৯	৫৯	৫৩	৫৫

(গ) অত্যাচারিতা মুসলমান নারী

পূর্ব্বোক্ত জেলা বিন্যাস

অনুসারে	১৯২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
১।	২	১	১	৪	...	১
২।	৪	১	৩	৪	৬	২
৩।	...	২	২	২	...	...
৪।	৩	২	২	২	...	২

পূর্ব্বোক্ত জেলা বিন্যাস অনুসারে	১৯২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
৫।	৬	৮	১০	১২	১৩	৫
৬।	১	২	১	৫	১	...
৭।	২০	২৩	২৬	১৮	২৪	১৪
৮।	৩	৯	৬	৭	১০	১৪
৯।	৮	৫	১	৯	১	৮
১০।	১৫	৯	১৩	১৬	১২	১৫
১১।	৮	১৪	৫	১০	৬	১২
১২।	১২	৭	৮	৫	৭	৫
১৩।	১৪৭	১৭২	১৬০	২০৭	১২৬	১৬০
১৪।	৩৯	৪৮	৩৪	৪৭	২৭	২৭
১৫।	৯৩	১০১	১৫৯	১৩৯	১০৪	১১১
১৬।	৪	৭	১১	১০	২১	২২
১৭।	৭	৬	৮	১২	১৪	২৪
১৮।	৭	৬	১২	৭	৯	৭
১৯।	২	২	১	২	১	১
২০।	২৬	৪৪	৪২	২০	৩৩	৪৫
২১।	২৪	২৭	৩৪	২৮	২২	২৪
২২।	১০	৮	১৫	৮	৩১	১৭
২৩।	১২	৭	২০	১৩	৮	৭
২৪।	১৬	২৮	৩৪	২৪	১৭	২১
২৫।	৩	৪	১০	১৪	৫	৫
২৬।	১২	১৪	১৯	২০	১৬	১৫
২৭।	১০	২০	১৯	১৯	১৮	১৭

(ঘ) মুসলমান অত্যাচারী ও হিন্দু নারী

পূর্ব্বোক্ত জেলা বিন্যাস অনুসারে	১৯২৬,	'২৭,	'২৮,	'২৯,	'৩০,	'৩১,
১।	—	—	১	১	—	১
২।	—	—	—	—	২	—
৩।	—	—	—	—	২	—
৪।	৫	—	১	—	১	১

পূর্ব্বোক্ত জেলা বিন্যাস অনুসারে	১৯২৬,	'২৭,	'২৮,	'২৯,	'৩০,	'৩১,
৫।	—	১	—	—	৩	১
৬।	—	১	১	—	২	০
৭।	১৩	১১	১২	১৮	১৬	১১
৮।	৩	—	৭	৬	৪	৩
৯।	—	—	—	—	—	৪
১০।	১	২	৪	৩	৬	৬
১১।	৭	৪	৪	৫	৩	৫
১২।	২	১	—	২	—	—
১৩।	১৪	২৩	১৬	২০	১৩	২১
১৪।	১০	৩	৭	৫	২	৩
১৫।	৮	১৫	৪	৫	১০	৬
১৬।	—	৩	—	১	১	১
১৭।	৬	—	২	২	২	৩
১৮।	১	—	২	১	৩	১
১৯।	—	১	১	—	—	১
২০।	৩	৪	৭	৮	৭	৯
২১।	৬	৩	৬	৫	১	১
২২।	২	১	৮	৩	৫	২
২৩।	৬	৩	—	—	—	—
২৪।	—	—	১	২	৩	—
২৫।	—	২	—	—	—	—
২৬।	—	—	২	—	—	১
২৭।	২৬	৪৪	১৯	২৭	২২	৩৯

(ঙ) অত্যাচারী ও অত্যাচারিতা মুসলমান

১৯২৬,	'২৭,	'২৮'	'২৯,	'৩০,	'৩১,
৪৮০	৫৬৮	৬৫৩	৬৫৩	৫২৬	৫৬৪

হিন্দু আক্রমণকারী ও মুসলমান নারী

১৯২৬,	'২৭,	'২৮,	'২৯,	'৩০,	'৩১,
৯	৩	১০	৮	৬	৮

ইতালীর বর্ত্তমান অবস্থা

আবিসিনিয়ার অধিবাসী দুর্দ্ধর্ষ হাব্‌সীদিগকে পরাস্ত করিয়া ইতালী ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে। মেডিটেরেনিয়ান বা ভূমধ্য সাগরে ইংরাজের এতকাল ধরিয়া যে অবাধ প্রভুত্ব ছিল তাহা খর্ব্ব করিবার জন্য ইতালী উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে এবং আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ড হইতে হাব্‌সীদিগকে নানারূপ সাহায্য করায় এবং শেষে রাজাকে আশ্রয় দান করায় ইতালী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার সাহস বা স্পর্দ্ধা না দেখাইলেও নানারূপে ইংল্যাণ্ডকে যেরূপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং অপমানজনক উক্তি করিয়াছে তাহাতে এই দুই শক্তির মধ্যে যুদ্ধ না বাধিলেও পরস্পরের মনোভাব যে যুদ্ধ বাধার মত এবং বাগে পাইলে এ উহাকে যে একেবারে পিষিয়া মারিয়া ফেলে এবিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

ইংল্যাণ্ড প্যালেষ্টাইনের ইহুদীদিগের পক্ষাবলম্বন করায় সমগ্র আরব জাতি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাইতেছে। এই সুযোগে ইতালী আরবীয়দিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া ইংল্যাণ্ডের ক্ষতিজনক নানা কাজ করিতেছে এবং ভূমধ্যসাগরের পথ ইংল্যাণ্ডের পক্ষে বিপজ্জনক করিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। সুয়েজ খালের মুখে এশিয়ার উপকূলে ইতালী তাহার এক ঘাঁটী নির্ম্মাণ করিয়াছে। স্পেনের অন্তর্বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া ইতালী, এবং তাহার নূতন মিত্র জার্ম্মাণী স্পেনের বর্ত্তমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে সৈন্য দিয়া, রসদ জোগাইয়া এবং নানারূপ যুদ্ধোপকরণ জোগাইয়া বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিতেছে; অথচ ইংল্যাণ্ড স্পেনের রাজকীয় সৈন্যদের রসদ জোগাইতে গেলে ইহারা বাধা দিতেছে।

এই উপলক্ষে অনেকে সন্দেহ করেন যে, ভূমধ্যসাগরের মধ্যে নানাস্থানে ইতালী মাইন্ পাতিয়া রাখিয়াছে এই সকল নানাদিকের লক্ষণ দেখিয়া আবার একটা মহাযুদ্ধের আতঙ্কে পৃথিবীর নরনারী শিহরিয়া উঠিতেছে। আমরা তাই আজ ইতালীর বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিলাম।

ইতালীর জনসংখ্যা প্রতিবৎসরই বাড়িতেছে। নিম্নের তালিকা তাহা প্রতিপন্ন করিবে।

বৎসর ১লা জানুয়ারী	জনসংখ্যা	বৎসরে শতকরা বৃদ্ধি
১৯২৬	৩,৯৩,৪৯,০০০	০·৮৪৬
১৯২৮	৪,০০,৫৪,০০০	০·৯৪০
১৯২৯	৪,০৪,৪৫,০০০	০·৯৭৬
১৯৩০	৪,০৭,৫৯,০০০	০·৭৭৬
১৯৩১	৪,১১,৭৬,৬৭১	০·৭৬৮
১৯৩৩	৪,:৮০৬,০০০	০·৮৬৭
১৯৩৪	৪,২২,১৭,০০০	০·৯৮৩
১৯৩৫	৪,২৬,২১,০০০	০·৯৫৬

ইতালী মোটেই স্বসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী নহে। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া এই ক্রমবর্দ্ধমান জনোচ্ছ্বাসকে ধারণ করিবার ও ভরণপোষণ করিবার শক্তি, ফ্রান্স, স্পেন, অথবা জার্ম্মাণীর অর্দ্ধেক পরিমাণ বিশিষ্ট এবং প্রাথমিক কাঁচামাল-বিরহিত-ইতালীর নাই। ইতালীয়গণ স্বদেশে একরকম বন্দী অবস্থায় আছে। ইতালী বদ্ধসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সমুদ্রের যাবতীয় নির্গম-পথ পররাজ্যাধিকৃত।

১৯৩১ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখের সেন্সাস্ অনুসারে—সমগ্র ইতালী রাজ্যের আয়তন—১,১৯,৭১৩ বর্গমাইল। জনসংখ্যা—৪,১১,৭৬,৬৭১। প্রতিবর্গ মাইলে গড়ে লোকসংখ্যা—৩৪৪'০।

তাই ইতালীকে প্রতিবৎসর বহুলোক স্বদেশ হইতে নিষ্কাশিত করিতে হয়। ইতালী হইতে—

১৯৩০ সালে—২,৮০,০৯৭ জন,

১৯৩১ „ —১,৬৫,৮৬৪ „

১৯৩২ „ —৮৩,৩০৯ „

১৯৩৩ „ —১,৯৪,৭৭২ „

এবং ১৯৩৪ „ —১,৭৫,৭৪০ জন লোক বিদেশে গমন করিয়াছিল। ১৯৩৪ সালে ইতালী হইতে ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশে গমন করিয়াছিল ১,৪২,১৫৮ জন এবং ইয়ুরোপের বাহিরে বিভিন্নদেশে গিয়াছিল ৩৩,৫৮২ জন। মোটের উপর ৯৬,০০,০০০ জন ইতালীয় ইতালীর বাহিরে আছে, তন্মধ্যে গ্রেটব্রিটেনে আছে ২৯,০০০ জন এবং মিশরে আছে প্রায় ৭০,০০০ জন। অবশ্য বর্ত্তমান আবিসিনিয়া যুদ্ধোপলক্ষে যাহারা আফ্রিকায় প্রেরিত হইয়াছে তাহাদিগকে যে এই সংখ্যাভুক্ত করা হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

ইতালীতে আছে ৭,৬৬,৩৭,৮৭৭ একর ভূমি। তন্মধ্যে কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত আছে—৭,০২,৯৪,৬৪০ একর ভূমি। এই ভূমি প্রধানতঃ নিযুক্ত ভাবে নিযুক্ত আছে (১৯৩৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর):—

খাদ্যশস্য (Cereals) উৎপাদনে—১,৭৯,৬৬,৬৪১

শুঁটী, কলাই ইত্যাদি (Leguminous plants) উৎপাদনে—২৩,০৭,৯১৪ শাকসব্জি—১২,৮৪,৯২০

উপকরণ (Industrial plants) উৎপাদনে—৪,৪২,৩০৯

আঙ্গুর গাছ— উৎপাদনে—২৪,৩৬,৪০৬

জলপাই গাছ (olive tree) „—১৯,৯১,৬২৬

কাঠ ও বন (আরণ্য ভূমি) „—১,৩৭,৪১,২৩১

গবাশ্বাদির ঘাস— „—১,২১,৮৪,৫০১

কৃষিভূমির অধিকতর বিস্তার আর সম্ভবপর নহে। কৃষিবিজ্ঞানের চরমোৎপাদক—শক্তিকে কাজে খাটানো হইতেছে। তবুও ইতালীর উৎপন্ন ফসলের প্রকার ও পরিমাণ শিল্পনির্ম্মাণ ও অধিবাসীদের শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

ইতালীর প্রধান প্রধান ফসল হইতেছে—গম, যব, জই (oats) রাই, ভুট্টা, চাউল, শিম বা বরবটী, আলু, বীটচিনি, আঙ্গুর ও জলপাই।

ইয়ুরোপে ও আমেরিকায় এক এক জন সম্বৎসরে গড়ে ৩২০ পাউণ্ড্ অর্থাৎ ৪ মণ খাদ্য খায়। জাপানে প্রতিজন লোকের সাম্বৎসরিক গড় আহার ৩২৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪ মণের উপর। আর ভারতবাসী জনপ্রতি গড়ে বৎসরে ১৮৯১—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে খাইত ২৮৪ পাউণ্ড্ অর্থাৎ ৩ মণ ২২ সের।

১৯৩০ সালের ১৯শে মার্চ্চ তারিখের কৃষি-সেন্সস অনুসারে ৪১,১৪,১১৬ টি ফার্ম্ম্ কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত ছিল। ৬০,৮৮,০৮৮ জন পুরুষ ও ২৭,০৪,৩৪৯ জন স্ত্রীলোকের প্রধান উপজীবিকা এবং ১২,০৭,৮৫০ জন পুরুষ ও ২৯,৩৮,৯১২ জন স্ত্রীলোকের গৌণ উপজীবিকা ছিল কৃষি।

ইটালীর পশু সম্পদ—১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ

ঘোড়া—৯,৭৩,৯৭৮ গরু—৭০,১২,৮৭৭

গাধা—৮,৬৯,৭৮১ শূকর শাবক—৩২,৬৪,৫৭২

খচ্চর—৪,৫৫,২৩৪ ভেড়া—১,০০,৯৩,৩৭০

মহিষ—১৫,৬৩৯ ছাগ—১৮,৪৬,০৭৫

ইতালীর খনিজ সম্পদ

ইতালীর প্রধান প্রধান খনিজ ধাতু হইতেছে-লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, তাম্র, দস্তা, সীসা, সোনা, রসাঞ্জন (antimony), পারদ, লৌহ ও তাম্রবং মাক্ষিক (iron and cupreous pyrites), খনিজ ইন্ধন, গন্ধক, শিলাজতু ও মেটে তৈলজাতীয় পদার্থ, এবং বোরিক্ এসিড্।

১৯৩৩ সালে ইতালীতে ৫৮১টি খনি কাজ, করিয়াছিল। এই সকল খনি হইতে ১৯,২৮০১,০০০ লিয়ার (Lire) মূল্যের ধাতু উত্তোলিত হইয়াছিল এবং এই গুলিতে কাজ করিয়াছিল ৩২,৩২০ জন শ্রমিক।

ইতালীর লৌহ সম্পদ

১৯৩৩

	মেট্রিক টন্‌স্
অবিশুদ্ধ লৌহ (Pig Iron)	৫,১৭,০৭
র ষ্টীল (Raw Steel)	১৭,৮৩,৬৫০
রোল্ড ষ্টীল (Rolled Steel)	১৪,৯৮,২৩৪

এবং ১৯৩৪ সনে হইতেছে যথাক্রমে—৫২০,৫৪৯ ১৮,৪৩,৫৩৪,১৫,৮০, ২৭০।

(১ মেট্রিক টন্ ২২০৪ পাউণ্ডস্, অথবা ১০১৬ মেট্রিক টনস্ = ১০০০ ইংলিশ টনস্)।

কাজেই দেখা যাইতেছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ইতালীও যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামের ব্যাপারে স্বাবলম্বী নহে। প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপ-করণের মধ্যে ইতালীতে লৌহ ব্যতীত অন্যান্য ধাতুর এবং ইস্পাত, কয়লা ও তৈলের একান্ত অভাব।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ইতালীতে ৯,৩৯৭টি প্রস্তর খনি (quarries) কাজ করিয়াছিল। তাতে ৮৮,৫৪৬ জন লোক নিযুক্ত ছিল। এই গুলি হইতে ৩১,১৪,১৯,০০০ লিয়ার মূল্যের ইমারতের ও সাজের পাথর উত্তোলিত হইয়াছিল।

(ইতালীর পেপার লিয়ারের মান মূল্য—৯২·৪৬ পেপার লিয়ার—১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং এর সমান, অথবা ১৯ পেপার লিয়ার—১ ডলারের সমান, অথবা ৩৬৬ পেপার লিয়ার—১০০ গোল্ড লিয়ারের সমান। বর্ত্তমানে ৬॥ লিয়ার আমাদের দেশের এক টাকার সমান)।

ইতালির শিল্প সমৃদ্ধি

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবরের শিল্প সেন্‌সাস্ অনুসারে দেখা যায়, ইতালীতে ঐ সময়ে মোট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা ছিল ৭,৩২,১০৯টি, এবং এই শিল্প-প্রতিষ্ঠান গুলিতে কাজ করিয়াছিল ৪০,০৫,৭৯০ জন শ্রমিক। তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ছিল ১০,০৯,৮৯০ জন।

শিল্পের মধ্যে ইতালীতে বয়ন-শিল্প প্রধান। বয়ন-শিল্পের কারখানা ঐ সময়ে ছিল ১০,৪০৬টি এবং তাতে কাজ করিয়াছিল ৬,৪২,৮৮৭ জন শ্রমিক। কার্পাস-শিল্পে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে ৫৩,৭৮,৩৮০টি টেকো নিযুক্ত ছিল।

ইতালীতে উৎপাদিত রেশমের পরিমাণ

১৯৩২	১৯৩৩
২,৯৬৫	৩,২৮৪

(Rayon) নকল রেশম উৎপাদিত হইয়াছিল ১৯৩৩ সালে ৩৭,২৯৩ মেট্রিক টন্‌স্।

চিনের উৎপাদন

খৃষ্টাব্দ	মেট্রিক টন্‌স্
১৯১৩-১৪	২,৬৯,৯৪৬
১৯২৭-২৮	২,৫৪,৯৫৪
১৯২৮-২৯	৩,৫৩,৪৫৮
১৯২৯-৩০	৪,০৫,০৮১
১৯৩০-৩১	৩,৮৭'৭৪৭
১৯৩১-৩২	৩,৪৫,৩৮৪
১৯৩৩-৩৪	২'৭৪,০৪৩

পণিবও ইতালীর অন্যতম প্রধান শিল্পের মধ্যে পরিগণিত

ইতালী তাহার উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে কাজ দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। বেকার সমস্যা সেখানে গুরুতর। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বেকারের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষের উপর। তন্মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষের অধিক লোককে যুদ্ধের কাজে টানিয়া লওয়ার পর বিগত জন মাসে বেকারের সংখ্যা ছিল ৬,৩৮,১০০।

ইতালীর বহির্ব্বাণিজ্য

ইতালীর বহির্ব্বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইতালীর পরনির্ভরতা বিশেষ ভাবে প্রকট হইবে। ইতালী আত্ম-গরজ পরিচালিত হইয়া এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। আজ যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘের শক্তিপুঞ্জ তাহাদের প্রস্তাবিত অর্থ-নৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রকৃতই অবলম্বন করে তবে ইতালীর যে নিদারুণ দুর্দ্দশা ঘটিবে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মনে ত হয় না যে কেহ ইটালীকে ঘাটাইতে সাহস করিবে।

ইতালীর ৫ বৎসরের বহির্ব্বাণিজ্য

আমদানি (মূল্যবান ধাতু বাদে অন্য পণ্য)

(মিলিয়ন পেপার লিয়ার)

১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪
১৭৩৪৬'৬	১১৬৪৮'১	৮২৫৭'৪	৭৪১২'৭	৭৬৬৪'৭

রপ্তানি (মূল্যবান ধাতু বাদে অন্য পণ্য

১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪
১২১১৯'২	১০২০৯'৫	৬৮১১'২	৫৯৭৯'৭	৫২৩'১৫

স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানী

৯,০২,৪২,০০০ লিয়ার—১৩৩,৮৩,০০,০০০ লিয়ার

স্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানি

১,৪৮,৭৪,০০০ লিয়ার—৭৫১,০০,০০০ লিয়ার

ইতালীর রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বেশী। এই অবস্থা একটা জাতির অর্থ-নৈতিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। ইতালীর বহির্ব্বাণিজ্যও দিন দিনই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে।

১৯৩৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইতালীর বাণিজ্য পোত বহর ১,১৪০,০০ মেট্রিকটন্‌স্ বাহী ২,২৯৯টি পাইল চালিত জাহাজ এবং ১৭,৮২,৩০০ মেট্রিকটন্‌স বাহী ১,২০৮ টি বাষ্পীয় পোত ও মোটর জাহাজ দ্বারা গঠিত ছিল।

এই ত ইতালীর সম্পদ! এই সম্পদ লইয়া ইতালী শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ের গুরু বোঝা বহন করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে কি?

এ দেশের কৃষকদের দুরবস্থার অন্ত নেই। তাদের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যেরও অবনতি ঘটছে। অপরাপর দেশে যখন সকল বিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্যেরও উন্নতি ঘটল, আমাদের দেশ তখনও সেই পুরাতন পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে কৃষিক্ষেত্রে এক যুগ পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। এ সম্বন্ধে কোন সংস্কার সাধনের কথা তুললে কৃষকেরা তাতে কর্ণপাত করবে না, এমনি তাদের গতানুগতিকতার মোহ! তাদের শিক্ষার মোটেই বালাই নেই, সুতরাং তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বোঝেও না, বুঝতেও চায় না। আমাদের দেশের বাজার, ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ব-বাজারেরই অঙ্গীভূত, একথা তাদের না জানা থাকার দরুণ অনেক বিষয়ে তারা প্রতারিত হয়। এ সমস্ত বিষয়ের হাত থেকে বাঁচবার উপায় চিন্তা না করলে কৃষিকার্য্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

শুধু তাই নয়, এই কৃষিকার্য্যের সঙ্গে আমাদের দেশের অন্যান্য বিষয় জড়িত। যে দেশের অধিবাসীর অধিকাংশই কৃষক-সে দেশে কৃষকদের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর ব্যবসা বাণিজ্যেরও উন্নতি নির্ণীত হয়। গত কয়েক বছরে কৃষিজাত দ্রব্যের দর বহু পরিমাণে কমে গেছে এবং এই জন্যই কৃষকদের অবস্থা এত সঙ্কটময়। সুতরাং এই কৃষিজাত দ্রব্যের দর বৃদ্ধি অর্থাৎ চাষীরা যাতে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বেশী দামে বিক্রয় করতে পারে সে বিষয়ে নজর দেওয়া প্রথমে প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধে এ সম্পর্কে কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার সম্বন্ধে আলোচনাও এসে পড়ে। সে বিষয়ে আমরা কিছু বিশ্লেষণ করব।

এ সম্বন্ধে একটা বিষয় প্রথমেই চোখে পড়ে যে চাষীদের উৎপন্ন দ্রব্য একেবারে সোজাসুজি বাজারে আসতে পায় না, ব্যাপারী, আড়ৎদার, দালাল প্রভৃতি অনেক মধ্যবর্ত্তী লোকের মধ্য দিয়ে তা' হাতফিরি হয়। এতে করে ঐ সমস্ত লোক বেশ দু'পয়সা করে নেয়, ফলে দরের দিক দিয়ে চাষীরা হয় ক্ষতিগ্রস্ত। চাষীদের কিন্তু একথা বোঝাতে গেলে সহজে তারা বলবে যে, ও রকম চিরকাল হয়ে আসছে,

ঐ রকমই চলবে। অথচ একদল বলেন যে, কোন উপায়ে এ ব্যবস্থাকে যদি বদলে দেওয়া যায় ত চাষীরা বেশ লাভবান্ হ'তে পারে। তাদের লাভবান্ হওয়া মানেই হ'ল তাদের হাতে ক্রয়-ক্ষমতা আসা। তাহ'লে অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্যও ভাল চলতে পারে।

কেন্দ্রীকরণের চেয়ে পৃথকীকরণই হ'ল ভারতীয় কৃষিকার্য্যের একটা প্রধান অঙ্গ। একজন ভারতীয় চাষী তার যতটুকু জমিই থাকুক না কেন, সেইটুকুর মধ্যে সে একটা ফসলের পরিবর্ত্তে দু'চার রকম ফসল লাগাবে। এর একমাত্র কারণ হল, ভারতীয় চাষী তার বাপ-পিতামহকে যা করতে দেখেছে, একটা অন্ধ গোঁড়ামী নিয়ে ঠিক তাই করবে, যুগোপযোগী, কালোপযোগী বৃহৎ উৎপাদন পন্থার দিকে সে এতটুকু মনোনিবেশ করবে না। তা' ছাড়া একটা বিশেষ জিনিসে তার মন ওঠে না, সব ফুলে সাজি ভরবার তার একটা চমৎকার স্পৃহা আছে!

এখন তার সামান্য কয়েক বিঘা জমিকে বিভিন্ন ফসলে টুক্‌রো টুক্‌রো করবার এই যে প্রবৃত্তি, এতে করে তার মাল বিক্রয়ের বাজারে অসুবিধা ঘটে! ৪০ বিঘা জমি সমেত একজন কৃষক যদি তার সারা জমিতে কেবল মাত্র একটা ফসলই লাগিয়ে দেয়, তাহ'লে তা' থেকে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হ'বে তা' ভালভাবেই খদ্দের টানতে পারবে, কেননা, ক্রেতা পাঁচ যায়গায় ঘোরার কষ্ট স্বীকার না করে এক যায়গা থেকেই বেশী জিনিস কিনবে এবং তার জন্যে ভাল দামও দেবে। কিন্তু তার বদলে
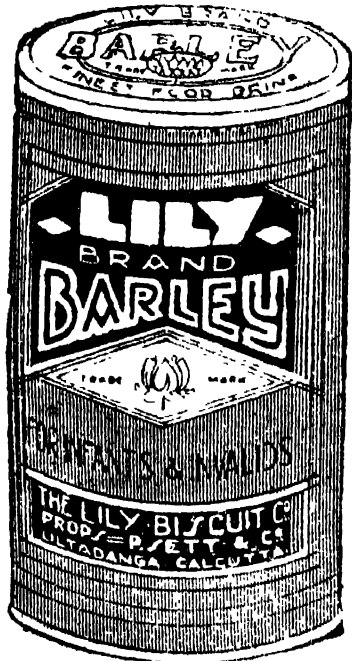
সে যদি তার জমিতে নানা রকম ফসল লাগায়, তবে তদুৎপন্ন বিভিন্ন খুচরো শস্য কিনতে সহজে কেউ আসবে না এবং তজ্জন্য সে ভাল দামও পাবে না। এর চেয়ে কম জমি যার আছে তার ত আরও কাহিল অবস্থা।

বিপদের মাত্রা তাদের আরও বেশী যাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়, আর আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকেরই ত আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল। ধরা যাক্ একজন গরীব কৃষক, জমির উৎপন্ন ফসলের মধ্যে কিছুটা সে নিজে পেটে খাবে, কিছুটা বিক্রী করে খাজনা ইত্যাদি অন্যান্য খরচ চালাবে। ধরা যাক্ না কেন, যারা তুলো চাষ করে, তারা তুলো বিক্রয় করে খাজনা ইত্যাদির খরচ জোগায়। ১৯৩৪ সালে আগ্রার নিকটবর্ত্তী যায়গা সমূহে তুলো এত কম উৎপন্ন হয়েছিল, এবং তার দাম এত নেমে গেছল যে তা' বিক্রী করে চাষাদের খরচের মূল্য কিছুই ওঠেনি। সুতরাং সেখানকার অধিকাংশ গরীব কৃষক পেটের খোরাকীর জন্য যে ফসল রেখেছিল, তা' বিক্রী করতে বাধ্য হয়। অথচ যারা অবস্থাপন্ন কৃষক তারা এ বছরের মাল চেপে রেখে সঞ্চিত অন্য শস্যের মধ্যে খানিকটা বিক্রয় করে সমস্ত খরচ পূরণ করে। এতে তাদের এই সুবিধে হ'ল যে, বিক্রীর জিনিসের দর ততটা নেমে গেল না। এর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, যে চাষীর জমি যত কম এবং সেই কম জমিতে যে আবার বেশী রকমের ফসল লাগায়, অজন্মার সময় সেই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এইবার দেখা যাক্ কী ভাবে চাষীদের উৎপন্ন শস্য বিক্রয় হয়? সে পদ্ধতি জানা থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করার সুবিধা হ'বে।

চাষীদের ফসল প্রথমে গ্রাম্য ব্যাপারীদের হাতে গিয়ে পড়ে। ব্যাপারীরা বেশ একটু অবস্থাপন্ন, এটা তাদের জাত ব্যবসা নয়, তারা অন্য কাজ করে। সুতরাং বাজারে তাদের একটু খাতির আছে, এবং ফসল কেনবার সময় নিজে অর্থ ছাড়াও দরকার হ'লে অন্যত্র হ'তে তারা ধারও পায়। ফসল কাটবার ঠিক সময়টিতে তাদের দুটো দিকে লক্ষ্য থাকে,—একটি হচ্ছে যে চাষীদের ফসলের পরিমাণ ও গুণাগুণ কি রকম, অপরটি হচ্ছে যে, সহরে সেই সময়ে ফসলের দর কি রকম যাচ্ছে, কেননা, সেই দেখেই তাকে উপস্থিত ফসলের দর ঠিক করতে হ'বে। সাধারণতঃ তারা এক কথায় চাষীদের মাল কিনতে রাজী হয় না তাদের খানিকটা 'হাঁ—না' করে ভোগায় এবং ইতিমধ্যে দেখে নেয় যে সহরের বাজার দরের ওঠা-নামা বন্ধ হ'ল কিনা। ব্যাপারীদের মাল ক্রয়ের এই বিলম্বের জন্য চাষীদের বেশ অসুবিধা হয় এবং চাষীরা এর জন্য ব্যাপারীদের দোষী করে। অনেক সময় দেখা গেছে যে, ব্যাপারীদের এই বিলম্বের জন্য বিরক্ত হয়ে চাষীরা নিজে নিজেই তাদের মাল বিক্রীর চেষ্টা করতে থাকে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, চাষীরা ফসল কাটা হ'লেই তা বিক্রী করবার যত চেষ্টাই করুক না কেন, সহজে তা পারে না এবং টাকাও শীঘ্র শীঘ্র হাতে পায় না। অনেক সময় ব্যাপারীরা আবার মাল ক্রয়ের এক মাস পরে মূল্য প্রদান করে। আবার দর যখন নামার দিকে তখন ত ব্যাপারীদের আর কথাই নেই, চাষীদেরই তখন 'গরজ বড় বালাই'। তারা তখন মালের নমুনা নিয়ে

ব্যাপারীদের আড্ডায় ঘুরে বেড়ায়, এবং সাধারণতঃ সহরের বাজার দরের চেয়ে কিছু কমে মাল ছেড়ে দেয়। এতে করে ব্যাপারীদের বেশ সুবিধে হয়, কেননা, সহরের বাজারে যদি দর কমে যায় ত তাহ'লে ব্যাপারীদের বেশী ক্ষতি হয় না।

আবার দর যখন উঠার দিকে থাকে তখন ব্যাপারীদের গরজ বেশী, কেননা, তারা তখন তাড়াতাড়ি মাল কিনে রাখতে পারলে বাঁচে। এক্ষেত্রে তারা প্রতি সন্ধ্যায় চাষাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের ফসলের নমুনা দেখে তখনি দর দস্তুর করে মাল কেনবার ব্যবস্থা করে। অধিকাংশ চাষীই রাজী হয়, কেননা, তাদের প্রচণ্ড অর্থাভাব। কিন্তু যারা একটু অবস্থাপন্ন এবং যাদের খাজনা ইত্যাদি মেটাবার মত টাকা মজুত আছে, তারা তাদের মাল চেপে রাখে এই আশায় যে পরে, আরও দর চড়লে তারা বেশী লাভবান্ হবে। যাই হোক, এ সময়ে অবস্থা চাষীদের অনুকূলে।

উক্ত দর দস্তরের দিন দুই পরে ব্যাপারীর গাড়ী এসে চাষীদের বাড়ী থেকে মাল উঠিয়ে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে চাষীদের এক পয়সা খরচ হয় না। গাড়ী ভাড়া লাগে ব্যাপারীর; কিন্তু এটুকুর জন্য ব্যাপারী আগে থেকেই চল্‌তি দর অপেক্ষা মূল্য কিছু কম ঠিক করে সেটা পুষিয়ে নিয়েছে।

এই মাল বিক্রয়ের ব্যাপারে কৃষকদের অবাধ স্বাধীনতা। একজন ব্যাপারীকে পূর্ব্বে বিক্রয় করেছে ব'লে যে তাকে বরাবরই বিক্রয় করিতে হ'বে এমন কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই, যদিও সেই ব্যাপারীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আছে। সে যার কাছে উচ্চ দর পায় তাকেই সে তার ফসল বিক্রী করে। সুতরাং সেই জন্যই বাইরের লোকও এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, এবং পুরাতন ব্যাপারীর ব্যবসা কেড়ে নেয়। স্থানীয় ব্যাপারীদের পরেই এই সমস্ত উড়ো-ক্রেতাদের স্থান। তারা তাদের বলদ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, এ চাষীর নিকট হ'তে কিছু, ও চাষীর কাছ থেকে খানিকটা ফসল কেনে; এবং তারপরে সেগুলো আবার নিকটস্থ হাট কিংবা বাজারে বেচে অন্য যায়গার উদ্দেশে বেরোয়। গরুর গাড়ীর চেয়ে যেহেতু তারা বলদ নিয়ে বেরোয়, এবং যেহেতু তারা সহরের বাজারের চেয়ে গ্রামের কিনারায়ই ব্যবসায় আরম্ভ করে। সেই হেতু সাধারণ চাষীদের কাছে তাদের খুব খাতির। পক্ষান্তরে, খুচরো খুচরো সামান্য পরিমাণ কেনার দরুণ তারাও খুব কম দামে কিনতে পায়, বিশেষতঃ সে সব স্থানে যদি ব্যাপারীদের প্রতিযোগিতা না থাকে তবে ত আর কথাই নাই।

কেউ কেউ এই ভেবে আশ্চর্য্য হন যে, কৃষকদের এই মাল বিক্রয় ব্যাপারটা এখনো ব্যাপারীদের হাত থেকে অযথা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে, অথচ এদের হাত থেকে বিক্রয় ব্যাপারটা নিজেদের হাতে নেওয়ার চেষ্টা তারা কিছুতেই করছে না! এর জবাব কেউ কেউ দেন এই বলে যে, সাধারণ চাষীরা বাজারের ব্যাপার সম্পর্কে কিছু বোঝে না। তা' ছাড়া পুলিশের ভয় ও অন্যান্য আশঙ্কাও তাদের আছে। গরুর গাড়ীও সব চাষীর থাকে না। সব চেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে, প্রচলিত সব জিনিষের প্রতি তাদের একটা অন্ধ গোঁড়ামি আছে, সেইজন্যই তাদের বাপ পিতামহ যা' করে গেছে সেই পথই তারা অনুসরণ করে; তা' থেকে এতটুকু বিচ্যুত হ'তে চায় না। তারা সোজা জবাব দেয়, "আমাদের বাপ ঠাকুর্দ্দা যখন বাজারে গিয়ে ফসল বিক্রী করেনি, ব্যাপারীরাই যখন তা' করছে, তখন কেন আমরা তা' করতে যাব।" তাদের একমাত্র আশঙ্কা যে পৈতৃক পেশা যেন নষ্ট না হয়। কিন্তু এর জবাবে বলা যায় যে, শস্য বিক্রয়ের সঙ্গে পৈতৃক পেশার কোন সম্পর্কই নেই। বিক্রয়ের ব্যাপারটা সে হাতে নিচ্ছে বলে তাকে ত আর চাষের কাজ ছাড়তে হচ্ছে না। এবিষয়ে অনেক বিশেষজ্ঞের মত যে, শ্রম-বিভাগের (Division of labour) আইডিয়াটাও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে চাষের কাজ করছে, সে চাষের কাজই করুক,—যে বিক্রয়ের কাজ করছে সে বিক্রয়ের কাজই করুক। কিন্তু এর জবাব কেউ কেউ এই বলে দেন যে, অপরাপর দেশের কৃষিকার্য্যের ব্যাপারে দেখা গেছে যে, শ্রম-বিভাগের চেয়ে শ্রমসংযোগটাই সময় সময় বেশী কার্য্যকরী। তা' ছাড়া ব্যাপারীর কাজটা সারা বছরের একটা পেশাও নয়, এবং এতে কোন বিশেষ জ্ঞানেরও দরকার হয় না। সুতরাং চাষীরা যদি একাজটা নিজেদের হাতে নিয়ে লাভবান্ হয় ত' তাতে ক্ষতি কি?

ব্যাপারী ও উড়োক্রেতা ছাড়া চাষীদের মাল বিক্রয়ের আর একটা যায়গা আছে, সেটা হচ্ছে, গ্রামের হাট। সমস্ত বড় বড় গ্রামেই সপ্তাহে দু'বার করে হাট বসে, সে হাটে খাবার জিনিস

থেকে প্রসাধন দ্রব্য ও ছেলেদের খেলনা পর্য্যন্ত সবই বিক্রয় হয়। এখানে সেই উড়ো-ব্যাপারীরা গরুর পিঠে মাল বোঝাই দিয়ে তা' বিক্রীর জন্য আনে, ছোট খাটো চাষীরাও তাদের কতক পরিমাণ শস্য নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়। ক্রেতার মধ্যে গ্রামের গৃহস্থ লোক ছাড়াও অনেক দোকানী থাকে, কেননা, তারা তাদের দোকানের জন্য মাল কিনে রাখতে চায়। তা' ছাড়া আসল ব্যাপারীও এখানে লাভের সুযোগ খোঁজে।

এপর্য্যন্ত আমরা দেখেছি যে, চাষীদের মাল ব্যাপারী, উড়োক্রেতা ও ছোট খাটো দোকান-দার শ্রেণীরাই ক্রয় করে। খুব কম চাষীই আছে যে বেশী লাভের আশায় নিজে সহরে মাল বিক্রয় করতে যায়। একদলের মত হচ্ছে যে, ব্যাপারী প্রভৃতি লোকের মারফত বিক্রয় ব্যাপারটা হাত-ফিরি হওয়ায় চাষীরা অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; চাষীরা যদি বিক্রয় ব্যাপারটা নিজেদের হাতে নেয় ত তারা বেশ লাভবান হ'তে পারে। চাষীরা যে কেন বিক্রয় ব্যাপারটা নিজেদের হাতে নেয় না তার কারণ আমরা দেখিয়েছি। তাদের একটা ভয়ঙ্কর বিশ্বাস আছে যে ব্যাপারী কিছুতেই তাদের ঠকাবে না, তারা তাদের খরচটা পুষিয়ে নেবার জন্য কেবল নামমাত্র লাভ করে।

চাষীদের দ্বারা যদি বিক্রয়ব্যাপারটা আপাততঃ নিজেদের হাতে নেওয়া সম্ভব না হয় ত অন্য উপায়ে তারা বর্ত্তমান অবস্থার চেয়ে অধিকতর লাভবান হ'তে পারে। বর্ত্তমান অবস্থায় তাদের লাভের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে তাদের কম পরিমাণ শস্য ও পৃথক বিক্রয় ব্যবস্থা। সামান্য পরিমাণ শস্য থাকায় তারা ক্রেতার নিকট হ'তে সুবিধাজনক দর পায় না। এরই দূরীকরণের জন্য সমবায় নীতিতে তারা যদি একত্রিত হয় তবে বেশ সুবিধা হবে। ধরা যাক্ এক এক জনের কাছে দু'মণ তিন মণ করে ফসল আছে, কিন্তু যদি জন-কয়েকের ফসল একসঙ্গে করা যায় ত সেগুলো মিলিয়ে ২০।২৫ মণ হ'বে। তারা যদি নিজেদের মধ্যে একজন মোড়ল ঠিক করে ঐ ২৫ মণ ফসল তাকেই বিক্রয় করবার ভার দেয় ত দরে সুবিধে হ'বে এবং তারপর সেই টাকাটা প্রত্যেকের নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী ভাগ করে নিতে পারে। এতে করে তাদের পেশা হারাবারও ভয় থাকে না, অথচ সুবিধেও হয়।

পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়েছি যে, চাষীর কতক পরিমাণ লাভ ভোগ করে ব্যাপারী ইত্যাদি মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিরা। এখন কি উপায়ে সেটা সম্ভাবিত হয় সেটা আলোচনা করা যাক্।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, ব্যাপারীরাই চাষীদের নিকট হ'তে মাল কিনে নেয়। সে-মাল তারা সহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে। এ-কার্য্য তারা মিছামিছি করে না, লাভ করবার জন্যই করে। এই লাভের কাজ চালাতে গেলে তাকে বিক্রয় মূল্য অপেক্ষা ক্রয়মূল্য কম রাখতে হয়। সহরে যদি চালের দাম মণ প্রতি চার টাকা হয় তবে সে চাষীর নিকট হ'তে ৩৷৷০ টাকা মণ কিনবে। এই আট আনা হ'ল তার লাভ। এই লাভের অংশ বেশী করবার জন্য সে চাষীর সঙ্গে সাধ্যমত দরদস্তুর চালাবে এবং যতক্ষণ না সহরের বাজারদরের ওঠানামা বন্ধ হ'বে ততক্ষণ সে কিছুতেই মাল কিনবে না। তাহলেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যাপারীদের হাত দিয়ে এই বিক্রয় কার্য্যটা সাধিত হওয়ার

জন্য চাষীরা মণ পিছু আট আনা করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। চাষীরা ইচ্ছা করেই এ ক্ষতিস্বীকার করে এই জন্য যে, সহরে কি দর যাচ্ছে তার খবর তারা রাখে না এবং ব্যাপারীদের প্রতি তাদের একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে যে তারা ঠিক দাম দেয়।

ব্যাপারীরা মাল কিনে কি রকম ভাবে সেটা নাড়াচাড়া করে সে সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখা যাক্। সমস্ত কেনার পর যখন গাড়ী ভর্ত্তি হয়, তখন তাই নিয়ে সে সহরের উদ্দেশে যাত্রা করে। এক্ষেত্রে সে সেই সমস্ত সহরের বাজারে যায় যেখানে খুব চড়া দাম পাবে বলে সে আশা রাখে। তার গ্রাম থেকে খুব কম দূরত্বে যদি কোন সহর পড়ে এবং সেখানকার বাজার দর যদি মন্দা যায় ত তবে সে সেখানে যাবে না; বরং সে দূরবর্ত্তী অন্য বাজারের উদ্দেশ্যে ছুটবে যেখানে সে দর অপেক্ষাকৃত বেশী পেতে পারে। গ্রাম থেকে সহরে বাজারে মাল নিয়ে যেতে ব্যাপারীর গরুর গাড়ী ভাড়া, মিউনিসিপ্যালিটির টোল প্রভৃতি খানিকটা খরচ পড়ে, এ খরচটা সে চাষীদের নিকট হ'তে মাল কেনবার সময় দর খানিকটা কম ঠিক করেই পুষিয়ে নেয়। এ ছাড়া পুলিসের কর্ম্মচারীদের কিছু ঘুসও আছে।

সহরের বাজারে এসে পৌছলেই সে দালালের হাতে পড়ে। বাজারের বর্ত্তমান হালচাল যে রকম তাতে দালালের সাহায্য ব্যতীত আর উপায় নেই। এখানেও আড়ৎদারের কমিশন, দালালের কমিশন, ওজনদারের পারিশ্রমিক, মুটেভাড়া ইত্যাদিতে ব্যাপারীর বেশ কিছু খরচ হয়। এই সমস্ত খরচের একটা মোটামুটি হিসাব করলে দেখা যায় যে তা' মণ পিছু এক আনা করে পড়ে। গাড়ী ভাড়া খরচ আলাদা, দূরত্বানুযায়ী তা' নির্দ্দিষ্ট হয়।

উপরোক্ত পরীক্ষা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যাপারীর সমস্ত খরচ শেষ করেও বেশ কিছু লাভ থাকে। একদলের মত যে, চাষীরা যদি নিজেদের হাতে এই ব্যাপারটা গ্রহণ করত তাহ'লে তারা এই লাভটা ভোগ করতে পারত। সময়াভাব বা জ্ঞানাভাবের প্রশ্ন উঠতেই পারে না, যেহেতু চাষীদের হাতে প্রচুর সময় আছে এবং এ কাজে কোন বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজনই হয় না। কতকগুলি চাষী মিলে যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, এবং তাদের সমস্ত ফসল একসঙ্গে করে কয়েক খানি গরুর গাড়ী বোঝাই করে যদি দল বেঁধে একসঙ্গে সহরে এসে বিক্রয় করে, তবে তাদের আর্থিক দিক দিয়ে প্রচুর সুবিধা হ'বে।

কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখছি যে আরও দু'টি জিনিস এসে পড়ে। সেদু'টি হ'চ্ছে—(১) নগর প্রতিষ্ঠান কিংবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পণ্যদ্রব্যের উপর নিয়োজিত টোল বা শুল্ক। (২) মাল প্রেরণের সুবিধা অর্থাৎ রাস্তার বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা। এ দুটি জিনিস সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান থাকলে মাল ক্রয় বিক্রয়ের আলোচনার সুবিধা হ'বে।

এটা সর্ব্ববাদীসম্মত অর্থনৈতিক সত্য যে সকল রকমের শুল্কই বাণিজ্যগতিকে প্রতিহত করে। সেইজন্যই অবাধ বাণিজ্যনীতির গুণাগুণকে অস্বীকার করা যায় না, যদিও এটাও সত্য যে বিশেষ দেশে, বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ

দ্রব্যের উপর শুল্ক নিয়োজিত করা অনিবার্য্য হ'য়ে পড়ে। কিন্তু দেশের ভেতরের এই নগর শুল্কের ব্যাপার আভ্যন্তরিক ব্যবসা বাণিজ্যের অত্যন্ত ক্ষতিসাধন করে। এ শুল্ক আদায় করা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য; এর জন্য বহুল পরিমাণে কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। ঐ সমস্ত কর্ম্মচারী আইনানুমোদিত হার ছাড়াও নিজেদের পকেটে কিঞ্চিৎ পোরবার জন্য বেশী আদায় করে—ব্যবসায়ীরা তাতে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার ওপর এ শুল্কের কোন যুক্তিসঙ্গত সমতা নেই, প্রয়োগকর্তার কোন বিচার নেই, দ্রব্যের মূল্যের চেয়ে পরিমাণের দিকেই এর বেশী নজর। একগাড়ী বালির ওপর শুল্কের যে হার, একগাড়ী মূল্যবান প্রসাধনদ্রব্যের ওপরও তাই।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে নগর শুল্ক কি করে বাণিজ্যের ক্ষতি করবে? গ্রামের শস্য কিছু উদ্বৃত্ত থাকবেই, সুতরাং নগরশুল্ক থাক্ বা না থাক্, তা' সহরে চালান আসবেই, কেননা, গ্রামে তাকে অবিক্রীত অবস্থায় রেখে দিলে চাষীদেরই ত ক্ষতি। এর জবাবে এই বলা যায় যে নগরশুল্ক থাকুক্ বা না-থাকুক্ গ্রামের মাল সহরে চালান আসবে এটা ঠিক কথা, কিন্তু নগরশুল্ক যদি তুলে দেওয়া যায় ত বর্ত্তমানের চেয়ে চাষীরা বেশী লাভবান হ'বে। কি করে তাই দেখা যাক্।

নগরশুল্ক যদি তুলে দেওয়া যায় ত শুল্ক পরিমাণের হার অনুযায়ী পণ্যদ্রব্যের দর তখনি নেমে যাবে। পণ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাসের সঙ্গে

সঙ্গে চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে, এবং এই চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ গ্রাম থেকে আরও বেশী মাল সহরে চালান আসবে। শুধু আভ্যন্তরিক বাজারের দর নয়, বিদেশের বাজারেও দর কমে যাবে এবং তজ্জন্য চাহিদা বৃদ্ধি হেতু আন্তর্জ্জাতিক বাজারে চাষীদের মাল বেশী পরিমাণে বিক্রয় হ'তে পারবে। চাষীদের লাভ ত এতে অনেকখানি।

এইখানে একটা কথা উঠতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের দর চড়ানোই যখন কৃষকের স্বার্থরক্ষার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য, সেখানে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হওয়াটা কি ক্ষতিকারক নয়? প্রশ্নটা সমীচীন, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখলেই আমরা আসল অবস্থাটা বুঝতে পারব। মূল্যহ্রাস তখনি ক্ষতিকারক যখন কৃষকের পাওনায় তা' হাত দেয়। এক্ষেত্রে ত সে অবস্থা নয়; নগরশুল্ক রহিত জনিত মূল্য হ্রাসের ফলে তার পাওনায় ত কিছু ঘা পড়ছে না, সে আগেও যা পাচ্ছিল, এখনো তাই পাবে। বরং বেশী করে পাবে, কেননা, দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি হেতু তার, ফসল বেশী বিক্রয় হ'বে এবং পরে দর চড়ে, যাবে।

কিন্তু এই নগর শুল্ক রহিত করবার প্রস্তাবে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষগণ ভয়ানক আপত্তি করবেন। তাঁরা এই যুক্তি দেখাবেন যে, যে আয়টা নষ্ট হ'বে, সেটা পূরণ হ'বে কোথা থেকে? এবং আশ্চর্য্য এই যে নগরের লোকেরাও তাঁদের সমর্থন করবেন, কেননা, নগরের স্বার্থ রক্ষা করা তাঁদের কর্ত্তব্য। কিন্তু নগরবাসীদের ওপর কোন একটা প্রত্যক্ষ ট্যাক্স ধার্য্য করে ক্ষতিটা পূরণ করা যায় এ প্রস্তাবে ত নগরবাসীরা প্রথমে একেবারে আগুন হ'য়ে উঠবেন, কেননা এতে তাঁদের পকেটে হাত পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নগর শুল্ক যখন বজায় ছিল, তখনো তাঁদের পকেটে হাত পড়ছিল, সেটা তাঁরা টের পান নি। নগরশুল্ক থাকলেই জিনিসের দর বাড়বে, জিনিসের দর বাড়লে নগরবাসীদেরই বেশী পয়সা খরচ হ'বে, কেননা, তারাই হলেন ক্রেতা। সুতরাং পকেটে হাত তাঁদের দু'বারেই পড়ছে, তাহ'লেই নগর শুল্ক রহিত করবার বিরুদ্ধে তাঁদের আপত্তি থাকতেই পাবে না, যেহেতু নগর শুল্ক রহিত করায় ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হ'চ্ছে।

এই রকম বিক্রয় বাজার সৃষ্টি করলে সুবিধা উভয় পক্ষের। নগর শুল্ক তুলে দিলে জিনিস পত্তরের চাহিদা বৃদ্ধি হেতু চাষীরা লাভবান্ হ'বে। চাষীরা লাভবান হওয়া মানেই হ'ল তাদের হাতে ক্রয় ক্ষমতা আসা; তাদের হাতে ক্রয় ক্ষমতা এলেই তারা সহরের লোকের নিকট হ'তে জিনিষপত্তর কিনবে এবং পক্ষান্তরে, তাতে করে সহরের লোকও লাভবান হ'বে। এক্ষেত্রে সেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাপারের নীতিটাই প্রযোজ্য; যে দেশ যত বেশী রপ্তানী করে, সে ঠিক সেই পরিমাণে আমদানী করতেও বাধ্য থাকে। গ্রামের লোকও সেরূপ সহরের লোককে যদি বেশী মাল বিক্রয় করে, সহরের লোকের নিকট হতেও তারা বেশী জিনিষ কিনবে। এইরূপে নগর শুল্ক রহিত করার ফলে দু'পক্ষই বেশ লাভবান হ'বে। ইউরোপেও ঠিক এই জিনিষটাই ঘটেছিল। সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই শুল্ক তুলে দেওয়ার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়। ইউরোপ যে জিনিষটা দেড়শ' বছর পূর্ব্বে উপলব্ধি করতে পেরেছে, ভারতবর্ষ যে সেটা এখনো ধরতে পারল না—এইটাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নানাবিধ আঠা, গঁদ ও জুড়িবার সিমেণ্ট প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী

মাটীর ও কাচের জিনিষ জুড়িবার সাধারণ আঠা ;—

এক জাতীয় শামুক আছে, তাহা আকারে খুব বড় হয়। এই বৃহদাকার শামুকের খোলার মধ্যে একটা সাদা ব্লাডার আছে; তাহাতে চর্ব্বির মত এক রকমের আঠা থাকে। শামুকটিকে ভাঙ্গিয়া সেই আঠা বাহির করিয়া লইতে হয়। উহাকে একটু শুকাইয়া তাহার দ্বারা মাটী, কিংবা কাচ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি জোড়া যায়।

বেল্ট্ গ্লু (Belt Glue) তৈয়ারী করিবার প্রণালী ;—

৫০ ভাগ জিল্যাটিন জলে ভিজাইয়া রাখুন। যখন দেখিবেন জিল্যাটিন বেশ ফুলিয়া উঠিয়া নরম হইয়াছে, তখন অতিরিক্ত জলটুকু ফেলিয়া পাত্রটিকে গরম জলের উপর বসান। কিছুক্ষণ ঐ ওয়াটার বাথে (Water bath) জাল দিয়া উহার সহিত প্রথমে ৫ ভাগ গ্লিসিরিন (Glycerine) তারপর ১০ ভাগ তাপিন তেল, এবং সর্ব্বশেষে ৫ ভাগ তিসির তৈল মিশ্রিত করুন। আঠাকে যে রকম তরল করিতে চান, সেই পরিমাণ মত জল মিশাইবেন।

ক্রোমিয়াম গ্লু (Chromium Glue) তৈয়ারী করিবার প্রণালী ;—

(১) প্রথমে অর্দ্ধ পাউণ্ড শিরীষ ১২ আউন্স ঠাণ্ডা জলে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ সিকি পাউণ্ড জিল্যাটিন (Gelatine) ১২ আউন্স ঠাণ্ডা জলে ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তৃতীয়তঃ দুই আউন্স বাইক্রোমেট্ অব্ পটাশ (Bichromat of Patash) ৮ আউন্স গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। এক্ষণে প্রথমকার অর্দ্ধ পাউণ্ড শিরীষ ভাল করিয়া গুলিয়া উহার সহিত ভিজান জিল্যাটিন ভাল করিয়া মিশাইয়া

লউন। তারপর, যে পাত্রে পটাস বাইক্রোমেট্ আছে, তাহাতে এই মিশান শিরীষ ও জিল্যাটিন ঢালিয়া দিন। সমস্ত জিনিষটা এবারে খুব নাড়িয়া চাড়িয়া মিশ্রিত করুন।

(২) প্রথমে খানিকটা শুষ্ক জিল্যাটিন লউন। উহাকে আন্দাজমত শতকরা ৫ ভাগ হইতে ১০ ভাগ জলে ভিজাইয়া রাখুন। ইহার সহিত জিল্যাটিনের ওজনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ য়্যাসিড্ ক্রোমেট্ অব্ পটাশ (Acid Chromate of Potash) মিশ্রিত করুন। এই আঠা জলে নষ্ট হয় না।

ফায়ার প্রুফ গ্লু (Fire Proof Glue) ;—

এক ভাগ শিরীষ বা জিল্যাটিন ৮ ভাগ কাঁচা মসিনার তৈলে ১০।১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখুন। তারপর উহাকে অল্প আঁচে গরম করিয়া ভালরূপে মিশাইয়া লউন। যখন মশলাটী সম্পূর্ণরূপে তরল হইয়া আসিবে, তখন উহাকে দুই ভাগ চূণের মধ্যে ঢালিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া মিশ্রিত করুন এবং একটু রৌদ্রে শুকাইতে দিন। এই আঠা ব্যবহার করিবার সময় গরম করিয়া লইবেন। ইহা অগ্নির উত্তাপে নষ্ট হয় না।

ছুরির বাঁট প্রভৃতি আঁটিবার সিমেণ্ট ;—

(১) ধুনা ৪ পাউণ্ড
মোম ১ „
প্ল্যাষ্টার প্যারিস্ অথবা মিহি সুরকী } ১ পাউণ্ড

একত্র মিশাইয়া ভালরূপে পেষণ করিয়া লউন।

(২) পীচ্ (Pitch) ৫ পাউণ্ড
কাঠের ছাই ১ „
চর্ব্বি ১ „

উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মিশ্রিত করুন।

(৩) ১২ ভাগ ধুনা, তিন ভাগ গন্ধক, পাঁচ ভাগ লৌহ চূর্ণ, একত্র মিশাইয়া গরম করিলে গলিয়া তরল হইয়া যায়। এই তরল পদার্থটি গরম অবস্থায় ছুরির বাঁটে ঢালিয়া উহাতে ছুরির গোড়াটি লাগাইয়া দিলে, খুব জোরের সহিত আঁটিয়া যায়।

(৪) প্রথমে এক ভাগ কষ্টিক্ সোডা (Caustic Soda), ৩ ভাগ ধুনা (Rosin), ৫ ভাগ জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহার সহিত ৪ ভাগ প্যারিস্ প্ল্যাষ্টার মিশাইয়া লউন। এই সিমেণ্ট জলে একটু নষ্ট হয়

(৫) সমপরিমাণ গাটা পার্চ্চা (Gutta percha) ও গালা (Shellac) একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভালরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া লউন। তারপর উহাকে একটি লোহার পাত্রে রাখিয়া গরম করুন। এই সিমেণ্ট ব্যবহার করিবার সময় প্রথমে একটু গরম করিয়া লইবেন, তারপর ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে জিনিষে লাগাইবেন।

(৬) ধুনা ৬০০ ভাগ
গন্ধক ১৫০ „
লৌহচূর্ণ ২৫০ „

একটী পাত্রে মিশাইয়া গরম করুন। তরল হইয়া আসিলে গরম থাকিতে থাকিতে ব্যবহার করিবেন।

পাথর জুড়িবার নানাপ্রকার সিমেণ্ট ;—

(১) ভাঙ্গা মার্ব্বেল পাথর জুড়িবার জন্য নিম্নলিখিত প্রণালীতে খুব ভাল সিমেণ্ট তৈয়ারী করা যায় ;—

চার ভাগ জিপসাম্ (Gypsum) অর্থাৎ প্যারিস প্ল্যাষ্টার এবং এক ভাগ আরবী-গঁদ চূর্ণ করিয়া ভালরূপে মিশ্রিত করুন। তারপর উহার সহিত আন্দাজমত ঠাণ্ডা সোহাগার জল (Borax Solution) মিশাইয়া লউন। যে দুইখণ্ড মার্ব্বেল জোড়া দিতে হইবে, তাহাতে এই সিমেণ্ট মাখাইয়া খুব চাপিয়া লাগাইবেন। কয়েকদিন ঐ চাপে রাখিয়া দিলে দেখিবেন, খুব শক্ত হইয়া জুড়িয়া গিয়াছে। যদি রঙ্গীন মার্ব্বেল হয়, তবে সেই রং এর সহিত মিল করিয়া সোহাগার জলটাকে রঙ্গাইয়া লইবেন। তাহা হইলে জোড়ের মুখ একেবারে বেমালুম হইয়া যাইবে।

(২) ৪।৫ ভাগ ধুনা এবং এক ভাগ মোম্ গরম করিয়া ভালরূপে মিশ্রিত করুন। যে দুইখণ্ড মার্ব্বেল জুড়িতে হইবে, সেই দুইখণ্ড অল্প গরম করিয়া, গরম থাকিতে থাকিতে খুব তাড়াতাড়ি ঐ তৈয়ারী সিমেণ্ট লাগাইয়া চাপিয়া রাখিতে হয়। কিছুক্ষণ পরে দেখিবেন, উহা খুব শক্ত হইয়া জুড়িয়া গিয়াছে।

এই প্রকার সিমেণ্ট প্রায় সকল প্রকার দ্রব্য জুড়িবার কাজে লাগান যায়। কিন্তু ইহার একটু অসুবিধা এই যে, যখন তখন তৈয়ারী করিয়া লাগাইতে হইবে। পুরানো হইয়া গেলে ইহার দ্বারা কোন কাজ হয় না। তবে ইহা যেমন সহজে ও অল্প ব্যয়ে তৈয়ারী করা যায় এবং ইহা যেমন অল্প সময়ের মধ্যেই আঁটিয়া শক্ত হইয়া যায়, তাহাতে এই সমান্য অসুবিধা এমন বিশেষ কিছু নহে।

(৩) চুণ (Slaked Lime) দশ ভাগ
প্যারিস প্ল্যাষ্টার ১৫ ,,
কেওলীন (Caolin) ৫ ,,

এই মশলাগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সমপরিমাণ পটাসিয়াম সিলিকেট (Potasium Silicate) মিশাইয়া লইবেন।

পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ

ধর্ম্মঘট জিনিষটা স্থান, কাল পাত্র হিসাবে ভাল, কেননা, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করবার সেটা একটা অস্ত্র স্বরূপ, আবার ধর্ম্মঘট জিনিসটা খারাপ, যেহেতু একটী ব্যবসার সহিত অন্যান্য আরও অনেক ব্যবসা জড়িত বলিয়া তাতে ব্যবসার ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়। এই পরস্পর-বিরোধী ছুটি স্বার্থের সঙ্ঘাতের ওপর ধর্ম্মঘট ব্যাপারটি দাঁড়িয়ে আছে, আইন তার অবস্থিতিকে করে নিয়েছে স্বীকার। শুধু আমাদের দেশেই নয়, ইটালী ও জার্ম্মাণী ছাড়া বিশ্বের সকল দেশের আইনই ধর্ম্মঘটকে স্বীকার করে নিচ্ছে। কিন্তু আইন যাই করুক না কেন, ধর্ম্মঘটটা যে একটা ভয়ঙ্কর দুঃখের ও আশঙ্কার ব্যাপার সেকথা যে কোন ধর্ম্মঘট থেকেই প্রতীয়মান হ'বে।

বাংলা দেশে পাট শিল্প ব্যাপারে চটকল-গুলিতে ক্রমাগত ধর্ম্মঘট দেখা দিচ্ছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে হাওড়া অঞ্চলে ধর্ম্মঘট দেখা দিয়েছিল। এবার আবার কিছুদিন হল সারা বাংলার চটকলগুলিতে ধর্ম্মঘট সুরু হয়েছিল, এতে ২ লক্ষের অধিক লোক সংশ্লিষ্ট ছিল। ধর্ম্মঘট ব্যাপারটা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা শুধু এর কারণ ও এতে করে শিল্প ব্যবসা কি রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটারই আলোচনা করব।

পাট যে বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট সম্পদ একথা কাহাকেও বিশেষ করে বুঝিয়ে দিতে হ'বে না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, যুদ্ধের পর হইতে পাট থেকে আমরা মোটেই লাভবান হ'চ্ছি না। বাংলাদেশে পাট থেকে যে একটা খুব মোটা রকমের রাজস্ব আদায় হ'ত, সেটার প্রায় সবটাই যেত কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে। সুতরাং বাংলাদেশ তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে থাকত একান্তভাবে বঞ্চিত। নূতন শাসনতন্ত্রে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের খরচ জোগাবার ভার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহের উপর যে হারে ন্যস্ত হ'য়েছিল তার বিলি ব্যবস্থা ক'রেছিলেন লর্ড মেষ্টন। এই মেষ্টন Award এ বাংলার উপর ভীষণ অবিচার করা হয়; বাংলার জুট এবং জুটোৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর যে রপ্তানী শুল্ক আদায় হইত তাহার সবটাই সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের তহবিলে মেষ্টন Award এ দেওয়া হইয়াছিল। বাংলাদেশ হইতে বহু প্রতিবাদেও কোনও ফল না হওয়ায় শেষে বর্ত্তমান গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন বিলাতে গিয়া ইহার কতকাংশ বাংলার তহবিলে টানিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে আংশিক কিছু দেওয়া হইলেও বাংলাদেশের প্রতি আর্থিক অবিচার ও অত্যাচার স্থায়ীরূপেই রহিয়া গিয়াছে। বাংলায় যে অসংখ্য পাটের কল আছে, তার মধ্যে প্রায় সবগুলিই বিদেশীর; মুষ্টিমেয় যে ক'টা কল ভারতীয়দের রয়েছে তার মধ্যে বাঙালীর প্রেমচাঁদ জুট মিল কৃতিত্বের সহিত কাজ চালাইতেছে এবং আরও একটা

জুট মিল চালাবার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চলেছে। ইউরোপীয় পরিচালিত পাটকলগুলিতে যে কী বিরাট আয় হয়, নিম্নের গুটিকয়েক কলের ষাণ্মাসিক হিসাব থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে :—

১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ষাণ্মাসিক হিসাব।

চটকলের নাম।	লাভের পরিমাণ।	ডিভিডেণ্ড্ শতকরা।
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া	৮,৫৭,২২৫ টাকা	১৫
বালী	২,৭২,৪৩৫ ,,	৬
চাঁপদানী	৪,৭৯,৯১৬ ,,	৫
ফোর্ট্ গলষ্টার	৫,৭৫,০৮৮ ,,	১৫
ফোর্ট্ উইলিয়াম	২,৯০,৭৫০ ,,	১০
গৌরীপুর	৬,০৮,৫০২ ,,	২৫
হাওড়া	১০,৮৯,১৮৫ ,,	১৭½
নদীয়া	৫,৬৩,৩৮২ ,,	২০
রিলায়েন্স	৭,৩৬,৫৯৭ ,,	২৫¾

এই যে বিরাট আয়ের অঙ্ক, এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পাটের কারবার একটি কী রকম লাভজনক কারবার। বিদেশীরা এই কারবারের ডিভিডেণ্ড মেরে একেবারে 'লাল' হয়ে গেছে। এখনো প্রতি চটকলের অংশীদারদের যে রকম উচ্চাহারে লভ্যাংশ দেওয়া হয় তা' ভেবে আশ্চর্য্য হতে হয়। বর্ত্তমানে অনেক ইউরোপীয় পরিচালিত মিলের শেয়ার আমাদের দেশীয় লোকের হাতে এসেছে বটে, কিন্তু বিদেশী এজেন্সীর কড়াকড়ি এখনো শিথিল হয়নি। পাটের উপযুক্ত মূল্য যদি বেঁটে দেওয়া যায় ত চাষীরাও পাট কারবারের লভ্যাংশ প্রাপ্ত হ'তে পারে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমানে তা' ঘটে না।
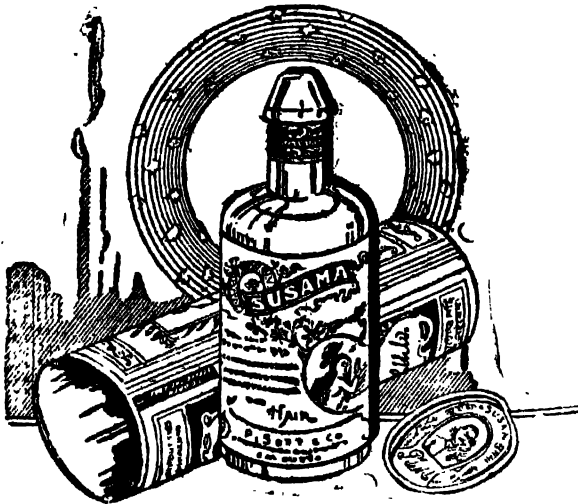
আমাদের চাষীরা পাট উৎপাদন করে ; এই উৎপাদন ব্যাপারটা বাংলার চাষীদের একেবারে একচেটিয়া ব্যাপার, তবুও বাংলার চাষীরা উৎপাদনের পরিশ্রমের যোগ্য পারিশ্রমিক পায় না। সেইজন্যই চাষীদের এত দুর্দ্দশা। কিন্তু পাটের দর যখন চড়া ছিল তখন চাষীদের এমন শোচনীয় অবস্থা দেখা দেয় নি। এই পাটের ওপর নির্ভর করেই চাষীরা তখন বাড়ী তুলেছে, গাড়ী চড়েছে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়েছে। পাটের দর ছিল তখন মণ পিছু ২৫।৩০্ টাকা। এখন সেই দর ৪।৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কথা উঠতে পারে যে, কেন এমন হ'ল ? একসময় যে পাটের দর চাষীদের ঘরকে লক্ষ্মীশ্রীতে ভরে রেখেছিল, সে পাটের দর এমন শোচনীয় ভাবে নেমে গেল কিসের জন্য ? অনেকে এর জবাবে বলেন যে, চাষীরা লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে প্রতি বছর অত্যন্ত বেশী পরিমাণে পাট উৎপাদন করেছে বলেই পাটের দরের এই মারাত্মক শোচনীয় অবস্থা দেখা দিয়েছে। কথাটা অনেকাংশে সত্য, এবং সেইজন্য কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্ট্ একযোগে চাষীদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন—পাটচাষ সীমাবদ্ধ ও সংযত কর, নতুবা সমূহ বিপদ। কলিকাতা ও তন্নিকটস্থিত পাটকলগুলি বছরে সাধারণতঃ ৭,০০০,০০০ গাঁট পাট ক্রয় করে ; গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ থেকে এই রকম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে যাতে করে চাষীরা ৯,০০০,০০০ গাঁটের বেশী পাট উৎপাদন করতে না পারে। এ প্রচেষ্টা যদি ফলবতী হয় ত পাটশিল্পের পক্ষে প্রভূত কল্যাণ দেখা দেবে।

কি করে কল্যাণ দেখা দেবে সেটাই দেখা যাক। অর্থনীতির নিয়মানুসারে চাহিদার তুলনায় যোগান যদি কম হয় এবং অপরাপর অবস্থা যদি পূর্ব্ববৎ থাকে তবে দ্রব্যের মূল্য বেড়ে যাবে। আবার চাহিদার তুলনায় যোগান যদি বেশী হয় এবং অপরাপর অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকে তবে দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাবে। আমাদের পাটশিল্পের ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত ব্যাপারটি ঘটেছিল। সেখানে চাহিদা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী পাট আমাদের চাষীরা উৎপাদন করেছিল বলেই দরের দিক দিয়ে তারা অমন দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করেছে। পূর্ব্বেই বলেছি যে, কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ চটকলগুলি বৎসরে সাধারণতঃ ৭,০০০,০০০ গাঁট পাট ক্রয় করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দেশী বাজারে অন্ততঃ ৭০ লক্ষ গাঁট পাটের রীতিমত চাহিদা রয়েছে। চাষীদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নব্বই লক্ষ গাঁটের বেশী পাট কিছুতেই উৎপাদন না করে। এ উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় ত দেশী বাজারের চাহিদার অতিরিক্ত কুড়ি লক্ষ গাঁট পাট বেশী উৎপাদিত হচ্ছে। এই অতিরিক্ত ২০ লক্ষ গাঁট থাকছে বিদেশের বাজারের চাহিদার জন্য। বিদেশের চাহিদার অনুপাতে ২০ লক্ষ গাঁট যে অল্প এটা স্বীকার করতেই হ'বে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মোটামুটিভাবে চাহিদার তুলনায় যোগান কম হচ্ছে এবং এমতক্ষেত্রে দর বৃদ্ধি পাবে, কেননা, চাষীরা যে দর চাইবে ক্রেতারা সেই দরে দিতে বাধ্য থাকবে। অতএব চাষীরা যদি সমবেতভাবে নব্বই লক্ষ গাঁটের বেশী পাট উৎপাদন না করে তবে তাদের কল্যাণ হওয়াই স্বাভাবিক।

চাষীদের এই কল্যাণই বর্ত্তমানে একান্ত কামনার বস্তু। পূর্ব্বেই বলেছি যে, চাষীদের

এই কল্যাণই এক সময় তাদের লক্ষ্মীমন্ত করে তুলেছিল; সুতরাং সে কল্যাণকে যদি পুনর্জ্জীবিত করা যায় ত কৃষক সম্প্রদায়ের একটা মস্ত উপকার সাধন করা হ'বে। দেহের কোন অঙ্গের সামান্য এক স্থানে ফোঁড়া হ'লে শুধুমাত্র সে সামান্য স্থানটুকুই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সারা দেহই ব্যথিয়ে ওঠে। সমাজদেহের মধ্যেও তেমনি কৃষক সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন শুধুমাত্র চাষীদের সর্ব্বনাশ নয়, পরন্তু, সারা সমাজকেই তার অভিশাপ ভোগ করতে হ'য়। এর এক মাত্র কারণ হচ্ছে যে, আমাদের সমাজ কৃষক প্রধান। ঐ অত্যন্ত সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি আর্থিক দুরবস্থা ভোগ করে ত সমাজে তার প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। উক্ত আর্থিক দুরবস্থা আর কিছুই নয়, কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার হ্রাস। কৃষকরা যদি ক্রয় ক্ষমতাশূন্য হয় ত দেশের অপরাপর সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে অচল হয়ে পড়ে। সমাজের পক্ষে সেটা অভিশাপ ছাড়া আর কি হ'তে পারে! এই অভিশাপের হাত থেকে যত শীঘ্র রেহাই পাওয়া যায় ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গলের।

উক্ত মঙ্গল শুধুমাত্র সামাজিক মঙ্গল নয়, অর্থনৈতিক মঙ্গলও বটে। এই অর্থনৈতিক মঙ্গল লাভের জন্যই দেশের বর্ত্তমান ব্যবসা বাণিজ্য একে বারে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। সকলেই জানেন যে, আমাদের বাজারের হালচাল পূর্ব্বের ভয়ঙ্কর মন্দার তুলনায় একটু ভাল হ'লেও তাতে করে ব্যবসায়ী শ্রেণীর দুঃখ দুর্দ্দশা একেবারে ঘুচছে না। তা' ছাড়া অনেক শিল্প ব্যবসায়কে এখনও টাল সামলাতে হচ্ছে। ঐ সমুদয় ব্যবসার উন্নতি ঘটতে পারে যদি ব্যবসা বাজারে মাল পত্তরের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। মাল পত্তরের চাহিদা বৃদ্ধি পাবার প্রধানতম উপায় হচ্ছে দেশের লোকের হাতে ক্রয়-ক্ষমতা আনয়ন করার ব্যবস্থা করা। দেশের লোকের হাতে ক্রয় ক্ষমতা আনয়ণ করবার সমস্যাটা আসল সমস্যা; নইলে দেশের মধ্যে যদি হাজার হাজার শিল্প বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করা যায়, আর দেশের লোকের হাতে একটুও ক্রয়-ক্ষমতা না থাকে তাহ'লে অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন হ'বে না। আমাদের দেশের জনসংখ্যার মধ্যে কৃষকদের সংখ্যা অত্যধিক; তাদের হাতে যদি ক্রয় ক্ষমতা আনয়ন করবার ব্যবস্থা করা যায় ত অত্যধিক সংখক লোকের হাতে যে ক্রয়-ক্ষমতা এসেছে একথা স্বীকার করতেই হবে। বাংলার কৃষকরা এই ক্রয় ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারে যদি তাদের উৎপন্ন দ্রব্য চড়া দরে বিক্রীত হয়। তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পাট অন্যতম। পাটের তারা যদি উচ্চ মূল্য পায় ত তাদের দুঃখ কষ্টের লাঘব হতে পারে।

এই পাটের উচ্চ মূল্য তারা পেয়েছিল যুদ্ধের বাজারে। শুধু তারা নয়, প্রত্যেক ব্যবসায়ী শ্রেণী ও উৎপাদনকারীই যুদ্ধের বাজারে অসম্ভব রকম অবস্থা ফিরিয়ে নিয়েছিল; চলতি কথায় আমরা যাকে বলি একেবারে 'লাল' হয়ে যাওয়া। এর কারণই হ'ল যে, যুদ্ধের বাজারে জিনিষ পত্রের দর অত্যধিক ভাবে চড়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের সময়কার অবস্থাটা একটা কল্যাণকর অবস্থা নয়, ওটা একটা স্বভাববিরুদ্ধ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। প্রকৃতির মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক সমতা আছে ইংরাজীতে যাকে বলে Natural equilibrium, সেটাই হ'ল সত্যকার কল্যাণকর পরিস্থিতি। এর কোন ব্যতিক্রম ঘটলে

আপাতঃ ফল তার লাভজনক হলেও শেষ ফল ভাল হয় না। যুদ্ধের বাজারে তাই ঘটেছিল। যুদ্ধের অস্বাভাবিক চাহিদার জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে একটা 'ওভার প্রোডাক্‌সনের' রাজত্ব চলেছিল, তাই যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই 'ওভার প্রোডাক্‌সন'ই সারা বিশ্বের বাজারে এক সর্ব্বনাশ আনলে এবং লক্ষ লক্ষ লোক তারই কবলে পড়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেল।

আমাদের পাট চাষীদের ওপরও ঠিক ঐ একই জিনিসের মারাত্মক ফল ফলেছিল। যুদ্ধের সময় বিশ্বের সমস্ত যায়গায় 'গানি'র চাহিদা অচিন্ত্যনীয় রূপে বৃদ্ধি পায় এবং সেই জন্যই চাষীরা ভয়ানক চড়া দর পেতে থাকে। এই চড়া দরটা তাদের পক্ষে এত লোভনীয় ছিল যে অপর সমস্ত দ্রব্য ফেলে তারা কেবল জমিতে পাট বুনতেই আরম্ভ করে। এমনো প্রবাদ আছে যে, তখন চাষীদের অপরাপর শস্য কেন তারা বুনছে না প্রশ্ন করলে তারা হেসে জবাব দিত যে চাল ডাল তারা কিনে খাবে। এই রকমই ছিল তাদের পাটের প্রতি লোভ। তখনকার ঐ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তাদের লোভ যে অসঙ্গত ছিল তা' বলছি না, কিন্তু তাদের বোঝা উচিত ছিল যে, এ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হ'বে না।

আমাদের অজ্ঞ, অশিক্ষিত চাষীরা এ জিনিষটা বোঝে নি বলেই তাদের আজ এত দুর্দ্দশা। যুদ্ধের পরে যখন ঐ ওভার প্রোডাক্‌-সনের আত্মঘাতী ফলের দরুণ সারা বিশ্বের বাজারে একটা মারাত্মক 'কোলাপ্স' দেখা দিলে, আমাদের পাট চাষীদের ভাগ্য তারই সঙ্গে জড়িত থাকলেও তারা এসম্পর্কে সচেতন হ'ল না। যুদ্ধের পরেও তারা ভাবলে বুঝি বেশী পাট উৎপাদন করলে এখনো তারা সেই পূর্ব্বের মতই চড়া দাম পাবে। কৃষক হিতৈষী ব্যক্তিরা তাদের এ সম্পর্কে যথেষ্ট উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা এধারে ভুলেও কর্ণপাত করে নি। ভুল করে তারা ভেবে ছিল যে হিতৈষী ব্যক্তিদের এ হচ্ছে স্বার্থ প্রণোদিত উক্তি।

কিন্তু বেশ গোটা কতক বছর কেটে যাবার পর যখন তারা দেখলে যে দর ক্রমশঃ নেমেই

যাচ্ছে এবং এত নেমে যাচ্ছে যে তাদের উৎপাদনের খরচা পোষাচ্ছে না, তখন তাদের একটু হুঁস হ'ল। কিন্তু এত বিলম্বে যা' সর্ব্বনাশ ঘটবার তা' ঘটে গেছে। এরই মারাত্মক প্রভাবের জের চাষীরা এখনও টেনে চলেছে। সুতরাং অবিলম্বে যদি পাটের দর বৃদ্ধি করা না যায় ত চাষীদের সর্ব্বনাশ থেকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।

যুদ্ধের পরিণতি থেকে আমাদের একটা জিনিষ শিক্ষা করবার আছে। যে কোন দ্রব্যেরই হোক না কেন, এ্যাব্‌নরম্যাল্ বা স্বভাব ব্যতিক্রমিক মূল্য বেশীদিন টেঁকে না। যে ব্যবসায়ী এ জিনিষটা ধরতে না পারে, তার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই সর্ব্বনাশই আমাদের পাট চাষীদের ঘটেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। বিগত ভূমিকম্পের পর করগেটেড টিনের এত চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল যে ভারতের বাজারে প্রায় একখানিও টিন অবশিষ্ট ছিল না, দরও একেবারে আগুন হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থাকে উপলক্ষ্য করে যদি দেশে অসংখ্য টিনের কারখানা ছড়িয়ে পড়ত ত আজ আরও কী মারাত্মক ফল ফলত ভাবুন দেখি? সেই সময়ের জন্য কারখানা স্থাপন লাভজনক হ'তে পারত বটে, কিন্তু তার পরে? তারপরে চাহিদা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ত সেই সমস্ত কারখানাগুলি ফেল পড়ত।

যুদ্ধের পরে পাট চাষীরাও ঠিক সেই রকম ফেল পড়েছে, এবং সেটা তাদের নিজেদের দোষে অতি-উৎপাদনের ফলে। এখন যে-কোন উপায়েই হোক্ তাদের পাট-উৎপাদন কমানো ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। যে সমস্ত পাট চাষ অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়েছে, তাঁরা সকলেই বলেছেন যে চাষীদের মণ পিছু উৎপাদনের খরচ ৩টাকা থেকে ৪ টাকা পড়ে। সুতরাং পাটের দর যদি মণ পিছু ৮৷১০ টাকা হয় ত চাষীদের মণ পিছু ডবল লাভ থাকে এবং পাট ক্রেতাদেরও এতে তেমন অসুবিধা হয় না। এই দরটাই স্বাভাবিক। এর ওপর দর যদি কখনো চড়ে ত সেটা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। পাট আমাদের একচেটিয়া জিনিস বলে পাট-উৎপাদন-কারীদের অনেক সুবিধা আছে এবং সেই সুবিধানুযায়ী চাষীদের ৮৷১০ টাকা মূল্য দেবার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টের করা উচিত।

পূর্ব্বেই বলেছি, এই পাটের দর বৃদ্ধি করবার জন্য গভর্ণমেণ্টও চেষ্টা করছেন। তাঁদের চেষ্টার যে আন্তরিকতা নেই সেকথা বললে অন্যায় হ'বে, কিন্তু তাঁদের চেষ্টার কোন উল্লেখযোগ্য ফল হচ্ছে না। কয়েক বছর থেকেই গভর্ণমেণ্ট 'পাট চাষ সংহত কর' 'পাট চাষ সংহত কর' বলে প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছেন কিন্তু তাতে দর কতখানি আর বৃদ্ধি পেয়েছে? তাঁদের উপদেশ মত নয় চাষীরা মোটমাট ৯০ লক্ষ গাঁট পাট উৎপাদন করল, তাহলেও তারপর? এই করলেই কি পাটের দর বৃদ্ধি পাবে?

আমাদের তা' মনে হয় না। আমরা জানি, যে বাংলাদেশে দাদন-প্রথা ও দালালদের অত্যাচার বর্ত্তমান আছে, এবং তারই উপদ্রবে চাষীরা প্রপীড়িত। সুতরাং চাষীরা ৯০ লক্ষ গাঁট কেন, ৭০ লক্ষ গাঁট উৎপন্ন করেও বর্ত্তমান অবস্থায় কিছু সুবিধা করতে পারবে না। এর কারণ হচ্ছে যে, চাষীরা হ'ল বাজারে চাহিদা-যোগানের তারতম্যের অবস্থা-নিরপেক্ষ জীব, বাজারের দরের ওপর তাদের কোন হাত নেই।

বাজারে রাজত্ব করে দালাল ও মহাজন সম্প্রদায়। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ই নিজেদের ইচ্ছামত দর ঠিক করে। এরকম সম্ভব হয় এই কারণেই যে, আমাদের দেশের চাষীরা হচ্ছে অত্যন্ত দুর্ব্বল। ঋণের দায়ে তাদের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বাঁধা। সুতবাং মহাজনদের নিকট হ'তে তারা দাদন নিতে বাধ্য হয়। এই দাদন-প্রথা এক ভয়ঙ্কর মারাত্মক ব্যাপার। এরই কৃপায় পাট না জন্মাতে জন্মাতেই তার মূল্য স্থিরীকৃত হয়ে, তা' বিক্রী হয়ে যায়। একটা উদাহবণ দিলেই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হ'বে। ধরুন, একজন কৃষকের যা জমি আছে তাতে সাধারণতঃ ২৫ মণ পাট উৎপন্ন হয়। এই ২৫ মণ পাট যদি বাজারে চড়া দরে বিক্রীত হয় তাহ'লে সাবা বছরের জন্যে সেই কৃষক পরিবারটিকে আর কিছু ভাবতে হয় না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে আমাদেব দেশের কৃষক সম্প্রদায় অত্যন্ত দরিদ্র ও দুর্ব্বল। তা' ছাড়া তাদের মধ্যে কোন সুসংগঠিত সমিতি নেই যারা মাল বিক্রয় ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করবে। অথচ অপরদিকে মিল ওনার্স এ্যাসোসিয়েসন একটি সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান; জুটের সিজন্ সুরু হবার পূর্ব্বেই তারা বাজারের হালচাল দেখে সমস্ত কেনাবেচার পরিকল্পনা ঠিক করে করে। এবং এইজন্যই তারা জুটের বাজার দরকে নিয়ন্ত্রণ করে, চাষীদের নিজেদেব নির্ব্বুদ্ধিতা ও সঙ্ঘশক্তির অভাবের দরুণ বাজাবের ওপর তাদেব কোন হাত থাকে না। আর তদ্দরুণই তারা কম দর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আমাদের উদাহরণোক্ত কৃষকটিরও সেইজন্য দুর্দ্দশা ঘোচে না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

কোথায় কিরূপে বিজ্ঞাপন দিতে হয় ?—

ইতিপূর্ব্বে আমরা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন এবং প্ল্যাকার্ড ও হ্যাণ্ডবিল সম্বন্ধে লিখিয়াছি। এবারে আমরা বিজ্ঞাপন দিবার অন্যান্য নানাবিধ উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমতঃ আমরা বিজ্ঞাপন ও চিত্র এই বিষয়টীর কথা বলিতেছি। শুধু চিত্র দ্বারা কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না;—তাহার সম্বন্ধে অন্ততঃ দুই চারিটি কথা চাই। এইখানেই বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কথায় ও চিত্রে প্রভেদ। শুধু কথায় বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে এবং সে বিজ্ঞাপন খুব সস্তাতেই হয়। সস্তা বলিয়াই যে তাহা কম ফলদায়ক, এমন নহে। বেশ সাজাইয়া গোছাইয়া লিখিতে পারিলে শুধু কথার বিজ্ঞাপন খুব জোরালো হয়। কিন্তু যত বড় আর্টিষ্ট হউক না কেন, শুধু চিত্র দ্বারা কোন ব্যবসা সম্পর্কিত বিশেষ একটী ভাব প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। ধরুন, কোন চা-ব্যবসায়ী যদি বুঝাইতে চান যে, তাঁহার চা একেবারে সোজা সুজি দার্জ্জিলিং এর বাগান হইতে আনীত এবং ইহার জন্য যদি তিনি কোন আর্টিষ্টের দ্বারা এমন একটি ছবি আঁকান যাহাতে এরূপ দেখান হয়,—একটি তুষারাবৃত পর্ব্বত শৃঙ্গ;—তার নিকটে একটি বাগান। বাগানে কুলী রমণীরা পাতা তুলিতেছে,—একজন তাহা মাথায় করিয়া পাতা তৈয়ারীর কারখানা ঘরে আনিতেছে;—কারখানার লোকেরা তাহা টিনে প্যাক্ করিতেছে। এখানে, ঐ চিত্রের মধ্যে যে টিনের ছবি থাকিবে, তাহাতে অন্ততঃ কোম্পানীর নাম থাকা চাই, তাহা না হইলে বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম বুঝা যাইবে না। যদি তাহা না থাকে, তবে ছবিখানি খুব সুন্দর এবং ঘরের দেওয়ালে টানাইয়া রাখিবার যোগ্য হইতে পারে, কিন্তু উহা যে দার্জ্জিলিং এর চা বাগানের ছবি তাহা কষ্টে সিষ্টে বুঝা গেলেও কোম্পানীর নাম এবং সোজাসুজি বাগান হইতে আমদানী করা এসব ত কিছুতেই বুঝা যাইবে না। এইজন্য আমরা বিজ্ঞাপন ও চিত্র সম্বন্ধে আলোচনায় দুইটী কথা ধরিব,—(১) চিত্রে বিজ্ঞাপন (২) বিজ্ঞাপনে চিত্র। চিত্রে বিজ্ঞাপনের অর্থ এই যে, চিত্রের সাহায্য বিজ্ঞাপন; অর্থাৎ তাহাতে চিত্রই হইবে প্রধান,—কথা হইবে অপ্রধান, চিত্রই থাকিবে বেশী স্থান জুড়িয়া,—কথা থাকিবে অল্প স্থান লইয়া—চিত্রই চোখে পড়িবে আগে, কথা হইবে সামান্য বিন্দুবৎ। যেমন গ্রামোফোনের রেকর্ডখানি বৃহৎ ও প্রসারিত; কিন্তু তাহা ত অমনি গান গাহে না অথবা কথা কথা বলে না। যখন ঐ ক্ষুদ্র অদৃশ্য আলপিনটির সূক্ষ্মাগ্র উহার উপর দিয়া চলিতে থাকে, তখনইত সুমধুর সঙ্গীত শোনা যায়। বাস্তবিক ঐ ক্ষুদ্র আলপিনটী যেন নির্ব্বাক রেকর্ডের মর্ম্ম কথা টানিয়া বাহির করে। চিত্রে বিজ্ঞাপনের ক্ষুদ্র কথাটুকুও সেই রকম ঐ আলপিনের সূক্ষ্মাগ্রের মত ছবি খানির

মর্ম্ম কথা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবে,—বাস্তবিক ছবিখানি যেন গ্রামোফোনের রেকর্ড,—আর তাহার নীচে লেখা ক্ষুদ্র কথাটী যেন সূক্ষ্ম আলপিন্। আপনারা সকলেই জানেন, ঐ আলপিন্‌টী যত সূক্ষ্মাগ্র হয় ততই রেকর্ডের গান বেশ পরিষ্কার শোনা যায়; ভোঁতা পিন্ হইলে, গানও ভাল শোনা যায় না, উপরন্তু রেকর্ডখানি নষ্ট হইয়া যায়। চিত্রে বিজ্ঞাপনও ঠিক সেইরূপ। চিত্রের নীচে অথবা পার্শ্বে লেখা কথাটি যত ছোট হয় ততই উহার জোর বাড়ে এবং ততই উহা চিত্রখানির মর্ম্মস্পর্শী ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু কথাটি যদি বড় ও বেশী হয় তবে চিত্রের ব্যাখ্যা ভাল হয় না এবং ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়া যায়। চিত্রে বিজ্ঞাপনের ইহাই প্রকৃত স্বরূপ। সুতরাং ইহাতে চিত্র আঁকা ও কথা রচনা দুইটি বিষয়েই খুব দক্ষতা চাই। এরকম আর্টিষ্ট কমই দেখা যায়;—কারণ, প্রকৃত চিত্রে বিজ্ঞাপন অতি অল্প সংখ্যকই আমাদের চোখে পড়ে। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

গ্রামোফোন কোম্পানী "হিজ্ মাষ্টার্স্ ভয়েস্" (His Master's Voice) এর ছবিখানি সকলেরই খুব পরিচিত। সেই বিখ্যাত ছবি না দেখিয়াছেন, এমন লোক নাই। আমাদের মনে হয়, ঐ ছবিখানি খাঁটী চিত্রে বিজ্ঞাপন। কারণ, ইহাকে যদি কেহ বাঁধাইয়া বৈঠকখানার দেওয়ালে টানাইয়া রাখেন, তাহা হইলে কেহ বলিতে পারেন না যে, উহা গ্রামোফোন কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। এই চিত্রের স্বকীয় একটা পৃথক ভাব আছে, যাহার সহিত ব্যবসায়ের কোন সম্বন্ধ নাই। বাস্তবিক চিত্রে বিজ্ঞাপন এরূপ হওয়া উচিত, যেন কেহ বুঝিতে না পারে উহা কোন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন। এখানে সৌভাগ্য বশতঃ এমন অবস্থা

দাঁড়াইয়াছে যে, কোম্পানীর নাম ও চিত্রের নাম একই। ইহা একটী বিশেষ সুবিধা। কারণ, চিত্রের নীচে যদি চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং অথবা ইউনাইটেড ট্রেডার্স্ লিমিটেড এসব কথা লিখিতে হয় তবেই ত সে বিজ্ঞাপনের আর কোন চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য্য থাকে না।

"হিজ্ মাষ্টার্স্ ভয়েসের" বিজ্ঞাপনে যেমন এক দিকে চিত্রের নামেই কোম্পানীর পরিচয়ও হইয়া গিয়াছে, আর একদিকে তেমনি চিত্রের পরিকল্পনায় ও আর্টিষ্টিক সৌন্দর্য্যে, কোম্পানীর জিনিষের গুণাগুণের ব্যাখ্যাও পরিস্ফুট হইয়াছে। ছবিতে বুঝা যায়, একটি প্রভুভক্ত কুকুর তাহার মৃত প্রভুর কণ্ঠস্বর গ্রামোফোনে শুনিয়া ঠিক চিনিতে পারিয়াছে। তাহার চক্ষু দিয়া দুই এক ফোঁটা জল পড়িতেছে, চিত্রকর সুকৌশলে তাহাও দেখাইয়াছেন। চোখের জল দেখাইবার অর্থ এই যে, কুকুরটি প্রভুর স্বর চিনিতে পারিয়াছে। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা দাঁড়াইল এই যে, কোম্পানী যে গ্রামো-ফোন যন্ত্র বিক্রয় করিতেছেন, তাহা এত উৎকৃষ্ট এবং তাহাতে কণ্ঠস্বর এত অবিকৃত হুবহু শোনা যায়, যে সামান্য কুকুরও তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে। এইখানেই ব্যবসায়ীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। এমন প্রচ্ছন্ন ভাবে আসল কথাটী যাইয়া লোকের প্রাণে লাগে যে, তাহা আর কিছুতেই ভুলিতে পারা যায় না।

কলিকাতার রংয়ের দোকানে সকলেই দেখিয়াছেন, একখানি লোহার প্লেটের উপর এনামেল করা একখানি ছবির নীচে লেখা আছে,—"Now they'll have to use it" অর্থাৎ "এখন তা'দের ইহা ব্যবহার করতেই হবে"। ছবিখানি এইরূপ,—একটা ছোট ছেলে রংয়ের টীনের মধ্যে বুরুশ ডুবাইয়া সামনের দেওয়ালে দুই তিনটী পোচ দিয়া রং লাগাইয়া দিয়াছে,—সে যেন বলিতেছে "এখন তা'দের ইহা ব্যবহার করতেই হবে"। ছবি খানি আর্ট হিসাবে খুব উঁচু দরের বলিয়া আমাদের মনে হয়। ইহাতে ছেলের দুষ্টুমির ভাব সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যবসায়ীর স্বার্থের জন্য ছবির এই আর্টের দিকটাও খুব দরকার। এই ছবিখানিতে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবেন। কোন পথিক যদি চলিতে চলিতে ছবি খানির দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে মনে হয়, পথিকের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুষ্টু ছেলেটিও যেন চোখ ফিরাইয়া মুচকি হাসিতেছে;—ছবি খানিকে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম জন্মে। এক্ষণে বিজ্ঞাপন হিসাবে ছবি খানির মূল্য কতটুকু তাহাই দেখা যাক্। "হিজ্ মাষ্টার্স্ ভয়েসের" মত এখানে ছবির নীচের লেখা কথার সহিত কোম্পানীর নামের কোন মিল নাই। ছবির এক কোণে ইংরাজীতে ডিস্‌টেম্পার,—Distemper এই কথাটা লেখা আছে। এই নামের দ্বারা কোম্পানীর নাম প্রকাশিত না হইলেও, কোম্পানীর তৈয়ারী জিনিষের নাম বুঝা যাইতেছে। কোম্পানী যে রং প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার নামই "ডিস্‌টেম্পার"। সুতরাং এখানে জিনিষের নামের দ্বারাই কোম্পানীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কারণ, রেজেষ্টারী ও পেটেণ্ট আইন অনুসারে ঐ নাম আর কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না। আবার "ডিস্‌টেম্পার" কথার সঙ্গে আর্ট হিসাবে

ছবিরও সামঞ্জস্য আছে। ডিস্‌টেম্পার শব্দের অর্থ "কুপিত করা,—কাহাকেও চটিয়ে দেওয়া"। এক্ষণে ছবিখানি দেখিলে বুঝা যাইবে, ঐ দুষ্ট ছেলেটি মিস্ত্রীদের চটাইবার জন্য খানিকটা জায়গাতে বুরুশ দিয়া রং লাগাইয়া দিয়াছে। সুতরাং সমস্ত ছবিতে ঐ যে Distemper এবং Now they'll have to use it এই কথা দুইটী লেখা আছে, তাহাতে বিজ্ঞাপন না বুঝাইয়া ছবির সম্বন্ধে একটা পৃথক ভাব ব্যক্ত করিতেছে। এইখানেই চিত্রে বিজ্ঞাপন সার্থক ও জোরাল হয়। এইখানে এই চিত্রের দ্বারা ব্যবসায়ীর আসল কথাটী কিরূপে প্রকাশ হইল, তাহাই বলিতেছি। এই দুষ্ট ছেলেটী একজায়গায় যে খানিকটা রং মাখাইয়াছে, তাহা আর কোন প্রকারেই উঠাইয়া ফেলিবার উপায় নাই, সুতরাং একরকম করিবার জন্য এ সমস্ত জায়গাতেই এখন রং মাখাইতে হইবে। ইহাতে রং-এর-চির-স্থায়িত্ব গুণটী প্রকাশ পাইল। বিজ্ঞাপনের প্রকৃতমর্ম্ম এই খানে।

আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। যদিও আমরা এই বিজ্ঞাপনের বিষয়ীভূত দ্রব্যের বিরোধী, তথাপি চিত্রে বিজ্ঞাপনের কৌশলটী বুঝাইবার জন্য তাহা উল্লেখ করিতেছি। "হোয়াইট্ হর্স্" নামে একপ্রকার মদ্য বাজারে খুব বিক্রয় হয়। তাহার একটী বিজ্ঞাপনে এইরূপ চিত্র অঙ্কিত আছে,—একটী সুন্দর সাদা তেজী ঘোড়া বেড়ার উপর দিয়া লাফাইয়া আসিতেছে। আর কিছু নয়। ছবিরনীচে লেখা আছে, "First over the bar" অর্থাৎ বেড়া ডিঙ্গাইয়া সর্ব্বপ্রথম আসিয়াছে। ছবির উপরে এক কোণে লেখা আছে White Horse. মোটামুটি ছবি খানি দেখিতে বিজ্ঞাপন বলিয়া মনে হইবেনা। ছবিতে মদের বোতল বা অন্য এমন কিছু আঁকা নাই, যাহাতে উহাকে বিজ্ঞাপন বলিয়া বুঝায়। কিন্তু যাহারা মদ্যের সহিত পরিচিত, তাহারা যখনই "হোয়াইট্ হর্স্" দেখিবে, তখনি নীচের কথাটার ব্যাখ্যা তাহাদের নিকট অন্যরূপ হইয়া উঠিবে। Bar কথাটীর তখন আর ঘোড়দৌড়ের চক্করের বেড়া বুঝাইবেনা,—তাহার অর্থ হইবে, শুঁড়িখানার রেলিং, যাহাতে খদ্দেরকে ও দোকানদারকে পৃথক রাখে। সেখানে "হোয়াইট্ হর্স্" নামক মদ্যই ঐ রেলিং এর উপর দিয়া সকলের আগে পরিবেশন করা হয়। কারণ, উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যেমন ঘোড়দৌড়ে ঐ সাদাঘোড়াটী সকল ঘোড়াকে পিছনে ফেলিয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া আগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানেও চিত্রে কোম্পানীর নাম দেওয়া দরকার হয় নাই। কারণ, জিনিসের নামটী এত পরিচিত যে, তাহাতেই কোম্পানীকে চেনা যায়। নীচের লেখা কথাটীর দ্বারা জিনিসের উৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা চিত্রে বিজ্ঞাপনের আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত এইখানে দিতেছি।

(প্রথম চিত্র)

এই চিত্রে সমুদ্রের তীরে ঝটিকাবিধ্বস্ত (Ship-wrecked) একখানি জাহাজের নানারূপ মালপত্রের মধ্যে এক কেস্ হুইস্কি নির্জ্জন বেলাভূমিতে পড়িয়া আছে। বাক্সটির একখানি ভাঙ্গা খোলা এবং তাহার পেরেক দুইটিও দেখা যাইতেছে।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী গরীব লোকেরা সময়ে অসময়ে প্রায়ই এইরূপ বেলাভূমির উপর দিয়া ঘুরিয়া

বেড়ায় এবং অনেক সময় ঝটিকা বিধ্বস্ত জাহাজের নানারূপ মাল পত্র কুড়াইয়া পায়; অবশ্য এরূপ ভাগ্য কালে ভদ্রে ঘটে, কিন্তু নানা রূপ রঙ্গীন ঝিনুক, প্রবাল, শঙ্খ, শামুক ও নানা জাতীয় সামুদ্রিক জীব যাহা গভীর সমুদ্রের মধ্য হইতে প্রতিনিয়ত ঢেউয়ের মুখে সমুদ্রের তীরে ভাসিয়া আসে এবং উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহা কুড়াইয়া নিয়া সহরে যাইয়া বিক্রয় করা ইহাদের একটা উপরি আয়ের পথ। একজন নাবিক এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট আয়ের আশায় বেলা ভূমির তীর ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এই মদের বাক্সটি দেখিতে পাইয়া পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া দেখে যে

Got here just at the right time and found every thing O. K.

এক বাক্স মদ তীরে পড়িয়া আছে। খড়ের চাপ সরাইয়া একটি বোতল বাহির করিয়া দেখে যে বোতল সব অটুট সিল করা অবস্থাতেই আছে এবং বোতল খুলিবার কর্কস্ক্রুটীও পাশে রহিয়াছে। তখন সে আনন্দের আবেগে অধীর স্ফুর্ত্তি লইয়া নৃত্য করিতে করিতে আপন মনে বলিতে লাগিল,—

Got here just at the right time and found every thing O. K.

অর্থাৎ ঠিক সময়েই ঠিক জায়গায় এসে

সমস্ত চিত্রটাই সামুদ্রিক জীবনের নানারূপ বিপদপাৎ, জাহাজ ডুবি এবং সমুদ্রতীরবাসী দুঃস্থ নাবিকদিগের দৈনিক জীবনের একখানি সুন্দর suggestive আলেখ্য। এই চিত্রের মধ্যে বিজ্ঞাপন দাতাদের কোথায়ও কোনও নাম গন্ধ নাই, কেবল মদের বাক্সটার (case) গায়ে, যেমন সব বড় বাক্সের গায়ে লেবেল মারা থাকে, তেমনি বড় বড় হরপে SCOTCH WHISKY এই কথাটা লেখা আছে। Scotch Whisky যে একটা বিখ্যাত মদের নাম একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। সুতরাং বিজ্ঞাপনের জন্য একখানি মহাভারত না লিখিয়া মাত্র বাক্সের গায়ে এই ক্ষুদ্র কথাটা লেখা থাকায় বিজ্ঞাপন দাতার উদ্দেশ্য চমৎকার সফল হইয়াছে।

—

দ্বিতীয় চিত্র

THIS IS THE PLACE TO GET "STOUT".

দ্বিতীয় চিত্রে একটা মদের দোকানের Counter দেখা যাইতেছে ; Counter এর উপর এক পাশে একটা glazed earthenware এর Decanter রহিয়াছে এবং আর এক পাশে একটা মদের বোতল রহিয়াছে। দোকানে একজন বিপুলকায় অপরিমিত-মেদ-বিশিষ্ট বর্ত্তুলাকার খরিদদার ঢুকিয়াই পরমানন্দে এক গ্লাস মদ হাতে করিয়া বলিতেছে,—

This is the place to get "stout" !

আকৃতি প্রকৃতি এবং ভাবভঙ্গীতে ছবিখানি দর্শকের চিত্তাকর্ষণ এবং হাসির উদ্রেক না করিয়া পারে না। আর তার উক্তিতে ঐ যে "Stout" কথাটা রহিয়াছে উহার মধ্যেই আসল রসিকতাটুকু লুকাইয়া আছে। stout মানে মোটা, আবার stout একপ্রকার মদেরও নাম। মাতাল দোকানে ঢুকিয়া গ্লাসটী হাতে তুলিয়া মনের আনন্দে যখন বলিতেছে This is the place to get stout, তখন তার মানে করা যায় যে এখানে এলে মোটা হওয়া যায়, আবার এও মানে করা যায় যে এখানে এলে stout পাওয়া যায়।

ছবির ব্যাখ্যাত বিষয় সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করা গেল। এপর্য্যন্ত বিজ্ঞাপিত বস্তুর কোনও নিশানা দেখা গেল না। কিন্তু বোতলটীর গায়ে "stout" নামক মদের লেবেলটী নজরে পড়িতেই বিজ্ঞাপন দাতার সব উদ্দেশ্যই জাহির হইয়া গেল।

(তৃতীয় চিত্র)

তৃতীয় চিত্রে একখানি stool এর উপর একটী পিপা রহিয়াছে; তাহার গায়ে যে stopcockটী আছে ঠিক তাহার নীচে একটী বড় ডিক্যাণ্টার এবং তাহার পাশে কতকগুলি বোতল রহিয়াছে। চিত্রে দেখানো হইয়াছে, পিপার মধ্যস্থিত তরল পানীয় ডিক্যাণ্টারে ভরিয়া নিয়া বোতলগুলিতে পোরা হইবে।

এই পিপাটীকে আলিঙ্গন করিয়া এক মদ্যপ বলিতেছে:—

My liking for you is turning to love

My liking for you is turning to love

অর্থাৎ তোমাকে আমার এত ভাল লাগে যে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। আপাতঃ দৃষ্টিতে কোথায়ও কোন বিজ্ঞাপনের চেষ্টা দেখা যায় না। কেবল পিপাটীর গায়ে বড় বড় হরপে এটী XXX লেখা আছে। সকলেই জানে যে Three XXX একটী বিখ্যাত মদের নাম। সুতরাং বিজ্ঞাপনের কাজ ওইখানেই সুসিদ্ধ হইয়া গেল।

(চতুর্থ চিত্র)

এই চিত্র খানিতে একটা লরীর ওপর একটী পিপা রহিয়াছে এবং সেই পিপার উপর ঘোড়ায় চড়ার মত বসিয়া এক মদ্যপ বলিতেছে'—

I am on a good thing here—come and join me.

পিপাটীর গায়ের উপর লেখা আছে "Bung's Beer".

ইহার উপর বিজ্ঞাপনের আর বেশী পরিচয় দিবার প্রয়োজন করে না।
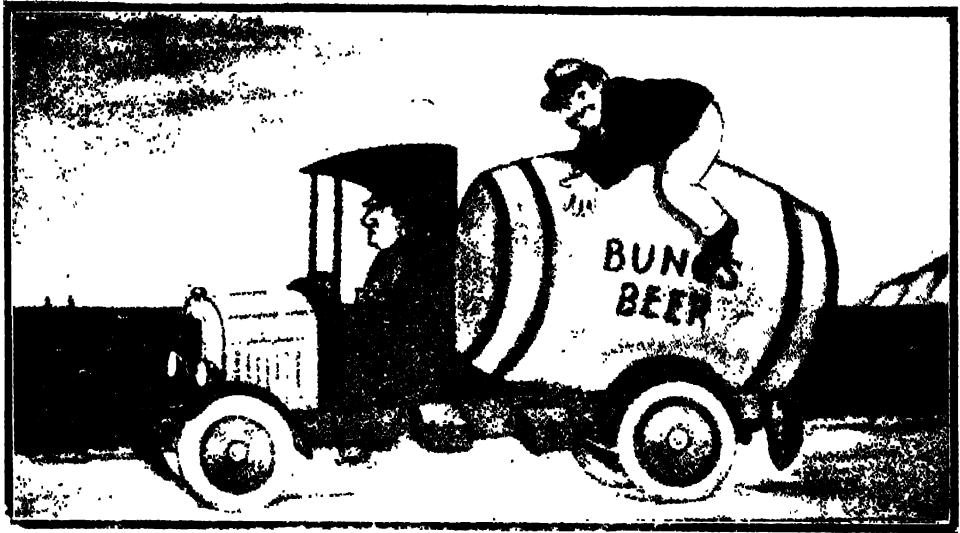
I am on a good thing here—come and join me.

যে-সকল জিনিস বা কারবার খুব পুরাতন হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এরূপ চিত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া কঠিন কার্য্য নহে। অথবা যাঁহাদের জিনিস খুব পরিচিত তাঁহারাও নিজেদের কোম্পানীর নাম না দিয়া কেবলমাত্র চিত্রে দু'টী মাত্র কথার দ্বারা সুন্দর বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে চিত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে জবাকুসুম, কেশরঞ্জন, লক্ষ্মীবিলাস, ইণ্ডিয়া ইকুইটেবিল, লিলিবিস্কুট—এবং ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ানের নাম উল্লেখযোগ্য। আমরা এই সকল বিজ্ঞাপনের বিষয় অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এখানে কেহ তর্ক তুলিতে পারেন, বিজ্ঞাপনের চিত্র দেখিয়া এত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা কেহ করিতে পারিবে না,—কেহ বুঝিবেও না সুতরাং ঐ বিজ্ঞাপন নিষ্ফল হইবে। তার উত্তরে আমরা বলি, এই প্রকার চিত্রে বিজ্ঞাপন সাময়িক বা অল্পকাল স্থায়ী নহে। শুধু বিজ্ঞাপন হিসাবে নয়, আর্টিষ্টিক চিত্র হিসাবেও ইহা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি,

বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া লোকের চক্ষে পড়িবে,—ঘরে বাহিরে সর্বদা দৃষ্টিগোচর হইবে। সুতরাং ইহার ব্যাখ্যা কাহাকেও জোর করিয়া বুঝাইতে হইবে না,—উহা আপনা আপনি লোকের মনে আসিবে এবং ব্যবসায়ীর অনুকূলে একটি ভাব তাহার মনে জাগিয়া উঠিবে। তখনই সেই জিনিষটী কিনিবার জন্য তার আগ্রহ জন্মিবে। চিত্রে বিজ্ঞাপন এইরূপে সার্থক হয়। এই প্রকার বিশেষ চিত্র রেজেষ্টারী করা স্থায়ী ট্রেড মার্ক রূপেও ব্যবহার করা যায়।

আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে চিত্রে বিজ্ঞাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা উহা স্থায়ী ভাবে চালাইতে পারেন নাই বলিয়া অনেকটা নিষ্ফল হইয়াছে। চিত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুবিধার জন্য প্রথম যখন কোন নূতন কারবার খোলা হয়, তখন তৎ-সম্পর্কিত জিনিষটীর নাম এমন বাছাই করিয়া রাখিতে হইবে, যেন তাহাতে চিত্রে বিজ্ঞাপনের কথা রচনার কৌশলও সুবিধা পাওয়া যায়। আগামীতে আমরা বিজ্ঞাপনে চিত্র সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব।

মধ্যপ্রদেশের কোন সহর হইতে জনৈক ভদ্রলোক (তাঁহার গ্রাহক নং ৫৮৯৭) আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, তিনি সেখান হইতে উৎকৃষ্ট মিহি আতপ চাউল, সরিষা, গম, ছোলা, গালা প্রভৃতি কলিকাতায় চালান দিতে পারেন। তিনি ঐ সকল মালের আড়তদার অথবা পাইকারী খরিদ-দারের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার পত্র এই পুস্তকের "পত্রাবলী" অধ্যায়ে প্রকাশিত হইল। যাঁহারা তাঁহার সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা "ম্যানেজার, ব্যবসা ও বাণিজ্য, ৯৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা এই ঠিকানায় আমাদের নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীহট্ট জেলার সুলতানপুর (পোঃ পাগলা) গ্রাম হইতে শ্রীবিপিন বিহারী দাস শিমুলতুলা চালান দিতে এবং ক্রিজিডেয়ার ও কেলভিনেটর কিনিতে চাহেন। "পত্রাবলী" অধ্যায়ে তাঁহার পত্র প্রকাশিত হইল। যাঁহারা তাঁহার সহিত কারবার করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা সোজাসুজি তাঁহার নিকট পত্র লিখিবেন।

মিঃ ডি গোস্বামী, পোঃ লক্ষ্মীপুর জেলা গোয়ালপাড়া (আসাম) হইতে লিখিয়াছেন যে, তিনি প্রচুর লাক্ষা সরবরাহ করিতে পারেন। যদি কোন খরিদদার থাকেন, তিনি সোজাসুজি তাঁর কাছে পত্র লিখিয়া কথাবার্ত্তা ঠিক করিতে পারেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক অথবা পাঠকদিগের মধ্যে যদি কাহারও কোনও জিনিষ বেচিবার বা কিনিবার দরকার থাকে তবে তাহা আমাদিগকে জানাইলে আমরা বিনামূল্যে আমাদের "ব্যবসায়ের সন্ধান" নামক অধ্যায়ে তাহা আমূল প্রকাশ করিব। এজন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোনও চার্জ্জ লইব না। নাম, ধাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং চিঠি পত্রাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন।

সম্পাদক

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বনিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ: তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

পত্র লেখকগণের প্রতি

(যাঁহারা গ্রাহক নহেন)

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাঁহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, অথচ বিনামূল্যে এমন সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন যাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তাঁহাদের মতলব, **"একটি হরিতকীও গুরুদক্ষিণা দিব না,—কিন্তু মন্ত্রটি আদায় করিয়া নিব"।** এই রকমের লেখকদিগকে আমরা জানাইতেছি, ব্যবসায়ীর সন্ধান এবং মাল পত্র বেচা-কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাঁহারা এক একটা মালের জন্য এক এক বারের কারবারে শ' দু'শ হইতে হাজার টাকা পর্য্যন্ত দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ীর সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও

নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্য ৫।৵০ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হইলেই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা মোটা দালালী দিতে অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ, এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,—নেও,—দেও,—ফেল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাঁক তালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,—অথচ তার জন্য একটা পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ, এই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

১৬ বৎসর যাবৎ কার্য্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি, গোড়াতে ফাঁকিবাজীর মতলব, বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে একটা প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য আমাদের অনুরোধ, যাঁহারা সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন। যাঁহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-শুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান মুফতি দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে এই যে, তাহারা যথেষ্ট লাভবান এবং উপকৃত হইয়াছেন আর আমরা লাভবান হওয়া ত দূরের কথা, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাহাদের পেট ভরাইয়াছি। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে। এই জন্য অতঃপর গ্রাহক না হইলে কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।

(যাঁহারা গ্রাহক আছেন)

আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহকগণ আমাদিগকে নানাবিধ ব্যবসায়সংক্রান্ত পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সকল প্রশ্ন করেন তাহার উত্তর ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিনা মূল্যেই প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ঐ সকল পত্রের অধিকাংশই উদ্দেশ্যবিহীন বৃথা প্রশ্নে পরিপূর্ণ। অনেকেই কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান। বাস্তবিক কোন কাজকারবারে হাত দিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। তাঁহাদিগকে জানাইতেছি, আমরা তাঁহাদের জন্য বাজারে ঘুরিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া নানা রকমের সংবাদ সংগ্রহ করি, যদি তাঁহারা সে সকল কোন কাজে না লাগান, তবে আমাদের শুধু শুধু হয়রান এবং অর্থ ব্যয় করান কেন? তাঁহাদের নিকট অনুরোধ, যেন খামকা আমাদিগকে প্রশ্ন না করেন এবং আমাদের নিকট হইতে যে সন্ধান, সংবাদ অথবা পরামর্শ পাইয়া থাকেন তাহা যেন যথার্থ কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া নিজেরাও লাভবান্ হন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিশ্রমকেও সার্থক করেন।

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মারফতে দিতে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, আমরা সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথকভাবে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র জোগাড় করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি **আমাদের যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ৫৲ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন।** গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে এই ফি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদিগের কাগজেই বিনা মূল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিকে প্রদান করিব। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক নম্বর পাঠানো চাই।**

১নং পত্র

মহাশয়,

আমি এই বিদেশে কয়েকমাস যাবৎ আছি। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট মিহি আতপ চাউল, সরিষা, গম, ছোলা, ল্যাক্ (গালারজন্য যাহা গাছে জন্মে) অন্যত্র, বিশেষ করিয়া কলিকাতা মোকামে চালান হইয়া থাকে। এই চালানী ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশেষ মুনাফা পাইয়া থাকে। আমার নিজের কোন মূলধন নাই। সংগ্রহ করিবার উপায়ও বর্ত্তমানে নাই। যদি কোন বিশিষ্ট খরিদ্দার কিংবা আড়তওয়ালার সংস্পর্শে আসিতে পারি, তবে এই চালানী কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। কলিকাতাস্থ ও হাবড়াস্থ যে সব আড়তদার ও খরিদ্দার উল্লিখিত মাল খরিদ করিয়া থাকেন, তাহাদিগের নাম ও ঠিকানা অনুগ্রহ করিয়া যদি আমাকে জানান তবে বিশেষ উপকৃত ও বাধিত থাকিব। ইতি—

X.Y.Z.

(ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক নম্বর ৫৮৯৭)

১নং পত্রের উত্তর

আপনার পত্রের মর্ম্ম "ব্যবসায়ের সন্ধান" শীর্ষক অধ্যায়ে প্রকাশিত হইল। আপনার অভিপ্রায় অনুসারে আপনার নাম অপ্রকাশিত থাকিল। কিন্তু আমাদের নিয়ম অনুসারে ৫ টাকা জমা না পাইলে এই সম্বন্ধে ব্যবসায়ী দিগের সহিত খরচখরচা করিয়া লোক পাঠাইয়া আপনার সহিত পত্রাদি লেখালেখি করিতে পারিব না, কারণ তাহার জন্য খরচ আছে এবং সময়ও লাগে। কোন সংবাদ আপনাকে জানাইতে অথবা কোন ব্যবসায়ীর সঙ্গে আপনার পরিচয় করাইয়া দিতে গেলে আমাদের পারিশ্রমিকাদি খরচ বাবদ ৫৲ টাকা জমা দিতে হইবে। কারণ, আমাদের এত কাজ যে, এ সকল বাহিরের ঝঞ্ঝাট নিজের পকেট হইতে টাকা খরচ করিয়া এবং সময় দিয়া ঘাড়ে নিতে পারি না। আপনার নিজের নাম প্রকাশ করিয়া সোজাসুজি চিঠিপত্র লিখিয়া কারবার করাই ভাল। সেই জন্যই

ব্যবসায়ের সন্ধান অধ্যায়ে আপনার পত্র প্রকাশ করিয়াছি। ঐ পত্রে আপনার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করিলে সব উত্তর আপনি সোজাসুজি পাইবেন। সে জন্য আপনার কোন খরচা লাগিবে না।

২নং পত্র

মহাশয়,

অত্রসহ একখানা রিপ্লাই কার্ড দিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিস্তারিত উত্তর দিয়া চিরবাধিত করিবেন। আমি আপনাদের ১৩৩৫ বাং পত্রিকা পাঠে অনুপ্রাণিত হইয়াছি এবং এই সব বিষয়ের সংবাদ লইতে আগ্রহান্বিত হইয়াছি। সম্প্রতি কলিকাতার বাজারে সাধারণ সবীজ শিমূল তূলার দর কত এবং বীজ ছাড়া তূলার দরই বা কত, সবিশেষ জানাইবেন। ব্যবসায় করিলে অবশ্য নমুনা পাঠাইব এবং আপনাদের হাত দিয়াই চালাইব। ২৫৲ মণ হইতে ৫০৲ মণ পর্য্যন্ত তূলা চালান দেওয়া গ্রাহ্য হইবে কিনা। কারবার করিলে অবশ্য আরও বেশী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব। তবে সঠিক মূল্য জানিতে চাই। কারণ, এখানকার দর ও আনুসঙ্গিক খরচ মিলাইয়া দেখিতে হইবে। বিলাতে ২০।২৫ মণ করিয়া খাঁটী তুলা পাঠান সম্ভব কি না জানাইবেন। দরই বা কত জানিতে ইচ্ছুক। ফ্রিজিডেয়ার, কেলভিনেটর বরফ তৈয়ারী কলের দাম কত, আপনাদের নিকট আছে কিনা জানাইবেন। আশা করি, জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির বিস্তারিত উত্তর পাইতে বঞ্চিত হইব না। ইতি—

নিবেদক—
শ্রীবিপিন বিহারী দাস
পোঃ পাগলা,
গ্রাম সুলতান পুর (শ্রীহট্ট)

২নং পত্রের উত্তর

(১) শিমূল তূলার দর আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যের বাজার দর শীর্ষক অধ্যায়ে দেখিবেন।

(২) ফ্রিজিডেয়ার ও কেলভিনেটর আমরা বিক্রয় করি না। সাইজ ও মেজার অনুসারে ইহার দাম চারি পাচশত টাকা হইতে হাজার বারের শত টাকা পর্য্যন্ত হয়।

(৩) আপনার পত্রের মর্ম্ম "ব্যবসায়ের সন্ধান" শীর্ষক অধ্যায়ে প্রকাশিত হইল; ঐ সম্পর্কিত ব্যবসায়ীরা আপনার নিকট সোজা সুজি চিঠি লিখিতে পারেন।

৩নং পত্র

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন এই,

আপনাদের ১৩৪০ সালের আশ্বিন মাসের ব্যবসা বাণিজ্য পত্রিকায় "গুলি সূতার কল" প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। আমিও নিজে ঐ প্রকার একটি কল আনিয়া নানা প্রকার গুলি সূতা বাহির করিয়া ব্যবসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও জ্ঞান না থাকাতে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্ন আপনাকে করিতেছি। আশা করি, এই উত্তর হইতে আমার অনেক উপকার হইবে।

১। আমি দিনাজপুর বা রংপুর সহরের উপর গুলি সূতার কল আনিয়া ব্যবসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার বিবেচনায় এই দুই সহরের কোন এক সহরে বসিলে সুবিধা হবে কি? দিনাজপুর সহরের উপর এই কল এ-যাবত কেহ আনে নাই।

২। বাজারে সাধারণতঃ (আলেকজাণ্ডার ৯০ এবং ১৬০) সেলাই কলে ও সাধারণ কার্য্যে ব্যবহার হয়। আমি এই কলে ৯০ এবং ১৬০ মত মোটা ও সরু সূতা তৈরী করিতে পারিব কিনা। এই গুলি ঠিক আলেক্জেণ্ডার সূতার মত শক্ত হইবে কিনা।

৩। বাজারে যে ফেটী কিনিতে পাওয়া যায় তাহা দুই প্রকার বুঝিলাম। এক প্রকার বাজার চল্‌তি এলো পাকের ফেটী সূতা। আর এক প্রকার Twisted yarn ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া লিখিবেন। ৯০ এবং ১৬০ ইত্যাদি বোধ হয় Twisted yarn হইতেই তৈরী হয়। এখন কথা হইতেছে, ১৬০ এবং ৯০ গুলি সূতা Twisted yarn এর কয় প্লাই সূতা হইতে তৈরী হয়।

৪। Twisted yarn ২ প্লাই, ৩ প্লাই ইত্যাদি ফেটীর মূল্য কত? বিড়ী ইত্যাদি বাঁধিবার সূতা এলো পাকের ফেটী হইতে তৈরী হয়,-না Twisted yarn হইতে তৈরী করিতে হয়?

৫। নানা প্রকার রং বেরংয়ের কাপড়ের জন্য নানা প্রকার রঙ্গীন গুলী সূতা পাওয়া যায়। আমারও সেই প্রকার পদ বাহির করিবার ইচ্ছা আছে। সূতা, পাকা রং করিবার কোন সহজ সাধ্য উপায় আছে কিনা! বহি থাকিলে তাহা পাওয়া যায় কিনা ও তাহার মূল্য কত?

৬। সূতা রং করিতে হইলে বোধ হয় কোরা Twisted Yarn Bleaching Powderএ সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া কাঁচা অবস্থায় রংএ দিয়া ছায়ায় শুকাইয়া এরারুটে দিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। কি করিতে হয় জানাইবেন।

৭। ২০ নম্বর কোরা Twisted Yarn মূল্য (এক ফেটী) ৭৲ টাকা লিখিয়াছেন। Bleached Twisted Yarn এর এক ফেটী মূল্য কত তাহাও জানাইবেন।

৮। Twisted Yarn কোরা এবং Bleached ২ প্লাই, ৩ প্লাই ইত্যাদি ফেটীর মূল্য কত জানাইবেন।

৯। এইটুকুই আমাকে সঠিক জানাইবেন। এই Twisted Yarn হইতে গুলি সূতা হইলে বাজার চল্‌তি আলেকজাণ্ডার সূতার মত শক্ত হইবে কিনা? ইহা বিশেষ করিয়া লিখিবার কারণ, বাজারে কয়েক প্রকার দেশী সূতা দেখা যায় যাহা সেলাইর কলে মোটেই কার্য্যকরী নয় এবং একটু জোরে টানিলেই ছিড়িয়া যায়। তাই এই কলেও যদি শক্ত গুলি সূতা না হয় তবে বাজারে মালও কাটিবে না এবং ব্যবসাও চলিবে না। উপরন্তু দেশীয় দ্রব্যের উপর লোকের অনাস্থা জন্মিবে।

১০। গুলী সূতার লেবেল ইত্যাদি কোথায় ছাপাইতে হয়?

১১। প্রথম প্রথম আমি সমস্ত খরচ বাদে যদি দৈনিক ২।৩ টাকাও উপার্জ্জন করিতে পারি, তবে জীবন সার্থক মনে করিব।

আমিও একটী মধ্য শিক্ষিত বেকার মনুষ্য। দিন কালের অবস্থানুসারে কিছুতেই কিছু করিতে পারিতেছি না। পরিবার লইয়া মরিবার উপায় হইয়াছে। তাই আপনার নিকট সদুপদেশ পাওয়ার জন্য বহু কথা লিখিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতেছি। আশা করি, মহাশয় আমাকে দয়া করিয়া এই গুটী সূতার কলের সমস্ত বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিয়া অতি সত্বর জানাইবেন। যাহাতে কল আনিয়া

২ পয়সা রোজগার করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারি তাহারই ব্যবস্থাযুক্ত উত্তর চাই। যাহাতে এই দরিদ্র লোকটীর একটী গুলী সূতার-কল আনিয়া অনর্থক অর্থ নষ্ট না হয় তাই করিবেন।

আমি ২০০।২৫০৲ টাকার এক পয়সাও বেশী মূলধন যোগাড় করিতে পারিব না। আপনার পত্র পাইলে একবার কলিকাতা যাইয়া আপনার নিকট হইতে কল আনিব ও বিস্তৃত উপদেশ লইব। ইতি—

শ্রীবাসুদেব ঘোষ

থানসামা পোঃ, দিনাজপুর

৩নং পত্রের উত্তর

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্য ১নং পত্রের উত্তর পড়িয়া দেখিলে আপনার অনেক কথার জবাব পাইবেন। সূতার রকমারি মূল্যাদি বিষয়ে জানিবার জন্য সূতা ব্যবসায়ী-দিগকে চিঠি লিখিবেন,—ঐ জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্য ৫নং পত্রের উত্তরে কতিপয়, সূতাব্যবসায়ীর ঠিকানা দেওয়া হইয়াছে, দেখিবেন। অন্যান্য বিষয়ে আপনি কল কিনিতে কলিকাতায় আসিলে সাক্ষাৎভাবে কথাবার্ত্তা হইতে পারে, চিঠিপত্রে সেই সব খুঁটি নাটি ব্যাপার আপনাকে বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে।

৪নং পত্র

মহাশয়,

বিনীত নিবেদন এই, এই বছরের "ব্যবসা ও বাণিজ্য"র বাঁধাই এক সেট বিনামূল্যে নমুনা স্বরূপ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

ঠিকানা—

Md. Asmat Ali Maih
Timber Merchant
Kalapara Bander,
Po. Khepapara,
Barisal Dt.

পুনঃ—ঐ সঙ্গে একখানা মাসের তারিখের Wall Calender, অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইলে কৃতার্থ হইব।

৪নং পত্রের উত্তর

ব্যবসা ও বাণিজ্যের বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। এই বৎসর ত সবে মাত্র আরম্ভ হইল। শেষ না হইতে এই বৎসরের বাঁধাই সেট্ কিরূপে পাঠাইব? তারপর বাঁধাই সেট্ বিনামূল্যে পাওয়া যায়, এ-সংবাদ আপনি কোথায় পাইলেন? পুরাতন বাঁধাই সেটের দাম ২৷৷০ টাকা,—নূতন সেটের দাম পত্রিকার বার্ষিক মূল্যের সমান। এসকল কথা আমাদের বিজ্ঞাপনেই লেখা আছে। বাঁধাই সেট্ দূরে থাক্, আমরা একখানি "ব্যবসা ও বাণিজ্য" ও বিনা মূল্যে নমুনা স্বরূপ পাঠাই না।

আমাদের কোন Wall Calender নাই।

অশ্বগন্ধা

৺রায় তারকনাথ সাধু
বাহাদুর, সি, আই, ই লিখিত

ভাষাভেদে নাম ভেদ—

বাঙ্গালা—অশ্বগন্ধা	হিন্দী—অসগন্ধ
আরবী—মেহেমন্ বরী	ফার্শী—এসগন্ধ নাগরী
গুজরাট—আশগন্ধ	কর্ণাট আগান্ধু অঙ্গুর
বোম্বাই—অশ্বগন্ধ	মহারাষ্ট্রে—অশ্বগন্ধা আগজ্ আসককন্দ
তেলেগু—অশ্বগন্ধা	তামিলী—অচুবগণ্ডী পিল্লী আঙ্গা

ইংরাজী—Inter Cherry

সংস্কৃত পর্যায়—অশ্বগন্ধ, হয়াহ্বয়া, বরাহ, কর্ণী; বরদা, বলদা, কুষ্ঠগন্ধিনী।

পরিচয়—ইহা ভারত জাতীয় গাছের মূল। এই গাছ প্রায় এক গজ উচ্চ হয় ইহার পাতা চওড়া বাসক পাতার মত। পাতার বোঁটা ছোট এবং পাতায় লোম যুক্ত। ইহার ফুল ছোট এবং এই ফুল বোঁটার মূল হইতে নির্গত হয়। ফুল দেখিতে পীতাভ হরিদ্রাবর্ণ। ইহা গুচ্ছাকারে ফুটে। ইহার ফল মটরের মত গোলাকার লাল বর্ণ এবং ইহা একটী আবরণ মধ্যে থাকে। ইহার মূল আঙ্গুলের মত সরু। মূলের উপরিভাগ কটাবর্ণ ভাঙ্গিলে ভিতরে সাদা দেখা যায়। আস্বাদনে ঈষৎ তিক্ত। কাঁচা মূল ঘোড়ার মূত্রের মত গন্ধযুক্ত। কিন্তু শুষ্ক হইলে ঐ প্রকার গন্ধ না থাকিয়া ঘোড়ার গাত্রের গন্ধ মত গন্ধযুক্ত হয়। ইহার বীজ অতি ক্ষুদ্র। অশ্বগন্ধ গাছ দুই প্রকার দেখা যায়—নাগরী ও দক্ষিনী। তম্মধ্যে নাগরীই উৎকৃষ্ট।

ঔষধার্থে ইহার মূল ব্যবহৃত হয়। অধিক দিনের পুরাতন হইলে পোকা ধরে; উহা ঔষধার্থে ব্যবহার করা উচিৎ নহে। টাটকা ও কাঁচা মূলই উৎকৃষ্ট।

মাত্রা ।০ আনা হইতে ॥০ আনা পর্য্যন্ত ওজনে। ইহার ক্ষার—৵০ আনা হইতে ।০ আনা মাত্র ওজনে।

আয়ুর্ব্বেদীয় মতে

অশ্বগন্ধা—বায়ু, কফ, ধবল, শোথ ও ক্ষয় রোগ নাশক এবং বলকারক, রসায়ন, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত। ইহা উষ্ণ বীর্য্য ও শুক্রবর্দ্ধক।

গুণ প্রকাশিকা সংজ্ঞা

পুষ্টিদা বল্যা, বাতঘ্না, বাজীকরী।

রাজনিঘণ্ট,—"অশ্বগন্ধা কটুষ্ণা স্যাত্তিকা চ
মদগন্ধিকা বল্যা বাতহরা
হন্তি কাপশ্বাস ক্ষয়
ব্রণান্।"

ভাবপ্রকাশ—বায়ু হৃদগত হইলে অশ্বগন্ধা উষ্ণ জল সহ পেষণ পূর্ব্বক সেবনীয় তাহাতে হৃদগত বায়ু প্রশমিত হয়।

চরক—শ্বাস রোগীকে ঘৃত মধুসহ অন্তর্দ্ধূমদগ্ধ অশ্বগন্ধার ক্ষার সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার পায়।

বঙ্গসেন—অশ্বগন্ধাচূর্ণ চিনি ও গব্যঘৃত একত্রে মিশাইয়া লেহন করিলে নষ্টনিদ্রের নিদ্রা লাভ হয়।

সুশ্রুত—**শোষরোগে**

কুট্টিত অশ্বগন্ধা—২ তোলা | একত্রে মিশাইয়া
গব্যদুগ্ধ—আধ পোয়া | ক্বাথ প্রস্তুত করিবে
নির্ম্মল জল—দেড় পোয়া | আধ পোয়া অর্থাৎ দুগ্ধ বিশেষ রাখিয়া নামাইবে। পরে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

কেহ কেহ বলেন, ঐ ক্বাথ মন্থন পূর্ব্বক মাখম উত্থিত হইলে উহাই পান করিতে দিবে। ইহাতে শোষ রোগে উপকার পাওয়া যায়।

চক্র দত্ত—**বাত ব্যাধিতে**—অশ্বগন্ধার ক্বাথ ও কল্ক এবং গব্যঘৃত ও চতুর্গুণ গব্য দুগ্ধ সহ যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিবে।

এই ঘৃত—বাতঘ্ন, বৃষ্য ও মাংস বর্দ্ধক।

উদরীরোগে—গোমূত্রে অশ্বগন্ধা পেষণ পূর্ব্বক পান করাইবে।

বন্ধ্যাত্বে—অশ্বগন্ধার ক্বাথে কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত প্রক্ষেপ করিয়া ঋতুস্নাতা বালাকে পান করিতে দিবে।

ইহা গর্ভপ্রদ।

"ক্বাথেন হয় গন্ধায়াঃ সাধিতং সঘৃতং পয়ঃ
ঋতুস্নাতা বালা পীতা ধত্তে গর্ভং ন সংশয়ঃ।

শিশুর পুষ্টির জন্য—দুগ্ধ, ঘৃত, তিল তৈল বা ঈষৎ উষ্ণ জল সহ অশ্বগন্ধা চূর্ণ সেবন করাইবে।

পীতাশ্বগন্ধা পয়সার্দ্ধমাসম্
ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা
কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে।"

অশ্বগন্ধা সহ অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া বৈদ্যেরা অনেকানেক ঔষধ প্রস্তুত করেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ।

১। অশ্বগন্ধাদি চূর্ণ

অশ্বগন্ধামূল ও বৃদ্ধদারক মূল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। পরে উহা অর্দ্ধ হইতে এক তোলা মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেবন করিলে দেহের পুষ্টি সাধন হয়।

২। অশ্বগন্ধা ঘৃত

অশ্বগন্ধার কল্ক এক ভাগ, দুগ্ধ ১০ ভাগ, ঘৃত ১ ভাগ, একত্রে পাক করিবে। ইহা সেবনে বালকের পুষ্টি বৃদ্ধি হয়।

৩। অশ্বগন্ধা তৈল

অশ্বগন্ধা—শতমূলী—কুড়—জটা, মাংসী—কণ্টিকারী ফল-এ ঐ সকল মিলিত করিয়া তৈলের চতুর্থাংশ—দুগ্ধ তৈলের চতুর্গুণ দিয়া পাক করিবে। ইহাতে শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধি হয়।

১। অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, গাম্ভারী, শতমূলী, পুনর্ণবা দ্বারা সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে ক্ষত ও ক্ষয় রোগ প্রশমিত হয়। এইরূপ নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হয়। উহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ডাক্তারী মত

আর, এন, ক্ষৌরীকৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—

অশ্বগন্ধা—বল্য, রসায়ন ও অবসাদক।

অশ্বগন্ধা মূলচূর্ণ দুগ্ধ কিম্বা ঘৃত সহ ক্ষীণ শিশুকে সেবন করাইলে শিশু অতি শীঘ্র পুষ্টি লাভ করে।

অশ্বগন্ধা (Alternative) রসায়ন বলিয়া খণ্ড মোদকাদি রূপে ব্যবহার করিলে ক্ষয়রোগ, জরাকৃত দৌর্ব্বল্য, ও বাতরোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

অশ্বগন্ধার পত্র এরণ্ড তৈলে সিদ্ধ করিয়া স্ফোটকাদির উপর স্থাপন করিলে তদঙ্গ সুপ্ত হয় অর্থাৎ ত্বকের স্পর্শ জ্ঞান রহিত হয়।

অশ্বগন্ধার বীজে **দুগ্ধ জমাট** বাঁধাইবার শক্তি আছে।

হেকিমী মতে

ইহা পেটে বাতে বিশেষ উপকারী এবং ধবল রোগে বিশেষ উপকারী। অশ্বগন্ধার মূল জলে বাটিয়া প্লেগ রোগীর স্ফীতস্থানে প্রলেপ দিলে রোগী অচেতন থাকিলেও তাহার চৈতন্য হইবে। এবং শরীরের সমস্ত বিষ সংগ্রহ করিয়া স্ফোটককে পাকাইয়া নির্গত করিয়া দেয়।

অশ্বগন্ধার কাঁচা শিকড় অর্দ্ধ পোয়া লইয়া ২৪ ঘণ্টা কাল জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর পিপাসার সময় সেই জল পান করিলে তিন দিবসে অর্শের রক্তপাত বন্ধ হয়।

ইহা চূর্ণ ও ঘুঁটের ছাই প্রত্যেক ৷৵০ ওজনে একত্রে মিলিয়া আটটি পুরিয়া করিবে।

ইহার এক একটি পুরিয়া গাভী দুগ্ধ সহ সেবন করিতে হয়। সাতদিন মাত্র সেবনে উপদংশ রোগী আরোগ্য লাভ করে। ইহা ব্যবহার করিলে একমাস পর্য্যন্ত টক্ ঝাল অথবা কোন বায়ুবৃদ্ধিকর দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। কোমরের বেদনায় ইহার ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।
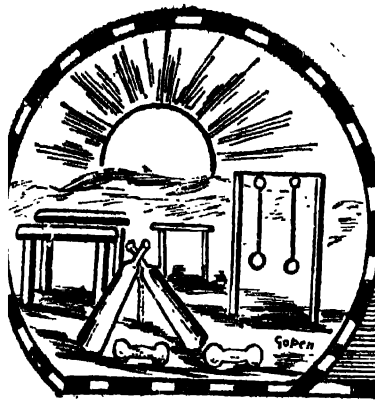
লবণ ক্যানসারের ঔষধ

ক্যালিফোরনিয়া ইউনিভারসিটির ডাক্তার আরনেষ্ট লরেন্স আবিষ্কার করিয়াছেন যে, সাধারণ লবণ ক্যানসারের একটি ঔষধরূপে গণ্য হইবে। তিনি ক্যানসারের ঔষধ আবিষ্কার করিবার জন্য বহুদিন হইতে গবেষণা করিতেছেন এবং একটি বিশিষ্ট উপায় দ্বারা লবণ হইতে রেডিয়ামের ন্যায় রশ্মি বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, রেডিয়াম রশ্মি অপেক্ষা লবণ রশ্মির শক্তি অধিকতর হইবে। তিনি গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, রেডিয়ামরশ্মি যেমন কখনো মৃদু কখনো শক্তিশালী হয়, লবণ রশ্মি তেমন নহে। লবণ রশ্মি একেবারে নির্ম্মল ও অবিশুদ্ধ। সুতরাং ক্যানসার আরোগ্য করিতে লবণ কাজে লাগিবে।

ন্যাসনাল টিউবারকিউলোসিস্ সমিতি পাঁচ বৎসর গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জীবিকার্জ্জনের জন্য মানুষ যেরূপ কাজ করে তাহার জীবনের পরিমাপও সেইরূপ হয়। আয়ুর সহিত কাজের নিকট সম্বন্ধ আছে। এই সমিতি এ সম্বন্ধে যে Statistics সংগ্রহ করিয়াছেন হইতে দেখা যায় যে পুরোহিত, পাদ্রী, আইন ব্যবসায়ী এবং জজদিগের অপেক্ষা Firemanদের আয়ু বেশী হয়। যদিও Firemanদিগকে দিনের মধ্যে কতবার যে মই দিয়া উঠা নামা করিয়া জীবন বিপদাপন্ন করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। এত বিপদের মধ্যে থাকিয়াও তাহারা বেশী দিন বাঁচে।

কলেজের প্রফেসর এবং প্রেসিডেন্টগণের আয়ু সাধারণতঃ বেশী হয় কিন্তু বিমানবিহারিগণ বেশী দিন বাঁচে না।

শ্রমিকদিগের মধ্যে ১৬ হইতে ৬৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লোকই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অনভিজ্ঞ এবং অপটু শ্রমিকগণ Professional লোকদের অপেক্ষা বেশী মারা যায়। সাধারণ শ্রমিকদিগের মধ্যে অপরিপক্ক শ্রমিকগণই ক্ষয়কাসে অধিক সংখ্যায় মারা যায়।

Professional লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশই ৪৫ বৎসর পূর্ণ হইবার পর হার্টের অসুখে আক্রান্ত হয়।

ভারতে যক্ষ্মারোগীর হাসপাতাল সমুহের তালিকা

বঙ্গদেশ ঃ—Jadabpore Tuberculosis Hospital and Sanatorium. কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলের যাদবপুর ষ্টেশনের সন্নিকটে।

বিহার ও উড়িষ্যা ঃ—Itki State Sanatorium বি, এন, রেলের ইতকী ষ্টেশন হইতে ১০ মিনিটের রাস্তা এবং রাঁচী সহর হইতে ১৪ মাইল পশ্চিমে।

মান্দ্রাজ ঃ—(ক) Edward VII Tuberculosis Institute, (Egmore)

(খ) Arogyavaram or The Union-mission Tuberculosis Sanatoriums. (Madanpalle). এম এস, এম, রেলের মদনপেলি ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

বম্বে :—(ক) Turner Sanatorium Bhoiadu, Paul.

(খ) Dr, Bahadurjee Memorial Sanatorium, Deolali (camp).

(গ) Bel-Air' Sanatorium Panchgoni

পুনা ঃ—Hindu Sanatorium, Karla, Poona. জি, আই, পি রেলের মালাবল্লী ষ্টেশনের নিকটে অবস্থিত।

রাজমুণ্ড্রী ঃ—Visranthepuram Tuberculosis Sanatorium, Rajahmundry, East Godavari (South India). রাজমুণ্ড্রী সহর হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

পঞ্জাব ঃ—King Edward Sanatorium, Dharampore (Simla Hills) এন, ডবলিউ রেলের কালকা সিমলা শাখার ধরমপুর ষ্টেশন হইতে ১০ মিনিটের রাস্তা।

রাজপুতানা ঃ—Mary Coilson Sanatorium, Tilounia (Rajputana)।

(ক) **যুক্তপ্রদেশ বা ইউ, পি** ঃ—লক্ষ্ণৌ মেডিক্যাল কলেজের সহিত Tuberculosis Hospital আছে।

C P & Berar ঃ—প্রদেশে ছিন্দওয়ারাতে (Chhindwara) এবং U. P.তে সুলতানপুরে কয়েদীদের চিকিৎসার জন্য দুইটী যক্ষ্মার হাসপাতাল আছে।

(খ) Sanatorium for tuberculosis (Almora) আর এবং কে রেলের কাটগুদাম ষ্টেশন প্রায় ৮২ মাঃ দূরে।

(গ) King Edward Sanatorium Bhowali (Nainital) উক্ত কাঠগুদাম ষ্টেশন হইতে ২১ মাইল দূরে অবস্থিত।

ইংলণ্ডের স্বাস্থ্যনীতি

ডাক্তার শ্রীঅমলচন্দ্র গাঙ্গুলী, এম-বি
ডি-পি-এচ, ডি-টি-এম্

আজকাল অনেক সংবাদপত্রে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তুলনামূলক সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের জন্ম মৃত্যুর হার, শিশু-মৃত্যুর হার ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক বেশী।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, অধিকাংশ রোগই নিবারণ করা যায়। একটী রোগীকে নিরাময় করা অনেক সময়ে কঠিন, কিন্তু রোগ নিবারণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক সহজ. এইজন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রোগ নিবারণ কল্পে গভর্ণমেণ্ট প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন, কারণ, যে অর্থের দ্বারা ১০০টী রোগীর চিকিৎসা হওয়া সম্ভব সেই অর্থের দ্বারা একশত অপেক্ষা অনেক বেশী লোককে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে রোগ নিবারণ করার চেষ্টা অন্যান্য দেশের চেয়ে খুব অল্পই হইয়াছে। রোগ আরোগ্য করিবার জন্য এখানে কিছু হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রোগ নিবারণের চেষ্টা সে হিসাবে খুব কমই হইতেছে। ইংলণ্ডের স্বাস্থ্য-নীতি আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব আমরা কতটা পশ্চাৎপদ।

ইংলণ্ডে গর্ভস্থ শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই স্বাস্থ্য গঠন ও রক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিবিধ প্রকারে সাহায্য করেন। রোগ নিবারণ কল্পে বিবিধ প্রকার গবেষণা করিয়াই গভর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত হন না, তাহার সাহায্য লইয়া নব নব উদ্ভাবিত উপায়ে রোগ নিবারণ করিতে চেষ্টা করেন।

ইংলণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্র প্রসূতি হাসপাতাল ও শিশু-স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতি আছে, এগুলি গভর্ণমেণ্ট ও জিলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর অর্থে পরিপুষ্ট। এই সকল হাসপাতাল ও সমিতি হইতে গর্ভবতী রমণীর নিকট স্বাস্থ্য পরিদর্শক পাঠান হয়। তাঁহারা গর্ভাবস্থায় কিরূপে জীবন যাপন করা উচিত সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন ও প্রয়োজন হইলে বিনামূল্যে চিকিৎসাও করেন। এই ব্যবস্থা কাহারও উপর নির্ভর করে না; পার্লামেণ্টের Maternity & Child Welfare Act of 1918 অনুসারে ইহা প্রত্যেক জিলা বোর্ডের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। অজ্ঞ ধাত্রীর হাত হইতে লোককে রক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট একটি Midwifes Act করিয়াছেন। ইহার ফলে পাশ করা ধাত্রী ব্যতীত অপর কেহ নিজেকে ধাত্রী বলিলে বা ধাত্রীর কাজ করিলে

তাহাকে ১৫০৲ পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হয়। এই জন্য বিলাতে প্রত্যেক ধাত্রীকে পাশ করিতে ও লাইসেন্স লইতে হয়। এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমিয়া গিয়াছে।

শিশুদের উন্নতি কল্পে আরো অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র পিতামাতার শিশুদের বিনামূল্যে দুগ্ধ দেওয়া হয়। Children's Act of 1908 অনুসারে বালকদের বিড়ি সিগারেট কিংবা অন্য কোন মাদক দ্রব্য বিক্রয়, দণ্ডনীয়। কোন বালক চৌর্য্য কিংবা অন্য কোন অপরাধে দণ্ডিত হইলে তাহাকে জেলে দেওয়া হয় না, তাহাকে Reformatory School এ পাঠাইয়া দেওয়া হয়। যাহাতে ভবিষ্যৎ জীবনে সে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে এরূপ কোন অর্থকরী বিদ্যা এখানে তাহাকে শিখাইয়া দেওয়া হয় ও তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। Refotmatory School হইতে বাহির হইয়া অধিকাংশ বালকই বেশ ভদ্রভাবে জীবনযাপন করে। অনেকেই জানেন, ইংলণ্ডে ৫ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন চিকিৎসক থাকেন তিনি মাঝে মাঝে ছাত্রদের পরীক্ষা করিয়া সম্প্রদায়ের প্রায় প্রত্যেক লোক National Health Insurance Act এ বিশেষরূপে উপকৃত হয়। এই আইনটি অতি চমৎকার। এই আইন অনুসারে যদি কোন পুরুষ সপ্তাহে চারি আনা করিয়া দেয় তাহা হইলে অসুস্থ হইলে বিনামূল্যে ঔষধ পায়, চিকিৎসার জন্য কিছু ব্যয় করিতে হয় না। অসুস্থাবস্থায় উপার্জ্জন করিতে পারিবে না বলিয়া সপ্তাহে পুরুষদের প্রায় ১১৲ টাকা এবং স্ত্রীলোকদের প্রায় ৯৲ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। যদি সেই লোকটি আরোগ্য না হয় তাহা হইলে তাহাকে দেখেন ও প্রয়োজন হইলে দাঁত, চোখ, কাণ ইত্যাদির চিকিৎসা করেন; এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় অনেক রোগ বিশেষতঃ দাঁত, চোখ, কাণ টন্‌সিল্ ও চর্ম্মরোগ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব ছাত্র-সমাজে কমিয়া গিয়াছে।

কোন ছাত্রের হঠাৎ সংক্রামক ব্যাধি হইলে তাহাকে আর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না ও বিদ্যালয় গৃহ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে পরিশুদ্ধ (disinfect) করান হয়। ইংলণ্ডে দরিদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যবিত্ত লোকদিগকে এইরূপ দেখা হয় ও তৎপরে রোগ নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে প্রতি সপ্তাহে ৫।০ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের পর দুই তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই আইন অনুসারে প্রতি সপ্তাহে ৩০৲ করিয়া পায়। এই আইনের দ্বারা শ্রমিক সম্প্রদায় যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে।

সংক্রামক রোগ নিবারণ কল্পে ইংলণ্ডে কয়েকটি আইন আছে। এই সকল আইন অনুসারে যদি কাহারো ঘরে কোন সংক্রামক রোগ হয় তাহা হইলে তাহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে County Council এর ডাক্তারকে খবর দিতে হয়। যদি কোন ডাক্তার কোন সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখেন তাহা হইলে তাঁহাকেও খবর দিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থা করার জন্য County Council এর ডাক্তার খুব অল্প সময়ের মধ্যে খবর পান ও রোগ যাহাতে প্রতিবেশীদের মধ্যে সংক্রামিত না হইতে পারে এইজন্য বিশেষ চেষ্টা করেন ও প্রয়োজন হইলে

রোগীকে হাঁসপাতালে যাইতে বাধ্য করিতে পারেন। কোন সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে ট্রেনে, মোটর গাড়ীতে, বাসে কিংবা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে গোপনে লইয়া যাওয়া দণ্ডনীয়।

Infectious Preventive Act of 1890 অনুসারে কোন ভাড়াটিয়া বাড়ী পরিশুদ্ধ (disinfect) না করিয়া পুনরায় গোপনে ভাড়া দিলে কিংবা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে সংক্রামক রোগী বহন করিয়া পরিশুদ্ধ না করাইলেও দণ্ড পাইতে হয়।

উপদংশ, গণোরিয়া প্রভৃতি রোগ যাহাতে সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া না পড়ে তাহার জন্য পতিতাদের মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়; রোগ লুকাইয়া রাখিয়া ব্যবসা চালাইলে দণ্ড হয়।

তথায় খাদ্যের উপরও গভর্ণমেন্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। দুগ্ধ ফুটাইয়া লইলে দুগ্ধের ভাইটামিন ও অন্যান্য জিনিষ নষ্ট হয় বলিয়া কাঁচা বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহের বিশেষ সুবিধা আছে। আইন অনুসারে দুগ্ধের শ্রেণী ভাগ করা আছে; যে সকল গোশালা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুগ্ধ সরবরাহ করা হয় বলিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হয় সেই সকল গোশালার গাভীদের তিন মাস অন্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়, ছয় মাস অন্তর তাহারা যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত কিনা তাহা নির্ণয় করা হয়। যন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ দোহন করাইয়া শীলমোহর করা টিনে ভর্ত্তি করা হয়। প্রত্যহ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় কোন বীজাণু দুগ্ধের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে কিনা। সাধারণ দুগ্ধ pasteurize করা হয় অর্থাৎ প্রায় আধঘণ্টা ১৩০° ডিগ্রি উত্তাপে রাখা হয় ও তাহার পর শীলমোহর করা টীনে ভর্ত্তি করা হয়।

উপরোক্ত আইন ব্যতীত স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিবিধ প্রকার নিয়ম করিয়াছেন, যথা—প্রত্যেক বাড়ীর নিকট বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা থাকিবে, বাড়ীর প্রত্যেক ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকিবে, বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে খোলা জমি থাকিবে।

এই সকল ব্যবস্থার গুণে আজ ইংলণ্ডের জনসাধারণের স্বাস্থ্য এত ভাল। পূর্ব্বেকার অপেক্ষা মৃত্যুর হার, শিশু মৃত্যু, বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই সমস্তগুলির মধ্যে আমাদের দেশে কিছু কিছু প্রচলন হইয়াছে ও হইতেছে, আশা করা যায়, কালে সমস্তই প্রবর্ত্তিত হইবে।

আমাদের দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণ বিষয়ে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা আর সর্ব্বোপরি আমাদের কুসংস্কার আমাদিগকে পাশ্চাত্য জগৎ হইতে অনেক পশ্চাৎপদ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বে প্রসবের জন্য বা চিকিৎসার জন্য কেহ হাঁসপাতালে যাইতে চাহিতেন না, কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমে চলিয়া যাইতেছে, আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আমরা সমস্ত দুর্ব্বলতা ও কুসংস্কার দূর করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষায় সমস্ত জগতের সহিত সমান ভাবে চলিতে পারিব।

মফঃস্বলে চিকিৎসকের অভাব

[শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

পল্লীগ্রামে লোক থাকিতে চায়না কেন? ইহার অনেক কারণ আছে সত্য, কিন্তু চিকিৎসকের অভাব যে সর্ব্বপ্রধান কারণ তাহা অস্বীকার করা যায় না। কবিরাজী টোট্‌কা চিকিৎসা এবং হোমিওপ্যাথি না থাকিলে আজ যে কয়টা মানুষও নিরোগী আছে তাহাও থাকিত কি না সন্দেহ।

জনসংখ্যার অনুপাতে বাঙ্গলার প্রতি চৌদ্দ হাজার লোকের জন্য একজন মাত্র চিকিৎসক ছিল; এখনও যে তাহা অপেক্ষা আনুপাতিক বৃদ্ধি পাইয়াছে এমন মনে হয় না, বরং পূর্ব্বে যে পরিমাণ পাশকরা ডাক্তার পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইত এখন তদপেক্ষা কম ডাক্তার সেখানে ফিরিয়া যায়। কলিকাতার সদর রাস্তার উপরত কথাই নাই, অলিতে গলিতে ডাক্তারখানার এত বৃদ্ধি এবং প্রতি ডাক্তারখানায় এক জনের স্থলে তিন চারিজন ডাক্তারের গাদাগাদি দেখিয়া কে না বলিবে যে, মফঃস্বলের ডাক্তার পূর্ব্বাপেক্ষা আনুপাতিক হ্রাস পাইয়া সহরের ডাক্তার সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৫বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় কত ডাক্তারখানা বা ডিস্পেন্সেরী ছিল এবং এখন কত হইয়াছে ইহা কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স বিভাগের হিসাবপত্র দেখিলে বুঝা যায়; কিন্তু Statistice বা সংখ্যা তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার আগ্রহ আমাদের নাই এবং সেজন্য অর্থব্যয় করা আমরা ফাজিল কাজ বলিয়াই মনে করি। অথচ সত্য নির্দ্ধারণের পক্ষে ইহাযে কত অপরিহার্য্য তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কোনও নির্ভর যোগ্য Statistics না থাকিলেও চাক্ষুষ দেখিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, পনর বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় কলিকাতায় ঔষধালয়ের সংখ্যা অন্ততঃ দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গড়পড়তা ঔষধালয় পিছু তিনজন ডাক্তার ধরিলে ডাক্তারের সংখ্যা কলিকাতায় ত্রিশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; ফলে, ইহাদের কদর কমিয়াছে। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ লোকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে। কবিরাজী বিজ্ঞাপন প্রচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশপ্রীতি বাহুল্যর জন্য বিশেষতঃ জটিল রোগ সমূহের জন্য কবিরাজী চিকিৎসার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় গৌরবের সহিত বলিয়াছিলেন, 'কবিরাজকে ষোলটাকা ভিজিট দিয়া ডাকিবে ইহা আমরা কখনও কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই! আর আজ চৌষট্টি টাকা দিয়াও লোক

কবিরাজ ডাকিতেছে। কলিকাতায় কবিরাজের সংখ্যা অন্ততঃ এখন ত্রিশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই এলোপ্যাথিক চিকিৎসার এতগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রমশঃ বলবান হওয়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই এলোপ্যাথি চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নবীন ডাক্তারগণের পেশা দাঁড়াইয়াছে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দালালী করা। রোগীর চিকিৎসা করিয়া ইঁহারা যাহা না রোজগার করিতে পারেন, একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্য আবশ্যক বলিয়া চৌষট্টি টাকা বা বত্রিশ টাকার একজন বিশেষজ্ঞ আনাইলে ইঁহারা কমিশন ও ভিজিট লইয়া যাহাহউক দুই পয়সার মুখ দেখিতে পান। এই সকল বিশেষজ্ঞ এবং রক্ত, মূত্র, শ্লেষ্মাদি পরীক্ষা হইলেও তাঁহারা আরও কিছু কমিশন পাইয়া থাকেন। ইহার উপর ২।৪টা ইন্‌জেকশন 'কেস' পাইলেই ইঁহারা নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করেন। এই সকলের চাপে কলিকাতার লোকে এখন এলোপ্যাথিকের হাতে সহজে যাইতে চায় না; ইহার উপর আর এক উপসর্গ হাঁসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি। পূর্ব্বের ন্যায় ভদ্রলোকে আর এখন হাসপাতালের ভয় করে না। এমন কি, হাসপাতালের প্রসূতী-আগারেও গর্ভবতী স্ত্রীগণকে প্রসবের জন্য পাঠাইতে কেহ সম্ভ্রম নাশ মনে করেন না।

"আউটডোরের" ডাক্তার

নবীন ডাক্তারের দল হাসপাতালে রোগী ধরিবার আশায় এখন হাসপাতালে হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন—বিনা পারিশ্রমিকে আউট-ডোর হাঁসপাতালে ইঁহারা এখন রোগীকে দেখিয়া থাকেন এবং কোথাও একটী জায়গা খালি হইলে ঐ পদের জন্য দুইশত দরখাস্ত পড়িতে শুনিয়াছি। আউটডোর হাসপাতাল এখন নবীন ডাক্তারদের পক্ষে একটি রোগী শিকার করিবার আড্ডা হইয়াছে। এখানে যেরূপ অসুবিধা ও অশিষ্টাচার সময়ে সময়ে সহ্য করিতে হয় তাহা অপেক্ষা ওখানের একজন ডাক্তারকে ২৲ ১৲ ভিজিট দিয়া গৃহে ডাকা সুবিধাজনক ভাবিয়া এবং ঔষধ বিনামূল্যে পাইবার বন্দোবস্ত হইবার আশায় অনেক সময়ে ডাক্তারদের রোগী সংগ্রহ হয়।

সহরে ডাক্তারী

সহরের বিভিন্ন পল্লীতে এবং বিভিন্নশ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে ইহাদের দালাল আছে। টাকায় চারি আনা কমিশন দিলে এই দালালেরা রোগী আনিয়া দেয়; সময়ে সময়ে ভাল রোগী হইলে আধা-আধি বখরা হইয়া থাকে। একথা সহরের অনেকেই জানেন। বেশ্যাগণ ডাক্তারকে যেরূপ মুক্তহস্তে অর্থদান করে ভদ্রলোকে তাহা পারে না, কারণ শরীরের স্বাস্থ্যের উপরই তাহাদের রোজগার নির্ভর করে। ইন্‌জেকসনের কল্যাণে এক জাতীয় রোগীর চিকিৎসাও সরল হইয়াছে। এরূপ বিনা মস্তিষ্ক চালনায় রোগী চিকিৎসা অনেক নবীন ডাক্তারের পক্ষে নানা কারণে লোভনীয় ব্যাপার, কাজেই মফঃস্বলের অভিভাবকগণ বয়ঃপ্রাপ্ত ডাক্তার সন্তানকে কলিকাতায় রোজগারের জন্য পাঠাইয়া কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে পারেন তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে দেশের চিকিৎসকের অভাব দেখিয়া অনেকে

চিকিৎসকের অভাব দূর করিবার জন্য সহরে আসিয়া পরে বিদ্যালাভ করিয়া অবিদ্যাপাড়ায় স্বীয় বিদ্যার প্রচার করেন। আর এদিকে তাঁহার জন্মভূমি পল্লীগ্রামে লোকেরা চিকিৎসার অভাবে শ্যামা-পোকার ন্যায় রোগের অনলে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। একস্থানে চিকিৎসক-বাহুল্য, অন্যত্র চিকিৎসকের অভাব!

কবিরাজের ভিড়

কলিকাতায় রোজগারের খ্যাতি শুনিয়া কবিরাজ মহাশয়েরা অবধি এখন এখানে জড়িবটীর ঝুলি লইয়া সুবৃহৎ সাইনবোর্ড "অমুক নামজাদা কবিরাজস্যভ্রাতুস্পুত্র, শিষ্য" ইত্যাদি বিজ্ঞাপন দিয়া ধোপ দোরস্ত ফরাসওয়ালা বিছানা পাতিয়া, তদুপরি বন্ধুদের জন্য কয়েকটী তাকিয়া, গড়গড়া, পান, বিড়ি ও পিকদানীতে সুসজ্জিত বৈঠকখানা, তথা চিকিৎসাখানায় দিবারাত্র আসর জাগাইয়া বসিয়া আছেন। মফঃস্বলের পূর্ব্বাগত কয়েকজন কবিরাজের ভাগ্যোন্নতি দেখিয়া দলে দলে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের পল্লীগ্রাম হইতে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় কবিরাজশ্রেণী আসিয়া জড় হইতেছে। নিজেরা ঔষধ তৈয়ারীর কিছু জানুক আর না জানুক একটী প্রকাণ্ড প্রস্তরের খল ও মুশল লইয়া জনৈক হিন্দুস্থানী বেহারা দিবারাত্র দ্বারদেশে উপবিষ্ট আছে।

মেডিক্যাল স্কুল

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লর্ড কারমাইকেল ও রোনাল্ডসে লাট সাহেবদ্বয়ের আমলে মফঃস্বলের জেলায় জেলায় মেডিক্যাল স্কুল (কলেজ নহে) স্থাপন করিবার জন্য আবেদনের ফলে এই নীতি মঞ্জুর হইয়াছিল এবং বর্দ্ধমান হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটী স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিতও হইয়াছিল, কিন্তু রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে ঐ প্রস্তাব এখন কোথায় তলাইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সম্বন্ধে কাউন্সিলের সভ্যগণ যদি অবহিত হন তাহা হইলে পল্লীগ্রামে চিকিৎসার উন্নতির একটী প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইবে। কেবল পল্লীমুখী হইতে পরামর্শ দিলেই লোকে পল্লী-গ্রামে ফিরিবে না। ইতঃপূর্ব্বে এই আন্দোলন উত্থাপন করিয়া সুফল পাইয়াছিলাম বলিয়াই ইহার পুনরালোচনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

ভারত কোন পথে ?—

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত। মূল্য চারি আনা মাত্র। ৪ বি, বৃন্দাবন পাল বাই লেন, শ্যামবাজার কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান, আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডি এম্ লাইব্রেরী কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি প্রধানতঃ রাজনৈতিক এবং কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জওহরলালজীর কম্যুনিজমের প্রতিবাদ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সমস্যার সহিত দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও যথার্থ জাতি-গঠনের কাম্য যে বিশেষরূপে জড়িত, গ্রন্থকার সেই ভাবেই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন এবং আমরাও তাহা সমর্থন করি। ১০৫ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখক সংক্ষেপে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—(১) টেররিজম বা সন্ত্রাসবাদ জাতীয় আন্দোলন আখ্যার যোগ্য নহে, উহা ভারতের লজ্জার কারণ; সুতরাং তাহা ছাড়িতে হইবে, উন্মূলিত করিতে হইবে। (২) ইংরাজ ও ভারতের সম্বন্ধ এক সময়ে বিজেতা-বিজিত ছিল বলিয়া আজ আর তাহা নহে, এবং চিরদিন তাহা থাকিবে না। দুই পরাক্রান্ত জীবন্ত জাতির প্রকৃত সম্বন্ধ বৈরিতা নহে, সহকর্ম্মিতা। সুতরাং ভারতে জাতীয়তা গঠনের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। (৩) পণ্ডিত জওহরলাল ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে যে রুশিয়ার কম্যুনিজম্ আনিতে চাহিতেছেন, তাহা একটা প্রকাণ্ড ভুল। কম্যুনিজম্ ভারতের স্বধর্ম্ম নহে উহা এদেশে চলিবেনা। গ্রন্থকারের বিস্তারিত আলোচনায় স্থানে স্থানে আমাদের সহিত মতের অমিল থাকিলেও মোটের উপর তিনি উপরি উক্ত যে তিনটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

অসহযোগ আন্দোলন যে কতবড় ভুল করিয়াছে, লেখক তাহা প্রমাণ করিতে যাইয়া বলেন, -

মুক্তির অতীব আবেগে আমরা মত্ত হয়ে সুরেন্দ্রনাথের মডারেট মনোবৃত্তির পরই নিছক ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়েছিলাম, অসহযোগের ধ্বজা তুলে কারাবরণ করেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম সহযোগ বুঝি করা হ'য়ে গেছে, ব্যর্থ সে রাস্তার পুনরাবৃত্তিতে কাজ নেই। সে সময়ে অরবিন্দ যদি নির্ব্বাসনে না যেতেন, মহারাষ্ট্র কেশরী তিলক যদি অকালে মৃত্যুমুখে না পড়তেন, তা'হলে জাতির এ ভ্রান্তি হয়তো সহজেই কাটতো। * * * * * *

আমরা চেয়েছি অপরে আমাদের শিক্ষা দিবে, মানুষ করবে" আমাদের ঘর সংসার গুছাবে; আর নিছক পরোপকার করতে সাত সমুদ্র পার হ'য়ে এদেশে এসে ইংরাজ যেন শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে; এ আবদার অলস, তামসিক, অসহিষ্ণু, নাবালক জাতিরই সাজে। আমরা নিজের দেশের শিক্ষার জন্য কতটুক করেছি, দরিদ্র চাষীর ঋণভার কমাতে আমাদের পলিটিক্যাল স্বরাজলুব্ধ কংগ্রেস কতটুকু খেটেছে?—

* * * * সভাসমিতি মিছিল ভুয়ারাও নৈতিক তামাসা আন্দোলনই যাদের হ'য়েছে পেশা। * * * * ঐ গবর্ণমেণ্ট দেশের রক্তে দেশের ধন-জন-বলে গড়া মায়ের শক্তিপীঠ, বিদেশী নয়; তোমার নিছক শত্রু নয়। যদি সে রাজশক্তি এতদিন জাতির কল্যাণ সাধনে বিমুখ ছিল, সে পাপ তোমার।"

গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগীতা না করাতেই যে জাতীয়তা গঠনের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে তাহা গ্রন্থকার বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন'—

"শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় শিক্ষা, দেশবন্ধুর পল্লীসংগঠন, মহাত্মাজীর অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও অস্পৃশ্যতা নিবারণ সবই সমান ব্যর্থতায় পরিণত হ'য়েছে, কারণ এঁরা সকলেই উপেক্ষা করেছিলেন, দেশের শাসন শক্তিকে, ব্যবস্থাপক মণ্ডলীকে,—Legislative ও Executive শক্তিকে। তাঁরা গেছিলেন হাওয়ার রাজপ্রাসাদ গড়তে,—ভাবের চোরা বালুর উপর দেশযজ্ঞের ভিত্তি রচনা করতে। তাই স্বায়ত্তশাসনে নাগরিক স্বাধীনতা দিতে হ'য়েছিল ঐ বহু লাঞ্ছিত Satanic গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে নরমপন্থীর রাজা সুরেন্দ্রনাথকেই। বাংলার দেশবন্ধু স্বরাজ্য দলের যত শক্তি যত চেষ্টা ও স্থায়িত্ব সবই মডারেটের দান সেই কর্পোরেশনেরই প্রসাদাৎ।"

পুস্তক খানি আগা-গোড়া পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায়, লেখক বাস্তবিক কার্য্যতঃ সুরেন্দ্র নাথেরই মতানুবর্ত্তী। কিন্তু তিনি তাহাকে "মডারেটদের ভিক্ষানীতি বলিয়া খোলাখুলি ভাবে গ্রহণ করিতে একটু সঙ্কুচিত হন। তিনি তিলকের যে Responsive Co-operation এর পক্ষপাতী তাহা সুরেন্দ্রনাথের মত ব্যতীত আর কিছুই নহে। লেখক বলেন,—

"তাঁদের (সুরেন্দ্রনাথ নৌরোজী গোখলে প্রভৃতি নেতৃগণের) মনে স্বরাজ বা ফেডারেটেড ইণ্ডিয়া,- অখণ্ড মহাযুক্ত ভারতের কোন চিত্রই ছিল না, বক্তৃতার উচ্ছ্বাসে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের নাম তাঁরা করলেও সে আশা পূরণের উপযোগী কোন বৈধ আন্দোলন তারা দেশে সৃষ্টি করতে পারেন নাই। * * * * সুরেন্দ্রনাথের ওজস্বিনী বক্তৃতা শিক্ষিত শ্রোতার কর্ণকুহর তৃপ্ত ক'রেই ফুরিয়ে যেত।

লেখকের উপরি উদ্ধৃত মন্তব্য আমরা সমর্থন করি না। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন,—১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে মডারেট নেতা দাদাভাই নৌরেজীই সভাপতি রূপে সর্ব্ব প্রথমে "স্বরাজ"—কথার উদ্ভাবন করেন। সুরেন্দ্র নাথ গোখলে প্রভৃতি নেতৃগণ যে বৈধ আন্দোলনের পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন সেই অনুসারেই দেশের আজ পর্য্যন্ত নব নব শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,—তাঁহাদের ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রোতৃগণের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়া ফুরাইয়া যায় নাই বলিয়াই আজ সন্ত্রাসবাদের জনক বোমার দলের নেতা বারীন ঘোষ "বিকৃতি ও অকল্যাণের মাঝে গিয়া আত্মঘাতী" হন নাই,—সেই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ আজ একেবারে চেহারা বদলাইয়া সহযোগের স্তুতিগান এবং অহিংসা মন্ত্রের প্রচার করিতেছেন। বাস্তবিক সুরেন্দ্র নাথের রাজনীতিকে জয়যুক্ত ও সফল করিয়াছেন এই পুস্তকের লেখক স্বয়ং। তিনি পুস্তকের শেষভাগে আদর্শ কার্য্য পদ্ধতির যে একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—

"পুরাতন মৃত বনাকীর্ণ পল্লীর পাশে গড়ে'

তোল একটি শ্রী সম্পন্ন পরিচ্ছন্ন নূতন পল্লী,—সমবায় পদ্ধতিতে যার আছে বৃহৎ যৌথ কৃষি ক্ষেত্র, যৌথ কৃষি ব্যাঙ্ক, নিজস্ব মার্কেটিং বোর্ড যৌথ যান বাহনের ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, বৈজ্ঞানিক কৃষি যন্ত্রাদি, চিনি লবণ ও শিল্পের কারখানা। * * * * সহস্র সহস্র পল্লীতে চাই অবৈতনিক শিক্ষা কেন্দ্র, সমবায় পদ্ধতিতে শিল্প ও যৌথ কৃষির সেই স্বাবলম্বী কর্ম্মীদল, তারাই অবসর সময়ে হবে গ্রামের স্কুল। এই গঠন শিল্পীর দল নিজেদের ও পল্লীর অন্নবস্ত্র সংস্থান করে নিজেরাই হবে অবৈতনিক শিক্ষার বাহন।"

আমরা আশা করি এই পুস্তকখানি বর্ত্তমান সময়ে সকলেই,—বিশেষতঃ নব্য যুবকের দল বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। এ সম্বন্ধে আমরা ভূমিকার প্রথম অনুচ্ছেদে গ্রন্থকারের উক্তি উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না,—

"আজকাল বাংলাদেশের তরুণদের মন হালকা আমোদের রসিক হয়ে উঠেছে। হাল্কা মাসিক, রঙ্গিন বায়োস্কোপ, চুটকী রসিকতা, অগভীর সমালোচনা, এই হ'য়েছে কচি ও কাঁচা মনের খোরাক। যে দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি গোধন, রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি সবই একেবারে গোড়া থেকে গড়ে তুলতে হবে, জাতি গঠনের কাঁচা বনিয়াদও যাদের আজও রচনা করা হয় নাই, সে দেশের তরুণ মন এত খানি পল্লবগ্রাহী, হলে জাতির ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার!

লেখকের ভাষার একটা বৈশিষ্ট আছে। কিন্তু গুরুতর ও গভীর আলোচনায় আমরা এইরূপ "খেলো" ভাষার পক্ষপাতি নহি। কথা বলিবার সময় হাতের মুখের চোখের ভঙ্গীতে এবং গলার স্বরে শ্রোতার নিকট বক্তব্য বিষয়টার ব্যাখ্যা করিয়া দেয়, কিন্তু পুস্তকের লেখায় সেই ভাষা চালাইলে, পাঠকের নিকট তাহা দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে। তার উপর আবার উপমায় ও কবিত্বে আসল কথা একেবারে চাপা পড়িয়া যায়। রাজনীতিক সাহিত্যের ভাষা এরূপ হওয়া উচিত নয়।
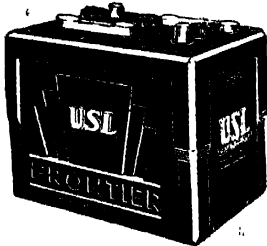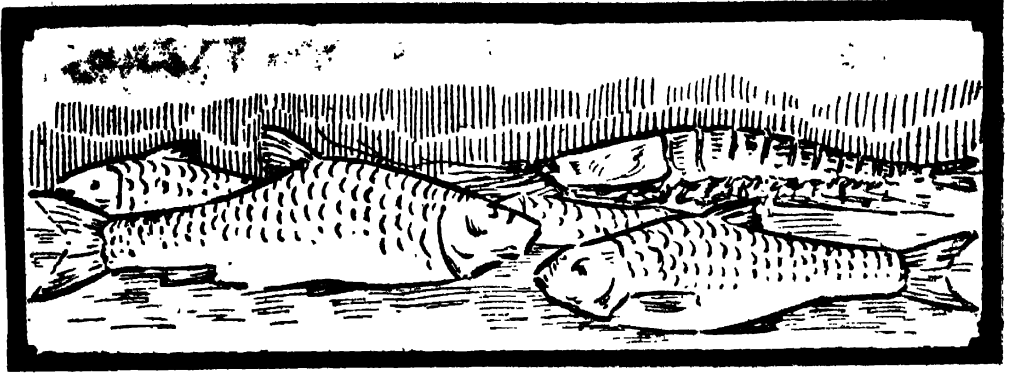
বাঙ্গলায় ফিসারী বিভাগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

প্রকৃতির বিধানে বৈশাখের খরতপ্ত আকাশের দিকে উর্দ্ধমুখ হ'য়ে চাতকপাখী 'ফটিকজল' 'ফটিকজল' বলে চীৎকার করে, ঠিক তেমনি আমরা বাঙালীরা উর্দ্ধবাহু হয়ে দরজায় দরজায় চাকুরী, চাকুরী, ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। চাতক পাখীর বেলায় প্রকৃতির খেয়ালে হয়ত বরুণদেব দু'চার ফোঁটা বারি বর্ষণ করেন, কিন্তু মানুষের বেলায় আপিশের কোন বড়বাবুই বেকার উমেদারদিগের প্রতি নেক্‌ নজরে তাকান না। লোকে বলে, বাঙ্গালী যুবকেরা পরিশ্রমী এবং কর্ম্মসহ নহে। মেনে নিলাম, আমরা না হয় শ্রমবিমুখ, কিন্তু সেই অপরাধে আমাদের গভর্ণমেন্টও কি কর্ম্মবিমুখ হ'য়ে বসে থাকবেন? তাঁদের না আছে, একটা প্ল্যান, না আছে কোন কার্য্যক্রম পদ্ধতি। মনে হয়, আবগারী বিভাগের আফিংএর মৌতাতে সমস্ত সরকারী দপ্তরখানাই যেন ঝিমিয়ে পড়ে আছে। সেখানে না আছে কোনও উৎসাহ, না আছে কোনও কর্ম্মপ্রেরণা, তাহা না হইলে এত যে কমিটি আর কমিশন তাহাদের রিপোর্ট সমূহ এমন চাপাচাপা হইয়া পড়িয়া থাকে কেন? তাহাদের recommendation গুলি যদি কার্য্যে পরিণত করার ইচ্ছা বা সামর্থ্য সরকারের না থাকে তবে এক-একটা কমিশন ও কমিটীর পিছনে এই গরীব দেশের হাজার হাজার টাকা জলের মত খরচ করিবার কি সার্থকতা আছে? কমিটি কমিশন বা Expert নিয়োগ লোকে তখনই করে যখন কোন বিষয়ের পশ্চাতে টাকা invest করিব এবং তাহা করা সার্থক হইবে কি না সেই সম্বন্ধে সকল বিষয় অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া ওয়াকিবহাল হইয়া পন্থা বাছিয়া লইবার জন্য। এইরূপে পন্থা স্থির হইলেই লোকে তাহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। কিন্তু এখানে সবই উল্টা। এদেশে কত যে কমিশন ও কমিটি নিয়োগ হইল এবং এই সকল কমিটির পশ্চাতে এ যাবৎ যে কত লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা যদি কোনও কাউন্সিলর ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বাহির করিতে

পারেন, তবে গভর্ণমেণ্টই চমকিয়া যাইবেন যে, এই গরীব দেশের কত টাকা এইরূপে তাহারা বরবাদ করিয়া দিয়াছেন এবং এই সকল কমিটির অধিকাংশ recommendations সরকারী দপ্তরে ধামাচাপা পড়িয়া রহিয়াছে। এইরূপ একটী ধামাচাপা রিপোর্টের বিষয়েই আজ আমরা আলোচনা করিব।

সমগ্র ইউরোপ আজ যে দুই despot এর মত দম্ভে কাঁপিয়া মরিতেছে তাহারা despot হলেও benevolent despot একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। Despotদের এইরূপ বেনিভোলেণ্ট হওয়ারও একটা উদ্দেশ্য আছে। ঘুরিয়ে বললে একথা বলা চলে যে, যে-রাজা যত বেশী বেনিভোলেণ্ট তার রাজত্বও তত বেশী কায়েমী। প্রজা যদি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে ত রাজ-সরকারের প্রতি কখনো সে বিরূপ কিংবা বিদ্রোহী হন না। আমাদের রাজ সরকারও যদি আমাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি কতকটা বেনিভোলেণ্ট হন ত রাজদ্রোহ দমন করবার জন্য তাঁদের এত মাথা ঘামাইতে হয় না। বেনিভোলেণ্ট হওয়া শুধু প্রজার পক্ষে কল্যাণকর নয়, রাজারও স্বার্থ রক্ষার অনুকূল। একথা সত্যি যে, রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য রাজকোষে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু কোন রাজা যদি শুধুমাত্র প্রজাদিগের উপর ট্যাক্স ধার্য্য দ্বারা সে অর্থ আহরণে মনোনিবেশ করেন তবে তার পক্ষে সেটা মারাত্মক অবিবেচনা ও আত্মঘাতী ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। সুতরাং রাজকোষে অর্থ সংগ্রহের জন্য দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করতে হয়। সম্পদশালী নয় এমন দেশেও সরকার কর্ত্তৃক জাতীয় সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে, কেননা, তারা জানে যে জাতীয় সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে রাজা ও প্রজা উভয়েই লাভবান হ'তে পারবে। সভ্যতার যুগে যন্ত্রবিপ্লবই এই জাতীয় সম্পত্তির বৃদ্ধির কার্য্যে অভাবনীয় সহায়তা করছে, কিন্তু এই যন্ত্রবিপ্লব যখন দেখা দেয়নি তারও পূর্ব্বে ইউরোপে এই জাতীয় সম্পত্তি বৃদ্ধি কার্য্যে দু'জন রাজা কর্ত্তৃক কীরকম প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল তা' ভেবে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই তাঁর রাজকোষে অর্থ সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত মন্ত্রীর সাহায্যে যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা' বিবেচনা যোগ্য। তবুও তখনো বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হয় নি। ইউরোপে অবস্থান করেও ইউরোপীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন যে এসিয়াটিক বর্ব্বর রুশিয়ার নামে ইউরোপবাসী নাসিকা কুঞ্চিত করত, অত্যাচারী হলেও শ্রমবরেণ্য পিটার দি গ্রেট্ তার যে কী অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত করেছিলেন তা' ভেবে স্তম্ভিত হতে হয়।

অথচ তাঁরা দু'জনেই ত Despot এবং অত্যাচারী সম্রাট ছিলেন। কিন্তু অত্যাচারী হ'লেও এ তথ্য বোঝবার স্বাভাবিক বুদ্ধি তাঁদের ক্ষয় হয়ে যায় নি যে, দেশের যদি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত করা যায় ত রাজতন্ত্রেরই তাতে উপকার বেশী। তুষার-তুহিন হিমশীতল তৃণহীন রুশিয়ার যদি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হ'তে পারে, ত আমাদের দেশের কেন উন্নতি ঘটবে না?

আমরা এত কথার উল্লেখ করলাম মিছামিছি প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করবার জন্য নয়, পরন্তু, এই দেখাবার জন্য যে, দেশের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রজার চেয়ে রাজারই বেশী দরকার। বাংলা দেশে এখনো বহু সম্পদ লোকচক্ষুর অগোচরে পড়ে রয়েছে যে-গুলোর উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাংলাদেশকে যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে পারা যায়। যে বেকার-সমস্যার নিদারুণ সঙ্কট-বেষ্টনীতে দেশ আজ অতিমাত্রায় বিব্রত হ'য়ে পড়েছে জাতীয় সম্পত্তি বৃদ্ধির প্রতি গভর্ণমেণ্টের মনোনিবেশ দ্বারা তা' অনেক পরিমাণে দূরীভূত হ'তে পারে।

আজকাল এবিষয়ে সমস্ত দেশই সজাগ হয়ে উঠেছে। দেশের খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন কল্যাণ কেউ আর চায় না; একটা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অখণ্ড কর্ম্মতালিকাই এখন সবাই গ্রহণ করছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, খণ্ড খণ্ড উন্নতির দ্বারা যে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা যায় না এ-তথ্যটা অনেকেই বুঝেছেন। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'বে। ধরুন, শিক্ষার ব্যাপার। দেশে যথেষ্ট শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করা হ'ল, কিন্তু তারপর? সেই শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকগুলি কি করবে, তার ব্যবস্থা ত করা হয় নি। কিংবা ধরুন, দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভাল করবার জন্য ব্যবস্থা করা হ'ল, কিন্তু তার জন্য যে অর্থব্যয় হ'বে তার সংগ্রহের কোন বন্দোবস্ত হয় নি ত। অথবা দেশের অর্থবৃদ্ধির ব্যবস্থা যথেষ্ট করা হ'ল, কিন্তু সে-অর্থটা যথাযোগ্যভাবে খরচ করবার পরিকল্পনা যদি না ঠিক থাকে ত টাকাটা বাজে কাজেই খরচ হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং আজকাল অর্থনীতিবিদ্ ও দেশহিতকামী ব্যক্তিরা একযোগে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পরিকল্পনার ব্যবস্থা করেন।

এবিষয়ে রুশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমেরিকায় রুসভেল্টও পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করবার সঙ্কল্প করেছেন। জার্ম্মানীতেও যথাযোগ্য পরিকল্পনা অনুসৃত হয়ে থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতে লয়েড্ জর্জ্জের 'নিউ-ডিল' পরিকল্পনা নিয়ে হৈ-চৈ এর বিরাম ছিল না। বিশ্বশুদ্ধ লোক আজ বৃহৎ কাজই হোক্ আর সামান্য কাজই হোক্, একটা পরিকল্পনা ঠিক না করে কার্য্যে অগ্রসর হয় না। সুতরাং আমাদের বাজ সরকারেও যদি প্রজাদের প্রকৃত কল্যাণ করবার ইচ্ছা থাকে ত একটা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিমূলক পরিকল্পনা নিয়ে কার্য্যে অগ্রসর হ'তে হবে।

নব শাসনতন্ত্র অনুসারে এসম্পর্কে সমস্ত দায়িত্ব মন্ত্রীদের। সুতরাং আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলীর উচিত দেশের সম্মুখে এক সুসংবদ্ধ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিমূলক পরিকল্পনা উপস্থিত করা। তাঁদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে, এই উপায় অনুসরণ করেই তাঁরা তা' প্রশমিত করতে পারেন। নইলে অন্য কোন কার্য্যের দ্বারা তাঁরা জনগণের আস্থা অর্জ্জন করতে সমর্থ হ'বেন না। এসম্পর্কে আমরা প্রধান মন্ত্রী এবং ফাইন্যান্স মিনিষ্টার মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার মহোদয়দ্বয়কে অবহিত হইতে বলি। কারণ ফাইনান্স মিনিষ্টারের সম্মতি ও সহকারিতা না পাইলে কোন নূতন পরিকল্পনাই গ্রহণীয় হইবে না।

উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে প্রধান কর্ম্মপদ্ধতি থাকবে দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা। এটা

ঠিক, যে রাজকোষে প্রচুর অর্থ না থাকলে তাঁরা রাজ্য শাসন ব্যতীত অপর কোন কল্যাণমূলক কার্য্য করতে পারবেন না। সুতরাং বাজেটে যাতে রাজকোষ পরিপূর্ণ হয় সেধারে নজর দিতে হ'বে। কিন্তু অপরাপর ব্যাপারের মত এধারেও আগে টাকা ছড়াবার ব্যবস্থা করিলে তবে টাকা আসে। গভর্ণমেণ্ট যদি দেশের লোকের অবস্থা ভাল রাখেন, ব্যবসা বাণিজ্য যদি যথাযোগ্য চালু থাকে, তবেই ত গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় হ'বে এবং বাজেটের সমতা রক্ষিত হ'বে। নইলে দেশের লোকের অবস্থা যদি খারাপ হয়, ব্যবসা বাণিজ্যের বাজার যদি মন্দা যায়, ত রাজস্ব আদায় হ'বে কোন্ পথ দিয়ে?

এই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির প্রধান উপায় হ'ল নূতন নূতন শিল্প বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করা। এ সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশিয়া আমাদের মতই পশ্চাৎপদ কৃষিপ্রধান দেশ ছিল; কিন্তু সোভিয়েট ব্যবস্থার আমলে সে যেরূপ বিরাট আকারে 'ইন্‌ডাসট্রিয়ালাইজড্' হয়েছে তা' সভ্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করে। অথচ তাই বলে সে যে কৃষিকার্য্য ত্যাগ করেছে তাও নয়, বৈজ্ঞানিক চাষ-পদ্ধতিতে প্রচুর শস্য সেখানে আজও উৎপাদিত হ'চ্ছে এবং surplus শস্য বিদেশে প্রচুর রপ্তানীও হচ্ছে। যাঁদের ধারণা আছে যে, কৃষি প্রধান দেশে শিল্পকার্য্য চলতে পারে না, তাঁরা সোভিয়েট রুশিয়ার উদাহরণে উপকৃত হ'তে পারেন।

আসলে সমস্ত দেশই স্ব স্ব দেশাভ্যন্তরস্থ সম্পদের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। যে-সমস্ত দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে তেমন বিত্তশালী নয় তারাও বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে সম্পদ সৃষ্টির দিকে মনোযোগ দিয়েছে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে প্রতি দেশের কাছে দেশস্থ সামান্য সম্পদও যে কি ভয়ঙ্কর মূল্যবান তা বোধ হয় আর কাকেও বুঝিয়ে বলতে হ'বে না। উক্ত সম্পদ রক্ষাকল্পে ও সম্পদের সদ্ব্যবহার কল্পে সকল দেশের গভর্ণমেণ্টই সর্ব্বাপেক্ষা সজাগ থাকেন এবং চেষ্টা করেন; কেননা, দেশের সম্পদের সদ্ব্যবহার ঘটলে তাঁরাই লাভবান হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট এধারে মোটেই সজাগ নন্। বর্ত্তমান ডিরেক্টর অব ইন্‌ডাসট্রিজের আমলে এধারে সামান্য কিছু উন্নতি দেখা দিলেও, এখনো বহু জিনিস আছে যে ধারে গভর্ণমেণ্টের নজর দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা আমাদের 'ব্যবসা-বাণিজ্যের' পূর্ব্বের এক সংখ্যায় "ফিসারী" সংক্রান্ত প্রবন্ধের আলোচনা কালে গভর্ণমেণ্টের এই ত্রুটির বিষয় আলোচনা করেছি। তাতে আমরা দেশের অপরাপর সম্পদের মধ্যে জল সম্পদও যে একটি প্রধান সম্পদ সে-কথার উল্লেখ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে বঙ্গোপসাগরে যে প্রচুর মৎস্য-সম্পদ আছে, তার যথোপযুক্ত ব্যবসা কার্য্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা এই আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলাম যে, যেহেতু জাপানীরা উক্ত সম্পদ অধিকার করবার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে সেইহেতু অবিলম্বে গভর্ণমেণ্টের উচিত এবিষয়ে ব্যবস্থা করা; নইলে এতবড় একটা অর্থকরী সম্পদ যদি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় ত পরে আমাদের মনস্তাপ ও দুর্দ্দশার সীমা থাকবেনা।

বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ যে ভয়ঙ্কর অর্থকরী একথা ১৯০৮ সালে বাংলা সরকারের রেভেন্যু-বোর্ডের কর্ম্মচারী মিঃ, পরে সার কে, জি, গুপ্ত আই, সি, এস মহোদয় বলেছিলেন এবং তিনি সরকারী ভাবে এসম্পর্কে বহু অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। বঙ্গোপসাগরের মৎস্য-সম্পদ এবং এসম্পর্কে সরকারী প্রচেষ্টা সম্বন্ধে মিঃ গুপ্ত যে সুচিন্তিত মন্তব্য ও তথ্যপূর্ণ বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছিলেন, গভর্ণমেণ্ট সে-সম্পর্কে নিশ্চয়ই তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি, কেননা, তা' যদি করতেন ত ১৯০৮ সাল থেকে আজ এই ২৯ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ মৎস্য ব্যবসায়ে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠত এবং এতে করে তার অনেক বেকার যুবকের মুখে অন্ন জুটত। মিঃ গুপ্ত সাহেবের রিপোর্ট এবং সে-সময়ে তাঁর প্রচেষ্টায় বঙ্গোপসাগরে মাছের ব্যবসা সম্পর্কে যে কার্য্যকরী পরীক্ষা চলেছিল, সে-সম্বন্ধে কিছু জানবার এক সরকারী দপ্তর ছাড়া আজ আর কোন উপায় নেই। আমরা বহু অনুসন্ধানের পর পুরাতন ফাইল পত্তর ঘেঁটে পাঠকদের অবগতির জন্য এবং বাংলাদেশে মৎস্য ব্যবসা সম্পর্কে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিবর্গের জ্ঞাতার্থে এসম্পর্কে নানান্ তথ্য উদ্‌ঘাটিত করছি। তা' থেকে সকলে বুঝতে পারবেন যে অপরাপর বিদেশীয় ফিসারীর তুলনায় বঙ্গোপসাগরে ফিসারী প্রতিষ্ঠিত হ'লে তার আয় কোন অংশে কম হয় না। তবুও গভর্ণমেণ্ট এতদিনেও যে এদিকে নজর প্রদান করেন নি এইটাই আশ্চর্য্যের।

গতস্য শোচনা নাস্তি, সে-সম্পর্কে আক্ষেপ করেও এখন আর কিছু লাভ নেই। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগ দিলে যথেষ্ট লাভবান হ'বেন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তা' প্রশমিত করতে গেলে জনসাধারণের সম্মুখে মন্ত্রিমণ্ডলী কর্ত্তৃক জন-সাধারণের কল্যাণকর এক কর্ম্মপদ্ধতি উপস্থিত করা দরকার। জনসাধারণের কল্যাণের মধ্যে প্রধান ব্যাপার হচ্ছে তাদের আর্থিক দুরবস্থা দূরীকরণ। বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদকে যদি কাজে লাগানো যায়, তবে তা' যে এক বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত হ'বে এবং অনেক বেকার যুবকের আর্থিক দুরবস্থা দূরীকরণে সমর্থ হ'বে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। আমাদের দেশে মাছের একটা ভয়ঙ্কর চাহিদা আছে। কত হাজার মণ মাছ যে প্রতিদিন এক বাংলাদেশেই ব্যবহৃত হয় তার ইয়ত্তা নেই; সুতরাং মাছের ব্যবসায়ে আর্থিক ক্ষতি হ'বার সম্ভাবনা নাই। এর কারণ হচ্ছে মাছ বাঙ্গালীর একটি অপরিহার্য্য দৈনন্দিন খাদ্য। ভাত ডালও যেমন বাঙালীর না হ'লে চলে না, মাছও তেমনি বাঙ্গালীর না হ'লে চলে না। সেইজন্য আমরা জোর করে বলতে পারি যে মাছ যদি সস্তায় যোগান দেওয়া যায় ত তার চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

তা' ছাড়া এই ব্যবসা প্রচলন করার স্বপক্ষে আরও একটি যুক্তি আছে। আমাদের দেশে আমরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ভয়ঙ্কর ভাবে উপলব্ধি করি; এই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের জন্যই আমাদের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হ'য়ে পড়ছে। অপরাপর যে সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্য আছে তা' ক্রয় করবার পক্ষে সাধারণ ভারত-বাসীর আয় মোটেই স্বচ্ছল নয়। সুতরাং কম

পয়সায় সস্তা দামে কোন পুষ্টিকর খাদ্য যোগাবার বন্দোবস্ত করলে বাঙালী জাতির স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে এক মহৎ উপকার সাধিত করা হয়।

১৯০৮ সালে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বঙ্গোপসাগরে মৎস্য ব্যবসায় সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান সম্পর্কে মিঃ পরে স্যার কে, জি, গুপ্ত আই, সি, এস্ মহোদয় রিপোর্টে লিখিয়াছেন :—

In working a vessel by Government agency, the chief object to be kept in view is not the amelioration of the condition of the fishermen or the enriching of fishing syndicates, but the opening up of a great supply of food material, which has been hitherto overlooked or neglected for the people of the country.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মাছের দ্বারা এক দিকে ব্যবসা এবং অপর দিকে স্বাস্থ্যরক্ষা দুই উদ্দেশ্য যে সাধিত হয়, একথা গবর্ণমেণ্টও স্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, মৎস্যের 'বাই প্রোডাক্ট' হিসাবে আরও অনেক জিনিষ পাওয়া যায় এবং তাদেরও ব্যবসা খুব ভাল রকম চলে। মৎস্যের 'বাই প্রোডাক্টের' মধ্যে নিম্ন দ্রব্যগুলি প্রধান :—

শুঁটকী মাছের ব্যবসা
মাছের ডানা
মাছের চামড়া
মাছের তেল
মৎস্য জনিত শিরীষ বা Isinglass
মাছের চাবুক
মাছের সার
Smoked fish
Fish pastes
Preserved fish
Preserved ডিমের ব্যবসা

উপরোক্ত প্রত্যেকটী দ্রব্যেরই পৃথিবী ব্যাপী ব্যবসা চলিতেছে কিন্তু, আমাদের জ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার অভাবে এদেশে এই সকল দ্রব্য বৃথা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এইখানে কথা উঠবে যে এবিষয়ে অগ্রণী হ'বে কে? ব্যক্তিগত মূলধন নিয়ে কোন লোক কিংবা প্রাইভেট কোম্পানী এ বিষয়ে অগ্রণী হ'তে পারেন নি এবং পারেন না। তার কারণ হচ্ছে যে ব্যবসার ব্যাপারে কেউ সহজে অগাধ জলে ঝাঁপ দিতে চান না। দুর্জ্জয় আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কলম্বস্ অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পেছনে স্পেন অধিপতির সাহায্য ও উৎসাহ যদি না থাকত ত কলম্বস্ মহা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আসলে প্রত্যেক বড় বড় ব্যাপারেই রাজা কিম্বা রাষ্ট্রের সহায়তা চাই-ই চাই। জগতে যে সকল নূতন নূতন ব্যবসায়ের ক্ষেত্র রচিত হইয়া ধনাগমের পথ বাহির হইয়া আসে সে সকল ব্যবসায়ের প্রাথমিক অবস্থার নানারূপ তথ্যানুসন্ধান, research সম্পদ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় সেই দেশের গভর্ণমেণ্টই বহন করিয়াছেন এবং এইরূপ কোনও একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের সম্ভাবনা থাকিলে সে সম্বন্ধে তাবৎ আনুষঙ্গিক ব্যয় গভর্ণমেণ্টই বহন করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ আয়ের সম্ভাবনার কথা দেশের লোককে জানাইয়া দিয়া থাকেন।

এ না হ'লে চলে না। চলে না এই জন্যে যে একটা অজ্ঞাত ব্যবসায়ে টাকা ন্যস্ত করিয়া শেষে তাহা সফল হইবে কি নিষ্ফল হইবে সে সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা না থাকায় এইরূপ অজ্ঞানিত ভবিষ্যতের পিছনে কেহ ব্যাক্তিগত পুঁজি খাটাইতে চাহেনা। কারণ Experimentটা ব্যর্থ হইয়া গেলে তাহার সব পুঁজিটাই উঠিয়া যাইবে। এইজন্য এইরূপ অজ্ঞাত ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে লোকে সাধারণতঃ ইতস্ততঃ করে, কারণ এইরূপ ভাবে টাকা খাটানো মানবের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট দেশের একটা নূতন আয়ের পথ খোলা যায় কিনা সে বিষয়ে সকল রকম অনুসন্ধান এবং তথ্যাদি বাহির করার জন্য অকাতরে টাকা ব্যয় করিতে পাবেন। যদি Experiment নিষ্ফল হয় তবে ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও পুঁজি নষ্ট হয় না এবং কেহ সে জন্য পথে বসেনা। যদি Experiment সফল হয় তবে দেশের লোকের নিকট নূতন একটা আয়ের পথ খুলিয়া যায় এবং তাহার ফলে দেশবাসীও যেমন উপকৃত হয় দেশও তেমনি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। এই কারণেই ব্যক্তিগতভাবে বা প্রাইভেট কোম্পানী খুলে কেহই বঙ্গোপসাগরে মৎস্য ব্যবসার পরীক্ষা কার্য্যের দায়িত্ব নিতে রাজী হয় না। তার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ অজানা যায়গায় কোন কিছু গড়ে তোলবার খরচ অনেক, দ্বিতীয়তঃ যে-জিনিসের লাভ লোকসানের হিসাব কার্য্যকরীভাবে জানা নেই, সে-জিনিসের প্রতি লোকের তেমন আগ্রহ থাকে না। কিন্তু কেউ যদি একবার পথ দেখিয়ে দেয় ত, বহু কারবার সেই পথে অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে ওঠে এবং ব্যবসার অবসম্ভাবী পরিণতি হিসাবে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর মধ্যে এরূপ মারাত্মক প্রতিযোগিতা দেখা দেয় যে শেষে ট্রাষ্ট গড়ে তোলা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। যদি বলা যায় যে লিমিটেড কোম্পানী খুলে এসম্পর্কে প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে, তার উত্তরে এই জানানো চলে যে, অনির্দ্দিষ্ট লাভের ব্যাপার যেখানে, সেখানে সহজে কেউ লিমিটেড কোম্পানীর সেয়ার কিনিতে চাইবে না, তা' ছাড়া এই বিরাট ব্যবসা সংগঠিত করতে কোম্পানীর প্রথম কয় বছর এত খরচ পড়বে যে, সেয়ারহোল্ডারদের মনঃপূত হ'বে না। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোন কোম্পানী খোলা হ'লে কিংবা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অপর কোন কোম্পানী গ্যারাণ্টীযুক্তভাবে পৃষ্ঠপোষিত হ'লে, জনসাধারণ হুড় হুড় করে তার সেয়ার কিনিতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করবে না। ঠিক এই একই কারণে লোকে গভর্ণমেণ্ট প্রমিশারী নোট কেনে। কিন্তু নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সেয়ার কিনে দেশের শিল্প বাণিজ্য গড়ে ওঠার সাহায্য করে না। অথচ সেই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন ব্যবসা বাজারে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নিয়মিত মোটা ডিভিডেণ্ড দিতে সুরু করে তখন সবাই আবার তাদেরই সেয়ার কেনবার জন্য ব্যগ্র হয়। এবং শুধু তাই নয়, একটি শিল্প চালু হ'লে অনেকে আবার সেই রকম আরেকটি শিল্প বা কোম্পানী চালু করতে অগ্রণী হন।

সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য-ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টেরই অগ্রণী হওয়া দরকার। ১৯০৮ সালে গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন

এবং তখন দেখা গিয়েছিল যে, বঙ্গোপসাগরে ফিসারী সংক্রান্ত ব্যবসার লাভ অন্যান্য দেশের ফিসারী ব্যবসার লাভের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই লাভ যদি গভর্ণমেণ্ট আয়ত্ত করতে পারেন ত গভর্ণমেণ্টের তাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা কিছুই নেই। বরং আজকালকার এই রীতিমত বাজেট ঘাটতি ও ব্যয় অসঙ্কুলানের যুগে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সেটা একটা আয়ের পথ বলে পরিগণিত হ'বে! শুধুমাত্র আয়ের দিকই নয়, সামাজিক মঙ্গলের দিক দিয়ে বহু বেকার ঐ বিরাট শিল্প প্রচেষ্টার ফলে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারবে।

বিশ্বের অপরাপর দেশের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই রকম সুযোগের সদ্ব্যবহার করার নজীর আমাদের আছে। পূর্ব্বোক্ত কে, জি, গুপ্ত মহোদয় তাঁর রিপোর্টে এ-সম্পর্কে কেপ কলোনীর নাম উল্লেখ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সেখানে উপকূলভাগে মৎস্য ব্যবসার কোন প্রচেষ্টা বা নাম গন্ধও ছিল না। অবশেষে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট একখানি ষ্টীম ট্রলার ক্রয় করে তার সাহায্যে উপকূলভাগে মৎস্য ধরিবার অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করেন এবং এতৎসংক্রান্তে কতকগুলি যোগ্য ব্যক্তিকে কার্য্যে নিয়োগ করেন। তার ফলেই বহু মৎস্যসম্পদ পরিপূর্ণ উপকূল আবিস্কৃত হয় এবং তাহার ফলে আজ সেখানে বহু প্রাইভেট কোম্পানী ব্যবসা কার্য্যে রত আছে।

বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নজীর কেন, দেশীয় গভর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক উদ্যোগ-আয়োজনে একটি বিরাট শিল্প গড়ে উঠেছে, এ-নজীরও আমাদের দেশে বর্ত্তমান। যে এ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে আমরা আজ এত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি, পঁচিশ বছর পূর্ব্বে আমাদের দেশে ওর নাম গন্ধ ছিল কিনা সন্দেহ। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের এক উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কার করেন যে আমাদের দেশে প্রচুর এ্যালুমিনিয়াম 'ওর্' (ধাতব পদার্থ) বর্ত্তমান থাকার দরুণ এখানে বিরাট এ্যালুমিনিয়াম্ শিল্প গড়ে উঠতে পারে। এ-বিষয়ে অনেক মাথা-ঘামানোর পর সরকারীভাবে এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য্য সুরু হয় এবং কার্য্যকরী ভাবে ব্যবসা আরম্ভ করলে দেখা যায় যে, তাতে পড়্তায় পোষাচ্ছে না। প্রাথমিক প্রচেষ্টায় এই রকম ঘটার দরুণ গভর্ণমেণ্ট্ এই প্রচেষ্টা হ'তে বিরত হ'ন্। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের একটু ভুল হয়েছিল। প্রথমতঃ, প্রাথমিক অনুসন্ধানকার্য্যে খরচ বেশীই পড়ে, দ্বিতীয়তঃ, সরকারী ব্যাপারই আলাদা। সেখানে খরচের প্রক্রিয়াটা গৌরী সেনের মতই অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের পড়্তার হিসেবটাই সঠিক হিসেব নয়। তাই গভর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক উক্ত প্রচেষ্টা ত্যাগ করবার পর সেই সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীটি ব্যক্তিগত পরিশ্রমের দ্বারা Cress Well & Co. নামে একটি প্রাইভেট্ কোম্পানী গঠিত করেন এবং মাদ্রাজে সর্ব্বপ্রথম এ্যালুমিনিয়াম কারখানা স্থাপিত হয়। আজ এ্যালুমিনিয়াম শিল্পের যে কতখানি বিস্তার ঘটেছে এবং কত লোকের যে তাতে অন্ন জুটবে সেকথা বোধ হয় আর বুঝিয়ে বলতে হ'বে না। কিন্তু সেদিনকার সেই প্রাথমিক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট যদি অগ্রণী হয়ে অনুসন্ধান কার্য্য না চালাতেন, তাইলে আজকের এই বিরাট এ্যালুমিনিয়াম শিল্প গড়ে ওঠা সম্ভব হ'ত কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্গোপসাগরে মাছের ব্যবসা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের অগ্রণী হওয়ার পক্ষে সরকারী নজীর আছে এবং ভাল নজীরই আছে। সরকার যদি অবিলম্বে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ত এ্যালুমিনিয়াম শিল্পের মত আর একটি বিরাট শিল্প গড়ে ওঠা সম্ভব হয়। বেকার-সমস্যা সমাধান কল্পে বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালাবার জন্য নানান্ হিতৈষী কর্ত্তৃক সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়, এবং ইতালী জার্ম্মানী প্রভৃতির নজীর দেখিয়ে বলা হয় যে রাস্তা নির্ম্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি কার্য্য সুরু করলে বহু লোক তাতে কাজ পেতে পারবে। রাস্তা নির্ম্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি প্রচেষ্টা আরম্ভ করলে তাতে যে অনেক লোক কাজ পাবে একথা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমাদের বলার কথা হচ্ছে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকার তাতে মুষ্টিমেয় কেরাণীর কাজ ছাড়া আর কোনও স্থান পাবে না। অথচ আজকের দিনে মধ্যবিত্ত বেকারের সমস্যাটাই আসল সমস্যা। মধ্যবিত্ত বেকারদের চরিত্রগত দুর্ব্বলতার জন্যই হোক্ বা সামাজিক আত্মাভিমানের জন্যই হোক্, কায়িক পরিশ্রম তারা করতে চায় না। এসম্পর্কে তাদের হাজার গালি দেওয়া হয়েছে, তবুও তাদের স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নি। এবং ঘটবে বলে আশাও করা যায় না। তাই গভর্ণমেণ্ট থেকে রাস্তা নির্ম্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি কার্য্যে অনেক লোক এসে জুটবে বটে, কিন্তু দলে দলে শিক্ষিত বেকারদের সেখানে পাওয়া যাবে না। ইউরোপে যেটা সম্ভব, আমাদের এখানে সেটা সম্ভব নয়, কেননা, ইউরোপ dignity of labour বোঝে, আর আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকাররা dignity of labour বুঝলেও অন্তরে মানে না। কোনদিন যে মানবে না এমন কথা বলিনে, কিন্তু আজ মানছে না। সেই কারণেই আজকালকার বেকার যুবক চাকরীর জন্য অনাহারে শুষ্ক মুখে ঘুরবে তবুও পয়সা দিলেও দশ হাত মাটি কোপাতে পাবে না!

আগামীবারে সমাপ্য

মিঃ সিদ্ধনাথ সেন বি, এস্ সি, ইকন (লণ্ডন) হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুর‍্যান্স সোসাইটীর য়্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী হইয়াছেন। মিঃ সেন পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুস্থানের কার্য্যে যোগ দান করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এইরূপ কর্ম্মপটুতা দেখাইয়া উন্নতি লাভ করাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল পি এইচ ডি, এম্ এল এ, হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ ইনস্যুর‍্যান্স সোসাইটীর এজেন্সীর স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহার পদে মাদ্রাজের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মিঃ এস্ এম্ চৌধুরী নিযুক্ত হইয়াছেন।

খুলনাতে বম্বে লাইফের একটী অর্গ্যানাইজিং অফিস খোলা হইয়াছে। মিঃ সুধীর কুমার বিষ্ণু তাহার পরিচালন ভার লইয়াছেন।

মিসেস্ মনমোহিনী সেগেল, ভারত ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর দিল্লী ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় মহিলা বীমা বিভাগে এত উচ্চপদে কার্য্য করেন নাই।

এশিয়ান ইনস্যুর‍্যান্সের চেয়ারম্যান মিঃ যমুনাদাস মেহতা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ফাইনান্স মিনিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত ২৩শে এপ্রিল ভারত গবর্ণমেণ্টের য়্যাকচুয়ারী মিঃ নগেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পদে য়্যাসিষ্টাণ্ট য়্যাকচুয়ারী মিঃ এ রাজগোপালম এ আই এ, অস্থায়ী ভাবে কার্য্য করিতেছেন।

"লাইট অব এশিয়ার" হেড আফিস ৪নং ড্যালহৌসী স্কোয়ার হইতে ২নং চিত্তরঞ্জন

য়্যাভেনিউ, কলিকাতা এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে। হীফেন হাউসের বাড়ীর তুলনায় লাইট অফ এশিয়ার এই নূতন বাড়ী সর্ব্বাংশে ভালই হইয়াছে। ইহার অবস্থান একেবারে চৌবঙ্গীর মোড়ের উপরে, Statesman আপিশের পাশে এবং "ভারতের" ঠিক সম্মুখে। আপিশের আয়তন, শৃঙ্খলা এবং সাজসজ্জা সবই খুব artistic হইয়াছে। আয়োজন যেমন সুন্দর হইয়াছে আশাকরি কারবারেও তেমনই শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

মিঃ কে এন্ তন্‌খা এম্ এস্ সি হিন্দুস্থানের দিল্লী ব্রাঞ্চের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের রেঙ্গুন ব্রাঞ্চ আফিস গত ১লা এপ্রিল হইতে ১১৮ নং ফেয়ার ষ্ট্রীট

(টেলিগ্রাফ আফিসের সম্মুখে) দরবার বিল্ডিংস্ এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

—※—

হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার বাংলা গবর্ণমেণ্টের ফাইন্যান্স মিনিষ্টার নিযুক্ত হওয়ায় হিন্দুস্থানের কার্য্য হইতে দীর্ঘকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তদুপলক্ষে হিন্দুস্থানের কর্ম্মচারিগণ গত ৩১শে মার্চ্চ তাঁহাকে একখানি মানপত্র প্রদান করিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন।

—※—

হিন্দুস্থানের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ বিমলচন্দ্র সরকার হিন্দু ফ্যামিলি য্যানুইটী ফাণ্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

—※—

ভারত ইন্‌স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ এইচ সি চক্রবর্ত্তী মহাবীর ইন্‌স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর এজেন্সী ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—※—

মোটর গাড়ী ইন্‌স্যুর‍্যান্স করা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং সম্প্রতি তাহার রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটির অভিমত এই যে, মোটর গাড়ী বীমা বাধ্যতামূলক করা হউক। কোন রকমের গাড়ী কত টাকার জন্য বীমা করিতে হইবে, তাহাও কমিটী নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

—※—

মিঃ এন্ এস্ মথুস্বামী আয়ার এম্ এ, বি এল ভারত ইন্‌স্যুর‍্যান্সের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি "হিন্দুস্থানে" যোগ দিয়াছেন

—※—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, এই তৃতীয় বৎসরে (১৯২৭ সালের ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত) আর্য্যস্থান ইন্‌স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর কারবার পূর্ব্ব বৎসরের উপর শতকরা ১৪ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৫নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস ভবনে প্যালেডিয়াম য্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানী তাহাদের নূতন আফিশ স্থাপন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে এলবার্ট হলে এক বৃহতী জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল; ঢাকার ভাওয়াল কেসের সবজজ রায় বাহাদুর পান্নালাল বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, সভায় বহু গণ্যমান্য লোকের সম্মুখে প্যালাডিয়ামের প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে কোম্পানীর চেয়ারম্যান্ মিঃ জে আর ব্যানার্জ্জি একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় কোম্পানীর দৃঢ়ভিত্তির পরিচয় এবং সুদক্ষ পরিচালনার কথা বিবৃত করেন এবং ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার দিনেই লক্ষাধিক টাকার বীমার কাজ সংগ্রহের কথা ঘোষণা করেন। আমরা সর্ব্বান্তকরণে এই কোম্পানীর উন্নতি কামনা করিতেছি কোম্পানী ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ও সাধারণ দুইপ্রকার বীমার কাগজ আরম্ভ করিয়াছেন।

—※—

আমরা অতি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বীকন ইন্‌স্যুর‍্যান্স কোম্পানী, ডাঃ এস্ সি রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পলিসির টাকা, দাবী উত্থাপিত হইবার দুইদিনের মধ্যেই তাঁহার বিধবা পত্নী শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী রায়কে প্রদান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী রায়ের একখানি পত্রের প্রতিলিপি আমাদের

নিকট প্রেরিত হইয়াছে। বীকন ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানী এই কার্য্যতৎপরতার জন্য বিশেষ প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, আর্য্য ইনসুর‍্যান্স কোম্পানীর ডিরেক্টার মিঃ বি, কে দাস (কংগ্রেস পক্ষীয়) আসাম ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত কোম্পানীর অন্য এক জন ডিরেক্টার মিঃ এইচ এন চৌধুরী (কংগ্রেস পক্ষীয়) আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আর একজন ডিরেক্টর মিঃ এস সি দাস ঐ প্রদেশেই উচ্চতর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মেট্রোপলিটান ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর এজেন্সী ইনস্পেক্টার মিঃ হীরালাল মুখার্জ্জি উক্ত কোম্পানীর চট্টগ্রাম বিভাগের এজেন্সী সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

য়্যাসোসিয়েটেড ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বরিশাল জেলার গৌর নদীতে একটি আফিস খুলিয়াছেন। উক্ত কোম্পানীর পরিশ্রমী ও সুদক্ষ কর্ম্মচারী মিঃ মণিমোহন নাথ, সেই ব্রাঞ্চ আফিসের ম্যানেজার হইয়াছেন।

মিঃ এল এন্ সেন, কমন ওয়েলথ্ য়্যাস্যুরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

নেপচুন য়্যাস্থ্যরান্স কোম্পানীর কলিকাতাস্থ ব্রাঞ্চ আফিস ১২নং ডালহৌসী স্কোয়ার হইতে "উইণ্ডসর হাউস্ ম্যাঙ্গো লেন, এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম. ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে জাতীয় কল্যাণ ইনসিওরেন্স সোসাইটি ১০৫০০০০ টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়াছেন। তন্মধ্যে ৯৫০০০ টাকার প্রস্তাব গৃহীত ও তাহার উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। গ্রেট ইণ্ডিয়ার দরুণ যে কারবার পাওয়া গিয়াছে তাহা এই হিসাবে ধরা হয় নাই।

সম্প্রতি নানাস্থানে কয়েকটী নূতন ব্যাঙ্ক ও পুরাতন ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে। তাহাদের নাম এই,—(১) ভাগলপুরে ক্যালকাটা কমার্শ্যাল্ ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ আফিস (২) কলিকাতা, ৩নং ম্যাঙ্গো লেনে ব্যাঙ্কার্স্ ইউনিয়ন লিমিটেড (৩) কলিকাতা ৮৪নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে ফেডারেটেড কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড (৪) জোড়হাট (আসাম) সহরে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ আফিস (৫) নোয়াখালী নাথ ব্যাঙ্কের চট্টগ্রাম ব্রাঞ্চ আফিস (১২) কলিকাতা ১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিমিটেডের নূতন আফিস।

ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রথম বৎসরে ৫:৯২৫০ টাকার বীমার কারবার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ৮১৭২৫০ টাকায় উঠে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, গত বৎসরে (কোম্পানীর তৃতীয় বৎসর) কোম্পানী ১০০৪৭৫০ টাকার নূতন বীমার কারবার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর এইরূপ ক্রমোন্নতি উহার সুপরিচালনার পরিচায়ক এবং বিশেষ আশার কথা।

গত ৭ই মে মিঃ শরৎচন্দ্র বসু রাজস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর উদ্বোধন কার্য্য উক্ত কোম্পানীর হেড আফিস গৃহে (১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে সম্পাদন করিয়াছেন।

(১) পোল্যাণ্ডের কন্সাল এবং জমিদার রাজেন্দ্র সিং সিংহ, (২) কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মিঃ বিজয় সিং নাহার, (৩) দয়াময়ী সুগার মিলের ম্যানেজিং এজেন্ট্ মিঃ পি সি ঘোষাল, ইঁহারা তিনজন গৃহলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর হইয়াছেন। মিঃ বি গাঙ্গুলী এম্ এ, ডি ই (লণ্ডন) এফ্ আর ই এস্ (লণ্ডন) ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে এই কোম্পানীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, গত ৩১শে মার্চ্চ (১৯৩৭) পর্য্যন্ত এক বৎসর স্বদ্ধ্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ৩৩ লক্ষ টাকার নূতন বীমার কারবার করিয়াছেন। তার পূর্ব্ব বৎসরে নূতন বীমার পরিমাণ হইয়াছিল ২৭ লক্ষ টাকা। জীবনবীমা তহবিলও ১২ লক্ষ টাকা হইতে সাড়ে ১৫ লক টাকায় উঠিয়াছে।

হিন্দুস্থানের' চীফ্ এজেন্টস্ মেসার্স এ সি বিশ্বাস এণ্ড সন্সের মিঃ পি কে বিশ্বাস গাইবান্ধা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

হিন্দুস্থানের ডিরেক্টর এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত গত ২২শে এপ্রিল সস্ত্রীক ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন।

৩নং জন্‌সন রোড, ম্যাগ্‌নেট বিল্ডিং, ঢাকা এই ঠিকানায় ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একটি শাখা আফিস খোলা হইয়াছে।

বেঙ্গল ইনসিওরেন্স এণ্ড রিয়্যাল প্রপার্টির অর্গানাইজিং অফিসার মিঃ সত্যপ্রিয় ব্যানার্জ্জির চলা ফেরা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের যে বিধি-নিষেধ ছিল, আমরা শুনিলাম, তাহা সম্প্রতি প্রত্যাহৃত হইযাছে। মিঃ ব্যানার্জ্জি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য।

ফ্রি-ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানীর দ্বিতীয় বৎসরে প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে ২২৪২৮৭ টাকা; খরচের অনুপাত শতকরা ৩৬·৮ টাকায় নামিয়াছে এবং জীবনবীমা তহবিল বাড়িয়া ১০৫৩৩৫ টাকা হইয়াছে।

জাতীয় কল্যাণ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৮ই মে তারিখে মোটর দুর্ঘটনায় বিশেষভাবে আহত হইয়া শয্যাগত আছেন। তাঁহার ৮টী দাঁত ও নীচের চোয়ালের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উক্ত কোম্পানীর মেডিকেল অফিসার শ্রীযুক্ত বিনয় বানার্জ্জি উক্ত দুর্ঘটনার ফলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় গত ১৩ই মে মারা গিয়াছেন। সত্যনারায়ণ বাবু ক্রমশঃ আরোগ্য পথে। তাঁহার অনুপস্থিতিতে মিঃ ব্যানার্জ্জি অবৈতনিকভাবে জাতীয় কল্যাণের জেনারেল ম্যানেজারের কাজ করিতেছেন।

নলিনী নাথ মুস্তফী নামক একব্যক্তি ১৯৩২ সালের ১৫ই জুলাই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার এষ্টেটের য্যাডমিনিষ্ট্রেটর রাধিকা প্রসাদ মুস্তফী ক্যানাডার সান্-লাইফ য্যাস্যুরেন্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে নলিনী নাথের জীবনবীমার ৪টী পলিসির দাবী বাবদ মোট ৮২০৭৫ টাকা লইবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে নালিশ করে। মিঃ জাষ্টিস্ আমীর আলীর এজলাসে মামলার বিচার হয়। আসামী কোম্পানী এই বলিয়া জবাব দেয় যে, তাহারা নলিনীর মৃত্যুর কোন খবরই পায় নাই। যদিও বা তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তথাপি ঐ মৃত্যুর তারিখে তাহার কোন বীমার পলিসিই বলবৎ ছিল না। অনাদায়ী প্রিমিয়ামের দরুণ তাহা পূর্ব্বেই বাতিল হইয়া গিয়াছিল। মামলা ডিস্‌মিস্ হইয়া গিয়াছে।

বাংলা গভর্ণমেণ্টের ইনকাম্ ট্যাক্স কমিশনার নর্থ ব্রিটিশ য্যাণ্ড মার্কেণ্টাইল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩৪-৩৫ সালের আয়ের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা সম্বন্ধে হাইকোর্টের মন্তব্যের প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্ত করেন। দেখা যায়, ইনকাম্-ট্যাক্স কমিশনার উক্ত কোম্পানীর ১৯৩৪-৩৫ সালের আয় ৬৯০৮৮৩ টাকার উপর ট্যাক্স ধার্য্য করেন। এই আয়ের ৫২৪৯৬৭ টাকা জীবনবীমা হইতে এবং বাকী ১৬৫৯১৬ টাকা অগ্নিবীমা হইতে পাওয়া গিয়াছিল। শেষোক্ত আয়ের উপর ট্যাক্স দিতে কোম্পানীর কোন আপত্তি ছিল না।

কোম্পানীর ১৯২৬-৩০ সালের ভ্যালুয়েশনে মোট ২৬২৪৮৩৫ টাকা লাভ দাঁড়ায়। ইহার এক পঞ্চমাংশের উপর ১৮৩৪-৩৫ সালে আয় কর ধার্য্য হইবার কথা। তদনুসারে ইনকাম্ ট্যাক্স কমিশনার ৫২৪৯৬৭ টাকার উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিতে চাহেন। কিন্তু কোম্পানীর তরফ হইতে এই আপত্তি করা হয় যে, ঐ আয় "ট্যাক্স-মুক্ত" সিকিউরিটী হইতে পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আইনের ৮ (২) এবং ১৮ (৫) ধারা অনুসারে উহার উপর ট্যাক্স বসানো যাইতে পারে না। চীফ জাষ্টিস্, মিঃ জষ্টিস্ কষ্টেলো, এবং মিঃ জষ্টিস্ প্যাংক্রিজ এই তিনজন বিচারপতি মিলিত হইয়া সমস্ত বিষয়টির আলোচনা করেন। শেষে অধিকাংশের মতে কোম্পানীরই

জয় হইল। অর্থাৎ কোম্পানী ত ট্যাক্স হইতে রেহাই পাইলেনই, উপরন্ত ইন্‌কাম্‌ ট্যাক্স কমিশনার মহাশয়ের নিকট হইতে মামলার খরচাও পাইবেন।

—※—

ইউনিক য়্যাস্যুরেন্স কোম্পানী তাঁহাদের অর্গেনাইজার বীরেন্দ্রকুমার সেনের বিরুদ্ধে ৩৭৯০ টাকার দাবী করিয়া হাইকোর্টে নালিশ করে। আসামী আত্মপক্ষ সমর্থন করে নাই। মিঃ জাষ্টিস্‌ ম্যাক্‌নেয়ারের এজলাসে মামলা উঠে। প্রমাণাদি দেখিয়া বিচারপতি সুদ ও খরচা সহ মামলা ডিক্রী দিয়াছেন।

—※—

মেদিনীপুর জেলার সবঙ্গ থানার এলেকায় শীতলদী গ্রাম নিবাসী চিন্তামণি ভারতী নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক দিল্লীর "সার্ব্বেণ্ট অব ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে" জীবনবীমা করিয়া পলিসি লইয়াছিল। চিন্তামণির মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী বসন্তকুমারী উত্তরাধিকার সার্টি-ফিকেটের জন্য জেলা জজের নিকট আবেদন করে। ইতিমধ্যে আর একটি বিধবা নারী আদালতে আসিয়া চিন্তামণির প্রথমা স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দেয় এবং উত্তরাধিকারিণী হিসাবে বীমার টাকার অর্দ্ধাংশ দাবী করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে আদালতে হাজির না থাকায় জজ বসন্তকুমারীকেই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী সাব্যস্ত করিরা সার্টিফিকেট দেন। এদিকে মেদিনীপুরের তৃতীয় মুন্সেফী আদালতে এই মর্ম্মে এক মামলা রুজু হয় যে, চিন্তামণির প্রথমা পত্নী মৃত স্বামীর সম্পত্তির অর্দ্ধেকের মালিক,—সুতরাং তাহাকে উহাতে দখল দেওয়া হউক। বসন্ত কুমারীর পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ ও তদন্ত করা হইলে প্রকাশ পাইল,—যে স্ত্রী-লোকটি চিন্তামণির প্রথমা পত্নী বলিয়া পরিচয় দিতেছে, সে পার্শ্ববর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামের বিপিন ধোপার স্ত্রী বসন্ত দাসী! স্বামী বর্ত্তমান থাকিতেই সে দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় ব্রাহ্মণ বিধবা সাজিয়া চিন্তামণির সম্পত্তিতে ভাগ বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। অতঃপর সে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে প্রতারণার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। দোষ স্বীকার করার বিচারক তাহাকে ৩০০ টাকার জামিনে এবং এক বৎসর সদ্ভাবে থাকার অঙ্গীকারে মুক্তি দিয়াছেন।

—※—

ত্রিপুরা জেলার মিয়াজান দপ্তরী নামে এক ব্যক্তি প্রভিডেণ্ট এণ্ড বেনাভলেণ্ট সোসাইটীতে তাহার মায়ের জীবনবীমা করে। কিছুদিন পরে তাহার মায়ের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সে পলিসির দাবী জানায়। কোম্পানীর তরফ হইতে অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, তাহার মাতার মৃত্যু হয় নাই। তখন কোম্পানী মিয়াজানের বিরুদ্ধে প্রতারণার অপরাধে ফৌজদারী মামলা করে। জবাবে মিয়াজান বলে যে, সে তাহার বিমাতার জীবনবীমা করিয়াছিল, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণে তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না। সুতরাং মিয়াজানের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

—※—

কিছু কাল পূর্ব্বে কান্টী ইনস্যুর্যান্স্‌ কোম্পানী লিঃ নামীয় একটী বীমার কারবার লিকুইডেশনে যায়। সম্প্রতি কে ভি লালা নামক এক ব্যক্তিকে পুলিশ লাহোর হইতে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় আনিয়াছে।

গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার মিঃ আর আই মেহ্‌তার চেষ্টাতেই কে ডি লালা ধরা পড়ে। ইহার বিরুদ্ধে রেঙ্গুনে এই অভিযোগে এক মামলা দায়ের হইয়াছে যে, কে ডি লালা প্রতারণা পূর্ব্বক ১০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায়, এই কে ডি লালা নাকি সেই কান্ট্রি ইন্‌সুর‍্যান্স্‌ কোম্পানীরই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিল। উক্ত বীমা কোম্পানীর হেড আফিস ছিল কলিকাতায়। সেইজন্য লালাকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় আনা হয়। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্ত লালাকে পুলিশ হেপাজতে রেঙ্গুনে পাঠাইবার আদেশ দিয়াছেন। সেখানে তাহার অপরাধের বিচার হইবে।

—※—

বরিশাল জেলার চোবামদ্দি গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র দাস নামক এক ব্যক্তি নিজেকে বরিশালের নিশিকান্ত দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া বম্বে মিউচুয়্যালের একটী হাজার টাকার পলিসি গ্রহণ করে। সতীশ হালদার ইহাতে এজেন্টের কার্য্যকরে, এবং বরিশালের কোন উকীল বন্ধুস্বরূপ প্রস্তাব পত্রে স্বাক্ষর করে। এই জুয়াচুরী প্রকাশিত হইয়া পড়িলে কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনের ৪১৭, ৪১৯ এবং ৫১১ ধারা মতে অভিযোগ উপস্থিত হয়। এজেন্ট্‌ সতীশ হালদার এবং সেই বন্ধুরূপী উকীলকেও আসামী ভুক্ত করা হয়। বরিশালের সাব্‌ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ মিঃ ডি এন মুখার্জ্জির বিচারে কৃষ্ণচন্দ্র দাসের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এজেন্ট্‌ সতীশ হালদার ও বন্ধুস্থানীয় উকীল মহাশয় খালাস পাইয়াছেন।

—※—

ঢাকার ইন্দ্রমোহন সাহা নামক একব্যক্তি কোন কোম্পানীতে জীবন বীমা করিয়াছিলেন। একবার দুইবার প্রিমিয়াম দেওয়ার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু কোম্পানী দাবীর টাকা দিলেন না। ইন্দ্রমোহন সাহার কন্যা সুরবালা পলিসির টাকা দাবী করিয়া ঢাকার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত অজিত রঞ্জন মুখার্জ্জির এজলাসে কোম্পানীর বিরুদ্ধে নালিশ করে। মামলা উত্থাপন হইলে সাক্ষ্য প্রমাণে জানা গেল, ইন্দ্রমোহনের বয়স অনেক বেশী ছিল,—জাল কুষ্টী তৈয়ারী করিয়া বীমার প্রস্তাবপত্রে বয়স কম লেখান হয়। সুতরাং বিচারক মুন্সেফ্‌ মহাশয় মামলা খরচ সমেত ডিস্‌মিস করিয়া দিয়াছেন।

—※—

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর কালীবাড়ীর পুরোহিত কোন কোম্পানীতে তাঁহার স্ত্রী কনকা সুন্দরী দেবীর জীবন বীমা করিয়া দুই হাজার টাকার পলিসি গ্রহণ করেন। দুই কিস্তি প্রিমিয়াম দেওয়ার পরে কনকা সুন্দরীর মৃত্যু হইয়াছে, সে খবরও শোনা গেল। কনকা সুন্দরীর একপুত্র নিকুঞ্জ কোম্পানীর আফিসে আসিয়া কোর্ট হইতে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারের সার্টিফিকেট্‌, এবং কনকা

সুন্দরীর মৃত্যুর সার্টিফিকেট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ দেখায়। কোম্পানী অগত্যা পলিসির টাকা দিলেন। পরে জানাগেল, সমস্ত ব্যাপারটাই আগাগোড়া জুয়াচুরী। সেই পুরোহিত ঠাকুরের কনকা সুন্দরী নামে কোন স্ত্রী-ই ছিলনা। সুতরাং তাহার পুত্র নিকুঞ্জও জাল এবং ঐ সকল সার্টিফিকেট প্রভৃতি কাগজপত্রও সমস্ত জাল। অবিলম্বে প্রতারণার অপবাধে পুরোহিত ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করা হইল। সঙ্গে তাঁহার একটি শ্যালকও ধরা পড়িল। বিচারে উভয়ের কারাদণ্ড হইয়াছে।

কলিকাতার বিখ্যাত জমিদার প্রদ্যুম্ন কুমার মল্লিক সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ন্যাশন্যাল ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর নিকট হইতে ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। তাহার দেড় লক্ষ টাকা তিনি আসল বাবতে পরিশোধ করেন। অবশিষ্ট আসল দুই লক্ষ ৭০ হাজার টাকার জন্য এবং ১৯৩৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অনাদায়ী সুদ ৬৬২১১ টাকার জন্য উক্ত কোম্পানী হাইকোর্টে নালিশ করেন। মিঃ জাষ্টিস্ লর্ট উইলিয়াম্‌সের এজলাসে মামলার শুনানী হয়। বিচারপতি খরচা সহ মামলা ডিক্রী দিয়াছেন।

নাগপুরে ইমাম নামে একজন লোক জি আই পি রেল কোম্পানীর ডিষ্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসারের অধীনে পিয়নের কার্য্যে স্থায়ীরূপে

নিযুক্ত ছিল। একদা সাইকেলে চড়িয়া তাহার মনিবের আফিসের ডাক লইয়া আসিবার সময় পথে একটা দৈব দুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু হয়। তাহার বিধবা স্ত্রী মুসাম্মত সীতা ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া রেল কোম্পানীর বিরুদ্ধে নালিশ করে। কিন্তু রেল কোম্পানী বলে যে, আইন অনুসারে মৃত ব্যক্তি ওয়ার্কম্যান্ (work man) পদবাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু কমিশনার মিঃ এম্ এন্ ক্লাক সেই যুক্তি গ্রাহ্য না করিয়া প্রার্থিনী বিধবা স্ত্রীলোকটিকে ৭২০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেন। ইহার বিরুদ্ধে রেল কোম্পানীর পক্ষ হইতে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট নাগপুর হাইকোর্টে আপীল করেন। বিচারপতি মিঃ জাষ্টিস্ নিয়োগীর বিচারে আপীল অগ্রাহ্য হয়। সুতরাং মৃত ইমামের বিধবা স্ত্রী মুসাম্মত সীতা ৭২০ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদে পাইবে।

গ্রেট্ ইষ্টার্ণ লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী চট্টগ্রামের পটীয়া থানার এলেকায় কোন গ্রাম নিবাসী রামগতি ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তির জীবন বীমার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ১৫০০ টাকার একখানি পলিসি ইস্যু করেন। অল্প দিনের মধ্যেই রামগতি মারা যায় এবং কোম্পানীকে দাবীর টাকা পুরাপুরি দিতে হয়। একদিন দৈবাৎ কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী রামগতিকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করে "কি মশাই, আপনার না মৃত্যু হ'য়েছে? সম্বোধিত ব্যক্তি অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে বলিল "আমার নাম ত ফণীন্দ্র ভট্টাচার্য্য"। অবিলম্বে ব্যাপারটি পুলিসের হাতে গেলেই সকল রহস্য প্রকাশ পাইল। এই ফণীন্দ্র ভট্টাচার্য্যই রামগতি সাজিয়া বীমার প্রস্তাবের সময় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়াছিল। কারণ, বাস্তবিক রামগতি ছিল ৭৫ বৎসরের শ্মশানাভিমুখী বৃদ্ধ। মামলা উঠিলে ফণীন্দ্র পলায়ন করিল। ষড়যন্ত্রে সহায়কারী সুরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য ও শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য নামক আর দুইজনের দেড়হাজার টাকা করিয়া জরিমানা এবং ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর নিয়ম অনুসারে ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত হিসাব ও রিপোর্ট দাখিল না করাতে রংপুর, কুতুবপুর লোনকোম্পানীর ডিরেক্টর (১) মণীন্দ্র চৌধুরী (২) বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (৩) প্রভাত ভট্টাচার্য্য (৪) নগেন্দ্র লাহিড়ী এবং সেক্রেটারী (৫) সুধীর চক্রবর্ত্তী, এই পাঁচ জনের প্রত্যেকের ১৫০ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

সঞ্চয়হীনের দশা

বয়স কালে হরেন বাবুর অর্থ সম্পদ, মান সম্ভ্রম, বন্ধুবান্ধব, সভাসদ, চাটুকার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার কথায় লোকে উঠিত বসিত। তিনি বলিলে লোকের চাকরি জুটিয়া যাইত। তিনি অসন্তুষ্ট হইলে কাহারও রক্ষা থাকিত না। ভোগে, বিলাসে, অভিনব খেয়ালে হরেন বাবুকে প্রাচীন বাদশাহী আদর্শের এক আধুনিক উদাহরণ বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। শুনা যায়, তিনি ছুটির সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইলে বাংলা দেশের মাটী ও জল হাওয়া ব্যতীত আর সকল উপকরণই সঙ্গে লইয়া চলিতেন। সুদূর পশ্চিমে, বাংলার একান্ত নিজের তরি তরকারী ও মৎস্য, অথবা যথাযথ ও নির্দ্দিষ্ট জাতীয় চাল, ডাল, তৈল, ঘৃত, চাকর, ঝি, বাসন, আসবাব, সটকা, তামাক কিম্বা কোন কিছুর অভাব হইলে হরেন বাবু তাহা বরদাস্ত করিতেন না। কন্যার বিবাহ কিম্বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে হরেন বাবুর ফিরিস্তি জার্ম্মান সমরের হতাহতের তালিকার মতই সুদীর্ঘ ও সর্ব্বগ্রাসী হইত। সে আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কিন্তু এখনও সে কথা লোকে কিম্বদন্তীর মতই আওড়াইতে থাকে।

কিন্তু, এ হেন হরেন বাবু আজ চাকরী অবসানে হৃত-সম্পদ এবং হৃত যৌবন অবস্থায় ছোট আদালতের উকিল মহলের "টাউট"। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন বাদী ফরিয়াদীদের উপযুক্ত উকিল সরবরাহ করিয়া দিনান্তে দুই এক টাকা সংগ্রহ করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া যান। ছোট টিনের চালায় স্বপাকে আহার ও ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করেন। কেন? কারণ, কিছুই নহে —শুধু অর্থাভাব। যৌবনে অগাধ অর্থ সম্পদ অপব্যবহার করিয়া হরেন বাবু আজ নিঃসম্বল। কিছু টাকা যাহা ছিল ভাঁটার মুখে রাতারাতি বড়লোক হইতে গিয়া তথাকথিত ব্যবসায়ে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহার দৌলতে কত লোকের একদিন সুসময় গিয়াছে, আজ তাহারই অভাবের দিনে কাহাকেও কোথাও দেখা যায় না।

গল্পটী কিছু অভিনব নহে। সময়ে বার্দ্ধক্যের পুঁজি ঠিক করিয়া না রাখিলে অনেকেরই এই দশা হয়। শুধু মানুষ কেন, জীবজগতে সঞ্চয়ের মূল্য সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য। উদাহরণ, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি। সময় থাকিতে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখা প্রয়োজন।

জীবন-বীমারও সার্থকতা এই কারণেই। যৌবনে, রোজগারের সময়ে, বিন্দু বিন্দু করিয়া যে অর্থ বীমায় রক্ষিত হয়, অভাবের সময়ে নিজের বা নিজের অবর্ত্তমানে, পরিবারবর্গের নিকট তাহাই প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, শীতল, সরোবরের রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হয়। বীমায় রক্ষিত অর্থ, সকল ভুল, ভ্রান্তি, মোহ, ও অপচয় আশঙ্কার উপরে। জীবিত থাকিলে বীমা বার্দ্ধক্যের সম্বল, মৃত্যু ঘটিলে পরিবারের আশ্রয়। ইহা ব্যতীত পুত্রের শিক্ষা কিম্বা কন্যার বিবাহের জন্যও বিশেষ বীমা করা যায়।

এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত উপদেশ পাইতে হইলে **ভারত ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ**, ভারত ভবন, কলিকাতা, ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। "ভারত" অদ্যাবধি তাহার বীমাকারীদিগকে এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়াছে। চল্লিশ বৎসরের পুরাতন আফিশ। বর্ত্তমানে মোট তহবিল দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। বীমার সর্ত্ত প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা ও লাভজনক। বীমাকারীদের পাওনা শোধ অতিসত্বর ও নির্ঝঞ্ঝাটে করা হয়। বাংলার সর্ব্বত্র এজেন্ট আছে।

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ য়্যাস্যুর্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

আমরা উপরোক্ত কোম্পানীর ১৯৩৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট পাইয়াছি। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণের সহিত আমাদের সমালোচনা প্রকাশিত হইল।

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া ৪০ বৎসর পার হইয়া গেল। বীমাজগতে এই কোম্পানী তাহার পূর্ব্বের সুনাম ও শ্রেষ্ঠ স্থান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আলোচ্য বৎসরের হিসাবই তাহার নিঃশংসয় পরিচয়। কেবলমাত্র "অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে" বলাই যথেষ্ট নহে,—কোম্পানীর বিজয় মুকুট অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১৮৬৬৯০০০ টাকা মূল্যের ১১৯১৫টী পলিসি ইস্যু করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্যাপেক্ষা এ বৎসর কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ২৯,৬০,০০০ টাকা বাড়িয়াছে। কোম্পানীর দীর্ঘ ৪০ বৎসরের ইতিহাসে, এইরূপ কারবার বৃদ্ধি আর কখনও হয় নাই। মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ আন্দাজ মতই রহিয়াছে; তবে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা অনেক কম। পূর্ব্ব বৎসরে কোয়েটা ভূমিকম্পে কোম্পানীর অনেক পলিসি হোল্ডার মারা যায়। সেইজন্য দাবীর পরিমাণ বেশী হয়। মৃত্যুজনিত পলিসির দাবী বোনাস্ সহ মোট ১১৫১৫৭২ টাকা উপস্থিত হইয়াছে। মেয়াদশেষ হওয়ার দরুণ (বোনাসসহ) ২৫১৪৬২০ টাকার দাবী উপস্থিত হইয়াছে। প্রিমিয়াম বাবতে যত টাকা আয় হইয়াছে, তাহার উপর শতকরা প্রায় ২৫ টাকা (২৪০৯) হিসাবে খরচ হইয়াছে। কোম্পানীর কারবার অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পরিচালনার খরচ বৃদ্ধি পায় নাই; এত কম খরচের অনুপাত, ভারতীয় বীমার কারবারে বড় একটা দেখা যায় না। এম্পায়ারের ইহাই বিশেষত্ব এবং এই গুণেই ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে এম্পায়ার এত প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর হইতে কোম্পানী "ফাইডিলিটী গ্যারাণ্টির বিভাগটী" তুলিয়া দিয়াছেন। কারণ ইহাতে উচ্চ হারে প্রিমিয়াম পাওয়া যায় না। ঐ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর বণ্ডের পরিমাণ ছিল ২,১০,৩০০ টাকা। তাহার দরুণ বার্ষিক প্রিমিয়াম পাওয়া যাইত ১১০৭ টাকা। এই বিভাগে ১২১৯ টাকার দাবী উপস্থিত হইয়াছে।

জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ (রিজার্ভ তহবিল সহ) ৪,৬৮,৪৮,১০৭ টাকা হইয়াছে। কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪,৮৭,২৭,১৩৪ টাকা; পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ২৪লক্ষ টাকা অধিক এবং মোট মজুত বীমার পরিমাণ (বোনাস সহ) ১২,৮২,৮৮,৯৭০ টাকা মূল্যের ৭০২৩৩ টী পলিসি। ভারতীয় ট্রাষ্ট আইন অনুসারে যে সকল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী অথবা অন্যবিধ সিকিউরিটী নির্দ্ধারিত আছে, তাহাতেই কোম্পানীর টাকা লগ্নী করা আছে। সুতরাং কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদ ও লাভজনক ভিত্তিতে ন্যাস্ত রহিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোম্পানীর সম্পত্তির হিসাবে এই সকল সিকিউরিটীর মূল্য বাজার চল্‌তি মূল্য অপেক্ষা কম ধরা হইয়াছে।

পাঁচবৎসর অন্তর কোম্পানীর একবার ভ্যালুয়েশন হয়। তদনুসরে এবারে কোম্পানীর ৮ম ভ্যালুয়েশন হইবে। কোম্পানীর নিজের য্যাকচুয়ারী কর্ত্তৃক সেই ভ্যালুয়েশনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কোম্পানী প্রতি শেয়ারে ২ টাকা ডিভিডেণ্ড্ এবং ১২ টাকা বোনাস্ দিয়াছেন এবং কর্ম্মচারিগণকে একমাসের বেতন বোনাস দিয়াছেন।

হিসাবের মধ্যে আমরা কোটী কোটী টাকার অঁাক দেখিতে না পাইলেও কোম্পানী ধীরস্থির ভাবে যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। কারবার বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে খরচের অনুপাত কম রাখা, পরিচালন ব্যাপারে বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক। বাস্তবিক অধিক পলিসির সংখ্যাই কোম্পানীর শ্রেষ্ঠতা ও উন্নতির লক্ষণ নহে। পক্ষান্তরে যদি সম্পত্তি বা য়্যাসেট্‌স্ উপযুক্ত পরিমাণে না থাকে, তবে পলিসির সংখ্যা অধিক হইলে কোম্পানীর বিপদ ঘনাইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ বীমার পলিসি ইস্যু করার সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর স্কন্ধে একটা চুক্তি-সঙ্গত দেনার ভারও চাপিয়া বসে। তাহা বৃদ্ধি পাইবার অনুপাতে যদি ঐ দেনা মিটাইবার টাকার জোগাড় না হয় তবেই কোম্পানীর অবস্থা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সেইজন্য কোম্পানীর সমালোচনায় আমরা কারবার বাড়্‌তির দিকে তেমন দৃষ্টি না দিয়া মোট সম্পত্তি বা য়্যাসেটস্, জীবনবীমা এবং অন্যান্য তহবিলের পরিমাণ, কার্য্যবৃদ্ধির অনুপাতে খরচের পরিমাণ; মজুত পলিসির তুলনায় লাইফ ফাণ্ডের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য করি। কোম্পানী বীমার প্রস্তাব নির্ব্বাচনে কিরূপ সাবধান ও সুকৌশলী তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণে। বলা বাহুল্য এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া এই সকল পরীক্ষায় প্রচুর আর্থিক ভিত্তিসম্পন্ন ক্রমোন্নতিশীল বীমা কোম্পানী বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্রই আদৃত হইয়া থাকে।

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়্যাল লাইফ য়্যাসোসিয়েসান লিঃ

আমরা উপরোক্ত কোম্পানীর ১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের রিপোর্ট ও হিসাব পাইয়াছি। দেখিয়া সুখী হইলাম যে, কোম্পানী পূর্ব্বের মত বরাবর উন্নতির পথেই চলিয়াছে এবং সকল দিকেই কোম্পানীর সুপরিচালনার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহা কোম্পানীর একাদশ বার্ষিক কার্য্য বিবরণ।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১৫০৯৭৫০ টাকার নূতন বীমা সংগ্রহ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্ব বৎসর ইহার পরিমাণ ছিল, ১১৯৭৫০০ টাকা। সুতরাং দেখা যায় কোম্পানীর এদিকে কারবার শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে বাড়িয়াছে। বীমা ব্যবসায়ে প্রবল প্রতিযোগিতা ও নানা অসুবিধার মধ্যে অল্প বয়স্ক এই কোম্পানীর পক্ষে এরূপ উন্নতি অতীব সন্তোষজনক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৎসরের আরম্ভে জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩,৯২,১৭৫ টাকা; বৎসরের শেষে উহা উহা দাঁড়াইয়াছে ৫,০১,৭৮২ টাকা। এই খানেও কোম্পানীর তহবিল শতকরা ২৫ টাকারও উপর বাড়িয়াছে। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, যে সকল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে কোম্পানীর টাকা লগ্নী আছে, তাহার মূল্য ৭৩০০০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ৭৩০০০ টাকা কোম্পানীর মোট সম্পত্তির হিসাবে ধরা হয় নাই। সুতরাং দেখা যায়, কাগজ পত্রে কোম্পানীর যে আর্থিক অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে, প্রকৃত অবস্থা তাহা অপেক্ষা বাস্তবিক আরও দৃঢ়তর।

তহবিলের শতকরা ৫১ টাকা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে, মিউনিসিপ্যাল ও অন্য ডিবেঞ্চারে লগ্নী করা হইয়াছে। কোম্পানীর তহবিলের শতকরা ২৭॥০ টাকা মর্টগেজে লগ্নী আছে। মর্টগেজের পরিমাণ প্রেসিডেন্সী সহরের উপর বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যের শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে নির্দ্ধারিত। অর্থাৎ শতকরা ৫০৲ টাকা margin রাখিয়া তবে মরগেজে সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়। তহবিলের শতকরা ১১ টাকা বীমাকারীদিগকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় একদিকে যেমন লগ্নী টাকা মারা পড়িবার ভয় নাই, অন্য দিকে তাহা হইতে আয়ও হইতেছে বেশী।

আলোচ্য বৎসরে ২৭টি মৃত্যু জনিত মোট ২৮৪৫১ টাকার দাবী উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে ৯টী দাবীর টাকা বৎসরের ভিতরেই দেওয়া হইয়াছে। অধিকাংশ দাবী বৎসরের শেষ ভাগে উপস্থিত হয়। আমরা হিসাবে দেখিতে পাইলাম ঐ অবশিষ্ট দাবী মিটাইবার জন্য টাকা বরাদ্দ করিয়া রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর আয় হইয়াছে ২২৮২৮১ টাকা। মোট খরচ ৯৬৩৭৭ টাকা। পরিচালন খরচা খুব কম দেখা যায়। ডিরেক্টর গণের রিপোর্টে প্রকাশ, কলিকাতা ব্রাঞ্চের কার্য্য খুব ভাল চলিতেছে। দিল্লীতে ও রাজমহেন্দ্রীতে ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে। আমরা "ইণ্ডিয়ান মিউচুয়্যালের" ক্রমোন্নতি কামনা করিতেছি।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়্যাল বেনিফিট সোসাইটী লিমিটেড

আমরা উপরোক্ত কোম্পানীর ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট পাইয়াছি। নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম দেওয়া হইল।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১২৬৭টী নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছেন। তন্মধ্যে ১০৯১টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহার উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। এই বীমার পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা। দেখা যাইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের নূতন বীমা অপেক্ষা এবার শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে কারবার বাড়িয়াছে। প্রিমিয়াম বাবতে আয় হইয়াছে ৩১০৫১ টাকা। ইহা অতীব সুখের বিষয় এবং আশার কথা যে, কোম্পানীর তহবিল এইরূপে বৃদ্ধি পাইয়া তাহার আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করিয়া তুলিতেছে। হিসাবে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে কোম্পানীর তহবিলের শতকরা ৬০ ভাগ গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটীতে লগ্নী করা আছে। আরও বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, যদিও ইনডাষ্ট্রীয়াল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর পক্ষে গভর্ণমেণ্টের নিকট টাকা ডিপজিট রাখার কোন বাধ্যতামূলক নিয়ম নাই, তথাপি এই কোম্পানী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট ৬০০০ টাকা জমা রাখিয়াছেন।

ইহার আগেকার বৎসরে প্রিমিয়াম বাবতে ২৪৬৪৬ টাকা আয় হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যায় প্রিমিয়ামের আয় শতকরা ২৬ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের আরম্ভে জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৭৬১৩ টাকা। বৎসরে শেষে তাহা দাঁড়াইয়াছে ২৪১২ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে মোট ৪৯৩২ টাকা। সমস্ত পলিসির দাবীই খুব শীঘ্র শীঘ্র মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর একটি বিশেষ আশার কথা এই যে, যদিও নূতন বীমা শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে বাড়িয়াছে এবং গঠন কার্য্যের জন্য সমস্ত খরচা ধরা হইয়াছে, তথাপি খরচের অনুপাত প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৬৭ টাকার উপরে যায় নাই। ৬ বৎসরের কোম্পানীর পক্ষে ইহা কম প্রশংসার বিষয় নহে। বর্ত্তমান ম্যানেজিং এজেণ্টসগণের ইহা বিশেষ কর্ম্মদক্ষতার পরিচায়ক।

বীকন ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

গত বৎসর নূতন বীমা বিষয়ক আইন প্রস্তাবিত হইবার সময় একটা গুজব রটিয়াছিল যে, অনেকগুলি প্রভিডেন্ট কোম্পানী উঠিয়া যাইবে। সাধারণের এইরূপ সন্দেহ জনক মনের অবস্থার মধ্যে প্রভিডেন্ট স্কীমে বীমার প্রস্তাব সংগ্রহ করা স্বভাবতঃই কঠিন, বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক নূতন প্রভিডেন্ট কোম্পানীর পক্ষে ইহা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী ব্যবসায়ীর নিকট যে সেই বাধার শক্তি

অনেকটা কমিয়া যায়, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি, বীকন ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর ১৯৩৬ সালের হিসাব ও রিপোর্ট হইতে। খুব বড় বড় কথা ও লাখ লাখ টাকার অঙ্ক না থাকিলেও ছোটর মধ্যেও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্যবৎসরে কোম্পানী ২৯৪৫০ টাকার ১২৩টী নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ২৪৭০০ টাকা মূল্যের ১০৩টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহার উপরে পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। কোম্পানীর সকল দিক দিয়া আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে, ২৯৮৯ টাকা। ইহার পূর্ব্ববৎসর আয় হইয়াছিল, ২৪৩৭ টাকা। আলোচ্য বৎসরে খরচ হইয়াছে, ২৪৮৮ টাকা। এই হিসাবে খরচের অনুপাত দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৮৩ টাকা। পলিসির দরুণ দাবী উপস্থিত হইয়াছিল মাত্র একটী এবং সেই দাবীর টাকা এক সপ্তাহের মধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। উলুবেড়িয়া ও কাঁকনাড়াতে কোম্পানীর দুইটী সাব অফিস খোলা হইয়াছে। ঐ সাব অফিস দুইটীর কার্য্য অতি সন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে। কোম্পানীর নিতান্ত প্রাথমিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ম্যানেজিং এজেন্টস-গণ তাঁহাদের প্রাপ্য সমস্ত কমিশন ছাড়িয়া দিয়া-ছেন। কোম্পানীর উন্নতির জন্য ম্যানেজিং এজেন্টসগণের এইরূপ স্বার্থ ত্যাগ বিশেষ প্রশংসনীয়।

বিবি চাহিনা

এক ফকীর কোনও এক মুসলমানের বাড়ীতে ভিক্ষা মাগিতে গিয়াছিল।

মিঞা দরজার উপর বসিয়াছিলেন, বলিলেন, বিবি ঘরে নাই অন্য বাড়ী হইতে ঘুরিয়া এস। ফকীর বলিল, আমিত বিবি চাহিতেছিনা, আমি শুধু ভিক্ষা চাহিতেছি।

ট্রাম ছেড়ে ট্যাক্সি

পরেশনাথের মন্দিরের সাম্‌নে এক ভদ্রলোককে দেখিয়া জনৈক ঠগ্‌ কাকুতি জানাইয়া বলিল,—

মশাই! জুতা জামা রেখে আমি মন্দিরে গিয়েছিলাম। এসে দেখি জুতা জামা সব চোরে নিয়ে গেছে। ভবানীপুর পর্য্যন্ত কেমন ক'রে যাব তাই ভাবছি। দয়া করে যদি দু'গণ্ডা পয়সা দেন তবে বাসে কিম্বা ট্রামে চ'লে যেতে পারি।

ভদ্রলোক। (পকেটে হাতদিয়া) মশাই, আমার কাছেত খুচরা কিছুই নেই, একখানা পাঁচ টাকার নোট আছে মাত্র।

ঠগ। আঃ তা' হ'লেত বাঁচালেন মশাই। এখান থেকে তা' হ'লে ট্যাক্সি ক'রেই বাড়ী চলে যাই।

বাসের বিপত্তি
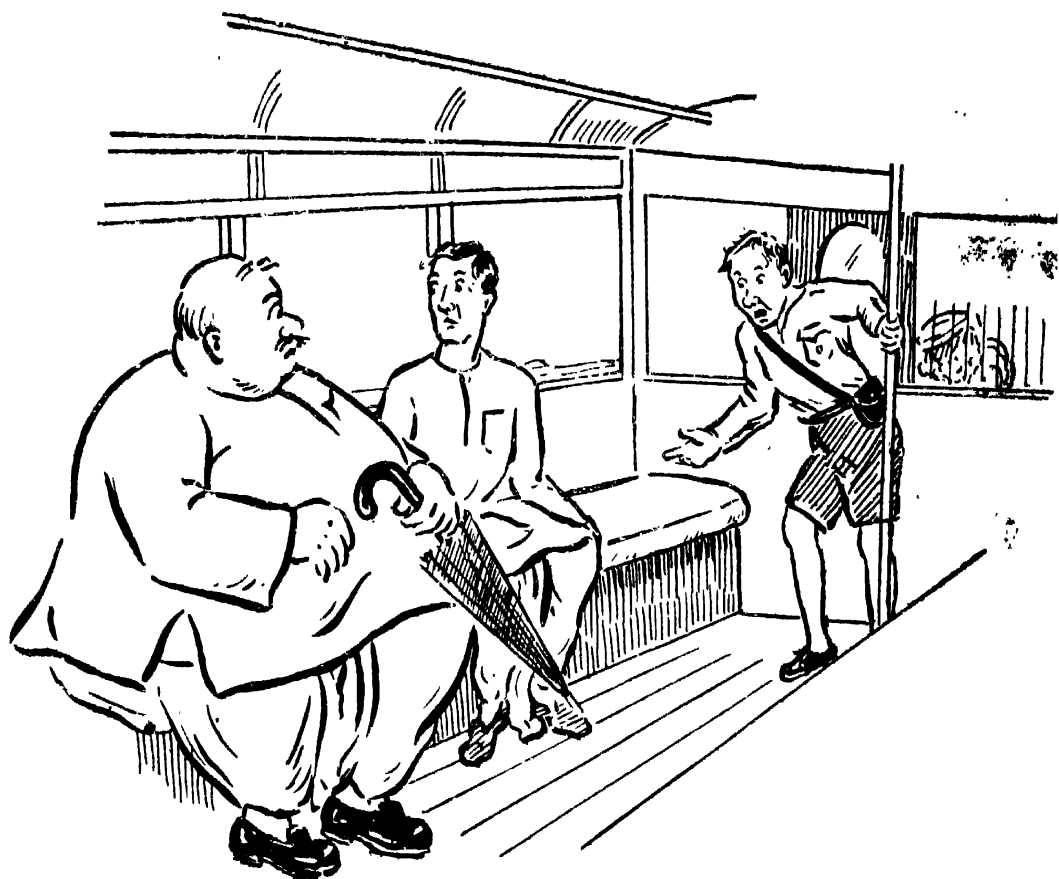
বাস্ কণ্ডাক্টব। আজ্ঞে, আপনি পেছন থেকে উঠে একটু মাঝে স'রে বসবেন?—বাসের সাম্‌নের চাকা মাটী ছেড়ে শূন্যে উঠে ঘুর্‌ছে। জমি না পেলে এগুতে পার্‌ছে না।

বিয়েটা একেবারে FAILURE
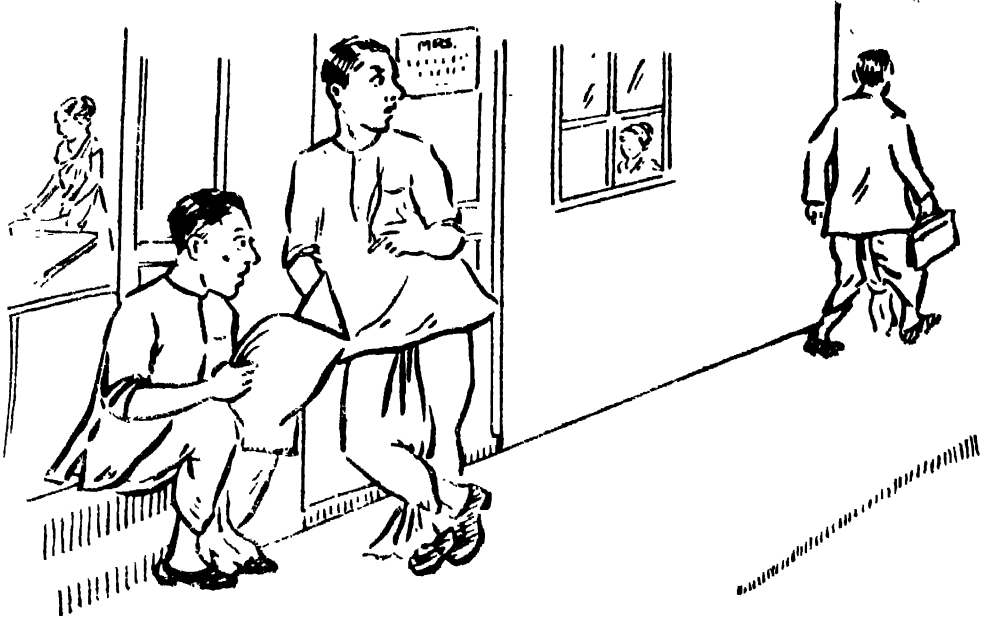
নবনীত কোমল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুশোভনকান্তি ঘোষ তুইজন বেকার গ্রাজুয়েট। উভয়ে একান্তে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছিল।

নবনীত। ভাই! বিয়ে আর কি ক'রে ক'রব ?—আমাদের ত চাকুরীও মিল্‌বে না—খেটে খাবারও শক্তি নেই!

সুশোভন। তুই চিরকাল হাব্‌লাই র'য়ে গেলি। ওসব হবে না জেনেই আমি কেশ, বেশ ও কান্তির পরিচর্য্যায় লেগে গেছি। দেখি যদি কাউকে attract ক'রতে পারি! আজকাল দেখ্‌ছিস্ না ছেলেরা সব রোজগেরে মেয়ের চেষ্টায় ঘোরা ফেরা করে। লাগেত ব্যাস্ নিশ্চিন্ত! রোজগারের হাঙ্গাম্ ত আর থাক্‌বে না!—সে সব স্ত্রীর ওপর। আমরা সব বাম্মা দেশের Drones হ'য়ে থাক্‌ব!

এমন সময়—তাদের সুমুখ দিয়ে তাদের পুরানোবন্ধু প্রলয়পয়োধি দত্ত ব্যাগ্‌ হাতে হন্ হন্ ক'রে আপিশে চলেছে দেখে নবনীত বল্লে—যাও!—তোমার সব বাজে কথা। ওইত পয়োধি হন্ত দন্ত হ'য়ে আপিশে চ'লেছে—ওত গ্রাজুয়েট মেয়ে বিয়ে ক'রেছে!

সুশোভন।— হ্যাঁ তাইত!—ওর বিয়েটা তা' হ'লে failnre হ'য়ে গ্যাছে দেখ্‌ছি!

// ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৭শ বর্ষ } শ্রাবণ—১৩৪৪ { ৪র্থ সংখ্যা।

নারিকেলের চাষ

গতবারে আমরা নারিকেলের চাষ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি। তাহাতে প্রধানতঃ দেখাইয়াছি, বাংলাদেশের পক্ষে নারিকেলের চাষ কত প্রয়োজনীয় এবং ইহার দ্বারা বাংলাদেশে কিরূপে একটি অর্থকরী ও লাভজনক ব্যবসায়ের পত্তন হইতে পারে;—নারিকেল বাংলাদেশের একটি প্রকৃতিদত্ত কৃষি সম্পদ; ইহার চাষে অবহেলা করিলে বাঙ্গালী বাস্তবিক "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিবে"। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে পাটের বাজার নষ্ট হওয়ায়, বাঙ্গালী একটি প্রধান কৃষি সম্পদ হারাইয়াছে। সেই ক্ষতি পূরণের জন্য নারিকেলের চাষ বিশেষরূপে সাহায্য করিবে;—কারণ, নারিকেলের ছোবড়া, মালা, শাঁস, প্রভৃতি সকল অংশই সভ্য জন-সমাজে নানা প্রয়োজনে লাগে এবং তাহার প্রত্যেকটীরই বৃহৎ জগৎজোড়া কারবার রহিয়াছে। বিদেশীয় উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা এদেশে প্ল্যান্টার (Planter) রূপে আসিয়া নারিকেলের চাষ ও তাহার ব্যবসায় হস্তগত করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীকে হয়ত সেই নারিকেল প্ল্যান্টারদের বাগানে কুলী মজুরের কাজ করিতে হইবে,—যেমন হইয়াছে দার্জ্জিলিং আসামের চা বাগিচায়।

আমরা আশা করি,—এত কথা বলিবার পর বাঙ্গালী আর চোখ বুজিয়া থাকিবে না,—যাহাদের সামান্য কিছু ছোট খাট নারিকেল বাগান আছে, তাঁহারা গাছগুলোকে একটু যত্ন করিবেন,—যথার্থ রূপে গাছের পরিচর্য্যা করিবেন, তাহা হইলে বছরে ১০ গণ্ডা নারিকেলের স্থলে অন্ততঃ ১৫ গণ্ডা ফল পাইয়া সুখী হইবেন এবং বুঝিবেন, সত্যই নারিকেল গাছ
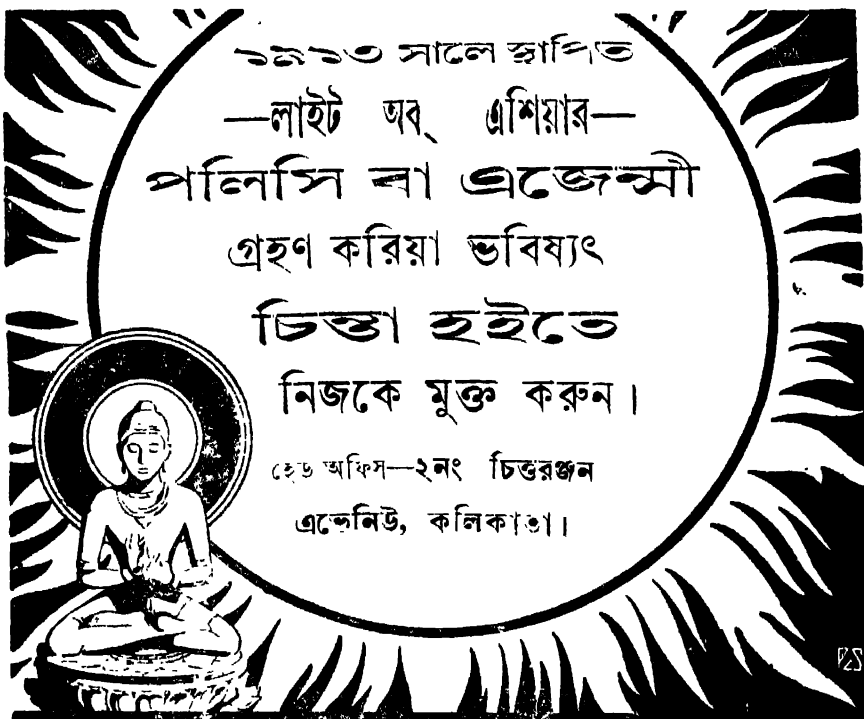
গৃহস্থকে পিতৃভক্ত পুত্রের মত সেবা করে ও লক্ষ্মীর মুখ দেখায়।

আর যাহাদের বড় কারবার খুলিবার মত টাকা আছে, তাঁহারা দস্তুরমত বৃহৎ বাগান কিনিয়া বা জমা লইয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বীজ নির্ব্বাচন, জমি তৈয়ারী, সার প্রদান প্রভৃতি কার্য্য করিয়া যাহাতে প্রচুর ফলন হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। তারপর তেলের কলে,—অথবা ছোবড়ার দড়ির কারখানায় ঐ সকল নারিকেল সরবরাহ করিতে পারেন। এই রকমের কারবার বৃহৎ লিমিটেড কোম্পানী না করিয়া ক্ষুদ্রভাবেও আরম্ভ করা যায়। আট দশ হাজার টাকা মূলধন অনেকেই দিতে পারেন। এই ব্যবসায়ে একটি প্রধান সুবিধা এই যে, ফসল গুদামজাত করিয়া কিছুদিন রাখা যায়। ছোবড়া ও শাঁস উভয় জিনিষই একটু যত্নের সহিত রাখিলে সহজে নষ্ট হয় না। সুতরাং বাজার বুঝিয়া মাল বিক্রয় করা যায়। আর একটী সুবিধা এই যে, একবার সার সহযোগে জমি তৈয়ারী হইয়া উঠিলে শেষে আর বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না।

এইবারে চাষের প্রণালী বলিতেছি। প্রথমতঃ বীজ নির্ব্বাচন। ধান্য, গম, পাট

প্রভৃতি যে সকল ফসল চাষের দ্বারা জন্মাইতে হয়, সে-সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ভাল বীজ নির্ব্বাচন করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ফসল বেশী পাওয়া যায়। নারিকেল সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। নারিকেল ফলের প্রধান অংশ দুইটি,—শাঁস ও ছোবড়া। ইহার মধ্যে শাঁস হইতেই বেশী লাভ পাওয়া যায়। সুতরাং যে ফলে ছোবড়ার অনুপাতে শাঁসের ভাগ অধিক, সেই ফলই ভাল। সাধারণতঃ দেখা যায় যদি খারাপ ফল হয় তবে ৮০০০ নারিকেল হইতে ২৭ মণ শাঁস পাওয়া যায়। আর খুব ভাল ফল হইলে ৪০০০ নারিকেল হইতেই ২৭ মণ শাঁস পাওয়া যায়। এক্ষণে বীজ নির্ব্বাচনে দেখিতে হইবে কি প্রকার নারিকেলে শাঁসের পরিমাণ বেশী থাকে।

যদি এমন জমিতে নারিকেল চারা লাগাইতে হয়, যে জমিতে আর কোন ফসল হয় নাই,—তবে খুব ভাল এবং পুরানো জানাশুনা কোন

পরিপুষ্ট এবং উৎকৃষ্ট বীজ হইতে উৎপন্ন নারিকেল চারার ফটোগ্রাফ।

নারিকেল বাগান হইতে বীজ ফল সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। পেনাং, আন্দামান, সিংহল প্রভৃতি দেশ হইতে নারিকেল বীজের চালান মালয় উপদ্বীপে আসে। তাহাতে বেশ ভাল ফসল পাওয়া যায়। যেখানে গাছ লাগান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, সেখানে যে

সকল গাছে বেশ রীতিমত সারা বৎসর ধরিয়া ভাল ফল দেয়, সেই সকল গাছ হইতে বীজ বাছিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। অনেক সময় দেখা যায়, খুব বড় ফলই যে ভাল হয়, তাহা নহে। ছোট আকারের ফল হইতেও বেশী পরিমাণ শাঁস পাওয়া যায়। সুতরাং মাঝারি আকৃতির ফলই বীজের জন্য বাছাই করিয়া লওয়া উচিত।

বীজের নারিকেল পুরাপুরি গাছ পাকা হওয়া চাই। কেহ কেহ বলেন, ফলগুলি পাকিয়া আপনা আপনি গাছ হইতে পড়িয়া গেলে,—তবে তাহা বীজের জন্য সংগ্রহ করিবে। কিন্তু ইহাতে একটা বিপদের আশঙ্কা আছে। পাকা ফলটা অত উঁচু হইতে মাটীতে পড়িলে আঘাতের চোটে তন্মধ্যস্থ ভ্রূণ ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইতে পারে,—সুতরাং ঐ ফল হইতে হয়ত গাছই জন্মাইবে না,—অথবা গাছ হইলেও তাহাতে ভাল ফল দিবে না। এই বিপদ এড়াইবার জন্য গাছে উঠিয়া গাছ পাকা ফল সাবধানে হাতে পাড়িয়া আনিতে হয়, যেন মাটীতে না পড়ে। ইহার জন্য খুব অভিজ্ঞ লোকের দরকার।

উপরের রং দেখিয়া কাঁচা নারিকেল বা ডাব চিনিতে পারা যায়; কিন্তু ঝুনা বা গাছ পাকা নারিকেল চিনিবার অন্য উপায় আছে। উপরের খোসা সবুজ হইতে বাদামী বা খয়েরী রং ধরিলেই বুঝা যায় যে নারিকেল ঝুনা হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ঝুনা হইলেই পাকা হয় না। গাছে উঠিয়া ঝুনা নারিকেল নাড়িয়া দেখিতে হয়, ভিতরে জলের আওয়াজটা কি রকম। যদি আওয়াজ খুব গভীর এবং চাপা-চাপা ধরণের হয়, তবে বুঝিতে হইবে ফল পাকে নাই। পাকা ফল নাড়িলে তার ভিতরে জলের আওয়াজ হইবে মৃদু কাঁসরের শব্দের মত। সেই ফলই বীজের জন্য পাড়িয়া আনিতে হয়। যদি অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে জল নড়ার শব্দ পাওয়া যাইবে না। সেই ফল বীজের জন্য নিতে হয় না।

মালয় উপদ্বীপের বাজারে পিনাং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নারিকেলের বীজ আমদানী হয়। তাহার মধ্যে "সানব্লাস্" নামক নারিকেল বীজই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত এবং সকলেই ঐ "সানব্লাস্" নারিকেল বীজই পছন্দ করে। 'সান-ব্লাস্' একটা জায়গার নাম। সেখানকার লোকেরা অতি সুকৌশলে গাছ-পাকা নারিকেল সংগ্রহ করিয়া থাকে। যে-সকল ভাল গাছের ফল বীজের জন্য সংগ্রহ করিবার যোগ্য, সেই সকল গাছের আধাআধি উঁচুতে তাহারা একখানি জাল চড়াইয়া পাতিয়া রাখে। সুতরাং গাছ-পাকা ফল বোঁটা হইতে খসিয়া গেলেও মাটিতে পড়েনা,—ঐ জালে আটকাইয়া থাকে। তাহাতে ভ্রূণটী রক্ষাপায়। এই জন্যই সান্‌ব্লাস্ নারিকেল বীজের এত সুনাম। অবশ্য এই কৌশলটী অন্যান্য স্থানেও অবলম্বিত হইতে পারে। কারণ, ইহা এমন-কিছু কঠিন কার্য্য নহে।

যদি এক গাদা নারিকেল হইতে বীজের জন্য ফল বাছাই করিতে হয়, তবে প্রত্যেকটাকে নাড়িয়া দেখিতে হইবে। যে গুলির মধ্যে জল নড়িবার আওয়াজ হয় না, সেগুলি একেবারে বাদ দিবে। যেগুলিতে জল নড়িবার সময়ে ঝুন্ ঝুন্ আওয়াজ পাওয়া যাইবে, সেগুলি অঙ্কুরোদ্গমের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। তারপর যখন অঙ্কুর খানিকটা বাড়িয়া উঠে, তখন উহার মধ্যে

যেটীকে খুব জোরাল দেখা যায়, তাহাকেই রোপণ ও পোষণ করিবার জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। এই সকল গাছ হইতেই খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

এইখানেই নার্সারী বা বীজতলার কথা আসে। অর্থাৎ নারিকেলের অঙ্কুরোদ্গম হইবামাত্র তখনই তাহাকে একেবারে স্থায়ীভাবে বাগানে রোপণ করিবে,—না উহাকে প্রথমতঃ কিছুকাল বীজতলায় বা নার্সারীতে রাখিয়া দিবে। তারপর অঙ্কুর একটু বড় হইলে বাগানে স্থায়ীভাবে রোপণ করিবে,—এই প্রশ্ন উঠে। কেহ কেহ বলেন, নার্সারী সাজাইয়া একটা অতিরিক্ত খরচ বাড়ান দরকার নাই। অঙ্কুর গজাইলে একেবারেই বাগানে লইয়া গিয়া রোপণ করা কর্ত্তব্য। অবশ্য বাগান যদি ছোট রকমের হয়, তবে নার্সারী না করিলেও চলে। অঙ্কুর যখন চারা অবস্থায় আসে, তখন তাহাকে একটু বিশেষ যত্ন করিতে হয় এবং তার তদারক তদ্বির একটু বেশী দরকার। স্থতরাং যদি বড় বাগান হয় এবং তাহাতে ২০ হাত অন্তর গর্ত্ত করিয়া অঙ্কুর-গজান নারিকেল বীজ রোপণ করা হয়, তবে উহাদিগকে যত্ন করা,—তদ্বির তদারক করা এক কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্যই নার্সারী করা আবশ্যক। নার্সারী বা বীজ-তলাতে অল্পজায়গার মধ্যে অনেক চারা-গাছের যত্ন করার স্থবিধা হয়। যদি ৬০০ বিঘা বাগান হয়, তবে তাহার জন্য ৯ বিঘা আন্দাজ জমিতে নার্সারী করিলেই চলিবে।

প্রথম যখন অঙ্কুর বাড়িতে থাকে, তখন উহাতে প্রচুর জলসেচন করিতে হয়। স্থতরাং নার্সারী এমন জায়গায় তৈয়ারী করিবে, যাহার নিকটেই খুব জল পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অঙ্কুরগুলিতে যেন রৌদ্রের ঝাঁজ্ না লাগে। সেইজন্য নার্সারীর উপরে বাঁশের কাঠামে নারিকেল পাতার ছাউনি মত দিয়া ছায়া করিতে হয়। প্রখর রৌদ্রে অথবা জলাভাবে অঙ্কুরগুলি শুষ্ক ও নষ্ট হইয়া যায়। যদিও বা বাঁচে, তথাপি আর তেমন জোরাল হইতে পারেনা। অঙ্কুর বড় হইবার সঙ্গে অল্পে অল্পে উপরের ছায়াও দূর করিয়া দিতে হয় এবং যাহাতে চারাগাছে একটু আলোক রৌদ্র লাগে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

(ক্রমশঃ)
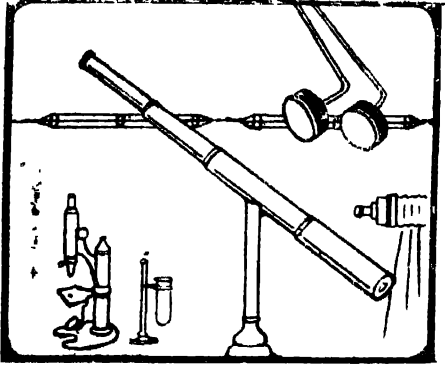
বৈজ্ঞানিক নোটস

কাষ্ঠের গুঁড়া হইতে চিনি প্রস্তুত

কার্য্যকরী বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে দুনিয়ায় অনেক আশ্চর্য্য জিনিস ঘটেছে। কার্য্যকরী বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই হ'ল মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা। এই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য মানুষ খানিকটা ভোগ করে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে, তাই প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের বড় প্রিয়। যে দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে যত সমৃদ্ধ সে-দেশের জাতীয় সম্পদ তত বেশী। এই প্রাকৃতিক সম্পদ যে দেশের কম থাকে তাকে কাঁচা মালের জন্য অপর দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। এই জন্য সে-দেশের অধিবাসীদের নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। আমার দেশে এমন কোন জিনিসের যদি অভাব থাকে যাহা না হলে আমার চলে না, তবে সে জিনিষের জন্য বিদেশের শরণ নিতেই হবে। এই শরণ নেওয়া মানে হল, আমার ট্যাকের কড়ি তার কাছে গুণে দেওয়া। আমার ট্যাকের কড়ি বেরিয়ে গেলে আমারই লোকসান; এই লোকসান আমার পুষিয়ে যায়, যদি আমি আবার তাকে আমার মাল বিক্রী ক'রে তার ট্যাকের কড়ি গুণে নিতে পারি।

কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে নানারকম অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক থাকার দরুণ এই দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা এত সহজ হয় না। এর মধ্যে ট্যারিফ-শুল্ক ইত্যাদির বেড়াজাল থাকার দরুণ জিনিষটিকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছে। যেমন আমার দেশ অপর দেশ থেকে হয়ত ক্রেতা হিসাবে চড়া দরে মাল কেনে অথচ চড়া দরে সেখানে নিজের মাল বিক্রয় করতে সমর্থ হয় না। ফলে তাকে আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়।

এই সকল আর্থিক অসুবিধার জন্যই তার মনে এই প্রশ্ন জাগে যে বিদেশ থেকে মাল আমদানী কি খানিকটা কমানো যায় না? কমানো নিশ্চয়ই যায় শুধু নিজ দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে। এই শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে গেলেই কাঁচা মালের প্রয়োজন।

কিন্তু কোন দেশ যদি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ না হয় ত তাকে সেই কাঁচামালের জন্যই বিদেশের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয়।

প্রকৃতি যখন মানুষকে তেমন সাহায্য করলে না, মানুষ তখন ব্যবহারিক বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হ'ল। এই ব্যবহারিক বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হওয়া মানেই হল কৃত্রিম উপায়ে যাতে কাঁচামাল উৎপাদন করা যায় তারই ব্যবস্থা করা। সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষে পূর্ব্বে নীলের চাষ হ'ত; এই নীলের জন্য অপরাপর দেশ কতকটা ভারতের মুখাপেক্ষী হয়েছিল। কিন্তু জার্ম্মানীতে কৃত্রিম নীলের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে (Synthetic Indigo) ভারতের নীল-শিল্প একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। অধুনা জার্ম্মানী আরও অনেক কাঁচামাল কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করতে মনোনিবেশ করেছে।

আধুনিক ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন করবার জন্য প্রভূত চেষ্টা চলেছে। ধরা যাক্ চিনির কথা। ইক্ষু থেকেই আমাদের দেশে চিনি প্রস্তুত হয়। কিন্তু ব্যবসার দিক দিয়ে তাতেও মানুষ সন্তুষ্ট না হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় বীট থেকে চিনি উৎপাদন করছে। এতেও মানুষের সন্তুষ্টি নেই, কাঠ থেকে যে চিনি প্রস্তুত হ'তে পারে, সে তথ্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর আবিষ্কর্ত্তা হলেন ডাঃ ফ্রিডিরিশ বার্জিয়াশ; কয়লা থেকে বেঞ্জিন এবং কাঠ থেকে চিনি উৎপাদন প্রণালী উদ্ভাবনের জন্যই তিনি প্রধানতঃ বিখ্যাত। ১৯৩২ সালে তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। নিম্নে আমরা কাঠ থেকে চিনি উৎপাদনের তথ্যটাই বিবৃত করব।

সে আজ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের কথা। ফরাসী দেশে একজন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের আরাধনায় নিজেকে একেবারে সঁপে দিয়েছিলেন; নাম তাঁর ব্যাকোনট্। তাঁর মাথা থেকেই প্রথম বেরুল ঘনীভূত সালফিউরিক এ্যাসিড ও সেলুলোজ পদার্থের রাসায়নিক মিলনের দ্বারা এক প্রকারের চিনি পাওয়া যেতে পারে। তারপরে এক শতাব্দীর ওপর অতিবাহিত হয়ে গেল, ইতিমধ্যে নানান্ বৈজ্ঞানিক ব্যাকোনটের ঐ প্রক্রিয়াকে কার্য্যকরী রূপ দেবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা-জনক ফল পাওয়া গেল না। নানা রকম গুরুত্বের (Specific gravity) এ্যাসিড সমূহ দিয়ে পরীক্ষা চালানো হ'ল, কোথায় কোথায় উচ্চ তাপ কিংবা উচ্চ চাপের সাহায্য নেওয়া হ'ল, কোথাও বা তাপ ও চাপ একেবারে কমিয়ে দেওয়া হ'ল, তবুও কিছুতেই কিছু পাওয়া গেল না। অবশেষে গত কুড়ি বছরের মধ্যে উক্ত প্রক্রিয়ায় ব্যবহারিক ভাবে চিনি উৎপাদন করবার প্রণালী সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে।

১৯১৬ সাল। মহাসমরে নিযুক্ত জার্ম্মানীর তখন মরণ বাঁচন সমস্যা। মিত্রশক্তির পরিবেষ্টনীর ফলে দেশে তখন খাদ্য সঙ্কট, তাই জার্ম্মানীর বৈজ্ঞানিকগণ কৃত্রিম ভাবে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। জনসাধারণ ও যুযুৎসু নরনারী তখন নানাভাবে বুভুক্ষু, মিত্রশক্তির প্রভাবে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। বিজ্ঞান-সরস্বতীকে তাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভার নিতে হয়েছে, নইলে উপায় নেই, বিজ্ঞান যদি তখন পুঁথিগত থাকে ত ক্ষুধার্ত্ত নরনারীকে না খেতে পেয়ে মরতে

হবে, বাইরের মহাসমর তখন ভেতরেই অনুষ্ঠিত হবে।

তাই বৈজ্ঞানিকগণ উঠে পড়ে লেগে গেল কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যদ্রব্য তৈরী করতে। মাথায় তখন তাঁদের খেলচে যে কি করে ঘনীভূত ও পুষ্টিকর কার্বো হাইড্রেট উৎপাদন করা যেতে পারে? অক্লান্ত চেষ্টা ও প্রভূত গবেষণায় বেরুলো "উড হাইড্রোলিসিস প্রোসেস।" বেরুলো যে, অত্যন্ত ঘনীভূত হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড ও সেলুলোজের সংমিশ্রণে কতক পরিমাণে চিনি পাওয়া যায় যা কাজে লাগে। এই উড-হাইড্রোলিসিস প্রসেসের প্রধান আবিষ্কর্ত্তা হচ্ছেন উইলষ্টেটর ও জেক মিষ্টর।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে গোল বাধল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পাত্র নিয়ে। কাঠ ও হাইড্রোক্লোরিক্ এ্যাসিড্ রাখবার জন্য পাত্র চাই যার মধ্যে উভয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়া চল্‌বে। উক্ত পাত্র এমন হওয়া দরকার যার ওপর হাইড্রোক্লোরিক্ এ্যাসিডের কোন প্রভাব থাকবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, হাইড্রোক্লোরিক্ এ্যাসিড্ একটি সাংঘাতিক পদার্থ হওয়ার দরুণ প্রায় সকল ধাতুর ওপরই ওর প্রভাব আছে, শুধু প্ল্যাটিনাম্ ও ট্যান্‌টালাম্ ওর প্রভাব এড়িয়ে যায়। কাজে কাজেই উক্ত দুটি ধাতু ছাড়া অন্য কোন ধাতুর পাত্রমধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হ'তে দিলে কাঠ, হাইড্রোক্লোরিক্ এ্যাসিড ও উক্ত পাত্রের ধাতুর মধ্যে রাসায়নিক সংমিশ্রণে অন্য জিনিস উৎপন্ন হ'বে। যদি প্ল্যাটিনাম-এর পাত্র ব্যবহার করা যায় তাহ'লে উক্ত ব্যাপারের হাত এড়ানো যায়, কিন্তু তা' যে কিরূপ ব্যয়সাধ্য সে কথা বোধ হয় কাকেও বুঝিয়ে বলতে হ'বে না। শুধু-ব্যবসার দিক দিয়েই নয়; ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার পথেও সে এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ তখন ভাবতে লাগলেন যে কি পাত্র ব্যবহার করলে হাইড্রোক্লোরিক্ এ্যাসিডের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কাঁচ, পোর্‌সিলিন্ ও অন্যান্য দ্রব্য নিয়ে পরীক্ষা করা হ'ল কিন্তু বিশেষ সুবিধা হ'ল না। অবশেষে ঢালাই লোহার পাত্রই ব্যবহৃত হ'ল কিন্তু তাতে বেশ পুরু করে একরকম 'এ্যাসিড্-প্রুফ্' দ্রব্যের প্রলেপ লাগানো রইল। কাজে কাজেই হাইড্রোক্লোরিক্ এ্যাসিড্ আর লোহাকে আক্রমণ করতে পারলে না।

এরপর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আর একটু উন্নতি ঘট্‌ল। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, চিনি সম্পন্ন এ্যাসিড্ সলিউশন্ আর পরিষ্কার কাঠের মধ্যে যদি প্রতিক্রিয়া (reaction) লাগানো যায় তবে প্রতিক্রিয়ার ফলে যে দ্রাবণ প্রস্তুত হয় তাতে চিনির ভাগ বৃদ্ধি পায়। এর ফলেই বৈজ্ঞানিকগণ তখন এদিক-টায় বেশী করে মনোনিবেশ করলেন। তাঁরা যে প্রক্রিয়া বার করলেন সেটা কতকটা বীট চিনি বিশুদ্ধ করণের প্রক্রিয়ার মত। পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত আট দশটা পাত্রে পরিষ্কার করে কাটা কাঠ রাখা হ'ল; তারপর একটু একটু করে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড পাত্র থেকে পাত্রান্তরে কাঠের মধ্য দিয়ে চালিত করা হ'ল। এরপর সেই সমস্ত দ্রাবণটাকে নিয়ে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ার দ্বারা তার থেকে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড্ পৃথক করবার পালা। কি করে পৃথক্ করা যাবে তা' নিয়ে অনেক বছর পরীক্ষা ও গবেষণায় কেটে গেছে। পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই পৃথকীকরণ চলে বায়ুশূন্য অবস্থার (Vacuum) মধ্যে।

হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড পৃথক করবার পর যে জিনিষটা থাকে তার মধ্যে শতকরা ৫৫ থেকে ৬৫ ভাগ চিনি বর্ত্তমান। এজিনিষটিকে তখন এ্যাটোমাইজিং (Atomising) পাত্রে রেখে গরম হাওয়ার দ্বারা শুষ্ক করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এসেটিক্ এ্যাসিড্ থাকলে পরিস্রবণ ক্রিয়া দ্বারা তা' পৃথক করে নেওয়া হয়।

এইরূপ ভাবে যে জিনিষটা পাওয়া যায় সেটা হ'ল প্রাথমিক অবস্থার অপরিষ্কৃত কাষ্ঠ চিনি,—শুকনো বাদামী গুঁড়োর মত তা ফুটে ওঠে। ১০০ কিলো পরিমাণ কাষ্ঠ সম্পদ হ'তে প্রায় ৬৫ কিলো পরিমাণ কার্ব্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়।

এই ত গেল উৎপাদনের বিবরণ। উৎপাদিত দ্রব্য কি কি কাজে লাগে এবার তা দেখা যাক্। উক্ত কাষ্ঠ চিনি যদি বার্লি কিংবা আলু ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় ত তা' চমৎকার পুষ্টিকর পশুখাদ্য রূপে ব্যবহার হ'তে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই খাদ্যে পশুগণের, বিশেষতঃ শূকরের দেহ যথেষ্ট পুষ্ট হয়েছে। পশুদিগের অন্য যে কোন কাঁচা খাদ্যের সঙ্গেও এ জিনিষটি পিষিয়ে দিলে তা' পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে! বয়ন শিল্পেও এই কাষ্ঠ চিনি 'ফিনিসিং' ব্যাপারে কতকটা কাজে লাগে। কাষ্ঠ চিনিকে যদি আরও পরিষ্কার করা যায় ত তবে পরিশুদ্ধ দ্রব্য আরও অনেক প্রয়োজনে আসে। ঐ পরিশুদ্ধ বস্তু থেকে যে পরিস্ফুটক কার্ব্বোহাইড্রেট পাওয়া যায় তার থেকে স্পিরিট, ল্যাকটিক্ এ্যাসিড প্রভৃতি উৎপন্ন হ'তে পারে। উক্ত স্পিরিট থেকে জাইলোজ্ (xylose) গ্যালেক্-টোজ্ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এই ত গেল পশুদিগের খাদ্যের কথা। মানুষের খাদ্য হিসাবে ও বস্ত্র কাজে লাগে কিনা এ প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে। সে দিক দিয়ে বলা যায় প্রাথমিক অবস্থার কাষ্ঠ চিনিকে অত্যধিক পরিশুদ্ধ করলে বিশুদ্ধ 'গ্লুকোস্' হিসাবে তা' মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হ'তে পারে।

আসল বস্তুটা ত এত রকম ভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে, দেখানো গেল। এছাড়া এর উৎপাদনক্ষেত্রে যে, 'বাই-প্রোডাক্ট্' প্রস্তুত হয় সেটাও কাজে লাগে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মধ্যে প্রধান 'বাই-প্রোডাক্ট্' হচ্ছে লিগনাইট্। এর বহু প্রকার ব্যবহার সম্ভব, তন্মধ্যে বয়লারে অগ্নিসংযোগ ব্যাপারে ব্যবহারই প্রধান। গ্যাস 'জেনারেটিং প্ল্যাণ্টে'র সাহায্যকল্পেও লিগ্‌নাইট্ ব্যবহৃত হয়।

উক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়ার আর একটি বাই-প্রোডাক্ট্ হচ্ছে এসেটিক্ এ্যাসিড্। তা' ছাড়া উক্ত হাইড্রোলিসিজ প্রণালীর সাহায্যে কাষ্ঠ থেকে ট্যানিক এ্যাসিড্, রজন প্রভৃতিও' পাওয়া যেতে পারে।

এ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারই আমরা লিপিবদ্ধ করলাম। এর থেকে স্পষ্টই দেখা গেল যে, কাঠ থেকে শুধু চিনি নয়, একই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আরও কয়েকটি দ্রব্য উৎপাদিত হয়। ব্যবসার দিক দিয়ে সেগুলি সব অ-লাভজনক নয়। পরন্তু এর জন্য যে কাঁচামালের আবশ্যক হ'বে তা আমাদের দেশে সুলভে প্রাপ্তব্য। ভারতবর্ষে বনজঙ্গলের অভাব নেই। যে সমস্ত কাঠ এপর্য্যন্ত কোন কাজেই লাগছিল না, সেগুলিকে দিয়ে যদি লাভজনক ব্যবসা খাড়া করানো যায় ত সেধারে আগ্রহশীল ব্যক্তির দৃষ্টি পড়বে আশা করি।

সোডিয়াম সিলিকেট উৎপাদনে ভাঙ্গাকাচের ব্যবহার

আজকের যুগে কোন জিনিষই আর ফেলা যায় না। বিজ্ঞানের সোনার কাঠির যাদু-পরশে সমস্ত জিনিষই যেন লক্ষ্মীমন্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং জঞ্জাল মনে করে কোন্ জিনিসটা আর ফেলতে পারি বলুন? ধরুন একটা জিনিষ আমি আবর্জ্জনা বলে নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছি; আমার কাছে যদি কোন বৈজ্ঞানিক কিম্বা বিজ্ঞান-ধর্ম্মী লোক থাকেন ত তিনি অমনি পরামর্শচ্ছলে হাঁ-হাঁ, করে উঠবেন—মশাই করেন কি? ফেলবেন না, ওতে সোনা ফলবে!

সোনা! স্বর্ণের নাম শুনেই হয়ত আমি চমকে উঠলাম, কেননা, আজকের এই দুনিয়া ব্যাপী মন্দার দিনে স্বর্ণ কেন, রজতেরও মুখ দেখা ভার হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য্য হয়ে হয়ত বললাম—সোনা! বলেন কি মশাই? এই জঞ্জালের মধ্যে স্বর্ণ! তা হলে জঞ্জালও ত গবর্ণমেণ্টের খাস-সম্পত্তি হয়ে উঠবে?

বিজ্ঞানধর্ম্মী লোকটি এবার একটু মুচ্‌কি হেসে বোধ হয় বলবেন—কূপমণ্ডূক কোথাকার! দুনিয়ার জয় যাত্রার খবর ত আর রাখবেন না, নইলে আজ টের পেতেন যে কোন জিনিষই আর ফেলা যায় না, সামান্য কাঠের গুঁড়া থেকেও সিল্ক তৈরী হয়, গৃহের জঞ্জাল, বোতল ভাঙ্গাও কাজে লাগে।

ভদ্রলোকের কথায় একেবারে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম, আর মনে মনে ভাবলাম যে, হাঁ, হয়ত আরশোলাও এবার পাখী হবে।
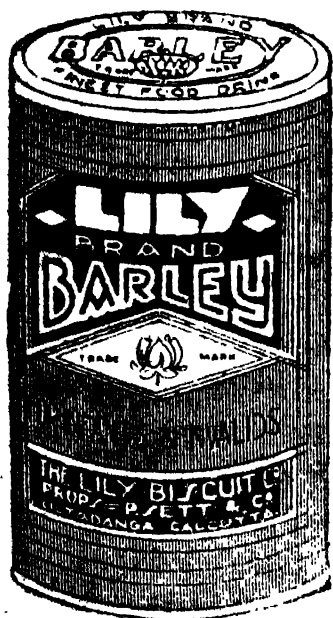
যাক্‌গে সে কথা। এবার সামান্য বোতল ভাঙ্গার ব্যাপারই আলোচনা করা যাক্। সোডিয়াম সিলেকেট উৎপন্ন কববার জন্য আজকাল সাধারণ কাচ ভাঙ্গা ভয়ানক কাজে লাগে, বিশেষতঃ সাধারণ সাবান-শিল্পে এ জিনিষটির অত্যন্ত প্রয়োজন।

সোডিয়াম সিলিকেটের আসল ব্যাপারটি এই যে, তার উৎপাদন ক্ষার জাতীয় পদার্থ ও শিলিকা জাতীয় পদার্থের আনুপাতিক সংমিশ্রণের ওপরই নির্ভর করে। সেই আনুপাতিক হিসাব সাধারণতঃ এই রকমই হয়ে থাকে :—

১ : ১ থেকে ১ : ৩·৮৬ ($Na_2O : SiO_2$)

সোডিয়াম সিলিকেটের দ্রব-ক্ষমতা সিলিকার আনুপাতিক হিসাবের ওপরই নির্ভরযোগ্য। সিলিকার ভাগ যত বেশী হবে, জলের মধ্যে এর দ্রবীভবন তত শক্ত হবে এবং ক্ষারাংশ এতে তত কম থাকবে। তার এই দ্রবীভবনের গোলযোগের জন্যই সাধারণতঃ তা' দ্রবণ রূপেই (Solution) বিক্রীত হয়ে থাকে।

বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিশেষ অগ্নিকুণ্ডের সাহায্যে বালি ও সাজিমাটি জাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণের ফলেই সোডিয়াম সিলিকেট উৎপাদিত হয়। ওদের রাসায়নিক প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :—

$$Sio_2 + Na_2Co_3 = Na_2Sio_3 + Co_2$$
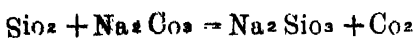
বর্ত্তমানে পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে সাবানের জন্য যে সোডিয়াম সিলিকেট সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, তাতে সিলিকা ও ক্ষারের ভাগ নিম্ন অনুপাতে থাকে :—

১ : ১·৩ থেকে ১ : ২

উপরোক্ত আনুপাতিক হিসাবের সোডিয়াম সিলিকেট্‌কে খোলা পাত্রের মধ্যেই জলে গোলা যায়। কিন্তু সিলিকার ভাগ বেশী থাক্‌লে অন্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় দ্রাবন প্রস্তুত করতে হয়।

সোডিয়াম সিলিকেটের চাহিদা বেশী থাকায় দরুণ আমাদের দেশেও রাসায়নিক কারখানাগুলিতে উক্ত পদার্থ উৎপাদিত হ'চ্ছে থাকে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, সোডিয়াম সিলিকেট উৎপাদন করতে গেলেই সোডিয়াম কার্বোনেটের প্রয়োজন। উক্ত সোডিয়াম কার্বোনেট্ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়; সুতরাং সোডিয়াম সিলিকেট্ উৎপাদনের খরচের পড়্‌তাও বড্ড বেশী পড়ে এবং বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাই ঠিকমত দাঁড়াতে পারে না।

সুতরাং বিশেষজ্ঞরা পড়্‌তার খরচ কমাবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। অবশেষে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, সোডিয়াম সিলিকেট্ তৈরী করবার উপরোক্ত প্রণালীর মধ্যে যদি বোতল ভাঙ্গা কাঁচ ঢুকিয়ে দেওয়া যায় ত খরচ কম পড়ে।

ব্যাপারটা হ'চ্ছে এই রকম :—পূর্ব্বের প্রক্রিয়ানুযায়ী সোডিয়াম সিলিকেট্ প্রস্তুত করতে গেলে বালি আর সোডিয়াম কার্ব্বোনেট প্রয়োজন। আচ্ছা, যে পরিমাণ বালি আর সোডিয়াম কার্ব্বোনেট পূর্ব্বে লাগছিল, এখন তাতে খানিকটা বোতল ভাঙ্গা যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় ত পূর্ব্বের চেয়ে সংমিশ্রিত পদার্থটা এখন বেড়ে গেল, অথচ পূর্ব্বের চেয়ে উল্লেখযোগ্য কোন খরচ বাড়ল না। অর্থাৎ কিনা পূর্ব্বে যে খরচে যে পরিমাণ সোডিয়াম সিলিকেট পাওয়া যাচ্ছিল

এখন ঐ বোতল ভাঙ্গা ঢুকিয়ে দেওয়ার দরুণ কোনরূপ উল্লেখযোগ্য খরচ বৃদ্ধি না করেই তার চেয়ে বেশী পরিমাণ সোডিয়াম সিলিকেট পাওয়া যাচ্ছে। বোতল ভাঙ্গার দাম আর কতই বা লাগে! তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, এখন প্রায় সমান খরচে পূর্ব্বের চেয়ে মাল বেশী পাওয়ার দরুণ প্রতিযোগিতার খরচের জন্য আর কোন ভাবনা রইল না।

এই কাচ ভাঙ্গার ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার সময় এটা দেখা দরকার যে বেশী পরিমাণ কাচ ভাঙ্গা যেন না ব্যবহৃত হয়, কারণ রসায়নের নিয়মানুযায়ী এবম্বিধ ব্যাপারে যত খুসী কাচ ভাঙ্গা ব্যবহার করলে আবশ্যক মত ফল লাভ হয় না। সাধারণতঃ কাচ ভাঙ্গায় শতকরা ১২ ভাগ ক্যাল্‌সিয়াম্‌ অক্সাইড্‌ থাকে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, সোডিয়াম সিলিকেটের মধ্যে সিলিকার ভাগ যত বেশী থাকে, এর দ্রবীভবনের কাজও তত শক্ত হয়।

সুতরাং পূর্ব্বের সেই বালি ও সোডিয়াম কার্ব্বোনেটের মধ্যে যদি সীমাতিরিক্ত কাচ ভাঙ্গা মিশিয়ে দেওয়া যায় তাতে ক'রে যে সোডিয়াম সিলিকেটের ভাগ বেশী হ'য়ে যাবে এবং তাতে দ্রবীভবনের কাজের ব্যাঘাত জন্মাবে। কাজে কাজেই কাচ ভাঙ্গা মিশ্রণের সময় এদিকটায় নজর রাখা দরকার।

কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের বর্ত্তমান পদ্ধতির দোষগুণ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

এবার আমাদের দ্বিতীয় বিষয়টী অর্থাৎ রাস্তার উন্নতি মূলক বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্। বর্ত্তমানে কয়েকবছর ধরে রাস্তা সমূহের উপযোগিতার অর্থনৈতিক দিকটার প্রতি অনেকের নজরে পড়েছে। সরকারও ১৯৩৭ সালের শেষভাগে রাস্তাঘাট সম্পর্কে উপদেশ দেবার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করেছেন। একটি চমৎকার উপমা সাহায্যে রাস্তাঘাটের উপযোগিতার বিষয় বর্ণনা করা যায়। দেহের সমস্ত শিরা উপশিরার রক্তপ্রবাহ যেমন শরীরকে সজীব ও উন্নতিশীল করে তোলে, দেশের অর্থ নৈতিক জীবনে রাস্তাঘাটও সেইরকম শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। রাস্তাঘাট যদি খারাপ হয়, কিংবা একেবারে না থাকে তবে একস্থান হ'তে অন্য স্থানে মালপত্তর চালান যেতে পারবে না এবং আভ্যন্তরিক অর্থনৈতিক প্রবাহ অচল হয়ে যাবে। এতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা, সুতরাং গমনাগমনের সুবিধার দিকে আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

রাস্তার উপযোগিতা সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করলাম এই জন্য যে, কৃষিসম্পদের ক্রয়বিক্রয়ের দামের ওপর তার একটা প্রভাব আছে। রাস্তা খারাপ হ'লেই মালবহনের খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং সময়ও বেশী লাগবে। ভাল রাস্তায় একখানা গরুর গাড়ী যদি ৩০ মণ মাল বোঝাই নেয় ত খারাপ রাস্তায় তা' ২০ মণের বেশী কিছুতেই নেবে না। তার ওপর ভাল রাস্তায় একস্থান হ'তে অন্য স্থানে যেতে গরুর গাড়ীর যদি ৯ ঘণ্টা সময় যায়, খারাপ রাস্তায় সেই জায়গায় ১৪ ঘণ্টা সময় নেবে। এর অর্থনৈতিক দিকটা বিচার করা যাক্। আমাদের পল্লীগ্রামে বহু জায়গায়ই কাঁচা রাস্তা। ব্যাপারীর সেখানে একগাড়ী মাল চালান দেওয়ার দরুণ কিছু খরচ পড়ছে। মালের দর ঠিক করবার সময় সে এই খরচটাকে হিসাবের মধ্যে ধরে। এখন কাঁচা রাস্তার বদলে রাস্তা যদি পাকা হয়, তাহলে একগাড়ীতে আগেকার চেয়ে ঢের বেশী মাল ধরবে। অথচ গাড়ীভাড়া ঠিক সমানই রয়েছে (সামান্য একটু বেশী হ'তে পারে কিন্তু তারতম্যের তুলনায় তা উপেক্ষণীয়), এবং এখন সময়ও ঢের কম লাগছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যেখানে দিনে একক্ষেপ দেওয়া যেত, এখন সেখানে

দু'ক্ষেপ দেওয়া যেতে পারে। এতে করে ব্যাপারীর পূর্ব্বাপেক্ষা খরচ ঢের কম হয়, এবং তাতে জিনিসপত্তরের দর কম হওয়ার জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে। এই চাহিদাবৃদ্ধির জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা মাল বেশী কাটার সম্ভাবনা; ইহাতে লাভ সকলেরই।

রাস্তার ভালমন্দর সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্যের দরের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। "ইণ্ডিয়ান রোড্‌স্ এণ্ড্ ট্রানস্‌পোর্ট ডেভলপ্‌মেণ্ট্ এসোসিয়েশন"-এর সাধারণ সম্পাদক কর্ণেল এইচ্, সি, স্মিথ লাহোর ১৯৩৪ সালের ১৯ শে জানুয়ারী তারিখে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—"পাকা রাস্তা হ'লে চাষীদের খরচের দিক দিয়ে প্রতি ক্ষেপে মাইল পিছু দু'আনা করে সুবিধে হয়।" তাঁর এ উক্তি হিসাবের দিকদিয়ে যদি সত্য হয় ত' এ সম্বন্ধে অনেক ভাববার বিষয় আছে।

এখন তা' হ'লে কথা উঠবে যে রাস্তা ভাল করতে গেলে কি রকম খরচ পড়ে? ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে "ইণ্ডিয়ান রোড্‌স্ কংগ্রেসে"র এক বক্তৃতায় লেফ্‌টনাণ্ট্ কর্ণেল এ, ডি, টি, ওয়েকৃলি সাহেব বলেছিলেন যে সন্তোষজনক মেটে রাস্তা তৈরী করতে মাইলপিছু ২৪০ টাকা থেকে ৪৫০ টাকা পর্য্যন্ত খরচ পড়ে, এবং সেটাকে রক্ষা করতে বাৎসরিক ১৫০ টাকা ব্যয় হয়। রাস্তা রক্ষাকল্পে বাৎসরিক যে খরচাটা পড়বে, সেটা প্রতি গরুর গাড়ী ও লরীর ওপর প্রতি ক্ষেপে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ট্যাক্স ধার্য্য করলেই সহজে উঠে আসতে পারে। প্রতি ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ড যদি এবিষয়ে মনোযোগ দেন্ ত কাজ কিছু এগুতে পারে। অবশ্য এখানে যে হিসেবটা দেওয়া হ'ল সেটা একটা মোটামুটি ব্যাপার; কার্য্যক্ষেত্রে তার তারতম্য ঘটতে পারে।

রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ দ্বারা কৃষিবাজারের উন্নতি ছাড়াও আর একটি উপকার আছে, সেটা হচ্ছে বেকার সমস্যার কিয়ৎ পরিমাণে সমাধান। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণকল্পে কিংবা রক্ষাকল্পে যে টাকাটা ব্যয় হবে সেটা বৃথা যাবে না। যদি একবার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা যায় ত বহু লোক এর দ্বারা প্রতিপালিত হ'তে পারে। পল্লী-গ্রামে দিন-মজুরদের মধ্যে বেকার সমস্যা ভয়ানক ভাবে প্রবল। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে বিশেষ কোন কুশলী শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ঐ সমস্ত দিনমজুরদের দিয়ে সেকাজ চালান যেতে পারে। রাস্তা রক্ষাকল্পে যে স্থায়ী কর্ম্মচারীর প্রয়োজন, তাতে শিক্ষিত বেকারের স্থান আছে। সুতরাং রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্য ব্যাপারটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

এতক্ষণ ধরে আমরা চাষী ও ব্যাপারীদের পল্লীগ্রামের মধ্যে মাল ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এবার সহরের বাজারে উক্ত মালসমূহ কি রকম ভাবে হাতফিরি হয় তাই দেখা যাক্।

গরুর গাড়ী বোঝাই দিয়ে ফসল যখন সহরে এসে পৌছল, তখন তাকে পাকড়াও করলে আড়ৎদার। এই আড়ৎদারদের সঙ্গে ব্যাপারী-দের পূর্ব্ব থেকেই পরিচয় কিংবা কারবার থাকে, তাই অধিকাংশ ব্যাপারীই গাড়ী নিয়ে তার চেনা আড়ৎদারের নিকট গিয়ে হাজির হয়। আড়ৎদারেরাও ব্যাপারীদের পাকড়াও করবার জন্য ভোরবেলায় রাস্তার মোড়ে লোক পাঠায়, কেননা, যে আড়ৎদার যত গাড়ী পাকড়াও করতে পারবে তার লাভ তত বেশী।

আড়ৎদারের গদীতে সকাল থেকেই খদ্দের আসতে আরম্ভ করে। সাধারণতঃ গদীর বাইরে থেকে খদ্দের ও আড়ৎদারের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হয়—

"কিহে, কি মাল এল ?

"মুগ এসেছে, ধানও এসেছে।

"মুগ কি দর যাচ্ছে ?

"যা দর বলবে।

"না—না, ঠিক করে বল।

"২২ সের।

"উঁহু, ২৫ সের।

"ও দরে এ মাল কি বেচা যায়? এ একেবারে সরেস চিজ, ধুলো একুকণাও নেই।

"কই নমুনা দেখি? ....আচ্ছা; না হয় ২৪।।০ সেরই হ'ল।

এইবার আড়ৎদার ব্যাপারীকে গিয়ে বলে—"এই দামেই ছেড়ে দাও হে।" ব্যাপারী সাধারণতঃ আড়ৎদারের পরামর্শই গ্রহণ করে; কেননা, এমন দেখা গেছে যে আড়ৎদারের কথা না শুনে ব্যাপারী ঠকেছে। আড়ৎদারের পরামর্শ গ্রাহ্য না করে সে হয়ত সকালের দরে মাল ছাড়লে না, হয়ত আশা করলে যে বেলায় বেশী দর পাবে, কিন্তু দেখা গেল শেষ সময়ে সে সকালের চেয়ে কম দরে মাল ছাড়তে বাধ্য হ'ল।

খদ্দেরও মাঝে মাঝে সকালের বাজারে দর-দস্তর না করে মূল্যের হালচাল দেখবার জন্য একটু বেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। তার ধারণা এই যে, বেলায় বেশী মাল এসে পৌঁছলে দর নামতে পারে। যাই হোক উপরের ঐ কথাবার্ত্তা হবার পর ব্যাপারী যদি আড়ৎদারের পরামর্শে রাজী হয়, তা হ'লে খদ্দের-এর সঙ্গে আড়ৎদারের পাকা কথাবার্ত্তা হয়ে যায় এবং খদ্দের আড়ৎদারের চালান সই করে।

উপরের ঐ যে খদ্দের, ও নিজে সব সময় ব্যবসাদার হয় না, ও হয় বড় বড় ব্যবসাদারের প্রতিনিধি। আড়ৎদার যেমন ব্যাপারীর স্বার্থ দেখে উক্ত প্রতিনিধি বা দালালও তেমনি তার প্রভুর স্বার্থ রক্ষার্থে যথেষ্ট সচেতন হয়। সুতরাং দুপক্ষই বাজারের হালচাল ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করে লাভবান হ'তে সচেষ্ট হয়। যখন চালান দস্তখত হয়, তখন উক্ত দালাল বা প্রতিনিধি উভয় পক্ষ থেকেই শতকরা চার আনা হারে কমিশন গ্রহণ করে।

পাকা কথাবর্ত্তা হবার পর ব্যাপারীর গাড়ী থেকে বস্তা নামিয়ে আড়ৎদারের ওজন ঘরে তা' নিয়ে যাওয়া হয়। যারা এই মাল খালাসের কাজ করে তাদের আড়ৎদার ব্যাপারীর পক্ষ থেকে নিজে পারিশ্রমিক দেয় (পারিশ্রমিকের হারের তারতম্য আছে। কোথাও কোথাও ১০০ বস্তা পিছু এক টাকা হার)। তারপর একজন পাল্লাদার সেই পর্ব্বতপ্রমাণ মাল ওজন করে ক্রেতার বস্তায় বোঝাই করে। সাধারণের কাছে এই ওজন ব্যাপারটা বেশ আমোদজনক। পাল্লাদার এক এক পাল্লা ওজন করে আর সুর করে "রামে রাম," "রামে দুই," "রামে তিন" বলে হাঁক দেয়। এর পারিশ্রমিক ব্যাপারীকে দিতে হয়। ওজন-কাজ যখন চলে তখন আশে পাশে পূজারী ব্রাহ্মণ, আড়ৎদারের চাকর, সাধারণ ভিখারী ইত্যাদির দল ভীড় করে—তাদেরও একমুঠো করে দিতে হয়। এসমস্ত ব্যাপারীর খরচ। একজন ঝি ওজনকাজের সময় মালগুলোকে ঝাঁট দিয়ে

সরিয়ে সরিয়ে একযায়গায় জড়ো করে দেয়,—তারও কিছু পাওনা আছে। তারপর মাল নিয়ে গিয়ে ক্রেতার গাড়ীতে বোঝাই হয়। সব যখন শেষ হ'ল তখন আড়ৎদার ব্যাপারীকে তার প্রাপ্য গণ্ডা মিটিয়ে দেয়, এবং নিজে সাত থেকে চৌদ্দ দিন পরে ক্রেতার নিকট হ'তে দাম গ্রহণ করে। দামের সঙ্গে সে টাকায় এক পয়সা করে কমিশন আদায় করে নেয়।

তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে যে সহরের বাজারে মালবিক্রয়ের খরচাটাকে তিনরকম ভাগে ভাগ করা যেতে পারে,—(১) পাল্লাদার, মুটে ইত্যাদির পারিশ্রমিক, (২) পূজারী ব্রাহ্মণ, চাকর, ভিখারী ইত্যাদিকে বিতরণ; (৩) আড়ৎদার, দালাল প্রভৃতির কমিশন। এর মধ্যে ১নং খরচাটা থাকবেই যতক্ষণ না প্রভূত উন্নতির সঙ্গে কলের মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। ২নং খরচাটা একটা সামাজিক প্রথা, আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন না হ'লে এর হাত থেকে রেহাই নেই। ৩নং খরচাটাই হচ্ছে আলোচনার বিষয়।

কেউ কেউ বলেন যে এই মাল বিক্রয়ের ব্যাপারে আড়ৎদার ও দালালের সাহায্য নিয়ে ব্যাপারীরা অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কেননা, এদের কমিশন বাবদ তাদের লাভের অংশ থেকে কিছুটা বেরিয়ে যায়। তাঁদের মত এই যে ঐ দুই সম্প্রদায় ত আবশ্যকীয় অপরিহার্য্য কাজ এমন কিছুই করে না, শুধু মাত্র দু' পক্ষের তরফ থেকে মাল ক্রয় বিক্রয়ের কথাবার্ত্তা চালায়, সুতরাং তাদের মধ্যস্থতার কোন প্রয়োজন নেই। ক্রেতা, বিক্রেতা ও মালপত্র যখন সমস্তই একস্থানে বর্ত্তমান, তখন মধ্যানুবর্ত্তী পরগাছা সম্প্রদায়ের অবস্থিতিতে কি লাভ দেবে ?

এই পরগাছা শ্রেণীকে তাদের লাভ থেকে বঞ্চিত করবার চিন্তা স্বাভাবিক এবং অধিকাংশ সমবায় প্রচেষ্টার মূলে এই চিন্তাই নিহিত আছে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে একটা জিনিস বিচার করার প্রয়োজন,—সেটা হচ্ছে যে তারা চাষী কিংবা ব্যাপারীদের প্রকৃত কোন কাজ করে দেয় কিনা, এবং যদি বা করে দেয় তাহ'লে সে কাজ তারা নিজেরা হাতে নিয়ে সন্তোষজনক ভাবে চালিয়ে লাভবান হতে পারবে কিনা ?

এখন আড়ৎদার ও দালাল উভয়ই বাজারের ওঠা নামার দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের মক্কেলের জন্য একটি অত্যাবশ্যক কার্য্য সাধন করে। বাজার হ'চ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতার একটি মিলন স্থান, সেখানে দরদস্তর ঠিক করা একটু গোলমেলে ব্যাপার। একজন লোক যদি প্রতিদিন এই বাজারের সমস্ত ব্যাপারের খুটি নাটির প্রতি লক্ষ্য না রাখেন তবে তাঁর পক্ষে বাজারের দর দস্তর ঠিক করা অসম্ভব। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বাজারে এসে বাজারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, কিন্তু সেটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত হবে। তাতে একপক্ষ জিতবে এবং একপক্ষ অন্যায় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'বে। আসল দরদস্তর ঠিক করতে গেলে একজন লোকের বাজারের "চাহিদা ও যোগানের" ব্যাপারটা ত জানা থাকা চাই, উপরন্তু অপরাপর দেশে ও যায়গায় অনুরূপ দর কি রকম যাচ্ছে, সে সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হওয়া আবশ্যক। ভবিষ্যতে দর কি রকম উঠবে কিম্বা নামবে সে সম্বন্ধেও তিনি যেন এক প্রকার ধারণা আগে থেকেই করে রাখতে পারেন। চাষীরা ও ব্যাপারীরা থাকে গ্রামে, সহর থেকে অনেক দূরে; সুতরাং তারা যেদিন সহরে মাল বেচতে যাবে, সেদিন বাজারদর কি রকম যাবে এ ধারণা তাদের থাকবে এমন আশা কিছুতেই করতে পারা যায় না।

এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতারই উক্তরূপ মধ্যস্থানীয় ব্যক্তির পরামর্শ বেশী আবশ্যক। সহরের কোন ময়দা-কলের ম্যানেজারই হয় ত এক ক্ষেত্রে ক্রেতা, তাঁর কথাই ধরা যাক্। তিনি শিক্ষিত, রোজ খবরের কাগজ পড়েন, সুতরাং দুনিয়ার প্রাত্যহিক বাজার দরের সঙ্গে তিনি সম্যক্ পরিচিত। মাল ক্রয়ের সময় যাতে না তিনি ঠকেন সেধারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু একজন গ্রাম্য চাষার কথা ধরুন। সেত কখনো খবরের কাগজের মুখও দেখতে পায় না, যদিও বা পায়, তাহ'লেও নিজের লজ্জাকর নিরক্ষরতার দরুণ তা' পড়তে পারে না। সুতরাং পাঞ্জাবে শিলাবৃষ্টি হ'লে কিংবা আমেরিকায় অন্য কোন কোন কারণে গমের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও, সে তার ফসল পূর্ব্বের মত কম দরেই বিক্রয় করে। অথচ তারই পাশের বাজারে তখন দর চড়ে গেছে।

তাহ'লেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে আড়ৎদার ও দালালেরা তাদের মক্কেলের হয়ে বেশ রীতিমত কাজ করে, যে কাজটা তারা নিজেরা কোনমতেই চালাতে পারত না। ব্যাপারীদের কোন বিশেষ গুণই নেই, তাদের কাজ চাষীরা নিজে নিজেই চালিয়ে নিতে পারে; কিন্তু আড়ৎদার ও দালালদের কথা স্বতন্ত্র। বাজারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংশ্লিষ্ট থেকে তারা এক বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে যেটা ক্রেতা-বিক্রেতার থাকা সম্ভব নয়। দুনিয়ার সেয়ারের বাজারের সঙ্গে এর তুলনা দিলে ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাবে। সেখানে কোন ব্যক্তিগত ক্রেতা বা বিক্রেতা নিজের বুদ্ধিতে কখনো কোন সেয়ার ক্রয় বিক্রয় চালায় না, সর্ব্বদাই দালালের সাহায্য গ্রহণ করে। কারণ তারা জানে যে ঐ সমস্ত সেয়ার সম্পর্কে তাদের মাত্র একটা মোটামুটি ধারণা আছে, কিন্তু সেগুলির প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে দালালেরা সঠিক ধারণা পোষণ করে।

সেয়ারের বাজারের একই কোম্পানীর একই শ্রেণীর সেয়ার সব এক রকম, কিন্তু ফসলের বাজারে তা' নয়, একই শ্রেণীর ফসল বিভিন্ন ধরণের হ'তে পারে, সুতরাং সেয়ারের বাজারে যদি দালালের সাহায্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তবে ফসলের বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষে অনুরূপ বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ত আরও বেশী প্রয়োজনীয়।

ক্রেতা ও বিক্রেতাদের বর্ত্তমানে দালাল ও আড়ৎদারের সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলেই যে এ সম্বন্ধে কোন উন্নতি বিধান সম্ভব নয় এমন কোন কথা নেই। বাজারে যদি একশ' ক্রেতা বিক্রেতা থাকে, তবে যে সঙ্গে সঙ্গে একশো দালাল ও আড়ৎদাররও থাকবে এ কোন কাজের কথা নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিস থাকলেই সেটা অপচয়। বাজারে যেখানে ১০জন দালাল কিংবা আড়ৎদারে কাজ চালাতে পারে সেখানে যদি ১০০ জন দালাল কিংবা আড়ৎদার এসে ভীড় জমায় ত লাভ কারও হয় না। সুতরাং এ দিক দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন আছে, পরস্পরের সঙ্গে অন্যায় প্রতিযোগিতায় কোন পক্ষই যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বিক্রেতাদের ও মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন। পূর্ব্বেই দেখানো গিয়েছে যে চাষারা যদি তাদের সামান্য পরিমাণ ফসল সব একত্রিত করে একসঙ্গে বিক্রয় করে ত তারা লাভবান হয়। অনুরূপ ভাবে তারা যদি নিজেদের মধ্যে সমবায় সমিতির সৃষ্টি করে বিক্রয় ব্যাপারটাকে নিজেদের হাতে নেয় ত তারা আরও বেশী লাভবান হ'বে। প্রত্যেক সমিতি যদি প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট আড়ৎদারের সঙ্গে কারবার চালায় এবং তাকে যদি এরকম নিশ্চয়তা প্রদান করে যে প্রতিবারই তারা তাকে দিয়েই বিক্রয় কার্য্য সমাধা করবে, তবে আড়ৎদার নিশ্চয়ই তার প্রাপ্য কমিশনের হার কমিয়ে দেবে। এতে চাষীরাই লাভবান হবে, আড়ৎদারের এতে প্রচুর সুবিধা, কেননা তার কাজের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে রইল। এইরূপে অনেকগুলি গ্রামের বিভিন্ন সমিতি মাল বিক্রয়ের ব্যাপার সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে এক নির্দ্দিষ্ট পলিসি গ্রহণ করতে পারে।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে চাষীদের মধ্যে যদি সমবায় সমিতির দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধতা আসে তবে বিক্রয় বাজারে তাদের লাভ প্রচুর। এক গ্রামের সমস্ত ফসল যদি একটি সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এইরকম বিভিন্ন গ্রামের কয়েকটি সমিতি যদি একত্র মিলিত হয়ে একটি নির্দ্দিষ্ট আড়ৎদারের মারফৎ বিক্রয় কার্য্য সমাধা করে; তবে তারা বেশী দর পাবেই পাবে। ক্রেতাদেরও এতে সুবিধা, কেননা, কোন একটি নির্দ্দিষ্ট এজেন্সীর দ্বারা যদি সমস্ত বিক্রয় কার্য্য সমাধা হয়; তবে ক্রেতাদের আর এধার ওধার ছুটোছুটি করতে হয় না, এবং এই ক্রয় কার্য্যের জন্য অযথা দালালদের কমিশন গুঁজতে হয় না। আড়ৎদারও লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না, যেহেতু তার নিজের কমিশনের হার খুব কম করলেও, একসঙ্গে অনেক টাকার কাজ হওয়ার দরুণ তার মোটামুটি আয় থাকে।

কৃষিবাজার সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করে যে সমস্ত উপায় নির্দ্দেশ করলাম তা' রাতারাতি কার্য্যে রূপান্তরিত হবার কোনই সম্ভাবনা নেই, এর জন্য সময়ের প্রয়োজন।

কিন্তু সময় লাগবে বলে নিরাশ হবার কোন দরকার নেই, ধাপে ধাপে কাজ আরম্ভ করলেই চলবে। আমাদের দেশে আজ যে কৃষক ঋণগ্রস্ত হচ্ছে, তার একমাত্র কারণ হ'ল কৃষিদ্রব্যের মূল্য হ্রাস। কৃষকরা যে কৃষিদ্রব্যের আসল মূল্য পায় না, তার একমাত্র কারণ হ'ল যে কৃষিদ্রব্যের বাজার সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেইজন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে দ্রব্যগুণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবাজার প্রণালীরও সংস্কার সাধন হওয়া দরকার। এই সংস্কার সাধনের উপায় সম্পর্কে এতক্ষণ আলোচনা হয়েছে; তবে 'মোদ্দা কথা' হচ্ছে কৃষকদের মধ্যে সমবায় নীতিতে বিক্রয় সমিতি গঠন করা। বিক্রয়-প্রণালীর উন্নতি হলেই কৃষিদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে, চাষীদের পক্ষে সেটাই কামনার বিষয়।

দেশের যাঁরা রাজদণ্ড পরিচালন করেন, তাঁদেরই কর্ত্তব্য এধারে সর্ব্বপ্রথমে মনোযোগ দেওয়া। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে অপরাপর বিষয়ের মত তাঁরা যদি দায়িত্বহীন, কর্ত্তব্যহীন হয়ে পড়েন ত দেশবাসীকেই সে ভার নিতে হবে। আজকাল কৃষক সমিতির উদ্ভব হচ্ছে, তাঁরাই এর উদ্যোগী হন্ না কেন?

বাঙ্গলায় তুলা চাষের প্রয়োজনীয়তা

গত কয়েক বৎসরের প্রচেষ্টার ফলে বাংলা-দেশে কয়েকটী কাপড়ের কল স্থাপিত হলেও অবশ্য একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে বস্ত্র-শিল্পে বোম্বাই-এর কাছে বাংলা দাঁড়াতে পারে না। ভারতে কাপড়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজ বোম্বাই-এ। একা বোম্বাই সারা-ভারতের বেশীর ভাগ চাহিদা পূরণ করছে। অন্য সব প্রদেশে কাপড়ের কল নেই যে তা নয়, মাদ্রাজে আছে, কানপুরে আছে, বাঙ্গালোরে আছে এবং এই রকম আরও অনেক জায়গায় আছে; কিন্তু সে সমস্ত স্থানের চাহিদার তুলনায় তাদের যোগান অতীব সামান্য। তাই বোম্বাই-এর আজও অপ্রতিহত রাজত্ব! তাই বোম্বাই-এর মাল আমাদের বাজার ছেয়ে ফেলল। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে আমাদের ভয়ানক বেগ পেতে হয়।

বাংলায় অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু বাংলার চাহিদার তুলনায় তা' যৎসামান্য। এ শিল্প প্রসার কল্পে এখনো যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস ভুললে চলবে না যে বস্ত্র শিল্পের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে তার কাঁচা মাল বা তুলার যোগানের উপায়। আমাদের দেশের বস্ত্র যে প্রতিযোগিতায় বোম্বাই-এর কাছে টক্কর দিতে পারে না তার একমাত্র কারণ বস্ত্র শিল্পের কাঁচা মালের প্রতি আমরা আদৌ দৃষ্টি দিই নি। তুলার ব্যাপারটা এখনও আমাদের মোটেই নজরে আসে না; এর জন্য আমরা বোম্বাই, নাগপুর, মধ্যভারত প্রভৃতির মুখাপেক্ষী। অথচ তুলার উপরই বস্ত্র শিল্পের সাফল্যের বারো-আনা নির্ভর করছে।

আমাদের এই প্রয়োজনীয় তুলা নিজেরা উৎপন্ন করতে না পারার দরুণ বোম্বাইয়ের তুলার বাজার হতে তুলা আনতে হয়, সুতরাং পড়তায় আমাদের খরচ বেড়ে যায়; আর সেইজন্যই বোম্বাইএর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠা আমাদের পক্ষে মুস্কিল হ'য়ে পড়ে। আমরা যদি এ জিনিষটা নিজেরাই উৎপন্ন করতে পারতাম, তবে একদিকে তুলার চাষ করে দেশে একটা নূতন ধনাগমের রাস্তা বের হত এবং কলের উৎপাদন খরচা আমাদের আরও কমে যেত। বাজারে বাংলার কাপড় সস্তা হ'ত, লোকে তখন আর বাংলাকে ফেলে বোম্বাইএর কাপড় ক্রয় করতে ছুটত না।

বস্ত্রশিল্প যে কতটা উন্নতিমুখী এবং ইহার ভবিষ্যৎ যে কত উজ্জ্বল তা আমরা এখনও ভাল ক'রে ধারণা করতে পারি নি, নইলে তুলাচাষের প্রতি আমরা এতটা উদাসীন থাকতাম না। সারা ভারতে যে পরিমাণ কাপড় আবশ্যক, বর্ত্তমান ভারত তা' উৎপন্ন করতে সমর্থ নয়,

ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে আমাদের চাহিদানুযায়ী কাপড় এখনো আমদানী করতে হয়। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে বস্ত্র শিল্পের সমুদায় চাহিদা মিটাতে আমাদের এখনো কতটা বাকী আছে। ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি স্থান হতে যে পরিমাণ কাপড় এখন আমদানী করতে হয়; আমাদের দেশের মিলগুলি যদি সে পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন করতে পারে ত দেশের টাকা আর বিদেশে চালান যায় না।

বস্ত্র শিল্পের উন্নতি করতে গেলেই বাংলার এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে সে অপরাপর যায়গার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে এই প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে গেলেই তাকে তুলার চাষের দিকে অধিকতর মনোযোগী হতে হবে। তুলা চাষের ক্ষেত্রে মধ্যভারতের বেরার একটি উন্নতিশীল জায়গা। সেখানকার তুলা চাষের উন্নতির ইতিহাস আমাদের অনেকটা সাহায্য ক'রতে পারে এই ভেবেই আমরা এখানে বেরারের তুলা শিল্পের ইতিবৃত্ত কতকটা লিপিবদ্ধ করিলাম।

একথা অনেকেই জানেন যে বেরার প্রায় সর্ব্বাংশে একটি কৃষিপ্রধান দেশ, এবং তার কৃষিদ্রব্যের মধ্যে তুলাই শীর্ষস্থানীয়। আবাদী জমির প্রায় দুই তৃতীয়াংশতেই তুলার চাষ করা হয়। দশ বছরের মধ্যে তার তুলার চাষ কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, নিম্নের এই পুরাতন তালিকাটী হতেই তা পরিস্কার বোঝা যাবে:—

বৎসর।	একর জমিতে চাষের পরিমাণ
১৮৯৬-৯৭।	২০৪,৭০৯।
১৮৯৭-৯৮।	২,১৫০,৭০৯।
১৮৯৮-৯৯।	২,৪৭১,১২৩।
১৮৯৯-১৯০০।	১,০৮৪,৪১৮।
(দুর্ভিক্ষের দরুন এ বছর হ্রাস পেয়েছে)	
১৯০০-০১।	২,৫২১,৬৫১।
১৯০১-০২।	২,৬৮৯,২০১।
১৯০২-০৩।	২,৭৬৫,৬৩৫।
১৯০৩-০৪।	২,৮৫১,০০০।
১৯০৪-০৫।	৩,০৬৯,০০০।
১৯০৫-০৬।	৩,১৯৭,৯০০।

হাল সনের তালিকা আমাদের হাতে নেই, ১৯০৬ সালের পর বস্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। সুতরাং তালিকা না থাকলেও এটা সহজেই ধারণা করা যেতে পারে যে ১৯০৬ সালের পর বেরারে তদনুপাতে তুলা চাষেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

এখন কথা উঠবে যে কি করে সে উন্নতি করলে? এর জবাবে বলা যায় যে পূর্ব্বে যে সমস্ত জমি অনাবাদী পড়েছিল কিংবা যে সমস্ত জমিতে অন্য ফসল ফলত, চাষীরা সেই সমস্ত জমিতেও তুলার চাষ লাগিয়েছিল। এখানে একটা কথা স্বীকার্য্য যে চাষের জমির পরিমাণ বাড়লেও, তুলার গুণাগুণের উন্নতি কিছুমাত্র সাধিত হয় নি।

বেরারে পূর্ব্বে দু'রকমের তুলা উৎপন্ন হ'ত— (১) জাদি, (২) বানি। প্রথমোক্ত শীতের ফসল, দেখতে সুন্দর ও রেশমের মত। শেষোক্তকে বর্ষার প্রারম্ভে চাষকরা হয় এবং এ-ও দেখতে চমৎকার। দু'য়েরই লম্বা আঁশ আছে, যদিও শেষোক্তের আঁশগুলি সব সমান পরিষ্কার, দেখতে বেশী চকচকে ও রেশমী। কিন্তু এ কোয়ালিটির ফসল কম হয়, এবং এ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার দরুণ

আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন তেমন সহ্য করতে পারে না। ঐ দু'শ্রেণীর তুলোই সমান উৎপাদিত হ'য়ে বোম্বাই-এর বাজারে বেশ দরে বিকোচ্ছিল। কিন্তু হাউরি বা নতুন জাদি নামে আর এক রকমের তুলো এসে ওদের স্থান গ্রহণ করে।

তুলাচাষের উন্নতি বিধান কল্পে প্রাদেশিক সরকার চাষীদের এক নতুন রকমের বীজ বিনামূল্যে দিয়াছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এটি নিয়ে শুধুমাত্র পরীক্ষা চালানো, কিন্তু ফলে দেখা গেল যে এইটাই দেশের মাটি ও আবহাওয়ার উপযোগী এবং এইটাই চাষীদের মধ্যে এত অধিক আদৃত হয়েছে যে পুরাতন ধরনের তুলাকে আর কেউ আমলই দেয় না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই শ্রেণীর তুলোচাষ সব মাটিরই উপযোগী এবং ইহা প্রচুর ফসল প্রদান

করে, যদিও এর আঁশ অপেক্ষাকৃত কম লম্বা হয়।

বেরারের চাষের জমি ওদের দেশের প্রাদেশিক নামে সাত ভাগে বিভক্ত,—(১) কালি—ঘন কালোমাটির জমি; (২) মারোয়াণ্ড—সাধারণ কালোজমি; (৩) পউধারী—সাদাজমি, সাধারণতঃ লোক বসতির কাছাকাছি; (৪) চোপান বা চিকানী—এ জমির উপর বর্ষাকালে একটা সাদা অংশ জমে এবং অধিকাংশ স্থলে এর উৎপাদিকা শক্তি থাকে না; (৫) মালাই—বন্যার পলিপড়া জমি; (৬) পিবালী—হলদে ধরনের, (৭) খারাদ বারাদ—খারাপ পাথুরে জমি। এদের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম নম্বরেই তুলোর চাষ হয় যদিও অপরগুলোতেও হ'তে কোন বাধা নেই।

ঘন কালো মাটির জমিতে প্রতি বছরই লাঙ্গল চালাতে হয় না, অন্য জমিগুলোতে তা' চালাতে হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত জমিতে বছর বছর লাঙ্গল না দিলেও তিন বছর অন্তর অবশ্য লাঙ্গল দেওয়া কর্ত্তব্য। লাঙ্গল দেওয়ার উদ্দেশ্যই হ'ল জমিকে নরম করা, যাতে করে বীজ থেকে শিকড় অনেক দূর পর্য্যন্ত মাটিতে প্রবেশ করে। এই লাঙ্গল দেওয়ার কাজটা পরিশ্রমের এবং এতে বেশ মজুরী খরচ পড়ে। সাধারণতঃ এর জন্য একর পিছু খরচ হচ্ছে চার টাকা। লাঙ্গল দেওয়া ছাড়া আর একটা কাজ করা দরকার, সেটা হচ্ছে জমিতে মই লাগানো। জমিতে যত বেশীবার মই লাগানো যায়, তা' তত বেশী চাষের উপযোগী হয়। বেরারে সাধারণতঃ দু'বার মই লাগানো হয় এবং সে দু'বারের মধ্যে প্রথম বারের নাম হ'ল একারনী, আর দ্বিতীয় বারের নাম হ'ল দুভারনী। দুটো বলদ নিয়ে একজন লোক চার একর জমির ওপর মই চালানো ৩ দিনে শেষ করতে পারে।

একারনী ও দুভারনী, চার একর জমির উপর এই দুই কার্য্য সমাধা করবার খরচ হ'ল পাঁচ টাকা।

কৃষি কার্য্যের আর একটা উপাদান হ'ল সার প্রদান কার্য্য। সাধারণতঃ পশুদিগের গোবর ইত্যাদি মলমূত্রই চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঐ সমস্ত মলমূত্র গ্রামের কিনারায় খানিকটা নীচু জমিতে জমা করা থাকে, কেউ কেউ বা ও গুলোকে একটা আলাদা গর্ত্ত কেটে তার মধ্যে রেখে দেয়। অনেকেই রাখবার চার ছ'মাস পরেই একে কাজে লাগায়; সামান্য কয়েকজন একে পচিয়ে বছর খানেক বাদে ব্যবহার করে।

আর এক রকমেও সার প্রদানের কাজ সম্পাদন করা হয়। গ্রামের যত ভেড়া, ছাগল, গরু প্রভৃতিকে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন ধরে চাষের মাঠে চরানো হয়, তাদের যে সমস্ত মলমূত্র পড়ে তাতে জমির সারের কাজ চলে যায়। মানুষের বিষ্ঠাও সারের কাজে লাগে, এবং এই সারই উৎকৃষ্ট। আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে চাষীদের এই উৎকৃষ্ট সারের দরুণ কোন খরচই পড়ে না। যে জমিতে এই উৎকৃষ্ট সার প্রদান করা হয় সে জমির উৎপাদন অন্যান্য জমি অপেক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

যে সমস্ত সার মাসের পর মাস ধরে গর্ত্তে পোঁতা থাকে সেগুলোকে কাজের সময় গর্ত্ত থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জমির স্থানে স্থানে তাল তাল করে রাখা হয়। তারপর জমিতে মই লাগাবার

পূর্ব্বে এটিকে নিয়ে সব যায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হ'লে পর জমিতে উত্তমরূপে মই চালানো হয়। এতে করে বড় বড় ঢেলাগুলো সব মিহি হয়ে যায় এবং সমস্ত সার সারা মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে।

জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করবার সার ব্যতীতও আর একটা উপায় আছে—সেটা হচ্ছে বছর বছর বদলে বদলে জমিতে ফসল লাগানো। ইংরাজীতে যাকে বলে 'রোটেশন্ অব্ ক্রপস্'। এই উপায়ে দেখা গেছে যে বেশ ভাল ফল ফলে, কিন্তু শতকরা ৯০ জন কৃষক এই উপায় অবলম্বন করে না।

তুলার চাষ করবার পূর্ব্বে তুলার বীজ গুলোকে বেশ করে একবার রগড়ে নেওয়া হয়। তারপর তাদের কালো মাটি ও পশুদিগের মল-মূত্রের এক লোসন দিয়ে উত্তমরূপে ভিজিয়ে দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল যাতে না বীজ-গুলো সব এক সঙ্গে জড়িয়ে যায়। বীজ পোঁতা সুরু হয় সাধারণতঃ জুন মাসের ৫ই থেকে ৭ই এর মধ্যে, তারপর জুলাই মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চলে। সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত যদি বেশ ভাল হয় তাহ'লে চারা খুব ভাল বেরোয়, কিন্তু পাখীদের খেয়ে নেওয়া এবং অন্যান্য উপদ্রবে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সাধারণতঃ চাষীদের একটা ধারণা আছে যে, মৃগনক্ষত্রে বীজ পুঁতলে ফসল খুব ভাল হয়, তাই জল না হ'য়ে মাটি শুকনো থাকলেও তারা ঐ ৫ই থেকে ৭ই এর মধ্যে কাজ আরম্ভ করে দেয়।

বীজ পোঁতবার এক সপ্তাহের মধ্যেই চারা বেরোতে আরম্ভ করে। একপক্ষ কাল পরে চারাগুলোর গোড়ায় নূতন মাটি লাগানো হয়। বেরারে একাজের নাম হ'ল দভারণ। এই দভারণের কাজ যত বেশী বার চালানো যায়, ফসল জন্মাবার পক্ষে তত বেশী সুবিধে হয়। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এই দভারণের কাজ চলে, তখন গাছে ফুল ফোটে। এরই সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কাজ চলে সেটা হচ্ছে যে চারা গুলোর গোড়ায় যদি ঘাস কিংবা অন্য কোন আগাছা জন্মায় ত সেগুলো তুলে ফেলে দেওয়া।

তুলার সঙ্গে সাধারণতঃ অন্য কিছুর চাষ হয় না, কিন্তু খুব অল্প যায়গায় এবং বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এর সঙ্গে অন্য জিনিষেরও চাষ চলেছে। সেক্ষেত্রে ২০ লাইন তুলোর মধ্যে এক লাইন সেই জিনিষ বসিয়ে দেওয়া হয়। তুলার চারা খুব কাছাকাছি বসানো হয়। সাধারণতঃ দু'টি চারার মাঝখানে মাত্র দু' ইঞ্চি ফাঁক থাকে, কিন্তু এই ব্যবধান যথেষ্ট নয়। চারা গুলিকে ভাল করে বাড়তে দেওয়ার জন্য আরও বেশী ব্যবধান আবশ্যক, কেননা, দেখা গেছে যে, অল্প ব্যবধানের চেয়ে বেশী ব্যবধানের গাছগুলি ঢের বেশী তুলা দিয়েছে।

এক একর জমিতে গড়ে সাধারণতঃ যে তুলা উৎপন্ন হয় তার অনুমানিক বাজার দর হ'ল ২৫ টাকা। ঐ এক একর জমিতে চাষের খরচ হ'ল ৬ টাকা, এছাড়া সরকারের খাজনা আছে ২ টাকা। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে একজন চাষী ৮ টাকা খরচ করে ২৫ টাকা অর্জ্জন করতে পারে। এই হ'ল একান্ত সাধারণ অবস্থার হিসাব; কিন্তু যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সারের দ্বারা চাষের আরও উন্নতি করা যায় এবং সমবায় নীতিতে উত্তম কৃষি বাজার প্রস্তুত থাকে তাহলে তুলোর পরিমাণ ও দাম ডবলের চেয়েও বৃদ্ধি পেতে পারে।

তুলা চাষের যদি উন্নতি করতে যাওয়া যায় তবে দু'টো দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে—প্রথমতঃ ফসলের পরিমাণ যেন বৃদ্ধি পায়, দ্বিতীয়তঃ তুলার কোয়ালিটিরও যেন উন্নতি হয়। অভিজ্ঞতা হ'তে দেখা গেছে যে নাগপুর জাদি বা হাউবী তুলো যা এককালে চাষীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তার চাষ ক্রমশঃ কমে গেছে। শুধু চাষই যে কমে গেছে তা' নয়, তুলার কোয়ালিটিরও অবনতি ঘটেছে। বেরারের পূর্ব্বেকার জাদি ও বানি তুলা কোয়ালিটিতে খুব ভাল ছিল এবং তার আঁশে চল্লিশ পর্য্যন্ত সুতো বোনা চল্‌ত। নাগপুরের এম্প্রেস মিলের ম্যানেজার বানি তুলোকে আমেরিকার তুলার সমান বলে মনে কর্‌তেন। কিন্তু পূর্ব্বেকার পুরাণো ধরণের তুলা কোয়ালিটীতে ভাল হ'লেও পরের তুলা পরিমাণে বেশী হয়।

ভারতে বস্ত্র শিল্পের প্রসারতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সুতরাং সব রকমের তুলার কোয়ালিটির উন্নতির দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। মিলের যখন প্রসার বাড়্‌ছে, তখন ভারতে ক্রমশঃ বেশী তুলার প্রয়োজন হ'তেই হবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তুলা চাষের যে রকম দশা, তাতে আশা করবার কিছু নেই। এই তুলা ক্রয় ব্যাপারে অনেক টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে।

নাগপুরের পরীক্ষা মূলক কৃষি ক্ষেত্রে বিদেশী বীজকে দেশী জলহাওয়ায় ধাতস্থ করিয়ে এবং দেশী বিদেশীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তুলার কোয়ালিটির উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা চলেছে। বিদেশী জর্জ্জিয়ান তুলার বীজ এই পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত হ'য়ে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের নানা স্থানে বিতরিত হয়েছিল এবং দেখা গেছ'ল যে তাতে ভাল ফল ফলেছে। এই প্রকার উপায় খুবই সমীচীন; কিন্তু আমাদের এদেশে সেই পূর্ব্বেকার কোয়ালিটির তুলা যা এক সময় খুবই আদৃত হয়েছিল, এবং চাষীরা যার চাষ এখন বন্ধ করেছে, তাকেও পুনর্জ্জীবিত করা দরকার। অবশ্য দেশী ও বিদেশীর সংমিশ্রণ ঘটালে ভাল ফল ফল্‌তে পারে। নাগপুরের পরীক্ষাগারের পরীক্ষা হতে দেখা গেছে যে এই সংমিশ্রণের ফল সন্তোষজনক হয়েছে।

আর একটা জিনিষ ভেবে দেখা দরকার। সেটা হচ্ছে যে, যে মাটিতে যে রকমের বীজ উপযোগী, সেই রকম সঠিক মনোনয়ন দরকার। কিন্তু চাষীরা এই মনোনয়নের ব্যাপারটা কিছুতেই ঠিক করতে পারে না; তারা যে বীজ যে জমিতে উপযোগী নয়, ঠিক সেই বীজ সেই জমিতে বপন করবে। কিন্তু চাষীদের এইটে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, তাতে ফল মোটেই সুবিধাজনক হয় না, বরং ক্ষতি হয়।

তারপর গাছ থেকে তুলা বিচ্ছিন্ন করেই চাষীরা তা' বাজারে চালান দেয়, পরের বছরে চাষ করবার জন্য বীজ রক্ষার্থে একটুও তুলা রাখে না। পরের বছরে চাষ করবার জন্য তাদের বীজ কিন্‌তে হয়। এতে তুলার কোয়ালিটির উন্নতিও হয় না, এবং চাষীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার চেয়ে চাষীরা যদি নিজের উৎপন্ন তুলা খানিকটা রেখে দিয়ে তার থেকে বীজ রক্ষা করবার উন্নতিমূলক পন্থা অবলম্বন করে তাহলে কাজের সুবিধা হবে।

(ক্রমশঃ)

বাংলায় ফিসারী বিভাগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ট্রানস্‌পোর্ট্ ওয়ার্ক, ব্যবসার হিসাব রাখা, ছোট ছোট মাছের কারবার চালানো, মাছের নানারূপ By-product-এর কারবার প্রভৃতি কাজে বহু শিক্ষিত বেকারকে পাওয়া যাবে। বঙ্গোপসাগরে মাছের কারবার সংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট্ একেবারে নতুন নন্। ১৯০৮ সালে তাঁদের এ-কাজে হাতেখড়ি হ'য়ে খানিকটা অভিজ্ঞতা লাভ হ'য়েছে।

এ-কথা সত্যি যে, এই প্রাথমিক পরীক্ষাকার্য্য ব্যাপারের পড়তায় খরচ খুব বেশী পড়বে, যেমনটি মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এ্যালুমিনিয়াম শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘটেছিল। সকলেই জানেন যে, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কার্য্য ব্যাপারে নানাকারণে ব্যয়বাহুল্য ঘটে থাকে এবং যেখানে এক টাকা খরচ হওয়া উচিত সেখানে দুই টাকা খরচ হ'য়ে যায়। পক্ষান্তরে, খরচ বেশী হোল বলে যদি গভর্ণমেণ্ট এইরূপ প্রচেষ্টায় বিরত থাকেন ত সম্পদ-বৃদ্ধির একটা সুযোগ নষ্ট হ'বে। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এ্যালুমিনিয়াম্ শিল্প-ব্যাপারটা এসম্পর্কে একটা নিদর্শন বলে গণ্য হ'তে পারে।

এই কার্য্য সম্পাদন করতে গেলে গভর্ণমেণ্টের প্রথম কর্ত্তব্য হ'বে বঙ্গোপসাগরের কোন্ কোন্ উপকূলে এবং কোন কোন স্থানে মাছ পাওয়া যায় সেটাই নির্দ্ধারণ করা, এবং এ-কাজ শেষ হ'লে, কি কি মাছ পাওয়া যায় ও ব্যবসার দিক দিয়ে সেগুলির উপযোগিতা কতখানি সেটা জ্ঞাত হওয়া। ইউরোপ ও আমেরিকায় যাঁরা সামুদ্রিক মাছের কারবার করতে নেমেছিলেন, তাঁরা প্রথমেই উপরোক্ত বিষয়গুলি ভাল করে প্রথমে আয়ত্ত করেছিলেন; সেই কারণেই তাঁদের ফিসারী সংক্রান্ত কারবার বেশ ভালই চলেছে। ১৯০৮ সালে গভর্ণমেণ্ট যখন এদিকটায় মনোনিবেশ করেছিলেন তখন তাঁদের উপরোক্ত তথ্যগুলি জানা ছিল না বলেই সাফল্য লাভ ঘটে ওঠে নি। এসম্পর্কে মিঃ কে, জি, গুপ্ত তাঁর

১৯০৮ সালের রিপোর্টে লিখেছেন—

The intermittent attempts made in previous years to fish in the Bay failed mainly because they were made without a knowledge of the habits and life history of the fish inhabiting the Bay, and above all, in complete ignorance of the banks and grounds where alone the fish are to be found in any number.

অর্থাৎ, বঙ্গোপসাগরে কোন্ কোন যায়গায় মাছ পাওয়া যায় এবং াদের প্রকৃতি কিরূপ, সেটুকু না জানা থাকার দরুণ পূর্ব্বেকার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। সেইজন্যই তিনি তাঁর রিপোর্টে এর পরেই লিখেছেন-

As a first step towards the opening up of sea fisheries. it is essential that Government should undertake a systematic survey of the Bay from the fishing point of view, so that the favourite haunts and the periodical migrations of the fishes may be ascertained and recorded and practical demonstration given as to what the sea is capable of yielding; and when the results are satisfactory, private enterprise is sure to come forward and take up the business on commercial lines.

অর্থাৎ, গভর্ণমেণ্ট যদি প্রথমে সমস্ত কিছু জেনে পথ তৈরী করে দেন ত প্রাইভেট কোম্পানীরা নিশ্চয়ই পরে একাজে নামবে।

১৯০৮ সালের পরীক্ষায় গভর্ণমেণ্ট ষ্টীম ট্রলারের সাহায্যে অনুসন্ধানকার্য্য চালাইয়াছিলেন, এই ষ্টীম্-ট্রলার অর্থাৎ মাছ ধরবার জাহাজের অনেক সুবিধা। প্রথমতঃ এই প্রকার জাহাজ সমস্ত ঝড়-ঝাপ্টা সহ্য করতে সমর্থ হয়, এবং বঙ্গোপসাগরে মে থেকে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত যে প্রচণ্ড ঝড়, হয় তাতেও এ কাবু হয় না। দ্বিতীয়তঃ ইহার আয়তনও খুব বড় নহে, ১২০ থেকে ৩০০ টন মাত্র এর 'ক্যাপাসিটি'; সুতরাং এ ঘণ্টায় ১২ নট্ পর্য্যন্ত বেগে চ'লতে পারে। তৃতীয়তঃ, অপরাপর জাহাজে যে-রকম দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, এর দ্বারা সে-রকম দুর্ঘটনা ঘটাবার কোন সম্ভাবনা নেই। এর সঙ্গে লাইফ্ বোটের তুলনা করা চলে।

এই মাছ ধরার কার্য্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় তিন রকমের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে :—

(১) বিম্ ট্রল্
(২) গিল্ নেট্
(৩) বড় বড় হাত-বঁড়শী, গাঁথী প্রভৃতি।

এগুলির মধ্যে এক ট্রল্ ছাড়া অপর দু'টি আমাদের দেশের জেলেদিগের নিকট পরিচিত। কিন্তু আমাদের দেশে যে-সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হ'লে তবেই তা' অধিকতর কার্য্যোপযোগী হ'য়ে উঠবে। কি কি যন্ত্র, কোন্ কোন্ মাছ ধরার পক্ষে বিশেষ উপযোগী তা' গভর্ণমেণ্ট এতৎসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ঠিক করিয়ে নেবেন। তাছাড়া

বিভিন্ন প্রকার জাল-এর উদ্ভাবন ও ব্যবহার করা প্রয়োজন।

মাছ ধরা পড়বার পর তার চালানী-কাজটাই প্রধান। অন্যান্য যায়গায় যে ট্রলারে করে মাছ ধরা হয়, সেইটাই মাছ ধরা কার্য্য শেষ হ'লে মাছ বোঝাই নিয়ে বন্দরে ফিরে আসে। সেখানে মাছ খালাস করে কয়লা ইত্যাদি জাহাজের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ভরে নিয়ে আবার সমুদ্রে ফিরে এসে মাছধরা কার্য্যে লেগে যায়! একই কোম্পানীর একই যায়গায় যদি অনেকগুলি ট্রলার থাকে, তবে সেখানে আর একটু উন্নততর প্রণালী অনুসৃত হ'য়ে থাকে। ঐ ট্রলার বাহিনীর একখানা মাছবাহী ষ্টীমার থাকে, সেটাই সমস্ত ট্রলারের মাছ বোঝাই নিয়ে বন্দরে পৌঁছে দেয় এবং বন্দর থেকে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিয়ে এসে ট্রলারে যোগান দেয়। এই প্রকার ব্যবস্থায় অনেক সময় ও অর্থের অপব্যবহারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, সুতরাং এই ব্যবস্থা যে লাভজনক সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ব্যাপকভাবে মৎস্য ব্যবসায় করিবার পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে মৎস্য 'প্রিজার্ভ্' করবার সমস্যা। ইউরোপ কিংবা আমেরিকা শীতপ্রধান দেশ; সেখানে মাছ ধরে বরফে ঢেকে কিংবা লবণ দিয়ে জরিয়ে ইতস্ততঃ চালান করে দেওয়া হয়। মাছ নষ্ট হওয়ার সেখানে মোটেই আশঙ্কা নেই। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা অন্যরকম; গরমের চোটে ড্যাঙ্গার মানুষই খাবি খায়, জলের মাছের কথা ত স্বতন্ত্র। এখানে ঐ মাছ 'প্রিজার্ভ' করার প্রক্রিয়াটা ঠিকমত অনুষ্ঠিত হয় না বলে মাছ এখানে প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয়। এতে ব্যবসার পক্ষে লোকসানের মাত্রা পড়ে বড় বেশী। সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, শীতকালের মাছের দরের অনুপাতে গ্রীষ্মকালের দর দ্বিগুণের চেয়েও বেশী। এর কারণ আর কিছুই নয়, গ্রীষ্মকালে মাছকে প্রিজার্ভ করে না রাখতে পারার দরুণ মাছ নষ্ট হয়ে যায় সুতরাং মৎস্যব্যবসায়ীকে এই নষ্ট মাছের লোকসান জনিত ক্ষতিটা বাকি মাছের উপর দাম চড়াইয়া পোষাইতে হয় এবং তাহা ছাড়া চাহিদানুযায়ী যোগান দিতে না পারার জন্য দরও আগুন হয়ে ওঠে। অথচ শীতকালের ঐ যোগান দেওয়ার কাজটা ঠিকমত অনুষ্ঠিত হয়, এবং মাছও অত শীঘ্র পচিয়া নষ্ট হয় না বলিয়া তখন মাছের ব্যবসাও খানিকটা সহজ হয়।

প্রাকৃতিক অবস্থার গুণে আমাদের দেশটা যখন গ্রীষ্ম-প্রধান হয়ে উঠেছে, তখন কোন ছলেই আমরা সেটাকে বদলে দিতে পারবো না। কিন্তু গরম দেশটাকে ঠাণ্ডা করতে না পারলেও, গরমটাকে আমরা বুদ্ধি খরচ করে এড়াতে পারি, যেমন বিজলী পাখার সাহায্যে আমরা দারুণ গ্রীষ্মের হাত থেকে খানিকটা রেহাই পাই। মাছের বেলাতেও আমরা যদি সেরকম কোন প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করি তবে হয়ত 'ফিস্ প্রিজার্ভিং' সমস্যাটার খানিকটা সমাধান হয়। আপাততঃ আমাদের বরফ আর লবণই সম্বল। সুতরাং ট্রলারের কর্ত্তাদের রীতিমত লক্ষ্য করতে হ'বে যে, কি পরিমাণ গরমে কতখানি বরফ দিয়ে ঢেকে রাখলে কতটা ওজনের মাছকে ঠিক প্রিজার্ভ করে রাখা যায়। এইটার যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব পাওয়া যায় ত মাছের ব্যবসাটা অধিকতর লাভজনক ও সহজ হ'য়ে আসবে। এই সঠিক বৈজ্ঞানিক

জ্ঞানের (precise scientific knowledge) অভাবে জেলেদের দেওয়া বরফ হয় under-ice অথবা over-ice হবার দরুণ তাহাদের অনেক লোকসান হয়।

এই বরফ দেওয়া প্রণালী ছাড়া আর কোন উৎকৃষ্টতর বৈজ্ঞানিক প্রণালী আজও বোধ হয় আবিষ্কৃত হয় নি, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নেমে অভাব অনুভূত হ'লে সেটা যে নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হ'বে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। অন্যান্য জিনিষ ঠাণ্ডা করে রাখবার জন্য যেমন রেফ্রিজারেটিং মেসিন ব্যবহৃত হয়, মাছ ধরার ট্রলারে সেইরূপ বৃহদায়তনের রেফ্রিজারেটিং মেসিন, Ice chamber ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল Refrigerating চেম্বারে শত শত টন মাছ টাট্‌কা অবস্থায় বাজারে আনীত হয়। মৎস্যের ব্যবসায়ে মোট কথা বরফই আমাদের প্রধান সম্বল।

বরফ ছাড়া লবণও মৎস্যের ব্যবসায়ে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন। মিঃ কে, জি, গুপ্ত যখন তাঁর রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন তখন লবণের প্রতি অত্যধিক ডিউটির জন্য দাম ভয়ঙ্কর চড়া ছিল। তাই কে, জি, গুপ্ত মহোদয় লবণের ডিউটি তুলে দেবার জন্য তাঁর রিপোর্টে সুপারিশ করেছিলেন। আজ সে ডিউটি অনেকাংশে লাঘব হ'লেও লবণের দর আরও কম্‌লে মৎস্য ব্যবসার আরও অনেক সুবিধা হইবে, সুতরাং এবিষয়েও গভর্ণমেণ্টের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

মাছের ব্যবসায়ে Quick Transport বা তাড়াতাড়ি মাছ চালান দেবার ব্যবস্থা থাকার অত্যন্ত প্রয়োজন, নচেৎ লোকসান, অবশ্যম্ভাবী। মাছ ধরার পর সেই মাছ বাজারে পৌঁছে দিতে যদি খুব বেশী দেরী হয় এবং কোনও কারণে বরফের জোগান ক'মে যায়, তা' হ'লে পচনের হাত থেকে মাছ রক্ষা করা কঠিন হ'য়ে পড়ে।

সুতরাং মাছ যত শীঘ্র সম্ভব বঙ্গোপসাগর থেকে কলিকাতার বাজারে এনে ফেলার ব্যবস্থা থাকা চাই। তা'হলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মাছ বাজারে তাজাবস্থায় এসে পৌঁছবে এবং জিনিষটা টাট্‌কা থাকার দরুণ দরও বেশী পাওয়া যাবে। বঙ্গোপসাগরে মাছের ব্যবসার ক্ষেত্রে ডায়মণ্ড্ হারবার ও পোর্ট ক্যানিংএ জেটি স্থাপন করে যদি মাছ চালান দেবার কেন্দ্র খোলা যায় তা'হলে ব্যবসার দিক দিয়ে যথেষ্ট সুবিধে হয়, কেননা, ডায়মণ্ড্ হারবার থেকে ট্রেনযোগে কলিকাতায় মাছ পৌঁছতে মাত্র ঘণ্টা দু'য়েক সময় লাগে।

বঙ্গোপসাগরের মাছ ধরা ছাড়াও বাংলা দেশে মাছের কারবারের আরও বহু যায়গা আছে। বাংলাদেশ প্রধানতঃ নদী বহুল; তাহা ছাড়া অসংখ্য খাল বিল বাঁওড় এবং জলাভূমি দেশের সর্ব্বত্রই পড়িয়া আছে। এই সকল জলায় নানা জাতীয় মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং সেই সমস্ত স্থানেও মাছ ধরবার কৌশল জাল বিস্তার করলে প্রচুর লাভবান হওয়া যায়। এই সমস্ত যায়গায় কাজে নামতে গেলে বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না; কাজে কাজেই অল্প মূলধন নিয়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এদিকে মনোনিবেশ করতে পারেন। ঐ সমস্ত নদী বা খালে ট্রলারের পরিবর্ত্তে Refrigerating chamber যুক্ত মোটর বোট ব্যবহার করাই অধিকতর কার্য্যোপযোগী; বাংলাদেশে এই খাল বিল নদী প্রভৃতিতে মৎস্য শীকারের উপরও তেমন ব্যবসায়োপযোগী নজর দেওয়া হয় নি। ঐ সমস্ত স্থানে স্থানীয় জেলেরা

পুরাতন পদ্ধতিতে যেরূপ ব্যবসা করে, তা' বহুলাংশে বৃদ্ধি করে নূতন লাভের উপায় নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে।

পদ্মা প্রভৃতি নদীতে জেলেরা ছোট ছোট নৌকা করেই মাছ ধরার কাজে লিপ্ত থাকে; মোটর বোট সাহায্যে বৃহৎ স্কেলে কেউই এ প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করে না। সমুদ্রে মৎস্য শীকার কার্য্যের একটা সুসংবদ্ধ উন্নতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'লে খাল নদী খাঁড়িগুলিতেও যে তা' অনুসৃত হ'বে এ আশা করা যায়। শুধু তাই নয়, একার্য্যের উন্নতি সাধিত হ'লে পল্লী বাংলার নদী তীরস্থ প্রধান প্রধান স্থানগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হ'বে এবং বিভিন্ন যায়গার মধ্যে চলাচল সংযোগ ঘটলেই পল্লী বাংলার সহর গুলিতেই প্রচুর পরিমাণে মাছ যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা সম্ভব হ'বে।

বঙ্গোপসাগরে এবং অপরাপর স্থানে উক্ত উন্নতিমূলক মাছ ধরার কাজ অনুষ্ঠিত করতে গেলে দেশীয় জেলে সম্প্রদায়ের হয়ত সাহায্য পাওয়া যাবে না। এর কারণ হচ্ছে যে ট্রলার বা মোটর বোটের ব্যাপার ইত্যাদি তারা মোটেই বোঝে না। তা' ছাড়া উন্নত ধরণের জাল, হাতবঁড়শী ও অপরাপর সাজ সরঞ্জামের ব্যবহারও তারা জানে না। এগুলি ব্যতীত কার্য্যক্ষেত্রে মস্তবড় বাধা হচ্ছে তাদের চিরাচরিত গতানুগতিকতা ও অন্ধ গোঁড়ামী। কোন নূতন কিছু অবলম্বন করতে গেলেই এজিনিষটা তাদের ভয়ানক বাধা দেয়। সুতরাং উন্নতিমূলক ব্যবস্থাকে চালু করতে গেলে গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য হ'বে বিভিন্ন স্থান হ'তে অভিজ্ঞ লোক আনয়ন করে তাদের কার্য্যে নিয়োগ করা এবং সেই সমস্ত লোকের অধীনে একদল স্থানীয় জেলের ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

এই একদল স্থানীয় জেলে সংগ্রহ করা প্রথমটায় একটু কঠিন হ'তে পারে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যদি উচ্চ মজুরীর লোভ দেখান এবং জেলেদের নিকট উন্নতিমূলক ব্যবস্থার লাভালাভ ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারেন, তা'হলে স্থানীয় জেলেদের সংগ্রহ করা মোটেই শক্ত হবে না। এর কারণ হচ্ছে যে সবাই অর্থের দাস এবং সকলেই আয় বাড়াতে চায়। সুতরাং জেলেদের যতই গোঁড়ামী এবং গতানুগতিকতার মোহ থাকুক না কেন, তাদের যদি একথা বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে তাদের বর্ত্তমান অবস্থার চেয়ে উন্নতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে অবস্থা ঢের ভাল হ'বে এবং চোখের সামনে তারা যদি কারও কারও এই রকম উন্নতি দেখতে পায়, তা'হলে নিশ্চয়ই তারা নূতন পন্থা এবং নূতন জীবন অবলম্বন করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করবে না।

এর যে কোন নজীর নেই তা' নয়; পূর্ব্বে আমাদের দেশে গুজবই হোক্ আর সত্য কথাই হোক্, এটা রটনা হয়ে গেছল যে বর্ম্মা মুল্লুকে যেতে পারলেই বড়লোক হওয়া যায়। কতলোক যে সেই প্রলোভনে পড়ে বর্ম্মায় ছুটেছিল তার ইয়ত্তা নেই; অথচ সেই সমস্ত লোকের গোঁড়ামি এবং গতানুগতিকতার মোহ ত কিছুমাত্র কম ছিল না। সুতরাং জেলেরাও যে ক্রমশঃ এই নূতন পন্থা অনুসরণ করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। প্রথম পরীক্ষা কার্য্যের সময়ে অভিজ্ঞ লোকেদের অধীনে একদল স্থানীয় জেলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হবে, তারাই আবার অপর জেলেদের শিক্ষিত করে

তুলতে সমর্থ হ'বে। গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য শুধু কাজটাকে চালু করে দেওয়া। কারণ যে ব্যবসার বিষয়ে জানা নেই, সেটার সম্পর্কে কেহ প্রাইভেট ক্যাপিট্যাল নিয়োগ ক'রে কিছু করতে ভয় পায়, কেননা যদি লোকসান যায় ত তার একেবারে ভরাডুবি ঘটবে। সেইজন্য এই সমস্ত ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের উচিত পথ তৈরী করে দেওয়া, যার উপর দিয়ে ব্যক্তিগত মূলধন অবাধে নিঃশঙ্কচিত্তে চলাফেরা করতে পারে। আমরা তাই মাননীয় ফজলুল্ হকের গভর্ণমেণ্টকে লক্ষ্য করে বলছিলাম যে তাঁরা এবিষয়ে অগ্রণী হ'য়ে বাংলাদেশের একটি প্রধান ধনাগমের পথ মুক্ত ক'রে দিয়ে দেশের লোকের আশীর্ব্বাদভাজন হউন।

বঙ্গোপসাগরের উপকূল ভাগ যে মৎস্য সম্পদে পরিপূর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে, মাছ ধরবার প্রণালী সেখানে উন্নতিমূলকভাবে আশানুরূপ অনুসৃত হয় না। উপকূলের একেবারে ধারে ধারে অক্টোবর থেকে মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জেলেরা কাজ করে। যদিও তাতে ভেটকী প্রভৃতি ভাল ভাল মাছ পাওয়া যায় তবুও ছোট জালের সাহায্যে মাছ ধরা কার্য্য সাধিত হওয়ার দরুণ প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায় না। বালেশ্বরের উপকূলে চণ্ডীপুর মাছ ব্যবসার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। উক্ত উপকূলভাগে যত মাছ ধরা হয় তার মধ্যে কতক স্থানীয় বাজারে বিক্রীত হয়, কতক কল'কাতার বাজারে চালান আসে, আর বাদবাকী, 'শুঁট্‌কী' তৈরী হ'য়ে বিদেশে রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত হয়। উক্ত ছয় মাস ছাড়া বছরের বাদবাকী সময়ে জেলেরা হাঁটুভোর জলে সরু ও লম্বা জালের সাহায্যে কাজ করে।

কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থিত জায়গাসমূহের মধ্যে একমাত্র পুরী ছাড়া আর কোথাও সমুদ্রের গভীর জলে মৎস্য শীকার কার্য্য সাধিত হয় না। কিন্তু সেখানেও এই কার্য্য ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয় না, এবং স্থানীয় উৎকলবাসী জেলেরা এ-ব্যবসা গ্রহণ করে না—গঞ্জামের তেলেগু জেলেরা যাদের স্থানীয়-ভাষায় 'নুলিয়া' বলা হয় তারাই উক্তকার্য্যে অগ্রণী হ'য়ে থাকে। পুরীতে নুলিয়ারা নৌকায় করে সমুদ্রের উপকূল থেকে বড় জোর দু'তিন মাইল মধ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হয় এবং তাতে যা' মাছ পাওয়া যায় সেটা প্রচুর নয়। তাও আবার বৎসরের সমস্ত সময়টায় এই মৎস্য শীকার কার্য্য সাধিত হয় না, মার্চ্চের মধ্যভাগ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত একেবারেই বন্ধ থাকে।

বালেশ্বরের এবং পুরীর উপকূল ভাগ থেকে সামান্য অনুন্নত ধরণের প্রচেষ্টায় যে হাজার রকম সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়, তার থেকে এই ধারণা করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মধ্য সমুদ্রে গেলে প্রভূত পরিমাণে বড় বড় মাছ পাওয়া যেতে পারে। বড় বড় মাছের ঝাঁক তীরের নিকট বড় একটা আসে না; উপকূলের নিকটে যে সমস্ত মাছ ধরা পড়ে সেগুলো হয়ত ঝাঁক থেকে ছিটকে এসেছে। সমস্ত ঝাঁক ধরা পড়লে যে নৌকা বোঝাই হ'য়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহই নাই।

জুতাব্যবসায়ী টমাস বাটার আত্মজীবন চরিত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা দুইভাই যখন আমাদের ভগ্নীর সহিত পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসি, তখন তাঁহার কথানুসারে আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমরা জীবনে কখনও তামাক, চুরুট, মদ এ-সব নেশার জিনিস স্পর্শও করিব না। আমরা সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছি। কিন্তু অন্যদিকে আমরা চিত্ত সংযম করিতে পারি নাই। স্বাধীনতা লাভের দোষ এই ভাবে দেখা দিল। আমরা প্রায়ই বৃথা কাজে সময় নষ্ট করিতাম। আমাদের একটা নেশা হইল, বড় লোকদের সঙ্গে মেশা। শেষে তার ফল দাঁড়াইল এই যে, আমরা মুচির ছেলে বলিয়া নিজেদের প্রতিই ঘৃণা হইত। আমরা জুতার কারবার করি, এই কথা মনে হইলে লজ্জিত হইতাম। ক্রমে ক্রমে আমরা আত্মগৌরব, শ্রমের মর্য্যাদা, আত্মবিশ্বাস এ-সব হারাইলাম এবং নিজেদের অতি হীন মনে করিতে লাগিলাম।

আমরা আমাদের কারখানা প্রথমে সাজাইবার জন্য আসবাব-পত্র ও যন্ত্রপাতি ধারে কিনিয়াছিলাম। ৬ মাস পরে টাকা শোধ করিবার কথা। তারপর, জুতা তৈয়ারী করিবার জন্য চামড়া প্রভৃতি কাঁচা মালও আমরা ধারে কিনিতাম। এই সুযোগেই আমরা আমাদের চাল-চলন অত্যন্ত বাড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম; বড় লোকের সঙ্গে মিশিয়া আমাদের ইহাই লাভ হইয়াছিল। ক্রমে বাজার দেনা বাড়িতে লাগিল। পাওনাদারদিগকে "আজ-নয়-কাল" বলিয়া কেবল ঘুরাইতে লাগিলাম। তাহারা বিরক্ত হইয়া উঠিল, বাজারেও আমাদের দুর্নাম রটিল। পাওনাদারদের তাগাদায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। তাহারা আদালতে নলিশ করিবার ভয় দেখাইতেও লাগিল।

বিপদ কখনও একাকী আসেনা। "ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলী ভবন্তী"—একটু দোষের জন্য উঁচু ষ্টাইলের নেশা আমাদিগকে চারিদিকে ঘিরিয়া

দাঁড়াইল, ঠিক সেই সময়ে যুদ্ধে যাইবার জন্য আমার ভাইয়ের ডাক পড়িল। তাহাকে সৈন্যদলে যোগ দিতেই হইবে। আমার ভাই চলিয়া গেলে আমি একাকী কখনই কারবার চালাইতে পারিব না, ইহা একেবারে অবধারিত ছিল। সুতরাং তাহা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। দেখিলাম, আমার ভ্রাতারও সেই অভিমত।

একবৎসর স্বাধীনভাবে কারবার চালাইয়া শেষে হিসাব করিয়া দেখিলাম, আমাদের আসল মূলধন যে ৮০০ ফ্লোরিণ (প্রায় হাজার টাকা) ছিল, তাহাত গিয়াছেই, মহাজনদের (যারা আমাদিগকে ধারে মাল দিয়াছিল) ৮০০০ ফ্লোরিণ (প্রায় দশ হাজার টাকা,)—সেও আমরা উড়াইয়াছি। প্রথম উদ্যমে যখন উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করি তখন সফলতার যে গৌরবমণ্ডিত চিত্র সম্মুখে দেখিয়াছিলাম, আজ দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাইয়া তাহা কলঙ্কিত করিতে হইবে,—এই কঠোর সত্য আমাকে চারিদিক হইতে আঘাত করিতে লাগিল। ছিঃ, ছিঃ, দেউলিয়া! এই কি ব্যবসায়ের শেষ পরিণাম?

'দেউলিয়া ব্যাপারটী যে কি, এতদিন আমি তাহা বুঝিবার জন্য মাথা ঘামাই নাই। লোকে পাওনাদারের টাকা দেয়না, ব্যবসায়ীরা মহাজনের টাকা মারে, দেনা এড়াইবার জন্য দেউলিয়া সাজে, এই সকল কথা শুনিয়া আমি মনে মনে হাসিতাম। কিন্তু এখন সেই সমস্ত বিষয় একে একে আমার মানস—নেত্রের সম্মুখে করাল সত্যের মত আবির্ভূত হইয়া আমাকে বিদ্রূপের হাসি শোনাইতে লাগিল। ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় আমার—

"কেশরাশি কণ্টকিত হয় শিরোপর
শঙ্কিত সজারু পৃষ্ঠ কণ্টক যেমন"

আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এমন ভাবে অধঃপতিত হওয়া আমার মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু আমিত মরিতে চাহিনা, বাঁচিবার জন্য যে আমার বড় সাধ! নৈতিক মৃত্যু অপেক্ষা দৈহিক জীবন আমার অধিকতর কাম্য হইয়া উঠিল। আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আরম্ভ করিলাম। দেহকে বাঁচাইবার জন্য দেহকেই শাস্তি দিলাম সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর। একবৎসর ধরিয়া যে আরামবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়াছিলাম তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিলাম। উঁচু ষ্টাইল, বড়লোকী চাল, একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা সকল প্রকার সুখভোগ হইতে দেহকে বঞ্চিত করিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনও এমন দায়ীত্ব-জ্ঞানহীনতার এবং অবিবেচনার কার্য্য করিব না।

অচিরে প্রায়শ্চিত্তের ফল পাইলাম। আমাকে দেউলিয়া হইতে হইল না! মহাজন ও পাওনাদারেরা যখন দেখিল যে, আমি পুনরায় নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করিয়াছি, তখন তাহারা আর পাওনার জন্য তাগাদা করিল না;—হিসাব মিটাইবার জন্য আর পীড়াপিড়ী করিলনা। তাহারা আমার প্রায়শ্চিত্তের কড়াকড়ি দেখিয়া বুঝিল, যে আমি এই ধাক্কা ঠিক সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিব। আমিও তাহাদের এই ধারণার মর্য্যাদা রাখিলাম। দুই বৎসরের মধ্যে আমি সমস্ত দেনা শোধ করিয়া ফেলিলাম।

আমি আর বড়লোকদের কাছে ঘেঁসিতাম না। তথাপি বড়লোক হইবার আশা আমার মনের মধ্যেই উঁকিঝুঁকি মারিত। একটা বৃহৎ বরফের খণ্ড আগুনের মধ্যে ফেলিয়া

দিলে যেমন তাহা তখনই গলিয়া যায় না, একটু সময় লাগে, তেমনি আমারও বড় লোক হইবার সাধ তখনও একেবারে মিটেনি। কারখানায় আমি যে বেঞ্চিতে বসিয়া কাজ করিতাম, তাহা আমি সরাইয়া এক কোণে লইয়া গেলাম। কারণ, আমি যে জাতিতে মুচি এবং মুচির কাজ করি, তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জিত হইতাম। আর একটা কারণ ছিল;—ব্যবসায়ের এই দুরবস্থায়, দেউলিয়া হইবার আসন্ন বিপদের ধাক্কায় আমি যে কিরূপ দমিয়া গিয়াছিলাম, তাহা আমি সকলকে জানাইতে ইচ্ছা করি নাই। শীঘ্রই আমার এই দুঃখ ও নিরাশার ভাব দূর হইয়া গেল। আবার দিন-রাত কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কাজের উৎসাহে ও আনন্দে সব দৈন্যদুর্দ্দশা ভুলিয়া গেলাম। সেই সময় হইতে আমার জীবনের সুখ সৌভাগ্য আরম্ভ হইল। অলস প্রকৃতি বড়লোকদের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমি যে বোকামি করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম। আর আমি তাহাদের সঙ্গে মিশিতাম না। কাজই আমার প্রিয় সঙ্গী হইয়া উঠিল।

আমি জাত মুচির ছেলে; সুতরাং নিজে হাতের কাজ জানিতাম। কিরূপে কম খরচায় কম সময়ে, খুব সুবিধায় ভাল কাজ হইতে পারে, তাহার সন্ধান সুলুক আমার জানা ছিল, সুতরাং কোন মিস্ত্রী অথবা কর্ম্মচারী আমাকে ফাঁকি দিতে পারিত না, অথবা ফাঁকি দিতে সাহসও করিত না। পরন্তু, তাহারা আমার কাছে কাজের কৌশল শিখিয়া উপকৃত হইত

এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিত। আমি বুঝিয়াছিলাম, বাস্তবিক টাকা কড়ি ব্যবসায়ের প্রকৃত মূলধন নহে। মালিকের নিজের পরিশ্রম, কার্য্যকুশলতা, দূরদর্শিতা, অধ্যবসায় এই সকল গুণই ব্যবসায়ের প্রকৃত মূলধন।

আমার কারখানার জুতা ভিয়েনা সহরে নগদ দামে বিক্রী হইত। সেইজন্য আমি ধারে চামড়া কিনিতে পারিতাম, এবং এক সপ্তাহের মধ্যে চামড়াওয়ালার পাওনা টাকা শোধ করিয়া ফেলিতাম। আমাদের জিলিন কারখানা হইতে ১২ মাইল দূরে অট্রোকোভিচ্ ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে চামড়ার আমদানী হইত। মালগাড়ী রাত্রি ১২ টার সময় ষ্টেশনে আসিত। আমি কারখানা হইতে সন্ধ্যার পর হাঁটিয়া ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইতাম। সেখান হইতে চামড়ার বোঝা পিঠে লইয়া আবার হাঁটিয়া রাত্রি শেষ না হইতেই কারখানায় ফিরিয়া আসিতাম। কিন্তু আমার বিশ্রাম করা বা ঘুমাইবার সময় ছিল না। তখনই চামড়াগুলিকে ছাঁট্-কাট করিয়া ঠিক করিয়া রাখিতাম, যেন সকালবেলা মিস্ত্রীরা আসিলেই তাহাদের প্রত্যেকের হাতে হাতে কাজ বিলি করিয়া দিতে পারি। সারাদিন মিস্ত্রীরা খাটিয়া যে মাল তৈয়ারী করিত, আমি সন্ধ্যার পর সে সব লইয়া খদ্দেরের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতাম,—টাকা কড়ি কিছু আদায় করিয়া মিস্ত্রীদের বেতন দিবার বন্দোবস্ত করিতাম। এইরকম খাটুনিতে আমার কষ্ট না হইয়া বরং আনন্দই হইত।

কখনও আমি পাওনাদারগণকে অথবা কাঁচামাল সরবরাহকারিগণকে বেশী টাকা দিয়া ফেলিতাম। ফলে, মিস্ত্রীদের বেতন দিবার টাকার টানাটানি হইত। তখন তাহাদের পুরা বেতন না দিয়া কোন রকমে দু'বেলা রুটী কিনিবার জোগাড় হয়, এই আন্দাজে কিছু-কিছু টাকা দিতাম। যাহারা দোকানে ধারে রুটী পাইত, তাহারা বেতন বাবদে কিছু লইত না। যাহারা দোকানে ধার-বাকী পাইতনা, তাহাদের ইহাতে সুবিধা হইত। কিন্তু তাহাতেও কুলাইতনা। কারণ, দোকানে যাহাদের ধার চলিতনা, মিস্ত্রীদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশী। বেতনের টাকা চুকাইয়া দিতে দিতে যখন টেবিলের উপর রাশীকৃত টাকার স্তূপ শেষে কয়েকখানি নিকেলের আনি দু-আনিতে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন আমি আমার নিজের মজুরী বাবদে ঐ সামান্য কিছু লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম। কিন্তু এমন অনেক দিন গিয়াছে, আমি ঐ খান-কয়েক আনি দু-আনি কুড়াইয়া পকেটে তুলিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় কোন মিস্ত্রী আসিয়া তার বেতন চাহিল। বেচারা দোকানে একখানি রুটীর টুকরাও ধারে পায় না,—বাড়ী যাইয়া ছেলেপিলের মুখে কি দিবে,—তার ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি আমার প্রাণে বড় লাগে;—আমি সেই অবশিষ্ট যা কিছু সবই তাকে দিয়া নিজে খালি হাতে ঘরে যাই। ঘরে যাইয়া দেখি, আমার ভগিনী কাঁদিতেছে,—ঘরে খাবার জন্য একটুকরা রুটীও নাই। রুটীওয়ালার দোকানে ধার পাওয়া গেল না। তার পাওনা আছে বলিয়া সে আর ধারে দিতে চাহেনা। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিনগুলি এই ভাবে কাটিয়াছে।

আর একটী ঘটনা বলিতেছি। খ্রীষ্টমাস পর্ব্ব নিকটে আসিল, আমাদের টাকার প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাইল। মিস্ত্রীদেরও কিছু কিছু বেশী

মজুরী দেওয়া দরকার। আমি পাওনা টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য সমস্ত অষ্ট্রিয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। হাঁটীয়া আমার জুতার তলা ক্ষয় হইয়া গেল। বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তা ঘাট জলে কাদায় একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। আমি ঐ ছেঁড়া জুতা পায়ে দিয়াই চলিয়াছি, গোড়ালি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে,—ছেঁড়ার ফাঁকে পায়ের আঙ্গুল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আমার চলারও বিরাম নাই, কোথাও দু'চারি মিনিট দাঁড়াইয়া যে জুতা জোড়াটীকে সারাইয়া লইব, তাহার সময়ও হয় না। আমার সেই কর্দ্দমাক্ত অক্লান্ত পদ-দ্বয় যেন নিতান্ত অসময়ের বন্ধুর মত ঐ জুতাজোড়াটীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। আমার মনে পড়িত সেই চল্‌তি কথা,—

"কবিরাজের নিত্যজ্বর,—
ঘরামির ভাঙ্গাঘর" !

শুনিতেছি, আজ আমাকে সকলে "জুতার রাজা" নাম দিয়াছে। তাহারা বোধ হয় জানে না, পৃথিবীর লোকের পায়ের জুতা জোগাইবার ভার লইবার সৌভাগ্য যাহার ভাগ্যে লেখা ছিল,—সেই বাটা এক সময়ে এমনি করিয়া একরকম খালি পায়ে অষ্ট্রিয়ার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

খ্রীষ্ট্‌মাস পর্ব্ব নিকটে আসিতেছিল। আমি খদ্দেরদের বাড়ীতে তাগাদার কার্য্য শেষ করিয়া জিলিনের দিকে রওনা হইলাম। ইতিমধ্যে আমার ভগিনীকে খবর পাঠাইয়াছিলাম, আমার জন্য যেন একজোড়া জুতা তৈয়ারী করাইয়া রাখে। কারণ, খ্রীষ্ট্‌মাসের সময় আর এই ছেঁড়া জুতায় চলিবে না। আমি যেরকম জুতার কথা আমার ভগিনীকে তৈয়ারী করাইবার জন্য বলিয়া ছিলাম, সেই রকম জুতা আমাদের নিজের কারখানায় তৈয়ারী হইত না। যাহা হউক, আমি কোন রকমে ঐ ছেঁড়া জুতা পায়ে দিয়াই হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে চলিতে চলিতে যখন জিলিনে যাইয়া পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, দেখিলাম, সকলে গীর্জ্জায় মধ্য রাত্রির পূজা উৎসবে যোগদান করিবার জন্য যাইতেছে। আমিও তাড়াতাড়ি গীর্জ্জায় উপস্থিত হইলাম। শেষ রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইল। এতদিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিবার সময়, আমার একরাত্রিও ভাল ঘুম হয় নাই। সঙ্গে বিছানাপত্র ছিলনা, থার্ডক্লাস্ রেলগাড়ীর বেঞ্চির উপরে, অথবা রেলষ্টেশনের খোলা প্লাটফর্ম্মে মালপত্রের বস্তার উপর কোন রকমে একটু কাৎ হইয়া কয়েক মিনিটের জন্য চোখ বুজিবার যা কিছু অবসর মিলিত, সেই আমার ঘুম! তাই দীর্ঘকাল পরে বাড়ীতে একটু আরামে শুইয়া ঘুমে একেবারে বিভোর।

ভগিনীর ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ রগড়াইয়া বিছানার পাশে চাহিয়া দেখি, আমার সেই ছেঁড়া জুতা জোড়াটী নাই, তার স্থলে একজোড়া সুন্দর নূতন জুতা! মনটা খুব খুসী হইল, বুঝিলাম, আমার ভগ্নীর এই কাজ! যাহা হউক, আমি হাতমুখ ধুইয়া জুতাজোড়াটী পায়ে দিয়া সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সেদিন খ্রীষ্টমাস উৎসব,—কারখানা ছুটী,—চারি দিকে আনন্দ কোলাহল। আমার ও টাকাকড়ি কিছু আদায় হওয়াতে মনটা বেশ ফুর্ত্তিতে

আছে। আবার বড় লোক ঘেঁসার নেশা চাঙ্গা হইয়া উঠিল। নিকটবর্ত্তী একটা ক্লাবে ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, সেখানে আমার পূর্ব্ব পরিচিত দুই একজন বড়লোক বন্ধুও আসিয়াছেন। আমি সবেমাত্র বিলিয়ার্ড খেলিবার ষ্টীক্‌টা হাতে নিয়াছি, এমন সময় পশ্চাতে কার তীব্র বিদ্রূপের হাসি আমার কাণে আসিয়া পৌঁছিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, আমাদের বাড়ীর সাম্‌নের সেই মুচি আমার পায়ে নূতন জুতার দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিতেছে, "কিহে খুবত বড়লোকী চাল দেখাচ্ছ, এদিকে উহুনে ত হাঁড়ী চড়েনা, জুতাজোড়াটী বেশ পায়ে দেওয়া হয়েছে, জিজ্ঞেস করি, ওর দাম দেবে কে ?" ঘর ভর্‌তি সব বড়লোক। তারা সকলেই ব্যাপারটী বুঝে নিল। আমার ত লজ্জায় মাথা কাটা। সেদিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, দাম না চুকাইয়া দিয়া কোন জিনিস আর ব্যবহার করিব না।

(ক্রমশঃ)
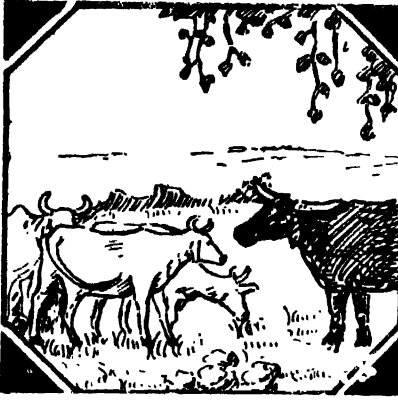
আমাদের পশু পালন সমস্যা

ভারতবর্ষের জনসংখ্যাই যে অত্যধিক তা' নয়, জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার অকর্মণ্য পশুর সংখ্যাও অত্যধিক। ভারতের সম্পদের তুলনায় তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির বহর দেখে অনেকে এই আশঙ্কা পোষণ করেছেন যে, তার এবার খাদ্যাভাব ঘটবে, দেশের পশুসংখ্যা সম্পর্কে সে আশঙ্কা বহুদিনই প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দেশে বহুকাল থেকেই যে পশুদের খাদ্যাভাব ঘটেছে, এ তথ্যটা বোঝাবার জন্য মোটেই আর তর্কের অবতারণা করতে হবে না। পশুদিগের অপুষ্ট চেহারা ও কঙ্কালসার দেহই জোর গলায় সাক্ষ্য দেবে যে তাদের আহার সংগ্রহ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অবশ্য এর প্রধান কারণ আমাদের আর্থিক দরিদ্রতা। একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, আমরা যদি এরূপ দরিদ্র না হ'তাম তাহ'লে পশুদিগের ঐ রকম শোচনীয় অবস্থা ঘটত না। একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশে যে লোকের চাষের জমি যত কম থাকে পশুসংখ্যা তার তত বেশী হয়। আবার যে লোকের চাষের জমি যত বেশী থাকে, পশুসংখ্যাও তার তত কম হয়। জনসংখ্যার ক্ষেত্রেও ঠিক এই উল্টাপাল্টা তথ্যটি প্রযোজ্য, যদিও সেটা শুধু আমাদের দেশে নয়, সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া। সারা দুনিয়ার জনসংখ্যার হিসাব নিকাশ থেকে ওয়াকিবহালরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, একান্ত গরীবদেরই সন্তান সংখ্যা বেশী এবং যাদের যত অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থা দেখা যায় তাদের সন্তান সংখ্যাও তত কম হয়। পৃথিবীর মানুষদের ওপর এই ব্যাপারটা যেন এক অভিশাপের মত বিরাজ করছে। যার অন্নের সংস্থান নেই, মা-ষষ্ঠীর কৃপা অজস্র তার ওপর বর্ষিত হচ্ছে! আশ্চর্য! যে নিজে খেতে পায় না তার ওপর দায়িত্ব পড়ছে আরও দশজনের প্রতিপালনের। অভিনব সামাজিক আবেষ্টনী সন্দেহ নেই!

আমাদের পশু পালনের ক্ষেত্রেও ঠিক এই জিনিসটা ঘটেছে যদিও বিশ্বের অন্য কোন যায়গায় এ-রকমটি ঘটেনি। আমাদের চাষীদের পশুপালনের সংস্থান যার যত কম, সে তত

বেশী পশু রক্ষা করে। আর সেই জন্যই আমাদের পশুদিগের অবস্থা এমন শোচনীয় আকার ধারণ করেছে।

বাংলার গরু এত কম দুধ দেয় যে, অপর কোথাও তা' দেখা যায় না। বাংলার গরু-বলদের আকৃতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে আসছে, বাংলার গরু মোটেই খেতে পাচ্ছে না—এসমস্ত বিষয় আমাদের কিছুমাত্র নজরে আসে না। এবং এইজন্যই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গৃহপালিত পশুর অধিকারী হয়েও আমরা মোটেই লাভবান হচ্ছি না।

কি করেই বা হ'ব? সংখ্যাটাই ত সকল যায়গায় সব নয়, লাভ-লোকসানের মধ্যে গুণটাকেও ধরতে হ'বে। কোন স্থানে যদি দশটি গরু থাকে এবং প্রত্যেকে এক সের করে দুধ দেয় এবং অপর কোন স্থানে যদি দু'টি মাত্র গরু থাকে এবং প্রত্যেকে দশ সের করে দুগ্ধ প্রদান করে, তবে শুধুমাত্র সংখ্যার জোরেই প্রথমোক্ত গরুগুলির দ্বারা লাভবান্ হওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের দেশের লোকেরা যে বেশী করে গরু পোষে তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, কেননা, আমাদের বাংলা দেশের গরুই সবচেয়ে কম দুধ দেয়। খরচের দিক দিয়ে দেখলে এতে করে আমরা বেশী মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হই, যেহেতু অধিক সংখ্যক গরুকে খেতে দিতে আমাদের বেশী খরচই পড়ে। কিন্তু তার জবাবে কেউ কেউ বলতে পারেন যে, আমাদের পল্লীগ্রামের লোকেরা যে গরু পোষে তাতে তাদের খেতে দিতে হয় না; গরু আপনি চরে খেয়ে আসে। ভাল কথা, গরু যদি আপনি চরে খাদ্য সংগ্রহ করে নেয় ত তার চেয়ে আর্থিক লাভের বিষয় আর কিছু নেই। কিন্তু তা' যদি হ'বে ত পল্লীগ্রামের বাংলা গাই-গরু অত কম দুধ দেয় কেন? পল্লীগ্রামের ঐ হাড়-জিরজিরে দেশী গরুগুলির বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে আমরা শুধু নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হই না, বাংলার ভবিষ্যৎ গো-ধনের সর্ব্বনাশ সাধন করি।

সুতরাং আমাদের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য রাখতে হ'বে যাতে রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য গরুগুলি বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে তার স্থলে হৃষ্টপুষ্ট দুগ্ধবতী গাভী বৃদ্ধি পায়। কথায় বলে কাণা গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল, অনর্থক অকর্ম্মণ্য গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে আমাদের কী লাভ দেবে? সবাই চায় আর্থিক দিক দিয়ে সাশ্রয় খুঁজে কম খরচে বেশী কল্যাণকর ফল লাভ করতে, রুগ্ন গরুর দ্বারা সেটা যে সম্ভব হ'বে না এটা একেবারে সুনিশ্চিত। তা'ছাড়া ঐ রকম রুগ্ন গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে ভাল গরু প্রাপ্ত হওয়ার আশা একেবারে দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে। সেধারে আমাদের লক্ষ্য রাখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

অথচ আমাদের গোধন ও অপরাপর পশু সম্পদ যদি ঠিক ভাবে বর্দ্ধিত হয় ত আমরা প্রচুর লাভের অধিকারী হ'তে পারি। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে, পশু সম্পদে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়। আমাদের পাবলিক ইন্‌ফরমেশনের ডিরেক্টর মহোদয় প্রেসে বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"ভারতের আনুমানিক পশু সম্পদের বাৎসরিক মূল্য হ'ল ২০০০কোটি টাকা। এ অঙ্কের হিসাবটা অবিশ্বাস্য মনে হ'তে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগতের সমস্ত দেশের চেয়ে ভারতের পশু-সম্পদ অনেক বেশী।" ভারতের পশুসংখ্যা ত্রিশ কোটিরও অধিক অর্থাৎ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশুসংখ্যার তুলনায় প্রায় ডবল।

এর থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ বিশাল সম্পদ যদি ভাল ভাবে যত্নের সহিত বর্দ্ধিত হয় ত দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দূরীকরণ করতে তা' অনেকাংশে সাহায্য করতে পারে। সুতরাং সরকারের দিক থেকে এধারে প্রচেষ্টা চালানো কর্ত্তব্য। সরকারী কার্য্যানুযায়ী মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'বার পর থেকে পশুপালনব্যাপারটি কৃষিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে হস্তান্তরিত বিভাগের মধ্যে পরিগণিত হয় এবং অনেকাংশে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসে। পশুপালন সম্পর্কে তথ্যাদি, রক্ষণাবেক্ষণ ও গবেষণার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারাল্ রিসার্চ্চ। উক্ত প্রতিষ্ঠান কাগজে কলমেই পরীক্ষা ও গবেষণা চালান, জনসাধারণের সঙ্গে তার সংযোগ মোটেই নেই এবং সেইজন্যই আমাদের পশু-সম্পদের মোটেই উন্নতি ঘটে না, বরং অবনতি দেখা দেয়।

পশুপালন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, তাদের রোগ সম্পর্কে ও পুষ্টি সম্পর্কে গবেষণা। রোগ যে অকাল মৃত্যুর কারণ একথা সবাই জানে এবং সেইজন্য কি করে পশুদিগের রোগকে প্রতিহত করা যায় পশুপালন ব্যাপারে সেটাই সর্ব্বাগ্রে জানা কর্ত্তব্য। পুষ্টির উপায় সম্পর্কেও জেনে রাখা দরকার এই জন্য যে হৃষ্টপুষ্ট পশু আর্থিক দিক দিয়ে বেশী লাভের। একটি রোগা পশুর চেয়ে একটি স্বাস্থ্যসম্পন্ন পশু বেশী দুধ দেয় কিংবা তার মাংস বিক্রী করে বেশী টাকা পাওয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে যে, দেশী হাড়জিরজিরে গরুদেরই যদি ভালভাবে খেতে দেওয়া যায় ত তাদের দুগ্ধ শতকরা পঞ্চাশভাগ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পুষ্টি জিনিসটা কোনমতেই অবহেলার ব্যাপার নয়। রোগ নিবারণকল্পে টীকা প্রদানের বন্দোবস্ত খুবই সমীচীন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গতানুগতিক পল্লী লোকেরা মানুষের টীকা নেওয়ার ব্যাপারেই তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে, সুতরাং রক্ষিত পশুদিগকে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থায় তারা যে তারস্বরে প্রতিবাদ জানাবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। উন্নততর পশু সৃষ্টি মানসে গতানুগতিক বর্জ্জিত বৈজ্ঞানিক প্রজনন-ক্রিয়ারও তারা ঘোরতর বিরোধী। এক কথায় পশুদিগের উন্নতি মানসে সমস্ত উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তনেই তারা বাধা দেয় এবং সেই সম্প্রদায়ই হ'ল শতকরা নিরানব্বই জন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে যে, পশু সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি মানসে যে সমস্ত সরকারী প্রচেষ্টা চালানো হয়, তার সঙ্গে ঐ শতকরা নিরানব্বই জনের কোনই সংযোগ নেই। গভর্ণমেণ্টের এসম্পর্কে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রি-কালচারাল্ রিসার্চ্চ আছে, ভেটারিনারী রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, এ্যানিম্যাল ও নিউট্রিসন রিসার্চ্চ আছে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তারা সব নিজেদের প্রতিষ্ঠানগত পরীক্ষাকেন্দ্রে এ সম্পর্কে যে গবেষণা চালান, সে-সমস্ত পরীক্ষা ও গবেষণার ফল তারা ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন, আর সে-সমস্ত সরকারী দপ্তরে চাপা থাকে। কচিৎ কখনো হয়ত দু'একটা সরকারী বুলেটিন্ প্রকাশিত হয় কিন্তু তারও ভাষা ইংরেজী হওয়ার দরুণ সরকারী কর্ম্মচারী ও সরকার-ঘেঁষা লোকেদের মধ্যেই তা' বিতরিত হয়। অথচ যাদের জন্য সে-সমস্ত দরকার, সেই

শতকরা নিরানব্বই জন এ-সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না—তারা যে অন্ধকারে ঠিক সেই অন্ধকারেই থেকে যায়।

এইখানেই হচ্ছে ব্যবস্থার পরিহাস! সরকারী টাকা এসম্পর্কে যথেষ্ট খরচ হয়, হোম্‌রা চোমরা এক্স্‌পার্টও বহু আসেন—কিন্তু আসল কাজের বেলায় কিছুই এগোয় না। অথচ সরকার ত তাঁদের পরীক্ষালব্ধ বিষয় নিয়ে দেশীয় ভাষায় প্রচার কার্য্য চালাতে পারেন। তাঁরা ত বেশ জানেন যে, ইংরাজী ভাষায় কোন জিনিস লিপিবদ্ধ করলে জনসাধারণ তার কিছুই বুঝবে না, তবুও তাঁরা কেন সে-প্রচেষ্টা থেকে ক্ষান্ত হ'ন না?

আমরা জোরের সহিত বলতে পারি যে, গভর্ণমেণ্টের এগ্রিকাল্‌চারাল্‌ ডিপার্টমেণ্ট্‌ থেকে যে সমস্ত বুলেটিন বা নব নব পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়, সাধারণ লোকে বা চাষীরা তার এক বর্ণও জানতে পারে না। অথচ সেই সমস্ত

সংবাদ বা বুলেটিন তাদের জানাবার জন্যই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। বুলেটিন্‌গুলি তাদের হাতে না পড়ে যদি কেবল সরকারী কর্ম্মচারী ও ওয়াকিবহাল ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়ে তবে কি সুফল আশা করা যায়? যারা সাধারণ লোক তারা অজ্ঞ, পশুপালন সম্পর্কে তাদের কোন বৈজ্ঞানিক ধারণা নেই এবং এই জন্যই প্রচলিত প্রথাকে অতিক্রম করে কোন নতুন উন্নততর প্রণালী অবলম্বন করতে তারা চায় না। সুতরাং তাদের জ্ঞানের জন্য, তাদের শিক্ষার জন্য, তাদের অবগতির জন্যই গভর্ণমেণ্টের জোর প্রচার কার্য্য চালানো উচিত।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই প্রচারকার্য্য চালাবার গভর্ণমেণ্টের টাকা কোথায়? কিন্তু এর জবাবে বলা চলে যে, গভর্ণমেণ্ট্‌ অপরাপর অপ্রধান ও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে প্রচার কার্য্য চালাবার টাকা কোথা থেকে পান্‌? অথচ প্রজাদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা করবার সময়ই যত টাকার অভাব দেখা যায়! এ কি রকম বিধি?

অথচ এটা নিছক সত্য যে, সাধারণ অজ্ঞ লোক ও চাষীদের পশু পালন বিষয়ে সকল কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিলে এবং তারা উন্নততর প্রণালী গ্রহণ করার ওপরই সকল কিছু নির্ভর করছে, কেননা, তারাই হ'ল দেশের আসল জনসাধারণ, সংখ্যায় গরিষ্ঠ। তারা যতই অজ্ঞ হোক না কেন, তাদের যদি একটা জিনিষ প্রচার কার্য্যের দ্বারা মনে ধরিয়ে দেওয়া যায় ত তারা সেটা গ্রহণ করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে 'টি সেস্‌ কমিটী'র প্রচার কার্য্য। কি রকম অবিশ্রান্ত প্রচার কার্য্যের দ্বারা কৃষকদের মনে চায়ের নেশা ঢুকিয়ে দিয়েছে, সেটা একটা লক্ষ্য করবার বিষয়। যে সমস্ত পাড়াগাঁয়ের লোক কখনও রেলগাড়ী দেখেনি, সহরে আসেনি, যাদের চৌদ্দ পুরুষেও কখনো চায়ের নাম গন্ধ জানত না, তারা আজ চায়ের নাম শুনলেই একেবারে অজ্ঞান! চা না হলে তাদের একদিনও চলে না, চায়ের নেশা আফিং-এর মত তাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে। এই যে পল্লীবাসী নিরক্ষর চাষীদেরও চা পায়ী করে তোলা হ'ল এ ত কোন অসম্ভব যাদুমন্ত্রের দ্বারা সম্ভব হয় নি। সম্ভব হয়েছে কেবল কার্য্যকরী প্রচার মহিমার গুণে। পয়সা খরচ করে নেশাখোর করবার ক্ষেত্রে যে জিনিষটা সম্ভব হয়, বিনা পয়সায় কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে কেন সেটা সম্ভব হ'বে না? গভর্ণমেণ্ট একবার প্রচার কার্য্য চালিয়ে দেখুন না কেন উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় কি, না?

(ক্রমশঃ)

মার্ব্বেল পাথরের সঙ্গে কাঠ কিম্বা লোহা জুড়িবার প্রণালীঃ—(১) মার্ব্বেল পাথরখানিকে খুব গরম করিয়া উহার পালিশের দিকটা নীচে রাখিয়া পাথর খানিকে সমতল ভাবে একখানা পরিষ্কার টেবিলের উপরে রাখুন। একখানা পশমী কাপড় টেবিলের উপর পাতিয়া তাহার উপর মার্ব্বল পাথরখানি রাখিলে আরও ভাল হয়, কারণ, তাহাতে পাথরের পালিশ নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। এখন পাথরখানির উল্টা পিঠে, অর্থাৎ যে দিকে পালিশ নাই, সেই দিকে খুব গরম পাতলা শিরীষ আঠা লাগান। তার উপরে প্যারিস্ প্লাষ্টার চূর্ণ ছড়াইয়া একখানি শক্ত চ্যাপ্টা মুখ কাঠি (স্প্যাচুলা, Spatula) দিয়া উহাকে শিরিষের সহিত বেশ ভালরূপ মিশাইয়া দিন। ইহা নরম থাকিতে থাকিতে ফ্রেমের কাঠখানিকে বসাইয়া খুব জোরে চাপিয়া লাগাইয়া দিবেন। লাগাইবার পূর্ব্বে ফ্রেমের কাঠ খানিকেও গরম করিয়া লইবেন। ফ্রেমের সহিত পাথর-খানিকে জোর চাপে দুইদিন যাবৎ রাখিবেন। দুইদিন পরে দেখিবেন, উহা শক্ত হইয়া আঁটিয়া গিয়াছে।

(২) ফ্লাওয়ার অব সালফার ১ ভাগ
(Flower of Sulphur)

হাইড্রো ক্লোরেট অব্ য়্যামোনিয়া ২ "
(Hydro Chlorate of Ammonia)

লৌহচূর্ণ (রেতি-ঘষা) ১৬ "
(Iron filings)

এই মশলাগুলি মিহি-গুঁড়া করিয়া একটী বোতলে ভালরূপে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিবেন। পাথর জুড়িবার সময় ২০ ভাগ লৌহচূর্ণর সহিত এক ভাগ এই বোতলের পাউডার আন্দাজমত জলে মিশাইয়া লেইয়ের মত করিয়া লইবেন। এই আঠা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লাগাইয়া ২০ দিন পর্য্যন্ত চাপে রাখিয়া দিবেন। ২০ দিন পরে দেখিবেন, ফ্রেমখানি পাথরের সহিত একেবারে লোহার মত আঁটিয়া গিয়াছে।

(৩) ভিনিগার অর্দ্ধ পাইন্ট
সর-তোলা দুধ অর্দ্ধ পাইন্ট
৫টী ডিমের শ্বেতাংশ
আন্দাজমত চুণের গুঁড়া

প্রথমতঃ সর-তোলা দুধের সহিত ভিনিগার মিশাইবেন। তার-পর উহার সহিত ৫টী ডিমের শ্বেতাংশ খুব ভাল করিয়া ফেটাইয়া মিশাইয়া লইবেন। সর্ব্বশেষ আন্দাজ মত চুনের গুঁড়া মিশাইলেই আঠাপ্রস্তত হইবে। এই আঠা জলে বা অল্প উত্তাপে নষ্ট হয় না।

(৪) মার্ব্বেল পাথরের সঙ্গে লোহা জুড়িবার আঠা,—

প্যারিস প্লাষ্টার	৬০ ভাগ
লৌহচূর্ণ (রেতি-ঘষা)	২০ ভাগ
নিশাদল	১ ভাগ

আন্দাজমত ভিনিগার

বেলে পাথর (Sand Stone) জুড়িবার মশলা

(১) গন্ধক	১ ভাগ
রোজিন (Rosin)	১ "
লিথার্জ্জ (Litharge)	৩ "
কাচ চূর্ণ (Ground Glass)	২ "

প্রথমতঃ গন্ধক ও রোজিন পৃথক পাত্রে গলাইয়া লউন। আর একটী পাত্রে লিথার্জ্জ ও কাচ চূর্ণ শুষ্ক অবস্থায় খুব মিহি চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করুন। তারপর এই দুইটী পাত্রের মশলা ভালরূপে মিশাইয়া লউন।

(২) পিচ	১০ ভাগ
মোম	১ "
ইষ্টক চূর্ণ	২ "

যে পাথরের টুক্‌রা জুড়িতে হইবে, অথবা যে পাথরের ফাটলের মধ্যে এই মশলা ঢালিয়া পুরিয়া দিতে হইবে, সেই পাথর খানি একেবারে শুষ্ক হওয়া চাই, এমন কি সম্ভব হইলে তাহাকে গরম করিয়া লওয়া উচিত এবং যার উপরে আঠা লাগাইবেন, সেই জায়গাতে দু'তিন কোট তেল বার্ণিশ লাগাইবেন এই আঠা খুব শক্ত হইয়া লাগিয়া যায়। যদি পাথরের জিনিসটা রৌদ্রে বৃষ্টিতে ঠাণ্ডায় অথবা খোলা বাতাসে পড়িয়া থাকে. তাহা হইলেও এই আঠা কিছুতেই নষ্ট হইবেনা।

কাচের সহিত নানা প্রকার জিনিস জুড়িবার আঠা ঃ—

(১) রোজিন (Rosin) ১ ভাগ
হলদে রঙের মোম ২ ভাগ
এই দুইটী মশলা একসঙ্গে গলাইয়া মিশাইলে তাহার দ্বারা কাচের উপরে কোন জিনিস লাগান যায়।

(২) কাচের উপরে তামা লাগাইবার আঠা ;—

কষ্টিক সোডা (Caustic Soda)	১ ভাগ
কলফনি (Colophony)	৩ ,,
জল	৫ ,,
প্যারিস প্লাষ্টার	৫ ,,

প্রথমে কষ্টিক সোডা কলফনির জলে গরম করিয়া লইবেন। তারপর উহার সহিত প্যারিস প্লাষ্টার মিশাইবেন। এই আঠা জল, উত্তাপ অথবা পেট্রোল লাগিয়া নষ্ট হয় না। প্যারিস প্লাষ্টারের পরিবর্ত্তে জিঙ্ক হোয়াইট (Zinc White), হোয়াইট লেড্ (White Lead) অথবা চুণ ব্যবহার করিলে আঠা আরও ধীরে ধীরে শক্ত হয়। সুতরাং খুব তাড়াতাড়ি না লাগাইলেও চলে।

(৩) কাচের উপর পিতল লাগাইবার আঠা ;—

কষ্টিক সোডা	১ ভাগ
রোজিন	৩ ,,
জিপসাম (Gypsum)	৩ ভাগ
জল	৫ ,,

প্রত্যেকটী উপকরণ খুব মিহিচুর্ণ করিয়া জলে ফুটাইয়া লইবেন। গরম করিবার সময় সর্ব্বদা খুব নাড়িবেন। এই আঠা আধ ঘণ্টার মধ্যেই শক্ত হইয়া যায়। সুতরাং খুব তাড়াতাড়ি লাগাইতে হয়।

(৪) কাচের সহিত শিং এর জিনিস জুড়িবার আঠা ;—

জিল্যাটিন	১২ ভাগ
জল	১২০ ,,
ম্যাষ্টিক (গঁদ)	২ ,,
স্পিরিট	৩ ,,
জিঙ্ক হোয়াইট	আন্দাজমত

প্রথমতঃ জিল্যাটিনকে জলের মধ্যে ভিজাইয়া নরম ও তরল করিয়া লউন; ইহার জল শোবাইয়া আয়তন এক ষষ্ঠাংশ করিয়া লইবেন। আর একটী পাত্রে স্পিরিটের মধ্যে ম্যাষ্টিক গঁদ গলাইবেন। এই তরল ম্যাষ্টিক গঁদ জিল্যাটিনের সহিত মিশ্রিত করুন। তারপর উহার সহিত জিঙ্ক হোয়াইট মিশাইয়া খুব নাড়িয়া চাড়িয়া লউন। এই আঠা গরম করিয়া লাগাইতে হয়। ইহা অল্প সময়েই শুকাইয়া যায়। একবার তৈয়ারী করিয়া অনেকদিন যাবৎ রাখিয়া দেওয়া চলে।

(৫) কাচের সহিত লোহা জুড়িবার আঠা

(ক) রোজিন Rosin	৫ আউন্স
হলদে মোম	১ আউন্স
ভিনীসিয়ান রেড (Venetian Red)	১ ,,

ফুটন্ত জলের উপর চড়াইয়া মোম ও রোজিন গলাইয়া লউন। গলাইবার সময় খুব নাড়াচাড়া করিবেন। তারপর ইহার সহিত ভিনীসিয়ান রেড মিশাইবেন। মিশাইবার পূর্ব্বে ভিনীসিয়ান রেডকে খুব ভালরূপে শুকাইয়া লইবেন। মশলাটী ঠাণ্ডা না হওয়া পর্য্যন্ত হরদম নাড়িতে থাকিবেন; নচেৎ ভিনীসিয়ান রেড তলানির মত নীচে পড়িয়া জমিয়া যাইবে।

(খ) পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট ২ আউন্স
তৈয়ারী করা খড়িমাটী ১ ,,
মিহি বালি ১ ,,
সোডিয়াম সিলিকেট আন্দাজমত
(Sodium Silicate)

(গ) লিথার্জ্জ (Litharge) ২ ভাগ
হোয়াইট লেড (White lead) ১ ,,
তিসির তেল (শুষ্ক ও সিদ্ধ করা) ৩ ,,
কোপ্যাল ভার্ণিশ ১ ভাগ

সেলুলয়েডের জিনিস জুড়িবার আঠা

(১) য়্যালকহল (Alcohol) ৩ ভাগ
ঈথার (Ether) ৪ ,,

এই দুইটী মশলা মিশাইয়া ভাঙ্গা সেলুলয়েডের জিনিসটার ধারে একটা বুরুশ দিয়া মাখাইবেন। যখন দেখিবেন ধারটা একটু গরম হইয়া উঠিয়াছে তখন উহাকে পাশাপাশি জুড়িয়া টিপিয়া লাগাইয়া দিবেন। ২৪ ঘণ্টা পরে শুকাইয়া গেলে দেখিবেন, বেশ শক্ত হইয়া আঁটিয়া গিয়াছে।

(২) কর্পূর ১ ভাগ
য়্যালকহল ৪ ,,
গালা (Shellac) ৫ ,,

প্রথমে য়্যালকহলে কর্পূর গলাইয়া, তারপর উহার সহিত গালা মিশাইবেন।

(৩) যদি সেলুলয়েডকে কাঠ, টিন প্রভৃতির সহিত আঁটিতে হয়, তবে নিম্নলিখিত মশলা ব্যবহার করিবেন ;—

(ক) গালা (Shellac) ২ ভাগ
স্পিরিট অব ক্যাম্ফর ৩ ভাগ
(Spirit of Camphor)
য়্যালকহল (জোরাল)
(Strong Alcohol ৪ ভাগ
অথবা ;—

(খ) গালা (Shellac)— ২ আউন্স
স্পিরিট অব ক্যাম্ফর ২ ,,
য়্যালকহল (৯০%)— ৬ হইতে ৮ আউন্স

(গ) কাচের শিশি বোতলের গায়ে অথবা যে কোন কাচের জিনিসের সহিত সেলুলয়েড্ আঁটিবার নিম্নলিখিত মশলাটী খুব মজবুত। জিলাটিন অথবা শিরীষকে জলে ভিজাইয়া বেশ জোরাল আঠা করুন। একটা অন্ধকার ঘরে উহার সহিত খানিকটা পটাসিয়াম বাইক্রোমেট্ সলিউসান (ঘন ও জোরাল ;—Strong, Concentrated) মিশান। সেলুলয়েডের লেবেল অথবা জিনিসটার পেছনের দিকটা খুব পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ঐ আঠা মাখাইয়া বোতলের গায়ে খুব চাপিয়া লাগান এবং জড়াইয়া কসিয়া বাঁধিয়া রাখুন অথবা অন্যকোন উপায়ে দু'টীতে আঁটিয়া রাখুন। সূর্য্যের আলোকে কয়েক ঘণ্টা উহাকে রাখিয়া দিলে দেখিবেন খুব শক্ত হইয়া আঁটিয়া গিয়াছে।

(খ) চুণ ২ আউন্স
ডিমের শ্বেতাংশ ৫ আউন্স
প্যারিস্ প্লাষ্টার ১১ আউন্স
জল (তরলদ্রব্যমাপের) ২ আউন্স

প্রথমতঃ চুণকে মিহি গুঁড়া করিয়া লউন। ইহার সহিত ডিমের শ্বেতাংশ মিশাইয়া লেইয়ের মত করুন। তারপর জল মিশাইয়া একটু পাতলা করিয়া লউন। তখনি প্যারিস প্লাষ্টার খুব তাড়াতাড়ি উহার সহিত মিশান এবং দেরী না করিয়া তখনি আঠাটী ব্যবহার করিবেন। জিনিস দুইটীর জোড়ের দিকটা একটু জলে ভিজাইয়া লইবেন। জোড়া হইলে উহাকে চাপের উপর অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা রাখিয়া দিবেন।
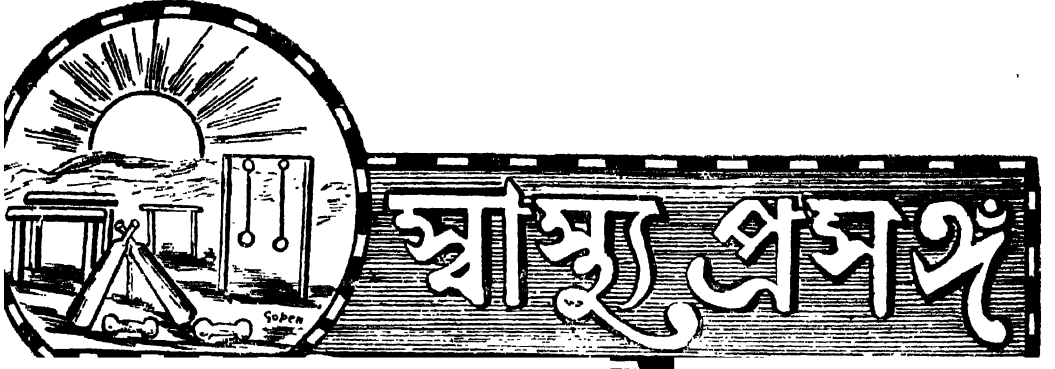
সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের কার্য্যকলাপ

আমাদের দেশে স্বাস্থ্য সম্পর্কে কী রকম সরকারী প্রচেষ্টা চালানো হয়, সে বিষয়ে সাধারণের একটা কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। সে সম্পর্কে 'পাব্‌লিক্ হেল্‌থ্ সার্‌ভিসেস্'এর রিপোর্ট থেকে আমরা খানিকটা বিবরণী নিম্নে তুলে দিলাম :—

ভারতবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটা ধারণা গঠিত হ'তে সুরু হয়েছে। এসম্পর্কে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ হ'তে গত ১০।১২ বছর ধরে যে প্রোপাগাণ্ডা চালানো হয়েছিল আজ তার ফল ফলতে সুরু হয়েছে বোধ হয়। পল্লী-সংস্কার, জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি, শিশু পালন, রোগ নিবারণের উপায় প্রভৃতি ব্যাপারগুলি সম্পর্কে সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা সুলক্ষণ বলতে হ'বে। একথা সত্যি যে, শিক্ষার বিস্তার না ঘটলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞানেরও বিস্তার ঘটে না, কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত যে, সাধারণ জ্ঞান স্বাস্থ্য সম্পর্কে সুব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।

পাবলিক্ হেলথ সার্‌ভিসেস্ সম্পর্কে ১৯৩৪ সালে ভারত গবর্ণমেণ্টের মোট খরচ হয়েছিল সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে চার লক্ষ টাকার কিছু বেশী পাবলিক্ হেল্‌থ সংক্রান্ত 'এস্‌ট্যাবলিস্‌মেণ্ট' খরচে, সাড়ে চার লক্ষ টাকা পাবলিক্ হেল্‌থ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকে সাহায্যে কল্পে, ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বিভিন্ন সংক্রামক রোগ নিবারণ কল্পে, দু'লক্ষ টাকা বীজাণু পরীক্ষাগারে, ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা অপরাপর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ব্যাপারে এবং দু'হাজার টাকা পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের সাহায্যকল্পে ব্যয়িত হয়েছে।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহের মোট ব্যয় প্রায় দেড় কোটি টাকা। তন্মধ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা এতৎসংক্রান্ত এস্‌ট্যাবলিস্‌-মেণ্ট খরচায়, সাড়ে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানাদিতে সাহায্যকল্পে, সাড়ে সতেরো লক্ষ টাকা সংক্রামক রোগ নিবারণকল্পে, ৮ লক্ষ টাকার কিছু বেশী জীবাণু পরীক্ষাগারে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা পাস্তুর ইনিষ্টিটিউটে এবং

সাড়ে দশ লক্ষ টাকা অপরাপর স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় কাজে ব্যয়িত হয়েছে।

বিভিন্ন প্রদেশে এ ব্যাপারে কত টাকা খরচ হয়েছে নিম্নে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

প্রদেশ	টাকা
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১,৩১,৯০০
পাঞ্জাব	১০,২৯,৩৯১
যুক্তপ্রদেশ	২০,৪৪,০৬৯
বিহার উড়িষ্যা	৯,৯৬,১৪৬
বাংলা	৩৬,০১,২৪১
মধ্যপ্রদেশ	৩,৫১,৩০৩
বোম্বাই	২৬,০৫,৭৫৩
মাদ্রাজ	২১.৭১,৬৯৭
কুর্গ	৭,২২৪
আসাম	৬,৬৮,৮১২
ব্রহ্মদেশ	৮,৭৯,০৮৭

কোন্ কোন্ প্রদেশে স্বাস্থ্য সম্পর্কে কি রকম কাজ হয়েছে নিম্নে তার চুম্বক দেওয়া গেল :—

যুক্তপ্রদেশ

এ প্রদেশের ৪৮টি জেলার মধ্যে মাত্র দশটি জেলায় 'স্বাস্থ্য পরিকল্পনা' প্রবর্ত্তিত ছিল। ঐ পরিকল্পনানুযায়ী গ্রামের কাজের মধ্যে পল্লী-সাহায্য পরিকল্পনা, পল্লীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে সাধারণভাবে স্বাস্থ্যকর্ম্মচারী নিয়োগ, পল্লীসংস্কার প্রচেষ্টা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পল্লী-সাহায্য পরিকল্পনার মধ্যে গ্রামে গ্রামে চিকিৎসালয় স্থাপন, প্রাথমিক সাহায্যকারী গড়ে তোলা এবং সাধারণভাবে পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নতিই প্রধান। উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী ১৮০৮টি গ্রামে সম্পূর্ণভাবে এবং ৫,০৩৬টি গ্রামে আংশিকভাবে কার্য্য চলেছিল। ঐ সমস্ত গ্রামগুলিতে চিকিৎসালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ৩,৩৭৮; ভারতীয় রেড্ ক্রশ সমিতির প্রাদেশিক শাখা ঐ সমস্ত চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন। সর্ব্বক্ষণের জন্য পাবলিক্ হেল্থ এর কার্য্যের তরে কর্ম্মচারী নিয়োগ করবার যে স্কীম, তা কেবল গোরক্ষপুর জেলাতেই কার্য্যকরী হয়েছিল, জেলাবোর্ডই তার খরচ নির্ব্বাহের ভার নিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত টাকা থেকে গুটি কয়েক গ্রামে গ্রামোন্নতির নানারকম পরিকল্পনা কার্য্যকরী করবার চেষ্টা হয়েছিল।

বাংলা

বাংলাদেশে "ডিষ্ট্রিক্ট হেল্থ স্কীমে"র কার্য্য ২৫টি জেলায় পরিব্যাপ্ত ছিল। ঐ সমস্ত জেলাগুলির আবার ৫৭৫টি "গ্রাম্য স্বাস্থ্য পল্লী"তে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক পল্লীতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হেল্থ ইনস্পেক্টর নিযুক্ত ছিলেন। কোন কোন ইনস্পেক্টর্-এর অধীনে আবার সহকারীও কাজ করতেন। স্বাস্থ্যোন্নতি সংক্রান্ত কার্য্যাবলীর মধ্যে বিভিন্ন যায়গার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন বাবদে ৩৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের শতকরা ১৭ ভাগ টাকা ব্যয়িত হয়েছিল। অবশিষ্ট খরচগুলির মধ্যে জলসরবরাহ বাবদে ৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট খরচের শতকরা ৩ ভাগ, গৃহনির্ম্মাণাদি বাবদে তিন লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট খরচের শতকরা প্রায় ২ ভাগ, স্বাস্থ্যরক্ষা বাবদে সাড়ে সতেরো লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট খরচের শতকরা ৯ ভাগ, টাকা প্রদানাদি বাবদে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট খরচের শতকরা ১ ভাগ এবং ড্রেনের ব্যবস্থা বাবদে ৩০ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট খরচের শতকরা ০·১ ভাগ ব্যয়িত হয়েছিল।

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন এ্যাক্টানুযায়ী বাংলাদেশে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির সংখ্যা হচ্ছে ৪,৭৪০। তারা রাস্তা নির্ম্মাণ ও মেরামত বাবদে প্রায় সওয়া ছয় লক্ষ টাকা অর্থাৎ তাদের মোট আয়ের শতকরা ৭ ভাগ, জলসরবরাহ বাবদে ৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট আয়ের শতকরা প্রায় ৭ ভাগ, ড্রেন্ ইত্যাদি বাবদে ৬৮ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট আয়ের শতকরা ১ ভাগ, চিকিৎসালয় ইত্যাদি বাবদে ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট আয়ের শতকরা ২ ভাগ ব্যয় করেছিল;

স্কুল ও কলেজ সমূহে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকার প্রত্যেক স্কুলে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দেবার এবং ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবার উপর

বিশেষ জোর দেন, এবং এতদুদ্দেশ্যে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। ধরতে গেলে সেদিন থেকেই সমস্ত স্কুলে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী ও পাঞ্জাব প্রদেশে স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্য্যের উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাই হয়েছে, তাদের স্বাস্থ্যের ত্রুটিগুলি দূর করবার জন্য কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি। এ সমস্ত কার্য্যগুলি প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ ও চিকিৎসা বিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত হ'য়ে থাকে। উক্ত বিভাগগুলির মধ্যে যদিও সহযোগিতার কোন অভাব নেই, তবুও একটা সম্মিলিত কার্য্যপদ্ধতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে কতকগুলি প্রদেশ সম্পর্কে খানিকটা তথ্য দেওয়া গেল।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জুলাই ১৯৩৩ থেকে জুন ১৯৩৭ পর্য্যন্ত ৪৩ হাজার ছেলের স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হয়েছিল। তন্মধ্যে দেখা গেল যে, শতকরা ১৪ টিরও অধিক ছেলে নিতান্ত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, শতকরা ১৫টির দন্তরোগ আছে, শতকরা ১০ টির চোখের রোগ আছে, শতকরা ছ'জন টন্‌সিল্-বৃদ্ধিতে ভুগছে, শতকরা ৪ জনের দৃষ্টিশক্তির দোষ আছে, শতকরা ৩ জনের কর্ণ, নাসিকা ও গলার রোগ আছে, এবং হাজারকরা ৮ জনের চর্ম্মরোগ আছে। যাদের রোগ ধরা পড়েছিল তাদের মধ্যে শতকরা ৮২ জনের চিকিৎসা এবং ৪,৬২৫ জনের অস্ত্রোপচার হয়েছিল।

স্কুলে কোন চিকিৎসার বন্দোবস্ত থাকে নি, শুধু কয়েকটি স্কুলে প্রাথমিক চিকিৎসার গুটি কয়েক ওষুধ রাখা হয়েছিল। পেশোয়ার এবং বাবুর তিনটি স্কুলে ছেলেদের দ্বিপ্রহরিক আহার দেওয়া হত। ছাত্রদের নিকট প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং বিপদ্ আপদ হতে রক্ষা পাবার উপায় সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

দিল্লী

সমগ্র দিল্লী প্রদেশের ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে জানা গেছল যে, শতকরা দু'জন 'ট্রাকোমা'য় ভুগছে, শতকরা ২১ জনের টন্‌সিল-বৃদ্ধি রোগ আছে, শতকরা ১৫ জনের দৃষ্টিশক্তির গোলমাল দেখা যায়, শতকরা ১০ জন অন্ত্ররোগে ভোগে, শতকরা ৮ জনের ম্যালেরিয়া ও দন্তরোগ আছে এবং শতকরা ১৬ জন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন।

যুক্তপ্রদেশ

যুক্তপ্রদেশের ২৫২ টি স্কুলের ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শতকরা ১৪ জনের দাঁতের রোগ আছে, শতকরা ৪ জনের আছে পায়োরিয়া, শতকরা ১৫ জনের টন্‌সিলের ব্যারাম আছে, শতকরা ৯ জনের চোখের দোষ আছে, শতকরা ১৭ জনের দৃষ্টি শক্তির অভাব, শতকরা দু'জনের ফুস্ফুসের দোষ ও শতকরা ৪ জনের চর্ম্মরোগ আছে এবং শতকরা ৬ জন খর্ব্বাকৃতি লাভ করেছে ও মুখ দিয়ে নিশ্বাস টানছে।

স্কুলে চিকিৎসালয় স্থাপনের স্কীম্

১৯৩৩ সালে হাইজিন্ পাবলিসিটি বুরো কর্ত্তৃক "সেণ্ট্রাল্ স্কুল ডিস্‌পেন্‌সারী" নামে যে

পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল, বেনারস, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও এলাহাবাদে তা' প্রযুক্ত হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার দরুণ অপরাপর ৮টি সহরেও তা প্রযুক্ত হ'বে বলে ঠিক হয়। উক্ত চিকিৎসালয় থেকে প্রায় সাত হাজার শিশু চিকিৎসা গ্রহণ করেছিল।

মোটমাট ৭০০ মেধাবী ছাত্রকে দুধ এবং অঙ্কুরযুক্ত ছোলা বিতরণ করবার ব্যবস্থা ছিল। অপরাপর স্থানে স্কুল বয়েজ্ মেডিক্যাল্ এ্যাসো-সিয়েসন স্থাপিত করে গোরখ্পুরে ৭টি স্কুলে চিকিৎসালয় স্থাপন পূর্ব্বক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সমগ্র যুক্তপ্রদেশে প্রায় চার হাজার প্রাথমিক চিকিৎসালয় চিকিৎসাকার্য্য সম্পন্ন করেছিল। বেনারসে সমগ্র ছাত্রদিগকে তাদের বয়স ও শারীরিক পরিপুষ্টি অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করে প্রতি বিভাগের উপযোগী ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিহার-উড়িষ্যা

বিহার উড়িষ্যার প্রায় দু'হাজার ছাত্রকে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, শতকরা ৪২ জনেরই স্বাস্থ্যের দোষ আছে। বালিকাদের পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, তাদের মধ্যে শতকরা ৭৮ জনেরই স্বাস্থ্য খারাপ। অন্যান্য প্রদেশের ছেলেদের মতই বিহার উড়িষ্যার ছেলেদেরও সেই দাঁতের রোগ, চোখের রোগ, বুকের রোগ প্রভৃতি বিদ্যমান।

বাংলা

বাংলার ১৬১টি স্কুলে মোটমাট ১৭,৬০২ জন ছাত্রকে পরীক্ষা করে দেখা গেছল যে, শতকরা ১৯ জন ভাল করে খেতে পায় না, শতকরা ১৩ জনের উপযুক্ত পরিচ্ছদ নেই, শতকরা ৬ জনের চর্ম্মরোগ, শতকরা ১২ জনের দন্তরোগ, শতকরা তিনজনের নাসিকার রোগ, শতকরা ১১ জনের টন্সিল্-বৃদ্ধি রোগ, শতকরা ৪ জনের অন্ত্র-রোগ, শতকরা ২ জনের ফুস্ফুসের রোগ, শতকরা ১৬ জনের চক্ষুরোগ, শতকরা দু'জনের সংক্রামক রোগ এবং শতকরা ১ জন মূক। উচ্চতা ও ওজনে ছাত্ররা মনুষ্য গঠনোচিত 'ষ্টাণ্ডার্ড'-এর নিম্নে পড়ে রয়েছে।

এছাড়া, গ্রাম্য স্বাস্থ্য পরিদর্শক মহাশয় প্রায় পাঁচ হাজার স্কুলের দেড় লক্ষ ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিলেন। তাতে দেখা গেছে যে প্রায় ৪২ হাজার ছাত্র প্লীহা বৃদ্ধি রোগে ভুগছে।

মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে গড়ে প্রত্যেক মাসে প্রায় একলক্ষ ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেল যে, শতকরা ৩ জনের টীকা নেওয়া ছিল না, শতকরা একজনের প্লীহাবৃদ্ধির রোগ আছে এবং শতকরা ২·৩ জন অপরাপর রোগে ভুগছে।

বোম্বাই

বোম্বাই প্রদেশে স্বাস্থ্য সম্পর্কে স্কুল পরিদর্শন সংক্রান্ত কোন পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু কিছু-দিন পূর্ব্বে সিন্ধুদেশে চার হাজার ছাত্রকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে শতকরা ২৭ জন প্লীহা বৃদ্ধি রোগে ভোগে।

শিল্পকেন্দ্রে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

আমাদের দেশে কার্য্যকরী কারখানার সংখ্যা ৮,৬৫৮, তন্মধ্যে ৪,০২৩ টিতে বরাবর কাজ

চলে। শেষোক্ত কারখানাগুলির মধ্যে শতকরা ৭০ টিই বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত; তার মধ্যে বাংলার ভাগে হচ্ছে ১১৩৯টি বোম্বাই ও মাদ্রাজের ভাগে পড়েছে যথাক্রমে ৮৭১ ও ৭২০টি। মধ্যপ্রদেশ, বর্ম্মা ও আসামে যে সমস্ত কারখানা আছে সেগুলিতে বরাবর একটানা কাজ চলে না।

বাংলা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং বোম্বাই দেশে গৃহ-ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। বোম্বাই প্রদেশের অনেকগুলি কারখানায় বায়ু চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়েছিল এবং ধাতু পালিশ কারখানায় ধূলা দূরীভূত করবার উন্নততর প্রণালী অবলম্বন করার দিকে দৃষ্টি পড়েছিল। বাংলা দেশের বড় কারখানা-গুলিতে বায়ু চলাচল এবং আলো সঞ্চালন ব্যবস্থাব যদিও খানিকটা উন্নতি ঘটেছিল, তবুও যে সমস্ত গৃহে ছোট ছোট কারখানাগুলি অবস্থিত, সেই সমস্ত গৃহগুলিতে হাওয়া আলো একেবারে ঢোকে না বললেই চলে।

উন্নতিমূলক কার্য্যের দিক দিয়ে, প্রত্যেক স্ত্রী-শ্রমিক যখন কাজে যায় তখন তার ছেলে-পুলেদের জন্য একটা আশ্রয় থাকা খুবই প্রয়োজন। কালিকটের একটা কারখানায় ছোট ছেলে মেয়েদের বিনামূল্যে দুধ এবং বার্লি দেওয়া হ'ত এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটি চা-বাগানে অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে ছোট ছেলে মেয়েদের সপ্তাহে সপ্তাহে চাল বিলানো হ'ত। বোম্বাই প্রদেশে 'মেটারনিটি বেনিফিট্ এ্যাক্ট্', প্রসূতি আগারের উন্নতির ব্যবস্থা ও শিশুরক্ষা-গার নির্ম্মাণ প্রভৃতি যে সমস্ত আইন পাস হয়েছে, সেগুলি উল্লেখযোগ্য। বাংলায় এইরূপ উন্নতিমূলক ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলা গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিব অনারেবল শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ

গত ১৯শে জুন তারিখে বগুড়ার নিখিলবঙ্গ প্রজাসম্মেলনে অনারেবল শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম।

বন্ধুগণ,

আপনাদের এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আপনারা যে আমাকে সাদর আহ্বান পাঠাইয়াছেন, সেজন্য আপনাদিগকে আমার সকৃতজ্ঞ ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। জীবিকার্জ্জনের মানদণ্ডে আমি আপনাদেরই একজন নই বটে, কিন্তু আপনাদের সুখদুঃখের পশ্চাতে যে সকল মূল সমস্যা রহিয়াছে, আমি দীর্ঘকাল সে সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছি এবং তাহা লইয়া অনুসন্ধান-আলোচনা করিতে ত্রুটি করি নাই। আমার আন্তরিক বিশ্বাস, আপনারা সেই কারণেই আজ আমাকে আপনাদের মধ্যে ডাকিয়া আনিয়াছেন। জনসাধারণ ও দরিদ্রের সেবা আমাদের জাতীয় সংস্কারে ধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই সংস্কার এবং আমার জাতীয় কল্যাণের কামনা ও আদর্শ আমাকে আপনাদের সমস্যাগুলির আলোচনায় প্রবুদ্ধ করিয়াছে,—যদিও এত দিন আমার কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত সাক্ষাৎভাবে আপনাদের জীবন-ধারার বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না। আমি মনে করি, এবং একথা আমি নানাস্থানে নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছি যে আমাদের জাতীয় কল্যাণ আপনাদের অবস্থার উন্নতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এই মূল সত্যের মর্ম্ম যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, আপনাদের সমস্যাগুলির আলোচনায় সমাজের প্রত্যেক কল্যাণকামীরই স্বাভাবিক অধিকার আছে; কেবল অধিকারই নয়, ইহা তাহাদের মুখ্য কর্ত্তব্য বলিয়াও মনে করিতে হইবে। আজ আমি পুনরায় আপনাদের সুখদুঃখ এবং সমস্যাগুলির আলোচনা করিবার এবং সাক্ষাৎভাবে আপনাদের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিবার সুযোগ পাইয়া সত্যই কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

প্রজা-সম্মেলনে নেতৃত্বের দাবী

ইহার পূর্ব্বেও আমি কয়েকটি জেলার প্রজা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার সম্মান লাভ করিয়াছি। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আপনাদের এই প্রকার আমন্ত্রণের বিরুদ্ধে কতিপয় ব্যক্তির সমালোচনা মুখর হইয়া

উঠিয়াছে, ইঁহারা মনে করেন যে, আমি যখন ব্যক্তিগতভাবে প্রজাসম্প্রদায়ভুক্ত নই, তখন আপনাদের এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ব্যাপার। ইঁহারা ভুলিয়া যান প্রজাসম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও আমি জমিদারও নহি; অথবা হয়ত, উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই ইঁহারা আপনাদের মনে সংশয় সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

স্থায়ীভাবে আমার কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে। যাঁহারা আজ আমার সভাপতিত্ব করিবার সমীচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টিত রহিয়াছেন এবং আপনাদের কল্যাণকামী নিকটতর বন্ধু বলিয়া আত্মঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারাও আমারই মত ঠিক প্রজাসম্প্রদায়ভুক্ত নন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জীবনের প্রথমাবস্থায় আমারই মত ব্যবসা-বাণিজ্যকে স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্ররূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করে নাই বলিয়াই কি তাঁহারা আমা অপেক্ষা আপনাদের অধিকতর শুভানুধ্যায়ী বলিয়া দাবী করিতে চান? বাঙ্গলার প্রজা-সম্প্রদায়ের প্রকৃত কল্যাণপ্রচেষ্টায় তাঁহাদের মত আমারও যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, একথাও কি ইঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে? ইঁহাদের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, আমি আশা করি যে, এই প্রকার বিরুদ্ধ এবং অপকৃষ্ট আন্দোলন আপনাদের মনে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করে নাই এবং আপনারা এই প্রকার নীচতামূলক আন্দোলনকে হেয়জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়াছেন।

অবশ্য আমার একথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, আপনাদের সমস্যাগুলির আলোচনা করিবার পক্ষে আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি নাই; আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, আপনাদের কল্যাণ-কামনা আমার কেবল সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস নহে; ইহা আমার সমগ্র দেশোন্নতির আদর্শের ভিত্তিস্বরূপ আন্তরিকতায় সুপ্রতিষ্ঠ।

জাতীয় জীবনের ভিত্তি—কৃষক সম্প্রদায়

আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা যে জাতির প্রধান সমস্যা তাহা আজ সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। যে দেশের শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে বাস করিয়া থাকে, তাহারই মাটি জল হইতে উৎপন্ন শস্য দ্বারা জীবন ধারণ করে,—দেশের অসংখ্য লোকের সকল সুখসুবিধার সকল উপকরণ জোগায়, তাহারাই যে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রকৃত ভিত্তি, তাহা আজ আর কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কৃষকের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিলে তাহার প্রতিঘাত সমাজের প্রত্যেক স্তরে আসিয়া পৌঁছায়; তাহাদের সমৃদ্ধির উপর জমিদার, মহাজন, উকিল, ডাক্তার, মধ্যবিত্ত, শিল্পী, ব্যবসায়ী সকলেরই আয় ও উপার্জ্জন নির্ভর করে, এবং কৃষকের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের জন্যই শিল্পী ও ব্যবসায়ীর পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণও সঙ্কুচিত হয়। এই যে দেশের প্রাণশক্তি, দেশের মাটিজল, বায়ুর সহিত যাহাদের নাড়ীর নিবিড় সম্বন্ধ,—তাহাদের দুঃখকষ্ট, তাহাদের অন্তরের বেদনা বুঝিবার শক্তি যদি আমাদের না থাকে, তবে দেশ-সেবার দাবী ও গৌরব আমাদের কোথায়? দেশের অগণিত এই জন-সাধারণের জীবন, শিক্ষায়, দীক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সম্পদে বঞ্চিত রাখিয়া দেশের উন্নতি প্রচেষ্টা বৃথা,—দেশ ও

সমাজসেবী ব্যক্তি মাত্রেরই এখন এই সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-জীবনে অশিক্ষিত ও শিক্ষিত, পল্লী ও সহরবাসীর মধ্যে যে একটা অস্বাভাবিক ও অনতিক্রম্য দূরত্ব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমাদের প্রজা-সম্প্রদায়ের, তথা সমগ্র জাতির উন্নতির পক্ষে প্রকাণ্ড বাধা; এই বাধা দূর করিয়া পল্লীজীবন ও কৃষক সম্প্রদায়কে একটা পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিতে হইবে।

অপরিচয়ের দূরত্ব ও শ্রেণীবিরোধ

আজ আপনাদের সহিত মিলিত হওয়ায় পরস্পরের ভাব ও অনুভূতির আদান-প্রদানের যে সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহা প্রত্যেকের পক্ষেই পরম লাভের জিনিষ বলিয়া মনে করি। এই পরিচয়ে, এই যোগাযোগে দূরত্বের ব্যবধান সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে, এবং অপরিচয়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়। আজ যখন বিদেশের আমদানী শ্রেণীবিরোধের আগুন আমাদের সমাজ-জীবনকে নষ্ট করিতে উদ্যত দেখি, তখন বুঝি এই ব্যবধান কি ভাবে বিরোধের সুযোগ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। আপনারা মনে রাখিবেন, এই যে শ্রেণী-বিরোধের দাবাগ্নি, ইহা আসিয়াছে মাঠের পথে আলেয়ার আলোর মত আমাদের পথ ভুলাইতে, আপনজনকে পর করিতে, মিলনের ক্ষেত্রে বিদ্বেষ সংক্রামিত করিতে। অপরিচয়ের দূরত্বে যাহাকে ভুলিয়াছিলাম বা ভুল বুঝিতেছিলাম, সে যে পর হইয়া যাইবে তাহা ত স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাদের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা এই পরিচয়ের মধ্য দিয়াই সত্য হইয়া উঠিবে। এই পূর্ণ পরিচয়ের শুভযুগ এইরূপ সম্মেলনের মধ্যদিয়া সূচিত হউক, আমাদের যত কিছু অপরিচয়ের গ্লানি, ভেদ-বিরোধ, আপনজনকে অবিশ্বাস করিবার ক্ষতি ঘুচিয়া যাক্,—

"আপন জনে চিন্‌লি নারে
জীবন ভরা অভিমানে"
—এই খেদোক্তি মিথ্যা হউক।

দেশের প্রকৃত সমস্যা কৃষকের সমস্যা

আমাদের ন্যায় যাহারা নগরের কোলাহলে ও কর্ম্মের আবর্ত্তে ডুবিয়া আছেন, তাঁহাদের পক্ষে অনেক সময় আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ বা প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। ইহাতে মনে করিবেন না যে, আপনাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা উদাসীন। যতই দিন যাইতেছে, সমাজে, রাষ্ট্রে, যতই জটিলতা বাড়িতেছে, ততই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে আপনাদের অভাব-অভিযোগের মধ্যেই রহিয়াছে দেশের প্রকৃত সমস্যা। কারণ দেশের যে সমস্যাগুলি আমরা গুরুতর ও বৃহৎ বলিয়া মনে করি, তাহা আপনাদের অভাব অভিযোগেরই রূপান্তর মাত্র। তাই যাঁহারা দেশের যথার্থ মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে আপনাদের সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা অসম্ভব এবং উদাসীন থাকিলে এই ঔদাসীন্যের প্রতিক্রিয়া সমগ্র সমাজ-জীবনে পক্ষাঘাত আনিবে। এই সম্পর্কে আমি বহুবার চীন দেশের বিখ্যাত দার্শনিক কনফিউসিয়াসের একটা কথা বলিয়া আসিয়াছি; আজ আবার সেই গভীর অর্থপূর্ণ বাণীটুকুর প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই।

কনফিউসিয়াস বলিয়াছেন যে, জাতির উন্নতি একটা বৃক্ষের মত ; কৃষি ইহার মূল, শিল্প এবং বাণিজ্য ইহার শাখা এবং জীবন। ইহার মূল ক্ষয় পাইলে পাতা ঝরিয়া পড়ে ; ক্রমে শাখাও খসিয়া পড়িবার উপক্রম হয় এবং অবশেষে সমস্ত বৃক্ষটিই শুকাইয়া ধ্বংস হইয়া যায়। যাহা হউক, আপনাদের সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি বহুবার বলিয়া আসিয়াছি ; তাহার আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই ; কারণ আজকাল সকলেই আপনাদের সমস্যার গুরুত্ব অল্পাধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিতেছেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব

এই প্রসঙ্গে আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে চাই যে, আমি ইহার পূর্ব্বে কয়েকবার আপনাদের নিকট যে ভাবে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আজ ঘটনাচক্রে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম আপনাদের সমস্যাগুলি যথার্থরূপ আলোচনা করিয়া তাহার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে এবং কি ভাবে আন্দোলন করিলে আপনাদের সমস্যাগুলির সমাধান সহজ হইয়া উঠিবে তাহার পথ-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আমার নিবেদন জানাইতে। আজ বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের

অন্যতম মন্ত্রীহিসাবে আপনাদের সমস্যাগুলির সমাধানের অনেকটা দায়িত্ব আমার উপরও ন্যস্ত হইয়াছে। তাই আজ সেই দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখিয়াই আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা আপনাদের নিকট নিবেদন করিব

পুরাতন ও নূতন শাসনতন্ত্র

প্রথমেই আপনাদিগকে একটি কথা বলিতে চাই যে, পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট বলিতে যাহা বুঝাইত, আজ তাহার রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কারণ-অকারণ নির্ব্বিশেষে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জন-সাধারণের মধ্যে যে একটা বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল, এখন সেরূপ আবহাওয়া আর থাকিবার তেমন কারণ নাই। এখন যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে আপনাদের অনেক অধিকার রহিয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্রে আমরা পরিপূর্ণ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করি নাই,—একথা সত্য। ইহার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা লইয়া দীর্ঘকাল আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। সেই সকল জটিল রাজনৈতিক তত্ত্বের কথা আজ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চাই না; কিন্তু একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে বর্ত্তমান ব্যবস্থা প্রাচীন শাসন ব্যবস্থায় এক গুরুতর পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। জন-সাধারণের হাতে গঠনমূলক কল্যাণ-সাধনের অনেক ক্ষমতা আসিয়াছে। মোট কথা, আজ শাসনব্যবস্থার ধরণ বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ যাঁহারা শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদেরই স্বজন, আত্মীয়, বন্ধু এবং প্রতিনিধি। তাঁহাদের সহিত আপনাদের একটা স্বাভাবিক প্রাণের যোগ আছে,—যাহা অতীতে বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত শাসকগণের সহিত ছিল না। তদুপরি আমাদের স্থায়িত্ব ও কাজ করিবার সুযোগ আপনাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের মত ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং আপনাদের স্বার্থের প্রতি যদি আমরা অবহিত না হই, তাহা হইলে আমাদের মন্ত্রীপদের স্থায়িত্বই থাকিবে না। ইহাই গণ-তান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মূল কথা। পূর্ব্বে যাঁহাদের হাতে শাসন কর্তৃত্বের ভার ছিল, তাঁহারা আপনাদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না,—বৃটিশ পার্লামেণ্টের উপরই তাঁহাদের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করিত। কাজেই তাঁহারা আপনাদিগকে অবহেলা করিতে পারিতেন এবং করিয়াও আসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ যাঁহারা শাসনকর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদেরই লোক বলিয়া আপনাদের সেবাই তাঁহাদের একান্ত কাম্য। তাই তাঁহারা আপনাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সর্ব্বপ্রকারের সহযোগিতা দাবী করিতে পারেন।

প্রজা-সাধারণের নব-লব্ধ ক্ষমতা ও তাহার ব্যাপকতা

আপনাদের হাতে আজ অসীম ক্ষমতা। আইনসভায় আপনারা আজ যে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মতামত লইয়াই আইনকানুন এবং অন্যান্য প্রকার শাসন-কার্য্য পরিচালন করিতে হইবে। আর, বর্ত্তমান পরিষদে আপনাদের প্রতিনিধির সংখ্যাই বেশী; এবং এই প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতেই কেহ কেহ মন্ত্রী হিসাবে শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। জমিদার এবং প্রজার পরস্পর সম্পর্ক লইয়া আমাদের দেশে যে তীব্র আন্দোলন হইতেছে এবং যে আন্দোলনের উপর ভিত্তি

করিয়াই আপনাদের কৃষক-প্রজাদল গঠিত হইয়াছে, আজ সেই দলের প্রতিনিধিগণ বাঙ্গালার আইন-সভায় সংখ্যানুপাতে এমন শক্তি লাভ করিয়াছেন, যে, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা প্রজা-জমিদার সম্পর্কে কেবল সাধারণ আইন-কানুনই নয়, এমন কি, জমিদার শ্রেণীর উচ্ছেদ-মূলক ব্যবস্থা করিতেও সমর্থ। অবশ্য কোন্ ক্ষমতা কিরূপ ভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন এবং তাহা প্রজাসম্প্রদায়ের পক্ষে কত দূর কল্যাণজনক হইবে তাহা আলোচনাসাপেক্ষ। আপাততঃ, বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থায় আপনারা যে কিরূপ ব্যাপক ও দায়িত্বপূর্ণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, আমি কেবল তাহার দিকেই আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

বাঙলার মন্ত্রীমণ্ডল ও তাঁহাদের নেতৃত্বের দাবী

যে গণতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার মূলনীতি অনুসারে আপনাদেরই প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর শাসন-ভার ন্যস্ত হইয়াছে। গণতন্ত্রে এই প্রকার মন্ত্রীমণ্ডলী ব্যক্তি হিসাবে পরিবর্ত্তন-যোগ্য হইলেও অপরিহার্য্য এবং আপনারা ইচ্ছা করিলেই এক মন্ত্রীমণ্ডলীর

উচ্ছেদ সাধন করিয়া আর এক মণ্ডলীকে মন্ত্রীত্বপদে অভিষিক্ত করিবার সুযোগ দিতে পারেন।

আজকাল স্বার্থ-প্রণোদিত এক শ্রেণীর লোক বাঙ্গালার বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে বিরোধের ভাব সৃষ্টি করিবার জন্য একটা প্রতিকূল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। এই আন্দোলন যে আপনদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী তাহা আপনাদের পক্ষে সম্যক বোঝা দরকার। আজ বিপুল মুসলমান সম্প্রদায়ের দিক হইতেই মন্ত্রীমণ্ডলের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে আজ যাঁহারা মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন, বর্ত্তমান পরিষদে, বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে, অভিজ্ঞতায়, কর্ম্মকুশলতায়, সমাজের বিশ্বাসভাজন এবং নেতৃত্বের দাবী করিবার পক্ষে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহ আছেন বলিয়া আমার জানা নাই। তাঁহাদের হাতে যদি আপনাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ না থাকে, তবে, সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে, আইন-সভায় আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করিবার পক্ষে তাঁহাদের অপেক্ষা উপযুক্ত লোক মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে আর বেশী কেহ নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। মুসলমান সমাজে হয়ত অনেক কৃতকর্ম্মা উপযুক্ত লোক আছেন; কিন্তু যাঁহারা জনসাধারণের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মৌলভী ফজলুল হক, স্যার নাজিমুদ্দিন, ঢাকার নবাব বাহাদুর প্রভৃতি অপেক্ষা কাহারা মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিবার পক্ষে অধিকতর যোগ্যতার দাবী করিতে পারেন? তাহা ছাড়া বর্ত্তমান পরিষদের মধ্য হইতেই যখন মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে, তখন আপনাদের স্বার্থরক্ষা করিয়া কাজ করিবার দাবী বর্ত্তমান পরিষদে তাঁহাদের অপেক্ষা আর কাহার আছে?

তারপর অনুন্নত সম্প্রদায়ের কথাও বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাঁহাদের মধ্য হইতেও যাঁহারা মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন, সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের দাবী করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের আছে এবং তাঁহাদের অপেক্ষা যোগ্যতর লোক অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্লভ। এই হিসাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল স্ব স্ব সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই গঠিত হইয়াছে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা নিজেদের কৃতকর্ম্ম দ্বারা দেশবাসীর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন এবং যে পর্য্যন্ত না তাঁহাদের অপেক্ষা যোগ্যতর লোক দ্বারা মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা সম্ভব হয়, সে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান মন্ত্রীবর্গ তাঁহাদের আরব্ধ কর্ম্মকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে ন্যায়তঃ আপনাদের সহযোগিতা দাবী করিতে পারেন; আপনাদের পক্ষ হইতেও এই প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিয়া পরীক্ষা করা দরকার যে বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী জনহিতকর বা দেশহিতকর কার্য্যে কৃতকার্য্য হন কিনা।

প্রতিকূল আবহাওয়া সাফল্যের অন্তরায়

মন্ত্রীমণ্ডলীর সাফাই গাহিয়া যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলের নিকট হইতে যতটা ন্যায্যমত আশা করা যায়, যদি তাঁহারা তাহা করিতে না পারেন, অথবা যদি তাঁহাদের দ্বারা দেশের স্বার্থরক্ষা হইতেছে না বলিয়া আপনারা বিবেচনা করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের স্থলে অন্য মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিবার প্রশ্ন আসিবে এবং তখনও

আপনাদের মতামতের উপরই পুনরায় নূতন মন্ত্রীমণ্ডল গঠন নির্ভর করিবে। মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর জনহিতকর কার্য্য করিবার যে গুরু দায়িত্বভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহার জন্য মন্ত্রীগণকে অনন্যমনা হইয়া কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে; কারণ আপনাদের সমস্যা অতীব জটিল এবং তাহার সমাধানের জন্য গঠনমূলক পরিকল্পনা ও একনিষ্ঠতা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আপনাদের প্রতিনিধিগণ যদি মন্ত্রীমণ্ডলকে কাজে সমর্থন ও সহযোগিতা দ্বারা সাহায্য না করেন এবং প্রতিবন্ধকহীন ভাবে কাজ করিবার সুযোগ না দেন, তবে মন্ত্রীমণ্ডলের পক্ষে একান্তভাবে কাজে মনোনিবেশ করা কঠিন হইয়া পড়িবে। প্রতিকূল আবহাওয়া কর্ম্মশক্তির পূর্ণ বিকাশের অন্তরায় এবং সেই আবহাওয়া যাঁহারা সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই আপনাদের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নন। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিবার সময় হয়ত অনেকের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সম্ভবপর হয় নাই; অনেকের হয়ত আবার ব্যক্তিগত ভাবে কোন কোন মন্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষভাব রহিয়াছে। এই সকল ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যদি কেহ কেহ মন্ত্রীগণের বিরুদ্ধে প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে আপনারা তাহাদের হাতের ক্রীড়নক হইবেন না। কারণ, মন্ত্রীমণ্ডলীর অপসারণ এবং গঠন বিষয়ে আপনাদের হাতে যে গুরুতর রাজনৈতিক ক্ষমতা আসিয়াছে, তাহা আপনাদের নিজ স্বার্থের সকল দিক বিবেচনা করিয়া বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত প্রয়োগ করা প্রয়োজন। স্বার্থপ্রণোদিত বিরুদ্ধভাব প্রতিহত করিতেই যদি মন্ত্রীমণ্ডলীর সমস্ত কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত হয়, তবে আপনাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের উপযোগী কাজ করিবার তাঁহাদের সময় কোথায়?

বিশেষতঃ এই সকল ব্যক্তিগত অপচেষ্টা ছাড়াও কংগ্রেসের পক্ষ হইতেও মন্ত্রীমণ্ডলের উচ্ছেদ সাধন করিবার একটা বিপুল আন্দোলন চলিতেছে। কংগ্রেস যে পর্য্যন্ত না দেশের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা অকংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল ধ্বংসের জন্য তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। এ বিষয়ে বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী কি কার্য্য করিতেছেন, তাহার ভাল মন্দ কংগ্রেস বিচার করিবেন না। রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্তই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে অন্য কোন গঠনমূলক কার্য্যের প্রশ্নই তাঁহারা বিবেচনা করিতে রাজি নহেন বলিয়াই মনে হয়। এতগুলি বিরুদ্ধ শক্তি যদি বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া মন্ত্রীগণকে প্রতিপদে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করে, তবে তাঁহাদের পক্ষে গঠনমূলক কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াও আশানুরূপ কিছু করিয়া উঠা হয়ত কঠিন হইয়া পড়িবে।

ধ্বংসমূলক মতবাদ ও আপনাদের কর্ত্তব্য

এই বিষয়ে আমার বিশদরূপ আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বর্ত্তমান স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় আপনারা যে সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, কি করিলে তাহা আপনাদের এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ বিধানে নিয়োজিত হইতে পারে, তাহারই উপায় নির্দ্দেশ করা। কংগ্রেসের মত বর্ত্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করাই যদি আপনাদের মূল উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে অবশ্য আমার কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু বিগত আইন-সভার নির্ব্বাচনের ফলাফলে

ইহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বাঙ্গালার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশই এই প্রকার ধ্বংস-মূলক কার্য্যনীতিকে সমর্থন করেন না। অতএব এই শাসনব্যবস্থাকে দেশের উন্নতিমূলক কার্য্যে প্রয়োগ করাই যদি আপনাদের অভিপ্রেত হয়, তবে কোন প্রকার অবান্তর প্রশ্নে বিক্ষুব্ধ হইয়া বা মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের কোন গৌণ ব্যাপারের প্রতি অনাবশ্যক প্রাধান্য আরোপ করিয়া আপনারা নূতন শাসনযন্ত্রের সহায়তায় দেশের কল্যাণ-সাধন প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ হইবার সুযোগ দিবেন না। কোন মন্ত্রীবিশেষের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিমাত্রকেই আপনারা বিরুদ্ধ আন্দোলনের প্রভাবে বড় করিয়া দেখিবেন না; কারণ মানুষমাত্রেরই কোন না কোন ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। আজ একজনকে বাদ দিয়া যদি অপর কাহাকেও মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত করা আপনাদের কাম্য হয়, তবে আপনাদের মনোনীত মন্ত্রীও বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবেন না বলিয়া আমি আশঙ্কা করি। এমনি ভাবে যদি আমরা কেবল মন্ত্রীমণ্ডলীর গঠন-সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত থাকি, তবে আমাদের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, অর্থাৎ দেশের হিতকল্পে গঠনমূলক কার্য্য করা,—তাহা সুচারুরূপে আরম্ভ করিবার সুযোগই পাওয়া যাইবে না।

কৃষকগণের অধিকার ও দায়িত্ব

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নূতন ব্যবস্থায় আপনাদের অধিকার ও শক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজ পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে আপনাদের প্রতিনিধিগণের সংখ্যা বেশী। শুধু সংখ্যার জোরেই আজ আপনারা অনেক বিষয়ে আপনাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার সুযোগ করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু অধিকার ও ক্ষমতা পাইলেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দায়িত্বও বাড়িয়া যায়; তাই অধিকার ও দায়িত্ব একে অপরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আজ অধিকার পাইয়া যদি আপনারা নিজেদের দায়িত্ব ভুলিয়া যান, বা সেই দায়িত্ব পালনে ভুল পথে চলিতে থাকেন, তাহা হইলে অধিকারলাভই হয়ত শেষ পর্য্যন্ত আপনাদিগকে বিপথে লইয়া যাইবে। আমি স্বীকার করি যে, যতদিন আপনাদের হাতে ক্ষমতা ছিল না, শাসনতন্ত্রে আপনাদের স্থান ছিল অবহেলিত,—ততদিন হয়ত আপনাদের অনেক প্রকার অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে; সম্প্রদায়বিশেষ,
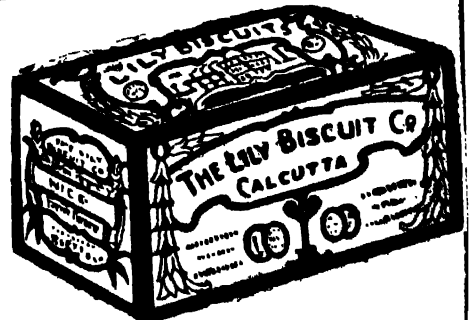
শ্রেণীবিশেষ ও দলবিশেষ আপনাদিগকে হয়তো অনেক প্রকারে নির্য্যাতিত করিয়াছে। তাই আজ ক্ষমতা পাইয়া শক্তিদর্পে যদি আপনারা অতীতের অন্যায়ের জ্বালা মিটাইতে চাহেন এবং অতীত আঘাতের পরিবর্ত্তে প্রতিঘাত করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনারা ভুল করিবেন। আপনাদের প্রকৃত কল্যাণ বিরোধ ও বিপ্লবের পথে নয়;—সাম্য ও মৈত্রীর পথে। আজ আপনাদের প্রাপ্ত অধিকারকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য যদি কোন শক্তি উন্মুখ হয়, তবে আপনারাও হয়তো আঘাত করিতে প্রলুব্ধ হইতে পারেন; কিন্তু এই অবস্থাকেও প্রতিঘাতের দ্বারা নয়,—সামঞ্জস্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কারণ ক্ষমতা যখন আজ আপনাদের হাতে, তখন ন্যায় ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা সমস্যার সমাধান করা আপনাদেরই দায়িত্ব। আজ যদি ক্ষমতার মোহে আপনারা বড়কে ছাটিয়া ফেলিয়া সমান করিয়া লইতে চাহেন, তাহা হইলে যাঁহারা বড়, তাঁহাদের অহমিকা চূর্ণ করিতে পারিবেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তো আপনি নিজে বড় হইতে পারিবেন না; আর আপনি নীজে যদি বড় হইতে না পারেন, তবে পরকে ক্ষুদ্র করিয়া যে আত্মপ্রসাদ, সে আত্মপ্রসাদ নিজের মন ও আদর্শকে ক্ষুদ্রই করে এবং নিজের অবনতিরই সোপান হয়। আপনারা উচ্চ আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, নিজকে উন্নত করিতে অগ্রসর হইবেন,—শুধু অসূয়ার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের অধিকারবোধকে নিজেরই অমঙ্গলসাধনে প্রয়োগ করিবেন না,—ইহাই আমার নিবেদন।

ধ্বংস-মূলক মতবাদ ও আশা-মরীচিকার সৃষ্টি

আবার অপর কেহ কেহ কতগুলি অতি আধুনিক ধ্বংসমূলক মতবাদ দ্বারা আপনাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন; নূতন জগতের প্রলোভন দেখাইয়া আপনাদিগকে এক অবাস্তব সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছেন। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ দুঃখ দুর্দ্দশায় অধীর হইয়া এই মরীচিকা-কেই সত্য জ্ঞান করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইতেছেন। জগতের সমস্ত ব্যবধান ও পার্থক্য সমান হইয়া যাইবে, ধনী দরিদ্র ভেদ থাকিবে না, সমস্ত ভেদ এক মহাসাম্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া এই পৃথিবীতে এক নূতন স্বর্গের সৃষ্টি করিবে,—আমাদের দেশে অদূর ভবিষ্যতে এই মতবাদের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। এখনই আপনাদের নিকট কোন স্বপ্নজগতের সন্ধান দিতে আমি অপারগ। এই যে ধ্বংসমূলক সাম্যবাদের বাণী আপনাদিগকে সমস্ত পার্থক্য ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া এক করিয়া দিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, তাহা আমাদের দেশের মাটিজলের সহিত খাপ খায় না, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার সহিত তাহার কোন প্রাণের যোগ নাই। আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির যে সকল বিশেষত্ব রহিয়াছে, পরের নকল করিয়া আমরা তাহার সমাধান করিতে পারিব না। অনেকে আপনাদের নিকট সাম্যবাদের যে উজ্জ্বলরূপ তুলিয়া ধরিতেছেন তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের স্থান নাই; সুতরাং বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাহার প্রকৃত সামঞ্জস্যও নাই। একটা পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি যে, আমাদের জীবন একটা ফুলের সাজির মত বিভিন্ন রঙের ফুলে ভরা,—ইহার পৃথক পৃথক রংকে জোর করিয়া এক রং করা চলে না; ইহার জন্য চাই সামঞ্জস্য, যাহা কেবল সুনিশ্চিত নক্সার দ্বারাই সম্ভব।

(আগামী বারে সমাপ্য)

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভলুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। "বঙ্গবাসী" এইরূপ প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাগজে প্রকাশ করতঃ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব।

—সম্পাদক

অতি বড় হ'য়োনা ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে,
অতি নীচু হ'য়োনা ছাগলে মুড়ে খাবে।

*

অতি দুঃখে যদি কোনো চণ্ডালেও শাপে,
এড়াতে পারে না তাহা ব্রাহ্মণেরও বাপে।

*

অভাগা যেদিকে চায়,
সাগর শুকিয়ে যায়।

*

অধিক খেতে করে আশা,
তাহার নাম বুদ্ধি নাশা।

*

আড়ার মন কাড়ার দিকে,
চোরের মন বোচ্‌কার দিকে।

*

আহার, নিদ্রা, ভয়,
তিন থাকতে নয়।

*

আমে দুধে মিশে যাবে,
আঁটী আদাড়ে যাবে।

*

অসারের তর্জ্জন গর্জ্জনই সার।

*

গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।

*

ঠগের নিমন্ত্রণ, না আঁচালে প্রত্যয় নেই।

*

উঠন্ত মূলো পত্তনেই চেনা যায়।

*

উনো ভাতে দুনো বল,
ভরা ভাতে রসাতল॥

*

কৃষ্ণ কেমন,—
যার মন যেমন।

*

খাল কেটে কুমীর আনা।

*

খেয়ে মোতে, হেগে খায়,
তার কড়ি না বৈদ্যে পায়।

*

খায় দায় ভুলেনা,
তত্ত্ব কথা ছাড়ে না।

*

গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল।

*

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

*

চোর্ণী মাগীর বড় গলা।

*

জানেনা ক, খ,
ক'রতে আসে দারগ্ গিরি।

*

চোরের উপর রাগ করে
মাটীতে ভাত খাওয়া।

*

চেনা বামুনের পৈতার দরকার নেই।

*

টাকা না থাকলে নিজের বাপের শ্রাদ্ধ হয় না
টাকা থাকলে ভূতের বাপেরও শ্রাদ্ধ হয়।

*

দেখা যায় না তুষের আগুন,
বাতাস পেলেই বাড়ে দ্বিগুণ।

*

ছোট মুখে বড় কথা,
শুনতে হয় মাথা ব্যথা।

*

পেট দিয়েছেন যিনি
আহার যোগাবেন তিনি।

*

দশে মিলে করি কাজ,
হারি জিতি নাহি লাজ।

*

যার রান্না খাই নাই সে বড় রান্ধুনী,
যার গান শুনি নাই সে বড় গাউনী।

*

যে আছে সাত বার খেয়ে,
তার চাল আন আগে ধুয়ে।

*

নিজে বাঁচলে বাপের নাম।

*

নেবু বেশী রগড়াইলে তেতো হয়।

*

ধীরে রাঁধে সুস্থে খায়,
তবে জিনিষের স্বাদ পায়।

*

যার হয় না নয়তে,
তার হয় না নব্বইতে।

*

যার সাথে যার মজে মন
কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

*

যতক্ষণ শ্বাস
ততক্ষণ আশ।

*

মরিচ পাকে আর ঝাল বাড়ে।

*

পচা আদায় বেশী ঝাল।

*

রাখে কৃষ্ণ মারে কে,
মারে কৃষ্ণ রাখে কে।

*

সাধও করে,
মনও পোড়ে।

*

নিধেও বৈরাগী হোল,
দেশেও আকাল পো'ল

*

যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।

*

ভেখ দেখ্লে ভিখ মিলে।

*

বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ছুঁচো।

*

যার জন্য রামের মা,
তাকে তুমি চেন না।

*

সেজে গুজে বসলেন রাই,
এ লগনে বিয়ে নাই।

*

বাঘে-মহিষে যুদ্ধ করে,
নল-খাগড়া প্রাণে মরে।

*

কাছারী বা কোথায়,
কান মলে বা কোথায়।

*

বাকিওয়ালা ধমকিয়ে মারে
ফাজিল ওয়ালাকে।

*

হাঁড়ি খুট্ খুট্ বাড়ী ছাড়া,
কড়ি মুট্ মুট লক্ষ্মীছাড়া।

শ্রীরতনলাল চক্রবর্ত্তী

ন্যাশন্যাল ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানী

১৯৩৬ সালের হিসাব ও রিপোর্ট

বিগত ২৮শে মে (১৯৩৭) ন্যাশন্যাল ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর অংশীদারগণের ত্রিংশং (৩০ তম) বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। মিঃ জে চৌধুরী (ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নে অভিভাষণের সারমর্ম্ম দেওয়া হইল,—

চেয়ারম্যানের বক্তৃতা

কোম্পানীর হিসাব ও কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমি সর্ব্বপ্রথমে গভীর দুঃখের সহিত রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধুর মৃত্যুর কথা স্মরণ করিতেছি। গত জানুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। দশ বৎসরের অধিক কাল তিনি এই কোম্পানীর ডিরেক্টার বোর্ডের সদস্য ছিলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি তাঁহার পরিপক্ক জ্ঞানের নানা উপদেশ দিয়া কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। আজ তাঁহাকে হারাইয়া কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত এবং সুপরামর্শ লাভ সম্পদে দরিদ্র হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোম্পানীর রিপোর্ট ও হিসাব অংশীদারগণের মধ্যে রীতিমত প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং তাহা এই সভাতে পঠিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। ঐ হিসাব ও রিপোর্ট সম্বন্ধে আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকিলে, তাহা আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমি আনন্দের সহিত তাহার উত্তর প্রদান করিব। এইরূপ প্রশ্নোত্তরের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিব বাস্তবিক কোন কোন বিষয় হিসাবে ও রিপোর্টে বিস্তারিত রূপে উল্লেখ থাকার প্রয়োজন। কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা ও কার্য্যপরিচালনার একটী সুস্পষ্ট চিত্র আপনাদের সম্মুখে প্রদর্শন করাই আমাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য, শুধু আজ নহে চিরদিন। আমাদের কোম্পানীর হিসাবে এবং রিপোর্টে অপূর্ব্ব চমৎকার একটা-কিছু নাই। হিসাবের মধ্যে চোখ ঝলসান খুব বড় বড় অঙ্ক দেখান আমি বিপজ্জনক বলিয়া মনে করি। আমরা সেই চোরা-গোপ্তা গর্ত্তে যাহাতে না পড়ি, সে বিষয়ে সাবধান হইয়া চলি। আমাদের কোম্পানী এবৎসরেও স্থির অবিচলিত ভাবে

উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, হিসাবের আলোচনায় আপনারা তাহাই দেখিতে পাইবেন। আমরা হঠাৎ ঋণ করিয়া কারবার বাড়াইতে চাহিনা; কারণ, সেই টানের ঝক্কিতে কোম্পানীর জীবনসংশয় হয়। ধীরে ধরে অগ্রসর হওয়াই আমাদের চিরন্তন নীতি; তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণ ঘটে নাই।

হিসাবে দেখা যায়, খরচের অনুপাত কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আফিসের কার্য্য পরিচালনায় যন্ত্রমূলক নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করাই ইহার কারণ। এসম্বন্ধে আমি গত বৎসরের সভায় বিস্তারিত রূপে বলিয়াছিলাম। আমার মনে হয়,
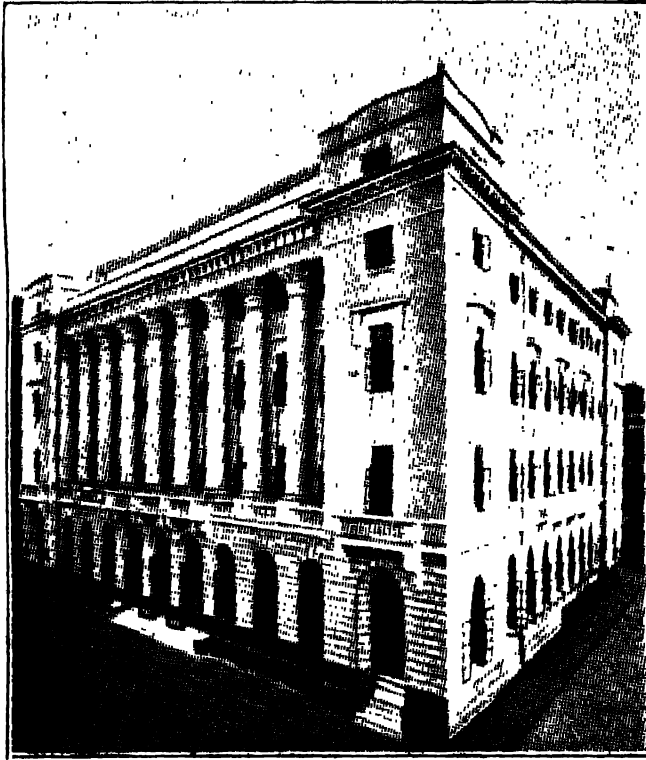
ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতাস্থ হেড্ আফিস

১৯৩৮ সালের মধ্যে আমাদের আফিসের এই যন্ত্র মূলক নূতন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।

সুদ বাবদে মোট আয়ের পরিমাণ সন্তোষজনক। গতবৎসর অপেক্ষা এই বৎসরে সুদ কিছু বেশী পাওয়া গিয়াছে দেখা যায়। ইহাতে কেহ মনে করিবে না যে, কোম্পানীর তহবিলের উপর আদায়ী সুদ হরদম বাড়িয়াই চলিয়াছে। বরঞ্চ কোম্পানীর কতকগুলি নূতন লগ্নীতে সুদ খুব কম পাওয়া গিয়াছে দেখিয়া আমাদের একটু চিন্তার কারণ হইয়াছে।

নূতন প্রস্তাবিত ইন্‌সুর‍্যান্স বিল সম্পর্কে অন্যান্য কোম্পানীর সঙ্গে আমাদের বিবিধ আলাপ আলোচনা এবং নানা প্রকারে যোগাযোগ হইবার সুবিধা ঘটিয়াছে। ব্যবসায় হিসাবে ইহা খুব লাভজনক, সন্দেহ নাই। বাস্তবিক প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীর মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ সম্বন্ধ বীমা ক্ষেত্রে যেমন বাঞ্ছনীয় তেমন অন্যত্র নহে। অন্য বীমা কোম্পানীর সঙ্গে খুব নিকট সম্বন্ধ রাখিবার এবং অবাধ আলোচনা করিবার নীতি আমরা চিরকাল অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। গতবৎসর ইন্‌সুর‍্যান্স বিল সম্পর্কে বিভিন্ন কোম্পানীর
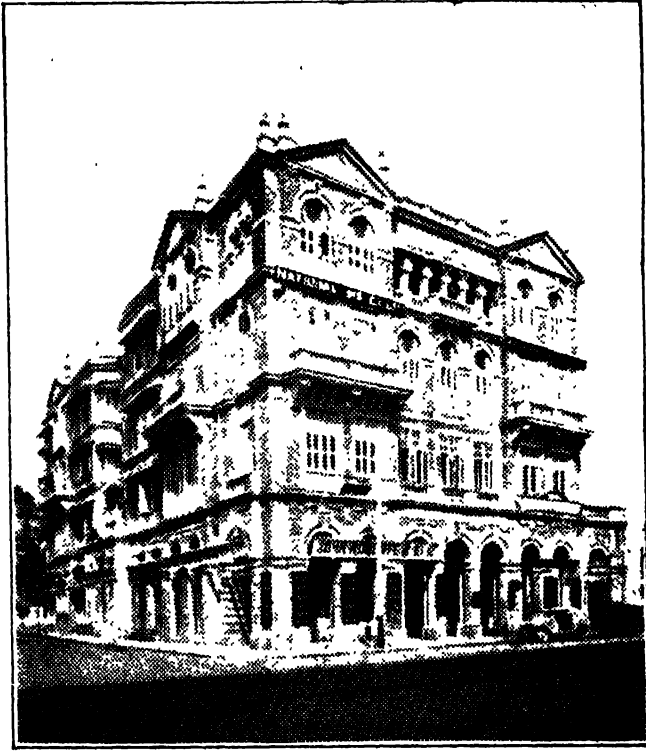
ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বোম্বাই আপিশের বাড়ী

মধ্যে যে সহযোগিতা দেখা গিয়াছে, আমরা ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক দেখিতে ইচ্ছা করি। আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে বলিয়াই সহযোগিতার প্রয়োজন আরও বেশী এবং আলাপ আলোচনার দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি না হইয়া বরং লাভই হয় অধিক। প্রস্তাবিত নূতন ইন্‌সুর‍্যান্স বিল বীমার ব্যবসায়কে একপদ অগ্রসর করিয়াই দিবে, কখনও পশ্চাদগামী করিবেনা, ইহা নিঃসন্দেহ। তা' বলিয়া বিলের যে কোন প্রকার সংশোধন অনাবশ্যক, এ কথা কেহ মনে করিবেন না। পরন্তু, বিলের কোন্ কোন্ ধারা

পরিবর্ত্তিত কিংবা সংশোধিত করা দরকার, তাহা অন্যান্য বীমা কোম্পানীর সহিত একযোগে আলোচনা করিয়া আমরা প্রকাশ করিয়াছি। সেই মিলিত মন্তব্য-লিপি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। বিস্তারিত সমালোচনায় না যাইয়া কেবল মাত্র নীতির দিক দিয়া আমরা বিলখানিকে অভিনন্দিত করি।

লগ্নী কারবারে সুদের হার খুব কমিয়া যাওয়াতে আমাদের বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়াছে। শুধু আমাদের নয়, সকল বীমা-কোম্পানীরই এই দশা। বীমা ব্যবসায়ে বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটী প্রধান সমস্যা। আমাদিগকে
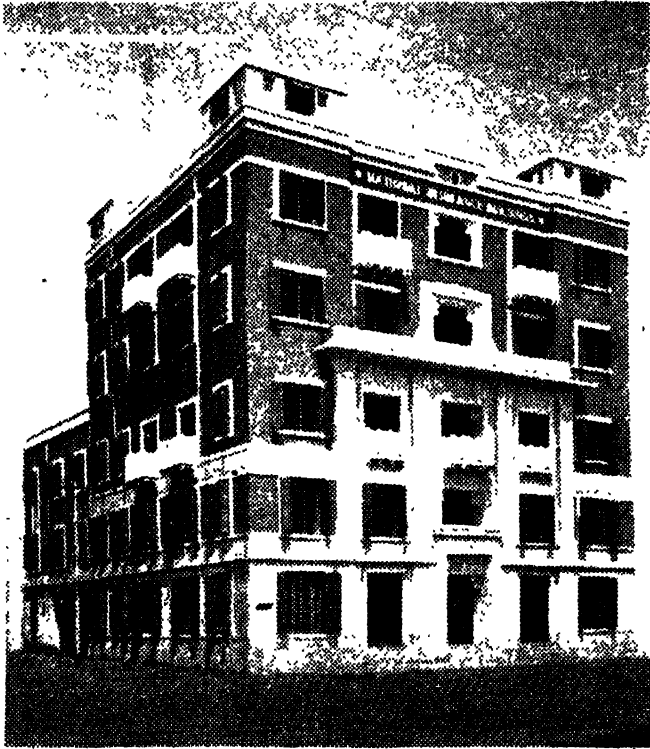
ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মান্দ্রাজ আপিসের বাড়ী

এখন এমন সিকিউরিটিতে টাকা লগ্নী করিতে হইবে যাহাতে সুদ কিছু বেশী পাওয়া যায় এবং যাহার মূল্য-হ্রাস বেশী না হয়।

আমাদের গত ভ্যালুয়েশনের ফল সন্তোষ-জনক হইয়াছে। আমি কয়েক বৎসর যাবৎ এই কথা বলিয়া আসিতেছি যে, বীমাব্যবসায় ক্ষেত্রে বোনাস লইয়া প্রতিযোগিতা অতি বিপজ্জনক ব্যাপার। সুদের আয় কমিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বোনাসের হারও কমতি হইবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। আমি এখনও আমার পূর্ব্ব মত দৃঢ় রূপে পোষণ করি এবং আমাদের প্রতিযোগীরাও যে আমার মত

সমর্থন করিবেন তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমরা যাহা বরাবর এক সমান ভাবে বজায় রাখিতে পারিবনা, এমন বোনাস্ কখনও ঘোষণা করিনা ;—ইহাই আমাদেব নীতি। এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলাতে, আজ এমন টানা-টানির অবস্থাতেও কোম্পানী তাহার পূর্ব্ব মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভবিষ্যতে বোনাস্ ঘোষণা করিবার আশা করিতে পারে।

রিপোর্ট ও হিসাব

[হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে]

আলোচ্য বৎসরে (১৯৩৬) ২২৫৩৮৪৩০ টাকা মূল্যের ১০৫৮৬ টী নূতন বীমার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ১৭৫২১৫৭৬টাকা মূল্যের ৭৯১৬টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহাদের উপর পলিসি ইস্যুকরা হইয়াছে। এই নূতন বীমার প্রিমিয়ামেব আয় (পুনর্ব্বীমা বাদে) ৭৯১০৫১ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

মৃত্যুজনিত পলিসির দাবী মোট উপস্থিত হয় ৮১২৯৪২ টাকার এবং মেয়াদ শেষ হওয়াব দরুণ পলিসির দাবী আসে মোট ১৩১০৭৭৮ টাকার।

বৎসরের আরম্ভে জীবনবীমা তহবিল এবং স্পেশ্যাল ফাণ্ড্ মিলিয়া মোট হইয়াছিল ২৫৪৩৮৪৭১ টাকা। বৎসবের শেষে উহা দাঁড়াইয়াছে ২৭৪৭০৯৮২ টাকা। সুতরাং দেখা যায়, তহবিলের পরিমাণ ২০৩২৫১১ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যে সকল সিকিউরিটীতে কোম্পানীর টাকা লগ্নী আছে ১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাহার বাজার দর, হিসাবে প্রদর্শিত মূল্য অপেক্ষা ১৪৬০৮৩৩ টাকা অধিক দেখা গিয়াছে। লগ্নী টাকা হইতে সুদের আয় (ইনকাম্ ট্যাক্স বাদে) হইয়াছে মোট ১৩২০৯৭৪ টাকা। প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৬'৩ টাকা পরিচালনা খরচ হইয়াছে।

১৯৩৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোম্পানীর পাঁচ বৎসরের ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট আলোচ্য বৎসরে (১৯৩৬ সালে) প্রকাশিত হয়। তাহাতে কোম্পানীর মোট লাভ দেখা যায় (পূর্ব্ব ভ্যালুয়েশনের জের সহ) ২৬২৪২০২ টাকা। তাহার ফলে পুরাতন হারে প্রিমিয়াম যুক্ত পলিসিতে আজীবন বীমায় ১৫ টাকা, মেয়াদী বীমায় ১০ টাকা হিসাবে এবং নূতন হারে প্রিমিয়ামযুক্ত পলিসিতে আজীবন বীমায় ১৮ টাকা, মেয়াদী বীমায় ১৬ টাকা হিসাবে বোনাস্ ঘোষণা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে অংশীদারগণকে শেয়ার পিছু ১২ টাকা হিসাবে ডিভিডেণ্ড্ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর নিয়মাবলীর ১৫২।১৫৩ ধারা অনুসারে প্রতি শেয়ারে ১০০ টাকা হিসাবে স্পেশ্যাল ডিভিডেণ্ড্ দেওয়া হইয়াছে।

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩০০০২২৬৩ টাকা। তন্মধ্যে আলোচ্য বৎসরে লগ্নী হইয়াছে ৪৫৯২৭০ টাকা। জীবন বীমা তহবিল এবং অন্যান্য ফাণ্ড্ লইয়া মোট তহবিল দাঁড়াইয়াছে ২৯৩৫২৮৯৫ টাকা। বৎসরের শেষে মোট মজুত পলিসির সংখ্যা দেখা যায়, ৫৭১২২ এবং মোট বীমার পরিমাণ হইয়াছে ১১৩০৫২৭২১ টাকা (বোনাস্ সহ)।

আমাদের মন্তব্য

ন্যাশন্যালের এই বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব সকল দিকেই সন্তোষজনক এবং কোম্পানীর উন্নতির পরিচায়ক। চেয়ারম্যান মিঃ জে চৌধুরী স্পষ্টভাবে সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। কোম্পানীর বার্ষিক সভায় তিনি সমবেত সকলকে আহ্বান করিয়া ব্যালেন্স সিট্ সম্বন্ধে তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য শুনিতে চাহিয়াছেন। এইরূপ প্রশ্নোত্তরের দ্বারাই বাস্তবিক কোম্পানীর অবস্থা পরিষ্কার বুঝা যায় এবং কোন কোন বিষয়ে কি ভাবে কার্য্য প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিলে কোম্পানীর উন্নতি হয় তাহাও নির্দ্ধারণ করা সহজ হয়। ব্যবসায়ক্ষেত্রে "বাহবা" পাইবার নিমিত্ত অথবা প্রতিযোগিতায় জয়ী হইবার নিমিত্ত ন্যাশন্যাল কখনও ব্যালেন্স সীটে বড় বড় অঙ্ক দেখায় না কিম্বা ভ্যালুয়েশনের ফলে মোটা বোনাস্ ঘোষণা করে না। ঠিক যাহা ন্যায্য ও সঙ্গত এবং যাহা বরাবর বজায় রাখা যায় ন্যাশন্যাল সেইরূপেই বোনাস্ দিয়া থাকে। সেইজন্য আজ লগ্নী কারবারে সুদের আয় কমিয়া যাওয়াতেও ন্যাশন্যাল পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বোনাস্ ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ন্যাশন্যালের সুযোগ্য ডিরেক্টার রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধুর মৃত্যুতে কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই,—আমরা আশা করি, সেই ক্ষতি অচিরে পূরণ হইবে এবং উপযুক্ত ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কোম্পানীর মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

১৯৩৬ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত একবৎসরের ও হিসাব রিপোর্ট

আমরা ক্যালকাটা ইন্সুর‍্যান্সের ১৯৩৬ সালের হিসাব ও রিপোর্ট পাইয়াছি। নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল। হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা-পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে ২৫,৮০,৯২০ টাকা মূল্যের ১৫৫৯ টী বীমার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ২০,৭২,৬৭০ টাকা মূল্যের ১২৯৬ টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহার উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। তদ্দরুণ বার্ষিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ ১,১৩,৩৯৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের নূতন কারবার অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরের নূতন কারবার শতকরা আড়াই টাকার উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে ৩,৫৫,৬৬০ টাকা। তৎপূর্ব্ব বৎসরে প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল ৩,১৩,১৩২ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রিমিয়াম বাবদে আয়ের ১৩·৫৮% পরিমাণ শতকরা ১৩৷৷০ টাকার বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বৎসরের আরম্ভে জীবন-বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৬,৬৭,২৩১ টাকা। বৎসরের শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮,৪০,৮৬৪ টাকায় উঠিয়াছে। এই তহবিলের বাড়তি হইয়াছে শতকরা ২৬ টাকার উপর।

কোম্পানীর মোট তহবিলের শতকরা ৫৫ টাকার অধিক এবং জীবন বীমা তহবিলের শতকরা ৭৭ টাকার অধিক গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে লগ্নীকরা আছে। অবশিষ্ট টাকা পলিসি বন্ধকী ঋণ ও স্বত্বের বাড়ী মর্টগেজী ঋণে লগ্নী করিয়া খাটান হইতেছে।

কোম্পানীর পরিচালকগণ সর্ব্বদা খরচের পরিমাণ কম রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার ফলে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে কার্য্য পরিচালন খরচা শতকরা ২·৩৬% টাকা কম হইয়াছে। ইহা পরিচালকগণের পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয় এবং কার্য্যদক্ষতার পরিচায়ক।

আলোচ্য বৎসরে রিভারসনারী বোনাস সহ মোট ৫৩,৬৯৭ টাকার দাবী উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে ২২,৮২৭ টাকা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট টাকা সম্পর্কে পাওনাদারগণ প্রয়োজনীয়

কাগজ পত্র উপস্থিত করে নাই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। মোট দাবীর মধ্যে মৃত্যু জনিত দাবীর পরিমাণ ৩৯,১৫০ টাকা এবং মেয়াদ শেষ জনিত দাবীর পরিমাণ ১৩,৭০০ টাকা হইয়াছে। বোনাস্ সহ সারেণ্ডারের (প্রত্যর্পণ-মূল্যের) পরিমাণ হইয়াছে ৫১৯৩ টাকা। পরিচালনার জন্য মোট খরচ হইয়াছে ১,৫৯,২৪১ টাকা।

সুদ ও ডিভিডেণ্ড বাবদে কোম্পানীর আয় হইয়াছে ৩৮,৫৫৬ টাকা এবং অন্যান্য বাবদে আদায় হইয়াছে ১৭৭৮ টাকা। কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১,৭,২১৯২ টাকা। তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে ৬,৪২,১২৯ টাকা, লোন্ এবং অন্যান্য সিকিউরিটীতে ৩,১৫,১২৬ টাকা খাটিতেছে।

১৯৩২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কোম্পানীর শেষ ভ্যালুয়েশন হয়। তাহাতে আজীবন বীমায় প্রতি হাজার টাকার পলিসিতে ১৫ টাকা এবং মেয়াদী বীমায় প্রতি হাজার টাকার পলিসিতে ১৩ টাকা হিসাবে বোনাস্ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের শেষে কোম্পানীর পরবর্ত্তী ভ্যালুয়েশন হইবে। তাহার ফলও সন্তোষজনক হইবে আশা করা যায়।

আমাদের মন্তব্য

ক্যালকাটা ইনসিওরেন্সের রিপোর্টে ও হিসাবে আমরা তাহার উত্তরোত্তর উন্নতির পরিচয় পাইতেছি। বর্ত্তমান সময়ে সকল দিকে টানাটানির মধ্যেও কোম্পানীর কারবার যে বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহাই বিশেষ সুখের বিষয়।

এই কোম্পানী অধিক বৎসরের পুরাতন নহে। অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ উন্নতির পরিচয় অনেকেই দিতে পারে না। আমরা নিম্নে কোম্পানীর সাত বৎসরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। তাহাতে বুঝা যাইবে, কোম্পানী কার্য্যক্ষেত্রে ক্রমশঃ কিরূপ অগ্রসর হইতেছে।

সাল	বিক্রীত পলিসির মূল্য টাকা	প্রিমিয়াম আয় টাকা	জীবনবীমা তহবিল টাকা	মোট তহবিল টাকা
১৯৩০	৭২২০০০	১৪৮০০০	১৫৭০০০	৩৮২০০০
১৯৩১	৭৩০০০০	১৫৬০০০	২০০০০০	৪৭৪০০০
১৯৩২	১২১৮০০০	১৯০০০০	৩১৪০০০	৫২১০০০
১৯৩৩	১৬৬৪০০০	২১৬০০০	৩৮৬০০০	৬০৭০০০
১৯৩৪	১৮০৯৫০০	২৮০০০০	৫২০০০০	৭৮৭০০০
১৯৩৫	২০১৮৯৫০	৩১৫১৩২	৬৬৬২৩১	৯৪৪৭৩০
১৯৩৬	২০৭২৬৭০	৩৫৫৬৬০	৮৪২৩৭৭	১১৭৩৬৮৪

ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স বেশীদিন স্থাপিত হয় নাই। সাধারণতঃ বীমা কোম্পানী সমূহের প্রাথমিক খরচ এত বেশী হয় যে পাঁচ বৎসরে প্রথম ভ্যালুয়েশনের সময় অতি অল্প কোম্পানীর ভাগ্যে Surplus বা বাড়্‌তি দেখা যায়। অধিকাংশ কোম্পানীরই ভাগ্যে এই প্রথম পঞ্চবার্ষিক ভ্যালুয়েশনে ঘাট্‌তি দেখা যায়। ক্যালকাটা ইনসিওরেন্সের বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রথম ভ্যালুয়েশনেই সকল খরচ এবং দেনা পাওনা মিটাইয়া বাড়্‌তি দেখা যায় এবং কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রথম ভ্যালুয়েশনেই প্রতি হাজার টাকার পলিসির উপর বার্ষিক ৫ টাকা হারে বোনাস্‌ ঘোষণা করেন।

১৯৩২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ইহার দ্বিতীয় ভ্যালুয়েশন হয়। এই ভ্যালুয়েশনে এতাধিক Surplus বাহির হয় যে কর্ত্তৃপক্ষ ১৫৲ টাকা এবং ১৩৲ টাকা হারে বোনাস্‌ ঘোষণা করিতে সমর্থ হন। আগামী ৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইহার তৃতীয় ভ্যালুয়েশন হইবে। আমরা পূর্ব্বাপর এই কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়দের যেরূপ ব্যয় সঙ্কোচ এবং চারিদিকে সর্ব্বদা শ্যেন চক্ষু দেখিতে পাইতেছি তাহাতে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে এবারও ক্যালকাটা ইন-সিওরেন্স তাহাদের বোনাসের রেকর্ড ঠিক রাখিবে।

প্যালাডিয়াম য়্যাসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ আরম্ভিক অনুষ্ঠান

বিগত ১৩ই মে এলবার্ট হলে উপরোক্ত বীমা কোম্পানীর কার্য্যারম্ভিক অনুষ্ঠান মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। অবসর প্রাপ্ত সেসন জজ মিঃ পান্নালাল বসু এম, এ, বি, এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে জনৈকা বালিকা একটী সংগীত করেন। কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ জে, আর, ব্যানার্জি নূতন কোম্পানীর সফলতা কামনা করিয়া বলেন, এই কোম্পানীর দুইটি শাখা আছে। একটি সাধারণ, আর একটি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল। ইহা শ্রমজীবীদিগের জীবন বীমার একটি প্রতিষ্ঠান। শ্রমজীবীদিগের দলে দলে এই কোম্পানীতে জীবনবীমা করা উচিত। এই কোম্পানী বেশ মিতব্যায়িতার সহিত সুচারুরূপে কার্য্যে পরিচালন করিতেছে।

সভাপতি মিঃ পান্নালাল বসু কোম্পানীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বলেন; বড়ই আনন্দের বিষয় যে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রথম দিনেই ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়াছেন। আশার কথা এই যে, এই কোম্পানীটি দেশী। জীবনবীমা কোম্পানীর সফলতা হইলেই বুঝিতে হইবে যে আমরা জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আমি এই কোম্পানীর সফলতা ও উন্নতি কামনা করি।"

মিঃ জে, এন, বসু কোম্পানীর পরিচালক দিগকে সতত সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া সকল বাধা বিঘ্ন, বিপদ অতিক্রম করিতে উপদেশ দেন।

মিঃ এস, সি, রায় বলেন যে আমাদের দেশে সুপরিচালিত জীবন বীমা কোম্পানী যতই প্রতিষ্ঠিত হয় ততই মঙ্গল। কারণ এদেশে এখনো ষ্টেট্ হইতে জীবন বীমা করা বাধ্যতামূলক হয় নাই।

সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

মিঃ জে, এন, বসু এম, এল, এ, মিঃ জে, সি, ঘোষ দস্তিদার (বম্বে মিউচুয়াল), রায় পান্নালাল মুখার্জি বাহাদুর জমিদার উত্তরপাড়া, মিঃ এস, পি, বসু (ন্যাশনাল ইণ্ডিয়া), ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল এম, এল, এ, মিঃ এস, পি, বসু (ব্যবসা ও বাণিজ্য), মিঃ এন, সি, ঘোষ (অমৃতবাজার), মিঃ কে, সি, ব্যানার্জি (ভাগ্যলক্ষ্মী), মিঃ এস, এন ঠাকুর (হিন্দুস্থান) মিঃ এ, বি, ঘোষ (ন্যাশনাল) প্রভৃতি।

মিঃ বি, এন, চন্দ্রের নেতৃত্বে কম্বুলিয়াটোলা ব্যায়াম সমিতির সভ্যগণ নানাপ্রকার ব্যায়াম ক্রীড়া দেখাইয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। ভদ্রকালী সবিতা কনসার্টের দল সুমিষ্ট কনসার্ট বাজাইয়া নিমন্ত্রিতগণকে আনন্দ দান করেন।

এই নূতন কোম্পানীর সেক্রেটারীগণ অভ্যাগত দিগকে আদর অভ্যার্থনায় তৃপ্তি দান করেন।
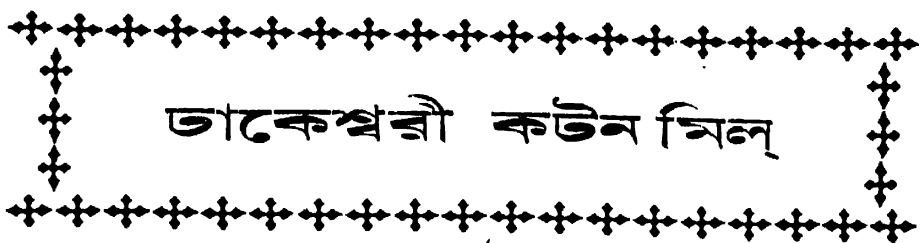
ঢাকেশ্বরী কটন মিল্

(চতুর্দ্দশ বার্ষিক রিপোর্ট)

(১৯৩৬)

আমরা ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ১৯৩৬ সালের (চতুর্দ্দশ বার্ষিক) হিসাব ও রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। এই রিপোর্ট হইতে বেশ বুঝা যায়, ঢাকেশ্বরী উত্তরোত্তর কিরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও যে ঢাকেশ্বরী কটন মিল এতাদৃশী উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা শুধু যে ব্যবসায়ের দিক হইতেই প্রশংসনীয় তাহা নহে,—বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবের দিক দিয়াও বিশেষ আনন্দের বিষয়। কারণ, ঢাকেশ্বরী কটন মিল সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। মূলধন, পরিচালনা, শ্রমিক, কর্ম্মচারী প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে খাঁটী বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান বলিতে যাহা বুঝায়,—ঢাকেশ্বরী তাহাই। আমরা এসম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আমাদের গত বৎসরের (১৩৪৩ সালের) ফাল্গুন মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" আলোচনা করিয়াছি। পাঠকগণকে আমরা পুনরায় উহা পড়িতে অনুরোধ করি।

চারিদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের দুরবস্থা,—বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্পে জাপান, ইংলণ্ড, বোম্বাই এবং আহমদাবাদের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ঢাকেশ্বরী কটন মিল আলোচ্য বর্ষে (১৯৩৬ সালে) মোট ৭,৮৭,৪৫২ টাকা লাভ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে (১৯৩৫ সালে) লাভ হইয়াছিল, ৭,১৭,৩৬৮ টাকা। সুতরাং দেখা যায় লাভের পরিমাণ ৭০০৮৪ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মোট লাভের টাকা হইতে ৩,১৯,১০১ টাকা খরচ বাবদে বাদ দিয়া নিট্ লাভ দাঁড়াইয়াছে ৪,৬৮,৩৫১ টাকা। ইহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের লভ্যাংশের জের ৬৯,৫০৬ টাকা যোগ করিলে ৫,৩৭,৮৫৭ টাকা মোট লাভ হয়। এই লাভের টাকা নিম্নলিখিত ভাবে বিলি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে,—

(১) শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখিবার জন্য ১,১৭,০৮৭ টাকা।

(২) শতকরা ১০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়ার জন্য ২,৭০,১৪৩ টাকা।

(৩) লভ্যাংশ সমীকরণ ফণ্ডে দেওয়ার জন্য ১,৫০,০০০ টাকা।

(৪) ১৯৩৭ সালের লাভ লোকসানের হিসাবে জমা রাখিবার জন্য অবশিষ্ট ৩,০৬,২৫৮ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে মিলের সূত্ররঞ্জন বিভাগে একটি চীজ্ ডাঈং (Cheese Dyeing) কল এবং একটি মার্সিরাইজিং (Mercirising) কল বসান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বয়ন বিভাগে একটি হাই স্পীড্ ওয়াইণ্ডিং মেসিন (High

Speed Winding Machine) এবং আরও কতগুলি ছোট খাট কল কব্জা বসান হইয়াছে। ইহার জন্য মোট খরচ হইয়াছে ৫২৫২২ টাকা। শ্রমিকদের জন্য অতিরিক্ত বাসস্থানের অভাব দূরীকরণার্থে চারিটী বৃহৎ তে-তলা পাকা বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীতে ৫১টি বড় বড় কাম্‌রা আছে। তাহাতে প্রচুর আলো বাতাস খেলে।

ইষ্টবেঙ্গল জুট্‌ এণ্ড কটন মিলের সহিত ঢাকেশ্বরী কটন মিলের একীকরণ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার জন্য আইন সঙ্গত প্রয়োজনীয় বাহ্যিক ব্যবস্থা সমস্তই হইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই এসম্বন্ধে দলিল পত্র লেখা পড়া এবং রেজেষ্টারী হইয়া যাইবে। ঐ মিল চালাইবার জন্য ৫৬০০ অশ্বশক্তি (Horse Power) বিশিষ্ট একটি টারবাইন (Turbine) দুইটি বয়লার (Water-tube Boiler) এবং ২১,২৮০টি টাকুর অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্রই উহার বয়ন বিভাগের কল কব্জাদিরও অর্ডার দেওয়া হইবে। ঐ সব আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে বসাইবার এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে যেন, আগামী বৎসরের প্রথম ভাগেই বয়ন কার্য্য আরম্ভ করা যায়।

আলোচ্য বৎসরের রিপোর্টে মামলা সম্পর্কিত প্রধান ঘটনা কোম্পানী আইনের ২৮২ ধারার মামলা। ইহার বিবরণ বাংলাদেশের সকলেই অবগত আছেন। আমাদের গত বৎসরের (১৩৪৩ সালের) ভাদ্র মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় তাহা বিস্তারিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকেশ্বরী কটন মিলের

তহবিল হইতে ঋণ অথবা ওভার ড্রাফট্ (Over draft) হিসাবে ইষ্টবেঙ্গল জুট্ এণ্ড কটন মিল্‌কে যে আর্থিক সাহায্য করা হইয়াছিল তাহা ব্যালান্স্ সীটে পৃথকভাবে বিশেষ করিয়া দেখান হয় নাই বলিয়া কোম্পানী আইন অনুসারে দূষণীয় বলিয়া সাব্যস্ত হয়। বাস্তবিক উহা সাধারণ ভুল মাত্র,—কোন প্রকার অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত নহে। পক্ষান্তরে, এই আর্থিক সাহায্য এবং ইহার পরে ইষ্টবেঙ্গল জুট্ এণ্ড কটন মিলের প্রতিনিধি ম্যানেজিং ডিরেক্টার গণের এবং ঢাকেশ্বরীর ডিরেক্টর গণের মধ্যে যে চুক্তি হয়, তাহাতেই ঢাকেশ্বরী মিল কর্তৃক উক্ত ইষ্টবেঙ্গল জুট্ এণ্ড কটন মিলের সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিবার পথ অবাধ ও সুপ্রশস্ত হইয়াছে। আমরা অবগত আছি, ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণ অন্যান্য স্থান হইতে,—এমন কি ঢাকার বহু ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট হইতেও অধিকতর সুবিধাজনক সর্ত্তে সাহায্যের প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। এই সকল প্রস্তাব খুব লোভনীয় ছিল। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ঐ ইষ্ট-বেঙ্গল জুট্ এণ্ড কটন মিলটিকে স্বাধীন ও পৃথক ভাবে চালাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা দৃঢ়চিত্তে সেই সকল লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রথম হইতেই ঢাকেশ্বরী কটন মিলকে উহার সহিত মিলিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন।

ঢাকা সেসন জজের বিচারে অভিযুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণ খালাস পান। কিন্তু হাইকোর্ট সেই রায় উল্টাইয়া তাঁহাদিগকে তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছিলেন।

তৎপরে দণ্ডিত ব্যক্তিগণ সপারিষদ মহামাননীয় গভর্ণর বাহাদুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আবেদন করেন। এতদ্দেশীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও বহু কোম্পানী সকল এই আবেদন সমর্থন করিয়া দেখাইয়া ছিলেন যে, এমনকি এই মিলের পরিচালনা কার্য্য হইতে এই ব্যক্তিত্রয়ের সাময়িক অভাবে এই উদীয়মান ঢাকেশ্বরী মিলকে বহু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এই আবেদন পাইয়া সপারিষদ মহামাননীয় গভর্ণর বাহাদুর কারাদণ্ডের পরিবর্ত্তে জরিমানা করিয়া শাস্তি লাঘব করেন। এতদ্বিষয়ে সপারিষদ গভর্ণর বাহাদুরের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"এই মোকদ্দমায় জন সাধারণের স্বার্থের পক্ষে এমন কতকগুলি বিবেচ্য বিষয় আছে যাহা কোর্ট কর্ত্তৃক বিবেচিত হয় নাই বা কোর্টের বিবেচনাধীনে আসে নাই; যথা—উক্ত মিলের যে তিনজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর সেই তিনজনই একসঙ্গে এতদিনের জন্য জেলে গেলে মিলটীর ভবিষ্যৎ কি হইবে?

আমার নিকট যে আবেদন করা হইয়াছে তাহার সত্যতার সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই। ঢাকেশ্বরী কটন মিল যে দীর্ঘকাল ধরিয়া খুব কৃতিত্ব এবং সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতেছে ইহা সত্য এবং এই মিলে বহুসংখ্যক লোক জীবিকার্জ্জন করিয়া খাইতেছে ইহাও সত্য। আজ একসঙ্গেই যদি তিনজন পরিচালকই জেলে আবদ্ধ হ'ন তবে মিলটী এবং মিলের সংসৃষ্ট অসংখ্য লোক পথে বসিবে। সুতরাং আবেদনকারীগণের এই নিবেদনের সমীচীনতা সম্বন্ধে যে যথেষ্ট ভিত্তি আছে তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট সন্দিহান নহেন। এমতাবস্থায় আবেদনকারীগণ

কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে এই ক্রমোন্নতিশীল মিলটী, যাহা এযাবৎ বহুলোকের অন্নসংস্থান করিয়া আসিতেছে তাহার উন্নতির পথে বহু অন্তরায় উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। যদিও ভারতীয় কোম্পানী আইন বিষয়ক শাসন সংরক্ষণমূলক বিষয় বিশেষের আইনগত চরম যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা বাহির করিয়া লওয়াই এই আপীল রুজ্ করা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া সপারিষদ মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর জেলের পরিবর্ত্তে ডিরেক্টরদিগের প্রত্যেককে আরও ৫০০৲ টাকা জরিমানা করাই সাব্যস্ত করিলেন এবং তাহা হইলে সাধারণের স্বার্থ এবং আইনের মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন থাকিবে।"

এইরূপে ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণের কারাদণ্ডের আদেশের পরিবর্ত্তে আরও ৫০০৲ টাকা জরিমানা করা হইল অর্থাৎ উক্ত আদেশানুযায়ী প্রত্যেকের ১০০০৲ টাকা জরিমানা করা হইল। যখন তিনজন ম্যানেজিং ডিরেক্টারের বিরুদ্ধে আনীত মামলা এই ভাবে সমাপ্ত হইল, তখন সেই একই অংশীদার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রমোহন ঘোষাল মহাশয় নিম্ন প্রাথমিক বিচারালয়ে কোম্পানীর অবশিষ্ট ডিরেক্টরগণের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার নিমিত্ত আবেদন করেন; কিন্তু উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য হয়। কেবল প্রাথমিক বিচারালয়েই তিনি মামলা রুজু করিয়া ক্ষান্ত হ'ন নাই। সেখানে হারিয়া গেলে পুনরায় হাইকোর্টে আপীল করেন; কিন্তু হাইকোর্টে ও আপীল টিকে নাই। ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণের জরিমানা বাবদ ৩০০০ টাকা কোম্পানীর তহবিল হইতে দেওয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণের কর্ম্মকুশলতা এবং পরিচালন দক্ষতা যে কোম্পানীর অংশীদারগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়। মামলার খাতে কোম্পানীর খরচ হইয়াছে মোট ৯,৭৩৮ টাকা। আয় ব্যয়ের হিসাবে ইহা দেখান হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নীলকমল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আনীত দেওয়ানী মামলা,—যাহা বর্ত্তমানে হাইকোর্টের বিচারাধীন আছে,—এবং ইনকাম ট্যাক্সের

মামলা যাহার রায় কোম্পানীর স্বপক্ষে হওয়ায় কোম্পানীর বৎসর বৎসর অনেক হাজার টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে,—এই সকল মামলার খরচও ইহার মধ্যে ধরা আছে।

যদি ইষ্টবেঙ্গল জুট এণ্ড কটন মিলটি একটী স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান থাকিত তবে কোম্পানী আইনের ২৮২ ধারার মামলার খরচা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টারদিগের জরিমানার টাকা উক্ত জুট এণ্ড কটন মিলকে দিতে হইত। কিন্তু উক্ত কোম্পানী তাহার সমস্ত দায় ও সম্পত্তি সহ ঢাকেশ্বরী মিলের অঙ্গীভূত হইয়াছে। সুতরাং ম্যানেজিং ডিরেক্টারগণ উক্ত মামলার খরচা ও তাহাদের জরিমানার টাকা এই কোম্পানীর নিকট হইতে সর্ব্বতোভাবে পাইবার যোগ্য।

কোম্পানীর মোট মূলধন ৩০ লক্ষ টাকার মধ্যে ইস্যু করা এবং বিক্রীত মূলধনের পরিমাণ ২৪,০১,৪৩০ টাকা। কোম্পানীর মোট সম্পত্তি ও স্থিতির পরিমাণ ৪৫,৬৩,৬৭৬ টাকা। আলোচ্য বৎসরে কাপড়, সূতা ও অব্যবহার্য্য তুলা ইত্যাদি বিক্রয় হইতে মোট ৩৮,১৮,৯২০ টাকা আয় হইয়াছে। তন্মধ্যে কাপড় বিক্রয় বাবদ ৩৫,০০,৪৮২ টাকা এবং সূতা বিক্রয় বাবদ ২,৯০,৪৪৬ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসর ঢাকেশ্বরী তাহার অংশীদারগণকে শতকরা ১০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে। ঢাকেশ্বরীর এই গৌরবজনক অপূর্ব্ব সাফল্যে আমরা তাহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।
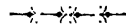
ওরিয়েণ্ট্যাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ য্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানী লিঃ

১৯৩৬ সালের হিসাব ও রিপোর্ট

গত ১৩ই মে বোম্বাই সহরে ওরিয়েণ্টাল বিল্ডিংস ভবনে, ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট লাইফ য্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর ৬২ তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে কোম্পানীর ১৯৩৬ সালের হিসাব ও রিপোর্ট আলোচিত হয়। কোম্পানীর চেয়ারম্যান্ স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আমরা নিম্নে সভাপতির বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং হিসাব ও রিপোর্টের সারাংশ প্রকাশ করিলাম।

চেয়ারম্যানের বক্তৃতা

ইহা অতি আনন্দের বিষয় যে কোম্পানী উন্নতির আর একটী শিখরে আরোহণ করিল,—নূতন কারবারের পরিমাণেই তাহা দেখা যাইতেছে। আলোচ্য বৎসরে ১০কোটী ২৬ লক্ষ টাকার উপর নূতন বীমা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমাদের কোম্পানী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে পূর্ব্বে যেমন দশম স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল, এখনও গৌরবের সহিত সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। নূতন বীমার প্রস্তাব ও ইস্যু-করা পলিসির সংখ্যা হিসাবে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে আমাদের কোম্পানীর স্থান পঞ্চম। প্রিমিয়ামের আয় সম্বন্ধেও আমাদের কোম্পানী উন্নতির আর এক সোপানে উঠিয়াছে। আলোচ্য বৎসরের হিসাবে দেখা যায়, ইহার পরিমাণ হইয়াছে প্রায় তিন কোটী টাকা, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী।

আলোচ্যবর্ষে স্থদ বাবদে নিট আয় হইয়াছে ৮২½ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা এই আয় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে। যে সকল সিকিউরিটীতে কোম্পানীর তহবিলের টাকা লগ্নী আছে, তাহার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে এই সুদের হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৪·৭০ টাকা। যদি এই মূল্যবৃদ্ধি ধরা না হয়, তবে সুদের হার শতকরা প্রায় ৫ টাকা হয়। পূর্ব্ব বৎসরেও সুদের হার এইরূপ হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ সুদের হারে টাকা লগ্নী করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছে, একথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং আমাদের কোম্পানী সুদ বাবদে যাহা আয় করিয়াছে, তাহা সন্তোষজনকই বলিতে হইবে।

কোম্পানীর বাতিল পলিসির সংখ্যা গত বৎসর অপেক্ষা এবার কিছু কম হইয়াছে। বস্তুতঃ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাতিল পলিসির সংখ্যা এরূপ কম দেখা যায় নাই।

আলোচ্য বর্ষে মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫৬॥৹ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই দাবীর পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা বেশী হইলেও কোয়েটার ভূমিকম্পে মৃত্যুজনিত ২॥৹ লক্ষ টাকার দাবী পূর্ব্বোক্ত দাবীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অতর্কিত বিপদপাত না হইলে কোম্পানীর মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ আলোচ্য বর্ষে কমই হইত। কারণ ভূমিকম্পে মৃত্যুজনিত দাবী সাধারণ দাবীর মধ্যে ফেলা যায় না।

বীমাকারীদের মধ্যে যত মৃত্যু আশা করা গিয়াছিল, শতকরা তাহার ৫০'৬ ভাগ মাত্র মৃত্যু ঘটিয়াছে। তার পূর্ব্ব বৎসরে (১৯৩৫) হইয়াছিল শতকরা ৫৪'২। কোম্পানীর অতীত ইতিহাসে এত কম মৃত্যুর হার দেখা যায় না।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২২'৯ টাকা পরিচালনা খরচ হইয়াছে। ১৯৩৫ সালে ২২'৪ এবং ১৯৩৪ সালে ২৩'১ পরিচালনা খরচ হইয়াছিল। এজেণ্টদের কমিশন বাবদে একটু বেশী খরচ হওয়ায় এই সামান্য বাড়তি ঘটিয়াছে। অন্যান্য দফাতে খরচ পূর্ব্ব বৎসরের মতই হইয়াছে। ডিরেক্টরগণের নির্দ্দেশ অনুসারে কোম্পানীর তহবিল হইতে গুণ্টরের ঝটিকাবিধ্বস্ত পল্লীবাসীদের সাহায্যার্থে এক হাজার টাকা দান করা হইয়াছে। এখানে এজেণ্টদের কমিশন সম্বন্ধে বিশেষ একটী কথা বলা দরকার। গত দশবৎসর ধরিয়া বিদেশী কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় এদেশে এজেণ্টদের কমিশনের হার অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। বিদেশী কোম্পানী এদেশে অধিক পরিমাণে বীমা সংগ্রহ করিবার জন্য অতি উচ্চহারে কমিশনের লোভ দেখায়, তাহারা প্রথম বৎসরের কমিশন এত বেশী দেয় যে, তাহা ন্যায্য পাওনার সীমা ছাড়াইয়া অত্যন্ত অতিরিক্ত ও অবাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ ইহার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী সমূহের মধ্যে রিবেট প্রথার উদ্ভব হয়। বীমাব্যবসায় ক্ষেত্রে এই উভয় প্রকার দুর্নীতি এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত নূতন প্রস্তাবিত বীমা আইনে, কয়েকটী ধারা সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। আমার মনে হয়, এসম্বন্ধে এজেণ্টদের মনোভাব একটু পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহাদের বুঝা উচিত, কোম্পানী তাঁহাদিগকে কমিশন বাবদে যে টাকা দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের পরিশ্রমের জন্যই দেন, সেই টাকা দ্বারা পলিসি হোল্ডারের প্রিমিয়াম কমান উদ্দেশ্য নহে। পলিসি হোল্ডারদের প্রিমিয়ামের হার কোম্পানী নিজের সুবিধামত কমাইবেন, সে বিষয়ে এজেণ্টদের ভাবিবার দরকার নাই। আমার মনে হয় কমিশনের বর্ত্তমান হার কমাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রিমিয়ামের হারও কমাইলে, কোম্পানী, এজেণ্ট এবং বীমাকারী পলিসি হোল্ডার সকলেরই মঙ্গল।

আলোচ্য বৎসরের হিসাবে দেখা যায়, কোম্পানীর মোট তহবিল প্রায় ১৯ কোটী টাকায় উঠিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহার পরিমাণ আড়াই কোটী টাকা বেশী। কোম্পানীর ষ্টক এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটীর মূল্য প্রায় ৫৯॥৹ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই তহবিল বাড়তির সুযোগ ঘটিয়াছে।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর বাজার দর কমিয়া গিয়াছে। ইহা একদিকে কোম্পানীর পক্ষে ভালই হইয়াছে। কারণ কোম্পানী

অন্য এমন সিকিউরিটীতে টাকা লগ্নী করিবার সুযোগ পাইয়াছে, যাহাতে সুদের হার কিছু বেশী। এক্ষণে যে সকল সিকিউরিটীতে কোম্পানীর টাকা লগ্নী আছে, তাহার বাজার দর কোম্পানীর হিসাবের খাতায় উল্লিখিত মূল্য অপেক্ষা দুইকোটী ৪০ লক্ষ টাকা বেশী। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট সিকিরিটীর মূল্য আরও কমিলেও আমাদের কোম্পানীর তাহাতে আশঙ্কার বিষয় এমন কিছু নাই।

হিসাব ও রিপোর্ট

(হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে)

নূতন বীমার পরিমাণ :—আলোচ্য বৎসরে ১৪১৮২৪৮২১ টাকা মূল্যের ৭৮৯১১টি নূতন বীমার প্রস্তাব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১০২৬৩০৪৯৬ টাকা মূল্যের ৫৬২৯৬টি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তৎসম্পর্কে পলিসি ইস্যু করা হয়। আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়ামের আয় ৫৫,৫০,৩৫২৲। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পলিসির সংখ্যা ৭৪৩৮ এবং বীমার পরিমাণ ১৩৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসবে একটি জীবন বীমায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের পলিসি হইয়াছে এক লক্ষ টাকা।

মোট মজুত বীমা :—

কোম্পানীর মোট মজুত বীমার পরিমাণ ৩২৭৩১০টী চল্‌তি পলিসির উপর (বোনাস্ ও ট্রিপল্ বেনিফিট্ সহ) ৬৫৫০০১২৭৮ টাকা। ইহার মধ্যে ২৮৩৬৭৯৮ পুনর্ব্বীমা করা আছে। চল্‌তি য়্যানুইটীর পরিমাণ, ৬৩০৭২ টাকা মূল্যের ৯৮টী। তন্মধ্যে ১৮৫৪ পুনর্ব্বীমা করা আছে। আলোচ্য বৎসরে ২৮৭৫ টাকা মূল্যের য়্যানুইটি শেষ হইয়া গিয়াছে।

দাবীর পরিমাণ :—

আলোচ্য বৎসরে বোনাস্ সহ মোট দাবী হইয়াছে ১১৯৪৪২২৩ টাকা। তাহার বিস্তৃত হিসাব এইরূপ,—

(১)	মৃত্যুজনিত	৫৭৬৬৬১৭ টাকা
(২)	মেয়াদ শেষ জনিত	৬৫৫৯০৫৯ „
	পুনর্ব্বীমার দরুণ বাদ	১১৪৮৫৭

আয় ব্যয় ও তহবিল :—

আলোচ্য বৎসরে মোট আয়ের পরিমাণ ৪৪৭২৭৭২৪ টাকা। প্রিমিয়াম বাবদে আয় হইয়াছে ২৯৯০৯৮৮৭ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের প্রিমিয়াম অপেক্ষা ৩২৮৮৬৯২ টাকা বেশী হইরাছে। খরচ হইয়াছে মোট ২১৩৪৫৯৬৭ টাকা। খরচ বাদে হাতে আছে ২৩৩৮১৭৫৬ টাকা। কোম্পানীর মোট তহবিলের পরিমাণ বৎসরের শেষে ১৯৩৫৪৪২৪৭ টাকায় উঠিয়াছে। প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২২·৯ টাকা খরচ হইয়াছে। ১৯৩৫ ও ১৯৩৪ সালে ইহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ২২·৪ টাকা ও শতকরা ২৩·১ টাকা। গত দুই বৎসর ধরিয়া এজেণ্টদের কমিশন বাবদে বেশী খরচ হওয়াতে খরচের অনুপাত সামান্য পরিমাণ বাড়িয়াছে।

মোট সম্পত্তি ও মূলধন :—

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২০০৪০০২৬৪ টাকা। তন্মধ্যে লগ্নী আছে, ১৬৪০৯১৩৬৬ টাকা, জমি ও বাড়ী সম্পত্তি (ভারতে ও ভারতের বাহিরে) ৫০৯৯০৮৪

টাকা; পলিসি বন্ধকী ঋণ ২০২৫৭৬০৪ টাকা এবং আসবাব পত্রও যন্ত্রপাতির মূল্য ৩৬২২১৬ টাকা। কোম্পানীর রেজেষ্টারী কৃত মূলধন দশ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬ লক্ষ টাকা পুরাপুরি আদায় হইয়া গিয়াছে।

আমাদের মন্তব্য ঃ—

সূর্য্যকে যেমন প্রদীপ জ্বালাইয়া দেখাইতে হয় না,—তেমনি ওরিয়েণ্ট্যালের উন্নতির পরিচয় টীকা টিপ্পনীর দ্বারা বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। পলিসির সংখ্যা হিসাবে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ওরিয়েণ্ট্যালের স্থান পঞ্চম এবং নূতন বীমার পরিমাণ হিসাবে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ওরিয়েণ্ট্যালের স্থান দশম,—এই দুইটি কথাতেই প্রকাশ পায়, ওরিয়েণ্ট্যাল ভারতের কত বড় গৌরবময় প্রতিষ্ঠান। বাস্তবিক জগতের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে ওরিয়েণ্ট্যালই ভারতের মুখ রক্ষা করিয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর মূল্য কমিয়া যাওয়াতে এবং সর্ব্বত্র সুদের হার পড়িয়া যাওয়াতে অনেক কোম্পানীরই আয় অল্প বিস্তর গিয়াছে,—কিন্তু সুব্যবস্থা ও পরিচালন কৌশলের ফলে ওরিয়েণ্ট্যালের গায়ে আঁচড়টিও লাগে নাই। কোম্পানীর হিসাবে দেখা যায়, ডিরেক্টরগণ ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট্ রিজার্ভ তহবিলের সমগ্র ২৫ লক্ষ টাকা জীবনবীমা তহবিলের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। ষ্টক্ এক্‌চেঞ্জ্ সিকিউরিটীর মূল্য বৃদ্ধির দরুণ ৫৯৷৷০ লক্ষ টাকাও ঐ জীবনবীমা তহবিলের সামিল করা হইয়াছে। চেয়ারম্যান মাহাদয়ের বক্তৃতায় প্রকাশ, কোম্পানীর বাতিল পলিসির সংখ্যাও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কম হইয়াছে। তিনি রিবেট্ ও কমিশন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। নূতন প্রস্তাবিত আইনে এসম্বন্ধে উপযুক্ত বিধান থাকা দরকার। ওরিয়েণ্ট্যালের পরিচালক,—বিশেষতঃ ইহার বাংলা দেশের কর্ম্মচারিগণকে তাঁহাদের সফলতার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়া আমাদের মন্তব্যের উপসংহার করিতেছি।

নিউ এশিয়াটিক লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

১৯৩৬ সালের হিসাব ও রিপোর্ট

আমরা উপরোক্ত কোম্পানীর ১৯৩৬ সালের তৃতীয় বার্ষিক হিসাব ও রিপোর্ট পাইয়াছি। নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম এবং আমাদের মন্তব্য প্রকাশিত হইল ;—

(হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে)

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৪২,৭০,৭৫০ টাকা মূল্যের ২৪৭৪টী বীমার প্রস্তাব পাইয়াছে। তন্মধ্যে ৩০,৬৫,৭৫০ টাকা মূল্যের ১৮১৫টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহার উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা নূতন কাজে পরিমাণ শতকরা ২২ টাকা বাড়িয়াছে।

কোম্পানীর মোট আয় হইয়াছে ২,৬৫,৮৪৮ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবদে আয় হইয়াছে ২,৪২,২৬২ টাকা। সুদ ও ডিভিডেণ্ড পাওয়া গিয়াছে ৩০৯০ টাকা। শেয়ার বিক্রীর প্রিমিয়াম আদায় হইয়াছে ১৮৭৩৭ টাকা। সিকিউরিটী বিক্রয়ের দরুণ লাভ হইয়াছে ১৬২১ টাকা। অবশিষ্ট ১৩৭ টাকা অন্যান্য বাবতে আয় হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট দাবীর পরিমাণ দশটী পলিসি বাবদ ৩৪,৫০০৲ টাকায় দাঁড়ায় তন্মধ্যে ৫,৫০০ টাকার দাবী মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঁকী টাকার দাবী বছরের শেষে উপস্থিত হওয়ায় এবং দাবী-দারগণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি যথাসময়ে দাখিল করিতে না পারায় এ বছরের হিসাবে দেওয়া যায় নাই।

দেখা যায়, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আয় শতকরা ৮০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী পরিচালনা খরচ হইয়াছে মোট ১,৭৯,৯৯৭ টাকা। ইহার মধ্যে আসবাব পত্রাদির মূল্য হ্রাসও ধরা হইয়াছে।

কোম্পানী গঠনের জন্য প্রাথমিক খরচ ২০৩০৩ টাকা শোধ করা হইয়াছে। শেয়ার বিক্রীর দালালী বাবদে খরচ হইয়াছে ১৮৭৩ টাকা। এইসব খরচ খরচা দিয়া ৩০১২৩ টাকা জীবন বীমা তহবিলে জমা হইয়াছে।

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২১৩৪৭১ টাকা। তন্মধ্যে লগ্নীতে খাটিতেছে ১৩২২২৫ টাকা। অনাদায়ী প্রিমিয়াম ও সুদ রহিয়াছে ১৩৮১৭ টাকা। বিবিধ ডিপজিট আছে ৫৭৪ টাকা। নগদ ও ব্যাঙ্ক ব্যাল্যান্সে হাতে আছে ৪৭৭৬২ টাকা। মূল্য হ্রাস বাদে আসবাব পত্রাদি বাবদে ধরা হইয়াছে ৪৮৫৫ টাকা। কোম্পানী গঠনের জন্য রহিয়াছে ৮০০০ টাকা।

আমাদের মন্তব্য

নিউ এশিয়াটিক একটি নূতন কোম্পানী। এই ইহার তৃতীয় ব্যাল্যান্স সীট ও রিপোর্ট। অল্প সময়ের মধ্যে এই কোম্পানী যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে এই কোম্পানী বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রধান স্থান অধিকার করিবে। ভারতের ব্যবসায় জগতে সুপরিচিত লক্ষ্মীর বরপুত্র শ্রীযুত বি এম্ বিরলা এই কোম্পানীর চেয়ারম্যান এবং বিবিধ ব্যবসায়ের পরিচালক মেসার্স বিরলা ব্রাদার্স ইহার ম্যানেজিং এজেণ্টস্। ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য মিঃ এস্ কে বসু (কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র) এবং খান বাহাদুর এম্ আবদুল মমিন সি আই ই মহোদয়গণ নানা প্রকারে জনসাধারণের নিকট গণ্যমান্য এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ও শ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছেন। এই সকল কারণেই আমরা এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উজ্জল দেখিতে পাইতেছি।

১৯৩৫ সালে ইহার জীবন বীমা তহবিল ২০২ টাকা ছিল; এক বৎসরের মধ্যে এই তহবিল বাড়িয়া ৩০১২৩ টাকায় উঠিয়াছে। শতকরা হিসাবে এই বৃদ্ধির পরিমাণ গণণা করিতে গেলে বলিতে হয়, জীবন বীমা তহবিল শতকরা প্রায় ১৫০০ টাকা বাড়িয়াছে। হিসাবের আলোচনায় বলিয়াছি নূতন বীমার পরিমাণ ১৯৩৫ সাল অপেক্ষা শতকরা ২২ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৪ সালের তুলনায় দেখা যায় এই বৃদ্ধির হার শতকরা ১০০ টাকায় গিয়া দাঁড়ায়। কোম্পানী খুব সাবধানে টাকা লগ্নী করিয়া থাকে এবং লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে ডিপজিট আছে; অন্যান্য সিকিউরিটিতে লগ্নী আছে ৩৫৬০০ টাকা। এই সকল সিকিউরিটির যে মূল্য কোম্পানীর হিসাবের খাতায় ধরা হইয়াছে, বর্ত্তমান বাজার দর তাহা অপেক্ষা ৫০০০ টাকা বেশী।

এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টসগণ যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ দেখাইয়া বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে সকলকে মুগ্ধ করিতেছেন। আলোচ্য বৎসরেও তাঁহারা কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। এই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহারা কোন বারেই কিছুমাত্র পারিশ্রমিক লন নাই। এযাবৎ মোটের উপর তাঁহারা ৩৮ হাজার টাকা ছাড়িয়া দিলেন! তাঁহারা ভারতীয় বীমা ব্যবসায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যে পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও অভিনন্দিত করিতেছি।

কোম্পানীর গঠন কার্য্য খুব দ্রুত গতিতে অগ্রসর ও প্রসারিত হইতেছে। গত বৎসরই ভারতের প্রধান প্রধান সহরে কোম্পানীর ব্রাঞ্চ আফিস ও এজেন্সী খোলা হইয়াছে। সম্প্রতি আফ্রিকাতে এবং ভারতের ফরাসী অধিকৃত স্থান সমূহেও কোম্পানীর কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহু লোকের অনুরোধে কোম্পানীর পরিচালকগণ পুনরায় শতকরা ৫০ টাকা প্রিমিয়ামে ৫০০০ টাকার শেয়ার ইস্যু করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য এত আবেদন আসে যে, কোম্পানী শতকরা প্রায় ৪০ খানা আবেদন অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হন। ইহাতেই বুঝা যায়, অল্প সময়ের মধ্যেই কোম্পানী জন সাধারণের কিরূপ বিশ্বাস ভাজন হইয়া উঠিয়াছে।

গত ১লা এপ্রিল হইতে তাজ ইন্সুর্যান্স কোম্পানী এবং ষ্টার অব ইণ্ডিয়া ইন্সুর্যান্স কোম্পানী মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত কোম্পানীর নাম হইল "The Star of India Insurance Co. Ltd (With which is amalgamated the Taj Insurance Co. Ltd)." ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার আফিসে, তাজের আফিস উঠিয়া আসিয়াছে।

—:*:—

ইণ্ডিয়ান ইন্সুর্যান্স ইন্ষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট এবং "এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়ার" মিঃ এ, সি সেন, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ইহার প্রেসিডেণ্ট স্যার হরিশঙ্কর পালও বীমা ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট এবং বীমার কারবারে বিশেষ উৎসাহী ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত।

—:*:—

জেনারেল য়্যাস্যুর্যান্স সোসাইটীর ম্যানেজার মিঃ পি ডি ভার্গব সম্প্রতি দীর্ঘকালের ছুটী নিয়াছেন। এই ছুটীর পরেই তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। আমরা শুনিলাম, তাঁহার পদে মিঃ পি জি ম্যারাথে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি পুনার বিখ্যাত য়্যাকচুয়ারী মিঃ জি এস্ ম্যারাথের পুত্র, এবং বিশেষ যোগ্য ব্যক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ইংলণ্ডে এবং এই দেশে কয়েকটী প্রধান বীমা কোম্পানীর কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

—:*:—

ভারত ইন্সুর্যান্স কোম্পানী সম্প্রতি নিম্ন লিখিত প্রকারে বাংলার কার্য্যভার বণ্টন করিয়াছেন,—(১) মিঃ অশোক চাটার্জ্জি, সেক্রেটারী কলিকাতা ব্রাঞ্চ (২) মিঃ করুণা কুমার নন্দী, সেক্রেটারী,—আসানসোল ব্রাঞ্চ

(৩) মিঃ জে সি বসু, সেক্রেটারী ঢাকা ব্রাঞ্চ (৪) মিঃ কে জি নিয়োগী, সেক্রেটারী জলপাইগুড়ী ব্রাঞ্চ।

গত ২৯ শে মে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের গৃহে ইন্‌ডিয়ান ইন্‌সুর‍্যান্স ফিল্ড-ওয়ার্কাস্ য়্যাসোসিয়েসনের বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বম্বে মিউচুয়্যালের মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হিন্দু মিউচুয়্যাল লাইফ য়্যাসুরেন্সের আফিস চিত্তরঞ্জন য়্যাভেনিউতে নিজ বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে। গত ২২ শে মে অনারেবল মিঃ জাষ্টিস্ সি সি বিশ্বাস সি আই ই, এই নূতন গৃহের উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

ট্রপিক্যাল ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চ আফিস গত ১লা জুন হইতে ১৪ নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট (উইণ্ডসর হাউস) কলিকাতা; এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

গত ৩১ শে মে ২নং রয়েল এক্‌চেঞ্জ প্লেসে ইণ্ডিয়ান ইন্‌সুর‍্যান্স ইনষ্টিটিউটের সপ্তম বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়াছে। ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এ সি সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১১ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রিট, কলিকাতা এই ঠিকানায় অবস্থিত মেসার্স ইণ্ডিয়া আণ্ডার রাইটার্স লিমিটেড, মাদ্রাজের প্রিমীয়ার ইন্‌সুর‍্যান্স য়্যাণ্ড বিল্ডিং সোসাইটী লিমিটেডের (বঙ্গ দেশীয়) প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিঃ এন্ আহম্মদ সাউথ ইণ্ডিয়ান জেনারেল য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর বেঙ্গল ব্রাঞ্চের ম্যানেজার এবং মিঃ সি জি গফুর বি এ, উহার অর্গেনাইজিং সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রভিডেণ্ট ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানী য়্যাসেসিয়েসানের আফিস ১৩৭ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট হইতে ২নং রয়েল এক্‌চেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

মিঃ ননীগোপাল তালুকদার হাবড়া জেলার জন্য ইণ্ডিয়ান মিউচুয়্যাল লাইফ য়্যাসোসিয়েশনের অর্গেনাইজিং অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। হাবড়া জেলার কার্য্য কলিকাতা ব্রাঞ্চের এলেকার মধ্যে।

গত ৫ই মার্চ্চ (১৯৩৭) ৪ এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটীর গৃহে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের প্রতিনিধি পলিসি হোল্ডার ও জন সাধারণের এক সভা হয়। মিঃ জে এন বসু এম এ, বি এল, এম্ এল এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভাতে প্রস্তাবিত নূতন বীমা আইন সম্বন্ধে আলোচনায় নির্দ্ধারিত হয় যে উহা নানা দিকে অসম্পূর্ণ, অসন্তোষজনক এবং আপত্তিকর। তাহার ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া মন্তব্য লিপি তৈয়ারী করিবার জন্য একটী কমিটি গঠিত হয়।

ঐ মন্তব্য লিপি গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান হইবে।

সিঙ্গাপুরের গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইফ য্যাস্থরান্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মিঃ কে ভট্টাচার্য্য তাঁহার কার্য্যে ইস্তাফা দিয়াছেন। তিনি প্রায় ১৫ বৎসর কাল এই কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৩৭ সালের জন্য ইণ্ডিয়ান লাইফ য্যাস্থর‍্যান্স অফিসেস্ য্যাসোসিয়েশনের নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন,—প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত কে শান্তনম্; ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস্ বি কার্ডমাষ্টার; অনারারী সেক্রেটারী মিঃ বৈরামজী হরমুস্‌জী; কমিটীর সদস্যগণ, মেসার্স্ এইচ ই জোন্স, কে সি দেশাই, জে এম কডিরিও, পি সি রায়, এ কে ঘোষ, কে এম নায়ক, এস্ পি বসু, ওয়াই মঙ্গাইয়া।

মিঃ এ রাজ গোপালম বি এ, এ আই এ স্থায়ী রূপে গবর্ণমেণ্টের য্যাসিষ্টাণ্ট য্যাক্‌চুয়ারী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে অফিসিয়েটিং গবর্ণমেণ্ট য্যাক্‌চুয়ারীর কার্য্য করিতেছেন। গতবৎসর জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত তিনি "ওরিয়েণ্ট্যালের" কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ঢাকার বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী রায় বাহাদুর শশাঙ্ক কুমার ঘোষ সি আই ই, মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা তাঁহার পুত্র, হিন্দুস্থানের সুযোগ্য কর্ম্মচারী মিঃ বিমল ঘোষের সহিত আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। রায় বাহাদুরের মত প্রবীন ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে হারাইয়া আজ শুধু ঢাকার নয়, সমগ্র বাংলাদেশের আইন ব্যবসায়ের ক্ষেত্র শ্রীহীন হইয়া পড়িল।

কার্য্য-বিস্তৃতি হেতু য্যাকমী ইন্‌স্থর‍্যান্স কোম্পানীর হেড আফিস ৫ ও ৬ নং হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে ১৯ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা, এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

নিউ এশিয়াটিকের মিঃ পি ডি রায় চৌধুরী কলিকাতা ব্রাঞ্চ আফিস হইতে হেড আফিসে বদলী হইয়াছেন। কোম্পানীর অর্গেনাইজিং সেক্রেটারী মিঃ আর রমন এক্ষণে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে কার্য্যোপলক্ষে ভ্রমণ করিতেছেন।

পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে দেওয়ান চমনলাল এম্ এল এ বে-কার বীমা বিষয়ক আইন উপস্থিত করিবেন। ইহাতে ২৬টী ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইউনিভারস্যাল প্রোটেক্টার ইন্‌স্থর‍্যান্স কোম্পানীর ডিরেক্টার কুমার অজিত প্রসাদ সিংহ দেও বিহার গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা কুমার সাহেব এবং কোম্পানী উভয়কেই অভিনন্দিত করিতেছি।

গ্রাণ্ড ন্যাশন্যাল ইন্‌স্থর‍্যান্স কোম্পানীর আফিস্ ৮৪।এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট হইতে ১৯১।এ বৌবাজার ষ্ট্রিটে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের ডিরেক্টার অব ইন্‌ডাষ্ট্রীজ এর আফিস ৪২ এ ফ্রি-স্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানা হইতে উঠিয়া ৭ নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা (ন্যাশন্যাল ইনস্যুর্যান্স বিল্ডিং) এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইন্‌স্যুর্যান্স কোম্পানীর ফিল্ড-ওয়ার্কার্স য়্যাসোসিয়েশনের (১৯৩৭-৩৮) সালের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন,—প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার; ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, মিঃ এস্ বাগচী এবং মিঃ এ কে গাঙ্গুলী; জেনারেল সেক্রেটারী, মিঃ এন প্রামাণিক; জয়েণ্ট সেক্রেটারী, মিঃ এন্ সি ঘোষ ও মিঃ শরদিন্দু সাহা; য়্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী মিঃ ভবতোষ ঘোষ ও মিঃ সদানন্দ বিশ্বাস; ধনাধ্যক্ষ মিঃ এস্ এন্ রায় চৌধুরী।

মিঃ হীরেন্দ্রকুমার সেন স্কটল্যাণ্ডের ফ্যাকাল্‌টি অব য়্যাক্‌চুয়ারীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ফ্যাকাল্‌টি অব য়্যাক্‌চুয়ারীর প্রথম ভারতীয় ফেলো এবং য়্যাক্‌চুয়ারীয়্যাল সায়েন্সের তৃতীয় ভারতীয় ফেলো। মিঃ সেন ১৯৩০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্ এস্ সি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস প্রথম হন। এক্ষণে তিনি পার্ল্‌-ইনস্যুর্যান্স কোম্পানী নামক গ্রেট ব্রিটেনের একটী বৃহৎ বীমা কোম্পানীতে কাজ করিতেছেন। শীঘ্রই তাঁহার স্বদেশে আসিবার সম্ভাবনা।

গত ১৬ই জুন ইউনিক য়্যাস্যুর্যান্স কোম্পানীর আফিসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দ্বাদশ মৃত্যু বার্ষিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়। তদুপলক্ষে আফিসের প্রশস্ত হলঘর সুন্দররূপে পত্র পুষ্পাদির দ্বারা সজ্জিত এবং কোম্পানীর পেট্রন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বৃহৎ প্রতিকৃতি মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়। রাধারমন দাস মহান্ত সুমধুর কীর্ত্তন গানে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের ১৯৩৭-৩৮ সালের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন,—প্রেসিডেণ্ট মিঃ এ সি সেন (এম্পায়ার)। ভাইস্ প্রেসিডেণ্টগণ,—মেসার্স কে এম নায়ক (ন্যাশন্যাল), আই বি সেন (বম্বে লাইফ), এস্ এন্ ব্যানার্জ্জি (ন্যাশন্যাল), এস্ সি রায় (আর্য্যস্থান); এস পি বসু (ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান)। জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ এস্ বাগ্‌চী (লক্ষ্মী)। জয়েণ্ট সেক্রেটারীগণ,—মিঃ বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জী (আর্য্যস্থান), মিঃ হরিশ চন্দ্র নাগ (ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল)। অনারারি ট্রেজারার মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার (বম্বে মিউচুয়্যাল)।

গত ১৫ই জুন গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে (কলিকাতা) ইনসিওরেন্স আইন কমিটীর দুইজন বাঙ্গালী সদস্য মিঃ আই বি সেন এবং মিঃ এস সি রায়, মিঃ সুশীল চন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্, সি বি ই মহাশয়কে এক লাঞ্চিয়ন্ পার্টিতে সম্বর্দ্ধিত করেন।

লাইট্ অব্ এশিয়ায়
নূতন শক্তি সঞ্চার

গত মাসে আমরা সংবাদ দিয়াছি যে, লাইট্ অব্ এশিয়ার আফিস ষ্টীফেন হাউসের ক্ষুদ্র কক্ষ হইতে ২নং চিত্তরঞ্জন য়্যাভেনিউর বৃহৎ ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহার সহিত যে আভ্যন্তরীণ একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের সংযোগ ছিল সে বিষয়ে আমরা আজ ব্যবসা ও বাণিজ্যের পাঠকগণকে সংবাদ দিতেছি।

লাইট্ অব্ এশিয়ার পরিচয় সকলেই জানেন। নূতন করিয়া তাহা জানাইবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে লাইট্ অব্ এশিয়ার বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রতিষ্ঠাতা রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক কলিকাতার বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধনীর দুলাল হইয়াও ১৯০৫ সালের স্বদেশী যজ্ঞে দধিচীর ন্যায় নিজের অস্থি দান করিয়াছিলেন। বাংলার জমিদারগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর নিকট হইতে চিরস্থায়ী দুর্ণামও পাইয়াছিলেন। সেই দুর্ণাম দূর করেন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক। স্বদেশের সেবায় হৃদয়, রক্ত ঢালিয়া, নিজের যথাসর্ব্বস্ব দেশের কল্যাণ কামনায় দুই হাতে বিলাইয়া দিয়া তিনিই সেই কলঙ্কের দাগ মুছিয়া ফেলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে লক্ষ টাকা দানে যে দেশ ভক্তির পবিত্র গঙ্গোত্রীর সৃষ্টি হইয়াছিল,—লাইট্ অব্ এশিয়ার প্রতিষ্ঠায় তাহারই সাগর সঙ্গম।

লাইট্ অব্ এশিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্প দিন পরেই সুবোধ চন্দ্র মারা যান। সুতরাং ইহার ক্রমোন্নতির অবস্থা তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই!

শ্রীযুক্ত সমীরচন্দ্র বসু মল্লিক বি, এ, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের দ্বিতীয় পুত্র। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, পাশ করিয়াই তিনি লাইট্ অব্ এশিয়ার কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। কলিকাতার মল্লিক পরিবারের ধনীর সন্তান, তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট; সমীরচন্দ্র ওকালতী, এ্যাটর্নী গিরি, কিম্বা কোনও উচ্চ চাকুরী লাভের জন্য অনায়াসে চেষ্টা করিতে পারিতেন।

কিন্তু তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্রের মত এই সকল আরাম কেদারার লোভ পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় কঠোর কর্ত্তব্য সাধন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা সুবোধ চন্দ্রের জীবনের শেষ কার্য্য, এই লাইট অব এশিয়া। ইহার উন্নতি তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত সমীর চন্দ্র পিতার সেই অসমাপ্ত কার্য্য-ভার স্কন্ধে লইয়া যেমন দেশভক্তি ও কর্ম্মনিষ্ঠা

দেখাইয়াছেন, তেমনি যথার্থ পিতৃ-তর্পণ করিয়াছেন।

কুমার শ্রীযুক্ত প্রশান্ত ঠাকুর এম্ এ, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র। তিনিও লাইট অব এশিয়ার কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। কুমার প্রশান্ত ঠাকুর পাথুরিয়া ঘাটার সর্ব্বজন মান্য এবং সর্ব্বজন বিদিত রাজ পরিবারের বংশধর হইয়াও উচ্চ শিক্ষা লাভে কখনও অমনোযোগী হন নাই। কলিকাতার বনীয়াদী ঘরের ছেলেরা যেমন উচ্ছন্নে যায়' কুমার প্রশান্ত ঠাকুর সেই পথে পদার্পণ করেন নাই। তিনি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষা পাশ করিয়া ইংলণ্ডে যান। সেখানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার গ্রাজুয়েট হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এরূপ উচ্চ বংশের উচ্চশিক্ষিত এবং বড় বনীয়াদী ঘরের জমিদার পুত্র যে আরাম-শয়ন ছাড়িয়া বীমা কোম্পানীতে কাজ করিতে আসিবেন ইহা এতদিন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু লাইট্ অব এশিয়া অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

আমার বিশ্বস্ত সূত্রে জানি, কোন ইউরোপীয় বীমা কোম্পানীর উচ্চপদস্থ একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী একটী নূতন বীমাকোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে কুমার প্রশান্ত ঠাকুরের পিতা স্বনামধন্য রাজা প্রফুল্ল নাথ ঠাকুরের নিকট ধন্না দিয়াছিলেন ও তাঁহার পুত্রকে খুব মোটা বেতনের লোভও দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কুমার প্রশান্ত ঠাকুর যথার্থই বুঝিয়াছেন, দেশসেবার সহিত জমিদারদের কলঙ্ক মোচন করিতে হইবে। রাজা সুবোধচন্দ্র যে আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াছিলেন, কুমার প্রশান্ত ঠাকুর তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন।

আমরা আনন্দের সহিত এই ধনীর পুত্র যুগলকে বীমাব্যবসায় ক্ষেত্রে "ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। আজ শুধু লাইট্ অব এশিয়ার আফিসে নহে,—সমগ্র বীমাব্যবসায় ক্ষেত্রে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এতদিন বীমার কাজ করা যেন একটা মহালজ্জা ও নিন্দার ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত ছিল, বীমা কর্ম্মীরা নিতান্ত অপরাধীর মত পথে ঘাটে মুখ লুকাইয়া চলিত,—আজ তাহাদের প্রাণে বল আসিয়াছে, মনে ভরসা জাগিয়াছে এবং ঐ লজ্জার মুখোস খসিয়া গিয়াছে। জমিদারের দুলালেরা আমোদ প্রমোদ ছাড়িয়া বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত আফিসের কাজে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছেন,—এই অভিনব দৃশ্যে আজ ব্যবসায় লক্ষ্মীর পূজার মন্দির উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম, কুমার প্রশান্ত ঠাকুরের চেষ্টায়, ইতিমধ্যেই লাইট্ অব এশিয়ায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার কাজ আসিয়াছে। যেরূপ অধ্যবসায়, গভীর আন্তরিকতা ও দরদের সহিত ইহারা খাটিতেছেন, তাহাতে আশা করি, লাইট্ অব এশিয়ার কারবার এখন হইতে ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং কোম্পানী উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া স্বদেশী যুগের রাজা সুবোধ চন্দ্রের শেষ কীর্ত্তি-ধ্বজা জগতের সমক্ষে দেখাইতে সমর্থ হইবে।

অজীর্ণ

আহারের পূর্ব্বে ঘোলের দ্বারা জিহ্বা ও মুখ উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া ঘোলেরই কুলকুচা করিলে অরুচির নাশ হয়।

*   *

সাদা জীরার চূর্ণদ্বারা জিহ্বা উত্তমরূপে ঘষিয়া ভোজন করিলে অরুচি প্রশমিত হয়।

পাঁকুই

মেদীপাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিয়া দিনে ৩।৭ বার ধুইলে আঙ্গুলের গলুয়ের পাঁকুই সারে। ঐ স্থানে যাহাতে জল না লাগে, তদ্‌বিষয়ে সম্ভবমত সাবধান হইতে হইবে।

হাজা পাকুই রোগে ইউ-ডি-কোলন্ (পাইভাব) সদ্য উপকারী। ঔষধটি ব্যবহারে অল্প জ্বালা অনুভূত হয়। ইহা ব্যবহারকালে আক্রান্ত স্থানে বেশী জল লাগান উচিত নয়।

*   *

বাবলা পাতা, অশ্বত্থ বৃক্ষের আঠা ও খয়ের একত্র মিশ্রিত করিয়া গরম গরম লাগাইলে হাজা পাকুই ৩ দিনে আরোগ্য হয়। জ্বালা-যন্ত্রণা নাই।

অর্শ

ওলট কম্বলের মূল আধা তোলা, ২।।টা গোল মরিচের সহিত বাটিয়া সমপরিমিত ইক্ষু-চিনির সহিত মিশাইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই নিয়মে সেবন করিলে অর্শরোগ নিবারিত হয়। ৭ দিন সেবন করিবে।

*   *

হরিতকী চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ, ইক্ষুচিনি ও মাখন প্রত্যেক ।।০ তোলা ; আধপোয়া জলে উত্তমরূপে মিশাইয়া সেবন করিলে অর্শরোগ নষ্ট হয়। ৫।৭ দিন সেবন করিতে হইবে।

রক্তামশা

বোরাস ফুল সিমলা, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি পাহাড় অঞ্চলে পাওয়া যায়। উক্ত ফুল ২।৩টা এক ছটাক জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে তাহা ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি সহ সেবন করিলে পুরাতন রক্তামাশয় নিবৃত্তি হয়। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সেবন করিতে হইবে।

* *

পিঁয়াজ পাতার কুঁড়ি (খুব কচিপাতা) ২।৩টা, সিকি তোলা মিশ্রী ও ছোট পিঁয়াজ সিকি তোলা একত্র বিনা জলে বাটিয়া প্রাতঃকালে শূন্যোদরে ৩ দিন সেবন করিলে পুরাতন রক্তামাশয় দূর হয়।

*

—ডালিমের খোসা, ও লবণ সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া ।০ আনা পরিমাণ লবঙ্গ পোড়া ও চাউল ধোয়া জল সহ সেবনীয়।

নাসিকাভ্যন্তরস্থ ক্ষতরোগ

অর্দ্ধ তোলা বেগুনের ফুল, (যে কোন বেগুনের ফুল হইলেই চলিবে) নয়টা গোল মরিচের সঙ্গে বাটিয়া উহার সহিত সামান্য পরিমাণ পাপ্ড়ি খয়ের মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে নাসিকাভ্যন্তরস্থ দুরারোগ্য ক্ষত আরোগ্য হয়।

বাতরোগ

জামার পকেটে জায়ফল (nutmeg) রাখিয়া দিলে বাত রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। বিলাতের বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক জজ কর্ত্তৃক ইহা পরীক্ষিত।

ব্রোঙ্কাইটিস

নীল রংয়ের কাঁচ গুটিকা (blue glass beads) ধারণ করিলে ব্রোঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি সর্দ্দিজনিত রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা বহু পরীক্ষিত।

বেরী বেরী

বেরী বেরীতে কলার থোড়ের রস বড় উপকারী। উক্ত রস প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে ৴০ ছটাক পরিমাণে সেবন করা উচিত। হাত পা ফুলা থাকিলে উহার উপর আদার রস মালিশ করা দরকার। অবস্থা জটিল হইলে থোড়ের রসের সহিত ২।১ গ্রেন মকরধ্বজ মিশ্রিত করিয়া সেবা। লবণ ও জল সেবন যত কমান যায় ততই ভাল।

আধকপালে

যে দিকের কপালে বেদনা হ'বে সেই দিকের বাহুমূল গামছা পাকাইয়া তদ্দ্বারা জোরে বাঁধিলে তৎক্ষণাৎ আধকপালে রোগের সমতা হইবে।

ভগন্দর

সজিনা পাতার কুঁড়ি (খুব কচিপাতা) ও বটের পাতার কুঁড়ি একত্র বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি ভগন্দরের নালীর মধ্যে প্রয়োগ করিলে ভগন্দর রোগ নিবৃত্তি হয়। এই নিয়মে ৭ দিন প্রয়োগ করিবে।

রক্তপ্রদর

চাঁপানটের মূল ২ তোলা ও জবাফুলের কুঁড়ি ২টা একত্র কাঁজিতে বাটিয়া সেবন করিলে রক্ত-প্রদর প্রশমিত হয়।

* *

আমের কুঁশী ১টা ৴।০ এক পোয়া গব্যদুগ্ধে বাটিয়া তাহার সহিত একটা চাঁপা কলা উত্তমরূপে চট্কাইবে। ইহা ভক্ষণ করিলে রক্তপ্রদর নষ্ট হয়।

গলাফোলা

উর্দ্ধশ্লেষ্মা হেতু গলায় বীচি (Glands) হইলে বা গাল গলা ফুলিলে কালজীরা ২ তোলা,

রক্তচন্দন ঘষা ২ তোলা, আফিং ৵০ আনা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মনসা পাতার রসে বাটিয়া গরম গরম তাহার প্রলেপ পীড়িত স্থানে ২।৩ বার দিলে উক্ত রোগের নিবৃত্তি হয়।

রাতকাণা

গবাঘৃত ভাল রকম গলাইয়া ব্রহ্মতালুতে চক্ষুর পাতার উপরে ও হাতের পায়ের তলায় উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে রাত্র্যান্ধতা (রাতকাণা) রোগ আরোগ্য হয়।

দন্তনালী

দন্তমূলে নালী হইয়া পূঁয পড়িলে গাব ভেরেণ্ডার আঠা ১ তোলা, এক সিকি সৈন্ধব লবণের সহিত মিশাইয়া পিতলের পাত্রে গরম করিয়া দন্তমূলের উভয়দিকে লাগাইয়া কিছুক্ষণ রাখিবে। পরে গরম জলে ধুইয়া ফেলিবে। দিনে ২।৩ বার লাগাইতে হইবে। ২।৪ দিন এইরূপ লাগাইলে দন্তনালী প্রশমিত হইয়া থাকে।

বিছানায় মোতা

লালকেশুর্য্যের মূল। স্থপারির সহিত ভক্ষণ করিলে শয্যামূত্র রোগ দূরীভূত হয়। রবিবারে শয়নের কিছু পূর্ব্বে সেব্য।

গরল

কাঁচা হরিদ্রার সহিত কালো ধুতুরার মূল অথবা শিরিষের ফুল বাটিয়া মাখিলে গরল বিষ দূরীভূত হয়।

একদিন অন্তর জ্বরে—

বাসক ডগা, নাটাকরঞ্জের ডগা ও আপাং ডগা হাতে উত্তমরূপে চটকাইয়া জ্বরের দিন হরিদ্রা ছোপান ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া বাসি মুখে শুঁকিলে জ্বর আসে না।

* *

জ্বরের ৩।৪ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে শেওলা পাতা, থানকুনী, নিশিন্দা পাতা ও কুকসীমা উত্তমরূপে হাতে কচলাইয়া ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া শুঁকিলে জ্বর আসে না।

* *

থেঁতো করা আস্‌শেওড়ার পাতা ও আপাং পাতা হরিদ্রা ছোপান ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া জ্বরের তিন চার ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে শুঁকিতে আরম্ভ করিলে জ্বর আসে না।

* *

পালার দিন বাসি মুখে একটি বাতাসার মধ্যে ছারপোকা খাওয়াইলে জ্বর আসে না।

* *

জ্বরের দিন বাসি মুখে শেওড়ার ছালের তাগা হাতে বাঁধিয়া দিলে এবং শেওড়া পাতা ও আপাং পাতা থেতো করিয়া শুঁকিতে দিলে জ্বর আসে না।

* *

কাঁকড়া মাটি বা কুমিরা পোকার বাসার মাটির জল বাসি মুখে দ্বাদশ ফোঁটা দিলে অনেক স্থলে জ্বর আসে না।

* *

হরিতকী, যোয়ান, বন-যোয়ান, সৈন্ধব লবণ, বিট লবণ, লবঙ্গ, কর্পূর—প্রত্যেক এক তোলা পরিমাণ লইয়া জলে পিষিয়া ।০ আনা পরিমাণ বটি প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ ৩ বটি জল সহ সেবনীয়।

* *

ধনে ও পাকা তেঁতুল প্রত্যেক ॥০ তোলা এবং চিনি ৵০ আনা একত্র বাটিয়া সেবন করিলে উপকার হয়।

শ্রাবণ মাসের কৃষি

এসময় বেগুন, লঙ্কা, ঢেঁড়শ, ঝিঙ্গা, সীম, ধুন্দুল, বরবটী, লাউ, শশা ও বিলাতী কুমড়া প্রভৃতি সব্জী বীজ বপন করিতে পারা যায়। দেশী শাকের মধ্যে পুঁই এবং বিদেশী এনডিভ এসপ্যারাগাস্, হালিম, পার্শেলী, পালং সোরেল, ব্রুমসডেল, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি শাকের বীজ এসময় বপন করা চলে।

শীতের সব্জী বীজ বপন করিবার এখনও সময় আসে নাই। জল্‌দি ফসলের জন্য মূলা, শালগম, জল্‌দী ফুলকপির বীজ এসময় বপন করা প্রয়োজন। শাকালু, পেঁপে, টেঁপারী, পেঁয়াজ, গ্লোব আর্টিচোক, মসরুম স্পন বা কোঁড -কের বীজ এই সময় লাগান চলে। জল্‌দী ফলন পাইবার আশায় কেহ কেহ পালম শাক, টম্যাটো বাঁধাকপি ও মটর শুঁটী লাগাইয়া থাকেন। বেগুনের চারা প্রস্তুত হইয়া থাকিলে এসময়ে উহা তুলিয়া জমিতে লাগাইতে পারা যায়। বর্ষায় চারা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে কিছু বেশী পরিশ্রম ও যত্ন লওয়া আবশ্যক নতুবা সফলকাম হওয়া যায় না।

আসাম ও বাংলার অনেক স্থানে এসময় আমন ধান্যের আবাদ হয়। বাংলার নিম্ন জমির পাট এই সময় কাটা হইয়া থাকে। আঁক, আদা ও হলুদ গাছের গোড়ায় এসময় মাটী তুলিয়া দিতে হয়। তামাক, সরগুজা ও কৃষ্ণতিলের বীজ এসময় বপন করা চলে। পশুর খাদ্যের জন্য রিয়েনা, লুসার্ণ, গিনি ঘাস, এবং দেধান, ভুট্টা প্রভৃতির বীজ লাগান চলে। পিপুলের কাটিং কাটিয়া এই সময়ে জমিতে লাগাইতে হয়।

ইন্ডাডালসিস, ডোডেনিয়া ভিসকোসা ইরিথিনা ইণ্ডিকা, একাসিয়া এরাবিকা প্রভৃতি বেড়ার বীজ বাগানের ধারে ধারে লাগাইতে পারা যায়। নতুবা একস্থানে বীজ ঘনভাবে চারাইয়া চারা বাহির হইলে জমির ধারে ধারে বসাইলেও চলে। ইউক্যালিপটাস, মেহগ্নি, রেণট্রি, গোল্ডমোহর, সেগুন, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি আয়কর বৃক্ষের বীজ এবং বাহারী বাঁশের বীজ ও গাছ লাগাইবার ইহাই উপযুক্ত সময়। বিবিধ ফলের বীজ হইতেও এই সময় চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। জিনিয়া, দোপাটী, অপরাজিতা, এম্যারান্থাস, মোরগফুল, কোরিয়পসিস, কসমস, গিলার্ডিয়া, কৃষ্ণকলি, গমফরেনা, পর্টুলেকা আইপোমিয়া এন্টিগোনান, তরুলতা, মুনফ্লাওয়ার, ভিনকা, কনভলভিউলাস, সানফ্লাওয়ার, ধুতুরা (ডাটুরা), ক্যানা, গাঁদা প্রভৃতি মরশুমি ফুলের চারা এখনও লাগান চলে। ক্যানা গাছের ঝাড় ঘন সন্নিবিষ্ট থাকিলে পাতলা করিয়া নাড়িয়া বসাইবার ইহাই সময়।

বেল, যুঁই, চামেলী, মল্লিকা, জবা, রঙ্গন, গোলাপ প্রভৃতি গাছের কাটিং মাটিতে পুতিয়া উহা হইতে এসময় চারা জন্মান যাইতে পারে। রঙ্গন, জবা, করবী, চাঁপা, বেল ও গোলাপের কলমও এসময় লাগান চলে। নানাজাতীয় লিলি, রজনীগন্ধা, বাহারি কচু প্রভৃতির মূল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসাইয়া এই সময় চারা বাড়াইয়া লইতে হয়। ক্রোটন, একালিফা, ইরেস্থিমাম, প্যালাক্স প্রভৃতি বাহারে পাতার ডাল কাটিয়া এই সময় বসাইলে সহজে শিকড় হয়।

আম, লিচু, কুল, লেবু, জামরুল, পেয়ারা সপেটা, পীচ, লকেট প্রভৃতি ফলের গাছও এসময় লাগান চলে। ঐ সমস্ত গাছে কলম বাঁধিবার আবশ্যক থাকিলে এসময়ে সম্পাদন করা দরকার। নারিকেল গাছ এসময়ে বসান চলে। আনারসের ফাকড়া ও ফলের মাথা ভাঙ্গিয়া এই সময়ে বসাইলে শীঘ্র শিকড় হয়। এসময় সমুদয় ফল ফুলের কলম লাগাইলে জল দিবার পরিশ্রম ও খরচা বাঁচিয়া যায় কিন্তু চারা গাছের গোড়ার যাহাতে জল না বসে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। অধিক বৃষ্টির সময় গাছ লাগান যুক্তিসঙ্গত নয়।

বীমা আইন সম্বন্ধে

ইয়ং লাইফ অফিসের মন্তব্য লিপি

সকলেই অবগত আছেন, গভর্ণমেণ্ট পুরাতন বীমা আইন সংশোধিত করিয়া পরিবর্ত্তিত ও নূতন আকারে প্রচলিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে এই নূতন বীমা আইনের খসড়া ব্যবস্থাপক সভায় পেশ ও গৃহীত হইয়াছে। জনসাধারণের মন্তব্য অবধারণ করিয়া আবশ্যক মত বিলটির কাট-ছাঁট করিবার জন্য উহাকে সিলেক্ট্ কমিটীর হাতে দেওয়া হইয়াছে। আগামী ৯ই আগষ্ট সিমলাতে সিলেক্ট্ কমিটীর অধিবেশন বসিবে। এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বাংলা গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণকে আহ্বান করিয়াছেন। তদনুসারে ইয়ং লাইফ অফিসেস্ লেজিস্‌লেসন কমিটির চেয়ারম্যান্ মিঃ এস্ সি রায় যে মন্তব্য লিপি পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম দেওয়া হইল।

ভারতীয় বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ২১৫। তন্মধ্যে ছোটখাট নূতন কোম্পানী আছে প্রায় ১৪০টি। ইহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং ইহাদিগকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিমান করিবার নিমিত্ত ইয়ং লাইফ অফিসেস্ লেজিস্‌লেসন কমিটী গঠিত হয়। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত যে পরামর্শ সভা দিল্লীতে বসিয়াছিল, তাহাতে এই ইয়ং লাইফ অফিসেস্ লেজিস্‌লেশন কমিটীর চেয়ারম্যান মিঃ এস্ সি রায় মেম্বার স্বরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, গভর্ণমেণ্ট এই প্রতিষ্ঠানটিকে যথার্থ প্রতিনিধিমূলক বলিয়া মনে করেন এবং ইহার মতামতকে বিশেষ গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। মন্তব্যলিপিতে খুব জোরের সহিত একথা বলা হইয়াছে যে যখন ছোট-খাট নূতন বীমা কোম্পানীর সংখ্যা সমস্ত ভারতীয় কোম্পানীর অর্দ্ধেকেরও বেশী, তখন ইহাদের ভাল মন্দ এবং উন্নতি অবনতির দিকে দৃষ্টি রাখা গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। ছোট-খাট অথবা কাঁচা বলিয়া ইহাদিগকে উপেক্ষা করা যায় না। গভর্ণমেণ্টের নূতন আইনের ফলে যদি এই বীমা কোম্পানী গুলির সমস্ত না হউক,—কয়েকটাও কারবার তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়, তবে বীমা ব্যবসায়ের পক্ষে তাহা সর্ব্বনাশকর হইবে। ব্যাঙের ছাতার মত (Mushroom) যে সকল কোম্পানী গজাইয়া উঠে, তাহাদের দলে নূতন ভাল কোম্পানীকে ফেলা উচিত নহে।

ক্যানাডা রাজ্যে প্রচলিত আইন অনুসারে তথাকার গভর্ণমেণ্ট বীমা কোম্পানী সমূহকে নানা প্রকারে নিয়ন্ত্রিত এবং তাহাদের আভ্যন্তরীণ পরিচালনা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। ভারতীয় বীমা আইন সেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এবিষয়ে ইংলণ্ডে প্রচলিত আইন অনেকাংশে অনুসরণ করা উচিত।

ইংলণ্ডের আইন তথাকার বীমা কোম্পানী সমূহকে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং প্রকাশ্য আচরণের অধিকার দিয়াছে। ভারতীয় আইন ততদূর অগ্রসর না হইয়া ন্যায় সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় ভাবে গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিতে পারে। বীমা কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব কম হস্তক্ষেপ করিবেন।

প্রাথমিক ডিপজিটের পরিমাণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে ব্যাঙের ছাতার মত কোম্পানী গজাইতে না পারে, তবে উহা বাড়াইয়া ২৫ হাজারের স্থলে এক লক্ষ টাকা করা উচিত। অবশ্য আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরে যে সকল কোম্পানী গঠিত হইবে তাহাদের সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটিবে। প্রাথমিক ডিপজিট এক লক্ষ টাকার পরে প্রতি বৎসর কোম্পানীর আয়ের একতৃতীয়াংশ টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট জমা রাখিতে হইবে,—যত দিন পর্য্যন্ত মোট ডিপজিটের পরিমাণ দুই লক্ষ টাকা না হয়। যে সকল বীমা কোম্পানী বর্ত্তমান সময়ে কারবার চালাইতেছে, তাহাদিগকে যদি ১৯৩৯ সালের মধ্যে দুই লক্ষ টাকা ডিপজিট পুরাইয়া দিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে অনেক ছোট-খাট কোম্পানী উঠিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে চলতি বীমা কোম্পানীর ডিপজিট সম্বন্ধে বর্ত্তমান আইনের ধারাই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। যদি এই পরামর্শ গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে ঠিক এই রকম অবস্থায় ইংলণ্ডের ক্লসন কমিটী যাহা করিয়াছিলেন,—সেইরূপ বিধান করা উচিত,—অর্থাৎ ঐ ২ লক্ষ টাকা ডিপজিট পুরাইতে কোম্পানী সমূহকে অন্ততঃ ৫ বৎসর সময় দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রিমিয়াম আয়ের এক তৃতীয়াংশ টাকা বার্ষিক কিস্তি হিসাবে কোম্পানী গভর্ণমেণ্টের নিকট জমা রাখিবে। যদি এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন কোম্পানীর পুরা ২ লক্ষ টাকা ডিপজিটের কিছু বাকী থাকে, তবে তাহার অবস্থা তদন্ত করিয়া তাহাকে আরও সময় দেওয়া উচিত। যে সকল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী ডিপজিট রাখা হয় তাহার বাজার চলতি মূল্য না ধরিয়া ফেস্ ভ্যালু (Face Value) ধরাই বাঞ্ছনীয়। অ-ভারতীয় কোম্পানী সমূহের ডিপজিটের পরিমাণ আরও অধিক হওয়া উচিত। তাহাদিগকে ভারতীয় কারবার সম্বন্ধে পৃথক ব্যালেন্স্ সিট্ ও ভ্যালুয়েশন করিতে হইবে। এবং তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে বীমা সুপারিণ্টেডেণ্টের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে ;—যেমন ভারতীয় কোম্পানীর উপর আছে।

কোন বিশেষ রকমের সিকিউরিটীতে সম্পত্তির নির্দ্দিষ্ট অংশ লগ্নী করিতে কোম্পানীকে আইনতঃ বাধ্য করিবার নীতি কখনই সমর্থন করা যায় না। প্রস্তাবিত আইনে এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক কোম্পানীকে তাহার মোট সম্পত্তির অন্ততঃ একতৃতীয়াংশ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে লগ্নী করিতে হইবে। ইহা নীতি হিসাবে যেমন আপত্তিজনক, তেমনি কার্য্যক্ষেত্রেও নানা কুফল উৎপন্ন করিবে। যদি এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের এবং আইন কর্ত্তাদের নিতান্ত জিদ্ হইয়া থাকে, তবে কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী না ধরিয়া (আধা গভর্ণমেণ্ট রকমের) মিউনিসিপ্যাল, পোর্ট ট্রাষ্ট অথবা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির সিকিউরিটী ও ডিবেঞ্চার সমূহকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং মোট সম্পত্তির একতৃতীয়াংশ লগ্নীর নিয়ম না করিয়া বীমা তহবিলের শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে লগ্নী করিবার নিয়ম করা কর্ত্তব্য।

ম্যানেজিং এজেন্সী পদ্ধতি একেবারে তুলিয়া দিবার প্রস্তাব ঠিক নহে। কোম্পানী আইনে (Indian Companies Act) ম্যানেজিং এজেন্সী সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম আছে, (ব্যাঙ্ক ছাড়া) বীমা কোম্পানীতেও তাহা প্রযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর কারবার একীকরণ এবং অদল-বদল সম্বন্ধে প্রস্তাবিত আইনে যে পদ্ধতি রচিত হইয়াছে, তাহা অধিকতর সরল হওয়া উচিত। যেরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এদেশে বীমার কারবার সংগ্রহ করা হয়, তাহাতে যদি আমার এজেন্টদের লাইসেন্স নিতে হয়, তবে বীমা ব্যবসায় চালানই মুস্কিল হইবে। বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চল হইতে কোন বীমার প্রস্তাব আর আসিবে না। অনেক এজেন্ট অন্য নানাবিধ কাজ করিয়াও অবসর সময়ে খাটিয়া প্রচুর বীমার প্রস্তাব সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই সকল সুদক্ষ ব্যক্তিকে হারাইয়া বীমার কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এজেন্সী কমিশনের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে পরিচালনা খরচা কমাইতে অথবা অন্যায় প্রতিযোগিতা নষ্ট করিতে পারা যাইবে না। রিবেট সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম করা উচিত যে রিবেট দেওয়া এবং রিবেট নেওয়া উভয়ই বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে।

বিদেশী কোম্পানীর অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় কোম্পানী সমূহকে রক্ষা করিতে হইলে আইনে এইরূপ নিয়ম করা উচিত যে, গভর্ণমেণ্ট ও আধা গভর্ণমেণ্টের আফিস ও কারখানা সংক্রান্ত সমস্ত ইন্‌সিওরেন্স ভারতীয় কোম্পানীতে করিতে হইবে। যে সকল বিদেশীয় কোম্পানী এদেশে কারবার করেন, তাহাদিগকে তাঁহাদের ভারতীয় কারবারের কিয়দংশ ভারতীয় কোম্পানীতে পুনর্ব্বীমা করিতে বাধ্য করান উচিত।

পাটচাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

নিম্নে বাংলা ও বিহারের পাঁচটি জেলার পাট চাষের প্রাথমিক হিসাব প্রদত্ত হইল :—

জেলা	গতবছরের হিসাব	এবছরের আনুমানিক হিসাব
দার্জ্জিলিং	২,০০০ একর জমি	১,৮০০ একর জমি
দিনাজপুর	৬৩,০০০ ,,	৬৩,০০০ ,,
কুচবিহার	২৮,৫০০ ,,	৩৪,৫০০ ,,
নোয়াখালি	৪৫,০০০ ,,	৩৬,৫০০ ,,
ত্রিপুরা রাজ্য	৭,১০০ ,,	৭,৮০০ ,,
বিহার	৪,৬৩,৬০০ ,,	৪,৬৩,৬০০ ,,

বঙ্গদেশে বীমা ব্যবসায়

শ্রীরামানুজ কর

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে এদেশে বীমা ব্যবসায় বিস্তার লাভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যত্রতত্র বিখ্যাত ও অখ্যাত, অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক বহু বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইযাছে। আমাদের স্বদেশ প্রীতির সুযোগ লইয়া অনেক অসাধু প্রকৃতির লোক বহু নিরীহ প্রকৃতির লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। অন্যদিকে আবার বীমা কোম্পানীকে প্রতারণা করিবার জন্য নানা প্রকার ফন্দি আবিষ্কৃত হইতেছে। যে সকল বীমা কোম্পানী সততা ও দক্ষতার সহিত কাজ চালাইতেছে, তাহাদিগকেও অন্যের অসাধুতার জন্য নানা প্রকার বিপদ ও অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। গ্রাহক সংগ্রহ করিবার অছিলায় কোন বেকার বীমা কোম্পানী অত্যধিক হারে বোনাস ঘোষণা করিতেছে। নানা প্রকারে অন্যান্য খরচার মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া যায়। ভবিষ্যতের সুখের আশায়-অকালে মৃত্যু হইলে বিধবা পত্নী ও সন্তান সন্ততিগণের প্রতিপালনের ব্যবস্থার আশায় যাহারা বীমা করিতে ইচ্ছুক তাহাদের মনে বীমা সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক হইতেছে। এতদিন বীমার ক্ষেত্র বাইরেই আবদ্ধ ছিল, মফঃস্বলের লোক এখনও বীমা ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বলিলেও হয়। কিন্তু অনেক অসৎ প্রকৃতির লোক বীমা কোম্পানী স্থাপন করিয়া কম প্রিমিয়াম ধার্য্য করিয়া পল্লীগ্রামের শান্ত প্রকৃতির লোকের মধ্যে প্রচার করিয়া তাহাদের বহুকালের অর্থ কৌশলে হরণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। বীমা কোম্পানী আগাছার ন্যায় যেখানে সেখানে গজাইয়া উঠিতেছে। আবার প্রতিমাসে অনেকগুলি করিয়া উঠিয়া যাইতেছে। যে গুলি উঠিয়া যাইতেছে সে গুলিতে বীমাকারীদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। কোম্পানীর পরিচালকগণ কারবার বন্ধ করিয়া দিলেই হইল। কোন কৈফিয়ৎ দিতে তাহারা বাধ্য নহেন। বীমা আইনের সুযোগ লইয়া অনেকেই এই প্রকারে বহু দরিদ্রের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া বড় লোক হইতেছে। অর্থোপার্জ্জনের এক সহজ পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রতি বৎসর যে সকল বীমা কোম্পানী বন্ধ হইয়া যায়, গভর্ণমেণ্ট যদি বিশদভাবে তাহাদের বিবরণ, ডিরেক্টরগণের নাম, পরিচালকগণের নাম প্রত্যেক বীমা কোম্পানীতে কত জন বীমা করিয়াছিল, কত জনের বীমা নষ্ট হইল, কি কারণে কোম্পানী বন্ধ হইল, বীমাকারীদের কত টাকা মারা গেল প্রভৃতি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দেশের লোকের চক্ষু ফুটিবে। যে সকল বীমা কোম্পানী ফেল হইয়াছে; তাহাদের পরিচালক

বা ডিরেক্টরেরা যাহাতে আর কোন নূতন বীমা কোম্পানী খুলিতে না পারে, আইনে তাহারও বিধান থাকা উচিত। যদি কোন প্রকার অসাধুতার জন্য কোন বীমা কোম্পানী ফেল হয়, তবে বীমাকারীদের টাকা স্থদ সমেত ডিরেক্টর ও পরিচালকগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। বীমা ক্ষেত্রে যাহাতে অসাধুতা প্রশ্রয় না পায় তদ্বিষয়ে গভর্ণমেন্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। ইহাতে যে সকল বীমা কোম্পানী সততার সহিত কাজ চালাইবে তাহাদেরও কাজে স্থবিধা হইবে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বীমা ব্যবসায়ে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় মনোবৃত্তিই সমানভাবে কার্য্য করিতেছে। বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর বহু কোটী টাকা লইয়া যাইতেছে। সততার দ্বারা তাহাদের গতিরোধ করিতে হইবে। আমাদের দেশ হইতে বীমা করিয়া কোটী কোটী টাকা লইয়া স্বদেশে নানাবিধ শিল্প বাণিজ্যে নিয়োগ করিয়া ধনশালী হইতেছে, আর আমরা বিদেশী কোম্পানীর নিকট জীবন বীমা করিয়া জন্ম-ভূমিকে ক্রমশঃ দরিদ্র করিতেছি। অর্থাভাবে আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্য প্রসারিত হইতেছে না। বর্ত্তমানে ১১৪টি ভারতীয় কোম্পানী জীবন বীমার কাজ করিতেছে। ইহাদের অনেকেরই শৈশবাবস্থা। জনসাধারণের মধ্যে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলে সূতি-কাগারেই ইহাদের লোপ পাইবার সম্ভাবনা।

আবার ঈর্ষা বশতঃ ভাল কোম্পানীর বিরুদ্ধেও অযথা মিথ্যা আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই সকল কারণে সংবাদপত্রে পরিচালিত আন্দোলনের প্রতি দেশবাসীর আস্থা হ্রাস পাইতেছে। ভারতীয় বীমা কোম্পানী গুলির মধ্যে বাঙ্গালীর পরিচালিত হিন্দুস্থান দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে। অনেক প্রতিপত্তিশালী অবাঙ্গালী ইহার ধ্বংস সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠিত না হইলে ইহার ধ্বংস অনিবার্য্য হইত। ভারতবর্ষে পরিচালিত দৈনিক কাগজগুলির মধ্যে আনন্দবাজারের গ্রাহক সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এজন্য আনন্দবাজার গৌরবান্বিত; কিন্তু গ্রাহক ও পাঠকগণের মধ্যে ইহার কোন প্রভাব আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই পত্রিকা দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার করিয়াও ইহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। ইহাতে একদিকে যেমন হিন্দুস্থানের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, অন্যদিকে দেশবাসীর উপর আনন্দবাজারের প্রভাব কিরূপ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কাগজ কাটতির জন্য যে পত্রিকা গৌরব অনুভব করে তাহার পক্ষে এরূপ অযথা আন্দোলন করা লজ্জার বিষয়।

কোন কোন কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের মধ্যে দেশ বিখ্যাত লোকের নাম দেখিতে পাই; কিন্তু কোম্পানী যখন ফেল পড়িবার উপক্রম হয়, তখন তাঁহারা নিজেদের দোষ স্খালনের জন্য জানান যে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই ডিরেক্টরের তালিকায় তাঁহাদের নাম দেওয়া হইয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি বীমা ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ তাহাদের ডিরেক্টর থাকাও সমীচীন নহে। ইহাতে দেশের অমঙ্গলই সাধিত হয়। জন সমাজেও তাহাদের কলঙ্ক ঘোষিত হয়। আপনাদিগকে

দোষ মুক্ত রাখিবার জন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অসাধু লোকের পরিচালিত বীমা কোম্পানীর সহিত জড়িত থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে। কয়েক জন ভদ্র লোককে জড়িত করিয়া একটী বীমা কোম্পানী গঠিত হইল। কিছুদিন পরে উহা বন্ধ হইল। তখন পরিচালকগণ আবার কয়েকজন নিরীহ ভদ্র লোককে লইয়া আর একটী বীমা কোম্পানী গঠিত করিয়া নূতন ভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া লোককে ঠকাইতে লাগিল।

পল্লী অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকেই মাসিক, ১৲ ২৲ টাকা প্রিমিয়ামে জীবন বীমা করে। প্রথম প্রথম টাকা আদায়ের জন্য স্থানে স্থানে এজেণ্ট নিযুক্ত হয়। বীমা করিবার পর এক কি দুইবৎসর তাগিদ করিয়া বীমা কারীদের নিকট টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হইল। তৎপরে টাকা আদায়ের এজেন্সী উঠিয়া গেল। টাকার জন্য বীমাকারীর নিকট কোন তাগিদ গেল না, বীমাকারীও তাগিদ না পাওয়ায় মাসে মাসে টাকা দিতে পারিল না। গ্রামের নিকট ডাক ঘর নাথাকায়, কি ভাবে টাকা দিতে হইবে, তাহা না জানায়, মাসে মাসে টাকা না দিতে পারিয়া কয়েক মাসের পরেই তাহার বীমা বাতিল হইল। বহু কষ্টে অর্জ্জিত অর্থ মাঠে মারা গেল। কিছু দিন পরে কোম্পানী পাততাড়ি গুটাইল। ফলে বহু দরিদ্রের কষ্টার্জ্জিত অর্থ এই ভাবে মারা গেল। ইহার কি কোন প্রতিকার হয় না?

গত ১৯৩৫ সালে বাংলা দেশে যে সকল বীমা কোম্পানীর কাজ বন্ধ হইয়াছে তাহাদের তালিকা নীচে দেওয়া হইল। কলিকাতা গেজেট হইতে এই তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে।

ষ্টাণ্ডার্ড প্রভিডেণ্ট কোং লিঃ
ইণ্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কোং
প্রভিন্সিয়্যাল ইনস্যুরেন্স কোং
অল ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কর্পোরেশন
ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট সোসাইটী
শান্তি ইনস্যুরেন্স সোসাইটী
নিউ লাইট্ ইন্স্যুরেন্স কোং
হেরাল্ড ইনস্যুরেন্স কোং
গ্লোব মিউচুয়েল প্রভিডেণ্ট ফণ্ড কোং
অটোম্যাটিক ইনস্যুরেন্স এণ্ড ব্যাঙ্কিং কোং
রিলায়েন্স প্রভিডেণ্ড কোং
ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কোং
প্যারাগন ইনস্যুরেন্স সোসাইটি লিঃ
শ্যাম সুন্দর ইনস্যুরেন্স কোং
ডায়েনা ইনস্যুরেন্স কোং
কুইন অভ্ ইষ্ট প্রভিডেণ্ট কোং
নোবল ইনস্যুরেন্স কোং
লয়াল্টী এস্যুরেন্স কোং
ইউনাইটেড বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট কোং
ক্যাপিট্যাল এস্যুরেন্স কোং
হিন্দু মস্লেম ইনস্যুরেন্স কোং
ইজি স্কীম ইনস্যুরেন্স কোং (easy)
গ্রেট বেঙ্গল ইনস্যুরেন্স কোং
নিউ ইনস্যুরেন্স কোং
ফ্যামিলী প্রভিসন ইনস্যুরেন্স সোসাইটী
গৌরীশঙ্কর ইনস্যুরেন্স কোং
য়্যানা এ ডে ইনস্যুরেন্স সোসাইটী অফ্ ইণ্ডিয়া (anna-a-day)
ইষ্টার্ণ মিউচুয়েল ইনস্যুরেন্স সোসাইটি
স্বস্তীক ইনস্যুরেন্স সোসাইটী

বিশ্বভারত ইনস্যুরেন্স কোং
রিপাব্লিক ইনস্যুরেন্স সোসাইটী
বেঙ্গল ওরিয়েন্ট্যাল ইনস্যুরেন্স কোং
ইষ্ট প্রভিডেন্ট কোং
ন্যাশন্যাল প্রভিডেন্ট ইনস্যুরেন্স কোং

কলিকাতা

সিটিকমার্শিয়েল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ
বিবেকানন্দ ইনস্যুরেন্স সোসাইটী লিঃ
সেষ্টী ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ
ইষ্ট এণ্ড ইনস্যুরেন্স সোসাইটী
ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিলায়েন্স এসিওরেন্স কোং
কলিকাতা ব্যাণ্ড এণ্ড ইনসিওরেন্স কোং
ইষ্ট লাইট ইনসিওরেন্স

কুমিল্লা

প্রতিমা ইনসিওরেন্স কোম্পানী, কুমিল্লা
মডেল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
ইজি স্কীম ইনসিওরেন্স কোং
কমল সাগর ইনসিওরেন্স সোসাইটী
দিনবন্ধু ইনসিওরেন্স সোসাইটী
প্রজাপতি ইনসিওরেন্স কোং
ন্যাশন্যাল বেনেভলেণ্ট ইনসিওরেন্স লিঃ
শাহজাহান বেনিফিট সোসাইটী
নব জীবন বেনিফিট সোসাইটী
মিনার্ভা ইনসিওরেন্স সোসাইটী
দেশ বন্ধু সম্মিলনী
কাশীশ্বরী ইনসিওরেন্স কোং
ইউনাইটেড সার্ভিস ব্যাঙ্ক এণ্ড ইননিওরেন্স কোং

কুমিল্লা পপুলার ইনসিওরেন্স কোং
কুমিল্লা মিউচুয়েল প্রভিডেণ্ট সোসাইটী
জন হিতৈষী ইনসিওরেন্স লিঃ
ইন্দোবার্মা বেনিফিট সোসাইটী
নিয়তি ইনসিওরেন্স্ কোং
লাইট অফ বেঙ্গল ইনসিওরেন্স্ কোং
গোল অফ ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স্ কোং
ত্রিপুরা কহিনুর ইনসিওরেন্স্ সোসাইটি

কুমিল্লা

জাতীয় ইনসিওরেন্স্ সোসাইটী
প্রুডেন্সিয়াল বেনেভলেণ্ট সোসাইটী
নবশক্তি ব্যাঙ্কিং এণ্ড ইনসিওরেন্স্ কোং
সর্ব্বজন মঙ্গল ইনসিওরেন্স্ কোং
ভারত পল্লী বান্ধব ইনসিওরেন্স্ কোং
কন্টীনেণ্ট্যাল মিউচুয়েল এডিং সোসাইটী
মুনলাইট ইনসিওরেন্স্ সোসাইটী
বেঙ্গল ম্যারেজ ইনসিওরেন্স্ সোসাইটী
অরোরা ইনসিওরেন্স্ কোং
মডার্ণ কমার্শিয়েল ইনসিওরেন্স্ কোং
ভারত প্রভিডেণ্ট সোসাইটী
কুটী ষ্টার ইনসিওরেন্স্ কোং
ধ্রুবতারা ইনসিওরেন্স এণ্ড ব্যাঙ্কিং করপোরেশন
অদৃষ্ট ইনসিওরেন্স্ সোসাইটী
কুমিল্লা ইনসিওরেন্স্ কোং
অমৃত ইনসিওরেন্স্ কোং
বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং এণ্ড ইনসিওরেন্স্ কোং
অল ইণ্ডিয়া হিন্দু মস্লেম মিউচুয়েল বেনিফিট সোসাইটী

ঢাকা

সিভিল ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স্ কোং . ঢাকা

বিক্রমপুর মিউচুয়েল বেনিফিট ইনসিওরেন্স্ কোং
নব ভারত মিউচুয়েল ইনসিওরেন্স্ কোং
প্রভিডেন্সিয়েল ইনসিওরেন্স্ কোং
আর্য্য ইনসিওরেন্স্ সোসাইটী
ইস্লামিয়া মিউচুয়েল ইনসিওরেন্স্ সোসাইটি
ঢাকা মিউচুয়েল ইনসিওরেন্স্ সোসাইটী
প্যারামাউন্ট ইনসিওরেন্স্ কোং
নর্থ ইষ্ট ইনসিওরেন্স্ কোং
লিবারেল ইনসিওরেন্স্ কোং
সিদ্ধেশ্বরী ইনসিওরেন্স্ কোং
গ্রীনউইচ ইনসিওরেন্স্ কোং　ময়মনসিং
নুরজাহান ইনসিওরেন্স্ কোং　রংপুর
চট্টগ্রাম প্রভিডেন্ট কোং　চট্টগ্রাম
রামকৃষ্ণ ইনসিওরেন্স্ সোসাইটী　বাঁকুড়া

বাংলার
নব-গঠিত মন্ত্রীমণ্ডল

বাংলার নব গঠিত মন্ত্রীমণ্ডলে ১১ জন মন্ত্রী আছেন; তাঁহাদের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হককে লইয়া মুসলমান ৬ জন এবং হিন্দু ৫ জন।

নিম্নলিখিত মন্ত্রীগণকে লইয়া মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইয়াছে :—

মৌলবী ফজলুল হক (প্রধান মন্ত্রী) শিক্ষা বিভাগের চার্জ্জে আছেন
খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন—হোম্ ডিপার্টমেণ্টের চার্জ্জে
ঢাকার নবাব বাহাদুর—কৃষি ও শিল্প বিভাগের চার্জ্জে
নবাব মুসারফ হোসেন—আইন ও ব্যবস্থাপক বিভাগের চার্জ্জে
সৈয়দ নওশের আলী—স্বায়ত্ব শাসনের চার্জ্জে
মিঃ এইচ, এচ, সুরহাওয়ার্দ্দি—ব্যবসা ও শ্রমজীবি বিভাগের চার্জ্জে
স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়—রাজস্ব বিভাগের চার্জ্জে
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—অর্থসচিব
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী—রাস্তাঘাট ইত্যাদির চার্জ্জে
শ্রীযুক্ত প্রসন্নদেব রায়কত—বনবিভাগ আবকারীর চার্জ্জে
শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী মল্লিক—কো-অপারেটিভ ও কৃষিঋণ বিভাগের চার্জ্জে

ইহারাই নূতন শাসনতন্ত্রের প্রথম মন্ত্রীমণ্ডল। ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রসন্নদেব রায়কত এবং শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী মল্লিক তপশীলভুক্ত জাতি সমূহের প্রতিনিধি।

সঞ্চয়হীনের দশা

বয়স কালে হরেন বাবুর অর্থ সম্পদ, মান সম্ভ্রম, বন্ধুবান্ধব, সভাসদ, চাটুকার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার কথায় লোকে উঠিত বসিত। তিনি বলিলে লোকের চাকরি জুটিয়া যাইত। তিনি অসন্তুষ্ট হইলে কাহারও রক্ষা থাকিত না। ভোগে, বিলাসে, অভিনব খেয়ালে হরেন বাবুকে প্রাচীন বাদশাহী আদর্শের এক আধুনিক উদাহরণবলিলেও অত্যুক্তি হইত না। শুনা যায়, তিনি ছুটির সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইলে বাংলা দশের মাটী ও জল হাওয়া ব্যতীত আর সকল উপকরণই সঙ্গে লইয়া চলিতেন। সুদূর পশ্চিমে, বাংলার একান্ত নিজের তরি তরকারী ও মৎস্য, অথবা যথাযথ ও নির্দ্দিষ্ট জাতীয় চাল, ডাল, তৈল, ঘৃত, চাকর, ঝি, বাসন, আসবাব, সটকা, তামাক কিম্বা কোন কিছুর অভাব হইলে হরেন বাবু তাহা বরদাস্ত করিতেন না। কন্যার বিবাহ কিম্বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে হরেন বাবুর ফিরিস্তি জার্ম্মান সমরের হতাহতের তালিকার মতই সুদীর্ঘ ও সর্ব্বগ্রাসী হইত। সে আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কিন্তু এখনও সে কথা লোকে কিম্বদন্তীর মতই আওড়াইতে থাকে।

কিন্তু, এ হেন হরেন বাবু আজ চাকরী অবসানে হৃত-সম্পদ এবং বিগত যৌবন অবস্থায় ছোট আদালতের উকিল মহলের "টাউট"। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন বাদী ফরিয়াদীদের উপযুক্ত উকিল সরবরাহ করিয়া দিনান্তে দুই এক টাকা সংগ্রহ করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া যান। ছোট টিনেব চালায় স্বপাকে আহার ও ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করেন। কেন? কারণ, কিছুই নহে —শুধু অর্থাভাব। যৌবনে অগাধ অর্থ সম্পদ অপব্যবহার করিয়া হবেন বাবু আজ নিঃসম্বল। কিছু টাকা যাহা ছিল ভাঁটার মুখে রাতারাতি বড়লোক হইতে গিয়া তথাকথিত ব্যবসায়ে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহার দৌলতে কত লোকের একদিন সুসময়ে গিয়াছে, আজ তাহারই অভাবের দিনে কাহাকেও কোথাও দেখা যায় না।

গল্পটী কিছু অভিনব নহে। সময়ে বার্দ্ধক্যের পুঁজি ঠিক করিয়া না রাখিলে অনেকেরই এই দশা হয়। শুধু মানুষ কেন, জীবজগতে সঞ্চয়ের মূল্য সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য। উদাহরণ, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি। সময় থাকিতে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখা প্রয়োজন।

জীবন-বীমারও সার্থকতা এই কারণেই। যৌবনে, রোজগারের সময়ে, বিন্দু বিন্দু করিয়া যে অর্থ বীমায় রক্ষিত হয়, অভাবের সময়ে নিজের বা নিজের অবর্ত্তমানে, পরিবারবর্গের নিকট তাহাই প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, শীতল, সরোবরের রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হয়। বীমায় রক্ষিত অর্থ, সকল ভুল, ভ্রান্তি, মোহ, ও অপচয় আশঙ্কার উপরে। জীবিত থাকিলে বীমা বার্দ্ধক্যের সম্বল, মৃত্যু ঘটিলে পরিবারের আশ্রয়। ইহা ব্যতীত পুত্রের শিক্ষা কিম্বা কন্যার বিবাহের জন্যও বিশেষ বীমা করা যায়।

এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত উপদেশ পাইতে হইলে **ভারত ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ**, ভারত ভবন, কলিকাতা, ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। "ভারত" অদ্যাবধি তাহার বীমাকারীদিগকে এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়াছে। চল্লিশ বৎসরের পুরাতন আফিশ। বর্ত্তমানে মোট তহবিল দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। বীমার সর্ত্ত প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা ও লাভজনক। বীমাকারীদের পাওনা শোধ অতিসত্বর ও নির্ঝঞ্ঝাটে করা হয়। বাংলার সর্ব্বত্র এজেন্ট আছে।

মিঃ এ, সি, সেন

এম্পায়ারের মিঃ এ, সি, সেন বর্ত্তমান বৎসরে ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মিঃ শচীন বাগ্‌চী

লক্ষ্মীর বাংলা দেশস্থ ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী মিঃ শচীন বাগ্‌চী ইনষ্টিটিউটের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।
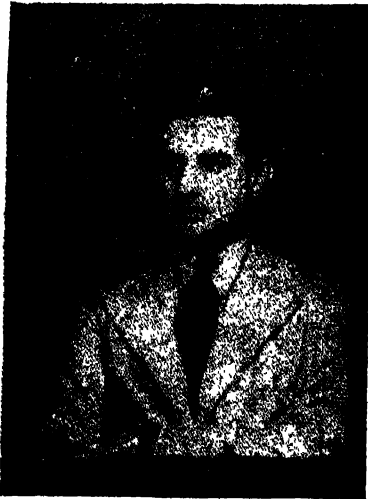
কুমার প্রশান্ত ঠাকুর এম, এ

পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের প্রপৌত্র এবং রাজা প্রফুল্ল নাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র কুমার প্রশান্ত ঠাকুর এম্, এ, লাইট অব এশিয়ায় যোগদান করিয়াছেন।

মিঃ সমীর চন্দ্র বসু মল্লিক বি, এ

স্বদেশভক্ত দানবীর রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিকের পুত্র শ্রীমান সমীর চন্দ্র বসু মল্লিক বি, এ, পিতার হৃদয়ের রক্ত দিয়া গড়া লাইট অব এশিয়ায় যোগদান করিয়াছেন।

রঙ্গরস

খোদার কাজ

এক বাদ্‌শাহের দরবারে এক ফকির যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাদ্‌শাহ ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

আচ্ছা ফকির সাহেব! খোদার কাজ কি? ফকির বলিলেন,—

জাঁহাপনা, আমাকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চান তবে আপনি নীচে আসিয়া দাঁড়ান, আর আমাকে সিংহাসনে বসিতে দিন। ইহা শুনিয়া বাদশা নীচে আসিয়া ফকিরকে সিংহাসনের উপর বসাইলেন তখন ফকির হাসিয়া বলিলেন,—

জাহাপনা! খোদার ইহাই কাজ। আমীরকে ফকির করা আর ফকিরকে আমীর করাই খোদারকাজ।

আফিং খোরের ঘোড়া চুরী

এক আফিংখোর ও তাহার চাকর সহরে যাইতেছিল; পথিমধ্যে এক সরাইয়ে উভয়ে আহারাদি করিতে নাবিলে; আফিংখোরের ভৃত্য সরাইয়ের কিছু দূরে এক গাছে ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিয়া আহারান্তে মনিব এবং চাকর উভয়ে পূরামাত্রায় আফিং সেবন করিলেন। নেশা যখন পাকিয়া উঠিল তখন চাকর মনিবকে বলিল,—

হুজুর! বেলা পড়িয়া আসিয়াছে এই বেলা রওনা হওয়া যাক্।

মনিব বলিলেন আচ্ছা।

যাইবার সময় মনিব চাকরকে বলিলেন,—দেখিস্, যেন কোন জিনিস্ ভুলিস্ না।

চাকর উত্তর করিল,—সে কি কথা? আফিংঙের কৌটা হুজুরের নিকট, আর হুঁকা কলিকা আমার নিকট, তবে আবার জিনিষ ভুলিব কেমন করিয়া!

এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে উভয়ে সহরের দিকে রওনা হইলেন, ঘোড়া লইবার কথা আর কাহারও মনে রহিল না। সহরে আসিয়া আহারাদি করিবার পর মনিব চাকরকে বলিলেন,—

ঘোড়ার জন্য দানা লইয়া আয়। তখন উভয়ের ঘোড়ার কথা মনে হইল এবং ত্রস্তে তাঁহারা ঘোড়ার সন্ধানে বাহির হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত সরাইয়ের নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে ঘোড়া চোরে লইয়া গিয়াছে, কিন্তু দড়ি গাছে বাঁধা রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া মনিব, একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন; চাকর কিছু বেশী বুদ্ধিমান, তাই তিনি বলিলেন,—

হুজুর! উপায় ঠাওরাইয়াছি; চোর বেটা বড়ই বোকা; ঘোড়া লইয়া গিয়াছে, কিন্তু দড়ি ফেলিয়া গিয়াছে; নিশ্চয়ই দড়ি লইতে আসিবে, আর অমনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিব।

এই বলিয়া উভয়ে সেইখানে বসিয়া চোরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৭শ বর্ষ | ভাদ্র—১৩৪৪ | ৫ম সংখ্যা।

বাঙ্গলায়
তুলা চাষের প্রয়োজনীয়তা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বীজ মনোনয়নের পরই সারের উন্নতির দিকে নজর দেওয়া কর্ত্তব্য। বেরারের জমি হচ্ছে কালো মাটির জমি, এবং কালোমাটির জমিতে প্রধানতঃ নাইট্রোজেনের ভাগ কম থাকে। সুতরাং জমির এই অভাবের জিনিসটা সার কার্য্যের দ্বারা পূরণ করে দিতে হবে। দুরকমের সারের দ্বারা এ অভাব পূরণ করা যেতে পারে; (১) পশুদিগের প্রভূত পরিমাণ মলের দ্বারা, (২) 'সল্টপিটার' প্রমুখ কৃত্রিম সারের দ্বারা। প্রথম নম্বরটি চাষীদিগের নিকট সুপরিচিত আর দ্বিতীয় নম্বরের সঙ্গে চাষীদের পরিচয় না থাকলেও পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। প্রথমটি ধীরে ধীরে কাজ করে, আর দ্বিতীয়টির দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়।

বেরারের চাষীরা গৃহপালিত পশুদিগের মল সারের জন্য কতকটা ব্যবহার করে বটে, কিন্তু তারা যে এর সম্পূর্ণ মূল্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারে নি, একথা বল্‌বার যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা, উক্ত প্রকার মল ইত্যাদি বেশীর ভাগই জ্বালানি কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া যে জিনিসটা জ্বালানো হয় তার ছাইগুলি সারের জন্য রেখে দেওয়া হয় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই জন্যই চাষীদের ভালকরে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে যে, গৃহপালিত পশুদিগের মল ইত্যাদি জ্বালানি কার্য্যের চেয়ে সার কার্য্য হিসাবেই বেশী মূল্যবান্, এবং যদিই বা জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহার করা হয়, তথাপি তার ছাইটাও সার কার্য্য হিসাবে কাজে লাগে।

মূল্য হিসাবে জ্বালানির পরে ছাইগুলো জালানীর পূর্ব্বের মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের সমান। তাহলেই দাহ্য ক্রিয়ায় দুই তৃতীয়াংশ মূল্য নষ্ট হয়েছে। এ ক্ষতির মূল্য হচ্ছে ১৬০ মণে চৌদ্দ টাকা। এখন ১৬০ মণ মালে ঘুটে ইত্যাদি যে জ্বালানি প্রস্তুত হয়, তার মূল্য ঐ ক্ষতির মূল্যের সমান কিনা সেটা ভেবে দেখা দরকার।

বেরারের জমিতে বহু শত বর্ষ ধরে চাষ চলেছে, সুতরাং ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কমে এসেছে নিশ্চয়। এমতাবস্থায় জমিতে যদি প্রচুর সার প্রদান না করা যায় ত উৎপাদিকা শক্তি আরও বেশী কমে যাবে। যে কোন বুদ্ধিমান চাষীই সহজে বুঝতে পারবে, গৃহপালিত পশুদিগের মলমূত্র কী চমৎকার সার হয় এবং তাতে কী চমৎকার ফসল ফলে। অথচ এ জিনিস প্রায় বিনা খরচায় প্রাপ্য। নাগপুরের কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষাগারে দেখা গেছে যে, বছর বছর উক্ত জিনিস দ্বারা সার প্রদান করায় জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ঐ প্রকার সারের মূল্য মাত্র একটি বছরেই ফুরোয় না, পরবর্ত্তী কয়েক বছর পর্য্যন্ত ওর জোর থাকে। টাকার দিক দিয়ে ঐ মূল্য সঠিকভাবে নির্ণয় করা শক্ত বটে, কিন্তু ওর যে একটা সত্যকার গুণ আছে একথা প্রত্যেক কেজো-চাষীই উপলব্ধি করে। উক্ত পরীক্ষাগারে আরও দেখা যাচ্ছে যে কালো মাটির তুলার জমির পক্ষে সাধারণতঃ গৃহপালিত পশুদিগের মলমূত্র জনিত সারই সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা এবং উপযোগী। এ জিনিস ছাড়াও তুলার জমিতে তাড়াতাড়ি কাজ হওয়ার জন্য কৃত্রিম সারও প্রদান করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে তুলার জমিতে নাইট্রোজেন-প্রধান সার লাগানো লাভজনক। এধার দিয়ে নাইট্রেট, অব-সোডা এবং সালফেট-অব য়্যামোনিয়াই উৎকৃষ্ট। এর সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তাড়াতাড়ি কাজের জন্য এই দু'টি বস্তুর ব্যবহার করায় অসুবিধাও আছে, কেননা, এরা জমির উৎপাদিকা শক্তি তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে দেয়। সুতরাং এর প্রতিবিধানকল্পে সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পশুদিগের মলমূত্র জনিত সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। কোন চাষী যদি একর পিছু তুলার জমিতে একটন পশুদিগের মলমূত্র জনিত সার এবং ১ মণ নাইট্রেট অব সোডা ব্যবহার করে তাহ'লে তার লাভ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

তুলার আঁশের উন্নতি বিধান কল্পে পটাশ জনিত সারই বিশেষ উপযোগী। মিঃ ক্লাউষ্টন এর মতে নাইট্রেট অব-সোডার উপস্থিতির চেয়ে পটাসের অভাবই আঁশের স্থূলত্বের কারণ। যে জমিতে পটাস জনিত সার দেওয়া হয়েছিল তার তুলার আঁশ বেশ সূক্ষ্ম হ'তে দেখা গেছে। আমেরিকাতেও ঠিক এই উপায়ে তুলার আঁশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়ে থাকে।

এখন আমাদের দেশে গৃহপালিত পশুদিগের মলমূত্র জনিত সার রক্ষা করবার ভুল প্রণালী অবলম্বিত হয়। সেটাকে নিম্ন উপায়ে শুধরে নিতে হবে:—(১) মূত্র এবং অপেক্ষাকৃত ঘন পরিমাণ মলটাকেই রক্ষা করতে হ'বে। (২) উক্ত দ্রব্যকে কোন গর্ত্তে সর্ব্বদা ভিজে অবস্থায় রাখতে হ'বে কিন্তু এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে যেন না তাতে জল কাটে। (৩) জমিতে সার লাগাবার পূর্ব্বে দেখতে হ'বে তা' বেশ ভালভাবে পচেছে কিনা।

লাঙ্গলকার্য্যের উন্নতিও তুলাচাষের শ্রীবৃদ্ধির একটি উপাদান। অনেকে বিলিতী লাঙ্গল প্রবর্ত্তনের কথা বলেন, কিন্তু তারও গোটা কয়েক অসুবিধা আছে। বিলিতী লাঙ্গল মাটিতে অনেকখানি প্রবেশ করতে পায় এবং তাতে ভাল ফল ফলে বটে, কিন্তু বেরাবে তার ব্যবহারে দেশী লাঙ্গলের চেয়ে কার্য্যতঃ বেশী কিছু সুবিধে হয় নি। বিলিতী লাঙ্গলের প্রথমতঃ দাম বেশী, দ্বিতীয়তঃ এ একবার খারাপ হ'লে গাম্য কামার তা মেরামত করতে পারবে না, তৃতীয়তঃ এ লাঙ্গল চালাতে খুব বেশী শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু যদি বৃহৎ স্কেলে কোন চাষের

কাজ করা যায় ত এ লাঙ্গল খুবই উপযোগী। যাই হোক, বর্ত্তমানের চেয়ে উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হ'বে এবং চাষীদের বুঝিয়ে দিতে হ'বে নতুন জিনিষ ব্যবহার করলেই তাদের বাপ পিতামহ যে এতকাল পুরানো জিনিস ব্যবহার করে বোকা বনেছিল, একথা প্রমাণিত হয় না! উন্নততর যন্ত্রপাতির ব্যবহার স্থানে স্থানে কেন্দ্র খুলে চাষীদের বুঝিয়ে দিলে তবেই এর উপযোগিতার দিকে তাদের লক্ষ্য পড়বে।

প্রত্যেক জিনিসেরই কিছুমাত্র উন্নতি করতে গেলেই টাকার প্রয়োজন, চাষের বেলাতেও সেই কথা খাটে। কৃষির শ্রীবৃদ্ধি করতে গেলেই টাকা খরচ করতে হবে, কিন্তু চাষাদের সে অর্থ মোটেই নেই। অধিকন্তু তারা দারুণভাবে ঋণ-জালে আবদ্ধ। তাই চাষীদের চাষের উন্নতির ইচ্ছা থাকলেও অর্থাভাবে কিছুই করে উঠতে পারে না। যা ফসল জন্মায় তার অধিকাংশই মহাজনকে দিতে বেরিয়ে যায়, সুতরাং সারা বছরের খরচ চালাবার জন্য সে আবার ধার করতে বাধ্য হয়। সময় সময় সে মহাজনদের কাছ থেকে পূর্ব্ব থেকেই দাদন নিতে থাকে যাতে করে ভবিষ্যৎ ফসলের ওপর তার কিছুমাত্র অধিকার থাকে না। চাষীদের দুরবস্থার এই একটা মারাত্মক হেতু। অন্যান্য দেশে এ দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য গভর্ণমেণ্ট সচেষ্ট, কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে সেরকম ব্যবস্থা নেই। এর জন্য দু'রকম প্রচেষ্টার প্রয়োজন। প্রথমতঃ কৃষকদের ঋণভার মুক্তির জন্য ব্যবস্থা করণ, আর দ্বিতীয়তঃ কৃষকদের জন্য ঋণদান সমিতি গঠন করা। শেষোক্তর জন্য "কো-অপারেটিভ সোসাইটি" গুলি আছে এবং তাতে খুব ভালই ফল ফলছে। প্রথমোক্তর প্রতি গবর্ণমেণ্টের নজর পড়েছে বটে, কিন্তু সে সম্পর্কে সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয়নি।

আমরা বেরারের ব্যাপারটা মোটামুটি আলোচনা করেছি এই ভেবে যে এর থেকে আপনাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। পূর্ব্বেই বলেছি যে বস্ত্রশিল্প উন্নতিমুখী। আমাদের দেশে এর প্রসারতার যথেষ্ট ক্ষেত্র এখনো পড়ে রয়েছে। তা'-ছাড়া আমাদের এখানে বস্ত্রশিল্পের জন্য যে তুলার প্রয়োজন তার জন্য আমরা অন্যান্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী। সুতরাং আমাদের এই বাংলা দেশে তুলার চাষ করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

সমষ্টিগত হিত ছেড়ে দিলেও ব্যক্তিগত হিতও এতে যথেষ্ট। বেরারের ব্যাপারেই দেখা গেছে যে মোটামুটী হিসাবে সাধারণ অবস্থায় তুলাচাষে একজন চাষী ৮৲ টাকা খরচ করে ২৫৲ টাকা আয় করতে পারে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি ও কৃষিবাজারের উন্নতি সম্ভব হলে লাভ ডবলের চেয়েও বেশী সম্ভব। সুতরাং তুলাচাষের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া চাষীদের পক্ষে মঙ্গলের। আমরা এদিকে কৃষকদের ও উৎসাহী ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমাদের পশু পালন সমস্যা

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ভারতে গোজাতীয় পশুর সংখ্যা ২০ কোটী। কিন্তু দুঃখের বিষয় তন্মধ্যে ১৩ কোটী জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্তই প্রায় অকর্ম্মণ্য। ভাবুন দেখি, এই বিপুল সংখ্যাটা যদি অকর্ম্মণ্য না হ'য়ে ফলপ্রসূ হ'ত ত আমাদের সম্পদ কতখানি বৃদ্ধি পেত। এত অধিক সংখ্যক পশু যে আমাদের অকেজো হয়ে থাকে তার একমাত্র কারণ হ'ল যে, আমরা পশুদিগের মোটেই যত্ন নিই না, পক্ষান্তরে, একটি অকেজো পশু বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও আমরা অনুরূপ অপর একটি পশু পালন করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিনে। এরই জন্য ভারতবর্ষে লোক পিছু সম্পত্তির অনুপাতে পশুপালনের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অথচ অপরাপর দেশে এসম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে সেটা দেখা যাক্। মিসর দেশে ও চীনে প্রতি ১০০ একর জমি পিছু যথাক্রমে ২৫ এবং ১৫টি গোজাতীয় পশু রক্ষিত হ'য়ে থাকে; জাপানে তদনুপাতে মাত্র ৬টি। কিন্তু সেই হিসাবে বাংলাদেশে ১০৮টি; বিহার উড়িষ্যায় এবং যুক্তপ্রদেশে প্রায় ৯০টি এবং সমগ্র ভারত হিসাবে ধরলে গড়ে ৬৭টি প্রাণী রক্ষিত হয়ে থাকে। এই বেশী সংখ্যক পশু রক্ষার জন্য তাদের খাদ্যের জন্য আমাদের বেশী খরচ পড়াই স্বাভাবিক, কিংবা আমাদের চাষ জমির একটা মোটা অংশ পশুদিগের খাদ্যের জন্য রক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সে-জিনিষের কোনটাই সম্ভব হয় না এবং তজ্জন্যই পশু পালন থেকে আমরা মোটেই লাভবান হই না, বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই থাকি। সুতরাং বিশ্বের অপরাপর দেশের পশু রক্ষণাবেক্ষণের হার অনুপাতে আমরা যদি আমাদের বর্ত্তমান পশু রক্ষণাবেক্ষণের হারটা উহার এক তৃতীয়াংশে কমিয়ে দিই ত আমাদের কোন ক্ষতিই হ'বে না, উল্টে অপর ধার দিয়ে লাভ দেখা দেবে।

ভারতের পশু রক্ষার ব্যাপারটা লক্ষ্য করলে আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার চোখে পড়ে। ভারতের গোজাতীয় পশুর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট

জাত ভারতের সেই অঞ্চলেই দেখা যায় যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম, জল-সিঞ্চন ব্যবস্থা অপ্রচুর এবং তৃণভুষির অপ্রাচুর্য্য। ব্যাপার হচ্ছে কি, যে সমস্ত যায়গায় বৃষ্টিপাত প্রচুর, চাষ ভাল হয় সেই সমস্ত জায়গায় লোক সংখ্যার ঘন বসতির জন্য প্রয়োজনের চাপে সমস্ত পশুচারণ ক্ষেত্রকেই চাষের জন্য ব্যবহার করা হয়। সুতরাং পশু-দিগের পুষ্টির অভাব হেতু তাদের আকৃতি ও গুণাগুণের ক্রম অবনতি দেখা যায়। যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত কম সে সব যায়গায় কিন্তু এ ব্যাপারটি ঘটতে পায় না এবং সেইজন্যই সেখান-কার পশুদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে, উত্তর ও দক্ষিণে, বিহারে, বাংলাদেশে এবং উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে গোজাতীয় পশুদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অবনতি দেখা দিয়েছে। যুক্তপ্রদেশে উক্ত পশুদিগের মধ্যে মাত্র শতকরা ৮টি প্রাণী দৈনিক তিন সের দুধ দেয়। এধার দিয়ে বাংলার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কাজনক। বাংলায় পশুচারণ ক্ষেত্র নেই, পশু পালকেরা পশু দিগকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোটেই খেতে দিতে সক্ষম হয় না, পশু খাদ্যও ভাল পাওয়া যায় না এবং এই সমস্ত কারণেই বাংলাদেশের গোজাতীয় পশু ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতম ক্ষীণকায়ে পরিণত হচ্ছে। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বাংলার পশুদিগের অবস্থা যতই খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং যতই তারা অকেজো হ'য়ে পড়ছে ততই তাদের পালনের হারটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উল্টোপাল্টা ব্যাপারটি প্রথমটা রহস্যজনক মনে হলেও একটী উদাহরণ দিলে সকল তথ্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার হ'বে। ধরুন, এক পরিবারে দৈনিক ৩ সের দুধের দরকার এবং পাল্টাপাল্টি ৩ সের দুগ্ধ প্রদানকারী দুটি গরুর দ্বারা তাঁদের বৎসর চলে যেত। আমাদিগের উপরিউক্ত কারণ সমূহের দরুণ কয়েক বছর পরে গরুর অবস্থা খারাপ হওয়াতে সে আর পূর্ব্বের মত দুধ দিলে না, দৈনিক তিন সেরের পরিবর্ত্তে দেড় সের করে দুধ দিতে লাগল। অথচ পরিবারের দৈনিক দুধের চাহিদা হচ্ছে ৩ সের, সে চাহিদা কিছুমাত্র কমে নি। সুতরাং এক্ষেত্রে দুটি উপায় পরিবারের পক্ষে খোলা আছে :—(১) বর্ত্তমান গরুটিকে বদলে একটি ভাল গরু আনয়ন করা কিংবা সম্ভব হ'লে যাতে বর্ত্তমান গরুটিই বেশী দুধ দিতে পারে তারই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করা; (২) বর্ত্তমান গরুটি ছাড়াও অপর একটি গরু আনয়ন করে দুগ্ধের ঘাট্‌তিটা পুষিয়ে নেওয়া। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে প্রথম উপায়টি অবলম্বন না করে দ্বিতীয় উপায়টি অবলম্বিত হয় এবং সেইজন্যই আমাদের দেশে গরুর নিকৃষ্টতম অবস্থা সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পালনের হারটাও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

বাংলাদেশের গরুগুলি যদি মোটামুটি খাদ্য পায় ত গড়ে দু'সের করে দুধ দিয়ে থাকে। এরকম গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে যে কোন লাভ নেই সে কথা বলাই বাহুল্য। অথচ বর্দ্ধমান, হুগলী, যশোহর প্রভৃতি জেলায় ঐ রকম গরুর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ ভাবে ধরলে ভারতবর্ষে গোজাতীয় পশুর সংখ্যা ১৯১২ সাল থেকে ১৯৩২ সালের ভেতর ১৫ কোটি ২ লক্ষ থেকে ২০ কোটি ৫ লক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্প্রতি লর্ড লিন্‌লিথগোর আগমনের পর থেকে গভর্ণমেণ্ট থেকে অনবরত গরুর অবস্থার

উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রচেষ্টা যে সং-উদ্দেশ্য প্রণোদিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে উপায় অবলম্বিত হচ্ছে, সেটা যথাযোগ্য নয়। ভারতে গরুর এই অবস্থার অবনতির প্রধান কারণ হ'ল তার খাদ্যাভাব, অপর সমস্ত কারণ গুলি এই প্রধান কারণ হ'তেই সম্ভূত। সুতরাং গরুর অবস্থা ভাল করণার্থে হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড় বিলাবার পূর্ব্বে খাদ্য ব্যবস্থার দিকে প্রথম নজর দেওয়া কর্ত্তব্য। ভারতে মানুষের খাদ্যাভাব ইতিপূর্ব্বেই দেখা দিয়েছে, সুতরাং কেউ যদি এমন বিধান দেন যে, অতিরিক্ত চাষের দ্বারা গরুর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে, সে বিধান গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রহণযোগ্য নয় এই জন্যই যে, ভারতে গরুর খাদ্য বৃদ্ধি করতে হ'বে বলে চাষের জমিও সঙ্গে সঙ্গে দৈবগুণে বেড়ে যাচ্ছে না, সুতরাং গরুর খাদ্যের জন্য বর্ত্তমান জমিতেই চাষ চালাতে হ'বে এবং তা' করতে গেলে মানুষের খাদ্য সরবরাহের জন্য চাষের জমি কম হ'য়ে যাবে। সে ব্যাপারটা যে হ'তেই পারে না একথা সকলেই বুঝিবেন, কেননা, মানুষের খাদ্য তাতে কম পড়বে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের পশু পালনের পরিমাণ হ্রাস করা ছাড়া উপায় নেই। যে সংখ্যক পশু আমরা পালন করি, তাদের খেতে দেবার ব্যবস্থা করতে আমরা মোটেই সমর্থ হচ্ছি না, আর সেই সমস্ত পশুদিগের দ্বারা যে আমরা লাভবান হচ্ছি এমনও নয়। সুতরাং আমরা যদি অকেজো পশুগুলিকে নষ্ট করে ফেলি ত আমাদের সঙ্কটের গুরুত্ব কতক পরিমাণ হ্রাস পায়। এই অবাঞ্ছিত পরিমাণ হ্রাস করার ব্যাপারে রুগ্ন দুর্ব্বল ষাঁড় গুলির দিকে আমাদের সর্ব্বপ্রথম নজর দিতে হ'বে, কেননা, তাদের প্রজনন কার্য্যের দ্বারা আরও দুর্ব্বল পশু সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে এই প্রজনন কার্য্যের উন্নততর প্রণালীর সাহায্য কেউই সাধারণতঃ গ্রহণ করে না, গরুকে চরতে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং মাঠে যে কোন দুর্ব্বল পঙ্গু ষাঁড়ের সঙ্গেই তার সঙ্গম কার্য্য সম্পন্ন হয়। একে ত গরুদের খাদ্য জোটে না, তার উপর এই প্রকার দুর্ব্বল ষাঁড়ের সাহায্য গ্রহণ করলে যে বাছুর জন্মাবে তার নিকট হ'তে আমরা বেশী কিছু মোটেই আশা করতে পারি না। সুতরাং দুর্ব্বল ষাঁড় গুলিকে নষ্ট করে তৎপরিবর্ত্তে হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড়ের ব্যবস্থা করাই যুক্তিযুক্ত। এই অতিরিক্ত দুর্ব্বল প্রাণী নাশের ব্যাপারটা আমাদের দেশে মোটেই নূতন নয়; ১৯৩২-৩৩ সালে পাঞ্জাব প্রদেশে এই রকম ৪লক্ষ ৮২ হাজার প্রাণীনাশ ঘটেছিল।

বিশ্বের অপরাপর স্থানেও এই রকম ব্যাপারের নজীর আছে। হল্যাণ্ডেও কয়েক বছর পূর্ব্বে আমাদের মত এই রকম পশু প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল, তাই তারা এসম্পর্কে ১৯৩৩ সালে 'ক্যাটল্ ক্রাইসিস্ এ্যাক্ট' পাশ করে। উক্ত এ্যাক্ট অনুযায়ী বাছুর রাখবার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হয় এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত গরুদের হত্যা করে তার মাংস বিদেশে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। হল্যাণ্ডের মত গোপালন ও ডেয়ারী ব্যবস্থায় উন্নতশীর্ষ দেশে যদি এই রকম ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে ত এর উপর কথা কইবার আর কি আছে। আমাদের দেশেও যে পরিমাণ প্রাণী নাশ করা হ'বে সেটা আর্থিক দিক দিয়ে একেবারে বৃথা যাবে না, কেন না, সেই মাংস বিদেশে চালান দিলেই চলবে। এই রকম চালানী ব্যবসা যে আমাদের দেশে চলেনা তা নয়; সুতরাং 'সেন্টীমেণ্টে'র

দিক দিয়েও এই প্রাণী নাশের ব্যাপারে আপত্তি করবার কিছু নেই।

ভারতের এই পশুপালন ব্যাপারে একটি যথোপযুক্ত প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে হ'বে। কৃষি-কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা যদি অল্পবিস্তর ডেয়ারী কার্য্যও চালায় সে যে শুধু আথিক দিক দিয়ে তাদের পক্ষে লাভজনক তা' নয়, আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও সেটা কল্যাণকর। আমাদের দেশ প্রধানতঃ নিরামিষাশী, কিন্তু নিরামিষাশীদের পক্ষে দুধ-ঘি একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই দুধ-ঘি-এর অভাবের দরুণ আমাদের স্বাস্থ্য একেবারে জাহান্নমে যেতে বসেছে এবং এই হেতুই আমরা জীবন সংগ্রামের টি'কে থাকবার শক্তি হারাতে বসেছি। উন্নত পশুপালন ব্যবস্থার দ্বারা আমরা যদি ডেয়ারী কার্য্য প্রচলন করতে পারি ত চাষীরা লাভবান হ'তে পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটতে পারে।

বাংলায় ফিসারী বিভাগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

এই প্রবন্ধের গোড়াব দিকে আমরা মাছের "বাই প্রোডাক্ট" গুলির নাম উল্লেখ করেছি এবং বলেছি যে, তদ্দ্বারা অনেকগুলি ব্যবসা পরিচালিত হ'তে পারে। বর্ত্তমানে ঐ সমস্ত জিনিসের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার হয় না। মৎস্যের ফুসফুস থেকে যে শিরীষ জাতীয় দ্রব্য তৈরী হয়, যাকে Isinglass বলে, তার যথেষ্ট বাজার পড়ে রয়েছে। ইউরোপ ও চীন দেশে মাছের ফুসফুসের যথেষ্ট চাহিদা আছে, সুতরাং ঐ সমস্ত দেশে ও বস্তু চালান যেতে পারে।

হাঙ্গরের চামড়া ও স্কেট মাছের ডানার যথেষ্ট চাহিদা আছে; বোম্বাই ও করাচী বন্দর থেকে তা চীনদেশে চালান যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলায় এসম্পর্কে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় না। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে বালেশ্বরের উপকূলভাগে বহু সংখ্যায় হাঙ্গর ও স্কেট-মাছ (সচরাচর যাহাকে শঙ্কর মাছ বলে) ধরা পড়ে; কিন্তু তাদের অবলীলাক্রমে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাদের চামড়া, মাংস, ডানা বা তেল প্রভৃতি সম্পদ সংগ্রহের কোন চেষ্টাই করা হয় না। স্কেট-মাছ নদীতে উপর দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত ঠেলে যায়, সেই জন্য মাঝে মাঝে বিহারের গঙ্গায় বড় বড় স্কেট-মাছ ধরা পড়ে। কিন্তু তাদের কোন সদ্ব্যবহার করা হয় না।

কুমীরও আমাদের দেশে অনেক দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং তা' সাধারণতঃ দু'জাতের হয়ে থাকে—(১) মেছো কুমীর বা ঘড়িয়াল (২) আসল জাত কুমীর, যা মানুষ খায়। বিহারে এই রকম বহু কুমীর শীকার করা হয়, কিন্তু তাদের মাংস ও তেলের ব্যবহার ঘটলেও চামড়াটাকে রক্ষা করবার প্রচেষ্টা অবলম্বিত হয় না। কুমীরে মাছ ভয়ঙ্কর নষ্ট করে, সুতরাং কুমীরের চামড়ার যদি ভাল বাজার পাওয়া যায় ত অধিক সংখ্যক কুমীর হত্যা করা দু'দিক দিয়ে প্রয়োজনীয়। কচ্ছপের

গোলাকেও আমাদের দেশে ফেলে দেওয়া হয়, কিন্তু তারও জগৎ জোড়া ব্যবসা-বাজার আছে।

কেরোসিন তৈলের প্রচলন হবার পূর্ব্বে, যে-সমস্ত দেশে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত সেখানকার লোকেরা নানারকম মাছ থেকে তেল বার করে জ্বালানীর জন্য ব্যবহার করত। আজও অনেক স্থলে গরীব অধিবাসীরা এই পন্থাই অনুসরণ করে। অনেক মাছের তেল ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। স্কেট মাছের তেল বাতের পক্ষে উপকারী। স্কেট মাছের লম্বা লম্বা ল্যাজ (যাকে শঙ্কর মাছের চাবুক বলে) ভাল চাবুকের জন্যও ব্যবহৃত হ'যে থাকে। এসমস্ত ছাড়াও গাছের সার হিসাবে পচা মাছের সার অতি মূল্যবান বলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে মাছ খেতে কুলায় না বলেই আমরা এ-জিনিসটা ঠিক ধরতে পারিনা, কিন্তু দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থানে আম, লিচু প্রভৃতি ফলের সার হিসাবে প্রচুর মাছ ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। ইহার ওভার-প্রোডাক্সনের কোন আশঙ্কা নেই।

বাংলাদেশের প্রধান মাছ হ'ল ইলিশ মাছ। বাংলার বাইরে সারা ভারতের মধ্যে সিন্ধুনদ ও গোদাবরী এবং কাভেরী নদীতে কিছু কিছু ইলিশ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাংলার কাছে কেহই লাগে না। শুধু তাই নয়, এই ইলিশমাছ স্বাদে গন্ধে ও উপকারিতায় অতুলনীয়। কোন্ মাছ খেতে ভাল লাগে-এ নিয়ে যদি কখনো ভোট গ্রহণ করা হয় তা' হলে প্রতিযোগিতা চল্‌বে ইলিশ মাছ আর রুই মাছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, বাংলাদেশে ইলিশ মাছই বেশী ভোট পাবে। এর একমাত্র কারণ যে, ইলিশ মাছের এমন একটা আস্বাদ আছে যা' অন্য কোন মাছের মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। বাংলার জেলেদের মধ্যে অধিকাংশের এই ইলিশ মাছের ব্যবসাটাই প্রধান এবং বেশী অর্থকরী। বর্ষাকালে উত্তাল তরঙ্গময়ী পদ্মার বুকের ওপর কত হাজার হাজার জেলে ডিঙ্গী যে ঘুরে বেড়ায় তার ইয়ত্তা নেই। গঙ্গার বুকের ওপর ঐ সময় লাল-নীল-হরিত বর্ণের পাল তোলা নৌকাগুলোও নদীর শোভা বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশে ইলিশমাছের ব্যবসা এক প্রধান অর্থকরী ব্যবসা। বছরের প্রায় সারা সময় এ-মাছ পাওয়া যায়, তবে জুন থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে ধরা পড়ে এবং সে সময়কার ইলিশের স্বাদের আর তুলনা নাই। মিঃ কে, জি, গুপ্তের আনুমানিক হিসাবানুযায়ী বাংলা দেশে ইলিশ মাছের সময়ে প্রায় আট হাজার নৌকা ইলিশ মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত থাকে।

কিন্তু একটা কথা আছে। ইলিশ মাছের এই অজস্র ব্যবহারের জন্য উক্ত মাছের ব্যবসার ক্ষেত্রে আশঙ্কা করবার কারণ ঘটেছে। মিঃ কে, জি, গুপ্ত এসম্পর্কে তাঁর রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন—In the course of our enquiries we received complaints from all directions that the supply of Hilsa was greatly on the decline. On the other hand, owing to increase of population and improved transport, there is a growing demand, to meet which incessant fishing is resorted to throughout the year; on the other hand, no steps are taken to protect the "spent" fish and fry in

their downward run to the sea or to assist nature by artificial propagation. It is certain that if no remedial measures are adopted, in course of time the hilsa would at this rate be exterminated, or the fishery at least would greatly diminish, as was the case in the United States in 1879,

অর্থাৎ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মাল চালানীর সুব্যবস্থা হওয়ার দরুণ ইলিশ মাছের চাহিদা প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়াতে সমস্ত মাছই প্রায় ধরে নেওয়া হয়, মাছের বংশ বৃদ্ধি করবার জন্য উপযুক্ত প্রায় কিছুই রাখা হয় না; এবং সেইজন্য ইলিশ মাছের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। এই রকম যদি অবস্থা থাকে এবং প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তা'হলে ইলিশমাছের ফিসারী একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

মিঃ কে, জি, গুপ্ত তাঁর রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন ১৯০৮ সালে। আজ এই ১৯৩৭ সালে সে-আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে বই কমে নি, কেননা, ১৯০৮ সালের তুলনায় আজ লোকসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 'ট্রানসপোর্ট ফেসিলিটিজের প্রভৃত উন্নতি ঘটেছে। তদ্দরুণ চাহিদা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ইলিশ মাছের চাষ বৃদ্ধির দিকে কোন নজর দেওয়া হয়নি। বরং এই চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় সমস্ত মাছই ধরে নেওয়া হচ্ছে এবং এই জন্যই ইলিশ মাছের বংশ বৃদ্ধি ঘটছে না।

এর প্রতিকার কল্পে গুপ্ত সাহেব বলেছেন যে বছরের মধ্যে কয়েক মাস যে-সময় মাছেরা ডিম পাড়ে সেই সময়টা মাছ-ধরা বন্ধ রাখা দরকার। এসম্পর্কে তিনি রিপোর্টে লিখেছেন The only way of re-introducing the close season is by penalising the capture of hilsa, say, from the 1st November to the 15th February. অর্থাৎ ১লা নভেম্বর থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যদি আইন করে মাছ ধরা বন্ধ রাখা যায় তবে সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান ঘটতে পারে।

আমেরিকান ইলিশ ও দেশী ইলিশ একই পরিবারভুক্ত হলেও ভিন্ন জাতের; কিন্তু বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ, ও আকৃতিতে ওরা প্রায় একই। যদিও পূর্ব্বোল্লিখিত ভিন্ন জাতের দরুণ ওদের বৈজ্ঞানিক নাম বিভিন্ন। আমেরিকান ও দেশী ইলিশ উভয়েই বছরের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নদীর উৎপত্তি অভিমুখে এগুতে থাকে এবং উভয়েই সেই অবস্থায় ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। কিন্তু আমেরিকায় আমেরিকান ইলিশ সম্পর্কে যে-রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে, আমাদের এখানে সে-সমস্ত কিছুই হয় নি এবং সেইজন্য দেশী ইলিশের প্রকৃতির অর্থাৎ তারা কি কি খায়, কখন ডিম পাড়ে ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনে। ফ্রান্সের জেলের মত বাংলার জেলেরাও বিশ্বাস করে যে, ইলিশমাছ নদীতে ডিম ফোটায় না। এর স্বপক্ষে তারা যুক্তি দেখিয়ে বলে যে আজ পর্য্যন্ত নদীতে কোন ইলিশ-ছানা ধরা পড়েনি। কিন্তু, আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ এসম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছে; আমাদেরও এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত। আমেরিকায়

বৎসরের মধ্যে মাত্র কয়েক মাস ইলিশ মাছ ধরা হয়, বাদবাকী সময় ইলিশমাছ ধরা নিষিদ্ধ; আমাদের এখানেও এইরকম একটা নিয়ম করে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইলিশমাছ শিকার বন্ধ রাখা উচিত।

* * *

আমরা প্রবন্ধের এতগুলি পৃষ্ঠায় বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। পূর্ব্বেই বলেছি যে ১৯০৮ সালে এসম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট বঙ্গোপসাগরে অভিযান চালিয়ে ছিলেন; তার বিবরণ জানা থাকলে আমাদের ভবিষৎ ব্যবসার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হ'বে। এই বিবরণ দুষ্প্রাপ্য, আমরা বহু কষ্ট স্বীকার করে পুরাতন কাগজপত্র ও ফাইল ঘেঁটে নিয়ে তার চুম্বক প্রদান করলাম।

মিঃ কে, জি, গুপ্ত, আই, সি, এস্, মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম এবিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এসম্পর্কে কেপ্ কলোনীই তাদের অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত, সেখানেও প্রথমে কোন কিছু জানা ছিল না, গভর্ণমেণ্ট্ এসম্পর্কে অগ্রণী হযে প্রচেষ্টা চালাতেই প্রাইভেট্ ক্যাপিটাল গিয়ে ব্যবসাটার ওপর পড়েছিল। মিঃ কে, জি, গুপ্ত সাহেবের ধারণা ছিল যে আমাদের এখানেও সেই রকম কিছু ঘটবে।

তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথম অনুসন্ধান কার্য্যের তরে অভিযান চালানো আবশ্যক এবং তার জন্য একখানি ষ্টীম ট্রলার চাই। সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটস্কে লিখতেই তিনি "গোল্ডেন ক্রাউন" নামে একখানি ষ্টিম-ট্রলার পাঠিয়ে দিলেন এবং সেটা ১৯০৮ সালের ১৩ই জুন তারিখে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলে—তার সঙ্গে রইল ৫ জন শ্বেতাঙ্গ নাবিক, একজন প্রধান নৌ-কর্ম্মচারী, ১৭ জন ভারতীয় মাঝি, ২ জন জেলে ও ২০ টন বরফ। সেবারে ৪০ দিন ধরে মাছ ধরা কার্য্য চালানো হয় এবং সর্ব্বসমেত ১২ টন মাছ পাওয়া যায়। সমস্ত ধৃত মাছই বরফে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছিল, সুতরাং মাছ যখন কলিকাতার বাজারে পৌছচ্ছিল তখন তা' কিছুমাত্র নষ্ট হয় নি। হগ্ মার্কেটে উক্ত সামুদ্রিক মাছ বিক্রয় করবার জন্য ষ্টল্ খোলা হয়েছিল এবং দেখা গেছলো যে, উক্ত মাছের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগষ্ট মাসে সেখানে ৭০০ টাকার মাছ বিক্রী হয়, সেপ্টেম্বরে সেটা ৯০০ টাকায় দাঁড়ায়। মাছের বাই প্রোডাক্ট্ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় একটি কারখানাও স্থাপিত হয়।

অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কোথায় কোথায় এবং কত রকমের মাছ পাওয়া যায় তার সন্ধান নেওয়া। সে-উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। এসম্পর্কে বাংলাদেশের তৎকালীন কমিশনার অব্ ফিসারীজ এ, আমেদ সাহেব তাঁর রিপোর্টে লিখিয়াছেন—As one of the main objects of the fishery survey is to determine the haunts and migration of different species of fish found in the Bay, I am getting the representative species of each cruise identified by Mr. B. L. choudhury, * * * * * I am glad to be able to say that already about 100 species have been identified, of which many are for the first time reported from the localities

and about six are believed to be new to Science. এর মোটামুটি অর্থ হচ্ছে এই যে, ফিসারী সংক্রান্ত অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মাছেদের অবস্থান স্থল এবং কত রকমের মাছ পাওয়া যায় সেটাই আবিষ্কার করা, সে-সম্পর্কে বলতে পারা যায় যে, একশ'রও ওপর বিভিন্ন জাতের মাছ পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি আমাদের কাছে নতুন এবং ছ'টি জাত মৎস্য-বিজ্ঞানের নিকট একেবারে নতুন।

উক্ত প্রথম অভিযানের পর "গোল্ডেন ক্রাউন" আবার দ্বিতীয় অভিযানে বেরোয় ১লা অক্টোবর। এবারে উক্ত ট্রলার ৭ বার উড়িষ্যার উপকূল, কোনারকের উপকূল, পুরীর উপকূল, সুন্দরবনের পূর্ব্বাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে 'ট্রিপ্' দেয়। প্রতিবারেই সে ৯ থেকে ২১ ফ্যাদম জলের গভীরতার মধ্যেই মাছ ধরা কার্য্য চালাচ্ছিল। এই ৭ দফায় গোল্ডেন ক্রাউন অক্টোবর মাসে ১৪ দিন, নভেম্বর মাসে ১০ দিন, ডিসেম্বর মাসে ১১ দিন, মোটমাট ৩৫ দিন কাজ চালিয়েছিল (অবশ্য এখানে খালি কাজের সময়টুকু হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে)। নিম্নে প্রতিবার কি পরিমাণ মাছ পাওয়া গেছল তার একটা তালিকা দেওয়া গেল—

১ম	ট্রিপ্—৮,৬৬০	পাউণ্ড্
২য়	,, —১৪,২৩৯	,,
৩য়	,, —১২,৩৪৭	,,
৪র্থ	,, —৭,৬৩৪	,,
৫ম	,, —১৫,৯৬৮	,,
৬ষ্ঠ	,, —১৮,১৯৫	,,
৭ম	,, —৮,৫৭৪	,,
	মোট ৮২,৬১৪	,,

(উক্ত তালিকা বাংলা গভর্ণমেণ্টের তৎকালীন ফিসারী এড্ভাইসার্ মিঃ জে, টি, জেন্‌কিন্স, ডি, এস-সি, পি-এচ্, ডি'র বিবরণী হ'তে সংগৃহীত)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উক্ত পঁয়ত্রিশ দিনে গড়ে প্রতিদিন ২,৩৬০ পাউণ্ড মাছ পাওয়া গেছল। এর মধ্যে অবশ্য হাঙ্গর, করাত-মাছ প্রভৃতি অপরাপর জীবজন্তুদের ধরা হয় নি

জেন্‌কিন্স্ সাহেবের মতে গোল্ডেন ক্রাউন যে পরিমাণ মৎস্য শীকার করেছে, ইউরোপীয় ক্ষেত্র হ'লে ওতেই ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জ্জন করা যায়। এসম্পর্কে তিনি লিখেছেন—So far then as actual quantity of fish caught per diem is concerned, the results are not unfavourable. Similar quantities in European works, such as the North Sea, would render trawling a Commercial success. এর মানে হচ্ছে যে, প্রতি দিন যে পরিমাণ মাছ ধরা পড়েছে তা' নিরাশাব্যঞ্জক নয়। ইউরোপের নর্থ সী কিংবা অপর কোন জায়গায় এ পরিমাণ মাছ ধরা পড়লে তাতে ব্যবসা বেশ চলে যেত।

উক্ত পরিমাণ মাছকে বরফ দ্বারা 'প্রিজার্ভ্' করে এনে কতক হগ্ মার্কেটে এবং কতক চিংড়ী ঘাটার বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হ'ত। দৈনিক ২,৭০০ পাউণ্ড করে মাছ যদি বিক্রয়ের জন্য আসে, আর পাউণ্ড প্রতি ২ পেন্স্ যদি দর হয়, তাহ'লে প্রতি দিন ২০ পাউণ্ড মূল্য অর্থাৎ প্রায় ২৭০ টাকা পাওয়া যায়।

"গোল্ডেন ক্রাউন" আবার জানুয়ারী মাসে মৎস্য ধরবারজন্য সাগরাভিমুখে পাড়ি দেয় এবং

জানুয়ারীর সুরু থেকে মার্চ্চ-এর শেষ পর্য্যন্ত এই কয় মাসে মোটমাট ছয়টি ট্রিপ্ মারে। এবারে মোটমাট ৫৩ দিন "গোল্ডেন ক্রাউন" পরিভ্রমণ করেছে। প্রত্যেক ট্রিপের গড়ে স্থিতিকাল হচ্ছে ৮৯/১০ দিন। কার্য্যকরী দিন হিসাবে ধরলে এবারে উক্ত ট্রলার দ্বারা মোটে ৩১¾ দিন কাজ, হয়েছিল, তন্মধ্যে জানুয়ারী মাসে ১৪¾ দিন, ফেব্রুয়ারী মাসে ৮¾ দিন এবং মার্চ্চমাসে ৭¾ দিন কাজ চলে। এই বারের অভিযানের বিশেষত্ব এই যে, অনেক দূর দূর স্থানে এবং ৩০ ফ্যাদম পর্য্যন্ত গভীর জলে অনুসন্ধান কার্য্য চালানো হয়েছিল। কী পরিমাণ মাছ এবারে ধরা পড়েছিল তার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল:--

১ম ট্রিপ	—৪,২৬২	পাউণ্ড
২য় ,,	—১৯,০২০	,,
৩য় ,,	—১৩, ৯১৪	,,
৪র্থ ,,	—১৭,৯৮৯	,,
৫ম ,,	—৮,৯৫৮	,,
৬ষ্ঠ ,,	—১৭,৯৭৭	,,
মোট	৮২,১২০	পাউণ্ড বা প্রায় ৩৬¾ টন।

কাজের দিক দিয়ে হিসেব করলে এবারে গড়ে দৈনিক ২৩ হন্দর করে মাছ ধরা পড়েছিল।

উক্ত ধৃত মাছের বিক্রয় তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল:—

মাস	পরিমাণ	মূল্য
জানুয়ারী ১৯০৯	২২৭ মণ ২৬ সের	৯৭৪॥৶৫
ফেব্রুয়ারী ,,	১১৩ ,, ১১ ,,	১,৫৩৩৵১৫
মার্চ্চ ,,	১৮২ ,, ২২ ,,	৫৪৫৲/১৫
মোট—	৫২৩ মণ ১৯ সের	৩,০৫৩॥৶৫

(উপরোক্ত সমস্ত তালিকা জেন্‌কিন্স্ ও আমেদ সাহেবের বিবরণী হ'তে সংগৃহীত)

এপ্রিল মাসে পুনরায় "গোল্ডেন ক্রাউন্" সাগরাভিমুখে পাড়ি দেয় এবং জুন মাস পর্য্যন্ত মাত্র দু'বার ট্রিপ্ মারে। এইবার এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ট্রিপের সংখ্যা কমে যাবার কারণই হচ্ছে যে ২৮শে এপ্রিলের পর থেকে ট্রলারটি খারাপ হ'য়ে যাওয়ার দরুণ "ড্রাই ডকে" পড়েছিল।

এবারে ১ম ট্রিপের মেয়াদ হচ্ছে এপ্রিলের ৭ সাত তারিখ পর্য্যন্ত, আর ২য় ট্রিপের মেয়াদ হচ্ছে ১৫ই এপ্রিল থেকে ২৫শে এপ্রিল পর্য্যন্ত।

ধৃত মাছের পরিমাণ।

১ম ট্রিপ্	—১৮,২৬২	পাউণ্ড্
২য় ট্রিপ্	—২৫,৭৩৬	,,
মোট	—৪৩,৯৯৮	,,

বা

১৯ টন ১২ হন্দর ৪৩ কোয়ার্টার ১০ পাউণ্ড্

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের অভিযানের সঙ্গে এবারের অভিযানের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, অপরাপর বারের চেয়ে এবারে কাজের অপেক্ষাকৃত উন্নতি ঘটেছে। এর থেকে এই প্রতীয়মান হয় যে, যদি আরও দক্ষিণে যাওয়া যায় ত কাজের অপেক্ষাকৃত বেশী উন্নতি ঘটবে।

সেপ্টেম্বর মাসে পুনর্ব্বার "গোল্ডেন ক্রাউন" সমুদ্রযাত্রা করে এবারে উক্ত মাসেই দু'টি ট্রিপ্ দেয়। ঐ সময়ে আবহাওয়া ভয়ঙ্কর প্রতিকূল ছিল কিন্তু তা' সত্বেও' সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। ১ম ট্রিপে ৩১,৬৬০ পাউণ্ড ও ২য় ট্রিপ ১৫,২৭২ পাউণ্ড মাছ পাওয়া গেছল এবারে সর্ব্বসমেত প্রায় ২১ টন মৎস্য ধরা পড়েছিল।

১ম ট্রিপে আসলে ৭½দিন কাজ হয়েছিল এবং দ্বিতীয় ট্রিপে ৬ দিন। সুতরাং গড়ে প্রতিদিন ৩১ হন্দর করে মাছ পাওয়া গেছল; এই হিসাবটা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। এসম্পর্কে জেনকিন্স্ সাহেব লিখেছেন—× × × × An average of 31 cwts per day's fishing, a result which is extremely creditable to Captain Mann and his European crew in view of the bad weather encountered and the fact that a large amount of time on each occasion was devoted to purely exploratory work., অর্থাৎ নিছক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গড়ে দৈনিক ৩১ হন্দর মাছ পাওয়ার ব্যাপারটা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। তা'ছাড়া মনে রাখ্তে হবে যে "Golden Crown"এর মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল মাছের আবাসস্থলগুলির সন্ধান করা—মাছ ধরাটা ছিল গৌণ উদ্দেশ্য। এপর্যান্ত গোল্ডেন ক্রাউন যতগুলি অভিযান চালিয়েছে তাদের ক্রমিক গড়পড়তা দৈনিক মাছ প্রাপ্তির হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

সময়	দৈনিক প্রাপ্তির পরিমাণ।
১৯০৮ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর	৬ হন্দর
,, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর	২১ ,,
১৯০৯ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ্চ	২৩ ,,
,, এপ্রিল থেকে জুন	৩৩'৪ ,,
,, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর	৩১ ,,

উক্ত হিসাব থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মৎস্য সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্য্যের ক্রমিক উন্নতি ঘটেছে। এই হিসাব দেখে এরূপ মতামত প্রকাশ করা যায় যে, ব্যবসার ক্ষেত্রে লোকসানের আশঙ্কা থাকবে না। অনুসন্ধান কার্য্যে সমস্ত ব্যাপারই একটু ঢিলাভাবেই সম্পন্ন হয়ে থাকে, ব্যবসা কার্য্যের সময় সমস্ত ত্রুটি বিচুতি সংশোধিত হওয়ার দরুণ উক্ত হিসাবের আরও উন্নতি ঘটবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের হিসাবের সঙ্গে ওদেশের মৎস্য-শীকার সংক্রান্ত কাজের তুলনা করবার জন্য ওদের প্রতিদিনের গড়পড়তা মৎস্যপ্রাপ্তির একটা তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

স্থান	দৈনিক গড়পড়তা পরিনাণ
আইস্ল্যাণ্ড	৪৪'১৬ হন্দর
শ্বেত সাগর	৪৩'১৪ ,,
রোকল্	৪১'১৮ ,,
স্কটল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চল	৩৭'৯০ ,,
ফ্যারো	৩৪'৩৫ ,,
আয়ারল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চল	২৬'৯২ ,,
,, পশ্চিমাঞ্চল	২৫'৪৯ ,,
বে-অভ্ বিস্কে	১৯'৪৬ ,,
স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চল	২২'৬১ ,,
নর্থ সি	১৭'০৭ ,,
বৃটিশ চ্যানেল্	১৬'৭৫ ,,
আইরিশ সাগর	১৫'৩৯ ,,
ইংলিশ চ্যানেল	১০'৫০ ,,
পর্ত্তুগাল ও মরক্কো	৯'৫৭ ,,

বাংলা গভর্ণমেণ্টের অর্থসচীব অনারেবল শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয়ের

অভিভাষণ

অলীক সাম্যের বাণী

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অবস্থার কোনরূপ পার্থক্য থাকিবে না, এরূপ কোন অলীক সাম্যের কথা মনে করিয়া আপনারা ভ্রান্ত হইবেন না। আপনারা মনে রাখিবেন, শুধু বৈষম্যের ধ্বংস-প্রবৃত্তির মধ্যে জাতির বৃহত্তর কল্যাণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না; আর, যেখানে কল্যাণ নাই তাহার সার্থকতা কোথায়? সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সুসমাধান, যে কল্যাণ-প্রচেষ্টা, তাহাই মানব সমাজের প্রকৃত কল্যাণের মূল। সত্যকার সাম্যবাদ ইহাই। নিজের বাঁচিবার উপায় যাঁহারা কেবল পরের ধ্বংসের মধ্যে খুঁজিতে চাহেন, তাঁহারা নিজে-কেও বাঁচাইতে পারিবেন না; অপরকে তো বিনাশ করিবেনই। নিজের আত্মজ্ঞান সচেতন করিবার মধ্যে আপন উন্নতির বীজ নিহিত আছে। আপনারা নিজ কল্যাণের প্রতি সজাগ হউন, দেখিবেন সকল দুর্ব্বলতা আপনা আপনি দূরীভূত হইবে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকিতে পারে, কারণ, মানুষের তৈয়ারী কোন কিছুই সম্পূর্ণ নয়; কিন্তু তজ্জন্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য সচেষ্ট না হইয়া যদি গোটা সমাজ ব্যবস্থারই পরিবর্ত্তন করিতে চাই, তবে হয়ত আপাতঃ কল্যাণের পথেই অকল্যাণ আসিবে। আমরা যদি উপযুক্ত ব্যবস্থার গুণে জাতীয় ধনসম্পদকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করিয়া কৃষি শিল্প-বাণিজ্য ও সমাজের কল্যাণানুগ কার্য্যপ্রণালীর মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করিতে পারি তাহা হইলে ধ্বংস ও বিরোধমূলক আন্দোলনের প্রয়োজন থাকিবে না। আমি অবশ্য স্বীকার করি যে, বর্ত্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা কমাইয়া দিতে হইবে; কিন্তু সেজন্য যে সমাজ ব্যবস্থা হইতে এই বৈষম্য একেবারে দূর করা সম্ভব তাহা আমি মনে করি না। তাই আমাদের প্রচেষ্টা হইবে এই বৈষম্যের প্রভেদকে সঙ্কীর্ণ করিয়া যাহারা সমাজের নিম্নস্তরে আছেন তাঁহাদিগকে উপরে তুলিতে সাহায্য করা; তাহাতে যদি কাহাকেও নীচে নামান অনিবার্য্য হইয়া পড়ে তবে তাহাতে ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না। নীচুকে উঁচুতে উঠিতে সাহায্য করিলেই বৈষম্যের পার্থক্য অনেকটা দূর হইবে

—ইহাই আমার বিশ্বাস এবং সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-প্রচেষ্টা দ্বারা নীচুকে উঁচুতে উঠিতে সাহায্য করাই আমি গভর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

বৈষম্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের উপায়

বর্ত্তমানে এই বৈষম্যমূলক অবস্থার পরিবর্ত্তন করার প্রতি আমাদের সকল চেষ্টা নিয়োজিত করিতে হইবে। বাংলার দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার প্রতিকার, নিরক্ষরতা দূর করা, কৃষক প্রজার উপর অবিচার নিবারণ, পল্লীজীবনের শ্রীবৃদ্ধিসাধন,—এই সকলই নির্ভর করিতেছে আমাদের সমবেত চেষ্টা ও শুভবুদ্ধির উপর। এই বিষয়ে আমাদের সকলের চিন্তা ও চেষ্টা যদি একলক্ষ্যাভিমুখী না হয় তাহা হইলে আমরা যে-ক্ষমতাটুকু পাইয়াছি, কল্যাণের পথে তাহার সার্থকতা অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়াই আমি আশঙ্কা করি।

আমার মন্ত্রীত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্য

গত কয়েক বৎসর কৃষক ও রায়তের অভাব অভিযোগ লইয়া যে সকল আন্দোলন হইয়াছে, তাহাদের দাবী ও অধিকারকে যাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের অনেকের উপরই অবস্থার প্রতিকারের ভার পড়িয়াছে। আপনারা জানেন আমিও এই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। কেবল তাহাই নহে, এই আন্দোলনের গতিপথে লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকারের যে সকল দাবী দেখা দিয়াছে তাহার আলোচনা ও প্রতিকার-চিন্তা আমি বহুদিন যাবৎ করিয়া আসিয়াছি। আমি সংস্কার ও ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি যখন দেখিলাম, বাঙ্গালার কৃষক-প্রজার হিতসাধনকল্পে পল্লীর ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থা, ঋণ আদান-প্রদান ব্যবস্থার প্রচলিত ত্রুটি ও অন্যায়গুলি দূর করিবার জন্য আপনাদিগের নির্ব্বাচিত নেতারা আন্তরিক সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন কর্ত্তব্যের আহ্বানে আমিও তাহাদের সহিত যোগ দিয়া মন্ত্রীমণ্ডলের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। এই পথে পদার্পণ করিতে আমাকে আমার নিজের সহিত, আমার অভ্যাসের সহিত, আমার রুচি ও প্রবৃত্তির সহিত, যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। মানুষের জীবনে যে অর্থ ও প্রতিষ্ঠা কাম্য, ব্যবসায়ের সহিত যুক্ত থাকিয়া তাহা আমি যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমার উপার্জ্জন যেমন অকিঞ্চিৎকর ছিল না, ভারতবর্ষে ব্যবসায়ী মহলে প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সৌভাগ্যও আমার কম হয় নাই। কেবল কর্ত্তব্যের আহ্বানেই এই উপার্জ্জন ও প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া আসিতে আমি দ্বিধা বোধ করি নাই। তাহার চেয়েও বড় কথা আমার অনেক পুরাতন ও বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী হইতেও আমাকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে। আজ অহঙ্কারের সহিত আমি ত্যাগ স্বীকারের ঘোষণা করিতেছি না। প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির নিরাপদ আসনে বসিয়া অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা দেশের মুখ্য সমস্যা সমাধানের সন্তোষ আমার নিকট অধিক-কাম্য বলিয়াই আমি মনে করিয়াছি; মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলে ঈপ্সিত কার্য্যের অধিকতর সুযোগ পাইব—এই বিশ্বাসই আমাকে প্রেরণা দিয়াছে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে একটি প্রথা আছে যে, কোন মহৎ কার্য্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধির
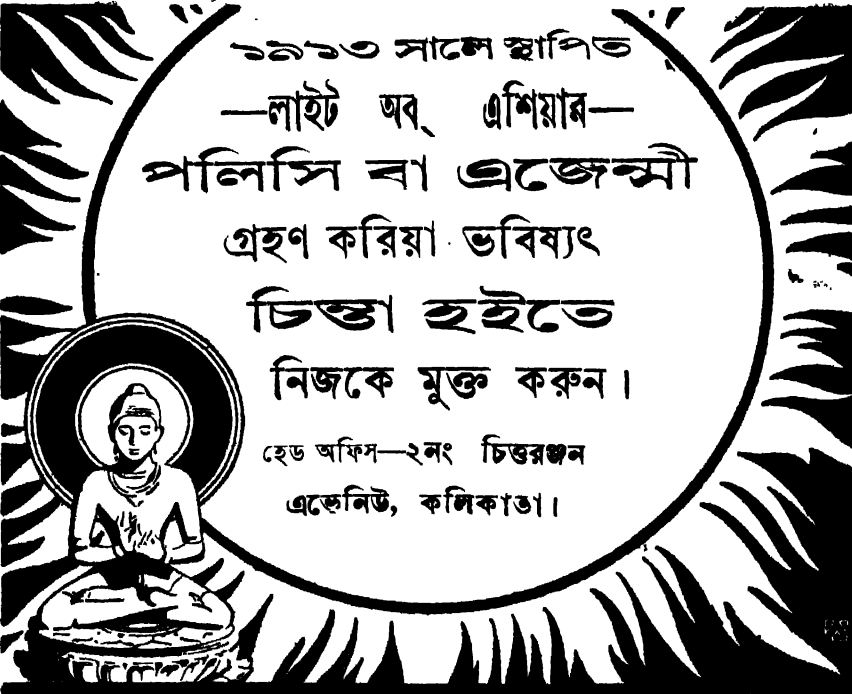
জন্য সংযম পালন করিতে হয়; আমিও তেমনি দেশসেবার গুরু-দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য গ্রহণ করিবার প্রারম্ভে ব্যবসায় ক্ষেত্রে অর্থ ও প্রতিষ্ঠার মোহ ত্যাগ করিয়া নিজকে ঈপ্সিত কার্য্যে ব্রতী করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছি। রাজনৈতিক কারণে মন্ত্রীদের প্রতি আমাদের দেশের লোকের চিত্তে দীর্ঘকালের একটা বিরুদ্ধভাব রহিয়াছে। কাজেই এই পদ গ্রহণ করিলে হয়তো অনেকের কাছে ধিক্কার ও উপহাসভাজন হইতে হইবে, ইহাও আমি উত্তমরূপেই জানিতাম। কিন্তু সুলভ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অপেক্ষা সাধ্যমত জনসেবাই আমি চিরদিন বড় করিয়া দেখিয়াছি। আমাকে ভুল বুঝিবার ও ভুল বুঝাইবার চেষ্টা হইবে, তাহা জানিয়া বুঝিয়াই আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি।

কিরূপে কৃষক-প্রজাসম্প্রদায়ের তথা বাঙ্গালার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, ন্যায্য অধিকার-বিরোধী আইনগত বাধাগুলির অপসারণ ও স্থায়ী কল্যাণ-সাধন সম্ভব হইতে পারে তাহারই অনুসন্ধান ও তাহারই জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আমার সহকর্ম্মীদের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় হইবে। এই কর্ত্তব্য উদ্‌যাপনে নিন্দা, প্রশংসা কিছুই আমাকে আদর্শচ্যুত করিবে না,—আমি এইরূপ সঙ্কল্প

লইয়াই এই গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছি।

বৃহত্তম সমস্যা সমাধানে শাসনতন্ত্রের ক্ষমতা

কিন্তু আমি আপনাদিগকে কয়েকটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। পুরাতন ব্যবস্থার বা কোন আইনের সংশোধন বা সংস্কারের জন্য আইন সভায় একটা প্রণালীবদ্ধ নিয়ম আছে। তাহার ব্যতিক্রম করিয়া সহসা কিছু করা সম্ভবপর নহে। তাড়াহুড়া করিয়া সস্তা বাহবা লইতে গেলে আমরা যে অনেক সমস্যার প্রতিই সুবিচার করিতে পারিব না, এ বিষয়ে সম্ভবতঃ আপনাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণও আমার সহিত একমত হইবেন। আমাদের ব্যবস্থা আমাদিগকেই করিতে হইবে, কাজেই ইহার দায়িত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়া সকল তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াই কোন সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে হবে। বহু বৎসর যাবৎ যে শাসন ব্যবস্থা কায়েমীভাবে চলিয়া আসিয়াছে, রাতারাতি তাহাকে যে আমরা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া একটা আমূল সংস্কার করিতে পারিব তাহা আমি মনে করি না, আপনারাও এরূপ আশা করিবেন না। কিন্তু আমার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আপনাদের সহযোগিতা পাইলে আপনাদের বৃহত্তম সমস্যাগুলির সমাধান কল্পে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে পারিব। এই সকল ব্যবস্থার দরুণ সম্যক্ ফললাভ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হইতে পারে; কিন্তু তাহা অনিবার্য্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আশু ফললাভ যাহাই হউক, শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণকামী যে মনোভাব সঞ্চারিত হইবে দেশের পক্ষে তাহা সামান্য লাভ নহে।

সংখ্যাগরিষ্ঠদল শাসনতন্ত্রের স্বপক্ষে

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার সাফল্য আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতেছে। একদিকে আপনারা যেমন উপযাচক, অন্যদিকে তেমনই দাতা। সুতরাং আপনাদের ক্ষমতা উপযুক্তভাবে ব্যবহারের উপরই দেশের অভাব অভিযোগ নিরাকরণের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। আপনারা জানেন যে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রকে কাজে প্রয়োগ করিবার সঙ্কল্প লইয়াই এই প্রদেশের আইন সভার অধিকাংশ সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যাঁহারা শাসন ব্যবস্থাকে কেবল মাত্র ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই আসিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা তুলনায় কম। যাঁহারা সংখ্যায় বেশী শাসন-কর্ত্তৃত্বের ভার তাঁহাদের উপরই পড়িয়াছে। তাঁহারাও এই শাসনতন্ত্রের দোষত্রুটি জানিয়াই ইহাকে দেশের উন্নতি মূলক কার্য্যে যতটা সম্ভব প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে এই শাসনতন্ত্র যে রূপ পরিগ্রহণ করিত, আমরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায় আমাদের হাতে তাহার কোন রূপান্তর ঘটে নাই বা আমাদের সংস্পর্শে ইহার দোষ-ত্রুটি বৃদ্ধি পায় নাই। কংগ্রেস জনহিতকর কার্য্যের জন্য যে পরিকল্পনা করিয়া থাকেন আমরাও সেই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। যে কোন দলের পক্ষেই এইরূপ জনহিতকর কার্য্যের ব্যাপকতা এবং সীমা বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থায় সুনির্দ্দিষ্ট। কোন দলবিশেষ এই প্রকার কার্য্যের ভার লইলেই তাহার নির্দ্দিষ্ট ব্যাপকতা বা সার্থকতায় কোন ব্যতিক্রম হইবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

কংগ্রেসের মনোভাব প্রকৃতভাবে ধ্বংসমূলক নয়

আপনারা জানেন যে, কংগ্রেস যদিও শাসনতন্ত্র ধ্বংস করিবার কথা বলিয়া থাকেন, তথাপি তাহাদের কর্ম্মপন্থায় ইহাকে আশু ধ্বংস করিবার কোন ইচ্ছা পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ কংগ্রেস নূতন শাসন-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া দেশ-বাসীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রচেষ্টা কার্য্যকরী করিবার জন্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; এবং যে যে প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সেই প্রদেশের প্রাদেশিক গভর্ণরগণ যদি কংগ্রেসী মন্ত্রিগণকে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বাধা দিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেন, তাহা হইলে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া এই শাসন ব্যবস্থাকে কাজে প্রয়োগ করিতেন। সুতরাং কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার সহায়তায় জনহিতকর কার্য্য করিবার সুযোগ হ্রাস-বৃদ্ধি পাইত, এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবে এইটুকু হয়ত অনুমান করা যাইতে পারে যে, কংগ্রেসের সংহতিশক্তি, আদর্শ ও নিয়মানুবর্ত্তিতা কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যসম্পাদনে বিশেষ সহায়তা করিত। প্রতিশ্রুতি লইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার মধ্যে বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা ধ্বংস করিবার ইচ্ছা মোটেই প্রকাশ পায় না; বরং ইহাকে কার্য্যকরী করিবার ইচ্ছাই প্রকাশ পায়। কারণ, যে যে প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সেই প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বগ্রহণ না করিয়াও শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস করিতে পারেন। মন্ত্রিগণের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব, বেতন পাশ করিতে অসম্মতি, ব্যয়-বরাদ্দে আপত্তি প্রভৃতি কতকগুলি প্রচলিত নিয়মেই ঠিকা মন্ত্রিমণ্ডলকে ভাঙ্গিয়া দিয়া শাসন ব্যবস্থাকে অচল করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিশ্রুতি লইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং পরে তাহার মধ্য হইতে শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা এমন কোন কুটিল পথ অনুসরণ করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। তাই বলিতেছিলাম, কংগ্রেসের কর্ম্মনীতি লক্ষ্য করিলে শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা অপেক্ষা ইহাকে কার্য্যকরী করিবার অভিপ্রায়ই অধিকতর সুস্পষ্ট মনে হয়।

গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে ধারণা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে, গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন, এবং পুরাতন ও প্রচলিত ধারণারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। গভর্ণমেণ্টের উপর একান্ত নির্ভরতার ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। সোজা কথায়, গভর্ণমেণ্ট মা-বাপের মত আমাদের প্রতিপালন করিবেন, আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করিবেন, এইরূপ মূঢ় প্রত্যাশা হইতে আমাদের মন মুক্ত করিবার সময় আসিয়াছে। আজ গঠন ও সংস্কারের ক্ষমতা আপনাদের নিজের হাতে, যদি কোথাও কোন সংস্কার বা পরিবর্ত্তন আশু-প্রয়োজন বোধ করেন, তবে তাহা করিয়া লইবার ক্ষমতা আপনাদের আছে। মনে রাখিবেন আপনাদের জীবন মরণের সমস্যাগুলির তুলনায় প্রজা-জমিদারের অধিকার সম্পর্কীয় প্রশ্ন নগণ্য বলিলেই চলে। বাঁচিবার প্রশ্নই যেখানে আজ প্রধান হইয়া উঠিয়াছে সেখানে অধিকারের প্রশ্নকে গৌণ বলিলেও অন্যায় হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। ভূমিরাজস্ব ও ভূমিসংক্রান্ত যে সকল ব্যবস্থা অনেকের মতেই

অব্যবস্থায় ভরিয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘকালের সংস্কার অভাবে যাহা জরাজীর্ণ এবং যাহা বর্ত্তমান কালেরও অনুপযোগী, তাহাই যদি আপনারা আপনাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক মনে করেন তবে তাহা আপনাদের প্রতিনিধিগণ দ্বারা সংস্কার করিয়া লইবার ক্ষমতা তো আজ আপনারা পাইয়াছেন; এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করাও খুব কঠিন নয়। কিন্তু ইহার চেয়েও গুরুতর যে সকল সমস্যা কৃষক-প্রজা সম্প্রদায়ের জীবনকে দুঃসহ এবং ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে অশিক্ষা, ঋণভার, কৃষিজাত-পণ্যের উপযুক্ত বিক্রয়ব্যবস্থার অভাব, অস্বাস্থ্য, পানীয় জলের অভাব, আয়ের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। এই সকল সমস্যার দিকেই এখন একান্তভাবে মনোযোগশীল ও তাহা সমাধানকল্পে উদ্যোগী হইবার সময় আসিয়াছে। কেবলমাত্র নিরুপায় হইয়া গভর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না; গভর্ণমেণ্টকে আপনারা কল্যাণ-সাধনের যন্ত্ররূপে দেখিতে ও ভাবিতে অভ্যস্ত হউন। আপনাদের অর্থে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান যাহাতে আপনাদের স্বার্থরক্ষায় এবং আপনাদের উন্নতি ও বিকাশের সহায়ক হয়, এমনভাবে ইহাকে পরিচালনা করিবার দায়িত্ব সকলে সচেতন ভাবে গ্রহণ করুন। গভর্ণমেণ্ট আজ আপনাদের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য নূতন নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, উন্নতির পথে আরোহণের জন্য সোপান তুলিয়া ধরিতে পারেন, কিন্তু উপরে উঠিতে হইবে আপনাদের নিজের পায়ে, নিজের চেষ্টায়। সেই ইচ্ছা ও শক্তি আপনাকেই অর্জ্জন করিতে হইবে। জাতীয় জীবনে কৃষককে যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া উন্নতি শিখরে আরোহণ করিতে হইবে, তাহাতে যদিও গভর্ণমেণ্ট ও নেতৃবর্গের সাহায্যের প্রয়োজন আছে, তবু প্রধানতঃ ইহা তাহার নিজের ইচ্ছা ও উদ্যমের উপর নির্ভর করে। বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা যদি নিজের মধ্য হইতে উৎসারিত না হয়, তবে বাহিরের চেষ্টা তাহাকে কতদূরই বা লইয়া যাইতে পারে। তাই কৃষকগণকে হইতে হইবে স্বাবলম্বী, আত্মবিশ্বাসী ও উদ্যমশীল,—গভর্ণমেণ্ট শুধু তাহাদের অধিকারগুলিকেই অব্যাহত রাখিতে পারেন এবং যে উন্নতির পথে তাহারা অগ্রসর হইবে সেই পথ সুগম করিয়া দিতে পারেন মাত্র।

প্রজা-সমস্যা সমাধানে আপনাদের কর্ত্তব্য

এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদিগকে কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ কথা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি। আপনাদের সমস্যাগুলি সমাধানের পথ ও তৎসম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব এবং সহায়তা করিবার সম্ভাবনীয়তা অতি সুনির্দ্দিষ্ট। ইহার মধ্যে কতকগুলি সমস্যার সমাধান সাক্ষাৎভাবে গভর্ণমেণ্টকেই করিতে হইবে সন্দেহ নাই; তাহা ছাড়া এমন কতক গুলি সমস্যা আছে, যাহার সমাধান সর্ব্বোত-ভাবে আপনাদের স্ব স্ব উদ্যম এবং চেষ্টার উপর নির্ভর করে। এই সকল সমস্যার জন্য গভর্ণমেণ্ট উপযুক্তরূপ অনুকূল অবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে পারেন মাত্র, এই অবস্থার সুযোগ লইয়া সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ করিতে হইবে আপনা-দিগকেই।

নিজ সমস্যা সমাধানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণার প্রয়োজন

কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই আপনারা ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন। আপনাদের

শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষালয়, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের উন্নত করিবার ইচ্ছা গভর্ণমেণ্ট আপনাদের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দিতে পারেন না; সে বিষয়ে আপনাদিগকে স্বেচ্ছায় এবং নিজের প্রয়োজনের প্রেরণায় অগ্রণী হইতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট কৃষির উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কেন্দ্রে আদর্শ 'ফার্ম্ম' স্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু সেই আদর্শ গ্রহণ করিবার এবং কার্য্যতঃ তাহাদের অনুসরণ করিবার ইচ্ছা স্ব স্ব কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের প্রেরণায় আপনাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্তি না পাইলে এই সকল আদর্শ ফার্ম্মের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। আদর্শ পল্লীস্থাপন সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। পারিপার্শ্বিক গ্রামগুলির অধিবাসিগণ যদি এই প্রকার আদর্শ পল্লীর উন্নত ব্যবস্থাগুলি পরিদর্শন ও তাহার অনুসরণ বিষয়ে উদ্যোগী হন, তাহা হইলেই এই পল্লী-সংস্কারের চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে, নতুবা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বিস্তৃতভাবে প্রত্যেক গ্রামকে আদর্শ পল্লী রূপে গঠন করিয়া তোলা সম্ভবপর নহে। গভর্ণমেণ্ট আপনাদের ঋণভার লাঘবের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু আপনারা যদি অমিতব্যয়িতা, মামলা মোকদ্দমা, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি দ্বারা কেবলই ঋণগ্রস্ত হইতে থাকেন, তবে গভর্ণমেণ্ট আপনাদের দুঃখ কতদূর নিরাকরণ করিতে পারিবেন? আপনারা যদি নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া চলিতে না পারেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ও সাহায্য সত্ত্বেও আপনারা বিপদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। রোগপীড়ায় যখন পল্লী-অঞ্চল ধ্বংসপ্রায়, তখন গভর্ণমেণ্ট সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত ও পল্লীস্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন; কিন্তু আপনাদের স্বাস্থ্য-জ্ঞান অর্জ্জন, বাসস্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি সাধন বা বাড়ীর আশেপাশে ফলমূল তরীতরকারীর উৎপাদন দ্বারা পুষ্টিকর খাদ্যের সংগ্রহ,—এই সকল স্বাবলম্বী কর্ম্মনীতি যদি গ্রহণ না করেন তবে গভর্ণমেণ্ট আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও

কতটাই বা সাহায্য করিতে পারিবেন? তাই আপনাদিগকে স্বাবলম্বী ও আত্মপ্রত্যয়ী হইতে হইবে। আমাদের দেশের প্রত্যেক কৃষক পরিবারের বসত বাটীর আশে-পাশে জঙ্গলপূর্ণ ও আগাছা পরিবৃত যে পতিত জমি পড়িয়া থাকে, কৃষকগণ যদি অন্ততঃ তাহারও সদ্ব্যবহার করিত, তবে তাহাদের জীবনে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটিত কিনা সন্দেহ। পুষ্টিকর ফল, তরিতরকারী উৎপাদন ও হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালন দ্বারা তাহারা এই পতিত জমিটুকুর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের খাদ্যের দিক দিয়াই যে অনেকটা অভাব মিটিতে পারে তাহাই নয়,—শারীরিক পুষ্টির দিক হইতেও তাহাদিগের কাজ করিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যাইতে পারে। একটু চেষ্টা ও আগ্রহ থাকিলে আমাদের গ্রাম্য জীবনে সহজ জীবন-যাত্রার অনেক জিনিষই অল্পায়াসে মিলিতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র অনভ্যাস ও শিক্ষার অভাবেই বাঁচিবার এই সহজ উপায়গুলি আমাদের কৃষক-সম্প্রদায় ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে। কৃষকের দারিদ্র্য ও ক্রমবর্দ্ধমান দুঃখের যে অংশের সমাধান গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে তাহার প্রতিকার এক কথা, আর, যে গুলির প্রতিকার আপনাদের নিজেদের আয়ত্তে আছে তাহার কথা স্বতন্ত্র। যেগুলি আপনারা করিতে পারেন অথচ করেন না, তাহার দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না। আপনারা জানেন, গত পঞ্চাশ বৎসরে বাংলার লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গেলেও জমির পরিমাণ বাড়ে নাই। অথচ অনেকে নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়িয়া কৃষক হইয়াছে। নূতন রোজগারের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় নাই। যেগুলি আপনাদের হাতে ছিল তাহাও ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। আজ মাটি কাটিবার জন্য বা কাঠ কাটিবার জন্য পশ্চিমা নেপালী ও সাঁওতালী কুলী না হইলে বাংলার চলে না। আগামী দশ বৎসরের মধ্যে বাংলার গভর্ণমেণ্ট প্রায় ৪।৫ কোটি টাকা রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, সেচ ব্যবস্থা, পুল তৈয়ার, গৃহাদি নির্ম্মাণ ইত্যাদিতে ব্যয় করিবেন। ইহার মধ্যে শ্রমিকদের মজুরী বাবৎ যে মোটা টাকা ব্যয়িত হইবে তাহা আমাদের কৃষিমজুর শ্রেণীর লোক উপার্জ্জন করিয়া লইতে পারে; কিন্তু তাহারা উদ্‌যোগী না হইলে এই টাকায় অধিকাংশই হয়ত ভিন্ন প্রদেশবাসিগণ অর্জ্জন করিয়া লইবে; এমন কি বাংলার উপযুক্ত লোকের অভাবে বড় বড় কণ্ট্রাক্টের কাজও হয়ত ভিন্ন প্রদেশবাসীকে দিতে হইতে পারে—ইহা কম আক্ষেপের কথা নয়। বস্তুতঃ পুল নির্ম্মাণের কণ্ট্রাক্ট বর্ত্তমানে উপযুক্ত বাঙ্গালীর অভাবে হয় ইংরেজ নতুবা বোম্বাই প্রদেশের ঠিকাদারকেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্যে কেবল মজুর শ্রেণীই নয়, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-শ্রেণীর লোকেরাও উপকৃত হইতে পারে। এবিষয়ে বাংলার অধিবাসিগণ যদি সচেতন না হন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা বঞ্চিতই থাকিয়া যাইবেন।

কৃষকের শ্রম-বিমুখতা

তারপর অনেক উদ্ভট ও অর্থহীন সামাজিক মর্য্যাদা বোধ হইতে বাংলার কৃষক-সম্প্রদায় যে সব বৃত্তি গ্রহণ করে না তাহা অন্যপ্রদেশের লোকে করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। হিন্দুস্থানী বেহারা, ধোপা, নাপিত, দারোয়ান, পেয়াদা, কনেষ্টবল, কুলী, পান বিড়ি-ওয়ালা,

ও মিঠাই-ওয়ালায় বাংলাদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার কারণ, আমাদের ভ্রান্ত সামাজিক মর্য্যাদা বোধ ও শ্রমবিমুখতা। বাংলাদেশে আজ কনেষ্টবলের কাজ করিয়া বহু পশ্চিমা অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। আমাদের কৃষক অনাহারে মরে তবুও এই সব কাজ গ্রহণ করিয়া সদুপায়ে উপার্জ্জনের পথ গ্রহণ করে না। বাঙ্গালার পুষ্করিণী ও বিল শুকাইতেছে, মাছ কমিতেছে।

বাংলা গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিব অনারেবল—
শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার

আজ গ্রামের পুষ্করিণী সংস্কার করিয়া মাছের চাষ করিতে আপনাদের মতি নাই, উদ্যম নাই; কৃষিকার্য্যের অবসরে অন্য কোন কাজ করিয়া দু'পয়সা রোজগারে আপনাদের প্রবৃত্তি হয় না। সদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ যে-কোন পরিশ্রমকে গৌরবমণ্ডিত করে। কোন কাজই নিজ অবলম্বনের জন্য হেয় নহে, নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশের জন্য এই শ্রমগৌরবের উপলব্ধি ও অনুসরণ বিষয়ে আপনারা সচেতন হউন।

উপসংহার

জগতে যেখানেই মানুষ আছে, সমাজ-ব্যবস্থা আছে, সেখানেই পার্থক্য আছে, শ্রেণী বিভাগ আছে। বড় কাজ—বৃহৎ অনুষ্ঠানের জন্য চাই বহু কর্ম্মী, নানা প্রকৃতি ও গুণের

মানুষ, তবেই সে বৃহৎ আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। কাজের সুবিধার জন্য আমরা শ্রেণী বিভাগ করি, জীবনের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে কাজে লাগাইয়া লই। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রেণী-বিভাগ মানেই শ্রেণী-বিরোধ নয়। ভাগ করি, কাজের সুবিধার জন্য,—দলাদলির জন্য, কলহ ও বিরোধের জন্য নয়। বাঙ্গালা দেশের অপেক্ষা এত বেশী দলাদলি আর কোথায়ও নাই, এত পরশ্রী-কাতরতা, তুচ্ছ বিষয় লইয়া এত ব্যক্তিগত মনোমালিন্য ভারতের কোন প্রদেশে নাই,—বাঙ্গালা দেশে যেমন আছে। সেই ভেদক্লিষ্ট বাঙ্গালা দেশে যদি পাশ্চাত্যের শ্রেণীবিদ্বেষমূলক আদর্শ আমদানী করি, তাহা হইলে এ দেশ গৃহ-বিবাদ, আত্মকলহ ও শ্রেণী-বিদ্বেষের ও হিংসার অনলে ছারখার হইয়া যাইবে। সে দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে মানুষের রক্তে কুলাইবে না, যেমন আজ স্পেন দেশে হইতেছে। আপনারা প্রজা, প্রজার দুঃখদুর্দ্দশা দূর করাই আপনাদের উদ্দেশ্য; কিন্তু কাজের সূচনাতেই এখনই ভেদ ও হিংসা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, দুইটি প্রজাপার্টির সৃষ্টি হইয়াছে। দুই দলে ভাগ হইয়া যদি আপনারা প্রজার কল্যাণসাধন করেন, তাহা হইলে এই ভেদ কাজের ভেদ হয়; কিন্তু যদি দুই দল হ'ন কলহ করিতে, একের যজ্ঞ অন্যে পণ্ড করিতে, তাহা হইলে প্রজার কল্যাণ করিবেন কখন? আত্মকলহেই আপনাদের সমস্ত সময় ও শক্তি ব্যয় হইয়া যাইবে এবং সেই অবসরে কাজ গুছাইবে স্বার্থানুসন্ধানীরা।

আপনাদের স্বাবলম্বনের কথা বলিয়াছি। নিজের অভাব অভিযোগ নিজে বুঝিয়া নিজের প্রযত্নে মিটাইতে হইবে,—শিখিতে হইবে আত্মনির্ভরতা। সেই উদ্দেশ্যে কাজে লাগাইয়া লইতে হইবে সমাজকে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে, নেতাকে, আমলাতন্ত্রকে। কিন্তু যেখানে একতা নাই, সেখানে স্বাবলম্বন নিষ্ফল। সংহতি চাই, ঐক্য চাই, সহকর্ম্মিতা চাই, তবে সম্ভব হয় স্বাবলম্বন। আপনারা বাঙ্গালার চাষী, বাঙ্গালার প্রজা সংহত হউন, একতায় একমন, একপ্রাণ হউন, দেখিয়া আপনাদের সেবক আমরা হাতে পায়ে বল পাই, ভরসা পাই, আপনাদের সেই ঐক্যের সহায়তায় আপনাদের যথার্থ কল্যাণ করিতে পারি। বাঙ্গালার চাষী, বাঙ্গালার মজুর, বাঙ্গালার প্রজা আত্মস্বার্থে সজাগ হউক, সচেতন হউক, একমন একাত্মা হউক—তাহা হইলে আর আপনাদের কোন সমস্যার সমাধানই দুঃসাধ্য থাকিবে না।

একটা কথা মনে রাখিবেন, আমরা হিন্দু নই, মুসলমান নই, ধনী নই, নির্ধন নই, স্পৃশ্য নই, অস্পৃশ্য নই,—আমরা মানুষ এবং তারপর আমরা বাঙ্গালী। যদি মানুষের অধিকার, বাঙ্গালীর অধিকার পাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারি—তবেই আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম থাকিবে। আপনারা মনে রাখিবেন, ক্ষুধার জাতি নাই; পেটের ক্ষুধা—অন্নবস্ত্রের অভাব, জাতিবিচারের অপেক্ষা রাখে না। খাইতে না পাইলে পেট জ্বলে হিন্দু-মুসলমানের সমান, অত্যাচারী মহাজন জমিদারের তাড়নায় দুঃখ ও অপমানের ব্যথা বাজে হিন্দু-মুসলমানের সমান। রক্ত মাংসের মানুষ, এক মাটির সন্তান আমরা,—অভাব অভিযোগ আমাদের একই।

নূতন শাসন-ব্যবস্থায় স্বরাজ না থাকিতে পারে, তবু যখন সে ব্যবস্থা আসিয়াছে, তখন

তাহাকেও কাজে লাগাইতে হইবে। অসম্পূর্ণ স্বরাজকে বুদ্ধি ও গঠন-কৌশলে পরিপূর্ণ স্বরাজে পরিণত করিতে হইবে। ইহাই সুষ্ঠু রাজনীতি। শুধু ছিদ্রান্বেষণ রাজনীতিও নয়, কর্ম্মকৌশলও নয়। আজ আমরা আপনাদেরই প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হইয়া দেশসেবার ও জনসেবার চেষ্টা করিতেছি, কাল কংগ্রেস আসিয়া এই আসনে বসিলে তাহাকেও এই নূতন বিধি-ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করিয়াই কার্য্য সাধন করিতে হইবে। এই নূতন শাসনব্যবস্থার বাঁধাবাঁধির মধ্যে এই সমস্যা-সমাকীর্ণ অবস্থাকে মানিয়া লইয়াই তাঁহাদেরও কাজে নামিতে হইবে। আমাদের বা তাঁহাদের যদি কর্ম্মকুশলতা থাকে, তবে সে সঙ্কীর্ণ সীমা বৃহত্তর হইবে, সে অর্থাভাব ঘুচিবে কাজেরই বেগে,—গঠনশক্তির স্বাভাবিক গতিবেগে। এই নূতন গঠন-যজ্ঞে আমি আজ আপনাদের সহযোগিতা ও আনুকূল্য ভিক্ষা করিতেছি। তাহা যদি পাই, তবে হয়তো এই মরা গাঙেও বানের প্রবাহ দেখিতে পাইব। শুধু আমরা নয়, দেশকল্যাণের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা লইয়া যিনি এই আসনে বসিবেন, তাঁহারই হাতে সোনার বাঙ্গালায় সোনা ফলিবে। আপনাদের লাঙ্গলের ফলায় আছে দেশলক্ষ্মীর সমুজ্জ্বল আবির্ভাব, মাটি দেশ নয়, প্রকৃত দেশ আপনারাই।
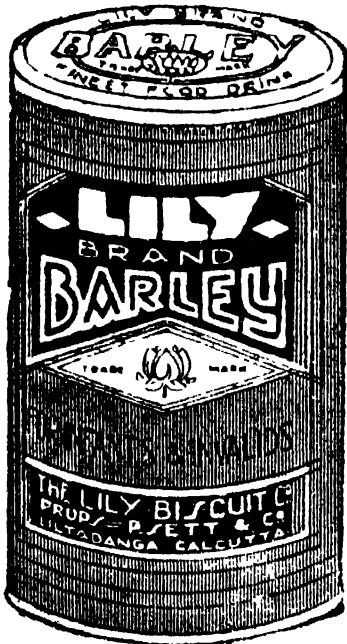
পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এর থেকে বাঁচতে গেলে দু'টী উপায় মাত্র খোলা আছে। একটি দেশের রাজা কিংবা রাষ্ট্রের হাতে, অপরটি প্রজার হাতে। দেশের গভর্ণমেণ্ট যদি এবিষয়ে উদ্যোগী হয়ে পাটের নিম্নতম দর বেঁধে দেবার জন্য সচেষ্ট হ'ন তবেই কৃষকেরা দুর্দ্দশার হাত থেকে রেহাই পায়। এর চেয়ে ভাল উপায় সমাজতন্ত্রী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অবলম্বিত হয়ে থাকে। তাঁরা উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্য নিজেরা কৃষকদের নিকট থেকে কিনে নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত দরে সেগুলো বিক্রয় করে থাকেন। সুতরাং সেখানে অসম্ভব রকম মূল্য হ্রাস জনিত কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশে যখন সেরকম কোন গভর্ণমেণ্ট নেই তখন প্রচলিত গভর্ণমেণ্টেরই আইন দ্বারা পাটের নিম্নতম মূল্য বেঁধে দেওয়া উচিত; নইলে শুধু মাত্র পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্ররোচনা চালিয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না।

ব্যবসার স্বাভাবিক গতির প্রতি সরকারী হস্তক্ষেপণ যে ব্যবসার মূল নীতির বিরোধী এবং 'লেসে ফেয়ারই' যে ব্যবসার আদর্শ হওয়া উচিত একথা আমরাও মানি, কিন্তু অনগ্রসর ও অজ্ঞ দেশের পক্ষে তারও ব্যতিক্রম আছে। ফ্রি ট্রেড্ ও প্রোটেকশনের দ্বন্দ্বে যেমন ভাবে কতক ক্ষেত্রে প্রোটেকশনকে সমর্থন করা হয় এবং সেটাই সবাই মেনে নেন, আমাদের পাট চাষের ক্ষেত্রে চাষীদের কল্যাণের জন্যই সেই রকম সরকারী হস্তক্ষেপণের প্রয়োজন, কেননা, আমাদের চাষীরা ভয়ঙ্কর অনগ্রসর এবং অজ্ঞ।

এই ত গেল রাজা অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের কাজের দিক। কিন্তু প্রজার দায়িত্বও পালন করতে হ'বে। গভর্ণমেণ্ট যদি তাদের কর্ত্তব্য পালন করতে পরাঙ্মুখ হন, তবে প্রজার চেষ্টাই একমাত্র ভরসাস্থল। প্রজার চেষ্টার মধ্যে নিজেদের সংগঠনের দিকটাই প্রধান।

নিজেদের সংগঠনের কথার উল্লেখ করতে গেলে প্রথমেই কথা ওঠে সমবায় প্রথা ও 'ভিলেজ মার্কেটিং' এর বিষয়। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে আমাদের কৃষকরা ভয়ঙ্কর দরিদ্র এবং সেইজন্যই তারা দাদন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যদি কৃষি সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন দ্বারা তাদের অর্থ সাহায্যের ও শস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে তারা বোধ হয় দুর্দ্দশার কবল থেকে রেহাই পাবে।

'ভিলেজ মার্কেটিং' এর সংগঠন যে কতখানি প্রয়োজনের তা' বোধ হয় বিশেষ করে বুঝিয়ে বলতে হ'বে না। এই মার্কেটিং এর সুব্যবস্থার অভাবেই চাষীরা মধ্যবর্ত্তী দালালদের হাতে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দালালরা হ'ল ক্রেতাদের এজেণ্ট, সুতরাং তারা ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষার্থ সচেষ্ট হ'বেই। বিক্রেতা চাষীদের তরফেও যদি

অনুরূপ কোন লোক থাকে তবে চাষীদের স্বার্থ কিছুটা রক্ষা পায়। কিন্তু চাষীরা যদি সমবায় পদ্ধতিতে কোন বিক্রয় প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সী সংগঠিত করতে পারে তবেই সেটা প্রভূত ফল-দায়ক হ'বে। ঐ বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের নিকট গ্রামের সমস্ত পাট এসে জড়ো হ'লে সেটা যদি একযোগে বিক্রীত হয় তবে দরের দিক দিয়ে সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু এতেও যে অসুবিধা নেই একথা বলা চলে না; কারণ সব চাষীর পাট এক গ্রামের হ'লেও চাষ বাস এবং সারের তারতম্যানুসারে ফসলও ভালমন্দ হবে সুতরাং সবাই একরকম দর পাবে না; কেউ বেশী, কেউ কম পাবেই। তবে সমবায় সমিতির হাতে ঠগামী বা ধাপ্পাবাজীর ভয় নাই এইটাই একটা বড় কথা।

প্রজাদের দিক দিয়ে এসমস্ত কার্য্যে অগ্রণী হ'তে পারে একমাত্র প্রজা প্রতিষ্ঠান; নইলে কোন ব্যক্তি যদি সুবুদ্ধি চালিত হ'য়ে এধারে

ব্যক্তিগতভাবে কিছু করতে যান ত সমষ্টি তা হয়ত মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করবে। এ দ্বিধা-বোধের যে কোন সঙ্গত কারণ আছে তা' নয়, আমাদের অদ্ভুত মনোবৃত্তি এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসমূলক মনস্তত্ত্বই এ কার্য্যে আমাদের বাধা দেয়। প্রজাদিগের প্রতিষ্ঠান গঠনে সরকার যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। তাঁরা যদি তা না করেন ত প্রজাকর্ম্মীদের নিজেদেরই একার্য্যে মনোযোগী হ'তে হ'বে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে প্রজা-হিতের সম্পর্কে দু'চার কথা বললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। বাংলা দেশ দরিদ্র দেশ, কিন্তু তাই বলে প্রজাহিত সম্পর্কে সে যে কখনো ব্যয় কুণ্ঠা প্রকাশ করেছে এমন বদনাম তার অতি বড় শত্রুও বোধ হয় দিতে পারবে না। ভারতের যেখানেই বন্যা-মহামারী-দুর্ভিক্ষ হোক্ না কেন, বাংলা দেশ অকাতরে তাতে অর্থ সাহায্য করেছে, প্রাদেশিকতার অন্ধ গোঁড়ামি তাকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। এই উদারতার জন্য সময় সময় তাকে টিট্‌কারী সহ্য করতে হয়, তবুও তাতে সে এতটুকু চঞ্চল নয়। অপ্রিয় সত্য বলতে গেলে বলতে হয় যে, বাংলা দেশের তুলনায় অপরাপর প্রদেশ এধার দিয়ে মোটেই উদার নয়, অন্ততঃ তাদের কার্য্যাবলী ত উদারতার প্রমাণ দেয় না। কিন্তু এই প্রজাহিত সম্পর্কে বাংলা দেশ যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য করেছে, তার তুলনায় সে উপকার মোটেই পায় নি। চোখের সামনে এই সেদিন মুহূর্ত্তের মধ্যে ভোজ বাজীর মত সে পল্লী উন্নয়নের জন্য লক্ষাধিক টাকা অকুণ্ঠিত চিত্তে তুলে দিল, কিন্তু তার বরাতে তদ্দ্বারা যে কতখানি উপকার এল তা' সর্ব্বসাধারণেই বিচার করবেন। অথচ সে টাকাটা যদি কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হ'ত তাহলে কিছুই বলবার থাকত না।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, কংগ্রেসই একমাত্র সর্ব্ববাদীসম্মত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য সে যদি শুধুমাত্র ধ্বংসমূলক কার্য্য পন্থাই গ্রহণ না ক'রে কতকটা সময় ও অর্থ গঠনমূলক কার্য্যে ব্যয় করত তবে অনেক কিছু স্থায়ী উপকার করতে পারত। কৃষকদের অবস্থার উন্নতি, মার্কেটিং সমস্যার সমাধান, সমবায় আন্দোলনের প্রসারতা প্রভৃতি সম্পর্কে সেও ত আন্দোলন চালাতে পারে। গভর্ণমেণ্ট যদি তাদের আন্দোলনের সারবত্তা গ্রহণ না করে তবে প্রজাদের কাছে এ গভর্ণমেণ্ট যে অনুপযুক্ত তা' দেখিয়ে দেবার তাদেরই ত সুবিধা বেশী।

এতক্ষণ ধরে আমরা প্রজার দিকটা আলোচনা করলাম, কিন্তু রাজার তরফ থেকে কি হয়েছে সেটাও দেখা যাক। কিছুদিন হ'ল গভর্ণমেণ্ট "সেণ্ট্রাল জুট কমিটি" নামে এক কমিটি নিয়োগ করেছিলেন, উক্ত কমিটির দু' একটা মিটিং ও হয়ে গেছে। ঐ কমিটিতে গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে, ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে ও চাষীদের তরফ থেকে সর্ব্বসমেত ২৩জন সভ্য আছেন। (বলা বাহুল্য যে উক্ত সভ্যগণ কেহই স্ব স্ব সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত নন, সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত)। ভারত সরকার এই কমিটীকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা করে সাহায্য করবেন, সুতরাং কমিটিরও পাট চাষ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য হিতকরী কিছু করা উচিত।

কমিটির উদ্দেশ্যের মধ্যে ত বহুৎ কিছু রয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে অনেক কিছুর আড়ম্বর হ'লেই আশঙ্কা জাগে যে বুঝি কোনটারই কিছু হ'বে না, কেননা, আজ পর্য্যন্ত আমাদের কথার অনেক জালবোনা হয়েছে কিন্তু কাজের বেলায় 'দশ মণ তেলও পোড়ে নি, রাধা ও নাচে নি। দেখেন না, আজ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট হাজার গণ্ডা কমিটি নিযোগ করেছেন, তার জন্য কথায় কথায় বিলেত থেকে হোম্‌রা-চোম্‌রা সব 'এক্সপার্ট' আমদানী হ'য়েছে আর আমরা সে-সমস্তর মোটা ফি ও খরচা জুগিয়েছি। কিন্তু ফলে, আমাদের অবস্থার এতটুকুও উন্নতি হয়নি। যদি অপ্রাসঙ্গিক না হয় ত আজ পর্য্যন্ত উক্ত কমিটি ও কমিশন-গুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পাবে, যথা :—

(১) ফেমিন কমিশন,
(২) এগ্রিকালচারাল্ কমিশন,
(৩) ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সী এনকোয়ারী কমিশন।

ফেমিন কমিশন এ পর্য্যন্ত কি করেছেন তা' আমাদেব দেশের দুভিক্ষের বহর দেখলেই টের পাওয়া যাবে। আমাদের এখানে দুভিক্ষ জিনিসটা যেন একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠান। ফেমিন কমিশন এই দুভিক্ষের কারণ নির্দ্ধারণ করেছেন, এবং তা' দূর করবার গুটিকয়েক পন্থাও আবিষ্কার করেছেন কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। গভর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লোকমতের চাপে পড়ে অমুক অমুক জায়গায় দুভিক্ষ দেখা দিয়েছে ঘোষণা করেন, কিন্তু দুভিক্ষ প্রতিকারার্থ যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাতে দুর্ভিক্ষের স্থায়ী কোনও প্রতীকার হয় না।

এই রকমই এগ্রিকাল্‌চারাল্ কমিশন ও ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটির অবস্থা। আমাদের দেশের টাকার যে বিনিময় মূল্য ধার্য্য করা আছে, সেটা আমাদের স্বার্থের পক্ষে একান্ত ক্ষতিকর। ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় বহুবার টাকার এই বিনিময় মূল্য পরিবর্ত্তন করবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানিয়েছেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। পুরানো ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিটলভাই প্যাটেল যখন সভাপতি ছিলেন তখন কংগ্রেসীদেব চাপে পড়ে তৎকালীন অর্থসচিব এসম্পর্কে এক বিল আনয়ন করেছিলেন বটে, কিন্তু বিলাতের খাস হোয়াইট হলের নির্দ্দেশ মতে তিনি সে-বিল প্রত্যাহার করতে মনস্থ করেন। কিন্তু পরিণামদর্শী সুবিজ্ঞ সভাপতি মহাশয় সে-বিল প্রত্যাহারে অনুমতি না দেওয়ায়, (কেনন', সভার সমক্ষে একবার কোন বিল উত্থাপিত হ'লে সভার বিনানুমতিতে তা' প্রত্যাহাব করা চলে না) গভর্ণমেণ্ট সে-বিলের ধারাগুলিকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করেন যে তদ্দ্বারা কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় হয় না। এই রকম হ'ল গভর্ণমেণ্টের মনোভাব এবং এই জন্যই লোকের ধরণা যে কমিশন বা কমিটি নিয়োগে আমাদেরই শুধু অজস্র টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু কাজে কিছুই হয় না।

অথচ কমিটি বা কমিশন যদি কল্যাণকর কোন উপায় উদ্ভাবন করেন এবং গভর্ণমেণ্ট যদি সেটার কার্য্যকরী রূপ দেন ত দেশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হ'তে পারে। পাট সম্পর্কে সেণ্ট্রালজুট কমিটি অনায়াসেই কল্যাণকর

প্রস্তাব রচনা করতে পারেন, কেননা, পাট হচ্ছে বাংলার একচেটিয়া জিনিস। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন নূতন পন্থা অবলম্বন করতে গেলে আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে; কিন্তু একচেটিয়া ব্যাপারের (monopoly) ক্ষেত্রে সে-আশঙ্কা নেই। পাট বাংলার একচেটিয়া সম্পদ হওয়ার দরুণ এর দরের তারতম্য ঘটলে ব্যবসার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট যদি পাট-শিল্পের উন্নতিমূলক কোন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করেন ত সেক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে না।

সেণ্ট্রাল জুট কমিটি গঠিত হওয়ায় পাট-শিল্পের উন্নতির কিছু আশা সূচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু কমিটির কাজ তেমন অগ্রসর হচ্ছে না। যে সকল কমিটির সভা হয়ে গেছে, তাতে মামুলী গতানুগতিকতা ছাড়া নতুন কোন উন্নতিমূলক কার্য্যধারার প্রকাশ পায়নি। কমিটি পাট সম্পর্কে ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ সংগ্রহ, পাটের বাজার নির্দ্ধারণ, উন্নততর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ও গুটি কয়েক সাব কমিটি নিয়োগ করেছেন। যে সমস্ত জেলায় পাট বেশী উৎপাদিত হয়, সেই সমস্ত জেলায় কমিটির স্থায়ী কর্ম্মচারী রাখবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এসমস্তর সঙ্গে পাটের দর বৃদ্ধিকরণের ব্যবস্থাই যদি না গৃহীত হ'ল তবে চাষীদের অবস্থার উন্নতি ঘটবে কি করে?

এতক্ষণ আমরা পাট উৎপাদনকারিদের উন্নতির সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, এবার পাট ব্যবসায়ীদের অবস্থার বিষয় আলোচনা করব। "রয়েল কমিশন অব্ এগ্রিকাল্‌চার" এর সুপারিশ ক্রমেই সেণ্ট্রাল জুট কমিটি নিযুক্ত হয়েছে। উক্ত কমিটির কার্য্যক্রম সম্পর্কে কমিশন বলিয়াছেন—"To watch over the interests of all the branches of Jute trade from the field to the factory," অর্থাৎ পাটক্ষেত থেকে পাটকল পর্য্যন্ত সমস্ত যায়গায় পাট-শিল্পের সমস্ত বিভাগের স্বার্থের প্রতি নজর রাখা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কমিটি চটকলগুলির শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে কোন নজরই রাখেন না কেননা, তা' যদি রাখতেন ত আজকের ধর্ম্মঘটের এত বিরাট প্রসারতা লাভ ঘট্‌ত না। আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি যে ধর্ম্মঘটে মালিক ও শ্রমিক উভয় সম্প্রদায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মালিকদের পক্ষে খানিকটা ক্ষতি হওয়াতে তাদের কিছুই আসে যায় না, কিন্তু দরিদ্র শ্রমিকদের পক্ষে ধর্ম্মঘট একটা জীবন-মরণ সমস্যা।

ট্রেড্ ইউনিয়ন এ্যাক্টানুযায়ী ধর্ম্মঘট আইন বিরুদ্ধ নয়, আইন সঙ্গত। অথচ ধর্ম্মঘটে যে শিল্প বাণিজ্যের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয় একথা কোন গভর্ণমেণ্টই অস্বীকার করবেন না। সুতরাং এসম্পর্কে গভর্মেণ্টের কর্ত্তব্য হচ্ছে অপরাপর উন্নতিশীল দেশের মত 'ট্রেড ডিস্‌প্যুইট এ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করা, যাতে করে সরকারী হস্তক্ষেপে শ্রমিক মালিকদের বিরোধ সহজেই শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার পথে অগ্রসর করে। মালিকদের পক্ষে এই ধর্ম্মঘট ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর। একটা কথা আছে যে, ভালর শত্রু মন্দ নয়, ভালর শত্রু আরও ভাল। মালিকেরা যদি ধর্ম্মঘট বন্ধ করতে চান ত শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা দ্বারা তাদের অবস্থা ভাল করে তুলুন; তাহলে আর ধর্ম্মঘট দেখা দেবে না।

পাটশিল্পের কথা আলোচনা করতে গিয়ে পাটকল সমূহে ধর্ম্মঘট লাগবার কারণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। আমরা ধর্ম্মঘটের সঠিক কারণটা যদি ধরতে পারি ত পাটশিল্পের বহু গলদ ধরা পড়বে এবং সে-সমস্ত গলদ যদি সংশোধন করা যায় ত পাট শিল্পের পক্ষে হিত ছাড়া অহিত কিছু ঘটবে না। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়েছি যে রয়েল কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে যে, 'ফিল্ড্ থেকে ফ্যাক্টরী পর্য্যন্ত' সমস্ত বিভাগেরই স্বার্থ সংরক্ষণ করবে এবং তদনুযায়ীই সেণ্ট্রাল জুট্ কমিটি গঠিত হয়েছে। বস্তুতঃ ফ্যাক্টরীগুলি হচ্ছে পাটশিল্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গ, সুতরাং ফ্যাক্টরীর স্বার্থ বাদ দিয়ে পাটশিল্পের উন্নতির চেষ্টা করা নিরর্থক। কিছুদিন থেকে এই ফ্যাক্টরীগুলির মধ্যে রীতিমত গোলমাল চলেছে, এর যদি কোন একটা সুব্যবস্থা না হয় ত পাট-শিল্পের স্থায়ী কল্যাণের আশা করা যায় না।

চটকলগুলির অবস্থা বিপর্য্যয়ের কারণ হ'ল ইণ্ডিয়ান জুট্ মিল্‌স্ এ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত মিলগুলি এবং ওর অন্তর্ভুক্তির বাইরের মিলগুলির মধ্যে বিরোধ। ওদের ঐ ঝগড়ার ফলেই চটকলগুলির অবস্থার অধোগতি ঘটেছে। এই রকম অবস্থা বিপর্য্যয় গত কয়েক বছরের মধ্যে অপরাপর সকল শিল্প কারখানায়ই অল্প-বিস্তর ঘটেছিল বটে, কিন্তু তারা সবাই আজ সে-অবস্থা কাটিয়ে ওঠবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করছে। তবুও ভারতীয় জুটমিলগুলির নিজেদের হিতের দিকে মোটেই লক্ষ্য নেই।

মাঝে চটকলগুলি নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি দ্বারা এই বিপর্য্যয় খানিকটা কাটিয়ে উঠেছিল। ১৯২৯ সাল থেকেই চটকলগুলির রপ্তানী বাণিজ্যের অধোগতি সুরু হয় এবং ১৯৩২ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ১৬৫০ লক্ষ গজ থেকে ১০১১ লক্ষ গজে নেমে আসে। এতে করে সব কোম্পানীর মধ্যেই একটা ত্রাসের সঞ্চার হয়। এবং এইজন্যই ১৯৩২ সালে ইণ্ডিয়ান জুট মিল্‌স্ এ্যাসোসিয়েসনের অন্তর্ভুক্ত মিলগুলি ও বাইরের গুটিকয়েক মিলের সঙ্গে উৎপাদন সীমাবদ্ধ করবার এক চুক্তি হয়। এর ফলে কিছুকালের জন্য অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং চটকলগুলি বেশ লাভ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু উক্ত চুক্তির একটু ত্রুটি ছিল, প্রথমতঃ ঐ চুক্তি সমস্ত মিলগুলি স্বীকার করে নেয় নি, দ্বিতীয়তঃ ঐ চুক্তির দ্বারা নতুন পাটকল স্থাপন করবার পথও রুদ্ধ হয় নি। সুতরাং চুক্তির পর যে সমস্ত চটকল স্থাপিত হ'ল, তারা এবং চুক্তির বাইরে অপরাপর মিলসমূহ মিলে চুক্তি লঙ্ঘন করে বেশী ঘণ্টা কাজ চালাতে লাগল। যেহেতু তারা চুক্তি স্বাক্ষর করেনি, সেইহেতু তাদের আইনতঃ বলবারও কিছু নেই। এতে করে ফল এই হ'ল যে, যে-সমস্ত মিল চুক্তি-নামায় স্বাক্ষর করেছিল তারা ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে লাগল।

এই রকম ভাবে বেশীদিন চলতে পারে না। ১৯৩৫ সালে আগষ্ট মাসে গভর্ণমেণ্ট্ যখন ইণ্ডিয়ান জুট মিল এ্যাসোসিয়েসনের দাবী অগ্রাহ্য করলেন তখন অবস্থা চরমে পৌছল। ইণ্ডিয়ান্ জুট মিল্‌স্ এ্যাসোসিয়েসন্ দাবী করেছিল যে গভর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক আইন দ্বারা উক্ত

চুক্তি সকল মিলের প্রতি প্রযুক্ত হোক্। গভর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক দাবী অগ্রাহ্য হবার পর এ্যাসোসিয়েসনের সভ্য নয় এমন একটী চুক্তিকারী মিল এই মর্ম্মে নোটিশ দেয় যে, যদি সকল মিল ১৯৩৫ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে চুক্তির মধ্যে না আসে তবে উক্ত মিল আর চুক্তি মেনে চলবে না। কিন্তু সকল মিলকে উক্ত চুক্তির মধ্যে আনা সম্ভব নয়, সুতরাং ইণ্ডিয়ান জুট্ মিলস্ এ্যাসোসিয়েসন ১৯৩৬ সালের ৩১ শে মার্চ্চ থেকে চুক্তি খতম করে দিলে।

আগড়পাড়া জুট মিল যখন চুক্তি লঙ্ঘন করবার নোটিশ দেয় তখন থেকেই বাজারে হেসিয়ানের দর পড়তে আরম্ভ করে। দর এত নেমে যায় যে ১৯৩৫ সালের শেষে হেসিয়ানের মূল্য ৭।৵০ আনায় দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে চুক্তিকারী মিলসমূহ ও অপরাপর মিলসমূহের মধ্যে একটা আপোষের প্রচেষ্টা চলে, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ফলে, যে সমস্ত তাঁত সিল্ করে রাখা হয়ে ছিল, সেগুলিতে পুনরায় কাজ সুরু হয়। ১৯৩৬ সালের ৩১ শে মার্চ্চ চুক্তির শেষ

দিন; এতকাল চুক্তি অনুযায়ী কাজের মেয়াদ ছিল সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা, কিন্তু চুক্তি খতম হ'বার পর সবাই সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা করে কাজ চালাতে সুরু করে।

এর ফল হ'ল এই যে, অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য বাজারে হেসিয়ানের দর আস্তে আস্তে নামতে আরম্ভ করল। দর আরও নেমে যেত যদি না ইটালী আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ লাগত। এবং সেইজন্য বাজারের অপেক্ষাকৃত উন্নতি না ঘটত।

এইরকম বিশৃঙ্খল অবস্থা চটকলগুলির এখনো চলেছে। যখন চুক্তিদ্বারা উৎপাদন বন্ধ ছিল তখন চটকলগুলির লাভ বেশ হয়েছিল, কিন্তু এখন প্রতিযোগিতায় উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাপ্তির দরুণ দর নেমে গেছে। সেয়ারের বাজারে পাটকলগুলির সেয়ারের মূল্যও তথৈবচ। এইরকম অবস্থা যদি বেশী দিন চলে ত পাটকলগুলির ভবিষ্যৎ মোটেই সুবিধার নয়।

অপরে যে যাই বলুক না কেন, চটকলগুলির এই বিশৃঙ্খলাই ধর্ম্মঘটের আসল কারণ। চুক্তি অনুযায়ী চটকলগুলি যখন কাজের ঘণ্টা কমিয়েছিল তখন মিল কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের বেতনের টাকা পিছু ছ'পয়সা করে ছাঁটাই করেছিল। এতে করে শ্রমিকদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পেলেও তারা কার্য্যকরীভাবে কিছু করে নি। কিন্তু চুক্তি খতম হবার পর যখন কাজের ঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়ে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা হ'ল, তখন শ্রমিকেরা টাকায় ছ'পয়সা ছাঁটাই তুলে দেবার দাবী জানালে। এটা তাদের ন্যায় সঙ্গত দাবী; কিন্তু মিল কর্ত্তৃপক্ষ সে-দাবীর প্রতি কর্ণপাত না করাতে ধর্ম্মঘটের উদ্ভব হয়েছিল।

কিন্তু সে-কথা যাক। চুক্তি ভঙ্গ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করার দরুণ ইতিমধ্যেই পাট শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, তার ওপর ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হওয়ার দরুণ সে-ক্ষতির পরিমাণ বাড়ল বই কমল না। বাংলার একটি নিজস্ব একচেটিয়া শিল্প যদি এইরকম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে থাকে ত তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কিছুই হ'তে পারে না। প্রত্যেক মিল এখন স্বতন্ত্র ভাবে সামান্য লাভের ওপর নির্ভর করে চলছে বটে, কিন্তু বেশী দিন এরকম ভাবে চলবে না। তাছাড়া মিলের অবস্থা যদি মন্দ হয় ত চাষীরা তাদের উৎপাদিত পাটের উচিত মূল্য পাবে না। সেক্ষেত্রে দেশের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। এছাড়াও আরও বিপদ আছে। আমাদের একচেটিয়াত্ব ভাঙ্‌বার জন্য বিশ্বের অপরাপর দেশ ইতিমধ্যেই কৃত্রিম পাট উৎপাদনে মনোনিবেশ করেছে। তাদের সে-প্রচেষ্টা যদি সফল হয় ত আমাদের পাটশিল্প একেবারে কানা হয়ে যাবে। সুতরাং পাট শিল্পের বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থা অবিলম্বে দূরীভূত হওয়া দরকার। সেণ্ট্রাল জুট কমিটির এবিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া কর্ত্তব্য।

কোথায় কিরূপে বিজ্ঞাপন দিতে হয়

এইবারে আমরা বিজ্ঞাপনে চিত্রের কথা বলিব। গত বারের প্রবন্ধে চিত্রে বিজ্ঞাপনের কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে দেখাইয়াছি, চিত্রই হইবে প্রধান,—কথা থাকিবে খুব অল্প; এবং কথা যতই অল্প হইবে, ততই বিজ্ঞাপনের জোর হইবে বেশী। তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্তও দেওয়া হইয়াছে। ইহাও বলিয়াছি যে, আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই তেমন জোরাল রকমের "চিত্রে বিজ্ঞাপন" দিতে পারেন না। যাহা যউক, আমরা আশা করি, এ অভাবটা ক্রমেই ঘুচিয়া যাইবে,—ব্যবসায় বুদ্ধি ও আর্টিষ্টের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

বিজ্ঞাপনে চিত্র-পদ্ধতিতে চিত্রটা অপ্রধান থাকে; কথাই প্রধান স্থান অধিকার করে। প্রচুর কথাতে চিত্রের ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে খবরের কাগজে সাধারণ চল্‌তি বিজ্ঞাপন এই রকমই বেশী। ইহাতে প্রধানতঃ তিন প্রকার চিত্র থাকে,—প্রথমতঃ যে জিনিসের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহার ছবি। ইহাকে বলা যায় বস্তুগত চিত্র; দ্বিতীয়তঃ যে জিনিসের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সেই সম্বন্ধে কোন একটা ভাব লইয়া ছবি আঁকা হয়;—তাহাকে বলা যায়, ভাব-গত চিত্র। তৃতীয়তঃ আর এক প্রকার চিত্র আছে, তাহাতে কোন বস্তু অথবা ভাব কিছুই বুঝায় না,—বিজ্ঞাপনটীর কোন কথা ছবির মত করিয়া সাজান হয় অথবা বিজ্ঞাপন দাতা কোম্পানীর কোন বিশেষ চিহ্নের চিত্র (ট্রেড্-মার্ক অথবা অন্য কিছু) দেওয়া হয়। এই প্রকার চিত্রের দুইটী উদ্দেশ্য থাকে,—চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য্য ও কোম্পানীর পরিচয়। সুতরাং ইহাকে বলা যায় শোভা-চিহ্ন-গত চিত্র। কখনও কখনও এই সকল বিভিন্ন প্রকার চিত্রকে নানাভাবে মিশাইয়া নূতন নূতন চিত্র করা যায়,—তাহাতে মিশ্র-চিত্র নাম দিয়া বিজ্ঞাপনে চিত্রের চারিটী প্রকার-ভেদ করা যায়।

এখানে আমরা এই চারি প্রকার চিত্রের বিস্তৃত সমালোচনা করিতেছি। তাহাতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের আষাঢ় মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করিব;—যাহাতে পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধা হয়। **প্রথমতঃ বস্তু-গত চিত্র।**

বিজ্ঞাপনে এই প্রকার চিত্রে কল্পনা মূলক আর্টের প্রয়োজন নাই; কিন্তু যে জিনিসটীর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহার ছবিটী খুব পরিষ্কার, সুন্দর এবং ব্যাখ্যাসম্বলিত হওয়া চাই; ছবি পরিষ্কার ও সুন্দর হওয়া নির্ভর

করে, ব্লক, ছাপা, কালী ও কাগজের উপর। দৈনিক সংবাদ পত্র সমূহের কাগজ এবিষয়ে সন্তোষজনক নহে। মাসিক পত্রেও অনেকে বিজ্ঞাপনের জন্য পাত্‌লা, রঙিন ও নিকৃষ্ট রকমের কাগজ ব্যবহার করেন,—তাহাতে ব্লক ভাল ছাপা হয় না। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" বিজ্ঞাপনের জন্য পৃথক কাগজ ব্যবহার করা হয় না। পঠিতব্য প্রবন্ধাদি যে কাগজে ছাপা হয়, বিজ্ঞাপনও সেই কাগজে ছাপা হইয়া থাকে— ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতির বিজ্ঞাপনে ছবিটী এরূপ হওয়া দরকার যেন তাহার বিভিন্ন অংশ স্পষ্টরূপে দেখা যায় এবং তাহার কার্য্য প্রণালী বুঝিতে কোন কষ্ট না হয় বা গোলযোগ না বাধে। প্রয়োজন হইলে পারিপ্রেক্ষিক চিত্রের (Perspective drawing) সহিত মেক্যানিক্যাল ড্রয়িং (Plan, Elevation and Section) দেওয়া উচিত।

এই বিষয়ে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা বিশেষ সুদক্ষ। ছোট বড় যে কোন জায়গায় তাহাদের বিজ্ঞাপন দেখিবেন অতি চমৎকার। তাহারা আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও, তাহাদের নিকট আমাদের এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার কৌশলটী শিখিবার আছে। দু'একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। টেলিফোন গাইডের অনেকগুলি পৃষ্ঠার নীচে দেড় ইঞ্চি মাত্র প্রশস্ত জায়গায় দেখিবেন "শেল মোটর অয়েলের" বিজ্ঞাপন। পেট্রোল তৈলের কোন ছবি আঁকা যায় না। কিন্তু মোটর গাড়ী, মোটরবাইক, এরোপ্লেন,

মোটর লঞ্চ্ প্রভৃতির ছোট ছোট ছবি এমন সুন্দর ভাবে আঁকিয়া ঐ "শেল পেট্রোলের" বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে যে তাহা কোন অংশে বড় বিজ্ঞাপনের চেয়ে কম জোরাল নহে। ঐ টেলিফোন গাইডের মধ্যেই মেট্রো সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখিবেন ;—সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের নক্সাটী আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে,—একেবারে আসন গুলির নম্বর শুদ্ধ। বিজ্ঞাপন দাতা কোম্পানীর উদ্দেশ্য এই, যাঁহারা টেলিফোন করিয়া সিট্ রিজার্ভ করিতে চান, তাঁরা যেন প্ল্যান দেখিয়া তাঁহাদের পছন্দমত সিটের নম্বর বলিয়া দিতে পারেন। বিজ্ঞাপন দেওয়ার স্থানের সহিত বিজ্ঞাপনের কি সুন্দর সামঞ্জস্য !

আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য কাগজে (আষাঢ় মাসের) গুলি সুতার কল, বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ্, যশোহর কোম্ব্ য়্যাণ্ড্ সেলুলয়েড ওয়ার্কস্, লিমাই ব্রাদার্সের মায়ার্স্ ইরিগেশন হ্যাণ্ড্ পাম্পস্, বম্বে মেসিনারী য়্যাণ্ড মেটালমার্ট এইসব বিজ্ঞাপন বস্তুগত চিত্রের দৃষ্টান্ত। অনেকে এই সকল বিজ্ঞাপনে এমন ছবি দেন, যাহা "দিন-গত-পাপ-ক্ষয়ের মত"—নেহাৎ একটা ছবি না দিলে নয়,—এই রকমের। ঐ সকল ছবিতে কোন কাজ হয় না এবং সে-সব না দেওয়াই ভাল। যে সকল জিনিসের বিশেষত্ব ছবিতে দেখান যায় না, সেই সকল জিনিসের বিজ্ঞাপনে কিঞ্চিৎ ভাবগত চিত্রের সাহায্য লইতে হয়। যেমন ধরুন, কোন ব্যবসায়ী বিস্‌রা চুণের বিজ্ঞাপন কিম্বা স্বস্তিকা মার্কা সিমেণ্টের বিজ্ঞাপন দিতে চান,—তিনি চুণ অথবা সিমেণ্টের ছবি আঁকিয়া তাহা দেখাইতে পারিবেন না। তাঁহাকে এমন একটা ছবি তৈয়ারী করাইতে হইবে, যাহাতে আঁকা থাকিবে,—রাজমিস্ত্রীরা একটা বাড়ী তৈয়ারী করিতেছে ;—বিস্‌রা চুণ বোঝাই লরীখানা আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে,—কুলীরা গাড়ী খালাস করিতেছে,—অদূরে বাড়ীর মালিক ও ইঞ্জিনীয়ার কথা বলিতেছেন,—ছবির নীচে সেই কথাটীর সারমর্ম্ম লেখা থাকিবে—"গাঁথুনির কাজে বিস্‌রা লাইমই ব্যবহার করিবেন"।

রাবারের জুতা অথবা ওয়াটার প্রুফের বিজ্ঞাপনে কেবলমাত্র জুতা এবং ওয়াটার প্রুফ জামার ছবি দিলেই হয় না,—উহা যে রাবারের তৈয়ারী তাহা বুঝান দরকার। সেইজন্য এমন ছবি আঁকিতে হয়, যাহাতে একজন লোক ওয়াটার প্রুফ গায়ে দিয়া বৃষ্টির মধ্যে চলিয়া যাইতেছে, এইরূপ দেখায় ;—নীচে লেখা থাকিবে, "ওয়াটার প্রুফ গায়ে থাকিলে ভাবনা কি ?" ঔষধ, প্রসাধন সামগ্রী, বিস্কুট, বার্লি, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি জিনিষের বিজ্ঞাপন ঠিক এই রকমের,—একেবারে খাঁটি বস্তুগত চিত্রের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না ;—কিয়ৎ পরিমাণে ভাবগত চিত্র ইহার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়।

অনেক ব্যবসায়ীর পক্ষে বস্তুগত চিত্রের সাহায্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, তাঁহাদের ব্যবসায়ের সহিত সাক্ষাৎভাবে কোন বস্তুর সম্পর্ক নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন, ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, ওরিয়েণ্ট্যাল গাস্ কোম্পানী, ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স কোম্পানী, কণ্ট্রাক্টর ও অর্ডার সাপ্লাইয়ার ইত্যাদি। এই সকল ব্যবসায়ের সঙ্গে পরোক্ষ ভাবে যাহার সম্বন্ধ আছে, সেই জিনিষের ছবি আঁকিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে ভাবগত চিত্রেরও মিশ্রন থাকে।

আষাঢ় মাসের (১৩৪৪) ব্যবসা ও বাণিজ্যে দেখিবেন, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন মোটর ও মিটারের ছবির দ্বারা যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; এবং ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী মাতা ও পুত্রের চিত্র দ্বারা যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাহা এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপন। আলোক প্রজ্জ্বালন ও রন্ধনাদি কার্য্য সম্পর্কিত নানা জিনিষের ছবি দ্বারা গ্যাস্ কোম্পানীও বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। যাঁহারা বিল্ডিং কণ্ট্রাক্টর, তাঁহারা যে সকল ভাল ভাল সুন্দর বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন, তাহার ছবি দিয়া বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। যাঁহারা টিউব ওয়েল খননের কণ্ট্রাক্টর তাঁহারা টিউব ওয়েলের সাজ সরঞ্জাম, পাম্প্ প্রভৃতির চিত্র দ্বারা অথবা টিউব ওয়েল খনন করা হইতেছে এই রকমের ছবির সাহায্যে খুব জোরাল বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। যাঁহারা সাধারণ অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যবসায় করেন, তাঁহারাও প্রধান প্রধান কতগুলি জিনিষের ছবি, অথবা জিনিষ পত্র প্যাকিং হইতেছে, লরী কিম্বা গাড়ী বোঝাই হইতেছে এই রকমের ছবি আঁকাইয়া বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশীয় এই প্রকার ব্যবসায়িগণ বিজ্ঞাপন খুব কমই দিয়া থাকেন,—যাঁরা দেন, তাঁরা চিত্রের ধার ধারেন না। তাহার কারণ, চিত্রে একটু বেশী জায়গা নেয় এবং চিত্র পরিবর্ত্তন করিতে খরচ আছে,—কিন্তু শুধু কথার বিজ্ঞাপনে, কথাগুলি বদ্‌লাইতে কোন খরচ নাই। বিজ্ঞাপনের মূল্য কেবলমাত্র জায়গা হিসাবেই নির্দ্ধারিত হয়,—নির্দ্দিষ্ট জায়গার ভিতরে সপ্তাহে সপ্তাহে অথবা মাসে মাসে কথা বদ্‌লাইবার স্বাধীনতা বিজ্ঞাপনদাতার থাকে। সুতরাং খরচের দিক দিয়া বিশেষ সুবিধা হয় বলিয়া সকলে কথার বিজ্ঞাপনই পছন্দ করেন বেশী। ছবি দিতে হইলে একখানি মাত্র ব্লক, সারা বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত ছাপিতে ছাপিতে উহা একেবারে অ-কেজো হয়ে না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত আর বদলান হয় না। ব্লকের ছবিতে বিজ্ঞাপন ছাপিতে কোন কোন সংবাদ পত্রের মালিক বেশী টাকা চার্জ্জ করেন,—কারণ, তাঁহারা বলেন যে, ব্লক ছাপিতে কালী খরচা হয় বেশী এবং কম্পোজিংয়ের মজুরী না থাকিলেও, ব্লক ফরমায় আঁটীতে এবং চিপি খাওয়াইতে ঝঞ্ঝাট অনেক। যাহা হউক, এসম্বন্ধে বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন প্রকাশক উভয়ের মধ্যে একটা বোঝা পড়া হওয়া দরকার। কথার বিজ্ঞাপন অপেক্ষা চিত্রের বিজ্ঞাপনে যে খরচ একটু বেশী তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাহাতে যে খদ্দেরও জোগায় বেশী ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অনেক ব্যবসায়ী নানাবিধ মনোহারী জিনিষ, পোষাক পরিচ্ছদ, গৃহস্থালীর দ্রব্য আসবাব পত্র প্রভৃতির দোকানদারী করেন,—যেমন ইউরোপীয়দের মধ্যে হোয়াইট্ য়্যাওয়ে লেইড-ল, হল্ এণ্ড এণ্ডারসন আর্মি নেভীষ্টোরস্। দেশীয়দের মধ্যে বেঙ্গল ষ্টোর, শিল্প-ভাণ্ডার কমলালয় ইত্যাদি। বস্তুগত চিত্রের সাহায্যে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে এই সকল ব্যবসায়ীকে খুব বড় বড় বিজ্ঞাপন দিতে হয়। ইউরোপীয় কোম্পানী এবিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে। মাঝে মাঝে প্রায়ই শীত গ্রীষ্ম বিভিন্ন ঋতুতে, বড়দিন বা ক্লিয়ারিং সেল উপলক্ষে ঐ সকল ইউরোপীয়

কোম্পানীর বড় বড় বিজ্ঞাপন ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে অনেকেই দেখিয়াছেন। আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীরা এখনও এরূপ বৃহৎ বিজ্ঞাপন দিতে সাহস করিয়া অগ্রসর হন নাই। দেশীয় দৈনিক সংবাদপত্র সমূহ অনেক বিষয়ে ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজের অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহাদেব তদ্রূপ সৌভাগ্য ঘটে নাই। কথাটাকে অন্য ভাবেও বলা যায়;— আমাদের দেশীয় বড় বড় দোকানদার ব্যবসায়ীরা অনেক বিষয়ে ইউরোপীয় দোকানের অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মত চিত্রের সাহায্যে বড রকমের বিজ্ঞাপন দেওয়া এখনও ধরেন নাই।

আগামী প্রবন্ধে আমবা অন্যবিধ চিত্রের বিষয় আলোচনা করিব।
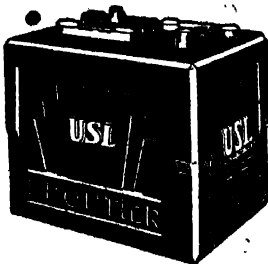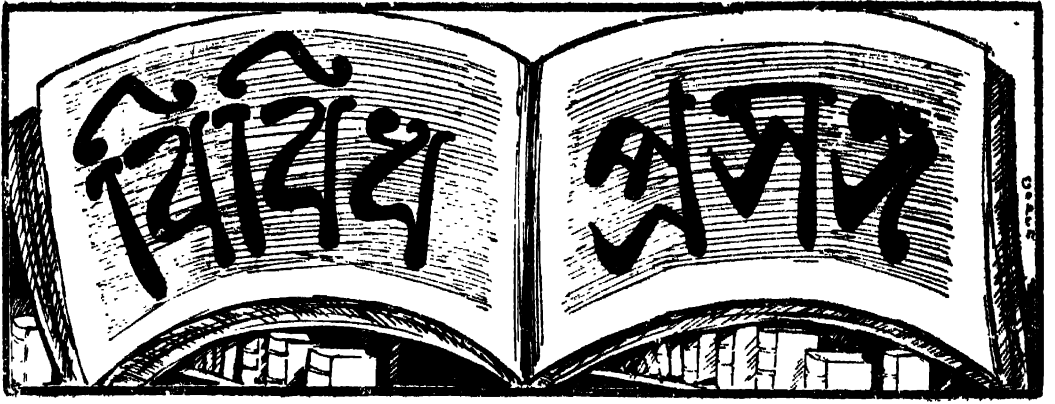
আচার্য্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অবসর গ্রহণ

১৯৩৭ সালের জুন মাসে আচার্য্য রায়ের বিশ্ববিদ্যালয় কার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করবার কথা। ইতিমধ্যে স্যার্ তারকনাথ পালিত ট্রাষ্টের গভর্ণিং বডি আচার্য্য রায়ের প্রতি তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন এবং সিনেটের কাছে প্রস্তাব করেছেন যে, তাঁর অবসর গ্রহণের পর থেকে তাঁকে যেন রসায়ণ শাস্ত্রের Emeritus অধ্যাপক হিসাবে গণ্য করা হয়। সিনেট উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।

স্যার পি, সি, রায়
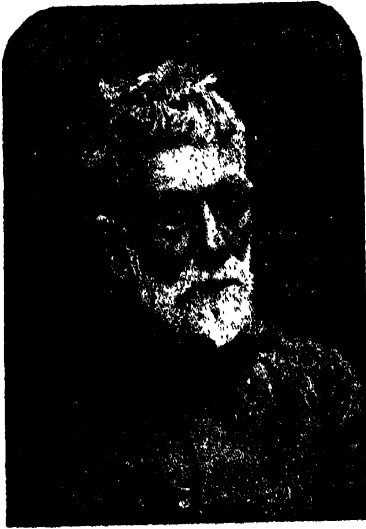
১৯২২ সালে তাঁর ষাট বছর বয়স পূর্ণ হ'লে আচার্য্যদেব অবসর গ্রহণ করবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন; কিন্তু সিনেট রসায়ণ শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে তাঁকে আরও পাঁচ বছর কার্য্যভার গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানান। আচার্য্যরায় পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং এই নির্দ্দেশ দেন যে এখন থেকে তাঁর বেতনের টাকা রসায়নের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হ'বে। সেই থেকেই তাঁর বেতন জমে জমে একটি তহবিলের সৃষ্টি হয়েছে এবং তার থেকেই আচার্য্য রায় ফেলোসিপ এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছে।

আচার্য্য রায়ের মত কৃতী লোক দুর্লভ, বিজ্ঞান চর্চ্চার উন্নতিকল্পে তাঁর প্রচেষ্টার কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। তিনি কার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করলেও আরও কিছুদিন বেঁচে থেকে উত্তর পুরুষদের সুপথে চালিত করুন এই আমাদের কামনা।

সাম্রাজ্যিক ট্রাষ্ট গঠন

বিলাতের সংবাদে প্রকাশ যে কোন অজ্ঞাতনামা ইংরাজ ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্‌ডুইনের হস্তে আড়াই লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করেছেন। উক্ত দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুক্ত রাজ্য ও উপনিবেশগুলির মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধির কার্য্যে সাহায্য করা এবং উক্ত টাকা বল্‌ডুইনের হাতে দেওয়ার মানে হচ্ছে রাজার রাজ্যত্যাগের সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে বল্‌ডুইনের সাহস ও বিচক্ষণতার তারিফ করা।

মিঃ বল্‌ডুইন উক্ত টাকা এক ট্রাষ্টের হাতে সমর্পন করেছেন। উক্ত ট্রাষ্ট ঐ টাকা সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলির মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধির কার্য্যে ব্যয় করবে। দাতার ইচ্ছানুযায়ী ট্রাষ্টের নিয়মাবলী এমনভাবে রচিত হয়েছে যাতে ভারতবর্ষ উক্ত সাহায্য থেকে বঞ্চিত না হয়।

রাজার রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া আক্‌ছার ঘটে না। ইংলণ্ডে যখন এই সমস্যা উপস্থিত হইল তখন বল্‌ডুইন যে সাহস, দৃঢ়তা এবং নীতিনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে জগত ইংরাজ জাতির এই শিক্ষা ও চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বল্‌ডুইনের এই কীর্ত্তি জাতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য এই যে একজন অজ্ঞাত নামা ইংরাজ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা দিয়া একটা ট্রাষ্ট গড়িয়া দিলেন, ইহাও ইংরাজ চরিত্রের এক বিশিষ্ট অবদান। ধন্য সেই জাতি যে জাতির মধ্যে এমন সব দাতা আছেন যাঁহারা প্রকৃত গুণীর মর্য্যাদা দিতে জানেন এবং দেশবাসীদিগকে এইরূপ চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাইবার জন্য উৎসাহিত করেন।

সব শিক্ষিতেরই সমান দশা

বেকার সমস্যার এই নিদারুণ প্রাবল্যের যুগে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, শিক্ষিত যুবকেরা কঠোর পরিশ্রমের কোন কাজ করতে পারেনা বলেই বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এত বেশী। কথাটা শুনে মনে হয় যেন, যে বাংলা দেশে অধিকাংশ শিক্ষিতই বাবু। বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বাবু কি'না জানি না, কিন্তু অন্যান্য সকল প্রদেশের শিক্ষিত যুবকই বাংলাদেশের যুবকদেরই সমান ; সুতরাং শুধুমাত্র বাঙ্গালীকে গালাগালি করলে আর কি লাভ হবে ! অন্যান্য প্রদেশের ছেলেরা ঠিক বর্ত্তমান বাঙ্গালীরই অনুরূপ। বিহারে বেকার সমস্যা সম্পর্কে বিবৃতি দিতে গিয়ে বিহার সরকারের পাব্‌লিসিটি অফিসার বলেছেন—The educated men of Behar hesitate in taking up a professiou which involves manual labour of any kind. They would not join factories or workshops where they have got to put their hand to the machines. এখানেই ত যত গণ্ডগোল। দোষ বাঙ্গালীর নয়, দোষ বিহারীর নয়, দোষ বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির।

বিহারে বেকার অবস্থার দরুণ আত্মহত্যা

বিহারে বেকার অবস্থা জনিত আত্মহত্যার ব্যাপার নিয়ে বেশ বাদ প্রতিবাদ চলেছে। বিহার বেকার সঙ্ঘের সম্পাদক কলিকাতার কোন সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিকে বলেছিলেন যে বেকার অবস্থার দরুণ বিহারে ১৪৩৬ জন লোক আত্মহত্যা করেছে। বিহার গভর্ণমেণ্টের পাবলিসিটী অফিসার এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বললেন—This statement of the Secretary, Bihar Unemployment Association is wholly incorrect and is liable to create feelings of depression in the minds of unemployed youngmen.

বিহার গভর্ণমেণ্টের মোদ্দা কথা হচ্ছে যে, কে বললে বিহারে বেকাররা আত্মহত্যা করে? ওসব বাজে কথা মাত্র; একজন বেকার বছরের মধ্যে আত্মহত্যা করেছে। ভাল কথা, আমরাও তাই মনে করি এবং বলি যে বিহারে বেকার একটিও আত্মহত্যা করে না, যারা করে তার সব ব্যবসায়ী।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও বেকারদিগের একটা Unemployment Register এবং Unemployment Bureau থাকার বিশেষ প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্টের এত বিভাগ আছে, কিন্তু বেকার সমস্যা সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল Facts, Figures, Data ইত্যাদি জানা অত্যাবশ্যক তাহা জানিবার জন্য কিম্বা তাহার তথ্য সংগ্রহের জন্য কোনও বিভাগ নাই; আমরা শ্রমিক মন্ত্রী অনারেবল মিঃ সহীদ সরওয়ার্দ্দির এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চায়ের উপর রপ্তানী শুল্ক

নিউ দিল্লীস্থ "গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া গেজেটের" এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ যে, ভারত হ'তে রপ্তানীকৃত প্রতি ১০০ পাউণ্ড চায়ের ওপর পাঁচ সিকা করে বাণিজ্য-শুল্ক ধার্য্য হ'বে।

কোম্পানীর কাগজ ও ব্যাঙ্কের সুদ।

বড়লাট বলিয়াছেন ইংরাজী ১৯২৯ সালের শেষ দিক্ হইতে জিনিষপত্রের দাম যে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল তাহা এইবার বন্ধ হইয়াছে, এখন বরং উহা বাড়িবার আশা হইয়াছে; শস্যের মূল্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ছিল তাহা কমিয়া আসিতেছে, ১৮৯৬ সালের পর প্রথম সরকারী ঋণের সুদের হার শতকরা ৩৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে; ব্যাঙ্কের সুদের হার ১৯৩১ সালের শেষে শতকরা ৮৲ টাকায় পৌঁছে, এখন ৩৲ টাকায় আসিয়াছে। বড়লাট বলেন, এগুলি অধিক উন্নতির সূচনা করিতেছে। আমাদের মনে হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। করভারে শিল্পবাণিজ্য নিষ্পিষ্ট হইতেছে; প্রাইভেট কাজ কারবারে লাভ দেখাইতে পারিতেছে না বলিয়া অন্য কোথাও টাকা খাটাইতে সাহস না করিয়া সরকারের কাছে বা বড় বড় ব্যাঙ্কের কাছে যত কম সুদেই হউক টাকা ফেলিয়া দিতেছে। ইহা দেশের যে কি ভীষণ অবস্থার পরিচায়ক তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

রেল ও মোটরবাসের প্রতিযোগীতা

যুক্ত-বাণিজ্য-সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে বড়লাট অনেকগুলি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। যানবাহনের কথায় বলেন, তাঁহার শাসন-সভার সদস্যগণ ও প্রাদেশিক মন্ত্রীরা একমত হইয়াছেন এবং রাস্তা ও রেলপথ নির্ম্মাণ, মোটরযান নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে এক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। রাস্তা তৈয়ারীর ব্যাপারে অপ্রচুর ধনভাণ্ডার যাহাতে সুবিবেচনা করিয়া ব্যয়িত হয় তজ্জন্য 'ভারতীয় পথ কংগ্রেস' নামে প্রতিষ্ঠান সাহায্য করিতেছেন। যান বাহনের বিষয়ে প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে মোটর যানের

উপর যে গুরু করভার ফেলা হইয়াছে তাহা কমাইয়া দেওয়া। সমগ্র ভারতে মোটর যানে বাইশ কোটি টাকার ভারতীয় মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বহু টাকা এই ব্যবসায়ে খাটিতেছে। পেট্রল-কর ও নানাবিধ করের চাপে এই ব্যবসায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। যদি পেট্রল কর কমে তাহা হইলে অনেক লোক দুপয়সার মুখ দেখিতে পায়। যদি রেলপথকে মোটরের প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচানই সরকারের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে নূতন মোটরবাস বা লরীর আমদানী বন্ধ করা বা নিয়ন্ত্রণ করা বরং ভাল, কিন্তু যাহারা এই ব্যবসায়ে টাকা লাগাইয়া ফেলিয়াছে তাহাদিগকে ধ্বংস হইতে দেওয়া উচিত নহে। এখন বাসের ও লরীর মালিকরা লোকসান খাইতেছেন ও ড্রাইভার কণ্ডাক্টরদের বেতন যৎসামান্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদন চলে না। বেঙ্গল নাগপুর, বি-বি এণ্ড সি-আই, বর্ম্মা রেলওয়ে, রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেল পথে এবং সাউথ ইণ্ডিয়ান রেল লাইনে মাল পার্শেল, ও যাত্রী বহন ব্যাপারে মোটরের সঙ্গে রেল কোম্পানীর প্রতিযোগিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে মোটের উপর শেষকালে জনসাধারণেরই সুবিধা। গবর্ণমেণ্টের উচিত, এই প্রতিযোগিতা যাহাতে সহযোগিতায় পরিণত হয় তাহারই চেষ্টা করা। যানবাহনের ক্ষেত্রে মোটর বাসের আমদানী হওয়াতে লোকের অনেক বিষয়ে সুবিধা হইয়াছে; এই মোটর বাস সার্ব্বিস যাহাতে সুপরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় সেই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। বহুকাল গত হইল, গবর্ণমেণ্টেরই চেষ্টায় রোড্-বোর্ড গঠিত হইয়াছে, কিন্তু দেশে রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যের কোন উন্নতিই হয় নাই। শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের বিস্তারে ইহাতে প্রবল বাধা জন্মিয়াছে। রাস্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মোটর বাস সার্ব্বিসেরও প্রসার হইবে এবং এই মোটর সার্ব্বিস তখন অন্য দিকে বৃহৎ বৃহৎ রেল লাইনে যাত্রী সরবরাহের পরিপোষকতা করিবে। এইরূপ প্রতিযোগিতাই শেষে পরস্পরের উন্নতি বিধায়ক সহযোগিতায় পরিণত হয়।

কয়লা খনির-দুর্ঘটনা

সম্প্রতি যে ভীষণ খনি-দুর্ঘটনা ঘটে গেল সে বিষয় সকলেই নিশ্চয় অবগত আছেন। মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে এই রকম মর্ম্মান্তিক ব্যাপারের যাতে না পুনরাভিনয় ঘটে সে দিকে প্রত্যেকের দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐ রকম দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে ; সুতরাং স্বভাবতঃই এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, খনির কার্য্য পরিচালনার মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গলদ আছে। পইদি খনি-দুর্ঘটনা সম্পর্কে ভারতীয় খনি শ্রমিক-সমিতি ও টাটা খনি-শ্রমিক-সমিতির ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস, বি, সেন যে বিবৃতি দিয়েছেন তা' প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন, "খনি-শ্রমিকদের অবস্থা প্রকৃতই বিপজ্জনক। জনসাধারণ কেবলমাত্র তাদের দাবীর প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানান, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে চিরাচরিত ঔদাসীন্য ত্যাগ করে কেন এইরকম দুর্ঘটনা ঘটে সে সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হ'তে তাঁহাদের কৈফিয়ৎ তলব করা কর্ত্তব্য। অবস্থা দেখে মনে হয় যে, খনির কার্য্য পরিচালনার মধ্যে নিশ্চয় কোথাও মারাত্মক গলদ আছে। এই সমস্ত দুর্ঘটনাকে যদি মানুষের আয়ত্তের বাইরে নিছক দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয় ত, জনসাধারণের সুবুদ্ধিকে অপমান করা হবে। জনসাধারণ ও সরকার খনি-বিভাগকে যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়াছেন এবং ফলে, খনিসংক্রান্ত আইনেরও কড়াকড়ি হয়েছে। কিন্তু তাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি যে, পইদিতে নিযুক্ত ২০৮ জন স্ত্রী শ্রমিকের মধ্যে ৬৩ জন চাপা পড়ল। বাগদীঘি, জোক্তিয়াবাদ (গিরিডি) ও লয়াবাদের খনিসমূহে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, সে সমস্ত স্থানে হাজরী বই ভাল ভাবে রাখা হয় না। এই সমস্ত খনি দুর্ঘটনা থেকে মনে হয় যে,খনিকর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনের প্রতি কোনদরদ

দেখান না। ভালগোরার দুর্ঘটনা তারই আর একটা প্রমাণ।

"এই সমস্ত দুর্ঘটনায় আর একটি নিরাশা ব্যঞ্জক ব্যাপার হচ্ছে যে, দুর্ঘটনার সময় খনি গহ্বরের ভেতর অবস্থিত জীবিত ব্যক্তিদিগকে কিংবা নিহত ব্যক্তির মৃতদেহগুলিকে উদ্ধার করবার কোন সন্তোষজনক প্রচেষ্টা করা হয় না। বিধ্বস্ত অঞ্চলের খানিকটা স্থান সাফ করে কতকগুলি মৃতদেহ উদ্ধার করলেই ত আর সবটা করা হল না। সভ্য জগতের কোথাও স্বতঃ নিশ্বাস প্রশ্বাসবাহী মুখোস (Self contained breathing apparatus) ছাড়া উদ্ধারের কাজে লাগা যায় না। পথাবাদের দুর্ঘটনার পরে যে কোন দায়িত্বসম্পন্ন খনি কর্তৃপক্ষেরই উক্ত মুখোস-যন্ত্র (Gas mask) রাখা উচিত ছিল। কিন্তু পইদি দুর্ঘটনার সময় জীবিতদের উদ্ধারকল্পে ঐ রকম একটিও যন্ত্র কি পাওয়া গেছল? না।

এই দুর্ঘটনা নিবারণের কার্য্যকরী উপায় হচ্ছে যে, খনিবিভাগকর্ত্তৃক প্রত্যেক খনি পরীক্ষিত হয়ে 'কাজ চালানোর উপযোগী' এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট পেলে পর তবে খনিতে কাজ আরম্ভ হওয়ার ব্যবস্থা করা। খনিবিভাগ কর্ত্তৃক উক্ত মর্ম্মে খনিসমূহ পরীক্ষিত হবার সময় শ্রমিক-সমিতিগুলির প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা অবশ্য প্রয়োজন। যেখানে জাতীয় সম্পত্তি ও মানুষের জীবন নিয়ে খেলা সেখানে খনিমালিকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার অজুহাত দিলে কিছুতেই চলবে না।"

কয়লা অনুসন্ধান কমিটীর রিপোর্ট

কিছুদিন হ'ল উপরোক্ত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টে কয়লা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন উত্তেজনা কিম্বা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নি। তার কারণ ওতে কার্য্যকরী কিছু সন্নিবেশিত নেই। কমিটী নিয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দু'টী:—

(১) প্রায়ই যে সমস্ত ভয়ঙ্কর খনি দুর্ঘটনা ঘটছে তা নিবারণ করা।

(২) যে কয়লা অপচয়ে নষ্ট হয়ে আমাদের জাতীয় সম্পদকে হ্রাস করছে তার উদ্ধারের ব্যবস্থা করা।

কমিটী এই দু'টী উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী রূপ দেবার কোন চেষ্টা করেছেন বলে ত মনে হয় না। এটা সন্দেহ নেই যে, কমিটী বহু নূতন তথ্য রিপোর্টে সন্নিবেশিত করেছেন, কিন্তু সেটা হ'লেই ত কমিটী নিয়োগের সকল উদ্দেশ্য ফলবতী হ'য়ে উঠল না। নূতন তথ্যেরও যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি নূতন পন্থারও দরকার আছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কমিটী নিযুক্ত হয়েছিল, সেটাই যদি পূর্ণ না হ'ল ত কমিটী নিয়োগের কি যুক্তি যুক্ততা ছিল?

১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে যখন উক্ত কমিটী নিযুক্ত হয় তখন কয়লা খনির মালিকরা তাতে ভয়ঙ্কর আপত্তি করেছিলেন। তাঁদের আপত্তির কারণ ছিল এই যে কমিটী 'এক্সপার্ট-মূলক না হয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক ভাবে গঠিত হোক্। গভর্ণমেণ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক কমিটী গঠিত করলেন না এই যুক্তি দেখিয়ে যে তাতে কমিটীর রিপোর্ট একমতের হওয়ার সম্ভাবনা কম। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু ঐ যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, এই এক্সপার্টমূলক কমিটির রিপোর্টে মতভেদ

ঘটেছে, অথচ ১৯২০ সালে প্রতিনিধিত্বমূলক যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার রিপোর্টে তেমন মতবিরোধ ঘটেনি। তাছাড়া, কমিটির নিয়োগ ব্যাপার ও কার্য্যপরিচালনায়ও নানা রকম ত্রুটি ছিল। কমিটি পাঁচজন এক্সপার্ট ও একজন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিয়ে গঠিত, আসলে, উক্ত সরকারী কর্ম্মচারীই কমিটির কার্য্যকে ইচ্ছামত ঘুরিয়েছেন ফিরিয়েছেন। তিনিই খনিসমূহের প্রধান পরিদর্শকের সাহায্যে প্রশ্নাবলী রচনা করেছেন। ফলে হয়েছে কি না, যে পরিদর্শক মহাশয়, প্রশ্ন পত্র রচনা করতে সহায়তা করেছিলেন তিনিই নিজে আবার সেগুলির জবাব দিয়ে কমিটির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

এছাড়া কমিটি ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশ-নের প্রতিও সুবিচার করেন নি। উক্ত ফেডারেশনের সঙ্গে প্রথম থেকেই তাঁদের একটা সংঘর্ষ বাধে এবং তার ফলেই কমিটি তাঁদের রিপোর্টে ফেডারেশনের সম্বন্ধে বিরূপ কটাক্ষ করেছেন। সংঘর্ষের কারণ হচ্ছে যে, কমিটি ফেডারেশনকে সমষ্টিগতভাবে তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিতে বলেছিলেন কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলি পৃথক পৃথক ভাবে তার উত্তর দেবার জন্য দাবী করেন। এই নিয়েই উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশ একটা মনোমালিন্য ঘটে এবং এর ফলেই সমাধানমূলক কোন ব্যবস্থাই স্থিরীকৃত হ'তে পারে নি।

আমরা এবার কি সরকারকে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি? কমিটি নিয়োগ ব্যাপারটা ত কোন কাজেই এল না। কিন্তু তার জন্য যে টাকার শ্রাদ্ধ হ'ল সেটা কি বিলাতের গভর্ণমেণ্ট-এর তহবিল থেকে দেওয়া হ'ল? তা' যদি না হয়ে থাকে'ত জনসাধারণের অর্থের এরূপ ভাবে অপব্যবহার করবার তাঁদের কি অধিকার আছে? অবশ্য তাঁরা যদি নিজেদের খুসীমত যা' ইচ্ছে তাই করেন তা'হ'লে আমাদের আর কি বলবার আছে!

কয়লার ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ

যুক্ত-বাণিজ্য সমিতির অধিবেশনে মিঃ ডব্লিউ এ এইক্ম্যান কয়লার ব্যবসায় লইয়া আলোচনা করেন। তাঁহার বক্তৃতাটি সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ। তিনি প্রস্তাব করেন ভারতের বাহিরে কয়লার রপ্তানী বাড়াইবার জন্য রেলওয়ে বোর্ড যে কয়লা বাহিরে যাইবে তাহার ভাড়া কমাইয়া দেন। প্রস্তাবটি মিঃ জে এ, ম্যাকারো ও রায় বাহাদুর পি মুখার্জ্জীর সমর্থনে গৃহীত হয়। মিঃ এইকম্যান বলেন যে, যুদ্ধের আগে বৎসরে তিন লক্ষ টন কয়লা সুদূর প্রাচ্যে ও পাঁচ লক্ষ টন সিংহলে রপ্তানী হইত। যুদ্ধের সময়ে সরকার রপ্তানী নিষেধ করেন। তাহাতেই বাজারগুলি হাত ছাড়া হয়। অনেক চেষ্টার পর এখন সিংহলে কিছু কাজ হইতেছে বটে, কিন্তু সুদূর প্রাচ্যে আর প্রবেশ করিতে পারা যাইতেছে না। গত বৎসর সিংহল রেলওয়ের কণ্ট্রাক্টটি বহু বৎসর ভারতীয় কয়লার হাতে থাকিবার পর আফ্রিকার কয়লার হাতে চলিয়া গিয়াছে। হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা সরকারী সাহায্য পাইয়া কম রেলভাড়ায় চালান হইতেছে। সুতরাং ভারত সরকারও এদেশের কয়লাকে

অনুরূপ সাহায্য দান করুন। মিঃ এইকম্যানের কথাগুলি যে যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কয়লা বাঁচিলে হাজার হাজার বাঙ্গালীর ভাত কাপড়ের যোগাড় হয়।

আফ্রিকার কয়লার দর খনির মুখ পর্য্যন্ত আনিয়া দিতে ৩।৵০ টন। আমাদের কয়লার ঐ দর ২৸৵০ টন। আফ্রিকার খনির কেন্দ্র হ্যাটিংসপ্রুইট হইতে ডারবান বন্দরের দূরত্ব ২৪১ মাইল। আমাদের কেন্দ্র রাধানগর হইতে কলিকাতা বন্দরের দূরত্ব১৫৪ মাইল। ডারবান্ হইতে কলম্বো ৫,১৩৫ মাইল। কলিকাতা হইতে কলম্বো ৩,৬১৫ মাইল, কলিকাতা হইতে সিঙ্গাপুর ১,৬৫০ মাইল। আফ্রিকার কয়লা সরকারী সাহায্য না পাইলে কখনই আমাদিগকে হটাইতে পারিত না।

জীবিকা নির্ব্বাচন সমস্যা

আমাদের দেশে সাধারণতঃ পিতা মাতা ও অভিভাবকগণ তাঁহাদের সন্তানের ভবিষ্যত জীবিকা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই ভালরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখেন না। পুত্রকে যখন প্রথম বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, যখন পুত্রের শিক্ষা-কার্য্য আরম্ভ হয় তখন পিতা অনেক স্থলেই কিছু ঠিক করিতে পারেন না, ছেলে ডাক্তার হইবে, না ইঞ্জিনীয়ার হইবে, ওকালতী করিবে না চাকুরী করিবে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে নামিবে, না কৃষিকার্য্য ধরিবে। এমন কি ছেলে যখন ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠে তখনও ঠিক হয় না, সে জীবিকা উপার্জ্জনের কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে। পিতা মাতা ও অভিভাবকগণের এইরূপ অক্ষমতা এবং উদাসীনতা সন্তানদের পরবর্ত্তী জীবনে দুঃখের কারণ হয়। শিশুকাল হইতেই বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্ধারিত করা উচিত। যে স্থলে পিতা মাতা নিজে না পারেন, সেস্থলে অন্য অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তির উপর সন্তানকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার দিতে হয়। এই ভাবে ছেলেকে তৈয়ারী করিতে পারিলে তবেই সে যথার্থ মানুষ হয় এবং তবেই পিতা মাতারও কর্ত্তব্য যথার্থরূপে পালন করা হয়।

ম্যাট্রিক পড়িবার সময় কিরূপে পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি। যদি পিতামাতা তাঁহার পুত্রকে ডাক্তার (চিকিৎসা-উপজীবি) করিতে চাহেন, তবে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে, বিশেষতঃ স্বাস্থ্যবিদ্যায় তাহাকে ব্যুৎপন্ন করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে ম্যাট্রিক ক্লাসে স্বাস্থ্যবিদ্যা পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তার পর কলেজে তাহাকে আই এস্ সি পড়িতে হইবে। আই এস্ সিতে গণিত (Mathematics), ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রি তৎসঙ্গে চতুর্থ বিষয় বট্যানি (Botany) অথবা বায়োলজি (Biology) এই কম্বিনেশন (Combination) নেওয়া দরকার। তাহা হইলে আই এস্ সি পাশ করার পর, মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার খুব সুবিধা হয়। ইংরাজী ভাষাতেও ভাল-জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আই এস সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ না হইলে এবং ইংরাজী সাহিত্যে ভাল নম্বর না পাইলে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হওয়া যায় না। ভাল ইংরাজী জানা না থাকিলে ডাক্তারী পুস্তকগুলি পড়িয়া তার সম্যক্-অর্থ পরিগ্রহ করা কঠিন।

যদি ছেলেকে উকিল করিতে চান, তবে তাহাকে প্রথম হইতেই সাহিত্য ও ইতিহাস

এই দুইটী বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভের চেষ্টায় নিরত করিবেন। ইংরাজী বলা এবং লেখা দুই বিদ্যাতেই খুব তুখোড় হওয়া চাই। অনেকে মনে করেন উকিলদের গণিতের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। উকিল হইতে হইলে গণিত বিদ্যায়ও শিক্ষা লাভ করা ভাল। গণিত বাস্তবিক একটী তর্ক শাস্ত্র;—জ্যামিতি পড়িবার সময় ছাত্রগণ তাহা অনেকটা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে। উকিলদেরও মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে তর্ক বিতর্কই করিতে হয়। গণিত বিদ্যার আলোচনায় এই বিচার শক্তি তীক্ষ্ণ ও পরিপুষ্ট হয়। স্নতরাং যাঁহারা ভাল উকিল হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে, গণিত বিদ্যা শিক্ষাকরাও ভাল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার মিঃ আনন্দ মোহন বসু, ইঁহারা সকলেই গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। স্নতরাং যে সকল বালক উকিল হইবার আশা করে, তাহারা গণিতে ঐরূপ অসাধারণ প্রতিভা দেখাইতে না পারিলেও অন্ততঃ তাহাতে যেন অবহেলা না দেখায়, ইহাই আমাদের পরামর্শ। ম্যাটিক পাশ করিবার পর তাহারা যেন কলেজে যাইয়া আই এ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়। তাহাদের কম্বিনেশন হইবে, ইতিহাস, লজিক ও সিভিক্স। যদি গণিত বিদ্যায় অনুরাগ থাকে তবে ইতিহাস, গণিত ও লজিক এই কম্বিনেশনও ভাল।

যাহারা আফিসের কেরাণী অথবা বড়বাবু হইতে চায় তাহাদের আই·কম্, বি-কম্ পড়া উচিত। ইহাতে ব্যবসা বিষয়ক গণিত (Commercial Arithmetic) দরকার হয়। স্নতরাং ম্যাট্রিকে সেই দিকে একটু মনোযোগ দেওয়া উচিত। সাধারণ লাইনে বি-এ এম-এ পাশ করিয়া আজকাল আফিসে চাকুরী পাওয়া কঠিন। বিশেষ মুরুব্বির জোর না থাকিলে এবং কেহ জোরাল স্নপারিশ ও মদ্দত না করিলে তাহা হয় না।

যাহারা ইঞ্জিনীয়ার কনট্রাক্টর, অথবা কল-কারখানার ম্যানেজারের কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে প্রথম হইতেই গণিত, বিজ্ঞান ও চিত্রাঙ্কন বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। এই তিনটী বিষয়ে অবহেলা করিলে চলিবে না। ম্যাট্রিক পাশের পর তাহাদিগকে একেবারে খাঁটী আই এস্ সি অর্থাৎ ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, ও গণিত এই তিনটী কম্বিনেশন লইয়া আই এস্ সি পড়িতে হইবে। অনেকে বি এস্ সি পাশ করিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে যায়, তাহাদিগকে বি এস্ সি পরীক্ষাতেও ঐ কম্বিনেশন নিতে হইবে। ছোট-খাট ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া প্রবেশ করা যায়, কিন্তু তাহাতেও গণিত, বিজ্ঞান ও চিত্রাঙ্কনকে এড়াইবার উপায় নাই। যাহারা ম্যাট্রিক পাশের পর কলেজে পড়িয়া সর্ট-হ্যাণ্ড টাইপ রাইটিং প্রভৃতি শিখিতে চায়, তাহাদের ইংরাজীভাষায় খুব ভাল জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সম্প্রতি ম্যাট্রিক, আই এ, আই এস্ সি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। এখন কলেজে ভর্ত্তি হইবার খুব ধুম। কে কোন লাইনে যাইবে, কে কি প্রকার উপজীবিকা অবলম্বন করিবে, এখনই তাহা ঠিক করিবার সময়।

বি এ, বি এস্ সি পরীক্ষার ফলও জানা গিয়াছে। তবে যাহারা বি এ, বি এস্ সি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে, তাহাদের জীবিকার পথ অনেকটা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তথাপি এই সময়ে যদি ছাত্র ও অভিভাবকগণ একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া চিন্তিয়া না দেখেন, কি পড়া উচিত,—জীবিকার কোন পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে শেষে বড় কষ্ট পাইতে হয়। কেহ দুই বৎসর মেডিক্যাল্ কলেজে পড়িয়া শেষে কেরাণীগিরি নিলেন, কেহ একবৎসর আই এ পড়িয়া শেষে থিয়েটারের অভিনেতা হইলেন; কেহ দুইবৎসব ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়িয়া স্বাস্থ্য খাবাপের দরুণ পুরী গিয়া থাকিলেন; কেহবা আই এস্ সি পরীক্ষায় বার বার ফেল হইতে লাগিলেন, কেহ বা "কিঞ্চিৎ পড়নং, বিবাহের কারণং" এই চলিত কথার অনুসরণ পূর্ব্বক কলেজের পড়া ছাড়িয়া "শ্বশুর বাড়ীর আনন্দেতেই" ডুবিয়া রহিলেন, এই রকম নানা গোলযোগ ঘটে। তাহাতে জীবনের পূর্ণ বিকাশ ও সার্থকতা হয় না; মনুষ্যত্ব লাভের পথে বাধা জন্মে এবং অতি দুঃখে কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া ভারাক্রান্ত জীবনরথ বিপদ সঙ্কুল পথে চিরকাল হেঁচড়াইয়া টানিয়া নিতে হয়।

সেইজন্য আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব, কে কি পড়িবেন। অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যেই লেখাপড়া। সুতরাং যাহাতে ঘর সংসার পাতিয়া, দু'পয়সা রোজগার করিয়া মানুষের মত সম্মানের সহিত জীবনের কয়টা

দিন কাটাইয়া দেওয়া যায়, তাহাই সাধারণতঃ সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। উকিল, মোক্তার য়্যাটর্ণী, ব্যারিষ্টার, য়্যাডভোকেট ইহাদের আইন ব্যবসায়। ডাক্তার, কবিরাজদের চিকিৎসা উপজীবিকা। ইঞ্জিনীয়ার, কনট্রাক্টর, মিস্ত্রী ইহাদের শিল্প ব্যবসায়। ওকালতী, ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডাক্তারী এই তিনটী প্রধান অর্থকরী ব্যবসায়; তারপর গভর্ণমেণ্ট ও সওদাগরী আফিসে চাকুরী।

যাঁহারা উকিল হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা জানিয়া রাখুন, বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্র উকিলের উপার্জ্জন ভীষণ রূপে কমিয়া গিয়াছে। মফঃস্বলে মামলা মোকদ্দমা বড় একটা হয় না। ইহার কারণ সাধারণ আর্থিক দূরবস্থা। আরও মুস্কিলের কথা এই, বৃদ্ধ উকিলেরা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন না বলিয়া নূতন উকিলেরা পসার জমাইয়া বসিতে পারেননা। কারণ, বুদ্ধিমান মামলাবাজ লোকেরা বৃদ্ধ উকিলদিগকেই কাজ দেয় বেশী। বৃদ্ধ ও প্রধান উকিলেরা তাঁহাদের জুনিয়রদিগকে সব দিকেই একটু দাবাইয়া রাখেন। উকিলের ছেলেদেরই উকিল হওয়ার সুবিধা। কারণ, তাঁহাদের বাঁধা ঘর মক্কেল থাকে। প্রথম প্র্যাক্‌টিসে বসিয়াই উপবাস করিয়া দিন কাটাতে হয় না। আর যাঁহাদের কিছু মূলধন আছে, তাঁহারা যদি পাঁচ সাত বৎসর খুব ষ্টাইলের উপর প্র্যাক্‌টিস চালাইতে পারেন, তবে শেষে বেশ পসার জমিয়া উঠে। **ইংরাজী ভাষায় অবাধ লেখা ও বলার শক্তি না থাকিলে উকিল হইবার আশা করা উচিত নয়।** এম্‌,এ, বি, এল্‌ পাশ করিয়া মুন্সেফ হওয়া আজকাল খুব কঠিন ব্যাপার। খুব সুপারিশের জোর চাই—অনেক হাঁটাহাঁটি ও তদ্বির করিতে হয়। তারপর জমিদারের ম্যানেজারী প্রভৃতি চাকুরী পাওয়াও যোগাড়যন্ত্রের উপর নির্ভর করে। মোটের উপর ওকালতীর দিকে খুব কম ছাত্রই ঝোঁক দিবেন,—এই আমাদের পরামর্শ। কলিকাতায় অনেক উকিল আছেন,—কলেজে প্রফেসারীও করেন,—আবার আদালতেও যান। অনেক উকিল প্রাইভেট ছাত্রও পড়ান। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ওকালতীতে কখনও নাম করিতে পারিবেন না! প্রত্যেক ব্যবসায়েই খাঁটী থাকা চাই।

মফঃস্বলের ওকালতীতে এক নূতন মুস্কিল দেখা দিয়াছে,—সাম্প্রদায়িকতা। সে শুধু হিন্দু মুসলমানে নহে,—হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেও। এযেন "গোদের উপর বিষ ফোড়া"। নমঃশূদ্র, বারুই, নাথ-যুগী, সাহা মাহিষ্য, প্রভৃতি ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আজকাল শিক্ষিত হইয়া উকিল হইয়াছেন। তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়েব মক্কেল জুটে;—সুতরাং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য উকিলদের রোজগার কমিয়া যায়। যাঁহারা ভবিষ্যতে মফঃস্বল কোর্টে উকিল হইয়া বসিতে চান, তাঁহারা এই কথাটা মনে রাখিবেন।

ইঞ্জীনিয়ারিং লাইনে যাইতে আমরা ছাত্রগণকে বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রগণকে বিশেষ সাবধান হইতে বলি। কারণ, প্রথমতঃ এই লাইনে গভর্ণমেণ্টের চাকুরী পাওয়া অতি কঠিন ব্যাপার,—একরূপ অসম্ভব। যাঁহারা পূর্ব্বাবধি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা সরিয়া না গেলে নূতন পাশ করা যুবকদের স্থান হইবে না;—অবশ্য যাঁহারা গভর্ণমেণ্ট চাকুরীতে আছেন,

তাঁহাদিগকে ৫৫ বৎসর হইলেই অবসর গ্রহণ করিতে হইবে;—কিন্তু এরূপ কর্ম্মচারীর সংখ্যা অতি অল্প। ইঁহারা মরিয়া গেলেও সেই স্থলে ভাল ছেলে দু'চার জন চাকুরী পাইবে,—অন্য সকলের উপায় কি? তাঁহাদিগকে প্রাইভেট কলকারখানায় কাজ নিতে হইবে।

পূর্ব্বে ইউরোপীয়দের কলকারখানায় বাঙ্গালীদের চাকুরী মিলিত; কারণ, ইউরোপীয় ইঞ্জিনীয়ারদেরে খুব বেশী বেতন দিতে হইত। সে স্থলে বাঙ্গালী যুবকদেরে কম বেতনে পাওয়া যাইত। কিন্তু গত কয়েক বৎসরাবধি এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ইউরোপীয় যুবকেরা এখন খুব কম বেতনে,—এমন কি প্রথমাবস্থায় মাসিক ৫০।৬০ টাকা বেতনে ফোরম্যান,—য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট ফোরম্যান অথবা সেকেণ্ড ইঞ্জিনীয়ারের কাজ লইতেছে। তাহারা এখন অল্প খরচে বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতে শিখিয়াছে,—বিলাসিতা ছাড়িয়া মিতব্যয়ী হইয়াছে। তাহাদিগকে কম বেতনে পায় বলিয়া আর বাঙ্গালী যুবকদিগকে ইউরোপীয় কারখানায় নেয় না। তারপর, দেশীয় লোকের কলকারখানা এত প্রচুর নাই,—যাহাতে প্রতি বৎসরের পাশ করা যুবকদের মধ্যে অন্ততঃ ৮।১০ জনেরও চাকুরী হইতে পারে। জেলায় জেলায় প্রধান সহরে জলের কল, ইলেক্ট্রিক লাইট বসান হইতেছে সত্য বটে। কিন্তু সে সকল স্থলে কর্ত্তারা ২০।২৫ টাকার মিস্ত্রীর দ্বারাই কাজ চালাইয়া থাকেন। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করা যুবকদিগকে মিস্ত্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হয়।

ইঞ্জীনিয়ারিং স্কুলে ড্রাফট্স্‌ম্যান্‌সিপ্ (নক্সা আঁকা) ও সার্ভে (জরীপ কার্য্য) এই দুইটী বিষয় শিখান হয়। অনেকে এই লাইনে যাইতে পারেন। ড্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানসিপ্ জানা থাকিলে অনেক বাঙ্গালী ইঞ্জীনিয়ার ও কণ্ট্রাক্টরের কারবারে চাকুরী পাওয়া যায়। বেতনও নেহাৎ কম নহে। যাঁহারা সার্ভে বা জরিপের কার্য্য জানেন, তাঁহারা জমিদারের সরকারেও চাকুরী পাইতে পারেন। কিন্তু আজকাল জমিদারদের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, সার্ভে পাশকরা যুবকদের চাকুরী জুটাও ভবিষ্যতে কঠিন হইবে।

কাঁচড়াপাড়ার রেলওয়ে কারখানায় এপ্রেন্‌টিস্ হইয়া প্রবেশ করা বাঙ্গালী যুবকদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরীতে এপ্রেন্‌টীস্ নেওয়া কিছুকাল বন্ধ ছিল;—এখন শুনিতেছি পুনরায় এপ্রেন্‌টিস নেওয়া আরম্ভ হইয়াছে;—সেও পাবলিক সার্ব্বিস কমিশনের মারফতে। সুতরাং সেখানে প্রবেশ করাও কঠিন। আই এস্ সি পরীক্ষায় ভাল পাশ (প্রথম বিভাগে) করিলে সেখানে প্রবেশ করা যায়। কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডে যে ক্যালকাটা টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের স্কুল হইলেও বড় বড় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ক্ষমতাই সেখানে অধিক। তাহাদের কারখানাতে যে সকল যুবক মিস্ত্রীর কাজ করে, তাহাদিগকে ইঞ্জীনিয়ারিং সম্বন্ধে মূলনীতি অর্থাৎ থিওরি (Theory) শিক্ষা দেওয়াই এই বিদ্যালয়ের প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে, পূর্ব্বে মার্টিন, জেসপ্, বার্ণ, ব্রেথওয়েট্, কিলবার্ণ প্রভৃতি ইউরোপীয় কারখানায় মিস্ত্রীর কাজে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

অনেকে কলিকাতা করপোরেশনের এণ্টালীর কারখানায় ঢুকিবার আশা করেন। তাঁহারা জানিয়া রাখুন, ঐ কারখানা হইতে গত কয়েক বৎসর যাবৎ যে সকল এপ্রেনুটিস্ শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হইয়াছেন তাঁহারাই চাকুরী পাইতেছেন না। আমাদের পরিচিত বহুলোক ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ইঞ্জীনিয়ারিং সম্বন্ধে ভালরূপে অভিজ্ঞ হইয়া আসিয়াও এ দেশে বে-কার বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে আমাদের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিও অনেক আছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে।

যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের পরামর্শ এই ;—ইঞ্জীনিয়ারিং লাইন ধরিতে ছাত্রগণ বিশেষ সাবধান হইবেন। আই এস্ সি পরীক্ষায় যাঁরা খুব ভাল ফল করিয়াছেন এবং যাঁহারা শেষ পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় হইবার ভরসা রাখেন ;—সর্ব্বোপরি যাঁহাদের স্বাস্থ্য খুব ভাল, কেবল তাঁহারাই শিবপুর অথবা যাদবপুর কলেজে প্রবেশ করিবেন। আর যাঁহারা ম্যাট্রিকে গণিত ও মেক্যানিক্স্ বিষয়ে ভাল নম্বর পাইয়াছেন, কিন্তু মোটের উপর খারাপ করিয়াছেন, তাঁহারা অন্যান্য টেক্‌নিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা মনে রাখিবেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে শেষ পরীক্ষায় পাশ করিয়া বাহির হইলে, তাঁহাদিগকে মাসিক ৩০।৪০ টাকা,—এমন কি ২০।২৫ টাকা বেতনেও চাকুরী লইতে হইবে। কারণ, এই লাইনের দস্তুর এই,—এখানে কেবলমাত্র পরীক্ষার ফল দেখিয়া বেতন বেশী দেওয়া হয় না। হাতের কাজ, কার্য্যদক্ষতা, মজুর খাটাইবার ক্ষমতা, এবং ব্যবহারিক বুদ্ধি কৌশল দেখিয়া বেতন বেশী দেওয়া হয়। আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধি ও হাতের কাজ সাফাইয়ের দরুণ ১৪ টাকা বেতনের মিস্ত্রি একদিনে ৫০ টাকার গ্রেডে প্রমোশন পাইয়াছে। ৬০ টাকা বেতনের জবার (Jobber) অথবা হেড্ মিস্ত্রী তাহার বুদ্ধির গুণে একবৎসরে দুইশত টাকা বেতনের ইঞ্জীনিয়ার হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ইঞ্জীনিয়ারিং লাইনে যাইবেন, তাঁহারা এই কথাগুলি বেশ মনে রাখিবেন।

বাংলাদেশে পার্শী, ভাটিয়া, বোম্বাই মুসলমান, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশ-বাসীদের অনেক কলকারখানা আছে। সেখানে বাঙ্গালী যুবকদের চাকুরী মিলা কঠিন। নিজ নিজ মুলুকের জাতভাইদের দ্বারাই সেখানে কাজ চলে। বাঙ্গালী যুবকেরা এই কথাটীও স্মরণ রাখিবেন। দুঃখের বিষয় কতকগুলি খাঁটী বাঙ্গালীর কল কারখানাতেও ভিন্ন প্রদেশবাসী অ-বাঙ্গালীর প্রতি পক্ষপাত ও প্রীতি দেখা যায়।

চিকিৎসা উপজীবিকা আমাদের মনে হয় সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। ডাক্তারী পাশ করিয়া বাহির হইলে চাকুরীর জন্য ভাবিতে হয় না। যেখানে সেখানে প্র্যাক্‌টিশ আরম্ভ করা যায়, কারণ রোগব্যাধি সর্ব্বত্রই আছে। প্রথম প্র্যাক্‌টিসে উকিল বা ইঞ্জীনিয়ারের মত ডাক্তারের কোন অসুবিধা কিম্বা প্রাথমিক খরচা নাই। সেইজন্য আমরা এই লাইনে যাইতে বাঙ্গালী যুবকদিগকে পরামর্শ দিতেছি। বাংলাদেশে দুইটী মেডিক্যাল কলেজ, অনেক গুলি মেডিক্যাল স্কুল এবং চারিটী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ রহিয়াছে। সুতরাং অনেক যুবক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত হইতে পারেন।

যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ কলেজে যাইতে চান, তাঁহাদের সংস্কৃতভাষায় বিশেষ দখল থাকা দরকার।

গবর্ণমেণ্টের চাকুরী আজকাল কেহ আশা করিবেন না। বি সি এস্ পরীক্ষায় পাশ করিয়াও অনেকে বসিয়া আছেন, দেখা যায়। করপোরেশনের চাকুরীও সেইরকম সীমাবদ্ধ এবং একেবারে ষোলআনা ভাগ্যের (Luck) উপর নির্ভর করে; সে সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই

সর্ট্‌হ্যাণ্ড,—টাইপরাইটিং, কিম্বা আর্টস্কুল্ এইসব লাইন মন্দ নয়। আর্টস্কুলে দীর্ঘকাল পড়িতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত না যাইয়া অনেকে দুই তিন বৎসর পরেই কমার্শ্যাল্ আর্ট শিখিয়া বাহির হইয়া আসেন। তাঁহারা আজকাল বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। কারণ প্ল্যাকার্ড, পোষ্টার, বিজ্ঞাপন, পুস্তক ছাপান, নানা প্রকারের ব্লক্ তৈয়ারীর ডিজাইন প্রভৃতির কাজে বর্ত্তমান সময়ে কমার্শ্যাল্ আর্টের খুব চাহিদা হইয়াছে এবং দিনদিন এই চাহিদা খুব প্রবল হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। যে সকল যুবকের চিত্রাঙ্কণে হাত ও ঝোঁক আছে, তাহাদিগকে আমরা এই লাইনে যাইতে পরামর্শ দিতেছি।

সর্ব্বশেষে আমরা ব্যবসা বাণিজ্যের কথা বলিতেছি। যেসকল যুবক ম্যাট্রিক ফেল হইয়াছে, অথবা তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে, তাহাদিগকে অভিভাবকগণ ব্যবসা লাইনে যাইতে বলেন। এই উপদেশ মন্দ নয়। কিন্তু অল্পবয়স্ক যুবকদেরে একাকী কোন ব্যবসায়ের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে। মনোহারী দোকানই হউক, অথবা মুদীর দোকানই হউক, কিম্বা দরজীর কারবারই হউক, সকল ব্যবসায়েই খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও হিসাবের দরকার। সেইজন্য যুবকদিগকে প্রথমে কোন বড় দোকানে অথবা বৃহৎ কারবারে কিছুকাল যাবৎ এপ্রেনটিশ বা শিক্ষানবীশ রূপে রাখিতে হয়। ব্যবসায়ের নীতি ও কৌশল আয়ত্ত হইলে তৎপর তাহাকে পৃথক ও স্বাধীনভাবে কোন দোকানের ভার দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ ব্যবসায় শিক্ষা করিবার কোন বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে নাই। অভিভাবকগণ পরিচিত ব্যবসায়ী বন্ধুদের নিকট নিজ নিজ ছেলেকে রাখিতে পারেন। ব্যবসা বাণিজ্য উপজীবিকা অর্থোপার্জ্জনের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

নারিকেলের চাষ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

নারিকেলের চারা খুব ছোট অবস্থায় ফস্ফেট্ ও পটাশের সার খুব প্রচুর পরিমাণে খায়। সুতরাং নার্সারীতে অথবা বাগানে এই সারের রীতিমত ব্যবস্থা থাকা চাই। নিকটেই একটা সারের গাদা তৈয়ারী করা উচিত। ঐ গাদাতে রাবিশ, আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল সমস্ত সংগ্রহ করা হইবে। এই আবর্জ্জনার মাঝে মাঝে এক পরল মাটী ছড়াইয়া দিলে ভাল হয়। উহার সহিত খানিকটা চুন মিশাইলে উদ্ভিজ্জ পদার্থগুলির পচনক্রিয়ার সাহায্য হয় এবং কোন প্রকার অম্লরস উৎপন্ন হওয়ারও বাধা জন্মে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে যে সারের গাদা তৈয়ারী হয় তাহা পরবর্ত্তী ভাদ্র আশ্বিন মাসে ব্যবহার করা যায়। জমিতে দিবার পূর্ব্বে সারকে খুব নাড়িয়া চাড়িয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভালরূপে মিশাইয়া লইতে হয়। নাইট্রোজেন সম্পন্ন কৃত্রিম সার না দিলেও চলে। তবে বেসিক্ স্ল্যাগ (Basic Slag) ও কাইনিট্ (Kainit) ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহাতে কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই। পরন্তু কাইনিট দিলে আর একটি বিশেষ উপকার এই যে, উই পোকার (White Ant) আক্রমণ হইতে গাছ রক্ষা পায়।

বীজ নির্ব্বাচন করিয়া সেই গুলিকে কোন শুষ্ক স্থানে প্রায় ৬ মাস পর্য্যন্ত রাখিয়া দিতে হয়। স্যাঁত-সেঁতে জায়গায় রাখিলে, বীজ গুলির মধ্যে চারা গাছের জন্য যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, তাহা অতিরিক্ত সিক্ততায় নষ্ট হইয়া যায়। যে সকল ফল পাড়িবার সময় পুরাপূরি পাকা ছিলনা, সেগুলি এই ছয় মাসের মধ্যে পাকিয়া উঠিবার সুযোগ পায়। তারপর একটি অগভীর লম্বা খাতের মধ্যে ফল গুলিকে একটু ট্যারচা ভাবে শোয়ান অবস্থায় দুই ইঞ্চি তফাতে মাটীর মধ্যে অর্দ্ধেকটা পুতিয়া লাগাইতে হয়। তিন চারি মাস মধ্যেই অঙ্কুর গজাইবার কথা। যদি দেখা যায়, রীতিমত জল সেচ ও ছায়া দেওয়া সত্ত্বেও কোন কোন বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই, তবে সেগুলিকে তুলিয়া দিবে; কারণ তাহাতে গাছ জন্মাইবেনা।

যখন অঙ্কুর গুলি মাটী ভেদ করিয়া একটু খানি উপরে উঠে, তখনই উহাদের জোর খুব বেশী হয় এবং তখনই উহারা খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে। সুতরাং এই প্রথম নার্সারীর জমিতে অঙ্কুরগুলি তিন ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা হইলেই উহাদিগকে দ্বিতীয় জমিতে তুলিয়া নিয়া আর একটু ফাঁক ফাঁক করিয়া লাগাইতে হয়। এই জমিটী যত্নের সহিত খুব সাবধানে

তৈয়ারী করিতে হয়। মাটী একটু গভীর করিয়া খুঁড়িয়া তাহাতে ভালরূপে গাদার সার, বেসিক স্ল্যাগ ও কাইনিট মিশাইতে হয়। মাটী গভীর করিয়া খোঁড়া দরকার এই জন্যে, যেন চারা গাছের শিকড়গুলি সহজে নীচের দিকে যাইতে পারে। নার্সারীর এই দ্বিতীয় জমিতে চারাগুলিকে ৩ ফুট কিম্বা ৪ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। তাহা হইলে আগাছা জঙ্গল প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার সুবিধা পাওয়া যায়। নার্সারীতে চারা গাছকে মোটের উপর দুই বৎসর রাখা দরকার;—প্রথম জমিতে ৬ মাস এবং দ্বিতীয় জমিতে দেড় বৎসর। এই প্রকার নার্সারীতে চারা গাছ করিবার পদ্ধতিতে যদিও দেখা যায়, প্রথমতঃ নানা রকমের ঝঞ্ঝাট ও পরিশ্রম আছে, তথাপি ইহা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, ইহার পরিণামে যখন সুস্থ, সবল ও প্রচুর ফলদায়ক বৃক্ষ জন্মে, তখন প্রাথমিক সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রম সার্থক হয়। সেই জন্য অনেকে এই নার্সারীতে নারিকেল চারা জন্মাইবার বিশেষ পক্ষপাতী।

বর্ষাকাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই নার্সারী হইতে চারাগাছ গুলিকে তুলিয়া বাগানে লাগাইতে হয়। চারাগাছগুলিকে তুলিবার

সময় সাবধান হইবে, যেন শিকড় গুলি ছিড়িয়া বা কাটিয়া না যায়। শিকড়গুলোকে যত অক্ষত ও অটুট রাখা যায়, ততই গাছের পক্ষে ভাল। নূতন অঙ্কুরে যাহাতে আঘাত না লাগে বিশেষতঃ ফলের সহিত উহার যেখানে যোগ হইয়াছে, সেইখানে যেন কোন চোট না পায়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে।

নার্সারী হইতে চারা তুলিয়া বাগানে স্থায়ী ভাবে রোপণ করিবার সময় গাছের নানা বিপদ হইবার সম্ভাবনা। অনেক স্থলে শিকড় ছিঁড়িয়া যায়, সুতরাং চারাগাছ প্রচুর পরিমাণে রস আকর্ষণ করিতে পারে না। সেইজন্য গাছের পাতা অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ কাটিয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে পাতার মধ্য দিয়া জলীয় রস বাষ্প হইবার সম্ভাবনা আর থাকে না। সুতরাং গাছের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। আর একটি বিপদ এই,—নার্সারী হইতে চারা গাছ তুলিয়া বাগানে লাগাইবার সময় এমন অবস্থা হইতে পারে, হয়ত, ফলের মধ্যে চারার জন্য যে স্বাভাবিক খাদ্য ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকে, তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে,—এবং মাটী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া লইবার ক্ষমতাও চারা গাছের জন্মে নাই। প্রথম বীজপত্র বাহির হইবার ছয় মাস পরে এইরূপ অবস্থা সাধারণতঃ দেখা দেয় এবং তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে চারাগাছ নূতন অবস্থার সহিত নিজের শক্তির একটা সামঞ্জস্য করিয়া লয়। এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন, নার্সারীতে চারা গাছ তৈয়ারী কবিবার দরকার নাই। এক একটি স্তূপে দশটী বারটী করিয়া নারিকেল রাখিয়া দিতে হয় ;—একটুখানি গেজ বা অঙ্কুর বাহির হইলেই উহাদিগকে একেবারে বাগানে রোপণ করিতে হয়। তাঁহাদের মতে ইহাই অধিকতর সুবিধাজনক উপায়। ইহাতে শুধু যে নার্সারী তৈয়ারী করিবার খরচ বাঁচিয়া যায় তাহা নহে,—আর একটি সুবিধা আছে। খারাপ ও কম জোরাল চারা গাছ প্রথম হইতে চিনিতে পারা যায় এবং সেগুলিকে তখনই বাদ দেওয়া যায়। সিংহলে এই দুই প্রকার পদ্ধতিই পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, নার্সারী করাই অধিকতর লাভজনক এবং প্রথমে নার্সারীতে চারাগাছ তৈয়ারী করিয়া পরে বাগানে লাগাইলেই গাছ ভাল হয়। নার্সারীর গাছ হইতে ফসলও শীঘ্র পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাথমিক খরচা পোষাইয়াও লাভ খুব বেশী থাকে। বাগানে গাছ লাগাইবার সময় উহাদের মধ্যে ২৫ ফুট কিংবা ৩০ ফুট করিয়া ফাঁক রাখা উচিত। এই হিসাবে তিন বিঘা জমিতে ৪৮টী গাছ লাগান যায়।

সমুদ্র তীরবর্ত্তী বালুকাময় ভূমিতেই নারিকেল গাছ স্বভাবতঃ অধিক জন্মে। ইহার কারণ এই যে, নারিকেল গাছের শিকড় খুব লম্বা এবং মাংসল কিন্তু আঁশ বিশিষ্ট নহে। সুতরাং এমন মাটীর দরকার, যাহার মধ্যদিয়া শিকড় বহুদূব পর্য্যন্ত নীচে যাইতে পারে। সমুদ্র তীরবর্ত্তী ভূমির আর একটী সুবিধা আছে। বৈজ্ঞানিকগণ অবিষ্কার করিয়াছেন, গাছ তরল দ্রব (সলিউসান) আকারে মাটীর রস গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ রস বৃক্ষের দেহ গঠনে ব্যয়িত হয় এবং উহার জলীয় অংশ বৃক্ষের বিস্তৃত পত্রের মধ্য দিয়া ঘর্ম্মরূপে নির্গত হইয়া যায়। সুতরাং যতই গাছের প্রসারিত পত্র সমূহের মধ্যে খুব বাতাস লাগে, ততই উহার রস আকর্ষণ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

সমুদ্রের তীরে প্রচুর বাতাস অবাধ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। তাহা নারিকেল পত্রে লাগিয়া গাছের ঘর্ম্ম নিঃসরণ ও রস আকর্ষণের সুবিধা করিয়া দেয়। নারিকেলগাছ যেখানেই হউক, তাহাতে খুব বাতাস চলিতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রচুর বাতাস এবং জল এই দুইটাই নারিকেল গাছের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে বৃষ্টিপাত খুব বেশী হয়, সুতরাং জমিতে জলেরও অভাব থাকে না। যে সকল অঞ্চলে ঝটিকার প্রকোপ অধিক, সেখানে নারিকেল গাছের ক্ষতির আশঙ্কা আছে। প্রবল ঝটিকায় পাতাগুলি ছিঁড়িয়া যায়, এবং কচি ফলগুলি ঝরিয়া পড়ে। নারিকেলচাষীদের এবিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

নারিকেল গাছে কিরূপ সার কি পরিমাণে দিতে হয়, তৎসম্বন্ধে এখনও নানাবিধ গবেষণা চলিতেছে। ডাঃ ব্যাকোফেন পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, দেড়বিঘা জমিতে একহাজার নারিকেলের ফসল নিম্নলিখিত দফায় ৫৩.৪ পাউণ্ড (এক পাউণ্ড-আধসের) খাদ্যদ্রব্য আকর্ষণ করিয়া লয়,—

Nitrogen নাইট্রোজেন	৮.৬ পাউণ্ড
Phosphoric Acid ফস্‌ফরিক য়্যাসিড	২.৪ "
Potash পটাশ	১৮.৭ "
Lime চুণ	২.৩ "
Salt লবণ	২১.৪ "
মোট	৫৩.৪ পাউণ্ড

সুতরাং সার দিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, ফসলে যেটুকু টানিয়া নিয়াছে, কেবল মাত্র সেইটুকু পূরণ করিলেই চলিবেনা; গাছের পরিপুষ্টির জন্যও সারের দরকার। প্রতি তিন বিঘা জমিতে ৫০টী গাছ, এবং প্রতি গাছে ৫০টী নারিকেল ধরিলে, দেখা যায়, গাছ ও ফল উভয়ের পুষ্টির জন্য নিম্ন লিখিত পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন,—

Nitrogen নাইট্রোজেন	২৯ পাউণ্ড
Phosphoric Acid ফস্‌ফরিক য়্যাসিড্	১৫ "
Potash পটাশ	৭৪ "

উপরিউক্ত খাদ্য সরবরাহ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত প্রকারের মশলা মিশাইয়া দুই রকমের সার তৈয়ারী করিতে হয়;—

	১ নং	২ নং
Ammonium Sulphate য়্যামোনিয়া সাল্‌ফেট	১০০ পাউণ্ড	১২০ পাউণ্ড
Bone-meal হাড়ের গুঁড়া	১৫০ "	২০০ "
Super-phosphate সুপার ফস্ফেট	৫০ "	৬০ "
Kainit কাইনিট	১০০ "	১০০ "
Potash Muriate পটাশ মিউরিয়েট	৫০ "	৭০ "

চারা গাছ লাগাইবার পর প্রথম তিন চারি বৎসর যাবৎ এক নম্বরের সারটী ব্যবহার করিবে। গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে ২ নম্বরের সার ব্যবহার করা উচিত। জমিতে যদি সবুজ সার দেওয়া হইয়া থাকে, তবে উপরিউক্ত মশলাতে য়্যামোনিয়াম সালফেটের পরিমাণ অনেক কম দিলেও চলে। গাছের খাদ্যে যে নাইট্রোজেন থাকে, তাহাতে ফলের আকৃতি বড় হয়। ফস্ফেট ও পটাশের দ্বারা ফলের গুণ ও সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

জুতা ব্যবসায়ী টমাস বাটার আত্মজীবন চরিত

আমার চরিত্রের নানাদিকে সংশোধন তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। মাঝে মাঝে খেয়ালের বশে অন্যায় কাজ করিয়া ফেলি ;—তারপর অনুতাপ জন্মে, দ্বিগুণ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করি। আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা করি নাই, নিজের সামান্য দোষটুকুও আমার চক্ষু এড়াইতনা। আমাকে যাঁহারা উপদেশ দিতেন, তাঁহাদের কাহারো কথায় আমার অশ্রদ্ধা ছিলনা। ছোটই হউন, কিম্বা বড়ই হউন, সকলের কথা আমি শুনিতাম। এই কারণে ব্যবসায়ী লোক ও জনসাধারণ সকলেই আমাকে বিশ্বাস করিত এবং একদিন না একদিন আমি একেবারে শোধরাইয়া উঠিব এই ধারণা সকলেরই ছিল।

বৎসরের শেষে আমি আমার কারবারের দেনা পাওনার একটা হিসাব তৈয়ারী করিলাম। যদিও সমস্ত হিসাব আমার মুখে মুখেই জানা ছিল, খুঁটি-নাটি দেনা পাওনার পাই পয়সাটী পর্য্যন্ত আমার অঙ্গুলীর অগ্রভাগে থাকিত, তথাপি আমি মনে করিলাম একটা রীতিমত ব্যালেন্স সিট তৈযারী করা দরকার। কারণ, তাহাতে ব্যবসায়ের সমগ্র অবস্থাটা এক সঙ্গে চোখে পড়ে। সুতরাং আমি নিকটবর্ত্তী ট্রেড স্কুলের (Trade School) এপ্রেন্‌টীস্ ক্লাসের জনৈক শিক্ষকের দ্বারা আমাদের কারবারের একটা নির্ভুল ও নিখুঁত ব্যালেন্সসিট তৈয়ারী করাইলাম। তাহাতে দেখা গেল, সম্পত্তি ও দেনার পরিমাণ (Assets and Liabilities) প্রায় সমান হইয়া আসিয়াছে।

ব্যবসায়ী লোকেরা আমার কারবারের এই ব্যালেন্স সীট দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারা মনে করিল, এ একটা অলৌকিক ব্যাপার। কিন্তু আমি ইহাকে সেরূপ মনে করি নাই। কারণ, আমি জানি, যেমন পরিশ্রম করিয়াছি, তেমন ফল পাইয়াছি। ইহাতে আর আশ্চয্য হইবার কি আছে? যাহারা অলস প্রকৃতি, বৃথা সময় নষ্ট করে এবং পুরুষকার

অপেক্ষা দৈবের উপরই নির্ভর করে বেশী, তাহারাই আমার কারবারের এই উন্নতিকে একটা অলৌকিক ইন্দ্রজাল ভাবিয়া বিস্মিত হয়। দিন রাত খাটিয়া জুতা তৈয়ারী করিয়াছি, একমুহূর্ত্ত বিনাকাজে থাকি নাই, সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ বিসর্জ্জন দিয়াছি। এইভাবে কাজ করাতে আমি অল্প সময়ের মধ্যে খুববেশী মাল তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ঐ সকল জুতা বাজারে পড়তে না পড়তেই বিক্রী হইয়া যাইত। সুতরাং আমি নগদ টাকাতে সস্তা দরে চামড়া প্রভৃতি কাঁচা মাল কিনিতে পারিতাম। তার ফলে আমার কারখানায় জুতা তৈয়ারীর খরচাও অনেকটা কম পড়িত।

আমার আশে-পাশে অন্যান্য জুতাব্যবসায়ীরা সকলেই শিক্ষিত ও লেখা-পড়া জানা লোক ছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতায় আমার সহিত তাহারা পারিয়া উঠিত না। কারণ, সকল বিষয়ে আমি তাহাদের অগ্রণী ছিলাম। আমি নিজে হাতে-কলমে সমস্ত কাজ জানিতাম, কোন কাজের জন্যই আমাকে পরের উপর নির্ভর করিতে হইতনা। আমি নিজে কাঁচামাল (চামড়া প্রভৃতি) কিনিতাম। নিজের হাতে চামড়া ছাঁট-কাট করিয়া মিস্ত্রীদের মধ্যে বিলি করিয়া দিতাম। জুতা তৈয়ারী হইয়া গেলে প্রত্যেক জোড়া জুতা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম। আমি নিজে মিস্ত্রীদের বেতন দিতাম এবং সমস্ত হিসাব পত্র নিজে রাখিতাম এত কাজ করিয়াও আমার কোন দিকে সময়ের অভাব হইত না, এবং তাড়া হুড়ো করিয়া কোন কাজ আধা-খেচড়া রকমেরও হইতনা। ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আমি একদিকে যেমন কাজের কৌশল জানিতাম, অন্যদিকে তেমনি একটী মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করিতাম না।

এইরূপে কাজ করিতে করিতে আমার কার্য্যক্ষমতা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, আমি একাকী চামড়া কাট-ছাঁট করিয়া একশত মিস্ত্রীকে এক সপ্তাহের অগ্রিম কাজ দিতে পারিতাম, এবং তাহাদের হাতে কি পরিমাণ ও কি রকমের মাল তৈয়ারী হইয়া উত্‌রাইবে তাহাও বলিয়া দিতে পারিতাম। প্রত্যেক মিস্ত্রীর নামে পৃথক পৃথক খাতায় তাহাদের কাজের হিসাব নিকাশ করিয়া রাখিতাম। তারপর তৈয়ারী মাল বিক্রী, তাহাও আমি নিজে করিতাম। মাল বিক্রীতে আমার বিশেষ দক্ষতা ছিল, পিতার কারখানায় ছেলেবেলা হইতে আমি তাহা শিখিয়াছিলাম। তখনও আমার কারবারে দেনা পাওনার সামঞ্জস্য হয় নাই। দেনার পরিমাণ কিছু বেশী ছিল। সুতরাং য়্যাসেট্‌স্ বা সম্পত্তি বলিতে যাহা বুঝায় বাস্তবিক তাহা আমার কিছুই ছিলনা। তথাপি আমি আমার পরিশ্রম, সাধুসঙ্কল্প ও অধ্যাবসায়কে সম্পত্তি মনে করিতাম। আমার এই আত্ম-বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে, আমি আশা করিয়াছিলাম, অল্প সময়ের মধ্যেই আমার দেনা পাওনার এই সমান্য প্রভেদ মিটিয়া যাইবে। ১৮৯৬ সালের মধ্যভাগে (আমার বয়স তখন ২০ বৎসর) আমার কারবারের এই অবস্থা প্রায় শেষ হইয়া আসে। ইহার জন্যই আমি প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতেছিলাম। ভাবিলাম, বুঝি বা আমার দুঃখের নিশার অবসান হয়। অরুণা-লোকের প্রত্যাশায় পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময় আর এক সর্ব্বনাশ ঘটিল।

ভিয়েনার কোন ব্যবসায়ী আমার কারখানায়

চামড়া সরবরাহ করিত। খবর পাইলাম, সেই ব্যবসায়ীর কারবার ফেল পড়িয়াছে। প্রথমতঃ আমি এই সংবাদে বিশেষ বিচলিত হই নাই। কেবল মাত্র আমার পিতার জন্য চিন্তিত হইয়াছিলাম, কারণ, তিনি প্রায়ই উক্ত কোম্পানীর দেনার জন্য দায়ী থাকিয়া সেই কোম্পানীর নামীয় (উহার পাওনাদারদের) বিলে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতেন। এইরূপে নিজেকে দায়ে আবদ্ধ করিয়া বিপন্ন করিতে তিনি কিছু মাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। আমাদের কারবারের পক্ষ হইতে আমার ভাইও মাঝে মাঝে সেই ব্যবসায়ী ফার্ম্মের বিলে এইরূপ ভাবে নাম স্বাক্ষর করিয়া তাহাদের দেনার দায় ঘাড়ে লইতেন; তবে এ যাবৎ তদ্দরুণ আমরা কোন বিপদে পড়ি নাই।

উক্ত ফার্ম্মের সহিত আমার কারবার ছিল পরিষ্কার, দেনা পাওনা কিছুই নাই। আমার ভাই একদিন আমাকে জানাইল যে সেই ফার্ম্মের মালিকেরা তাহাদের পাওনাদারদের কতগুলি বিলে তাঁহাকে পূর্ব্বের রীতি অনুযায়ী নাম স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করিতেছে। আমি আমার ভাইকে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া জানাইলাম, আমাদের নিজের কারবারের এই দুরবস্থায় অন্যের দেনার দায় খামখা ঘাড়ে লইবার দরকার নাই। সেই ঝক্কি সামলাইতে গিয়া আমাদেরই সর্ব্বনাশ হইবে। বিশেষতঃ সেই ফার্ম্মের সঙ্গে আমাদের কোন কাজ কারবারও এখন নাই। তাহাদের নিকট হইতে কোন মালপত্র আমরা এখন কিনিনা। কিন্তু আমার ভাই আমার উপদেশ শুনিলেন না। একদিন তাঁর চিঠি পাইলাম; তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে সেই ফার্ম্মের মালিকদের অনুরোধ ও কাকুতি-মিনতি এড়াইতে না পারিয়া তিনি তাহাদের পাওনাদারদের কতগুলি বিলে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং সেই দেনার দায়ে আবদ্ধ হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তাহারা বলে, পূর্ব্বে আমাদের পিতার নিকট তাহারা কত অনুগ্রহ পাইয়াছে, আমাদের নিকটেও সদয় ব্যবহার লাভ করিয়াছে। এই বিপদের সময় কি আমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব? তাহারা আরও বলে, মিঃ টমাস বাটা এই বিল্ সই করিবার বিষয় কিছুই জানিবেন না,—ইত্যাদি।"

এই পত্র পাইয়া আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। আমার চিরকালের আশা ভরসা এক মুহূর্ত্তে ধোঁয়ার মত উড়িয়া গেল। ঝড় তুফানের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া,—বিপুল তরঙ্গের আস্ফালন হইতে রক্ষা করিয়া যে তরণীকে কূলের নিকট লইয়া আসিয়াছিলাম,—আজ চক্ষুর পলকে তাহা অতল সলিলে নিমজ্জিত হইল। আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম। আমি যেন দেখিতেছি, আমাকে বাঁধিয়া নিতে পুলিশ পেয়াদা আসিয়াছে,—তাহারা ঘরে ঢুকিবার জন্য দরজায় ধাক্কা দিতেছে।

আমি অস্থির চিত্তে আমার বাইসাইকেলটী চড়িয়া ইউহারস্কে হ্রদিস্তে (Uherske Hradiste) সহরের দিকে ছুটিলাম। খানিক দূর যাইয়া লক্ষ্য করিলাম, বারাণ্ডার লোকেরা আমার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইতেছে; আমার পাগলের মত চেহারা দেখিয়া হয়ত তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে, প্রথমতঃ তাহাই মনে করিলাম। শেষে বুঝিলাম, তাহা নয়,—আমার মাথায় টুপী নাই দেখিয়াই রাস্তার লোকেরা আমার দিকে তাকাইয়া আছে। কারণ, তখন-

কার দিনে ভদ্রলোকের পক্ষে টুপী মাথায় না দেওয়াটাকে লোকে পাগলামি মনে করিত। আমি তাড়াতাড়ি টুপী মাথায় দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া টুপী মাথায় দিয়া বাহির হইলাম।

হুসদিন্তে সহরে পৌছিয়া আমি সোজাসুজি একেবারে আমাদের উকিলের বাড়ী যাইয়া উঠিলাম। তখন সূর্য্য অস্ত যায় যায়। উকিলের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সন্ধ্যা হইল। দু'জনে এত তন্ময় চিত্তে আইনের কূট তর্ক আলোচনা করিতেছিলাম যে, সন্ধ্যা বেলার আলো জ্বালা এবং খাওয়া দাওয়া সবই ভুলিয়া গেলাম।

বিল বাবদে দেনা পরিশোধ করিবার উপযুক্ত আমার কারবারের কোন সম্পত্তি নাই, সুতরাং ঐ কারবারের পক্ষীয় কোন ব্যক্তির স্বাক্ষর বাতিল হইবার যোগ্য ;—এইরূপ যুক্তি যে ব্যক্তি প্রকৃত দেনাদার, তাহার সম্বন্ধে খাটিতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বয়ং দায়িত্ব লইয়া বিল স্বাক্ষর পূর্ব্বক দেনাদারের স্থলভুক্ত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযুজ্য হয় না। পাওনাদারদের টাকা আমাদিগকে দিতেই হইবে। তবে আমাদের যাহা ক্ষতি হয়, তাহা আমরা সেই ফেল পড়া ফার্ম্মের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব আদায় করিতে পারি। অবশ্য আইনে এরূপ একটি ধারা আছে যে, কন্‌স্ক্রিপট সৈনিক (Conscript Soldier) অর্থাৎ যাহাকে সৈনিক হইতে বাধ্য করা হইয়াছে—সে যদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকবার সময় কোন বিল স্বাক্ষর করে, তবে তাহা বাতিল হইবে। কিন্তু এস্থলে তার পাল্টা জবাবও আছে যে, আমাদের কারবার রেজেষ্টারী হইবার সময়েও আমার ভাই কন্‌স্ক্রিপট সৈনিক ছিল।

সেই রাত্রিতেই আমি ট্রেনে ভিয়েনা রওনা হইলাম। আমার আহার নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। দেউলিয়া ফার্ম্মের পাওনাদারদের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি সকল বিষয় খুলিয়া বলিলাম। আমার সরল চিত্ত ভাইকে স্তোক বাক্যে হাত করিয়া সেই দেউলিয়া ফার্ম্মের মালিকেরা কিরূপে স্বার্থ সাধন করিয়াছে,—তাহা যে প্রতারণারই নামান্তর,—এসব কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম। আমার ভাই যে সকল বিলে সই করিয়াছিলেন, তাহার মোট দেনার পরিমাণ ছিল ২০ হাজার ফ্লোরিণ (প্রায় ২৫ হাজার টাকা ;—এক ফ্লোরিণ দুই শিলিং এর সমান)। আমি অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এত কষ্টে সামান্য যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলাম, দেখিলাম, তার সর্ব্বস্ব দিলেও এই দেনার অর্দ্ধেকও শোধ হয় না।

(ক্রমশঃ)

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভলুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। "বঙ্গবাসী" এইরূপ প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাগজে প্রকাশ করতঃ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব।

—সম্পাদক

(সেক্রেটারী বাদিয়াখালী পাব্লিক্ লাইব্রেরী কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

লাথির ঢেঁকি কিলে ও'ঠে না।

*

কানা গরুর ভিন্ বাথান

*

যাহা বায়ান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন

*

খোদার উপর খোদকারি

*

বিশ্ব কর্ম্মার ব্যাটা চিকারাম

*

চোরের উপর বাটপাড়ি

অতি দর্পে হৃতা লঙ্কা

*

পাঁকে পড়িলে ব্যাঙে'ও হাতিকে লাথি দেয়

*

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে

*

কচু কেটে হাত পাকান

*

শয়নে পদ্ম লাভ

*

বামনের চাঁদ ধরা

ঘুঘু দেখেছ—ফাঁদ দেখনি

*

না পেয়ে নাতি ভাতার

*

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল

*

শর্ষের মধ্যে ভূত

*

দৈয়ের স্বাদ ঘোলে মেটে না

*

টাকের উপর টেক্কা—

*

কিস্তি মাৎ

*

চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী

*

গোদের উপর বিষ ফোড়া—

*

বোঝার উপর শাকের আঁটী

*

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি

*

আপ ভালা তো জগৎ ভালা

*

তেলা মাথায় তেল দেওয়া

*

পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘন

*

পর্ব্বতের মূষিক প্রসব

*

যত গর্জ্জে তত বর্ষে না

*

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট

*

গরীবের ঘোড়া রোগ

*

নাপিত দেখলে নখ বাড়ে

*

বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচী

*

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ

*

বার রাজপুতের তের হাড়ি

*

আমে চাউলে চিবানো'

*

সব ভাল যার শেষ ভাল

*

মধুরেণ সমাপয়েৎ

*

পারার উপর দাঁড়ান

*

মরুভূমির নিকট জল ভিক্ষা

*

বাড়ীর গরু উঠানের ঘাস খায় না

*

গাধার চেয়ে বুড়া ঘোড়াও ভাল

*

অদৃষ্ট করলা ভাতে—

*

ঘ্যাগের উপর রসের কাঠি

*

সাপে নেউলে খেলে

*

কৈ মাছের প্রাণ,
তপ্ত তেলেও যায়না জান্

*

এক গেলাসের ইয়ার

*

চাঁদিকা জুতি

*

কেঁচো খুড়তে সাপ

*

গুণ হ'য়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়

*

রাখালি—, কত খেলাই দেখালি

*

পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনাই ভাল

*

সাধলে জামাই কাঁঠাল খান না,
শেষে জামাই ভোঁতাও পান না

*

ঘোমটার নীচে,
খেম্‌টা নাচ্

*

বিশ্বাসে মিলয়ে হরি
তর্কে বহুদূর

*

ক'নের মাসী
বরের পিসী

*

কথায় কথা বাড়ে
জলে বাড়ে ধান ;
মানের গোড়ায় ছাই দিলে
বড় হন মান

*

গু'য়ের এপিঠ ওপিঠ
দু' পিঠই সমান

*

কাঁঠালের আঠা
গোলাপের কাঁটা
নারকেলের খোলা
সবই বিধির খেলা

*

ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়
যার টাকা দিয়ে তের টাকা লয়

*

নিমতলার ঘাটও চিনি
কাশী মিত্রের ঘাটও চিনি
কিন্তু মরে যে আছি

*

কা'রো পৌষ মাস
কা'রো বা সর্ব্বনাশ

*

যাও যদি যেয়ো,—
লুটের আগে,
লড়ায়ের পাছে

*

সিন্নি দেখলে এগিয়ে এস
আর কোঁৎকা দেখলে পিছিয়ে যাও !

*

হাতির ঘাড়ে চড়ে মশা,
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা

*

পার হয়ে ভুরা'কে (২) লাথি
যারে ভুরা সিতি সিতি (৩)

*

পাঁজি পুঁথি পরকে দিয়ে
দৈবজ্ঞ বেড়ায় গালে হাত দিয়ে

*

যে করে পাপ,
সে হয় আঠার ছেলের বাপ
যে করে পুণ্যি,
তার চারিদিকে শূন্যি

*

রাজায় রাজায় ঝগড়া হয়,
নল খাগড়ার প্রাণ যায়

*

এক কাণ কাটা—
যায় গাঁয়ের বার দিয়ে
আর দু' কান কাটা যায়
গাঁয়ের মাঝ দিয়ে

*

খোদা যব দেতা হ্যায়
ছপ্পর ফোঁড়কে দেতা হ্যায়

*

বাপকা বেটা
সিপাহিকা ঘোড়া
কুছ নেহি হ্যায়
তব্ ভি থোড়া থোড়া

*

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়
আর লোম বাছতে কম্বল উজাড়

*

বীর মরে একবার
ভীতু মরে শতেকবার

*

বেশী মোল্লা যেথা
মুরগী মরে না সেথা

২। ভুরা—ভেলা। ৩। সিতি সিতি—যেদিক সেদিক,—যথা ইচ্ছা।

মহীশূর রাজ্যে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান

মহীশূর গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত তিনটী বৃহৎ শিল্পের কারখানা খুলিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন,—(১) সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী (২) কাগজের কল (৩) সিল্ক্ ওয়েইষ্ট্ অর্থাৎ রদ্দি রেশম হইতে সূতা তৈয়ারীর কারখানা। মহীশূর সুগার কোম্পানী যেমন যৌথ কারবার স্বরূপ গঠিত হইয়াছে, কাগজের কল এবং রদ্দি রেশমের কলও সেইরূপ হইবে। ২৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া কাগজের কল বসিবে,—ভদ্রাবতীতে। গবর্ণমেণ্ট কাগজের কলের সমগ্র মতলবটী বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, উহা খুব লাভজনক ব্যবসায়রূপে দাঁড়াইতে পারিবে। শুনা যায়, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কয়েকজন ধনী ব্যবসায়ী কাগজের কলের ডিরেক্টর বোর্ডে থাকিবেন। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট্ বিনামূল্যে জমি এবং প্রতি টন ১২টাকা মূল্যে বাঁশ সরবরাহ করিবেন। মহীশূর গবর্ণমেণ্টের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ভারতে দুইটী কাগজের কল গড়িয়া উঠিতেই নষ্ট হইয়াছে, একটী আমাদের বাংলার আসাম পেপার মিল্স, আর একটী পাঞ্জাবের জগ্ধারীর সেই বৃহৎ কাগজের কল, যাহা পরলোকগত স্যার উইলোবি কেরী আরম্ভ করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে কাগজের চাহিদা ও ভারতবর্ষে কাঠ, বাঁশ ও ঘাস প্রভৃতি কাগজ নির্ম্মাণের উপাদান এই দুইটাই প্রচুর, তার তুলনায় ভারতে কাগজের কল বেশী নহে! এমত অবস্থায় মহীশূর রাজ্যের কাগজের কল যদি সফলতা লাভ করিয়া দাঁড়াইতে পারে, তবে বলিতে হইবে, শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ আর এক ধাপ উপরে উঠিল।

বিহারে কুটির শিল্প সম্পর্কে সরকারী প্রচেষ্টা

সকলেই অবগত আছেন যে, বিহারে আম, লিচু প্রভৃতি ফল বেশী পরিমাণে জন্মায় কিন্তু মরসুমের সময়েই ঐ সব পাওয়া যায়, তার পরে আর পাওয়া যায় না। অথচ সব সময়েই যদি ঐ সব ফল পাওয়া যেত তাহ'লে তাহা বেশী দরে বিক্রয় হ'তে পারত এবং সারা বছর ঐ ফলের ব্যবসা বজায় থাকার দরুণ কতকগুলি লোক করে খেতে পারত।

প্রকৃতি যখন সারা বছর ধরে এই সব ফল প্রসব করে না, তখন মানুষ সারা বছর

ধরে উক্ত ফল সমূহকে 'প্রিজার্ভ' করে রাখার ব্যবস্থায় মন দিল। এইরূপে প্রিজার্ভ করা ফলসমূহ বৎসরের সকল সময়েই বিক্রীত হয় এবং এই রকম করেই সারা বছর ফলের বাজার বজায় থাকে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই বিহার সরকার উক্ত ফল প্রিজার্ভ করার ব্যবস্থাকে কুটির-শিল্প হিসাবে প্রচলন করতে মনোনিবেশ করেছেন। সেইজন্য বছর দুই ধরে শিক্ষিত বেকার বেছে নিয়ে গভর্ণমেণ্ট এদিক দিয়ে তাদের পারদর্শী করে তুলতে চেষ্টা করছেন। উক্ত ব্যবসায়ে মূলধন খুব কম লাগে (প্রায় ১৫০ টাকা), আর অতিরিক্ত ফলগুলির একটা সদ্ব্যবহার হয়। কিন্তু গত দু'বছর ধরে এসম্পর্কে সরকারী প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও এবং অনেক যুবক শিক্ষা নিলেও বিহারে এপর্য্যন্ত এ সংক্রান্ত একটীও শিল্প স্থাপিত হয় নি।

ভারতীয় শ্রমশক্তির প্রশংসা

সকলেই অবগত আছেন যে, কলিকাতা হ'তে ৩৫ মাইল দূরে গঙ্গার ধারে সাহাগঞ্জ গ্রামে ডান্‌লপ কোম্পানীর রবার ফ্যাক্টরী বছর খানেক পূর্ব্বে খোলা হয়েছিল। সেখানকার ম্যানেজার মিঃ সলোমন ভারতীয় শ্রমিকদের কাজের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারতীয় শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা ইংরাজ শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের মতই সমান বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ। মিঃ সলোমানের উক্তি উপেক্ষার নয়, কেননা, তিনি ইংলণ্ড ও সাউথ আফ্রিকায় বহুদিন ফ্যাক্টরী চালিয়ে এসেছেন। তিনি যে মন্তব্য করেছেন সেটা তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসূত।

এই সঙ্গে মিঃ সলোমনের কারখানার কর্ম্মপদ্ধতির বিষয় দু'চার কথা বললে বোধ হয় তা' অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। সাহাগঞ্জের কারখানায় শ্রমিকদের কাজ হিসাবে মজুরী দেওয়া হয়, অর্থাৎ যে যত বেশী কাজ করতে পারে সে তত বেশী মজুরী পায় এবং কাজ বেশী করলে তদনুপাতে মজুরী কিছুতেই কমানো হয় না। এই প্রথার একটা সুবিধা এই যে, সবাই চেষ্টার দ্বারা নিজের কাজের উন্নতি করে বেশী মজুরী লাভ করতে পারে। তা'ছাড়া প্রত্যেক শ্রমিকই কাজ শিক্ষা করবার জন্য সকল রকম শিক্ষা ও সুব্যবস্থার অধিকারী হ'তে পারে।

সাহাগঞ্জের ডান্‌লপের কারখানায় আর একটি বিশেষত্ব এই যে, সেখানে যতদূর সম্ভব ভারতীয় নিয়োজিত হয়। মিঃ সলোমন বলেন যে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটিকে যতদূর সম্ভব ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত করা। তদনুসারে ভারতীয় ছাত্রদের কারখানায় ব্যবহারিক শিক্ষানবীশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে যাতে নাকি তারা পরে কাজ শিখে ফ্যাক্টরী পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়। উক্ত ফ্যাক্টরীর রিসার্চ্চ ও টেষ্টিং ল্যাবরেটরীতে বহু ভারতীয় ছাত্র কি করে টায়ার ইত্যাদি তৈরী করতে হয় তা' শিক্ষা করছে। ডানলপ্ কোম্পানী বেকারদের মধ্য হ'তেই বেছে বেছে লোক নিযুক্ত করেছেন, সুতরাং তাঁদের দ্বারা যে বেকারদের খানিকটা সাহায্য হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না।

ক্যাপিট্যালিজমের যুগে ইউরোপীয় মূলধন সকল নিজেদের দেশে খাটবার পথ খুঁজে না পেয়ে কলোনী সমূহে ঠেল মেরেছে। বর্ত্তমান

ধনবাদের এ এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তদনুসারেই আমাদের দেশে ডানলপ্, বাটা ইত্যাদি কোম্পানী স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু অপরাপর ইউরোপীয় কোম্পানীর মত তাঁরা ভারতীয়দের ঘৃণা না করে তাদের যে যথাসাধ্য কাজে নিযুক্ত করেছেন সেটাই সুখের কথা। অপরাপর কোম্পানীরা এঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে লাভবান হবেন সন্দেহ নাই।

ভারত ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে বাণিজ্য

পূর্ব্বে বস্ত্র বয়ন শিল্পে চেকোস্লোভাকিয়া উন্নত ছিল, কিন্তু বিশ্বব্যাপী মন্দার বাজারে তার সে-শিল্প ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিছুকাল হ'ল চেকোস্লোভাকিয়া পুনরায় তাঁর বস্ত্রবয়ন শিল্পের উন্নতির দিকে মনোযোগ দিয়েছে। চেকোস্লোভাকিয়ার এই প্রচেষ্টা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক, কেননা, সে ভারতীয় তুলার একজন প্রধান ক্রেতা। সুতরাং সেখানকার বয়ন শিল্প যদি জোর চলে ত ভারত ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে এক বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৩৪ সালের চেয়ে ১৯৩৬ সালে চেকোস্লোভাকিয়া ভারতের নিকট হ'তে ২৫,০৯,০০০ ক্রাউন মূল্যের তুলা বেশী কিনেছে, এবং এ অঙ্ক আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই আশা হয়।

পাট বাজারের ভবিষ্যৎ

আমাদের দেশে পাট কারবারের ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ বলে আপাততঃ মনে হয়। কলিকাতা থেকে পাটের রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ক্রেতার দল মনে করে যে, বর্ত্তমানে পাটের দর অত্যন্ত চড়া। অবস্থা যাই হোক্ না কেন, পাট দ্রব্যের ব্যবহার সারা দুনিয়াময় বেড়ে যাচ্ছে, সুতরাং পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য।

পাটের তৈরী থলের প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়েছিল কাগজের থলে। কিন্তু বৃটিশ কন্টিনেন্টাল প্রেস থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "জুটের" সংবাদে প্রকাশ যে, কাগজের থলের চেয়ে পাটের থলেই লোকে বেশী পছন্দ করে। কাগজের থলের জন্মদাতা জার্ম্মানীর অভিমত হচ্ছে যে, পেপার ব্যাগের চেয়ে জুট ব্যাগই বেশী ট্যাঁকসই এবং আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধা-জনক। জার্ম্মানীর কোন কোন স্থানে পেপার ব্যাগ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়েছে। আমেরিকার বেথিস ব্রাদার্স ব্যাগ কোং নামে এক কোম্পানী তাদের তৈরী একপ্রকার পাটের থলের স্বপক্ষে অসম্ভব প্রচার কার্য্য চালাচ্ছে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে। সুতরাং জুটব্যাগের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয়।

ভারতের পক্ষে এই পাট-শিল্প সংক্রান্ত এক উদ্বেগের সংবাদ আছে। ভারতের তৈরী পাট-ব্যাগ লণ্ডনের বাজারে গিয়া ওদের দ্রব্যকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিচ্ছে দেখে ডাণ্ডি থেকে ওদের বাণিজ্য সচিবের নিকট ডেপুটেশন গিয়েছিল। ডেপুটেশনের বক্তব্য হচ্ছে যে, যেহেতু বিনাশুল্কে ভারতজাত দ্রব্য ইংলণ্ডে পৌঁছানোর দরুণ ওদের শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে সেই হেতু ভারত জাত পাটদ্রব্যের ওপর শুল্ক স্থাপন করা হোক। বাণিজ্য-সচিব এসম্পর্কে বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। যদি শুল্ক বসে ত ভারতীয় শিল্পের ক্ষতি হবে।

পাট বাংলার একটি প্রধান সম্পদ। এই পাটই কৃষকদের একদিন সম্পদ এনে দিয়েছিল, তারা যদি আবার অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে পারে ত সে সম্পদ তারা পুনরায় আয়ত্ত করতে পারে। বিশ্ববাজারের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাদের এসম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।
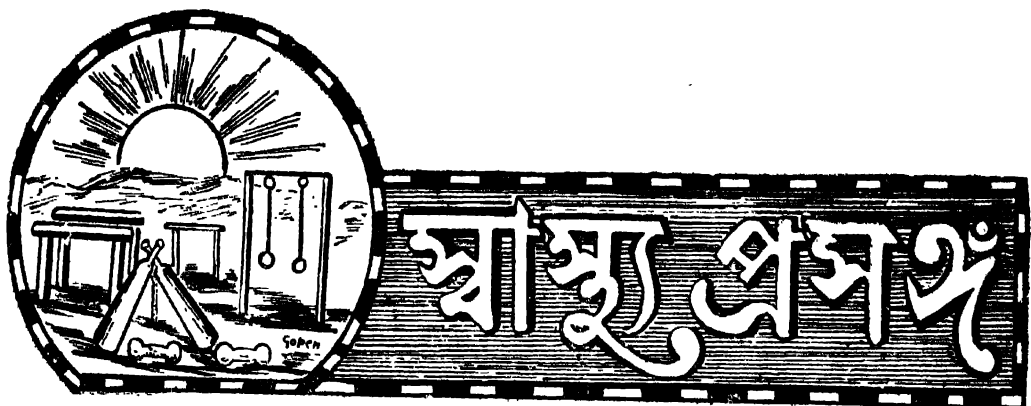
ম্যালেরিয়া বাহী মশক

ভারতবর্ষের প্রতি নগরে ও গ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বর এক প্রধান রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক স্থলে ইহা স্থায়ী হয় এবং মানুষের শিক্ষা ও কর্ম্মময় জীবন-পথের অন্তরায় হইয়া উঠে। ইহার ফলে মানুষ শক্তিহীন হইয়া ক্রমশঃ ক্ষয়রোগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, স্প্রু ইত্যাদি নানাবিধ উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়।

নিম্নলিখিত সহজ উপায়গুলি পালন করিলে নিশ্চয় এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব এবং সময় সময় কিরূপে ইহা হইতে মহামারীর সৃষ্টি হইত ইহার প্রকৃত কারণ অনেক যুগ ধরিয়া কেহই জানিত না। অনেকের মতে দুষিত বায়ু সেবন, জলা ভূমিতে বাস করা, ঠাণ্ডালাগান ইত্যাদিই ছিল প্রধান কারণ। কিন্তু প্রকৃত মূল কারণ জানিতে না পারায় আমরা ইহার বিস্তারের কোন প্রতিকার করিতে পারি নাই। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপে কত গ্রাম ও নগর যে জনমানবশূন্য হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কুইনাইন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এই রোগের চিকিৎসা একপ্রকার অসাধ্যই ছিল।

"এনোফেলিয়া" নামক এক প্রকার মশক হইতে এই রোগের বিস্তার হয়। এই মশকের কতকগুলি অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে। কোনস্থান হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে সেই বিশেষত্বগুলি ভালমতে জানা উচিত। কিউলেক্স জাতীয় মশকের ন্যায় ইহারা অপরিষ্কার জলে ডিম্ পাড়ে না, কূপ, পুষ্করিণী, চৌবাচ্চা, টিন, ভাঙ্গা বোতল ইত্যাদি যেখানেই বৃষ্টির পরিষ্কার জল জমে সেই খানেই ডিম পাড়ে।

"কিউলেক্স" এবং "এনোফেলিসের" চারি প্রকার বিভিন্ন অবস্থা

অন্যান্য কীট পতঙ্গের ন্যায় মশকেরও চারিটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে। যেমন:— (১) "এগ" বা (ডিম), (২) "লারভা" বা একপ্রকার জলচর কীট জীবনের প্রথমাবস্থা (৩) "পিউপা" বা (পতঙ্গগুটি) এবং (৪) "ইমেগো" বা (মশক অবস্থা)। ইহারা জলে

অথবা জলের নিকটবর্ত্তী স্থানে ডিম দিবার পর উহা গরম কিম্বা শীতল বাতাসে দুই একদিনেই ফুটিয়া যায়।

এই ডিম পরের অবস্থায় লারভায় পরিণত হইয়া সর্ব্বদা জলেই বাস করে। "লারভা" উহার শুঁড় এবং লোমের সাহায্যে জলের উপর সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। ইহারা কখনও জলের নীচে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে পারে না,—সুতরাং বায়ু সেবন করিবার জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা জলের উপরিভাগেই থাকিতে হয়। যাহা হউক, প্রায় এক সপ্তাহ পরে এই 'লারভা' "পিউপা" তে পরিণত হয়।

"পিউপা"ও সাধারণতঃ জলের উপরেই বাস করে এবং দুই তিন দিন পর যখন ইহার চামড়ার আবরণ ফাটিয়া যায়, তখন ইহা "ইমেগো" বা মশকে পরিণত হয়, এই মশকই "পিউপার" পরিত্যক্ত ভাসমান চামড়ার উপর ক্ষণিকের জন্য বসিয়া উড়িয়া যায়।

ইহারা শুড়ের সাহায্যে রস পান করিয়া জীবন ধারণ করে, পুরুষ মশক উদ্ভিদ্ এবং স্ত্রীমশক মানুষ, পশু, পক্ষী ও সরীসৃপ প্রভৃতির রক্ত পান করে।

মশার বিবরণী

"এনোফেলিস" মশক বসিবার সময় মাথা নীচু ও পেছনের দিকটা উঁচু করিয়া দেয়, ইহাদের ডানার চিহ্নগুলির একটা বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য কীটাদির তুলনায় "এনো-ফেলিস" মশক দেখিতে একটু অধিক পাণ্ডুবর্ণ।

এই মশক, যখন প্রথম ডিম ও লারভা অর্থাৎ ডিমের পরের অবস্থায় থাকে, তখন ইহাদের অতি সহজেই নষ্ট করিয়া ফেলা যাইতে পারে, কিন্তু একবার মশক হইয়া গেলে ইহাদের সমূলে বিনাশ করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এই মশক ম্যালেরিয়া রোগীদের কামড়াইয়া রক্তের সহিত উহাদের শরীরের বীজাণু গ্রহণ করে। তারপর এই বীজ মশকের শরীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেই মশক যদি ১২ দিনের মধ্যে কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায়, তবে ঐ সুস্থ ব্যক্তির রক্ত দূষিত এবং বিষাক্ত হইয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে এই মশকের জন্যই সুস্থ ব্যক্তিও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। মশকই সুস্থ এবং অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে দূষিত বীজ বহনের কাজ করে।

ম্যালেরিয়া প্রতিকারের উপায়

ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে তিনটি উপায় প্রধানতঃ আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে, (১) মশকের আবাস স্থলগুলি ভরাট বা পরিষ্কার করিয়া অথবা ঔষধ দিয়া শোধন করিতে হইবে। (২) ইহারা যাহাতে কামড়াইতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি ও উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। (৩) "এনোফেলিস" মশক হইতে রোগের বিস্তার করিতে না পারে।

উপরোক্ত উপায়গুলিতে কাজ করা নিতান্ত প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য। ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বাঁচিবার আর একটি উপায়, ম্যালেরিয়া প্রধান স্থান হইতে যথাসম্ভব দূরে বাস করা। ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানেও মশারী ব্যবহার করিলে, এই সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু মশারী খুব সাবধান ও সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে—যেন একটিও ছিদ্র না থাকে। যদি যষ্টিযুক্ত খাট অথবা চৌকি হয়, তাহা হইলে মশারিটি ঐ

বাহিরের দিকে না টাঙ্গাইয়া, ভিতরের দিকে টাঙ্গাইতে হইবে। মশারীর চারি দিকের কাপড় বিছানার চারিদিকে সমানভাবে খাটাইয়া লওয়া প্রয়োজন। বিছানার বাহিরে কিম্বা মাটিতে যেন মশারীর কাপড় পড়িয়া না থাকে, সে দিকেও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মশারী টাঙ্গাইবার সময়ে দেখিতে হইবে চারিদিকে উত্তমরূপে আটকাইল কিনা, কারণ ইহাতে বায়ু চলাচলের সুবিধা হয়।

ঘরের জানালায় সূক্ষ্মতারের পর্দ্দা দেওয়া সম্ভবপর হইলে, এবং দুয়ার সম্মুখদিকে খুলিবে ও আপনিই বন্ধ হইবে,—এইরূপ হইলে খুব ভাল হয়।

জল যাহাতে কোনরূপে গৃহের চারিদিকে অথবা, চৌবাচ্চা, নালা-নর্দ্দমা, বালতি, জাগ, ফুলদানী, ভাঙ্গাবোতল, বাসন, টিন, গাছের কোটর, কিম্বা যে কোন স্থানে অধিকদিন ধরিয়া পড়িয়া না থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত আবশ্যক।

যে স্থান হইতে জল ফেলিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ ফেলিয়া দিতে অসুবিধা হয়, সেখানে অল্প কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিলেই "লারভা" মরিয়া যায়, অথবা **বর্ম্মাসেল** কোম্পানীর আবিষ্কৃত "**ম্যালেরিয়া**" নামক একপ্রকার তৈল ব্যবহার করা উচিত। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করিয়া প্রত্যেক গৃহীর নিজ নিজ গৃহ এইরূপভাবে পরিষ্কার করা উচিৎ। গৃহস্বামীর প্রতি রবিবারে তাঁহাদের নিজ নিজ বাসস্থান পর্য্যবেক্ষণ করা উচিৎ।

মশা যাহাতে পানীয় জলে ডিম পাড়িতে না পারে, সেইজন্য জলপাত্রের মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া রাখা উচিৎ। **"সেলটকস"** নামক এক প্রকার তৈল ঘরে ছিটাইয়া দিলে মশা মরিয়া যাইবে।

প্রত্যেক গৃহস্বামী যদি উপরোক্ত নিয়মগুলি পালন করিয়া চলেন, তবে তাঁহাদের গৃহের কীট পতঙ্গাদি আশ্চর্য্যরূপে হ্রাস পাইবে। যাঁহাদের নিজেদের গৃহ আছে তাঁহারা এইরূপে মশা ও মশার ডিম নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারেন। আর যদি কোন বাড়ীতে বহু মিশ্রিত লোকের বাস হয়, তবে তাঁহাদের সেই বাড়ীর এবং স্বাস্থ্যোন্নতি বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মিলিত হইয়া, এইসমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। তবেই মশার উপদ্রব দূর হওয়া সম্ভব।

পল্লীগ্রামে মশা বিনাশ করা অসম্ভব এবং ব্যয় সাপেক্ষ। এই স্থলে ম্যালেরিয়া রোগীদের উত্তমরূপে চিকিৎসা করানই শ্রেয়ঃ ও বাঞ্ছনীয়। ইহাতে মানুষের শরীরের বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়, এবং "এনোফেলিস্" মশক সুস্থব্যক্তিকে কামড়াইয়াও কিছু করিতে পারে না।

কাহাকেও ম্যালেরিয়ায় আক্রমণ ক'রার সঙ্গে সঙ্গেই যদি সে ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত চিকিৎসা না হয় তবে সেই রোগ প্রায় আজীবন স্থায়ী হইয়া উঠে। এইরূপ স্থলে রোগী ৪ দিন পর্য্যন্ত ২০ গ্রেন্ কুইনাইন সেবন করিবার পর আরোগ্য লাভ করে। লৌহ ও আর্সেনিক যুক্ত টনিক পিল এবং প্রয়োজন হইলে কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

আবার অনেক সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তন করিলে রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে, এবং বহু দিনের সঞ্চিত বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়।

জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন হুগলী সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের (চুঁচড়া) সেক্রেটারী এবং তাঁহার জ্ঞাতি সম্পর্কিত ভাই সত্যদয়াল বসু ছিলেন তার য়্যাসিষ্টাণ্ট্ সেক্রেটারী। ইহারা উভয়ে ষড়যন্ত্র করিয়া চাতরা শ্রীরামপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটীর দশহাজার টাকা আত্মসাৎ করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হন। চুঁচুড়ার সহকারী সেসন জজ্ মিঃ বি সিংহের বিচারে তাঁহাদের প্রত্যেকের ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। এই তহবিল তছরূপের ব্যাপার ঘটিয়াছিল ১৯২৮ সালে। সম্প্রতি অন্য আর একটা তহবিল তছরূপের ঘটনার তদন্ত করিতে করিতে ইহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

—※—

ঢাকার শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ২॥ লক্ষ টাকার বীমার চারিটি চুক্তিপত্র সম্পর্কে "সান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর" বিরুদ্ধে ঢাকার সাবজজ আদালতে এক মামলা করিয়াছিলেন। সাবজজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভক্ত গত ২৫শে মে সেই মামলার রায় দিয়াছেন।

বাদী প্রার্থনা করেন যে, সান লাইফ কোম্পানীর এজেণ্ট এবং কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে ভুল বুঝাইয়া তাঁহার দ্বারা চারিটি চুক্তিতে মোট ২॥ লক্ষ টাকার বীমা করাইয়াছে। অতএব এই বীমার চুক্তিপত্র চারিটি বাতিল করিয়া দেওয়া হউক। অধিকন্তু বীমার প্রিমিয়াম বাবদ তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহা এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৬০ হাজার টাকা তাঁহাকে দেওয়ার জন্য সান লাইফের বিরুদ্ধে ডিক্রি দেওয়া হউক।

সাব জজ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া বাদীর প্রথম তিনটি চুক্তিপত্র বাতিল করিয়া দেওয়ার প্রার্থনা নামঞ্জুর করিয়াছেন। তবে চতুর্থ চুক্তিপত্র দ্বারা যে ৫০০০৲ টাকার বীমা করা হইয়াছিল, তাহা বাতিল করিয়া দেওয়ার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। সাবজজ স্বীকার করিয়াছেন যে, সান লাইফের কর্ম্মচারীরা ভুল বুঝাইয়াই বাদীর নিকট হইতে এই বীমাটি আদায় করিয়াছিলেন।

মামলার খরচা সম্পর্কে সাব জজ রায় দিয়াছেন যে বাদী সমগ্র মামলার খরচার চারি ভাগের এক ভাগ মাত্র সান লাইফের নিকট

পাইবেন। কিন্তু সমগ্র মামলার খরচার চারি ভাগের তিনভাগ টাকাই সান লাইফ কোম্পানীর প্রাপ্য হইবে।

জেনারেল য়্যাসুর‍্যান্স সোসাইটী আজমীবের গঙ্গানাম্নী এক স্ত্রীলোকের জীবন বীমা করিয়া ৬০০০ টাকার পলিসি ইস্যু করে। বসন্তলাল নামক একব্যক্তি এই বীমা ব্যাপারে এজেণ্ট ছিল। তিনমাস পরেই গঙ্গার মৃত্যু হইযাছে বলিয়া তাহার স্বামী সানাভাই নয়াভাই পলিসির টাকার দাবী করে। অনুসন্ধানে জানা গেল গঙ্গার মৃত্যু ত হয়ই নাই; উপরন্তু গঙ্গা সানা-ভাই নয়াভাইর স্ত্রীও নহে। সমস্ত ঘটনাটী বসন্তলাল, গঙ্গা ও সানাভাই নয়াভাইর একটী ষড়যন্ত্র মাত্র। যথা সময়ে আহ্মদাবাদের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে গঙ্গার একমাস জেল, বসন্তলালের ৫০০ টাকা জরিমানা ও তিনমাস জেল, এবং সানাভাই নয়াভাইর এক বৎসর জেল হইয়াছে।

সান্‌-লাইফ অব ক্যানাডা য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর এজেণ্ট দ্বিজেন্দ্রনাথ গোস্বামী ফরিদ-পুর জেলার পাংসা গ্রাম নিবাসী মন্মথ নাথ ঘোষের জীবন বীমা করাইয়া ঐ কোম্পানী হইতে ২০ হাজার টাকার একটী পলিসি আদায় করে। এস্‌ সি সাহা নামক একজন এম্‌-বি ডাক্তার মন্মথ ঘোষের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই মন্মথ ঘোষ মারা যায় এবং কোম্পানী পলিসির টাকা দিতে বাধ্য হয়। পরে গোয়েন্দা পুলিশের দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া জানা গেল, বাস্তবিক মন্মথ ঘোষ খুব বৃদ্ধলোক ছিল। বীমার প্রস্তাব পত্রে প্রতারণা পূর্ব্বক তাহার বয়স কম এবং স্বাস্থ্য ভাল লেখা হইয়াছে। যথাসময়ে এজেণ্ট দ্বিজেন্দ্র নাথ ও ডাক্তার এস্‌ সি সাহা গ্রেপ্তার হইয়া প্রতারণার অপরাধে রাজবাড়ীর সাব-ডিভিসানেল অফিসা-রের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

ম্যানহিম্‌ ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানী একটী জার্ম্মাণ বীমার কারবার। বোম্বাইর হার্ডক্যাস্‌ল এণ্ড্‌ কোম্পানী উহার পূর্ব্বদেশীয় প্রতিনিধি এবং রেঙ্গুনের জারভিস্‌ এণ্ড্‌ কোম্পানী তাহার ব্রহ্মদেশীয় এজেণ্ট। এই এজেণ্টদের মারফতে মাইকিনা নামক স্থানের নিকটে মোগাউং সহরের একটী বাড়ী উক্ত ম্যানহিম কোম্পানীতে অগ্নিবীমা হয়। একদা ঐ বাড়ী পুড়িয়া যাওয়াতে জারভিস্‌ এণ্ড্‌ কোম্পানী উক্ত অগ্নি বীমার পলিসি বাবদে ২০ হাজার টাকার দাবী করে। পুলিশ তদন্তে জানা যায়, অগ্নিকাণ্ডের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। বাস্তবিক মোগাউং সহরে দুই বৎসরের মধ্যেও কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটে নাই। রেঙ্গুনের ইষ্টার্ণ সাব-ডিভিসানের ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে উক্ত জারভিস্‌ এণ্ড কোম্পানীর দুইজন মালিকের চারিমাস করিয়া জেল হইয়াছে।

১২৩৪ সালের ব্যালেন্স সীট দাখিল না করার অপরাধে, কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্‌ কে সিংহের বিচারে দ্বারভাঙ্গা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর ডিরেক্টার পি এল জেইটুলীর ১০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ককে প্রতারিত করিবার অপরাধে চট্টগ্রামের জমিদার এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুক্ত সারদারূপা লালার ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং একহাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, আসামী সারদারূপা লালা দেনা মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্কের নিকট এমন-সব সম্পত্তি মর্টগেজ রাখিয়াছিলেন, যাহার মালিক তিনি নহেন। তদন্তে প্রতারণা প্রকাশিত হইলে, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্তের এজলাসে মামলার বিচার হয়।

কৃষ্ণমনচারী নামক একব্যক্তি মাদ্রাজ ট্রাম কোম্পানীতে চাকুরী করিত। দেউলিয়া অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়। ট্রাম কোম্পানীর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে তাহার প্রায় ৮০০ টাকা পাওনা ছিল। তাহার বিধবা পত্নী ঐ টাকার দাবী করে। অফিসিয়াল এসাইনী ঐ দাবীর প্রতিবাদ জানাইয়া বলে যে, কৃষ্ণমনচারী যখন দেউলিয়া অবস্থায় মারা গিয়াছে, তখন তাহার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা অফিসিয়াল এসাইনীর জিম্মায়ই আসিবে, বিধবা স্ত্রী উহা পাইতে পারে না। কারণ গবর্ণমেণ্ট প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের নিয়ম কেবলমাত্র রেলওয়েতে প্রযোজ্য হইতে পারে, ট্রামওয়েতে নহে। কিন্তু এই আপত্তি হাইকোর্টের বিচারে গ্রাহ্য হইল না। মিঃ জষ্টিস্ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ কৃষ্ণমন চারীর বিধবা স্ত্রীকেই উক্ত প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকার ন্যায্য মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া মামলা ডিক্রী দিয়াছেন।

ঢাকা,—আর্ম্মানীটোলার গোবিন্দ দাস লেন নিবাসী কুঞ্জলাল দাস নামক একব্যক্তি মিথ্যা ব্যাঙ্কের চেক কাটিবার অপরাধে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মুখার্জ্জির এজলাসে অভিযুক্ত হয়। বিচারে তাহার দেড়বৎসর জেল ও ২০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানা না দিলে আর একমাস জেল খাটিতে হইবে। জরিমানার টাকা আদায় হইলে উহা হইতে ১০ টাকা অভিযোগকারী পাইবে।

বিহারের অন্তর্গত ছাপরা জেলার কোন গ্রাম নিবাসী রামচেতন সিং নামক একব্যক্তি "সান্ লাইফ্ অব্ ক্যানাডা" ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে ২০০০ টাকার জীবন বীমা করে। ঐ পলিসি ১৮৭৪ সালের স্ত্রী-ধন সম্পর্কিত আইন অনুসারে বীমাকারীর পুত্র যোগেন্দ্র প্রসাদ সিংহের স্বপক্ষে একটি ট্রাষ্ট স্বরূপ গণ্য বলিয়া অভিযোগ হয়। বীমাকারী ১৯৩১ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে ছাপরার ব্যাঙ্ক অব বিহার লিমিটেডের নামে সেই পলিসি এসাইন করিয়া কিছু টাকা নেয়। ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত পলিসির মেয়াদ ছিল। ১৯৩৩ সালের মে মাসে বীমা-কারীর মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র যোগেন্দ্র প্রসাদ সিংহ পলিসির টাকার দাবী করে। ব্যাঙ্ক অব্ বিহার লিমিটেড ছাপরা মুন্সেফ কোর্টে এক মামলা করিয়া যোগেন্দ্র প্রসাদ সিংহের বিরুদ্ধে ডিক্রী পায় এবং ঐ পলিসির টাকা সান্লাইফ অব ক্যানাডার নিকট দাবী করে। এদিকে বাংলা গবর্ণমেণ্টের অফিসিয়াল ট্রাষ্টীও পূর্ব্বোক্ত ১৮৭৪ সালের স্ত্রী-ধন-সম্পর্কিত আইন অনুসারে ঐ পলিসির টাকা পাইবার দাবী করে। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া সান্লাইফ অব ক্যানাডা আদালতের শরণাপন্ন হয়।

প্রেসিডেন্সী স্মল কজেস্ কোর্টের (ছোট আদালতের) অফিসিয়েটিং চীফ জজ্ নবাবজাদা এ এস্ এম্ লতিফার রহমান এই মামলার বিচারে রায় দিয়াছেন যে, পলিসির দাবী বাবদ ১৬৭৭ টাকা ১০ আনা ৬ পাই সান্‌লাইফ অব ক্যানাডা আদালতে জমা দিবে। এই টাকা ডিপজিট্ রাখা হইলে পর কোম্পানী ঐ পলিসি খানি ফেরৎ পাইবে এবং কোম্পানী পলিসির সর্ব্ববিধ দায় হইতে মুক্ত হইবে। ঐ ডিপজিটের টাকা হইতে ৮৭০ টাকা যোগেন্দ্র প্রসাদ সিংহ পাইবে। অবশিষ্ট টাকা এখন কোর্টে জমা থাকিবে ;—তৎসম্বন্ধে পরে বিচার করা হইবে। বাস্তবিক এই পলিসি বীমাকারীর স্বার্থেই সৃষ্ট হইয়াছিল ;—স্ত্রীধন সম্পর্কিত আইনের ৬ ধারা ইহাতে প্রযোজ্য নহে। সুতরাং অফিসিয়াল ট্রাষ্টী কিছুই পাইতে পারে না।

ময়মনসিংহ জেলার চন্দুরা গ্রামের রামসুন্দরী দেবী নাম্নী এক মহিলা কলিকাতার মুন্‌লাইট ইনসুর‍্যান্স কোম্পানীতে জীবন বীমা করে। এক বৎসরের অধিক হইল, তাহার মৃত্যু হয়। তাহার য়্যাসাইনী ব্রজগোপাল গোস্বামী পলিসির টাকা দাবী করে। কোম্পানীর ম্যানেজার এন্ এম চৌধুরী নাকি ব্রজগোপালকে একখানা ফরম সই করিয়া আনিলে টাকা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। ব্রজগোপাল সেই মতে ফরম খানি সই করিয়া ম্যানেজারকে ফেরৎ দেয়। কিন্তু আজ একবৎসর হইয়া গেল, তবুও টাকা পাইতেছে না। এই অভিযোগে ব্রজগোপাল উক্ত ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের দক্ষিণ সদর এস্ ডি ওর এজলাসে নালিশ করিয়াছে। তদনুসারে ম্যানেজারের নামে সমন জারী হইয়াছে।
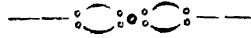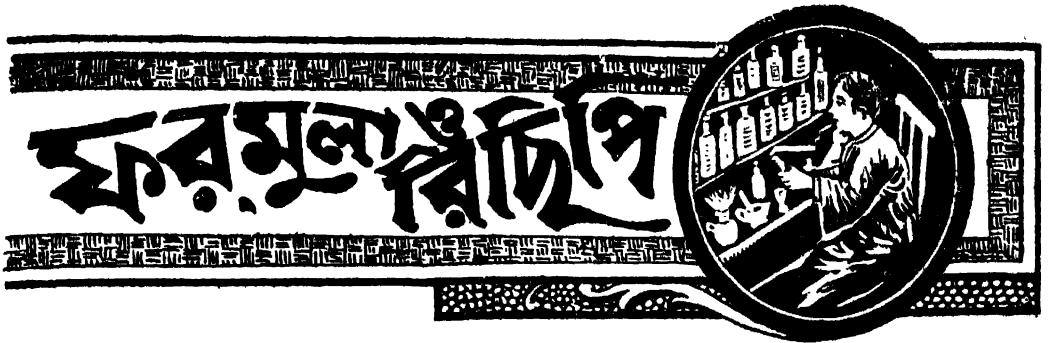
সাইন বোর্ডে অক্ষর আঁটিবার আঠা ঃ-

(১) সাদা লিথার্জ্জ (White Litharge) ১০০ ভাগ
(খুব মিহি চূর্ণ)
শুষ্ক হোয়াইট্ লেড্ (Dry White Lead) ৫০ ,,
মসিনার তৈল বার্ণিশ ৩ ,,
কোপ্যাল বার্ণিশ ১ ,,

(২) কোপ্যাল বার্ণিশ ১৫ ভাগ
মসিনার তৈল বার্ণিশ ৫ ,,
কাঁচা তার্পিণ ৩ ,,
তার্পিণ তৈল ২ ,,
ছুতোর মিস্ত্রীর শিরীষ জলে গোলা ৫ ,,
তলানি পড়া মিহি খড়ি মাটী ১০ ,,

(৩) ম্যাষ্টিক গঁদ (Mastic Gum) ১ ভাগ
লিথার্জ্জ (Litharge) ২ ,,
হোয়াইট্ লেড্ (White Lead) ১ ,,
মশিনা তৈল ৩ ,,

উপরি উক্ত (২) ও (৩) নম্বরের মশলা গরম করিয়া মিশাইতে হয় এবং ব্যবহার করিবার সময়েও গরম করিয়া লাগাইতে হয়। অক্ষর গুলিকেও যদি গরম করা যায়, তাহা হইলে আঠা আরও শক্ত হইয়া আঁটিয়া ধরে।

কাচের উপরে সোনার অথবা রূপার অক্ষর আঁটিবার মশলা ;—

(১) খুব ভাল আইসিং গ্লাস্ (Ising Glass) ১ আউন্স
রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিট ১ কোয়ার্ট
প্রচুর জল (যাহাতে সমস্ত জিনিষটা ওজনে ২৮ পাউণ্ড হয়)।

এই মশলাটি তৈয়ার করিয়া রাখিয়া দিতে হইলে বোতলে ভালরূপে ছিপি আঁটিয়া রাখিতে হয়। ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে যে কাচে অক্ষর লাগাইতে হইবে, সেই কাচখানিকে খুব পরিষ্কার ও পালিশ করিয়া লইতে হয়।

(২) খুব ভাল রকম মদ্য ২ কোয়ার্ট লউন। তাহাতে এক আউন্স আইসিং গ্লাস্ (Ising Glass) একটু অল্প আঁচে গরম করিয়া গলাইয়া ফেলুন। তার পর উহার সহিত দুই কোয়ার্ট পরিস্রুত জল মিশান। এক্ষণে সমস্ত

মিশ্রিত দ্রব্যটীকে পরিষ্কার ন্যাকড়ার দ্বারা ছাঁকিয়া লউন।

কাচের উপরে এনামেল অক্ষর লাগাইবার আঠা ;—

তৈলে চূনিত হোয়াইট্ লেড্ (White Lead ground in oil) ২ ভাগ
শুষ্ক হোয়াইট্ লেড্ (Dry White Lead) ৩ „

কোপ্যাল বার্ণিশ আন্দাজ মত। এই আঠা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে কাচ খানিকে এমনভাবে পরিষ্কার করিয়া লইবেন. যেন তাহাতে তেল তেলে ভাব না থাকে। অক্ষরগুলির পিছনে সমান ভাবে আঠা লাগাইবেন। এই আঠা দিয়া অক্ষর একবার আঁটা হইয়া গেলে যদি তাহাকে পুনরায় তুলিয়া ফেলিতে হয়, তবে একটু তার্পিণ তেল বা অক্সালিক (Oxalic acid) লাগাইলেই অক্ষরটি আপনা আপনি খুলিয়া আসিবে।

চীনা মাটীর অক্ষর লাগাইবার আঠা ;—

প্রথমে ১৫ ভাগ চুর্ণে ২০ ভাগ জল দিয়া উহাকে গলাইয়া লউন। তৎপর ৫০ ভাগ কুচুক্ (Caoutchouc) এবং ৫০ ভাগ মসিনার তৈল ভালরূপে মিশাইয়া ফুটন্ত গরম করুন। ফুটন্ত গরম অবস্থায় এই তরল দ্রব্যটীকে আস্তে আস্তে গলান চুণের উপরে ঢালুন। ঢালিবার সময় সর্ব্বদা নাড়িতে থাকিবেন। এই মিশ্রিত তরল পদার্থটীকে গরম অবস্থায় পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া লউন এবং ঠাণ্ডা হইতে দিন। এই আঠার উপরে চীনা মাটীর অক্ষর কাচের উপরে লাগান যায়। ইহা শক্ত হইতে দুই দিন সময় লাগে। কিন্তু একবার শক্ত হইয়া আঁটিয়া গেলে উহা খুব জোরাল হয় এবং গুরুতর আঘাতেও খসিয়া পড়ে না।

জুয়েলারগণের ব্যবহার্য্য আরমিনিয়ান্ সিমেণ্ট ;—

ম্যাষ্টিক গঁদ (Mastic Gum) ১০ ভাগ
আইসিং গ্লাস্ (Ising Glass) ২০ „
য়্যামোনিয়াক্ গঁদ (Gum Ammoniac) ৫ „
খাঁটি য়্যালকহল (Absolute Alcohol) ৬০ „
৫০ পারসেণ্ট য়্যাল্কহল্ (50 Per cent Alcohol) ৩৫ „
জল ১০০ „

প্রথমতঃ খাঁটী য়্যালকহলে ম্যাষ্টিক গঁদ গলাইয়া লউন। আর একটি পাত্র গরম জলের তাতে চড়াইয়া উহাতে অল্প আঁচে উপরি উক্ত ১০০ ভাগ জলে ২০ ভাগ আইসিং গ্লাস্ গলাইবেন এবং তাহার সহিত ১০ ভাগ ৫০ পারসেণ্ট য়্যালকহল মিশাইবেন। এই য়্যাল-কহলের অবশিষ্ট ২৫ ভাগ য়্যামোনিয়াক্ গঁদ গলাইয়া লউন। এক্ষণে আগে ম্যাষ্টিক গঁদের সলিউসান ও আইজ্ঞিং ল্যাসের সলিউসান ভালরূপে মিশ্রিত করুন। তারপর উহার সহিত য়্যামোনিয়াক্ গঁদের সলিউসান মিশাইয়া লউন। খুব ভালরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া মিশাইয়া সমস্ত জিনিষটীকে গরম জলের তাতে বসাইয়া আস্তে আস্তে শোষাইতে থাকুন। যখন দেখিবেন উহা কমিয়া ১৭৫ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন গরম জলের উপর হইতে নামাইয়া লউন।

এই আরমিনিয়ান সিমেণ্ট জুয়েলারদের বিশেষ পরিচিত ও প্রয়োজনীয়। বহুমূল্য মণি মুক্তা, হীরক প্রস্তরাদি স্বর্ণালঙ্করে বসাইবার জন্য এই সিমেণ্ট তুরস্কের ও ভারতবর্ষের জুয়েলারগণ পূর্ব্বকালে ব্যবহার করিত। আজকাল সর্ব্বত্রই ইহার চলন আছে।

ডায়মণ্ড সিমেণ্ট ;—

জুয়েলারগণ ডায়মণ্ড সিমেণ্ট নামে আর এক প্রকার আঠা ব্যবহার করেন; তাহা তৈরী করিবার প্রক্রিয়া নিম্নে লিখিত হইল। এই ডায়মণ্ড সিমেণ্ট অল্পক্ষণ জল লাগিলে নরম হইয়া যায় না।

আইসিং গ্ল্যাস্	৮ ভাগ
য়্যামোনিয়াক গঁদ	১ ,,
গ্যাল বান্নম (Gal Banum)	১ ,,
স্পিরিট অব্ ওয়াইন (Spirit of Wine)	8 ,,

প্রথমতঃ জলে আইসিং গ্ল্যাস ভিজাইয়া লউন। তার সঙ্গে একটু স্পিরিট্ অব্ ওয়াইন দিবেন। অবশিষ্ট স্পিরিট অব্ ওয়াইনে য়্যামোনিয়াক গঁদ ও গ্যাল বান্নম গলাইয়া লইবেন। তারপর আইজিং ল্যাস ও গঁদ সলিউসান মিশ্রিত করিলেই ডায়মণ্ড সিমেণ্ট তৈয়ারী হইল। ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে এই সিমেণ্টকে গরম করিয়া লইবেন। তাহা হইলে উহা একটু নরম হইয়া আসিবে।

জুয়েলারদের গ্লু সিমেণ্ট ;—

গরম জলের তাতে ৫০ ভাগ আইসিং গ্ল্যাস্ গলাইয়া লউন। তাহাতে একটু ৯৫ পারসেণ্ট য়্যাল্কহল্ দিবেন। তারপর উহার সহিত ৪ ভাগ (ওজনে) য়্যামোনিয়াক গঁদ মিশাইবেন। ইহার নাম দিন ১নং সলিউসান। আর একটি পাত্রে ২ ভাগ (ওজনে) ম্যাষ্টিক গঁদ ১০ ভাগ (ওজনে) য়্যালকহলে গলাইয়া লউন। ইহার নাম দিন ২নং সলিউসান। এক্ষণে এই ১নং ও ২নং সলিউসনে আর একটি পাত্রে খুব ভাল করিয় মিশাইয়া লউন এবং একটি বোতলে উত্তমরূপে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিন। ব্যবহার করিবার সময় গরম জলের তাতে একটু নরম করিয়া লইবেন।

কাচ-প্রস্তর ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যাদি জুড়িবার ওয়াটার প্রুফ সিমেণ্ট ;—

(১) গন্ধক, নিশাদল, (রেতি-ঘষা) লোহা চুর, ও জাল দেওয়া (মসিনার) তৈল এই সকল দ্রব্য আন্দাজ মত লইয়া ভালরূপে মিশাইয়া লেইয়ের মত করুন।

(২) হোয়াটিং (Whiting)	৬ পাউণ্ড
প্যারিস প্লাষ্টার	৩ ,,
বালি	● ,,
লিথার্জ্জ (Litharge)	৩ ,,
রোজিন (Rosin)	১ ,,

এই মশলাগুলি এক সঙ্গে শুষ্ক অবস্থায় মিশ্রিত করিয়া লউন। তারপর আন্দাজ মত কোপ্যাল বার্ণিশ মিশাইয়া লেইয়ের মত করুন।

(৩) জাল দেওয়া তৈল	৬ পাউণ্ড
কোপ্যাল (Copal)	৬ ,,
লিথার্জ্জ (Litharge)	২ ,,
হোয়াইট্ লেড্ (White Lead)	১ ,,

এই সকল উপকরণ ভালরূপে মিশাইয়া লেইয়ের মত করিয়া লউন।

(৪) জাল দেওয়া তৈল ৩ পাউণ্ড
মিহি ইষ্টক চূর্ণ ২ ,,
শুক্‌না চুণ ১ ,,
এই সকল মশলা ভালরূপে মিশাইয়া লউন।

(৫) একটী পাত্রে ৯৩ আউন্স ফট্‌কিরি এবং ৯৩ আউন্স সুগার অব লেড্ আন্দাজ মত এই পরিমাণ জলে গলাইবেন। যেন সলিউসানটী খুব গাঢ় হয়। আর একটী পাত্রে ১৫২ আউন্স আরবীগঁদ ২৫ গ্যালন জলে গলাইয়া লউন এবং তাহাতে ৬২॥০ পাউণ্ড ময়দা নাড়িয়া চাড়িয়া মিশ্রিত করুন। তারপর ঐ ফট্‌কিরি ও সুগার অব লেড্ সলিউসানটী ইহার সহিত মিশাইয়া গরম করুন যেন লেইয়ের মত হইয়া আসে। কিন্তু দেখিবেন,—ফুটন্ত গরম করিবেন না।

(৬) প্রথমতঃ ৩ পাউণ্ড জলে এক পাউণ্ড সোডিয়াম সিলিকেট্ (Water Glass) এবং এক পাউণ্ড সোহাগা (Borax) গলাইয়া লউন। ইহার সহিত ২ পাউণ্ড চীনামাটীর কাদা ও এক পাউণ্ড ব্যারাইটা (Barytes) মিশাইয়া লেইয়ের মত করুন। লৌহ ও মার্ব্বেল পাথর এই সিমেণ্টের দ্বারা জুড়িলে উহা উত্তাপেও নষ্ট হয় না।

(৭) একটী পাত্রে ৫৫ পাউণ্ড শিরীষ জলে গলাইয়া লউন। আর একটী পাত্রে ৪০ পাউণ্ড বাইক্রোমেট্ ও ৫ পাউণ্ড ফট্‌কিরিজলে সলিউসান করুন। এই উভয় পাত্রের জিনিস মিশাইলে যে শিরীষ আঠা তৈয়ারী হইবে তাহা গরমজল লাগিলেও নষ্ট হয় না।

(৮) শুষ্ক চুণ ৪০ পাউণ্ড
ফট্‌কিরি ১০ ,,
ডিম্বের শ্বেতাংশ ৫০ ,,
এই তিনটী দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করুন।

(৯) য়্যালকহল ১০০০ ভাগ
স্যাণ্ডারাক (Sandarac) ৬০ ,,
ম্যাষ্টিক (Mastic) ৬০ ,,
তার্পিন তৈল ৬০ ,,

প্রথমে গঁদগুলিকে য়্যাল্‌কহলে গলাইয়া লউন। তারপর উহাতে তার্পিণ তেল ঢালিয়া বেশ ভালরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া মিশান। একটী পৃথক পাত্রে ১২৫ ভাগ শিরীষ ও ১২৫ ভাগ আইসিংগ্ল্যাস ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখুন। উহা জল শুষিয়া যতদূর সম্ভব ফুলিয়া উঠিলে অতিরিক্ত জল ফেলিয়া দিয়া উহাকে গরম জলের তাতে (Water bath) চড়াইয়া গলাইয়া লউন। সম্পূর্ণ গলিয়া গেলে ইহার আয়তন, গঁদের সলিউসানের প্রায় সমান হইবে। গঁদের সলিউসানটীকেও সাবধানে গরম জলের তাতে চড়াইয়া ফুটন্ত অবস্থায় আনিয়া উহার সহিত গলান গরম শিরীষ মিশাইয়া লউন। এই আঠা দিয়া জিনিস জুড়িলে, সেই জোড়া ঠাণ্ডা জল লাগিয়া দীর্ঘকালেও নষ্ট হয় না। গরম জলেও উহা বহুকাল টিকিয়া থাকে।

টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ চিকিৎসা

[কবিরাজ শ্রীশিবশর্ম্মা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী]

দূষিত ক্ষতের অমোঘ ঔষধ :—

যে কোন রকমের ক্ষত অর্থাৎ ঘা হউক না কেন নিম্নলিখিত মলমদ্বারা উপকার হইবে। খুব পুরাতন ঘৃত ও মোম তুল্যাংশে লইয়া চতুর্গুণ বনচালিতা গাছের পাতার রস সহ একত্রে পাক করিয়া মলমের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। যে কোন প্রকার কঠিন ক্ষত হউক না কেন প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে নিম ও নিসিন্দা পাতা সিদ্ধ জলে ধৌত করিয়া উক্ত মলম লাগাইলে রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

অন্ত্রবৃদ্ধিতে :—

পুরাতন গব্যঘৃত এক পোয়া, ভেড়ার লোম এক ছটাক, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ এক ছটাক একত্রে একখানি তাম্রপাত্রে রাখিয়া প্রত্যহ রৌদ্রে দিতে হইবে এবং সেই লোমগুলি ও সৈন্ধবলবণ উক্ত ঘৃতের সহিত তাম্রপাত্রে প্রত্যহ আধ ঘণ্টা করিয়া ঘষিতে হইবে, এইরূপ ২১ দিন ঘষা হইলে লোমগুলি ছাকিয়া ফেলিয়া উক্ত ঘৃত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে অন্ত্রবৃদ্ধিস্থানে উত্তমরূপে আধঘণ্টা করিয়া মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিবার সময় ঐ ঘৃত হাতে লাগাইয়া আগুনে হাতটী একটু তাতাইয়া লইতে হইবে। এইরূপ কয়েকদিন ব্যবহারে বৃদ্ধের সম্বন্ধে না হউক, যুবক বা বালকের পক্ষে এই ঔষধ দ্বারা বিশেষরূপ ফললাভ হইবে।

প্রদররোগে :—

একটী গাব কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া পূর্ব্ব দিবস রাত্রিতে অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ জলের সহিত ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরদিবস প্রাতে সেই জল ছাকিয়া তাহার সহিত কাঁটানটে শাকের মূল সিকিতোলা উত্তমরূপে বাটিয়া একটু মধুর সহিত সেবন করিতে হইবে। রোগের

প্রবলতা থাকিলে এইরূপ নিয়মে একটু বেশীদিন সেবন করিলে রোগের শান্তি হইয়া যাইবে, এই মুষ্টিযোগের সঙ্গে আহার বিহারাদির নিয়ম পালন করা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। মনে রাখিবেন ঔষধের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

প্লীহা যকৃতের বৃদ্ধি :—

ইহাদের বৃদ্ধিতে যদি বেদনা বোধ হয় তাহা হইলে গোমূত্রের স্বেদ কয়েকদিন দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বোরিক কম্প্রেস যেরূপ ভাবে করিতে হয় সেইভাবে করিলে বিশেষ ফল হয়।

মাথার যন্ত্রণা :—

ক্রুর শ্লেষ্মার জন্য যদি মাথার বিশেষ যন্ত্রণা বা বেদনা কিম্বা দুইই উপস্থিত হয় (তাহা সামনেই হউক আর পশ্চাতেই হউক) শ্বেত-কুঁচের শাঁস চন্দনের মত ঘষিয়া ৪।৫ দিন নস্য লইলে নাক দিয়া প্রচুর হরিদ্রাভ শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া মাথার যন্ত্রণা চলিয়া যাইবে। এই মুষ্টিযোগটী একজন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

গেঁটে বেদনা :—

পায়ের সন্ধিস্থলে অপক্ক রস জমিয়া প্রবল বেদনা ও ফুলা উপস্থিত হয়। তাহাতে রোগীর চলৎশক্তি একপ্রকার রহিত হয়—রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায়—নিম্নলিখিত প্রলেপটী বিশেষ উপকারী।

সজিনার মূলের ছাল অভাবে গাছের ছাল, কনক ধুতরার পাতা অভাবে সাদা ধুতরার পাতা, রসুন, আদা ও গোলমরিচ একত্রে সমপরিমাণে লইয়া বাটিয়া গরম করিয়া সহ্যমত গরম থাকিতে সেইস্থানে প্রলেপ দিতে হইবে। প্রত্যহ দুইবার করিয়া দিতে হইবে, একবার বাটিলে দুইবার চলিবে, তবে দ্বিতীয়বার দিবার সময় গরম করিয়া লইতে হইবে। এই প্রলেপে চমৎকার উপকার হয়; বাহ্য প্রয়োগে ফুলা ও যন্ত্রণার উপশম হইবে বটে, তবে রোগের

চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের শরণ লওয়া উচিত।

(১) **ফোড়ায়**—(১) মেথী পিষিয়া চতুঃপার্শ্বে লাগাইয়া, ফোড়ার মুখে কবুতরের বিষ্ঠা লাগাইয়া রাখিলে ফোড়া অবশ্য ফাটিবে। (ক) লাল কৃষ্ণকলি ফুল বাটিয়া ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

(২) **নালীঘায়ে**—সর বাটা মাখনকে শত ধৌত করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিয়া সেই ঘৃতের সহিত শ্বেত ধুনা একচতুর্থাংশ মিশাইয়া ঐ ঘৃত নালীঘায়ের মুখ বাদ দিয়া চারিধারে লাগাইয়া তাহার উপরে হেলঞ্চ শাকের শিকড় ছোট ছোট করিয়া লাগাইয়া পরে কলার পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) **ভগন্দর**—গব্য ঘৃত ⁄।০ এক পোয়া, তুলসীর শিকড় ২ তোলা, পচা পুঁটি মাছ ৩টা; ঘৃত নিস্ফেন হইলে ঐ ঘৃতে প্রথমে তুলসীর শিকড় দিবে, ভাজা হইলে তাহার পর মাছ দিবে, মাছ ভাজা হইলে নামাইয়া লইয়া ছাঁকিয়া লইবে, এই ঘৃত পলিতা করিয়া নালির মধ্যে দিবে।

(৪) **ঘায়ের ঔষধ**—(ক) যষ্টিমধু, নিমপাতা, খোসাছাড়ান কৃষ্ণ তিল প্রত্যহ সমানভাগে সামান্য জল দ্বারা ভাল করিয়া বাটিয়া মধু মিশ্রিত করিয়া পুল্‌টিসের মত ক্ষত স্থানে দিনে দুইবার লাগাইবে। রাত্রে মধু লাগাইবে। ঘায়ে যতদিন ক্লেদ বা পুঁজ হইবে তত দিন এই ভাবে দিবে। ক্লেদাদি না থাকিলে ঐ প্রলেপ মধু না দিয়া ঘৃত দিয়া লাগাইলে শুষ্ক হইবে। প্রলেপ দিবার পূর্ব্বে ক্ষত স্থান নিমপাতাসিদ্ধ জল দ্বারা ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে।

(খ) গব্য ঘৃত ⁄৷৷০ লইয়া তাহার সহিত তাহাতে শ্বেত ধুনা ⁄০ ভাজিয়া একখানা বড় থালার উপর রাখিয়া ঐ ঘৃত ও ধুনা ভাজার সহিত থানকুনি পাতার রস ⁄৷৷০ মিশাইবে। ঠাণ্ডা হইলে ঐ ঘৃত শত ধৌত করিয়া লইবে। এই মলমে যাবতীয় ঘা আরোগ্য হয়।

১। সূতিকাজ্বরে মুষ্টিযোগ

[শ্রীশ্রীশ চন্দ্র তা]

১। মাশকলাই
২। মুগ
৩। বুট
৪। কৃষ্ণতিল
৫। তেলা কুচার শিকড়

প্রত্যেক দ্রব্য এক তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্রে বাটিতে হইবে। বাটা শেষ হইলে উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। একভাগ বেলা ৯।১০ টার সময়ে খাইতে হইবে। ঔষধ সেবনান্তে কৈ অথবা মাগুর মাছের ঝোল এবং গৃহে পাতা দধি সহ ভিজা ভাত খাইতে হইবে।

দ্বিতীয় ভাগ ঔষধ বেলা ১ টার সময় সেবন করিতে হইবে। ঔষধ সেবনান্তে ডাবের জল পান করিতে হইবে।

তৃতীয় ভাগ ঔষধ বেলা ৪ টার সময় সেবন করিতে হইবে। সন্ধ্যার পর ঘৃত পক্ক দ্রব্যাদি এবং মিষ্টান্ন খাইতে হইবে। ঔষধ একদিন মাত্র সেবন করিতে হইবে। ইহা মহাত্মা গঙ্গাধরের মুষ্টিযোগ বলিয়া কথিত আছে।

সঞ্চয়হীনের দশা

বয়স কালে হরেন বাবুর অর্থ সম্পদ, মান সম্ভ্রম, বন্ধুবান্ধব, সভাসদ, চাটুকার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার কথায় লোকে উঠিত বসিত। তিনি বলিলে লোকের চাকরি জুটিয়া যাইত। তিনি অসন্তুষ্ট হইলে কাহারও রক্ষা থাকিত না। ভোগে, বিলাসে, অভিনব খেয়ালে হরেন বাবুকে প্রাচীন বাদশাহী আদর্শের এক আধুনিক উদাহরণ বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। শুনা যায়, তিনি ছুটির সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইলে বাংলা দেশের মাটী ও জল হাওয়া ব্যতীত আর সকল উপকরণই সঙ্গে লইয়া চলিতেন। সুদূর পশ্চিমে, বাংলার একান্ত নিজের তরি তরকারী ও মৎস্য, অথবা যথাযথ ও নির্দ্দিষ্ট জাতীয় চাল, ডাল, তৈল, ঘৃত, চাকর, ঝি, বাসন, আসবাব, সটকা, তামাক কিম্বা কোন কিছুর অভাব হইলে হরেন বাবু তাহা বরদাস্ত করিতেন না। কন্যার বিবাহ কিম্বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে হরেন বাবুর ফিরিস্তি জার্ম্মান সমরের হতাহতের তালিকার মতই সুদীর্ঘ ও সর্ব্বগ্রাসী হইত। সে আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কিন্তু এখনও সে কথা লোকে কিম্বদন্তীর মতই আওড়াইতে থাকে।

কিন্তু, এ হেন হরেন বাবু আজ চাকরী অবসানে হৃত-সম্পদ এবং বিগত যৌবন অবস্থায় ছোট আদালতের উকিল মহলের "টাউট"। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন বাদী ফরিয়াদীদের উপযুক্ত উকিল সরবরাহ করিয়া দিনান্তে দুই এক টাকা সংগ্রহ করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া যান। ছোট টিনের চালায় স্বপাকে আহার ও ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করেন। কেন? কারণ, কিছুই নহে—শুধু অর্থাভাব। যৌবনে অগাধ অর্থ সম্পদ অপব্যবহার করিয়া হরেন বাবু আজ নিঃসম্বল। কিছু টাকা যাহা ছিল ভাঁটার মুখে রাতারাতি বড়লোক হইতে গিয়া তথাকথিত ব্যবসায়ে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহার দৌলতে কত লোকের একদিন সুসময়ে গিয়াছে, আজ তাহারই অভাবের দিনে কাহাকেও কোথাও দেখা যায় না।

গল্পটী কিছু অভিনব নহে। সময়ে বার্দ্ধক্যের পুঁজি ঠিক করিয়া না রাখিলে অনেকেরই এই দশা হয়। শুধু মানুষ কেন, জীবজগতে সঞ্চয়ের মূল্য সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য। উদাহরণ, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি। সময় থাকিতে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখা প্রয়োজন।

জীবন-বীমারও সার্থকতা এই কারণেই। যৌবনে, রোজগারের সময়ে, বিন্দু বিন্দু করিয়া যে অর্থ বীমায় রক্ষিত হয়, অভাবের সময়ে নিজের বা নিজের অবর্ত্তমানে, পরিবারবর্গের নিকট তাহাই প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, শীতল, সরোবরের রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হয়। বীমায় রক্ষিত অর্থ, সকল ভুল, ভ্রান্তি, মোহ, ও অপচয় আশঙ্কার উপরে। জীবিত থাকিলে বীমা বার্দ্ধক্যের সম্বল, মৃত্যু ঘটিলে পরিবারের আশ্রয়। ইহা ব্যতীত পুত্রের শিক্ষা কিম্বা কন্যার বিবাহের জন্যও বিশেষ বীমা করা যায়।

এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত উপদেশ পাইতে হইলে **ভারত ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ**, ভারত ভবন, কলিকাতা, ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। "ভারত" অদ্যাবধি তাহার বীমাকারীদিগকে এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়াছে। চল্লিশ বৎসরের পুরাতন আফিশ। বর্ত্তমানে মোট তহবিল দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। বীমার সর্ত্ত প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা ও লাভজনক। বীমাকারীদের পাওনা শোধ অতিসত্বর ও নির্ঝঞ্ঝাটে করা হয়। বাংলার সর্ব্বত্র এজেণ্ট আছে।

ভাদ্রমাসের কৃষি

যে সকল জমিতে ফসল করিতে হইবে, ভাদ্র মাসেই সেই সকল জমিতে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এখন হইতে গোময় প্রয়োগ করিয়া মাঝে মাঝে লাঙ্গল দিয়া মাটি উল্টাইয়া দিলে মাটির সর্ব্বত্রই সারগুলি সমানভাবে ছড়াইয়া পড়িবে; ফলে, একস্থানে সারের আতিশয্যে গাছ হাপসিয়া যাইবে না, আবার অন্যত্র আদৌ সার না পড়ায় গাছগুলি জীবন্মৃত হইয়া থাকিবারও সম্ভাবনা লুপ্ত হইবে।

শাকসব্জী—

শীতের সমস্ত শাক সব্জীরই বীজ এখন বপন করিতে হয়, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, গাজর, বীট, মুলা, লেটুস্, টোম্যাটো, মটর, স্কোয়াস্, পার্সনিপ, পালং, নটে, শশা, লাউ, কুমড়া, শাকালু প্রভৃতির বীজ এখন বপন করা প্রয়োজন; এমডিভ, হালিম, পার্সলী, সেলেরী, সোরেন্ ব্রুম্স্, ডেল নিউজিল্যাণ্ড এস্পারগাসের চাষও এই সময় হওয়া উচিত।

ফুলকপি—

যে সমস্ত জলদি (end) ফুলকপির চারা ইতিপূর্ব্বে ক্ষেতে বসান হইয়া গিয়াছে তাহাদের গোড়ায় মাটী টানিয়া দেওয়া প্রয়োজন, সমুদায় চারা এই মাসের মধ্যে ক্ষেতে বসান শেষ হওয়া চাই।

বাঁধাকপি—

জলদি বাঁধাকপির বীজ এখন হইতে বসান আবশ্যক, এই মাসের শেষের দিকে কপির চারা বসান আরম্ভ করিবে, উত্তর পশ্চিম বা বেহার প্রদেশে ইতিপূর্ব্বেই ঐ কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এখন উহা শেষ হইয়া আসিল।

যাহা হউক, বাংলা দেশে ভাদ্রমাসের গোড়াতেই কপি রোপণের জন্য গোবর ও পচাইল সার দিয়া জমি তৈয়ারী করিয়া রাখা উচিত। এই জমিতে চারা রোপণের পূর্ব্বে চারাগুলিকে টব হইতে উঠাইয়া কিছুদিনের জন্য অন্যত্র পুঁতিতে হয় এবং গোড়ায় মাটি শুকাইয়া গেলে জল দিয়া খুঁড়িয়া আনিয়া চাষের জমিতে বসাইতে হয়।

কপির চারা তৈয়ারী করিতে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। সাধারণতঃ টবে করিয়াই কপির চারা তৈয়ারী করা হয়, টবে

সার মিশ্রিত মাটি ভরিয়া উহাতে কপির বীজ বপন করতঃ প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে উহাতে খড়ের গোড়াদিয়া জল ছিটাইয়া দিতে হয়। সূর্য্যের প্রখর তেজে রাখিলে চারাগুলি মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা, এই জন্য ঐ সকল টব দিনের বেলায় ছায়ায় এবং রাত্রিকালে খোলা স্থানে রাখিতে হয়।

যাঁহারা খুব বেশী জমিতে চাষ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে কিন্তু টবে চারা তৈয়ারী করা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। তাঁহারা উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাঁধিয়া বীজ বপন করিতে পারেন, রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য আবশ্যক মত হোগলা দিয়া বীজতলা ঢাকিয়া রাখিলেই চলিবে।

ঝিঙ্গা উচ্ছে ইত্যাদি—

ঝিঙ্গা, উচ্ছে, লাউ, কুমড়া, শশা, বেগুন, লঙ্কা, সীম, নটেশাক, ওল, মানকচু, প্রভৃতির ফলন এ সময়ে পাওয়া যায়, শাক আলু পেপে টেপারী প্রভৃতির বীজ এ সময়ে লাগান উচিত।

নারিকেল—

নারিকেলের চারা তৈয়ারী করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়।

যে সকল নারিকেল গাছেই ঝুনা হইয়া আপনা আপনি বৃন্তচ্যুত হইয়া নীচে ঝরিয়া পড়ে, তাহাদিগকে 'গলন' নারিকেল বলে, এই 'গলন' নারিকেলই বীজ নারিকেলরূপে ব্যবহার করিতে হয়। নারিকেলের চারা তৈয়ার করিতে বিশেষ হাঙ্গামা নাই। একটি শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল একপাশে ঈষৎ হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয়, মাটি শুকাইয়া গেলে উহাতে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া ভূমি সর্ব্বদাই সরস রাখিতে হইবে।

ওল

এই মাসে ওল তুলিবার প্রকৃষ্ট সময়, যাঁহারা ওলের চাষ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ওল তুলিয়া বাজারে পাঠাইতে হইবে।

ওল তুলিয়া ওলের মুখীগুলি ছাড়াইয়া লওয়া হয়, এইগুলি বীজরূপে ব্যবহৃত হইবে, কিন্তু সাধারণতঃ চাষীরা সকল মুখীই একত্র মিশাইয়া রাখে, এই পদ্ধতিটী খুব ভাল বলিয়া মনে হয় না।

খুব তেজী ওলের মুখীগুলি আলাদা করিয়া রাখা আবশ্যক, কেননা, ঐ সমস্ত বীজ হইতে স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত বড় ওল জন্মিবে।

হলুদ ও আদা—

শ্রাবণ মাসে হলুদ ও আদার দাঁড়া বাঁধিতে হয়, কিন্তু কোন কারণে যদি ঐ মাসে ঐ কাজ শেষ না হইয়া থাকে তবে ভাদ্র মাসেই তাহা করা উচিত।

আলুর জমি—

আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে যে জমিতে গোল আলু, কপি ও মলা পুতিতে হইবে, এই মাসে সেই জমি উত্তমরূপে চাষ দিয়া রাখিতে হয়।

মরশুমী ফুল

জিনিয়া, ব্যাল্‌সাম, কস্‌মস্‌, কোরিয়প্‌সিস্‌ পর্টুলেক প্রভৃতি মরশুমী ফুল বীজের চারা বপনের সময় শেষ হইয়াছে। ডালিয়া, গাঁদা,

প্রভৃতি বীজ এখন বপন করা যায়, শীতের মরশুমী ফুল-বীজ বপনের জন্য এই সময় হইতে জমি প্রস্তত রাখা আবশ্যক।

বেল, যুঁই চামেলী, মল্লিকা জবা, রঙ্গণ, গোলাপ প্রভৃতি গাছের কাটিং (ডাল) মাটিতে পুঁতিয়া উহা হইতে চারা প্রস্তত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। জবা, করবী, চাঁপা, বক, টগর, বেল, রঙ্গণ, গোলাপ, প্রভৃতি সমুদয় ফুলের কলম এসময় লাগান চলে। ক্রোটণ, পাম্ ঝাউ প্রভৃতি বাহারী গাছও এসময় লাগাইতে পারা যায়।

ঘাস—

পশু খাদ্যের জন্য রিয়ানা, দেধান, লুসান, গিনিঘাস, বোরু, ম্যাঙ্গোল্ড প্রভৃতির বীজ এ সময়ে বপন করিতে পারা যায়।

অন্যান্য—

তামাক ও ভুট্টার বীজ এই সময় লাগাইবে; ঈগ্নাচালপীস্ ডোডোনিয়া ভিস্কোলা, ইরিথিনা ইণ্ডিকা, এ্যাকাসিয়া এ্যারবিকা, লপেনিয়া এ্যাল্‌বা বেড়ার বীজ এই সময় লাগান চলে। ইউক্যালিপ্‌টাস, গোল্ডমোহর, সেগুণ, রেণট্রি, মেহগ্নি, শিশু প্রভৃতি আয়কর বৃক্ষের বীজ হইতে এই সময় চারা প্রস্তত করা চলে।

পাট চাষের সরকারী পূর্ব্বাভাষ সম্পর্কে পাট ব্যবসায়ী মহলে অসন্তোষ।

পাট চাষের পূর্ব্বাভাষ সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তির প্রতিবাদ কল্পে কলিকাতা বেল্‌স্ জুট এ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির সম্পাদকের নিকট এক পত্র লিখেছেন। তাহাতে তাঁরা পাটচাষ সম্পর্কে সরকারী হিসাবের ত্রুটির উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর পাট চাষ কম হয়েছে এই মর্ম্মে সরকার যে বিবরণী প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁরা আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে, তাঁরা যতখানি তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে তাঁদের নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর মোটমাট পাটের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে; সুতরাং তাঁরা আশা করেছিলেন যে সরকারী বিবরণীতে সেই রকমই লিপিবদ্ধ হ'বে। কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক পাট চাষ হ্রাস প্রাপ্তির এই বিবরণ প্রকাশে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন।

সরকারী বিবরণে ঘোষিত হয়েছে যে প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগে এবার পাট চাষ হ্রাস পেয়েছে; কিন্তু উক্ত এ্যাসোসিয়েশনের হিসাব মত ঐ দুই বিভাগদ্বয়ে এবার পাট চাষ শতকরা কুড়ি ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আসামে পাট চাষের হিসাব সম্পর্কে যে সরকারী তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সেটা সত্য নয়। ১৯৩৬ সালের সরকারী শেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল যে ১৪০,৩০০ একর জমিতে পাট চাষ চলেছিল, কিন্তু এ বছরের বিজ্ঞপ্তিতে সেটাকেই ১৫৭,৫০০ একর বলে ধরা হয়েছে। বাজারে আসাম

থেকে যে পরিমাণ পাট এসেছিল তাতে ঐ শেষোক্ত হিসাবটা মিথ্যা বলেই মনে হয়; তবুও সরকার পূর্ব্ব বছর অপেক্ষা এবছর আসামে পাট চাষ কম হয়েছে কেন যে বলছেন তা তারা ধারণা করতে অক্ষম। বিহার সম্পর্কেও ঠিক অনুরূপ ভুল করে ১৯৩৬ সালের ২১০,০০০ একর পাট চাষের জমিকে বর্ত্তমান বিজ্ঞপ্তিতে ৪৬৩,০০০ একর বলে ধরা হয়েছে। এ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য এই যে, পূর্ব্ব বছরের ঐ রকম ভুল হিসাব উদ্ধৃত করেই বর্ত্তমান বিজ্ঞপ্তিতে এ বছর পাট চাষ কম হয়েছে বলে দেখানো হচ্ছে; সুতরাং সেণ্ট্রাল জুট কমিটীর নিকট তাদের দৃঢ় দাবী এই যে, সরকার যেন বর্ত্তমান বিজ্ঞপ্তির হিসাবকে সংশোধন করে এসম্পর্কে সঠিক বিবরণ প্রকাশ করেন।

এই পত্র প'ড়ে আমরা স্তম্ভিত হ'য়েছি। Calcutta Baled Jute Association এই পত্রে সরকারী ঘোষণার সম্বন্ধে যে বিবরণ বাহির করিয়াছেন তাহা গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে যেমন damaging তেমন অনাস্থা জ্ঞাপক। সরকারী কৃষিবিভাগের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা উচিৎ এবং তাঁহারা যে মিথ্যা ফিগার প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে ভ্রান্তপথে চালিত করেন নাই তাহা প্রমাণ করা উচিত এবং পাট ব্যবসায়ী-দিগের উক্তি অসত্য হইলে তাহাদিগের নামে ড্যামেজ আনা উচিত। পাটের চাষ পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে ঘোষণা করিলে পাট চাষীরা ব্যস্ত হইয়া কমদামে পাট ছাড়িয়া দিতে প্রবৃদ্ধ হইবে। আর পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা পাট চাষ যদি কম হইয়া থাকে বলিয়া ঘোষিত হয় তাহা হইলে পাট-চাষীরা কমদামে পাট ছাড়িয়া দিতে রাজী হইবে না। পাট চাষ খুব বেশী হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা পাট ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থের অনুকূল। কিন্তু তাহাদের ঘোষণার উপর কেহ আস্থা স্থাপন করিবে না। কিন্তু সরকারী কৃষি বিভাগের ঘোষণার উপর সকলেই আস্থা রাখে এই জন্য যে, সেখানে লোকে সঠিক খবর পাইবে। সঠিক না পাইলেও তাহাদের ঘোষণা যে কোনও অভিসন্ধি-মূলক নহে ইহাই লোকে আশা করে।

এইজন্য পাটের সরকারী পূর্ব্বাভাষ জানার জন্য লোকে এত উদ্‌গ্রীব থাকে। এখন সেই সরকারী ঘোষণাটাকেই যদি মিথ্যা বলিয়া প্রচার করা হয় তবে কৃষিবিভাগের মান, মর্য্যাদা এবং ইজ্জৎ থাকে কোথায়? আমরা কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নব-প্রস্তাবিত বীমা আইন

এজেণ্টদিগের কমিশনের সীমা নির্দ্দেশ এবং ভারতীয় নবজাত বীমা কোম্পানী সমূহ

নিউ ইণ্ডিয়া'র মিঃ ডাক্ আমাদের নিকট উক্ত বিষয়ে একটী সুচিন্তিত সারগর্ভ প্রবন্ধ (ইংরাজী) পাঠাইয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার প্রয়োজনীয় অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।—

নব প্রস্তাবিত বীমা আইনের ৩৩ (২) সংখ্যক ধারা লইয়া খুব তর্ক বিতর্ক উঠিয়াছে। এই ধারাতে এজেণ্টদের কমিশনের সীমা নির্দ্দেশ বিষয়ে বিধান দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক এই ধারাটী সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক এবং ইহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমতঃ ব্রাঞ্চ আফিসের এলেখার বাহিরে যে সকল এজেণ্ট কাজ করেন, তাহার জন্য চীফ এজেণ্টকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে, সাধারণ বীমার অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর বীমায় কমিশনের হার নানা রকমের হইয়া থাকে। লাইফ, ফায়ার, মেরিন এবং মজুরদের ক্ষতি পূরণ সম্বন্ধীয় বীমায় যে এক রকম হারে কমিশন দেওয়া যাইতে পারে না,—এ কথা সকলেই বিনাতর্কে স্বীকার করিবেন।

এক্ষণে দেখা যাক্, নীতির দিক দিয়া এজেণ্টদের এই "কমিশন বাঁধিয়া দিবার" আইন কতদূর সঙ্গত। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত

দুইটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে,—(১) পলিসি-হোল্ডার বা বীমাকারীদের স্বার্থই সকলের উপরে (২) ভারতীয় বীমাকোম্পানী সমূহ অমিতব্যয়ীর মত উচ্চহারে কমিশন দিয়া দুর্ণাম কিনিয়াছে এবং বহুকাল পর্যান্ত তাহারা এই কমিশন খরচা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে নাই। বড় বড় কোম্পানী খুব মোটা রকমের কমিশন দিয়া বীমা সংগ্রহ করিয়া থাকে, এইজন্যই ছোট কোম্পানীগুলি কিছুই কাজ পায় না,—এই অভিযোগ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। নূতন প্রস্তাবিত বীমা আইন সম্পর্কে মন্তব্য সমূহের আলোচনার জন্য যে চারিটী কমিটী গঠিত হইয়াছিল, আমি তাহাতে সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলাম। সেই সকল কমিটীর অধিবেশনে আমি দেখিয়াছি, ছোট কোম্পানী সমূহের স্বার্থ অথবা দাবী যে উপেক্ষা করা হইতেছে, একথা সত্য নহে। পরন্তু, ইণ্ডিয়ান ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীজ্ য়্যাসোসিয়েশন (বোম্বাই) এবং ইন্সুর‍্যান্স লেজিস্‌লেসান কমিটী,- ইহারা ছোট কোম্পানী সমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ পরামর্শ দিয়াছেন এবং খুব জোরাল সুপারিশ করিয়াছেন। শেষোক্ত কমিটী ছোট কোম্পানী সমূহের এক প্রতিনিধি সংঘের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভাব অভিযোগ সমস্ত অবগত হইয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও এজেণ্টদের কমিশন ধরা-বাঁধার আইন করা সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। অবশ্য ইহা কেহ মনে করিবেন না যে, এই মতভেদ বড় কোম্পানী ও ছোট কোম্পানীর মধ্যে একটা সংগ্রাম।

কিছুকাল পূর্ব্বে দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান লাইফ য়্যাসুর‍্যান্স অফিসেজ্ য়্যাসোসিয়েশনের এক সভায় তাহার অধিকাংশ সদস্যের মতে কমিশন ধরা-বাঁধা করার বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এস্থলে উহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে,—উভয় প্রকার যুক্তিরই সাবধানে আলোচনা করিলে বিষয়টী পরিষ্কার হইতে পারে :—

স্বপক্ষে যুক্তি :—

(১) কমিশন ধরা-বাঁধা হইয়া গেলে দূষনীয় রিবেট্ প্রথা আপনা আপনিই উঠিয়া যাইবে। এই রিবেট্ দেওয়ার রীতি বীমা ব্যবসায়কে নষ্ট করিয়া দিতেছে। নব প্রস্তাবিত আইনেও তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(২) যে সকল কোম্পানী কারবার ফাঁদিয়া বসিতে অথবা কারবার বাড়াইতে খরচের কোন পরোয়া করেনা, কমিশন ধরা বাঁধা হইলে তাহারা একটু বাধা পাইবে,—সে দেশী কোম্পানী হউক,—অথবা বিদেশী কোম্পানীই হউক

(৩) ভারতীয় কোম্পানী সমূহ খরচের অনুপাত কিছুতেই কমাইতে পারিতেছে না। এজেণ্টদের কমিশন নিয়ে সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেলে এই বিষয়ে ভারতীয় কোম্পানী সমূহের বিশেষ সাহায্য হইবে। পলিসি হোল্ডার এবং অংশীদারদের স্বার্থের দিক দিয়া ইহা অতিপ্রয়োজনীয়।

(৪) এজেণ্টগণ সাধারণতঃ নিজ নিজ কোম্পানীর গুণগান করিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোম্পানীর কুৎসা রটাইয়া থাকেন। কমিশন ধরা-বাঁধা হইয়া গেলে এই কদর্য্য অভ্যাসটী দূরীভূত হইবে, বিশেষতঃ যে সকল এজেণ্ট উচ্চতম কমিশন পাইবেন, তাঁহাদের মধ্যে এই দোষটী আর থাকিবেনা।

(৫) কমিশন সীমানির্দ্দিষ্ট হইয়া গেলে, বীমা ব্যবসায়ের অনেক অপ্রীতিকর ও অবিশ্বাস-জনক ব্যাপার দূরীভূত হইয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—যে সকল কোম্পানী খুব উচ্চহারে অতিরিক্ত পরিমাণ কমিশন দেয়, তাহাদের প্রিমিয়ামের হারও অত্যন্ত অধিক,- তাহা না হইলে কমিশন দিবেন কোথা হইতে? প্রিমিয়ামের হার বেশী চড়া হইলে বীমার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ থাকেনা।

বিপক্ষে যুক্তি;—

(১) কোম্পানী ও তাহার এজেন্টের মধ্যে পারিশ্রমিক সম্বন্ধীয় কোন কথাবার্ত্তায় গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

(২) এই আইন-ভঙ্গ করিবার অনেক ফাঁক ফন্দী রহিয়াছে।

(৩) যদি ব্যয়ের সীমা নির্দ্দেশ করাই অভিপ্রেত হয়, তবে কেবলমাত্র কমিশন বাবদ খরচা ধরা-বাঁধা না করিয়া সমগ্র ব্যয়েরই সীমা নির্দ্দেশ করা উচিত।

(৪) যদি গভর্ণমেণ্ট এজেন্টদের কমিশনের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেন,—তবে ইহাও গবর্ণমেণ্টের দেখা উচিত যেন প্রিমিয়ামের হার অতিরিক্ত ও অসঙ্গত না হয়।

(৫) কমিশনের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, ছোট-খাট ভারতীয় কোম্পানী সমূহের বিশেষ ক্ষতি হইবে।

স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর আর টিকা টিপ্পনীর দরকার নাই। তবে বিপক্ষীয় যুক্তি সমূহ আর একটু বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ আইন ভঙ্গ সম্বন্ধে দেখা যাক্। কোম্পানীর ডাইরেক্টর ও কর্ম্মচারিগণ জরিমানা দিয়া দুর্ণামের ভাগী হইতে চাহিবেন না,—একথা নিশ্চয়। যদি কেহ আইন ভঙ্গ করিয়া এজেন্টদিগকে বেশী কমিশন দেন, তাহা হইলে উহা ধরা পড়িবেই,—যতই চাতুরী করুন না কেন। বিদেশী কোম্পানী ভারতের বাহিরে এজেন্টদিগকে অতিরিক্ত কমিশন দিতে পারেন। গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে কোন কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেসান নাকচ করিতে পারেন,—এইরূপ বিধান থাকিলে কেহ আইন ভঙ্গ করিতে সাহসী হইবে না।

মোট ব্যয়ের সীমা নির্দ্দেশ করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু তাহারও কয়েকটা দোষ আছে। প্রথমতঃ কোন কোম্পানী সুদক্ষ ও ব্যয় বহুল পরিচালনা করিয়াও তাহার প্রতিযোগী কোম্পানী অপেক্ষা সচ্ছল অবস্থায় থাকিতে পারে,—যদি তাহাকে দাবীর পরিমাণ বেশী দিতে না হয়। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন কোম্পানী বাছাই করিয়া এমন সব বিশেষ বিশেষ রকমের বীমার কারবার করেন, যাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে সেই কোম্পানীর পরিচালনা খরচা বেশী হইলেও তাহা সমর্থন করা যায়। তৃতীয়তঃ পরিচালনা খরচ আইনের দ্বারা ধরা বাঁধা হইয়া থাকিলে, প্রিমিয়াম আয়ের কমতি বাড়তির দরুণ কোম্পানীর অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠে। ধরুন, যদি এক লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম আয় হয়, তবে শতকরা ১৫ টাকা হারে, পরিচালনা খরচা ১৫ হাজার টাকা হইয়া যাইবে। যদি ভাল এজেন্ট না থাকার দরুণ, অথবা পুনর্ব্বীমা না হওয়াতে, অর্দ্ধেক কারবার নষ্ট হয়, তবে প্রিমিয়ামের আয় দাঁড়াইবে ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু পরিচালনা খরচা সঙ্গে সঙ্গে কমান যাইবে না,—সেই ১৫ হাজার টাকাই থাকিবে। সুতরাং পরিচালনা খরচার হার দাঁড়াইল,—শতকরা ১৫ টাকার স্থলে,—শতকরা ৩০ টাকা।

ছোট খাট ভারতীয় কোম্পানীর মালিকগণ বলিয়া থাকেন, বড় কোম্পানী সমূহ যে হারে তাহাদের এজেন্টদিগকে কমিশন দিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা উচ্চ হারে কমিশন দিতে না পারিলে ছোট কোম্পানীর পক্ষে এজেন্ট পাওয়া দুঃসাধ্য। তাঁহারা আরও বলেন, তাঁহাদের পরিচালনা খরচা খুব কম,—সুতরাং তাঁহারা যদি বেশী কমিশন দিয়াই এজেন্ট নিযুক্ত করেন, তবে তাহা দোষের বলা যায় না। কিন্তু এই কথা কতদূর সত্য তাহাও পরীক্ষা করে দেখা উচিত। নানা কোম্পানীর হিসাব আলোচনা করিয়া দেখা যায়, বড় বড় কোম্পানীর পরিচালনা খরচ শতকরা ১২ টাকা হইতে শতকরা ২৩ টাকা পর্য্যন্ত হয়। পক্ষান্তরে ছোট ছোট ছোট কোম্পানী পরিচালনা বাবদে শতকরা ২৩ টাকা হইতে শতকরা ৫০ টাকা পর্য্যন্ত খরচ করে। এই বিষয়ে কোন শেষ সিদ্ধান্ত করিতে হইলে কোম্পানীর বয়সও ধরিতে হইবে। ছোট কোম্পানী সমূহকে সাহায্য করিতে সকলেই একমত,—কিন্তু অনেক ছোট কোম্পানী পলিসি হোল্ডার এবং অংশীদারদের স্বার্থ রক্ষা বিষয়ে মনোযোগী হন নাই,—ইহাও একটি সমস্যা।

ইয়ং লাইফ অফিসেস্ লেজিস্লেশন কমিটি গভর্ণমেণ্টের নিকট যে মন্তব্য-লিপি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা কমিসনের সীমা

নির্দ্দেশে আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মোট খরচা কমানই আসল কাজ।

আমার মত এই যে, কমিশনের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে ভারতীয় কোম্পানী সমূহের বিশেষ সাহায্য হইবে; পরোক্ষে উহাতে পলিসি হোল্ডার ও অংশীদারগণেরও স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে।

নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্নেরও আলোচনা দরকার;—

(১) ছোট কোম্পানী কোন্ গুলি? এবং বড় কোম্পানীই বা কোন গুলিকে বলিতে হইবে?

(২) কমিশন ধরা বাঁধা হইলে, বড় কোম্পানী উচ্চতম কমিশন দিতে রাজী হইবেন কিনা?

(৩) ছোট কোম্পানীতে পুনর্ব্বীমা কতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে?

(৪) কোম্পানীর কাজের প্রথম ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কমিশন ধরা বাঁধা না করিয়া দিলে চলে কিনা?*

* এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে অনেক স্থলে লেখকের সহিত আমাদের মতভেদ থাকিলেও মিঃ দাফের ন্যায় বিশিষ্ট বীমাকর্ম্মীর মতামত সকলেরই প্রণিধানযোগ্য বলিয়া আমরা এখানে উহা আমূল প্রকাশ করিলাম। সম্পাদক।
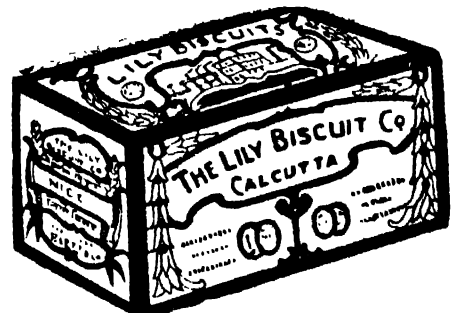
ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের নূতন কাজের পরিমাণ

—*—

আমরা নিম্নলিখিত ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের হাল-তক এক বৎসরের নূতন কারবারের পরিমাণ প্রকাশ করিলাম। তাহার সঙ্গে তুলনার সুবিধার জন্য পূর্ব্ববৎসরের কারবারের পরিমাণও দেওয়া হইল। এই সকল অঙ্কের মধ্যে কোথায়ও কোন ভুল ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে। এরূপ কোনও ভুল দেখিতে পাইলে তাহা আমাদিগকে জানাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যায় সংশোধিত figure বাহির করিব

কোম্পানীর নাম	যে তারিখে বৎসর শেষ	নূতন কারবার হাজার টাকা	পূর্ব্ব বৎসরের নূতন কারবার হাজার টাকা
অল্ ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্	৩১ ১২ ৩৬	১৯১১	১৮০২
অন্ধ্র	৩১ ৩ ৩৭	৩৩০০	২৭১০
আর্য্যস্থান	৩১ ৩ ৩৭	১০২৬	৯০২
এশিয়া মিউচুয়াল	৩১ ৭ ৩৬	১০০০	০
এশিয়ান	৩১ ১২ ৩৬	৭২০১	৭৬৫৫
এশিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট	৩১ ১২ ৩৬	২৮১৭	২১১০
বেঙ্গল ইন্সিওর‍্যান্স	৩১ ১২ ৩৬	১০১৪	৭০৬
ভারত	৩১ ১২ ৩৬	১০০০০	০
ভাবতী বীমা	৩১ ১ ৩৭	৮০৫	প্রথম বৎসর
ভাগ্যলক্ষ্মী	৩১ ৩ ৩৭	১০০৪	৮১৭
বম্বে কো-অপারেটিভ্	৩০ ৬ ৩৬	১৩১৯	১০১৭
বম্বে লাইফ্	৩১ ১২ ৩৬	১৩৬০০	১২৩০০
বম্বে মিউচুয়্যাল	৩১ ১২ ৩৬	২০১৫০	১৮৬০০
ক্যালকাটা	৩১ ১২ ৩৬	২০৭২	২০১৮
কমন ওয়েলথ্	৩০ ৪ ৩৭	৩২২৪	২৮১৬
ইষ্ট ইণ্ডিয়া	৩০ ৬ ৩৬	৪০৩	০
ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট	৩১ ১২ ৩৬	৩৬১৮	৩৫০৫
এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া	২৮ ২ ৩৭	১৮৭০০	১৫৭০০
ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল	৩১ ৩ ৩৭	১৬২১	১৪৯৭
জেনারেল	৩১ ১২ ৩৬	৫১২৬	৪৫৯৯
জেনুইন	৩১ ১২ ৩৬	১২১০	৮০৮
গার্জ্জিয়ান্ অব ইণ্ডিয়া	৩১ ১২ ৩৬	৩৬৫২	৩৫৫৪
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্	৩০ ৪ ৩৭	২৭৫০০	২৩৫০০
হিন্দুস্থান মিউচুয়্যাল	৩১ ১২ ৩৬	৬০৬	প্রথম বৎসর
আইডিয়্যাল ডিমক্রেটিক	৩০ ৬ ৩৬	১৩৩	০

কোম্পানীর নাম	যে তারিখে বৎসর শেষ			নূতন কারবার হাজার টাকা	পূর্ব্ব বৎসরের নূতন কারবার হাজার টাকা
ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্	৩১	১২	৩৬	৩৫১৮	৩৩১৯
ইণ্ডো এশিয়াটিক্	১৭	২	৩৭	৭০০	৬০১
ইণ্ডিয়ান্ মার্কেণ্টাইল	৩১	১২	৩৬	১৬৩২	১১১২
ইণ্ডিয়ান মিউচুয়্যাল	৩১	১২	৩৬	১৫১০	১১৯৭
ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ্	৩১	১২	৩৬	৪২৩	প্রথম বৎসর
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল য়্যাণ্ড প্রুডেন্সিয়্যাল্	৩১	১২	৩৬	৯১৮০	৮৩৫৩
জাতীয় কল্যাণ	৩১	৩	৩৭	৯০৯	০
জুপিটার	৩০	৬	৩৬	১৬২৯	১৪৮৪
লক্ষ্মী	৩০	৪	৩৭	১৫০০০	১৪০০০
মহাবীর	৩১	৫	৩৬	৯২৩	০
মেট্রোপলিটান	৩১	৩	৩৭	৭২৮০	৭০১৯
মহীশূর	৩১	১২	৩৬	৮৬২	৫০০
নাগপুর পাইয়োনিয়ার	৩১	১২	৩৬	১০০০	৮৫৩
ন্যাশন্যাল	৩১	১২	৩৬	১৭৭০০	১৭৩০০
ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান	৩১	১২	৩৬	৫০১৫	৪৩৩২
নেপ্চুন্	৩০	৬	৩৭	মে মাস পর্য্যন্ত ২২০০ এর উপর	২৬৮৪
নিউ এশিয়াটিক্	৩১	১২	৩৬	৩০৬৭	২৫০১
নিউ ইণ্ডিয়া	৩১	৩	৩৭	১৬৭০০	১৭৬০০
নিউ ইন্সুর‍্যান্স	৩০	৪	৩৭	২৪০০	১৯০০
ওরিয়েণ্ট্যাল	৩১	১২	৩৬	১০২৬০০	৮৯০০০
পপুলার	৩১	১২	৩৬	৭১৫	৬১১
সেন্টীনেল (১৫ মাস)	৩১	১২	৩৬	১০০৫	১১৪০
সাভ্যাণ্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া	৩১	৩	৩৭	১৩৫০	১৯২০
শ্রী লাইফ	৩১	১২	৩৬	৬৬৩	০
সাউথ ইণ্ডিয়া কো-অপারেটিভ্	৩০	৬	৩৭	১২০০	১০৯৯
ট্রপিক্যাল	৩১	১২	৩৬	৪১০০	৩৭০১
ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া	৩১	১২	৩৬	৯০০৮	৮৫৮৮
ইউনিক্	৩১	৫	৩৬	১৬৩৬	২১০২
ওয়ার্ডেন	৩১	১২	৩৬	৩৫০০	২৮০০
ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া	৩১	১২	৩৬	৬৬৩২	৫১৩০
জেনিথ্	৩১	১২	৩৬	৩৩২০	৩৩৭৯

ওরিয়েণ্ট্যালের রাজসাহী ব্রাঞ্চ

বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে মিঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী বি এ, সকলের নিকট সুপরিচিত। তিনি ওরিয়েণ্ট্যালের একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী। সম্প্রতি তিনি উক্ত কোম্পানীর রাজসাহী ব্রাঞ্চের সেক্রেটারীর পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। তদুপলক্ষে গত ২৭ এ জুন আফিসের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে এক বিশেষ সভায় অভিনন্দিত করেন। রাজসাহীর প্রাচীন ও প্রবীণ জননায়ক, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুত কিশোরী মোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল মহাশয় সেই প্রীতিকর অনুষ্ঠানের পৌরহিত্যে বৃত হন। সরকারী উকীল, রায় বাহাদুর এস্ এন ভায়া, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জীনীয়ার মিঃ বি এন্ ভাদুরী, ট্রেজারী অফিসার মিঃ পি আর দাসগুপ্ত, ইঞ্জীনীয়ার মিঃ এন সি সেন, জমিদার হাজী এস্ রহমান, সিবিল সার্জ্জন ডাঃ এস্ সি সেন, অধ্যাপক মিঃ বি কে ব্যানার্জ্জি, ব্যবসায়ী মিঃ এইচ এন্ ব্যানার্জ্জি জমিদার মিঃ রণজিত সরকার, মাদ্রাসার মৌলবী জেড হক, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের এজেণ্ট মিঃ এস্ সি সেন গুপ্ত প্রভৃতি বহুগণ্য মান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অভিনন্দনের উত্তরে মিঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী বীমা-ব্যবসায় ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করা সম্বন্ধে একটী সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম দেওয়া হইল ;—

"কর্ত্তব্য সম্পাদনই জীবনের যথার্থ সফলতা। এই কর্ত্তব্য বলিতে বুঝায় নিষ্কাম কর্ম্ম। সকলেই সফলতা লাভের আশা করেন, কিন্তু সকলের ভাগ্যে সফলতা ঘটেনা। যাঁহাদের ইচ্ছা শক্তি প্রবল ও অদমনীয়, কেবলমাত্র তাঁহারাই সফলতা লাভ করিতে পারেন। আত্মবিশ্বাস এবং ভবিষ্যতের দিকে আশাপূর্ণ দৃষ্টি না থাকিলে অগ্রসর হওয়া যায় না। দুঃখে দুর্দ্দশায় ও বাধা বিঘ্নে নিরাশা আসিলে সফলতা লাভের পথ অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

মিঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী

উৎসাহ ব্যতীত কার্য্য সিদ্ধি হয় না। সকল মহৎ কার্য্যের পশ্চাতে রহিয়াছে অদম্য উৎসাহ। কর্ম্মের প্রতি একান্ত অনুরাগ থাকা আবশ্যক। কাজকে নিজের প্রাণের মত ভালবাসিতে হয়। কর্ম্মশক্তি পরীক্ষার জন্যই বাধা বিঘ্ন আসে। আত্ম বিশ্বাসে বলবান হইয়া দাঁড়াইলে সেই সকল বাধাবিঘ্ন চুর-মার হইয়া যায়। উৎসাহ

থাকিলেই সাহস ও বিশ্বাস আসে। সফলতা লাভের প্রধান শত্রু ভয় ও অস্থিরতা। ইহাতে উচ্চাভিলাষ নষ্ট করিয়া দেয়। "হবেনা, হবেনা" এই রকম চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। নীল চশমার ভিতর দিয়া কাজের দিকে চাহিবেন না এবং কাল্পনিক বাধা বিঘ্নে অস্থির হইবেন না। যখন বাস্তবিকই বাধা আসে, তখন সাহস বিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তাহাকে অতিক্রম করা কঠিন নহে।

কার্য্যে সফলতা লাভের আর একটী উপায়, অন্যকেহ বলিয়া দিবার পূর্ব্বে নিজের বুদ্ধিতে উপযুক্ত কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া। পরিষ্কার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এবং সচল কল্পনা শক্তি হইতেই এই প্রকার গুণের উদ্ভব হয়। যাহারা সফলতা কামনা করেন, তাঁহারা মনে মনে এই সকল প্রশ্নের আলোচনা করিবেন,—আমরা কি উন্নতি করিতেছি? প্রতিবৎসর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আমরা কি অধিকতর যোগ্য হইতেছি? আমরা কি পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এখন অধিক বেতন পাইতেছি? যদি না পাইয়া থাকি, তবে তাহা কার দোষে?

আমরা সকলেই চারি পাঁচ বৎসর পরে বেতন বৃদ্ধি চাই। কিন্তু আমরা নিজেকে তাহার যোগ্য করিতে মনোযোগী হইনা। কেবলমাত্র দীর্ঘকাল চাকুরী করিলেই আমরা বেশী বেতন পাইতে পারি না। আমাদিগকে কাজ দেখাইতে হইবে। কার্য্যে বিফলতা আসিলেই বুঝা যায়, ভিতরে কোন দোষ নিশ্চয়ই আছে। অলস লোকেরাই নিজের দোষ অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপায়। দৈবের উপর সফলতা নির্ভর করে না,—নির্ভর করে পুরুষকারের উপর।"

শ্রীযুত হরিপদ বাবুর বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে সুযুক্তি পূর্ণ অল্প কথায় আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক বক্তৃতা করেন। তিনি হরিপদ বাবুর নানা গুণের বিষয় আলোচনা করিয়া বলেন, ওরিয়েণ্ট্যাল এই রকম যোগ্য লোকের হাতে কার্য্যভার দিয়াছে বলিয়াই আজ বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে।

সভা শেষে অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে প্রচুর জলযোগে পরিতৃপ্ত করা হয়।

গভর্ণমেণ্ট এ্যাকচুয়ারী নিয়োগ সম্বন্ধে পণ্ডিত শান্তানমের প্রস্তাব

ইণ্ডিয়ান লাইফ য়্যাস্যুর‍্যান্স অফিসেস্ য়্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত কে, শান্তনম্ ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট এই মর্ম্মে এক চিঠি লিখিয়াছেন যে, নব প্রস্তাবিত বীমা আইনে এরূপ একটী ধারা আছে যে, গভর্ণমেণ্টের বীমা বিভাগের পরিচালনার জন্য সর্ব্বোপরি একজন সুপারিণ্টেডেণ্ট থাকিবেন। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট য়্যাক্চুয়ারীর মৃত্যু হওয়ায় হয়ত উক্ত সুপারিণ্টেডেণ্টের পদে ও য়্যাকচুয়ারীর পদে একই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হইতে পারে। বীমা বিভাগের কার্য্য গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ;—ইহাতে ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল, জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন; এবং সকলের বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র উচ্চ গুণ-পণা ও বিদ্যাবত্তার দ্বারাই এই পদের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। সুতরাং ইণ্ডিয়ান লাইফ য়্যাস্যুর‍্যান্স অফিসেস্ য়্যাসোসিয়েশনের অভিমত এই যে, এই পদে একজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হউক। ভারতীয়দের মধ্যে বীমা বিদ্যায় পারদর্শী এবং শ্রেষ্ঠ গুণী ব্যক্তির অভাব নাই। তাঁহারা যেরূপ দক্ষতার সহিত বীমা বিভাগ পরিচালিত করিতে পারিবেন, অ-ভারতীয় ব্যক্তি সেরূপ পারিবেন না। উক্ত সুপারিণ্টেডেণ্টের পদে যিনি নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে যে য়্যাক্চুয়ারী হইতে হইবে, এমন কোন কথা নয়। য়্যাক্চুয়ারীর বিদ্যা ও গুণপণা যদি তাঁহার থাকে, তবে ভালই,—না থাকিলে তাঁহার অধীনস্থ একজন য়্যাক্চুয়ারী তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন।

পণ্ডিত কে, শান্তনম্

গ্রেট ইণ্ডিয়ার দায় দেনার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া জাতীয় কল্যাণ বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই কার্য্যের দ্বারা জাতীয় কল্যাণ বাঙ্গালীকে এক লজ্জাজনক কলঙ্কের ছাপ হইতে বাঁচাইয়াছে। সেইজন্য জাতীয় কল্যাণের উন্নতিতে আমরা বিশেষ আনন্দিত হই। গত ২৫শে জুন এলাহাবাদ সহরে জাতীয় কল্যাণের যুক্ত প্রদেশস্থ (পূর্ব্বাংশের) চীফ এজেন্সির আফিস খোলা হইয়াছে। তদুপলক্ষে যে সভার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে মেট্রোপলিটানের মিঃ এ মুখার্জ্জী, ইণ্ডিয়া ইকুইটেবলের মিঃ বসু, ডাঃ

কে ঘোষ, ডাঃ এল এম বসু প্রভৃতি শতাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। জাতীয় কল্যাণের অফিসিয়েটিং জেনারেল ম্যানেজার ও ডাইরেক্টর মিঃ এন্ এন্ ব্যানার্জ্জী উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন।

—✻—

অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানী কলিকাতায় একটি চীফ এজেন্সী আফিস খুলিয়াছেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই আফিসের এলেকা ভুক্ত হইবে। মেসার্স কে ডি মুখার্জ্জী এণ্ড কোং ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

—✻—

ওয়েল্‌থ অব ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ নির্ম্মলচন্দ্র গুহ বহুকাল যাবৎ স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন। কোম্পানী পুনরায় মিঃ গুহের মত সুদক্ষ এবং উৎসাহী কর্ম্মীর সাহায্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়াতে, আমরা আনন্দিত হইলাম।

—✻—

"নিউ ইণ্ডিয়া"র মিঃ বি কে সাহা এ আই এ, লণ্ডনের ইন্‌ষ্টিটিউট অব য়্যাক্‌চুয়ারিস্ এর শেষ পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। ইহা অতি আনন্দের বিষয় যে, ভারতীয়দের মধ্যে যাঁহারা এফ্ আই এ উপাধি লাভ করিয়াছেন, মিঃ সাহা তন্মধ্যে তৃতীয়। তিনি কিছুকাল হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভেও কার্য্য করিয়াছেন। গত বৎসর তিনি নিউ ইণ্ডিয়ায় যোগ দেন। আমরা মিঃ সাহা ও নিউ ইণ্ডিয়া উভয়কেই অভিনন্দিত করিতেছি।

—✻—

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর যুক্ত প্রদেশের কার্য্যের জন্য মেসার্স মুখার্জ্জী এণ্ড কোং এজেন্সি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—✻—

মিঃ পি এন তালুকদার এম্ এ (ক্যান্‌টাব্) হিন্দুস্থানের হেড আফিসের কর্ম্মচারী রূপে যোগ দিয়াছেন। মিঃ তালুকদার ১৯৩৪ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতি শাস্ত্রে (Economics) এ ট্রাইপোস্ পান। তারপর প্রায় দুই বৎসর যাবৎ তিনি মিডল্যাণ্ড্ ব্যাঙ্কে হাতে কলমে কাজ শিখেন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি প্রথমতঃ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার বোম্বাই আফিসে নিযুক্ত হন। এক্ষণে তিনি হিন্দুস্থানে যোগদান করিলেন।

—✻—

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি, হিন্দুস্থানের ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট্ ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারী পাঁচুলাল মিত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আফিসের কার্য্য অর্দ্ধদিন বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

—✻—

রাইটার্স্ বিল্ডিংএতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের আফিস গত ১২ই জুলাই হইতে ৩।২ ডালহৌসী স্কোয়ার (ইষ্ট), কলিকাতা এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

—✻—

১৯৩৭ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে হিন্দুস্থানের নূতন বীমার পরিমাণ হইয়াছে পৌণে তিন কোটী (২·৭৫) টাকা।

আমরা অবগত হইলাম, ইতিমধ্যে আরও প্রায় ৮ লক্ষ টাকার কারবার হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে নূতন কারবারের পরিমাণ ছিল ২·৩৫ কোটী টাকা। হিন্দুস্থানের এই উন্নতিতে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু এই সম্পর্কে মামুলী আনন্দ প্রকাশ ব্যতীত আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। যাঁহারা কোন বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে যা'ন তাঁহাদের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের একটা কুফল শেষে এই দেখা যায় যে, তাঁহারা সরিয়া গেলেই সেই প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়ে। এই নিয়মের ব্যতিক্রমই হিন্দুস্থানের বিশেষত্ব। বাংলা গভর্ণমেন্টের বর্ত্তমান অর্থসচিব মাননীয় মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার নানা বিপদসঙ্কুল অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়া হিন্দুস্থানকে আজ মহামহী-রুহে পরিণত করিয়াছেন। তিনি যখন হিন্দুস্থান হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন অনেকেই গতানুগতিক ভাবে আশঙ্কা করিয়া ছিলেন, হিন্দুস্থানের কাজের পরিমাণ এইবার হয়ত কমিয়া আসিবে। তাঁহারা জানেন না, হিন্দুস্থানের গঠনকর্ত্তা পূর্ব্ব হইতেই সে বিষয়ে সাবধান হইয়াছিলেন। বাস্তবিক একটি প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তোলা অপেক্ষা তাহাকে চিরকাল সমানভাবে রক্ষা করাই কঠিন কার্য্য। এইজন্য গঠনকর্ত্তা নিজের ব্যক্তিত্বের আওতায় প্রতিভার অঙ্কুরকে মারিয়া ফেলেন না। মাননীয় মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার হিন্দুস্থানের গঠন কার্য্যে এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মধ্য হইতে প্রতিভাসম্পন্ন যুবক এবং মহিলা কর্ম্মীদিগকে লইয়া তিনি হিন্দুস্থানের বনিয়াদ তৈয়ারী করেন। আজ তাঁহারা এমন সুশিক্ষিত, সুদক্ষ এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন যে গঠনকর্ত্তা সরিয়া দাঁড়াইলেও তাঁহারা হিন্দুস্থানের গৌরব ও উন্নতি অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

ইকুইটী ইনসিওরেন্স কোম্পানী জোরহাটে (আসাম) একটি ব্রাঞ্চ আফিস খুলিয়াছেন। মিঃ পুষ্পধর চালিহা ইহার পরিচালনা ভার লইয়াছেন। সমগ্র আসাম উপত্যকা এই আফিসের এলেকা ভুক্ত হইবে।

করাচীর প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স সোসাইটী কলিকাতায় "ভারত ভবনে" একটি ব্রাঞ্চ আফিস খুলিয়াছেন। করাচী সহরের মেয়র দেওয়ান দুর্গারস বি অদ্বানী মহাশয় এই কোম্পানীর পরিচালক। কলিকাতার ব্রাঞ্চ আফিসের ভার লইয়াছেন মিঃ ডি কে সিওলানী।

ইনসিওরেন্স বিল সম্পর্কে মিঃ সুশীলচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার (কেন্দ্রীয়) সদস্য রূপে মনোনীত হইবেন।

মিঃ এইচ কে নিয়োগী বি এ, বঙ্গলক্ষ্মী ইনসিওরেন্সের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিঃ রূপ নারায়ণ গাগর এম্ এ, বি কম, বি এল, হুকুমচাঁদ লাইফ য়্যাস্যুরেন্স কোম্পানীর এজেন্সি সুপারিণ্টেন্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিউ ইণ্ডিয়ার ক্রমোন্নতি

নিউ ইণ্ডিয়া হইতে গত বৎসর যখন ডাক্তার এস্ সি রায় কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসেন তখন তাঁহার সহিত অনেক দক্ষ এবং পুরাতন কর্ম্মীও নিউ ইণ্ডিয়া ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। ডাক্তার রায়ের সহিত তাঁহারাও আসিয়া ভারতে যোগদান করেন। নিউ ইণ্ডিয়ার পুরাতন কর্ম্মীদের মধ্যে কেবল ডাক্তার রায়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ মিঃ সুধীর চৌধুরী এবং প্রসিদ্ধ বীমা কেস্ সংগ্রাহক মিঃ যতীন ঘোষ

মিঃ ওয়াই, আর, প্যাটেল

নিউ ইণ্ডিয়া ছাড়িয়া আসেন নাই। কেস্ সংগ্রাহকদিগের মধ্যে ভাল ভাল কর্ম্মী চলিয়া যাওয়ায় সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে নিউ ইণ্ডিয়ার কাজের পরিমাণ এবার অনেক কমিয়া যাইবে। কিন্তু নিউ ইণ্ডিয়ার লাইফ বিভাগের ম্যানেজার মিঃ প্যাটেলকে যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা কখনও এ সন্দেহ মনে স্থান দেন নাই।

আফিসের কর্ম্মকর্ত্তার প্রকৃতির উপরেই কর্ম্মীদিগের কাজের সাফল্য নির্ভর করে। মিঃ প্যাটেলের প্রকৃতির মধ্যে আমরা যে সকল গুণ লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে কর্ম্মীগণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। সরল অমায়িক ব্যবহার, এজেণ্টদের দুঃখে কষ্টে আন্তরিক সহানুভূতি, দেনা পাওনার ব্যাপারে লোকের ন্যায্য গণ্ডা তড়িঘড়ি মিটাইয়া দিবার স্বভাব, কর্ম্মীদিগের ন্যায্য পাওনা এবং হক্ হইতে কাহাকেও বঞ্চিত না করা ইত্যাদি যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে বীমাকর্ম্মীরা একই আপিশে লাগিয়া থাকে এবং ঘন ঘন আপিশ চাখিয়া বেড়ায় না, মিঃ প্যাটেলের মধ্যে সেই সকল গুণ যথেষ্ট রহিয়াছে। অনেক আপিশে দেখিয়াছি এজেণ্ট দেখা করিতে গেলেই বড়কর্ত্তারা হঠাৎ অস্বাভাবিকরূপে গম্ভীর হইয়া উঠেন। কথা যাহা বলেন তাহা মাপা জোকা non-committal, হেঁয়ালীতে পূর্ণ এবং দৃষ্টিও সুপ্রসন্নত নয়ই, চস্‌মার কোন্ হইতে তির্য্যগ্ গতিতে সন্দেহ ও অবিশ্বাস বর্ষণ করিতে থাকে। এইরূপ আওতার মধ্যে এজেণ্টদের মনে কোনও ভরসা আসে না এবং প্রাণেও কোম্পানীর প্রতি কোনও দরদ বসে না। কিন্তু কোম্পানীর বড় কর্ত্তার প্রকৃতি যেখানে মধুর এবং ব্যবহারও সহৃদয়তা জ্ঞাপক, অথচ কর্ত্তব্যে কঠোর, সেখানে কর্ম্মীরা প্রাণ দিয়া কাজ করে।

মিঃ প্যাটেল এবং আপিশে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ মিঃ সুধীর চৌধুরী উভয়েরই মধ্যে এই সকল গুণ থাকায় নিউইণ্ডিয়ার কাজ ডাক্তার সুরেশরায় ছাড়িয়া গেলেও এবার নয় লক্ষ টাকারও উপর বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা নিউ ইণ্ডিয়ার এই সাফল্যে বিশেষ সুখী হইয়াছি।

"ভারত" বীমাকোম্পানীর বেঙ্গল ব্রাঞ্চের কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন

ডাক্তার এস, সি, রায়ের হঠাৎ মৃত্যুতে ভারতের বেঙ্গল ব্রাঞ্চের কর্ম্মচারী নিয়োগ লইয়া বীমা মহলে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। ভিন্ন ভিন্ন আফিসের পদস্থ বীমা কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেকে এই আকাঙ্ক্ষিত পদের প্রত্যাশায় বহুদিন ধরিয়া তদ্বির তাগাদা এবং আনাগোনা করিতেছিলেন। এতদিন পরে এ ব্যাপারের যবনিকাপাত হইয়াছে এবং সকল জল্পনা কল্পনার অবসান হইয়াছে। এই ব্যাপারের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য গত মাসে ভারতের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ পি, ডি খোসলা এম্-এ লাহোর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

১। মিঃ অশোক চ্যাটার্জ্জী কলিকাতা ব্রাঞ্চের চার্জ্জে—

২। মিঃ করুণা কুমার নন্দী আসানসোল ব্র্যাঞ্চের চার্জ্জে—

৩। মিঃ যোগেশ বসু ঢাকা ব্র্যাঞ্চের চার্জ্জে—

৪। মিঃ কে, জি, নিয়োগী জলপাইগুড়ী ব্র্যাঞ্চের চার্জ্জে—

মিঃ অশোক চাটার্জ্জী

মিঃ অশোক চ্যাটার্জ্জীকে কলিকাতা ব্রাঞ্চের সেক্রেটারীর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিয়োগ করায় সকলেই সুখী হইয়াছেন। অশোক চ্যাটার্জ্জী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবক এবং অক্সফোর্ড হইতে ইকনমিক্স্ এ উচ্চ উপাধি লইয়া আসিয়াছেন। তিনি বাংলা দেশের সাংবাদিক মহলে সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক এবং জননায়ক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃতী এবং সুযোগ্য পুত্র। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি "Welfare" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন এবং খুব যোগ্যতার সহিত তাহা পরিচালনা করিতে-ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে এখন সিনেমা (অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন যাহার নূতন নাম করণ করিয়াছেন SIN এর মা) ও ন্যাংটা ছবির যুগ। চারিদিকে কেবল লঘু সাহিত্য, এবং সেন্টিমেন্ট্যালিজমের প্লাবন। Serious study এবং Serious thinking যেন বাংলা দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। অশোক চ্যাটার্জ্জীর Welfare তাই নৃত্যগীত মুখর, চটুল-চঞ্চল, লীলায়িত ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার পর তিনি প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ খুব দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন। শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি এবং সামাজিক আভিজাত্যের দিক দিয়া অশোক চ্যাটার্জ্জী বর্ত্তমান যুগে বাংলাদেশে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাহার উপর সকলের সহিত অমায়িক ব্যবহারে এবং আলাপ আপ্যায়নে তিনি বীমাকর্ম্মীদিগের সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার ভিতর কোনও প্যাঁচোয়া বুদ্ধি এবং পরের ক্ষতি করার আন্তরিক প্রবৃত্তি নাই। লোকের সহিত ব্যবহারে—আমাদের আশঙ্কা হয় অশোক চ্যাটার্জ্জীই অনেক স্থানে হয়ত হাত ঝাড়িয়া পকেট খালি করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু কাহারও কষ্টার্জ্জিত অর্থ এবং ন্যায্য গণ্ডা তাঁহার প্ররোচনায় কিম্বা যোগ সহযোগে কখনও মারা যাইবে না। এরূপ লোককে কলিকাতা ব্রাঞ্চের মত সর্ব্বাপেক্ষা দায়িত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাইয়া ভারতের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা আশা করি এই যোগাযোগ উভয় পক্ষেরই বিশেষ কল্যাণের কারণ হইবে।

শেঠ রাধাকিষেণ ডালমিয়া

ভারতীয় শিল্পের নূতন নূতন পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শেঠ রাধাকিষেণ ডালমিয়ার নাম আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বস্তুতঃ বিরাট শিল্পাদি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আজ শেঠ রাধা কিষেণের নাম ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিহার এবং উত্তর ভারতের নানাস্থানে অতিকায় আয়তনের চিনির কল স্থাপন করিয়া শেঠজি সকলের বিস্ময়

রাধাকিষেণ ডালমিয়া

আকর্ষণ করেন। তারপর লালা হরকিষেণ লালের মানস পুত্র ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানী যখন হাইকোর্টের রিসিভারের Sale এ বিক্রয়ের জন্য উঠিল তখন রাধাকিষেণ ডালমিয়াই একাকী ১১ লক্ষ টাকায় ভারত ইনসিওরেন্সের মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া ল'ন। ভারত ইনসিওরেন্সকে করতলগত করার পরেই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাধা কিষেণ ডালমিয়ার নাম, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিদ্যুদ্গতিতে প্রচারিত হইয়া পড়িল। লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তিনি যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছিলেন সেই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি তখন দেশবাসীর নজর পড়িল এবং ভারতের শিল্প সাধনার যুগে এই নূতন সাধকের সন্ধান পাইয়া সকলেই মহা আশান্বিত হইয়া উঠিল। তা'রপর রাধাকিষেণ ডালমিয়া উত্তর ভারতে কতকগুলি সীমেণ্ট কোম্পানীকে একত্রিত করিয়া যে এক বিরাট Cement Merger এর ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাও তাঁহার অসাধারণ ব্যবসা বুদ্ধি, গঠন ও সৃজন শক্তির পরিচায়ক। এই সিমেণ্ট কোম্পানীর কার্য্য ব্যপদেশে শেঠজি সম্প্রতি করাচীতে গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া তিনি একটু অসুস্থ হইয়া পড়েন। স্থানীয় জনৈক ডাক্তার তাহাকে দেখিতে আসিয়া খুব আগ্রহের সহিত তাহার জন্য একটা সাময়িক ঔষধের ব্যবস্থা করেন এবং নিজেই তাঁহার ডিস্পেনসারী হইতে ঔষধ তৈরী করিয়া আনিয়া দেন। রাত্রিতে শয্যা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শেঠজী সেই ঔষধ এক দাগ সেবন করিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। ঘণ্টা খানেক পরে পেটে ও বুকে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করিয়া তিনি বিছানায় উঠিয়া বসেন। তখনই বড় বড় ডাক্তার ডাকা হইল। তাঁহারা আসিয়া ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে তাহাতে বিষাক্ত দ্রব্য রহিয়াছে। ভগবানের অসীম দয়ায় শেঠ রাধাকিষেণ এই আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তিনি একটু সুস্থ হইয়াই করাচী ত্যাগ করিয়া বোম্বাই চলিয়া যান। আমরা যতদূর জানি, এবিষয় লইয়া তিনি আর হৈ চৈ করিতে চা'ন নাই। ভারতের এই শিল্প জাগরণের দিনে শেঠ রাধাকিষেণের জীবন জাতীয় সম্পদ বলিয়া আমরা মনে করি। ভগবান তাঁহাকে একটি সতর্কবাণী পাঠাইয়াছেন। অতঃপর খাদ্য ও পানীয়াদি ব্যাপারে শেঠজীকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে আমরা অনুরোধ করি।

হিন্দুস্থানের বীমা কর্ম্মচারীর বিলাতে কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটীর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল সম্প্রতি লণ্ডনের 'চার্টার্ড ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউট' এর এ্যাসোসিয়েটসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ, সি, আই, আই (লণ্ডন) ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ কিছুকাল দৌলতপুর কলেজে অধ্যাপনার কার্য্য করিয়াছিলেন। সেখান হইতে গত ১৯২৯ সালে হিন্দুস্থানে আসেন এবং স্বীয় কার্য্যদক্ষতা গুণে অনতিকাল মধ্যেই একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হন। আমরা আশা করি যে ইনসিওরেন্স ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত ঘোষের এতদিনের অভিজ্ঞতা এবং এই বিশেষ শিক্ষা তাঁহাকে হিন্দুস্থানের কার্য্যে দিন দিন অধিকতর কর্ম্মদক্ষ করিয়া তুলিবে।
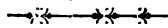
Expensive Present !!
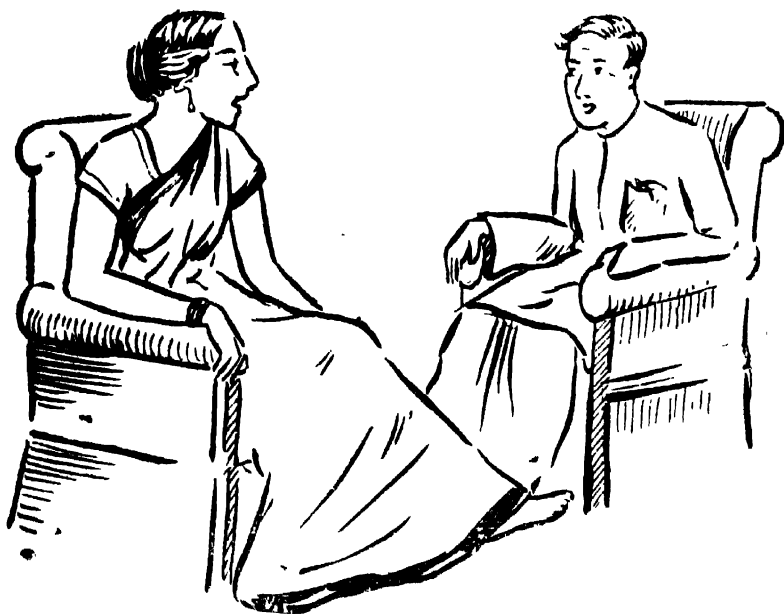
নব পরিণীতা স্ত্রীর বাপের বাড়ী থেকে নানারূপ উপঢৌকন এসেছে।

হর্ষোৎফুল্ল মুখে স্ত্রী স্বামীকে গর্ব্বের সহিত ব'ল্লেন—

বাবা যখনই যা দেন সব Expensive জিনিষই দেন।

স্বামী একটু দোমোনা হ'য়ে উত্তর ক'ল্লেন,—সে তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যখন তোমাকে দিচ্ছিলেন।

ডাক্তারে এ্যাটর্নীতে মতভেদ
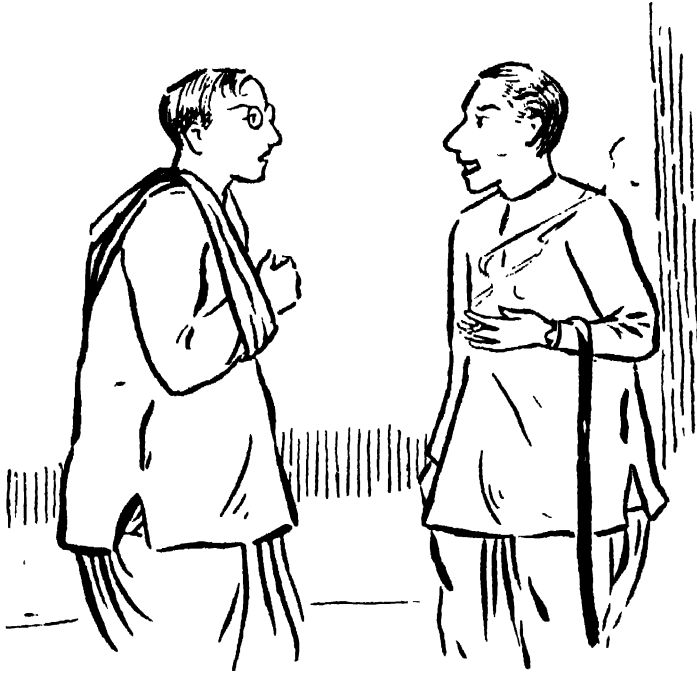
মোটরকার দুর্ঘটনায় বিধু বাবুর হাতে খুব চোট্ লাগে। ডাক্তার আসিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া হাতখানা কিছুদিন Slingএ ঝুলাইয়া রাখিতে পরামর্শ দিয়া যান। কিছুদিন বাদে বিধু বাবুর বন্ধু হরেন বাবুর সহিত রাস্তায় সাক্ষাৎ। হরেন বাবু শুধাইলেন,—

কিহে বিধু।—আজও সারতে পারলে না?—আর কতদিন হাতখানা Slingএ ঝুলিয়ে রাখবে?—

বিধু।—আরে ভাই এ সম্বন্ধে আমার ডাক্তারে আর এ্যাটর্নীতে কিছু মতভেদ হ'চ্ছে। ডাক্তার বলেন যে আর এক সপ্তাহ রাখলেই সেরে যাবে, কিন্তু এ্যাটর্নী বলেন,—উহুঁ! দুটী মাস Sling ছাড়তে পারবেন না—ড্যামেজটা মোটা রকমের আদায় করতে হবে।
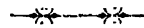
ঋণ শোধ

রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে কৃতজ্ঞতা জানাইতে গিয়াছেন। গদগদ হইয়া বলিলেন,—

আপনার ঋণ কেমন করিয়া যে শোধ করিব ভাবিয়া পাই না।

ডাক্তার।—কেন এ' আর কি ?—এত খুব সোজা কথা! হয় চেকে, আর না হয় নগদ ;—যাতে আপনার ইচ্ছা!

রেলওয়ে টাইমটেবেল

হাওড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে সকল মেল ট্রেণ এবং প্রধান প্রধান এক্সপ্রেস ট্রেণ যাতায়াত করে তাহাদের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল। সমস্তই কলিকাতার টাইম বলিয়া গণ্য হইবে।

হাওড়া ষ্টেশন

ই, আই, আর :—

	পৌছে	ছাড়ে
কলিকাতা দিল্লী-কালকা মেল	সকাল ৮ ৭	রাত্রি ৯-১০
বোম্বে মেল	সকাল ৮-৪১	রাত্রি ৮ ৩৪
কলিকাতা-পাঞ্জাব মেল	সকাল ৭- ১০	রাত্রি ৭ ৪০
ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল, বোম্বাইয়ের বেলার্ড পীয়ার পর্য্যন্ত (কেবল বৃহস্পতিবার)		রাত্রি ১০- ৫
পাঞ্জাব এক্সপ্রেস, মেন লাইন এবং সাহারাণপুর হইয়া	দিবা ২ ৫৫	সকাল ১২ ৫৫
দিল্লী এক্সপ্রেস, গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া	সন্ধ্যা ৬-৫৫	বিকাল ৪-৪৪
দেরাডুন এক্সপ্রেস, ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার	সকাল ৬-২০	রাত্রি ১০-২৫
বেনারস মেইন লাইন হইয়া	সকাল ৮-২৫	বৈকাল ৬-৫০
দানাপুর এক্সপ্রেস মেইন লাইন হইয়া	সকাল ৭ ৫৫	রাত্রি ৯-৩৪
দানাপুর এক্সপ্রেস সাহেবগঞ্জ লুপ হইয়া	সকাল ৮ ৩৯	রাত্রি ৭-১৪
দিল্লী এক্সপ্রেস মেইন লাইন হইয়া	সন্ধ্যা ৬-৪৫	রাত্রি ১০-৩৯

বি, এন, আর :—

	পৌছে	ছাড়ে
বম্বে মেল	সকাল ৭ ৩৩	রাত্রি ৭-২৪
মাদ্রাজ মেল	সকাল ৭-৫৯	রাত্রি ৮-৫৪
পুরী এক্সপ্রেস	সকাল ৬-৩০	রাত্রি ৮- ০
রাচী ফাষ্ট	সকাল ৬-১০	রাত্রি ৯- ৪
পুরুলিয়া ফাষ্ট	সকাল ৫-৪৪	রাত্রি ৯-১০
১৩ ডাউন ও ১৪ আপ হাওড়া নাগপুর	সকাল ৯-	রাত্রি ৯-২৪
হাওড়া নাগপুর	সকাল ৫-২৪	রাত্রি ১০-৩৪
১১ ডাউন ও ১২ আপ হাওড়া নাগপুর	সন্ধ্যা ৫-৩০	সকাল ৯-
গোমো প্যাসেঞ্জার	রাত্রি ৮-২৪	সকাল ৬-৪৪

শিয়ালদহ ষ্টেশন

ই, বি, আর :—

দার্জ্জিলিং মেল	সকাল ৭-২৪	রাত্রি ৯
আসাম মেল	মধ্যাহ্ন ১-১৫	মধ্যাহ্ন ১-৩০
ঢাকা মেল	সকাল ৫-৫৯	রাত্রি ১০-২৪
চট্টগ্রাম মেল	রাত্রি ৮-২৪	সকাল ৭-৩০
বরিশাল এক্সপ্রেস	সকাল ১০-৩৪	বিকাল ৩-৫০
নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস	সকাল ৫-৩৯	রাত্রি ৯-৫৪
সিরাজগঞ্জ মেল	সকাল ৭-৩৪	রাত্রি ৮-৫০

ডাকের সময়

কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট অফিসে শেষ কখন চিঠি ডাকে দিলে তাহা পরবর্ত্তী ডাকে যাইবে তাহার সময় তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আকিয়াব, কাউকপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, শিলচর	সকাল	৫-৪৫
আসাম	”	১১-৩০
শিউড়ী, ডুমকা, ভাগলপুর (লুপ লাইন)	বিকাল	৫-০
বোম্বে (ভায়া নাগপুর),	”	৫-১৫
পাঞ্জাব (ই আই আর), রাজপুতনা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ	”	৫-৪৫
বোম্বে (ভায়া জব্বলপুর), গয়া, হাজারীবাগ	”	৬-৩০
দার্জ্জিলিং, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, পূর্ণিয়া, পাবনা এবং উত্তর-বঙ্গ	বিকাল	৬-৪৫
রাঁচি, জামসেদপুর, টাটানগর, চাইবাসা এবং চক্রধরপুর	”	৬-৩০
মাদ্রাজ, কটক, পুরী, বালেশ্বর	”	৬-৩০
পুরুলিয়া, মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া	”	৬-৩০
মধ্য বাংলা, যশোহর এবং খুলনা	”	৭-৩০
মুর্শিদাবাদ, মালদহ, এবং কৃষ্ণনগর	”	৭-৩০
ত্রিপুরা, শিলচর, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট	”	৭-৩০

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৭শ বর্ষ | আশ্বিন—১৩৪৪ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

স্যার সোরাবজী পোচখানাওয়ালা

গত ৪ঠা জুলাই ভোর ৪টা ১৫ মিনিটের সময় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্যার সোরাবজী পোচখানাওয়ালা পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গত কয়েক মাস যাবৎ রোগে ভুগিতেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই নিরাময় হইবেন সকলেই এইরূপ আশা ও কামনা করিতেছিলেন। অবশেষে মৃত্যুর নিষ্ঠুর হস্ত তাঁহাকে ইহলোক হইতে লইয়া গেল! বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় ক্ষেত্রে স্যার সোরাবজীর ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁহার মৃত্যুতে আজ ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কারবার নিদারুণ আঘাত পাইয়াছে।

আমরা স্যার সোরাবজীর বিধবা পত্নী লেডী পোচখানাওয়ালা এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পুত্রকন্যাগণের সহিত গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার শক্তি একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও নাই। আজ সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিদারুণ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের শোকের সান্ত্বনা হউক। ভগবান্ তাঁহার কর্ম্মবীর সন্তানের পরলোকগত আত্মাকে চির শান্তি ও চির বিশ্রাম প্রদান করুন,—এই প্রার্থনা।

ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে ২০ টাকা বেতনের কেরাণী হইতে ইহার উচ্চতম শিখরে উঠিতে স্যার সোরাবজী ছাড়া আর কাহাকেও বড় দেখা যায় না। দরিদ্র অবস্থা অতিক্রম করিয়া অনেকেই ধনশালী হন,—কিন্তু ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে এরূপ সফলতার জন্য যে সংগ্রাম করিতে হয়, তাহার তুলনা নাই। সকল ব্যবসায়ের মূল ব্যাঙ্কিং—সুতরাং বিদেশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা

এইখানে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং তাহাতে জয়ী হওয়া বিশেষ শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচায়ক। স্যার সোরাবজীর জীবনের প্রতিপদক্ষেপে,—প্রতি নিঃশ্বাসে, সেই তেজোময়ী শক্তির বিকাশ দেখা যায়। আমরা নিম্নে তাঁহার জীবন-কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৮১ সালে ৯ই আগষ্ট তারিখে বোম্বাই সহরে স্যার সোরাবজী পোচখানাওয়ালার জন্ম

স্যার সোরাবজি পোচখানাওলা

হয়। চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সকলের ছোট। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হীরজীভাই, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে কাজ করিতেন। তিনি বিশেষ যত্নের সহিত সোরাবজীকে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করেন। ১৬ বৎসর বয়সে সোরাবজী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ হইয়া সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু সেখানে তিনি বেশীদিন পড়িতে পারিলেন না। সাংসারিক অভাবের তাড়নায় কলেজের পড়া ছাড়িয়া তাঁহাকে চাকুরীর খোঁজে বাহির হইতে হইল।

নানাস্থানে কয়েক মাস যাবৎ নিস্ফল ঘোরাঘুরি করিয়া যখন তিনি নিরাশায় চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন, তখন অগত্যা তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হীরজীভাই বিশেষ চেষ্টা করিয়া চার্টার্ড্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার আফিসে তাঁহাকে মাসিক ২০ টাকা বেতনে একটা কেরাণীগিরি চাকুরীতে কোন রকমে ঢুকাইয়া দেন। হীরজীভাই তাঁহার এই কনিষ্ঠ ভাইটীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার চেষ্টাতেই সোরাবজীর শিক্ষালাভ ও চরিত্রগঠন হইযাছিল। চাকুরীতে নিযুক্ত করাইয়া তিনি সোরাবজীকে ব্যাঙ্কিং কারবার সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশের দ্বারা কার্য্য কৌশল শিখাইয়াছিলেন। উত্তরকালে সোরাবজীর জীবনে যে সদ্‌গুণ ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়, হীরজীভাইয়ের শিক্ষা ও উপদেশই তাহার প্রধান কারণ।

সোরাবজী ২০ টাকা বেতনের সামান্য কেরাণী হইলেও তাঁহার লক্ষ্য ছিল অনেক উচ্চে। তিনি সাধারণ কেরাণীর মত কোন রকমে চাকুরী বজায় রাখিবার জন্য "দিনগত পাপক্ষয়ের" মত দৈনিক কার্য্য করিতেন না। "কাজ শিখিব" এই কথাটী তাঁর সর্ব্বদা মনে থাকিত। সেই জন্য সকল বিষয় তিনি খুঁটিনাটী করিয়া দেখিতেন। কোন কাজে কখনও তাঁর আলস্য ছিলনা।

তিনি বুঝিলেন, ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে ভালরূপে জানিতে হইলে আফিসের কাজের সঙ্গে সঙ্গে ইহার মূলনীতিও শিক্ষা করা আবশ্যক।

সেইজন্য তিনি লণ্ডন ইনষ্টিটিউট অব ব্যাঙ্কার্স পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কেরাণী গিরির হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর মধ্যে যেটুকু অবসর তিনি পাইতেন, তাহার মধ্যেই পড়াশুনা করিয়া তিনি একে একে সমস্ত পরীক্ষাই পাশ করিলেন।

১৯০৫ সালে তাঁহার কেরাণীগিরির চাকুরীর ৭ বৎসর পূর্ণ হয়। এই সাত বৎসর তিনি কঠিন পরিশ্রমের সহিত একদিকে যেমন ব্যাঙ্কের কার্য্য করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখিয়াছেন অন্য দিকে তেমনি নিজেও ব্যাঙ্কের বিবিধ বিভাগে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া জ্ঞান-সমৃদ্ধ হন। পদ বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যভার অর্পিত হয়। কিন্তু যতই উপযুক্ত কর্ম্মকুশল হউন না কেন, ইউরোপীয় ব্যাঙ্কে তাঁহার উচ্চপদ লাভের যে একটা সীমা আছে, একথা তিনি ভালরূপে জানিতেন এবং তাহা বুঝিয়াই তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে দুঃসহ যন্ত্রণা বোধ করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐ ব্যাঙ্কে আজীবন মন-প্রাণ দিয়া খাটিয়াও হেড ক্লার্কের বেশী আর কিছু হইতে পারেন নাই। অথচ কার্য্যে তাঁহার সুখ্যাতি যথেষ্ট ছিল। কিরূপে এই Inferiority Complex এর মার্কা মাড়াইয়া নিজের প্রাপ্য মান ও মর্য্যাদা আদায় করা যায় সোরাবজী দিন-রাত সেই কথা চিন্তা করিতেন। ভারতবাসী চিরকাল ব্যবসায় ক্ষেত্রেও বিদেশীর দাসত্ব করিবে ইহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না।

এই সময়ে ১৯০৫ সালে বোম্বাই সহরে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়। সোরাবজীর দক্ষতা ও কর্ম্মকুশলতার কথা ইতিমধ্যে ব্যবসায়ী মহলে সকলের নিকট প্রচারিত হইয়াছিল। কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তির চেষ্টায় সোরাবজী ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে সাব য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট পদে ১৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। যদিও তাঁহার যোগ্যতার অনুরূপ এই দেড় শত টাকা বেতন অতি সামান্য, তথাপি তিনি আশা করিয়াছিলেন, অন্ততঃ এই ব্যাঙ্কে ভারতবাসীর মনে মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া চাকুরি করিতে পারিবেন।

তখনও ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয় নাই। ম্যানেজারী পদের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির খোঁজ করা হইতেছিল। প্রথম অবস্থায় ব্যাঙ্ককে সুগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার গুরুতর ভার সোরাবজীর স্কন্ধেই পতিত হয়। তিনি সুনামের সহিত এই বিপুল শ্রম সাপেক্ষ কার্য্য সম্পাদন করেন। আজও বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী মহলে সেকথা সকলের মনে আছে। তারপর মিঃ ষ্ট্রীংফেলো নামক জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক মাসিক ৫০০০ টাকা বেতনে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। ম্যানেজার কার্য্যে যোগদান করিয়াই একজন ইউরোপীয়কে য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট পদে নিয়োগ করেন। মিঃ ষ্ট্রীং ফেলো সোরাবজীর কার্য্য দক্ষতায়, গুণপনায় এবং ব্যাঙ্কের মক্কেলদিগেব সহিত আলাপ ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ফলে ইউরোপীয় য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট মহাশয়ের ঈর্ষ্যার উদয় হয়। তিনি আদেশ করিলেন, সোরাবজী কোন চেক্ পাশ করিতে পারিবেন না। ইহাকে কেবল মাত্র ব্যক্তিগত অপমান মনে না করিয়া সোরাবজী ভাবিলেন বাস্তবিক

ইহা ভারতবাসীর জাতীয় অবমাননা। তিনি ইউরোপীয় য়্যাকাউন্ট্যান্টের শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। কিন্তু আফিসের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা পদদলিত করা তাঁহার ইচ্ছা ছিলনা। তিনি কোন প্রকারে অন্তরের জ্বালা চাপিয়া রাখিয়া আফিসের আদেশ মানিয়া লইলেন। ম্যানেজার ও ডিরেক্টার গণের নিকট অভিযোগ করিয়াও কোন ফল হইলনা।

এই সময়ে সোরাবজীর বিবাহ হয়। তখন বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছে। তাহার বিপুল উত্তেজনা সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনে এক নূতন স্পন্দন আনিয়াছে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নহে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সকল বিষয়ে ভারতবাসী আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অভিযান সুরু করিয়াছে। সোরাবজীর অন্তরের আগুন জ্বলিয়া উঠিল : দেশের মধ্যে যে নব ভাবের বন্যা আসিয়াছিল, সোরাবজী সেই সুযোগ লইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে ভারতবাসীর সর্ব্ব প্রকারে নিজস্ব ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে না পারিলে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি এবং দেশবাসীর আর্থিক স্বাধীনতা ও স্বচ্ছলতা হইবে না। সেই জন্য তিনি সংকল্প করিলেন যেরূপেই হউক, স্বদেশী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতেই হইবে। এই চিন্তা দিবা রাত্রি তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার চাকুরীতে তিনি যে ব্যক্তিগত অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া ছিলেন, সেই অপমানকে তিনি জাতীয় অপমান বলিয়া মনে করিলেন।

তিনি অতঃপর কয়েকজন বন্ধুর নিকট তাঁহার সংকল্প ও মনোভাব ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু বন্ধুগণ তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিলেন না। কেহ কেহ ইহা অসম্ভব কার্য্য বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু সোরাবজী যেন দিব্য চক্ষে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঋষির মত স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, এ নব জাগরণের পর আর নিদ্রা আসিবে না, স্বদেশী ভাবের পবিত্র হোমানল আর নির্ব্বাপিত হইবে না। বাংলাদেশে যে শঙ্খনাদ উঠিয়াছে, সমগ্রভারত সেই আহ্বানে সাড়া দিয়াছে, এখনই উপযুক্ত সময়। এমন সুযোগ আর মিলিবেনা।

সোরাবজীর সংকল্পের কথা ক্রমে ক্রমে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার মিঃ ষ্টীং ফেলোর কানে উঠিল। তিনি সোরাবজীকে ডাকাইলেন এবং এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনেক উপদেশ দিয়া বলিলেন, "তোমার এই সংকল্প দিবাস্বপ্নের মত অলীক,—আকাশ কুসুমের মত অসম্ভব ; মরুভূমিতে মরীচিকার মত প্রাণান্তক ভ্রান্তি। ধ্রুবকে পরিত্যাগ করিয়া, অধ্রুবের আশায় অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়া মারা যাইও না"। এত বড় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির উপদেশেও সোরাবজী কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি অম্লান বদনে ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার চাকুরী ইস্তাফা দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন। নব বিবাহিত যুবক সোরাবজী,—সাংসারিক জীবনের ভোগ বিলাসের উপকরণ সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা বিসর্জ্জন দিয়া দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করিলেন।

যাহারা সেদিন বিজ্ঞের মত সোরাবজীকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছ", তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, বাস্তবিক সোরাবজী চাকুরী ছাড়িয়া সেদিন লক্ষ্মীকেই মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন।

দেশনায়ক, রাজনীতিক পণ্ডিত, বিখ্যাত ব্যবহারজীবী, কংগ্রেস নেতা, স্যার ফেরোজ শা মেটা তখন পশ্চিম ভারতের জনসাধারণের মধ্যে মুকুট বিহীন সম্রাট—যেমন ছিলেন বাংলাদেশে স্যার সুরেন্দ্র নাথ। সোরাবজী তাঁর কাছে যাইয়া নিজের মনোভাব প্রকাশ করিলেন। স্যার ফেরোজ শা, সোরাবজীর সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রস্তাব আলোচনা করিয়া স্বদেশী ব্যাঙ্ক স্থাপনের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিশেষ রূপে সোরাবজীকে উৎসাহিত করিলেন এবং তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সোরাবজী বুঝিলেন, এতদিনে শুভক্ষণে তিনি যথার্থ দরদী বন্ধুর সন্ধান পাইয়াছেন: অবিলম্বে নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার আয়োজন আরম্ভ হইল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই অতর্কিতে আবার এক নূতন বিপদ পাতের সূচনা হয়।

এই সময়ে ব্যাঙ্ক অব্ বাম্বা ফেল পড়ায়, বোম্বাইয়ের বহু লোক আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এত নিরাশা ও বাধা বিঘ্নের মধ্যেও সোরাবজীর চেষ্টার বিরাম ছিল না। ১৯১১ সালে স্যার ফেরোজ শা মেটাকে ডিরেক্টর বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান করিয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া গঠিত হয়। সোরাবজী মাসিক ৮০০৲ টাকা বেতনে তাহার ম্যানেজার এবং ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়াতে তাঁহার সহকর্ম্মী বন্ধু মিঃ এ এল বালশেখর একাউণ্টেণ্ট পদে নিযুক্ত হইলেন।

আশা, আনন্দ ও উৎসাহের সহিত প্রথম দুই বৎসর কাজ চলিবার পর সম্মুখেই বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ১৯১৩ সালে কয়েকটি ব্যাঙ্ক ফেল পড়াতে চারিদিকে একটি আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। স্বদেশী ব্যাঙ্কের উপরে লোকের একটা অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়। বোম্বাইয়ের স্পীসী ব্যাঙ্ক (Specie Bank) এবং পাঞ্জাবের পিপল্স্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এই ফেল পড়া ব্যাঙ্কের মধ্যে ছিল খুব বড় দুইটী ব্যাঙ্ক। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইহাদের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত ছিল। ইহাদের এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া জনসাধারণ নূতন এবং ছোট ব্যাঙ্কের উপর আস্থাহীন হইয়া উঠিল ?

কার্য্যারম্ভের দুই বৎসর পরেই এই ভীষণ বিপদে সোরাবজী দমিয়া গেলেন না। তাঁহার বুদ্ধি কৌশলে, অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া সেই বিপদ অতিক্রম করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। আত্মবিশ্বাস এবং আশাশীলতা সোরাবজীর চরিত্রে এত বেশী ছিল যে, এই বিপদের সময় উপযুক্ত সিকিউরিটী দেওয়া সত্ত্বেও যখন ব্যাঙ্ক অব্ বম্বে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য করিল না, তখন তিনি কিছুমাত্র ভীত, নিরাশ অথবা উৎসাহ শূন্য হইলেন না। যিনি স্যার ফেরোজ শা মেটার চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহার কাছে সকল বিপদ তুচ্ছ। অবিলম্বে স্যার ফেরোজ শা মেটা ব্যাঙ্ককে বাঁচাইবার জন্য নিজের সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। বিশ্বাসই ব্যাঙ্কের প্রাণ,—তাহা যখন একবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে, তখন আর কোন ভয় থাকে না। ১৯১৩ সালের সেই নিদারুণ ঝড় তুফানের মধ্যে এমনি ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া সোরাবজীর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া আজ পর্য্যন্ত আর্থিক জগতে মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে।

গত বৎসরে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার রজত জুবিলী উৎসব সম্পন্ন হয়। সেই বৎসরই লণ্ডনে ইহার একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর কোন ভারতীয় ব্যাঙ্কের শাখা লণ্ডনে নাই। সুতরাং স্যার সোরাবজীর এই কার্য্যের দ্বারা আর্থিক জগতে ভারতের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম চাকুরী জীবনে যুবক সোরাবজী বিদেশী প্রভুর হাতে যে অপমান পাইয়া ছিলেন, তাঁহার প্রাণে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই,—কেবলমাত্র ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় সফলতা লাভ করিয়া তাঁহার সেই ক্ষোভ মিটে নাই। লণ্ডনে ভারতীয় ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপিত হওয়াতে তাঁহার সেই অপমানের যাথার্থ প্রতিশোধ হইয়াছে। স্যার সোরাবজী অল্পবয়সেই মারা গিয়াছেন। ব্যবসায় জগতে এত বড় প্রতিভাশালী ব্যক্তির ৫৬ বৎসর পরমায়ু কিছুই নহে। তিনি যদি আর দশটী বৎসরও বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় জগতের মধ্যে আরও গৌরবান্বিত হইয়া উঠিত।

স্যার সোরাবজীর বিধবা পত্নী তিন কন্যা এবং দুই পুত্র বর্ত্তমান আছেন। আমরা তাঁহাদের সহিত গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। আশাকরি, সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া উত্তরোত্তর শক্তি লাভ করিয়া স্যার সোরাবজীর চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ ও ভারতের জাতীয় গৌরব স্বরূপ হইবে।

কৃষি কার্য্যের সুবিধার্থে ঋণদান

বাংলাদেশের কৃষকেরা অত্যধিক পরিমাণে ঋণগ্রস্ত; অর্থাভাবে তাহারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে পারে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গভর্ণমেণ্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটী বা সমবায় সমিতি প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। বহুকাল যাবৎ এই বিভাগের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কৃষিকার্য্যের উন্নতি কিছুই হয় নাই। নানাস্থানে বহুসংখ্যক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটী বা ঋণদান সমিতি স্থাপিত হইয়াছে; তাহাতে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ পাইবার সুযোগও রহিয়াছে;—কিন্তু বাস্তবিক সেই টাকা কয়জন কৃষক পাইয়া থাকে? আমাদের যতদূর জানা আছে, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটীতে যে টাকা খাটে, তাহার অতি অল্পাংশই কৃষকের হাতে যায় এবং অতি অল্পাংশই কৃষিকার্য্যে ব্যয় হয়। সাধারণ কৃষকেরা লেখা পড়া জানে না,—তাহারা কো-অপারেটিভ সোসাইটীর মেম্বার হয় না। সাধারণ চাকুরীজীবি মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকেরাই উহার মেম্বার হন এবং টাকা কর্জ্জ লইবার সুবিধা পান। ঐ টাকা তাঁহাদের বার মাসে তের পার্ব্বণে, কন্যার বিবাহে, রোগের চিকিৎসায়, এবং সাধারণ বিলাসিতায় খরচ হইয়া যায়; সুতরাং কৃষিকার্য্যের কোন সাহায্য হয় না,—জমির ফসল হয় ও বাড়ে না,—কৃষকের দুরবস্থাও ঘুচে না।

ইহার আর এক কুফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, অল্পায়াসে ও কম সুদে টাকা পাওয়া যায় বলিয়া সাধারণ গৃহস্থদের ঋণ গ্রহণ প্রবৃত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদিও এই ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত প্রথায় মামলা মোকর্দ্দমা, কোর্ট-ফি উকিল মোক্তার, এ-সবের প্রয়োজন নাই,—সাব্-ডিভিসন্যাল অফিসারের সার্টিফিকেট জারীতেই কাজ হয়,—তথাপি অনেকস্থলে কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীর কর্ম্মচারীদিগকে টাকা আদায়ের ঝঞ্ঝাটেই ব্যস্ত থাকিতে হয়,—কৃষির উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী হইবার অবসর তাঁহারা পান না।

সম্প্রতি ল্যাণ্ড মর্টগেজ্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। এখন কৃষকেরা তাহাদের জমি বন্ধক

রাখিয়া ঐ সকল ব্যাঙ্ক হইতে কম সুদে টাকা কৰ্জ্জ লইতে পারে। ব্যাঙ্কের মেম্বার ব্যতীত অন্য কাহাকেও কৰ্জ্জ দেওয়া হয় না। ১৯৩৪ সাল হইতে ময়মনসিংহ, পাবনা, ত্রিপুরা, যশোহর, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৩৫ সালে মোট ১৫৯৯ জন মেম্বার ৩৯৮৯৩০ টাকা কৰ্জ্জ লইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ তাহার মধ্য হইতে ৬৩৭ জনের দরখাস্ত সম্বন্ধে তদন্ত করেন এবং অবশেষে ২৬৬ জনকে ১০৪২৯৭ টাকা ঋণ দেওয়া স্থির হয়। এই টাকার মধ্যে ১৬৮২২ টাকা পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয় হইবে। সুতরাং অবশিষ্ট টাকা যদি কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যয় হয়, তাহা হইলে জনপ্রতি মাত্র ৩২৮ টাকা পড়ে। এই সামান্য টাকাতে কৃষির কি উন্নতি হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

কৃষি সম্বন্ধে স্যার জন রাসেলের উপদেশ

কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকায় কার্জ্জন হলে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কৃষি বিশেষজ্ঞ স্যার জন রাসেল এক বক্তৃতা দিয়াছেন ; তাহার সার মর্ম্ম এই ;—

"ভারতীয় কৃষকদের প্রত্যেকের জমির পরিমাণ অতি সামান্য এবং সেই জমিও খণ্ড খণ্ড এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য করা কর্ত্তব্য। যদি কৃষকেরা সাধু-প্রকৃতির হয় এবং সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করে, তবে সমবায় পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা যদি ফন্দিবাজ, স্বার্থপর ও অসাধু স্বভাব বিশিষ্ট হয়,তাহা হইলে উহাতে বিষময় ফল উৎপন্ন করে। আটবৎসরের মধ্যে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য করিয়া তথাকার অধিবাসিগণ জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সমর্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এবং সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে তদ্রূপ সুফল পাওয়া যাইবে।

"কৃষি সম্বন্ধীয় গবেষণায় পদার্থ বিদ্যা-বিশারদ রাসায়নিক পণ্ডিত এবং গণিতজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিযুক্ত থাকিবেন। বোম্বাইয়ের কার্পাস গবেষণাগারে এইরূপ বহুসংখ্যক ব্যক্তি কার্য্য করিতেছেন। মূর্খ চাষাদের হাতে কৃষি কার্য্য ফেলিয়া, না রাখিয়া শিক্ষিত যুবকদের কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত।"

স্যারজন্ রাসেলের উপদেশ সমূহ সারগর্ভ কিন্তু নূতন নহে। তদনুসারে অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ হউক ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়। বাংলা গবর্ণমেন্টের কো-অপারেটিভ্ ডিপার্টমেন্ট ঋণ-দান সমিতি স্থাপনে যেরূপ মনোযোগী হইয়াছেন, কৃষিকার্য্যে সেরূপ কিছু করেন নাই। পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে অধিক সফলতা লাভ করিয়াছেন। কারণ, সেখানে জলসেচ ব্যবস্থা সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত। জলসেচ না হইলে কৃষিকার্য্য চলেনা, সুতরাং কৃষি কার্য্য আপনি আপনিই সমবায় পদ্ধতির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টি-পাত হয়, নদ-নদী-খালও বহু সংখ্যক রহিয়াছে। জল সেচের জন্য কৃষককে কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয় না। সুতরাং কৃষিকার্য্য সকলে স্বাধীন ভাবেই করিয়া থাকে। সমবায় পদ্ধতিতে যে পরস্পর সহযোগিতার দরকার, তাহার মূল্য সাধারণ কৃষকেরা বুঝেনা। স্থানে স্থানে শিক্ষিত লোকগণ যদি সমবায় পদ্ধতিতে

মিলিত হইয়া কৃষি কার্য্য আরম্ভ করেন এবং জনসাধারণকে তাহার সুফল দেখাইতে পারেন, তবেই তাহারা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

তত্ত্বানুসন্ধান ও গবেষণা এদেশে খুব চলিয়া থাকে ; অন্ততঃ ইংরাজী রিপোর্টে তাহা আমাদের চোখে পড়ে প্রচুর। কিন্তু সে সব কৃষকদের নিকট পৌঁছেনা,—তাহারা গবেষণার ফলাফল জানিতে পারে না। গবর্ণমেন্টের তত্ত্বানুসন্ধান সমিতির কোন নূতন আবিষ্কারের কথা বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় পুস্তিকার আকারে ছাপাইয়া কৃষকদের মধ্যে বহুল প্রচার করা কর্ত্তব্য এবং তাহারা তদনুসারে কাজ করিতেছে কিনা, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

শিক্ষিত যুবকেরা অনেক স্থলে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নানা অসুবিধায় পড়িতে হয়। দেশে যাতায়াতের ও মালপত্র চলাচল করিবার সুব্যবস্থা, বা রাস্তা ঘাট নাই। কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা কঠিন। স্থলপথ ও জলপথের প্রসার সকল দেশেই কৃষিকার্য্যের উন্নতির বিশেষ সাহায্য করে। বাংলা দেশে কৃষি বিদ্যালয়ের সংখ্যা এত অল্প যে, তাহা একেবারে হাস্যাস্পদ ;—এ যেন একটা ছেলেখেলা। কয়েকজন কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী তৈয়ারী করিবার জন্যই তাহা স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতিতে কৃষির নাম গন্ধও নাই। সুতরাং শিক্ষিত যুবকেরা স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইয়া চাকুরীর সন্ধানেই ছুটে, কৃষি কার্য্যে কাহারও আগ্রহ জন্মেনা, কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে কাহারও কিছু জ্ঞানও থাকেনা। যে সকল শিক্ষিত যুবক কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই অগত্যা ঐ পথে গিয়াছে।

—✤—

বাংলাদেশের দুরবস্থা

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিংশতি অধিবেশনে অর্থনীতি শাখার সভাপতি ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহার সারমর্ম্ম এই :—

বাংলার লোক সংখ্যা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা বিশেষ আশঙ্কার কথা। এই কারণে জনপ্রতি কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাংলাদেশে সর্ব্বাপেক্ষা কম এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত। কৃষি কার্য্যে অবনতির ইহা একটী প্রধান কারণ।

জগদ্ব্যাপী বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির সময় অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলার প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য (১৯২৮-২৯ সালের তুলনায়) বেশী কমিয়াছে। এই কমতির পরিমাণ শতকরা ৬১ টাকারও উপর। পাট ও চাউলের মূল্য হ্রাস ইহার প্রধান কারণ। ইহাতে বাঙ্গালীর জীবন যাত্রার ধরণ-ধারণ অত্যন্ত নীচু হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালীর খাদ্যে শ্বেতসার খুব বেশী অথচ প্রোটীন নাই। উদরাময়, আমাশয়, বেরি-বেরি, চোখের পীড়া, যক্ষ্মা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশের খাদ্যের অপকর্ষ ও অসামঞ্জস্যের প্রমাণ। বাংলাদেশে গড় পড়তায় স্ত্রীলোকের পরমায়ু কমিয়া যাইতেছে। পল্লী

অঞ্চলে শিশু-মৃত্যুর হার হাজার করা ১৮৯। পুরুষের পরমায়ু বাংলাদেশে গড়পড়তায় ২৫ বৎসর মাত্র। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলাদেশে অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বংশবৃদ্ধি হইতেছে।

ভারতবর্ষেব অন্যান্য প্রদেশে উপার্জ্জনকারী কর্ম্মীর সংখ্যা গত ৩০ বৎসরে শতকরা ৪ জন বাড়িয়াছে, কিন্তু বাংলাদেশে শতকরা ৯ জন কমিয়াছে। এই ৩ বৎসরে বাংলাদেশে শিল্পী ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা শতকরা ১৪ জনেরও অধিক কমিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশে এত কমে নাই। সুতরাং বুঝা যায়, এই ৩০ বৎসরে বাংলাদেশে শিল্পের প্রসার কিছুই হয় নাই। বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া রোগে গড় পড়তায় প্রতিবৎসব ৩৫০০০০ লোকের মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষের আব কোন প্রদেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এত বেশী নহে। ইহা বাংলার আর্থিক অধোগতি, স্বাস্থ্যহানি ও জন্মহ্রাসের কারণ।

চিকিৎসকগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ম্যালেরিয়ার মৃত্যুতে মানুষের ভোগ হয় গড় পড়্তায় ২০০০ দিন। এই সবলোকের রোজগার মাসে ১০ টাকা করিয়া ধরিলেও ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর দরুণ বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ হয় বৎসরে ২৩ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা।

১৯৩১—৩২ সালে বাংলাদেশের জন-প্রতি রাজস্ব ব্যয় হইয়াছে ১ টাকা ১৩ আনা মাত্র। পক্ষান্তরে, বোম্বাই প্রদেশে ব্যয় হইয়াছে ৬ টাকা ১২ আনা; পাঞ্জাবে ৪ টাকা ৩ আনা এবং মান্দ্রাজে ৩ টাকা ৭ আনা। ইহার ফলে শিক্ষার জন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলাদেশে কম খরচ হইয়াছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায়, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি এই সকল বিভাগের ব্যয়ের পরিমাণের উপর অনেকটা নির্ভর করে। সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলার মন্ত্রীদের নিজস্ব বিভাগের ব্যয় খুব কম বাড়িতে পারিয়াছে। পাটশুল্ক হইতে যে টাকা আদায় হয়, তাহার অর্দ্ধেক বাংলার রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইলেও তাহাতে এমন বিশেষ কিছু সুফল ফলে নাই। পাটের দর কম,—বিদেশী বাজারও মন্দা। ইহাতে শুল্কের চাপ কিয়দংশ পরোক্ষে বাংলার কৃষকদের উপরেই পড়িতেছে। এদিকে আবার পাটের চাষ কমাইবার জন্যও চেষ্টা হইতেছে;—সুতরাং পাটরপ্তানী শুল্কের দরুণ কোন লাভই বাংলার ভাগ্যে হইল না।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোক অপেক্ষা বাঙ্গালীকে অধিক ট্যাক্স দিতে হয়। প্রত্যেক বাঙ্গালী ৭।৹ টাকা হিসাবে ট্যাক্স দেয়। জন-প্রতি ট্যাক্সের হার যুক্তপ্রদেশে ৩।৹ টাকা, মান্দ্রাজে ৫৷৵৹ এবং বিহার ও উড়িষ্যায় ১৷৹ বাংলার কর প্রদানের ক্ষমতা বোম্বাই অপেক্ষা কম। অথচ—বহির্ব্বাণিজ্যের শুল্ক, পাট রপ্তানীর শুল্ক, ইন্‌কামট্যাক্স এবং লবণ শুল্ক মিলিয়া বাংলা বোম্বাইর দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী কর দেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ কোন পরিবারে বা শ্রেণী বিশেষে যে ধন উদ্বৃত্ত হইয়াছিল তাহা এই ১৫০ বৎসরের মধ্যে বহু প্রকারে হস্তান্তরিত, বণ্টিত ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা গভর্ণমেণ্টের বাজেটে ঘাটতি দেখা যাইতেছে। এইবার সপ্তমবর্ষের ঘাট্‌তি। ১৯২৮ ও ১৯৩০ সালের সামান্য বাড়্‌তি না ধরিলে দেখা যায়, ১৯২৬ সাল হইতে ঘাট্‌তি আরম্ভ হইয়াছে। এই দশবৎসর ব্যাপী রাজকোষের অর্থাভাব বাংলা দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি স্থগিত রাখিয়াছে।

কৃষি-শিল্পের উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন?

ভারতের কৃষি-শিল্প এক্ষণে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে গিয়াছে। এসম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ ভাবে কোন দায়িত্ব নাই। গবেষণা কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত ভারত গভর্ণমেণ্ট ইম্পীরিয়াল এগ্রিকালচার্যাল কাউন্সি-লের হাতে এযাবৎ দেড় কোটী টাকা দিয়াছেন। কৃষি সম্বন্ধে যে "রয়্যাল কমিশন" নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশ অনুসারেই উক্ত ইম্পীরিয়্যাল এগ্রিকালচার্যাল কাউন্সিল ১৯২৯ সালে গঠিত হয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিবার দায়িত্ব অর্পিত হয়। প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগের মন্ত্রীদের

মধ্য হইতে এই ইম্পীরিয়্যাল কাউন্সিলের পরিচালক নির্ব্বাচিত হন। ভারতের দেশীয় রাজগণও ইহাতে যোগদান করেন। তন্মধ্যে হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, বরদা, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর ভূপাল এবং কোচীন রাজ্যের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই রাজন্যবর্গ কাউন্সিল-তহবিলে অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন।

তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে, শিক্ষালাভের নিমিত্ত এই কাউন্সিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই গবেষণা কার্য্য সুনিয়মিতরূপে পরিচালনা করিবার নিমিত্ত কাউন্সিল ন্যূনাধিক ২৫০ জন কর্ম্মচারীকে বৃত্তি দিতেছেন। কাউন্সিলের চেষ্টায় পুষার কৃষি-বিদ্যালয়ের সহিত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের যোগ সাধিত হইয়াছে। ইহাতে উক্ত কৃষি-বিদ্যালয়কে আরও প্রসারিত করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং বরদায় প্রায় ১১টী কেন্দ্রে চিনি প্রস্তুত সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষামূলক কার্য্য চলিতেছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে কাঁচা মাল রক্ষা করা যায় এবং ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয়, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত দুইটী কমিটী গঠিত হইয়াছে।
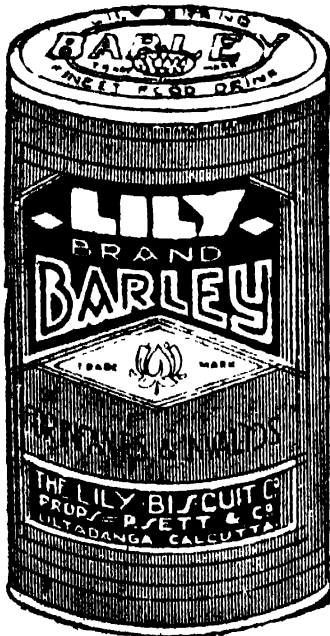
পণ্ডিত জওহর লালের সোস্যালিজ্‌ম

দুনিয়া আজ যে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে এবং যার প্রভাব ভারতবর্ষ কিছুতেই এড়াতে পারছে না, সে সম্পর্কে অনেকেই অনেক মতামত ব্যক্ত করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁর মালয় দ্বীপের বক্তৃতায় বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। জগতের নানা ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মতামত সুচিন্তিত। সুতরাং তাঁর মতামত সম্পর্কে কেউ একমত না হ'লেও সেটাকে উপেক্ষা করা চলে না, ভেবে দেখতে হয়। জহরলালজীর এই বক্তৃতায় অনেক কিছু ভাববার বিষয় আছে।

প্রথমেই বলে রাখি যে, অপরাপর নেতাদের সঙ্গে পণ্ডিতজীর তফাৎ হচ্ছে যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। বিংশ শতাব্দীতে বাস করে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান দিয়ে কোন জিনিষের বিচার করেন না। জনপ্রিয়তা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর পরেই তাঁর স্থান; কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, মহাত্মার জনপ্রিয়তা ম্যাজিকের উপর প্রতিষ্ঠিত আর জহরলালের জনপ্রিয়তা লজিকের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ মহাত্মাকে ধার্ম্মিক মহাপুরুষ বলে সকলেই ভক্তি করে যতই কেন না তাঁর সঙ্গে অপরের মতবিরোধ থাকুক; আর জহর লালের প্রগতিমূলক মতবাদকে যে সমর্থন করে সেই জহরলালকে ভালবাসে, যাদের সঙ্গে জহর লালের মতে মেলে না তারা তাঁকে সমাজের শত্রু বলে ভয় করে। জহরলালের কাছে ধর্ম্ম-তত্বর চেয়ে রাষ্ট্রনীতিই বড় জিনিষ। গান্ধীর মতো জনসাধারণের নাড়ী টিপে ধরে বিহারের ভূমিকম্পকে বিহারীদের পাপ বলে তিনি অভিহিত করতে পারেন না। অথচ এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, গান্ধীজীর দৌলতেই তাঁর যত জনপ্রিয়তা! জাতীয় সভার সভাপতিরূপে তিন বার নির্ব্বাচিত হওয়ার মধ্যে দু'বার তিনি নির্ব্বাচিত হ'ন গান্ধীজীর কৌশল এবং কারসাজীতে। অথচ জহরলালের প্রতিভা যতদিন মহাত্মার প্রভাবে ঢাকা ছিল ততদিন তিনি এতটা জনপ্রিয় হ'তে পারেন নি।

জহরলালের এতটা জনপ্রিয় হবার কারণই হচ্ছে তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি। পঠদ্দশায় তিনি ছিলেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ছাত্র, সেইটাই তাঁকে তাঁর মতবাদ গঠনে সাহায্য করেছে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হলেও একে শিল্প প্রধান না করলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি সম্ভব নয়; এসত্যটা সভাপতির আসন থেকে তিনিই জোর গলায় ঘোষণা করেছেন।

তিনি তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন যে, তিনি সোসিয়ালিষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু তা' বলে তিনি গোঁড়া মার্কসিষ্ট নন্। তাঁর মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুয়েরই সমন্বয় আছে, তাঁর আত্মচরিত থেকে জানা যায় যে তাঁর মনটা পাশ্চাত্যের দিকেই বেশী করে ঝোঁকে। এই কারণেই তিনি অমন বৈজ্ঞানিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হ'তে পেরেছেন, এই জন্যই ষ্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকা তাঁর সভাপতির অভিভাষণের সমালোচনাচ্ছলে মন্তব্য করেছিল—An Englishman speaks !

জহরলালের এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিমার জন্যই একদল ক্যাপিটালিষ্ট তাঁকে অত্যন্ত ভয় করে। তিনি নিশ্চিত জানেন যে, আজকের যুগ হচ্ছে শিল্প প্রসারণের যুগ, সুতরাং সে দিকটায় কেউ যদি অন্ধ হ'য়ে থাকে ত তার দ্বারা দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। এই জন্যই তিনি এমন অসম্ভব কথা বলেন না যে, ভারতের উন্নতি চরকার সূতায় বাঁধা রয়েছে। বরং তিনি বলেন যে, যন্ত্রশক্তির সাহায্য নিযে দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসারতায় লেগে যাও, বিংশ শতাব্দীতে সপ্তদশ শতাব্দীর আদর্শ চলবে না। তিনি মনে প্রাণে দেশকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজ্ করবার পক্ষপাতি, সুতরাং দেশের বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কে তিনি যদি কোন মতামত প্রকাশ করে থাকেন ত সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হ'বে।

তাঁর মতামতের বিচার করবার সময় আমরা তাঁর সম্পর্কে যে এতখানি আলোচনা করলাম তার কারণ হচ্ছে যে, তাঁকে না বুঝলে তাঁর মতামত সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। আজ তাঁর কথা যে লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করছে তার কারণ তিনি অর্থনৈতিক দাবীর সম্পর্কে লোককে সচেতন করছেন। এই অর্থনৈতিক দাবী ও অর্থনৈতিক সমস্যার গোড়ার কথা হ'ল লেবার ও ক্যাপিট্যালের বিরোধ ; সে সম্পর্কে জহরলাল প্রশ্ন করছেন—What exactly are we driving at when we talk of labour and its future ? Is it just to maintain a large force of labour with a certain minimum degree of security and comfort, ever supplying larger dividends to industry, but with no other vital change in their condition ? Or do we think in terms of raising them educationally, culturally and economically ever to higher levels and making them true citizens of the country they live in and of the larger world ? ঐ প্রশ্নের মধ্যেই বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার মূল জিজ্ঞাসা নিহিত রয়েছে এবং সেইজন্য জহরলাল বলেছেন যে যদি শ্রমিকদের প্রকৃত উন্নতি কামনা করা যায় ত উপরোক্ত দ্বিতীয় পন্থাটিই আমাদের গ্রহণ করতে হ'বে।

আমরা সকলেই জানি যে, দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারতা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং জনসাধারণের তাতে অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে যে, বর্ত্তমানে দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার সত্ত্বেও বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশের লোকের অবস্থা ভাল হওয়া দূরে থাকুক বরং ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে। এসম্পর্কে জহওরলাল বলেছেন,—

The rapid progressive growth of the machine technique in industry, a growth which means ultimately greater production of wealth and higher standards for all, has strangely resulted in paralysing industry to some extent in the most highly developed industrial countries of the world by increasing unemployment and lessening purchasing power. এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—The growth of man must keep pace with the growth of the machine or else both will go under. বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমান ক্যাপিটালিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই তার ধ্বংসের বীজ লুক্কায়িত আছে।

পণ্ডিতজী এই সমস্ত ব্যাপার বিশ্লেষণ করে নিরন্তর নিজের মনো প্রশ্ন করেছিলেন যে, কেন এমন হয়? শিল্প ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের যদি উদ্দেশ্য থাকে দেশের লোকের অবস্থার উন্নতি করা তবে তা' হয়ে ওঠে না কেন? কেন জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না অথচ বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে? সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে একটা মারাত্মক গলদ না থাকলে কিছুতেই এ জিনিসটা সম্ভব হয় না। সেই গলদের মূল হেতু হচ্ছে economic policyর অদূরদর্শিতা। যাঁরা economist, তাঁরা আজকের সমস্যামূলক দৃষ্টিতে সমস্ত বিষয় প্রণিধান করে economic policy নিয়ন্ত্রিত করেন নি, পরন্তু পুরাতন দৃষ্টীভঙ্গী নিয়েই বর্ত্তমান সমস্যার বিচার করেছেন। তাই পুরাতন মতবাদ আজকের দিনের প্রগতির সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে উঠতে পারছে না। সমাজের অন্যান্য সকল ব্যাপার যদি dynamic হয় এবং প্রয়োজনের তাগিদে তাদেরও যদি পরিবর্ত্তন ঘটে তবে economicsএর ক্ষেত্রে খানিকটা ওলট পালট না ঘটতে দেওয়ার কোনই হেতু নেই। Economicsএর ক্ষেত্রে এরকম পরিবর্ত্তনের যে কোন নজীর নেই তা' নয়, বরঞ্চ তার আদর্শগত পরিবর্ত্তন ঘটেছে এমন নিদর্শন পাওয়া যায়। পূর্ব্বেকার economistদের অদূরদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণতার ফলে এক সময়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর জনসাধারণের ঘৃণা জেগেছিল, তারা ভাবত যে economics হচ্ছে কৃপণের অর্থ বৃদ্ধির শাস্ত্র। সেটা ভেবেই Ruskin ইকনমিক্সকে gospel of Mammon বলে অভিহিত করেছিলেন, কারণ তখন Economics-এর আদর্শ ছিল মানুষের ধনবৃদ্ধি করা। অনেকদিন কেটে যাবার পর আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ Economics এর সেই আদর্শগত ত্রুটি ও সঙ্কীর্ণতা বুঝতে পেরে সেটাকে শুধরে নিয়ে ঘোষণা করলেন যে ইকনমিক্সের আদর্শ হচ্ছে To increase the wealth of man in relation to his utility. এই Utility টাই হ'ল বড় কথা, তা' নাহ'লে কৃপণও ত নানান্ উপায়ে তার ধনবৃদ্ধি করে, তার পলিসিকে কেউই ইকনমি বলবে না কিংবা তার শাস্ত্রকেও কেউ ইকনমিক্স নাম দেবে না।

ইকনমিক্সের ঐ আদর্শগতি ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে, কেননা, তখন লোকে বুঝেছিল যে ইকনমিক্সের ঐ সঙ্কীর্ণতা সমাজ জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না। তাই তারা Utility কথাটা জুড়ে দিয়েছিল।

তাদের মতে ইকনমিক্সের আদর্শ শুধু efficient production নয়, equitable distribution ও ; কিন্তু আজকের সমাজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, সেই equitable distribution এর অভাব হয়েছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেখানে equity নেই, সেখানে বেকার সমস্যা যে বৃদ্ধি পাবে এবং জনসাধারণের হাতে ক্রয় ক্ষমতা থাকবে না এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে! ইকনমিক্সের আদর্শ ও পলিসির বিরোধ ও অসমন্বয়ই এর কারণ। পূর্ব্বেকার সমাজে production আজকের মত বৃদ্ধি পায় নি, তাই distribution-এর পুরাতন পলিসি সেখানে ততটা ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায় নি। কিন্তু আজকের অতি-উৎপাদনের যুগে disribution এর সে-ব্যবস্থা অচল। অথচ সমাজে জোর করেই সেই ব্যবস্থা চলে আসছে!

ইকনমিক্সের এই আদর্শ ও পলিসির বিরোধ এবং বর্ত্তমান যুগে অকেজো পুরাতন থিয়োরির জের টানা সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল দীর্ঘ মন্তব্য করে বলছেন—So used were we in the past to a lack of the good things of life that we built up an Economics of scarcity. When plenty came we thought and acted in the same way, and even went to the extent of destroying large quantities of commodities and restricting production to fit in with our out-of-date Economics. It was an astonishing spectacle only possible in our topsy-turvy world and it was a foolish attempt for we must live up to Science and the machine and their inevitable consequences. Crisis came and slump and depression and we imagine now that we are out of the wood. But the conflict betwen an age of plenty and an Economics of scarcity continues. পণ্ডিতজীর ন্যায় এরকম সূক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আর কোন নেতা করেছেন কিনা সন্দেহ। আমরা উপরে যে তথ্যের আলোচনা করেছি পণ্ডিত জওহরলাল ঠিক সেই বিষয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন। Economics এর পুরাতন ব্যবস্থা আর চলবে না, কেননা, বর্ত্তমানের অতি-উৎপাদনের সঙ্গে তা, কিছুতেই খাপ খাচ্ছে না। পুরাতন ইকনমিক্ থিয়োরি বর্ত্তমানের অতিরিক্ত উৎপাদনকে নষ্ট করে ফেল্‌তে বলছে, কিংবা মাল উৎপাদন বন্ধ করতে বলছে; সেটা করা মানে বিজ্ঞানের বিপক্ষে যাওয়া। আমরা আজ যন্ত্রশক্তির কল্যাণে অনেক কিছু ক্ষমতা আয়ত্ব করেছি, সে-ক্ষমতাকে আমরা কেন হাতছাড়া করব? এই ক্ষমতাকে যথাযথ বজায় রেখে কি করে অবস্থার উন্নতি করা যায় অর্থাৎ efficient production এর সঙ্গে কি করে equitable distribution-এর ব্যবস্থা করা যায়, তার হদিস্ পুরাতন ইকনমিক্ ব্যবস্থা দিতে পারে না। এইখানেই যত গলদ। তখনকার সময় অর্থাৎ পুরাতন ইকনমিষ্টদের আমলে বিজ্ঞান এত বেশী উৎপাদন-ক্ষমতা আমাদের হাতে প্রদান করতে পারে নি, তাঁদের সময় শাস্ত্রটা ছিল Economics of Scarcity, সুতরাং Scarcityর সময় distributionএর ব্যবস্থাটা

ছিল একরকম। আজকের অবস্থা অন্যরকম, আজ আর Scarcity-র যুগ নয়, আজ plenty-র যুগ। এর distribution ব্যবস্থা অন্যরকম হওয়া উচিত, কিন্তু এখনো আমরা Economics of Scarcity দিয়ে সব জিনিসের বিচার ও ব্যবস্থা করছি, ভুলেও ভাবছি না যে ইকনমিক্স আজকে out-of-date হ'য়ে পড়েছে। ঠিক এই জিনিসটির জন্যই ক্রমাগতঃ অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিচ্ছে এবং জওহরলালের ভাষায় the conflict between an age of plenty and an Economics of Scarcity বেড়ে চলেছে!

এ বিরোধ কিসে মেটে? সারা দুনিয়ার কাছে আজ ঐ এক প্রশ্ন যে, এ বিরোধ কিসে মেটে? ক্যাপিটালিষ্ট ইকনমিষ্টরা এর কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারছেন না। তাঁরা প্ল্যানিং এর ব্যবস্থা করছেন বটে, কিন্তু সে-প্ল্যানিংও সেই Economics of Scarcity-র আদর্শে গড়া। সুতরাং ক্যাপিটালিষ্ট ইকনমিষ্টদের দ্বারা কি করে আর ঐ বিরোধের সমাধান ঘটবে?

তবে কি এ সঙ্কট অবস্থার থেকে কোন পরিত্রাণ নেই? আছে। পণ্ডিত জওহরলাল বলছেন—A socialist has a clear and Scientific way out of this muddle. সত্যিই তাই। অপর কেউই সমাজতন্ত্রীদের মত এত সূক্ষ্ম ও নির্ভুলভাবে বর্ত্তমান সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে দেখে নি। অপর সকল মতবাদ যেখানে বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থার প্রকৃত হেতু নির্ণয়ে অসমর্থ হয় এবং যে-সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় নির্দ্ধারণ করতে পারছে না, সোসিয়ালিজম সেখানে মাভৈঃ রবে উপস্থিত হয়ে বলছে—হে বিশ্ববাসী, আমাকে গ্রহণ কর, নয় যুক্তিতর্কের দ্বারা আমার গলদ ও অনুপযুক্ততা দেখিয়ে দাও, কিন্তু আমায় আর উপেক্ষা করে নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন কোরো না। সোসিয়ালিজমের এই নিবেদন বিশ্বের নিপীড়িতদের কর্ণে প্রবেশ করেছে, তাই আজ দেখতে পাচ্ছি দুনিয়ার সকল যায়গায়ই একটা নব-জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, জওহরলাল বলেছেন A Socialist has a clear and scientific way out of this muddle. প্রশ্ন উঠবে যে কি করে তা সম্ভব হয়, তার জবাবে জওহরলাল দীর্ঘ মন্তব্য করে বলেছেন—He (Socialist) would introduce an Economics of plenty to fit in with this age of plenty. He would encourage production to its furthest limit, and he would produce for consumption and not for profit, and all the profit of industry would go to the community ever raising its standards as the wealth of tha country increases. There is no limit to this process as there is no limit to the progress and advancement of man. Private monopoly would be avoided and wages and salaries would be so adjusted as to give enough purchasing power to the

community to consume all the goods produced. There can then be no unemployment and there can be no trade slump.

যতই মতবিরোধ থাকুক না কেন, জওহরলালের উপরোক্ত কথাগুলি ভেবে দেখবার বিষয়। আমরা যদি আমাদের এই বর্ত্তমান মন্দার হাত থেকে রেহাই পেতে চাই তা'হ'লে আমাদের জওহরলালের উল্লিখিত ব্যবস্থা মেনে নিতে হ'বে, নয়ত যুক্তিতর্ক দ্বারা ওটাকে বাতিল করে ওর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা বাৎলাতে হ'বে। নইলে শুধুমাত্র নতুন মতবাদের নিন্দা করে এবং পুরাতন ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে কোন কল্যাণকর ফল পাওয়া যাবে না। জওহরলালের প্রথম বক্তব্য হচ্ছে যে, আজকের প্রাচুর্য্যের যুগে আমরা যে ইকনমিক্স অনুসরণ করব, সেটা যেন economics of scarcity না হ'য়ে economics of plenty হয়। সে ইকনমিক্স অব প্লেন্টি-র আদর্শ হবে বিজ্ঞানের সাহায্যে যতটা পারা যায় ততটা মাল উৎপন্ন করা। আজকের ইকনমিক্স অব স্কারসিটির মত উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা নয়। আর সেই মাল উৎপাদনের লক্ষ্য profit নয়, মাল উৎপাদনের লক্ষ্য consumption. সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইকনমিক্স অব প্লেন্টি ও ইকনমিক্স অব স্কারসিটির মধ্যে মূলতঃ বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। এই বিরাট পার্থক্যের ব্যাপারটাই আমাদের ভালকরে ভেবে দেখতে হ'বে।

যুক্তিতর্কের সাহায্যে যদি উক্ত দু'রকম ইকনমিক্সকে বিশ্লেষণ করা যায় ত দেখা যাবে যে, সে-যুগ অর্থাৎ ক্যাপিটালিজমের প্রথম যুগটা ছিল অপ্রাচুর্য্যের যুগ; আর এ-যুগটা হ'ল প্রাচুর্য্যের যুগ। এ বিষয়টা নিয়ে কারও মতভেদ নেই। এখন কথা উঠবে যে, অপ্রাচুর্য্যের যুগের ইকনমিক্স, প্রাচুর্য্যের যুগে তা' সচল কি'না? আমরা আমাদের আর্য্য ঋষিদের অনুষ্ঠিত বর্ত্তমান সামাজিক অনুষ্ঠানের নিন্দা করে থাকি এই বলে যে, পূর্ব্ব পুরুষের লোকেরা যতই কেন তাঁরা মননশীল হোন না, উত্তর পুরুষের জীবন যাত্রার পদ্ধতি বেঁধে দিতে পারেন না। কেননা, কালপ্রবাহে সব কিছুরই পরিবর্ত্তন আছে, কিছুই শাশ্বত নয়। সমাজশাস্ত্রের বেলায় যে যুক্তি খাটে, অর্থশাস্ত্রের বেলায় তা' খাটবে না কেন? এ বিষয়ে কিছুই মতবিরোধ নেই যে, সেদিনকার অপ্রাচুর্য্যের যুগ আজ প্রাচুর্য্যের যুগে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। সুতরাং সেদিনকার অপ্রাচুর্য্যের ইকনমিক্সের আজ ত প্রাচুর্য্যের ইকনমিক্সে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। সে-জিনিসটাই ঘটে নি, অথচ সেদিনকার ইকনমিক্ আদর্শ ও পদ্ধতি আজকের প্রাচুর্য্যের যুগের সঙ্গে মোটেই খাপ খাচ্ছে না। দৃষ্টান্তের স্বরূপ ধরা যাক, প্রচুর উৎপাদনের কথা। পুরাতন ইকনমিক ব্যবস্থা-নুযায়ী আজ চারধারে কেবল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করবার প্রচেষ্টা চলেছে, তা' না হ'লে ব্যবসা বাজারে পণ্যদ্রব্যের দর পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সেইজন্যই লক্ষ লক্ষ মণ গম কিম্বা অপরাপর দ্রব্য পুড়িয়ে দেওয়া হয় তবুও ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা হয় না। পুরাতন অর্থনৈতিক পদ্ধতি এ ছাড়া ব্যবসা রক্ষার আর কোন উপায় খুঁজে পায় না, অথচ এ-পদ্ধতি আমাদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা মানে বিজ্ঞানের বিপক্ষে যাওয়া, বিজ্ঞান আমাদের যে কার্য্যক্ষমতা প্রদান করেছে আমরা তার সদ্ব্যবহার

না করে বরং সেটাকে আমরা পঙ্গু করে রাখছি। অর্থাৎ কোন কারখানায় যদি উৎপাদন ক্ষমতা একশো টন থাকে, আমরা তা' নিয়ন্ত্রণ করে ৭৫ টনে পরিণত করছি। ফলে ২৫ টন করে দ্রব্যের আমাদের অযথা অপচয় হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ঐ একশো টন মাল উৎপন্ন করতে কারখানায় হয়ত ৪০০০ লোক নিযুক্ত ছিল। যেমনি কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা ৭৫ টনে সীমাবদ্ধ করা হল, তেমনি কারখানার ঐ ১০০০ লোক বেকার হ'য়ে পড়ল, কেননা কোম্পানী তাদের নিশ্চয়ই বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেবে না। এখন ঐ হাজার লোক কোথায় কাজ পাবে? শুধু ঐ হাজার লোক নয়, সকল শিল্প ব্যাপারেই অতি উৎপাদনের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়ার দরুণ হাজার লোক বেকার হ'য়ে পড়ছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, দেশে শিল্প-বাণিজ্য চালু থাকলে বেকার সমস্যার সমধান হ'বে এই যে ধারণা, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দ্বারা তা' অমূলক বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে এবং যতই নিয়ন্ত্রণ পন্থা অবলম্বন করবার চেষ্টা চলেছে ততই দেশে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমাজতন্ত্রীদের ভাষায় এই জিনিসটাকে ক্যাপিটালিজমের Contradiction in itself বলা হয়। অর্থাৎ ক্যাপিটালিষ্ট উৎপাদন-পদ্ধতি ঘোষণা করে যে তদ্দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধিত হ'বে। কার্য্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তার তা' করবার মোটেই সামর্থ্য নেই। যেমন পূর্ব্বেকার উদাহরণে দেখা গেল যে, ৪০০০ লোককে প্রথমে কাজ দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু ঘটনাক্রমে ১০০০ লোককে পদচ্যুত করতে তা বাধ্য হ'ল। এইভাবে দেখা যায়, সমাজের উন্নতি করা ত দূরে থাকুক, বরং সমাজে বেকার সমস্যাই বৃদ্ধি পায়। এর কারণ হচ্ছে যে যতদিন ক্যাপিটালিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় থাকবে ততদিনই অতি উৎপাদন ঘটবে এবং প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান থাকার দরুণ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানাদি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হ'বে ও তজ্জন্যই পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সমাজে বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে।

এই হ'ল ক্যাপিটালিজম ও ক্যাপিটালিষ্ট পৃষ্ঠপোষিত Economics of scarcity-র প্রধান গলদ। ক্যাপিটালিষ্ট ইকনমিষ্টরা যে এই

contradiction in itself-কে বোঝেন না তা' নয়, বরং তাঁরা বুঝেও সেটাকে ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেন। ফলে, সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার এতটুকু উন্নতি ঘটে না। এইরকম গতানুগতিকতা আর কতদিন চলতে পারে?

এখন দেখা যাক্, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইক্‌নমিক্স অব্ প্লেণ্টি ··· কতটা কার্য্যকরী হ'তে পারে। পূর্ব্বেই বলেছি যে, ইক্‌নমিক্স অব্ প্লেণ্টির লক্ষ্য profit নয়, এর লক্ষ্য হ'ল consumption. এইটাকে যদি আমরা বুঝতে পারি ত ইকনমিক্স-অব-প্লেণ্টি বুঝতে কষ্ট হ'বে না। লক্ষ্য যদি profit থাকে ত তাহ'লে ইক্‌নমিক্স-অব্ স্কারসিটির মত প্রতি-যোগিতা দেখা দেবে এবং তাহ'লেই পুনরায় উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হতে হ'বে, আর তার ফলেই ক্রমশঃ বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু profit এর দিকে যদি লক্ষ্য থাকে ত প্রতিযোগিতা মোটেই দেখা দেবে না, কারণ, লাভ করবার জন্যই প্রতিযোগিতা সুরু হয়। এখন কথা উঠবে যে, বেশী মাল উৎপাদন করে কি করব? তার জন্যই বলা হয়েছে যে, ইক্‌নমিক্স-অব্-প্লেণ্টির লক্ষ্য হ'ল consumption. যে পরিমাণ জিনিষ উৎপন্ন হ'বে তাই জনসাধারণের মধ্যে প্রদান করা হ'বে যাতে সবাই সেটা সমান ভাবে ভোগ করতে পায়। সুতরাং এখানে অতি উৎপা-দনের আশঙ্কা নেই।

কিন্তু এখানে একটা জিনিষ মনে রাখা কর্ত্তব্য। Economics of plentyর প্রবর্ত্তন করতে গেলে state competitionএর প্রয়ো-জন। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই সমস্ত শিল্প-ব্যাপারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'বে।

রাষ্ট্রই সবকিছু উৎপাদন করবে এবং রাষ্ট্রই তার দর বেঁধে দেবে। এ-জিনিসটা না হ'লে ইকনমিক্স অব প্লেণ্টির প্রবর্ত্তন কার্য্যকরী হ'বে না। ষ্টেট্-ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি এই যে, এতে প্রতিযোগিতা না থাকার দরুণ ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। কিন্তু প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান থাকার যে কী শোচনীয় পরিণাম তা' আমরা পূর্ব্বেই প্রত্যক্ষ করেছি। প্রতিযোগিতাসঙ্কুল ইকনমিক্স অব স্কারসিটি দিয়ে এতদিন আমাদের দুঃখদুর্দ্দশা মোটেই ঘোচে নি, বরং তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ইকনমিক্স অব্ প্লেণ্টির অনুবর্ত্তী হয়েই দেখি না কেন তাতে কি হয়।

আমরা শিল্প ব্যাপারের উভয় দিকটাই লিপিবদ্ধ করলাম, এখন পাঠকগণ বিচার করুন কোন্ ইকন্‌মিক্স অনুসরণ করলে আমরা প্রকৃত লাভবান্ হ'তে পারব। শিল্প ব্যাপারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, শ্রমিকদের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। শ্রমিকদের এবং জনসাধারণের হাতে যদি প্রচুর ক্রয়-ক্ষমতা থাকে তা'হলে সমস্ত শিল্প বাণিজ্য বেশ চালু থাকবে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, ইকনমিক্স অব্ স্কারসিটি প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান ব্যবস্থায় জনসাধারণের হাতে ক্রয় ক্ষমতা প্রদান করা সম্ভব নয়। সুতরাং কিসে শিল্প ব্যাপারের উন্নতি হ'তে পারে এসম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তি মাত্রই তার বিচার করবেন।

মোম বাতি

বাতির আলোচনা প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না যে, আমাদের হিন্দু সভ্যতার পিলশুজের উপর জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলেছে, আর ইউরোপীয় সভ্যতার বাতি দানের উপর প্রতীচ্য সংস্কৃতির আলোক প্রজ্বলিত হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার যে প্রভেদ সেটা হ'ল কতকটা পিলসুজ ও বাতি দানের প্রভেদ। ওদের পূর্ব্বতন সভ্যতা রোম্যান্ ক্যাথলিক্ সভ্যতা, তাই ওদের জন্ম মৃত্যুতে, বিবাহে, ধর্ম্মসাধনায়, জীবনযাত্রার দৈনন্দিন কর্ম্মপদ্ধতিতে বাতিদান না হ'লে চলে না। আর আমাদের হিন্দু-সংস্কৃতি প্রদীপের উপাসক, তাই আমাদের ধর্ম্ম-আরাধনা ও জীবন নির্ব্বাহের প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে প্রদীপ অপরিহার্য্যরূপে জড়িয়ে আছে। আসলে আমরা বাতির ভক্ত কোন দিনই নই, ওরাও প্রদীপ সম্পর্কে কোন দিনই আগ্রহ দেখায় নি, যদিও উভয়তঃই আমরা আলোর উপাসক।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই যে সূক্ষ্ম প্রভেদ, একে বিদূরিত করেছে যন্ত্র বিপ্লব, সহর-সভ্যতাকে জন্ম দিয়ে।

এই সহর-সভ্যতার কল্যাণে বাতি কিংবা প্রদীপ কেবল মাত্র পল্লীর সীমার মধ্যেই নির্ব্বাচিত হয়ে আছে, সহরে তাদের প্রবেশাধিকার ঘট্‌ছে মাত্র বিশেষ প্রয়োজনের পাস্‌পোর্ট দেখিয়ে। সহর থেকে যে বস্তু ওদের নির্ব্বাসন দিলে তাদের নাম হ'ল কেরোসীন, গ্যাস ও বিদ্যুৎ। এই কেরোসীন, গ্যাস ও বিদ্যুৎই হচ্ছে সহর সভ্যতার অন্যতম প্রধান বাহন।

কিন্তু দেশের পক্ষে সহর-সভ্যতা প্রগতিমুখী হ'লেও সমস্তটা নয়, সহরের বাইরে যে বিরাট পল্লীজীবন পড়ে রয়েছে মানুষের উপর তার প্রভাব অনেক বেশী। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক পল্লীবাসী, কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে, পল্লীবাসী হলেও তাদের সঙ্গে বাতির পরিচয় নেই, প্রদীপের পরিচয় আছে। তবুও বাতি জিনিষটা আমাদের আরও অনেক কাজে লাগে, সুতরাং বাতি সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না।

বস্তুতঃ পক্ষে ইউরোপের কোন মুদিখানা কিম্বা তৈল ব্যবসায়ীর দোকানে বাতিটা পণ্য দ্রব্যের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ, কেননা, সেখান-

কার লোকদের মোম বাতি না হ'লে চলে না। আধুনিকযুগে মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক নগর ও সহর সমূহ ইলেক্ট্রীক বাতি কিম্বা গ্যাসের আলোর সাহায্যে আলোকিত করবার ব্যবস্থা হইয়াছে; ইতিহাসে খ্যাত আছে যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কনস্টান্টিনোপল্‌কে আলোকিত করবার জন্য বহু মোম বাতির প্রয়োজন হ'ত। স্যাক্সন যুগে রাজা আলফ্রেডের পুরোহিতগণ ছিলেন রাজকীয় বাতি বিক্রেতা। অনেকে ভাবেন যে 'মোম' বাতি বুঝি আধুনিক যুগের অবদান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওটা পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গিল্‌বার্ট্‌ হোয়াইট্‌ কর্ত্তৃক লিখিত 'ন্যাচারল্‌ হিষ্টরী অব্‌ সেল্‌বোর্ন' এ হ্যাম্পস্যায়ার প্রদেশে মোম বাতি তৈরীর এক চমৎকার বর্ণনা আছে। কিন্তু মোম বাতি তৈরীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয় বৈজ্ঞানিক শেভ্‌রিউল কর্ত্তৃক চর্ব্বির উন্নতিমূলক গবেষণায় এবং ১৮৫৪ সালে জেম্‌স্‌ ইয়ং কর্ত্তৃক সাদা প্যারাফিন ওয়াক্স্‌ উৎপাদন প্রণালী উদ্ভাবনে।

বাতি প্রস্তুত কালে বাতিতে যে রকম উপাদান ব্যবহৃত হয় তদনুযায়ী তার শ্রেণী বিভাগ হ'তে পারে। উক্ত শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী কতকগুলি বাতির নাম দেওয়া গেল :—কম্পোজিট, প্যারাফিন, স্পার্ম্‌, ষ্টিয়ারিন, ট্যালো, ওয়াক্স প্রভৃতি। বাতিতে ব্যবহৃত ওয়াক্স খনিজ, জান্তব বা উদ্ভিজ প্রকৃতির হয়ে থাকে। উৎপাদন প্রণালী অনুসারে বাতির তিন রকম নাম হয় যথা :—ডিপ্‌ ক্যাণ্ডল্‌, মোল্ডেড্‌ ক্যাণ্ডল্‌ ও পোর্ড ক্যাণ্ডল্‌। বর্ত্তমানে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ষ্টিয়রিন উপাদানে প্রস্তুত বাতি এবং শীত প্রধান দেশে খনিজ মোম দ্বারা প্রস্তুত বাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খনিজ মোম দ্বারা প্রস্তুত বাতির আলো বেশ শাদা হ'য়ে থাকে কিন্তু ও একটু গরম হ'লেই বেঁকে পড়ে, সেইজন্য ওর সঙ্গে ষ্টিয়ারিন সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত করে দেওয়া হয়। মোম বাতির যে পল্‌তে থাকে তাকে প্রথমে একটা কেমিক্যাল সলিউশনে ভিজিয়ে নেওয়া হ'য়ে থাকে, উক্ত সলিউসনে সোহাগা, নাইটার, স্যাল্‌ এ্যামোনিয়াক্‌, পটাসিয়াম ক্লোরাইড ও ক্লোরেট, ফস্‌ফরাস্‌ জনিত পদার্থ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে। পল্‌তেকে এই সলিউশনে একদিন ভিজিয়ে রাখবার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওর ছাই পড়া ও ধূমোদ্গম নিবৃত্ত করা। উক্ত সলিউশনে পল্‌তেকে একদিন ভিজিয়ে রাখবার পর উহা মেসিন সাহায্যে শুষ্ক করা হয়।

আজকাল 'মোল্ড' ক্যাণ্ডলই বেশী রকম বাজারে চলে। মোল্ড ক্যাণ্ডল্‌ তৈরী করবার সমস্ত প্রণালী এক জটিল ব্যাপার, কিন্তু তার আসল প্রকৃতিটা সহজেই বোঝা যেতে পারে। কতকগুলি বাতির ছাঁচ পাশাপাশি সাজানো আছে এবং প্রত্যেকটি ছাঁচের এক প্রান্ত সংলগ্ন একটি বড় পাত্রে প্যারাফিন কিংবা ষ্টিয়ারিন ঢালা আছে। প্রত্যেক ছাচের অপর প্রান্তে একটি করে 'পিষ্টন' লাগানো এবং প্রত্যেক পিষ্টনের মাঝখান দিয়ে বরাবর পল্‌তের সাইজে একটি সরু গর্ত্ত থাকে। বাতি তৈরীর সময় প্রত্যেক পিষ্টনে প্রথমে পল্‌তে লাগানো হয়, তারপর পাত্র থেকে প্যারাফিন কিংবা ষ্টিয়ারিন নিয়ে ছাচগুলি পূর্ণ করা হয়। তারপর যন্ত্র সাহায্যে পিষ্টনগুলিকে উপর দিকে ঠেল্‌লেই পল্‌তে সমেত বাতি ছাচের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। এইবার পিষ্টনগুলি নীচে

নামানো হয়, পুনরায় প্যারাফিন কিংবা ষ্টিয়ারিন দ্বারা ছাঁচ ভর্ত্তি করা হয় এবং পুনরায় পিষ্টন গুলিকে উপর দিকে তোলা হয়। এরই পুনরাবৃত্তি চলে বারবার এবং প্রতিবারই কতক-গুলি করে বাতি উৎপাদিত হ'তে থাকে। সমস্ত ছাঁচগুলিই ষ্টীম্-পোরা জ্যাকেট দিয়ে মোড়া থাকে যাতে করে ভেতরকার তাপ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যায়।

ওয়াক্স দিয়ে বাতি ঢালাই কার্য্য ভাল হয় না। কারণ, ঢালাই কার্য্যের সময় ওয়াক্স ছাঁচের গায়ে লেগে যায়। এক্ষেত্রে পল্‌তেটাকে একটি পরাতের গায়ে ঝুলিয়ে রেখে সুতাটা বারংবার ওয়াক্সে ডোবানো হয় ও ওঠানো হয়। এই রকম ভাবে প্রতিবারে পল্‌তের গায়ে একটু একটু করে মোম লেগে ওটা যখন বেশ পুরু হ'য়ে ওঠে তখন সেটাকে মার্ব্বেল পাথরের গায়ে গড়িয়ে মসৃণ করা হয়। তারপর ছুরির সাহায্যে দু'প্রান্ত কেটে ফেলে মুখের দিকটা হাত দিয়ে টিপে সরু করা হয়ে থাকে। গীর্জ্জায় প্রয়োজনীয় বাতি এবং ঘোড়ার গাড়ীর আলোর বাতি অধিকাংশই এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়।

ডিপড্ ক্যাণ্ডেল পূর্ব্বে যে প্রক্রিয়ায় উৎ-পাদিত হ'ত এখন তার বহুলাংশে উন্নতি ঘটেছে। এখন সরু সরু ষ্টিলের রড্ তরল ট্যালোর মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং তার গায়ে যখন আবশ্যকীয় সাইজ অনুযায়ী ট্যালো লেগে যায় তখন সেটাকে নিয়ে ঠাণ্ডায় জমতে দেওয়া হয়। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে রড্‌গুলো বার করে নেওয়া হয়ে থাকে এবং বাতির মধ্যে যে গর্ত্ত হ'য়ে যায় তাতে পল্‌তে পুরে দেওয়া হয়। পুরাতন প্রক্রিয়া অপেক্ষা এই নূতন প্রক্রিয়া লাভজনক।

উৎপাদনের সুবিধার জন্য কোন কোন বাতি একেবারে লম্বা লম্বা রড্ আকারে প্রস্তুত হয়ে থাকে; তারপর তাকে ইচ্ছামত সাইজে কেটে ছোট করে বাজারে বিক্রীর জন্য পাঠানো হয়।

বাজারে শাদা বাতি ছাড়াও রঙ্-বেরঙের বাতি বিক্রয় হয়। ঐ সমস্ত বাতি রং করে বিক্রীত হয়ে থাকে। কিন্তু তা' ছাড়াও রং করবার জন্য অপরাপর কেমিক্যাল পদার্থও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হলদে রঙের জন্য ক্রোম্ ইয়লো পদার্থ; লাল রংয়ের জন্য কারমাইন্ (carmine), এ্যাল্‌কানেট (alkanet) ও সিঁদুর (vermilion), নীল রংয়ের জন্য ইণ্ডিগো; প্রুসিয়ান্ ব্লু, আল্‌ট্রামেরিন (ultra-marine) ও কপার সাল্‌ফেট (copper sulphate) প্রভৃতি দরকার।

উপরের আলোচনা থেকে এটা বেশ প্রতীয়মান হ'বে যে, বাতির যথেষ্ট বাজার আছে এবং এ-বস্তু উৎপাদন করাও তেমন শক্ত নয়। ছোটখাটো প্রচেষ্টা হিসাবে চালাতে গেলে এতে তেমন বিশেষ মূলধনেরও প্রয়োজন হয় না। সুতরাং বাংলার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং বেকার যুবকবৃন্দ যদি এবিষয়ে উৎসাহী হ'ন ত তাঁরা লাভবান্ হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ট্যালো

গণতন্ত্র ও গণ-সাম্যের যুগে আমরা যতই আভিজাত্য-বিরোধী হই না কেন, বিলাসের উপকরণ সাবানের দিকে সকলেরই মন টানে। এর কারণ বোধ হয় যে, সাবান ভারতীয় সরল জীবনযাপন প্রণালীর দৃষ্টিতে বিলাসের উপকরণ বলে ঘোষিত হ'লেও এ-বস্তু আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয়। অকারণ বিলাসিতার প্রতি আমাদের ঘৃণা থাকা ভাল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলে অপরিচ্ছন্নতাকে বরণ করা প্রশংসার পরিচয় নয়। খইল্ কিংবা মাটি মেখে পরিষ্কার হবার প্রক্রিয়াতে ব্যয়শূন্যতা থাকতে পারে, কিন্তু সে-আদর্শ এ-যুগের নয়। এ-যুগে সাবান পরিচ্ছন্নতার পক্ষে অপরিহার্য্য, তাই সাবানের ব্যবহার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

সাবান নানা জাতের, নানা শ্রেণীর এবং নানা রকমের আছে, ব্যবসাজগতে যত রকমের সাবান আছে তা' উৎপাদন করতে গেলে চর্ব্বি বা চর্ব্বিজাতীয় পদার্থের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। কারণ, অত তৈল কোথা থেকে পাওয়া যাবে? কাপড় কাচা সাবানের জন্য চর্ব্বিই হচ্ছে প্রধান উপাদান। এই চর্ব্বির ওপর কারসাজী করে কিংবা চর্ব্বির বদলে চর্ব্বির অনুরূপ পদার্থ ভেজাল দিয়েই সাবানের কারবারে জোচ্চুরি চলে। সুতরাং চর্ব্বি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না।

বাংলায় চর্ব্বি এই কথাটি প্রকাশ করবার জন্য ঐ একটি শব্দই আছে, কিন্তু ইংরেজীতে চর্ব্বি কথাটির অনেকগুলি প্রতিশব্দ বর্ত্তমান। টেক্‌নিক্যাল ভাষায় সাবানে প্রধাণতঃ যে চর্ব্বি ব্যবহৃত হয় তাকে ট্যালো (tallow) বলে। ব্যবসাগতভাবে অনেকে মনে করেন যে ট্যালো বলতে বুঝি গরু এবং ভেড়ার চর্ব্বিই বোঝায়, কিন্তু আসলে তা নয়। ট্যালো নামক পদার্থে গরু এবং ভেড়া ছাড়াও আরও অনেক পশুর চর্ব্বি থাকে। ট্যালো প্রস্তুত করতে গেলে প্রথমে চর্ব্বিকে ঘন-পরিমাণ আকৃতিতে যথাযোগ্য মেসিন সাহায্যে কেটে নেওয়া হয় এবং তারপরে সেটা গালানো হয়। ঐ গালানো কার্য্য তিন রকম উপায়ে সাধিত হয়ে থাকে ঃ—

(১) বদ্ধপাত্রের মধ্যে গরম বাষ্প সাহায্যে ;
(২) আগুনের ওপর খোলা পাত্র স্থাপন করে ;
(৩) প্রথমে তরল সাল্‌ফিউরিক্ এ্যাসিড্ বা কস্‌টিক্ সোডার সঙ্গে চর্ব্বিটাকে মিশ্রিত করে তারপর উন্মুক্ত পাত্রে করে আগুনের ওপর রেখে।

প্রথম এবং তৃতীয় প্রক্রিয়ায় গলিত চর্ব্বি তরল পদার্থের উপরিভাগে ভেসে ওঠে। এইভাবে তা' চামড়া বা অপরাপর টিস্যু থেকে আলাদা হয়ে যায় ; দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় গলিত চর্ব্বিকে যতদূর সম্ভব আলাদা করে নিয়ে অবশিষ্টাংশকে (যাকে টেক্‌নিক্যাল ভাষায় Greaves বলা হয়) Greaves-Press মেসিনে ফেলে বাদ বাকী চর্ব্বি নিঙড়ে নেওয়া হয়। উক্ত প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত চর্ব্বি গরম থাকে এবং তাকে ঠাণ্ডা হ'তে দেওয়া হয়। তৃতীয় প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক দ্রব্য মেশাবার উদ্দেশ্য হ'ল টিস্যুসমূহের মধ্য হ'তে চর্ব্বিকে বহিষ্কৃত করে আনা। এই উপায়ে প্রাপ্ত ট্যালো অপরিষ্কার থাকে, সুতরাং তাকে গরম জলের সঙ্গে ফুটিয়ে কিংবা যথাযোগ্য রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে শোধিত করা হয়। ঐরূপ ট্যালো

নরম থাকার দরুণ ব্যবসাকার্য্যে তা' অসুবিধার সৃষ্টি করে, সেইজন্য ঐ নরম ট্যালোর সঙ্গে কিঞ্চিৎ নাইট্রাস্ এ্যাসিড বা নাইট্রিক ও সাল্‌ফিউরিক্ এ্যাসিডের সলিউশন্ মিশ্রিত করে তা' কার্য্যোপযোগী করে নেওয়া হয়। উক্ত ট্যালো থেকে olein নামক একপ্রকার পদার্থ বার করে নিলে 'ট্যালো তৈল' পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট ট্যালো জমাট বাঁধা পদার্থবিন্দুর (atoms) ঠাসবুনানী দিয়ে তৈরী। এর রং সাদা কিংবা ম্যাড়মেড়ে হলদে, এ-বস্তু যখন টাট্‌কা থাকে তখন এর কোন গন্ধ থাকে না, কিন্তু কিছুক্ষণ গত হ'লে ইহাতে 'চর্ব্বি-চর্ব্বি' গন্ধ ছাড়ে। বাজারে যে ট্যালো কিনতে পাওয়া যায় তার রং হলদে এবং তার থেকে একটা কটুগন্ধ নির্গত হয়। দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং রাসিয়া থেকেই প্রধানতঃ বিভিন্ন যায়গায় ট্যালো আমদানী হয়। কিন্তু এ-ব্যাপারেও একটা কারসাজী আছে। রাসিয়ার ট্যালো নামজাদা হয়ে পড়েছে বলে এখন বাজারে সবরকমের ট্যালোকেই রাসিয়ান ট্যালো বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে ট্যালো প্রত্যক্ষভাবে মেসিনসমূহ তৈলাক্ত কারণের জন্যই ব্যবহৃত হ'ত কিন্তু এখন ইহা নানারকম খনিজ তৈল সংযোগে Lubricant mixture তৈলের জন্যই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। মেসিনে প্রদান করবার জন্য যে ট্যালো ব্যবহৃত হয় তাতে শতকরা ৩ ভাগের বেশী পরিমাণ এ্যাসিড যেন না থাকে। চামড়া প্রস্তুতকরণ, সাবানতৈরী, মোমবাতি উৎপাদন প্রভৃতি কার্য্যে যথেষ্ট ট্যালো ব্যবহৃত হয়। ট্যালোতে সাধারণতঃ জল এবং অপরাপর খনিজ দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। একে সস্তা দরে বিক্রীকরবার জন্য এর সঙ্গে মৎস্যজাত তৈল 'গ্রিজ', ষ্টার্চ্চ, চিনামাটি, বেরিয়াম্ সাল্‌ফেট্ প্রভৃতি ভেজাল দেওয়া হয়।

আর একরকমের চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ আছে। ইংরেজীতে যার নাম হ'ল 'ষ্টিয়ারিন্' (Stearin)। উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণীজ চর্ব্বি থেকেই ষ্টিয়ারিন্ প্রস্তুত হয় এবং রাসায়নিক দিক থেকে ইহা ষ্টিয়ারিক এ্যাসিড এবং গ্লিসারিনের সংমিশ্রনেই উদ্ভূত হয়ে থাকে। বাজারে কিন্তু ষ্টিয়ারিন বলে অনেক জিনিস চলে যায় যদিও তাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃত ষ্টিয়ারিন নয়। সকল রকম চর্ব্বির মধ্যে ষ্টিয়ারিন হ'ল অপেক্ষাকৃত কঠিন পদার্থ।

—※—

ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক অথবা পাঠকদিগের মধ্যে যদি কাহারও কোনও জিনিষ বেচিবার বা কিনিবার দরকার থাকে, তবে তাহা আমাদিগকে জানাইলে আমরা বিনামূল্যে আমাদের "ব্যবসায়ের সন্ধান" নামক অধ্যায়ে তাহা আমূল প্রকাশ করিব। এজন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোনও চার্জ্জ লইব না। নাম, ধাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং চিঠি পত্রাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন।

সম্পাদক

নারিকেলের চাষ

আমাদের বাংলাদেশে নারিকেল ফল যে একটি প্রধান আর্থিক সম্পদ, এ বিষয়ে পূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার রীতিমত চাষ নাই,—যেমন ইক্ষু, তুলা, চা, পাট প্রভৃতির আছে। মাদ্রাজ, বোম্বাই (মালাবার) সিংহল, মালয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে নারিকেলের চাষ রীতিমত চলিতেছে। গাছের গোড়ায় সার দেওয়া চাষের একটি প্রধান অঙ্গ। বাংলাদেশে নারিকেল গাছের গোড়ায় বিশেষ কোন প্রকারের সার দিবার পদ্ধতি প্রচলিত নাই। সেই জন্য এখানকার নারিকেল গুণে, আকৃতিতে ও সংখ্যায় অতি নিকৃষ্ট এবং তাহা হইতে অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট পরিমাণে তৈল মাখন প্রভৃতি দ্রব্য পাওয়া যায় না।

গ্রীষ্মকালে "ডাব" রূপে সুস্নিগ্ধ পানীয় সরবরাহের কার্য্যেই বাংলার নারিকেল প্রায় শেষ হইয়া যায়। যেগুলি ঝুনা বা পাকা অবস্থায় যাইয়া পৌছে,—সেগুলি সাধারণ খাদ্য রূপেই ব্যয়িত হয়। গাছের গোড়ায় সার দিয়া অধিক সংখ্যায় খুব ভাল নারিকেল ফলাইতে কিম্বা নারিকেল শাঁস খুব পুষ্ট এবং তৈল বহুল করিবার কেহ চেষ্টা করেন না। সুতরাং অল্প পরিমাণ ও নিকৃষ্ট ফসলের উপর নির্ভর করিয়া নারিকেল সম্বন্ধীয় কোন শিল্পের কারখানা এদেশে আজিও পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই।

সার দেওয়া গাছের ফল — সার না দেওয়া গাছের ফল

ফসল বৃদ্ধি করিতে হইলে উপযুক্ত সার ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত যে সকল দেশে নারিকেলের চাষ রীতিমত হয়, তথায় সারের ব্যবহার বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাংলাদেশের লোক এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন। কৃষি সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইলে যে চেষ্টার আবশ্যক, একথা

বাংলার লোক ভুলিয়া গিয়াছে। তাই আজ বাংলাদেশে নারিকেল জন্মিলেও বাঙ্গালী নারিকেল তৈলের জন্য কোচিনের মুখ চাহিয়া থাকে,—কো কোজেম্, কো কো-লাড কোকোটীন, কোকোলা প্রভৃতি বিবিধ উদ্ভিজ্জ মাখন জাতীয় সুখাদ্য বিক্রয় করিয়া যখন বোম্বাই ও মাদ্রাজের ব্যবসায়ীরা বহু টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, তখন নিঃস্ব বাঙ্গালী নিঃসহায়ের মত কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে। দীর্ঘকাল যাবৎ যে সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কৃষি-কার্য্যে বিশেষ সুফল দায়ক বলিয়া অবলম্বিত হইতেছে, বাঙ্গালী আজ পর্য্যন্ত তাহা গ্রহণ করে নাই। সিংহলে, মালয়ে, মাদ্রাজে বোম্বাইয়ে, নারিকেলের সার সম্বন্ধে অনেক দিন যাবৎ নানা রকম পরীক্ষা চলিতেছে। তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া হইল।
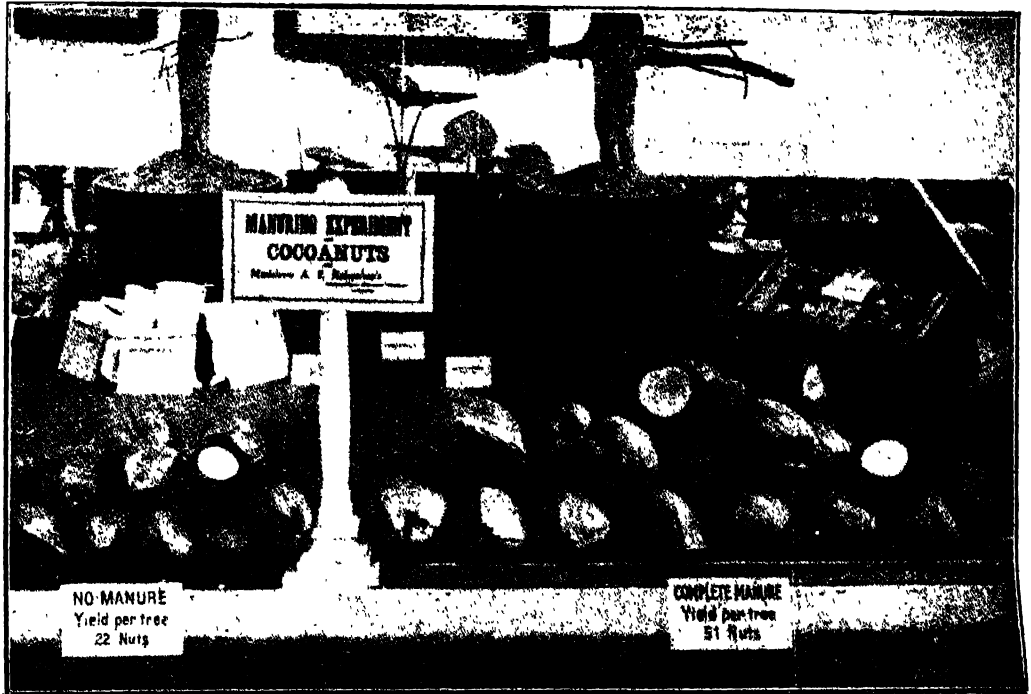
১৯১১ সালে (২৬ বৎসর পূর্ব্বে) লণ্ডনে ইণ্টার ন্যাশন্যাল রাবার একজিবিসান হয়। তাহাতে পটাশ সিণ্ডিকেট্ কোম্পানী সারের গুণ বুঝাইবার নিমিত্ত যে নারিকেল ফল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা সার দেওয়া ও সার না দেওয়া গাছের ফলের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টরূপে দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের সঙ্গে তাহার ছবি দেওয়া হইল। ইহাতে সার দেওয়া ফলগুলি কিরূপ বৃহদাকৃতি, পরিপুষ্ট এবং মাংসল শাঁস বিশিষ্ট দেখাইতেছে। এবং সার না দেওয়া ফল কত ক্ষুদ্র, ক্ষীণ ও পাতলা শাঁস যুক্ত দেখা যাইতেছে। সিংহলে আলেকজাণ্ডা কোকোনাট এষ্টেটের জমিতে সারের এই গুণ পরীক্ষা করা হয়। দুই খণ্ড জমির প্রত্যেক নারিকেল গাছের গোড়ায় প্রথমতঃ সাধারণ নিকৃষ্ট রকমের গোবর সার চার

ঝুড়ি পরিমাণ দেওয়া হয়। তারপর একখণ্ড জমির প্রত্যেক গাছের গোড়ায় নিম্নলিখিত বিশেষ সার দেওয়া হয়,—

হাড়ের গুঁড়া	৬ পাউণ্ড
রেড়ির খৈল	৩ ,,
মাছের সার	২ ,,
কাইনিট্	৩ ,,
পটাশ সালফেট্	১ ,,
মোট	১৫ পাউণ্ড

প্রতি গাছের গোড়ায়

দেখা গিয়াছে, যে জমিতে এই সার দেওয়া হয় নাই, তাহার প্রত্যেক গাছে গড়ে ২২টী নারিকেল হইয়াছে কিন্তু যে জমিতে সার দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক গাছে গড়ে ৫১টী নারিকেল ফল দিয়াছে।

সুতরাং দেখা যায়, সারের গুণে উৎপন্ন ফলের সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক হইয়া থাকে। শুধু সংখ্যা নহে,—ফলের শাঁসও খুব পুরু, সারবান এবং ওজনে ভারী হয়। এইরূপ ভাল শাঁস হইতে বেশী পরিমাণ তৈল পাওয়া যায়। সেইজন্য উহা চড়া দামে বিক্রী হয় এবং সারের

সিংহলের রাজেপাস্কা ষ্টেটের নারিকেল গাছ।
সার-দেওয়া অবস্থায় প্রতি গাছে ৬৫ টী ফল হইয়াছে।

দরুণ অতিরিক্ত খরচা শীঘ্রই পোষাইয়া দেয়।

এখানে ছবিতে যে নারিকেল গাছ দেখা যাইতেছে উহা সিংহলের রাজেপাস্কা ষ্টেটের একটি গাছ। ইহাতে দুইবারে দুই রকমের সার দেওয়া হইয়াছিল। প্রথমে নিম্নলিখিত সার দেওয়া হয়,—

গোবর সার	৪ ঝুড়ি
রেড়ির খৈল	২ পাউণ্ড
মাছের সার	২ পাউণ্ড
হাড়ের গুড়া	৬ ,,
পটাশ সালফেট্	১ ,,
কাইনিট্	৩ ,,

দ্বিতীয় বারে দুই বৎসর পরে নিম্নলিখিত সার দেওয়া হয়,—

রেড়ির তৈলের খৈল	৪ পাউণ্ড
মাছের সার	২ ,,
হাড়ের গুঁড়া	৬ ,,
পটাশ সালফেট্	২ ,,

এই প্রকার সার দেওয়াতে উহাতে গড়ে ৬৫টী নারিকেল ফলিয়াছে এবং ঐরূপ সারে অন্যান্য গাছেও এই রকম ফল পাওয়া গিয়াছে।

যে সকল পুরাতন নারিকেল বাগানে গাছের জোর কমিয়া গিয়াছে দেখা যায়, সেখানে নিম্নলিখিত সার বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে,—

রেড়ির খৈল	২৫০ পাউণ্ড
পুকুরের নীচের পচা মাটী	২০০ ,,
য়্যামোনিয়া সালফেট্	৫০ ,,
কাইনিট	১২০ ,,
মিউরিয়েট্	৮০ ,,
মোট	৭০০ পাউণ্ড

এই ৭০০ পাউণ্ড সার এক একর অর্থাৎ তিন বিঘা জমির পক্ষে যথেষ্ট ; গাছগুলি একটু জোর পাইয়া উঠিলেই নিম্নলিখিত সার দেওয়া কর্ত্তব্য ;—

য়্যামোনিয়া সালফেট্	১০০ পাউণ্ড
হাড়ের গুঁড়া	১৫০ ,,
সুপার ফস্ফেট্	৫০ ,,
কাইনিট্	১০০ ,,
পটাশ মিউরিয়েট্	৫৯ ,,

প্রতি একরে মোট ৪৫০ পাউণ্ড

বাংলাদেশে নারিকেলের চাষ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে নারিকেলের শাঁস হইতে তৈল মাখন ব্যতীত আরও এত রকমের সুখাদ্য প্রস্তুত হইতেছে যে, পৃথিবীর বাজারে নারিকেলের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সময়ে বাংলাদেশে নারিকেল ফসলের উন্নতি করা উহার আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির কারণ হইবে,—ইহা সুনিশ্চিত। যে সকল ধনী ব্যক্তি ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করিতে, চাহেন আমরা তাঁহাদিগকে নারিকেল চাষের প্রতি মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভল্যুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। "বঙ্গবাসী" এইরূপ প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাগজে প্রকাশ করতঃ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব। — সম্পাদক

(রায় বাহাদুর অজিত নাথ দাস, জে. পি,
এম. আর. এ. এস, প্রেসিডেন্সী
ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

চক্ষে সরিষা ফুল দেখা

*

সাধ যায় বোষ্টম হ'তে
পোঁদ ফাটে মোচ্ছব্ দিতে

*

আন্ শুন্‌তে কান্
ঢেঁকি শুন্‌তে কুলো

*

হনুমানে কয় কথা
বানরে নাড়িছে মাথা

*

বানরের গলায় মুক্তার মালা

*

প্যাঁজ্ পয়জার দুইই হো'ল

*

লাথির ঢেঁকি চড়ে উঠে না

*

ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে

*

আক্কেল যার হ'য়েছে তার যাবে না
যার হয় নি তার হবে না

রাখে কৃষ্ণ মারে কে
মারে কৃষ্ণ রাখে কে

*

ভগবানের মার তুনিয়ার বার

*

খোদের উপর খোদকারি

*

চিঁড়ে চ্যাপ্টা

*

মাঘ ঘ'স যাবে না
ফাল্গুন এলে ববে না

*

মা মবে ঝির জন্যে
ঝি মবে কোলাব্যাঙ্ নাঙ্গের জন্যে

*

এক টাকাও টাকা আর
এক ব্যাটাও ব্যাটা

*

চোবের উপর বাটপাড়ি

*

ঘরের ঢেঁকি কুমীর

*

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল

*

অকাল কুষ্মাণ্ড

*

গবীবের ঘোড়া রোগ

*

গরীবের রাংতা সোনা
ফেলে দিলে কেউ নেবে না

*

যা রয় সয় তাই ভাল

*

বামন গেল ঘর ত
লাঙ্গল তুলে ধর্

*

লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন

*

বোবার শত্রু নাই

*

অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন

*

শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না

*

কথা কানে হাঁটে

*

ধান ভানতে শিবের গীত

*

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়
উলু খাগ্‌ড়ার প্রাণ যায়

*

বাঙ্গাল্ চিংড়ী মাছের
কাঙ্গাল

*

রাজবাড়ীর পূজো
হেঁটে মরলো কুঁজো

*

বাপ রাজা ত, রাজার ঝি
ভাই রাজা ত আমার কি ?

*

গোড়া কেটে আগায়
জল দেওয়া

*

দিল্লীকা লাড্ডু যো খায়া
ওভি পস্তায়া, যো নেই খায়া
ওভি পস্তায়া

*

দশে মিলি করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ

*

ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচ

বল্‌তে পারি কইতে পারি
সইতে পারি না
নিতে পারি থুতে পারি
দিতে পারি না

*

আপনার কথা কয় না শালী
পরকে বলে টেবো গালী

*

সতীনের বাটীতে গু গুলে খায়
তবু ত সতীনের বাটীটা যায়

*

আজ মলে কাল দুদিন হবে
কেউ কারো না সঙ্গে যাবে

*

যা দেবে অঙ্গে তাই যাবে সঙ্গে

*

মরার উপর খাঁড়ার ঘা

*

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা

*

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা

*

মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল

*

গিন্নী মলে সিন্নী দোব
আমি গিন্নী কবে হব
দোরে চাবি দিয়ে নাইতে যাব

*

ঘর সর্ব্বস্ব তোমার
চাবি কাটীটি আমার

*

যে যাকে না দেখ্‌তে পারে
তার ছাওয়ায় তিনটে লাথি মারে

*

আমার নাম যমুনা দাসী
পরের খেতে ভালবাসি
নিজে দিতে মন্দবাসি

*

ভাল ভাল করি কালোর মাকে
কালোর মা বলে খা তোর ব্যাটাকে

*

ঢিল মার্‌লেই
পাটকেলটী খেতে হয়

*

ছুঁচ হয়ে ঢোকে
ফাল হয়ে বেরোয়

*

হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভাঙ্গা

*

কান পাতলা মানুষ

*

রামে মারিলেও মারিবে
রাবণে মারিলেও মারিবে

*

এক ঢিলে দুই পাখী মারা

*

রথ দেখা কলা বেচা

*

মুস্কিলে আসান

*

শিকারী বেরালের গোঁপ
দেখলেই চেনা যায়

*

দেখে শেখা আর ঠেকে শেখা

*

পাকা ধানে মই দেওয়া

*

বুকে বাঁশ দেওয়া

*

গোলে হরিবোল

*

গোলেমালে চণ্ডীপাঠ

*

গণ্ডায় এণ্ডা দিচ্ছে

*

কেবা কার শ্রাদ্ধ করে
খোলা কেটে বামুন মরে

*

মারি ত হাতি লুটি ত ভাণ্ডার

*

বর বামুনে বিয়ে

*

ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া

*

পটল তুলেছে

*

শিঙ্গে ফুকেছে

*

বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে

*

নাক শিকেয় উঠেছে

*

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি

*

যে বুঝেছে সে মজেছে
যে না বুঝেছে সে আছে ভাল
আধ বুঝুনির প্রাণটা গেল

*

ভস্মে ঘি ঢালা

*

যক্তের মধু পিপড়েয় খায়

*

চোরের রাত্রি বাসই লাভ

*

সাত মণ তেলও পুড়বে না
রাধাও নাচবে না

*

কিলিয়ে কাঁঠাল পাকান

*

হাবাতের ভাত নেই

*

বিষকুম্ভং পযোমুখম্

*

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

*

সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে
বেঁড়ে শালাকে ধর
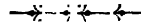
*

আচারে লক্ষী বিচারে পণ্ডিত

পোল্‌ট্রি প্রসঙ্গ

কিক'রে পোল্‌ট্রির কারবার বাড়ানো যেতে পারে ?

আমাদের দেশে হাঁস-মুরগীর ডিমের চাহিদা বিলাতের মত নয়; তা' না হ'লেও এদেশে পোল্‌ট্রির কারবার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এবং আরও বাড়বে বলে মনে হয়। কেন যে এদেশে হাঁস-মুরগীর ডিমের অতটা চাহিদা নেই তার কারণ হচ্ছে যে, ভারতের জনসংখ্যার সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দুরা হচ্ছে প্রধানতঃ নিরামিষাষী। পূর্ব্বে প্রধানতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হাঁস-মুরগী ও ডিমের ব্যবহার প্রচলিত ছিল কিন্তু এক্ষণে বহু হিন্দু ওগুলি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন। কাজে কাজেই পোল্‌ট্রির কারবারও পূর্ব্বাপেক্ষা বেড়ে চলেছে।

সমাজ যাই বিধান দিক্ না কেন বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুরা অধিকাংশই হাঁস ও মুরগীর ডিমের ভক্ত হয়ে উঠছেন। যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখতে পাব যে বর্ত্তমান অবস্থায় ডিমের ভক্ত হওয়া লাভজনক এবং এই আর্থিক চাপের দরুণই অনেকে ডিমের ভক্ত হ'তে বাধ্য হচ্ছেন। দুধ-ঘি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে যে খুবই ভাল একথা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু বর্ত্তমানে জন-সাধারণের দুধ-ঘি খাওয়ার পয়সা জোটানো ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং তারা সস্তায় ডিম পেলে সেইটাই কিনে থাকে। তাছাড়া পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে ডিমও শ্রেষ্ঠ খাদ্য। ঘি-দুধের মত এরও পুষ্টিকর ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। সুতরাং ঘি-দুধের ব্যবস্থা যারা করতে পারে না তাদের পক্ষে ডিমের ব্যবহার অধিকতর উপযোগী।

একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে বোঝানো দরকার। ভারতের অধিকাংশ লোকই যে দরিদ্র একথা বুঝিয়ে বলার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। এই দরিদ্র লোকেদের অধিকাংশের ক্ষমতা নেই যে, ঘি-দুধ কিনে ব্যবহার করেন অথচ কিনলে—স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই হ'ত। কিন্তু বাঁচতে গেলে ঘি-

দুধের পরিবর্ত্তে এমন জিনিস খাওয়া দরকার যেটা দেহের পুষ্টির পক্ষে সাহায্য করবে। ডিম হ'ল সেই জিনিস, অথচ এর মত সস্তা দ্রব্য আর নেই। সেইজন্যই দেখি গরীব গৃহস্থেরা ঘি-দুধ না কিনতে পারুক, ভাল মাছ না কিনতে পারুক, তিন পয়সা দিয়ে দু'টো ডিম কিনে সন্তানদের পাতে দিয়ে থাকে। তাছাড়া ডিমও সস্তা, মাত্র ৬৷৭ আনা কুড়ি'এর দর। সুতরাং মনে হয় যে, ডিমের চাহিদা ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাবে, কাজে কাজেই পোল্‌ট্রি কারবার আরও অধিক পত্তন হওয়ার পক্ষে কিছুমাত্র বাধা নেই।

সেই হেতু, যাঁরা পোল্‌ট্রির কারবার করছেন, তাঁদের পক্ষে কি করলে পোল্‌ট্রির কারবার বাড়ানো যায় সে-আলোচনা লাভ জনক। আমরা এসম্পর্কে ৩টী পন্থা বাৎলাতে পারি; পোল্‌ট্রি কারবারীরা সেগুলি অনুসরণ করে দেখতে পারেন :—

(১) আপনার যা হাঁস-মুরগী আছে তার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করুন।

(২) আপনার হাতে যেটুকু সময় আছে সেটুকু অন্য দিকে না লাগিয়ে ব্যবসা সংগঠন ও বিক্রয় ব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

(৩) আপনার উৎপাদন যত বৃদ্ধি পাবে লাভও তত বাড়তে থাকবে (অবশ্য বাজারে চাহিদা থাকলে), সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে আপনি নজর দিন।

এখন কথা হচ্ছে যে প্রথমেই ব্যবসার কোন্ দিক দিয়ে প্রসারণের চেষ্টা করা হবে? সেটা ব্যবসার গতির ওপর কতকটা নির্ভর করে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসার যেধারটার চাহিদা বেশী দেখবেন সেইধারটারই প্রসারণের দিকে মনোনিবেশ করবেন। ধরুন, বাজারে কচি মুরগীর ভয়ঙ্কর চাহিদা রয়েছে; সেক্ষেত্রে আপনার নজর দিতে হবে যাতে বাচ্ছার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিক নিয়মে মুরগীর দ্বারা ডিমে তা' দিয়া বাচ্ছা ফুটাইতে গেলে তাহাতে একদিকে যেমন যথেষ্ট বাচ্ছা পাওয়া অসম্ভব, তেমনি ডিমও প্রায় আধা কিম্বা তারও বেশী নষ্ট হ'যে যায়। এইজন্য অল্পসময়ের মধ্যে বাচ্ছা লাভ করতে হ'লে Incubator বা কৃত্রিম উপায়ে ডিমে তা' দেওয়াব যন্ত্র কেনা দরকার হবে। এই যন্ত্র না হ'লে যদি আপনি স্বাভাবিক উপায়ের ওপর নির্ভর করেন, তাহলেবাচ্ছা হ'তে দেরী হবে এবং একসঙ্গে আপনি বেশী বাচ্চা পাবেন না। সুতরাং বাজারেব চাহিদানুযায়ী আপনি মাল যোগান দিতেওসক্ষম হবেন না।

আপনি যদি দেখেন যে ডিমেব চাহিদা বেড়ে গেছে, তাহলে আপনার ঐ কৃত্রিম উপায়ে তা' দেবার যন্ত্রের প্রয়োজন নেই বটে কিন্তু যাতে ডিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সেদিকে আপনাকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং তাহলে আপনাকে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের মত ভাল রেখে সকল ব্যবস্থা করতে হবে। মুরগীর Incubator সংখ্যাও এক্ষেত্রে রীতিমত বৃদ্ধি করতে হ'বে।

সমস্ত ব্যাপারেই একটা বিপদের সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায়ীদের সে-সম্পর্কে পূর্ব্ব থেকেই সতর্ক করা প্রয়োজন। কারবার বাড়ানোর ক্ষেত্রে জিনিসের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রতি নজর দিতে গিয়ে কোয়ালিটি খেলো হয়ে পড়বার সম্ভাবনা বেশী। সেক্ষেত্রে বাজারে ব্যবসায়ীর নাম খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীর এদিকেও নজর থাকা কর্ত্তব্য যাতে দ্রব্যের কোয়ালিটি নিকৃষ্ট হয়ে না পড়ে।

মুরগী পালন এবং কৃত্রিম উপায়ে ডিমে তা' দেওয়া সম্পর্কে যাঁদের ব্যবস্থা নাই তাঁরা টেবল্ পোলট্রীর (table poultry) প্রতি মনোনিবেশ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের লাভ হ'বার সম্ভাবনা বেশী। ব্যবসার প্রসারণের ব্যাপারে সর্ব্বদা এটুকু মনে রাখা উচিত যে, একেবারে নূতন লাইনে যাওয়া বিপজ্জনক। যে লাইনে ব্যবসায়ীর পূর্ব্ব থেকেই কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে, কেবল মাত্র সেইদিকেই তার মাথা গলানো দরকার। কোন কিছু করতে গেলে প্রথমে তা' সামান্য ভাবে আরম্ভ করাই শ্রেয়ঃ। ছোট ছোট পোলট্রী ব্যবসায়ীদের আস্তানার সংলগ্ন যদি ফাঁকা জমি কিংবা বাগান থাকে তা'হলে সেখানে তার ব্যবসার প্রসার কার্য্য চলতে পারে। হাঁস মুরগী পালনের সঙ্গে সঙ্গে যদি কেউ ভেড়া ছাগল পালন করবার ব্যবস্থা করে তাহ'লে লাভের সম্ভাবনা বেশী, অথচ এর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় খুব বেশী হয় না।

সহরের লোকেদের একটা বিশ্বাস আছে যে, সারের গাদা কিংবা জঞ্জালের আঁস্তাকুড়ই বুঝি মুরগীদের চরবার উপযুক্ত ক্ষেত্র, কেননা, তাঁরা মনে করেন যে ঐ সমস্ত যায়গা থেকে তারা খাদ্য আহরণ করে নিতে পারবে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে সারের গাদা কিংবা জঞ্জালের আঁস্তাকুড় প্রভৃতি যায়গায় ময়লার সঙ্গে খাদ্য কণাও পড়ে থাকে, মুরগীরা চরবার সময় সেই সমস্ত খাদ্যকণা খুঁটে খেতে পারে। কথাটা সত্যি বটে, কিন্তু এর একটা বিপদ আছে।

জঞ্জালের মধ্যে যেমন খাদ্য কণা থাকে তেমনি নানারূপ কৃমিকীটাদিও থাকে; খাদ্যকণা আহরণের সময় সেগুলো মুরগীদের পেটে যায়। উক্ত পোকাগুলি গলাধঃকরিত হ'লে মুরগীদের জীবননাশ ঘটে না বটে; কিন্তু তাতে মুরগীদের স্বাস্থ্য খারাপ হয় এবং তা' হ'লেই ডিম আশানুরূপ পাওয়া যায় না।

সুতরাং সকল দিক দিয়ে দেখতে গেলে ঐ সমস্ত স্থানে মুরগীদের চরতে না দেওয়াই ভাল। পোলট্রির যায়গায় কোথাও যদি সারের গাদা কিংবা আঁস্তাকুড় থাকে তাহ'লে সেইস্থানের চার পাশে জাল দিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কখন মুরগী খাবারের উপযুক্ত হয় ?

যাঁরা মুরগীর ব্যবসা করেন, কখন মুরগী খাবারের উপযুক্ত হয় এতথ্যটা যদি তাঁদের জানা থাকে ত কারবারের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়। কারণ, ঠিক সময়টিতে যদি মুরগী বাজারে প্রেরিত না হয় ত মুরগীর যথাযোগ্য দর পাওয়া যায় না। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে যদি মুরগী ঠিক পুষ্ট হবার পূর্ব্বে বাজারে প্রেরিত হয়, তা'হলে তাকে রোগা দেখাবে এবং তজ্জন্য ক্রেতার দল বেশী দাম দেবে না। আবার যদি পুষ্ট হবার কিছুকাল পরে মুরগীকে বাজারে পাঠানো যায় তা'হলে মিছামিছি কিছুকাল দেরী করা হয়, এবং এই অতিরিক্ত সময় মুরগীদের খেতে দেওয়ার দরুণ ব্যবসায়ীর পক্ষে সেটা লাভের অঙ্কে জমা না পড়ে লোকসানের ঘরে জমা পড়ে। সুতরাং মুরগীরা কখন বাজারে প্রেরণ করবার উপযুক্ত হ'বে সেবিষয়ে ব্যবসায়ীর নজর থাকা প্রয়োজন।

পোলট্রি ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য হচ্ছে মুরগী বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মাঝে মাঝে টিপে টিপে দেখা যে কি রকম ভাবে সে পুষ্ট হচ্ছে। মুরগী যখন বড় হয় অর্থাৎ বাড়তে থাকে তখন তার গায়ে ক্রমশঃ মাংস লাগতে আরম্ভ করে। এখন ঠিক কোন অবস্থাটিতে মুরগী ক্রেতার চোখে বেশ নধর কান্তি, মাংসবহুল হয়ে ফুটে উঠতে পারে সেটা ধরতে পারাই ব্যবসায়ীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

এখন কথা হচ্ছে যে, কি করে সেটা ধরা যায় ? মুরগীর বেশ পুষ্ট হওয়ার একটা চিহ্ন হচ্ছে যে, তার বুকের হাড় মোটেই টের পাওয়া যায় না। যখন মুরগী ছোট থাকে তখন তার বুকের হাড় বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তার গায়ে মাংস লাগবার সঙ্গে সঙ্গে সে হাড় ক্রমশঃ বুজে আসে এবং যখন একেবারে নধরকান্তি, মাংসবহুল হ'য়ে যায়—তখন বুকের হাড়টা আর টের পাওয়া যায় না। এই বুকের হাড় দিয়েই প্রধানতঃ মুরগী ঠিক পুষ্ট হয়েছে কিনা ধরা যায়।

মুরগী বেশ হৃষ্টপুষ্ট হ'ল কিনা তা টের পাবার আর একটা উপায় হচ্ছে pelvic bones পরীক্ষা করা। যদি মুরগী বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং মাংসবহুল হয় তাহ'লে তার pelvic bones গুলি চর্ব্বিতে ঢেকে যাবে।

আর একটি চিহ্ন দেখেও মুরগীর হৃষ্টপুষ্টতা ধরা যায়। মুরগী বেশ মোটাসোটা হ'লে তার পেট কখনো পড়ে থাকে না।

কখন মুরগীর পালক ঝরে ?

যাঁরা পোলট্রির ব্যবসা করেন তাঁরাই জানেন যে, সময় সময় মুরগীর পালক খসে যায়। সে-সময় তাদের যেমন বিশ্রী দেখায়,

তেমনি তাদের ডিমও কম হয়। এর কারণ হ'ল যে, মুরগীরা তখন অসুস্থ থাকে। তাতে করে শুধু যে পাখীদেরই স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় তা' নয়, পরন্তু ব্যবসায়ীদেরও লাভের অঙ্ক অতিমাত্রায় হ্রাস পায়। তাছাড়া পালক না থাকলে মুরগীদের অপরাপর নানান্ রোগে আক্রমণ করতে পারে; কেননা, যে-পালক দেহের একটা আচ্ছাদনের কাজ করে সেটাই ঝরে যায় এবং শরীরের নানা অংশ exposed বা অনাবৃত হ'য়ে পড়ে এবং তাতে নানারূপ রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। উক্ত অবস্থায় মুরগীদের অসুস্থ হওয়ার কতকগুলি কারণের মধ্যে নিম্ন-লিখিতগুলি প্রধান :—

(১) দেহে পোকা হওয়া।
(২) পালক আঁচড়ানো।
(৩) কুপথ্য গ্রহণ।
(৪) ঠিকমত জুড়ী-মোরগ না পাওয়া।
(৫) খুববেশী ডিমে তা' দেওয়ার স্বভাব।
(৬) রোগা দেহ।

অসুস্থ হওয়ার উপরোক্ত কারণগুলি থেকে রক্ষা পেতে গেলে মুরগীদের ঠিকমত বাসস্থান ও আহার যোগানো এবং তাদের গায়ে যাতে পোকা না থাকে সে-চেষ্টা করা দরকার।

মুরগীদের পালক ঝরাবার জন্য গায়ে যে পোকা হয় তা' সাধারণতঃ খালি চোখে দেখা যায় না। উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকাগুলি পালকের ঠিক মূলে বসে' পালকটীর মূল কুরে খায় এবং তাতেই পালক ঝরে যায়। সময় সময় এই রকম ভাবে পালক ঝরে-যাওয়াকে পালক আঁচড়ানো বলে ভ্রম হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা' নয়। পালক আঁচড়ানো হ'লে তা' একবারে মূল থেকে খসে যাবে কিন্তু পোকা লাগার দরুণ পালক ঝরে গেলে চামড়ার গায়ে পালকের গোড়ায় একটুখানি লেগে থাকবে।

প্রথমে পিঠের পালক ঝরতে আরম্ভ হয়, তারপর ঘাড়ের। সেই সময় যদি যত্ন নেওয়া না হয় ত সারা দেহের পালক ঝরতে আরম্ভ করে। সুতরাং প্রথমেই অবিলম্বে পোকা গুলিকে নষ্ট করে ফেলবার ব্যবস্থা করা উচিত। কোন মালিশ মাখালে কিংবা প্রতিষেধক কোন ঔষধ প্রদান করলে অথবা যে স্থানে পোকা হয়েছে সে স্থানটুকু রং করে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। পোকা নিবারণের জন্য যদি মালিশ ব্যবহার করা হয় ত একভাগ Oil of carraway এর সঙ্গে পাঁচ ভাগ ভ্যাসিলিন মিশ্রিত করে মালিশ তৈরী করলেই চলবে। যদি গ্রীষ্মকাল হয় ত এক গ্যালন গরম জলে ¾ আউন্স সোডিয়াম ফ্লুয়োরাইড, দেড় আউন্স নরম সাবান ও ২ আউন্স ফ্লাওয়ার অব্ সাল্ফার মিশিয়ে সেই জলে মুর্গীদের স্নান করালে পোকা মরে যায়।

পালক আঁচড়ানো ব্যাধি প্রথমে পিঠে এবং তারপর বুকে ও তলপেটে দেখা দেয়। বাজে খাদ্য প্রদান এবং ঠিকমত পালিত না হওয়ার দরুণই এ রোগ দেখা দেয়। যদি এ ব্যাধি মাত্র গুটিকয়েক পক্ষীকে আক্রমণ করে তাহ'লে তাদের আলাদা করে রেখে দিলে সবার মধ্যে আর এ রোগ ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ পায় না। কিন্তু যদি সাধারণভাবে সকলের মধ্যেই এ রোগ দেখা দেয় তবে আক্রান্ত স্থানে ফেনাইল বা আলকাত্রা লেপণ করা ফলপ্রদ।

মুর্গীদের খাদ্যের যদি কোন গোলমাল হয়। অর্থাৎ খাবারে যদি জান্তব পদার্থ কম হয় ও ভুট্টার ভাগ বেশী হয় তাহলে খাদ্যের অভাবটা

পূরণ করবার জন্য তারা নিজেদের পালক চিবোতে আরম্ভ করে। এতে মুর্গীদের এত ক্ষতি হয় যে তাদের মৃত্যু ঘট্‌তে পারে। সুতরাং যাতে তা' না ঘটে তজ্জন্য খাদ্যের প্রতি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার।

সাধরণতঃ দেখা যায় যে একটা মোরগের কাছে যদি মাত্র গুটিকয়েক মুরগী থাকে তাহলে সে ঐগুলির প্রতি পুনঃ পুনঃ আসক্ত হয়। এবম্বিধ কার্য্যে মুরগীর পিঠের এবং মাথার পালক ঝরে থাকে। কিন্তু যদি অনেকগুলি মুরগী থাকে ত সকলের প্রতি তার নজর থাকার দরুণ মাত্র কয়েকটির প্রতি সে পুনঃ পুনঃ আসক্ত হ'তে পারে না। তাছাড়া এমনও দেখা যায় যে, দলের মধ্যে কোন একটি বিশেষ মুরগীকে যদি মোরগের ভাল লাগে তবে সে-মুরগীটীর ওপর সে অতি-আশক্তির অত্যাচার চালায়। তাতে পূর্ব্বোক্ত ভাবে মুরগীটির পালক খসে যায়। সেক্ষেত্রে সঙ্গম হয়ে গেলেই মোরগকে সরিয়ে রাখাই বাঞ্ছনীয় এবং মুরগীগুলির পালক-আক্রান্ত স্থানে গন্ধকমিশ্রিত ভেস্‌লিন লাগিয়ে দেওয়া দরকার।

যে সমস্ত মুরগী অনবরত ডিমে তা' দেয় তাদের বুকের পালক খসে যায়। এটা স্বাভাবিক এবং এতে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু এতে একটা বিপদের সম্ভাবনা এই যে, ঐ স্থানে প্রায়ই পোকা লাগে। সুতরাং মুরগী পালন-কারীর সে-বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

হাঁস মুরগীর ডিম ছোট হয় কেন ?

যাঁরা পোল্‌ট্রি পালন করেন তাঁদের এ অভিজ্ঞতা আছে যে, সব পাখীর সমান ডিম হয় না; কোনটার বা বড় হয়, কোনটার বা ছোট হয়। কেউ কেউ বরাবরই ছোট ডিম প্রসব করে, আবার এমনও দেখা যায় যে, কারও কারও বড় ডিম হচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ ছোট ডিম হতে আরম্ভ হয়েছে। এই শেষোক্ত ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের ভয়ানক ক্ষতি হয়। বড় ডিম ও ছোট ডিমের বাজার দরের কুড়ি পিছু তফাৎ হচ্ছে এক আনা থেকে দু'আনা। এখন ধরুন কোন ব্যবসায়ীর ২৫০ শত হাঁস-মুরগী আছে যারা সপ্তাহে মোট মাট ৯০০ শত ডিম দেয়। তার মানে হচ্ছে ব্যবসায়ীটি সপ্তাহে ৪৫ কুড়ি ডিম পাচ্ছে। তাহ'লে যারা বড় ডিম দিচ্ছিল তারা যদি হঠাৎ ছোট ডিম দিতে আরম্ভ করে তাহলে ব্যবসায়ীটির কুড়ি পিছু ২ আনা হ'লে সপ্তাহে পাঁচ টাকা দশ আনা লোকসান যায়। শুধু তাই নয়, লোকে প্রায়ই বড় ডিমই খোঁজে, সুতরাং ব্যবসায়ীটির ছোট ডিমগুলি সহজে বিক্রীত হবে না এবং দর আরও পড়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ীটির লোকসানের মাত্রাটা একবার ভাবুন দেখি ?

এইবার হাঁস-মুরগীর ছোট ডিম পাড়বার কারণ কি সেটা আলোচনা করা যাক্। পাখীদের ডিম ছোট হ'তে পারে যদি ঃ—

(১) তাদের দেহ ছোট হয়

(২) যারা ছোট ডিম দিত তাদের বাচ্চা যদি ডিম পাড়ে

(৩) পালন করবার সময় যদি তাদের যথোপযুক্ত আহার না দেওয়া হয়।

(৪) তারা যদি মানসিক রোগগ্রস্ত হয়।

(৫) বর্ত্তমানে যদি তারা যথাযথ খাদ্য না পেয়ে থাকে।

সুতরাং যে পাখীর হঠাৎ ডিম ছোট হচ্ছে কিংবা বরাবর ডিম ছোট হয়ে আসছে, তার সম্পর্কে উপরোক্ত কারণগুলির মধ্যে কোন্‌টি প্রযোজ্য সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখা কর্ত্তব্য।

যে-সমস্ত হাঁস মুরগী জন্মাবধি ছোট সাইজের তাদের ডিম যে ছোট হবে এসম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। তাদের ডিম বড় হওয়ার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই, তবে তাদের খাদ্যের প্রতি যদি খুব বেশী যত্ন নেওয়া হয় তাহলে অন্যরকম ফল ফলতে পারে। ইংলণ্ডের বিভিন্ন প্রকারের ছোট সাইজের মুরগীগুলি নিম্ন লিখিত ওজনের হয়ে থাকে,— কোন শ্রেণীর ৫১/২—৬১/২ পাউণ্ড; কোনটা ৫১/২—৫১/২ পাউণ্ড, কোনটা বা ৪১/২—৫ পাউণ্ড। আমাদের দেশের মুরগীদের যদি কেউ সঠিক ওজন নির্ণয় করেন তবে ভাল হয়।

যদি এমন হয় যে, ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনের তাগিদে খুব ছোট অবস্থায়ই পাখীদের ডিম পাড়তে বাধ্য করেন, তাহলে ডিম ছোট হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা একটু সতর্ক হলেই এ জিনিসটা আর ঘটে না।

উল্লিখিত কারণগুলির মধ্যে একটিতে বলা হয়েছে যে, পাখীরা যদি মানসিক রোগে ভোগে তাহলে তাদের ডিম ছোট হয়, কেননা, সে অবস্থায় পাখীরা সম্পূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না।

যে সমস্ত হাঁস-মুরগী ছোট ডিম পাড়ে তাদের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখে চেনা যায়—তাদের আকৃতি ছোট, পিঠের দিকটায় সরু, ঘাড় অপ্রশস্ত এবং মাথাটা ক্ষুদ্র হয়।

এতক্ষণ আমরা যে সমস্ত পাখী জন্মাবধি ছোট তাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। কিন্তু যে সমস্ত পাখী আকৃতিতে ছোট নয় এবং বরাবরই বড় ডিম দিচ্ছিল, তারা যদি হঠাৎ ছোট ডিম দিতে আরম্ভ করে তবে বুঝতে হবে যে, তাদের খাদ্যের কোন গোলমাল ঘটেছে। সেক্ষেত্রে তাদের খাদ্যের প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেওয়া উচিত এবং যাতে তাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

ডিমের সাইজ বাড়াতে গেলে পাখীদের খাদ্যের মধ্যে যাতে হল্‌দে রঙের ভুট্টা এবং জান্তব খাদ্য ভালভাবে বর্ত্তমান থাকে তার ব্যবস্থা করা উচিত। ঐ-দুটি খাদ্যের যথাক্রমে অনুপাত হবে শতকরা ২৫ ভাগ এবং শতকরা ১২ ভাগ। অপরাপর খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে পাখীদের এ দুটো জিনিস খাওয়ানো উচিত।

নারিকেল চাষের শত্রু

(আষাঢ় মাসের প্রকাশিত অংশের পর)

[গত আষাঢ় সংখ্যায় নারিকেলের চাষ সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা হইয়াছিল। এই সংখ্যায় নারিকেল চাসের ক্ষেত্রে কি কি বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি ও অপরাপর তথ্যাদি প্রকাশিত হইল। সম্পাদক]

পিঁপড়ে চাষের খুব ক্ষতিসাধন করে। বন জঙ্গলের যে জমি, তাতে সচরাচর পিঁপড়ে ধরে না, কিন্তু খোলা জমিতে পিঁপড়ে থাকে খুব বেশী। বড় গাছের প্রতি তাদের ততটা আকর্ষণ নেই, কিন্তু কচি গাছ পেলেই তারা আক্রমণ করে। যখন কোন চারা গাছ লাগানো হয়, তখন মাটির তলায় শিকড় গজাতে কিছুদিন সময় নেয়, এবং যে পর্য্যন্ত না মাটির তলায় শিকড় গজাচ্ছে সে সময় পর্য্যন্ত ডালপালার মধ্যে যে রস সঞ্চিত থাকে, তার সাহায্যেই চারাটা বেঁচে থাকে। কিন্তু যদি পিঁপড়ে একবার পেছনে লাগে তবে অল্প সময়ের মধ্যে ডালপালা গুলোকে সাবাড় করে এবং ফলে চারাগাছটার মৃত্যু ঘটে। সুতরাং এর হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে দু'তিন বছরের বয়সের গাছই জমিতে লাগানো উচিত, কেননা, তাদের তখন রীতিমত শিকড় গজিয়ে গেছে। তা' যদি না হয় ত চারা গাছ বসাবার সময় গাছের ডাঁটার গায়ে টাট্‌কা গোবর, লবণ ও জলের একটা প্রলেপ করে লাগিয়ে দিয়ে গাছ লাগালে আর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকেনা।

আর একটা যত্ন নেওয়া কর্ত্তব্য। চারা গাছগুলোকে কিছুতে যেন কোন পশু আক্রমণ করতে না পারে। পশুতে যদি গাছের পাতার ডালগুলো খেয়ে নষ্ট করে তবে গাছের আর তেমন বৃদ্ধি হয় না। এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে নারকেল্ ক্ষেতের চারপাশে রীতিমত বেড়ার বন্দোবস্ত করাও একটা বড় রকম খরচের ব্যাপার। আমরা যদি বাঁশ কিংবা অন্য কিছুর বেড়া দিই ত সে-বেড়া বেশীদিন টেঁকে না। আবার আমরা যদি সিমেণ্ট দিয়ে লোহার খুঁটী গেঁথে কাঁটা তারের মজবুত বেড়া লাগাই ত তা' ভয়ঙ্কর ব্যয়সাধ্য হ'য়ে পড়ে। সুতরাং এমন ভাবে বেড়া দিতে হ'বে যাতে খরচও বেশী না পড়ে অথচ বেড়া বেশীদিন টেঁকসই হয়। আমাদের বাংলাদেশে বাঙ্‌চিতে, ফণী-মনসা, দুরন্ত কাঁটা, আনার ও নানারকম কাঁটা গাছ দ্বারা বেড়া দেবার প্রথা প্রচলিত আছে। সিংহলে কাজু বাদামের গাছ দিয়ে বেড়ার কাজ সারা হয়। যাই হোক্ যাতে বেড়া অধিকদিন টেঁক্‌সই হয়, সেধারে লক্ষ্য রাখা উচিত।

নারিকেল গাছের আর একটা শত্রু হ'ল গুব্‌রে পোকা। গাছের ডগার মাঝখানটিতে কুরে কুরে এ গাছের দফা রফা করে ছাড়ে। এ পোকার একটা প্রকৃতি হচ্ছে যে, যে গাছ গুলোকে এদের ভাল লাগে তাদেরই এরা আক্রমণ করে, বাগানশুদ্ধ সমস্ত গাছকে নষ্ট করে না। এ পোকার হাত থেকে বাঁচাবার

উপায় হচ্ছে গাছে গাছে অনুসন্ধান করে এ পোকা তাড়ানো।

ইঁদুর ও সজারুও নারিকেল-চারার খুব ক্ষতি সাধন করে থাকে। তাদের হাত এড়াতে গেলে তাদের গর্ত্তে ঘুরে ঘুরে মেরে ফেলাই যুক্তিযুক্ত।

আর একরকম গুব্‌রে জাতীয় পোকা আছে যেটা গুব্‌রে পোকার চেয়ে আরও বেশী মারাত্মক। এ পোকার আক্রমণে গাছের আসল জিনিসটাই একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। গাছের ডগা যদি খসে পড়ে তবে বুঝতে হবে যে এই জাতীয় পোকাই আক্রমণ করেছে। এর আক্রমণ এমন সাংঘাতিক যে কোন কোন বাগানে দশ বছরের মধ্যে এ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গাছ নষ্ট করে দিয়েছে। গাছের মধ্যে কোন যায়গায় একটু ফাটল কিম্বা গর্ত্ত পেলেই এ পোকা সেখানে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্ছা বেরোবামাত্রই এ পোকা তখন গাছের ভেতর দিয়ে কুরে কুরে উপরে উঠতে থাকে। এই রকম ভাবে ঝাঁঝরা করে দেয় যে ওপরটাতে একটা পাতলা কাগজের মত আবরণ পড়ে থাকে। যে বৃক্ষ এই রকম ভাবে ঝাঁঝরা হ'য়ে যায় তাকে কেটে পুড়িয়ে ফেলা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

আমাদের দেশের রীতি অনুযায়ী প্রতি বছর অন্ততঃ একবার করে গাছের শুকনো ও আধ শুকনো পাতা কেটে ফেলা হয়,—চল্‌তি ভাষায় যাকে বলে "গাছ ছাড়িয়ে দেওয়া।" এর যুক্তি এই যে, এতে করে নাকি গাছ ভাল থাকে এবং ফল ভাল হয়। কিন্তু কেউ কেউ এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, এরূপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। গাছ যখন খুব ছোট থাকে তখন পাতাগুলি কোন কিছুর আঘাতে কিংবা আক্রমণে নষ্ট হওয়ার খুবই আশঙ্কা দেখা যায়। কিন্তু পরীক্ষা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, ছোট গাছের পাতাগুলো বড় গাছের পাতার চেয়ে বেশী শক্ত ভাবে ডাঁটায় লেগে থাকে। প্রকৃতির বিধান এই রকম ভাবে পাতার আবেষ্টনী দ্বারা ডাঁটাকে রক্ষা করছে এবং গাছকে বাড়তে সাহায্য

করছে। প্রকৃতি যদি এধার দিয়ে ভুল করে থাকে ত মানুষের ঐ রকম ভাবে গাছ ছাড়িয়ে দেওয়ার অধিকার আছে; কিন্তু প্রকৃতি ত বিনা প্রয়োজনে কিছুই করে না। সুতরাং মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে গাছকে, আঘাত দান ক'রে বৃক্ষের ক্ষতি সাধনই করে থাকে। 'গাছ ছাড়িয়ে দেবার' পর যে নরম ছালটা বেরিয়ে পড়ে অনেক সময় প্রকৃতির আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে তার, গায়ে ক্ষত এবং গর্ত্ত দেখা দেয়। তাতে পোকা ইত্যাদির বাসা বাঁধা ও ডিম পাড়ার সুবিধে ঘটে। সুতরাং কোন ক্রমেই 'গাছ ছাড়ানো' উচিত নয়। এমন অনেক দেখা গেছে যে গাছ ছাড়াবার পূর্ব্বে গাছে কোনরূপ ক্ষত কিংবা পোকার আক্রমণ দেখা দেয় নি, কিন্তু গাছ ছাড়াবা মাত্রই তাতে ক্ষত এবং পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। একটা সুবৃহৎ নারকেল বাগানে গাছ ছাটাই করার দরুণ দশ বছরের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ গাছ নষ্ট হয়ে গেছল, কিন্তু সেই বাগানেই যেমনি গাছ ছাঁটাই করা বন্ধ করে দেওয়া হল তখন দেখা গেল যে একটিও গাছ আর নষ্ট হচ্ছে না।

এইবার দেখা যাক্ গাছ যখন ফল দিতে আরম্ভ করে তখন আমাদের কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়? বেশীর ভাগ স্থলেই আমরা গাছের নিকট থেকে যত পারি আদায় করে নিই, কিন্তু তার প্রতিদানে বৃক্ষের জন্য কোন সুব্যবস্থা বহাল করিনে, অর্থাৎ গাছের গোড়ায় সার প্রদান করার দিকে আমরা মোটেই মনোযোগ দিই নে। অধিকাংশ বড় বড় বাগান জঙ্গলে ভরে থাকে তবুও সেধারে আমাদের নজর পড়ে না। কেউ কেউ বাগান পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা পান ও জঙ্গল সাফ করেন, এবং গাছের গোড়ায় গোবরের সার দেন। অনেকে গাছের গোড়ায় পশু বেঁধে রেখে সার প্রদানের পরিশ্রমের হাত থেকে রেহাই লাভ করেন। বাগানে যে ঘাস জন্মায় পশুরা দিব্য নিশ্চিন্ত মনে তা' ভক্ষণ করে। নারকেলের ঝরা পাতা, গামড়া ইত্যাদি বাজারে জ্বালানী ও ঝাঁটার কাঠি হিসাবে বিক্রীত হয়। যখন বিক্রীত হয় না তখন সেগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে গোবরের সঙ্গে মেখে জমির ওপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কোন কোন জমিতে কেউ কেউ আবার মাঝে মাঝে চাষ লাগান। বালি মাটির জমি হলে কিন্তু চাষ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বাগানে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়ে থাকে। সেখানে গাছ থেকে সমস্ত নারকেল পেড়ে তেল প্রস্তুত করা হয়, গাছের পাতা, গামড়া, ছোবড়া ইত্যাদি বাজারে বিক্রীত হয় এবং তাতে যা পাওয়া যায় তা' দিয়ে হাড়ের গুঁড়ো কেনা হয়ে থাকে। বাগানের যত আগাছা, ঝরা পাতা ইত্যাদি একটি লম্বা গর্ত্ত কেটে তাতে পুতে রাখা হয়, এই রকম অনুরূপ আর একটি গর্ত্তেও পশুদিগের বিষ্ঠা জমা হয়ে থাকে। পরে এই সমস্ত বস্তু সার-কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। যদি কোন বাগানে একশত পশু রাখা হয়, তাহলে তার মধ্যে ৪০।৫০টা সার প্রদানের জন্য দরকার হয়, বাদ বাকী সব পশু পালন এবং ব্যবসার জন্যই রক্ষিত হয়ে থাকে। জমিতে হাড়ের গুঁড়োর সার প্রদান অত্যন্ত ফলদায়ক; প্রতি একর জমিতে ৩ হন্দর করে হাড়েরগুঁড়া সার হিসাবে প্রদত্ত হয়ে থাকে। এই সার প্রদানে শতকরা ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত ফল বৃদ্ধি পেতে পারে।

পরলোকে রেডিও আবি-ষ্কারক মার্কনি

১৯৩৭ সালের ২০শে জুলাই এর রাত্রি। রোমের Via Condotti নামক রাস্তার ১১নং বাড়ী মৃদু গুঞ্জনে পূর্ণ। কি যেন এক উদ্বেগের ছায়া অধিবাসীদের মুখের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে।

ভোর তখন সাড়ে তিনটা। ইতালীর দু'জন বিখ্যাত ডাক্তার সমস্ত আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে নত মস্তকে Via Condottiর ১১নং বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। উদ্বিগ্ন জনতা অস্ফুটে শুধিয়ে উঠল—কি হল ডাক্তার মশাই?—সব শেষ! হার্ট প্যারালাইজড্ হ'য়ে গেছে।

● ●

ভোর তখন ৪টা। বিশ্বদূত রয়টারের রোমস্থ আফিস থেকে পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ পত্রের আফিসে টেলিগ্রাম ছড়িয়ে পড়ল—৬৩ বৎসর বয়সে বেতার বিজ্ঞানের বিখ্যাত আবিষ্কর্তা মার্কনি আর ইহ লোকে নাই।

সাব এডিটারের হৃদয় হঠাৎ কেমন করে উঠল, চোখ রগড়ে আবার টেলিগ্রাম খানার দিকে দৃষ্টিপাত করে পড়লে—রেডিও আবিষ্কারক মার্কনি পরলোকে। তারপর সকালবেলা সারা সভ্য জগৎ সবিস্ময়ে শুনলে যে, রেডিওর জন্মদাতা মার্কনি আর ইহলোকে নেই। কে এই মার্কনি?

ইটালির বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গুগ্‌লিএলমো মার্কনি ইটালীস্থ বোলোগ্‌নার নিকটবর্ত্তী এক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থা থেকেই তাঁর বিদ্যুৎ বিজ্ঞানের দিকে এক স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যায়। লেঘোর্নে পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি বেতার টেলিগ্রাফ সম্পর্কে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকের চিন্তাসমূহ শুধু যে আয়ত্ত করেছিলেন তা' নয়, পরন্তু তাতে ব্যবহারিক রূপ দিতে চেষ্টিত হয়েছিলেন। তিনি পিতার সম্পত্তি বিক্রয় করে এসম্পর্কে বহু পরীক্ষা কার্য্য চালিয়েছিলেন। তাঁর পূর্ব্বে ১৮৮৭ সালে হার্টজ্ নামে এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়েছিলেন যে বিদ্যুৎ দ্বারা ইথরে তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। মার্কনি পরীক্ষা দ্বারা আরও দেখালেন যে,

হার্টজ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত দু'টি Sphere এর মধ্যে একটিকে মাটিতে রেখে এবং অপরটি একটি বাঁশের ওপর ধাতু পাত্রে স্থাপন করে দু'টিকে সংযুক্ত করলে উক্ত ইথরের তরঙ্গ খানিক দূর পর্য্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তিনি আরও পরীক্ষা করে দেখালেন যে, বাঁশ দণ্ডটি (Pole) যত উঁচু হ'বে তরঙ্গকে তত দূরে চালিত করা চলবে।

তারপর মার্কনি তরঙ্গ প্রেরণ করবার এবং তরঙ্গ ধরবার যন্ত্রপাতির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। এমন কি তিনি মর্সের টেলিগ্রাফ যন্ত্রদ্বারা বেতারে একস্থান হ'তে অন্যস্থানে টেলিগ্রাফ কোড্ প্রেরণ করে তা' লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হন। ১৮৯৬ সালে তিনি এমন একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন যার দ্বারা এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে বেতারে টেলিগ্রাফ সংবাদ প্রেরণ করা ও গ্রহণ করা চলে। সেই বছরই তিনি ইংলণ্ডে গমন করে বৃটিশ টেলিগ্রাফ বিভাগের বড়কর্ত্তা সার উইলিয়াম প্রাইস্‌কে তাঁর সমস্ত আবিষ্কারের কাহিনী বলেন।

বেতার বার্ত্তা আবিষ্কারক মার্কনি

মার্কনি ঠিক উপযুক্ত সময়েই ইংলণ্ডে গমন করেছিলেন, কেননা, সার উইলিয়াম প্রাইস্ নিজেও তখন বেতার ব্যাপার সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন এবং কি করে ইথর তরঙ্গ দূরে চালিত করা যায় সে সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে প্রাইস্ রয়েল ইনিষ্টিটিউশনে সকলের সম্মুখে মার্কনির পরীক্ষা কার্য্য প্রদর্শন করেন এবং এই মত ঘোষণা করেন যে মার্কনির এই যন্ত্রের মত এত সূক্ষ্ম ইলেকট্রিক যন্ত্র আর আবিষ্কৃত হয় নি। মার্কনি সে সময় ৪ মাইল দূর পর্য্যন্ত বেতার বার্ত্তা প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরের বছরে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা' মার্কনিকে আরও বিখ্যাত করে তুল্‌লে। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড (তখন ওয়েল্‌স্‌ এর যুবরাজ) হটাৎ হাঁটুতে আঘাত পান এবং তিনি সপ্তাহ ধরে Cowes Bayতে রাজকীয় বজরায় শয্যাশায়ী থাকেন। এমতাবস্থায় মার্কনিকে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি যেন বজরায় এবং Osborne এর রাজ বাড়ীতে বেতার যন্ত্র স্থাপন করেন যাতে করে যুবরাজের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে সব সময়ে সংবাদ আদান প্রদান চলিতে পারে। মার্কনি সে ব্যবস্থা সম্পাদন করেছিলেন।

তারপর থেকে আশ্চর্য্যজনক ভাবে বেতার বিজ্ঞানের উন্নতি চলতে লাগল যা' বিজ্ঞান জগতে নব নব বিস্ময়ের উদ্রেক করলে। ১৮৯৯ সালে মার্কনি ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট হতে Boulogne এর নিকটবর্ত্তী Wimerenx নামক স্থানে এক লম্বা মাস্তুল নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হলেন এবং সেখান থেকে ইথর তরঙ্গ প্রেরণ করবার জন্য তিনি ঐ মাস্তুলের ওপর aerial wire খাটালেন। বাঁশের দণ্ড খাড়া করবার ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই অন্তর্হৃত হয়েছিল। Dover এও আর একটি অনুরূপ মাস্তুল নির্ম্মিত হ'ল এবং ইংলিশ চ্যানেলের ওপর দিয়ে সর্ব্ব প্রথম বেতার বার্ত্তা ভেসে গেল—দূরত্ব তার ৩২ মাইল। এই অপরূপ সাফল্য মার্কনিকে আরও উৎসাহিত করে তুললে।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে স্থির থাকতে দেয় না, আরও উন্নতির আশায় মার্কনির মন চঞ্চল হ'য়ে উঠল। ১৯০১ সালে তিনি নিউফাউণ্ড্‌ল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করলেন—উদ্দেশ্য যে বিশাল আতলান্টিক মহাসাগরকে এবার তিনি বেতারের বন্ধনে বেঁধে ফেলবেন। তজ্জন্য Cornwall এ তিনি এক শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র স্থাপন করলেন। দূরত্ব যদি বেশী হয় ত লম্বা aerial wireই কার্য্যকরী, সুতরাং তিনি একটি ছোট্ট বেলুন থেকে লম্বা তার ঝুলিয়ে দিলেন। Cornwall Station থেকে 'এস্‌' এই অক্ষরটি টেলিগ্রাফ যন্ত্রে প্রেরিত হ'ল এবং অনেক উৎকণ্ঠার পর অবশেষে অপর ষ্টেশনে ঐ অক্ষরটি পরিষ্কার শোনা গেল। এই ভাবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শূন্য মার্গে বেতারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বিজ্ঞান হ'ল জয়ী, সীমাহারা অনন্ত আকাশে ইথর কম্পনের মৌন বাণীকে আয়ত্বের মধ্যে এনে সে তাকে ভাষা দিলে!

১৯০২ সালে মার্কনি জাহাজে বেতার যন্ত্র স্থাপন করে তদ্দ্বারা ইতালিতে ও রুশিয়ার জারের নিকট বেতার টেলিগ্রাফ প্রেরণ করলেন। ঐ বৎসরই পরে তিনি ভূমধ্যসাগর ও জিব্রাল্টার প্রণালীর বিভিন্নস্থলে জাহাজে বসে Cornwall থেকে প্রেরিত বেতার টেলিগ্রাফ গ্রহণ করতে লাগলেন। অবশেষে উক্ত বৎসরে ডিসেম্বর মাসে ক্যানাডা ও ইংলণ্ডের মধ্যে বেতার বার্ত্তা চলাচল প্রচলিত হ'লো বলে তিনি ঘোষণা করলেন। ঐ বার্ত্তা চলাচলের উদ্বোধন রূপে সর্ব্ব প্রথম ক্যানাডার গভর্ণর জেনারেলের নিকট হ'তে ইংলণ্ডের রাজার নিকট এবং মার্কনির কাছ থেকে ইতালীর রাজার নিকট বেতার বার্ত্তা প্রেরিত হ'ল। কয়েক সপ্তাহ পরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ইংলণ্ডের রাজার নিকট বেতারে সংবাদ প্রেরণ করলেন। এই সম্বন্ধের পুরস্কার স্বরূপ ১৯০২ সালে তিনি রুশিয়ার জার

কর্তৃক 'অর্ডার অব্ St. Anne' দ্বারা ভূষিত হ'ন এবং ইতালীর রাজা কর্তৃক গ্র্যাণ্ড ক্রশ অব্ দি অর্ডার অব্ দি ক্রাউন অব্ ইতালী দ্বারা পুরস্কৃত হন। ১৯০৪ সালে তিনি R. M. S. Campania নামে প্রথম সামুদ্রিক দৈনিক সংবাদ পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯০৫ সালে তিনি বেতার টেলিগ্রাফীর Directive system এবং পরের বছর বেতার টেলিগ্রাফীর নূতন Persistent wire system আবিষ্কার করেন। ১৯০৭ সালে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় ট্রান্স্ আতলান্তিক বেতার টেলিগ্রাফ সার্ভিস্ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে বেতারে সংবাদ আদান প্রদানের সুযোগ জনসাধারণকে প্রদান করা হয়।

১৯১০ সালে তিনি একটি নূতন ধরণের "ভাল্‌ভ রিসিভার" এবং একটি নূতন ধরণের ডিটেক্টর উদ্ভাবন করেন এবং পরবর্ত্তী বৎসর তাঁর এই নূতন যন্ত্র বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজে খাটানো হয়।

১৯১৪ সালে সারা বিশ্বের মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল। সাম্রাজ্যবাদী জার্ম্মাণী ও জাতীয়তাবাদী মিত্র শক্তির সংঘর্ষ চললো দারুণ ভাবে। এই সমরানলে আহুতি যোগাবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের ডাক পড়ল; তাদের বলা হ'ল যে, যে যত পার উন্নত ধরণের মানুষ মারা কল বানাও। আজকের যুগে যত কিছু বিজ্ঞানের নৃশংসতা দেখে আমরা শিউরে উঠছি, সে সমস্তই উদ্ভাবিত হয়েছিল গত মহাসমরের সময়। বিজ্ঞান তার সকল বুদ্ধিমত্তা নিয়োগ করেছিল মানুষ মারা কার্য্যে, বৈজ্ঞানিকরা সেজেছিল এক একটি ধ্বংসদানব।

ইতালীর তরফ থেকে মার্কনীরও ডাক পড়ল যুদ্ধে ইতালীকে সাহায্য করবার জন্য। ঐ মহাযুদ্ধের সময় তিনি ইতালী গভর্ণমেণ্টের বেতার বিভাগের ভার প্রাপ্ত হ'ন এবং উন্নত ধরণের কয়েকটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ১৯১৬ সালে তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎ তরঙ্গ সম্পর্কে পরীক্ষা কার্য্য সুরু করেন এবং তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় ইংলণ্ডে একটি 'শর্টওয়েভ্' ষ্টেশন স্থাপিত হয়। ১৯২৪ সালে তিনি 'বিম্ সিষ্টেম্' উদ্ভাবন করতে সমর্থ হন। তারপর তিনি প্রধানতঃ 'শর্টওয়েভ্' বার্ত্তা প্রেরণের উন্নতি বিধান এবং জাহাজ ও বিমানসমূহের জন্য 'রেডিও সিগন্যাল্' উদ্ভাবন কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকেন।

জগতের সভ্যতার ক্ষেত্রে বেতার এক অদ্ভুত জিনিষ; লক্ষ লক্ষ লোক এই বেতার রেডিওর সাহায্যে শিক্ষা ও আনন্দ একসঙ্গে দুই-ই লাভ করছে। মার্কনির চেষ্টায়ই জগৎবাসী এই সুবিধা পেতে পেরেছে, তজ্জন্য জগৎবাসী তাঁর নিকট ঋণী। শুধু তাই নয়, বিদ্বজ্জনমণ্ডলীও তাকে তাঁর কৃতিত্বের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন। ১৯০৯ সালে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হ'ন—জগতের মধ্যে এই হ'ল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ১৯১৪ সালে তিনি জি, সি, ভি, ও উপাধি লাভ করেন। ১৯২৫ সালে তিনি ইতালী রাজ্যের সেনেটর হ'ন এবং ১৯২৯ সালে তাঁকে মার্কুইশ পদবী প্রদত্ত হয়।

আশ্বিন মাসের কৃষি

ভাদ্র মাস গত হইল, বিলাতী সব্জী বপন করিতে আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

নাবী (Late) ফসলের এখনও সময় আছে; এখনও তাহাদের চাষ চলে, কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সকল বিলাতী বীজ বপন করিতে যেন আর বাকী না থাকে।

কপি, শালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে; সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপন করিতে হইবে।

মটর, মূলা এবং নাবী জাতীয় সীম, শালগম, বীট, গাজর, পেঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপন কার্য্য আশ্বিন মাসেই আরম্ভ করা উচিত।

বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে।

পেঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নাবাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্ফাদি—সুল্ফ, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনী ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে না, কিন্তু উহার শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনের এই সময়।

কার্পাসের গাছ—গাছ কার্পাসের দুই চারিটী গাছ, বাগানের এক পাশে বাড়ীর আনাচে কানাচে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের বহু কাজে লাগে, উহার বীজ এখন বপন কর।

তরমুজ—তরমুজাদি বালুকা মিশ্রিত পলি মাটীযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয় তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে, মাটি চাপা দিয়া রাখিলে তরমুজ বড় হয়, তরমুজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৪ হাত অন্তর উচ্ছের খাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটি খাদায় ৩।৪ টার অধিক পুঁতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাইতে হয়।

পটল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্প জলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন অঙ্কুর বা ফল বাহির হইলে ভূমিতে পুঁতিবে। পুনঃ পুনঃ খুঁড়িয়া বা নিড়াইয়া দেওয়াই পটল ক্ষেতের প্রধান পাইট। পটল চাষ এই মাসে আরম্ভ হয়। বেলে দোঁয়াস মাটীতে এক বৎসর অন্তর শুক্‌না পাক মাটী ছড়াইলে ফসল ভাল হয়। একই স্থানে ৪ বৎসরের অধিক ভাল পটল জন্মে না। অল্প খোলা ও সম্পূর্ণ রৌদ্র বিশিষ্ট ক্ষেতেই পটল চাষ ভাল হয়। চূণ মিশ্রিত ছাই, পলিমাটি বা হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে পটল চাষ খুব লাভের হয়। নদীর চরে পটল খুব ভাল হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত পেঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুঁতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির 'যো' হইলে খুঁড়িয়া দিবে। এইমাসে পেঁয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটী ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়্‌ড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেতের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু বা কপি লাগান হইয়াছে তাহাতে আবশ্যক মত জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ-মাসে উহাদের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—ফলের বাগান এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধাইয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে অপর, প্যান্সি, দোপাটী, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে, এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নয়।
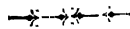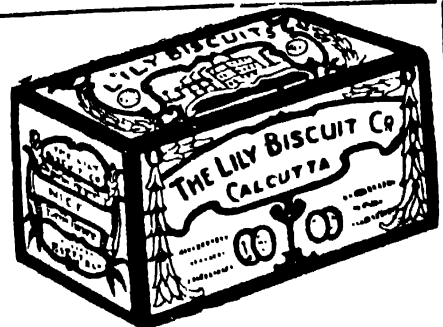
চামড়া ও রাবার জুড়িবার আঠা :—

(১) গাট্টা পার্চ্চা (Gutta Percha) এবং খাঁটী য়্যাস্ফাল্ট (ashfalt) একসঙ্গে মিশাইয়া গলাইয়া লউন। এই আঠা গরম অবস্থায় ব্যবহার করিতে হয়। জিনিসটী জুড়িয়া খুব চাপ দিয়া রাখা দরকার, যতক্ষণ না আঠা ঠাণ্ডা ও শক্ত হইয়া আসে।

(২) গালা চূর্ণ এক ভাগ; লাইকার য়্যামোনিয়া (ঘন) ১০ ভাগ। প্রথমতঃ গালা চূর্ণকে য়্যামোনিয়ার জলে ভিজাইয়া একটা ছিপি-আঁটা পাত্রে ৩।৪ সপ্তাহ রাখিয়াদিন। এই সময়ের মধ্যে সমস্ত মশলাটী বেশ তরল ও স্বচ্ছ হইয়া আসিবে। তখন উহা ব্যবহার করা যায়।

(৩) সাদা গাট্টা পার্চ্চা
(Gutta percha) ১ ড্রাম
কারবন ডাইসালফাইড্
(Carbon di Sulphide) ১ আউন্স

এই দুইটী মিশাইলে গাট্টা পার্চ্চা, কারবন ডাইসালফাইডে গলিয়া যাইবে; ইহাকে ছাঁকিয়া তাহার সহিত ইণ্ডিয়া রাবার ১৫ গ্রেণ মিশাইয়া গলাইয়া লউন। তবেই আঠা তৈয়ারী হইল।

উপরি উক্ত আঠাগুলির দ্বারা চামড়া অথবা রাবারকে লৌহ প্রভৃতি ধাতুর সহিতও জোড়া যায়।

নিম্নলিখিত আঠার দ্বারা চামড়াকে রাবারের সহিত জোড়া যায় :—

(১) প্রথমতঃ চামড়া ও রাবারের যে দিকটা জোড়া হইবে, তাহাকে ধারাল কাচের টুকরা দিয়া চাঁচিয়া বা শীরীষ কাগজ দিয়া ঘষিয়া কর্ক্কশ করিয়া লউন। তারপর কারবন ডাইসালফাইডে গাট্টা-পার্চ্চা সলিউসান চামড়াও রাবারের কর্ক্কশ দিকটাতে মাখাইয়া খানিকক্ষণ রাখিয়া দিতে হয়, যেন সলিউসানটী ভিতরে শুষিয়া যায়। তারপর দুইটী দিক মুখোমুখী জুড়িয়া কিছুক্ষণ গরম চাপে (warm press) রাখিয়া দিতে হয়।

(২) ৩০ ভাগ রাবার কুচি, ১৪০ ভাগ কারবন ডাইসালফাইডে ভিজাইয়া উহাকে গরম (৩০ ডিগ্রী সেণ্টীগ্রেড) জলের উপর বসাইয়া গলাইয়া লউন। আর একটী পাত্রে ১৫ ভাগ কলোফনিতে ১০ ভাগ রাবার গলাইয়া উহার সহিত ৩৫ ভাগ তাপিন তৈল মিশান। যখন সমস্ত রাবার সম্পূর্ণরূপে গলিয়া যাইবে, তখন পূর্ব্বের সলিউসানের সহিত ইহাকে মিশ্রিত করুন। এইবারে আঠা তৈয়ারী হইল, ইহাকে ভালরূপে ছিপি-আঁটা বোতলে রাখিয়া দিবেন। এই আঠার সুবিধা এইযে, ইহাতে জিনিসটীকে চাপে রাখিতে হয় না।

রাবারকে কাঠের সহিত আঁটিবার আঠা :—

(১) কাঁচা গাম্ রাবার (gum rubber) অথবা খাঁটি রাবার (pure rubber) কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া উপযুক্ত পরিমাণে ন্যাপথা (Naptha) অথবা গ্যাসোলীনে গলাইয়া লউন। এই সলিউসানকে ১৪ দিন যাবৎ খুব টাইট ছিপি আঁটা বোতলে রাখিয়া দিন। প্রতিদিন একবার করিয়া নাড়িবেন।

(২) গালাচূর্ণ এক আউন্স, ২৷৷০ আউন্স খুব ঘন য়্যামোনিয়ার জলে গলাইয়া লউন। এই আঠাকে রাখিয়া দিতে হইলে টাইট ছিপি আঁটা বোতলে রাখিবেন।

(৩) সমপরিমাণে গালা ও গাটা পার্চ্চা মিশাইয়া উত্তাপে গলাইলে ভাল আঠা তৈয়ারী হয়।

(৪) নিম্ন লিখিত উপকরণ গুলি মিশ্রিত করুণ,—

ইণ্ডিয়া রাবার	৮ আউন্স
গাটাপার্চ্চা	৪ „
আইসিং য়্যাস্	২ „
কারবন ডাই-সাল্ফাইড	৩২ „

(৫) ইণ্ডিয়া রাবার	৫ „
ম্যাষ্টিক গঁদ (gum mastic)	১ „
ক্লোরোফরম (Chloroform)	৩ „

(৬) গাট্টা পার্চ্চা	১৬ „
ইণ্ডিয়া রাবার	৪ „
পীচ (Pitch)	৪ „
গালা	১ „
মসিনার তৈল	১ „

গরম করিয়া মিশাইবেন।

(৭) তার্পিণ তৈল	১ „
কারবন ডাইসালফাইড	১০ „
গাটা পার্চ্চা	আন্দাজমত ঐ

১০ আউন্সে যে পরিমাণ গলে।

(৮) গাটা পার্চ্চা	১০০ আউন্স
ভিনিস্ তার্পিণ	৮০ „
গালা	৮ „
ইণ্ডিয়া রাবার	২ „
তরল ষ্টোরাক্স Liquid Storax	১০ „

এইগুলিকে উত্তাপের সাহায্যে গলাইয়া মিশ্রিত করুন।

(৯) ইণ্ডিয়া রাবার		১০০ আঃ
রোজিন	Rosin	১৫ „
গালা		১০ „

এই মশলাগুলি মিশাইয়া উপযুক্ত পরিমাণ কারবন ডাইসালফাইডে গলাইয়া লউন।

(১০) নিম্নলিখিত (ক) ও (খ) সলিউসান পৃথক পাত্রে তৈয়ারী করিয়া পরে মিশ্রিত করুণ,—

(ক) ইণ্ডিয়া রাবার	৫ আঃ
ক্লোরোফরম (Chloroform)	১৪০ „

(খ) ইণ্ডিয়া রাবার	৫ „
রোজিন (Rosin)	২ „
ভিনিস্ তার্পিণ	১ „
তার্পিণ তৈল	২০ „

ছেঁড়া রাবারের জুতায় তালি দিবার আঠা :—

(১) মিহি কুচি কুচি করিয়া কাটা

ইণ্ডিয়া রাবার	১০০ ভাগ
রোজিন (Rosin)	১৫ ,,
গালা (Shellac)	১০ ,,

ইহাদিগকে গলাইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে কারবন ডাইসালফাইড। রাবারের জুতায় তালি দেওয়া ব্যতীত এই আঠাতে চামড়ার সহিত চামড়া অথবা রাবার, এবং রাবারকে কাঠ, ধাতু প্রভৃতি যে কোন পদার্থের সহিত আঁটা যায়।

(২) মিহি কাটা কুচুক

(Caont chonc)	৪ ভাগ
মিহি কাটা ইণ্ডিয়া রাবার	১ ,,
কারবন ডাইসালফাইড	৩২ ,,

(৩) কাঁচা রাবার

অথবা কুচুক	১০০ ভাগ
রোজিন (Rosin)	১৫ ,,
লাক্ষা গদ (Gumlac)	১০ ,,

ইহাদিগকে গলাইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে কারবন ডাইসালফাইড। উপরি উক্ত (১) (২) ও (৩) নং মশলা প্রস্তুত করিতে স্মরণ রাখিবেন কারবন ডাইসালফাইড পদার্থটী সহজেই জলিয়া উঠে এবং উড়িয়া যায়। সুতরাং খুব সাবধানে আঠা প্রস্তুত করিয়া, উহাকে একটী টাইট্ ছিপি আঁটা বোতলে রাখিতে হয়।

টায়ার জুড়িবার আঠা

(১) ইণ্ডিয়া রাবার	১৫ গ্রাম্
ক্লোরোফর্ম্ম	২ ,,
ম্যাষ্টিক (Mastic)	অৰ্দ্ধ আউন্স

প্রথমে ইণ্ডিয়া রাবারকে ক্লোরোফর্ম্মে মিশাইয়া গলাইয়া লউন। তারপর চূর্ণের আকারে ম্যাষ্টিক তাহার সহিত মিশ্রিত করুন। আঠাটীকে দুই এক সপ্তাহ রাখিয়া দিয়া তারপর ব্যবহার করিবেন।

(২) গালা (shellac)	১ আউন্স
গাটা পার্চ্চা (guttape rcha)	১ ,,
গন্ধক	৪৫ গ্রেন
রেড-লেড (Red lead)	৪৫ গ্রেন

প্রথমে গালা ও গাটা পার্চ্চা গলাইয়া লউন। তারপর উহার সহিত গন্ধক ও রেড-লেড খুব নাড়িয়া চাড়িয়া মিশ্রিত করুন। এই আঠা গরম অবস্থায় ব্যবহার করিতে হয়। বাই-সাইকেলের চাকার টায়ার এই আঠাতে খুব ভাল রকমে জোড়া যায়।

(৩) কাঁচা গাটা পার্চ্চা	৪৮ আউন্স
কারবন ডাইসালফাইড	২১৬ ,,
অ-ডি-কোলন	৮ ,,

এই আঠা একটী ইংলিস্ পেটেন্টের ফরমুলা। বাইসাইকেল ও মোটর গাড়ীর চাকার টায়ার এবং ইলেক্ট্রিক্ তারের ইন্‌সুলেসান ভালরূপে জোড়া যায়।

(৪) গালা	১ পাউণ্ড
য়্যালকহল	১ পাইন্ট
রেড়ির তৈল	অৰ্দ্ধ আউন্স

প্রথমে য়্যালকহলে গালা গলাইয়া তারপরে রেড়ির তৈল মিশ্রিত করুন। ইহা বাই-সাইকেলের টায়ার জুড়িবার খুব ভাল সিমেণ্ট। রেড়ির তৈল আঠাটীকে বেশ নরম রাখে।

চামড়া জুড়িবার আঠা বা সিমেণ্ট :—

(১) গাটা পার্চ্চা	২০ ভাগ
সিরীয়ান য়্যাসফাল্ট চূর্ণ (Syrian asphalt powder)	২০

কারবন ডাইসালফাইড	৫০ ,,
তার্পিন তৈল	১০ ,,

প্রথমে গাট্টা পার্চ্চাকে মিহি কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া কারবন ডাইসালফাইডে এবং তার্পিণ তৈলে গলাইয়া লউন। তারপর এই সলিউসানের সহিত য়্যাস্‌ফাল্ট চূর্ণ মিশ্রিত করুন। ইহা কিছুদিন রাখিয়া ব্যবহার করিবেন। এই আঠা মধুর মত ঘন হইবে। যদি দেখেন যে, তদপেক্ষা পাতলা হইয়াছে, তাহা হইলে খোলা পাত্রে রাখিয়া দিবেন। যে জিনিষটি জুড়িবেন, তাহাকে প্রথমতঃ বেনজিনের দ্বারা ধুইয়া লইতে হয়।

(২) শিরীষ	১ আউন্স
ময়দার লেই (Starch paste)	২ ,,
তার্পিণ	২ ড্রাম

জল উপযুক্ত পরিমাণ। প্রথমতঃ জলে উত্তাপের সাহায্যে শিরীষ গলাইয়া লউন। আর একটি পাত্রে ময়দার লেইতে জল এবং তার্পিণ মিশ্রিত করুন। তারপর উহা উত্তপ্ত শিরীষ সলিউসানে ঢালিয়া ভালরূপে মিশাইয়া লউন।
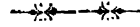
রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে পাটের ব্যবহার

পাট বাংলার একটি প্রধান সম্পদ। এক সময় এমন ছিল যে এই পাটের জন্য বাংলা দেশের কৃষক টিনের ঘর বাড়ী তুলেছে, বৌ-এর গায়ে গয়না দিয়েছে, এক কথায় সংসারের অবস্থা ফিরিয়েছে। এই পাটের ওপর ভরসা করে বাংলা দেশের কৃষক দেনাও করেছে বিস্তর— তার হয়ত মনে এই আশা ছিল যে পাট বিক্রীর আয় থেকে সে তার দেনা ত শুধ্‌বেই, অধিকন্তু উদ্বৃত্ত দ্বারা অবস্থা স্বচ্ছল করে নেবে। তার এবম্বিধ আশাটা মোটেই দোষণীয় নয়, কেননা, আয় যাদের থাকে তারাই দেনা করতে সাহস করে। কিন্তু পাটের দর একেবারে নেমে যাওয়ার দরুণ তার আশা পূর্ণ হয়নি। বাংলা দেশের চাষীরা যে এত বেশী দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তার কারণই হ'ল পাটের অসম্ভব দর হ্রাস। এইটাই তাদের ভয়ঙ্কর কাবু করে ফেলেছে, এ আঘাতের গুরুত্ব তারা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। পারবেই বা কি করে? ভাবতে পারেন সেই অবস্থা ২০।২৫ টাকা মণ যখন পাটের দর ছিল? আজ তার শূন্য গুলো উঠে গিয়ে ৫।৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে চাষীদের আয়ের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হ'য়ে মাত্র ১০ ভাগের এক ভাগে দাঁড়ালো!

কিন্তু এই যে মারাত্মক রকম দর পড়ে যাওয়া—এর কারণ কি? প্রথম প্রথম সকলে বলেছিলেন যে, এর কারণ হচ্ছে চাষীদের অত্যধিক পাট উৎপাদন। সেইজন্য সকলেই চাষীদের অতিরিক্ত পাট বুনতে বারণ করেছিলেন। পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দেশের মধ্যে কারও মতানৈক্য ছিল না, কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে একমত ছিলেন। পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ যে একান্ত আবশ্যক সে কথা কেউই অস্বীকার করবে না, কিন্তু পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। এর থেকে মনে হয় পাটের দর পড়ে যাওয়ার অন্য কারণও আছে। পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করে সামান্য দর উঠলো বটে, কিন্তু সে আর কতটুকু?

আসল কথা, পাটের আর সে রকম চাহিদা নেই। এই চাহিদা কম বলেই দর অত নেমে গেছে। সুতরাং পাটের দর বৃদ্ধি করতে গেলে, চাহিদা কি করে বৃদ্ধি পায় সে ব্যবস্থা করতে হ'বে। পাটের চাহিদা বৃদ্ধি করতে গেলে পাট বস্ত্রের নূতন নূতন ব্যবহার প্রয়োজন। শিল্প ব্যাপার কিংবা ব্যবসাদি বৃদ্ধি পেলেই পাট বস্ত্র অর্থাৎ চট হোসিয়ারী ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া যুদ্ধ বিগ্রহ লাগলে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

কিন্তু এ ছাড়াও পাটের চাহিদা বৃদ্ধি করবার সম্প্রতি আর একটি উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রক্রিয়া যদি সাফল্য মণ্ডিত হয় তবে তা' যুগান্তকারী বলে পরিগণিত হ'বে। সে

প্রক্রিয়া হচ্ছে রাস্তা তৈরী কার্য্যে পাটের ব্যবহার।

বিলাতের ডাণ্ডি চেম্বার অব্ কমার্স এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছেন। গ্ল্যাস্গোর এম্পায়ার একজিবিশনে এই সংক্রান্ত প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হ'বার কথা ছিল। চেম্বারের সভাপতি মিঃ জেম্স্ রবার্টসন্ এসম্পর্কে বলেছিলেন—"রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে পাটকে কি করে সুবিধা মত ব্যবহার করা যায়, সে সম্পর্কে একটি কমিটী প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। গ্ল্যাসগোর এম্পায়ার একজিবিসনে জুট সংক্রান্ত শিল্প ও অপরাপর শিল্পও প্রতিনিধিত্ব পাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেখানে পাটের ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণভাবে যদি কোন প্রক্রিয়া দেখানো হয় তবে তাতে ভাল ফল ফলবে। এরকম সাধারণ প্রক্রিয়া প্রদর্শনের যদি ব্যবস্থা করা যায় ত রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে পাট ব্যবহারের প্রক্রিয়াটাও দেখানো যেতে পারে।"

এখন ব্যাপার হচ্ছে যে রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে পাট ব্যবহারের প্রক্রিয়া যদি সাফল্য মণ্ডিত হয় তবে পাটের চাহিদার ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্ত্তন সূচিত হ'বে। এতে লাভ শুধুমাত্র এক পক্ষের নয়, লাভ দু'পক্ষের। যাঁরা রাস্তা নির্ম্মাণ করছেন, তাঁদের অপর জিনিষ ব্যবহারের চেয়ে পাট ব্যবহার করলে খরচ কম পড়ছে বলেই তাঁরা পাট ব্যবহারে মনোযোগী হ'বেন। তা' ছাড়া রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে পাট ব্যবহৃত হ'লে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি প্রাপ্তির দরুণ পাটের দরও বৃদ্ধি পাবে এবং তাতে চাষীদের ঘরে দু'পয়সা আসবার সম্ভাবনাও কম নয়।

আজকের দিনে সেইটাই একমাত্র কামনার বিষয়। অর্থনীতিবিদ্‌গণ ক্রমাগত বলছেন যে, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি ভাল করতে চাও ত তার অধিবাসীদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়ে তোল। ভারতের অধিবাসীদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করবার জন্য এক শ্রেণীর লোকের প্রচেষ্টার বিরাম নাই। এই ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে গেলেই পণ্য দ্রব্যেরও দর বৃদ্ধির প্রয়োজন। তাই পণ্য দ্রব্যের দর বৃদ্ধির জন্য উন্নত চাষ প্রণালী, মার্কেটিং স্কীম, সমবায় প্রথা, নূতন নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারের আলোচনা চলিতেছে। ভারতের কৃষকদের যে ক্রয় ক্ষমতা নেই, তার একমাত্র কারণ হ'ল তাদের জমিতে উৎপন্ন পণ্য দ্রব্যের মূল্যের অসম্ভব রকম হ্রাস প্রাপ্তি। বাংলার পাট সেই পণ্য দ্রব্যের মধ্যে একটি প্রধান দ্রব্য। বাংলার কৃষকদের অবস্থা বর্ত্তমানের চেয়ে ঢের ভাল ছিল যখন পাটের মূল্য বেশী ছিল। সুতরাং আজ পুনরায় যদি আবার পাটের মূল্য বৃদ্ধির প্রতি নজর দেওয়া যায় ত কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সম্ভব হ'তে পারে।

উক্ত সম্ভাবনাকে কার্য্যে পরিণত করতে গেলে আমাদের দেশেও রাস্তাঘাট নির্ম্মাণকল্পে পাট-ব্যবহার প্রক্রিয়ার পরীক্ষা চালানো উচিত। এই পরীক্ষা যদি কার্য্যকরী হয় ত পাটের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হবে সে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া আমাদের দেশে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে প্রতি বৎসর বহু টাকা ব্যয় হয়, শুধু তাই নয়, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের বিরাট ক্ষেত্র আমাদের দেশে পড়ে রয়েছে যাতে সহস্র সহস্র বেকার যুবকের সংস্থান হ'তে পারে। রাস্তা নির্ম্মাণের ক্ষেত্রে পাটের ব্যবহারে খরচ যদি কম পড়ে তাহলে এতে করে পাট উৎপাদনকারী চাষী থেকে আরম্ভ করে পাট-ব্যবসায়ী. রাস্তা নির্ম্মাণরত কণ্ট্রাক্টর ও বহু বেকার যুবক উপকৃত হ'তে পারবে। আমরা এবিষয়ে সরকার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভেকচ্ছত্র ব্যবসায়

(শ্রীকেশব সেন)

ব্যাঙের ছাতা যেমন মাটী ফুঁড়িয়া যেখানে সেখানে গজাইয়া উঠে আবার দু'দশ ঘণ্টা পরেই শুকাইয়া মিলাইয়া যায়, এই বাংলাদেশে অনেক গুলি ব্যবসায়ই তেমনি হঠাৎ গজাইয়া উঠিয়া হঠাৎ মিলাইয়া যায়। আজ পাঠকগণ সমীপে এই সকল ভেকচ্ছত্র ব্যবসায়ের কয়েকটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

সগোষ্ঠী হইলেও সত্যকথা বলিতেই হইবে। যাঁহার আপত্তি থাকে, তিনি আমাদের উপরে প্রগল্‌ভতার নিন্দাবাদ আরোপিত করিতে পারেন—নাচার। এই কলিকাতায় অহঃরহঃ কতই না নূতন নূতন মাসিক, বার্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজের উৎপত্তি ও লয় হইতেছে। ইহাদের তালিকা তৈরী করিতে হইলে অফিস খুলিয়া রিপোর্টার লাগাইয়া রেজিষ্টারী লিখিতে হয় এবং কোন্ কাগজ কবে কোন্ মহেন্দ্রক্ষণে প্রথম প্রকাশিত হইল, কত সংখ্যা আলোকের মুখ দেখিল, কোন ত্র্যহস্পর্শ-অশ্লেষা-মঘার ঘোরতর অশুভক্ষণে সে আলোকপাত বন্ধের ভয়াবহ দুর্দ্দৈব বঙ্গদেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, রীতিমত হাজিরা বহিতে তাহার হিসাব লিখিতে ও সঙ্গে সঙ্গে নিকাশ বুঝিয়া লইতে হয়! একবার আমাদের জনৈক বন্ধু নূতন কাগজের নাম ঠিক করিতে না পারিয়া কোন নামে যে বাংলা কাগজ নাই বা কোনোদিন হয় নাই, তাহা জানিবার জন্য ব্যাঙ্কশাল কোর্টের রেজিষ্টারের আফিসের বাবুদের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বাবুরা বন্ধুবরকে খাতা খুলিয়া দেখাইলে বন্ধুবর দেখিলেন—কত নাম যে তালিকাভুক্ত হইতেছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। প্রতিদিন বিশ পঞ্চাশটা করিয়া ডিক্লারেশনের পিটিশন, পড়িতেছে, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এজলাসে বসিবার পূর্ব্বে ব্যস্ততার সহিত পরপর সহি করিয়া যাইতেছেন। নামের সহিত রাজনীতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকিলে আবেদন পত্র বড় একটা না-মঞ্জুর হইতেছে না—আর কিছু হৌক্ না হৌক্ এক শ্রেণীর উকিলেরা ডিক্লারেশনের আবেদন লিপি সনাক্ত করিয়া লিপি পিছু এক টাকা আটা আনা করিয়া পাইতেছেন!

অবশ্য যত কাগজের ডিক্লারেশন লওয়া হয়, তাহার সবগুলি মুদ্রিতাকারে বাজারে বাহির হয় না—অনেকগুলি ও এক ফর্ম্মা আধ ফর্ম্মা ছাপা অবস্থায় ছাপাখানায় পড়িয়া থাকে, আমাদের যতটা অভিজ্ঞতা আছে তাহাতে বলিতে পারি—কভারের ডিজাইন ও ব্লক তৈয়েরী করা

যাহাদের ব্যবসা, তাহাদের বরাতে কিছু কিছু 'নগদ' জুটিয়া থাকে।

যেগুলি বাজারে বাহির হয়, সেগুলির সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। কলিকাতার যে কোন বড় রাস্তার মোড়ে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়—হকারেরা রকম বেরকমের সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজ লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। এই পূজার বাজারে যে অন্ততঃ পনেরো খানি মাসিক এবং বিশখানি সাপ্তাহিক পত্রের **"প্রথম এবং পূজা সংখ্যা"** বাহির হইবে, একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

যতদূর আমরা জানি তাহাতে বলিতে

পারি—প্রধানতঃ দুইশ্রেণীর লোকে এই নূতন নূতন কাগজ গুলি বাহির করে—(১) যাহাদের পয়সা আছে এবং সঙ্গে নিজেদের সম্পাদক ও লেখক বলিয়া জাহির করিবার ক্ষমতা আছে তাহারা এবং (২) যাহাদের পয়সা না থাকিলেও বুদ্ধি আছে—সংবাদ বা সাময়িক পত্র যে লাভ জনক ব্যবসা, ধনী ব্যক্তিদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দিয়া ইহারা তাহাদের পয়সায় কাগজ বাহির করে। দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই—পয়সা থাকিলে মানুষ যখন অপকৃষ্ট সখ-গুলিও মিটাইয়া থাকে, তখন কাগজ বাহির করার সখ মিটানে আপত্তির কি আছে? কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা যে সমাজের ভীষণ শত্রুতা করে, তাহাতে সন্দেহ কি?

এদেশে শিক্ষিত ও পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা কত এবং তাহাদের মধ্যে সংবাদ পত্র কিনিবার মত রুচি ও পয়সাই বা কতজনের আছে, নূতন নূতন কাগজ বাহির করিবার পুর্ব্বে কেহ তাহা তলাইয়া দেখেনা। ইহাদের কাজে সাংবাদিক-আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি ব্যবসা হিসাবেও চল্‌তি পত্রিকাগুলির ক্ষতি হয়। ভেকচ্ছত্র সংবাদ পত্রের 'উদ্‌গাতা' ও 'অনুষ্ঠাতা' দিগকে আজ বিশেষ করিয়া সমঝাইয়া দিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

আমাদের দেশ হুজুগের দেশ—একজনে একপথে চলিলে অমনি আর দশজনে হুড়মুড় করিয়া সেইদিকে ঢুকিয়া পড়ে। এদেশে প্রথমে ইন্সিওরেন্সের একখানা কাগজ ছিল, দেখাদেখি এই কলিকাতারই বুকে পাঁচ-সাত খানা ইন্সিওরেন্স সম্বন্ধীয় পত্রিকা গজাইয়া উঠিল। সবগুলিই মাসিক এবং সবগুলিই ইংরাজী ভাষায়। বাংলা কাগজের মধ্যে আগে শুধু ব্যবসা ও বাণিজ্যে ইন্সিওরেন্সের সম্বন্ধে আলোচনা হইত, তারপর আরও দু'একখানা পত্রিকায় এই সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে থাকে। এখন প্রত্যেকখানি মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক কাগজ ইন্সিওরেন্স বিভাগ খুলিয়া—অনুগ্রহকারী কোম্পানীদের ব্যালান্স সীটের ধামা-ধরা আলোচনা ও প্রত্যাখ্যান-কারীদের মুণ্ডপাত করিয়া আপনাদের স্বভাবের পরিচয় দিতেছে। এই সকল ভেকচ্ছত্র পত্রিকা নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না, অথচ অপরের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতেও ছাড়ে না।

কতকগুলি অপরিণামদর্শী ও অব্যবসায়ীর দৌলতে মুদ্রাযন্ত্র ব্যবসাও ভেকচ্ছত্র ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। কোনোমতে পাইকা-স্মল পাইকার খান দুই কেস্ আর একটা ভাঙ্গা ট্রেডিল্ মেসিন্ লইয়া কত লোকে যে কলিকাতার অলিতে গলিতে নূতন নূতন "প্রেস্" খুলিয়া বসিতেছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। এইরূপ ভেকচ্ছত্র ছাপাখানার অধিকারীরা সুলভে কাজ দিবার লোভ দেখাইয়া দু'চারি খানি কাড, প্রীতি-উপহার ও হ্যাণ্ডবিলের অর্ডার সংগ্রহ করে—যেমন সময়মত কাজ দিতে পারে না, তেমনি আবার পুরানো টাইপে ভাঙ্গা মেসিনে কষ্টে-সৃষ্টে বা খাড়া করে, তাহা দেখিয়া খরিদ্দারের মনে এতটুকুও সন্দেহ থাকেনা যে তিনি Printers Devil বা ছাপাখানার ভূতের দ্বারা আবিষ্ট হইয়াছিলেন। একবারের বেশী কেহ এইসকল জায়গায় কাজ দেয়না বটে, কিন্তু ঐ একেবারেই ইহারা খাঁটী ছাপাখানা-ওয়ালাদের কিছু ক্ষতি করিয়া তবে ছাড়ে—

অন্ততঃ ইহাদের ক্যান্‌ভাসিং-এর দৌলতে ছাপাব দর কিছু কমিয়া যায়-ই!

কাপড়-ধোয়া সাবানের ব্যবসা একটী মস্ত-বড় ভেকচ্ছত্র ব্যবসা; প্রসিদ্ধ কেমিষ্ট ও উদ্ভাবক শ্রীযুত রাজশেখর বসু এদেশে প্রথমে কাপড়-ধোয়া সাবান তৈয়েরী করেন। তারপরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া ওঠে এবং কাপড়-ধোয়া সাবানের ব্যাপারে এদেশে আত্মনির্ভরশীল হয়। কিন্তু আমাদের দেশ—অনুকরণস্পৃহা এদেশবাসীর হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায়। দেখিতে দেখিতে যে-সে আজ কাপড়-ধোয়া সাবানের কারখানা খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে—একটা কড়াই, কিছু কষ্টিক সোডা আর কিছু তেল হইলেই যেন একটী কারখানা গড়িয়া উঠিল! চৌকো আকারে, গোলাকারে, শঙ্খের আকারে কত যে কাপড়-ধোয়া সাবান লইয়া দলে দলে লোক কলিকাতার রাস্তার দু'পাশে বসিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই! একজন চারি পয়সায় একপোয়া সাবান বিক্রয় করিতেছে তো অপরে দিতেছে চারি পয়সায় একসের! দরের নমুনা দেখিয়া মনে হয়, হয়তো বা সাজিমাটীতেও কুলাইতেছে না—সোডা মাটীই ইহারা ব্যবহার করিতেছে।

টুথ্-পাউডার, পাউডার, সুগন্ধী তেল, ক্রীম ও লাইম্‌জুসের কারখানাও এতদূর বাড়িয়া গিয়াছে যে, পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র এক একটী "কেমিকাল্ ওয়ার্কস্" দেখিতে পাওয়া যায়। সহরের ভাল ষ্টেশনারী দোকান এই সকল জিনিষ রাখেনা, ছোট-খাট দোকানগুলি চল্লিশ পার্শেণ্ট পঞ্চাশ পার্শেণ্ট কমিশনের লোভে এই ভেকচ্ছত্র কেমিক্যাল্ ওয়ার্কসের অবৈজ্ঞানিক প্রথায় ও অপক্ক হস্তে তৈয়ারী জিনিষ অল্প শিক্ষিত খরিদ্দারের হস্তে গছাইয়া দিতেছে!

কলিকাতায় ড্রাইংক্লিনিং ও ভেকচ্ছত্র ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। যেখানে সেখানে ড্রাইংক্লিনিং। একটা আলমারী একটা ভাঙ্গা টেবিল, একখানি লোহার চেয়ার ও একখানা ছাপন রসিদ বহি হইলেও যেন হইল! ঘর ভাড়া দিতে না পারায় মাসান্তেই এই ড্রাইংক্লিনিং উঠিয়া যায়, ফলে অন্ততঃ বিশ-পচিশজন লোকের কাপড়-চোপড় মারা যায়!

এইরূপ বহু ভেকচ্ছত্র ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করা যায়, বাহুল্য ভয়ে আজ আমরা এইখানেই বিরত হইব। সর্ব্বশেষে কেবল একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর কথা উল্লেখ করিব, যাহাদের ব্যবসায়-স্পৃহা লোকের ঘোরতর অনিষ্ট করে। দুঃখের বিষয় শিক্ষিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীরাই এই অনিষ্টকর কার্য্যে লিপ্ত।

আজকাল কলিকাতার অলিতে গলিতে নূতন নূতন ভেকচ্ছত্র স্কুল-গার্লস্কুল গজাইয়া উঠিয়াছে। সকালে মেয়েদের স্কুল, দুপুরে ছেলেদের স্কুল। ইহার সঙ্গে যেখানে রাত্রে একটা হোমিওপ্যাথী বা কমার্শিয়াল বসানো গিয়াছে, সেখানকার তো কথাই নাই—এক বাড়ী-ভাড়ায় তিনটী ব্যবসায়, একগুলীতে তিনটী বাঘ মারা আর কি!

এই স্কুল ব্যবসায়ীরা যে কচি কচি ছেলে-মেয়েদের মস্তক চর্ব্বন করে, এবং হোমিওপ্যাথী ও কমার্শিয়াল্ শিক্ষার লোভ দেখাইয়া বেকার যুবকদিগের অভাব-অনাটনের উপরে নূতন ট্যাক্স বসায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। জানিনা কবে আমাদের দেশের ভেকচ্ছত্র ব্যবসায়ীদের প্রকৃত ব্যবসা-বুদ্ধি জন্মিবে!

শশা গাছের শত্রু

যে সমস্ত লোক শশা ফলের চাষ করেন তাঁরাই জানেন যে, প্রায়ই শশা গাছকে ব্যাঙের ছাতার মত এক রকম জিনিষ আক্রমণ করে যাতে করে জমির এক ইঞ্চি উপরে গাছের মূল ডাঁটার গায়ে ক্ষত দেখা দেয়। খুব বেশী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকলে প্রথমে ঐ ক্ষতটা চোখে পড়ে না, কিন্তু ক্রমশঃ দেখা যায় যে, ডাঁটা ও পাতার সেই সবুজ রং আর থাকছে না। গাছের উজ্জ্বল সবুজ রং অন্তর্হিত হ'লেই বুঝতে হ'বে যে তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছে, এবং তখন ভাল করে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে, পূর্ব্বোক্ত স্থানে ক্ষত দেখা দিয়ে সেখানটায় শুকিয়ে গেছে। উক্ত ক্ষত যদি নিবারণ করা না যায় ত সমস্ত গাছ অল্প সময়ের মধ্যেই একেবারে শুকিয়ে যাবে।

ঐ ক্ষতের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে ডাঁটার যে যায়গাটা শুকিয়ে গেছে সেটা ধারালো ছুরির সাহায্যে কেটে ফেলতে হ'বে। তারপর সেই কাটা স্থানের ওপর গন্ধক ঘসে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। অবশিষ্ট সেই গাছের গোড়ায় খানিকটা চূণের জল (৬ পাইট আন্দাজ) দিতে হ'বে।

ফলের বাগানে অন্য চাষ চলে কিনা?

ফলের বাগানে অন্য কোন কিছুর চাষ চলে কি'না?—এই প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেককে একটু চিন্তা করতে হয়। কারণ, অপর কিছুর চাষ করলে বিপদের সম্ভাবনা, কেন না, তাতে করে ফলের গাছের ক্ষতি হতে পারে; আবার যদি চাষ না করা যায় ত রীতিমত লোকসান যাবে, কারণ অতখানি জমি বৃথাই পড়ে থাকে। আমাদের দেশে সচরাচর ফলের বাগানে অপর কিছুর চাষ হয় না, কিন্তু যদি চাষ চালানো যায় ত চাষীরা দ্বিগুণ লাভ করতে পারে। প্রথম লাভ তাদের ফল বিক্রয় জনিত আয় থেকে, দ্বিতীয় লাভ ফলের বাগানে অপর যে সমস্ত ফসল লাগাবে তারই বিক্রয় লব্ধ টাকা থেকে। অথচ জমিটা যদি খালি পড়ে থাকে ত চাষীরা এই দ্বিতীয় লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

বোঝবার সুবিধার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট উদাহরণ ধরা যাক্। একজন চাষীর হয়ত দুটো

বাগান আছে ; একটি আম, জাম, লিচু প্রভৃতির ও অপরটি নারিকেল ইত্যাদির। দু'টি বাগানের ফল বিক্রী করে বার্ষিক হয়ত তার ২০০।২৫০ টাকা লাভ হয়। এর বেশী সে আর কিছুই পায় না। কিন্তু যদি উক্ত বাগান দু'টিতে ফলের গাছের ফাঁকে ফাঁকে অপর জিনিষের চাষ লাগানো সম্ভব হয় তাহ'লে তার বার্ষিক আয় আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। এবং তার আয় আরও বৃদ্ধি পেলে তার ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। এবং তাতে আমাদের আরও উন্নতি ঘটা সম্ভব হ'বে।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে, ফলের বাগানে অন্য জিনিষের চাষ লাগাবার পক্ষে একটা বিষয় ভেবে দেখতে হ'বে যে তাতে ফলের গাছের কোন ক্ষতি হ'বে কিনা ? এসম্বন্ধে দু'রকম মত বর্ত্তমান। যারা এই ব্যবসায়ে নূতন নামে তারা অত্যধিক লাভের বশবর্ত্তী হয়ে এই অভিমত প্রকাশ করে যে ফলের বাগানে অপর জিনিসের চাষ করলে তাতে ফলের গাছের কোনই ক্ষতি হয় না। অপর পক্ষে অনেকে বলেন যে, ফলের বাগানে অপর কোন চাষ লাগালে তাতে ভাল ফল দেয় না। মোট কথা, ফলের বাগানে গাছ গুলির মধ্যে ব্যবধান যদি অল্প থাকে তা'হলে সেক্ষেত্রে অপর কিছু চাষ করবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ব্যবধান যদি অধিক থাকে তাহ'লে তার মধ্যে শিম, বরবটি, বাঁধাকপি, মটর ইত্যাদির চাষ চালানো যেতে পারে। আসল ব্যাপার হচ্ছে যে, সেই সমস্ত বস্তুরই চাষ করা চলে যাতে ফলের গাছের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই এবং যাতে প্রচুর সার ব্যবহৃত হয়ে জমির উৎপাদিকা শক্তি ঠিক রাখে। শিম, বরবটি, বাঁধাকপি, মটর, প্রভৃতির চাষে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না এবং তাতে চাষীরাও বেশ লাভবান হ'তে পারে।

ফল ছাঁটাই করলে কি বেশী লাভবান হওয়া যায় ?

আমাদের দেশে গাছ ছাঁটাইয়ের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত, কিন্তু ফল ছাঁটাই আমাদের দেশে অল্পই দেখা যায়। এটা আমরা ভালই জানি যে, গাছ ছাঁটিয়ে দিলে তার ফল বৃদ্ধি পায়, তেমনি এটাও সত্যি যে গাছের অতিরিক্ত ফল ছাঁটাই করলে গাছের ফলের পরিমাণ ও আস্বাদ ভাল হয়। কিন্তু অনেকে ভাবে বুঝি এতে ব্যবসার ক্ষতি হ'বে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের এই ধারণা সত্যি নয়। যে বছর ফল ছাটাই করা হয়, সে বছর হয়ত তাদের লাভ একটু কম হয়, কিন্তু পরবর্ত্তী বছর গুলির হিসাব ধরলে ফল ছাটাই কার্য্যে তাদের লাভ বাড়ে বই কমে না।

ফল ছাটাই কার্য্য খাটুনীর ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু বালক বালিকা ও মেয়েদের পর্য্যন্ত এ কাজে লাগানো যায়, কেননা, কাজটা মোটেই শক্ত নয়। ফল ছাটাই করলে যে লাভ বৃদ্ধি পায় সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। যে ব্যবসায়ী একবার ফল ছাঁটাই কার্য্যে লিপ্ত হয়েছে সে আর এ অভ্যাসটিকে ছাড়তে পারে না। সেইজন্যই আজকাল অন্যান্য দেশে আধুনিক ফল চাষী মাত্রই ফল ছাটাই কার্য্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।

অনেকে ফল ছাটাই কার্য্যের গুণাগুণ ঠিক ভালভাবে বুঝতে পারেন না, কিন্তু ফল ছাঁটাই সুবিধা গুলির বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা গেল :—

১। যে গাছের ফল ছাঁটাই করিয়া দেওয়া হয়, সে গাছের ফল আরও বড় সাইজের ভাল আস্বাদযুক্ত হয়ে থাকে ; কারণ অতিরিক্ত ফল ছাঁটাই করে দেওয়ার দরুণ অবশিষ্ট ফলগুলি ভাল আলো বাতাস এবং বৃদ্ধির সুযোগ পায়। তাছাড়া, খারাপ কিংবা পোকা লাগা অথবা বাজে সাইজের ফলগুলি ছেটে দেওয়ার দরুণ নিকৃষ্ট ফল আর ফলে না।

২। গাছের অতিরিক্ত ফল ছাঁটাই করার দরুণ গাছেরা উৎকৃষ্ট মুকুল ধারণ করবার সুযোগ পায়।

৩। গাছের অতিরিক্ত ফল ছেঁটে দেওয়ার দরুণ বেশী ভারের জন্য ডাল ভেঙ্গে পড়বার আশঙ্কা থাকে না।

৪। ফল ছাঁটাই করলে গাছে পোকা ইত্যাদি খুব কম ধরে।
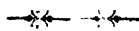
বড় পেঁয়াজের উৎপাদন

আমরা বাজারে যে বড় পেঁয়াজ দেখতে পাই, তার চেয়ে বড় এবং সরস পেঁয়াজ সকলেই একটু চেষ্টা করলে অনায়াসে উৎপন্ন করতে পারে। উক্ত পেঁয়াজের এক রকম বীজ পাওয়া যায় এবং সেই বীজ যদি অনতিবিলম্বে ভাল জমিতে পোঁতা যায় ত ছবির মত বড় বড়
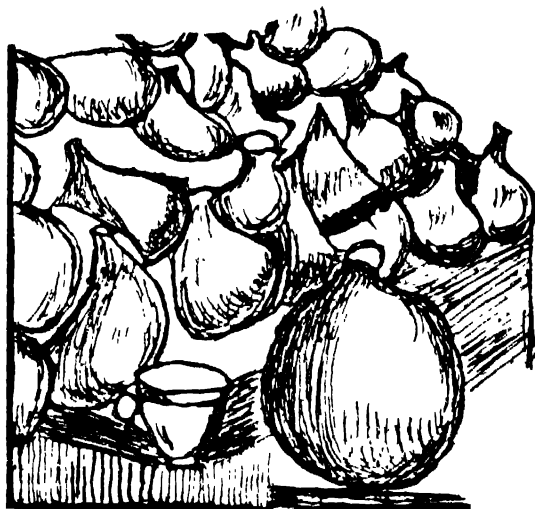
পেঁয়াজের গাছ বেরোবে। ব্যাপার আর কিছুই নয়, চাষের সময় একটু যত্ন নিতে হয়।

খোলা জমিতে দু'ফিট আন্দাজ গর্ত্ত খুঁড়ে এবং সেই গর্ত্তের তলার মাটিতে এক বাল্‌তি প্রচলিত সার এবং সিকি বাল্‌তি চুণ মিশিয়ে দিতে হয় এবং ওপরকার মাটীতে প্রায় এক বাল্‌তি পরিমাণ পচা গোবর এবং ৪ আউন্স পরিমাণ কাঠের ছাই মিশ্রিত করতে হয়। তারপরে সমস্ত মাটিকে বেশ ভাল করে মেখে দিয়ে জমি পাতলা করে রাখতে হয় যাতে করে পেঁয়াজের শিকড় সহজে তলায় যেতে পারে।

যদি কেউ খুব তাড়াতাড়ি গাছ জন্মাতে চায় তা'হলে বীজকে ঘণ্টা দু'য়েক জলে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিতে হ'বে। তারপর সেই বীজ গুলো উপরোক্ত জমিতে এক ফুট অন্তর অন্তর প্রায় এক ইঞ্চি গর্ত্ত করে পুঁতে দিতে হয়। প্রতি গর্ত্তের তলায় যদি সিকি ইঞ্চি করে পাতার সার দেওয়া যায় ত ভাল কাজ দেয়। তারপর আস্তে আস্তে অথচ চাপ চাপ ভাবে বীজের ওপর ভাল মাটী চাপা দেওয়াই রীতি। লক্ষ্য রাখতে হ'বে যেন মাটিতে বেশ সূর্য্য কিরণ বর্ষিত হয়।

বীজ থেকে চারা বেরোলেই, আবহাওয়া যদি শুষ্ক থাকে ত তার ওপর ভূষোর জল ছিটিয়ে দিতে হ'বে। এই রকম দশ দিন অন্তর অন্তর করতে হ'বে যতদিন না চারাগুলো বেশ বড় হয়। তারপর ইচ্ছা করলে সুবিধা মত অপর জমিতে স্থানান্তরিত করতে পারা যায় কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখতে হ'বে যে দুটি চারার মধ্যে যেন অন্ততঃ এক ফুট ব্যবধান থাকে। চারা গুলির মধ্যে যাতে কোন আগাছা জন্মিতে না পারে সেধারে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

শুধু তাই নয়, চারাগুলিকে দস্তুরমত ভাবে খেতে দিতে হ'বে, অর্থাৎ জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সাপ্তাহিক একবার করে দু' দফায় নাইট্রেট্ অব্ সোডা, তারপর ফস্ফেট অব্ লাইম এবং শেষে সাল্ফেট অব্ পটাশ দিতে হয়। প্রতি চারা পিছু সিকি চামচে করে দেওয়া নিয়ম।

পেঁয়াজের খোলা যখন রং বদলাবে এবং চারার ডগাগুলো যখন হলদে হয়ে যাবে তখন আর উপরোক্ত দ্রব্যগুলি দিতে হ'বে না। ফলের দু' ইঞ্চি ওপর থেকে চারাকে দুমড়ে দিয়ে এক পক্ষ কাল ঐরূপ অবস্থায় রাখ্তে হ'বে এবং তারপরে মাটি থেকে সমস্ত তুলে নিয়ে আরও একপক্ষ কাল রৌদ্রে শুকোতে হ'বে।

আমাদের দেশে সব জিনিষেরই চাষ করতে হয় বলেই করা হয়, বৈজ্ঞানিক কোন পদ্ধতি অবলম্বিত হয় না। কিন্তু উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যদি অবলম্বিত হয় তাহ'লে তা' অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য হ'লেও বেশী পরিমাণ উৎপাদনের দ্বারা চাষীরা লাভবান হবেন।

বাংলার লবণ-শিল্প

বাংলা সরকারের প্রেস অফিসারের এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, বাংলা সরকার বিদেশী লবণের উপর শুল্ক স্থাপন করেছেন। ব্যাপারটা আপাততঃ বেশ ভাল বলে মনে হ'লেও বিষয়টা বেশ করে তলিয়ে দেখা দরকার। কোন গভর্ণমেণ্ট বিদেশী পণ্যদ্রব্যের উপর দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে শুল্ক ধার্য্য করতে পারেন—

(১) দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করণ,

(২) গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি মানসে যদি শুল্ক ধার্য্য করা হয়, তাহলেও এটা লক্ষ্য করা দরকার যে, তাতে করে জনসাধারণের অসুবিধার সৃষ্টি হবে কিনা?

লবণ জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী; এ বস্তুর উপর শুল্ক ধার্য্য করিলে জনসাধারণের উপরই ট্যাক্স বসানো হয়, কারণ, শুল্ক ধার্য্য হওয়ার দরুণ জনসাধারণকে পূর্ব্বাপেক্ষা চড়া দরে লবণ কিনতে হচ্ছে। লবণ বিলাসিতার জিনিস নয়, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই ইহা সমান প্রয়োজন। আবার একটা মজার ব্যাপার এই যে লবণ এমন জিনিষ যাহা লোকে বেশী খেতে পারে না। চিনি মণ্ডা লোকে প্রয়োজনের অনেক বেশী লোভে প'ড়ে খেয়ে ফেলে; কিন্তু লবণ এমনই জিনিষ যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক রতিও কেহ খেতে চায় না কিম্বা খেতে পারে না। সুতরাং লবণ লোকে যা ব্যবহার করে সে যে টুকু না করলে নয় তাই করে থাকে।

ভারতের শতকরা ৯৫ ভাগ লোকই দরিদ্র, সুতরাং লবণের উপর শুল্ক স্থাপনের পীড়নটা তাদের ওপর গিয়ে পড়ে।

কিন্তু ঐ শুল্ক স্থাপন কার্য্যটা যদি দেশীয় লবণ-শিল্পকে রক্ষার মানসে অনুষ্ঠিত হ'ত, তাহ'লে আমাদের কিছু বল্‌বার থাকতো না এই জন্যে যে, জনসাধারণের এক দিককার ক্ষতি অপরদিকের কল্যাণের দ্বারা পুসিয়ে যাচ্ছে; কারণ, যদি কোন দেশী শিল্পের উন্নতি হয়'ত তাহলে তদ্দ্বারা বহু দেশীয় লোকের অন্নসংস্থান হয় এবং জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলা সরকার বাংলা দেশে লবণ-শিল্পকে চালু করবার জন্য কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালান নি। বরং প্রেস-অফিসারের উক্ত বিবৃতি থেকে এটাই কতকটা বোঝা যায় যে, বাংলা দেশে লবণ-শিল্প ভাল চলবে না।

কিন্তু এটা জোরের সঙ্গে বলা চলে যে, বাংলাদেশের মধ্যে কাঁথিতে গুটি কয়েক লবণ কারখানার কার্য্য বেশ চলছে এবং তাদের উৎপাদিত লবণ বিদেশী লবণ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। তা' ছাড়া যে দরে ইহারা বাজারে লবণ বিক্রয় করিতেছে তাহাও বিদেশী লবণের দাম অপেক্ষা কম।

সুতরাং এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, গভর্ণমেণ্ট বিদেশী লবণের উপর শুল্ক বসিয়েছেন বটে, কিন্তু দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই করেন নি। এতে করে গরীব জনসাধারণ অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অথচ দেশের কোন হিত সাধিত হচ্ছে না। গভর্ণমেণ্টের এবম্বিধ কার্য্য কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। বাংলা সরকারের প্রেস অফিসার কি জানাবেন লবণ শুল্কের দরুণ মোট কত টাকা তাঁদের আয় হই য়াছে বং সে-টাকা থেকে কতখানি তাঁরা লবণ শিল্পের হিতার্থে খরচ করেছেন ?

প্রেস অফিসার মহোদয় তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, এদেশের একটি ইউরোপীয় লবণ কোম্পানী ফেল মেরেছিল। আশ্চর্য্য কি ? কত ব্যবসায়ী কোম্পানীই ত ফেল মারছে। কিন্তু একটি ইউরোপীয় কোম্পানীর কারবার গুটানো থেকে এটা ত প্রমাণিত হয় না যে, বাংলাদেশে লবণ-শিল্প চালু হ'বে না। প্রেস অফিসার মহোদয় উল্লেখ করবেন কি সেই ইউরোপীয় কোম্পানী কতদিন কাজ চালিয়েছিল, কত টাকাই বা তাদের লোকসান গেছে এবং কি প্রণালীতেই বা তারা লবণ উৎপাদন করত ? প্রেস অফিসার মহোদয় এটা কি অবগত আছেন যে, যে স্থানে উক্ত কোম্পানীর কাজে লোকসানের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই স্থানেই অপরাপর

ভারতীয় লবণ কোম্পানীর কাজ বেশ ভাল ভাবেই চলেছে।

বাংলা সরকার মিঃ পিটের রিপোর্টটী নজীর হিসাবে ধরেছেন। কিন্তু মিঃ পিট্ কি সমুদ্র জলের খনিত্ব সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেছেন। মিঃ পিটের রিপোর্টে এক যায়গায় আছে যে It must be borne in mind that figures given are estimates only and may be subject to considerable modifications in the light of actual experience. এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পিট্ সাহেব কোন স্থির সিদ্ধান্ত করেন নি, শুধু তাঁর 'এষ্টিমেট' দিয়েছেন। বরং তিনি পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে কার্য্যক্ষেত্রে এষ্টিমেটের ফলাফল অনেকাংশে বদলে যায়। সুতরাং বাংলা সরকার মিঃ পিটের মন্তব্যানুযায়ী কি কোন কার্য্যকরী বিবরণ সংগ্রহ করেছেন? যদি তা' না করে থাকেন, সেটাই কি তাঁদের করা উচিত ছিল না?

মিঃ পিটের লবণ সম্বন্ধীয় রিপোর্টের আদ্যোপান্ত বিবরণ আমরা ব্যবসা বাণিজ্যে দুইবৎসর পূর্ব্বে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করিয়াছি। তাহার মধ্যে অনেক জায়গায় তিনি লবণ শিল্পের সাফল্য সম্বন্ধেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এক Transport এর অসুবিধার জন্যই লবণ বিক্রয়ের দর বিদেশী প্রতিযোগীতায় পারিয়া উঠিবে কি না সেই বিষয়েই তিনি যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তা' ছাড়া বাংলার সমুদ্রোপকূলে বর্ষাকালের কয়েক মাস বাদ দিলে কত দিন কাজ করা যাবে না যাবে সে বিষয়ও পরীক্ষা সাপেক্ষ। আমরা আমাদের গ্রাহক ও পাঠক দিগকে ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত এই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি পড়িতে অনুরোধ করি।

প্রেস অফিসার মহোদয় উল্লেখ করেছেন যে মিঃ পিট বাংলাদেশে লবণ-শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন। কিন্তু মিঃ পিট তাঁর রিপোর্টের কোনখানটায় অনুরূপ মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন প্রেস অফিসার মহোদয় তা জানাবেন কি? আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি বাংলা দেশে কয়েকটি লবণ কোম্পানীর কাজ বেশ চলেছে, সুতরাং কার্য্যকরী দৃষ্টান্তটা কি গভর্ণমেণ্ট ব্যবহার করতে পারতেন না? পিটের রিপোর্ট নিয়ে গভর্ণমেণ্টের এখন ত আর Speculate বা কল্পনা করা চলে না! কারণ দেশী লবণের কারখানাগুলি লবণ তৈরী ক'রে তা বাজারে বিক্রয় করিতেছে। ইহা স্বাদে, বর্ণে এবং গুণে কোনও বিদেশী লবণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে এবং ইহার দামও বেশী নহে। সুতরাং এ সময়ে গভর্ণমেণ্টের তরপ হইতে এইরূপ বিবরণ বাহির করিলে লবণ শিল্পের মস্তকে লগুড়াঘাত করা হয় না কি?—

আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, বাংলা সরকার দেশীয় লবণ শিল্পের প্রসারতার প্রতি বিরূপ। এ বিরূপতার যে কি কারণ থাকতে পারে তা আমাদের জানা নেই, তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে বস্তু বাংলা দেশের ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতার নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, সে বস্তু উৎপাদনে গভর্ণমেণ্ট যদি দেশীয় কোম্পানী গুলিকে উৎসাহিত এবং সাহায্য না করে থাকেন, তবে গভর্ণমেণ্টের এর চেয়ে মারাত্মক ভ্রম আর কিছুই হ'তে পারে না। অথচ গভর্ণমেণ্ট এই ভ্রমই করে চলেছেন।

গভর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত দেশীয় লবণ শিল্পের উন্নতিকল্পে কোন চেষ্টাই করেন নি। ৭বছর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুত করা এদেশে অপরাধ বলে গণ্য হ'ত। ১৯৩০ সালের বিরাট আইন অমান্য আন্দোলন এই লবণ আইন থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল! এই লবণ শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে সরকার কোন 'এক্সপার্টের' মতামত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন নি, বরং যাঁরা লবণ শিল্পের প্রসারতার অনুকূলে মতামত প্রকাশ করেছেন গভর্ণমেণ্ট তাঁদের রিপোর্ট বাইরে প্রচারিত হ'তে দেন নি। বাংলা সরকারের প্রেস অফিসার মহোদয় কি জানাবেন লবণ শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে মিঃ টি, আর, আয়েঙ্গার কি রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন এবং সে রিপোর্ট কেনই বা বাইরে প্রকাশিত হয় নাই? গভর্ণমেণ্টের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কেমিষ্ট ডাঃ আর, এল, দত্ত মহোদয় লবণ শিল্প সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সরকার কি সে সমস্ত জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করতে রাজী আছেন? এটা কি সত্য যে, বাংলা দেশের লবণ ব্যবসায়ীরা যখন লবণ শিল্পের উন্নতিকল্পে সরকারী কর্ম্মচারী পূর্ব্বোক্ত মিঃ টি, আর, আয়েঙ্গারের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল তখন সরকার সে সাহায্য প্রদান করেন নি? লবণ উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি 'বাই-প্রোডাক্ট' পাওয়া যায়, সেগুলির ব্যবস্থা লাভজনক—প্রেস অফিসার মহোদয় তাঁর বিবৃতিতে এই সমস্ত বাই-প্রোডাক্টের বিষয় কেন উল্লেখ করলেন না? বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস, সি, মিত্র তাঁর 'রিকভারী প্ল্যানে' লবণ শিল্প সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন প্রেস অফিসার মহোদয় সেটাও কি পড়ে দেখেন নি?

এসম্পর্কে আমরা বর্ম্মা মুলুকের নজীর উল্লেখ করতে চাই। ব্রহ্মদেশ আজ বিচ্ছিন্ন হ'লেও কয়েকমাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদেরই সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সে দেশে মোটমাট ২৩১টি লবণ শিল্পের কারখানা আছে, গভর্ণমেণ্ট তাদের যথাযথ উন্নতির ব্যবস্থা করে থাকেন। শুধু তাই নয়, গভর্ণমেণ্ট নিজে থেকে সরকারী লবণ কারখানা খুলে এবিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা চালান। বাংলা দেশের গভর্ণমেণ্ট কিন্তু সে সমস্ত কোন কিছু করেন না; কেন করেন না এ সম্বন্ধে শিল্প বিভাগের মন্ত্রীর নিকট কোনও কাউন্সিলার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন কি?
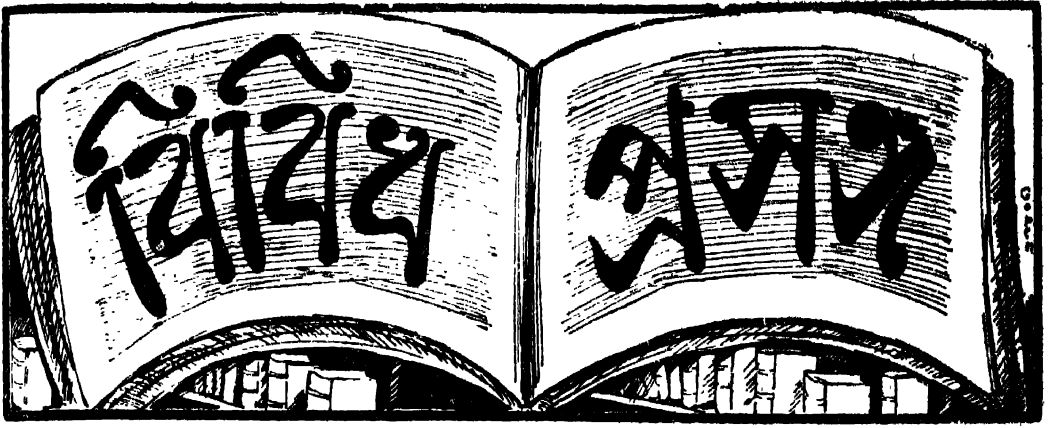
পার্লামেণ্টের কমিশন নিয়োগ

বর্তমান পার্লামেণ্টের গত ১৮ মাস কাজের মধ্যে ২ টি রয়েল কমিশন ও ৩১ টি অপরাপর কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল। রয়েল কমিশন দু'টি প্যালেষ্টাইন সমস্যা ও খনি-নিরপত্তা সংক্রান্ত। অপরাপর কমিশনগুলি স্কটল্যাণ্ডের বিবাহ আইন, বৃটিশ ফিল্ম-এর অবস্থা, যানবাহন কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের মজুরীর হার ও অন্যান্য জনহিতকর ব্যাপার সংক্রান্ত। আমাদের দেশেও কমিশন ও কমিটি নিযুক্ত হয়, তবে ওদের সঙ্গে আমাদের এই তফাৎ যে, ওদের কমিশন-ব্যাপারটা কার্য্যে পরিণত হয় আর আমাদের কমিশন ব্যাপারটা রিপোর্ট প্রকাশেই শেষ হয়ে যায়।

লবঙ্গ সম্পর্কে অনুসন্ধান

ভারতের প্রায় সমস্ত স্থানে, বিশেষতঃ দক্ষিণাংশে লবঙ্গের চাষ হয়। কিন্তু ঐ চাষ সম্পর্কে কোন সঠিক সংবাদ লাভ করবার কোন প্রতিষ্ঠান নেই। সিমলার এক সরকারী কম্যুনিকে প্রকাশ যে, ঐ অভাব দূর করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট, মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর অব এগ্রিকাল্‌চার মিঃ এ, কে, যোগনারায়ণ আয়ারকে লবঙ্গ সম্পর্কে অনুসন্ধানকল্পে বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেছেন। তাঁর অনুসন্ধান কার্য্য ৬ মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে মনে হয়।

বি, এ, ও বি, এস্-সি পরীক্ষায় মহিলাদের কৃতিত্ব

এ বৎসর বি, এ, পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, ইংরেজীতে কেউই প্রথম শ্রেণীর অনার্স্ প্রাপ্ত হয় নি; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, ও নবম এই ক'টি স্থানই মহিলাগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়েছে। অপরাপর বিভাগেও বেশী সংখ্যক মহিলা পাশ করেছেন। এর থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মহিলাদের মধ্যে যথেষ্ট উচ্চশিক্ষার বিস্তার লাভ ঘটছে।

এ বৎসর বি, এ, পরীক্ষায় ৪,০৮৮ জন ছাত্র হাজির হয়েছিল, তন্মধ্যে ২,৪৩৬ জন পাশ করেছে। গত বৎসরে পাশের শতকরা হিসাব

ছিল ৬২·৪৫ ; এবারে তা' ৫৯·৯-এ দাঁড়িয়েছে।

এবৎসর বি, এস-সি, পরীক্ষার ফল গত তের বছরের মধ্যে রেকর্ড স্থাপন করেছে, কেননা, পাশের শতকরা হিসাব দাঁড়িয়েছে ৭৩·৩; গত বছরে উক্ত হিসাব ছিল ৬৬·১। মোটমাট ৯৭৫ জন পরীক্ষা দিয়েছিল তন্মধ্যে ৬৭১ জন পাশ করেছে।

—*—

বিহারের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

বিহারের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ইউনাসকে তখনকার মুসলিম সঙ্ঘ এক অভিনন্দন-সভায় সম্বর্দ্ধিত করেছিল। তার উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে তিনি জনসাধারণের কল্যাণ সাধনার্থে নিজেকে সর্ব্বদা নিয়োজিত রাখবেন এবং তার নিকট হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কোন পার্থক্য থাকবে না। কথা গুলো খুবই ভাল। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন প্রদেশগুলির মন্ত্রীমণ্ডলী যদি কথায় ও কাজে অনুরূপভাব প্রকাশ করেন ত ভাল হয়।

বিহারে বিধবা বিবাহের প্রচেষ্টা

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, বিহারে বিধবা বিবাহের প্রসারকল্পে জোর প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলাদেশে যেখানে সবচেয়ে অধিকসংখ্যক বিধবা বর্ত্তমান (হাজার পিছু ২২৬) সেখানে বিধবা বিবাহের প্রসার কল্পে তেমন কোন প্রচেষ্টা চলছে না। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্লান্ত চেষ্টা করে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরে সে আন্দোলনের স্রোতে ভাঁটা পড়েছে। সে-সম্পর্কে দেশবাসীর পুনরায় সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সর্দ্দা বিলে যেমন হিন্দু বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ সম্পর্কে রাষ্ট্র কথঞ্চিৎ সাহায্য করেছেন, বিধবা বিবাহের প্রসার সম্পর্কেও রাষ্ট্র সেই রকম যদি কোন আইন প্রণয়ন করেন ত ভাল হয়। উক্ত আইনের বিষয় বস্তু সম্পর্কে জনৈক ভদ্রলোক সংবাদ পত্রে নিম্নরূপ মতামত প্রকাশ করেছেন।

(১) প্রত্যেক মৃতদার ব্যক্তি বিধবা বিবাহ করবেন, অন্যথায় একেবারে পুনর্বিবাহ করতে পারবেন না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি অসবর্ণ বিধবা বিবাহ করেন তা'হলেও সে আইনতঃ গ্রাহ্য হ'বে।

(৩) নির্দ্দিষ্ট বয়স ও অবস্থাসম্পন্ন বিধবা-দেব বিবাহ বাধ্যতামূলক হ'বে।

উক্ত বিষয়বস্তু সম্বলিত কোন আইন যদি বিধিবদ্ধ হয় ত সমাজের পক্ষে সেটা কল্যাণকর হ'বে বলেই মনে হয়। দেশবাসী এবং গভর্ণমেণ্টের এসম্পর্কে উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নব প্রচেষ্টা

কলিকাতা নগরীকে আধুনিক কালোপযোগী শ্রেষ্ঠ সহরে পরিণত করবার জন্য কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। ইতিমধ্যেই তার বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু নগরীর আরও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি ৬,১৬,০০০ টাকার এক স্কীম প্রস্তাবিত হয়েছে।

উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী আরও চওড়া চওড়া বড় বড় রাস্তা নির্ম্মিত হবে বলে জানা গিয়াছে।

মোটর বাসে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম

সম্প্রতি মহীশূর ট্র্যাফিক্ বোর্ড কর্ত্তৃক এক অভিনব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী জুলাই মাস হ'তে মহীশূর রাজ্যের সমস্ত মোটর বাসের মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামের একটি বাক্স রাখতে হ'বে। ব্যবস্থাটি ভারতবর্ষের মধ্যে নূতন এবং দৈবদুর্ঘটনার হাত হ'তে রক্ষা পাবার জন্য যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের যেখানে যেখানে মোটর বাসের প্রচলন আছে সেইখানেই এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা উচিত।

দেশীয় চকোলেট প্রস্তুত

পাটনার এক সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য-সম্মতভাবে এবং দেশীয় উপায়ে চকোলেট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হয়েছে। উক্ত ব্যবস্থা 'কো-অপারেটিভ স্থগারকেন কণ্ট্রোল' স্কীম্-এর প্রচেষ্টা সম্ভূত। ঐ ব্যবস্থা যদি কার্য্যকরী হয় ইক্ষু চাষের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা দেবে।

জার্ম্মাণীতে জন্মের হার বৃদ্ধি

ইউরোপের অপরাপর দেশে ১৯৩৩ সাল থেকে যখন জন্মের হার হ্রাস পাচ্ছে তখন জার্ম্মাণীতে উক্ত বছরের পর থেকে জন্মের হার বেড়ে চলেছে। ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকিয়ায় ১৯৩৫ সাল অপেক্ষা ১৯৩৬ সালে জন্মের হার যথাক্রমে শতকরা ১·৪ ও ৩ ভাগ কমেছে। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতি কৃষি-প্রধান দেশে এবং গ্রেট্ বৃটেন, পোলাণ্ড ও পর্ত্তুগালে পূর্ব্বাপেক্ষা জন্মের হার হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু জার্ম্মাণীতে ১৯৩৩ সালের পর শতকরা ২৭ টি জন্মের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশেও জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে কিন্তু তাতে আমাদের আশঙ্কাই বেশী, কেননা, আমাদের খাদ্য-সম্ভার সেই অনুপাতে কিছুমাত্র বাড়ছে না।

ধর্ম্মের নামে হত্যা

ধর্ম্মের গোঁড়ামী মানুষকে মাঝে মাঝে কিরকম উন্মাদ করে তোলে এবং তার ফলে কি নৃশংস আচরণ অনুষ্ঠিত হয় তার এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। লাহোরের এক গ্রামে চঞ্চল সিং ও তার পত্নী রঞ্জিত কাউর সম্প্রতি মুসলমান ধর্ম্ম থেকে শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিল। প্রকাশ উক্ত চঞ্চল সিং ইসলাম সম্পর্কে আপত্তিকর কতকগুলি মন্তব্য করে। তাতে চঞ্চলসিং এর গ্রাম থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত এক গ্রামের আবদুল্লা নামে এক তাঁতি সেকথা শুনে একেবারে ক্ষেপে ওঠে এবং অস্ত্র নিয়ে ষাট মাইল পথ অতিক্রম করে এসে কার্য্যরত চঞ্চল সিংকে অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করে। চঞ্চল সিং এর স্ত্রী পাশে ছিল, তাকেও সে হত্যা করে। পরে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়ে বিচারার্থ চালান দেওয়ায় তার ফাঁসীর হুকুম হয়েছে। ধর্ম্মের অনুরাগ ভাল কিন্তু ধর্ম্মের গোঁড়ামী ও ধর্ম্মের নামে বর্ব্বরতা সর্ব্বদা নিন্দনীয়।

জাহাজ-ব্যবসায়ের নেপলিয়নের মৃত্যু

জাহাজ-ব্যবসায়ের 'নেপলিয়ান' নামে খ্যাত লর্ড কিলস্যাণ্টের ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বছর খানেক যাবৎ রোগে ভুগছিলেন এবং গত ৪ সপ্তাহে তাঁর পীড়া বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ তিনি একেবারে শয্যাশায়ী ছিলেন।

বৃটেনে নারীর সংখ্যাধিক্য

গভর্ণমেণ্টের হিসাবে প্রকাশ যে, বৃটেনে সর্ব্ব বয়সের প্রায় ২৫,৯০০,০০০ নারী আছে কিন্তু সেই অনুপাতে সেখানে পুরুষের সংখ্যা হচ্ছে ২৪,০০০,০০০। যদি কেবল বয়স্কদের হিসাব ধরা যায় তাহ'লে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা ১০ লক্ষ বেশী।

গভর্ণমেণ্ট এই নারী সংখ্যাধিক্য নিয়ে মহা ভাবনায় পড়েছেন এবং কি করে এর একটা ব্যবস্থা করা যায় সে বিষয়ে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁরা 'এমিগ্রেসনের' দিকে নজর দিয়েছেন যার ফলে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পুরুষ প্রধান বৃটিশ উপনিবেশ গুলির লোকেদের সঙ্গে বৃটেনের নারীদের বিবাহ ঘটতে পারে। এসম্পর্কে আইন করে উক্ত বাজ্যগামী নারী দিগের নিরপত্তা রক্ষার নিমিত্ত সাহায্য করবার কথাবার্ত্তা চলেছে।

পুরুষ ও নারীর জনসংখ্যার সমতা রক্ষিত না হ'লে ব্যভিচার ঘটবার সম্ভাবনা বেশী। ভারতবর্ষ সম্পর্কে নিন্দুকের দল এই বিষয় নিয়ে দোষারোপ করে থাকে। কিন্তু ইংলণ্ডের নারীসংখ্যাধিক্য সম্পর্কে মিস মেয়ো ও জনবুলের দল বর্ত্তমানে কি মন্তব্য করবেন?

চীনে 'এ্যাণ্টি-ড্রাগ' আইন অবহেলায় মৃত্যুদণ্ড

চীনদেশে ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাস হ'তে এই মর্ম্মে এক নতুন আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে যার ফলে ঔষধরূপে ছাড়া নেশাভ্যাসের জন্য কোন ড্রাগের ব্যবসা করলে তার মৃত্যুদণ্ড হ'তে পারবে। চীনদেশকে নেশার হাত হ'তে রক্ষা করাই বোধ হয় এই আইনের উদ্দেশ্য। তদনুসারে কিয়াংসু প্রদেশের হচাউফু সহরে এক সুন্দরী চীনা রমণীর মৃত্যুদণ্ড সহস্র সহস্র লোক প্রত্যক্ষ করেছে। উক্ত সুন্দরী 'এ্যাণ্টি-ড্রাগ' আইন অবহেলা করে চোরাই কারবারে লিপ্ত ছিল। খবর পাওয়া গেছে যে, ঐ একই অপরাধে আরও ত্রিশ জনের ফাঁসীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্ত্তমানে প্রত্যেক সভ্যদেশেই প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হচ্ছে, কিন্তু চীনের ঐ ব্যাপারে এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, দেশকে নেশার ঝিমুনি থেকে বাঁচাবার জন্যই এইরূপ আইন প্রবর্ত্তিত হয়েছে। মারাত্মক নেশা চীনাবাসীর যে কি প্রবল ক্ষতিসাধন করেছিল তা ইতিহাসামোদীদের জানা আছে।

ক্যানাল করের প্রতিবাদ

সকলেই অবগত আছেন যে, বর্দ্ধমানের কৃষকদের মধ্যে ক্যানাল কর সম্পর্কে প্রবল অসন্তোষ বর্ত্তমান। হুগলীর কামারকুণ্ড থেকে সুরু করে বর্দ্ধমানের পানাগড় পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত ভূভাগের অধিবাসিবৃন্দ বহু জনসভায় এক বাক্যে উক্ত করের প্রতিবাদ করেছেন এবং সরকারের নিকট উক্ত করের রোধকল্পে বহু ডেপুটেশন্ ও প্রতিবাদ প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন। কিন্তু জনমতের এত আন্দোলন ও কৃষকদের দুর্দ্দশা দেখেও গভর্ণমেণ্টের হৃদয় টলেনি।

উক্ত উপক্রত অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ একবাক্যে সরকারকে এক তদন্ত কমিটি বসাতে অনুরোধ করছেন, কিন্তু সরকার সে-অনুরোধে কর্ণপাতও করছেন না। তাঁদের দাবী হচ্ছে যে—

(১) যেহেতু ক্যানেল দ্বারা কৃষকদের কোন উপকার কিংবা লাভবৃদ্ধি ঘটে নি, সেই হেতু উক্ত কর ধার্য্যের কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই।

(২) যে-হিসাব অনুপাতে সরকার কর ধার্য্য করেছেন সে-হিসাবটাই একেবারে ভুল,—সরকারী এক্সপার্টরা ক্যানেল কাটার পূর্ব্বে একর পিছু ৯ মণ ফসল ও ক্যানেল কাটার পরে একর পিছু ২৭ মণ ফসল হ'বে বলে হিসাব ধার্য্য করেছেন, কিন্তু রেকর্ড ও দলীল দস্তাবেজ ইত্যাদি থেকে প্রমাণ করা যায় যে, উক্ত হিসাব একেবারে ভ্রান্ত।

(৩) ক্যানেল থেকে যে জল পাওয়া যায় তা' নিতান্ত অপ্রচুর।

(৪) একর পিছু ৪৷৷৹ টাকা করে কর দেবার সামর্থ্য চাষীদের নেই।

(৫) বর্ত্তমানে কৃষিদ্রব্যের দারুণ মূল্যহ্রাসের দরুণ এবং বর্দ্ধমান জেলার জমির খাজনা ও চাষের খরচ অত্যধিক হওয়ার দরুণ কৃষকদের পক্ষে মাত্র জীবনধারণের সংস্থান করাই কষ্টকর, সুতরাং কর প্রদানে তারা নিতান্ত অপারগ।

উপরোক্ত দাবীগুলির যথার্থতা নিরূপণের জন্য সেখানকার অধিবাসিবৃন্দ সরকারকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে অনুরোধ করেছেন। আমরা এ অনুরোধ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও উভয় পক্ষের সম্মানীয় বলে মনে করি। কিন্তু সরকার সে অনুরোধ উপেক্ষা করেছেন। সরকারের এই অবিবেচনায় সেখানকার অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে কৃষকজাগরণের একটা সাড়া পড়ে গিয়েছে। অন্ততঃ চারধারে তার একটা চেষ্টা চলেছে। ইতিমধ্যেই বর্দ্ধমানের উৎপীড়িত কৃষকবৃন্দ যথেষ্ট একতা ও মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে। এক সংবাদে প্রকাশ যে, খাজনা অনাদায়ে সরকার থেকে এক কৃষক পরিবারের বলদজোড়া ক্রোক করে নিলাম ডাকা হয়েছিল, কিন্তু মাত্র চার আনাতেও তা' কেনবার খদ্দের পাওয়া যায় নি। অসন্তোষ যদি বাড়তে থাকে ত কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করা যায়। আমরা সরকারকে এখনো অবহিত হ'তে বলি, এখনো সময় আছে। নইলে, যে অবস্থার উদ্ভব হ'বে, শত চেষ্টাতেও তা রোধ করা যাবে না।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান সাধনা

(শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে ইউরোপে এবং আমাদের দেশে যে সমস্ত কৃত-বিদ্য লোক আলোচনা করেছেন, তাঁদের লেখা থেকে, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি ও ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী যে বর্ত্তমান ঔষধ ব্যবস্থা থেকে কোন কোন মূল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল, তারই একটা বিশেষ উদাহরণ দিতে চাই। এ থেকে বোঝা যাবে যে, তাঁদের ঔষধ প্রণালী এবং ঔষধ ব্যবস্থার পিছনে কতখানি বিজ্ঞান অনুশীলন বর্ত্তমান ছিল।

বর্ত্তমান চিকিৎসা পদ্ধতিতে ঔষধের ধাতব অংশের উপরেই সম্পূর্ণ ক্রিয়া নির্ভর করে এই ধারণা আজও বদ্ধমূল আছে। বিভিন্ন রোগে এইজন্য বিভিন্ন ধাতব পদার্থের ব্যবস্থাব আছে। বৈজ্ঞানিকরা বহুদিন ধবে গবেষণা করে দেখলেন যে, একই ধাতুর বিভিন্ন সংযোগে ফল দ্রুত কিম্বা গৌণে হয়। যে ধাতুর যে সংযোগ সহজে দ্রব হয়, সেই ধাতব ঔষধ সেই অনুপাতে শরীর-তন্তুতে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করে এবং যে অনুপাতে তা শরীরতন্তুতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে সেই অনুপাতেই রোগের উপকার হয়।

বৌদ্ধ যুগের হিন্দু রাসায়নিকদের কাছে এই তথ্য পরিষ্কার ভাবে জ্ঞাত ছিল। অতি সূক্ষ্ম-ভাবে বিভক্ত ধাতব কণা শরীরের মধ্যে যে সহজে প্রবেশ লাভ করে এবং সেই অবস্থায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা তাঁদের অপরিজ্ঞাত ছিল না। কাজেই সেই যুগেরও রসশালায় যেমন রস-ধাতু ঘটিত বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি তাঁরা আবও একটু দূর অগ্রসর হয়ে-ছিলেন। ধাতুর সঙ্গে গন্ধক ইত্যাদি অন্যান্য পদার্থেব সমবায়ে অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় প্রাপ্তব্য ধাতুকণার অন্বেষণ তাঁরা করেছিলেন এবং এই জন্য তাঁরা অনেকগুলি Catalytic agent তাঁদেব কাজে লাগাতেন। (যে সমস্ত জিনিষ যৌগিক পদার্থের রসায়নের মধ্যে মিশে যায় না তাদের Catalytic agent বলে) মূল ধাতুর সঙ্গে তাঁরা যে সব Catalytic agent মেশাতেন, যদিও সেগুলি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের অঙ্গীভূত হত না, তত্রাচ তাঁরা অনুশীলন করে দেখিয়েছিলেন যে, তাদের উপস্থিতিতে শরীরে বিভিন্ন ফল লক্ষিত হয়। তারপরও তাঁরা রাসায়নিক অনুশীলন করে দেখেছিলেন যে, একই যৌগিক পদার্থ বিভিন্ন উত্তাপে সৃষ্ট হলে, তার ক্রিয়াও বিভিন্ন হয়। সুতরাং Catalytic agentএর সহযোগের মত উত্তাপের বিভিন্ন পরিমাণেও যে একই যৌগিক পদার্থের ক্রিয়ার

তারতম্য হয়, এই সত্য উপলব্ধি করেই তাঁরা ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর জন্য বিভিন্ন রকম উত্তাপ প্রয়োগের বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা করেছিলেন। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ তৈরী করবার জন্য বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন উত্তাপ প্রদানের যে সমস্ত বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তার মূলে এই বৈজ্ঞানিক সত্য উপলব্ধির বিশেষ প্রমাণ বর্ত্তমান রয়েছে।

এখানে এসেও তাঁদের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন-প্রতিভা নিরস্ত হয় নি। এই বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, সেদিন হিন্দু রাসায়নিকগণ ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীতে সেই তথ্য জ্ঞাতসারে কাজে লাগাতেন।

আয়ুর্ব্বেদকারগণ বুঝেছিলেন যে, রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্ট হলেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত হয়ে যায় না। রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগকালীন ব্যবহার পদ্ধতিও শরীরের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয়, এবং এই ব্যাপার সম্পর্কে আয়ুর্ব্বেদকারগণ এক বিস্ময়কর আবিষ্কারের আদি জন্ম-দাতা। বর্ত্তমান যুগের জগৎ প্রসিদ্ধ রাসায়নিক 'বরডেট" বহুদিনের অনুশীলনের পর প্রমাণ করেছেন যে, রাসায়নিক পদার্থগুলিকে যদি বারম্বার ঘর্ষণে চূর্ণ করা হয়, তা হলে সেই চূর্ণ পদার্থের শরীরতন্তুতে প্রবেশ করবার শক্তি (যে শক্তি হল ঔষধের সবচেয়ে বেশীগুণ) বহুগুণ বৰ্দ্ধিত হয়। এইভাবে চূর্ণিত বা ঘর্ষিত হলে ধাতু-কণাগুলি বৈদ্যুতিক শক্তি প্রাপ্ত হয়। বরডেট আরও দেখাইয়াছেন যে, এইভাবে চূর্ণিত, ঘর্ষিত বা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রাপ্ত ধাতুকণা জল অথবা সুরাসার অপেক্ষা গাঢ়তর পদার্থের সংযোগে শরীরে প্রবেশলাভ করবার অধিকতর শক্তি অর্জ্জন করে। প্রফেসার বরডেট "অলিভ অয়েলের" সমবায়ে এই তথ্য প্রমাণিত করেছেন। হিন্দুরাসায়নিকের নিকট এই তথ্য সপ্তম শতাব্দীতে পরিজ্ঞাত ছিল। খলে মেড়ে মধু দিয়ে ওষুধ খাবার ব্যবস্থা ভারতবর্ষের কাহারও অপরিজ্ঞাত নয়। এইভাবে ঔষধ ব্যবহারে যে ঔষধের শক্তি বৃদ্ধি পায় তা বহুদিন থেকে আমাদের দেশে জ্ঞাত ছিল।

অন্যান্য যেসব ব্যাপারে হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্‌গণ জগতের অন্যদেশের বৈজ্ঞানিকদের অপেক্ষা বহুপূর্ব্বে জ্ঞানলাভ করেছিলেন তার কয়েকটীর তালিকা নিম্নে দিলাম,—

(১) অঙ্গচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম অঙ্গ যোজনার পদ্ধতি তাঁরা আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমানকালের বহু কঠিন অস্ত্রোপচার তাঁদের জানা ছিল, যথা—মৃত শরীরে উপচার, অর্ব্বুদ অপসারণ, অশ্মরী রোগে অস্ত্রোপচার ইত্যাদি। ঋগ্‌বেদে প্রথম কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহারের উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। কৃত্রিম চক্ষু সংযোজনা ব্যাপারেও তাঁরা অগ্রণী।

(২) চোখের ছানি তোলবার প্রথা সুশ্রুতই প্রথম আবিষ্কার করেন।

(৩) ওয়ার্ড সাহেব তাঁর হিন্দুদিগের ইতিহাস বইএর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ইউরোপে জেনারের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে ভারতীয় গোপালক এবং রাখালরা বসন্ত রোগের প্রতিশেধক স্বরূপ এক রকম টীকা ব্যবহার করিত। বসন্ত রোগের শুকনো মামড়ী সংগ্রহ করে তার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ বাহুর উপর রেখে ছুঁচের সাহায্যে বিদ্ধ করে দিত। ডাক্তার হুইলেট বলেন যে, হিন্দু অস্ত্র চিকিৎসকরা প্রকৃত বসন্তের টীকা অবগত ছিলেন।

(৪) হাঁপানী রোগে ধুতুরার ধূম, পক্ষাঘাত এবং অম্ল রোগে নাক্স ভমিকার (কুঁচিলা ফল) ব্যবহার, ঔষধের জন্য ক্রোটনের ব্যবহার, ইউরোপ ভারতবর্ষ থেকে নিয়েছে।

(৫) বিষতন্ত্রে তাঁরা প্রাচীন জগতে অদ্বিতীয় ছিলেন। বিষ চিকিৎসার জন্য গ্রীক চিকিৎসকগণ অপারগ হলে দ্বিগ্বীজয়ী সেকেন্দর শাহ হিন্দু চিকিৎসক ডাকিয়ে ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, (নিয়র্কাস লিখেছেন),—

"আলেকজাণ্ডার তাঁর সভায় বহু প্রসিদ্ধ হিন্দু চিকিৎসককে সমবেত করেছিলেন এবং তাঁদের প্রেরণায় ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে যে কোন সৈনিক যখনই সর্পদষ্ট হবে, তৎক্ষণাৎ যেন চিকিৎসার জন্য প্রাসাদে আসে। বিভিন্ন বিষের জন্য বিভিন্ন বিষঘ্ন ঔষধের ব্যবহার তাঁরা জানতেন।

(৬) চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখাকে অধুনা আমরা সাইকোথেরাপি নামে অভিহিত করি, সেই বিভাগের সূচনাও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে দেখা যায়। ফ্রয়েডের বহু পূর্ব্বে হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ যত্নের সঙ্গে স্বপ্নের গুপ্ত রহস্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন।

(৭) বর্ত্তমান চিকিৎসকগণ যাকে climatology বলেন, আয়ুর্ব্বেদকারগণ তার নাম দিয়াছিলেন, স্বাস্থ্যবৃত্তি। বায়ু পরিবর্ত্তনের দ্বারা অথবা প্রাকৃতিক উপায়ে রোগ নিবারণ করবার পদ্ধতিতে তাঁহারা বিশেষ উন্নত ছিলেন।

(৮) ১৭০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইউরোপে দাঁতনের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। চরকের সময় বারো রকমের দাঁতন সম্বন্ধে স্পষ্ট নিয়ম লিপিবদ্ধ হয়।

(৯) ভেষজ সংগ্রহের জন্য রাজকীয় উদ্যান স্থাপন আমাদের দেশেরই প্রাচীন প্রথা।

(১০) খাদ্যে ভেজাল নিবারণ করবার জন্য প্রথম আমাদের দেশেই আইন লিপিবদ্ধ হয়।

(১১) সাধারণ রোগীদের জন্য হাঁসপাতাল প্রথম এই ভারতবর্ষেই নির্ম্মিত হয়। বৌদ্ধ যুগে প্রত্যেক দশটি গ্রামের চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিদর্শন করবার জন্য একজন করে রাজ-বৈদ্য নিযুক্ত হতেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০ অব্দের বিবরণে দেখা যায় যে, একটি বিরাট সরকারী চিকিৎসক সম্প্রদায় তখনই গঠিত হয়েছে।

(১২) পশু চিকিৎসার ব্যাপারে সমস্ত জগৎ বৌদ্ধ ভারতের কাছে ঋণী।

পরিশেষে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি কথা বলে এই প্রবন্ধ শেষ করব। তারা সেদিন রোগের চিকিৎসা করবার জন্য যে বিজ্ঞানের সাধনা করেছিলেন, সেই বিজ্ঞান বুদ্ধি তাঁদের মানব-জীবনকে এমন সমগ্রভাবে দেখতে শিখিয়েছিল যে, এত ব্যাপক, এত সমগ্র এবং এত সূক্ষ্মভাবে জীবনকে পর্য্যবেক্ষণ করা জগতের ইতিহাসে বিরল বললেও হয়। মানব-জীবনের এমন কোন সূক্ষ্ম অংশ নাই যা তাঁদের বিচক্ষণ দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পেরেছিল।
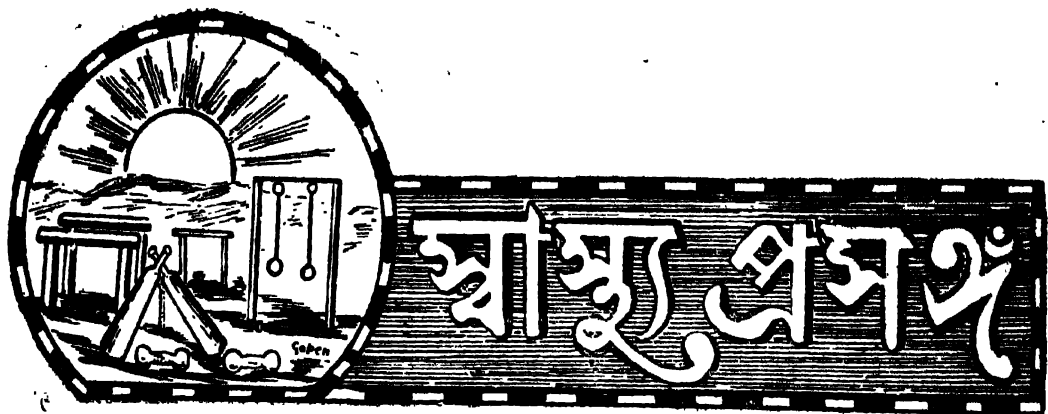
দেহের দুয়ার*

কোন গৃহ কিংবা দুর্গ রক্ষা করিতে হইলে, দুয়ার কিংবা সিংহদ্বারের উপর সতর্ক পাহারা দিতে হয়। আমাদের দেহ-দুর্গ রক্ষা করিবার জন্যও কি অনুরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিৎ নহে? বস্তুতঃ, মুখই দেহের দরজা বিশেষ; সেনাধ্যক্ষ যেমন করিয়া দুর্গকে রক্ষা করিয়া থাকেন, আমাদের সেইরূপ ভাবে শরীরকে রক্ষা করা উচিৎ।

গোড়ার দিক হইতে কথাটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাউক। জন্মের ৪০।৪৫ দিন পর হইতেই শিশুর দন্ত গজানো আরম্ভ হয়; কাজেই শিশুর জন্য ভাল দাঁত কামনা করিলে গর্ভবতী জননীকে আহারাদির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত মাতাকে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি আহার করিতে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে:—

তাজা দুধ, প্রতিদিন কমপক্ষে একসের। ভাত, রুটী, পরিমাণ মত মাখন ও ঘি। প্রচুর পরিমাণে তাজা শাকশব্জী, বিশেষতঃ উহার ডগা। মাছমাংস প্রভৃতি দিনে একবারের বেশী নহে। ডিম, পনীর মাঝে মাঝে খাওয়া যাইতে পারে। যে ঋতুতে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা তাজা থাকিতেই আহার করা। পুডিং, মিষ্টদ্রব্য কদাচিৎ খাইবে। প্রচুর পরিমাণে জল, কমপক্ষে প্রতিদিন ৬ গ্লাস জল খাওয়া চাই। মধু, কিশমিশ প্রভৃতি সন্দেশ রসগোল্লার চেয়ে ভালো। চা কাফি সাধ্যমত পরিত্যাগ করিবে। যাহাতে অ্যালকহল বা মদের অংশ থাকে, তাহা বিষবৎ পরিত্যজ্য।

শিশুর পক্ষে মাতার স্তন্যে পুষ্টিলাভ করাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। যেখানে উহা পাওয়া সম্ভবপর নয়, যেখানে গরুর দুধ খাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই শিশুকে একচামচ চুণের জল প্রতিবার আহারের সময় দিতে হইবে; কয়েক চামচ তাজা ফলের রসও প্রতিদিন খাওয়ানো উচিৎ। কমলালেবুর রস সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও, টোম্যাটোর রস দিয়া কাজ চালানো যাইতে পারে।

জন্ম হইতে দাঁত উঠিবার সময় পর্য্যন্ত, মুখের কথা ভাবিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

---

* বিখ্যাত Dentist Dr. R. Ahmed D. D. S. এর লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ।

সম্পাদক।

যখন একটী কিংবা দুইটী দাঁত উঠিয়াছে, তখন মাতা কিংবা ধাত্রী তর্জ্জনীতে একটুকরা গজ (gauze) লাগাইয়া লইয়া উহার মধ্যে সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের সলিউসন কিংবা সাধারণ স্যালাইন দিয়া শিশুর দন্ত পরিষ্কার করিবেন। দুই বৎসরের সময় যখন শিশুর কুড়িটি দাঁত দেখা দিয়াছে, তখন শিশুকে ছোট বুরুষ দিয়া নিজের দন্ত পরিষ্কার করিতে শিক্ষা দিবেন।

ভারতের শিশুদের যেভাবে দন্তবিকাশ হয়, নীচে তাহার একটি তথ্য সঙ্কলন করিয়া দেওয়া গেল :—

৪টী মধ্যের দাঁত	৬ হইতে	৮	মাসের	মধ্যে
৪টী পার্শ্বের দাঁত	৭ ,,	৯	,,	,,
৪টী প্রথম কসের দাঁত (Molars)	১২ ,,	১৬	,,	,,
৪টী কাস্‌পিড (Cuspids)	১৬ ,,	২২	,,	,,
৪টী দ্বিতীয় কসের দাঁত	২১ ,,	৩৬	,,	,,

উপরে যে হিসাব দেওয়া হইল, তাহার একটু ইতর-বিশেষ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু উহাকে সাধারণ নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

দাঁত যাহাতে সহজ সুন্দরভাবে উঠিতে পারে এবং খাদ্যাদির যোগেই যাহাতে পরিষ্কৃত হইতে পারে, সেইজন্য শিশুকে প্রথম হইতেই খাদ্যাদি চর্ব্বণ করিতে শিক্ষা দিবেন। শিশুর বয়স ছয়মাস হইতে আট মাস হইলেই, উহাকে
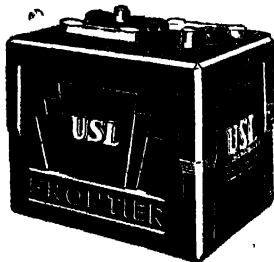
রুটীর টুক্‌রা কিংবা টোষ্ট্, ন্যাসপাতি অথবা মুর্গীর হাড় চিবাইয়া খাইতে দিবেন। চিবাইয়া খাইতে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; উহাতে কেবল যে হজমশক্তির বৃদ্ধি হয় তাহা নহে; মুখের বর্ণ ও মগজ সুগঠিত হয়।

৬ বৎসর বয়স হইলে শিশুকালের দাঁতগুলি পড়িয়া চিরস্থায়ী দাঁতের উদ্ভব হয়। উহার ক্রম বিকাশের ধারা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল:—

৪টী প্রথম কসের দাঁত (Molars)	৬	হইতে	৮	বৎসর
২টী মধ্যের দাঁত, নীচের পংক্তি	৬	,,	৭	,,
২টী মধ্যের দাঁত, উপরের পংক্তি	৭	,,	৮	,,
৪টী পাশের দাঁত	৭	,,	৯	,,
৪টী প্রথম বাইকাসপিডস (bicuspids)	৯	,,	১০	,,
৪টী দ্বিতীয় বাইকাসপিডস	১০	,,	১১	,,
৪টী কাস্‌পিড	১১	,,	১০	,,
৪টী দ্বিতীয় কসের দাঁত	১২	,,	১৪	,,
৪টী তৃতীয় ,, ,,	১৮	,,	২৫	,,

দাঁতকে কিপ্রকার দেখায়

দাঁতের ৪টী অংশ আছে। উপরে যে পর্দ্দাটি থাকে, তাহাকে এনামেল বলে এবং উহা দেহস্থ যাবতীয় পদার্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। নীচের পর্দ্দাকে সিমেণ্টাম (Cementum) বলে। দাঁতের প্রধান অংশের নীচে যাহা থাকে, তাহাকে ডেণ্টিন বলে। ইহার ভিতরেই দাঁতের অন্তঃশাস বর্ত্তমান; ইহাকে দাঁতের নাড়ী বলিলেও ভুল হয় না কেননা, ইহা যে কেবলমাত্র দাঁতের পরিপুষ্টি সাধিত করিয়া থাকে তাহা নহে, ইহার সাহায্যেই দাঁতের অনুভূতি মস্তিষ্ক জগতে যাইয়া পৌছাইয়া থাকে।

কিরূপে দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়

উপরে যে কয়টী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা মনে রাখিলেই দাঁত কেন ক্ষয়িত হয় তাহার সহজ সদুত্তর মিলিবে। দন্তব্যথার মূল কারণের সন্ধানও এইখানেই পাওয়া যাইবে।

যখন আমরা খাই, তখন ছোট ছোট খাদ্যকণা দাঁতের ফাঁকে লাগিয়া থাকে, খাওয়ার পর পরিষ্কার রূপে দন্তধাবন না করিলে উহা ঐস্থলে লাগিয়াই থাকে। এই খাদ্যাংশ পচিয়া দন্তমূলস্থ এনামেলকে ক্ষয় করিতে থাকে। প্রথমে ক্ষয়স্থল খুব ক্ষুদ্র থাকে, কিন্তু অপরিষ্কৃত মুখে ইহা বাড়িতে বাড়িতে শেষে ডেণ্টিনকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া থাকে। এই সময় দাঁতগুলি খুব অনুভূতিপ্রবণ হয় কেননা, ডেণ্টিন বহিস্থ হওয়ায় উহা সহজেই মস্তিষ্কে সাড়া পৌছাইয়া দিয়া থাকে। এই সময়ে মিষ্ট ও টক জিনিষ কিংবা গরম ও ঠাণ্ডা তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে কেবল ব্যথা অনুভূত হয়। ইহা প্রকৃতির সতর্কবাণী, যে, শরীরের কোন কলকব্জা ঠিকভাবে নাই, উহাকে মেরামত করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে দাঁতের কোন চিকিৎসা না করিলে, উহা ক্ষয় হইতে হইতে নাড়ীতে গিয়া পৌছায়; তখনই দন্তশূল রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। কাজেই, এই রোগের প্রধান নিদান হইতেছে, রোগকে মোটেই আক্রমণ করবার সুবিধা না দেওয়া; এই সঙ্গে কোন অভিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই একান্ত উচিৎ।

পাইয়োরিয়া

দাঁতের আর এক প্রকার পীড়া জন্মিয়া থাকে, উহাকে ডাক্তারী শাস্ত্রে পাইয়োরিয়া বলিয়া থাকে। অনুমিত হয় যে ভারতের শতকরা ৭০।৮০ জন লোকই এ পীড়াতে ভুগিয়া থাকে। বেশী মাত্রায় পান খাওয়া, অপর্য্যাপ্ত আহার করা এবং দন্ত সম্বন্ধীয় নিয়ম কানুন পালন না করিলেই পাইয়োরিয়া রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

মুখ অপরিষ্কার থাকিলে দাঁতের পেছনে টার্টার নামক পদার্থ জমিতে থাকে। কালক্রমে এই টার্টার বাড়িতে বাড়িতে মাড়িমূল ক্ষয় করিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য ব্যথা অনুভূত হয়। যেখানে মাড়িমূল ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, সেখানে খাদ্যাদির অংশ পচিয়া পুঁজ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই পুঁজ মুখ বিবর দিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। যদি এই বিষ সর্ব্বদা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে, তাহা হইলে দেহ যন্ত্রের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহা স্থানীয় পীড়া নহে, সমস্ত শরীরকে আক্রমণ না করিলে ইহা থামিতে চাহে না। কাজেই মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহারা পাইয়োরিয়া রোগে ভুগিতেছে, তাহারা আবার বাত, বুকের পীড়া, কিড্‌নি প্রভৃতি লইয়াও মুস্কিলে পড়েন। কাজেই এই পীড়াকে কিরূপে পর্য্যুদস্ত করা যায়, তাহার নিয়ম কানুন বিশেষ ভাবে জানা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমেই, প্রাতরাশ, ও নৈশাহারের পর দাঁতকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে। তারপরে, অতিরিক্ত পানাহার ত্যাগ করিতে হইবে এবং যাহা খাওয়া হয়, তাহা উত্তমরূপে চর্ব্বিত করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হইবে। আজকাল সভ্যসমাজে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ভোজন করা হয়, তাহার অধিকাংশই অত্যন্ত কোমল। কিছু শক্ত দ্রব্য চিবানো যে একান্ত আবশ্যক, শুধু মাড়ির কসরতের জন্য নহে, কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারণের জন্যও, তাহা আমরা কাজের বেলায় ভুল করিয়া বসি। তোমার শারীরিক অবস্থা এবং বয়সের অনুপাতে কি কি দ্রব্য ভোজন করা উচিত, তাহা ডাক্তারের কাছে জানিয়া লইতে পার। তবে সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে, যে, বিভিন্ন ধরণের খাদ্যদ্রব্য, যেমন, ডিম, মাংস, প্রচুর পরিমাণে শাকশব্জী ও ফলমূল, মাখন, দুধ, রুটী, ভাত প্রভৃতি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। প্রতিদিন অন্ততঃ পক্ষে ছয় গ্লাস জল পান করা চাই। টিনবন্দী এবং রক্ষিত দ্রব্যাদি খাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে।

যদি আমরা মুখ ও দাঁত বিশেষ যত্নের সঙ্গে পরিষ্কার করি তাহা হইলে দন্তক্ষয়রোগ কিছুতেই হইতে পারিবে না। পাইয়োরিয়া রোগ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। নিম্নে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল :—

(ক) শিশুর কয়েকটি দাঁত উঠিলেই তাহাকে অ্যান্টিসেপ্টিক পাউডার ও বুরুশ সাহায্যে দাঁত পরিষ্কার করিতে শিখাইবে।

(খ) পাওয়া গেলে, 'নিম' এবং 'বাব্‌লা' গাছের দাঁতন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বস্তুতঃ, এই শ্রেণীর ভারতীয় দাঁতনের তুল্য দাঁতন আর কোথাও মিলিবে না। একবার ব্যবহার করা হইয়া

গেলেই উহাকে ফেলিয়া দিবে। বড় বড় সহরে রোজ রোজ দাঁতন সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কাজেই বুরুশ ব্যবহার করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। দন্তধাবন শেষ হইলে বুরুষকে সাবান জলে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিবে।

(গ) পেষ্ট বা লেপ হইতে পাউডার অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞাপনে যখন বাহির হয় যে অমুক পেষ্ট ব্যবহার করিলে মুখস্থ দূষিত জীবাণু নষ্ট হয়, তখন উহাতে নজর দিও না। মুখটা কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীর টেষ্ট টিউবও নয়, ঔষধের দোকানও নয়। মনে রাখিতে হইবে, পাউডারের আসল কাজ হইতেছে দাঁত পরিষ্কার রাখা। বেশী শক্তিশালী অ্যান্টিসেপ্টিক ব্যবহার করিলে দন্তমূলের কোমল মাংস নষ্ট হইয়া যাইবে। চককে বিভিন্নরূপে রূপান্তরিত করিয়া লইলেই পাউডার কিংবা পেষ্ট তৈয়ার করা যায়। ইচ্ছা করিলে বাড়ীতে বসিয়াও নিম্ন লিখিত উপায়ে পাউডার প্রস্তুত করা যাইতে পারে :—

চককে সুক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিয়া ৮৫ নম্বরের মসলিনের উপর ছাকিয়া লও। তৎপরে অ্যালামচূর্ণ ৫ ভাগ; কর্পূর, মেন্থল, থাইমল কিংবা ঐরূপ ধরণের কোন পছন্দসই জিনিষ ১০ ভাগ লইয়া একত্র কর।

উপরে যে ফরমুলা দেওয়া হইল তাহাতে একটি উচ্চশ্রেণীর পাউডার তৈয়ার হইবে, শিশু বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে ইহা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। যাহারা পাইয়োরিয়া রোগে ভুগিতেছে, তাহারা চক্ চূর্ণের বদলে কয়লার গুঁড়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ব্যবহার করিবে। নানা রকমের পাউডার তৈয়ার করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তুমি যাহা দিয়া একবার দাঁত পরিষ্কার করিতে সুরু করিয়া দিয়াছ, তাহা ত্যাগ করিও না। কেবল মুখ ধুইতে হইলে, জলের সঙ্গে খানিকটা লবণ মিশাইয়া কুলকুচি করিয়া ফেলিতে হইবে। যাহারা পাইয়োরিয়াতে ভুগিতেছেন, তাহাদের পক্ষে চুণের জল ব্যবহার করা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। বেশী মূল্যবান দ্রব্য ব্যবহার করিলেই যে মুখ ধৌত করা উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা আদৌ ঠিক নহে।

(ঘ) দাঁতের ফাঁকে ময়লা জমিলে, দন্ত শলাকা ব্যবহার করা যাইতে পারে; dental floss silk ও অনেক ক্ষেত্রে ভাল কাজ করে।

(ঙ) এদেশের লোকেরা খাওয়ার পর যে কুলকুচি করিয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। এই অভ্যাস কখনো ত্যাগ করিয়া সাহেবীপন্থা অনুসরণ করিবে না।

(চ) পান খাওয়া দাঁত ও মাড়ির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক। ইহাতে দাঁতে টার্টার জন্মে ও ক্রমে ক্রমে পাইয়োরিয়া রোগ দেখা দেয়। ২।১টি পান দৈনিক খাওয়া হজমের দিক দিয়া ভাল হইতে পারে; কিন্তু ২০।২৫।৫০টি করিয়া পান চিবানো অত্যন্ত ক্ষতিকারক। ইহাতে দাঁত খারাপ হয়, মুখ বিশ্রী রকমের লাল হয় এবং বেশী পরিমাণ লালা নষ্ট হইয়া যায়। স্বাস্থ্যের খাতিরে এই বদভ্যাস ত্যাগ করিতে হইবে।

উপরে যে সমস্ত কথা বলা হইল, তাহা নিয়মিত রূপে পালন করিলে দেহ সুস্থ থাকিবে; কেননা, শতকরা ৭০টি ব্যারামই মুখের পথে প্রবেশ লাভ করে।

অর্শ

হরিতকী, পিপুল ও তিল সমভাবে মাখনের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে অর্শ নষ্ট হয়।

গাঁদা ফুলের পাতার রস চিনির সহিত সেবন করিলে রক্তরোধ ও বেদনা নিবৃত্তি হয়।

ওল, পেঁপে ও তিল অর্শরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

ক্রিমি

চালতে মাদার পাতার রস পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

সোমরাজ বীজ সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

আনারস পাতার রস মধু সহ সেবন করিলে ক্রিমি নিবারণ হয়।

দাড়িম্বের শিকড়ের ছাল ২ তোলা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ✓০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু সহ খাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

সামান্য বোধে ক্রিমি রোগকে উপেক্ষা করিবে না। এই রোগ হইতে অগ্নিমান্দ্য, শারীরিক অবসন্নতা, জ্বর, দেহ ক্ষীণতা, শূল, হৃদরোগ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উৎকট ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

শ্বাস ও কাস

গরম দুগ্ধের সহিত মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাস ও শ্বাস দমন হয়।

যষ্টিমধু ও তুলসী মঞ্জরী সমভাগে সিদ্ধ করিয়া মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বালকদিগের কাস নষ্ট হয়।

বাসক পাতার রস ঘৃত দ্বারা পাক করিয়া পিপুল চূর্ণ সেবন করিলে শ্বাস ও কাস নিবারণ হয়।

বহেড়ার শাঁস কলিকায় সাজিয়া খাইলে শ্বাসের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

হিক্কা

আমড়ার আটীর গুঁড়া কলিকায় সাজিয়া খাইলে হিক্কা নিবারণ হয়।

হীরাকস একতোলা, কদবেলের শাঁস ২ তোলা একত্র পেষণ করিয়া সিকি তোলা পরিমাণ মধুর সহিত সেবন করিলে হিক্কা

নিবারণ হয়।

চিনি ও মরিচ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ও পিঁপুল চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবারণ হয়।

বমন

খৈ চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জল ও মধু দিয়া সেবন করিলে বমন নিবারিত হয়।

শুষ্ক অশ্বত্থছাল দগ্ধ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে; পরে সেইজল ছাকিয়া পান করিলে বমন নিবারণ হয়।

কুলের আঁঠির শাঁষ মধুর সহিত সেবন করিলে বমন নিবারিত হইয়া থাকে।

তেলাপোকার বিষ্ঠা ৩।৪ দানা কিঞ্চিৎ জলে ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলে বমন নিবারিত হয়।

মূর্চ্ছা

সৈন্ধব, সজনাবীজ, শ্বেত সর্ষপ ও কুড়ছাল মূত্রের সহিত পেষন করিয়া নাশিকায় প্রদান করিলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়া থাকে।

মত্ততায়

মদ্যপান জনিত মত্ততায় দিশি কুমড়ার রস গুড় দিয়া সেবন করিবে।

সুপারী ভক্ষণ জনিত মত্ততা জন্মিলে শীতল জল পান বা লবণ ভক্ষণ করিবে।

ধুতুরা ভক্ষণ জনিত মত্ততায় চিনির সহিত দুগ্ধ পান করিবে।

বমনোপায়

কল্‌মি শাকের রস অর্দ্ধ পোয়া সেবন করিলে বমন হয়।

ঘৃতকুমারীর মূলের রস ২ তোলা গ্রহণ করিয়া উষ্ণ জল সহযোগে সেবন করিলে বমন হয়।

দন্তরোগ

তুঁত গাছের ছাল কিম্বা বকুল ছাল সিদ্ধ করিয়া সেই জলে কুলকুচা করিলে দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পড়া ও বেদনা নিবারণ হয়।

বটের ঝুরি চিবাইলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়।

প্রতিদিন হুঁকার জলে কুলকুচা করিলে দাঁত পড়িবার ভয় থাকে না।

ফুলখড়ি, কর্পূর, ও তুঁতে ভস্ম সমভাবে মিশ্রিত করিয়া দন্ত মার্জ্জন করিলে দাঁতের গোড়া ফুলা ও বেদনা নিবারিত হয়।

ব্রণাদি

ভুই চাঁপা ফুলের গেঁড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোঁড়া প্রভৃতি বসিয়া যায়।

কাঁটা নটের শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোঁড়া পাকিয়া যায়।

ভুঁই আমলার গাছ মূল সমেত বাটীয়া ঘা-মুখে প্রলেপ দিয়া কলা পাতা বাঁধিয়া রাখিলে নালি ঘা ভাল হয়।

বিজ্ঞাপনের চিত্র

ভাদ্রমাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" বিজ্ঞাপনে বস্তুগত চিত্রের কথা লিখিত হইয়াছে। এবারে আমরা বিজ্ঞাপনে অন্যবিধ চিত্রের বিষয় আলোচনা করিব। প্রথমতঃ ভাবগত চিত্র,—ইহাতে ব্যবসায়ী যে জিনিসটী প্রচার করিতে চান, তাহার ছবি না দিয়া, তৎসংক্রান্ত কোন একটী ভাব চিত্রের দ্বারা প্রকাশ করেন। ইহার দুইটী উদ্দেশ্য থাকে। চিত্রের দ্বারা বিজ্ঞাপনটীকে চিত্তাকর্ষক ও মনোরম করিয়া তোলা একটী উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ লোকে সুন্দর ছবি দেখিলেই উহাতে মনোযোগের সহিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ভাষায় লেখা বিজ্ঞাপন পড়িবার আগ্রহ কাহারও হয় না। খবরের কাগজের কিম্বা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইবার সময় বিজ্ঞাপনে যেখানে ছবি আছে, সেখানে একটু থামিতেই হইবে। কিন্তু আবার ছবির মধ্যেও এমন ছবি আছে, যাহা দেখিবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ জন্মে না। বিজ্ঞাপনে সেই সকল চিত্র দিলে কোন ফল নাই।

ধরুন, কোন ব্যবসায়ী বিস্কুটের বিজ্ঞাপন দিবেন মনস্থ করিলেন। তিনি যদি বিজ্ঞাপনে কেবল বিস্কুটের টিন আঁকিয়া দেন, তবে তাহা কিছুমাত্র চিত্তাকর্ষক ও ফলপ্রদ হইবেনা। এই খানেই বস্তুগত চিত্রের পরিবর্ত্তে ভাবগত চিত্রের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায় এবং ভাবগত চিত্রের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটীও ধরা পড়ে। তাহা এই,—চিত্রের সাহায্যে বস্তুর কোন বিশেষ গুণ, তাহার প্রয়োজনীয়তা, প্রাপ্তিস্থান, উৎপাদন প্রণালী প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকাশ করা। ভাবসৃষ্টি না হইলে এই সকল বিষয় ব্যক্ত হয় না। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে ঐ বিস্কুটের টিনের পরিবর্ত্তে যদি এমন একটা ছবি দেওয়া যায়, যাহাতে আঁকা থাকিবে, মা তাঁহার হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর শিশুটীর মুখে একখানি বিস্কুট তুলিয়া দিতেছেন, তাহা হইলে উহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে;—শুধু তা নয়, ছবিখানি মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া থাকিবে। এইরকম একটী সুন্দর শিশুর ছবি,—(শিশুটী হামাগুড়ি দিতেছে, এইরূপ অবস্থায়) পাঠকগণের মধ্যে অনেকেরই মনে পড়িতে পারে,—আমরা আমাদের বহু বন্ধুবান্ধবের ঘরের দেওয়ালে সেই ছবিখানি সযত্নে টাঙ্গান রহিয়াছে, দেখিয়াছি,—সেই ছবিখানি শিশুর খাদ্য গ্ল্যাক্সোর বিজ্ঞাপন।

আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে কয়েকখানি ভাবগত চিত্রের বিষয় আলোচনা করিতেছি। বিখ্যাত জবাকুসুম তৈলের বিজ্ঞাপনে একটী প্রশ্নসূচক চিহ্নের সহিত নারীর দীর্ঘ কেশরাশি সুকৌশলে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবটী খুব সুন্দর,—অর্থাৎ জবাকুসুম তৈলব্যবহারে কেশরাশি যে প্রচুর ও দীর্ঘ হয় সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারেনা। ভাবটী সুন্দর হইলেও

ছবি আঁকাটী তদুপযোগী ভাল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কল্পতরুর অমৃতভোগের বিজ্ঞাপনে যে ভাবগত ক্ষুদ্র চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা মন্দ নহে,—উহাকে আরও চিত্তাকর্ষক করা যাইতে পারে,—ভাল আর্টিষ্টের দ্বারা। রবিনসনের বার্লির বিজ্ঞাপনে, উপরে ও নীচে দুইটী বর্ডার-লাইনে বার্লির উৎপত্তিস্থান যব শীর্ষের ছবিতে সামান্য একটু ভাবের ইঙ্গিত মাত্র করা হইয়াছে। পিয়া-সোপের বিজ্ঞাপনে কালো ব্যাক্ গ্রাউণ্ডের (Back ground) উপর শুভ্রকান্তি নারীর আবক্ষ মুখমণ্ডল, সাবানের গুণ ব্যাখ্যান করিতেছে। ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইনসুর্য্যান্স কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের চিত্রটীর ভাব (এদের দেখবে কে ?) খুব সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী। ইহাতে জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতেছে। লাইট্ অব-এশিয়া ইন্সুর্য্যান্স কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে চিত্রের ভাবটী অতি চমৎকার। লাইট্ অব-এশিয়া বলিতে বুদ্ধদেবকে বুঝায়। বিজ্ঞাপনে ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবের ছবি রহিয়াছে। চারিদিকে আলোকচ্ছটার পরিবেশ। বুদ্ধদেব যেমন সাধনার দ্বারা জরামৃত্যু জয় করিবার পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তেমনি এই বীমা কোম্পানী মানুষের জরামৃত্যুর ভয় দূর করিয়া দিয়াছে। ভিতরের লেখাতে সেই ভাবটী ব্যক্ত হইয়াছে,—"লাইট্ অব এশিয়ার পলিসি বা এজেন্সী গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা হইতে নিজেকে মুক্ত করুন।" আমাদের মতে বিজ্ঞাপনটী ছোট আকারের হইয়াছে। অন্ততঃ এক পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন হইলে বুদ্ধদেবের ছবিটী আর একটু বৃহৎ ও পরিষ্কার হয়। যাহা হউক, এই কয়েকটী দৃষ্টান্ত আমরা বিষয়টী মোটামুটী রকমে ব্যাখ্যা করিবার জন্য উল্লেখ করিলাম। পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই ইহা অপেক্ষা সুন্দর ভাবগত চিত্রের বিজ্ঞাপন হাজার হাজার দেখিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনে বস্তুগত চিত্র অপেক্ষা ভাবগত চিত্রের জোর অনেক বেশী। সেই জন্য দেখা যায়, অনেক ব্যবসায়ী এদিকে একটু ঝোঁক দিয়াছেন। কিন্তু এদেশে আর্টিষ্টের অভাবে আমরা বিজ্ঞাপনে তেমন জোরাল ভাবগত চিত্র খুব কমই দেখিতে পাই। আশাকরি কালক্রমে এই অভাব মিটিয়া যাইবে।

ভাবগত চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য পাঠকের চঞ্চল দৃষ্টিকে নিশ্চল করা। সেইজন্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রেই ভাবগত চিত্রের দ্বারা বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত। কারণ ঐ সকল খবরের কাগজ পড়িবার সময় পাঠকেরা তাড়া তাড়ি পাতা উল্টাইয়া যান,—বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর তাঁহাদের থাকেনা। সেইস্থলে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য বিজ্ঞাপনে ভাবগত মনোরম ও চিত্তাকর্ষক চিত্রের বিশেষ প্রয়োজন। ক্যাটালগ বা মূল্য তালিকা পুস্তিকায় বস্তুগত চিত্র থাকাই বাঞ্ছনীয়। কারণ ঐ প্রকার চিত্রের দ্বারা জিনিষটীর পরিচয় ভালরূপে দেওয়া যায়।

আসবাব পত্র, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, পোষাক পরিচ্ছদ, থালা বাসন, ছুরি কাঁচি, জুয়েলারি প্রভৃতির বিজ্ঞাপন ক্যাটালগে দিতে হইলে বস্তুগত চিত্রের সাহায্যেই দেওয়া উচিত। দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক খবরের কাগজে ভাবগত চিত্র ভিন্ন ইহাদিগকে লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিবার উপায় আর নাই। ঔষধের

বিজ্ঞাপনে কিন্তু ভাবগত চিত্রের প্রয়োজনীয়তাই সর্ব্বত্র,—ক্যাটালগেই হউক, অথবা খবরের কাগজেই হউক। কোন্ ঔষধে শরীর যন্ত্রের কোথায় কি ভাবে কার্য্য করে,—যে রোগের জন্য ঔষধটি তৈয়ারী হইয়াছে, সেই রোগের উৎপত্তি শরীরের মধ্যে কিরূপ হয়,—রোগের সময় এবং রোগ সারিয়া গেলে শরীরের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়,—ইত্যাদি বিষয় নানারূপ চিত্র দ্বারা প্রকাশ করিবার রেওয়াজ আজকাল ঔষধের বিজ্ঞাপনে খুব চলিয়াছে।

পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত বস্তুগত ও ভাবগত চিত্র ব্যতীত আর এক প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়,—বিজ্ঞাপনের অক্ষরগুলিকে নানা ফ্যাশানে লিখিয়া ও সাজাইয়া অথবা কোম্পানীর ট্রেড মার্ক কিম্বা অন্য কোন পরিচয় চিহ্ন সাজাইয়া। এই প্রকার বিজ্ঞাপনকে আমরা শোভা চিহ্নগত আখ্যা দিয়াছি। আজকাল এই রকম বিজ্ঞাপনের চল্‌তিও খুব আছে।

আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকায় কয়েকটী এই ধরণের বিজ্ঞাপন আছে;—(১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলস্ (২) ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী (৩) ঘোষ এণ্ড কোম্পানী (৪) রবিনসনের বার্লি (৫) মুস্‌লিম্ ইণ্ডিয়া ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানী। বাংলা অক্ষর অপেক্ষা ইংরাজী অক্ষরের রকমারি ষ্টাইল অনেক বেশী, সুতরাং এই ধরণের বিজ্ঞাপন ইংরাজী ভাষায় দেওয়াই সুবিধা। আজকাল আমাদের দেশীয় আর্টিষ্টগণ বাংলা অক্ষরেরও রকমারি ষ্টাইল বাহির করিতেছেন। কিন্তু তাহা ব্লকেই সম্ভব, ছাপাখানার টাইপের হরফে তাহা হয় না। এই জন্য বাংলা অক্ষরের রকমারি ষ্টাইলে বিজ্ঞাপন ব্লক্ তৈয়ারী করার দরুণ খরচা বেশী পড়ে।

চতুর্থ প্রকার বিজ্ঞাপনে চিত্র আমরা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ চিত্রের মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া ঠিক করিয়াছি। এই ধরণের বিজ্ঞাপনকে একটু বৃহদাকার না করিলে হয় না। কারণ ছোটর মধ্যে বস্তুর পরিচয় ও দেওয়া যায় না, ভাবও পরিস্ফুট হয় না, এবং অক্ষর সাজানও মুস্কিল। ইংরাজী দৈনিক কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপনগুলি অনেক সময়ে এই ধরণের থাকে। সাধারণ মাসিক পত্রিকার এক পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপনেও এইরূপ মিশ্র চিত্র চলিতে পারে;—এবং সেই বিজ্ঞাপনের জোরও হয় খুব বেশী।
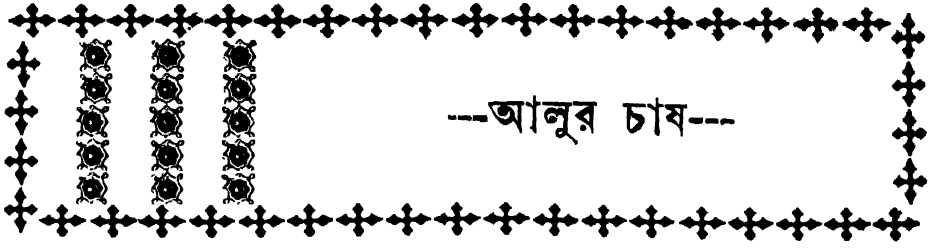
—আলুর চাষ—

সমগ্র পৃথিবীতে আজ আলু একটী প্রধান খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেও আজকাল ইহা একপ্রকার শ্রেষ্ঠ তরকারীরূপে গণ্য হইয়াছে। আলু এদেশীয় সব্জী নয়। আমেরিকার অন্তর্গত চিলি, পেরু ইত্যাদি ইহার আদি জন্মস্থান। তথা হইতে ইংরাজ বণিক কর্ত্তৃক ইউরোপে যায় এবং তথা হইতে ক্রমশঃ অন্যান্য দেশে ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। অনেক সময় চাউল, গম ইত্যাদি না পাইলে একমাত্র আলু খাইয়া লোকে দিনাতিপাত করিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক পাওয়া যায়। আলু নানা জাতীয়; লসনের পুস্তকে (Lawson's synopsis of the vegetable products of Scotland) ১৭৫ প্রকার আলুর নামোল্লেখ আছে।

এদেশে বোম্বাই, দেশী, পাটনাই, নৈনিতাল, চেরাপুঞ্জী, বৈদ্যবাটী, গৌহাটী, মাদ্রাজী ইত্যাদি কয়েক জাতীয় আলুর চাষ হইয়া থাকে। তবে এখন কয়েক জাতীয় বিদেশী আলু যেমন—নর্দ্দার্ন ষ্টার, কিং ৭ম এডওয়ার্ড, ব্রিটিশ কুইন কালি এমেরিকান, মেগ্নাম বোনাম, মেন ক্রপ, রিংলিডার, পারফেক্শান ইত্যাদি আনাইয়া অনেকে চাষ করিতেছে। তবে ইহার ফল তেমন সন্তোষজনক হয় নাই। এখন পাট চাষের বদলে আলুর চাষ বেশী করাই মঙ্গল। ইহাতে কৃষকের লাভই হইবে। আলুর মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদান গুলি আছে। যথা অসার অংশ ২০ জলীয় অংশ ৭২৬, প্রোটিন ১৮, তৈলময় পদার্থ ১, শ্বেতসার ১৪৭, ভস্ম ৮।

মৃত্তিকা—

বেলে দোয়াঁস মৃত্তিকাতেই আলুর চাষ ভাল হয়। কেবল বেলে দোয়াঁস হইলেই হইবে না। মৃত্তিকার সহিত যে বালি থাকিবে তাহা যেন বেশ সরু হয়। মোটা বালি বা কাঁকর মিশ্রিত হইলে কিন্তু আলু ভাল হইবে না। লবণাক্ত মৃত্তিকাতেও আলু ভাল হয় না; ২৪ পরগণা, এবং পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানের মৃত্তিকা লবণাক্ত বলিয়া ঐ সমস্ত অঞ্চলে আলুর চাষ তেমন ভাল হয় না; কিন্তু হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের মৃত্তিকাতে এ সমস্ত দোষ নাই, সে জন্য ঐ সমস্ত অঞ্চলে প্রচুর আলু হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা কর্ষণ—

আলুচাষের জমি খুব গভীর কর্ষিত হওয়া আবশ্যক। জমি গভীর (অন্ততঃ ২ ফিট) কর্ষিত, হাল্কা ও সারবান হইলে আলুর ফসলও বেশী হয়। এই কর্ষণের কাজ দাঁড়া কোদাল দ্বারা করিলেই ভাল হয়। কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য সুবিস্তৃত জমি কোদাল

দ্বারা কর্ষণ করিলে খরচ বেশী পড়িবে। এক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করাই ভাল।

একই শিরালে (দাঁড়ায়) তিন খানি লাঙ্গল পরপর চালাইলে মৃত্তিকার গভীর কর্ষণ হয় এবং এই ভাবে আড় দিকে অন্ততঃ ১০ বার চাষ দিলে আলুর জমি তৈয়ারী হয়।

রোপণ কাল—

আলু বসাইবার শ্রেষ্ঠ সময় হইতেছে আশ্বিন মাস। কেহ কেহ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসেও বসাইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে ফল পাইতে দেরী হয়। কাজেই ফসল শীঘ্র পাইতে হইলে আশ্বিন মাসেই বসান উচিৎ। আর ফসল শীঘ্র হইলে লাভও কিছু বেশী হয়। কারণ বাজারে নূতন আলু যাহারা সকলের আগে আমদানী করিতে পারে তাহারা দামও বেশী পায় সুতরাং ভাদ্র মাসের শেষেই পাট ও আউস ধান কাটিয়া লইয়া জমিটাকে খুব ভাল করিয়া চাষ দিয়া লইতে হয়। এই কর্ষণের কাজ চৈত্র বৈশাখ হইতেই করিতে হয়। কর্ষিত জমি ফেলিয়া রাখিলে আগাছা জন্মায়। সেইজন্য উহাতে আউস ধান বা পাট ইত্যাদির একটা ফসল করিয়া লইলে জমিটি পরিস্কার থাকে এবং অন্য একদিক দিয়া কিছু লাভও হয়।

সার—
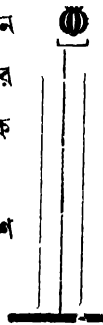
আলুর জমিতে অপর্য্যাপ্ত সার দিতে হয়। ইহাতে খরচ কিছু বেশী হয় বটে, কিন্তু তজ্জন্য লাভও বেশ হয়। কারণ যতটা সার দেওয়া হয়, তাহার সমস্তই আলুচাষে ব্যয়িত হয় না, কারণ আলুর দেহ গঠনে ঐ সমস্ত সার আলুগাছ টানিয়া লয় না। যে সার পড়িয়া থাকে তাহা অপর একটি ফসলের জন্য পর্য্যাপ্ত। সে জন্য আলু চাষের সহিত আর একটি চাষ করিয়া লাভবান হওয়া যায়। সেটি হইতেছে "কুমড়ার চাষ।" আলুর সারিতে সারিতে কুমড়ার বীজ বপন করিয়া দিলে, আলুর সেচ ও সার পাইয়া কুমড়াও শীঘ্র ফলে ও আকারে বড় হয়। কুমড়া বীজ বিঘা প্রতি ৫ তোলা হইলেই যথেষ্ট।

কেবল সারের উত্তেজনায় আলু শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জমি কর্ষণ করিবার সময় যদি বিঘা প্রতি দেড়শত মণ গোবর অথবা পচা ঘোড়ার নাদি ৭৫ মণ ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে বিঘাপ্রতি ৫/ রেড়ির খৈলের গুঁড়া দিলেই যথেষ্ট হয়; কিন্তু পূর্ব্বে গোবর দেওয়া না থাকিলে ১২/ মণ রেড়ির খৈল দিতে হইবে। কোন কোন চাষী প্রায় ২০/০ মণ খৈইল দেয়। আলুর জমি কোপাইয়া এবং চষিয়া ধূলার মত করিয়া চাষ এবং আঁচড়া দিয়া জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থে একটু ঢালু রাখিতে হয়। বর্ষা বেশী হইলে এইরূপ জমিতে জল দাঁড়ায় না।

আলুতে সবুজ সারও (green manure) বেশ কার্য্যকরী। সবুজ সারের জন্য আলু বসাইবার পূর্ব্বে শন, বা অন্য কোন শিম্বি জাতীয় খন্দের আবাদ করিয়া একটু বড় হইলে জমিতে হাল ও মই দ্বারা চষিয়া ফেলিতে হয়। এই গুলিকে শীঘ্র পচাইবার জন্য জমিতে কিছু চূণ ও ছাই ছড়াইতে হয়। ইহাতে জমির উর্ব্বরতা খুব বৃদ্ধি হয় এবং আলুর ফলনও বাড়িয়া যায়। বিঘাপ্রতি ১/০মণ সুপার ফস্ফেট অব-বোন, ২/০ মণ রেড়ির খৈল, ।৫ সের খনিজ পটাশ (কাইনিট্) (ইহা পাওয়া না গেলে ৪ ঝুড়ি ছাই দিলেই হয়) সার ব্যবহার করিয়াও আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। এই মিশ্র সারে আলুর আবশ্যক মত সমস্ত সারই আছে।

বীজ রোপণ প্রণালী—

সার ইত্যাদি দেওয়া সমাধা হইলে ক্ষেত্রটী যেদিকে ঢালু করা হইয়াছে সেই দিকে লম্বালম্বি ভাবে জুলী কাটিতে হইবে। প্রত্যেক জুলি অন্ততঃ ১৮ ইঞ্চি অন্তর ও ৫ ইঞ্চ গভীর হওয়া আবশ্যক। বীজের জন্য আলু লাগাইতে হইলে আরও কিছু বেশী অন্তর করিয়া লাগাইতে হয়। প্রত্যেক জুলিতে ৯ ইঞ্চি অন্তর বীজ রোপণ করিতে হয়। বড় জাতীয় আলু ১৩।১৪ ইঞ্চি অন্তর লাগান উচিৎ। ইহাপেক্ষা অধিক অন্তর অন্তর বীজ লাগানও চলে। তাহাতে বীজের পরিমাণ কিছু অল্প হয়। বড় জাতীয় আলু নৈনিতাল, বোম্বাই ইত্যাদির চোক গুলিকে বজায় রাখিয়া দুই বা তিন খণ্ড যেমন 'কল' পাওয়া যাইবে সেইরূপভাবে চিরিয়া ঐ কর্ত্তিত স্থানের গায়ের রস ছায়ায় শুকাইয়া রোপণ করিতে হয়। টাট্‌কা অবস্থায় পুঁতিলে অনেক বীজ পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। আর যদি একান্তই সময়া-

ভাবে বসাইতে হয়, তাহা হইলে কর্ত্তিত স্থানে ছাই মাখাইয়া লাগাইতে হইবে। ছোট জাতীয় আলু, যথা,—বৈদ্যবাটী, দেশী, পাটনাই ইত্যাদির ছোট ছোট বীজ একটী করিয়া রোপণ করিতে হয়। বড় হইলে ঐরূপ কাটিয়া বসাইতে হইবে।

প্রতি গর্ত্তে বীজ রোপণ করার পর তদুপরি দুই অঙ্গুলি পরিমিত ধূলিবৎ মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া দিয়া আল্গাভাবে কিঞ্চিৎ চাপিয়া দিতে হইবে। আলু বসাইবার পূর্ব্বে দাগী আলু বাছিয়া লইতে হইবে এবং আলুগুলি তুঁতের জলে ডুবাইয়া রোপণ করিলে পোকা ধরিবার আশঙ্কা থাকে না। এদেশে অধিকাংশ স্থলে প্রায়ই দেখা যায় যে, আলু রোপণ করিবার পরই, তাদের মূলে একপ্রকার মোটা মোটা সাদা নরম পোকায় আলুর চারাগুলি কাটিয়া দেয়। ইহার প্রতিকার কল্পে বীজ রোপণের পূর্ব্বে, জুলি গুলির মধ্যে যে যে স্থানে বীজ রোপণ করা হইবে, সেই স্থানগুলিতে ছোট ছোট বাটির ন্যায় গোলাকার ভাবে এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে রেড়ির খইল চূর্ণ ২ ভাগ ও চাউলের কুঁড়া ১॥০ ভাগ একত্রে মিশাইয়া প্রতি গর্ত্তে আধ ছটাক আন্দাজ দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বীজ রোপণ করিতে হইবে।

জলসেচন—

আলু চাষে সেচের জলের বিশেষ প্রয়োজন। কারণ আকাশের জলের উপর নির্ভর করিয়া আলুর চাষ করা যায় না। সেচের জলের সুবিধা করিয়া তবে আলুর চাষ আরম্ভ করা উচিত।

ওরিয়েণ্ট্যাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ য়্যাস্থর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেড্

একবিংশ ত্রৈবার্ষিক ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট

বিগত ৬ই জুলাই, বুধবার (১৯৩৪) বোম্বাই ওরিয়েণ্ট্যাল বিল্‌ডিংস্ ভবনে উক্ত কোম্পানীর অংশীদার এবং পলিসিহোল্ডারদের এক একষ্ট্রা অর্ডিনারী জেনারেল মিটিং হয়। তাহাতে কোম্পানীর একবিংশ ত্রৈবার্ষিক ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট আলোচিত ও গৃহীত হয়। নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

চেয়ারম্যানের বক্তৃতা

কোম্পানীর ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস অনুপস্থিত থাকাতে মিঃ মেয়ার নিসিম এম্ এ, জে পি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই ;—

বর্ত্তমান (১৯৩৪—১৯৩৬) ভ্যালুয়েশনে দেখা যায়, কোম্পানীতে মোট ১৪৭৫৩২ সংখ্যক পলিসিতে ২৬৭৮৬২৪০৬ টাকা বীমা করা আছে। স্থতরাং পূর্ব্বের ভ্যালুয়েশনের তুলনায়, কোম্পানীর কারবার শতকরা ৫০ টাকা বাড়িয়াছে। গত বৎসর কোম্পানীর নূতন বীমা যে পরিমাণ হইয়াছে, এত বেশী কোম্পানীর জন্মাবধি আর কখনও হয় নাই। কারবার

এরূপ প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও খরচের হার তেমন বৃদ্ধি পায় নাই ;—শতকরা ২২.৮ টাকা মাত্র হইয়াছে। পূর্ব্বের ত্রৈবার্ষিক ভ্যালুয়েশনে খরচের হার যদিও শতকরা ২১.৪ টাকা ছিল, তথাপি কারবার যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে,—তার তুলনায় খরচের হার যে সামান্য বাড়িয়াছে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। আমাদের পরামর্শদাতা য্যাকচুয়ারীও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রিমিয়াম বাবদে আয় হইয়াছে ৮০৮৭১১৯৮৪ টাকা এবং স্থদ বাবদে পাওয়া গিয়াছে ২৩০৮৪৩৫৪ টাকা। পূর্ব্ব ভ্যালুয়েশনের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, প্রিমিয়ামের আয় শতকরা ৩৩ টাকারও অধিক এবং স্থদের আয় শতকরা ২৬ টাকার উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে। মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ (আলোচ্য ৩ বৎসরের মধ্যে) ১৬১৬১৮৪৪ টাকা হইতে দেখা যায় উহা শতকরা ২৯ টাকা (পূর্ব্ব ভ্যালুয়েশন অপেক্ষা) বাড়িয়া থাকিলেও মোট দাবীর (৩৫৫২৭২১৮ টাকা) শতকরা ২৮ টাকা মাত্র বাড়িয়াছে। যে পরিমাণ দাবী আশা করা গিয়াছিল তাহার শতকরা ৫২টী মাত্র দাবী প্রকৃতপক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বের ভ্যালুয়েশনে (১৯৩১-১৯৩৩) ইহার পরিমাণ ছিল শতকরা ৫৩ এবং তার পূর্ব্বের ভ্যালুয়েশনে (১৯২৮-১৯৩০) এই অনুপাত ছিল শতকরা ৬১। কোম্পানীর কারবারে যে লাভ দাঁড়াইয়াছে, ইহা তাহার প্রধান কারণ না হইলেও ইহার দ্বারা যে কোম্পানীর লাভের অন্ততঃ একটা দিকও রক্ষা পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বীমার প্রস্তাব বাছাই করিতে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ যে বিশেষ স্থবিবেচনা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, আমাদের য্যাকচুয়ারী মহাশয়ও তাহা স্বীকার করেন।

পূর্ব্বে টাকা লগ্নীতে বেশী স্থদ পাওয়া যাইত। কিন্তু গত তিন বৎসর যাবৎ স্থদের হার কমিয়া যাওয়াতে আমাদের কোম্পানীর টাকা লগ্নীর দিক দিয়া আয় সন্তোষজনক হয় নাই। য্যাকচুয়ারী মহাশয় তাঁহার রিপোর্টে দেখাইয়াছেন স্থদের হার ১৯৩৪ সালে শতকরা ৫.০৫ টাকা হইতে ১৯৩৬ সালে শতকরা ৪.৭০ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় কোম্পানী যাহাতে উপযুক্ত বোনাসের হার বজায় রাখিতে পারেন, সেইজন্য ভ্যালুয়েশনে স্থদের হার ধরা হইয়াছে শতকরা ৩৷০ টাকা। পূর্ব্বের ভ্যালুয়েশনে ধরা হইয়াছিল শতকরা ৩৷৷০ টাকা। ইহাতে কোম্পানীর রিজার্ভ ফাণ্ড অনেকটা মজবুত হইয়াছে।

স্থদ বাবদে কোম্পানীর আয় কমিয়া যাওয়াতেই এবারে পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চহারে বোনাস্ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। অন্যান্য দিকে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ কমে নাই এবং কোম্পানীর পরিচালনা কার্য্যেও কোন ত্রুটী ঘটে নাই। কোম্পানীর পরামর্শদাতা য্যাকচুয়ারী মিঃ ব্রাউন তাঁহার রিপোর্টে স্পষ্টরূপে একথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান ভ্যালুয়েশনে কোম্পানীর লাভ দাঁড়াইয়াছে ১৮৭০৭৮৯২ টাকা। ইহার পূর্ব্বের ভ্যালুয়েশনে লাভ হইয়াছিল ১৫১৩৭৪৪১ টাকা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভ্যালুয়েশনে (১৯২৮-১৯৩০) এই লাভের পরিমাণ ছিল ১১৬২৩৫৪৩ টাকা। স্থতরাং দেখা যাইতেছে লাভের অঙ্কে বাড়্তির পরিমাণ সমানই রহিয়াছে। কোম্পানীর

প্রিমিয়াম ও সুদবাবদে মোট আয়ের উপর শতকরা ১৮ টাকা লাভ হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ১৯৩৩ সালের ভ্যালুয়েশনে ছিল শতকরা ১৯·২ টাকা এবং ১৯৩০ সালের ভ্যালুয়েশনে ছিল শতকরা ১৮·৭ টাকা।

আমাদের কোম্পানীর নিয়ম অনুসারে লাভের টাকা অংশীদার ও পলিসি হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করার পূর্ব্বে, উহার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ রিজার্ভ ভাণ্ডে রাখিতে হয়। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাকে দশ ভাগ করিয়া নয় ভাগ পলিসি হোল্ডারদের মধ্যে এবং এক ভাগ অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং মোট লাভ ১৮৭০৭৮৯২ টাকা হইতে ৬২৩৫৯৬৪ টাকা কন্টিঞ্জেন্সী রিজার্ভ ফাণ্ডের জন্য রাখিয়া অংশীদার ও পলিসি হোল্ডারগণের মধ্যে ১২৪৭১৯২৮ টাকা বণ্টন করা হইয়াছে।

কন্‌টিঞ্জেন্সী রিজার্ভ ফাণ্ডের ৬২৩৫৯৬৪ টাকা হইতে পলিসি হোল্ডারদের বথরায় ৬১২৪৫২১ টাকা এবং অংশীদারদের বথরায় ১০২৮০৭ টাকা পুনরায় আনিয়া যোগ করা হয়। তাহাতে পলিসি হোল্ডারগণকে আজীবন বীমায় হাজার করা ২২॥০ টাকা এবং মেয়াদী বীমায় হাজার করা ১৮ টাকা বোনাস দেওয়া হইয়াছে। অংশীদারগণ শেয়ার পিছু নগদ বোনাস্ ৭৫ টাকা এবং ১৯৩৭, ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ এই তিন বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে বার্ষিক ১২৫ টাকা হিসাবে ডিভিডেণ্ড পাইবেন। এইরূপ করার পর বর্ত্তমান ত্রৈবার্ষিক ভ্যালু-য়েশনের মোট লাভের টাকা হইতে অবশিষ্ট ৮৬৩৬ টাকা কন্‌টিঞ্জেন্সী রিজার্ভ ফাণ্ডে থাকে। ১৯৩৫ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর ঐ ফাণ্ডের পরিমাণ ছিল ৫৯৮৭৯৬ টাকা। সুতরাং এক্ষণে উহা দাঁড়াইয়াছে ৬০৭৪৩২ টাকায়।

আমাদের কতিপয় পলিসি-হোল্ডার ও অংশীদার উপরি উক্ত ব্যবস্থায় আপত্তি জানাইয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমি প্রথমতঃ পলিসি-হোল্ডারদের সম্বন্ধে জানাইতেছি যে, তাঁহারা মোট বন্টীত টাকার শতকরা ৯২·৮ অংশ পাইয়াছেন। এত অধিক হাবে পলিসিহোল্ডারদিগকে ইদানীং আর কখনও দেওয়া হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদের আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ অংশীদারগণ পাইয়াছেন শতকরা ৭·২ টাকা। ইহা যদিও খুব কম, তথাপি তাঁহাদের বোনাস্ ও ডিভিডেণ্ডের পরিমাণ পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহারাও কোন আপত্তি করিতে পারেন না। আমি নিজে কোম্পানীর একজন বড় অংশীদার হিসাবে এই কথা বলিতে পারি।

কেহ কেহ আমাদিগকে পত্র লিখিয়া ইহাও জানাইয়াছেন যে, কোম্পানীর যেমন আর্থিক অবস্থা তাহাতে আরও উচ্চহারে বোনাস্ ও ডিভিডেণ্ড দেওয়া যায়, যদি সিকিউরিটীর মূল্য বৃদ্ধি তার মধ্যে গণ্য করা হয়। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই, সিকিউরিটীর মূল্য বৃদ্ধিকে বোনাস্ ও ডিভিডেণ্ড হিসাবে ধরা বীমা ব্যবসায়ের পক্ষে বিপজ্জনক। তাহাতে ভ্যালুয়েশনের সাম্য-ভাব নষ্ট হয়। সুতরাং ঐ নীতি অবলম্বন করা যুক্তি সঙ্গত নহে। কোম্পানীর অন্য দিক দিয়া যে লাভ হয়, তাহা হইতেই বোনাস্ ও ডিভিডেণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য। যেমন অতিরিক্ত সুদ আদায়, বীমাকারীদের মধ্যে কম মৃত্যু, পরিচালনা খরচা কমান, প্রিমিয়াম লোডিং, সিকিউরিটী বিক্রয় অথবা খালাস,—এই সকল কারণে যে লাভ হয়

তাহা হইতে বোনাস্ ও ডিভিডেণ্ড দিলে কোম্পানীর কোন ভয় থাকেনা।

একথা মনে রাখিবেন; কোম্পানীর হিসাবের খাতায় সিকিউরিটীর মূল্য যতই বেশী ধরা থাকে,—ততই উহার সুদের হার অল্প হয়। অথচ ভ্যালুয়েশন কোম্পানীর লাভের অঙ্কে সাম্য-ভাব রাখিতে হইলে উচ্চতম সুদের হার ধরিয়া হিসাব করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে সিকিউরিটী সমূহের বাজারদর যেমন চড়িয়া গিয়াছে,—যদি এইরূপ চলিতে থাকে,—(অবশ্য ইহাতে সন্দেহ আছে) তাহা হইলে সর্ব্বত্রই বোনাসের হার কমিয়া যাইবে। এর মধ্যেই তিনটী খুব ভাল এবং বড় ব্রিটিশ কোম্পানী বোনাসের হার কমাইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার মধ্যে কেহ কেহ ভারতেও কারবার করেন।

৬০ বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত ওরিয়েণ্ট্যাল যে সুনাম ও গৌরবের সহিত কারবার করিয়া আসিতেছে, তাহা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ, পরামর্শদাতা য়্যাকচুয়ারীর উপদেশ অনুসারে পূর্ব্বোক্তরূপে বোনাস ও ডিভিডেণ্ড দিবার সংকল্প করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে চারিদিকে আর্থিক ব্যাপারে যেমন অনিশ্চয়তা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন-কিছু বলা একপ্রকার অসম্ভব। তবে আমরা যে

সম্মুখে আশার উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। সিকিউরিটীর মূল্য যদি কমিয়া যায় তবে আমাদের সুদের আয় বৃদ্ধি পাইবে। আর যদি বর্ত্তমান সময়ের মত উহার দাম বাড়িতে থাকে, তবে আমাদের কারবার প্রসারের দ্বারা আমরা লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিব। একবার লাভ বণ্টন কিঞ্চিৎ নিরাশাজনক হইলেও ভবিষ্যতের উপর আমরা বিশ্বাস হারা হই নাই।

১৯৩৪-১৯৩৬ সালের হিসাবের সারমর্ম্ম (হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে)

আয় ;— (প্রধানতঃ)

প্রিমিয়াম (পুনর্বীমা বাদে)	৮০৪৭৯২৫৫ টাকা
য়্যানুইটী সম্পর্কিত	৩৯২৭২৮ টাকা
সুদ, ডিভিডেণ্ড ও বাড়ীভাড়া প্রভৃতি	২৩০৮৪৩৫৩ ,,
সিকিউরিটী বিক্রয় ও খালাস	৮৯৯৫৪৯ ,,
সিকিউরিটীর পুনর্ম্মূল্য নিরূপণের জন্য লাভ	৫৯৫৩১১৪ ,,

ব্যয় ;— (প্রধানতঃ)

ডিভিডেণ্ড	৯৭৫০০০ টাকা
অংশীদারদের বোনাস ডিভিডেণ্ড	২২৫০০০ ,,
দাবী	৩৩৫২৭২১৮ ,,
সারেণ্ডার	৩৫০৮৬৫৪ ,,
য়্যানুইটী ও নগদ বোনাস	৬১৯১৮০ ,,
পরিচালনা খরচ	১০৯৩৭৯৩৩ ,,

১৯৩৪ সালের ১লা জানুয়ারী কোম্পানীর মোট তহবিলের পরিমাণ ছিল, ১৪৩০০৪৫৩৫ টাকা। ১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৫৪৪২৪৭ টাকা হইয়াছে।

ভ্যালুয়েশনের ফলাফল

১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর জীবন-বীমা তহবিলের পরিমাণ—	১৯২০৮৭৬৯৪ টাকা
বাদ অংশীদারদের ১৯৩৬ সালের ডিভিডেণ্ড—	৩৭৫০০০ ,,
অবশিষ্ট	১৯১৭১২৬৯৪ ,,
বাদ য়্যানুইটী এবং য়্যাস্যুর্যান্স কন্‌ট্রাক্ট বাবদে দেনা—	১৭৩৬৮১৪৭৪ ,,
অবশিষ্ট	১৮০৩১২২০ ,,
ভ্যালুয়েশনের তিন বৎসরে যে সকল পলিসির দাবী উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দরুণ ইণ্টারিম বোনাস্ যোগ—	৬৭৬৬৭২ ,,
তিন বৎসরের মোট লাভ—	১৮৭০৭৮৯২ ,,
কণ্টিজেন্সী রিজার্ভ ফাণ্ডে যায়—	৬২৩৫৯৬৪ ,,
বণ্টন যোগ্য নিট্ লাভ	১২৪৭১৯২৮ ,,

ইহার দশ ভাগের এক ভাগ ১২৪৭১৯৩ টাকা অংশীদারদের পাওনা এবং অবশিষ্ট নয় ভাগ ১১২২৪৭৩৫ টাকা পলিসি হোল্ডারদের পাওনা। অংশীদারদের পাওনার সহিত কণ্টিজেন্সী রিজার্ভ তহবিল হইতে ১০২৮০৭ টাকা আনিয়া যোগ করিলে মোট ১৩৫০০০০ টাকা হয়। এই টাকা নিম্নলিখিত রূপে অংশীদারদিগকে দেওয়া হয়,—

(১) প্রতি শেয়ারে নগদ বোনাস্ ৭৫ টাকা হিসাবে ২২৫০০০ টাকা।

(২) প্রতি শেয়ারে বার্ষিক ১২৫ টাকা হিসাবে ১৯৩৭, ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালের ডিভিডেণ্ড ১১২৫০০০ টাকা।

পলিসি হোল্ডারদের পাওনা টাকা হইতে ইণ্টারিম বোনাসের ৬৭৬৬৭১০ টাকা বাদ দিয়া, কন্টিজেন্সী রিজার্ভ তহবিল হইতে ৬১২৪৫২১ টাকা আনিয়া যোগ করিলে ১৬৬৭২৫৮৪ টাকা হয়। এই নিম্নলিখিত প্রকারে পলিসি হোল্ডার গণকে বোনাস্ দেওয়া হয়,—

(১) আজীবন বীমায় প্রতি হাজার টাকাতে বার্ষিক ২২॥০ টাকা বোনাস্।

(২) মেয়াদী বীমায় প্রতি হাজার টাকাতে বার্ষিক ১৮ টাকা বোনাস্।

(৩) ঐ হারে ইণ্টারিম বোনাস।

আমাদের মন্তব্য

পূর্ব্বের ভ্যালুয়েশন অপেক্ষা বর্ত্তমান ভ্যালুয়েশনের ফলে বোনাস্ কিঞ্চিৎ কম হইলেও আমরা ইহাতে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনায় সুব্যবস্থার পরিচয়ই পাইতেছি। আর্থিক জগতে সর্ব্বত্রই সুদের হার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই কোম্পানীর নিজের নিরাপদ অবস্থা রক্ষা করিয়া বোনাসের হার বাড়াইতে পারেন না। ওরিয়েণ্ট্যালের অধিকাংশ টাকাই গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে লগ্নী করা আছে। উহার বাজার দর চড়িয়া যাওয়াতেই সুদের হার পড়িয়া গিয়াছে। কোম্পানীর কারবার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যখন আরও অধিক পরিমাণে টাকা লগ্নীতে খাটিবে তখন কম সুদেও কোম্পানীর লাভ পোষাইয়া আসিবে। সুতরাং এবারের ভ্যালুয়েশনে কম বোনাস্ হওয়া কোম্পানীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক নহে। এসম্বন্ধে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ পলিসি হোল্ডার ও অংশীদারদের নিকট হইতে যে সকল আপত্তিকর কথা শুনিয়াছিলেন, চেয়ারম্যান মহাশয় তাহার যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়াছেন।

কোম্পানীর কারবার যেরূপ প্রসারিত হইয়াছে, তাহাতে খরচের অনুপাত অতি সামান্যই বাড়িয়াছে ;—তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা ব্যাপারে ওরিয়েণ্টালের দক্ষতা ব্যবসায় জগতে প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত। বীমার প্রস্তাব বাছাই করিতেও ওরিয়েণ্ট্যাল সিদ্ধ-হস্ত। সুদের আয় এত কমিয়া যাওয়াতেও যে ওরিয়েণ্ট্যাল তেমনি মাথা তুলিয়া বোনাস্ ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছে,—বীমার প্রস্তাব বাছাই করার কৌশল তাহার অন্যতম কারণ। আমরা দেখিয়াছি, পূর্ব্বের ভ্যালুয়েশনের তিন বৎসরে (১৯৩১-১৯৩৩) যে হারে সুদ পাওয়া গিয়াছিল, সেই হারে সুদ পাইলেও এবারকার ভ্যালুয়েশনে সুদ বাবদে আয় আরও ২১॥০ লক্ষ টাকা বেশী দেখা যাইত এবং তাহা হইলে পূর্ব্বের হারে বোনাস্ দেওয়াও সম্ভব হইত। কিন্তু কোম্পানীর কাগজের সুদের হার অসম্ভবরূপে কমিয়া যাওয়ায় কোম্পানীর লাভের অঙ্কও কমিয়া গিয়াছে সুতরাং বুঝা যাইতেছে, কেবল মাত্র সুদের হার কমিয়া যাওয়াতেই কোম্পানীর লাভ কম দাঁড়াইয়াছে। অন্য সকল দিকেই কোম্পানীর অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুদৃঢ় ও অপরাজেয় হইয়া আছে।

ওরিয়েণ্ট্যালের পর পর ৫টী ভ্যালুয়েশনের তুলনা মূলক বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

ত্রৈবার্ষিক	ইস্যু করা পলিসির সংখ্যা	বীমার পরিমাণ টাকা	প্রিমিয়াম টাকা
১৯২২-২৪	২৫৪৪১	৫৭৬৭৬৪০০	৩৩৭৩৫৮২
১৯২৫-২৭	৫২৩৩৪	১১৫৫৮৬৩৮৭	৬৬০৬৭৭৫
১৯২৮-৩০	৮৪৮৬৭	১৭৭৯৬৫৬৩৬	৯৯৪১৫০৮
১৯৩১-৩৩	৯৪৬৫৯	১৮৩২৮৭৮৮৪	১০০৫৭১২৪
১৯৩৪-৩৬	১৪৭৫৩২	২৬৭৮৬২৪০৬	১৫০৩৮০৪৮

নিম্নে পূর্ব্ববর্ত্তী ও বর্ত্তমান ভ্যালুয়েশনের প্রিমিয়াম আয় ও সুদের আয় তুলনা করা হইয়াছে,—

ত্রৈবার্ষিক	নিট্ প্রিমিয়াম টাকা	নিট্ সুদ টাকা	মোট টাকা
১৯৩৪-৩৬	৮০৮৭১৯৮৪	২৩০৮৪৩৫৪	১০৩৯৫৬৩৩৮
১৯৩১-৩৩	৬০৭০৫৫৬৯	১৮২৭৩৬০৬	৭৮৯৭৯১৭৫
বাড়্তি	২০১৬৬৪১৫	৪৮১০৭৪৮	২৪৯৭৭১৬৩

—✲— —✲—

[১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্টের সারমর্ম্ম]

(হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদদেওয়া হইয়াছে)

নূতন বীমার পরিমাণ :--

আলোচ্য বৎসরে ১২৯৩০০০ টাকা মূল্যের ১৭৯২টী বীমার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১০০৫২৫০ টাকা মূল্যের ১৪৩৪ টী বীমার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ৮১৭২৫০ টাকা মূল্যের ১১২৭ টী পলিসি ইস্যু হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যায়, কোম্পানীর কারবার শতকরা প্রায় ২৪ টাকা বাড়িয়াছে।

আয়-ব্যয় :—

কোম্পানীর আয় হইয়াছে মোট ৮০৪৩৫ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবদে পাওয়া গিয়াছে (পুনর্ব্বীমা বাদ) ৭৮৯৪২ টাকা। সুদ বাবদ (ইন্‌কামট্যাক্স বাদ) আয় হইয়াছে মোট ১৪৯৩ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ৫১৫৭৮ টাকা। সুতরাং কোম্পানীর আয় শতকরা ৫৬ টাকা বাড়িয়াছে।

ব্যয় হইয়াছে মোট ৫৬১০৫ টাকা। তন্মধ্যে দাবী বাবদে গিয়াছে ৩৫০০ টাকা এবং পরিচালনা খরচ হইয়াছে ৫২৬০৫ টাকা। খরচ বাদে পূর্ব্ব বৎসরের (লাইফ-ফাণ্ডের) ১০২৫৪ টাকা সহ, জীবন বীমা তহবিলে মোট ৩৪৫৮৫ টাকা জমিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৬৮·৫ টাকা পরিচালনা খরচা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে তাহা কমিয়া শতকরা ৬৫·৪ টাকায় নামিয়াছে।

লগ্নী :—

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী কারেন্সী কন্‌ট্রোলারের নিকট আরও ৫৫৫০০ টাকা সিকিউরিটী ডিপজিট্ রাখিয়াছে। ইহাতে ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ডিপজিটের পরিমাণ হইয়াছে ৮৬৫০০ টাকা। আমরা অবগত হইলাম, ৩১ শে মার্চ্চের পরে অল্প দিনের মধ্যে কোম্পানী আরও ১৩৫০০ টাকা সিকিউরিটী ডিপজিট রাখিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোম্পানীর মোট একলক্ষ টাকা ডিপজিট পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

দাবী :--

আলোচ্য বৎসরে ৩৫০০ টাকার পাঁচটী দাবীমাত্র উপস্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৫০০

টাকার তিনটী দাবী সঙ্গে সঙ্গেই মিটাইয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট এক হাজার টাকার দুইটী দাবীর (প্রত্যেকটী ৫০০ টাকা) কাগজ পত্র পাওয়া যায় নাই এবং উহা বৎসরের শেষ ভাগে উপস্থিত হয় বলিয়া তখনই দেওয়া হয় নাই। দেখা যায়, কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ বীমার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে যেমন সুবিবেচনার পরিচয় দেন, দাবী মিটাইতেও সেইরূপ তৎপর।
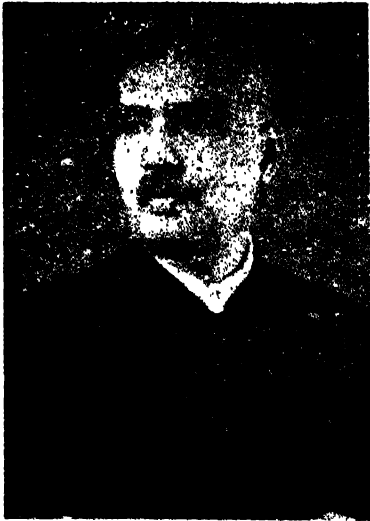
ভাগ্যলক্ষ্মীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জী

জীবন বীমা তহবিল :—এই সকল দাবী শোধ করিয়াও কোম্পানী জীবন বীমা তহবিলের জন্য ২৪৩৩০ টাকা বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং ঐ তহবিলে পূর্ব্বের টাকা সহ মোট ৩৪৫৮৫ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে।

ডিভাইডিং ইন্স্যুর‍্যান্স :—

এই বিভাগে কোম্পানীর মোট আয় (পূর্ব্ব বৎসরের জের তহবিল ১২৭৩৩ টাকা সহ) ৫৪৯২৮ টাকা হইয়াছে। তন্মধ্যে ডেথ্ কল বাবদে আয় হইয়াছে ৩৮৫০৬ টাকা। বার্ষিক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে ৩০৬৮ টাকা। ভর্ত্তির ফি ১১৬ টাকা এবং সুদ ৪৬১ টাকা আদায় হইয়াছে। খরচ হইয়াছে মোট ৪২২৯৪ টাকা। তন্মধ্যে দাবী দেওয়া হইয়াছে ১৫৫৬২ টাকা। পরিচালনা খরচ হইয়াছে ২৩৩৬৭ টাকা। মূল্য হ্রাস, শেয়ার কমিশন, প্রাথমিক খরচা প্রভৃতি বাবদে ৩৩৬১ টাকা গিয়াছে। বৎসরের শেষে রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১২৬৩৪ টাকা।

ডিভাইডিং ইন্স্যুর‍্যান্স পদ্ধতিতে এযাবৎ কোম্পানী মোট ১৫৮৭৩৫ টাকা দাবী দিয়াছেন। এই পদ্ধতির অনিষ্টকারিতা যখন প্রচারিত হইল, তখন ম্যানেজিং এজেণ্টগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া, ঐ প্রকার বীমা পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের পুরাতন পলিসি হোল্ডারগণকে বুঝাইয়া শুনাইয়া রাজী করান। ইহার ফলে বীমাকারীগণ পুরাতন ডিভাইডিং স্কীমের পলিসি বদলাইয়া সাধারণ জীবন বীমার পলিসি গ্রহণ করিতে থাকেন। পূর্ব্ব বৎসরে (১৯৩৫-৩৬) ডিভাইডিং স্কীমের মোট পলিসির সংখ্যা ছিল ৩৮৭৫। আলোচ্য বৎসরে (১৯৩৬-৩৭) উহা কমিয়া ২০৪০ হইয়াছে। তার পরে উহার সংখ্যা আরও কমিয়া এই রিপোর্ট লিখিত হইবার সময় পর্য্যন্ত ১৬৫০ এতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের মন্তব্য

বীমার কারবারে ডিভাইডিং স্কীম বা বণ্টন পদ্ধতি যে অনিষ্টকর প্রথা এবং ইহা যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বীমা সম্বন্ধীয় যে আইন তৈয়ারী হইতেছে, তাহাতে এই প্রকার অনিষ্টকর পদ্ধতি তুলিয়া দেওয়ারই

কথা ; সুতরাং ভাগ্যলক্ষ্মীর কর্ত্তৃপক্ষ যে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া বীমাকারীদের পুরাতন পলিসিগুলিকে সারেণ্ডার করাইয়া লইতেছেন ইহা খুব বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা আশাকরি, অনতিবিলম্বে অবশিষ্ট ১৬৫০ খানা পলিসিও পরিবর্ত্তিত হইয়া সাধারণ জীবন বীমার পলিসিতে পরিণত হইবে।

আমরা ভগ্যলক্ষ্মীর সকল দিকেই উন্নতি দেখিয়া আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। ইহার নূতন কারবার, আদায়ী মূলধন, জীবন বীমা তহবিল, সবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে খরচের অনুপাত কমিয়া আসিয়াছে। কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩০৯৪৫ টাকা। আমরা নিম্নে ভাগ্যলক্ষ্মীর তিন বৎসরের উন্নতির পরিচয় দিলাম ;—

	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-১৯৩৬	১৯৩৬-১৯৩৭
	টাকা	টাকা	টাকা
প্রাপ্ত বীমার প্রস্তাব	৮১৯৭৫০	১১০৭২৫০	১২৯৩০০০
ইস্যুকরা পলিসি	৫১৯২৫০	৮১৭২৫০	১০০৫২৫০
প্রিমিয়াম আয়	১৭৮৬৩	৫০৮৩৩	৭৮৯৪২
খরচ শতকরা	৯১·৮	৬৮·৫	৬৫·৪
জীবন বীমা তহবিল	১৫০১	১০২৫৪	৩৪৫৮৫
দাবী	×	৬৫০০	৩৫০০
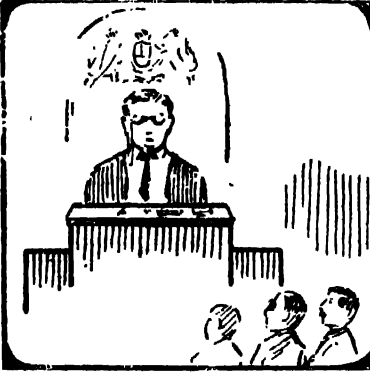
ত্রিপুরার গিরিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ জে সি চক্রবর্ত্তীর ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। তাঁহার অপরাধ, তিনি সংবাদ পত্রে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, তাহাতে রেজেষ্টারীকৃত মূলধনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বিক্রীত ও আদায়ী মূলধনের কথা কিছুই লেখেন নাই। কলিকাতায় ১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এই ব্যাঙ্কের একটী শাখা আফিস আছে। সুতরাং বিচার হইয়াছে, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্তের এজলাসে।

যশোহর জিলার অন্তর্গত বনগাঁও মহকুমার সীতাই ইউনিয়ান বোর্ডের জমাদ্দার গায়েন নামক এক ব্যক্তি য়্যাসোসিয়েটেড ইণ্ডিয়ান ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীতে ৫০০ টাকার জীবন বীমা করে। কোম্পানীর এজেন্ট সুরেশ চন্দ্র মুখার্জ্জির মারফতে এই বীমার প্রস্তাব প্রথম প্রিমিয়াম ও ভর্ত্তির ফিস আদি সহ কোম্পানীর আফিসে (২নং রয়েল একচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা) আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রস্তাব পত্রে বীমাকারী জমাদ্দার গায়েনের বয়স লেখা ছিল ৪৯; তাহার 'নমিনী' (Nominee) হইয়াছিল ফজলাল করিম। এই ফজলাল করিম, ইউনিয়ান বোর্ডের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট হারাণ বিশ্বাসের পুত্র। বীমাকারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়া ছিলেন ডাঃ বিভূতি ভূষণ চ্যাটার্জ্জি। বয়সের প্রমাণ স্বরূপ হারাণ বিশ্বাসের য়্যাফিডেবিটও কোম্পানীর আফিসে পাঠান হয়।

তিনমাস পরেই বীমাকারী জমাদ্দার গায়েনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাহার নমিনী ফজলাল করিম টাকার দাবী করে। ইতিমধ্যে ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হারাণ বিশ্বাস এক ফৌজদারী মামলায় জড়িত হওয়াতে প্রেসিডেন্ট পদ হইতে অপসারিত এবং সেইস্থলে বনগাঁওয়ের উকীল সুরেন্দ্র নাথ প্রধান ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন। এদিকে কোম্পানীর তরফ হইতে জমাদ্দার গায়েনের বয়স সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ প্রধান মহাশয়ের নিকট একপত্র লেখা হয়। তিনি জানাইলেন যে, জমাদ্দার গায়েন জল-জ্যান্ত মানুষ, সশরীরে বহাল তবিয়তে বাঁচিয়া আছে, তাহার বয়স ৭২; সে বেচারা বৃদ্ধ, বীমার কথা, প্রিমিয়াম দেওয়ার কথা কিছুই জানেনা।

তখনি সমস্ত ঘটনা বনগাঁওর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান হইল এবং পুলিশ তদন্তের ফলে শেষে জাল জুয়াচুরিও সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইল।

যথা সময়ে যশোহর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে কোম্পানীর এজেণ্ট সুরেশ মুখার্জ্জি, হারাণ বিশ্বাসের পুত্র ফজ্‌লাল করিম, ইউনিয়ান বোর্ডের কেরাণী আব্বাস্ আলী প্রভৃতি ৯জন আসামী ফৌজদারী আইনের ১২০-বি ও ৪২০ ধারা মতে অভিযুক্ত হয়। ইতিমধ্যে হারাণ বিশ্বাস মারা যায়। কোম্পানীর এজেণ্ট সুরেশ মুখার্জ্জি সমস্ত ঘটনা স্বীকার করাতে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়া তাহাকে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী স্বরূপ গণ্য করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এই মামলার ফরিয়াদী। যশোহরের পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ জে সেন, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মামলা চালাইতেছেন।

হুট বিহারীদাস নামক এক ব্যক্তি ১৯৩৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী এলায়্যান্স য়্যাণ্ড ষ্টাট গার্টার লাইফ ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানী হইতে ৫০০০ টাকার একটী মেয়াদী বীমার পলিসি গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার মৃত্যুহয়। পলিসিখানি তাঁহার পুত্র হেমন্ত কুমার দাসের নামে এসাইন করা ছিল। যথা সময়ে হেমন্ত কুমার দাস কোম্পানীর নিকট টাকার দাবী করে। কিন্তু কোম্পানী তাহা দিতে আপত্তি করায়, হেমন্তকুমার দাস হাইকোর্টে আবেদন করেন। মিঃ জাষ্টিস্ লর্ড উইলিয়মের এজলাসে মামলার বিচার হয়।

বিবাদীপক্ষ বীমার টাকা দিবার বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, বীমাপত্র গ্রহণের সময় সর্ত্ত ছিল, বীমাকারীর বয়স অনধিক ষাট বৎসর প্রমাণিত না হইলে বীমাপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। এসম্বন্ধে জানা গিয়াছে বীমাকারীর বয়স ৬৭ হইতে ৭০ বৎসরের মধ্যে ছিল। এতদ্ব্যতীত বীমার প্রস্তাবপত্রে বীমাকারীর স্বাস্থ্যের পূর্ব্ব অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও মিথ্যাপূর্ণ ছিল।

বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, বিবাদীপক্ষ তাঁহাদের যুক্তির স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ দেখাইতে পারে নাই। সেই জন্য তিনি খরচা সহ মামলা ডিক্রী দিয়াছেন।

বরিশালের জনৈক উকীল ও বম্বে মিউচুয়্যাল লাইফ য়্যাসুর‍্যান্স্ সোসাইটীর বরিশালস্থ এজেণ্ট সহ চারিজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১৯ ও ৫১১ ধারামতে এক মামলা দায়ের হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, কৃষ্ণদাস নামক এক ব্যক্তি উক্ত উকীলের বাড়ীতে অবস্থান কালে নিজেকে বাউফল নিবাসী নিশিকান্তদাস নামে মিথ্যা পরিচিত করিয়া বম্বে মিউচুয়্যালে ১০ হাজার টাকার জীবন বীমা করে এবং দুই কিস্তিতে প্রিমিয়ামের টাকা জমা দেয়। উকীল তাহাকে নিজের বন্ধু বলিয়া বীমার কাগজপত্রে লিখিয়াছেন। বরিশালের পুলিশ সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট্ কোতোয়ালীর দারোগাকে ঘটনার তদন্ত করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ্-সীট্ দাখিল হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শিশির কুমার কর নর্দ্দান্ ইণ্ডিয়া ইন্‌সুর‍্যান্স্ কোম্পানীর বাংলা বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ্ এজেণ্ট্ নিযুক্ত হইয়া

ছিলেন। ১৯৩৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী কোম্পানী তাঁহাকে বিনা নোটিসে বরখাস্ত করেন। ইহাতে শিশির বাবু কোম্পানীর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা আনেন। মিঃ জাষ্টিস্ প্যাংক্রিজের এজলাসে মামলার বিচার হয়। কোম্পানী চার্জ্জ্ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে শিশির বাবু একবৎসরে তিনলক্ষ টাকার বীমা সংগ্রহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা পারেন নাই; বিচারপতি কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলার ডিক্রী দেন। রায়ে তিনি বলেন "বাদীকে অন্যায়রূপে ডিস্‌মিস্ করা হইয়াছে। তাঁহার পাওনা ন্যায্য কমিশন এবং একটা স্পেশ্যাল ড্যামেজ্ বা বিশেষ ক্ষতিপূরণ কোম্পানীকে দিতে হইবে। শিশির বাবু কোম্পানীর উপর মানহানির দরুণ দাবীও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই।

জেনারেল য়্যাক্সিডেন্ট্ ফায়ার য়্যাণ্ড্ লাইফ্ য়্যাস্যুর্যান্স্ করপোরেশন তাঁহাদের চীফ্ এজেন্ট্‌স্ ইষ্টার্ণ জাপান ট্রেডিং কোম্পানীর মারফত এইচ্ এন্ সাহার বিরুদ্ধে তাঁহার মোটর গাড়ী বীমার প্রিমিয়াম আদায়ের জন্য কলিকাতার ছোট আদালতে নালিশ করেন। মামলায় খরচা সমেত ডিক্রী হয়। বিচারক মিঃ এস্ সি সরকার রায়ে বলেন, আসামীর রিনিউয়্যালের দরখাস্ত কোম্পানী যখন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নোটীশ দিয়াছেন তখন চুক্তিনামা পূর্ণ হইয়াছে ধরিতে হইবে। সুতরাং আসামী প্রিমিয়াম দিতে বাধ্য।

ইউনিক য়্যাস্যুর্যান্স্ কোম্পানী তাঁহাদের অর্গ্যানাইজার বীরেন্দ্রকুমার সেনের বিরুদ্ধে ৩৭৯১ টাকার দাবীতে হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছেন। মিঃ জষ্টিস্ ম্যাক্‌নেয়ারের এজ্‌লাসে মামলার বিচার হয়। আসামী আত্মপক্ষ সমর্থন করে নাই। সুদ ও খরচা সমেত মামলা ডিক্রী হইয়াছে।

বীমা জগৎ

প্যালেডিয়াম য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর আফিস ৮নং ড্যালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় উঠিয়া আসিয়াছে।

* * *

ইংলণ্ডের ভারতীয় অধিবাসিগণ ১১নং রাসেল ষ্ট্রীট, কেনসিংটন (লণ্ডন) জোরোয়াষ্ট্রীয়ান হাউসে এক সভায় সমবেত হইয়া পরলোকগত স্যার সোরাব্জী পোচখানাওয়ালার প্রতি সমান প্রদর্শন করেন। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর ও বোম্বাই মিল্‌ওনার্স য়্যাসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট স্যার হরমুস্‌জী মোডী উক্ত সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন।

* * *

শুনাযাইতেছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট কণ্ট্রোলার অব-কারেন্সীর পদ তুলিয়া দিবার মতলব করিয়াছেন। মিঃ জে ডবলু কেলী এখন ঐ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি আগামী অক্টোবর মাসে কার্য্য পরিত্যাগ করিলে আর ঐ পদে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবেনা। কণ্ট্রোলার-অব-কারেন্সীর অধিকাংশ কাযই এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে গিয়াছে। সেই জন্যই ঐপদ তুলিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কণ্ট্রোলার-অব-কারেন্সীর আফিসে যাঁহারা চাকুরী করেন, তাঁহাদিগকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্টে চাকুরী দেওয়া হইবে।

* * *

মেসার্স দাস এণ্ড কোং অল্‌-ইণ্ডিয়া-মিউচুয়্যাল য়্যাসুর‍্যান্স করপোরেশনের চীফ এজেণ্টস্ ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদের স্থলে মেসার্স ইণ্টার ন্যাশন্যাল এজেন্সী উক্ত কোম্পানীর চীফ এজেণ্টস্ হইয়াছেন।

* * *

গত ১৮ই জুলাই জার্ম্মাণীর অন্তর্গত মিউনিক সহরে হের হিটলার নিউ আর্ট প্যালেসের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে পৌরহিত্য করেন। তদুপলক্ষে মিউনিক রি-ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর আহ্বানে মিঃ অখিল চন্দ্র দত্ত এবং তাঁহার পুত্র শ্রীযুত নেপাল চন্দ্র দত্ত হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সুর‍্যান্স সোসাইটীর পক্ষ হইতে তথায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন। মিঃ অখিল চন্দ্র দত্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ডিপুটী প্রেসিডেণ্ট এবং হিন্দুস্থানের একজন ডিরেক্টর। শ্রীযুত নেপাল চন্দ্র দত্ত হিন্দুস্থানের একজন কর্ম্মচারী। উক্ত উৎসবে এই দুইজন ব্যতীত আর কোন ভারতীয় লোক উপস্থিত ছিলেন না। ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার ২৭টী দেশের ৩০০ প্রতিনিধি এই উৎসবে যোগদান করেন।

* * *

মিঃ কে কে নন্দী ভারত ইন্‌সুর‍্যান্সের আসানসোল ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে ইন্‌সুর‍্যান্স এণ্ড ফাইনান্স রিভিউ কাগজের সম্পাদক ছিলেন। মিঃ নন্দী কার্য্যভার লইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই কোম্পানীর কারবার বাড়াইয়াছেন।

* * *

১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় চিটাগং লোন্ কোম্পানীর একটি ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে। এজন্য উহার সুযোগ্য

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ সতীশ চন্দ্র নাগ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

মেসার্স কে ডি মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লক্ষ্ণৌয়ের অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড য্যাস্যুর্যান্স কোম্পানীর বাংলা বিহার উড়িষ্যার জন্য চীফ এজেণ্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর এবং মেসার্স কর মেটা কোম্পানীর প্রধান অংশীদার সুপ্রসিদ্ধ সলিসিটর মিঃ পি সি কর এম্ এ, গত ২রা আগষ্ট পরলোক গমন করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম ওরিয়েণ্ট্যাল লাইফ অফিসের ম্যানেজার মিঃ এইচ ই জোন্স্ এফ্ এফ্ এ, এ, আই এ, ফার্লো ছুটী লইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ জি ডি সাদারল্যাণ্ড এক্ষণে অস্থায়ীভাবে ম্যানেজারের কার্য্য করিতেছেন।

মিঃ এ এন্ গুপ্ত গার্জ্জিয়ান অব্ ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা আপিশের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে এণ্ড্রু ইউল এবং য্যালায়ান্স এণ্ড ষ্টুট গার্টারে কার্য্য করিতেন।

সিলেক্ট কমিটীতে ইনসিওরেন্স বিল্ সম্বন্ধীয় আলোচনায় স্থির হইয়াছে, যে সকল কোম্পানী জীবন বীমার কারবার করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রথম ৫০ হাজার টাকা ডিপজিট দিতে হইবে। তারপর ৬টী বার্ষিক কিস্তিতে ২৫০০০ টাকা করিয়া দেড় লক্ষ টাকা দিতে হইবে। এইরূপে মোট দুই লক্ষ টাকা ডিপজিট পূর্ণ করা চাই।

সিলেক্ট কমিটীতে ইন্স্যুর্যান্স বিল সম্বন্ধীয় আলোচনায় ইহাও স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমান ম্যানেজিং এজেন্সী পদ্ধতি আরও দশবৎসর যাবৎ চলিবে, তারপর ইহা তুলিয়া দেওয়া হইবে। ম্যানেজিং এজেণ্টগণ মাসিক দুই হাজার টাকার অধিক বেতন লইতে পারিবেন না।

ভারত ইন্স্যুর্যান্সের কলিকাতা ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী মিঃ অশোক চাটার্জ্জি বি এ (ক্যাণ্টাব্) "সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব" সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা দিবার জন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর এই সম্মানে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

আমরা অবগত হইলাম, ১১৩নং হ্যারিসন রোডের মিঃ রামচন্দ্র বর্ম্মা, স্বদেশী বীমা কোম্পানীর চীফ এজেন্সীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমায় কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের একটী ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে। গত ৩১ শে মে হইতে ইহার কার্য্য চলিতেছে। এই উপলক্ষে ব্যাঙ্কের

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ এস্ বি দত্ত এবং মিঃ কামিনী কুমার দত্ত এম্ এল সি প্রভৃতি তথায় যাইয়া এক জনসভায় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

গত ১লা জুন হইতে ইষ্টার্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেডের আফিস ৩৫৭ বি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে ১—১ এ মিশন রো কলিকাতা এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

বাখরগঞ্জ ইন্সুর্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কলিকাতা ব্রাঞ্চ আফিস ১৫ নং ক্লাইভ রো হইতে ২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট্ কংগ্রেসের নিকট আমেরিকার সম্প্রতি এক অভিনব বীমার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, অজন্মার হাহাকারের প্রতিরোধ-কল্পে শস্য-বীমার ব্যবস্থার জন্য আইন প্রণয়ন করা উচিত। যে বৎসরের জন্য বীমা করা থাকবে, সেই বৎসর যদি অজন্মা হয় ত চাষীদের স্বাভাবিক অবস্থায় যে শস্য উৎপাদিত হয় তার ¾ ভাগ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

উক্ত প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার মানসে রুজ-ভেল্ট্ বলিয়াছেন যে, আপাততঃ ১৯৩৮ সালের জন্য গম শস্যের প্রতি উক্ত বীমা-ব্যবস্থা প্রযুক্ত হউক এবং ঐ ব্যবস্থা যদি সাফল্য মণ্ডিত হয় তবে অপরাপর শস্যের প্রতিও অনুরূপ বীমা ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারিবে।

কলিকাতার ১০, ক্লাইভ রো-স্থিত ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড, প্রমিসরি নোট সংক্রান্ত টাকার দাবীর জন্য কলিকাতার ২৩-এ শশীভূষণ দে ষ্ট্রীটস্থ টেপার জমিদার শ্রীযুক্ত নলিনী মোহন রায়ের বিরুদ্ধে আসল ও সুদ সমেত ৩,৯৮৬ টাকা দশ আনা তিন পাইয়ের জন্য নালিশ করিয়াছিলেন। বিচারপতি মিঃ ম্যাক্‌নেয়ার বাদী কোম্পানীর অনুকূলে খরচা সমেত ডিক্রি দিয়াছেন।

পূজার বাজারে স্বদেশী জিনিসের প্রাপ্তিস্থান এবং ডাইরেক্টরী

পূজার বাজার করিতে আসিয়া কোথায় খাঁটী স্বদেশী জিনিষ পাওয়া যাইবে তাহার একটী বিস্তৃত তালিকা আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম। এই তালিকা প্রস্তুতের সময় সর্ব্বাগ্রে আমরা বাংলার জিনিষের নাম ঠিকানা দিয়াছি। তাহার পর প্রয়োজন বুঝিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কারখানার নামধামাদি দিয়াছি। যেখানে প্রয়োজন বোধ করি নাই, সেখানে অন্যান্য প্রাদেশিক জিনিসের নামধামাদি দেই নাই।

খদ্দর

১। নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ

কলেজষ্ট্রীট মার্কেট্

[কুমিল্লা, ফেণী, মুন্সীর হাট, বরকান্তা, দুর্গাপুর, ঢাকা ও আবুতোরাপ—এই সকল জায়গায় খদ্দর প্রস্তুত হয়]

বিক্রয়ের কেন্দ্র—কলিকাতা ছাড়া—কুমিল্লা ফরিদপুর, মেদিনীপুর, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, বাঁকুড়া, নারায়ণ গঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুর, আগরতলা।

২। খাদি প্রতিষ্ঠান। সোদপুর, ২৪ পরগণা

(কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা)

[ফেণী, দুর্গাপুর, কুন্দরহাট, মহাজনহাট, এই সকল জায়গায় খদ্দর উৎপন্ন হয়।]

বিক্রয়ের কেন্দ্র ঃ—কলিকাতা ছাড়া, আত্রাই, ভবানীপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর, রতনগঞ্জ, সোদপুর ও তেজপুর।

৩। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ। কলেজষ্ট্রীট মার্কেট্—

৪। নদীয়া খাদি-মন্দির—কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট্

৫। লোহাগড়া খাদি বোর্ড ; লোহাগড়া—

৬। রাণীগঞ্জ খদ্দর ভাণ্ডার। রাণীগঞ্জ

৭। শিল্পাশ্রম (গয়ঘর, ফরিদপুর) কলেজষ্ট্রীট্ মার্কেট্

৮। খাদি মণ্ডল-ই-৭৫ কলেজ ষ্ট্রীট্

৯। বিদ্যাশ্রম } কলেজষ্ট্রীট্ মার্কেট্
১০। বেঙ্গল খাদি ভাণ্ডার }

১১। দক্ষিণ খাদি ভাণ্ডার
৪ রসা রোড্

বাংলার কটন মিল

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্স্ লিঃ
২৮ পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন্ মিল্স্ লিমিটেড
মিল —আন্দুল-মৌরী (হাওড়া)
কলিকাতা আফিস—১২০নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীট

ঢাকেশ্বরী কটন মিল্স্, ঢাকা

লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস্, ঢাকা

মোহিনী মিলস্, কুষ্টিয়া নদীয়া

মহালক্ষ্মী কটন মিল
১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্
১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, পাণিহাটি ২৪ পরঃ
কলিকাতাস্থ আপিস—লায়ন্স রেঞ্জ

বাগের হাট-কো-অপারেটিভ্ মিলস্ লিঃ,
বাগেরহাট, খুলনা।

এই কয়েকটী প্রচলিত বাংলার মিল বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত।

নিম্নে বাঙ্গালীদের দ্বারা স্থাপিত কয়েকটি মিলের নাম ঠিকানা দেওয়া গেল ইহাদের কাজ এখনও আরম্ভ না হইয়া থাকিলে শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কটন মিলস্, খুলনা,

বঙ্গশ্রী কটন মিল, সোদপুর

বঙ্গোদয় কটন মিল, শ্রীরামপুর

দেশপ্রিয় কটন মিলস্, চট্টগ্রাম।

চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্' লিঃ নারায়ণগঞ্জ,
১৪-১৫ পটুয়াটুলী ষ্ট্রীট ঢাকা।

অবাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত বাংলার কয়েকটী মিলের নামও এখানে দেওয়া গেল ঃ—

ভারত অভ্যুদয় কটন মিলস্, হাওড়া।

বাউরিয়া কটন মিলস্ কোঃ লিঃ
২১নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

ডান্‌বার মিলস্ লিঃ, শ্যামনগর ২৪ পরগণা।

কেশোরাম কটন মিলস্, গার্ডেন রীচ। কলিঃ

রামপুরিয়া কটন মিলস্ কোঃ
শ্রীরামপুর, মহেশ, ই-আই আর।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ কটন মিলস্, বেলুড়

ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ ; সালকিয়া

ইয়ং ইণ্ডিয়া কটন মিলস্ লিমিটেড,
২৬, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

বাংলার মিলের বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ

কমলালয়—কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট

কাত্যায়নী ষ্টোর্স ঐ

বৈকুণ্ঠনাথ গুঁই ঐ

পল এণ্ড কোং ঐ

জহরলাল পান্নালাল ঐ

ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর্স, কলেজ ষ্ট্রীট

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী ঐ

রাজলক্ষ্মী বস্ত্রালয় ঐ

বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রাগার ঐ
তারা ষ্টোর্স ঐ
ফ্রেণ্ড সোসাইটী
চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং
১৫৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
নর্থ বেঙ্গল ক্লথ সোসাইটী
৩ নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট
এ, বর্ম্মণ এণ্ড কোং বহুবাজার, কলিঃ
ভারত বস্ত্রালয়, ঐ
বান্ধব বস্ত্রালয় ঐ

আর্য্য বস্ত্রালয় ঐ
শান্তিপুর বস্ত্রালয় হ্যারিসন রোড
কেশোরামের নিজস্ব দোকান
(১) ১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
(২) ১৬৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট
(৩) ৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড
মহালক্ষ্মী কটন মিলের দোকান
২২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
শীতলা বস্ত্রালয় ২০৮।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

রেশমী কাপড় ও পোষাক বিক্রেতা

সিল্ক হোম ৫৬নং কলেজ ষ্ট্রীট
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস ২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
মুর্শিদাবাদ সিল্ক ষ্টোর্স
৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
বেঙ্গল হোম ইণ্ডাষ্ট্রিস্ এসোসিয়েসন
৩এ, হগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কো-অপারেটিভ ডিপো
৪৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
ইণ্ডিয়ান সিল্ক ষ্টোরস্,, বহুবাজার ষ্ট্রীট
সিল্ক ভাণ্ডার—৮নং কর্ণওয়লিস ষ্ট্রীট
ইণ্ডিয়ান সিল্ক ডিপো—

কলিকাতার এই কয়েকটী ব্যবসায়ী ছাড়াও মফঃস্বলের বিশেষতঃ রেশমের কেন্দ্রের কয়েকটী ব্যবসায়ীর নাম এখানে দিলাম ঃ—

বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সিল্ক ইউনিয়ান লিঃ, মালদহ।
ডি, এস্ ভট্টাচাৰ্য্য এণ্ড সন্স, বহরমপুর, মুর্শিদাবদ
কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী, খাগরা বাজার
পিত্তর সিল্ক ক্লথ ভাণ্ডার, বিষ্ণুপুর, জিলা বাঁকুড়া
শ্রীআজাদ সিল্ক কটেজ, বিষ্ণুপুর, জিলা বাঁকুড়া।

গেঞ্জী, মোজা প্রভৃতি

কলিকাতা হোসীয়ারী
২৮ নং পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এন, বোসের বেলেঘাটা হোসিয়ারী
১নং ক্যানেল ইষ্ট বাই লেন, কলিকাতা
খিদিরপুর হোসিয়ারী
২নং আশুবাবু লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা
টালীগঞ্জ হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
২৮, রসা রোড, কলিকাতা
কোহিনুর হোসিয়ারী, ২৩নং রসারোড, কলিকাতা
কালীঘাট হোসিয়ারী, ২১।৩, লেক রোড, কলিঃ
পার্‌ফ্লোয়ার্ হোসিয়ারী
২৪।৫ বেনারস্ রোড, হাওড়া
পাবনা শিল্প-সঞ্জীবনী, পাবনা
ক্রাউন হোসিয়ারী ৩৮এ, জয় মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ডি, এন, বসু এণ্ড কোং
২৪।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ
পাবনা লক্ষ্মী, পাবনা.

সাবান—

ন্যাশন্যাল্ সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস
৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা
পারিজাত সোপ ওয়ার্কস্
১, পর্ত্তুগীজ চার্চ্চ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ইন্‌ম্যান এণ্ড কোং পোঃ বক্স নং ৮৯৮৩ কলিকাতা
কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্, ২৯নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড
ক্যাল্‌সো পার্ক, বালীগঞ্জ
যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস, ২৯নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিঃ
হিমানী সোপ ওয়ার্কস
কারখানা—৫৯, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা
মডেল সোপ কোং
৫৫।৮ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্
২৮, পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শিশির সোপ ওয়ার্কস যশোর রোড, কলিকাতা
বেঙ্গল কেমিক্যাল
৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা
কলিকাতা কেমিক্যাল কোং লিঃ,
কারখানা :—পণ্ডিতিয়া রোড, বালীগঞ্জ
টাউন অফিস :—খোংরাপটি, কলিকাতা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ল্যাড্কো সোপ
কাশীপুর কলিকাতা

মহীশূর সোপ ওয়ার্কস্—১১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিঃ

গড্রেজ্ সোপ—
প্রাপ্তিস্থান :—মাড়োয়ারী ষ্টোর্স লিঃ

উপরে যে কয়েকটি নাম দেওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই নানাবিধ প্রসাধনের সাবান প্রস্তুত করে। ইহাদের মধ্যে মীরা, হিমানী, ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস্, যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস্, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, ও কলাপী সোপ ফ্যাক্টরী ১৫, ট্যাংরা রোড, কলিকাতা—এই কোম্পানীগুলির নিকট দাড়ি কামাইবার সাবানও পাওয়া যায়।

ঔষধ জাতীয় সাবান নিম্নলিখিত কোম্পানী সমূহপ্রস্তুত করে :—

লিষ্টার এন্টিসেপ্টিক এণ্ড ড্রেসিংস্ কোং, কাশীপুর ক্যালকাটা কেমিক্যাল কো°
পণ্ডিতিয়া রোড, বালীগঞ্জ

সাবানের মালমসলা বিক্রেতা

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
১নং জ্যাক্সন্ রোড, কলিকাতা

মেসার্স ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং
৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

সুগন্ধি তৈল

ইণ্ডিয়া বোকে—ধর ব্রাদার্স,
৮২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

কুন্তাল নারিকেল—বিহার মিসেলেনী
২ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা

ক্যান্থারাইডিন—বেঙ্গল কেমিক্যাল, কলিকাতা

জবাকুসুম—সি, কে, সেন এণ্ড কোং
২৯নং কলুটোলা, কলিকাতা

কুন্তলীন—এইচ, বোস,
৫২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লক্ষ্মীবিলাস—এম, এল, বোস, গড়পার অথবা
১২২ ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কাঁচা তিল তৈল—জি, ঘোষ,
২০ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

নব কুন্তল—বেঙ্গল মিসেলেনী,
১৭৪ মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা

নিরুপমা—হিমানী,
৫৯ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা

"রেডক্রস" ক্যাষ্টার অয়েল—কলিকাতা

রেডিয়াম তৈল—বসাক ফ্যাক্টরী

কেশরঞ্জন—এন, এন, সেন, এণ্ড কোং
১৯, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ক্যাষ্ট্রল—কলিকাতা কেমিক্যাল কোম্পানী,
পণ্ডিতিয়া রোড, বালিগঞ্জ

সুষমা—পি, সেট,
৩ রামকান্ত ধর লেন, কলিকাতা

এসেন্স—

অগুরু—বেঙ্গল কেমিক্যাল,
৩১ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা

ইণ্ডিয়া বোকে—ধর ব্রাদার্স
৮২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

হিমানী—হিমানী ওয়ার্কস্;
বেলগাছিয়া, কলিকাতা

শেফালী—শ্রীনাথ কেমিক্যাল,
২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

পি, এম, বাগচী, কলিকাতা

টেক্‌নলজিক্যাল ওয়ার্কস্,

৮৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

চিরুণী

সুপ্রসিদ্ধ কিরণ প্রডাক্টস্ এর নির্ম্মাতা

যশোহর কুম্ব এণ্ড সেলুলয়েড ওয়ার্কস্, যশোহর

যশোহর কুম্ব ফ্যাক্টরী, যশোহর

কলিকাতা হর্ণ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং

১৮ আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা

বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কটেজ—

৪০ কাপুড়িয়া নগর রোড,—ফরিদাবাদ, ঢাকা

ভারত লক্ষ্মী কোং লিঃ

১৩, কাগজীতলা, ঢাকা—

ক্যালকাটা সেলুলয়েড্ ওয়ার্কস্

৪৫।২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্

ইষ্টার্ণ স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীস্ লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

ইণ্ডিয়া সেলুলয়েড ওয়ার্কস্ লিঃ

৪-৫ ডালহোসী স্কোয়ার, ষ্টীফেন্ হাউস, কলিঃ

ফেস্ পাউডার

বেঙ্গল কেমিক্যাল—

৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা

মায়া ফেস্ পাউডার—

মায়া প্রডাক্টস্ নেবুতলা রো

রেণুকা—কলিকাতা কেমিক্যাল কোং

নার্শারী—ডাঃ বসুর লেবরেটরী

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাস্

বেঙ্গল ব্রাস ফ্যাক্টরী

১, নবীন ঘোষাল রোড, বালিগঞ্জ

কলিকাতা হর্ণ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং

১৮নং আনন্দ পালিত লেন, কলিকাতা

বি, দত্ত ব্রাদার্স ৬২ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্।

ক্যালিডোনিয়ান্ ব্রাস ওয়ার্কস্

৬৯।১ এফ্ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট

দত্ত এণ্ড কোং-১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট

ক্লাইম্যাক্স্ ব্রাস ওয়ার্কস্ ১২৩।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

টুথ ব্রাস্

যশোহর কুম্ব এণ্ড সেলুলয়েড্ ওয়ার্কস্ যশোহর

ক্যাল্‌কাটা হর্ণ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং

১৮, আনন্দ পালিত রোড, ইটালী, কলিঃ

দাঁতের মাজন ও পেষ্ট

বেঙ্গল কেমিক্যাল—

৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা

রদফেন, অবন্তী, এন্টিসেপ্‌টীক, কার্ব্বলিক্ ইত্যাদি

কলিডোণ্ট পেষ্ট, ইন্‌ম্যান এণ্ড কোঃ

পোঃ বঃ নং ৮৯৮৫ কলিকাতা

সুরভী ও কলোডিনা—বিহার মিসেলেনী

২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

নিম টুথ পেষ্ট, কলিকাতা কেমিক্যাল্

৬৫।১ পণ্ডিতিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলিঃ

ব্যাক্টো্‌ক্লিনিক্যাল্ লেবরেটরি—

৬৩।৩ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিঃ

মায়া প্রডাক্টস্—১০।১এ নেবুতলা রো

মায়া টুথ পাউডার

কুন্দ টুথ পেষ্ট—ষ্টারলিং পারফিউমারী ওয়ার্কস্

৭২।২, শম্ভুনাথ পণ্ডিত রোড, কলিকাতা

চুলের কাঁটা

যশোহর কুম্ব ও সেলুলয়েড ওয়ার্কস্, যশোহর।

"ব্যাণ্ডোস" হেয়ার পিন,

বঙ্গীয় শিল্প ভাণ্ডার, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

সিন্দুর

মায়া সুবাসিত সিন্দুর, মায়া প্রডাক্টস্,
১১।১এ, নেবুতলা রো, কলিকাতা।

সিঁথির সিন্দুর—ভারত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কস্,
১২৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বি দত্ত এণ্ড কোং, মাধব পাশা, বরিশাল

বেঙ্গল কেপিট্যাল ওয়ার্কস্—
২১, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড্

ইণ্ডিয়ান ভার্মিলিয়ন ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং
৪৬-ই বোসপাড়া লেন

মুখার্জ্জী এণ্ড কোং
২১১, হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট বাগবাজার,

সেফ্টিপিন

নবদুর্গা শিল্প বিদ্যালয়, বেহালা।

বার্লী

কে, সি, বসু এণ্ড কোং, কালাচাঁদ সান্যাল লেন

এন্, সি, মণ্ডল এণ্ড সন্স, ২ অক্ষয় দত্ত লেন

বেঙ্গল বার্লি, ৩৩৪ অপার চিৎপুর রোড

অমূল্যধন পাল এণ্ড কোং
১১৩ খেঙ্গরাপটী ষ্ট্রীট, কলিঃ (।সটী)

রবিন্‌সন্‌স্ পেটেণ্ট বার্লী

লিলি বিস্কুট কোম্পানী—
৩নং রামকান্ত সেন ষ্ট্রীট, উল্টাডাঙ্গা

বিস্কুট—

দি লিলি বিস্কুট কোং কলিকাতা
বোম্বে—বিস্কুট কোং ৯৯।৯ ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিঃ
কে, সি, বসু, ২ কালাচাঁদ সান্যাল লেন
দি বেঙ্গল বিস্কুট ফ্যাক্টরী লিঃ
২ বি বাগমারী লেন, কলিঃ
আর্য্য কনফেক্‌সনারী, ১০।১৶চক্রবেড়ে রোড,
ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোং, বীরপাড়া ফাষ্ট লেন দমদম
অথবা, ৫, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিঃ
ক্যালকাটা ক্রাউন বিস্কুট কোং
৯৯।৩ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ
পি শেঠ এণ্ড কোং, ৩, রামকান্ত সেন লেন

লজেঞ্জস্

শেট ব্রাদার্স, ৭৮।৭৯ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গোপাল চন্দ্র মণ্ডল, ৯১।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিঃ
দি ফাইন কনফেক্‌সনারী ওয়ার্কস্
১৭০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ
দাস সামন্ত এণ্ড কোং, ১১৯সি গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ভারত কন্‌ফেক্‌সনারী ওয়ার্কস্
১৯ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা
দি বেঙ্গল কন্‌ফেক্‌সনারী ওয়ার্কস্
১৭০নং ফর্ডাইস্ লেন, কলিকাতা
বেঙ্গল কন্‌ফেক্‌সনারী কোং
৯৯।৩ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কণ্ডেন্সড্ মিল্ক

এ, সি রায়, কলিকাতা।
ভারত লক্ষ্মী ৩১।১ বলরাম দে ষ্ট্রীট
সইন দাস এণ্ড কোং, ৩৪ কলেজ ষ্ট্রীট,

কালী

দি বেঙ্গল ট্রেডিং কোং, ১৩২-১, ক্যানিং ষ্ট্রীট,
('সূর্য্য' মার্কা)
বেঙ্গল মিস্‌লেনী লিঃ,
১৭৪, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা
কেমিক্যাল এসোসিয়েশন, ৫৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট
পি-এম্ বাগচী এণ্ড কোং ১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
জে, বি, দত্ত—১, রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা

ইঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই ফাউণ্টেন পেনের কালিও প্রস্তুত করেন। ইহা ছাড়াও কয়েকটি ফাউণ্টেন পেনের কালী প্রস্তুত কারকের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—

কেমিক্যাল এসোসিয়েশনের "কাজল কালী"
বেঙ্গল মিস্‌লেনীর
দি বিহার মিসেলেনী, ২, কলেজ স্কোয়ার
(ঈগল" কালী)
দি বেঙ্গল ট্রেডিং কোং ১৩২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট
("সূর্য্য" মার্কা)
জে, বি, দত্ত
ধর ব্রাদার্স ৮২, হ্যারিসন রোড
("রুবি" মার্কা)
এ, বোস, ৯৯ বি গড়পাড় রোড
("কোয়েল কালা মার্কা)
এ্যাডভান্স কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ ১১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কাপড়ে দাগ দিবার—

বেঙ্গল মিসেলেনী লিঃ
এন আর প্যাটেল, ২৫, রবার্ট ষ্ট্রীট

রবার ষ্ট্যাম্পের—

দি বেঙ্গল ট্রেডিং কোং, ১৩২, ক্যানিং ষ্ট্রীট
দি বেঙ্গল মিসেলেনী, ১৭৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট

জুতার কালি—

শ্রীনাথ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ (কুমীর মার্কা)
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত

বেঙ্গল মিসেলেনী,

১৭৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

('কোকিল' ও 'ব্লঙ্কো' মার্কা)

কলিকাতা কেমিক্যাল কোং লিঃ

পণ্ডিতিয়া রোড, বালীগঞ্জ

('চিতা' মার্কা)

মায়া বুটক্রীম, মায়া প্রডাক্টস্

১, রামহরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লাষ্টার বুট পলিশ, বঙ্গীয় শিল্প সদন,

৮১ হরিশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

বেঙ্গল প্রোডাক্টস্

('মুচি' পালিশ ও ক্রীম)

২৭, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা

কেমিক্যাল এসোসিয়েশন,

('ক্রাউন' ক্রিম, 'ক্রাউন হোয়াইট')

৫৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

('পাতুকা')

আর্য্য কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

নীহার পারফিউমারী, পোঃ বক্স ৭৮৭৩, কলিকাতা

কোয়ালিটী ড্রাগ কোং ৪৪, ওল্ড বালীগঞ্জ ফার্ষ্ট লেন

('ঝিকমিক' মার্কা)

ষ্টার প্রোডাক্টস্ কোং ৭৪, বাণ্ডেল রোড, কলিঃ

('ষ্টার' মার্কা)

ওয়াটার লিলি কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

১৪৯-২, বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা

('পদ্মা' ও ব্লঙ্কো মার্কা)

জুতার ফিতা

জি, বি, ঘোষ এণ্ড কোং

ফরাসগঞ্জ ব্রেইড ফ্যাক্টরী

৪৩, মালাদারতলা, ঢাকা

কাগজ

টিটাগড় পেপার মিল্স্ লিঃ কলিকাতা

কলম

হোল্ডার—

ক্যালকাটা হর্ণ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী

১৮, আনন্দ পালিত রোড

জি-সি-লাহা এণ্ড কোং ৩৩, ক্যানাল ইষ্ট রোড

এফ্. এন্ গুপ্ত এণ্ড কোং ১৩, বেলেঘাটা রোড

ফাউণ্টেন পেন

এফ্. এন্ গুপ্ত ;

জি-সি-লাহা ;

নীলমণি দত্ত এণ্ড কোং, ৮০।৩ হ্যারিসন রোড

পেন্সিল

এফ্. এন্ গুপ্ত—

নিব্

সি এম্ কর্ম্মকার কোং, কুমিল্লা

এফ্. এন্ গুপ্ত,

জি-সি-লাহা

ওরিয়েণ্ট লিমিটেড্, ২৯, বলাই সিংহি লেন

ছুরি কাঁচি

প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী, কাঞ্চননগর, বর্দ্ধমান

এম্, এন্, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ঢাকা

পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির, বেলগাছিয়া

খান এণ্ড কোং, ১।২ হরিতকী বাগান লেন, কলি

বেঙ্গল কাট্লারীস্—১৫।১, হ্যারিসন রোড

পাইওনীয়ার কাট্লারী ওয়ার্কস্

৬এ বেলগাছিয়া রোড

এস্ মহম্মদ হাসান এণ্ড সন্স্ ১৭০ হ্যারিসন রোড

বোতাম

ইষ্টার্ণ স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিস্, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা
ভিক্টোরিয়া বাটন্ ম্যানু কোং, নারিন্দা ঢাকা
ক্যালকাটা বাটন্ ওয়ার্কস্
৩৯নং ইণ্টালী রোড, কলিকাতা
ক্যালকাটা হর্ণ ম্যানু কোং
১৮নং আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা
যশোর কুম্ব্ ও বাটন ফ্যাক্টরী
২০।১, লাল বাজার ষ্ট্রীট কলিঃ

গুলিসুতা ইত্যাদি

ভারত ট্রেডিং কোং, ২২, সুকিয়া লেন কলিঃ
চিত্তরঞ্জন ক্রুশে ম্যানু কোং
মাণিকতলা, কলিকাতা
সিবনী, ৭৩নং মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গঁদ

'লাইকোলা, বেঙ্গল পেষ্ট কোং,
২০ ডিহি ইটালী রোড কলিকাতা
এস্, জি, আর ব্রাদার্স,
১৩ বাই সিংহ লেন, কলিকাতা

পেষ্টবোর্ড

কুবের লিমিটেড, ৮৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দিয়াশলাই

বঙ্গীয় দিয়াশলাই কার্য্যালয়
৭৬, যশোহর রোড কলিঃ
পাইওনীয়ার ম্যাচ ফ্যাক্টরী, ১৬ দমদম রোড
ঈষাভী ম্যাচ্ ম্যানুফ্যাক্‌চারীং কোং
৪৬, মুরারীপুকুর রোড, কলিঃ
করিম ভাই ম্যাচ ফ্যাক্টরী
৩২, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড, কলিঃ
রামপুরিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরী
৩৩, বেলগাছিয়া রোড, কলিঃ
হায়দারী ম্যাচ কোং
১৫০এ, বেলেঘাটা মেন রোড
ভাগীরথী ম্যাচ ফ্যাক্টরী
১, যোগেন বসাক রোড, বরাহনগর
উষা ম্যাচ ফ্যাক্টরী—৭, সোয়ালো লেন
পাইওনীয়ার ম্যাচ ফ্যাক্টরী—কুমিল্লা
প্রসন্ন ম্যাচ ফ্যাক্টরী, ৩৩, বেচারাম দেউরী, ঢাকা
জলপাইগুড়ি, ইণ্ডাষ্ট্রি, জলপাইগুড়ি

মাষ্টার্ড—

বেঙ্গল মাষ্টার্ড কোং
১৯৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিঃ

টর্চ ও ব্যাটারী

বেঙ্গল ব্যাটারী ওয়ার্কস্
১৮৫।১, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ
পূর্ণিমা ব্যাটারী—বেলেঘাটা
ড্রাই ব্যাটারী ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং
১০৮, বেলিয়াঘাটা মেন রোড
নিশা প্রডাক্টস্—৭২, গড়পার রোড্
শক্তি ব্যাটারিস্ লিঃ-পি ৫৬ রসারোড কালিঘাট
সানলাইট ব্যাটারী—ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং
২২৬, বৌবাজার ষ্ট্রীট
বেঙ্গল ব্যাটারী ওয়ার্কস্ লিঃ
২, রয়্যাল এক্‌স্‌চেঞ্জ প্লেস্

তাস

মাতৃমন্দির— কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ইণ্ডিয়ান প্লেয়িং কার্ডস কোং, ৫৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট
নিউ পপুলার প্রেস—৫৭, সিমলা ষ্ট্রীট—
জোড়াসাঁকো ষ্টোর, ৩৭০ অপার চিৎপুর রোড

ষ্টোভ

বেঙ্গল কেমিক্যাল, ৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ

শিল্প পীট—

১৯, গোপালদাস ঠাকুর রোড, আলমবাজার

মেটাল পালিশ

ওয়াটার লিলি, ১৪১১২ বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট কলিঃ

মেটকো, এস, বল্লভ

১০, গোবিন্দ পাল লেন, কাশীপুর

এরিয়ান ক্যামিকেল ওয়ার্কস

৩০, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেন, কালিঘাট কলিঃ

কাঁচের দ্রব্যাদি

বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস,

দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, ২৪ পরগণা

হরদেও গ্লাস ওয়ার্কস্, ঢাকা

শিবাজী গ্লাস ওয়ার্কস্—হাওড়া

শ্রীগোবিন্দ গ্লাস ওয়ার্কস্

৯ এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফারত গ্লাস ওয়ার্কস্

১০ দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, ২৪ পরঃ

কলিকাতা গ্লাস এণ্ড সিলিকেট ওয়ার্কস্

৬বি কুণ্ডু লেন, কলিকাতা

এনামেলের বাসন

বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস

১, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট কলিকাতা

স্থর এনামেল ওয়ার্কস্ ৯ মিডল রোড, কলিকাতা

এম্পায়ার এনামেল ওয়ার্কস্, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা

ইম্পিরিয়াল এনামেল ওয়ার্কস্

১০ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা

ক্যালকাটা এনামেল ওয়ার্কস্

১০৮, প্রিন্স আনয়ার সা রোড

অথবা ৭, সোয়ালো লেন কলিঃ

দত্ত এণ্ড কোং, ২৯।২ ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট

এলুমিনিয়ম—

ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কস্

৫৬।১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এলুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং

৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বেঙ্গল এলুমিনিয়াম ওয়ার্কাস লিঃ

রডকাটা, ঢাকা

ক্রাউন এলুমিনিয়ম ওয়ার্কস

৫৫।৩ ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

চীনামাটীর বাসন—

ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং

৭নং সোয়ালো লেন কলিকাতা।

কুঞ্জবিহারী রায়ের পটারী ওয়ার্কাস

উত্তরপাড়া।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্কস

রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান।

বেঙ্গল পটারীস্, ৪৫ টেংরা রোড, কলিকাতা

উত্তর পাড়া পটারী ওয়ার্কস, উত্তরপাড়া হুগলী

বর্ষাতি—

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস

২নং নজরালী লেন, কলিকাতা

কমলালয়, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ন্যাশন্যাল্ ড্রাই ও ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্

৩৯নং রসা রোড, কলিকাতা

সুরেশ হৃষিকেশ দত্ত এণ্ড কোং

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ছাতার কাপড়—

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্

২নং নজরালী লেন, কলিকাতা

ন্যাশনাল্ ডাই এণ্ড ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস

কলিকাতা,

দুগ্ধের শত্রু আলোক, আলোকে দুগ্ধের গুণ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু দুগ্ধ কোন রঙিন বোতলে রাখিলে উহার গুণ নষ্ট হয় না।

* * *

এক চামচ চিনি লইয়া গ্যাসের আগুনে ধরিতে হয়, তাহাতে যদি চিনি একেবারে পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায় তাহা হইলে চিনি খাঁটী বুঝিতে হইবে, কিন্তু যদি তলায় অঙ্গার থাকে তাহা হইলে ভেজাল আছে বুঝিতে হইবে।

* * *

নানারূপ পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেনের সাহায্যে ডিম এক বৎসরকাল সুন্দররূপে রক্ষা করা যায়। ইহার স্বাদ সদ্যজাত ডিম হইতে কোন অংশে ন্যূন হয় না। ডিমের ব্যবসায়ীদিগকে আমরা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

* * *

ডিম খারাপ অথবা টাট্‌কা বুঝিতে হইলে দুই ঠোঁটের মধ্যে ডিমটি চাপিয়া ধরিয়া দেখিতে হয় উহা শীতল বোধ হয় কিনা। যদি শীতল বোধ হয় তাহা হইলে টাট্‌কা, আর যদি ডিমটি ঈষদোষ্ণ মনে হয় তাহা হইলে উহা খারাপ। ইহার আর একটি উপায় আছে;—এক বাটি জলের মধ্যে ডিমটি ছাড়িয়া দিতে হয়, যদি ডিম ডুবিয়া যায় তবে উহা টাট্‌কা, যদি ভাসিয়া থাকে তবে উহা খারাপ বুঝিতে হইবে।

* * *

একটি শিশিতে খানিকটা অলিভ অয়েল ঢালিয়া উহার দশ ভাগের এক ভাগ আন্দাজ এমোনিয়া মিশাইয়া নাড়িলে উহা যদি দুধের মত সাদা হয়—তবে উহা খাঁটি। যদি দেখা যায় উহা চক্রাকৃতি বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে তাহা হইলে উহার সহিত অন্য তৈল মিশ্রিত আছে বুঝিতে হইবে।

* * *

পেট্রোল দিয়া দামী জামা কাপড় পরিষ্কার করিবার পর অনেক সময় গোল গোল দাগ থাকিয়া যায়; যদি পেট্রোলের সহিত একটু লবণ মিশাইয়া লওয়া হয় তাহা হইলে আর ঐরূপ হয় না।

* * *

ময়লা ব্রাস এক বালতি সাবান গোলা গরম জলের মধ্যে বার বার আঘাত করিলে পরিষ্কার

হইয়া যায়, পরে ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

* * *

ঘরে খুটি লাগাইবার পূর্ব্বে উহার গোড়া ১ দিন লবণ মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া রাখিয়া (ডুবাইয়া না রাখিয়া বারংবার জলের পোঁচ দিলেও চলে) পরে তুঁতে ভিজান জল মাখাইয়া লইলে আর উই ধরিবার আশঙ্কা থাকে না। কপাট, জানালাদিও ঐ ভাবে লবণ জল মাখাইয়া পরে ভালরূপে শুকাইয়া ক্রিয়োজোট তৈল দ্বারা প্রলেপ দিলে উই বা ঘুণ ধরিতে পারে না।

উনুনের ছাই

বঙ্গের কোন কবি বলিয়াছেন—

যেখানে দেখিবে ছাই
"উড়াইয়া দ্যাখো তাই,
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন"।

আমরা কবিতা শুনিয়াই নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ইহার যাথার্থ্য অক্ষরে অক্ষরে সপ্রমাণ হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে সামান্য দ্রব্য হইতে যে ভাবে অর্থ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে আমাদের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতার অহঙ্কার খর্ব্ব হইয়া যায়, দর্প চূর্ণ হয়। উনান হইতে যে ছাই ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে কয়লার গুঁড়া, খড়কুটো প্রভৃতি মিশাইয়া জ্বালাইবার ইট প্রস্তুত করিলে না কি তাহার সাহায্যে শীঘ্র উনান ধরানো যায়, খাঁটী কয়লা অপেক্ষা অধিক উত্তাপ পাওয়া যায়, অর্থ ব্যয়ও অল্প হয় এবং ছাইয়ের মত তুচ্ছ জিনিষেরও অপচয় বন্ধ হয়।

* * *

স্মরণ হইতেছে, সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে একজন জার্ম্মাণ এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এই প্রকার ইট প্রস্তুত করিবার জন্য জার্ম্মাণীতে কারখানাও খোলা হইয়াছে। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে, উনান ধরানো সম্বন্ধে এই ভাবে কার্য্য করা যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তাহা বলা যায় না। "গুল" প্রস্তুত করাকে ইহারই আদিমতম আকার বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহা প্রণালীবদ্ধভাবে করিবার ব্যবস্থা না থাকায় আমরা এই অপচয়কে তেমন ব্যাপক ভাবে কাজে লাগাইতে পারিতেছি না।

অপচয়

কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর খাদ্যদ্রব্যের অপচয় সম্বন্ধে এডুকেশন গেজেটে একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন আমাদের দেশে কথায় কথায় খাদ্যদ্রব্যের এত অপচয় হয় যে, বলিয়া শেষ করা যা'য় না।

* * *

ভোজন গৃহে আসন পাতার সঙ্গে সঙ্গে "পাত সাজাইবার" প্রথা আছে, অর্থাৎ ভাত, ব্যঞ্জন যাহা কিছু আহার্য্য প্রস্তুত হয়, সেগুলির প্রত্যেকটিই ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রত্যেক পাতে পূর্ব্ব হইতেই দিয়া রাখা হয়—দেখা হয় না যে, যাহার পাতে যাহা দেওয়া হইতেছে, সে তাহা খায় কিনা কিংবা চায় কি না এবং চাহিলেও কতটুকু চায়। ইহার ফলে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, প্রত্যেকেরই পাতে অভুক্ত বিস্তর দ্রব্য পড়িয়া থাকে। যদি অতি নিম্নশ্রেণীর লোক দাসদাসীর অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে সেই সকল অভুক্ত দ্রব্য তাহাদিগকে নচেৎ গো প্রভৃতি জীবজন্তুকে দেওয়া হয়। তাহারও অভাব হইলে সেগুলি নিকটবর্ত্তী আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকারে, বলিতে গেলে আমাদের বহিশ্চক্ষু বা মনশ্চক্ষু এড়াইলেই বিস্তর খাদ্যদ্রব্যের অপচয় হয়।

ভারতীয় সমাজে বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্মে ও পর্ব্বাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রিতদিগের জন্য এইভাবে পাতা সাজাইবার ফলে যে কত রাশি রাশি খাদ্য-দ্রব্য নষ্ট হয়, স্বচক্ষে তাহা না দেখিলে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না। ইহা অপেক্ষা যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রার্থিত মত ভোজ্য পাতে দেওয়া হয়, তবে অপচয়ের হাত হইতে বোধ হয় অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্যের সুলভতা, সামাজিক প্রথা ও প্রাচুর্য্যই এরূপ অপচয়ের অবসর এবং প্রশ্রয় দিবার প্রধান কারণ।

* * *

পাশ্চাত্য দেশে খাদ্যদ্রব্য এদেশের ন্যায় সস্তা ও প্রচুর নহে এবং সে দেশের লোক যথেষ্ট হিসেবী বলিয়াই তথাকার রীতি আমাদের ঠিক বিপরীত! সেখানে শীতের প্রাবল্য বশতঃ চৌকিতে বসিয়া মঞ্চভোজনের ব্যবস্থাই প্রচলিত। মঞ্চের উপর কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা পাতা সাজাইয়া রাখা হয় না। ভোজনের জন্য সকলে চৌকিতে বসিলে ভাত, ব্যঞ্জন প্রভৃতি সকল দ্রব্যই উপস্থিত প্রত্যেককে দেখাইয়া আনা হয়—যাহার যাহা আবশ্যক, সে তাহাই কাঁটা চামচ প্রভৃতির সাহায্যে গ্রহণ করে। কাজেই কোন দ্রব্যই "এঁটো" বা উচ্ছিষ্ট হইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইলে অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি সময়ান্তরে ব্যবহারের জন্য রাখা হয়। এই রীতির ফলে অপচয়ের সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

* * *

আমাদের দেশে গৃহিণীরা সস্তায় প্রচুর তরি-তরকারি পান বলিয়া আলু প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য ছোট ছোট করিয়া বানাইলে অনেক কম খরচ হইতে পারে, অনেক স্থলে তাঁহারা সেগুলি বড় বড় আকারে এক রাশি "কোটেন"—ফলে অনেক অপচয়ের সম্ভাবনা আসে। ইহা দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত গার্হস্থ্য প্রণালীতে অনভিজ্ঞতা বা "দরাজ হাতের" "ফোতো" বড় মানুষী প্রকাশ পায়। দৈনন্দিন ঐ ভাবে কার্য্য করিলে যে কত অপচয়ের এবং তৎসঙ্গে কত অপব্যয়ের পথ খুলিয়া যায়, তাঁহাদের মনে সে ধারণা স্থান পায় না।

* * *

বিজ্ঞান চর্চ্চার অভাবে এদেশের মেয়েরা তরিতরকারির খোসা প্রভৃতি বাতিল বলিয়া ফেলিয়া দিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ অপচয়ের যথেষ্ট সাহায্য করেন। ঐ সকল বাতিল অংশেই "প্রাণশক্তি" বা Vitamine প্রচুর পরিমাণে লুক্কায়িত থাকে। সামান্য মশলা সহকারে সিদ্ধ করিয়া সেগুলির সুস্বাদু ঝোল প্রস্তুত করিয়া পান করিলে দেহের বিশেষ উপকার হয়; অনেক রোগীকেই আরোগ্য লাভের পথে এইরূপ ঝোলের ব্যবস্থা করিয়া আমরা বিশেষ উপকার পাইতে দেখিয়াছি।

* * *

আমাদের দেশের মেয়েরা লেখা পড়া শিখিতেছেন বটে, কিন্তু নিপুণতার সহিত সুশৃঙ্খল ভাবে ভাঁড়ার কিংবা রান্নাঘর সাজাইয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। আধুনিক শিক্ষিত মেয়েদের প্রায় সকলেই সিনেমা, থিয়েটার ও লঘু সাহিত্য পাঠে কাল কাটাইতেই ভালবাসেন। অথচ ভাঁড়ার রক্ষা করিতে না জানিলে যে স্বামীর অথবা পিতামাতার

সংসার উজাড় হইয়া যায় এবং যে রান্নাঘরের যত্ন না লইলে দেহ রক্ষা করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে, আধুনিক মেয়েদের সেই দুই দিকেই অবহেলা দেখিতে পাওয়া যায়।

সেকালের মেয়েরা রান্নাঘর ও ভাঁড়ারের ভার নিজ হস্তে রাখিতেন বলিয়া তাঁহাদিগকে গৃহলক্ষ্মী আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। আজ সেই ভাঁড়ারের কর্ত্রী হইয়াছে নীচ জাতিয়া অশিক্ষিতা
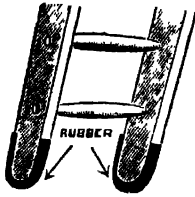
তলায় রাবার লাগানো সিঁড়ি

এবং চৌর্য্য—পরায়ণা ঝি,—আর রান্নাঘরের ভার লইয়াছে অজ্ঞাত কুলশীল, জাতি গোত্র বিহীন, নানারূপ সংক্রামক রোগের আকর, কয়েক গাছি সূত্রধারী (উপবীত?) উৎকলবাসী। সুতরাং বাঙ্গালীর ভাঁড়ার একদিকে যেমন উজাড় হইয়া যাইতেছে, তাহার রন্ধনশালারও তেমনি শোচনীয় অধোগতি হইয়াছে। অথচ আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাগণের মতিগতির যদি পরিবর্ত্তন হয় তবে ইহার যে কত উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমি বোম্বাইয়ের বহু গুজরাটি এবং পার্শী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের রান্নাঘর এবং ভাঁড়ার ঘর দেখিয়াছি। সেখানে বাড়ী ভাড়া এত বেশী যে ছোট একটি ঘরেই রান্নাঘর এবং ভাঁড়ার ঘরের কাজ এক সঙ্গেই করিতে হয়। অল্প স্থানের মধ্যে এমন নিপুণতার সহিত সুশৃঙ্খল ভাবে সমুদয় ভাঁড়ার সজ্জিত থাকে যে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

দেওয়ালের গায়ে হুক মারিয়া ছোট ছোট Shelf একটির উপর একটি টাঙ্গানো থাকে এবং তাহার মধ্যে Screw Top Glass Jarএ করিয়া রান্নার সকল রকমের জিনিষ যথা,—চাল, ডাল, ধনে, জিরা, হলুদ, সুপারী, গরম—মসলা প্রভৃতি সাজাইয়া রাখে। প্রত্যেক Glass Jarএর উপর জিনিষের নাম লেখা থাকে। যে সকল Shelf দেওয়ালের খুব উচ্চে টাঙ্গানো থাকে তাহা হইতে জিনিষ পাড়িবার জন্য ঘরে ২।৩ ধাপের ছোট ছোট সিঁড়ি থাকে। সিড়ি গুলি আবার এত হালকা যে এক হাত দিয়াই ঘরের যেখানে ইচ্ছা সেখানে সরাইয়া লওয়া যায়। সিড়ির নীচের দিকের ঠোক্কর লাগিয়া পাছে ঘরের মেজেতে দাগ লাগিয়া যায় কিংবা মেজে খুঁড়িয়া যায়, এইজন্য নীচের তক্তায় ছেঁড়া রবারের টিউব সাইজ মত কাটিয়া পেরেক ঠুকিয়া লাগাইয়া দেওয়া হয়।
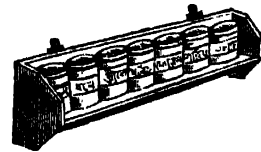
ভাঁড়ার ঘরের সেলফ

উপরে এইরূপ Shelf ও সিঁড়ির প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। আশা করি বাংলা দেশের গৃহস্থ ও গৃহিণীরা এই বিষয়গুলি একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

বিশল্যকরণী বা নির্বিবিষ

Delphinium denudatum Wall (নির্বিষি) **fig** kirtikar, Ind. Med. Pl. & 7 A Bruhl Arn. Bot. Gard. Cal. V. pt II & 117, fig. 10d, &. 119, fig. 19 (1896).

Ref. f. B. I, i, 25 , Collett,. Fl. Siml. 12 (1902) ;

জন্মস্থান—

পশ্চিম হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ; কাশ্মীর হইতে কুমায়ুন প্রদেশের তৃণ ক্ষেত্রে দেখা যায়।

দেশীয় নাম—

সং—বিশল্যকরণী, নির্বিষি; নেপাল-নীলো-বিষ, বম্বে এবং হিন্দি জাদোয়ার, নির্বিষি।

ব্যবহার্য্য অংশ—

মূল এবং বীজ।

বর্ণনা—

অবনত ওষধি তরু। কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ শাখাযুক্ত। পত্রে ৫—৯ সরু ও পক্ষাকার বিভাগ আছে, দাঁতযুক্ত। কাণ্ডে পত্র অল্প হয়, বৃন্ত লম্বা। ফুল অল্প হয়, ইহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ১½ ইঞ্চি লম্বা লম্বা গোলাকার। ফুলের পাপড়ী ৫টী, নীলবর্ণ পশমময়। পুষ্পস্তবক বিস্তৃত শ্বেত নীলবর্ণ বেগুনে এবং শুষ্ক ধূসরবর্ণ। পুষ্পদণ্ডে ফুল একটির পর একটী বিপরীত দিকে হয়। পত্র দেখিতে অনেকটা ধনে গাছের মত। ফলের বীজ ১—৭টী থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—

ইহার মূল চিবাইলে দাঁতের বেদনা উপশম হয়। জ্বরের বিরাম কালে ইহার মূলের ক্বাথ ২—৪ ড্রাম পরিমাণ ব্যবহার করিলে জ্বর আরাম হয়। ইহা বাত ও উপদংশ রোগে ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য পুনরায় আনয়ন করে। কথিত আছে যে, বানর বৈদ্য সুসেন লক্ষ্মণের শক্তি শেল কালে এই ঔষধ হনুমানকে আনিতে বলেন। হনুমান এই ঔষধ হিমালয় প্রদেশ হইতে আনিলে ভয়ঙ্কর শেল জনিত রাবণের আঘাত হইতে লক্ষ্মণ আরোগ্য লাভ করেন।

ইহা উপদংশ ও বাতের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

নির্বিষি ১ ড্রাম, আম্বার ১০ গ্রেণ, জাফরাণ ১ ড্রাম এইগুলি গোলাপ জলে পেষণ করিয়া ২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পরিমাণ বটীকা প্রস্তুত

করিয়া ব্যবহার করিলে হৃদ্রোগ ও মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ আরাম হয়। ইহা শুক্র ও পুংজননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতায় বিশেষ হিতকর।

এই গাছ প্রায় দেখিতে D, Saniculae-folium, Baiss. গাছের তুল্য। ইহাকে একটী Sub-Species বলা যাইতে পারে।

Jadwar (নির্ব্বিষি) সচরাচর একোনাইটের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়।

কাঠবিষ—

A. Napellus Linn (কাঠ বিষ)

Fig.—Bentl. & Trim Med, pl i, t. 6; Kittikar, t. 9.

Ref—F. B. I. i, 28; Journ. Board. Agric xxi, 496 & 502; Annals Royal Botanic Garden, Calcutta, x 121.

জন্মস্থান—

হিমালয় প্রদেশের ১০,০০০ ১৫,০০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতে চাম্বা প্রভৃতি স্থানে ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অতি উচ্চ পার্ব্বতীয় ভূভাগে জন্মে। সাধারণতঃ ইহা ইউরোপ এসিয়া এবং আমেরিকার মেরু প্রদেশ ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে দেখা যায়।

দেশীয় নাম—

(সং) বিষ, (বা) কাঠবিষ, (হিঃ) তুধি বিষ, (পঞ্জাব) মহরী; Eng Monk's hood.

ব্যবহার্য্য অংশ—

মূল ও টাটকা পত্র।

বর্ণনা—

ইহা একটী খাড়া গুল্ম জাতীয় গাছ, মূল মোচার ন্যায়, দেখিতে পটলের মূলের ন্যায়, গায়ে সরু সরু শিকড় জন্মে। মূল ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। গাছ মরিয়া যাইলে উহার মূল হইতে পরবর্ত্তী বৎসরে গাছ বাহির হয় এবং পূর্ব্ব বৎসরের মূল পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। গাছের পাতা ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, অনেকটা দেখিতে রজনীগন্ধা গাছের ন্যায়। উপরের পাতা ছোট হয়। ডাঁটার উপরিভাগে মটর ফুলের ন্যায় ফুল হয়। ফুল ডাঁটায় লাগিয়া থাকে। পাতার স্বাদ জ্বালাকর। টাটকা মূল উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট। শুষ্ক মূল মিষ্ট (Fluck & Humb) ফুল সবুজের আভাযুক্ত নীলবর্ণ। ফুলের বহির্ব্বাস ৫টী, পাপড়ী ২০৫টী। পুংকেশর অনেক থাকে, ইহা লোমযুক্ত। বীজকোষ মসৃণ, অভ্যন্তরে অনেক বীজ থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—

ইহা সাধারণতঃ জ্বর নাশক, নানাবিধ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, পুরাতন বাত, গেঁটেবাত ও হৃদ্রোগে হিতকর। ইহা অধিক মাত্রায় বিষের ন্যায় কাজ করে। অর্দ্ধ মাত্রায় বলকারক ও জ্বর নাশক।

শ্রীএককড়ি ঘোষ

বিদেশ হইতে ভারতে সাবান ও সাবান প্রস্তুতের মাল মসলাদি আমদানীর বিবরণ

Household and Dhobi

Soaps অর্থাৎ কাপড় কাচা ও ঘরের কাজের	১৯৩৫ হন্দর	১৯৩৫ টাকা	১৯৩৬ হন্দর	১৯৩৬ টাকা	১৯৩৭ হন্দর	১৯৩৭ টাকা
জন্য সাবান	১,১৪৪	৩০,৫১৬	৮৮৫	২৮,৪৭৮	৭৮৫	১৫,০৫৭
টয়লেট বা গায়ে মাখা	৩,৪১৪	২,৩৩,৪৯৮	৩,৩১২	২,৩০,৮২৬	২,২২০	১৪,৫৮৯
অন্যান্য প্রকার	৫৬১	১৬,২৪২	২১৩	৮,৪১৪	১৮৫	৬,৭৮৩
মোট	৫,১১৯	২,৮০,২৫৬	৪,৪১০	২,৬৭,৭১৮	৩,১৯০	১,৬৭,৭৩৭

উপরে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে সাবানাদি আমদানীর হিসাব দেওয়া হইল ; তন্মধ্যে যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য দেশ হইতে যে পরিমাণ আমদানী হয় তাহার হিসাব নিম্নে পৃথক করিয়া দেখান হইতেছে।

	হন্দর	টাকা	হন্দর	টাকা	হন্দর	টাকা
যুক্তরাজ্য	৩,৮৩৯	২,২০,৪৪৫	৩,৩৭২	২,২২,৯৩৫	১,৭১০	৯৯,৭০৭
অন্যান্য প্রদেশ	১,২৯০	৫৯,৮১২	১,৬৩৯	৪৪,৭৮০	১,৪৮০	৬৮,৩৩০

	১৯৩৫ গ্যালন	১৯৩৫ টাকা	১৯৩৬ গ্যালন	১৯৩৬ টাকা	১৯৩৭ গ্যালন	১৯৩৭ টাকা
Essential Oil বা সুগন্ধি তৈল	৬,২৭৮	১,৫৬,৬৩৮	৪,০৭২	১,০৭,৩৬৫	৬,১৬৫	১,৫১,৩৪৭

	১৯৩৫ টাকা	১৯৩৬ টাকা	১৯৩৭ টাকা
পারফিউমারি বা গন্ধদ্রব্যাদি	১০,৭৮৫	১৭,৪১৪	১৯,০২৯

	১৯৩৫ হন্দর	১৯৩৫ টাকা	১৯৩৬ হন্দর	১৯৩৬ টাকা	১৯৩৭ হন্দর	১৯৩৭ টাকা
কষ্টিক সোডা						
যুক্তরাজ্য হইতে	২৮,৬৮২	২,৮৫,৯৪৭	২৫,৩১২	২,৩৭,৪০০	৪৫,৬৬৬	৩,৪১,১১৭
অন্যান্য প্রদেশ হইতে	১০,৪০৭	৯৮,২৮৫	৭,৬৫০	৭০,৩৭৭	২,৯৮৫	১৯,৮৯৭
গ্লিসারিণ	৭৪৩	২৪,৩১২	৩২৫	৮,৭৭৪	৫০	৪,৮৪১
রোজিন	৫,১১৪	৪৭,১২৩	১,৮৬৭	১৪,২৫১	১,৩৩৬	১৩,৯৭৬

	১৯৩৫ হন্দর	১৯৩৫ টাকা	১৯৩৬ হন্দর	১৯৩৬ টাকা	১৯৩৭ হন্দর	১৯৩৭ টাকা
ট্যালো বা চর্ব্বি	৩	৩০	৪২	১,২৭৯	১৩,০৩৩	২,৭৬,৬২৮
ষ্টিয়ারিন	১০,৯৮৬	২,০২,২১৭	১৩,১৭৩	২,৩৪,৬০৮	৩,৭৫৩	৫৩,৭২৫
অন্যান্য চর্ব্বি					১,১৬০	১৩,২৯৬
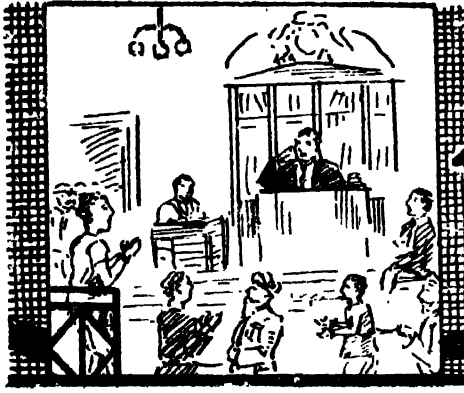
পুরাণো বাসন সারায় দাগাবাজী

কিছুকাল পূর্ব্বে পাবনা জিলার অন্তর্গত কুস্থুম্বী, চৌবাড়িয়া, খুটিগাছা ও রঘুনিলি প্রভৃতি গ্রামে কয়েকজন লোক পিতল ও কাঁসার বাসন মেরামত করিতে আসে। তাহারা প্রত্যেক বাড়ী হইতে ভাঙ্গা থালা, ঘটি, বাটী, কলস সংগ্রহ করিয়া উক্ত ভাঙ্গা জিনিষ মেরামত করিয়া দিবে বলিয়া নাম ধাম ও চাট মোহরেব ঠিকানা দিয়া বহু টাকার জিনিষ পত্র পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে লইয়া যায়। পরে খোঁজ লইয়া জানা যায় যে লোকগুলি চাট মোহবের নহে। এইরূপ সর্ব্বত্র বিষম ধোকাবাজী চলিয়াছে। শুধু তাড়াশ অঞ্চলেই নহে—বগুড়া, বাজসাহী, রংপুব অঞ্চলেও এইরূপ ধোকাবাজী চলিয়াছিল। দেশবাসী এইরূপ জুয়াচোরদিগের চাটুবাক্যে মুগ্ধ না হইয়া সাবধান হইবেন।

পথে পাওয়া নোট

কলিকাতার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, অশ্বিনী কুমার বন্দোপাধ্যায়, রামধন মিশির প্রভৃতিকে জুয়া চুরির অভিযোগে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড দিলে তাহারা হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিল। বিচারপতি জ্যাক্ এবং এম, সি, ঘোষ নিম্নের আদালতের রায়ই বহাল রাখিয়াছেন।

ঘটনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ফরিয়াদী কুমুদ কান্ত কলিকাতার কোন ফার্ম্মের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন; তাঁহার কাছে সুধাংশু উপস্থিত হইয়া বলে যে একজন কুলী অনেক গুলি বেশী দামের নোট কুড়াইয়া পাইয়াছে এবং সে উহা অল্প মূল্যেই বিক্রয় করিতে চাহে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ফরিয়াদীর মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সুধাংশু একদিন বিবেকানন্দ রোডের কোন নির্জ্জন স্থলে লইয়া যায়। এই খানে আসামী কুমুদকান্তবাবুর কাছ হইতে টাকা পাইলেই, তাহাব দলের লোক পুলিশ কর্ম্মচারীর বেশে আসিয়া সেখানে হানা দেয়। সুধাংশু খুব ভীত হইয়াছে এইরূপ ভাব দেখাইয়া তাড়াতাড়ি চম্পট দেয়; কুমুদকান্ত ততক্ষণ নকল পুলিশের কবলে পড়িয়াছে।

এইরূপে আসামী ফরিয়াদীর ১৫০০৲ টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। কুমুদকান্ত বাবু এই

টাকা আফিস হইতে তাঁহার মেয়ের বিবাহের কথা বলিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। ঘটনার পরদিন তিনি আফিসে আসিয়া বলিয়াছিলেন যে ট্রামে বাড়ী ফিরিবার সময় তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল এবং এই অবকাশে পকেটমার তাঁহার অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে।

আসামী নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত বিচারপতিদ্বয় এই সঙ্গে আরও দুইটি আপিলের রায় প্রদান করেন। ইহার একটিতে সুধাংশু ও অশ্বিনী একই উপায়ে এবং একই জায়গায় বটকৃষ্ণ রাণা নামক জনৈক কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর কাছ হইতে মূল্যবান জুয়েলারী আত্মসাৎ করিয়াছিল। এই দুই ব্যক্তি আর একবার মতফল এবং কেলাবর নামক দুইজন সহযোগীর সাহায্য লইয়া আলীপুর জজ্ কোর্টের একজন উকীলের কাছ হইতে একই স্থলে এবং একই উপায়ে ১৫০০৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল।

বড়লাটের নাম লইয়া প্রতারণা

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজাকে প্রতারণা করিবার চেষ্টার অভিযোগে কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালোর হইতে আগত জর্জ্জ ফরেষ্ট নামক একজন এংলো ইণ্ডিয়ানকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়। আসামী পূর্ব্বে কলিকাতায় আরও বহু ফার্ম্মকে প্রতারিত করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসামী বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী বলিয়া পরিচয় দিয়া কোনও বিপদাপন্ন এংলো ইণ্ডিয়ানকে আর্থিক সাহায্যের জন্য ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজাকে টেলিফোনযোগে অনুরোধ জানান। মহারাজা তখন দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরই আসামী জর্জ্জ ফরেষ্ট মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হয় এবং বলে মহারাজার নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হাউস হইতে তাহাকে পাঠান হইয়াছে।

মহারাজাকে ইহা জানান হইলে, তিনি অবিলম্বে এংলো ইণ্ডিয়ান যুবককে ৫০০৲ দিবার জন্য তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে আদেশ দেন, কিন্তু প্রাইভেট সেক্রেটারীর সন্দেহ হওয়ায়, তাহাকে যে গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে পাঠান হইয়াছে তিনি তাহার প্রমাণ চাহেন! পাছে সমস্ত রহস্য প্রকাশ পাইয়া যায় এবং তাহাকে ঐস্থানেই গ্রেপ্তার করা হয়, এই ভয়ে আসামী ঐ স্থান হইতে কোনও প্রকারে পলায়ন করে।

ইতিপূর্ব্বে আসামী আর্মি এণ্ড নেভি, হল এণ্ড এণ্ডারসন, এন মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স, বরাকত আলী ব্রাদার্স এণ্ড কোং এবং অন্যান্য বহু ফার্ম্মকে ফোনের সাহায্যে প্রতারিত করে। আসামী কখনও ডানলপ হাউসের মিঃ টেলর অথবা কখনও ওল্ড মিশন চার্চ্চের রেভারেণ্ড পিয়ার্সন অথবা কোনও ভূয়া নামে নিজেকে পরিচয় দিত। এবং ফোনে মালের জন্য বড় বড় অর্ডার দিত। কুলীরা যখন মাল লইয়া আসিত, আসামী তখন রাস্তায় আসিয়া মাল লইয়া যাইত এবং কুলীদিগকে বিলের টাকার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিত। এইভাবে সে মালসহ প্রস্থান করিত।

৩২ বৎসর পূর্ব্বে,—১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট, বাঙ্গালী জনসাধারণ টাউন হলের বিরাট সভায় সমবেত হইয়া এক অপূর্ব্ব মাতৃ পূজার আয়োজন করে। তার মূলমন্ত্র "বন্দে মাতরম,"—তার সংকল্প,—

"আমি পরের ঘরে কিন্‌ব না আর
ভূষণ বলে গলার ফাঁসী,
আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।"

সেই পূজার আহুতি,—

দেবী আমার সাধনা আমার,—
স্বর্গ আমার, আমার দেশ!

বাংলার ইতিহাসে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে সেই শুভদিন চিরস্মরণীয়। ইংরাজী ভাষায় আগষ্ট শব্দের অর্থ মহিমান্বিত। বাস্তবিক আগষ্ট মাসে ভাদ্র-আশ্বিন ব্যাপী শরৎকালের প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যের সহিত যে শক্তির বিকাশ হয়, তাহাতে বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে মহান্ ও গৌরব যুক্ত করে। সেই জন্যই শারদীয় পূজায় বাংলাদেশে একটা প্রবল উন্মাদনা আসে।

পুরাণে বর্ণিত আছে স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য শক্তির উদ্বোধনার্থে এক মহতী সভায় মিলিত হইয়াছিলেন। এই সঙ্ঘবদ্ধ দুর্দ্দমনীয় শক্তিই দেবীরূপে তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালী শারদীয় মহাপূজায় ভক্তির সহিত উত্তেজিত চিত্তে সেই ইতিহাস কথা পাঠ করে। লঙ্কাধিপতি রাবণের অত্যাচার হইতে অপহৃতা সীতাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত রাম শরৎ কালেই সেই মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন। দুষ্কৃতকারীর নিধন, বিপন্নের উদ্ধার সাধন যাঁহাদের জীবনের ব্রত, তাঁহারা চিরকাল এই প্রাচীন কাহিনী হইতে অনুপ্রেরণা পাইয়া আসিতেছেন।

যুগে যুগে কত দুরবস্থা, কত বিপদ আপদ, কত অত্যাচার অবিচার, কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী এক জাতিরূপে উন্নতির পথে চলিয়াছে। বাঙ্গালীর রাষ্ট্র ও সমাজে, শিক্ষা ও সাধনায়, ব্যবসা ও বাণিজ্যে, আশা ও অভিলাষে সেই পুরাতনের প্রভাব, সেই প্রাচীন ইতিহাসের প্রেরণা ব্যর্থ হয় নাই। ৩২ বৎসর পূর্ব্বে ৭ই আগষ্টের সভায় তাহা দেখা গিয়াছিল।

উৎপীড়িত দেবতার মত, বিপদগ্রস্ত রামচন্দ্রের ন্যায় বাঙ্গালীরাও সেদিন এক সমর ঘোষণা করিয়াছিল,—এক বিজয় যাত্রার পথমুখে দণ্ডায়মান হইয়া সেই মহাশক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল,—

রূপং দেহি, জয়ং দেহি,
যশো দেহি, দ্বিষো জহি।

কিন্তু সে ত অস্ত্র শস্ত্রের সংগ্রাম নহে, কামান বন্দুক ঢাল তরোয়ালের লড়াই নহে। শিল্প ব্যবসায়ের দ্বারা আর্থিক উন্নতি প্রতিষ্ঠা, বিদেশী বণিকের সহিত প্রতিযোগিতা, বাণিজ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার, এই সবই সেই যুদ্ধের প্ল্যান বা মতলব। আজও সেই যুদ্ধ চলিতেছে,—আরও ভীষণ ও প্রবলতর।

"আমাদিগকে রূপ দাও,—আমাদিগকে জয় দাও,—যশ দাও;—আমাদের শত্রু সংহার কর"—বাঙ্গালীর এই প্রার্থনা ত অপূর্ণ থাকে নাই। তার রূপজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়াছিল নদীয়ার শচীদুলাল,—মেহারের সর্ব্বানন্দের গৌর কলেবরে। তার জয় পতাকা উড়িয়াছিল বিজয় সিংহের সমুদ্র যাত্রায়,—চট্টল সন্দ্বীপের অর্ণবপোতে। তার যশঃ সৌরভের ভাণ্ডার ছিল দীপঙ্করের জ্ঞানে;—রামমোহনের সাধনায়। তার শত্রু সংহার করিয়াছিল প্রজাবিদ্রোহের বীরত্ব,—দ্বাদশ ভৌমিকের তরবারি।

বাঙ্গালীর বুদ্ধিবলকে শত্রু-মিত্র সকলেই ভয় করে। কিন্তু তার বাহুবলও বিলুপ্ত হয় নাই।

যেখানেই সুযোগ পাইয়াছে, সেখানেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা॥

নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমোনমঃ—ইহাই বাঙ্গালীর চিরদিনের সাধনা। আজ শারদীয়া মহাপূজার উদ্বোধনে বাংলাদেশের আকাশ বাতাশ মুখরিত করিয়া সেই মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে।

"মা আসিয়াছেন",—বাংলার নবনারী আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে বলিতেছে "মা আসিয়াছেন।" সকলের মুখে—একই কথা;—ধনী দরিদ্র, বালকবৃদ্ধ, গৃহী উদাসীন,—সকলেই বলিতেছে, "মা আসিয়াছেন।" কবি যখন গাহিলেন,—

আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে;
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।—

ঐ ভিখারী বাউল বাংলার নগর ও পল্লীর অন্তর কাঁপাইয়া করুণস্বরে শুষ্ক বেদনার প্রতিধ্বনি শুনাইতেছে সেই চির পুরাতন আগমনী গীতে,—

আয়মা উমা করি কোলে,
এলি অনেক দিনের পরে,
তুমি মা জগতেশ্বরী—
কে তোমায় চিনিতে পারে?

তাহার চক্ষে অশ্রুধারা! বন্যায় দেশ ডুবিয়া গিয়াছে,—সহস্র সহস্র লোক গৃহহীন, দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের মত মুখব্যাদান করিয়াছে,—অভাবের তাড়নায় গৃহস্থ জর্জ্জরিত;—মহামারী দেখাইতেছে ভীষণ শ্মশান বিভীষিকা,—বাঙ্গালীকে সবাই করিতে চায় কোন-ঠেসা। তথাপি দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কোটী কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে,—"মা আসিয়াছেন"। দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া ঐ আশার সঙ্গীত,—

"শূন্যহৃদয় লয়ে নিরাশায় পথ চেয়ে,
বরষ যাহার কাটিয়াছে,
এসগো কাঙ্গালজন, আজি তব নিমন্ত্রণ
জগতের জননীর কাছে;
কার অতি দীন হীন বিরস বদন
ওগো ধূলায় ধূসর মলিন বসন
দুঃখী কেবা আছ শুনগো বারতা
ডাকিছেন তোমারে জগতের মাতা।"

বাংলার নরনারীর প্রাণে নব বলের সঞ্চার হইয়াছে। শত দুঃখের মধ্যেও বাঙ্গালী তার মাকে ভুলে নাই। এই মা কে?—বাংলার মাটী,—যে মাটীতে সোনার ফসল;—জীবন দায়ী ফল জল,—সর্ব্ব জীবের আশ্রয় স্থল। তাই মৃন্ময়ী চিন্ময়ী অভেদ জানিয়া বাঙ্গালী মাকে ডাকিতেছে,—

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
ত্বংহি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণীং
কমলা কমলদল বিহারিণীং
বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বাং॥

সমগ্র বাংলাদেশ সেই আহ্বানে জাগ্রত হইয়াছে। নিদ্রার অচৈতন্য, আর নাই;—মোহের অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়াছে;—বিলাসের জড়তা ভাঙ্গিয়াছে,—আরামের আলস্য আর দেখা যায় না। বাঙ্গালী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছে। 'হাতীকা দাঁত,—

মরদ্‌কা বাত' যেমন, তেমনি বাঙ্গলী আর পশ্চাৎপদ হইতে পারেনা। আজ এই শুভক্ষণে আমরা বিশ্ব কবির কথায় সমস্বরে প্রার্থনা করি,

বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা
বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক্
হে ভগবান্।

বাংলার কিসের অভাব? মা আমাদের দিতে বাকী রাখিয়াছেন কি? অভ্রভেদী হিমাচল যাঁর শিরোভূষণ;—অনন্ত নীলাম্বুধি নিরন্তর যাঁর পদ ধৌত করিতেছে, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের অবিরাম ধারায় যিনি নিত্য সুজলা, যাঁর ফলে শস্যে নিখিল জীবের প্রাণ দায়িনী শক্তি, তাঁর সন্তানের কিসের অভাব? চারিদিকে চাহিয়া দেখ, শারদলক্ষ্মীর সাজ সজ্জায় কি প্রাচুর্য্য, কি উজ্জ্বলতা, কি হৃদয়স্পর্শী ভাব। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নির্গলিতাম্বু লঘু মেঘ মালায় শোভিত, দিবসে রৌদ্র দীপ্ত, রজনীতে জ্যোৎস্না মণ্ডিত। নিম্নে শ্যামলা বসুমতীর শস্য সম্ভারে খচিত সোণার আঁচল। রাশি রাশি অশোক, সেফালী, অতসী, অপরাজিতা কমল, কুমুদ, কাশ কুসুম প্রস্ফুটিত। মৃদুকল নাদিনী নদীর বক্ষে বিবিধ শিল্প সম্ভার পূর্ণ তরণীর মনোরম দোলন গতি। বনে বনে দোয়েল, পাপিয়া, শ্যামা, শালিকের মধুর কূজন। শত প্রকারের দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যেও মা আমাদের সর্ব্বাভরণ ভূষিতা রাজরাজেশ্বরী রূপিণী হাস্যময়ী।

বাংলার সুদূর পল্লীতে জননী স্নেহ ছল ছল নেত্রে তাঁর সন্তানের আগমন প্রতীক্ষায় চাহিয়া আছেন। বৎসরান্তে অঞ্চলের নিধি ঘরে ফিরিবে, মা তাকে কত যত্নে খাওয়াইবেন পরাইবেন। দীর্ঘ বৎসর ব্যাপী দুঃখের কথা ভুলিয়া, চোখের জল মুছিয়া ছেলের জন্য মা কত রকমের খাবার তৈয়ারী করিয়াছেন। সারা বছর ধরিয়া কত সুমিষ্ট ফলমূল, কত সুস্বাদু শস্য সম্ভার, কত সুকোমল শাক সব্জী, মায়ের ঘরে আদরের সন্তানের জন্য সঞ্চিত হইয়াছে,—তার সীমা সংখ্যা নাই। গাদায় গাদায় গোয়ালন্দের তরমুজ ও ইলিশ মাছ;—ঝুড়িতে ঝুড়িতে দার্জ্জিলিং সিলেটের কমলা নেবু;—কাঁড়ি কাঁড়ি যশোহরের মানকচু, হাঁড়ি হাঁড়ি নলিনপাটালী আর কৈ মাছ; বস্তায় বস্তায় তারকেশ্বরের বেগুন, কাটোয়ার ডাঁটা, চাটগাঁয়ের হাতিখুরা,—কুমিল্লার করলা,—নোয়াখালীর নারিকেল সুপারী,—বরিশালের চাউল;—দত্ত পুকুরের ছানা, কৃষ্ণ নগরের সর ভাজা, নাটোরের সন্দেশ, বিক্রমপুরের পাতক্ষীর, ঢাকার পরটা, বর্দ্ধমানের মিহিদানা সীতাভোগ; জয়নগরের মোয়া আর পয়রা গুড;—ঘাটালের মাখন;—আরও কত কিছু নিত্য নিত্য ভারে ভারে আসিয়া মায়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখে। সেই সুখ স্মৃতি বক্ষে লইয়া মা আজ শারদ প্রভাতে সন্তানের ডাকে সাড়া দিয়াছেন। গিরিরাজপত্নী মেনকার স্নেহার্দ্র করুণ কণ্ঠে ঐ শুন বাজিতেছে কি মর্ম্মস্পর্শী সুর,—

সারা বরষ দেখিনি গো
তুই মা আমার কেমন ধারা,
নয়ন তারা হারিয়ে আমার
অন্ধ হ'ল নয়ন তারা;

পাষাণীর মেয়ে এলি কিরে
দেখ্‌ব তোরে নয়ন ভরে,
কিছুতেই থামে না যে মা
এ পোড়া নয়নের ধারা।

মায়ের কোলে যখন সন্তান ফিরিয়া আসে, তখন এমনি করিয়া তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। বাঙ্গালী কি আজ সেই মায়ের ডাক শুনিবে না?

৩২ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার ভাই বোনদিগকে আহ্বান করিয়া পথে পথে এই গান গাহিয়া ছিলাম,—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই;
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।

আজ এই পূজার বাজারে বাঙ্গালী ভাই বোনদিগকে আর সে অনুরোধ করিব না। রাজ রাজেশ্বরী মাকে আর দীন দুঃখিনী বলিয়া জগতের কাছে ছোট হইব না কিম্বা মাথা হেট্ করিব না! আমাদের মোটা কাপড় মিহি হইয়াছে। বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী, ঢাকেশ্বরী, বাসন্তী, বঙ্গেশ্বরী, ইষ্ট ইণ্ডিয়া, মহালক্ষ্মী, লক্ষ্মী নারায়ণ, চিত্তরঞ্জন, বঙ্গশ্রী—প্রভৃতি কাপড়ের কলে প্রচুর কাপড় তৈয়ারী হইতেছে। বিশেষ মোহিনী, ঢাকেশ্বরী, বাসন্তী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কাপড়ের কলে মিহি সুতার যে সব রকমারি ফ্যাসনের, ধুতি, শাড়ী প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে তাহা লালমিল, অরবিন্দ মিল ও কল্যাণ মিলের বস্ত্রাদির সহিত সমানভাবে টেক্কা দিয়া বাজারে চলিতেছে, বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতায় তাহা বাজারে স্পর্দ্ধার সহিত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তাহার নিজের কলের বস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক।

কেবলমাত্র বস্ত্র নহে,—সাবান, জুতা গন্ধ তৈল, খোস্-বাই, ষ্টীলট্রাঙ্ক, দিয়াশলাই, গেঞ্জি, মোজা, পেন্সিল, কলম, রাবারক্লথ, বোতাম, বুরুশ, চিরুণী প্রভৃতি অপরাপর শিল্পদ্রব্যও বাংলাদেশে প্রস্তুত হইতেছে। তাহার জন্য আর বিদেশের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই। এই সকল জিনিসের জন্য বহুকাল যাবৎ বাঙ্গালী বিদেশী বণিকের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলিয়া দিয়া নিজে দরিদ্র হইয়াছে। তখন বাংলাদেশে এত রকমারি শিল্পের কলকারখানা ছিলনা। বাঙ্গালী তখন বুঝিতনা, বিদেশীর নিকট হইতে এক পয়সার জিনিস কিনিলে তাহা হাজার টাকা ক্ষতির তুল্য হইয়া বাঙ্গালীর দারিদ্র্যকে বাড়াইয়া তোলে। "পরের ঘরের ভূষণ" যে বাস্তবিকই "গলার ফাঁসী" হইয়া দাঁড়ায় একথা তখন বাঙ্গালীর বুদ্ধিতে আসে নাই।

৩২ বৎসর পূর্ব্বে এমনি এক শারদ প্রভাতের অরুণালোকে বাঙ্গালীর মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছিল। সে যে কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা ও অন্তঃসারহীন আস্ফালন নহে,—এই ৩২ বৎসরের বাংলার ইতিহাস তাহার জলন্ত প্রমাণ দিতেছে। বাঙ্গালী বুঝিয়াছে, ঘরের জিনিস ফেলিয়া পরের জিনিস কিনিলে "লক্ষ্মী-ছাড়া" হইতে হয়,—দারিদ্র্যের চাপে একেবারে পিষিয়া দেয়,—জাতীয় অস্তিত্ব চিরকালের তরে বিনষ্ট হইয়া যায়। তাই আজ এই পূজার বাজারে বাঙ্গালী তার চির দিনের সংকল্প রক্ষা করিতে ঘরের জিনিস ফেলিয়া কখনও পরের জিনিস কিনিবে না। স্বদেশী কাপড় জামায়, স্বদেশী গন্ধদ্রব্যে, স্বদেশী সৌখীন দ্রব্যে নিজেও সাজিবে,—আত্মীয় স্বজনকেও সাজাইবে। সস্তা দামের জাপানী ও জার্ম্মানী জিনিসে বাংলার বাজার ছাইয়া গিয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় "দু'পয়সা,

চার পয়সা” হাঁকদিয়া ফেরিওয়ালারা ঐসব জিনিস বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। অসাবধান ও অদূরদর্শী গৃহস্থেরা না ভাবিয়া চিন্তিয়া,—বাহ্যিক চাকচিক্যে ভুলিয়া সেইসব জিনিস ক্রয় করে লাভের আশায়,—কিন্তু শেষে তাহাতে ক্ষতিই হয় বেশী। কারণ ছেলেখেলার জিনিসে গৃহস্থালী চলেনা।

বাংলার শিল্প পরিচয় আমাদের 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' পত্রিকায় ক্রমাগত প্রকাশিত হইতেছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের এই পূজা সংখ্যাতেই নানা প্রকারের স্বদেশী জিনিষ কোথায় পাওয়া যায়, কে নির্ম্মাতা, তাহাদের নাম, ধাম, ঠিকানা ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আমরা প্রকাশ করিয়াছি, যাহাতে ক্রেতারা একস্থানেই সকল রকম স্বদেশী জিনিষের প্রাপ্তিস্থান অনায়াসে জানিতে পারেন। তাহা ছাড়া কলিকাতায় কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের কমার্শ্যাল মিউজিয়ামে, বাংলাদেশের নানাবিধ শিল্পদ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। সেখানে যাইয়া স্বচক্ষে দেখিয়া শুনিয়া সকলেই ঐসকল জিনিষের বিস্তারিত বিবরণ ও পরিচয় জানিতে পারেন। সুতরাং পূজার বাজারে “স্বদেশী জিনিষ কোথায় পাওয়া যায়,—জানিনা” এই অজুহাত কাহারো চলিবে না।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা “রাঙ্গা কাপড়,—রাঙ্গা জামা” পাইবার আশায় আনন্দে নৃত্য করিতেছে ;—গৃহিণীর অভিমান ভাঙ্গাইতে কিছু গহনা চাই,—আত্মীয় স্বজনের জন্য এবং লৌকিকতা রক্ষার্থে বস্ত্রাদির প্রয়োজন'—বর্ষা কাটিয়া গিয়াছে, পূজার জন্যে না হইলেও,—এখনই জুতা কিনিবার সময় ;—বন্ধু-বান্ধবদিগকে প্রীতিউপহার দিতে হইবে,—তার জন্য অন্নের মধ্যেও সাবান, গন্ধতৈল, রুমাল, এসেন্স্-ক্রীম, পাউডার এসবের দরকার,—একটু দামী উপহারের মধ্যে মুর্শিদাবাদ বেনারসী সিল্কের ধুতি সাড়ী জামা ব্লাউজ প্রভৃতির দরকার, ষ্টীলট্রাঙ্ক,—সুটকেস,—আয়না, চিরুণী, বুরুশ এসবও চাই। তারপর সর্ব্বোপরি আছে পূজার তত্ত্ব,—যাহা বাংলার সামাজিকতা ও আত্মীয়তার একটা প্রধান অঙ্গ। এই সকল প্রয়োজনে পূজার বাজারে বাঙ্গালীর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

এই টাকার একটী পয়সাও যেন বিদেশী বণিকের ঘরে না যায়,—বাঙ্গালী ভাইদের নিকট ইহাই আমাদের নিবেদন।

বাংলার শ্রেষ্ঠ আনন্দ উৎসব এই শারদীয় মহাপূজা। এই পূজা বাংলাদেশেরই বিশেষ উৎসব। শরৎকালের মনোরম শোভা সৌন্দর্য্য ভারতের আর কোন স্থানে এত ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়না। সেইজন্য চিন্তাশীল ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী শারদশ্রীর আন্তরিক উপলব্ধিকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত চিরসম্বন্ধ করিয়াছে। এ কার্য্য আর কেহ পারে নাই। যুগযুগান্ত পূর্ব্বে এমনি শোভা-সম্পদ-মণ্ডিত শরৎকালে শক্তিশালী বীরগণ দিগ্বিজয় ও শত্রু সংহার করিতে বাহির হইতেন,—সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা সন্দর্শন করিয়া ভক্তি-পুলকে পূর্ণ হইতেন। সেই আনন্দস্মৃতি এখনো অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। প্রতিবৎসর তাহা বন্যার জলোচ্ছ্বাসের মত বাঙ্গালীর প্রাণে জাগ্রত হয়। ভারতের আর কোনদেশ এমন ভাবে পূজার আমোদে মাতিয়া উঠেনা।

খ্রীষ্টানদের বড়দিন, মুসলমানগণের মহরম, ধর্ম্মোৎসব হিসাবে তত্তৎ সম্প্রদায়ের লোকদের

নিকট পবিত্র ও মহান্। কিন্তু হিন্দুদের এই শারদীয় দুর্গা পূজায়,—ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত সামাজিক ও অর্থনীতিক বিষয়ের সংযোগ থাকায় সকল সম্প্রদায়ের নিকট ইহার আদর এবং জনসাধারণের উপর ইহার প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

বাংলাদেশে পূজা আসিলে চারিদিকে একটা অনাবিল আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। সকলের চিত্ত সেই আনন্দে নাচিয়া উঠে। ধর্ম্মপ্রাণ ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভগবচ্চিন্তায় রত হন। ভক্ত গৃহস্থ "মা আসিয়াছেন" বলিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। গৃহিণী আঁচলে চোখের জল মুছিয়া, আশায় বুক বাঁধিয়া পথপানে চাহিয়া থাকেন,—কতকাল পরে দুঃখিনী মেয়ে মায়ের ঘরে আসিবে,—মায়ের বুক জুড়াইবে। দোকানী-পসারী, ব্যবসায়ী বণিক, সারাবৎসর যার লাভের ঘরে শূন্য, সেও পূজার বাজারে কিছু বেচা-কেনা করিয়া—দু'পয়সা পাইবে এই আশা করে। বড় বড় কোম্পানী হইতে আরম্ভ করিয়া গাড়োয়ান মুটে মুজুর পর্য্যন্ত,—সকলেরই কিছু না কিছু রোজগারের মরশুম শারদীয় উৎসবের এই পূজার বাজার।

তাই আজ আমরা আমাদের স্বদেশবাসী বাঙ্গালী ভাইদেরে বলিতেছি,—এই শারদোৎসবে দিগ্বিজয়, আনন্দ ও ভগবৎ সান্নিধ্য এই তিনের সাধনে যদি জীবনকে সার্থক করিতে চাও, তবে পূজার বাজারে স্বদেশী জিনিস কিনিয়া বাংলার টাকা বাংলায় রাখ। এক সময়ে যে দিগ্বিজয় হইয়াছিল নরহত্যায় ও রক্তপাতে,—তোমরা শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক সম্পদ প্রসারের দ্বারা সেই দিগ্বিজয় সাধন কর। বাঙ্গালীর পক্ষে ত ইহা নূতন নহে। বাঙ্গালীর অর্ণবপোত এক সময়ে সুদূর সাগর সাগরান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিল,—ঢাকাই মস্‌লিন, সিলেট চূণ, রংপুরী তামাক, মুর্শিদাবাদ মালদহের রেশম, কাশীপুরের চিনি, হাতিয়া সন্দ্বীপের লবণ,—এসব ত বাণিজ্য জগতে একছত্র আধিপত্য করিত। এখনো বাংলার পাট,—চা,—কয়লা দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন জোগাইয়া বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতেছে। এই ত বাংলার যথার্থ দিগ্বিজয়।

শারদোৎসবের উদ্বোধনে দিকে দিকে গম্ভীর নাদে মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে। ঐ ত বিজয়ার আগমনী ঘোষণা। বাঙ্গালী,—আজ ভুলিয়া যাইও না এই শারদোৎসবের শক্তিরূপিণী মহাদেবীর এক নাম দুর্গা,—অন্য নাম বিজয়া। মায়ের দুই নামই সংগ্রাম সূচক। সেই সংগ্রাম আজ বাধিয়াছে বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবাঙ্গালী বিদেশীর সহিত। আমেরিকা জার্ম্মানী পাটের বদলে অন্য জিনিস আবিষ্কার করিয়াছে;—তাহারা আর বাংলার পাট কিনিতে চাহে না। দার্জ্জিলিং এর চা আর কিনিবে না,—এই মতলবে রুশিয়া নিজে চা' এর চাস আরম্ভ করিয়াছে। সস্তাদরের মালে জাপান বাংলার বাজারকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। বাংলাদেশের বুকের উপরে সুইডেন দিয়াশলাইর কারখানা খুলিয়াছে,—জেকোস্লোভাকিয়া জুতার কারখানা বসাইয়াছে;—ক্যানাডা এলুমিনিয়াম তৈয়ারীর আয়োজন করিতেছে,—আমেরিকা সিনেমার ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিয়াছে। এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বাংলার সংগ্রাম,—সেই সংগ্রামে জয়লাভ এবং সেই জয়লাভের আনন্দই যথার্থ শারদোৎসব।

উপনিষদের ঋষিগণ উপদেশ দিয়াছেন, "অন্নং ব্রহ্ম,—অন্নং বহুকুর্ব্বীত"। তাহারই অনুসরণে কৃষি শিল্প বাণিজ্য ঐশ্বর্য্যময়ী ব্রহ্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালী আজ আনন্দোচ্ছ্বসিত চিত্তে কোটী কণ্ঠে সমস্বরে বলুক,—

"বন্দে মাতরম্"।

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

পত্র লেখকগণের প্রতি

(যাঁহারা গ্রাহক নহেন)

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাঁহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, অথচ বিনামূল্যে এমন সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন যাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তাঁহাদের মতলব, **"একটি হরিতকীও গুরুদক্ষিণা দিব না,— কিন্তু মন্ত্রটি আদায় করিয়া নিব"**। এই রকমের লেখকদিগকে আমরা জানাইতেছি, ব্যবসায়ীর সন্ধান এবং মাল পত্র বেচা-কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাহারা এক একটা মালের জন্য এক এক বারের কেনা বেচায় শ' দু'শ হইতে হাজার বা ততোধিক টাকা দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ীর সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও

নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্য ৫।৵০ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হইলেই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা মোটা দালালী দিতে অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ, এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,—ফ্যাও,—ফ্যাও,—ফ্যাল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাঁক তালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,—অথচ তার জন্য একটী পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ, এই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

১৭ বৎসর যাবৎ কার্য্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি, গোড়াতে ফাঁকিবাজীর মতলব, বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে একটা প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য আমাদের অনুরোধ, যাঁহারা সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন। যাঁহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-জুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান মুফতে দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে এই যে, তাঁহারা যথেষ্ট লাভবান এবং উপকৃত হইয়াছেন আর আমরা লাভবান হওয়া ত দূরের কথা, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাঁহাদের পেট ভরাইয়াছি। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে। এই জন্য অতঃপর গ্রাহক না হইলে কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।

(যাঁহারা গ্রাহক আছেন)

আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহকগণ আমাদিগকে নানাবিধ ব্যবসায়সংক্রান্ত পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সকল প্রশ্ন করেন তাহার উত্তর ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিনা মূল্যেই প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ঐ সকল পত্রের অধিকাংশই উদ্দেশ্যবিহীন বৃথা প্রশ্নে পরিপূর্ণ। অনেকেই কেবলমাত্র কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান। বাস্তবিক কোন কাজকারবারে হাত দিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। তাঁহাদিগকে জানাইতেছি, আমরা তাঁহাদের জন্য বাজারে ঘুরিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া নানা রকমের সংবাদ সংগ্রহ করি; যদি তাঁহারা সে সকল কোন কাজে না লাগান, তবে আমাদের শুধু শুধু হয়রান এবং অর্থ ব্যয় করান কেন? তাঁহাদের নিকট অনুরোধ, যেন খামকা আমাদিগকে প্রশ্ন না করেন এবং আমাদের নিকট হইতে যে সন্ধান, সংবাদ অথবা পরামর্শ পাইয়া থাকেন তাহা যেন যথার্থ কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া নিজেরাও লাভবান্ হউন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিশ্রমকেও সার্থক করুন।

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মারফতে দিতে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, আমরা সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথকভাবে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র জোগাড় করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি **আমাদের যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ৵৹ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন।** গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে এই ফি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদিগের কাগজেই **বিনা মূল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিকে** প্রদান করিব। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক নম্বর পাঠানো চাই।**

১নং পত্র

মহাশয়,

আমার নিজস্ব ব্যবসা সম্পর্কে কতগুলি সংবাদ জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া লিখিলাম।

(১) আয়ুর্ব্বেদীয় ভাল মাসিক পত্রিকার ঠিকানা জানিতে চাই।

(২) কতগুলি ভেষজ,—অর্থাৎ শতমূল, অনন্ত মূল, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, পারুল, গাম্ভারী, ইত্যাদি দ্রব্যের মণ দর কত এবং কোথায় বিক্রীত হয়।

(৩) নপুংসক ছাগ একটির মূল্য কত হইতে পারে; কোথায় বিক্রী হইবে? ইতি—

নিবেদক
শ্রীরজনীকান্ত অধিকারী
গ্রাহক নং ৫৮৯২
সেক্রেটারী;—ঘোড়াঘাট, পাবলিক্ লাইব্রেরী
পোঃ ঘোড়াঘাট
জিঃ দিনাজপুর

১নং পত্রের উত্তর

আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে একখানা মাসিক পত্রের নাম আমরা বিশেষ রূপে লিখিতে পারি,—"আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্মিলনী"। ইহার আফিস ১৯১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায়। ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "স্বাস্থ্য সমাচার" নামক মাসিক পত্রেও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত আর কোন ভাল মাসিক পত্র এ বিষয়ে নাই। "ধন্বন্তরি" নামে আর একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্র ছিল,—এখন তাহা দেখিতে পাইনা,—উঠিয়া গিয়াছে কিনা জানিনা।

(২) ভেষজ দ্রব্যের দরের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আমাদের নাম উল্লেখ করিয়া পত্র লিখুন;—

১। শক্তি ঔষধালয়, স্বামীবাগ, ঢাকা।

২। কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস্; কল্পতরু প্যালেস্ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ কলিকাতা।

৩। বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ; ৩১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

৪। আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড, ঢাকা।

৫। সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ ২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ শ্যামাদাস ঔষধালয়, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৩) নপুংসক ছাগের মূল্যের জন্যও উপরি উক্ত ঠিকানায় চিঠি লিখিবেন।

২নং পত্র

মহাশয়,

আপনার মাসিক পত্রিকায় জানিতে পারিলাম, ডিম ফুটাইবার কল বা ইনকিউবেটার আপনাদের নিকট লিখিলে পাওয়া যাইবে। আমি ৪০টি ডিমের উপযোগী কল আনাইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু আমরা নূতন ও অনভিজ্ঞ, কাজেই তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ জানিতে পারি, এইরূপ কোন বহি থাকিলে তাহার এক কপি পূর্ব্বে পাঠাইয়া দিবেন। বহি পাঠ করিয়া যদি সুবিধা মনে করি তবে একখান কলের জন্য আপাততঃ অর্ডার দিব। আমাদের এখানে এরূপ কোন ব্যবসায় কেহ করে না এবং জানেও না।

অতএব আপনারা যদি আমাদিগকে যথাযথ পরামর্শ দানে শিক্ষিত করিতে পারেন তবে আপনার উত্তর পাইলেই অর্ডার দিব। একখান কলের দৈনিক খরচ এবং কত ডিম ফুটান যায় তাহা বিস্তৃত ভাবে লিখিবেন। কল আনিতে কত খরচ পড়িবে এবং বর্ত্তমান বাজার দর কত তাহাও লিখিবেন।

ইতি—
শ্রীসোমেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত
বিবির হাট,
পোঃ ফটিকছড়ি
জিং চট্টগ্রাম

২নং পত্রের উত্তর

ইন্‌কিউবিটার বা ডিম ফুটাইবার কল সম্বন্ধে আমাদের পুরাতন ব্যবসা ও বাণিজ্য কাগজে এ-বিষয়ের সকল জ্ঞাতব্য তথ্য পরিপূর্ণ সচিত্র বিস্তারিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহা কিনিয়া পড়িলে সকল বিষয় পুংখানুপুংখ রূপে জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। প্রতি বৎসরের এক সেটের দাম ২॥০ ডাক খরচা পৃথক লাগিবে।

৩নং পত্র

শ্রীযুক্ত ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্পাদক
মহাশয়—

আমি আপনার পত্রিকার একজন নূতন গ্রাহক। বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই কয় মাসের পত্রিকা পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। এই মূল্যবান পত্রিকার বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।

"কফি" ও "কোকো" এর পৃথিবীর বাজারে বেশ কাটতি আছে। আসামের চেরাপুঞ্জীর কাছে ছোট একটি কফির বাগান দেখিয়াছি

বলিয়া মনে হয়। গত আশ্বিন মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ভারতের কফির বাজার শীর্ষক প্রবন্ধে (৫৭১ পৃষ্ঠা) দেখিলাম মাদ্রাজ, মহীশূর, কুর্গ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি প্রদেশে কফির চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। অবশ্য আপনার আলোচনা হইতে কফির রপ্তানী হ্রাস হওয়ার সংবাদ কিছু নৈরাশ্য জনক। তবে সর্ব্বদাই যে এরকম থাকিবে মনে হয় না।

(১) আসামের জমিতে কফির ও "কোকোর" চাষ করিতে পারা যায় কিনা ?

(২) এই দুই চাষ সম্পর্কে ইংরাজী বা বাঙ্গালা ভাষায় কোনও পুস্তক পাওয়া যায় কি ?

(৩) এই দুই জিনিষ বিদেশে রপ্তানীর জন্য কলিকাতা বা বোম্বাই বা মাদ্রাজে কাহারা এজেন্টস্ ?

(৪) এই দুই জিনিষ চাষ করিতে হইলে প্রতি একরে কত চারা প্রয়োজন ?

(৫) বীজ আপনার মারফতে পাওয়া সম্ভবপর কিনা ?

(৬) সম্ভবপর হইলে প্রত্যেক মনের দর কত ?

(৭) শেষ পর্য্যন্ত ইহার জন্য কোনও ইঞ্জিন বা মেসিনারী প্রয়োজন হইবে কি ?

(৮) কাহাকেও কাজ শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইলে দক্ষিণ ভারতের কোনও বাগানে আপনি ঠিক করিয়া দিতে পারেন কি ?

(৯) আসামের বা বাঙ্গালার আর কোথাও এই দুই জিনিষের চাষ আছে কি ? ইত্যাদি ও আপনার বিবেচনা মত অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সত্বর জানান তবে বাধিত হইব। ইহার জন্য কোনও ব্যয় হইলে আমি বহন করিতে প্রস্তুত আছি।

যদি আমার এই চিঠি ও আপনার উত্তর ব্যবসা ও বাণিজ্য কাগজে ছাপান তবে আরও অনেকের পক্ষে সুবিধা হইবে। আমি সেজন্যই আরও বলিয়া রাখিতে চাই যে যদি কেহ কফি ও কোকোর চাষ আরম্ভ করিতে চান তবে সঙ্গে যেন ঔষধের গাছ গাছড়া (Medicinal herbs), আনারস, ইত্যাদির চাষ করেন, তাহা হইলে আর ক্ষতির আশঙ্কা বেশী থাকিবে না।

আসামের জমিতে (পাহাড় Tillah soil) রাবার চাষ কেমন হইবে এসম্বন্ধেও বিস্তারিত সংবাদ আমাকে জানাইয়া ও আপনার কাগজে ছাপাইয়া বাধিত করিবেন।

এই দুইটি সংবাদ আমার যথা সম্ভব শীঘ্র পাওয়া প্রয়োজন। কারণ সন্তোষ জনক হইলে আমি সত্বরই অর্থাৎ বর্ষার প্রারম্ভে যাহাতে চাষ আরম্ভ করিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিব।

ইতি—

সৈয়দ বদ্রুল হোসেন
গ্রাহক নং ৫৮৫৯
পোঃ কোনাউড়া, শ্রীহট্ট

৩নং পত্রের উত্তর

১। আমরা অনেকদিন পূর্ব্বে আসামের কোন ভদ্রলোকের নিকট হইতে তথাকার উৎপন্ন কফির বেরী বা ফলের নমুনা পাইয়াছিলাম। যদিও তাহা স্বাদে ও গন্ধে মহীশূর, কুর্গ, মোচা প্রভৃতি স্থানের কফির মত ছিলনা, তথাপি উহা আসামজাত বলিয়া আমরা তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য সেই ভদ্র লোকটীকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার নিকট হইতে আর কোন উত্তর পাই নাই।

তিনি আমাদের কাগজের গ্রাহক ছিলেন না। অনেকলোক আমাদিগকে খাম্‌কা এইরূপ উত্যক্ত করেন। তাঁহারা এইসব ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত অথবা কৃষি শিল্পের বিষয় আগ্রহের সহিত (Seriously) চিন্তা করেন না। কল্পনার আকাশ কুসুম রচনা করিয়া লম্বা লম্বা চিঠি লেখেন। কাজের বেলা কিছুই দেখি না। মনে রাখিবেন, ব্যবসা ক্ষেত্রে এই রকম ছেলেখেলার স্থান নাই।

২। কফি, কোকো ও রাবার ; এই সকল জিনিস দক্ষিণ ভারতেরই প্রধান ফসল। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মালবার, কূর্গ, নীলগিরি প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের প্রচুর চাষ হয়। ব্রহ্মদেশেও রাবারের যথেষ্ট চাষ আছে। আসামের জঙ্গলে ঐ জাতীয় বৃক্ষ বন্য-ভাবে জন্মে। পাহাড়িয়া লোকেরা তাহা হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। বাস্তবিক ব্যবসা ক্ষেত্রে উহার কোন স্থান নাই। কফি ও কোকো বেরী-জাতীয় (Berry) একপ্রকার ফল। কফি ফল দেখিতে আমাদের পরিচিত করঞ্জা ফলের মত কিন্তু রং ব্রাউন। উহাকে ভাজিয়া খোসা ছাড়াইয়া গুঁড়া করা হয়। রাবার গাছ খেজুর গাছের মত কাটারি দিয়া কাটিলে আঠার মত রাবার নির্গত হয়। উহাকে বিবিধ কার্য্যের উপযোগী করিয়া লইতে হইলে, অনেক রকমের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক।

৩। আসাম অঞ্চলে এই সব জিনিসের চাষ সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা চলিতেছে। যখন দেখা যাইবে, কফি, কোকো অথবা রাবারের চাষ আসামে, দক্ষিণ ভারতের মত সফল ও লাভজনক হইবে, তখন বড় রকমে কাজ অর্থাৎ প্ল্যানটেশন আরম্ভ হইতে পারে। সে এক বিরাট ব্যাপার ;—তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন,—বিশেষজ্ঞ এক্সপার্ট,—নানা রকম যন্ত্রপাতি কলকব্জা এসব চাই। সুতরাং আমাদের উপদেশ, "আদার বেপারীর জাহাজের খবর" লইয়া দরকার নাই।

৪। আপনি ঠিক প্র্যাকটিক্যাল ,—ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের মত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই। কোথায় কফি,—কোথায় কোকো তার ঠিকানা নাই। কফি-কোকোর গাছ কখনও চোখেও দেখেন নাই,—এখনই আপনি চাহিতেছেন বড বড় রপ্তানীকারক এজেণ্টদের নাম। ইহাকেই বলে, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল"। যাহা হউক আপনি যদি যথার্থই এবিষয়ে স্থির সংকল্প করিয়া থাকেন, তবে প্রথমতঃ ত্রিবাঙ্কুর, মালবার কোচিন প্রভৃতি অঞ্চল একবার ঘুরিয়া আসুন। সেখানকার কফি চাষের প্রণালী শিখিয়া আসুন। তারপর আসামে আসিয়া কয়েক লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া চাষ আরম্ভ করুন। দুইখানি পুস্তক পড়িয়া,—অথবা নিজের বাড়ীতে চারিটী কফির গাছ লাগাইয়া নূতন ব্যবসায়ে হাত দেওয়া চলে না।

৪নং পত্র

মহাশয়,

আমাদের সমিতি আপনাদের মাসিক পত্রিকার ৫৯৩২ নং এর গ্রাহক। আমাদের সমিতির তত্ত্বাবধানে আমরা কিছু কলাই এর ভুষি ও রেড়ির তৈল রাখিতে চাই। বর্ত্তমানে আমরা উহার সঠিক দর ও কোথায় সুবিধা অনুযায়ী পাওয়া যায় তাহার কোনই সংবাদ জানিনা। আশা করি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে উক্ত জিনিষ দুইটী ক্রয়ের বিস্তারিত বিবরণ ও ঠিকানাদি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

৪নং পত্রের উত্তর

১। কলাইয়ের ভুষির মণ একটাকা বার আনা। রেড়ির তৈলের মণ ১৩ টাকা হইতে

১৫ টাকা। এইখানে শুধু চল্‌তি আজ্‌কার বাজার দর দেওয়া গেল। দরের প্রায়ই উঠতি পড়্‌তি আছে। যদি আপনি কিনিতে চান তবে আমাদের ঠিকানায় মতিলাল সাহা দালালের নিকট অর্ডার পাঠাইতে পারেন।

২। কলাইয়ের ভূষির জন্য নিম্ন ঠিকানায় ব্যবসায়ীদের কাছে পত্র লিখুন,—

(১) আদম হাজী পীর মহম্মদ ইসাক, ১নং আমড়াতলা লেন, কলিকাতা

(২) গুলীরাম দিলবাগ ২৬নং বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৩) হাজী সত্তর হাজী পীর মহম্মদ ৯নং আমড়াতলা লেন

(৪) সম্বর সিং হরিশঙ্কর সিং ১৯২।৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

(৫) গীনুরাম গৌরীশঙ্কর ৯২ বাঁশতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

রেড়ির তৈলের জন্য নিম্ন ঠিকানায় ব্যবসায়ীদের নিকট চিঠি লিখুন :—

(১) রামাপদ ঘোষ এণ্ড সন্স ১৭।৪ ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা

(২) ললিত মোহন শীল এণ্ড সন্স ২৪৩নং মাণিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা

(৩) আদম হাজী পীর মহম্মদ ইসাক, ১নং আমড়াতলা লেন, কলিকাতা

(৪) খিমজী হংসরাজ ১৬৫ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

(৫) ডি, এম, লকাট ৬৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া ফেরত ডাকে জানান যে কোথায় ও কিরূপে fruit preserving শিক্ষা করা যাইতে পারে। যদি আপনি সঠিক বিবরণ অবগত না থাকেন, তবে আপনার পত্রিকার মারফতে তাহা জানিয়া আমাকে জানাইবেন। আমার এক পুত্র I. A. পরীক্ষা এইবার দিয়াছে এবং অন্য পুত্র মেট্রিক দিয়াছে। তাহাদিগকে Technical শিক্ষা দেওয়া আমার অভিপ্রায়। তাহারা Mathematics এ weak, কাজেই সকল লাইনে যাওয়া তাহাদের পক্ষে সুবিধা হইবে না ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া যদি আপনি কয়েকটি লাইনের বিবরণ আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তবে বিশেষ বাধিত হইব। আজ কাল যেরূপ বেকার সমস্যা তাহাতে তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষাদেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি না। কাজেই ভদ্রভাবে ও স্বাধীনভাবে জীবিকার সংস্থান করিতে পারে এইরূপ শিক্ষা দিতে আমি অভিলাষী। আপনাকে বিরক্ত করিতেছি এইজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। উত্তর পাইবার জন্য /০ আনা ষ্ট্যাম্প এতৎসহ দিলাম।

বশংবদ

* * * * *

শিলচর নর্ম্যাল স্কুল
পোঃ শিলচর
জেলা কাছাড়

৫নং পত্রের উত্তর

"ফল সংরক্ষণ প্রণালী" সম্বন্ধে আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য কাগজে বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ২॥০ টাকা মূল্যে (ডাক মাশুল ব্যতীত) সেই পুরাতন সেট কিনিয়া পড়িলে সমস্তই জানিতে পারিবেন।

জীবিকা নির্ব্বাচন,—অর্থাৎ কে কি পড়িবেন এবং কোন লাইনে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবেন, তৎসম্বন্ধে এই ভাদ্র মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পড়িলে আপনার পুত্রদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

সঞ্চয় হীনের দশা

যৌবন কালে হরেন বাবুর অর্থ সম্পদ, মান সম্ভ্রম, বন্ধুবান্ধব, সভাসদ, চাটুকার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার কথায় লোকে উঠিত বসিত। তিনি বলিলে লোকের চাকরি জুটিয়া যাইত। তিনি অসন্তুষ্ট হইলে কাহারও রক্ষা থাকিত না। ভোগে, বিলাসে, অভিনব খেয়ালে হরেন বাবুকে প্রাচীন বাদশাহী আদর্শের এক আধুনিক উদাহরণ বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। শুনা যায়, তিনি ছুটির সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইলে বাংলা দেশের মাটী ও জল হাওয়া ব্যতীত আর সকল উপকরণই সঙ্গে লইয়া চলিতেন। সুদূর পশ্চিমে, বাংলার একান্ত নিজের তরি তরকারী ও মৎস্য, অথবা যথাযথ ও নির্দ্দিষ্ট জাতীয় চাল, ডাল, তৈল, ঘৃত, চাকর, ঝি, বাসন, আসবাব, সটকা, তামাক কিম্বা কোন কিছুর অভাব হইলে হরেন বাবু তাহা বরদাস্ত করিতেন না। কন্যার বিবাহ কিম্বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে হরেন বাবুর ফিরিস্তি জার্ম্মান সমরের হতাহতের তালিকার মতই সুদীর্ঘ ও সর্ব্বগ্রাসী হইত। সে আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কিন্তু এখনও সে কথা লোকে কিম্বদন্তীর মতই আওড়াইতে থাকে।

কিন্তু, এ হেন হরেন বাবু আজ চাকরী অবসানে হৃত-সম্পদ এবং বিগত যৌবন অবস্থায় ছোট আদালতের উকিল মহলের "টাউট"। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন বাদী ফরিয়াদীদের উপযুক্ত উকিল সরবরাহ করিয়া দিনান্তে দুই এক টাকা সংগ্রহ করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া যান। ছোট টিনের চালায় স্বপাকে আহার ও ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করেন। কেন? কারণ, কিছুই নহে —শুধু অর্থাভাব। যৌবনে অগাধ অর্থ সম্পদ অপব্যবহার করিয়া হরেন বাবু আজ নিঃসম্বল। কিছু টাকা যাহা ছিল ভাঁটার মুখে রাতারাতি বড়লোক হইতে গিয়া তথাকথিত ব্যবসায়ে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহার দৌলতে কত লোকের একদিন সুসময়ে গিয়াছে, আজ তাহারই অভাবের দিনে কাহাকেও কোথাও দেখা যায় না।

গল্পটী কিছু অভিনব নহে। সময়ে বার্দ্ধক্যের পুঁজি ঠিক করিয়া না রাখিলে অনেকেরই এই দশা হয়। শুধু মানুষ কেন, জীবজগতে সঞ্চয়ের মূল্য সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য। উদাহরণ, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি। সময় থাকিতে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখা প্রয়োজন।

জীবন-বীমারও সার্থকতা এই কারণেই। যৌবনে, রোজগারের সময়ে, বিন্দু বিন্দু করিয়া যে অর্থ বীমায় রক্ষিত হয়, অভাবের সময়ে নিজের বা নিজের অবর্ত্তমানে, পরিবারবর্গের নিকট তাহাই প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, শীতল, সরোবরের রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হয়। বীমায় রক্ষিত অর্থ, সকল ভুল, ভ্রান্তি, মোহ, ও অপচয় আশঙ্কার উপরে। জীবিত থাকিলে বীমা বার্দ্ধক্যের সম্বল, মৃত্যু ঘটিলে পরিবারের আশ্রয়। ইহা ব্যতীত পুত্রের শিক্ষা কিম্বা কন্যার বিবাহের জন্যও বিশেষ বীমা করা যায়।

এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত উপদেশ পাইতে হইলে **ভারত ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ,** ভারত ভবন, কলিকাতা, ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। "ভারত" অদ্যাবধি তাহার বীমাকারীদিগকে এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়াছে। চল্লিশ বৎসরের পুরাতন আফিশ। বর্ত্তমানে মোট তহবিল দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। বীমার সর্ত্ত প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা ও লাভজনক। বীমাকারীদের পাওনা শোধ অতিসত্বর ও নির্ঝঞ্ঝাটে করা হয়। বাংলার সর্ব্বত্র এজেন্ট আছে।

পুস্তক সমালোচনা

জীবন বীমা ও এজেন্সী কার্য্যপদ্ধতি

শ্রীবেণী মাধব দেব রায় প্রণীত; মূল্য আট আনা। প্রকাশক, শ্রীঅম্বিকাচরণ নাথ বি এল, বিপণ লাইব্রেরী ঢাকা। আজকাল অনেক ভদ্র যুবক জীবনবীমা কোম্পানীর এজেন্সী কার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্য চাকুরী করিয়াও এই কার্য্য করা যায় বলিয়া অনেক চাকুরীওয়ালা কিঞ্চিৎ উপরি রোজগারের জন্য এজেন্সীর কাজ করেন। "কিঞ্চিৎ রোজগার" বলিলে বাস্তবিক ভুল হয়, কারণ, আমরা জানি অনেকে এই কার্য্যে খুব মোটা টাকা পান,—এমন কি তাহা চাকুরীর বেতন অপেক্ষাও বেশী হয়। যাহা হউক, জীবনবীমার এজেন্সী কার্য্য যে একটী সৎ ও সম্মানিত উপজীবিকা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকে না জানিয়া শুনিয়া এই কার্য্য গ্রহণ করেন বলিয়া সফলতা লাভ করিতে পারেন না। বাস্তবিক এজেন্সীর কার্য্য নিতান্ত সোজা নহে। যদিও কোন পরীক্ষায় পাশ না করিয়াই এই কার্য্য পাওয়া যায়,—তথাপি রীতিমত কাজ করিয়া সফল হইতে হইলে, ইহাতে শিখিবার অনেক আছে। এই পুস্তকখানি সে বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবে।

এজেন্টদের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, কিরূপে খরিদ্দারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে হয়, বীমার প্রস্তাব কি কৌশলে উত্থাপন করা যায়, বাহ্যিক আকৃতির সহিত স্বাস্থ্য ও রোগের সম্বন্ধ, কোম্পানী নির্ব্বাচন,—অর্থাৎ কোন্ কোম্পানীর এজেন্সী গ্রহণ করা উচিত, প্রিমিয়াম ও য়্যানুইটী নির্দ্ধারণ প্রণালী, জীবন বীমার স্বপক্ষে যুক্তির ব্যাখ্যা এবং জীবন বীমার বিপক্ষে আপত্তির খণ্ডন,—প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় এই পুস্তকে অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। চক্রবৃদ্ধি সুদ, বর্ত্তমান মূল্য, মৃত্যুর হার, সুস্থ পুরুষের দেহের ভার সম্বন্ধে কয়েকটী তালিকা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে,—সে সবও এজেন্টদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। আমরা আশা করি, এজেন্ট কার্য্যপ্রার্থী অথবা এজেন্সী কার্য্যে

ব্রতী সকলেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া এবং সঙ্গে রাখিয়া উপকৃত হইবেন।

Milk and Milk Products

২২নং আর জি কর রোড (কেশবভবন) কলিকাতা এই ঠিকানা হইতে ইন্‌ডাষ্ট্রী পাবলিশারস্ লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

এই পুস্তকখানি গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী সকলের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইলেও ইহা সামান্যজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝিতে পারিবেন। দুগ্ধ সম্বন্ধে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিবরণ,—দুগ্ধের উপাদান, দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দ্রব্য, দুগ্ধ সংরক্ষণ, মাখন, ঘি, জমাট দুগ্ধ, ছানা প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী,—সমস্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১২ খানি সুন্দর চিত্রদ্বারা স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাঁহারা কুটীর শিল্পরূপে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির ব্যবসা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই খুব সুন্দর,—সেই হিসাবে মূল্য বেশী নহে।

Govinda's Kadcha—A black Forgery. (গোবিন্দ দাসের কড়চা;—একটা জঘন্য জালিয়াতি)

বি ভি দাস গুপ্ত প্রণীত, মূল্য এক টাকা। ১০ নং দোলাইগঞ্জ ষ্টেশন রোড, ঢাকা হইতে এস্ এন দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। "গোবিন্দ দাসের কড়চা" নামক একখানি পুস্তক প্রথমতঃ ১৮১৯ সালে শান্তিপুর হাইস্কুলের হেড্‌পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সমাজে এই পুস্তকখানি অত্যন্ত সুপরিচিত ও প্রভাবশীল। ১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। প্রথম হইতেই এই পুস্তক খানিকে লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিল। উহা লইয়া খুব তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদ চলিতে থাকে। একদল ইহাকে সাহিত্যিক জালিয়াতি বলিয়া নিন্দা করেন, অপর দল ইহাকে চৈতন্যের সম-সাময়িক বাংলা দেশের ধর্ম্ম ও সমাজের একটা নিখুঁত চিত্র বলিয়া প্রশংসা করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুস্তক খানি প্রকাশিত হইবার পর এই তর্ক-বিতর্ক আরও বাড়িয়া উঠে। তবে মীমাংসা বিশেষ কিছু হয় নাই। সম্প্রতি মিঃ বি ভি দাসগুপ্ত ইংরাজী ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া তাহাতে গোবিন্দ দাসের কড়চার জালিয়াতি সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। সেই পুস্তকই আমাদের সমালোচনার বিষয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলার, বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত স্যার যদুনাথ সরকার এই পুস্তক খানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। গোবিন্দ দাসের কড়চার ভাষা ও লিখিবার ভঙ্গী—উহার প্রথম প্রকাশের ইতিহাস,—জয়গোপাল গোস্বামীর প্রকাশিত সংস্করণ ও ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের প্রকাশিত সংস্করণের মধ্যে পাঠের পার্থক্য,—প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া মিঃ বি ভি দাশগুপ্ত নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিয়াছেন, বাস্তবিক গোবিন্দ দাসের কড়চা, একটা জঘন্য জালিয়াতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

তাঁহার অকাট্য যুক্তিতে ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের কার্য্যেও কলঙ্কপাত হইয়াছে,—কড়্চার লেখক যে গোবিন্দ কর্ম্মকার এতকাল পর্য্যন্ত বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে পার্শ্বচর বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিয়াছিল,—সেই গোবিন্দ কর্ম্মকারের অস্তিত্বও মিথ্যা কাল্পনিক বলিয়া উড়িয়া গিয়াছে। পুস্তকখানি প্রধানতঃ ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ্ (Challange) বা আহ্বান,—তাঁহারা কেন এত টাকা খরচ করিয়া এই মিথ্যা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন, তার কৈফিয়তের দাবী। পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত হওয়াতে, সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইবার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রগণের পড়িবার সুবিধা হইয়াছে।

—❖—

Industry Year Book and Directory 1937. মূল্য ৫ টাকা। ডাক মাশুল ১৫ আনা (অতিরিক্ত)। প্রকাশক :— ইন্ডাষ্ট্রী পাব্লিসার্স লিমিটেড্। কেশব ভবন (২২নং আর জি কর রোড), শ্যাম বাজার, কলিকাতা।

থ্যাকার্স ডাইরেক্টরীকে সরাইয়া এই মূল্যবান পুস্তক খানি ক্রমে ক্রমে ব্যবসায়ী মহলে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ১১০০ পৃষ্ঠার এই বৃহৎ গ্রন্থখানি ৫ টাকা মূল্যে দেওয়া বাস্তবিক ব্যবসায় ক্ষেত্রে একটি যুগান্তর ব্যাপার এবং একমাত্র ইন্ডাষ্ট্রী পাবলিসার্স কর্ত্তৃকই সম্ভব। ব্যবসায় ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রয়োজনীয় বিবরণে পরিপূর্ণ হইয়া এই পুস্তক খানি প্রকাশিত হয়। আমরা দেখিতেছি ক্রমশঃ ইহার আয়তন সৌন্দর্য্য ও তথ্য সম্ভার বৃদ্ধি পাইতেছে,—অথচ মূল্য সেই ৫ টাকাই রহিয়াছে। এবারকার পুস্তকে ১৮টি অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি আছে,—সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়,—রেল সম্বন্ধীয় বিবরণ, জাহাজের কথা, অর্থনীতি, মাপ এবং ওজন, শ্রমিক ও বাণিজ্য বিষয়ক আইন, ব্যবসায় সমিতি, বাণিজ্য পরিভাষা ও সঙ্কেত, ভারতীয় বাণিজ্য সমালোচনা (১৯৩৬-৩৭), বার্ষিক উৎপন্ন দ্রব্যের হিসাব, খনিজ দ্রব্য, সমগ্র দেশের সিভিল ষ্টেশন সমূহ, হাট বাজার, মেলার বিবরণ, শিল্প বিদ্যালয়, ব্যবসায়ীদের তালিকা, সংবাদ পত্রাদির নাম ও ঠিকানা, বিস্তৃত সূচীপত্র। কেবল মাত্র ব্যবসায়ীর নহে,—পুস্তক খানি গৃহস্থ, ছাত্র, অধ্যাপক, জননায়ক, লেখক, পণ্ডিত সকলেরই পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। যাঁহারা দেশের কথা লইয়া আন্দোলন করেন,—দেশের সংগঠন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। ইহার ছাপা বাঁধাই ও সাজ সজ্জা অতি সুন্দর এবং মূল্যও কম,—যাহাতে সকলেই কিনিতে পারেন।

১৯৩৩-৩৪ সালের শেষে বোম্বাই মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে কতগুলি ব্যাঙ্কিং কোম্পানী কারবার করিত। নিম্নে তাহার একটী হিসাব দেওয়া হইল,—

	সংখ্যা	রেজেষ্ট্রারীকৃত মূলধন টাকা	বিক্রীত মূলধন টাকা	আদায়ী মূলধন টাকা
বঙ্গদেশ	৪৫৫	৮১৬২২৫০০০	৬৭৬৭৩৭৬৭	৩৫২৬৯৪৭৯
মাদ্রাজ	২৪৬	৮৯৭৭৬৬৫৬	৭২৩২৭৫৬৪	৮৩২৬৭৯৬৬
বোম্বাই	৪৫	৮৩১৮৫১৫০	৪৪২৭৭৬২৮	২৪৫১৪৬৬৪

এই তালিকাতে যদিও দেখা যায়, বাংলা দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কিন্তু আদায়ী মূলধন এবং ডিপজিটের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা কম। বোম্বাইতে উহার পরিমাণ গড়ে ৫ লক্ষ টাকা,—মাদ্রাজে পৌণে দুই লক্ষ টাকা;—বাংলাদেশে মাত্র ৭৭ হাজার টাকা। ইহাতেই বুঝা যায়, বাংলাদেশে ব্যাঙ্কের কারবার কত অধঃপতিত,—এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয় না কেন?

স্বদেশী যুগের আরম্ভে,—৩২ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশে যে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল, তাহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিশ্বাস, একতা, সহযোগিতা এবং স্বার্থত্যাগের ভাব দেখা দেয়। সেই সুযোগেই তখন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠে। ২০ বৎসর পর্য্যন্ত জয় ধ্বজা উড়াইয়া বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বাঙ্গালীর গৌরব ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর ব্যবসা বাণিজ্য ও আর্থিক উন্নতির বহু প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সেই ধাক্কা সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারে নাই। তারপর কো অপারেটিভ্ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের পতন হওয়াতে বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হইল।

ব্যবসা ক্ষেত্রে উঠ্‌তি পড়্‌তির সাধারণ নিয়ম অনুসারে কোন কারবারে যদি আঘাত লাগে,

তবে তাহাতে মূল ভিত্তি নষ্ট হয় না,—আবার ধীরে ধীরে সমস্ত শোধ্‌রাইয়া যায় ;—আবার কারবার ফাঁপিয়া উঠে। কিন্তু বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পতন সেই পথে হয় নাই। ব্যবসায় ক্ষেত্রে রাজনীতিক দলাদলি ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষই উহার পতনের কারণ। সেই অপ্রিয় এবং দুঃখজনক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এখন কোন ফল নাই। বাঙ্গালী নাকে খৎ দিয়া দুই কাণ মলিয়া এই শিক্ষা করুক, আর কখনও ব্যবসায় ক্ষেত্রে রাজনীতিক মতবাদের কাঁটা ছড়াইবে না ;—আর্থিক উন্নতির পথে আর কখনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের পাহাড় খাড়া করিবে না।

নিম্নে কলিকাতার বাজারের কয়েকটি প্রধান ব্যাঙ্কের এক বৎসরের আর্থিক অবস্থার একটা হিসাব দেওয়া হইল,—

ব্যাঙ্কের নাম	বৎসর শেষ	রেজেষ্টারীকৃত মূলধন	আদায়ী মূলধন	রিজার্ভ ও কন্টিজেন্সী তহবিল	মোট ডিপজিট	ডিভিডেণ্ড শতকরা
		লক্ষ টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া	৩১-১২-৩৬	৩৫০	১৬৮১৩২০০	৭০০০০০০	৩১৪৮৫১৪০০	৬ ট্যাক্স ক্যাশ সার্টিফিকেট সহ মুক্ত
ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া	৩১-১২-৩৬	২০০	১০০০০০০০	১০৫০০০০০	১৬৯৯৯৪৩০০	১০ ,,
ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা	৩১-১২-৩৬	৬০	৩০০০০০০	২৩৫০০০০	৬৯৪৫০৮৮০	১০ ,,
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	৩১-৩-৩৬	৪০	৩৫৫০০০০	৪৪৫০০০০	৯৭৬৩৬৩১০	১২ ,,
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৩১-১২-৩৬	১০০	৪৩৪৮০১	২৫৩৭২৩	৬৪৮৪৯৬০	৫ ,,
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন	৩১-১২ ৩৬	১৫	৩২৬৩৯৬	৫১১০০০	৮৭৮৭৯৬০	১৪ ট্যাক্স মুক্ত
কুমিল্লা ইউ-নিয়ান ব্যাঙ্ক	১৩-৪-৩৭	১০	৩৫২১৯০	৫৬৭৩৪৪	৯৪ লক্ষের উপর	১২॥০ ,,
ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন	৩০-৬-৩৬	২	১২৫০০০	২২০০০০	৭১৪৩৯০০	৬ ,,
নোয়াখালী নাথ ব্যাঙ্ক	১৩-৪-৩৬	২৫	১৩৫০৫৯	৩৫০০০	২০২৪৩৯০	৬।০ ট্যাক্স মুক্ত

বাঙ্গালীর পরিচালিত ব্যাঙ্ক্ সমূহের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা যথার্থরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত আমরা প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া ছিলাম। এযাবৎ আমরা কুমিল্লা ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক এবং বেঙ্গল সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের জবাব পাইয়াছি। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম; কুমিল্লা ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের ডিপজিটের পরিমাণ প্রায় এক কোটী টাকার কাছে গিয়াছে। ব্যাঙ্কের রিজার্ভ তহবিলের টাকা গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে লগ্নী আছে। বর্ত্তমানে ইহার কলিকাতা, ঢাকা, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চট্টগ্রাম, বক্সীর হাট (চট্টগ্রাম), নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ময়মনসিংহ, গৌহাটী, ডিব্রুগড়, টিনসুকিয়া, রাজসাহী, জোরহাট, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এই ১৬টী শাখা আফিস রহিয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে কুমিল্লা ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কুমিল্লা ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি

বৎসর	আদায়ী মূলধন টাকা	রিজার্ভ তহবিল টাকা	ডিপজিট টাকা	ডিভিডেণ্ড শতকরা
১৯২৩-২৪	৪৮৬০	৮৫০	৬২০০০	১২॥০
১৯২৪-২৫	১২৪৪৫	৪৯০০	২১২০০০	১৫
১৯২৫-২৬	১৬১০০	১২০০০	৪৩১০০০	১৫
১৯২৬-২৭	২১০৩০	২৪০০০	৭৪৬০০০	২০
১৯২৭-২৮	২৮১০৫	৫৩০০০	৯৪৯০০০	২০
১৯২৮-২৯	৪৩৭৭৫	৯০০০০	১৩৩৭০০০	২০
১৯২৯-৩০	৮৩৪৫৫	১৩৯০০০	১৬৭০০০০	২০
১৯৩০-৩১	১১২২২০	১৭৭০০০	১৭৪৮০০০	২০
১৯৩১-৩২	১১৮৩৮০	১৯০০০০	১৮২০০০০	১৫
১৯৩২-৩৩	১২৫৫০০	২০০০০০	২১২৪০০০	১৫

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইবে,—

বেঙ্গল সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি

৩১শে ডিসেম্বর	ডিপজিট ইত্যাদি টাকা	মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড টাকা	গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য সিকিউরিটীতে পরিমাণ লগ্নীর টাকা
১৯১৯	১৮৬০০	৩৩৮১১	×
১৯২০	১৪১৮০০	৪৬৩৯৯	×
১৯২১	১৮৯৩০০	৭২২৮৯	×

৩১ শে ডিসেম্বর	ডিপজিট ইত্যাদি টাকা	মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড টাকা	গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য সিকিউরিটিতে পরিমাণ লগ্নীর টাকা
১৯২২	২৪৫৬০০	৯০৫৬৪	৪১৬
১৯২৩	২৮৮৭৬০	১০৭২৭৩	৪২৬
১৯২৪	৪০৩৭৫০	১৩১২৮০	১৬৫৩১
১৯২৫	৫০১৯৬০	১৫১৬৩৩	৪৬০৭৩
১৯২৬	৭১৬৮১২	১৮৬৬৮৪	৮৫৭৮৭
১৯২৭	১০৫০৭৬৮	২২৯৪৪৩	২২৭৮০১
১৯২৮	১৬২৩৩৫৭	২৫৮৩০৫	২৮২৬৮৮
১৯২৯	১৫২৩৭৯৯	৪০৪৭৩৫	২৭৭১২০
১৯৩০	১৭৩৭৬৮৯	৪৭৮৭০০	২৪৯৯৪৭
১৯৩১	২০৮০০০৪	৫০০২৬২	৩২২৬৯৬
১৯৩২	২৪৬৫২৪৬	৫০৩৩০৯	৪৩৮১১১
১৯৩৩	২৮৮২৩০২	৫১৪২৯৪	৪৭৭৭৭৬
১৯৩৪	৪০০৫৪৪০	৫৪৭৭৫৯	৬১১২০৫
১৯৩৫	৫৫১৫৭৭৯	৬৭১৩২১	৭৮৬১৭৭

কলিকাতায় বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিম্নলিখিত ব্রাঞ্চ অফিস আছে,—শ্যামবাজার, গৌরীবাড়ী, মাণিকতলা, জোড়াসাঁকো, হ্যারিসন রোড, বৌবাজার। মফঃস্বলে ইহার নিম্নলিখিত ব্রাঞ্চ আছে,—বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং ঢাকা, চক বাজার ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, বহরমপুর, (মুরশিদাবাদ)। ইহার লণ্ডনস্থিত এজেণ্টস্—মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কস্ লিমিটেড্।
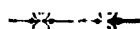
সেণ্ট্রাল ক্যাল্‌কাটা ব্যাঙ্ক্ লিমিটেড্

৩, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা দেশে যে কয়েকটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভাল ভাবে দাঁড়াইতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু সেণ্ট্রাল ক্যাল্‌কাটা ব্যাঙ্ক সম্পর্কে সেকথা বলা চলে না। এই ব্যাঙ্কটি নূতন হইলেও, ইহা এই কয় বছরেও কার্য্যে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে, ব্যাঙ্কিং কারবারে তাহা কৃতিত্বের পরিচায়ক। নিম্নে ইহার আর্থিক অবস্থার উন্নতির একটি

তালিকা দেওয়া গেল :—

সাল	বিক্রীত মূলধন	প্রদত্ত মূলধন	সাধারণের ডিপজিট বা জমার
	টাকা	টাকা	টাকা
জুন ১৯৩৫	২৪,৭৮০	৭,৭৮৩	১৬,১৯৬ ৭-৬½
জুন ১৯৩৬	২৬,৬৩০	৮,৮৬৩	১০২,৭৯৬-১ ৫½
জুন ১৯৩৭	৫০,৫৪০	১৭,২৫১	২,৩০,৩৯৩-৫-৩½

উক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে আর্থিক দিক দিয়া ইহা উন্নতির পথে চলিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে, ইহার টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ ব্যাপারে লগ্নী আছে। ব্যাঙ্কের ব্যাপারে এইটাই হইল আসল কথা। ইহার জন্যই ব্যাঙ্কের ডিপজিটের টাকার পরিমাণ এই বছর আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণের নিকট যথেষ্ট বিশ্বাস অর্জ্জন না করিলে এবকম সম্ভব হয় না। নূতন ব্যাঙ্কের পক্ষে ইহা কম সুখ্যাতির কথা নয়।

ইহার পরিচালনা ভার যোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পিত আছে। সম্প্রতি সিরাজগঞ্জে ইহার শাখা খোলা হইয়াছে। আমরা এই ব্যাঙ্কটির অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

মুন্সীগঞ্জে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য

মিঃ এ, টি, গাঙ্গুলীর রাজোচিত দান

ব্যবসা জগতে মিঃ গাঙ্গুলীর নাম না শুনিয়াছেন এরূপ লোক বিরল। ইণ্ডিয়ান সোপ জর্ণালের সুযোগ্য সম্পাদকরূপে ভারতের বাহিরেও তাঁহার নাম অপরিচিত নহে; ভারতীয় সাবান ব্যবসায় সংক্রান্ত এই কাগজ খানি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে ইহাতে কত মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মিঃ গাঙ্গুলী Handwares ব্যবসায়েও যথেষ্ট সাফল্য ও কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন; এই সাফল্যের লাভ তিনি একাকী ভোগ করেন নাই; নিজের জেলার লোকদিগের শিক্ষার উন্নতিকল্পে মুন্সীগঞ্জে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি তিনি একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতাস্থ Soap Makers Association-এর সভ্যগণ তাঁহাকে একটী চাপার্টী দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।
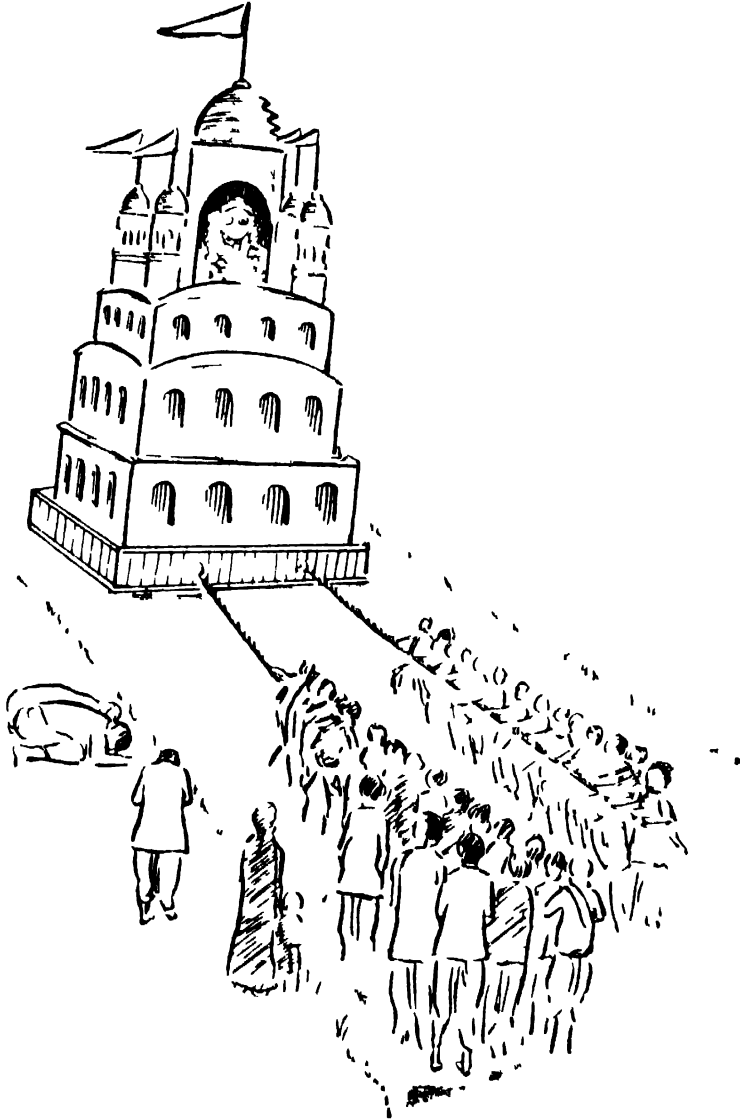
রথযাত্রা

রথ যাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম,
ভক্তেরা লুটিয়া পথে করিছে প্রণাম।
রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি
মূর্ত্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।

অমুকস্থ অমুক

বর্ত্তমান সময়ে মফঃস্বলের জেলা এবং মহকুমাতেও কালেক্টর বদলীর ব্যাপার একটা রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনের সামিল হইয়া দাঁড়াইযাছে। তিন বৎসর অন্তে একজন কালেক্টর অন্যত্র বদলী হইয়া গেলেন—তাঁহার স্থানে আর একজন জেলা বা মহকুমা হাকিম এলেন। অমনি বিদায় অভিনন্দন ও স্বাগত সম্বর্দ্ধনার ধুম পড়িয়া ত গেলই, তা' ছাড়া Interview এরই বা মহড়া কত!—

এই ব্যাপার নিয়ে সব জায়গাতেই নানা দল থাকে।

সচরাচর একটা দল দেখা যায়,—যাহাদিগকে লোকে "রাজ্য রক্ষার দল" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করে—নূতন হাকিম আসিলে তাহাদের একেবারে আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইয়া যায়। তাহাদের মস্ত বড় ভাবনা,—কেমন করিয়া আবার তাহারা এই নূতন সাহেব বাহাদুরের দরজায় সোনার-কাঠি, রূপার-কাঠি হইয়া দাঁড়াইবে! সাহেব এইটুকু বুঝিলেই তাহাদের "দুগ্ধ-মচ্ছ" বজায় থাকে, যে এই কয়েকটি প্রাণী আছে বলিয়াই জেলাটা আজিও ইংরেজের হাতে আছে, নচেৎ এতদিনে এটা হস্তচ্যুত হইয়া যাইত!—

দ্বিতীয় আর একটা দল আছে, যাঁহাদিগকে লোকে "পসারী ব্রাদার্স" বলিয়া চিহ্নিত করে;—তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটা ছোট-খাট প্রতিষ্ঠানের 'ডিরেক্টর', 'ম্যানেজার' কিম্বা 'ম্যানেজিং ডিরেক্টর' এর পদ বাগাইয়া বাজারে পসার ঠিক রাখেন। ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহাদের পক্ষে এক একটা 'পসারহাটার' দোকানের মত,—লাট সাহেব হইতে কালেক্টর সাহেব পর্য্যন্ত যে যখন আসেন তখনই উঁহারা নিজ নিজ দোকানের জৌলুস দেখাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে 'আহা-মরি' প্রাপ্তির ফন্দি এবং কসরৎ চালাইয়া থাকেন!—

"আজ্ঞে, আমি অমুকস্থ অমুক"—এই কার্য্যে

জীবন-যৌবন সমর্পণ করিয়া দিন কর্ত্তন করিয়া থাকি !”—

ইহারা চায় Recognition অর্থাৎ এক একটা ‘মঞ্জুরী’ ! একবার ঐটা প্রাপ্তি ঘটিলেই সাহেব বাড়ীর দরজা ঠেলিবার অধিকার লাভ ঘটে এবং ইহ সংসারে সেটা কদাচ অলাভেরও হয় না।

তৃতীয় আর একটা মিস্‌লেনিয়াস (miscellaneous) দল আছে, তাহাদিগকে লোকে “স্বয়ং সিদ্ধ এণ্ড কোং” বলিয়া বিদ্রূপ
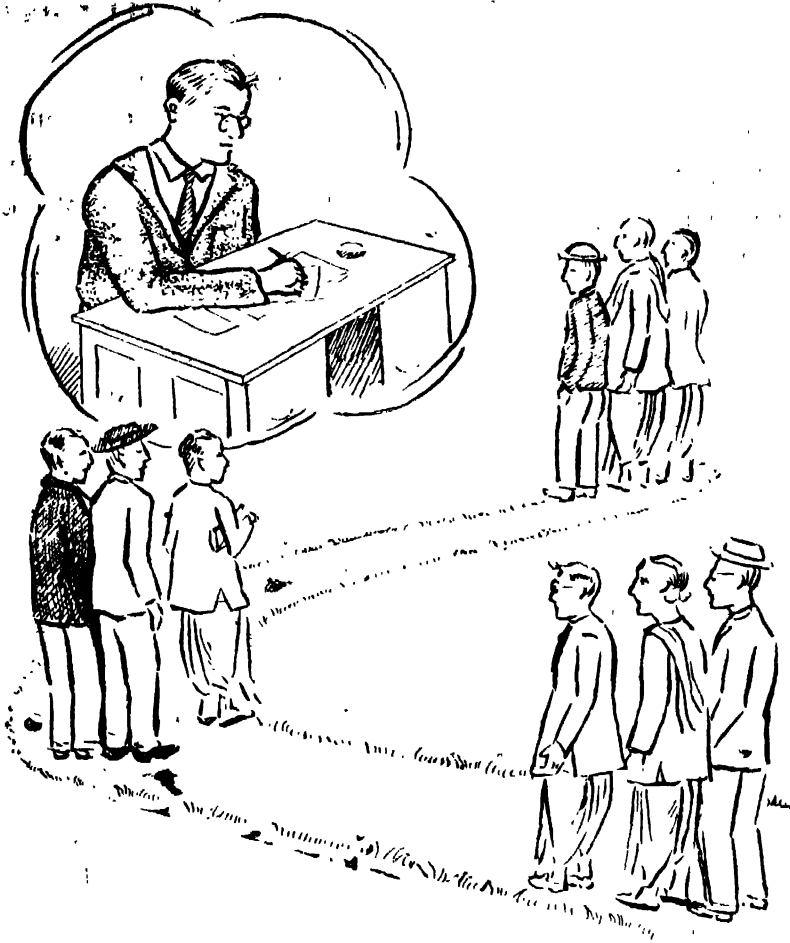
“অমুকস্য অমুকের” দল কালেক্টর সাহেবের কুঠীতে হানা দিতে যাইতেছেন

করে। তাহারা যথা,—

“আজ্ঞে আমি গৌড়দূত পত্রিকার সম্পাদক”,—

“আজ্ঞে আমি কামচ্‌কাট্‌কার ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছি”,—

“আজ্ঞে আমি ভেরেণ্ডা পিসিয়া তৈল বাহির করিয়াছি”,—

“আজ্ঞে আমি হোসেন সা’র আমলের মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছি”,—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

“মিস্‌লেনিয়াস কোম্পানীর” মেম্বরগণ

এইরূপ এক একটা 'ছিপ' হাতে করিয়া বসিয়া আছেন ;—কবে কে কোন্ 'ছিপে' 'রুই-কাতলা' আট্‌কাইয়া ছিলেন, তাঁহাদের কাছে সে সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারা যায় !—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ভবানী বাবুকে 'একটা পুরাণো মুদ্রা' দেখাইতে পারিলে 'মোকদ্দমার দিন' পাওয়া যাইত ,—বটব্যাল সাহেবকে খালিসপুরের যা কিছু হউক্ একটা ইতিহাস বানাইয়া দিতে পারিলে তিন ক্রোশ পথ হাটাইয়া লওয়া যাইত ;—মিঃ পেডিকে বলিলেই হইত, অমুক মহাজন সাঁওতালের 'বালাখানা-তোষাখানা' লুঠিয়া লইয়াছে ! বাস্, তাহার আর রক্ষা নাই। এ সমস্ত বেবাক তত্ত্বই উক্ত 'মিস্‌লেনিয়াস কোম্পানীর' কণ্ঠগত !

—অথচ জেলার প্রকৃত অধিবাসীরা ইহার চতুঃসীমার মধ্যেও নাই !

—কি বিপদ ! জেলায় আসিয়া পৌছিতে না পৌছিতে ভদ্রলোককে চারিদিক হইতে কী ভাবেই ইহারা আক্রমণ করে। আহার নিদ্রার পর্য্যন্ত অবকাশ দেয় না।—**"আজ্ঞে, আমি অমুকস্য অমুক"** !

রাজভক্তির আমরা নিন্দা করি না, রাজ পুরুষের সম্মান-সমাদর আমরা অনাবশ্যক মনে করি না, কিম্বা অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখি না ;—কিন্তু লজ্জারও ত একটা সীমা আছে ?—এবং সৌজন্য-শিষ্টাচার বলিয়াও ত একটা কথা আছে !—**"আমি অমুকস্য অমুক"** ?

—আবার এ'ও দেখি, সেদিন যাহারা মিঃ অমুকের আঁচল ধরিয়া টানিয়া রাখিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিল, আজ তাহারাই আবার সর্ব্বাগ্রে অন্য প্রভুর সন্ধানে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে।

—লেখাটা শ্লেষ-বিদ্রূপের মত মনে হইতে পারে,—অবৈজ্ঞানিক এবং impolitic অর্থাৎ চাণক্য-সূত্র বহির্ভূত সাব্যস্ত হইতে পারে, কিন্তু যাহারা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া 'চাল্' দেখে, তাহারা অনেকেই ব্যাপারটা এই চক্ষেই দেখিয়া থাকে।

—রক্ষে কর, বাবা !

শ্রীলালবিহারী মজুমদার

ভিটামিন B
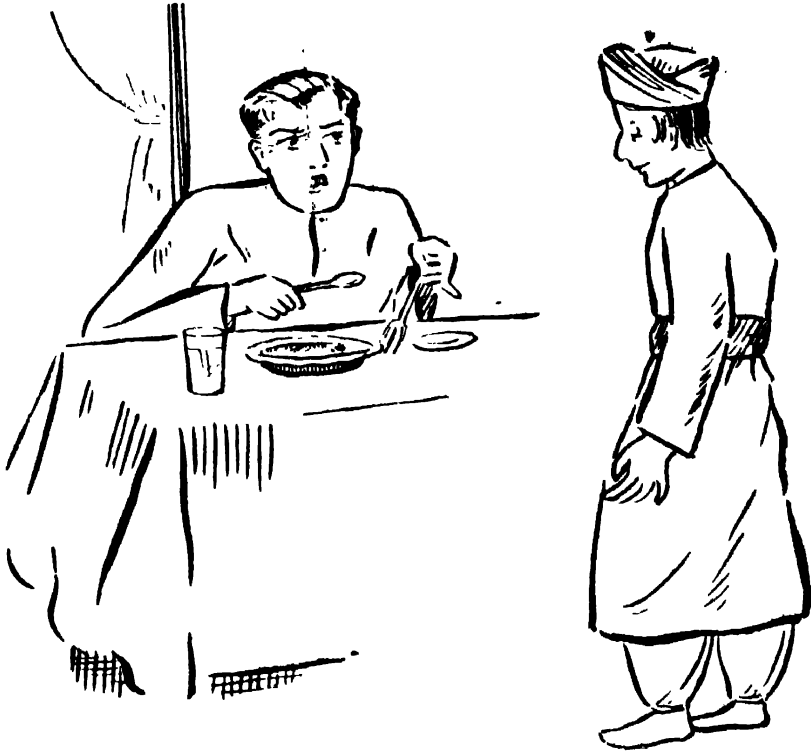
বাবু "ফার্পোতে" খানা খাইতে বসিয়াছেন। Soupএর মধ্যে একটা মাছি দেখিয়া বলিলেন—বয়! এটা কী?—

বয় সপ্রতিভ ভাবে উত্তর করিল,—হুজুর! ওটা ভিটামিন "B"

পাগলের গান

ভণ্ড কাব্য
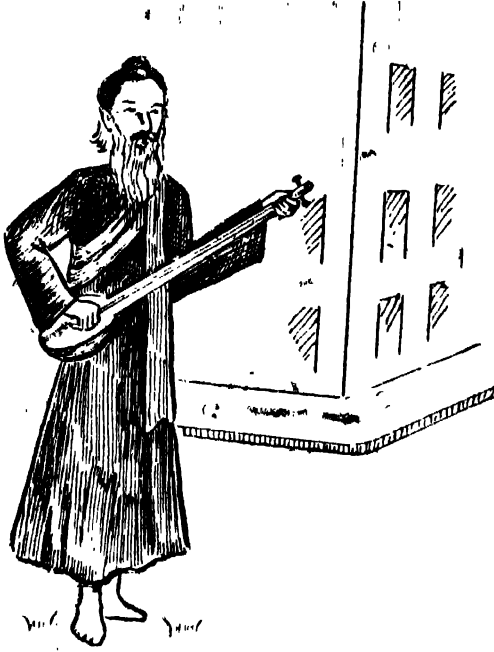
দুনিয়া ভাঁড়ের * আস্তানা। ধু ॥
হেথা ভাঁড়ে ভাঁড়ে আঁধার ঘরে
ফুটায়ে খায় 'মগদানা'।
সাধু-ভাঁড় গ'ড়ে চেলা,
যু'ড়ে দ্যায় ভোগের মেলা,
তারা দিন-উপোসী হবিষ্যাশী,
রেতে মারেন সর-ছানা।

পণ্ডিত-ভাঁড় 'পাতি' দিয়ে
হাত পাতেন পয়সা চেয়ে,
সেথা টাকা দিলে 'বিধান' মিলে
'শূওর গরু'র নাই মানা।
বামূন-ভাঁড় ফলার পেলে,
'সন্ধ্যা' ফেলে ছোটে ধেয়ে,
তাঁরা পেটে পোরেন, গামছায় মোড়েন,
হাত মেলে চান 'দখ্‌ষিনা'।

উকিল-ভাঁড় 'ছওয়াল' যুড়ে,
ফ্যালেন 'উদোর পিণ্ডি বুদোর' ঘাড়ে,
তাঁরা সাধু মেরে, পাপী ছাড়ান্,
সাক্ষী ক'রে তিন্ টানা।

নায়েব-ভাঁড় বড় ঘরে,
মালিক ম'লে চিম্‌টা গাড়ে,
পেয়ে বেওয়ারিশ, সবায় 'বারিশ'
সঙ্গী জুঠায় দশজনা।

বণিক-ভাঁড় 'ভেজাল' দিয়ে,
আসল-ব'লে দ্যায় চালায়ে,
যখন 'আকাল' ডাকে, চৌগুণ হাঁকে,
সুযোগ পেলেই 'দরটানা'।

কবি-ভাঁড় 'কেচ্ছা' গেয়ে
দ্যায় ধুলো কাদা মানীর গায়ে,
তাদের পয়সার লোভে, বাংলা ডোবে,
'আর্টের' নামে দিগ্‌বসনা।

সব দিকে আছে খাঁটি
(যাদের) পায়ের ধূলায় শুদ্ধ মাটি,
পাগল তাদের পাদুকাটি,
খুঁজে বেড়ায়, উন্মনা।

* এখানে "ভণ্ড"কে ভাঁড় বলা হইয়াছে, যেমন "ষণ্ড"কে ষাঁড় বলা হয়।

(জনশক্তি হইতে)

হাফ্ খোরাকি

দুই ভাই গোয়ালন্দ ষ্টেশনে নামিয়া এক হোটেলে ঢুকিল। হোটেলওয়ালা অতি সমাদর করিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। বড় ভাই হোটেলওয়ালাকে বলিল যে তাহার ছোট ভাইয়ের বয়স অল্প; সুতরাং উহার "হাফ্ খোরাকির" পয়সা লইতে হইবে, কিন্তু সে নিজে পুরাই দিবে। এই বলিয়া সে ভাইকে খাইতে বলিয়া স্নান করিতে গেল। ছোট ভাই ক্রমান্বয়ে তিন থালা ভাত কেবল ডাল তরকারী দিয়াই সাবাড় করিয়া যখন পুনরায় মাছ ও ভাত চাহিল, তখন হোটেলওয়ালা তাহার বড় ভাইকে স্নান করিয়া ফিরিতে দেখিয়া কহিল—

"মশায়, "হাফ খোরাকির" নমুনা যদি এই হয়, তবে "ফুল খোরাকি" যোগাইতে আমাকে দেউলিয়া হইতে হইবে। আপনি অপর হোটেল দেখুন।"

পাব্‌লিশার ও নবীন গ্রন্থকার
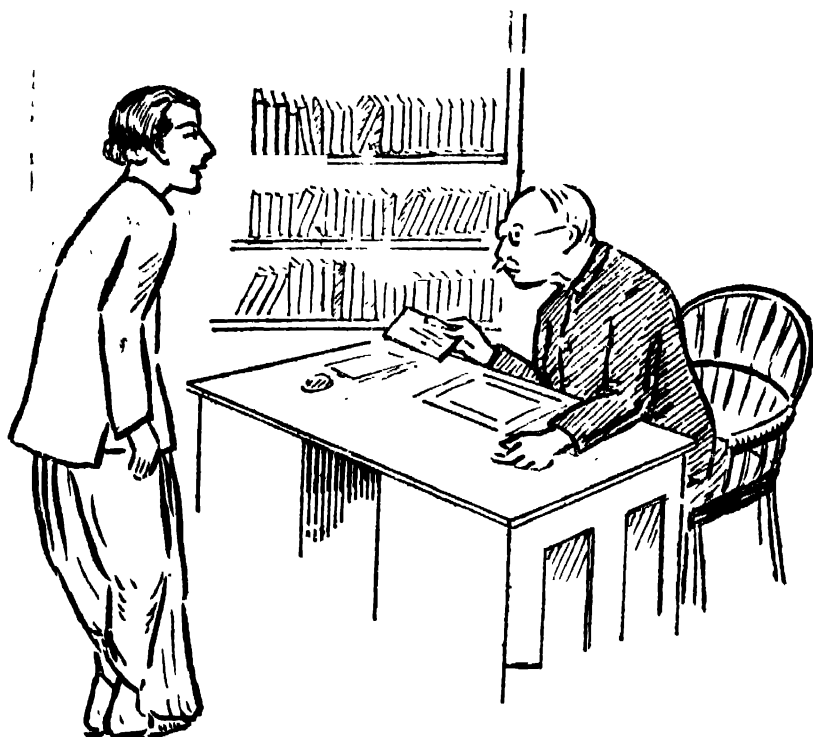
গ্রন্থকার ভয়ে, সঙ্কোচে, বিনয়ে, নত হইয়া মুখ কাচু মাচু করিয়া পাব্‌লিশারের নিকট আসিয়া সুধাইলেন।—আজ্ঞে মশাই! পূজা ত এল! যাদের কাছে Complimentary Copies পাঠিয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে আমার বই খানার appreciations কিছু এল কি?—

পাব্‌লিশার ক্রূর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, এই একখানা চিঠি এসেছে বটে; আপনার নাম ও এই নাম একই, তাই কিছু গোলমাল বেধেছে। ইনি লিখেছেন যে এখুনি কাগজে নোটীশ দিয়ে দিন যে এ বইয়ের লেখক আমি নই।
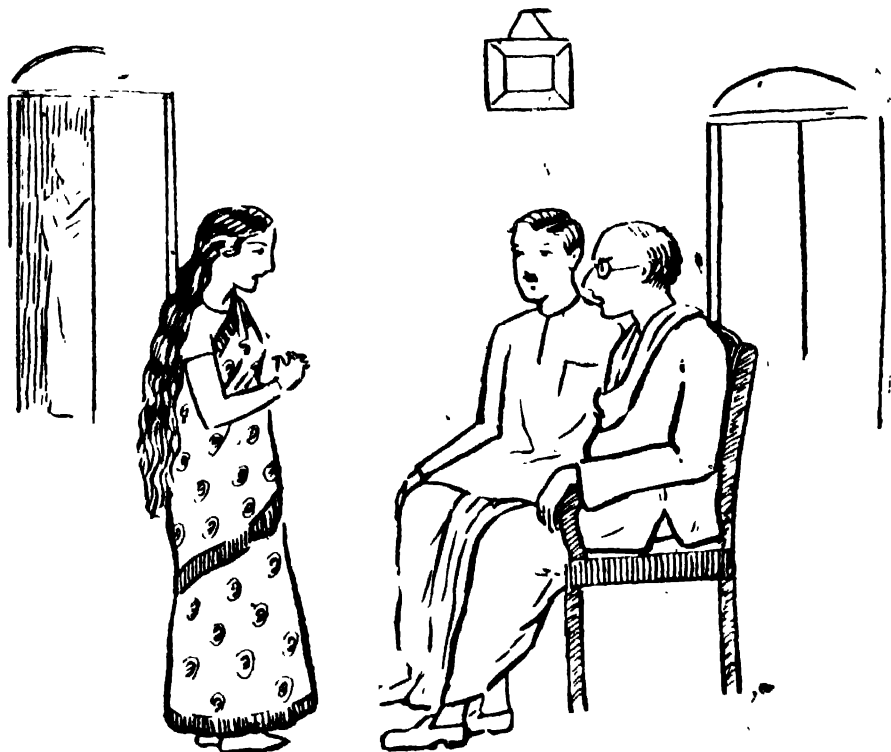
পাত্রী দেখা

অত্যন্তাধুনিক রুচিপরায়ণ যুবক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে পাত্রী দেখতে গিয়েছেন। নিজেই কন্যাকে প্রশ্ন করছেন,—

প্রঃ—লেখা পড়া জান ?—

উঃ—কিছু কিছু শিখেছি।

প্রঃ—শরৎ চাটুয্যে, বুদ্ধদেব বোস, অচিন্ত্য সেন, এদের বই টই প'ড়েছ ?—

উঃ—(কুণ্ঠিত ভাবে) না—বঙ্কিম বাবু, রবী ঠাকুর, প্রভাত মুখুজ্জে প্রভৃতির বইই পড়েছি।

প্রঃ--গান জান ?

উঃ—কিছু কিছু জানি—

প্রঃ--Dance জান ?—গর্ব্বা, মণিপুরী, পোয়ে ওরিয়েণ্ট্যাল্ ?—

উঃ—আজ্ঞে না—মা ব'লেছেন ওসব নাচ্ টাচ্ তোমার শাশুড়ীর কাছে শিখো।

পাত্রী দেখা

(অন্যত্র)
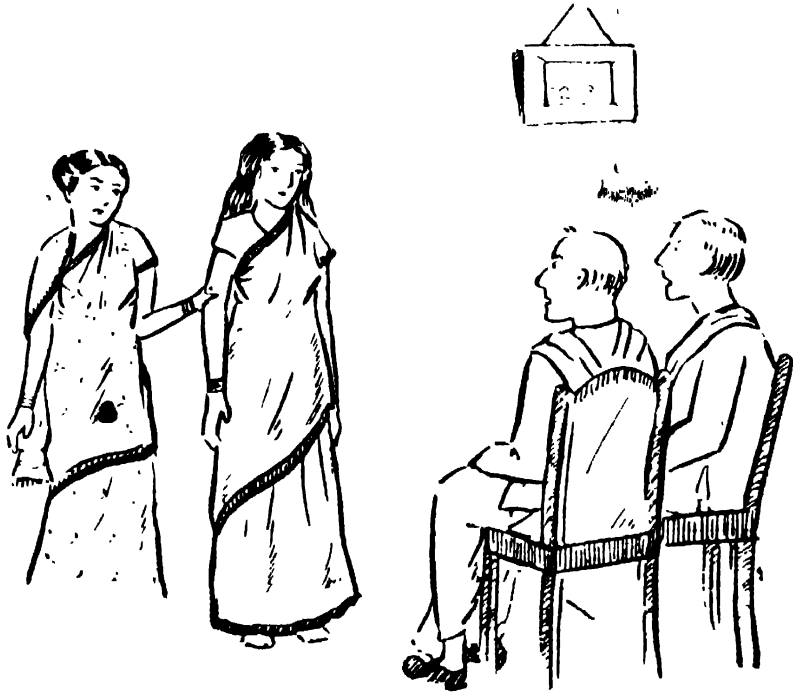
প্রঃ—সেলাইয়ের কাজ জান?—Hem, Drawn thread, Embroidery শিখেছ?—

উঃ—মোটামুটী এক রকম জানি।

প্রঃ—রোগীর সেবা?—সাগু, বার্লী, এ্যারারুট, জাগসুপ, পুল্‌টীশ করা, Bed pan দেওয়া এসব জানত?—

উঃ—তাও মোটামুটি জানি।

প্রঃ—আচ্ছা রান্নাবান্না?—শুক্তোতে কি মশলা আর কোন্ কোন্ তরকারী দিতে হয়?—পটলের দোল্‌মা, ছানার ডাল্‌না, ধোকার টক্, চিংড়ী মাছের মালাই কারী, চীনে কাট্‌লেট্, মোগ্‌লাই কারী, মাটন্ রোষ্ট্ পাঁঠার দো পেঁযাজী, টীকিয়া কাবাব ইত্যাদি কেমন করে রাধ্‌তে হয় তা জান?—

(প্রশ্নের বহর শুনিয়া ছোট বোন দিদির হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া)—

দিদি!—চ'লে আয়। ওরা ত মেয়ে দেখতে আসেনি—ওরা একাধারে বাঁদী ও বামুনী খুঁজতে এসেছে।

—•—

রেলওয়ে টাইমটেবেল

হাওড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে সকল মেল ট্রেণ এবং প্রধান প্রধান এক্সপ্রেস ট্রেণ যাতায়াত করে তাহাদের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল। সমস্তই কলিকাতার টাইম বলিয়া গণ্য হইবে।

হাওড়া ষ্টেশন

ই, আই, আর :—

	পৌছে	ছাড়ে
কলিকাতা-দিল্লী কালকা মেল	সকাল ৮ ৭	রাত্রি ৯ ১০
বোম্বে মেল	সকাল ৮-৪১	রাত্রি ৮-৩৪
কলিকাতা-পাঞ্জাব মেল	সকাল ৭- ১০	রাত্রি ৭ ৪০
ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল, বোম্বাইয়ের বেলার্ড পীয়ার পর্য্যন্ত (কেবল বৃহস্পতিবার)		রাত্রি ১০ ৫
পাঞ্জাব এক্সপ্রেস, মেন লাইন এবং সাহারাণপুর হইয়া	দিবা ২-৫৫	সকাল ১২-৫৫
দিল্লী এক্সপ্রেস, গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া	সন্ধ্যা ৬ ৫৫	বিকাল ৪-৪৪
দেরাদুন এক্সপ্রেস, ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার	সকাল ৬-২০	রাত্রি ১০-২৫
বেনারস মেইন লাইন হইয়া	সকাল ৮-২৫	বৈকাল ৬ ৫০
দানাপুর এক্সপ্রেস মেইন লাইন হইয়া	সকাল ৭ ৫৫	রাত্রি ৯-৩৪
দানাপুর এক্সপ্রেস সাহেবগঞ্জ লুপ হইয়া	সকাল ৮ ৩৯	রাত্রি ৭-১৪
দিল্লী এক্সপ্রেস মেইন লাইন হইয়া	সন্ধ্যা ৬-৪৫	রাত্রি ১০-৩৯

বি, এন, আর :—

	পৌছে	ছাড়ে
বম্বে মেল	সকাল ৭-৩৩	রাত্রি ৭ ২৪
মাদ্রাজ মেল	সকাল ৭-৫৯	রাত্রি ৮-৫৪
পুরী এক্সপ্রেস	সকাল ৬-৩০	রাত্রি ৮- ০
রাঁচী ফাষ্ট	সকাল ৬ ১০	রাত্রি ৯- ৪
পুরুলিয়া ফাষ্ট	সকাল ৫ ৪৪	রাত্রি ৯-১০
১৩ ডাউন ও ১৪ আপ হাওড়া নাগপুর	সকাল ৯-	রাত্রি ৯-১৪
হাওড়া নাগপুর	সকাল ৫-১৪	রাত্রি ১০-৩৪
১১ ডাউন ও ১২ আপ হাওড়া নাগপুর	সন্ধ্যা ৫-৩০	সকাল ৯-
গোমো প্যাসেঞ্জার	রাত্রি ৮-১৪	সকাল ৬-৪৪

শিয়ালদহ ষ্টেশন

ই, বি, আর :—

	পৌছে	ছাড়ে
দার্জ্জিলিং মেল	সকাল ৭-২৪	রাত্রি ৯
আসাম মেল	মধ্যাহ্ন ১-১৫	মধ্যাহ্ন ১ ৩০
ঢাকা মেল	সকাল ৫-৫৯	রাত্রি ১০-২৪
চট্টগ্রাম মেল	রাত্রি ৮-২৪	সকাল ৭-৩০
বরিশাল এক্সপ্রেস	সকাল ১০-৩৪	বিকাল ৩ ৫০
নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস	সকাল ৫-৩৯	রাত্রি ৯-৫৪
সিরাজগঞ্জ মেল	সকাল ৭-৩৪	রাত্রি ৮-৫০

ডাকের সময়

কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট অফিসে শেষ কখন চিঠি ডাকে দিলে তাহা পরবর্ত্তী ডাকে যাইবে তাহার সময় তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আকিয়াব, কাউকপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, শিলচর	সকাল	৫-৪৫
আসাম	,,	১১-৩০
শিউড়ী, দুমকা, ভাগলপুর (লুপ লাইন)	বিকাল	৫-০
বোম্বে (ভায়া নাগপুর),	,,	৫-১৫
পাঞ্জাব (ই আই আর), রাজপুতনা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ	,,	৫-৪৫
বোম্বে (ভায়া জব্বলপুর), গয়া, হাজারীবাগ	,,	৬-৩০
দার্জ্জিলিং, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, পূর্ণিয়া, পাবনা এবং উত্তর-বঙ্গ	বিকাল	৬-৫০
রাঁচি, জামসেদপুর, টাটানগর, চাইবাসা এবং চক্রধরপুর	,,	৬-৩০
মাদ্রাজ, কটক, পুরী, বালেশ্বর	,,	৬-৩০
পুরুলিয়া, মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া	,,	৬-৩০
মধ্য বাংলা, যশোহর এবং খুলনা	,,	৭-৩০
মুর্শিদাবাদ, মালদহ, এবং কৃষ্ণনগর	,,	৭-৩০
ত্রিপুরা, শিলচর, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট	,,	৭ ৩০

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৭শ বর্ষ } কার্ত্তিক---১৩৪৪ { ৭ম সংখ্যা

টমাস বাটার আত্মজীবন চরিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাহা হউক, আমার কারবারের নূতন ব্যালেন্স্ সীটে দেন। পাওনার মধ্যে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ভীষণ ও অধিকতর নিরাশাজনক অসামঞ্জস্য প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বোক্ত দেউলিয়া ফার্ম্মের দেনা গুলো আমার ঘাড়ে পড়াতেই এই বিপদের সৃষ্টি। ইহা কাটাইয়া উঠিতে আমাকে আবার কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, টাকা কড়ি অপেক্ষা পরিশ্রম অধ্যবসায়, সাধুসংকল্প, সত্যনিষ্ঠা,—এইসব চারিত্রিক গুণকেই আমি শ্রেষ্ঠ মূলধন বলিয়া গণ্য করি। আপদে বিপদে, ব্যবসায়ের দুরবস্থা এবং সঙ্কট সময়ে আমি এই মূলধনের উপরে নির্ভর করিয়াই রক্ষা পাই। আমার মহাজন, পাওনাদার ও খরিদদার সকল আমাকে এই কারণেই বিশ্বাস করিত এবং তাহাদের বিশ্বাসই ছিল, আমার প্রধান সম্পত্তি।

আমি যদিও এই বিপদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম,—আমাদের পরিবারের কিন্তু ইহাতে সর্ব্বনাশ হইল। আমার পিতা ঐ দেউলিয়া ফার্ম্মের কতগুলো দেনার দায় ঘাড়ে লইয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ স্বভাবের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অনেকবার তিনি ঝক্কি সামলাইয়াছিলেন,—কিন্তু এবারে আর পারিলেন না। আমার পিতাও শেষে দেউলিয়া হইলেন,—এবং তাঁহার কারবার উঠিয়া গেল। আমি কিছুতেই তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। কিরূপে বাঁচাইব?—আমারও যে সেই

অবস্থা! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,—পিতার কারবার রক্ষা করিতে যাইয়া যে আমি শুদ্ধ ডুবিয়া মরি নাই! যাহা হউক, উত্তরকালে আমার অবস্থা যখন একটু স্বচ্ছল হয়, তখন আমি পিতার দেনা অনেকটা পরিশোধ করিয়াছিলাম। পাওনাদার-দের মধ্যে যাহাদের খোঁজ খবর ও ঠিকানা পাইয়াছিলাম, তাহাদের সকলের টাকাই মিটাইয়া দিয়াছি।

এই সময়ে আমার কারখানায় একটা পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। এ যাবৎ মিস্ত্রীরা সকল কাজ হাতেই করিত,—কিন্তু কারবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, হাতের কাজের দ্বারা আর পারা যায় না। ভিয়েনা সহরের একজন বড় জুতা ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়, তাহাতে আমি সেই ব্যবসায়ীকে চামড়ার তলী বিশিষ্ট কানভাস্ জুতা সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হই। তখন আমাদের ও-অঞ্চলে ঐ রকম জুতা কেহ তৈয়ারী করিত না। এই চুক্তি লইয়া আমি এক বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, আমি নিজে মিস্ত্রীদেরে কাজ শিখাইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল তৈয়ারী করিয়া উঠিতে পারিব। কিন্তু কাজে হাত দিয়া নিরাশ হইলাম। দেখিলাম, এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহা একেবারে অসম্ভব। ব্যবসার ক্ষেত্রে আমার সুনাম নষ্ট হইবার ভয় হইল। বাস্তবিক যে ব্যবসায়ী কথা দিয়া কথা রাখিতে না পারে,—চুক্তি মত কাজ করিতে না পারে,—তাহার কারবার অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যায়।

যাহা হউক, উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় দেখিলাম, যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা। আমি তখন রুশিয়ার বিখ্যাত চিন্তাশীল মনীষী কাউণ্ট টলষ্টয়ের লেখা পুস্তক সমূহ পড়িয়া সেই নেশায় মশগুল,—যন্ত্রপাতি ও আধুনিক উন্নত ধরণের পদ্ধতি ছাড়িয়া আদিম কালের সরল জীবনযাত্রা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ এই রকমের ধারণা আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন থাকিলে ত চলিবেনা। যখন কারবার করিতে বসিয়াছি, তখন চুক্তির সর্ত্ত রক্ষা করিতে হইবে,—ওয়াদা-মত মাল জোগাইতে হইবে। দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা ব্যবসা চলেনা। যেরূপেই হউক,—আমাকে এখন নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে মাল তৈয়ারী করিতে হইবে,—ইহাই প্রধান কথা।

জুতার তলার অংশগুলি ছাটকাট করাই খুব ঝঞ্চাটের কাজ। যাহারা পুস্তক বাঁধাইর কাজ করে, সেই দপ্তরীদের নিকট হইতে একটা চাপ দিবার যন্ত্র (press) কিনিলাম। উহাতে কাটিবার ছুরি লাগাইয়া দেখিলাম, বেশ কাজ চলে। কিন্তু কাযটী বড় সোজা নয়,—যন্ত্রটীকে আগাগোড়া বদ্লাইয়া একরকম নূতনই করা হইল। আমাদের ও-অঞ্চলটা ছিল একেবারে অজ্ পাড়াগাঁ;—যন্ত্রপাতির কাজ জানা লোক কেহ ছিলনা। সুতরাং ঐ যন্ত্রটীকে পরিবর্ত্তিত করাইয়া বসাইতে এবং কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিতে আমার যে পরিশ্রম ও শক্তি ব্যয় হইয়াছিল,—আমাদের ইলেকট্রিক কারখানা তৈয়ারী করিতেও বোধ হয় এত লাগে নাই। যাহা হউক, আমার এই নূতন যন্ত্রটীতে যেমন সুন্দর কাজ উত্রাইতে লাগিল, তাহাতে যন্ত্রের উপর আমার বিরুদ্ধ-ভাব অনেকটা কমিয়া আসিল। জুতার তলী কাট্ ছাঁট করিবার অসুবিধা আমার তখনও যায় নাই। তাহা দূর করিবার জন্য আমি নানা

স্থানে খোঁজ-খবর লইতেছিলাম। কারণ ঐটাই ছিল, আমার প্রধান অসুবিধা। আমি প্রাগ্ সহরে এক জুতাব্যবসায়ীর নিকট গেলাম। সহরের উপকণ্ঠে ভিনোহাডি নামক স্থানে তাঁহার কারখানা ছিল। তিনি জুতা ব্যবসায় সম্বন্ধে একখানি সংবাদ পত্রও পরিচালনা করিতেন। আমি তাঁহার নিকট এবিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ চাহিলাম। তিনি বলিলেন জার্ম্মানীর একটী কারখানায় জুতা তৈয়ারীর নানাবিধ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়। সেই সকল যন্ত্র অনেক জুতার কারখানায় বসান হইয়াছে। কিন্তু খদ্দেরগণ হাতের তৈয়ারী জুতাই পছন্দ করে বেশী। সুতরাং ঐ সকল যন্ত্র এখন দিনের দিন অকেজো হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি যে কি করিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার মনের তখন দোদুল্যমান অবস্থা। এদিকে ভিয়েনার সেই জুতা ব্যবসায়ীর সঙ্গে যে চুক্তি ছিল, তাহারও মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে।

আমি জার্ম্মাণীর অন্তর্গত ফ্রাঙ্কফর্ট অন্ মেইন সহরের দিকে রওনা হইলাম। প্রাগে যে জুতা ব্যবসায়ীর সহিত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তিনি আমাকে ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই, জার্ম্মাণীর কোন্ সহরে জুতার মেসিন তৈয়ারী হয়। তিনি কেবলমাত্র জার্ম্মাণীর নাম করিয়াছিলেন। "কোথায় যাই,—কোথায় যাই",—অস্থির চিত্তে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ ফ্রাঙ্কফর্ট অন্ মেইন সহরের নাম আমার মনে হইল। কারণ এই সহরের কোন কারখানার মালিকের নিকট হইতে আমি একখানা চিঠি পাইয়াছিলাম;— তাহাতে লেখা ছিল যে ঐ কারখানায় জুতা তৈয়ারীর নানাবিধ মেসিন ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত এবং প্রয়োজনমত সরবরাহ হইয়া থাকে। তখনই প্রাগ্ হইতে ফ্রাঙ্কফর্ট সহরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমার পরিধানে একটি পাতলা আল পাকার সুট্, পায়ে একজোড়া কেম্বিসের জুতা- এইমাত্র আমার পোষাক। একটা হ্যাণ্ড ব্যাগও সঙ্গে নাই। ফ্রাঙ্কফর্ট সহরে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে জাঁকালো ঘরবাড়ী,—লম্বা চওড়া রাস্তা, গাড়ী ঘোড়া যান বাহনের বহর,—লোক জনের পোষাক পরিচ্ছদ ও চলা ফেরার কায়দা দেখিয়া আমার তাক লাগিয়া গেল। এত বড় সহরে কোন্ রাস্তা দিয়া কোথায় যাইব কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। কারণ সেই কারখানার ঠিকানা আমার জানা ছিল না। অগত্যা একজন পুলিশ পাহারাওয়ালার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, সে আমাদের মত সাধারণ জুতা ব্যবসায়ী অপেক্ষা জুতার কারখানার খবর অনেক বেশী রাখে। সে আমাকে তখনি মিনাস এ জি (Moenus A. G.) কোম্পানীর কারখানার ঠিকানা বলিয়া দিল এবং কোন রাস্তা দিয়া সেই কারখানায় যাইতে হইবে, তাহাও ভালরূপে চিনাইয়া দিল। ঐ কারখানাতে যে জুতা তৈয়ারীর নানারকম মেসিন প্রস্তুত হয়, সে খবরও তাহার নিকট পাইলাম।

পুলিশ পাহারাওয়ালাকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার নির্দ্দেশমত রাস্তা ধরিয়া আমি অবিলম্বে মিনাস্ এ. জি, কোম্পানীর কারখানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কি বিরাট রাজ প্রাসাদের মত বাড়ী,—কি প্রকাণ্ড ফটক,— আমার ত প্রথমে ঢুকিতেই ভয় হইল।

দেখিলাম, সেখানকার দরওয়ান, মজুরদের পোষাকও আমার ঐ আলপাকার স্যুট্ কিম্বা ঐ ক্যাম্বিসের জুতা অপেক্ষা দামী ও সুন্দর। নিতান্ত ভয়ে ভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার একেবারে চক্ষু স্থির।

আমি জানিতাম, শুধু পাঞ্চিং ও সেলাইর কাজই যন্ত্রের সাহায্যে করা যায়। সেইজন্য এখানে আমি ঐ রকম সামান্য দুই একটা মেসিনের খোঁজেই আসিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, জুতা তৈয়ারীর হেন কাজ নাই,—যাহা মেসিনে হয় না। চামড়া চাঁচা ছোলা, ছাঁট কাট হইতে আরম্ভ করিয়া সেলাই ও ফিনিস্ পর্য্যন্ত যাবতীয় কাজ সমস্তই মেসিনের সাহায্যে হইতেছে। ছোট বড় এত রকমারি মেসিন আমি কখনো কল্পনাও করিতে পারি নাই। কারখানায় ঘুরিতে ঘুরিতে চারিদিকে চাহিয়া আমার মনে হইল যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যে আছি। দেখিলাম, জুতা তৈয়ারীতে কোন কাজই আর হাতে করিতে হয় না। আমার ইচ্ছা হইল, এই সব যন্ত্র নিয়া আমার জিলিনের ক্ষুদ্র কারখানায় বসাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ষ্টীম ইঞ্জিন অথবা ইলেকট্রিক শক্তি ব্যতীত ঐ সব কল চালাইবার উপায় নাই। আমার কারখানাতে সেই ব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। শুধু তাহাই নহে,—ঐ সকল মেসিনের দাম এত বেশী ছিল যে,—দু'টী একটি ক্রয় করাও আমার পক্ষে অসাধ্য। সুতরাং "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথঃ"—দরিদ্রের মনোবাসনা মনে উঠিয়া মনেই মিলাইয়া যায়।

ফ্রাঙ্কফর্টের সেই কারখানা হইতে কয়েকটা হস্তচালিত ছোট যন্ত্র কিনিয়া আমি বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। পথে চলিতে চলিতে চিন্তা ভাবনায় আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল। কিন্তু এখন আর সেই ভিয়েনার জুতা ব্যবসায়ীর চুক্তি রক্ষা বিষয়ে আমার কোন চিন্তা ছিল না। ফ্রাঙ্কফর্টের কারখানায় যাহা দেখিলাম, তাহাতে সেই চুক্তি রক্ষা করা আমার কাছে অতি সামান্য ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। এমন উন্নত ধরণের যন্ত্র,—যাহা দ্বারা আমার কারখানার উৎপাদন হাজার গুণে বৃদ্ধি করা যায়,—সেই সব যন্ত্র থাকিতে আমি কেন যে ভিয়েনার জুতা ব্যবসায়ীর চুক্তি রক্ষায় চিন্তিত হইয়াছিলাম,—তাহা ভাবিয়া এখন আমার নিজেরই মনে মনে হাসি পাইল।

(ক্রমশঃ)
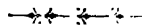
বাংলার লবণ-শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল

বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর ডিরেক্টর রূপে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এন, কে, বসু প্রভৃতি কোম্পানীর পুরুষোত্তমপুর ও দাদনপাত্রের কারখানার কার্য্যাবলী সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন, তাতে বাংলা দেশে লবণ শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলেই মনে হয়। উক্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, কোম্পানীর করকচ্ লবণ ও 'ফাইন' বা মিহি লবণ উৎপাদন করতে যথাক্রমে মণ পিছু খরচা পড়ে ২ আনা ও ৭ আনা। তাছাড়া কোম্পানী খুব অল্প খরচায় গুটিকয়েক বাই প্রোডাক্টও উৎপাদন করছেন। কোম্পানী আরও দেখিয়েছেন যে, ব্রহ্মদেশের উৎপাদন প্রণালী ও কোরমাণ্ডেল উপকূলের উৎপাদন প্রণালীর সমন্বয়ে বাংলা দেশেও কৃতিত্বের সঙ্গে Solar salt বা সূর্য্যোত্তাপে উৎপন্ন করা যেতে পারে।

বর্ত্তমানে হামবার্গের আমদানী কর্কচ ও ফাইন লবণের মণপ্রতি মূল্য হ'ল (ডিউটি ও প্রেরণ খরচ ছাড়া) যথাক্রমে ৯ আনা ও ১০ আনা। বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর উৎপাদিত লবণ কারখানা থেকে উলুবেড়িয়ায় আনতে খরচ পড়ে মণ পিছু মাত্র ২ আনা। সুতরাং কোম্পানীর কর্কচ লবণ উৎপাদন ও উলুবেড়িয়ায় চালান দিতে সর্ব্বসমেত মণ পিছু খরচ পড়ল ৪ আনা ও ফাইন লবণে খরচ পড়ে ৯ আনার কিছু বেশী। সুতরাং দেখা-যাচ্ছে যে দেশী লবণ অনায়াসে বিদেশী লবণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমর্থ হ'বে।

মেদিনীপুরের এক্সাইজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁর লবণ সংক্রান্ত রিপোর্টে বলেছেন—"ব্যবসার দিক দিয়ে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের (বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী) বিফল হওয়ার কোনই কারণ নেই। আমার বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই যে, নানা রকম বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে কোম্পানী যতখানি কাজ চালিয়েছেন তা' সন্তোষজনক।"

এই সমস্ত ব্যাপার দেখে মেদিনীপুরের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কোম্পানীর যাতে আরও উন্নতি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করছেন। একটি বাঙ্গালী কোম্পানী লবণ ব্যবসায়ে যে সাফল্য অর্জ্জন করেছেন তজ্জন্য আমরা গৌরবান্বিত

কিন্তু বৃহৎ স্কেলে কাজ চালাতে গেলে কোম্পানীর আরও মূলধনের প্রয়োজন। এ সম্পর্কে ডিরেক্টরবর্গ দেশবাসীর নিকট তাঁদের আবেদন পেশ করেছেন। আমরা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও ধনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাঁরা যেন মূলধন দ্বারা একটি বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে সাহায্য করেন ও নিজেরা লাভবান হ'ন।

বেঙ্গল লেবার এসোসিয়েশনের দুর্নীতি

এদেশের কতকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যথা:- জুতা ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান, ট্রাঙ্ক ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠান, আয়না ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি, বেঙ্গল লেবার এসোসিয়েশন নামক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করেন। তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করার নিমিত্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একটি সাব কমিটী গঠিত হয়। উক্ত এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তারা বিদেশীয় বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্ররোচনায় তাহাদের স্বার্থের খাতিরেই ছোট ছোট শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে ধর্ম্মঘট চালায়। সম্প্রতি সাব কমিটি তাঁদের অনুসন্ধান কার্য্য সমাপ্ত করে যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন তাতে লেবার এ্যাসোসিয়েশনের বহু গলদ ধরা পড়েছে। রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বড় বড় শিল্প-ব্যবসায়ীরা ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ধর্ম্মঘট বিস্তারের জন্য লেবার এ্যাসোসিয়েশনকে বহু টাকা প্রদান করেছেন।

ঠিক যে কত টাকা প্রদত্ত হয়েছে তা' প্রকাশ না পেলেও সাব-কমিটি এই মত প্রকাশ করেছেন যে লেবার এ্যাসোসিয়েশন উক্ত টাকা গ্রহণ করেছিল এবং তজ্জন্য সাব-কমিটি তাদের কাজের নিন্দা করেছেন। সাব-কমিটির মতে ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এরূপ ধর্ম্মঘট বিস্তার করা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক, কেননা, ছোট ছোট শিল্পগুলি গৃহশিল্প হওয়ার দরুণ বড় বড় শিল্পের সঙ্গে

তারা স্বভাবতঃই প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারে না ; তার ওপর যদি তাদের মধ্যে ধর্ম্মঘট বিস্তার করা যায় তাহ'লে তাদের সর্ব্বনাশ সাধন অনিবার্য্য। সুতরাং সাব কমিটি লেবার এ্যাসোসিয়েশনের ঐরূপ ধর্ম্মঘট বিস্তার কার্য্যকে অন্যায় বলে অভিহিত করেছেন।

শুধু তাই নয়। গত চটকল ধর্ম্মঘটের সময় ধর্ম্মঘট কমিটির বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ শোনা গেছিল যে, ধর্ম্মঘট কমিটি উৎকোচের বশবর্ত্তী হ'য়ে কতকগুলি বিশিষ্ট চটকলে ধর্ম্মঘট করায়নি। উক্ত চটকলগুলিতেও শ্রমিকদের অবস্থা যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিল, কিন্তু কোন এক রহস্যজনক কারণে (উৎকোচ গ্রহণ ?) সেগুলিকে ধর্ম্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। এখন ধর্ম্মঘট শেষ হয়েছে। শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট দ্বারা কতখানি লাভক্ষতি হয়েছে সে প্রশ্ন না হয় নাই তুললাম, কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে ঐ রকম কোন কিছু না ঘটে তজ্জন্য, আমাদের মনে হয়, এক অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হওয়া উচিত। লেবার এ্যাসোসিয়েশনের মত এখানেও হয়ত অনেক গলদ ধরা পড়বে।

আমাদের মত এই যে, শ্রমিকদের দুর্দ্দশা দূর করা ভাল কাজ, কিন্তু যে সমস্ত শ্রমিক প্রতিষ্ঠান নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত তারা অপরের দুর্নীতি দূর করবে কি করে তা আমরা বুঝতে পারি না। তারা ভাল ত করেই না, একদিকে তাহারা শ্রমিকদের ভ্রান্ত পথে চালিত করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করে, অপর দিকে ব্যবসা বাণিজ্যেরও সমূহ ক্ষতি করে।

রাণীমার্কা টাকা অচল হয় নি

কিছুদিন হ'ল রাজকীয় কোষাগার ও ব্যাঙ্কসমূহে এই স্থিরীকৃত হয়েছিল যে, যে সব রাণীমার্কা টাকা ফিরে আসবে তাদের আর পুনরায় বাজারে ছাড়া হবে না, তৎপরিবর্ত্তে নতুন টাকা বাজারে বার করা হ'বে। এতে রাণীমার্কা টাকা বাজারে একেবারে কমে গেছিল এবং লোকের ধারণা হয়েছিল যে, রাণীমার্কা টাকা বুঝি আর চলবে না। সম্প্রতি সরকার কম্যুনিক প্রকাশ দ্বারা লোকের সে ভ্রান্ত ধারণা দূর করেছেন।

বিহারে বাঙালী বিদ্বেষ

বিহারে বেকার সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে এক কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল, সম্প্রতি তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টে বেকার সমস্যার অপরাপর কারণের মধ্যে বিহারে বাঙালীদের অবস্থানটাও একটা কারণ বলে গণ্য হয়েছে, এবং 'ডোমিসাইল্ড্' বাঙালীদের সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য বাদ পড়ে নি। এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যায়—বোঝা যায় যে, অপরাপর প্রদেশে যে যার ঘর সামলাতে ব্যস্ত। কেবল আমাদের বাংলা দেশই উদারতার লীলাক্ষেত্র এবং তার জন্য আমাদের দুঃখের সীমা নেই। আমরা নিজেদের ক্ষতিস্বীকার করেও উদারতার ভড়ং করি, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের লোকদের এইরূপ আচরণ দেখে কি আমাদের চোখ ফুটবে ?

মিঃ বলডুইনের ভাগ্য পরিবর্ত্তন

আমাদের দেশের সরকারী কর্ম্মচারী কিংবা মন্ত্রী সম্প্রদায় সরকারের নিকট হ'তে আর্থিক পুরস্কার লাভ করলে আহ্লাদে একেবারে গদগদ হয়ে উঠেন, কিন্তু বিলাতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইনকে নিয়ে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত মিঃ বলড়ুইনের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, সেইজন্য তাঁর অবসব গ্রহণ কালে ইংলণ্ডের সরকার কর্ত্তৃক তাঁর জন্য ২০০০ পাউণ্ড পেন্সনের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার হচ্ছে যে, মিঃ বলড়ুইন ঐ পেন্সন গ্রহণ করবেন কিনা, সে সম্পর্কে ভয়ানক জল্পনা কল্পনা চলেছে। এই জল্পনা কল্পনার একমাত্র কারণ এই যে, বলড়ুইন লিঃ নামে এক কোম্পানীর শেয়ারের দর হঠাৎ চড়ে যাওয়ার দরুণ মিঃ বলড়ুইনের ভাগ্যও একদম ফিরে গেছে। উক্ত কোম্পানীব যে অর্ডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ারের ১৯৩১ সালে যথাক্রমে মূল্য ছিল ১ শিলিং ২ পেন্স ও ১ শিলিং ৬ পেন্স, আজ তার বাজাব দর দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১১ শিলিং ৬ পেন্স ও ১ পাউণ্ড ৪ শিলিং ২ পেন্স। মিঃ বলড়ুইন উক্ত কোম্পানীর ১,৮১,৫২৬ খানি অর্ডিনারী শেয়ার ও ৩৭,৫৯১ খানি প্রেফারেন্স শেয়ারেব অধিকারী, উক্ত কোম্পানী গত বছরে দশ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ড দিয়েছে। সুতরাং মিঃ বলড়ুইনের বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্গতি প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের ওপর। সেইজন্যই তিনি সরকারী পেন্সন গ্রহণ করবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে Fortune favours the brave. মধ্য যুগে ঐ brave কথাটার মানে যাই হোক না কেন, বর্ত্তমানে রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীরাই brave বলে পরিগণিত হবেন। সুতরাং আজকাল ঐ প্রবাদ বাক্যটি এই রকম দাঁড়ায়—Fortune favours the Prime Ministers. এইখানে একটা কথা চুপি চুপি বলে রাখি যে, মিঃ বলড়ুইন প্রধান মন্ত্রী থাকা কালীন 'রি-আর্ম্মামেণ্টের নূতন স্কীম গৃহীত হওয়াতেই উক্ত কোম্পানীর বরাত খুলে গেছে। আমাদের দেশের প্রধান মন্ত্রীরা মিঃ বলড়ুইনের মত ঐ রকম কিছু করে দেখুন না, সৌভাগ্যের কৃপা অর্জ্জন করতে পারেন কিনা।

অর্থসচিবগণের সম্মেলন

কংগ্রেস কর্ত্তৃক মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাই-এ মিঃ যমুনাদাস মেটার সভাপতিত্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অর্থসচিবদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল যে, কি করে সকল প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত করা যায় তারই একটা কার্য্যক্রম স্থির করা। একথা সকলেই বুঝতে পারেন যে, সরকারী ভাবে উন্নতিমূলক নতুন কোন কর্ম্ম পদ্ধতি গ্রহণ করতে গেলেই অর্থের আবশ্যক, অথচ এপর্য্যন্ত সরকার সকল কাজেই টাকার অভাবের অজুহাত দেখিয়ে এসেছেন। সুতরাং মন্ত্রীমণ্ডলীকে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে যে, কি করে টাকা আসে। মিঃ যমুনাদাস মেটা এই অর্থাগমের উপায় সম্বন্ধে বলেছেন যে, চার রকম উপায়ে ঐ অর্থসংগ্রহ করা যেতে পারে—

(১) রিট্রেঞ্চমেণ্ট বা ব্যয় সঙ্কোচ

(২) আয়কর (Incometax) বেশী বাড়ানো;

(৩) ঋণ-গ্রহণ

(৪) নতুন ট্যাক্স ধার্য্য

মিঃ মেটা যে চারটি উপায়ের কথা বলেছেন তাদের সম্বন্ধে কিছুই বলবার নেই; কিন্তু কথা হচ্ছে যে, ওর মধ্যে কোন্‌টি অবলম্বিত হ'বে? মিঃ যমুনাদাস মেটা নানা অবান্তর কারণ দেখিয়ে প্রথমোক্ত তিনটির দ্বারা আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না বলে চতুর্থটীর দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। আমাদের এই খানেই আপত্তি। আমরা বলি যে, নতুন ট্যাক্স ধার্য্য করে জনসাধারণকে আবার উৎপীড়িত করবার প্রচেষ্টা কেন? বর্ত্তমান ট্যাক্সের বন্ধনেই ত তারা পঙ্গু হ'য়ে পড়ে আছে, সেটাই বহন করবার শক্তি তাদের নেই। তার ওপর যদি নতুন ট্যাক্স ধার্য্য করা যায় ত 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি' হয়ে উঠবে। তার চেয়ে তাঁরা শাসন ব্যাপারের সংস্কার সাধন করুন না কেন। গভর্ণমেণ্টের ব্যাপারে যেখানে গৌরীসেনের মত অজস্র অর্থের অপব্যয় হয়, সেটা বন্ধ করবার চেষ্টা করুন না কেন।

রিট্রেঞ্চমেণ্ট, আয়কর বাড়ানো ও জনসাধারণের নিকট হ'তে ঋণ গ্রহণ করে অর্থাগমের চেষ্টা করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু সব চেয়ে বড় উপায় হচ্ছে (যদিও এটা আশু ফলপ্রসূ নয়) জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করা। জনসাধারণের একবার যদি অবস্থার উন্নতি হয় অর্থাৎ তাদের হাতে, যদি ক্রয় ক্ষমতা আসে ত সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য বেশ ভাল চলে এবং তাতে বেকার সমস্যা দূরীভূত হ'বার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সেই অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের শুল্ক, ষ্ট্যাম্প, পোষ্টেজ ইত্যাদি বাবদ যথেষ্ট আয় বাড়ে, এবং জনসাধারণেরও তখন অতিরিক্ত ট্যাক্স দেবার ক্ষমতা জন্মায়। সুতরাং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, সর্ব্ব প্রথম তাঁরা জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করবার স্কীম গ্রহণ করুন। তাহ'লেই তাঁদের অর্থাগমের উপায় সম্ভব হ'বে।

জনসাধারণের অবস্থা যদি ফিরে যায় ত নতুন ট্যাক্স ধার্য্য করলেও তাদের তত লাগবে না। অবশ্য মিঃ মেটা একথা বলেছেন যে গরীবদের উৎপীড়িত করবার জন্য কোন ট্যাক্স ধার্য্য করা উচিত নয়। তা' যদি হবে তাহ'লে এক আয়

কর ছাড়া বড়লোকদের ওপর আর কি ট্যাক্স ধার্য্য করা যেতে পারে। আয়কর ছাড়া অন্য যে কোন রকমের ট্যাক্স ধার্য্যের ব্যবস্থা হোক্ না কেন গরীব জনসাধারণ তাতে প্রত্যক্ষভাবে না হোক্ পরোক্ষভাবে উৎপীড়িত হ'বে।

শ্রমিকদের অবস্থা

মানুষ ও মূলধনের সহযোগিতার ওপর উৎপাদনের উন্নতি নির্ভর করে। নইলে, ওদের মধ্যে কোন একটিকে দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। মূলধন না থাকলে যেমন কারবার জমে না, তেমনি শ্রমিকদের কিছু উন্নতি না ঘটলে উৎপাদনেও ব্যাঘাত জন্মায়। সেই হেতু সমস্ত যায়গাতেই শ্রমিকদের উন্নতির জন্য চেষ্টা চলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত জঘন্য। তাদের পেটে প্রয়োজন অনুরূপ ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, নিজ নিজ সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থাও তারা করতে সমর্থ হয় না। এক চীন দেশ ছাড়া ভারতের শ্রমিকদের অবস্থা সারা বিশ্বের তুলনায় অত্যন্ত জঘন্য। তাদের ঋণের পরিমাণও প্রচুর, এমনকি কারও কারও কাছে সেটা তার রোজগারের প্রায় সাড়ে তিন ভাগ।

আমাদের এই মনেহয় যে, উৎপাদনের উন্নতির জন্য শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করা অবিলম্বে প্রয়োজন। শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে গেলে তাদের মজুরীর হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মজুরীর হার বৃদ্ধির দরুণ শ্রমিকদের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে যদি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে ত মজুরীর হার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মালিকদের কিছুতেই আপত্তি থাকতে পারে না।

আইনের ফাঁকী

কলিকাতার ছোট আদালতের জজ্ মিঃ এ, এস্, এম্, আক্রামহোসেনের এজলাসে এক কণ্ট্রাক্ট জনিত মামলার বিচার হয়ে গেছে। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, শচীন্দ্রনাথ বাগচী নামক জনৈক বালককে গ্রামোফোন ব্যবসায়ী মদন গোপাল গত সেপ্টেম্বর মাসে কতকগুলি গ্রামোফোনরেকর্ড বিক্রয় করেছিল এবং উক্ত বিক্রয় ব্যাপার একখানি কণ্ট্রাক্ট মারফৎ সাধিত হয়েছিল। পরে দাম আদায় নিয়ে বর্ত্তমান মামলা দায়ের হয় এবং বিবাদী পক্ষ বলে যে এখন সে সাবালক হলেও যেহেতু গত সেপ্টেম্বর মাসে সে নাবালক ছিল সেই হেতু উক্ত কণ্ট্রাক্ট আইনানুমোদিত নয়। জজ্ বিবাদীর অনুকূলে মামলা ডিস্‌মিস করেছেন।

আইনের এইরূপ ফাঁকীর ওপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। আমরা বলি কি দেশে যত ২।১ মাস ব্যবধান জনিত নাবালক আছে, তারা সব উক্ত বাগচীর মত কণ্ট্রাক্ট করে প্রচুর দ্রব্য সস্তার কিনে ঘর সাজিয়ে রাখুক; তারপর আইনের জোড়া বস্তা দেখাইবার ব্যবস্থা আছে।

লণ্ডনের বাস ধর্ম্মঘটের জের

সংবাদপত্র পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনে বাস-ধর্ম্মঘট হয়েছিল এবং তিন সপ্তাহ চলবার পর তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই ধর্ম্মঘট মিটে যাওয়াতে লণ্ডনের জনসাধারণ যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবেন

সেখানকার ট্যাক্সি ওয়ালারাও তেমনি দুঃখের সঙ্গে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে, কেননা, তাদের মোটা লাভের পরিমাণটা আর তেমন ফলাও হ'ল না। কিন্তু ট্যাক্সি ওয়ালাদের সঙ্গে আর এক শ্রেণীর জীবও বাস-ধর্ম্মঘট মিটে যাওয়াতে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, সেটি হচ্ছে গাঁট কাটা সম্প্রদায়। যখন বাস বন্ধ ছিল তখন 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' ষ্টেশন গুলিতে লোকের ভয়ঙ্কর ভীড় হ'ত এবং গাঁট কাটাদের পকেট মারবারও বেশ সুবিধা ছিল। প্রকৃত পক্ষে তারা লাভবানও হচ্ছিল। কিন্তু ধর্ম্মঘট মিটে যাওয়ায় তাদের ব্যবসা ফেল পড়েছে। এসম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে ঐ কয়দিনে মেয়ে গাঁট কাটার উপদ্রব খুব বেশী হয়েছিল! পুলিস পুরুষ গাঁট কাটাদেরই চেনে, সুতরাং ভীড়ের মধ্যে মেয়ে গাঁট কাটাদের তারা মোটেই সন্দেহ করতে পারে নি এবং পুলিসের চোখে ধূলা দিয়ে তারাও বেমালুম কাজ হাসিল করছিল।

ওদের দেশে নারীর সমানাধিকার, সুতরাং পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নারীরাও গাঁট কাটার ব্যবসা চালায়। তাদের অসুবিধার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আমরা বলি—আহা! আবার বাস ধর্ম্মঘট হোক্‌।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভলুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথব ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব।

—সম্পাদক

সাত বরে নড়ে চড়ে
এক বরে বিয়ে করে

*

লাখ কথায় বিয়ে হয়

*

ভেক না নিলে ভিখ্ মেলে না

*

জোর যার মুল্লুক তার

*

মেঘ না চাইতে জল

*

কুড়ে গরু অগাবস্থা খোঁজে

*

কুড়ে গরুর ভিন্নগোঠ্

*

যেমন উন্নুনমুখো দেবতা
তেমনি ঘুটের পাঁশ নৈবদ্যি

*

অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি

*

প্রদীপের নীচেই অন্ধকার

*

শিব-রাত্রির সলিতা

*

তুমি যাবে বঙ্গে
বরাত যাবে সঙ্গে

*

বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছ

*

যে চায় চিনি
তার চিনি যোগান চিন্তামনি

*

পরের ধনে পোদ্দারী
তারে বলে লক্ষীছিরি

*

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

*

পুঁথিগত বিদ্যা

*

পুস্তকে স্থাপিতা বিদ্যা
পরহস্তগতং ধনং
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে
ন সা বিদ্যা ন, তদ্ধনং

*

ঘৃণা লজ্জা ভয়
এ তিন থাক্‌তে নয়

*

মানের কান্না কাঁদো বসে

*

এক হাতে তালি বাজে না

*

পেটে খেলে পিঠে সয়

*

কষ্ট না করলে কৃষ্ণ পায় না

*

আহ্লাদে আটখানা
নেজা মুড়া দশখানা

*

আদরের ঢেলা
রূপের মৌরলা

*

ঢাকি ঢুলি বিসর্জ্জন

*

দরগাতলায় ফয়তা দিচ্ছে

*

গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া

*

ভাইটীর মত বন্ধু নাই
ভাইএর মত শত্রুও নাই

*

দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?

*

যখন ঠাকুর মাপায়
উপরি উপরি চাপায়

*

ভাল করতে পারি নে
মন্দ করতে পারি—কি দিবি তাই বল

*

হাড়ে নাড়ে জ্বালাচ্ছে

*

ঝগড়াটে নাড়ী কোঁ কোঁ করে

*

গোবর গাদায় পদ্মফুল

*

বিষে বিষক্ষয়

*

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

*

যমের অরুচি

*

বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো

*

আলালের ঘরের দুলাল

*

কে কার কড়ি ধারে ?

*

যত বড় মুখ তত বড় কথা

*

আমি কি মার আটাশে ছেলে
ভয় করি চোখ রাঙ্গালে ?

*

বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে ?

*

হাঁসতে ফুল কাশতে শুকোয়
ডুব দিলে ফুল অমনি শুকোয়

*

হাঁচি টিকটিকি বাধা
যে না মানে গাধা

*

রাজার হালে স্বর্গবাস

*

মহিষের শিং বেঁকা
বোঝবার বেলা একা

*

কলসীর জল গড়াতে গড়াতে কতক্ষণ থাকে

*

ভাগের মা গঙ্গা পায় না

*

শিব গড়তে বাঁদর হোল

*

থাক শত্রু পরে পরে

*

নেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়

*

হরি হে পার কর
যার ধাবি তার মরণ কর

বেরী-বেরী ও গ্লুকোমার প্রতিষেধক

[ডাঃ কমলাকান্ত হাজারি]

গত কয়েক বৎসর হইতে বেরী-বেরীর প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়াছে—গ্লুকোমাও কম নহে। সহরে সহরে ও নগরে নগরে আজ বেরী-বেরী ও গ্লুকোমার প্রাবল্য! বাঙালীর প্রাণ-মূলে অলক্ষ্যে দংশন করিয়া এই দুরারোগ্য ব্যাধি আজ তাহার জীবনীশক্তি অপহরণ করিয়া লইতেছে ধীরে অতি ধীরে, কিন্তু অব্যর্থ সন্ধান তাহার—বদ্ধপরিকর সে তাহার কার্য্যে। সে এমন আক্রমণ করিয়াছে, যাহার বিন্দুবিসর্গও রোগী বুঝিতে পারে না। জ্বর নাই, জ্বালা নাই, ক্লেশ নাই—রোগ আসিয়া পড়িল, চিকিৎসা হইল না! রোগ ধরা পড়িল যখন তখন আর উপায় নাই। বেরী-বেরী রোগগ্রস্ত কত রোগীকে দেখিয়াছি—জিজ্ঞাসা করিলে বলে, তাহাদের কিছুই হয় নাই। একটুখানি বুক কনকন করা, সামান্য একটু পেটের অসুখ, চোখে একটু ঝাপসা দেখা—এ সবের অন্য কারণই দেওয়া হয়, বেরী-বেরী ব'লে আর কেউ বলে না। এ অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসা হয় না। রোগ যখন বদ্ধমূল হইয়া বসিল, মানুষকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল, তখন চিকিৎসা আরম্ভ হইল। যখন দেখিবে একটী মাত্র লক্ষণ দেখা দিয়াছে—বুক কনকন করা, শ্বাসকষ্ট, আলোর চারিপার্শ্বে রামধনুর রং দেখা, দুর্ব্বলতা, কি পেটের অসুখ যাহাই হউক না কেন, ধরিয়া লও বেরী-বেরী। ইহার ধাতুগত অর্থ দুর্ব্বলতা। শুধু দৃষ্টিহীনতা রোগেই শতশত সংসার ধ্বংস হইয়া গেল। কোথাও বা সমগ্র সংসার এমন কি দাসদাসী পর্য্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় একটি পরিবার ইহার জলন্ত সাক্ষ্য। মধ্য-কলিকাতায় একটি পরিবারে উপর্য্যুপরি ছয়টি মৃত্যু। কয়েকটি তেল কলের মালিকের গৃহে সকল ভাই, স্বামী, স্ত্রী, পিতা, পুত্র সকলেই অন্ধপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। সালখিয়ার একটি প্রকাণ্ড গৃহ আজ জনশূন্য।

বেরী-বেরীর ধ্বংসলীলা ভাবিতেও কষ্ট হয়। ভূমিকম্প অথবা জলপ্লাবন অপেক্ষাও এই রোগ

অনিষ্টকর। গত ইউরোপীয় মহাসমর দেশের লোকক্ষয় ও অকর্ম্মণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি যত না করিয়াছে, এই রোগ বাঙ্গালায় তদপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে লোক ক্ষয় করিতেছে। বেরী-বেরী সমস্যার নিকট ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কালাজ্বর, কলেরা বা বসন্ত রোগ সমস্ত অতি নগণ্য, কারণ বেরী-বেরী যুদ্ধ করে ইন্দ্রজিতের ন্যায় অদৃশ্য থাকিয়া এবং ইহার কারণ মানবের নিকট অপরিজ্ঞাত।

বেরী-বেরীর প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য চিকিৎসা বিভাগের অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও কেবল মাত্র অল্প তথ্য জানা গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন পুরান চাউলে এক প্রকার রোগের বীজাণু জন্মায়, আবার কেহ বা বলেন খাদ্যে ভাইটামিনের অভাবই ইহার কারণ, কিন্তু এই রোগ যে সংক্রামক তাহা আমরা জানি। এখন বাঙলা ছাড়াও বিহার, উড়িষ্যা ও বাঙালীদের অধিকাংশ বায়ুপবিবর্ত্তন স্থানে ইহার প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু যে সকল পরিবারের মধ্যে পুরাণ চাউল, মাছ, সরিষার তৈল প্রভৃতি সাধারণ বাঙালী খাদ্য ব্যবহার হয়, এই রোগ কেবলমাত্র সেই সব পরিবারেই আত্মপ্রকাশ করে।

নিম্নে, এই রোগের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

১। যাহারা সাধারণ বাঙালী খাদ্য—পুরান চাউল, মাছ, সরিষার তৈল প্রভৃতি ব্যবহার করে, এই রোগ মাত্র তাহাদিগকেই আক্রমণ করে। আমি কোন মাড়োয়ারী বা ইউরোপীয় পরিবারে এই রোগ দেখি নাই, কিন্তু এইরূপ দুই একটি পরিবারে যাহা দেখিয়াছি সেখানে উক্ত আহার্য্য প্রচলিত।

২। কোনও গ্রামে চল্লিশটী পরিবারের মধ্যে চারটী বেরী-বেরী ও গ্লুকোমায় ভুগিতেছিল। জানা গেল যে ঐ চারিটীই ধনী গৃহস্থ এবং তাহারা সমুদয় বৎসর সঞ্চিত চাউল ব্যবহার করিত। অন্যদিকে দৈনিক জীবিকা উপার্জ্জন-কারী দরিদ্র গৃহস্থেরা এই রোগে ভুগিত না।

৩। কোন এক গৃহস্থের সকলেই বেরী-বেরী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজনের মৃত্যু হইল, সুতরাং অপর সকলে অশৌচের চিহ্নস্বরূপ আতপ চাউল, ঘি, এবং শাকশব্জী প্রভৃতি পবিবর্ত্তিত খাদ্য আহার করিতে বাধ্য হওয়ায় সেই গৃহস্থের সকলেই আরোগ্যের দিকে যাইতে লাগিল। তারপর হইতে বহুদিন ঐ খাদ্য ব্যবহারে তাহারা সকলেই বেরী-বেরী হইতে পরিত্রাণ পাইল।

৪। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, স্থান ও খাদ্য পবিবর্ত্তনে এই রোগের উপশম হয়।

৫। সামান্য গ্লুকোমায় ভুগিতেছেন এমন লোক কোন আত্মীয় বিয়োগে আরও অধিক রোগগ্রস্থ হইয়া থাকেন। এক যুবক অল্প গ্লুকোমা রোগাবস্থায় আইন অমান্য অপরাধে জেলে প্রেরিত হন, ফলে রোগটী আরও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু মুক্ত হইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।

চিকিৎসা—বেরী-বেরীর কোন নির্দ্দিষ্ট-ভাবে চিকিৎসা হয় না। ক্যালসিয়ামই ইহার একমাত্র ঔষধ, যে হেতু রোগীর রক্তে উহার

অভাব দেখা যায়। অন্ত্রের পচন নিবারক বিরেচক ঔষধ এবং ভাইটামিনপূর্ণ খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। হৃদরোগের জন্য ডিজিটালিস বা অর্জ্জুন দেওয়া হয়।

পথ্য—যতদূর বুঝা যায়, চাউল, বিশেষতঃ পুরাতন চাউল দৈনিক খাদ্য হইতে বাদ দিতে হইবে। এই পুরাণ চাউল জলে ফেলিলে স্বচ্ছ হয় না, পরন্তু সাদা অস্বচ্ছ চূণের ন্যায় দেখায়। চাউলের পরিবর্ত্তে সুজির পিষ্টক অথবা পাউরুটী ব্যবহার করা উচিত। রোগ যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন কেবলমাত্র চাউল পরিবর্ত্তন করিলেই যথেষ্ট হইল না; যেহেতু অন্ত্রের ভিতরকার অজ্ঞাত বীজাণু, ভুক্ত অন্নকে বিষময় করিয়া ফেলে। সুতরাং রুটী ও ডাল ব্যবহার করাই শ্রেয়। টাট্‌কা ফল, ছোলা, পুরাতন গুড়, আর গোদুগ্ধে প্রস্তুত মিষ্টান্ন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মাছ, ডিম, মাংস তৈলপক্ক না হইয়া ঘৃত পক্ক হইলে ব্যবহার করা যায়; পাঁউরুটী অথবা লাল আটার রুটী খাওয়া যাইতে পারে।

এককথায় বলিতে গেলে খাদ্য-বিষয়ে সাহেব ও পাশ্চাত্যদের অনুকরণ করাই উচিত।

বায়ু পরিবর্ত্তন অসম্ভব হইলে উক্তরূপ পথ্যের ব্যবস্থা করাই এই রোগের চিকিৎসা। কিন্তু আহার্য্য পরিবর্ত্তনই ইহার উৎকৃষ্ট চিকিৎসা!

গ্লুকোমা রোগ দেখা দিলে আলোকের চতুর্দ্দিকে রামধনুর রশ্মি দর্শন বা মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি শক্তির হ্রাস হয়। যদি খাদ্য প্রণালীর পরিবর্ত্তনে বা চক্ষুতে ঔষধ দ্বারা উপশম না হয় তবে উহার অস্ত্রোপচার কর্ত্তব্য। একবার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইলে পুনরায় কদাপি উহা লাভ হয় না। চিন্তিত বা বিষণ্ণ ভাবাপন্ন হইলে গ্লুকোমা রোগের বৃদ্ধি হয়। রোগীকে প্রফুল্ল চিত্তে বন্ধুবান্ধবের সহিত থাকিতে হইবে। নিঃসঙ্গ জীবন বা গৃহে অবরুদ্ধ হইলে রোগ প্রবল হয়।

মশা, ম্যালেরিয়া ও কুইনাইন

মশা ও ম্যালেরিয়া মিলিয়া বাংলার শ্মশানে যে মহোৎসব আরম্ভ করিয়াছে, তাহার শেষ না করিতে পারিলে বাঙালীর রক্ষা নাই। শুধু বাংলায় নহে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং সিংহলেও এই ব্যাধি নিদারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। পাবলিক হেল্‌থ কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষে এই রোগে প্রায় বারোলক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। আর লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। একমাত্র বাংলাদেশেই ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুসংখ্যা ৩৩৬,৮৭৯ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। মশার হুলে ভর করিয়া ম্যালেরিয়া মানুষের দেহ আক্রমণ করে, এবং দেহ হইতে দেহান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিয়া গ্রামকে গ্রাম উজাড় করিয়া দেয়। বাংলার বহু গ্রাম ও নগর এই রোগে শ্মশান হইয়াছে। এখন অবস্থা এমন হইয়াছে যে, মানুষ ম্যালেরিয়া দূর করিতে না পারিলে, ম্যালেরিয়াই একদিন তাহাকে দূর করিবে।

কিন্তু কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার হইবে? কেহ বলেন, মশক কুল বিনাশ করিতে না পারিলে ম্যালেরিয়া হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় নাই। কেহ বলেন, পানা-পচা খানা ডোবা বুজাইয়া ফেলিলেই মশা ও ম্যালেরিয়ার উৎপাত দূর হইবে। কেহ বলেন, শুধু খানা ডোবা নয়, বনে, জঙ্গলে জীবজন্তুর পায়ের দাগে জল ও পচা পাতা মিলিয়া যে বিষ সৃষ্টি করে, সেই বিষেও মশা জন্মে এবং জঙ্গলের আড়ালেই তাহারা দলপুষ্টি করে, অতএব বন কাটিয়া, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এবং খানা ডোবা বুজাইয়া গ্রামকে মশা ও ম্যালেরিয়া মুক্ত কর।

কিন্তু বক্তৃতা যত সহজ, কাজ তত সহজ নয় তাই বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ যাঁহারা, তাঁহারা বলেন, বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া মশা তাড়াইবার যুক্তি যত সুন্দরই হউক, কার্য্যতঃ ইহা যথাযথ রূপে প্রতিপালন করা সম্ভব নয়। বাংলায় যত বন জঙ্গল এবং পচা ডোবা পুকুর আছে তাহা পরিষ্কার করা এবং সব সময় পরিষ্কার রাখা কি সহজ কাজ? তথাপি এরূপ কাজ উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বাড়ীর আশে পাশে, ঝোপে ঝাড়ে যাহাতে মশার বংশ বৃদ্ধি না পাইতে পারে সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে মশার কামড় সত্ত্বেও যাহাতে ম্যালেরিয়া না আসিতে পারে মানুষের শরীরটিকেও সেইরূপ করিয়া রাখিতে হইবে। অর্থাৎ মশায় কামড়াইলেই যাহাতে অসুস্থ হইয়া না পড়িতে হয়, সেজন্য যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন

গ্রহণ করিতে হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যাহারা নিয়মিত কুইনাইন সেবন করে, তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না; এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষেও কুইনাইনই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

কিন্তু দাম অত্যন্ত বেশী বলিয়া অনেকেই উপযুক্ত পরিমাণে কুইনাইন সেবন করিতে পারে না। সরকারী বিবৃতিতে যে আনুমানিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রায় ১০০,০০০,০০০ দশ কোটি ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসাই হয় না। যাহারা অল্প বা পূর্ণ চিকিৎসার সুযোগ পায় তাহাদের সংখ্যা প্রায় আশী লক্ষ। ইহা আনুমানিক হিসাব হইলেও ম্যালেরিয়া যে কিরূপ ভয়াবহরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছে এই হিসাব হইতে তাহারই গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

অথচ এই ম্যালেরিয়া পীড়িত ভারতবর্ষে যেখানে কুইনাইনের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সেই খানেই ইহা ব্যবহৃত হয় সকলের চেয়ে কম। ইতালীতে ম্যালেরিয়া রোগীগণ জন প্রতি ১৬ গ্রেণ কুইনাইন সেবন করে, গ্রীসের লোক ব্যবহার করে ২৪ গ্রেণ, কিন্তু ভারতবর্ষে রোগী প্রতি মাত্র সাড়ে তিন গ্রেণ কুইনাইন ব্যবহার হইয়া থাকে। যে সব প্রদেশে ম্যালেরিয়া অত্যন্ত প্রবল, তাহার কোনো কোনো স্থানে ইহা অপেক্ষাও কম কুইনাইন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান একটি ম্যালেরিয়া প্রধান স্থান। সেখানে রোগী প্রতি গড়-পড়তা মাত্র ১'০৭ গ্রেণ, কুইনাইন সেবন করে। এইরূপে প্রেসিডেন্সি বিভাগে মাথাপিছু মাত্র ১'৩১ গ্রেণ, রাজসাহীতে মাত্র ১'০৭ গ্রেণ, এবং ঢাকায় ১'৫০ গ্রেণ, এবং চট্টগ্রামে ২'৬ গ্রেণ, কুইনাইন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতেই বুঝা যায় আমাদের দেশে কুইনাইনের ব্যবহার কত কম।

বোম্বাই মেডিক্যাল ইউনিয়নের মতে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য জন প্রতি ১১০ গ্রেণ কুইনাইনের প্রয়োজন ধরিলেও, শুধু হাসপাতালে যাহারা চিকিৎসার জন্য যায়, তাহাদের জন্যই বৎসরে ১২৫,০০০ পাউণ্ড কুইনাইনের দরকার। কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসে না এমন রোগীর সংখ্যাও প্রায় দশ কোটি। পাব্লিক হেল্‌থ কমিটি ও সরকারের মতে ম্যালেরিয়া তাড়াইতে হইলে প্রায় পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন আবশ্যক। স্যার প্যাট্রিক হেবির অনুমানে ম্যালেরিয়া সমস্যা দূর করিতে অন্ততঃ ৯৭০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইনের প্রয়োজন। ডাঃ (বর্ত্তমানে স্যার) চার্লস বেণ্টলী বলেন, একমাত্র বাংলার জন্যই প্রয়োজন ১ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে যে কুইনাইন ব্যবহৃত হয় তাহার মোট পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ পাউণ্ড।

কুইনাইন প্রস্তুত করিবার জন্য দুই স্থানে সিনকোনা চাষের সরকারী বন্দোবস্ত আছে। একটি দার্জ্জিলিং এর মাংপুতে, অপরটি নীলগিরি পর্ব্বতে উতকামণ্ডের নিকটে নাদুভট্টমএ। ইহা ছাড়া ব্রহ্মদেশেও সিনকোনার চাষ হয়। পূর্ব্বে বে-সরকারী কয়েকটি কোম্পানীও সিনকোনার চাষ করিত, কিন্তু প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া তাহাদের প্রায় সবগুলিই উঠিয়া গিয়াছে। বাংলায় মোট ২,৮৭৭'৩ একর জমিতে এবং নাদুভট্টম (মাদ্রাজ) এ মোট ২,০৩৫ একর জমিতে কুইনাইন চাষ হয়। এই দুইটি সরকারী কারখানা হইতে বৎসরে মোট ৭০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন পাওয়া যায়। সুতরাং আরও প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ড

বা তাহার অধিক কুইনাইন বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় এবং বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় বলিয়াই কুইনাইন এর দাম সস্তা হয় না।

ভারতবর্ষে যদি অধিক পরিমাণ জমিতে কুইনাইনের চাষ করা যাইত, তাহা হইলে এই অসুবিধা অনেকটা দূর হইত। কারণ, বিদেশী কুইনাইন সরবরাহকদের 'কিনা বুরো' (Kina Bureau) নামে যে সঙ্ঘ আছে তাহা এমন সঙ্ঘবদ্ধ এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান যে, স্বাধীন বা ব্যক্তিগত কোন প্রতিষ্ঠানই তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া পারে না। 'কিনা বুরো' কুইনাইন এর যে দাম ধরিয়া দেয়, সেই দামেই সমগ্র পৃথিবীতে উহা বিক্রয় হয়। কেহ কেহ এই প্রতিষ্ঠানটির আধিপত্য এড়াইয়া স্বাধীনভাবে কুইনাইন এর চাষ ও ব্যবসা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কেহই এযাবৎ সফল হয় নাই। 'কিনা বুরো' প্রয়োজন মত চাষ কমাইয়া কুইনাইনএর দাম বেশী রাখে, এবং তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দরে সকলকে এই জিনিসটি কিনিতে বাধ্য করে! একচেটিয়া ব্যবসায়ের এই আধিপত্যে ভারতবাসী অল্প দামে কুইনাইন পায় না। ইহাদের চক্রান্তের ফলে ১৯২৬ সালে কুইনাইন এর দাম যে ১৮৲ টাকা পাউণ্ডে উঠিয়া আছে, আজও তাহা কমে নাই। দরিদ্র ভারতবাসী যাহাদের দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইবার পয়সা নাই, তাহারা এত দাম দিয়া উপযুক্ত পরিমাণ কুইনাইন গ্রহণ করিবে কিরূপে?

প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন আমদানী করাই যথেষ্ট নহে, জনসাধারণের অর্থ সামর্থ্যের অনুপাতে ইহার দাম কমাইবার ব্যবস্থা করাই বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। 'কিনা বুরো'র একাধিপত্যে আত্মসমর্পণ করিলে তাহা কোন কালেই সম্ভব হইবে না। কুইনাইন এর দাম কমাইতে হইলে ভারতবর্ষেই প্রচুর পরিমাণ চাষের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। ভারত সরকার যদি এবিষয়ে উদ্যোগী হ'ন তাহা হইলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে।

অত্যধিক মূল্যের ফলে কুইনাইনে ভেজালের পরিমাণও অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কুইনাইনের ট্যাবলেট, সলিউসন, মিকশ্চার বা সল্ট নামে যাহা বিক্রয় হয়, তাহাদের অনেক গুলিতে ভেজাল থাকে, অথবা যে জিনিসে যে পরিমাণ কুইনাইন আছে বলিয়া লেখা থাকে, পরীক্ষা করিলে সে জিনিসে সে পরিমাণ কুইনাইন পাওয়া যায় না। রোগীর মিকশ্চার দিতে হইলে কম্পাউণ্ডারগণ তাহা হইতেই সামান্য কিছু বাঁচাইয়া 'উপরি' অর্থাগমের উপায় করিবার সুযোগ পান।

সরকারী কারখানাগুলিতে দেখা গিয়াছে, প্রতি পাউণ্ড কুইনাইনের মোট উৎপাদন খরচ ৭॥০ টাকা, কিন্তু বিক্রয় মূল্য এগারো টাকা। এই হিসাব হইতেই স্পষ্ট যে বর্ত্তমানে যে দামে ইহা বিক্রয় হইতেছে, তাহার অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিলেও প্রচুর লাভ থাকে।

ইহাই যদি অবস্থা হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, ভারত সরকার প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন চাষের চেষ্টা করিতেছেন না কেন? তাঁহারা বলেন, আমেরিকা ও জাভাতে সর্ব্বাপেক্ষা ভালো কুইনাইনের চাষ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের জমিতে যে গাছ জন্মে তাহার ছালে কুইনাইন এর অংশ কম পাওয়া যায়। তবুও দেখা গিয়াছে, এদেশে প্রতি পাউণ্ডে মাত্র সাড়ে সাত

টাকা করিয়া কুইনাইন উৎপাদনের খরচ পড়ে। অথচ এইরূপ কম দামে পাইবার সুযোগ এবং সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীকে বাধ্য হইয়া প্রতি পাউণ্ড আঠারো টাকা দামে বিদেশী কুইনাইন কিনিতে হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ের সুযোগ লইয়া 'কিনা বুরো'র এই চড়া দাম রাখিবার ফলেই দরিদ্র ভারতবাসী উপযুক্ত পরিমাণে কুইনাইন সেবনের সুযোগ পায় না, লক্ষ লক্ষ লোক বিনা চিকিৎসায় মরিতে বাধ্য হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের জন্য শত শত লোকের অচিকিৎসায় অকাল মৃত্যু কি ভয়ানক নয়? যেখানে কুইনাইন জন্মাইবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ এবং সুবিধা আছে, সেখানে ঔষধের অভাবে লোক মরিতে দেওয়ার অপরাধের বিচার কে করিবে? জাতি সঙ্ঘ আন্তর্জ্জাতিক বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করেন, এবং তাহার প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কুইনাইন সম্পর্কেও তাহাদের আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই যে ভয়াবহ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে এবং একটি প্রতিষ্ঠানের লাভের জন্য শত শত জীবন ঔষধাভাবে নষ্ট হইতেছে, তাহার প্রতিকারের জন্য তাহারা কি করিয়াছেন?

ভারতবর্ষের জমিতে ভারতীয় আবহাওয়ায় যে কুইনাইন উৎপন্ন হইতে পারে, প্রচুর পরিমাণ চাষের ব্যবস্থা করিলে তাহা দ্বারাই অল্প ব্যয়ে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার হইতে পারে।

লেফটেনান্ট কর্ণেল আর, নোল্‌স (R. Knowles) এবং মিঃ সিনিয়র হোয়াইট (Mr. Senior White) বলেন, সিনকোনার ছালে উৎপন্ন কুইনাইনই যে সর্ব্বোত্তম 'উপক্ষার' বা alkaloid একথা ঠিক নহে, কুইনিডাইন ও সিঙ্কোনিডাইন (quinidine & cinchonidine) ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করিতেও কার্য্যকরী। কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ম্যালেরিয়া চিকিৎসার জন্য কুইনাইনের স্থলে সিন্‌কোনার ছাল হইতে উৎপন্ন উপক্ষার ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। কারমাইকেল হাসপাতালেও সিনকোনা ফেব্রিফিউজ ম্যালেরিয়া-জরাঘ্ন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ডাঃ ফ্লেচার মালয় উপদ্বীপে বহু ম্যালেরিয়া রোগীকে সিনকোনার উপক্ষার দিয়া নীরোগ করিয়াছেন।

সুতরাং ভারতবর্ষেই যাহাতে প্রচুর পরিমাণে সিঙ্কোনার চাষ হইতে পারে। সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার চেষ্টা করা উচিত, 'কিনা বুরো' যাহাতে ভারতের বাজারে তাহাদের স্বার্থ লাভের জন্য দেশবাসীর অসুবিধা সৃষ্টি করিতে না পারে, সে জন্য তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া সরিয়া আসাই দেশবাসীর কর্ত্তব্য। কয়েকজন ব্যবসাদারের স্বার্থের জন্যই আজ ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে, না হয় অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য হইয়া অসহায়ভাবে জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহন করিতেছে। ভারতবাসীর যদি স্বদেশ প্রীতি থাকে, সরকার যদি জনহিতৈষী হন, তাহা হইলে অবিলম্বে এই স্বার্থলোভী ব্যবসায়ীর একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান করিয়া কুইনাইন চাষে ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী করা উচিত।
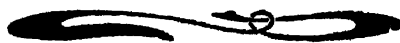
জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বিল

জাঞ্জিবার লবঙ্গ বিল সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলে বিক্ষোভের অন্ত নেই। উক্ত বিল ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসার স্বাধীনতা হরণ করেছিল, সেইজন্য ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় উক্ত বিলের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন সুরু করে এবং গভর্ণমেণ্টকে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিকূলে হস্তক্ষেপ করতে আবেদন জানায়। কিন্তু সম্প্রতি ভারত সরকার উক্ত লবঙ্গ বিল গ্রহণ যোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। এতে মহামান্য আগা খাঁ, স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুর দাস, মিঃ বিড়লা, মিঃ অনন্তানি প্রভৃতি বড় বড় ব্যবসায়ীবৃন্দ অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন! তাঁরা মনে করেন যে ভারত গভর্ণমেণ্ট উক্ত বিলে সম্মতি প্রদান করে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বাধীনতা খর্ব্ব করেছেন।

ভারত সরকারের এই অবিবেচনার কার্য্যের জন্য সকলেই ভারতের বাণিজ্য প্রতিনিধি স্যার জাফারুল্লা খাঁ ও স্যার গিরিজা শঙ্কর বাজপেয়ী-কেই দায়ী করছেন। অন্যত্র সংবাদে প্রকাশ যে, আগা খাঁ ও পুরুষোত্তমদাসের প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্যার জাফারুল্লা খাঁ ও স্যার গিরিজা শঙ্কর বাজপেয়ী স্যার ওরমস্‌বি গোরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন যে ঐরূপ বিল পাশ হ'লে ভারতীয়দের তরফ হ'তে কোন প্রতিবাদ উত্থিত হ'বে না। বিশিষ্ট ভারতীয় ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ কিছুতে ভেবেই পাচ্ছেন না যে, যেখানে ভারতীয়দের ক্ষতি হচ্ছে এবং আফ্রিকার ভারতীয়দের ব্যবসা কার্য্যের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করছে, সেখানে ভারতীয় প্রতিনিধিদ্বয় কি করে উক্ত বিল অনুমোদন করেন!

অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, ভারত সরকারের এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্তের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ তাঁদের নিকট হ'তে কৈফিয়ৎ তলব করবেন। আরও জানা গেছে যে, গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত না করেন তাহ'লে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ ইঙ্গ ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা একেবারে বন্ধ করে দেবেন। যেখানে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার পদদলিত হয়, সেখানে ইঙ্গ ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা চালানো সম্ভব নয়।

এ সম্পর্কে আর একদলের অভিমত এই যে, জাঞ্জিবার হ'তে আমদানী লবঙ্গের উপর কেন্দ্রীয় আইন সভার অবিলম্বে শুল্ক স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

ইতিমধ্যে জাঞ্জিবারস্থ ভারতীয়েরা ভারত সরকারের নিকট যে তার পাঠিয়েছেন তাতে জানা যায় যে সেখানে ভারতীয়দের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে। সরকারপক্ষ সেখানে আরবদিগকে ভারতীয়দের বয়কট করতে প্ররোচনা দিচ্ছে। বহু বাদানুবাদের

ফলে অবস্থা এরকম দাড়িয়েছে যে ভারতীয়দের প্রাণ এবং ধনসম্পত্তি সেখানে বিপন্ন। তাঁরা ভারত সরকারকে অবিলম্বে এসম্পর্কে কোন বিধি ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ করেছেন।

ভারত সরকারের সে অনুরোধে সাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য নয় কি?

পাটের দর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রস্তাবিত বিল

পাটের দর পড়ে গেলে কৃষকদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়, সুতরাং পাটের মূল্য সমস্যাব সমাধানের প্রতি সকলেই আগ্রহশীল। সংবাদ পাওয়া গেল যে, আগামী-ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য স্থির করে দেওয়ার জন্য কংগ্রেসী সদস্য কর্ত্তৃক একটি বিল আনীত হ'বে। উক্ত বিলে বাংলায় একটি জুট কমিটি স্থাপন করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত জুট কমিটিই পাট শিল্প নিয়ন্ত্রণ করবাব সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হ'বেন।

প্রতি বছর পাট-চাষের প্রাক্কালে উক্ত কমিটি গত বছরের পাটের একটা মজুদ হিসাব এবং আগামী বছরে কি পরিমাণ জমিতে চাষ হ'বে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং তদনুযায়ী চাষ করবার জন্য চাষীদের মধ্যে লাইসেন্স বিতরণ করবেন। কেবলমাত্র লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিরাই পাট চাষের অধিকারী হ'বে এবং উক্ত লাইসেন্স ফি থেকেই জুট কমিটির সকল ব্যায়াদি নির্ব্বাহ হ'বে। এইরকম ভাবেই কমিটি পাটের একটা সর্ব্বনিম্ন দর বেঁধে দিতে সমর্থ হবেন এবং বাজারগতিক দর যদি তার চেয়ে নেমে যায় ত কমিটি সেই নির্দ্দিষ্ট দরেই সকল পাট কিনে নিতে বাধ্য থাকবেন। বিলে পাটের ওজন স্থির, বাজার সংগঠন প্রভৃতি ব্যাপারেব ব্যবস্থা আছে।

পাটের একটা নিম্নতম দর বেঁধে দেওয়ার জন্য সত্ত্বরই একটি আইন প্রণয়ন করা দরকার কিন্তু উক্ত বিল কতটা Practicable এবং কতটা Utopian সে সম্পর্কে আমরা বারান্তরে আলোচনা করব।
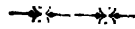
জাপানী প্রতিযোগীতায় ভারতীয় শিল্পের সর্ব্বনাশ

ব্যবসায়ী মাত্রেই অবগত আছেন যে, ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের আজ প্রধান প্রতি-বন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে জাপান। জাপানী দ্রব্যে সারা বাজার একেবারে ছেয়ে গেছে। এমন দ্রব্য নেই যা জাপান ভারতে রপ্তানি না করছে। শুধু যদি রপ্তানি করেই ক্ষান্ত থাকতো তাহ'লে কিছু বলবার থাকতো না, কেননা, সমান প্রতিযোগীতায় ভয় পাবার তত কারণ নেই। কিন্তু জাপান আজ ভারতীয় বাজারে অসম্ভব সস্তায় মাল ছাড়তে আরম্ভ করেছে,—এত সস্তায় যে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ তা' কিছুতেই কল্পনাও করতে পারেন না। ফলে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হ'তে বসেছে।

কথা উঠবে যে, এর হাত থেকে রক্ষা পাবার কি উপায় থাকতে পারে? বস্তুতঃ কোন দেশ যদি অতি সস্তায় মাল উৎপাদন করে বিদেশীয় বাজারে অসম্ভব সস্তায় মাল ছাড়তে আরম্ভ করে, তাহ'লে তাকে এ বলা সাজে না যে, ওগো তুমি অত সস্তায় মাল উৎপাদন কোরো না, তাতে আমাদের ক্ষতি হয়। যে দেশ সস্তায় মাল উৎপাদন করে, তার পারিপার্শ্বিক অনেক সুবিধা থাকে, যথা:—সেখানে কাঁচা মাল, মজুরী প্রভৃতি সস্তায় পাওয়া যায়। অপর দেশের পক্ষে সে সুবিধা নাও থাকতে পারে। কিন্তু তা' বলে একথা বলা চলে না যে, প্রথমোক্ত দেশের সুবিধা থাকার দরুণ এবং শেষোক্ত দেশের সুবিধা না থাকার দরুণ প্রথমোক্ত দেশের মালপত্র শেষোক্ত দেশের বাজারে গিয়ে তাদের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট করে দেবে। আসল কথা ব্যবসা ক্ষেত্রও একটি প্রতিযোগীতার ক্ষেত্র হ'লেও সে প্রতিযোগীতা সমানে সমানে হওয়া চাই। একজন ১৫ ষ্টোন লোকের সঙ্গে যেমন একজন ৭ ষ্টোন লোকের বক্সিং প্রতিযোগীতা হয় না, তেমনি একটি সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের সঙ্গে আর একটি সুবিধাহীন দেশের বাণিজ্য প্রতিযোগীতা হ'তে পারে না। যে কোন কৃত্রিম উপায়ে তাদের সমান স্তরে আনতে হয়।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উক্ত কৃত্রিম উপায় হ'ল 'প্রোটেক্‌সন্' পদ্ধতি বা শুল্ক স্থাপন। বিদেশীয় দ্রব্যের উপর অনুরূপ শুল্ক নিয়োজিত করেই প্রতি দেশ তাদের শিল্প বাণিজ্যকে রক্ষা করে। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'বে। ধরুন, জাপানী ইলেক্‌ট্রীক্ বাল্‌ব গুলো। ওদের দেশে এর এক একটির উৎপাদন খরচ এক আনা থেকে দু' আনা। আমাদের দেশে ইলেক্‌ট্রীক্ বাল্‌বের উৎপাদন

খরচ পড়ে ৬ আনা থেকে ৮ আনা। ইউরোপীয় দেশ গুলিতে সেই জিনিসের উৎপাদন খরচ পড়ে সাড়ে পাঁচ আনা। সুতরাং আমাদের দেশের বাল্‌ব শিল্পকে রক্ষা করতে গেলে খুব কম পক্ষে জাপানী বাল্‌বের ওপর ৫ গুণ শুল্ক স্থাপন করা আবশ্যক। নইলে আমাদের বাল্‌বের কারবার একেবারে ফেল মারবে। শুধু বাল্‌ব নয়, ওয়াটার প্রুফ, বিস্কুট, পেন্সিল, কলম কাচ, এনামেল, চক্ পেন্সিল প্রভৃতি কারবারের জাপান ভয়ঙ্কর ক্ষতি করছে। সেই জন্যই ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গভর্ণমেণ্টের নিকট জাপানী দ্রব্যের উপর অধিকতর শুল্ক স্থাপনের জন্য নিরন্তর দাবী জানাচ্ছিলেন ; গভর্ণমেণ্ট সে দাবী এতদিন গ্রাহ্য করেন নি।

কিন্তু ব্যবসায়ী মহলের অসন্তোষ বৃদ্ধি হ'তে দেওয়া সুবিবেচনার কাজ নয় ভেবে গভর্ণমেণ্ট এতদিন পরে এর প্রতিকার করতে মনস্থ করেছেন। সেই জন্যই এসম্পর্কে ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশের বণিক সঙ্ঘের মতামত জানতে চেয়েছেন। উক্ত আহ্বানে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স যে সুচিন্তিত মেমোরেণ্ডাম দাখিল করেছেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চেম্বার জানিয়েছেন যে, আমাদের দেশে বৃহৎ শিল্প কারবার খুব কমই আছে, মাঝারি রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠানই আমাদের দেশে বেশী। কিন্তু তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অধিক পরিমাণে, কেননা, বৃহৎ শিল্প কারবারের তুলনায় তাদের উৎপাদন খরচা অধিক পড়ে। ফলে জাপানী দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় তারা মোটেই দাঁড়াতে পারে না।

আমাদের ব্যবসার এই মন্দা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকেই যখন জাপান স্বর্ণমান ত্যাগ করে। এসম্পর্কে চেম্বার বলেছেন—The serious situation caused by the competition from Japan has been engaging the attention of the Commercial Community ever since Japan went off gold towards the end of 1931 and the yen had begun to depreciate. উক্ত স্বর্ণমান ত্যাগ করার

ফলেই জাপানী মুদ্রা ইয়েনের মূল্য হ্রাস পেতে সুরু করে এবং ১৯৩৪ সালে তা' ভয়ঙ্কর নেমে যায়। অর্থনীতির নিয়মই হ'ল এই যে, কোন দেশের মুদ্রামূল্য হ্রাস পেলে তার রপ্তানি বৃদ্ধি পায়, কারণ অপরাপর দেশের নিকট সে দেশের দ্রব্যাবলী যথেষ্ট সস্তা হয়ে পড়ে। সেই কারণেই ভারতের বাজারে জাপানী মাল যথেষ্ট সস্তা হয়ে পড়েছে। আর সেইজন্যই ভারতের দেশী দ্রব্য অপেক্ষা জাপানী দ্রব্য বেশী বিক্রীত হচ্ছে। এর থেকে রেহাই পেতে গেলে জাপানী দ্রব্যের ওপর আরও শুল্ক বসানোর প্রয়োজন. কিংবা জাপান ও ভারতের মধ্যে পরস্পর ঘরোয়া চুক্তির দ্বারা যাতে উভয়ের না ক্ষতি হয় সেই রকম একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

সেইজন্যই ব্যবসায়ী মহলের সকলেই আশা করেছিলেন যে, গত বছরে যখন জাপান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে পুনর্ব্বার আলোচনা হয়, গভর্ণমেণ্ট তখন এর একটা সুব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সকলকেই তখন যৎপরোনাস্তি নিরাশ হ'তে হয়েছিল। এসম্পর্কে চেম্বার বলেছেন—When, therefore, negotiations were opened last year between the two countries for modifying the terms of the convention of 1934, hopes were entertained that the Government of India would be able to pursuade Japan to enter into a new agreement in regard to the import of competitive goods from Japan into India, with particular reference to the existing disparity between the C. I. F. prices of Japanese imports and the cost of production of the indigenous industries. * * * * * They were, however, very much disappointed to note that the question of protecting the interests of minor industries in India which were adversely affected by Japanese competition was left out of the scope of negotiations.

যাই হোক, গভর্ণমেণ্ট তাদের সে ত্রুটি সংশোধন করে বর্ত্তমানে দেশীয় শিল্পগুলির অবস্থার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। দেশীয় শিল্পগুলিকে রক্ষা করতে গেলে জাপানী আমদানী দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক স্থাপন ছাড়া এখন আর অন্য উপায় নেই, কারণ ঘরোয়া আলোচনা দ্বারা পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য চুক্তি সম্পাদন করা এখন আর সম্ভব নয়। উক্ত শুল্ক স্থাপন করতে গেলে গভর্ণমেণ্টের এটা লক্ষ্য রাখতে হ'বে যে যাতে করে দেশীয় শিল্পগুলির মূলধনের সুদ, কারবারের বাড়তি-পড়তি, ধরিয়া উৎপাদন খরচার উপর কিছু লাভ বজায় থাকে। উৎপাদন খরচের 'ইউনিট' স্থির করতে গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সতর্ক হ'তে হ'বে, কারণ এই 'ইউনিট' নির্ণয়ের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। দক্ষতার সহিত চালিত বৃহৎ কারবারের উৎপাদন-খরচকে যদি ইউনিট হিসাবে ধরা যায় এবং তদনুযায়ী যদি শুল্ক নিয়োজিত হয় তাহ'লে ক্ষুদ্র কারবারের কোন সুবিধা হ'বে না, কারণ বৃহৎ কারবারের চেয়ে ক্ষুদ্র কারবারের উৎপাদন খরচ বেশী পড়ে। সুতরাং ইউনিট নির্দ্ধারণ একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

তাছাড়া গভর্ণমেণ্টকে আরও একটি বিষয়ের প্রতিও যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হ'বে। ১৯৩৪ সালে যে সংশোধিত ট্যারিফ এ্যাক্ট পাশ হয় তাতে এমন কতকগুলি দ্রব্য তালিকাভুক্ত করা হয়নি যেগুলি আজ ভারতীয় শিল্পের ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব এবং বর্ষাতি ও ছাতার কাপড়ের বিষয়। উক্ত দ্রব্যদ্বয় ১৯৩৪ সালে ভারতের বাজারে তত আমদানী হ'ত না, সেইজন্য ঐ সালের এ্যাক্টে উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের উপর আমদানী শুল্ক নিয়োজিত হয় নি। বর্ত্তমানে ঐ দ্রব্যগুলি ভারতীয় দ্রব্যের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করছে, সুতরাং সরকারের ঐ দ্রব্যদ্বয় এবং অনুরূপ দ্রব্যগুলির সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

দেশীয় শিল্পগুলির রক্ষাকল্পে আর একটি বিষয়ের কথাও ভাবা উচিত। সকলেই জানেন যে, কোন শিল্প চালু করতে গেলেই তার, কাঁচামালের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। অনেক ক্ষেত্রে উক্ত কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। সেস্থলে যদি আমদানী দ্রব্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক নিয়োজিত থাকে তবে দেশীয় শিল্পগুলির তা' ক্রয় করতে বেশী মূল্য লাগবে এবং ফলে তাদের উৎপাদন খরচও অধিক পড়বে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এনামেল-শিল্প, সাবানশিল্প, কাচ শিল্প, পেন্সিল কলম ও ইলেক্‌ট্রিক্ বাল্‌বের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত দ্রব্যগুলি উৎপাদন করতে বিদেশ হ'তে যে কাঁচামাল আমদানী করতে হয়, তার উপর অধিক পরিমাণ আমদানী শুল্ক নিয়োজিত থাকার দরুণ দেশীয় শিল্পগুলির উৎপাদন খরচ বেশী পড়ে। গভর্ণমেণ্টের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় দাঁড়াতে সাহায্য করা। সেক্ষেত্রে উৎপাদন-খরচ যত কম পড়ে ততই সুবিধা, সুতরাং উক্ত শিল্পসমূহ চালু করতে যে-সমস্ত কাঁচামাল আমদানী করতে হয়, গভর্ণমেণ্টের উচিত সে-সমস্ত দ্রব্যের আমদানী শুল্কের উপর যথেষ্ট পরিমাণ 'রিবেট' প্রদান করা। এসম্পর্কে চেম্বারের অভিমত হচ্ছে—These duties have invariably raised the costs of production of the articles concerned, and the committee had on a number of previous occasions drew pointed attention of the government to the necessity of giving relief to these industries by granting a rebate of duty on imported raw materials used in the manufacture of finished good.

জাপান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ব্যাপারের সমস্ত দিকটাই আলোচিত হয়েছে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জাপান আমাদের বাজারকে যে মাটি করতে বসেছে তার থেকে রেহাই পেতে গেলে গভর্ণমেণ্টের জাপানী দ্রব্যের উপর অধিকতর আমদানী শুল্ক স্থাপন করা ছাড়া উপায় নেই। এই আমদানী শুল্ক স্থাপন করেও রেহাই নেই, কারণ, জাপান বুদ্ধিমানের মত আইনকে ফাঁকী দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ পেন্সিলের কথা ধরা যাক্। জাপানী পেন্সিলের উপর ডজনপিছু এক আনা শুল্ক স্থাপিত হ'ল। জাপান তখন কারসাজী করে প্রচলিত পেন্সিলের ডবল সাইজ পেন্সিল রপ্তানী করতে আরম্ভ করলে। ফলে এক আনা শুল্ক স্থাপন কোন কাজেই এল না,

কারণ লোকে সমান দামে যখন ডবল সাইজের পেন্সিল পেতে আরম্ভ করলে তখন তাই কিনতে লাগল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আইন করলেও জাপান আইনকে ফাঁকী দিতে জানে। শুধু পেন্সিল নয়; দেশলাই যখন ৬০ কাঠিতে সীমাবদ্ধ হ'ল, তখন প্রথম প্রথম জাপান কাঠির দু'ধারে বারুদ লাগিয়ে পাঠাতে আরম্ভ করেছিল। আইন ৬০ কাঠি দিতে বলেছে, জাপান আইনানুযায়ী প্রতিটি দেশলাই-এ ৬০টি কাঠি দিল বটে কিন্তু আইনের ফাঁকী অনুযায়ী দু'ধারে বারুদ লাগিয়ে কার্য্যতঃ তাকে ১২০ কাঠিতে পরিণত করলে। ওতে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। এই কারসাজী নিবারণ কল্পে চেম্বার প্রস্তাব করছেন—The Committee would urge on the government the necessity of reserving to themselves the power of adopting necessary corrective measures in the exercise of their executive authority for counteracting all tactics that may be adopted by Japanese manufacturers or exporters to circumvent the measures adopted as a result of the present enquiry.

* * *

এতক্ষণ ধরে আমরা সমস্ত বিষয়ের থিযোরী সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, এবার কার্য্যতঃ জাপান আমাদের কোন্ কোন্ শিল্পের কতখানি ক্ষতিসাধন করছে সেটাই দেখা যাক পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ছাতার সরঞ্জাম, ইলেকট্রিক্ বাল্‌ব্, চক্ পেন্সিল, কলম, বিস্কুট, বর্ষাতি, এনামেল প্রভৃতি দেশীয় শিল্পের জাপানী দ্রব্য-সমূহ ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন করছে। এইবার এক এক করে উক্ত দ্রব্য সমূহের আলোচনা করা যাক্।

ছাতার সরঞ্জাম

পূর্ব্বে ছাতার সরঞ্জামাদি বিদেশ থেকেই আমদানী হ'ত কিন্তু বর্ত্তমানে দেশেই ঐ জিনিস উৎপাদন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। ২ লক্ষ টাকার উপর দ্রব্য বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়, এবং ভবিষ্যতে ঐ শিল্পের প্রসারতার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিম্নের তালিকা থেকে জানা যাবে যে, দেশীয় দ্রব্যের উৎপাদন খরচা ও জাপানী দ্রব্যের বর্ত্তমান বিক্রয় মূল্যের মধ্যে কি পার্থক্য বর্ত্তমান।

দ্রব্য।	দেশীয় দ্রব্যের উৎপাদন খরচা।	জাপানীদ্রব্যের পাইকারী বিক্রয় মূল্য।
রানার্স—	২।০ প্রতি গ্রোস্	২।০ প্রতি গ্রোস্
নচেস্—	১৵০ ,,	১৲ ,,
ক্যাপ্—	।৵০ ,,	।/১০ ,,
ফেরিউল্‌স্—	১৵০ ,,	৸৵৹ ,,
স্প্রিং কাপ্—	৫৲ ,,	৪৵০ ,,
বক্স্ কাপ্—	৩৸০ ,,	৩৸০ ,,

উপরোক্ত তালিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, দেশীয় দ্রব্যের উৎপাদন খরচ অপেক্ষা জাপানী দ্রব্যের কলিকাতাস্থ বিক্রয়-মূল্য যথেষ্ট কম। এমতাবস্থায় অধিকতর আমদানী শুল্ক স্থাপন না করলে দেশীয় শিল্পের পক্ষে প্রতিযোগীতায় দাঁড়ানো অসম্ভব।

কলম হোল্ডার প্রভৃতি

জাপানী হোল্ডারের পাইকারী বাজার দর এবং দেশীয় হোল্ডারের উৎপাদন খরচার মধ্যে

যথেষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জি, সি, লাহা কোম্পানীর "পপুলার" হোল্ডারের কথা ধরা যেতে পারে। ওর উৎপাদন খরচা হচ্ছে গ্রস্ পিছু ১৸৵০ এবং তার বিক্রয় মূল্য কিছুতে ২৲ টাকার কমে নামানো যায় না—তার মধ্যেই আবার এজেণ্টদের কমিশন ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু জাপানী হোল্ডার "সুলতানের" বিক্রয় মূল্য হচ্ছে গ্রস্ পিছু ১৷৷০ টাকা মাত্র। অথচ তা' উৎকৃষ্টতায় কোন অংশে হীন নয়।

তাছাড়া কলম প্রভৃতি উৎপাদনের কারবার এদেশে নূতন সুরু হয়েছে এবং কলম তৈরী করবার গোটা কতক সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। কলম মোড়বার টিন, নিব্ আঁটবার টিউব, রং প্রভৃতি ভারতে পাওয়া যায় না। ঐ সমস্ত দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত পরিমাণ আমদানী শুল্ক নিয়োজিত থাকার দরুণ দেশীয় শিল্পের উৎপাদন খরচ বেশী পড়ে। সুতরাং চেম্বার উক্ত শিল্পের উন্নতিকল্পে দু'টি প্রস্তাব করছেন :—

১। উক্ত শিল্পের প্রয়োজনীয় আমদানী দ্রব্যের শুল্কের উপর যথেষ্ট পরিমাণ রিবেট্ প্রদান করতে হ'বে।

২। জাপান হ'তে আমদানী কলম প্রভৃতির উপর শতকরা আরও ৪০ ভাগ শুল্ক বৃদ্ধি করতে হ'বে।

চক্ পেন্সিল ও দরজীর খড়ি প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদন

উপরোক্ত দ্রব্য দু'টির ব্যবহার এদেশে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। চক্ পেন্সিল স্কুল কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রে এবং বিভিন্ন হাসপাতালে ব্যবহৃত হয়। এদেশে প্রতি বছর দু' লক্ষ টাকার চক্ পেন্সিল এবং প্রায় একলক্ষ টাকা গ্রিজ পেন্সিল (দরজীর খড়ি) কাজে লাগে। শুধু তাই নয়, উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সুতরাং উক্ত দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পগুলি যাতে প্রভূত উন্নতি করতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু জাপানী প্রতিযোগীতার দরুণ উক্ত শিল্প মোটেই দাঁড়াতে পারছে না। জাপানী চক্ পেন্সিল ও গ্রীজ পেন্সিল আমাদের বাজারে দেশীয় দ্রব্য অপেক্ষা শতকরা ৬০ ভাগ কম মূল্যে বিক্রীত হচ্ছে। উক্ত শিল্পের একটা সুবিধা হচ্ছে যে, কাঁচা মালের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না, কিন্তু মাল প্রেরণের জন্য রেলওয়ে মাশুল বড্ড বেশী পড়ে। সুতরাং চেম্বারের অভিমত হচ্ছে যে, এ বস্তুর বিক্রয় মূল্য সুলভ করবার জন্য রেলওয়ে মাশুল কমাতে হ'বে এবং জাপানী দ্রব্যের সঙ্গে যাতে প্রতিযোগীতায় দাঁড়াতে পারে তজ্জন্য জাপানী দ্রব্যের উপর শতকরা ৬০ ভাগ আমদানী শুল্ক স্থাপন করতে হ'বে। আগামী সংখ্যা হইতে জাপানী প্রতিযোগীতার ফলে দেশীয় অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান যেরূপ ভাবে বিপন্ন হইতেছে আমরা তাহার বিবরণাদি প্রকাশ করিব।

(ক্রমশঃ)

ভারত সমবায় আন্দোলনের হিসাব নিকাস

আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলনের প্রসারতা এখন কম নয়। সমবায় সমিতিগুলি যে আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে কত প্রয়োজনীয় তা, এসম্পর্কে উৎসাহী মাত্রই টের পান। সমবায় আন্দোলন পূর্ব্বের তুলনায় যে কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে তা' জানতে গেলে এসম্পর্কে তুলনামূলক হিসাবগুলি অনুধাবন করা দরকার "ডিপার্টমেণ্ট অব কমার্শিয়াল ইন্‌টেলিজেন্স এণ্ড ষ্টাটিস্‌টিক্‌স্‌ থেকে ভারতের সমবায় আন্দোলন সংক্রান্ত একটি বিবরণী বেরিয়েছে, পাঠকদেব অবগতির জন্য নিম্নে আমবা তার সার সঙ্কলন করে দিলাম। এতে ১৯০৬-৭ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত হিসাব আছে।

১৯০৬ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত এই কয় বছরে ভারতে সমবায় সমিতিগুলির গড়ে সংখ্যা ছিল,১৯২৬। ১৯৩৪-৩৫ সালে ঐ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১০৬,০০১-এ। উক্ত কয় বছরে' সেণ্ট্রাল এবং প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সমিতিগুলি এবং গ্যারাণ্টিং ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ১৭টি। ১৯৩৪-৩৫ সালে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সমিতিগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৬। উক্ত কালে সুপারভাইজিং এবং গ্যারাণ্টিং ইউনিয়নগুলির সংখ্যা হচ্ছে ৭৮৯।

১৯০৬-১০ সালের কয় বছরে কৃষি সমবায় সমিতিগুলির (পশু ইন্সিওরেন্স সমিতিগুলি সমেত) সংখ্যা ছিল ১৭১৩। ১৯৩৪-৩৫ সালে ওগুলির সংখ্যা দাঁড়ালো ৯৩,১৬০।

গত ২৮ বছরে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা ১৬১,৯১০ থেকে ৪,৪০৯, ৬৩৭ এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। উক্ত কয় বছরে সমিতিগুলির কার্য্যকরী মূলধন ৬৮,১২,০০০ টাকা থেকে ৯৬,৮৮,৫২,০০০ টাকায় বৃদ্ধি পেল।

এককথায় বলতে গেলে ১৯০৭ সাল থেকে গত ২৮ বছরে ভারতে সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা ৫৫গুণ, উহাদের সভ্য সংখ্যা ২৭ গুণ এবং কার্য্যকরী মূলধন ১৪২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৩৪-৩৫ সাল পর্য্যন্ত এতৎসংক্রান্ত হিসাব অনুধাবন করলে বহু চিত্তাকর্ষক তথ্য চোখে পড়ে। বৃটিশ ভারতের মধ্যে সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যার দিকদিয়ে বাংলাই অগ্রগামী। কেননা বাংলায় ২৩,৪২৬ টি সমিতি বর্ত্তমান। ক্রমপর্য্যায় অনুসারে বাংলার পরেই স্থান হল পাঞ্জাবের ও সেখানে সমিতিগুলির সংখ্যা হচ্ছে ২১,৮৮৩। মাদ্রাজ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে, সেখানকার সমিতিগুলির সংখ্যা হ'ল ১৩,৪১৯। প্রতি লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে বাংলায় সমিতির সংখ্যা হচ্ছে ৪৫'৫, পাঞ্জাবে ৮৮'২ এবং মাদ্রাজে ২৭'৬। এইধার দিয়ে দেখলে সমগ্র বৃটিশ ভারতে কুর্গই প্রথম স্থান অধিকার করেছে। প্রতি লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে সেখানে সমিতির সংখ্যা হচ্ছে ১২৮। আজমীড় মাড়োয়ারের স্থান দ্বিতীয়। সেখানকার সমিতির সংখ্যা হচ্ছে ১২২.২। পাঞ্জাবের স্থান হ'ল তৃতীয়, সেখানকার সংখ্যা হচ্ছে ৮৮. ২।

ভারতীয় করদরাজ্যগুলির মধ্যে গোয়ালিয়রে বেশী সংখ্যক সমবায় সমিতি আছে। সেগুলির সংখ্যা হচ্ছে ৩,৩০১। তারপরেই স্থান হ'ল কাশ্মীরের, সেখানকার সমিতিগুলির সংখ্যা হ'ল ২,৯৪৯। হায়দ্রাবাদ তৃতীয়স্থান অধিকার করেছে, সেখানকার সমিতিগুলির সংখ্যা হচ্ছে ২,৮০৯। প্রতি লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে সমিতির সংখ্যা হিসাব করলে গোয়ালিয়রের সংখ্যা হচ্ছে ১১৬.২, কাশ্মীরের ৭৭·৬ এবং হায়দ্রাবাদের ১৮·৪

প্রতি লক্ষ অধিবাসী পিছু সমিতির সংখ্যা হিসাবে ভূপাল প্রথম স্থান অধিকার করেছে, সেখানকার সমিতিগুলির সংখ্যা (প্রতি লক্ষ অধিবাসীর), ১৩৭·৯। গোয়ালিয়রের স্থান দ্বিতীয়, সেখানকার সংখ্যা হ'ল ১১৬·২। কাশ্মীরের স্থান তৃতীয়, সেখানকার সংখ্যা হচ্ছে ৭৭·৬।

সমগ্র ভারতে প্রতি লক্ষ অধিবাসীতে সমিতিগুলির সংখ্যা হচ্ছে ৩৩।

সমবায় সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যার দিক দিয়ে দেখলে মাদ্রাজই অগ্রগামী, সেখানকার সমিতিগুলির সভ্য-সংখ্যা হচ্ছে ৮৭৫,৯০১ জন। তৎপরেই স্থান হ'ল বাংলার। এখানকার সমিতিগুলির সভ্য-সংখ্যা হচ্ছে ৭৮৩,৬৯৭। পাঞ্জাব তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে, সেখানকার সভ্য-সংখ্যা হচ্ছে ৭৩৫,৮৮৭। প্রতি হাজার লোক সংখ্যা পিছু সমিতিগুলির সংখ্যা ধরলে মাদ্রাজে ১৮টি; বাংলায় ১৫·২টি এবং পাঞ্জাবে ২৯·৭ টি। এধার দিয়ে সমগ্র বৃটিশ ভারতের মধ্যে পাঞ্জাব প্রথম স্থান অধিকার করলেও সমগ্র ভারতের মধ্যে পাঞ্জাবের স্থান তৃতীয়, কেননা প্রতিহাজার লোকসংখ্যা পিছু কুর্গের সমিতি-সংখ্যা হচ্ছে ৮০·৮ টি এবং আজমীড় মাড়োয়ারের ৫০'২ টি।

সভ্য-সখ্যার বৃদ্ধি হিসাবে যদি সমবায় আন্দোলনের জনপ্রিয়তা মাপা যায় তবে ভারতীয় করদ রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর প্রথম স্থান অধিকার করে। সেখানকার সমিতিগুলির সভ্য-সংখ্যা হচ্ছে ২২১,০৬১। শুধু তাই নয় প্রতিহাজার লোক সংখ্যা পিছু সভ্যের-সংখ্যা ধরলেও ত্রিবাঙ্কুর প্রথম স্থান অধিকার করে, কেননা, এধার দিয়ে তার সংখ্যা হচ্ছে ৩৯.৫। সমিতির সভ্য-সংখ্যা হিসাবে মহীশূরের স্থান হচ্ছে দ্বিতীয়, তার সভ্য-সংখ্যা হচ্ছে ১৪২,০৭১ জন। গোয়ালিয়রের স্থান হ'ল তৃতীয়, সেখানকার সংখ্যা হচ্ছে ৭৫,২০৯ জন। প্রতি হাজার লোকসংখ্যা পিছু সমিতির সভ্য-সংখ্যা অনুপাতে জনপ্রিয়তা ধরলে ভূপাল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, তার প্রতি হাজার লোকসংখ্যা পিছু সভ্যসংখ্যা হচ্ছে ২৫·৯। মহীশূরের স্থান হ'ল তৃতীয়, প্রতিহাজার লোকসংখ্যা পিছু তার সভ্যসংখ্যা হচ্ছে, ২০·৮৯। এধার দিয়ে গোয়ালিয়রের সভ্য সংখ্যা হ'ল ২০·৩। বৃটিশ ভারতে প্রতি হাজার লোকসংখ্যা পিছু প্রাথমিক সমিতির সভ্য সংখ্যা হচ্ছে ১৩·৩, উক্ত হিসাবে করদ ভারতের সভ্যসংখ্যা হচ্ছে ১৬·০। দুটিকে একসঙ্গে ধরলে প্রতিহাজার লোকসংখ্যা পিছু সমগ্র ভারতের সভ্য সংখ্যা হ'ল ১৩·৭।

এইবার কার্য্যকরী মূলধনের হিসাব পরীক্ষা করা যাক। এধার দিয়ে সমগ্র ভারতে প্রতি মাথা পিছু মূলধনের পরিমাণ হ'ল ৪৮ আনা। তন্মধ্যে বৃটিশ ভারতে মাথা পিছু মূলধনের পরিমাণ হ'ল ৫০ আনা এবং করদ ভারতে মাথা পিছু মূলধনের পরিমাণ হ'ল ৩৭ আনা। বৃটিশ ভারত ও করদ ভারত উভয়ের মধ্যেই কার্য্যকরী মূলধনের ক্ষেত্রে বাংলার স্থান হল প্রথম। বাংলাদেশে কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ

হচ্ছে ১৮,২১,২৪,০০০ টাকা। পাঞ্জাবের স্থান হ'ল দ্বিতীয়, তার পরিমাণ হচ্ছে ১৮,১৭,০৫,০০০ টাকা। তার পরেই বঙ্গের স্থান, তার মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ১৬,৮১,৪৯'০০০ টাকা। মাদ্রাজ চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে, তার মূলধনের পরিমাণ হ'ল ১৬,১৫,১২,০০০ টাকা। বাংলায় প্রতি মাথা পিছু মূলধনের পরিমাণ হ'ল ৫৭আনা পাঞ্জাবের ১১৭ আনা, বঙ্গের ১১৭ আনা, মান্দ্রাজের ৫৩ আনা। মাথা পিছু সর্ব্বোচ্চ' মূলধনের হিসাবে আজমীড় মাড়োয়ারে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, সেখানে প্রতি মাথা পিছু মূলধনের পরিমাণ হ'ল ১৪২ আনা। কুর্গের স্থান দ্বিতীয়, তার হ'ল ১২২ আনা। পাঞ্জাব ও বঙ্গের স্থান হ'ল তৃতীয় তাদের প্রত্যেকের ১১৭ আনা।

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূরেই কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ বেশী, যথা—২,৩১,০৫,০০০ টাকা। হায়দ্রাবাদের স্থান দ্বিতীয়, তার পরিমাণ হ'ল ২,২৪,৪৭,০০০ টাকা। গোয়ালিয়র তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে, তার পরিমাণ হ'ল ১,০০,৭৪,০০০ টাকা। মাথা পিছু মূলধনের হিসাব মহীশূরের হ'ল ৫৪ আনা, হায়দ্রাবাদের ২৩ আনা এবং গোয়ালিয়র ৪৪ আনা। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মাথা পিছু সর্ব্বোচ্চ মূলধনের পরিমাণ হ'ল ইন্দোরের যথা ৯১ আনা। মহীশূরের স্থান দ্বিতীয়, তার পরিমাণ হচ্ছে ৫৪ আনা। ভুপাল তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে, তার পরিমাণ হচ্ছে ৫১ আনা।

এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ১৯৩৪-৩৫ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গুলির সংখ্যা ৬১৩ হ'তে ৬২৬এ বৃদ্ধি পেলেও সভ্যের সংখ্যা ও কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ কমে গেছে। উক্ত সালের পূর্ব্বে সভ্য সংখ্যা ছিল ১৯৭,৬৩৩ জন, তা' কমে ১৯৬,৫০৮এ দাঁড়িয়েছে। মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪১,৮৮,০০,০০০ টাকা, তা' ৪১,০৪,০০,০০০ টাকায় নেমে গেছে। কিন্তু উক্ত ব্যাঙ্ক গুলির মোট আয় পূর্ব্ব বছর অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৩৩-৩৪ সালে উক্ত আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৩,৪৮,১৫২ টাকা। ১৯৩৪-৩৫ তা' ৫৬,৩৬,৪৮৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

কৃষি প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও অন্যান্য প্রাথমিক সমবায় সমিতি গুলির সংখ্যার কিছু উন্নতি ঘটেছে। পূর্ব্বে কৃষি সমিতি গুলির সংখ্যা ছিল ৯২,২২৬, তা' বৃদ্ধি পেয়ে ৯২,৯২০এ দাঁড়িয়েছে। কৃষি ছাড়া অপর সমিতি গুলির সংখ্যা ছিল, ১১,১১৮, তা' ১১,৪২৮এ বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত সংখ্যার মধ্যে ইন্‌সিওরেন্স সমিতি গুলিকেও ধরা হয়েছে। ১৯৩৪-৩৫ সালের শেষে কৃষি সমবায় সমিতি গুলির সভ্য সংখ্যা ও কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩,০০৮,১৫২ জন ও ৩৪,২২,০০,০০০ টাকা। কৃষি ছাড়া অপর সমিতি গুলির সভ্য সংখ্যা ও কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৩৮৭,৭৫৩ জন ও ২১,৬৩,০০,০০০ টাকা। সমস্ত রকমকেই এক সঙ্গে মিলিয়ে সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা ও কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪,৩৯৫,৯০৫ জন ও ৫৫,৮৫,০০,০০০ টাকা।

উক্ত বছরে কৃষি সমবায় সমিতিগুলির মোট লাভের পরিমাণ হ'ল ১,১২,০৯,৯৭৭ টাকা।

কৃষি ছাড়া অপর সমিতিগুলির লাভের পরিমাণ হচ্ছে ১২,২২,৩১০ টাকা। দু' রকমকে জড়িয়ে লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৮৪,৩২.২৮৭ টাকা।

এইবার সমস্ত প্রবন্ধের হিসাবাংশের সারাংশ এক সঙ্গে দেওয়া গেল—

	১৯০৬-১০	১৯৩৪-৩৫
ভারতে সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা—	১৯২৬	১০৬,০১১
সেণ্ট্রাল ও প্রাদেশিক প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানাদির সংখ্যা—	১৭	৬২৬
সুপারভাইজিং ও গ্যারাণ্টি ইউনিয়নের সংখ্যা—	×	৭৮৯
প্রাথমিক সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা—	১৬১৯১০	৪,৪০৯,৬৩৭
সমিতিগুলির মোট কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ—	৬৮,১২,০০০	৯৬,৮৮,৫২,০০০

১৯০৬-১০ সাল অপেক্ষা ১৯৩৪-৩৫ সালে সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা ৫৫ গুণ, উহার সভ্য সংখ্যা ২৭ গুণ এবং কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৪২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে সমিতিগুলির সংখ্যা।

	সংখ্যা	প্রতি লক্ষ অধিবাসী পিছু সমিতির সংখ্যা
বৃটিশ ভারত :—		
বাংলা—	২৩৪২৬	৪৫·৫
পাঞ্জাব—	২১৮৮৩	৮৮·২
মাদ্রাজ—	১৩৪১৯	২৭·৬
দেশীয় রাজ্য :—		
গোয়ালিয়র—	৪৩০১	১১৬·২
কাশ্মীর—	২৯৪৯	৭৭·৬
হায়দ্রাবাদ—	২৮০৯	১৮·৪

প্রতি লক্ষ অধিবাসী পিছু সমিতির সংখ্যা হিসাবে প্রদেশ গুলির ক্রমানুযায়ী স্থান—

ভূপাল—	১৩৭·৯
কুর্গ—	১২৮·০
আজমীর মাড়োয়ার	১২২·২
গোয়ালিয়র—	১১৬·২
পাঞ্জাব—	৮৮·২
কাশ্মীর—	৭৭·৬

সমগ্র ভারতের কথা ধরলে প্রতি লক্ষ অধিবাসী পিছু গড়ে সমিতির সংখ্যা হ'ল ৩৩।

প্রদেশানুযায়ী সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যার তালিকা :—

	সভ্য সংখ্যা	হাজার অধিবাসী পিছু সভ্য সংখ্যা
কুর্গ—	...	৮০·৮
আজমীঢ় মাড়োয়ার—	...	৫০·২

	সভ্য সংখ্যা	হাজার অধিবাসী পিছু সভ্যসংখ্যা
ত্রিবাঙ্কুর—	২২১,০৬১	৩৯·৫
পাঞ্জাব—	৭৩৫,৮৮৭	২৯·৭
ভূপাল—	...	২৫·৯
মহীশূর—	১৪২,০৭১	২০·৮৯

গোয়ালিয়র	৭৫,২০৯	২০·৩
মাদ্রাজ—	৮৭৫,৯০১	১৮·০
বাংলা—	৭৮৩,৭৯৮	১৫·২

বিভিন্ন প্রদেশে কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ঃ—

	টাকা	মাথা পিছু মূলধন (আনা)
বাংলা—	১৮,২১,২৪,০০০	৫৭
পাঞ্জাব—	১৮,১৭,০৫,০০০	১১৭
বোম্বাই —	১৬,৮১,৪৯,০০০	১১৭
মাদ্রাজ—	১৬,১৫,১২,০০০	৫৩
মহীশূর—	২,৩১,০৫,০০০	৫৪
হায়দ্রাবাদ	২,২৪,৪৭,০০০	২৩
গোয়ালিয়র	১,০০,৭৪,০০	৪৪
আজমীর-মাড়োয়ার	...	১৪২
কুর্গ—	...	১২২
ইন্দোর—	...	৯১
ভূপাল—	...	৫১
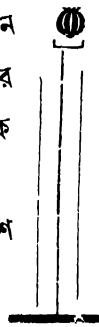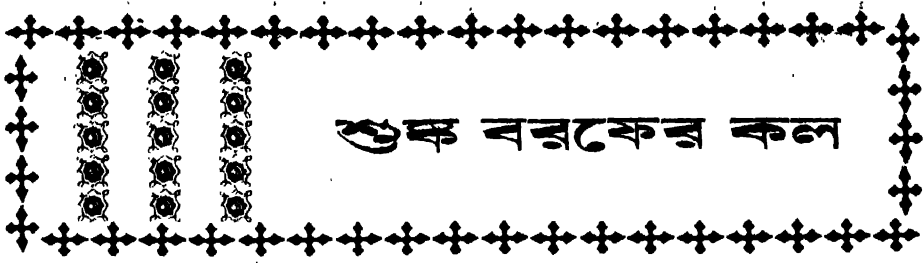
শুষ্ক বরফের কল

ভূপালের নবাব তাঁহার রাজ্যে একটি শুষ্কবরফ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। গত বৎসর বোম্বাইয়েও এই ধরণের একটী কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে।

শুষ্ক বরফ কথাটি শুনিতে অনেকের কাছে বিসদৃশ মনে হইবে। উহা জমাট কার্ব্বণ (Co 2) ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহার গুণাগুণ বরফেরই মত। কিন্তু সাধারণ আর্দ্র বরফ হইতে শুষ্ক বরফের সুবিধা অনেক বেশী।

প্রথমতঃ শুষ্ক বরফ গলে না, উহা বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। কাজেই কোন জিনিষ শুষ্ক বরফ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে বরফের জলীয় ভাগ দ্বারা উহা ময়লা হয় না অথচ উহার সংস্পর্শে কোন জিনিষ পচিয়া যাইবার আশঙ্কাও থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ উহা প্রস্তুত করিতে খরচা অনেক কম পড়ে। সাধারণতঃ এক হন্দর আর্দ্র বরফ তৈয়ার করিতে ১৩৲ টাকার মত ব্যয় পড়ে কিন্তু এক হন্দর শুষ্ক বরফ ১০॥০ টাকাতেই তৈয়ার করা যায়।

তৃতীয়তঃ আর্দ্র বরফ যত তাড়াতাড়ি গলিয়া যায় শুষ্ক বরফ উড়িয়া যাইতে উহার ১৫ গুণ বেশী সময় লাগে।

চতুর্থতঃ উহা উড়িয়া যাইতে অনেক সময় লাগে বলিয়া কম পরিমাণ জিনিষেই কাজ হয়। ফলে উহার সাহায্যে মালপত্র পাঠাইতে আর্দ্র বরফের তুলনায় মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ ব্যয় পড়ে।

পঞ্চমতঃ আর্দ্র বরফ একস্থান হইতে অন্যস্থানে পাঠাইতে পথেই উহার বহুলাংশ গলিয়া যায়; শুষ্ক বরফে এই অপচয় এক প্রকার হয় না বলিলেই চলে।

দেশের শিল্প-বাণিজ্যে বরফের ব্যবহার কত বেশী তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিভিন্ন শিল্পে বরফ তো ব্যবহার হয়ই, অধিকন্তু বরফ না হইলে দেশের একস্থান হইতে অন্য কোন দূরবর্ত্তী স্থানে ফল, দুধ, মাখন, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি জিনিষ অবিকৃত অবস্থায় চালান দেওয়া সম্ভবপর হয় না। অনেকে হয়তঃ একথা অবগত নহেন যে, শুষ্ক বরফের সাহায্যে কলিকাতার বাজারে পর্য্যন্ত সময় সময় জাপান হইতে আগত টাটকা সামুদ্রিক মাছ বিক্রয় হইয়া থাকে। বরফের সাহায্যে বিদেশে মাছ চালান দেওয়ার সুবিধার ফলেই জাপানে বর্ত্তমানে মাছের ব্যবসায়ে আমাদের দেশের তুলনায় দশগুণ বেশী লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। সস্তা বরফের সুবিধা পাইলে এদেশে

দুগ্ধজাত শিল্পের প্রসারের পথ সুগম হইবে এবং এদেশের ফলফলারি ও তরিতরকারী বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিবে।

বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে প্রচুর দুধ পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রদেশে দুগ্ধজাত শিল্পের কিছুই প্রসার হয় নাই। ফলে বাঙ্গলা দেশ প্রতিবৎসর জমাট দুগ্ধ, ঘৃত মাখন ইত্যাদির জন্য এক কোটী টাকারও বেশী বাহিরে পাঠাইতেছে। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র যদি সস্তা এবং একস্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণযোগ্য বরফ পাওয়া যায় তাহা হইলে বাঙ্গলার দুগ্ধজাত শিল্পের প্রসারের পথ সুগম হইতে পারে। অধিকন্তু মরশুমের সময়ে বাঙ্গলার অনেক স্থানে এত ইলিশ মাছ ধরা পড়ে যে, ধীবরগণ বরফের অভাবে উহার সমস্ত বাহিরে চালান দিতে অসমর্থ হইয়া অনেক মাছ নদীতে ফেলিয়া দেয় বলিয়া শুনা যায়। সস্তা বরফের সুবিধা পাইলে কেবল যে এই অপচয় বন্ধ হইবে এইরূপ নহে—উহার সাহায্যে সুন্দরবন ও অন্যান্য দূরবর্ত্তী অঞ্চলের মৎস্য চালানের নূতন নূতন আড়ত সৃষ্টি হইয়া দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইবে।

বাঙ্গলা দেশে যাঁহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠা স্থাপন বিষয়ে চিন্তা করেন, আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি। গতানুগতিক পন্থায় চলিয়া প্রত্যেক শিল্পের মধ্যে অনিষ্টকর প্রতিযোগীতার সৃষ্টি না করিয়া যদি দেশে কোন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহা হইলে সেজন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই শুষ্ক বরফ শিল্পের দ্রুত প্রসার হইয়াছে এবং উহা একটী লাভজনক শিল্প বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে উহা সফল না হইবার কোন কারণ নাই। ভূপালের নবাব তাঁহার রাজ্যে নূতন কারখানা স্থাপনকালে এরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই কারখানার জন্য বরফ আর একটা বিলাস সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ দরিদ্র ব্যক্তিগণও এই বরফ সস্তা মূল্যে ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। বাঙ্গলায় এই ধরণের কারখানা বসিলে উহা কেবল শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারেই সহায়তা করিবেন না—উহার ফলে দরিদ্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্যও একটু বৃদ্ধি পাইবে।

এই ধরণেব একটী কারখানা স্থাপন করিতে কি পরিমাণ মূলধন আবশ্যক তদ্বিষয়ে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। ভূপালে যে কারখানা স্থাপিত হইতেছে তাহার মূলধন কত তাহা প্রকাশ পায় নাই, তবে বোম্বাইয়ে যে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহার অনুমতিপ্রাপ্ত মূলধন চৌদ্দ লক্ষ টাকা। কাজ আরম্ভ করিতে বোধ হয় উহা অপেক্ষা কম মূলধনেই চলিবে। এই কারখানার উদ্যোক্তাগণ মনে করিতেছেন যে, প্রথম প্রথম উহাতে প্রত্যহ ১৮ টন শুষ্ক বরফ প্রস্তুত হইতে পারিবে। এই সব বিবরণ হইতে মনে হয় যে, শুষ্ক বরফের কারখানা প্রতিষ্ঠা কাপড়ের কল বা চটকল অপেক্ষা অধিক মূলধন সাপেক্ষ নহে।

(১)

আসাম ট্রেডিং কোম্পানীর মিঃ ডি গোস্বামী আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা লাক্ষার কারবার করেন। যাঁহারা পাইকারী দরে বেশী পরিমাণ লাক্ষা কিনিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত কোম্পানীর সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পত্র লেখা-লেখি করিতে পারেন। তাঁহাদের ঠিকানা এই—The Assam Trading Co. P. o. Lakhipur, Dt. Goalpara, Assam.

(২)

রংপুর জেলার অন্তর্গত বর্দ্ধনকুঠি ওয়ার্ডস এষ্টেটের ম্যানেজার আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে শতমূল ও কুটরাজ সরবরাহ করিতে পারেন। যাঁহারা এই জিনিস দুইটী কিনিতে চাহেন, তাঁহারা উক্ত ম্যানেজার মহাশয়ের সহিত সোজাসুজি পত্রলিখিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন। তাঁহার ঠিকানা ;—Manager; Bardhan Kuti, Wards Estate; Po. Govindagauj; Dt. Rangpur.

(৩)

বগুড়া জেলার অন্তর্গত চন্দনবৈসা ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সুপারভাইজিং ডিরেক্টার আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি ট্র্যাক্টর লাঙ্গল, ধানভানা কল ও আটা ভাঙ্গা কল কিনিতে চাহেন। যে সকল কোম্পানী উক্ত কল সমূহ সরবরাহ করিতে পারিবেন, তাঁহারা নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন,—Supervising Director; Chandan Baisa United Bank Ltd. Po. Chandan Baisa, Dt. Bogra.

(৪)

দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ঘোড়াঘাট পাবলিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারী শ্রীযুত রজনীকান্ত অধিকারী আমাদিগকে জানাইয়াছেন, তিনি

কবিরাজী গাছ-গাছড়ার কারবার করিতে চান। তাঁহার পত্রখানি আমরা আশ্বিনের পত্রাবলী শীর্ষক অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার সহিত যাঁহারা কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সোজা সুজি তাঁর নিকট পত্র লিখিবেন। তাঁহার ঠিকানা,—Rajani Kanta Adhikari Secretary, The Ghoraghat Public Library. Po, Ghoraghat. Dt Dinajpur

(৫)

আমরা আমাদের গ্রাহক শ্রীজুডোন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে এক খানি পত্র পাইয়াছি। নিম্নে তাহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হইল,—

"মান্যবর বন্ধু,

অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্রখানা আপনার বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার ব্যবসায়ীর সন্ধান, অথবা পত্রাবলী সিরিজে প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

আমি এখানে কিছুদিন যাবৎ আছি। এই স্থানটী ব্যবসায়ের একটী উৎকৃষ্ট চালানী বন্দর (good despatching station)। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট আতপ চাউল, সরিষা, গম, ছোলা, লাক্ষা (যাহা হইতে গালা প্রস্তুত হয় এবং, যাহা বৃক্ষে জন্মে) হরিতকী, মহুয়া, খস্‌খস্ (যাহা গ্রীষ্মকালে পর্দ্দারূপে ব্যবহৃত হয়) বেশ সুবিধা দরে অন্যত্র বিশেষ কলিকাতায় চালিয়ার চালান যায়। কোন বিশিষ্ট মহাজন খরিদ্দারের সাহচর্য্য ও সহানুভূতি পাইলে এই চালানী কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া কলিকাতাস্থ ও হাবড়ার রামকৃষ্ণপুরের যে সমস্ত বিশিষ্ট আড়তদার মহাজন আছেন, তাঁহাদের ঠিকানা আমাকে জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।"

গ্রাহক নং ৫৮৯১
শ্রীজুডোন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
পেণ্ড্রারোড পোঃ বিলাসপুর
বি, এন, আর

আমাদের এই বৎসরের আষাঢ় মাসের পত্রিকায় "ব্যবসায়ের সন্ধান" শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত মর্ম্মে একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে আমাদের এই গ্রাহকের নাম দেওয়া হয় নাই। এবারে তাঁহার ইচ্ছানুসারেই আমরা তাঁর নাম প্রকাশ করিলাম। ব্যবসায়িগণ সোজাসুজি তাঁহার নিকট চিঠি লিখিয়া কথাবার্ত্তা স্থির করিতে পারেন। আমাদের নিকট আর লিখিবার দরকার নাই।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক অথবা পাঠকদিগের মধ্যে যদি কাহারও কোনও জিনিষ বেচিবার বা কিনিবার দরকার থাকে, তবে তাহা আমাদিগকে জানাইলে আমরা বিনামূল্যে আমাদের "ব্যবসায়ের সন্ধান" নামক অধ্যায়ে তাহা আমূল প্রকাশ করিব। এজন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোনও চার্জ্জ লইব না। নাম, ধাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং চিঠি পত্রাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন।

সম্পাদক

ক্যাপিটাল ও লেবারের বিরোধ

বর্ত্তমান জগতের দ্বন্দ্ব হ'ল লেবার ও ক্যাপিট্যালের দ্বন্দ্ব। এই লেবার ও ক্যাপিট্যালের দ্বন্দ্ব আজকের পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, আমাদের চারিদিকেই কেবলই চোখে প'ড়বে এই লেবার ও ক্যাপিট্যালের মধ্যে দারুণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। অথচ এই লেবার ও ক্যাপিট্যালের কোনটাই সমাজের পক্ষে অনাবশ্যক নয়, বরং অত্যাবশ্যক। ক্যাপিটালিষ্টদের শোষনের জন্যই আমরা তাদের নিন্দা করি, কিন্তু তাই বলে ক্যাপিট্যালের (মূলধন) নিন্দা করা চলে না। যদি কেউ অত্যধিক প্রাচীনতার মোহে ক্যাপিটালের নিন্দা করে, তবে তাতে তার মূর্খতার পরিচয় পাওয়া যাবে। ক্যাপিট্যাল আমাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করণের একটা উপাদান, অথচ এটাও ঠিক যে, আজকের যুগে ক্যাপিটালিষ্ট সিষ্টেম্ মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার জন্য অধিকাংশে দায়ী। কথাটা কতকটা প্যারাডক্সিক্যাল শোনালেও ওর মধ্যে মিথ্যার ছোঁয়াচ একটুকুও নেই! ক্যাপিট্যালের সাহায্যে ধনবৃদ্ধি ঘটছে, জাতীয় সম্পদ বাড়ছে, তবুও জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা একটুকু দূর হচ্ছে না। আমাদের অধঃপতিত পরাধীন দেশ, আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া যাক্; কিন্তু ইউরোপের উন্নত দেশগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেও ঐ একই জিনিস চোখে পড়ে। প্রতি দেশই আজ জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা ও বেকার সমস্যা দূর করবার দিকে অতিমাত্রায় মনোযোগী হ'য়ে উঠেছে। এ-মনোযোগ তাদের আজকের নয়, কয়েক বছর ধরেই ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলিতে এই প্রচেষ্টা চলেছে, কিন্তু পারছে না—পারছে না—কিছুতেই কেউ এই সমস্যার একেবারে সমাধান করতে পারছে না। এর আসল কারণ এই যে, ইউরোপের রাষ্ট্রপতিরা (রুশিয়া ব্যতিরেকে) সমস্যার মূলে হাত দিতে দেন না। সংস্কার পন্থীদের প্ল্যানিং-এর চেষ্টায় এই সমস্যাকে সাময়িকভাবে ধামাচাপা দেওয়া যায় বটে; কিন্তু সম্পূর্ণ এড়ানো যায় না। তাইতেই আমরা দেখি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বেকারের সংখ্যা কখনো কমে, কখনো বাড়ে, কিন্তু একেবারে দূরীভূত হয় না। ওদের স্বাধীন দেশ, উন্নত দেশ, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ওদের নিজেদের হাতে বলে বেকারদের ওরা ভাতা দেয়, মজুরীর একটা ন্যূনতম হার বেঁধে দেওয়ার নিয়ম করে; কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যবস্থাই ওদের কৃত্রিম, আইনের দণ্ডের, ওপরই

গুলি প্রতিষ্ঠিত। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে কৃত্রিম আইনে বেঁধে জনসাধারণ ও বেকারদের উন্নতি করবার ওরা চেষ্টা করছে, কিন্তু অকৃত্রিম উপায়ে অর্থনৈতিক গতি-পরিণতির স্বাভাবিক সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা ওরা দুরবস্থাটাকে একেবারে দূরীভূত করবার চেষ্টা করছেন। ফলে, এই পৃথিবীতে সেই পূর্ব্বেকার মতই বেকার ও বুভুক্ষার মিছিল আজও বজায় আছে।

ক্যাপিটাল ও লেবারের বিরোধই এর জন্য দায়ী, অথচ এ বিরোধের মীমাংসা কি সম্ভবপর নয়? সম্ভবপর যে নয় এ কথা কেউ-ই বলবে না, অথচ কেমন করে সম্ভব সেই নিয়েই মত বিরোধ দেখা দেয়। মত বিরোধ যে দেখা দেয় তার কারণ হচ্ছে' যে, এ পৃথিবীতে সবার স্বার্থ সমান নয়। আমরা সবাই সামাজিক অবস্থানুযায়ী নানা শ্রেণী গণ্ডায় বিভক্ত, সুতরাং লেবার ও ক্যাপিটালের বিরোধ সম্পর্কে যে যার শ্রেণীগত স্বকীয় অভিমত ব্যক্ত করি। কিন্তু মতানৈক্যের ক্ষেত্রে একটা যায়গায় সকলের মুখমিল আছে, সকলেই চায় যে, পৃথিবীর লোকের সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটুক, মধ্যযুগীয় অবস্থায় কেউ আর ফিরে যেতে চায় না। কেননা, মধ্যযুগীয় অবস্থায় ফিরে গেলে আমাদের আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার যে ক্ষতি হয় একথাটা সবাই বোঝে।

কিন্তু এই উন্নতি ঘটানো নিয়েই যত বিতর্ক। ক্যাপিটালিষ্ট যে, সে শ্রমিকের উন্নতি ঘটাতে চায় ততটুকু যতটুকু দ্বারা সে জীবন ধারণ করে থাকতে সমর্থ হয়; অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরী হয় ততটুকু যতটুকু দ্বারা শ্রমিকের শ্রমশক্তি বজায় থাকে। এর বেশী সে আর দিতে পারে না, কেননা, তাতে তার লাভের হিসাবে হাত পড়ে। কিন্তু শ্রমিক এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে যে জিনিস উৎপাদন করলে তার জন্য মাত্র সে যে কেবল কোনরকমে টিকে থাকার মজুরী লাভ করবে আর তারই সামনে ক্যাপিটালিষ্ট মোটা লাভ মারবে, এ জিনিসটা তার সয় না। শুধু তাই নয়, সামাজিক দিক দিয়ে দেখলেও এ অবস্থা অনুমোদন করা যায় না। পৃথিবীতে শ্রমিকের সংখ্যাই (এখানে শ্রমিক বলতে যারাই দিন মজুরী করে খায় তাদেরই ধরা হয়েছে) অতিরিক্তরূপে বেশী ক্যাপিটালিষ্টদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সুতরাং শ্রমিকদের আমরা যদি কোনরকমে টিকে থাকার পর্য্যায়ে ফেলে রাখি ত তাতে সমাজের স্বাস্থ্য ভাল থাকতে পারে না। চৌরঙ্গীর আপাতঃ সুদৃশ্য সৌখীন দীপ-মালাই কোলকাতার আসল পরিচয় নয়. ওরও শ্যামবাজারের ঘিনজী পল্লী আছে, বড় বাজারের ভ্যাপসা এঁদো গলি আছে। সেই জন্যই কেউ যদি শুধুমাত্র চৌরঙ্গী দেখেই বলে যে, আহা! কোলকাতা যেন একেবারে স্বর্গরাজ্য, তখন তার বুদ্ধির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করতে হয়। সেই রকমই আধুনিকযুগে উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্যাপিটালিষ্টদের দেখে কেউ যদি বলে যে আমাদের সমাজের আর কোন দুঃখদুর্দ্দশা নেই, তখন তার ভাষণটাকেও সত্য বলে যেন নিতে পারা যায় না। কই, ক্যাপিটালিষ্টদের জাঁকজমকের অন্তরালে 'লেবারে'র বিরোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'রুশিয়ার চিঠিতে' একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন, বলেছেন যে, শ্রমিকরা হ'ল সভ্যতার পিলসুজ! কথাটা বড় সুন্দর এবং অপ্রিয় সত্য। সভ্যতার পিলসুজ সেজে ওরা ক্যাপিটা-লিষ্টদের জন্য ভোগের দীপ জ্বালিয়ে রাখে,

আর ওদের গা দিয়ে প্রতিনিয়ত তেল কালি গড়িয়ে পড়ে, সেইটাই হ'ল খাটুনীর বেদনার চিরন্তন পুরষ্কার! অনেকে হয়ত আপত্তি করে বলতে পারেন যে, ওটা হ'ল কবির উপমা, আসল তথ্য বিশ্লেষণ নয়; কিন্তু তার জবাবে এটুকু বলা চলে যে, কবির উপমা হ'লেও ওতে মিথ্যার ছোঁয়াচ নেই। যে-শ্রমিক হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতে কোন জিনিস তৈরী করে সে কি সেটা ভোগ করতে পায়? পৃথিবীতে এত যে ভোগের বস্তু তৈরী হচ্ছে, কটা মজুর আর তার আস্বাদ পেয়ে থাকে? সুতরাং তাদের সভ্যতার পিলসুজ ছাড়া আর কি বলা চলে?

পৃথিবীর বর্ত্তমান লোকসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১৯০ কোটি, হিসাব করে কেউ দেখুক ত তার মধ্যে কি-মুষ্টিমেয় সংখ্যা হচ্ছে ক্যাপিটালিষ্ট আর কি বিরাট সংখ্যা হচ্ছে ঐ শ্রমিক সম্প্রদায়ের! এখানে এটা ভুললে চলবে না যে যারাই দিন মজুরী করে খায় তাদেরই শ্রমিক বলা হচ্ছে কৃষকরাও তার থেকে বাদ যায় না। অথচ ঐ মুষ্টিমেয় লোকের কৌশলেই উক্ত বিরাট সম্প্রদায় বুভুক্ষিত হ'য়ে দিন

কাটায়। এমতাবস্থায় এই বুভুক্ষিত সম্প্রদায়ের কি বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিপক্ষে অভিযোগ করবার কিছু নেই? পূর্ব্বেই বলেছি যে, ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে কারও কিছু বলবার নেই। ক্যাপিটালিষ্টদের বিরুদ্ধেই যত আক্রোশ সবার। অদৃষ্টের কি আশ্চর্য্য পরিহাস! এই ক্যাপিটালিষ্টরাই একসময়ে বুভুক্ষিত জনসাধারণের পক্ষ নিয়ে লড়েছিল, অথচ আজকে তারাই তাদের শোষনের সঙ্গীন্ জনসাধারণের বিরুদ্ধে তুলে ধরেছে।

ইতিহাসের সেই জিনিসটা সবার চোখে পড়ে না।

সে আজকের কথা নয়, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিভলিউসন্ তখন কিছুদিন হ'ল সুরু হয়েছে। যারা কলকারখানার মালিক, তারা দেখ্‌লে যে নোবিলিটি ও এ্যারিষ্টোক্র্যাট্‌দের হাতে যতদিন রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকবে ততদিন তাদের ব্যবসার পক্ষে তেমন কোন সুযোগ নেই। তাই তারা উৎপীড়িত জনসাধারণের সাহায্যে বিপ্লব ঘটালে, ধ্বনিত করলে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী। তখনকার কৃষিজীবী জনসাধারণ ঐ বাণীর মোহে ভুলে বিপ্লবে যোগদান করেছিল, কেননা, তাদের উদ্দেশ্য ছিল কোন রকমে সার্ফডমের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। সে বিপ্লবের নাম হ'ল বুর্জ্জোয়া বিপ্লব, ক্যাপিটালিজমের জন্ম সেইখান থেকেই। ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে পর পর এই রকম অনেকগুলি বুর্জ্জোয়া বিপ্লব ঘটে গেছে।

তাতে সমাজ Serfdom এর হাত থেকে মুক্তি পেলে বটে; কিন্তু ক্যাপিটালিজমের দুর্জ্জয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল। সেই বাঁধনই আজ শক্ত করে সমাজের বুকে চেঁপে লেবার ও ক্যাপিটালের বিরোধ ঘটাচ্ছে। এ বিরোধের মীমাংসা নেই যতদিন না আর একটা বিপ্লব ঘটে যায়। যার নাম 'প্রলিটারিয়েট রিভিলিউসন্', কিংবা দু' পক্ষ নিজেদের স্বার্থ ছেড়ে দিয়ে মানবতার পথে অগ্রসর হয়। ক্যাপিটালিষ্ট যখন তার স্বার্থ বোঝে তখন তার কেবল নিজের লাভের দিকটাতেই নজর থাকে, মানবতার দিকে নজর থাকে না; আর 'লেবারার্'রা যখন ক্যাপিটালিষ্টদের প্রতি আক্রোশ পোষণ করে তখন সে তা' মরিয়া হয়ে অন্ধ ভাবেই করে, শিল্প-বাণিজ্যের তাতে ক্ষতি হবে কিনা সেটা ভেবে দেখে না। ছারপোকা মারতে যেয়ে বিছানাই পোড়াইয়া ফেলে কিন্তু বাড়ীতেই আগুন লাগিয়াছে। এইখানেই চরম ট্র্যাজিডি নিহিত রয়েছে।

ক্যাপিটালিষ্টদের শুধু এইটুকু ভাবা উচিত যে, লোকে ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে কিছু বলছে না, আধুনিক ইণ্ডাষ্ট্রির বিরুদ্ধে কিছু বল্‌ছে না, বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবনার বিরুদ্ধেও কিছু বলছে না—শুধু বলছে ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে। তাদের এই ক্যাপিটালিষ্টিক মনোবৃত্তির মধ্যে কোন মারাত্মক গলদ নেই কি? যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, কোন গলদ নেই, তবে পৃথিবীর শ্রমিক মহলে এত দ্বন্দ্ব কোলাহল এবং ঝঞ্ঝা বিরোধ কেন?—কেন এত ক্ষুধিতের হাহাকার ও বেকার সমস্যার প্রাবল্য? এর জবাবে ক্যাপিটালিষ্টরা বলতে পারে যে তার জন্য তারা করবে কি, দোষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার, তার কাছে গিয়ে নালিশ করগে। কথাটা শুনতে মন্দ নয়, মানতেও মন্দ নয়; কিন্তু রাষ্ট্র যখন ক্যাপিটালকে 'সোসিয়ালাইজড্' করতে যায় তখন ক্যাপিটালিষ্টরা অমন মারাত্মক

ভাবে বাধা দেয় কেন ? অথচ ক্যাপিটালকে 'সোসিয়ালাইজড' না করে রাষ্ট্র যে কি উপায়ে জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত করতে পারে তা বোঝা শক্ত। বলতে পারেন যে, রাষ্ট্র নানা রকম শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে, কৃষির উন্নতি করে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ত করতে পারবে, সেক্ষেত্রে ত আর ক্যাপিটালকে সোসিয়ালাইজড্ করবার প্রশ্ন ওঠে না ? কথাটা সত্য না হ'লেও আংশিক সত্য বটে। কিন্তু আধুনিককালের ক্রমাগতঃ ক্রাইসিসের নিকট ঐ আংশিক সত্য বস্তু আর কিছুতেই টিঁকতে পারছে না। যে সমস্ত দেশের উন্নতিশীল গভর্ণমেণ্ট উপরোক্ত মর্ম্মে কৃষি শিল্পের উন্নতি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তাদের দেশেও হাহাকারের অন্ত নেই, হ'তে পারে সে হাহাকার আমাদের মত পশ্চাৎপদ পরাধীন দেশের হাহাকার অপেক্ষা ঢের কম। তবুও সে ত হাহাকার বটে, দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের ব্যথা বেদনার অশ্রুবাষ্প ত তার সঙ্গে মিশিয়ে আছে বটে ! আধুনিক জগৎ হাজার চেষ্টা করেও তাকে কিছুতেই এড়িয়ে চলতে পারছে না।

আধুনিক জগতের এই অসামঞ্জস্যের মূলে রয়েছে সেই লেবার ও ক্যাপিটালের দ্বন্দ্ব। রাষ্ট্র যতই উন্নতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক না কেন, যতক্ষণ না সে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ ব্যাপার গুলিকে সোসিয়ালাইজড্ করছে, ততক্ষণ সে কিছুতেই এই লেবার ও ক্যাপিটালের দ্বন্দ্বকে এড়াতে পারবে না। কিংবা সে এড়াতে পারে তখন যখন সকল শ্রমিকদের সে যথেষ্ট মজুরী দিতে পারে যাতে করে তারা শুধু টিঁকে থাকা নয়, ভাল করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শিল্প ব্যাপারে একমাত্র 'মনোপলির' ক্ষেত্র ছাড়া সে ব্যবস্থা সম্ভব নয়। ক্যাপিটালিষ্ট যতই উদারচেতা এবং শ্রমিক দরদী হোন্ না কেন, তাঁর ব্যবসায়ে লোকসান খাইয়ে তিনি কিছুতেই শ্রমিকদের বেশী মজুরী দিতে পারেন না। এর একমাত্র কারণ হ'ল যে, শিল্প ক্ষেত্রে ভীষণ প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান। আজ পর্য্যন্ত ক্যাপিটালিষ্টরা এমন কোন 'ভানুমতীর খেল' কিংবা অদ্ভুত যাদুবিদ্যা আবিষ্কার করতে পারে নি যাতে করে এ দুনিয়া থেকে মুহূর্ত্তের মধ্যে 'কম্পিটিশন্' অন্তর্হিত হতে পারে। এই কম্পিটীশনের দরুণই ক্যাপিটালিষ্ট দের লাভের অঙ্ক ক্রমশঃ কমে আসছে। সে ক্ষেত্রে তারা কি করে শ্রমিকদের বেশী মজুরী দিতে পারে ?

একটা স্পষ্ট উদাহরণ দিলে বোধ হয় ব্যাপারটা পরিষ্কৃত হ'তে পারবে। সকলেই জানেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার গম ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ মণ গম ইচ্ছা করে পুড়িয়ে ফেলে। মানবতার দিক দিয়ে হয়ত এ প্রশ্ন করা যায় না, পৃথিবীতে যেখানে এত খাদ্য সঙ্কট সেখানে ও জিনিসটা পুড়িয়ে না ফেলে কি গরীবদের বিলিয়ে দেওয়া চল্‌ত না ? প্রশ্নটা সমীচীন, কিন্তু মানবতা ও ব্যবসা পরিচালনা এক জিনিষ নয়। মানবতার দিক দিয়ে ওটা বিলিয়ে দেওয়া চলত কিন্তু ব্যবসার দিক দিয়ে ওটাকে পুড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যদি পুড়িয়ে না দেওয়া হত তাহলে অতি উৎপাদনের জন্য গমের বাজার দর এত নীচে নেমে যেতো যে, পৃথিবীর সমষ্টিগত মানবতার শত চেষ্টায়ও গম শিল্পকে রক্ষা করা সম্ভব হত না।

এইখানেই আধুনিক জগতের ট্র্যাজিডি! শুধু ত গম পুড়িয়ে নয়, ঐ রকম প্রতি বছর যে কত জিনিষকে অপচয়ে নষ্ট করা হচ্ছে অথচ বুভুক্ষিতের কাজে আসছে না তার ইয়ত্তা নেই। সে-ক্ষেত্রে দোষ ত আর ক্যাপিটালিষ্টের নয়, দোষ ক্যাপিটালিষ্টদিগের উৎপাদন ব্যবস্থার। এই ক্যাপিটালিষ্টিক্ উৎপাদন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাই আধুনিক যুগের বঞ্চিতদের যত আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এ আক্রোশ কোনো ব্যক্তিগত ধনীর বিরুদ্ধে নয়, বিশ্বের সকল ধনীর বিরুদ্ধে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়েছি যে, যতদিন এই উৎপাদন ব্যবস্থা বর্ত্তমান থাকবে ততদিন কোন মানব প্রেমিক কিংবা কোন শ্রমিক-দরদী ক্যাপিটালিষ্ট এর ক্ষমতাই নেই যে, শ্রমিক সম্প্রদায়ের উন্নতি ঘটান। বিশ্বব্যাপী বিকট প্রতিযোগিতাই এর জন্য দায়ী। কাজেই যাঁরা বলেন যে শ্রমিক-দরদী ক্যাপিটালিষ্টরা শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি করবেন, তাঁদের কথার মধ্যে মনোহারিত্ব থাকতে পারে কিন্তু যুক্তির সারবত্তা নেই।

তবে কি ক্যাপিটাল ও লেবারের বিরোধের সমাধান সম্ভব নয়? সম্ভব এবং রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ক্যাপিটালকে সোসিয়ালাইজড করবার ব্যবস্থা করলেই তা' সম্ভব হ'তে পারে। এ উপায় ছাড়া আধুনিক বঞ্চিতদের আর কোন উপায় চোখে পড়ে না। যদি কোন চিন্তাশীল মনীষী এর চেয়েও কোন ভাল উপায় দেখাতে পারেন ত আধুনিক জগৎ তা' অবনত মস্তকে গ্রহণ করবে। কিন্তু সমস্যাকে ফাঁকি দিলে ত চলবে না, কম্বল ঢেকে বায়ুর চাপকে আর কতদিন রোধ করা যায়? আমাদের চার পাশে আজ এই যে ক্ষুধিতের হাহাকার ও বেকার এবং পঙ্গুত্বের মিছিল, এ সম্পর্কে ক্যাপিটালিষ্টরা যে সচেতন নয় তা' বলেনি, তাঁরাও এসমস্যাটাকে আমাদের মতই ভেবে থাকেন; কিন্তু তাঁদের করবার কিছুই নেই। ক্যাপিটালিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থার যতক্ষণ তাঁরা অঙ্গ ততক্ষণ তাঁরা শ্রমিককে মাত্র টিঁকে থাকার বেশী মজুরী দিতে পারেন না, অথচ সেটুকুতে কি লেবার ও ক্যাপিটালের বিরোধ মিটতে পারে?

এতক্ষণ আমরা ক্যাপিটাল ও লেবারের বিরোধ সম্পর্কে দেশের আভ্যন্তরীন্ ক্ষেত্র সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি, এবার আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তার কি মারাত্মক ফল ফলে সেটাই দেখব। পূর্ব্বেই বলেছি যে যন্ত্র বিপ্লব থেকেই ক্যাপিটালিজমের উৎপত্তি। যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের লোভ এত বেড়ে গেল যে, সে বহুল পরিমাণে মাল উৎপন্ন করতে আরম্ভ করলে। অল্প সময়ের মধ্যে বেশী মাল উৎপাদন করতে সমর্থ হওয়ার দরুণ লাভও তার যথেষ্ট বেড়ে গেল। কিন্তু এই লাভের ভাগী একলা কেউ হ'তে পারলে না। একজন লাভবান হচ্ছে দেখে আরও অনেকে সেই কাজে নেমে পড়ল, ফলে সকলেরই প্রতিযোগিতার দরুণ লাভের অংশ গেল কমে। লাভের অংশ যত কমতে লাগল, বেশী করে লোকে ততই মাল উৎপাদন করতে আরম্ভ করলে, ভাবলে পরিমাণ দিয়ে ঘাটতিটা পূরণ করে নেবে। তার ফল হ'ল কিনা এত বেশী মাল মজুদ হ'তে লাগল যে, দেশের বাজারে তার কোন ক্রেতা নেই—বিদেশের বাজার না হ'লে আর চলবে না।

সেই বিদেশের বাজার অধিকার প্রচেষ্টা থেকেই ইম্পিরিয়ালিজমের উৎপত্তি; আমাদের ভারতে সেই ইম্পিরিয়ালিজমের নিগড় কেমন

ভাবে গ্রথিত হয়েছে এবং কি ভাবে প্রসারিত হয়েছে তা' কারও অজানা নয়, একথাটা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারবে না যে, ইংরেজ এদেশে মুখ্যতঃ বাণিজ্য করতেই এসেছিল—সেই বাণিজ্য করবার জন্যই তার রাজত্ব করা। বিগত মহাসমরের পেছনে জার্ম্মানীর এই বাণিজ্য বাজার অধিকারের স্পৃহাই লুকিয়েছিল। ইম্পিরিয়ালিষ্ট ইতালী যে সেদিন অন্যায়ভাবে আবিসিনিয়ার ওপর দস্যুবৃত্তি চরিতার্থ করলে, তারও গোপন কারণ বাণিজ্যের জন্য কলোনি অধিকার করা। যে সমস্ত দেশের কলোনি নেই, ব্যবসার দিক দিয়ে তারা ভয়ঙ্কর ঘা খাচ্ছে, হয় তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ইতিমধ্যেই নষ্ট হ'য়ে গেছে, নয়ত অসম্ভব সস্তায় মাল বিক্রী করার দরুণ কোন রকমে তা' টিকে আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইম্পিরিয়ালিজমের সঙ্গে ক্যাপিটালিজমের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর এই ইম্পিরিয়ালিজম্ হ'ল বিশ্বের মানবতার চিরশত্রু। এই ইম্পিরিয়ালিজমের প্রেরণায়ই ইতালী ও জার্ম্মানী আজ স্পেনকে একেবারে ছিঁড়ে খেতে বসেছে—ফ্রাঙ্কো ত সেখানে নিমিত্ত মাত্র। কাজে কাজেই এ ইম্পিরিয়ালিজম্ যতদিন পৃথিবীতে বজায় থাকবে ততদিন মানবাত্মার স্থায়ী শান্তি সম্ভব নয়। অতএব বিশ্বের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত হচ্ছে ইম্পিরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করা, এবং রঁল্যা, ল্যাস্কি, শ', রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা তাই করতে চেষ্টা করছেন। ইম্পিরিয়ালিজম্ যদি বিদূরিত হয় ত ক্যাপিটালিজমের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে উঠবে। তখন আর ক্যাপিটাল ও লেবারের এই মারাত্মক বিরোধ থাকবে না।

ক্যাপিটালিষ্টিক উৎপাদন-ব্যবস্থার পদে পদে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করবার বিষয়। উক্ত উৎপাদন ব্যবস্থায় শুধু যে লেবার ও ক্যাপিটাল্-এর মধ্যে বিরোধ দেখা যায় তা' নয়, পরন্তু ক্যাপিটালিষ্টদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ লাগে যার ফলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্যাপিটালিষ্টরা উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সকলেই জানেন যে, যন্ত্র-বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ এমন একটা ক্ষমতা তার আয়ত্তে এনেছে যদ্বারা সে অনায়াসে যত খুসী মাল উৎপাদন করতে পারে। উক্ত ক্ষমতাবলে বেশী মাল উৎপাদনের প্রচেষ্টাই তাদের লাভের অঙ্ক কমিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ওদের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। এই প্রতিযোগিতা যাতে তাদের একেবারে ধ্বংস করে না ফেলে তজ্জন্য বড় বড় ব্যবসায়ীরা সময় থাকতে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে এক হ'য়ে যায়, যার ফলে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা সেই একীভূত বিরাট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনা। এই রকম ভাবেই দেশের শিল্পগুলির মধ্যে ট্রাষ্ট গড়ে ওঠে; উক্ত ট্রাষ্টের ব্যবসাগত যতই সুবিধা ও উপযোগিতা থাকুক না কেন, ওর মধ্যে যে ক্যাপিটালিষ্টদের পরস্পর বিরোধের ভাব লুকিয়ে আছে এটা অস্বীকার করা যায় না।

অতএব আমরা এ সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করতে পারি যে, ক্যাপিটালিষ্টিক উৎপাদন ব্যবস্থা নিজের মধ্যেই নিজেকে ধ্বংস করবার বীজ লুকিয়ে রাখে। এ-সত্যটা সকলের চক্ষে ধরা পড়ে না, নইলে ক্যাপিটালিষ্টিক উৎপাদন ব্যবস্থার একদিন যে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী (মনে রাখবেন ক্যাপিটালের ধ্বংস নয়, কিংবা বিজ্ঞানসম্মত

উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থারও ধ্বংস নয়) একথাটা স্বীকার করতে ক্যাপিটালিষ্টরা অমন কুণ্ঠিত হ'ত না। পূর্ব্বেই বলেছি যে, অদৃষ্টের পরিহাস রূপে একদিন এই ক্যাপিটালিষ্টরা 'নোবিলিটিও ল্যাণ্ডেড্ এ্যারিষ্টোক্র্যাসী'র হাত থেকে রাষ্ট্রভার কেড়ে নেবার জন্য বিপ্লবে সহায়তা করেছিল, কেননা, তাতে বাণিজ্যগত সুবিধা হ'বার কথা। কিন্তু আজ তারাই যে-কোনো রাষ্ট্রবিপ্লবে বাধা সৃষ্টি করবে। এখানে এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, যে-সমস্ত দেশে পূর্ব্বোক্ত বুর্জ্জোয়াবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় নি, সে-সমস্ত দেশের ক্যাপিটালিষ্টরা রাষ্ট্রভার করায়ত্ত করবার জন্য সংগ্রামে আন্তরিকতা সহকারে যোগ দেবে। ভারতবর্ষ হচ্ছে সেই রকম দেশ, ইউরোপের অন্যান্য যায়গায় যখন বুর্জ্জোয়াবিপ্লব ঘটে গেছে; ভারতবর্ষে ঠিক সেই সময়ে বৃটিশ রাজত্ব কায়েমী হ'বার পথে অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষের মধ্যে যাঁরা শ্রমিকবিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন তাঁদের এটা বোঝা উচিত যে বুর্জ্জোয়াবিপ্লব সংঘটিত না হ'লে শ্রমিক বিপ্লব কিছুতেই অনুষ্ঠিত হ'তে পারে না। অবশ্য ভারতবর্ষ যদি অত্যন্তরূপে শ্রমিক প্রধান ও শ্রেণী চেতনশীল হয়ে ওঠে ত স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু আপাততঃ তার কোন সম্ভাবনা নেই। ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্য এখনো তেমন গড়ে ওঠে নি, সুতরাং ভারতবর্ষের প্রধান এবং প্রথম প্রচেষ্টা হবে কৃষি-প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দেশকে শিল্পবাণিজ্য প্রধান করে গড়ে তোলা। দেশকে

যদি শিল্পবাণিজ্য প্রধান করে গড়ে তোলা যায় ত দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং আমাদের দেশের বর্ত্তমান ক্যাপিটালিষ্টরা বলেন যে, দেশের এই পরিবর্ত্তনের সময়ে অর্থাৎ দেশ যখন শিল্পবাণিজ্য প্রধান হয়ে ওঠবার প্রাথমিক অবস্থায় তখন শ্রমিক বিপ্লবীরা যদি শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অকারণ বাধা সৃষ্টি করেন ত দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে তা' মারাত্মক ক্ষতিসাধন করবে। শুধু তাই নয়, তাঁদের (শ্রমিকবিপ্লবীদের) দিক দিয়ে দেখতে গেলেও শিল্প বাণিজ্যের যদি প্রসারতা না ঘটে ত তাঁদের শ্রমিক বিপ্লবের আশা মোটেই সফল হ'বে না। ক্যাপিটালিষ্টদের এই সব উক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিক বিপ্লবীদের অনেক কিছু বলবার আছে জানি, কিন্তু আমাদের দেশে ইণ্ডাষ্ট্রিসমূহ যখন একেবারে শিশু অবস্থায় এবং বিদেশী প্রতিযোগিতার দরুণ যখন দারুণ ঘা খাচ্ছে তখন ঐ সমস্ত শিল্প ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে এই সকল শিল্পের ক্ষতি হয় কিনা সে-বিষয়টা তাঁরা একবার ভেবে দেখবেন। দেশী শিল্প ব্যাপারে ক্যাপিটালিষ্টদের অসুবিধা অনেক; প্রথমতঃ তাঁদের শিল্প সমূহের শিশু অবস্থা; দ্বিতীয়তঃ বিদেশী প্রতিযোগিতার আক্রমণের জন্য তাঁদের সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। সুতরাং প্রথমাবস্থায় যদি আরও নতুন প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় ক্যাপিটালিষ্টরা আরও বিচলিত ও বিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। তাই আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত হচ্ছে যে, আমাদের দেশের শিল্পের দুঃসময়ে শ্রমিক বিপ্লবীরা যেন কোন বাধা সৃষ্টি না করেন, কেননা, তাতে তাঁদেরই অসুবিধা বেশী। বরঞ্চ শিল্পবাণিজ্য যখন বেশ চালু অবস্থায় থাকে তখন তাঁরা ধর্ম্মঘট ইত্যাদি দ্বারা ক্যাপিটালিষ্টদের বিব্রত করতে পারেন, তাতে তাদের সুবিধা আদায়ের সম্ভাবনা বেশী। আমরা জানি যে, বর্ত্তমান ক্যাপিটালিষ্টদের যথেষ্ট উদাসীনতা আছে, কিন্তু তাদের সে উদাসীনতা ভাঙ্গতে গেলে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতি করাটা সুকৌশল নয়, বরং তাদের লাভের পড়তার সময় চাপ দেওয়াটাই রীতিসম্মত। রুশিয়ার বিপ্লবের পূর্ব্বে শ্রমিকগণ কর্ত্তৃক এই পন্থাই অনুসৃত হ'ত।

যাক্ সে-কথা। আমাদের আসল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে, ক্যাপিটাল ও লেবারের বিরোধ সমাজের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করছে, মানবজীবনের কল্যাণের তরেই সে-বিরোধের মীমাংসা আবশ্যক। আমরা দেখিয়েছি বর্ত্তমান ক্যাপিটালিষ্টিক উৎপাদন-ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী, এই ক্যাপিটালিষ্টিক উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করতে হ'বে, নইলে বিরোধ-মীমাংসার অন্য কোন উপায় নেই। আমরা আরও দেখিয়েছি যে, বর্ত্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রেখে শ্রমিকদের বেশী মজুরী দিয়ে বিরোধ মীমাংসার যে-যুক্তি তা' ভ্রান্ত, কেননা, বিভিন্ন শিল্প ব্যাপারের মধ্যে মারাত্মক প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান থাকার দরুণ সে-প্রচেষ্টা কিছুতেই কার্য্যকরী হ'তে পারে না। এই সমস্ত ব্যাপার থেকে আমরা উপসংহার করেছি:যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যে রকম বুর্জ্জোয়া বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, পুনরায় সমাজ যে বিরোধ ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছে

তারই সমাধানের জন্য আর একটা বিপ্লব অনুষ্ঠিত হ'বে যার নাম সর্ব্বহারা বিপ্লব। এটা ঐতিহাসিক সত্য, একে অস্বীকার করা চলে না। ও-বিপ্লব কবে আসবে তার সম্বন্ধে জ্যোতিষগত ভবিষ্যৎবাণী করা চলে না, কেননা, সে-বিপ্লব নির্ভর করে দেশের ও শিল্প বাণিজ্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, যে-দেশের ক্যাপিটালিষ্ট সম্প্রদায় শ্রমিকদের প্রতি যত উদার হবে সে-দেশের শ্রমিক বিপ্লব তত বেশী পেছিয়ে যাবে, যেমন বলা চলে যে পৃথিবীর মধ্যে যদি কোথাও কখনো শেষ রাজকীয় রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হয় ত তা' ইংলণ্ডেই সংঘটিত হবে। কিন্তু একথা ঠিক যে, চিরকালের জন্য ক্যাপিটালিষ্টদের শ্রেণী হিসাবে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়।

অতএব এখন এই দাঁড়াচ্ছে যে, যতদিন না আগামী বিপ্লব সংঘটিত হয় ততদিন ক্যাপিটাল ও লেবারের বিরোধ সম্পর্কে কি করা যেতে পারে ? প্রশ্নটা অতীব জটিল, কেননা, পূর্ব্বেই বলেছি যে ক্যাপিটালিষ্ট ও শ্রমিক কেউ নিজেদের স্বার্থ এতটুকু ছাড়তে রাজী নয়। ক্যাপিটালিষ্টকে যদি বলা যায় যে শ্রমিকদের মজুরীর হার বাড়িয়ে দাও, তাহলে সে অম্লানবদনে জবাব দেবে যে, তাতে তার ব্যবসার ক্ষতি হবে, সুতরাং তার পক্ষে সেটা সম্ভবপর নয়। আবার শ্রমিককে যদি বলা যায় যে, কম মজুরী নিয়ে তুমি কাজ করে যাও; তাহলেও সে জবাবে জানাবে যে তাতে তার ভরণপোষণ চলবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দুই পরস্পর বিরোধী স্বার্থ কিছুতেই এক যায়গায় মেশবার অবসর পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় যে ক্যাপিটালিষ্ট নিজের অমায়িক ব্যবহার ও উদার মনোবৃত্তি দ্বারা শ্রমিকবিরোধকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে, সেই তার ব্যবসার-সংগ্রামে জয়ী হবে।

আমরা এতক্ষণ ধরে লেবার ও ক্যাপিটালের বিরোধের সমস্ত অবস্থা আলোচনা করেছি। এ-আলোচনা থেকে পরিষ্কার প্রতিভাত হবে যে আমরা কোন এক পক্ষের কথা বা স্বার্থ নিয়ে আলোচনা চালাই নি, পরন্তু ক্যাপিটালিষ্ট ও শ্রমিক উভয়ের যা যা বলবার আছে সে সমস্ত বিষয়ের ওপরই আমাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছি। আমরা এটুকু দেখিয়েছি যে ঐতিহাসিক প্রগতি বা পরিণতির হাত কেউ-ই এড়াতে পারবে না, সেই ঐতিহাসিক প্রগতির জোয়ারেই ক্যাপিটালিষ্টিক্ উৎপাদন ব্যবস্থা ভেসে চলে যাবে কিন্তু ক্যাপিটাল বিনষ্ট হবে না। বরঞ্চ সমাজের ও সমষ্টির কল্যাণের জন্য সে-ক্যাপিটাল সোসায়ালাইজড্ হয়ে যাবে। সোসিয়ালিজমের সম্বন্ধে আমাদের একটা অমূলক ভীতি আছে, কিন্তু সেটা থাকা উচিত নয়। সোসিয়ালিজম্ ক্যাপিটাল ও লেবারের বিরোধের সমাধানের এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, সোসিয়ালিজম্ মানে হিংস্র মারামারি কাটাকাটি নয়। একথাটা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে, জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপরই দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। উক্ত ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করবার জন্যই আজ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্ল্যানিং-এর অন্ত নেই। কিন্তু এক রুশিয়া ছাড়া প্ল্যানিং-এ কেউই সফলতা অর্জ্জন করতে পারেনি। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তিনি

ক্যাপিটালিষ্টদের উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রেখে অথচ ক্যাপিটালিষ্টদের আয়ের ওপর মোটারকম ট্যাক্স করে লেবার ও ক্যাপিটালের বিরোধের মীমাংসার প্ল্যানিং করেছিলেন, কিন্তু কার্যকরী ভাবে তিনি কিছুতেই সফলকাম হ'তে পারছেন না। তাছাড়া সুপ্রিম্ কোর্ট তাঁর প্ল্যানিং এর অধিকাংশ কার্য্য আমেরিকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আইনবিরুদ্ধ বলে বাতিল করে দিয়েছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে বেনাভোলেণ্ট ক্যাপিটালিজমের সমর্থক বলা যেতে পারে; তিনি ক্যাপিটালিষ্টিক উৎপাদন ব্যবস্থার যে গলদ আছে সেটা বিশ্বাস করেন, কিন্তু ক্যাপিটালকে সোসিয়ালাইজড করতে চান না। অপরপক্ষে ক্যাপিটালকে সোসিলাইজড করবার স্বপক্ষে ষ্ট্যালিন; দুজনে দু'টি বিরাট রাজ্যের কর্ণধার। বছর দেড়েক পূর্ব্বে মিঃ এইচ, জি, ওয়েলস ষ্ট্যালিন ও রুজভেল্টের দুই বিভিন্নমুখী কর্ম্মধারার বিষয় 'ষ্টেটসম্যান্' পত্রিকায় আ,লাচনা করিছিলেন; ওয়েলস্ এর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের ঐ দুই বিরাট রাষ্ট্রপতির ভিন্নপন্থী কর্ম্মধারার কোন সামঞ্জস্য মূলক মধ্যপন্থা স্থির করা যায় কি'না সেটাই অনুসন্ধান করা। কিন্তু ওয়েলস্ মারফৎ ষ্ট্যালিন ও রুজভেল্টের কথোপকথন থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা গেছিল যে, রুজভেল্টের 'বেনাভোলেণ্ট' ক্যাপিটালিজমের যতই সৎ উদ্দেশ্য থাকুক্ তদ্বারা ক্যাপিটাল্ ও লেবারের বিরোধ ঘোচে না।

ভারতের যাঁরা উন্নতিতে বিশ্বাসী, যাঁরা ভারতবর্ষে শিল্প বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত করে দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে চান, তাঁদের উপরোক্ত বিষয়গুলি ভাল করে ভেবে দেখতে হবে, নইলে এখানেও যদি ক্যাপিটাল ও লেবারের বিরোধ বৃদ্ধি পায় তবে দেশের তাতে কোন রকমেই শান্তি বা শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না।

নারিকেল চাষের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারিক বিবরণ

আমরা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" বিগত কয়েক সংখ্যায় নারিকেল চাষের সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেছি। তার থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'বে যে নারিকেলের চাষ একটি বিশেষ লাভজনক কারবার। আমাদের আলোচনা থেকে যদি কোন উদ্যোগী লোকের এ-কারবারের প্রতি ঝোঁক হয় তাই মনে ক'রে তার সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে নারিকেল চাষের সংক্ষিপ্ত প্রণালী লিপিবদ্ধ করলাম। একজন অভিজ্ঞ কারবারীর অনুসৃত পন্থা থেকেই সকল তথ্য সংগৃহীত হ'য়েছে, সুতরাং আশা করা যায় যে; সকলেই এ-প্রণালী অনুসরণ করে যথাযোগ্য ফল লাভ করতে পারবেন।

চাষের জমি সংগৃহীত হ'লেই তা একেবারে চেঁচেছুলে পরিষ্কার করে ফেলতে হ'বে এমন কোন কথা নেই। অনেকেই সে-প্রণালী অবলম্বন করেন বটে কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে তা' ক্ষতিকারক। নারকেল-চাষীকে সর্ব্ব প্রথম নজর নিতে হ'বে ভাল বীজ নির্ব্বাচনের দিকে। বীজ যদি উৎকৃষ্ট হয় ত চারাও উৎকৃষ্ট হবে। যে সমস্ত গাছের ডাল বেঁকে পড়ে না কিংবা অকালে ঝরে যায় না—সেই সমস্ত তেজী গাছ থেকেই বীজ সংগ্রহ করা উচিত। বীজের নারিকেল গুলি বড় বড় এবং শাঁসভরা হওয়া চাই। এই বীজ সংগ্রহের জন্য যদি নারিকেলের প্রচলিত বাজার দর অপেক্ষা বেশী দর দিতে হয়, তাহ'লেও অধিক মূল্য দিয়েই বাছাই করে বীজের নারিকেল সংগ্রহ করা উচিত, কেননা, এখানকার এই অধিক মূল্য পরে বহুগুণ উঠে আসবে। কিন্তু বীজের নারিকেল যদি উৎকৃষ্ট দেখে সংগৃহীত না হয় তাহলে ভাল গাছ জন্মাবে না এবং গাছ পিছু ফলও বেশী ফলবে না। প্রতি গাছের নিকট গিয়ে তার ফল পরীক্ষা করে মনোমত বীজ যদি সংগ্রহ করতে পারা যায় ত আরও ভাল হয়। বীজ নারিকেল গাছ থেকে নামাবার সময় দড়ি বেঁধে নামানো উচিত কাঁদি সমেত মাটিতে আছড়ে ফেলা উচিত নয়—তাতে নারিকেলে আঘাত লাগায় বীজ ভাল হয় না। এই সমস্ত ছোট খাটো খুঁটিনাটি জিনিষ হ'লেও এধারে লক্ষ্য না করলে ভবিষ্যতে ভাল চারা জন্মানো যায় না।

আবশ্যক মত বীজ-নারিকেল সংগৃহীত হবার পর নার্সারী স্থাপনের দিকে মনোনিবেশ করতে হ'বে। নার্সারীর জমি কুপিয়ে পরিষ্কার করে রাখা দরকার এবং সেখানে যদি কোন আগাছা থাকে ত সেগুলি জ্বালিয়ে তার ছাই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। জমি তৈরী হবার পর বীজ নারিকেল গুলি পাশাপাশি

একটু হেলান ভাবে কাৎ করিয়া পুতে দিতে হয়। রৌদ্র থেকে রক্ষা করবার জন্য ছাউনির দরকার এবং যদি গ্রীষ্মকাল হয় ত জমিতে জল সিঞ্চন করাই উচিত। বীজ পোঁতবার মাস চারেকের মধ্যে চারা বেরুবে; যদি এমন দেখা যায় যে, পাঁচ মাস কেটে যাবার পরও কোন বীজের চারা বেরুচ্ছে না তাহ'লে তাদের আশা ছেড়ে দেওয়াই উচিত, কারণ তাদের পরে যদিও চারা বেরোয় তবুও তার গাছ কিছুতেই ভাল হ'বে না। বীজের কলগুলি যখন নারিকেলের খোলার উপর দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি বড় হ'বে তখন তাদের নিয়ে গিয়ে অন্য একটি নার্শারীতে ১৮ থেকে ২০ ইঞ্চি অন্তর অন্তর বসাতে হ'বে। সেখানে অপেক্ষাকৃত অধিক রৌদ্র ছায়ার প্রয়োজন এবং এসময়ে যদি চারাগুলির গোড়ায় অল্প পরিমাণ ছাই দেওয়া যায় ত তাদের বাড় বৃদ্ধি পায়। এক বছর কেটে যাবার পর চারাগুলি নারিকেলের বাগানে স্থায়ী ভাবে পোঁতবার উপযুক্ত হয়, তখন তাদের পিঁপড়ের আক্রমণ সহ্য করবার কতকটা ক্ষমতা জন্মায়। নার্শারী থেকে সরিয়ে নিয়ে বাগানে স্থায়ীভাবে পোঁতবার সময় এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, যেন তাদের ডাল ধরে তুলে নিয়ে যাওয়া না হয়, কেননা, তাতে চারাগুলি খুব জখম হইয়া যায়। আষাঢ় মাসে বর্ষা সুরু হওয়ার দরুণ চারা রোপণের ঐটাই উপযুক্ত সময়।

চারা রোপণের সময় যথাযোগ্য গর্ত্ত খননের প্রয়োজন। গর্ত্তগুলি ৩ বর্গ ফুট পরিমাণ ও ৩ ফিট গভীর হওয়া চাই; খরচ বেশী হ'বার ভয়ে গর্ত্ত-খননের কার্য্যে কোন মতে কার্পণ্য করা উচিত নয়। উক্ত গর্ত্তগুলি যতটা পারা যায় ছাই ও রাবিশ দ্বারা ভর্ত্তি করতে হ'বে। যখন উক্ত গর্ত্তগুলি আংশিক ভরাট হয়ে মাত্র ১॥০ ফুট অবশিষ্ট থাকবে তখন তার ভেতর চারাগুলি বসিয়ে দিতে হ'বে। তারপর চারাগুলির চারপাশে এবং গর্ত্তের ভেতর বেশ করে মাটি দিয়ে ভরাট করতে হ'বে। জমি যদি ঢেউ খেলানো হয় ত প্রতি গাছের গোড়ায় একটা ঢিবি মত করা সুবিধাজনক। যদি কোথাও পিঁপড়ে মাটির ঢিবি করে থাকে ত সেটা সমতল করে দিয়ে তার মাটি প্রত্যেক গাছের গোড়ায় প্রদান করলে ভাল ফল ফলে। হিসাবমত সাধারণতঃ একর পিছু ৬৬টা গাছ থাকে কিন্তু উক্ত হিসাবে নার্শারীতে আরও বেশী চারা থাকা আবশ্যক; কারণ, অনেক গাছ পোকায় কাটার দরুণ কিংবা অন্যপ্রকারে নষ্ট হওয়ার দরুণ যে যায়গাটা খালি হ'বে সেটা ভর্ত্তি করার প্রয়োজন। নার্শারীতে যদি মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক চারা থাকে ত এগুলি পূরিত হয় না।

নারিকেল চাষের প্রথম পর্য্যায় অর্থাৎ চারা বসানোর পালা এবার শেষ হল। তারপর গাছের ফল পেতে ৮।৯ বছর দেরী। ইতিমধ্যে গাছ যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সেধারে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। দৃষ্টি রাখার ভার চাষী নিজে গ্রহণ করতে পারে কিন্তু যদি অপরের সঙ্গে এসম্পর্কে একটা বন্দোবস্ত করা যায় ত কাজের সুবিধা হয়। উক্ত দৃষ্টি রাখার জন্য কিছু খরচ আছে, চাষী যদি নিজে সে-ভার গ্রহণ করে ত খরচাটা তার নিজের পকেট থেকে যায়। কিন্তু চাষী যদি অপর কোন রকম বন্দোবস্তের দ্বারা অন্য কারও উপর এ-ভারটা দিতে পারে তাহ'লে তার খরচাটা বেঁচে যায়।

উক্ত কার্য্য সাধনের জন্য চাষী যদি নারিকেলের জমিতে আলু চীনাবাদাম প্রভৃতি চাষ করবার নিমিত্ত অপরকে জমি বন্দোবস্ত করে দিতে পারে ত স্থবিধা হয়। তাদের সঙ্গে এই সর্ত্ত থাকবে যে তারা নারিকেল গাছ গুলির পরিচর্য্যা করবে এবং এই নজর রাখবে যে যাতে না গাছগুলি পিপড়ে, কিংবা অপর কিছুর দ্বারা নষ্ট নয়। এর বিনিময়ে তারা জমিতে চাষ করবার অধিকারী হ'বে। যদি তারা সর্ত্ত মানতে অবহেলা প্রদর্শন করে তাহ'লে তাদের ফসলের অর্দ্ধেক জমি জমা প্রদানকারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া, যারা জমি জমা নেবে তারা কোন গাছ ধ্বংস প্রাপ্ত হ'লে সে সম্পর্কে মালিকের নিকট সংবাদ পাঠাবে যাতে তৎক্ষণাৎ উক্ত ধ্বংস প্রাপ্ত গাছকে নষ্ট করে ফেলে সেই স্থানে অন্য চারা বসানো যায়। বাগানে কোন ধ্বংস প্রাপ্ত গাছ থাকতে দেওয়া উচিত নয়, কেননা, আয়ের দিক দিয়ে তাতে ক্ষতি হয়।

এইবার নারিকেল গাছের শত্রুদের সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। সাদা পিপড়ে, গুবরে পোকা, বজ্রপাত এবং জলাভাব নারিকেল গাছের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে। গুবরে পোকাদের মধ্যে যেগুলো লাল জাতীয় সেগুলো গাছের পক্ষে মারাত্মক শত্রু। যদি এমন দেখা যায় যে কোন গাছে উক্ত পোকা আক্রমণ করেছে তাহ'লে তৎক্ষণাৎ সেই গাছকে শিকড় সমেত কেটে ফেলে এবং ডাল পালা এবং গুঁড়িটাকে চেরাই করে তাতে তৎক্ষণাৎ আগুণ ধরিয়ে দেওয়া দরকার। এই রকম উপায় অনুষ্ঠিত হ'লে সব পোকাই পুড়ে মরবে, কেউই আর রেহাই পাবে না। এই রকম উপায় অবলম্বন না করে রেহাই নাই। অনেকে এ উপায় অবলম্বন করাকে একটু বাড়াবাড়ি মনে করতে পারেন কিন্তু এরূপ উপায় যদি অবলম্বিত না হয় এবং গুবরে পোকাকে যদি বংশ বৃদ্ধি করতে দেওয়া হয়, তাহ'লে কিছুদিনের মধ্যে সারা বাগানের মধ্যে গাছ নষ্ট হওয়ার একটা 'এপিডেমিক' লেগে যাবে। একটা কি দু'টো কিংবা পাঁচটা গাছের মোহে বহু গাছকে তখন হারাতে হ'বে। সেটা কিছুতেই লাভজনক হবে না।

বজ্রে পুড়েও বহু গাছ নষ্ট হয়। যেগুলি সম্পূর্ণ ভাবে দগ্ধ হয়েছে, তাদের বাঁচবার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু যেগুলি আংশিক ভাবে অল্প দগ্ধ হয়েছে তাদের চেষ্টা করলে

বাঁচানো যায়। সে ক্ষেত্রে গাছের গোড়ায় যদি গর্ত্ত খুঁড়ে দেওয়া যায় ত সুবিধা হ'তে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে যে, অনুরূপ গর্ত্ত খননের দ্বারা অনেকগুলি গাছ রক্ষা পেয়েছে। যে সমস্ত গাছ বাজে পুড়ে যায় অথচ তাদের কেটে ফেলা হয় না, তারা নারিকেল বাগানের ক্ষতি করতে পারে। কারণ ঐ সমস্ত গাছের মধ্যে গুবরে পোকা আশ্রয় নেয় এবং তাদের বংশ বৃদ্ধি হ'লে তারা পাশাপাশি অপরাপর গাছকেও আক্রমণ করে। সুতরাং এক্ষেত্রে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে বজ্রদগ্ধ বৃক্ষদের কেটে ফেলে দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

জলাভাবেও নারিকেল বৃক্ষের ক্ষতি হ'তে পারে কিন্তু নারিকেল গাছে যে সব সময় জল সিঞ্চন করা দরকার এমত মনে হয় না। নারিকেল চারা যখন নার্শারীতে থাকে তখন তার জলের প্রয়োজন এবং সেইজন্য নার্শারীতে জল সিঞ্চন অত্যাবশ্যক। চারাগুলি যখন এক বছরের হয় তখন তাদের বাগানে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়। এই গাছ বসানোর সময় জল সিঞ্চনের প্রয়োজন। সাধারণতঃ বর্ষার প্রারম্ভেই উক্ত কার্য্য করা হয়ে থাকে। বছর দুয়েক কেটে গেলে আর জল সিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না।

এই গেল নারিকেল বৃক্ষের শত্রুদের হাত থাকে বাঁচবার উপায়। চাষীগণ যদি উক্ত উপায় সমূহ অবলম্বন করেন তাহলে' তাঁরা লাভবান হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। নারিকেল এক রকমের হয় না, বিভিন্ন রকমের হ'য়ে থাকে। সুতরাং বাগানে যদি বিভিন্ন প্রকারের গাছ রাখতে হয় ত বিভিন্ন প্রকারের বীজ সংগ্রহে মনোনিবেশ করতে হ'বে।

নারিকেল ব্যবসায়ীদের তরফ হ'তে এবার প্রশ্ন আসতে পারে যে, একটা গাছে মোট কতগুলি নারিকেল ফলে? এর কোন সঠিক জবাব দেওয়া যায় না। চাষের জমির উৎকর্ষতা এবং নারিকেল গাছের তেজের ওপর তা' নির্ভর করে। সিংহলের জমিতে এক একটা গাছে বৎসরে ১৫০ ফল ফলতে দেখা গেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হবে যে, নারিকেলের চাষ বিশেষ লাভজনক। অথচ অপরাপর চাষের মত এতে তত খরচ পড়ে না এবং পরিশ্রমও কম লাগে। তাছাড়া এর আরও একটা সুবিধে এই যে, নারিকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে যে জমি পড়ে থাকে তাতে আলু প্রভৃতি অপরাপর জিনিষেরও চাষ চলতে পারে। সেটা কম লাভের নয়। আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে যে, বিনা পরিশ্রমে এতে বছর বছর ফল পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলার চাষীরা যদি এধারে মনোযোগ দেন ত ভাল হয়। এমন অনেক ছোট খাটো বাগান বাংলাদেশে পড়ে আছে যা সংস্কারাভাবে নষ্ট হ'তে বসেছে, সেগুলো উদ্ধার করে লাভবান হওয়াও চাষ ব্যবসায়ীদের কর্ত্তব্য। নারিকেল চাষের সকল সংক্ষিপ্ত বিবরণই প্রদত্ত হ'ল, ব্যবহারিক ভাবে সেগুলি অনুষ্ঠিত হ'লেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

সঞ্চয়হীনের দশা

বয়স কালে হরেন বাবুর অর্থ সম্পদ, মান সম্ভ্রম, বন্ধুবান্ধব, সভাসদ, চাটুকার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার কথায় লোকে উঠিত বসিত। তিনি বলিলে লোকের চাকরি জুটিয়া যাইত। তিনি অসন্তুষ্ট হইলে কাহারও রক্ষা থাকিত না। ভোগে, বিলাসে, অভিনব খেয়ালে হরেন বাবুকে প্রাচীন বাদশাহী আদর্শের এক আধুনিক উদাহরণ বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। শুনা যায়, তিনি ছুটির সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইলে বাংলা দেশের মাটী ও জল হাওয়া ব্যতীত আর সকল উপকরণই সঙ্গে লইয়া চলিতেন। সুদূর পশ্চিমে, বাংলার একান্ত নিজের তরি তরকারী ও মৎস্য, অথবা যথাযথ ও নির্দ্দিষ্ট জাতীয় চাল, ডাল, তৈল, ঘৃত, চাকর, ঝি, বাসন, আসবাব, সটকা, তামাক কিম্বা কোন কিছুর অভাব হইলে হরেন বাবু তাহা বরদাস্ত করিতেন না। কন্যার বিবাহ কিম্বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে হরেন বাবুর ফিরিস্তি জার্ম্মান সমরের হতাহতের তালিকার মতই সুদীর্ঘ ও সর্ব্বগ্রাসী হইত। সে আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কিন্তু এখনও সে কথা লোকে কিম্বদন্তীর মতই আওড়াইতে থাকে।

কিন্তু, এ হেন হরেন বাবু আজ চাকরী অবসানে হৃত-সম্পদ এবং বিগত যৌবন অবস্থায় ছোট আদালতের উকিল মহলের "টাউট"। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন বাদী ফরিয়াদীদের উপযুক্ত উকিল সরবরাহ করিয়া দিনান্তে দুই এক টাকা সংগ্রহ করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া যান। ছোট টিনের চালায় স্বপাকে আহার ও ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করেন। কেন? কারণ, কিছুই নহে—শুধু অর্থাভাব। যৌবনে অগাধ অর্থ সম্পদ অপব্যবহার করিয়া হরেন বাবু আজ নিঃসম্বল। কিছু টাকা যাহা ছিল ভাঁটার মুখে রাতারাতি বড়লোক হইতে গিয়া তথাকথিত ব্যবসায়ে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহার দৌলতে কত লোকের একদিন সুসময়ে গিয়াছে, আজ তাহারই অভাবের দিনে কাহাকেও কোথাও দেখা যায় না।

গল্পটী কিছু অভিনব নহে। সময়ে বার্দ্ধক্যের পুঁজি ঠিক করিয়া না রাখিলে অনেকেরই এই দশা হয়। শুধু মানুষ কেন, জীবজগতে সঞ্চয়ের মূল্য সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য। উদাহরণ, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি। সময় থাকিতে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখা প্রয়োজন।

জীবন-বীমারও সার্থকতা এই কারণেই। যৌবনে, রোজগারের সময়ে, বিন্দু বিন্দু করিয়া যে অর্থ বীমায় রক্ষিত হয়, অভাবের সময়ে নিজের বা নিজের অবর্ত্তমানে, পরিবারবর্গের নিকট তাহাই প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, শীতল, সরোবরের রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হয়। বীমায় রক্ষিত অর্থ, সকল ভুল, ভ্রান্তি, মোহ, ও অপচয় আশঙ্কার উপরে। জীবিত থাকিলে বীমা বার্দ্ধক্যের সম্বল, মৃত্যু ঘটিলে পরিবারের আশ্রয়। ইহা ব্যতীত পুত্রের শিক্ষা কিম্বা কন্যার বিবাহের জন্যও বিশেষ বীমা করা যায়।

এলাহাবাদের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ ডি এল মেহ্‌তা স্ত্রীপুত্রাদি সহ একবার ইউরোপ ভ্রমণ করিতেছিলেন ; তখন একদল ইউরোপীয় জুয়াচোর কিরূপ ফন্দীতে তাঁহার বহুমূল্যের দ্রব্যাদি ঠকাইয়া লইয়াছিল এইখানে তাহার বিবরণ প্রকাশ করা গেল।—

মিঃ মেহ্‌তা প্রথমে বেনারসের কলেক্টর ছিলেন। যুক্ত প্রদেশীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা ও ব্যবসা বিভাগের সেক্রেটারী হইবার পূর্ব্বে তিনি এলাহাবাদ ডিভিসনের কমিশনার ছিলেন। কিছু দিনের ছুটী লইয়া যখন তিনি ফ্রান্সে গিয়া স্ত্রীপুত্রাদি সহ নাইসের একটী বড় হোটেলে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা একদিন মণ্টি কার্লোতে বেড়াইতে যান। এই সময়ে উত্তম পোষাক পরিহিত একজন ইউরোপীয়ান তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করে। মিসেস্ মেহ্‌তার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলিতে বলিতে নবাগত ভদ্রলোটি বলেন যে, তিনি ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সেখানে শীঘ্রই যাইবার মনস্থ করিয়াছেন। তারপরে মিসেস্ মেহ্‌তার কাছে তাঁহার সুন্দর পরিবারটির একটী ফটো লইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন; মিসেস্ মেহ্‌তাও কোন প্রকার অবিশ্বাস না করিয়া তাঁহাকে ছবি তুলিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন।

শীঘ্রই তাঁহাদের ক্ষণিকের আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হইল। নবাগত ভদ্রলোকটি নিজের নাম ফ্রেডারিক রাসেল বলিয়াছিলেন; তিনি মিঃ ও মিসেস্ মেহ্‌তাকে পরদিন সকালবেলায় ফুল কিনিবার মার্কেট ও পুরাণো নাইস্ সহর দেখাইবার ভার চাহিলে, তাঁহারাও অত্যন্ত আনন্দের সহিত ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন।

পরদিন ভোরবেলায় সকলেই দল বাঁধিয়া পলষ্ট্রীটের সেণ্ট ফ্যাঙ্কয়স এর ফুলবিক্রেতার দোকানগুলির কাছ দিয়া যাইতেছিলেন; এমন সময় একজন পথিকের নিকট হইতে এক গোছা চাবী পড়িয়া যায়; তিনি মিঃ মেহ্‌তার আগে আগেই যাইতেছিলেন। মিঃ মেহ্‌তা উহা দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া উহা ভদ্রলোকটিকে প্রত্যর্পণ করেন; ভদ্রলোকটিও মিঃ মেহ্‌তাকে ইংরাজীতে কথা বলিতে দেখিয়া খুব খুসী হন; কেননা, ইংরাজী তাঁহার মাতৃভাষা।

তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেন, "আমি নাইসে কিছুকাল পূর্ব্বে আসিয়াছি এবং কাহারো সঙ্গে এখনো বেশী পরিচয় হয় নাই। আমার নাম প্যাট্রিক হিলি।" মিঃ মেহতা এবং ফ্রেডারিক রাসেলও তাঁহাদের নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন।

ইহার পর তাঁহাদের আলাপাদি সাধারণ বিষয়ে চলিতে লাগিল। পার্টির সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা একটী রেঁস্তরাতে যাইয়া উঠিলেন। ভোজনের টেবিলে বসিয়া প্যাট্রিক হিলি বলিলেন যে, তিনি তাঁহার খুড়ার মৃত্যুতে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন; কিন্তু উইলে একটী সর্ত্ত আছে যে তাঁহার ওয়ারিশকে বিভিন্ন দাতব্য কাজের জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে হইবে। মিঃ মেহতাকে তিনি ঐ অর্থের কিছু অংশ দাতব্য কাজের জন্য ব্যয় করিতে অনুরোধ করিলেন। মিঃ মেহতাও আনন্দের সহিত এই ভার লইতে স্বীকার করিলেন, তিনি বলিলেন যে, দেশে একটী দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠভাবে যোগ রহিয়াছে; মিঃ হিলি বলিলেন তিনি উহার অর্দ্ধাংশ সেখানে দান করিবার বন্দোবস্ত করিতে পাবেন।

উভয়ের মধ্যে এই সম্বন্ধে একটা পাকা কথাবার্ত্তা হওয়ার পর হিলি বলিলেন যে, তিনি এত টাকা কোন আথিক গ্যারান্টী ভিন্ন দিতে ভরসা পান না। মিঃ রাসেলও বলিলেন যে, এরূপ সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করার জন্য তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে।

মিঃ ও মিসেস্ মেহতা বেলা একটার সময় কুক্স্ এক্সেন্সীতে যাইয়া দুইশত পাউণ্ড ভাঙ্গাইয়া লইয়া হোটেলে ফিরিয়া আসেন। হিলি ও রাসেল সেখানে পূর্ব্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাসেল মানিব্যাগ হইতে এক বাণ্ডিল ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিয়া হিলিকে বলিলেন,

"তুমি যে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক চাহিয়াছিলে, তাহা এই লও।"

হিলি সমুদয় বাণ্ডিল মানিব্যাগে রাখিয়া মিঃ মেহতাকে বলিলেন, "আমার মনে হয়, আপনি আমাকে বিশ্বাস করিবেন। আপনি আমাকে আপনার অপরাপর সিকিউরিটি দিন আমি মিঃ রাসেলের সঙ্গে যাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইয়া লইয়া আসি।"

মিঃ মেহতা বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক লইলেন; কিন্তু পূর্ব্বের স্থিরীকৃত অর্থ হইতে ইহা কম হওয়ায় মিসেস মেহতা ত্রিশহাজার টাকা মূল্যের ডায়মণ্ড চুড়ী খুলিয়া দিলেন। উহা লইয়া মিঃ হিলি ও রাসেল দুয়ারের দিক দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহারা আর ফিরিয়া আসেন নাই। মিঃ মেহতা পুলিশে খবর দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বোঝা গেল, সমস্ত ব্যাপারটী একটী জুয়াচুরীর ফল।

ঘটনাটি সেই মুসলমান কাজী সাহেবের গল্পের মত হইয়া দাঁড়াইল। কোন এক বাদশাহ অচেনা এক অশ্ব ব্যবসায়ীকে সুন্দর ঘোড়া কিনিবার জন্য বহুমূল্য অর্থ প্রদান করেন; কিন্তু অতীতের কাজী সাহেবের দিন হইতে সেই অশ্বব্যবসায়ী যে নিখোঁজ হইয়াছে, আর তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের দণ্ড

২৫ বি, সোয়ালো লেনস্থিত হিন্দু ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার এল এম গান্ধী তাঁহার ক্যাশিয়ার ও একাউন্টেন্টকে প্রতারণা করিবার অভিযোগে চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ . কে দে'র এজলাসে অভিযুক্ত হয়। চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে আদালতের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখিবার আদেশ দেন এবং তিনশত টাকা অর্থদণ্ড, অন্যথায় তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। রায় প্রদানকালে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, "জনসাধারণকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্য ব্যাঙের ছাতার ন্যায় যে সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই কোম্পানী তাহার অন্যতম, নথীপত্র হইতে ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই ফার্ম্ম কোন কারবারে হস্তক্ষেপ করে নাই।

উক্ত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বলিয়া বর্ণিত খেমচাঁদ মুনি (মেসার্স ডিনভো এণ্ড কোম্পানী উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন) ফেরার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য পরওয়ানা জারী করা হইয়াছে।

অভিযোগকারী ফণীন্দ্রনাথ মিত্র সাক্ষ্য প্রদানকালে বলে যে, সে তিনশত টাকা জমা দিয়া মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে উক্ত ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার ও একাউন্টেন্ট নিযুক্ত হয়। আসামী অনুরূপভাবে আরো বহু লোকের নিকট হইতে নগদ টাকা জমা লইয়াছিল। প্রথম মাস শেষ হইলে অভিযোগকারী, আসামীর নিকট তাহার বেতন চায়। কিন্তু আসামী তাহাকে বেতন দিতে অসমর্থ হয়। অফিসে মিত্রের কোন কাজ করিতে হইত না। শীঘ্রই উহা তাহার নিকট একটী জাল ব্যবসার প্রতিষ্ঠান বলিয়া অনুমিত হইলে, সে কাজে ইস্তফা দেয় এবং জমার টাকা ফিরাইয়া চায়। কিন্তু টাকা ফিরাইয়া পায় নাই।
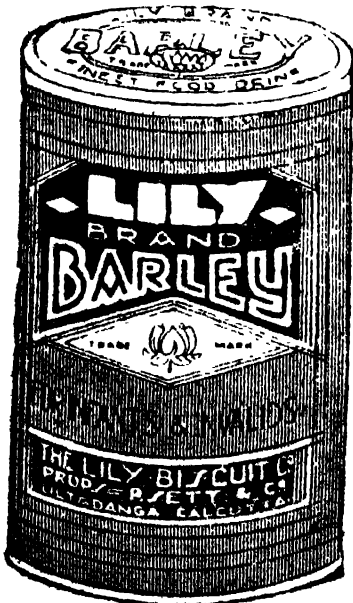
✲ সাবান ✲

আমাদের দেশে ছোট খাটো শিল্পের মধ্যে যদি কোন শিল্পের প্রসারতা লাভ ঘটে থাকে ত সেটা সাবান শিল্পেরই ঘটেছে। পূর্ব্বের তুলনায় আমাদের দেশী সাবানের কাটতি যে কত বেড়ে গেছে তা' দেশী সাবানের কারখানা-গুলির সংখ্যার দিকে তাকালেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'বে। কিন্তু দেশী শিল্পের যতখানি প্রসারতা লাভ ঘটুক না কেন, বিদেশী বড় বড় কোম্পানীগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এ-শিল্প এখনো এঁটে উঠতে পারছে না। তার অনেকগুলি কারণের মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশে কস্‌টিক সোডা উৎপন্ন হয় না; অথচ কস্‌টিক সোডা সাবান তৈরী করার জন্য খুব বেশী পরিমাণে দরকার হয় এবং আমরা অপেক্ষাকৃত অধিকমূল্য দিয়ে তা' কিনে থাকি। এজন্য আমাদের পড়তার খরচা বিদেশীদের তুলনায় বেশী পড়ে। দ্বিতীয়তঃ সাবান উৎপাদন করবার সময় বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে যে গ্লিসারিণ পাওয়া যায় তা' উদ্ধার করবার জন্য আমাদের এখানে কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা নেই (মহীশূর রাজ্যের কারখানা ব্যতীত), সুতরাং ঐ মূল্যবান পদার্থটি এখানে অপচয় হইয়া যায়। অথচ বিদেশীদের কারখানায় এই গ্লিসারিনটা উদ্ধার করে খুব চড়া দামে বিক্রীত হওয়ার দরুণ তাদের খরচের পড়তা অনেক কম পড়ে। তৃতীয় কারণ, অটোয়া চুক্তিতে সকল রকম গন্ধদ্রব্যের উপর ডিউটী স্থাপন। সাবানের ব্যবসায়ে, বিশেষতঃ টয়লেট সাবানের ব্যবসায়ে—প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। এই গন্ধ দ্রব্যাদি প্রধানতঃ ফ্রান্স হইতে আসে। অটোয়া চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স ব্রিটিশ এম্পায়ারের বাইরে বলিয়া ফ্রান্স হইতে এদেশে আনীত গন্ধ দ্রব্যাদির উপর উচ্চ হারে ডিউটী দিতে হয়, অথচ ইংলণ্ডে গন্ধদ্রব্যাদি রপ্তানী করার মত তেমন কিছুই পয়দা হয় না; সুতরাং এই অটোয়া চুক্তির ফলে গন্ধদ্রব্যাদির বাবদ ইংলণ্ড কিছুই লাভবান হইতেছেন না, অথচ ভারতের সাবান ব্যবসায়ীদিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছেন। তা' ছাড়া বিদেশী কোম্পানীগুলির অগাধ মূলধন থাকার দরুণ দেশী কোম্পানীগুলির ক্ষতিসাধন করবার জন্য তারা যথেষ্ট চেষ্টিত হয়। এ সমস্ত বাধা বিপত্তির সঙ্গে লড়াই করবার জন্য আমাদের দেশী কোম্পানীগুলির মধ্যে সহযোগি-তার ভাব বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন, নইলে দেশী কোম্পানীগুলি যে ফেল পড়তে বাধ্য হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিম্নে আমরা নানা রকমের সাবানের বিষয় মোটামুটি বর্ণনা করিলাম।

সাবান জিনিসটা আমাদের এত বেশী পরিচিত যে এর গুণাগুণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু না বললেও চলে। অতি প্রাচীনকাল হ'তে

এ-বস্তুটি সমাজে চলে' আসছে। খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ 'ওল্ডটেষ্টমেণ্টে' সাবানের দু'বার উল্লেখ আছে। মহাকবি হোমার তাঁর 'ওডিসি' কাব্যে নাউ-সিকিয়ার বস্ত্র ধৌতকার্য্য পরিচালনার বিষয় বর্ণনা করেছেন, অবশ্য সেখানে প্রত্যক্ষভাবে সাবানের বিষয় উল্লেখ নেই। খৃষ্টিয় যুগের প্লেটো ও এ্যারিষ্টোফেন্স কর্তৃক সাবানের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। খৃষ্টিয় যুগের পূর্ব্বে সাবান শব্দটি 'খার' (alkali) অর্থে ব্যবহৃত হ'ত কিন্তু বর্ত্তমানে সাবান শব্দটি যে-অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে সাবান শব্দটির সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় খৃষ্টিয় ১ম শতাব্দীতে। লেখক প্লিনি হার্ড সোপ ও সফ্‌ট সোপ এই দু'রকমের সাবানের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তিনি বলে গেছেন যে, গল'গণ কর্তৃকই (Gauls) সাবান প্রথম উদ্ভাবিত হয় কিন্তু উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হয় জার্ম্মানীতে। তখন সাবান প্রস্তুত প্রক্রিয়ার উপাদান হিসাবে ট্যালো এবং ছাই ব্যবহৃত হত। পম্পী নগরী ধ্বংস হয়েছিল খৃষ্টিয় ৭৯ অব্দে, সেই সমস্ত ধ্বংসস্তুপ পুনরুদ্ধার কালে একটি বহুপ্রকার যন্ত্রপাতি বিশিষ্ট উত্তম সাবানের কারখানা পাওয়া গেছে। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে বহু প্রাচীন কালেও উত্তম সাবানের প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সাবান শিল্পের তুলনাতীত উন্নতি হয়েছে। এই উন্নতির মূলে রয়েছেন ফরাসী বৈজ্ঞানিকদ্বয় লেবলাঁ ও শেভরিউল। সাবান শিল্পের পক্ষে খার বস্তুর প্রয়োজন খুব বেশী। পূর্ব্বে এই খার সংগ্রহ ব্যয়সাধ্য ছিল, কিন্তু লেবলাঁ সোডা উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কার করে খার প্রাপ্তির যথেষ্ট সুবিধা করে দিয়েছেন। সাবান তৈরীর পক্ষে চর্ব্বিজাতীয় পদার্থেরও ও বিশেষ প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক শেভরিউল সে-সম্বন্ধে উন্নতিমূলক গবেষণা দ্বারা সাবান-শিল্পের প্রচুর সহায়তা করেছেন।

সাবান খার জাতীয় পদার্থ ও চর্ব্বিজাতীয় পদার্থের একটি রাসায়নিক সংমিশ্রণ। সাবান প্রস্তুতকারকেরা চর্ব্বিজাতীয় যে-সমস্ত পদার্থ ব্যবহার করে তাকে টেক্‌নিক্যাল ভাষায় গ্লিসারাইড্ বলে এবং সাবান প্রস্তুত প্রণালীর মূল প্রক্রিয়া হ'চ্ছে এই গ্লিসারাইড থেকে গ্লিসারিণটুকু সরিয়ে দিয়ে খার জাতীয় পদার্থের দ্বারা সেই স্থানটুকু পূরণ করা। হার্ডসোপের বেলায় গ্লিসারিনকে একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়; সফ্‌ট সোপের বেলায় খারজাতীয় পদার্থের সঙ্গে এ-বস্তু খানিকটা থেকে যায়। কিন্তু হার্ড ও সফ্‌ট সোপের মধ্যে এইটাই আসল প্রভেদ নয়, আসল প্রভেদ হচ্ছে যে, হার্ড সোপের বেলায় খার হিসাবে সোডা ব্যবহৃত হয়, সফ্‌ট সোপের বেলায় খার হিসাবে পটাশ ব্যবহৃত হয়। সাবানে কি প্রকারের চর্ব্বি বা তৈল ব্যবহার করা হয় তার ওপরই কতকটা সাবানের গুণাগুণ নির্ভর করে। সাবান শিল্পে চর্ব্বি জাতীয় পদার্থরূপে নানা প্রকার 'গ্রীজ' (grease), ট্যালো; মাছের তৈল, উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। তা'ছাড়া ব্যবসার দিক দিয়ে সুবিধার জন্য সাবানের উপাদনের সঙ্গে ভেজাল হিসাবে রজন মিশ্রিত করা হয়। সফ্‌ট সোপের জন্য তিসির তৈলই খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এ তৈল ব্যবহার করলে উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ সাবান পাওয়া যায়। তুলা বীজের তৈল ব্যবহার করলে এর চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাতে সাবান বেশী পুরানো হ'লে দুর্গন্ধ ছাড়ে।

হোয়াইট সোপ বা কার্ড সোপের জন্য চর্ব্বি জাতীয় পদার্থরূপে ট্যালো, পাম্-অয়েল নারিকেল তৈল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, সাধারণ হলদে সাবানের জন্য নিকৃষ্ট ট্যালো ও উৎকৃষ্ট গায়ে মাখা সাবানের জন্য পাম্-অয়েল, বাদাম তৈল, নারিকেল তৈল, ক্যাষ্টর অয়েল ও উৎকৃষ্টতর ট্যালো কাজে লাগে।

হার্ডসোপ উৎপাদনের প্রক্রিয়া হল নিম্ন রূপ। চর্ব্বি কিংবা চর্ব্বি মিশ্রিত তৈলকে প্রথমে কস্‌টিক সোডার খার মিশ্রিত জলে দু'ঘণ্টা ধরে ফোটান হয় (খুব বৃহৎ স্কেলে উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রতি টন চর্ব্বিতে ১৫০ থেকে ২০০ গ্যালন কস্‌টিক সোডার জল দেওয়া হয়ে থাকে) এতে করে চর্ব্বিটা কস্‌টিক সোডার সঙ্গে মিশে 'ফেনা ফেনা' হয়ে ওঠে, টেক্‌নিক্যাল্ ভাষায় এ অবস্থাকে বলা হয় 'পেষ্টিং'। তারপরে ঐ সংমিশ্রিত পদার্থের সঙ্গে লবণ মিশ্রিত করে 'ব্রাইন' প্রস্তুত হয় এবং যেহেতু সাবান ভাগ ব্রাইন জলে দ্রবীভূত হয় না সেই হেতু উহা উপরিভাগে ভেসে ওঠে। টেক্‌নিক্যাল ভাষায় এ প্রক্রিয়াকে বলে 'সল্টিং আউট', এর সুবিধা হচ্ছে যে সাবান ভাগ উপরি ভাগে আলাদা হ'য়ে ভেসে উঠলে খার জাতীয় সলিউসনকে পাম্প করে বার করে নেওয়া হয়। উক্ত প্রক্রিয়ার পর সাবান ভাগকে পুনরায় নূতন খার জলে ফুটানো হয়। যাতে করে সাবান ভাগ পরিপূর্ণ সাবান পদার্থে পরিণত হ'তে পারে। খার জলকে সাবান পদার্থ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য উক্ত পদার্থকে আবার একটু জলের সঙ্গে ফুটিয়ে গরম তরল পদার্থটিকে আস্তে আস্তে অপেক্ষাকৃত শীতল হ'তে দেওয়া হয়, এবং হাতা করে তখন তাকে ছাঁচে ঢালা হয়ে থাকে। এই রকম ভাবে দিন দুই রাখবার পর যখন ওটা বেশ জমে যায় তখন সেটাকে মেসিন সাহায্যে ইচ্ছামত আকারে কেটে বিক্রীর জন্য বাজারে প্রেরণ করা হয়।

উপরে যে প্রক্রিয়ার বিবরণ দেওয়া গেল, ওটি একটি সাধারণ বিবরণ। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে বিভিন্ন রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে যদ্দ্বারা উৎপাদন খরচ খুব কম পড়ে।

সফ্‌ট সোপের বেলায় চর্ব্বি (কিংবা তৈল) এবং খার জল ঘণ্টা কয়েকের জন্য ধীরে ধীরে ফোটানো হয়—এক্ষেত্রে খার জল একটু একটু করে মেশানো হয়ে থাকে যতক্ষণ না মিশ্রিত পদার্থ স্বচ্ছ হয়ে সাবান ভাগে পরিণত হয়। তারপর সেটাকে ছাঁচে ফেলে ঠাণ্ডা করা হয়ে থাকে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, সফ্‌ট সোপের বেলায় পটাশ খার ব্যবহার করতে হ'বে। সফ্‌ট সোপের প্রস্তুতকরণ প্রণালী থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, খার পদার্থে যে সমস্ত ময়লা থাকে, সাবানেও সে সব ময়লা থেকে যায়।

(আগামী বারে সমাপ্য)

ভারতের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা

প্রাকৃতিক সম্পদে ভারতবর্ষ দরিদ্র না হলেও তার অধিবাসীরা যে একান্ত দরিদ্র একথা সকলেই স্বীকার করবেন। তারা এত দরিদ্র যে তাদের মধ্যে কয়েক কোটি লোকে অর্দ্ধাহারে এবং প্রায় অনাহারে দিন কাটায়।

এই দেখে অপরাপর দেশের লোক ভাবে যে ভারতবর্ষের লোক গুলো বুঝি একেবারে অপদার্থ, নইলে ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে এত ধনী হ'য়েও ওখানকার লোকগুলো কেন এরকম অনাহারে শুকোয়।

ভারতবাসীদের এই দারিদ্র্য সম্পর্কে সাধারণতঃ দুটো মতবাদ শোনা যায়। একপক্ষ বলেন যে, বৈদেশিক শোষণই ভারতবাসীদের দরিদ্রতার কারণ; অপর পক্ষের মত হচ্ছে যে, অত্যধিক জনসংখ্যাই ভারতবাসীদের এই দরিদ্রতার জন্য দায়ী। ঐ দুটো মতবাদ যে মিথ্যা তা বলছিনে, কিন্তু ও ছাড়া আরও কারণ আছে।

প্রধান কথা হচ্ছে যে, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যাপারে ভারতের লোক পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে অনেক পিছু পড়ে আছে। এই অপটুতার জন্যই তার জাতীয় সম্পদ কিছুতেই বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে এর জন পিছু জাতীয় আয় একেবারে লজ্জাজনক ভাবে কম। ইংলণ্ডের জন পিছু জাতীয় আয় যা, ভারতের জন পিছু জাতীয় আয় হচ্ছে তার এক দ্বাদশাংশ।

ভারতের উৎপাদন পরিমাণের হার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ঢের কম। ভারতের এক বিঘা জমিতে যে গম উৎপন্ন হয়, ইংলণ্ড ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশের এক বিঘা জমিতে তার চেয়ে ঢের বেশী গম উৎপন্ন হয়। এইরূপ প্রত্যেক ব্যাপারে। তা' সে কৃষি সংক্রান্তই হোক্ আর শিল্প সংক্রান্তই হোক্।

এই সমস্ত দেখে শুনে ভারতের দারিদ্র্যের কারণ অনেকটা অনুমান করা যায়। তার সমস্ত শক্তি ও সম্পদ সুপরিচালনার অভাবে নষ্ট হচ্ছে। ভারতবাসীদের যে কোন ক্ষমতা নেই তা' নয়, ব্যাপার হচ্ছে যে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করবার তারা সুযোগ পায় না। সুযোগ পেলে কার্য্য ক্ষমতায় ভারতবাসীরা জগতের কোন জাতের চেয়ে যে পশ্চাদপদ নয়, তার পরিচয় পাঞ্জাবী চাষীরা ক্যালিফোর্ণিয়ায় যেয়ে যথেষ্ট দেখিয়েছে এবং আমেরিকাস্থ চীনা-জাপানী বৃটিশ ও আমেরিকান শ্রমিকদের সঙ্গে সমানভাবে টক্কর দিতেছে। আমেরিকায় ভারতীয় শ্রমিকরা সুপরিচালিত হয়ে তাদের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ

করবার সুযোগ পেয়েছে বলেই ত অসীম কার্য্যক্ষম হয়ে উঠেছে।

এখানকার উৎপাদন কারীরা তেমন কোন সুযোগ পায় না। তাদের শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, সামান্য মূলধন পর্য্যন্ত নেই। সুতরাং ভারতের উৎপাদনের পরিমাণ হার বৃদ্ধি পাবে কি করে? কৃষির ব্যাপারই ধরুন। একজন লোক কৃষিকার্য্য করতে নামল। প্রথমতঃ কৃষি সম্পর্কে উন্নতি মূলক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তার কিছু নেই, আবাহমান কাল থেকে যা' চলে আসছে সেইটাই সে অনুসরণ করে। দ্বিতীয়তঃ, যে লোক সে নিয়োগ করে সে তেমন দক্ষ নয়, কেননা, দক্ষ হবার মত লেখা পড়া, টাকা পয়সা কিংবা সুযোগ সুবিধা সে পায় নি। এমতাবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ কিছুতেই বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং অপরাপর দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ এঁটে উঠতে পারে না।

শিল্প ব্যাপারের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। ভারত কৃষি প্রধান দেশ হওয়ার দরুণ এতদিন সকলের বোধ হয় ধারণা ছিল যে, এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। কিন্তু ক্রমশঃ দেশের লোকের সে ভুল ভেঙ্গে গেছে এবং যাচ্ছে। আজ আমরা আমাদের দেশে নানারূপ শিল্প প্রতিষ্ঠা করে লাভবান হচ্ছি। তবুও অপরাপর দেশের তুলনায় সে কিছুই নয়।

সকল রকম কৃষি ও শিল্পোৎপাদন ব্যাপার প্রধানতঃ দু'টি জিনিষের ওপর নির্ভর করে—

(১) শ্রমশক্তি।

(২) মূলধন।

যে সমস্ত দেশে মূলধন কিংবা শ্রমশক্তির অভাব সে সমস্ত দেশে কিছুতেই শিল্প-কার্য্য প্রসারতা লাভ করতে পারে না। ভারতে মূলধনের ভয়ঙ্কর অভাব, এর একমাত্র কারণ এই যে, আর্থিক দিক দিয়ে ভারত একান্ত দরিদ্র। যাঁরা ধনী তাঁরা শিল্প বাণিজ্যে টাকা ন্যস্ত করিতে ভয় পান, তার চেয়ে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে টাকা খাটানোই তাঁরা নিরাপদ বলে মনে করেন। তাই একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করতে গেলে এখানে একেবারে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়।

ধনীদের বাদ দিলে সমাজে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁদের ইংরাজীতে "বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়" বলা হয়। শিল্পপ্রধান দেশে এই বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়রা শিল্প-গঠন কার্য্যে প্রভূত সাহায্য করেন, কেননা, তাঁরা বেশ দু'পয়সার অধিকারী। আমাদের দেশে এই বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়ের অভাব আছে, আমাদের এখানে যা' আছে তা' বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায় নয়, 'পেটি বুর্জ্জোয়া' সম্প্রদায় অর্থাৎ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এরা কোন রকমে সংসার চালায়; কিংবা এদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন তাদের হেসে খেলে বেশ চলে যায়। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দায় ঘাড়ে নেবার তাদের অবস্থাও নয় এবং সে মনোবৃত্তিও নাই।

আমাদের দেশে মূলধনের কেন অভাব তার কারণ নির্ণয় করতে গেলে মূলধনের উৎপত্তির মূল অন্বেষণ করতে হ'বে। আমাদের সমাজে যখন সামন্ত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ হিন্দু-যুগের মধ্য ও শেষ ভাগে, মুসলমান যুগে এবং বৃটিশ যুগের প্রথমাবস্থায়—তখন মূলধন কতকাংশে বর্ত্তমান থাকলেও আজকের যুগের মত প্রাধান্য লাভ করে নি। ইউরোপে যখন

থেকে যন্ত্র বিপ্লব সুরু হয়েছে, তখন থেকেই এই মূলধন আধুনিক রূপ পেয়েছে। সামন্ত যুগে শ্রমিকরা ছিল অধিকাংশ ক্রীতদাস, তারা একটা পণ্য পদার্থ বিশেষ, তাদের কোন পৃথক্ সত্তা ছিল না। তাছাড়া তখন বিশৃঙ্খল রাজ্য ব্যবস্থার দরুণ বাণিজ্যেরও তত সুবিধা ছিল না। তার ওপর মূলধন বৃদ্ধিকারী যন্ত্র সমূহও তখন আবিষ্কৃত হয় নাই। মোট কথা, তখন অনেকেই সম্পদ ভোগ করতে পেরেছে, সে সম্পদ মূলধনের সম্পদ নয়, প্রাচুর্য্যের সম্পদ। কৃতদাস সাহায্যেই হোক কিংবা অন্য কোন ভাবেই হোক্, যে যার উৎপাদনের অংশ পেয়েছে এবং সেই উৎপাদনের বিনিময়ে বা বার্টার এক্সচেঞ্জ দ্বারা নিজ পরিবারের প্রয়োজনীয় সকল অভাব মিটিয়েছে। সমাজ দেহে তখন এই মূলধনটা ছড়িয়েছিল, বিশেষ কোন যায়গায় কেন্দ্রীভূত হতে পারে নি।

কিন্তু যেই যন্ত্রবিপ্লব ঘটে গেল তখন এই উৎপাদন পর্য্যায়টা আলাদা একটা রূপ নিলে। যন্ত্রসমন্বিত শিল্পওয়ালারা দেখলে যে এই যন্ত্রের সাহায্যে তাদের আশাতিরিক্ত 'লাভ' থাকছে। এই লাভটা আর কিছুই নয়, তার উৎপাদনের পড়তা-মূল্য ও বিক্রয়-মূল্যের বিয়োগ ফল। যারা ছোট খাটো শিল্প নিয়ে স্বাধীন ভাবে কাজ চালাচ্ছিল, তারা এই বৃহৎ শিল্পের কাছে টিঁকতে পারলে না, আস্তে আস্তে এসে সেই বৃহৎ শিল্পব্যাপারেই শ্রমিক হিসাবে কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ল ;

পূর্ব্বে যন্ত্রহীন শিল্পব্যাপারে লাভটা কেন্দ্রীভূত হ'তে পারে নি, কেননা, অনেকেই স্বাধীনভাবে ছোট ছোট শিল্প ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু যন্ত্র বিপ্লবের পর থেকে লাভটা ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হ'তে লাগল। এই কেন্দ্রীভূত লাভটাই মূলধনের বর্ত্তমান আকার গ্রহণ করেছে।

এক হিসাবে দেখতে গেলে এই মূলধনটা শোষণ ছাড়া আর কিছুই নয়, কেননা, উৎপাদন বস্তুটা তার উৎপাদন খরচার দামে ত বিক্রী হয় নি, হয়েছে তার ঢের বেশী দামে বিক্রী। এই যে লাভটা, এটা ত যারা উৎপাদনকারী তাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু উৎপাদনকারীদের মধ্যে যারা সংগঠনকারী অর্থাৎ মালিক সম্প্রদায়, তারাই ঐ লাভটা ভোগ করে, শ্রমিকরা শ্রমের মজুরী ছাড়া আর কিছুই পায় না। এই অসাম্যই ব্যক্তিগত ধনবাদের বিরুদ্ধে একটা বড় যুক্তি। সমাজতন্ত্রীরা তাই রাষ্ট্রীয় ধনবাদ (State Capitalism) কামনা করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীভূত লাভ থেকেই মূলধনের উৎপত্তি। মালিকদের আবার নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে কেন্দ্রীভূত লাভটা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখা যায়। সেই জন্য যাদের বড় বড় প্রতিষ্ঠান তারা ছোট ছোটদের টিপে মেরে ট্রাষ্ট, গিল্ড কম্‌বাইন প্রভৃতি সংগঠিত করে নেয়। ঐ কেন্দ্রীভূত লাভটা বজায় রাখবার ও বাড়াবার জন্যই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কেননা, তা' না হ'লে বাণিজ্যের ভয়ঙ্কর অসুবিধা ঘটে। ঐ কেন্দ্রীভূত লাভের উৎপাদন যন্ত্রটা হচ্ছে ভয়ানক লোভের। সেই লোভের বসেই মালিকরা দেশের চাহিদার বেশী মাল উৎপাদন করে ফেলে। তার জন্য তখন বিদেশের বাজার আবশ্যক। এই বিদেশের বাজার অধিকার করবার জন্য কলোনি দরকার আর এই কলোনির প্রয়োজনীয়তা থেকেই ইম্পিরিয়ালিজমের উৎপত্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ধনবাদ

ও সাম্রাজ্যবাদ একই বস্তুর এ পিঠ আর ওপিট।

ইউরোপ ও আমেরিকা উপরোক্ত ব্যাপারে ভয়ঙ্কর সিদ্ধহস্ত, তাই আজ সে সব যায়গায় যত মূলধনের সমাবেশ। ভারতে গত ত্রিশ বছরের পূর্ব্বে ঐ রকম যোগাযোগ কখনো দেখা যায় নি, তাই ভারতে মূলধনও সে রকম সঞ্চিত হ'তে পারে নি। ত্রিশ বছর পূর্ব্বে ভরেতবর্ষে কল কারখানা বড় একটা ছিল না, সুতরাং ফিনিস্‌ড দ্রব্য সমুহ ভারতবর্ষ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বিদেশ থেকে কিনে এসেছে। কাঁচা মাল বিক্রী করে তারা যা পায় তাতে সমগ্র ভারতবাসীর জীবন যাত্রাই নির্ব্বাহ হয় না। মূলধন ভারতবাসীর হাতে জমবে কোথা থেকে?

এই সমস্ত কারণেই মুলধনের অভাবে ভারতবর্ষে শিল্পেব প্রসাবতা ঘটতে পারে নি। সেইজন্য, দেশে যখন আবশ্যকীয় মূলধন পাওয়া যাচ্ছে না তখন বিদেশের দ্বারস্থ না হ'লে আর চলল না। এই বিদেশের মূলধন ব্যবহার করার জন্য অনেক অর্থনীতিবিদ্ আপত্তি করেন। বিদেশী মূলধন ব্যবহার করায় দেশের টাকা বিদেশেই বেরিয়ে যায়, কিন্তু অবস্থানুযায়ী বিদেশী মূলধন ব্যবহার না করেও ভারতের উপায় ছিল না।

ভারতবর্ষের এই মুলধনহীনতার সুযোগ বিদেশীরা খুব ভাল ভাবেই নিল। তাই ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শিল্প সমূহ আজ বিদেশীদের করতলগত। অধিকাংশ পাটকল সমূহের মালিক ইউরোপীয়, বিরাট রেলওয়ে ব্যবসা ইউরোপীয় পরিচালিত, চা বাগান, কয়লা খনি সমূহের মধ্যেও ভারতীয়দের স্থান অল্প। আমাদের পক্ষে এগুলি লজ্জার কথা, দেশের অনেক টাকা এতে বিদেশে বেরিয়ে যায়।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষ দরিদ্র সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে এখানে যে বিলাসের সমারোহ চলে না এমন কথা বলা যায় না। দরিদ্র ভারত, হৃতশ্রী ভারত, বুভুক্ষিত ভারত—তবুও তার মধ্যেই বিলাসীর ভোগের লীলা আছে; হ'তে পারে তাদের সংখ্যা খুব কম, একেবারে মুষ্টিমেয়।

সাধারণ ভাবে বিলাসিতা যে দোষের একথা উৎকট সমাজতন্ত্রবাদীও উচ্চারণ করবেন না। আসলে বিলাসিতা হ'ল একটা আপেক্ষিক শব্দ; যার যে বস্তু প্রয়োজন, তার কাছে সে বস্তু বিলাসিতা নয়, যদিও সেটা অপরের কাছে আতিশয্য বলে মনে হয়। যার টাকা আছে, সে বিলাস করবেই, সেটা হ'ল ব্যবসা বাণিজ্যের কথা—ভোগের কথা; যাদের টাকা নেই তারা তাতে আপত্তি করবেই—সেটা হ'ল সমাজতন্ত্র-বাদের কথা, নীতির কথা! খুব উলঙ্গভাবে বললে একথা বলা চলে যে, ঐ ভোগের কথা ও নীতির কথার বিরোধই ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ঘটাচ্ছে। আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ভাল চালানো মানে ঐ বিরোধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া।

আমাদের নিকট সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যাপারটা যে বিলাসিতার ব্যাপার সে কথায় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে ওর ব্যবসা অচল থাকে নি। বহু টাকা ঐ সুগন্ধি দ্রব্য বাবদ বিদেশে চলে যায়; ব্যবসার দিক দিয়ে সেটা আমাদের লোকসানের দিক। এই লোকসানটা কারও কারও চোখে পড়াতে আজ সুগন্ধি দ্রব্য এদেশে প্রস্তুত করবার প্রচেষ্টা চলেছে; কিন্তু সে 'সিন্থেটিক্' প্রসেসে অর্থাৎ কেমিক্যাল উপায়ে। এই কেমিক্যাল প্রসেসে প্রস্তুত করবার দরুণ কাঁচা মাল বিদেশ থেকেই আমদানী করতে হয়—তাতেও বহু টাকা বিদেশে বেরিয়ে যায়। সে টাকাটা কি বাঁচানো চলে না?

নকল জিনিষ বানাবার জন্য বিজ্ঞান যে সমস্ত কেমিক্যাল উদ্ভাবন করেছে তাতে বিজ্ঞানের যে কেরামতি আছে একথা কেউই অস্বীকার করবে না। কিন্তু এমন দিনও ত ছিল যেদিন বিজ্ঞান ঐ সিন্থেটিক প্রসেস্ আবিষ্কার করে নি। তখনকার লোকে তাহ'লে কি দিয়ে অঙ্গরাগ লেপনে ব্যাপৃত থাকত?

ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে এ সম্বন্ধে অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন করা যায়। পূর্ব্বেকার সেই হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস এক বিশিষ্ট যুগের ইতিহাস। বর্ত্তমানে বিলাসিতা ও সমাজনীতির যে বিরোধ ব্যবসা বাণিজ্যকে ভারাক্রান্ত করে, অতীতে তার

অস্তিত্ব ছিল না। তখনকার যুগে বিলাসিতাটা নিরাধার ছিল না, ছিল সাধার। তখনকার সাহিত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্য্যে, স্থপিতবিদ্যায় বিলাসিতার চিত্র রীতিমত অঙ্কিত আছে। সমানভাবে অতি-প্রাচুর্য্যের যুগ না হোক, সেটা রিক্ততার যুগ ছিল না—তাই বিলাসিতার ভোগলীলা তখন সম্ভব হয়েছে।

ভারতের যে-যুগে বিলাসিতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল এবং যে-যুগে বিজ্ঞান সিন্থেটিক প্রসেস্ আবিষ্কার দ্বারা কোনরকম নকল জিনিষ বানাতে সক্ষম হয় নি, সে-যুগে বিলাসের উপকরণ সমূহ কি ভাবে উৎপাদিত হ'ত সেটা প্রণিধানযোগ্য। সেটা আর যে উপায়ে হোক্ না কেন, সিন্থেটিক্ প্রসেসে যে নয়, এটা নিশ্চিত। আমরা সেই ভারতেরই অধিবাসী, পূর্ব্বেকার সেই বিলাসপ্রিয়দেরই উত্তরপুরুষ. সুতরাং আমরা যদি তাঁদের সেই উৎপাদন প্রক্রিয়া আয়ত্ব করতে পারি তাহলে আমাদের আর বিদেশের সিন্থেটিক প্রসেসের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। কিন্তু আমাদের সেই অতীতের ব্যবসা-বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি অনুশীলনের অভাবে লুপ্ত হতে বসেছে। আমাদের দেশে যাঁরা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁরা কাব্য-স্মৃতি-ন্যায় ইত্যাদির চর্চ্চা করেন কিন্তু পূর্ব্বেকার সেই ব্যবসা-বিজ্ঞানকে পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করেন না। আধুনিক আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা কেবল চিকিৎসাটাকেই আয়ত্বে অনেন, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রসায়ন শাস্ত্রকে উদ্ধার করতে কিছুমাত্র প্রচেষ্টা চালান না।

আমাদের এই লেখা থেকে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা বিদেশী সিন্থেটিক প্রসেস গ্রহণের বিরোধী। আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের পূর্ব্বেকার অর্থাৎ অতীত যুগের পন্থা ও প্রণালী সমূহ অবলম্বন করে আমরা যদি লাভবান হ'তে পারি তাহলে সে-জিনিস অবলম্বন করাই আমাদের শ্রেয়ঃ। অতীত-এর প্রতি আমাদের কোন মোহ নেই, যা অতীত তা-ই শুভ এবং কল্যাণকর এমন কথা আমরা কোনদিনই বলিনে, কিন্তু অতীতের এমন যদি কিছু থাকে যা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করলে বর্ত্তমানের অধিবাসীরা লাভবান হতে পারেন তাহ'লে তাকে অবলম্বন করার মধ্যে আমরা কিছুমাত্র প্রগতি বিরোধিতা বা লজ্জার ব্যাপার দেখতে পাই না। অতীতে গৌরব-শিখরে আরূঢ় ভারত বহুপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে গিয়েছে, তার প্রকাশ দেখা যায় মিনার, স্মৃতিস্তম্ভ ও স্থপতিবিদ্যার কলালিপিতে,—ভারতের সেই গৌরব-সম্পদকে অনুশীলনীর দ্বারা সম্পূর্ণ অধিকার করে আমরা যদি পুনরায় গৌরবান্বিত হতে পারি তাতে আক্ষেপের কি আছে? সে ত বর্ত্তমানকে প্রতিহত করতে যাচ্ছে না, সে বর্ত্তমানকে আরও অগ্রগতির পথে চালিত করছে।

আয়ুর্ব্বেদও আমাদের সেই গৌরবময় সম্পদ। ভারতে পূর্ব্বে যে সমস্ত বিলাস-উপকরণ প্রচলিত ছিল, তাদের উৎপাদন প্রণালী আয়ুর্ব্বেদ, চরকসংহিতা, বৃহৎসংহিতা, নগরসর্ব্বস্বম্ প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। শুধু তাই নয়, পরিপূর্ণ বিলাসী হতে গেলে ও স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জন করতে গেলে কি রকম ভাবে অঙ্গসজ্জা করা দরকার তারও বিবরণ প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। কি করলে স্ত্রীলোকের হৃদয় জয় করা যায় সে-সম্পর্কে

প্রাচীন গ্রন্থ নগরসর্ব্বস্বম বলছেন—"প্রেমের আর্টে যদি কেউ অভিজ্ঞ হয় এবং তার যদি বিদূষী, বুদ্ধিমতী, ঐশ্বর্য্যশালিনী, তন্বী রমণীর মনোরঞ্জন করবার ইচ্ছা থাকে তাহলে তাকে ধূপগন্ধযুক্ত, ঋতু উপযোগী পোষাকে ভূষিত হতে হবে—মণিমুক্তা খচিত অলঙ্কার ধারণ করতে হবে এবং ভ্রমর মাতালকারী নানারকম সুগন্ধিপুষ্পের মাল্য গলায় দিতে হবে। তা' ছাড়া নানারকম অঙ্গরাগ দ্বারা দেহ সুরভিত করতে হবে এবং তাম্বুলচর্ব্বন দ্বারা মুখবিবর সুবাসিত রাখতে হবে।"

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বিলাসিতা সম্বন্ধে কি তীক্ষ্ণ জ্ঞান ছিল। তাঁরা লোধ্রচূর্ণ দ্বারা তাঁদের দেহ রঞ্জিত করতেন, চন্দন ও কেতকী চূর্ণ দ্বারা অঙ্গ চর্চ্চিত করতেন এবং কাকপক্ষ দ্বারা চক্ষুদ্বয় শোভিত রাখতেন। ধূপগন্ধে তাঁদের বেশবাস সর্ব্বদা সুরভিত থাকত। কিন্তু সে-সমস্ত ব্যাপার আজ লুপ্ত হয়েছে, সাধারণ ভারতের আজ বিলাসিতার সুযোগ নেই, যাঁদের আছে তাঁদের সে-অনুশীলনী নেই।

তাছাড়া প্রাচীন কাব্য ও গ্রন্থ সমূহে কখন কি রকম বিলাস উপকরণ ব্যবহার করতে হয় তারও ফিরিস্তি দেওয়া আছে। বাৎস্যায়নের "কামসূত্রে" নাগরিকের দৈনন্দিন বিলাসকার্য্যের তালিকা দেওয়া আছে। তখনকার নাগরিকগণ ধূপ, অলক্তক, তাম্বুল, মুখবাস প্রভৃতি দৈনিক ব্যবহার করতেন। দন্ত পরিষ্কারের জন্য তাঁরা যে দ্রব্য ব্যবহার করতেন তাতে শুধু যে দন্ত পরিষ্কৃত হত তা' নয়, পরন্তু মুখবিবর সুরভিত হত।

সুগন্ধযুক্ত জল প্রস্তুত করবার জন্য তাঁরা এই দ্রব্যগুলি কাজে লাগাতেন :—৪ ভাগ জায়ফল, ২ ভাগ পত্র, ১ ভাগ এলাচ, ৩ ভাগ কর্পূর। এই দ্রব্যগুলি মিশ্রিত জলে তাঁরা মুখ ধৌত করতেন। বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে এ-সমস্তর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। স্নানের জলও যাতে সুগন্ধযুক্ত হয় সেদিকেও প্রাচীন ভারতীয়দের দৃষ্টি ছিল।

"নগরসর্ব্বস্বম্" গ্রন্থে স্নানের জল সুগন্ধযুক্ত করবার একটা ফরমুলা দেওয়া আছে :—অগুরু, টগর, পান, গ্রন্থীপর্ণ, কস্তুরী প্রভৃতি দ্বারা জল সুগন্ধযুক্ত করা যায়।

গাত্র সুরভিত করবার জন্য বাৎস্যায়ন নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যবহারের নির্দ্দেশ দিয়াছেন :—কস্তুরী, কর্পূর, চন্দন, নাগপুষ্প, অগুরু প্রভৃতি এক সঙ্গে চূর্ণ করে গাত্রে লাগাতে হ'বে। তাছাড়া নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির চূর্ণ গাত্রে লাগলেও দেহ সুরভিত হয় :—চন্দন, খস, বিল্বপত্র, অগুরু, নাগকেশর প্রভৃতি।

অধিক ঘর্ম্ম নির্গমন বন্ধ করবার জন্য এবং সকল প্রকার চর্ম্মদোষ দূর করবার জন্য এই দ্রব্য গুলির ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে :—লোধ্র, খস, শিরীষ ও পদ্মক কাষ্ঠ সমষ্টির চূর্ণ প্রলেপ। প্রাচীন কালের বিলাসী বিলাসিনীদের ঐ সমস্ত চূর্ণ বড় প্রিয় ছিল। যাঁরা একটু অবস্থাপন্ন হতেন তাঁরাই লোধ্র চূর্ণ, চন্দন চূর্ণ এবং কেতকী পুষ্পচূর্ণ ব্যবহার করতেন।

নিমপাতা, পদ্মমৃণাল, লোধ্র এবং ডালিম গাছের ছালের সংমিশ্রণে তখন এক প্রকার কেশপট্টবাস, গৃহবাস, বদনবাস, স্নানীয়চূর্ণবাস, চটুচাস্তগন্ধ, ধূপারতি, দীপারতি, প্রভৃতি বিখ্যাত সুগন্ধ দ্রব্যাদির উল্লেখ আছে।

আধুনিককালে অনেক প্রকার সুগন্ধযুক্ত কেশ তৈল দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু আধুনিক কালের ব্যবসায়ীরা শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হ'বেন যে, পূর্ব্বে বহু ভাল ভাল কেশ তৈল প্রচলিত ছিল। মঞ্জিষ্ঠা, ব্যাঘ্র নখ, শুক্তি, দারু চিনি, পদ্ম প্রভৃতির চূর্ণ তৈলে ভিজিয়ে তৈলকে সুগন্ধযুক্ত করা হ'ত এবং তাকে সুবাসিত চম্পক তৈল নাম দেওয়া হ'ত।

তিল তৈলকে সুগন্ধযুক্ত করবার জন্য তার মধ্যে বিল্বপত্র এবং রৌদ্র শুষ্ক কেতকী ও অশোক পুষ্প ভিজিয়ে রাখা হ'ত।

পূর্ব্বেকার কেশ পরিচর্য্যাকারীরা যে রকম উৎকৃষ্ট চুলের কলপ ব্যবহার করতেন, আধুনিক কলপ সমূহ তার নিকট দাঁড়াতেই পারে না। আমলকী, ভিনিগার ও নানা রকম পুষ্প ও পত্র সহযোগে সেকালের ব্যবসায়ীগণ ব্যাপকভাবে চুলের কলপ প্রস্তুত করতেন।

উপরোক্ত ব্যাপার সমূহ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'বে যে, সেকালে ভারতীয়গণ দেশীয় গাছ গাছড়া হ'তেই সমস্ত অঙ্গরাগ সমূহ প্রস্তুত করতেন, বিদেশী কাঁচা মালের ওপর কিছুমাত্র নির্ভর করতেন না। ভারতীয় চন্দন, কস্তুরী, খস, লোধ্র প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ সমূহে সমাদৃত হ'ত। প্রকৃতই, এক সময়ে ভারতবাসীরা মিশর, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, পারস্য, ফিনিসীয়, গ্রীস ও রোমবাসীদের মতই বিলাস প্রিয় ছিলেন।

এই সুগন্ধী দ্রব্যের উৎপত্তির ইতিহাস নির্ণয় করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এখন যেমন সমষ্টিগত ভাবে সুগন্ধী দ্রব্য উৎপাদিত হয় পূর্ব্বে সে রকম ছিল না। বহু শতাব্দী কেটে গেছে যখন ব্যক্তিগতভাবেই এই সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদিত হ'ত। মোগল যুগেই সুগন্ধি দ্রব্যের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ দেখা যায়। তার কারণ, মোগল সম্রাট ও বাদ্‌শাহদের অপর্য্যাপ্ত বিলাস-লীলা সুগন্ধি দ্রব্যের উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। কথিত আছে যে, জাহাঙ্গীর পত্নী নুরজাহান কর্ত্তৃক গোলাপের আতর সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং সে আবিষ্কারের কাহিনী অনেকেই অবগত আছেন। সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের হামাম্ ঘরে (স্নানের ঘর) শ্বেত পাথরের চৌবাচ্চায় বসোরাজাত উৎকৃষ্ট গোলাপ ফুল সমূহ ভিজানো থাকিত। এইরূপ উৎকৃষ্ট গোলাপ গন্ধ সুবাসিত জলে নুরজাহান স্নান করিতেন। একদিন সাম্রাজ্ঞী কোনও কারণে হামান ঘরে স্নান করিতে যান নাই। তাহার পরদিন চৌবাচ্চায় নামিয়া দেখেন যে জলের উপর তৈলাক্ত চাপ চাপ কি ভাসিতেছে এবং তাহার গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি পালক দ্বারা এই তৈলাক্ত পদার্থ ধীরে ধীরে একটি পাত্রে তুলিয়া লইলেন এবং ইহাই জগদ্বিখ্যাত গোলাপী আতর আবিষ্কারের ইতিহাস। গোলাপের আতর আবিষ্কৃত হবার পর ব্যবসায়িগণ বিভিন্ন সুগন্ধ পুষ্পের নির্য্যাস প্রস্তুত করতে সুরু করেন। এইরূপে গোলাপ ও অপরাপর পুষ্পের নির্য্যাস প্রস্তুত করার ব্যবস্থা কনৌজ, গাজীপুর, জৌনপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বিশেষ প্রসারতা লাভ করে। ঐ সমস্ত স্থানে উক্ত দ্রব্য সমূহ প্রস্তুত করণের যে প্রথা প্রচলিত আছে তা' সম্পূর্ণ সেকেলে প্রথা। কিন্তু ভারতীয় সুগন্ধি শিল্পকে নষ্ট করে ফরাসী ও জার্ম্মানজাত দ্রব্য সমূহ। ভারতীয়দের পরে ফরাসী ও জার্ম্মাণগণ বিভিন্ন সুগন্ধ দ্রব্য সমূহের গুণাগুণ

শিক্ষা করে সিন্থেটিক প্রসেসে নানারকম গন্ধ দ্রব্য উৎপাদন পূর্ব্বক পৃথিবীর বাজার অধিকার করেন।

সুগন্ধী দ্রব্য প্রস্তুত করণের নানা রকম কাঁচা মাল ভারতের বিভিন্ন যায়গায় পরিব্যাপ্ত আছে। মহীশূর ও কোপ্পাম্-এ প্রচুর চন্দন কাঠ পাওয়া যায়; নেপাল ও ভুটানে পাওয়া যায় কস্তুরী; আসামে অগুরু আর গাজীপুর, জৌনপুর ও আলিগড়ে গোলাপ। ঐ সমস্ত দ্রব্য ইউরোপের ব্যবসায়ীদের নিকট চালান যায়, তারা আবার ওগুলির মধ্য থেকে নির্য্যাস ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেয়। সম্প্রতি, ঐ সমস্ত দ্রব্যের যাতে ভারতেই সদ্ব্যবহার ঘটে তার জন্য প্রচেষ্টা চলেছে। মহীশূর রাজ্য চন্দন কাঠের ব্যাপারে এবিষয়ে অগ্রণী হয়েছে। মহীশূরে চন্দন বৃক্ষের এক রকম 'মনোপালি' বললেই চলে; সেখানকার চন্দন কাষ্ঠসমূহ পূর্ব্বে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হ'ত এবং তার ফলে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সমূহ সেই সমস্ত ক্রয় করতেন। ফলে এই হ'ত যে ভারতবাসীদের তাদেরই দেশে উৎপন্ন দ্রব্য সমূহ ইউরোপের নিকট হ'তে বোতল ভর্ত্তি অবস্থায় ক্রয় করতে হ'ত। মহীশূর রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত প্রথা বন্ধ করে দিয়ে ভারতবর্ষের যথেষ্ট উপকার সাধন করেছেন। শুধু তাই নয়, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ যখন বুঝতে পারলেন যে, মূল্যবান চন্দন কাষ্ঠের উপযুক্ত ব্যবহারে তাঁদের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের অনেক বেকারের সংস্থান হতে পারবে, তখন তাঁরা তাঁদের রাজ্যে একটি distillation এর কারখানা খোলেন। তৎপরে তাঁরা ঐ কারখানাকে একটি বৃহৎ ব্যাপারে পরিণত করেন এবং চন্দনের নির্য্যাস সম্পর্কে পৃথিবীর চাহিদা মেটাতে সক্ষম হ'ন। এইরূপে চন্দন কাষ্ঠের নীলাম একেবারে বন্ধ হয়।

সম্প্রতি বারানসীতে হিন্দুস্থান এ্যারোম্যা-টিক্স্ কোং নামে একটি কোম্পানী ডাঃ গড়বোল্ এবং সদ্গোপালের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়েছে। তাঁরা দেশীয় গাছ গাছড়া থেকে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করেন। তাঁদের তৈরী কেয়া, হেনা ও চাঁপা ফুলের আতর অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, ইউরোপীয় সুগন্ধ দ্রব্য যা' আমাদের দেশে চালান আসে তদপেক্ষা সেগুলি ভাল। সুতরাং আমাদের মধ্যে যে সমস্ত বিলাসী বিলাসিনীগণগণ 'এসেন্স' প্রভৃতি ব্যবহার করেন তাঁরা বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করবার পূর্ব্বে যেন দেশী দ্রব্য পরীক্ষা করে দেখেন। দেশী শিল্পকে তাঁরা যদি উন্নতির পথে চালিত করেন ভারতের একটি অতি উৎকৃষ্ট লুপ্ত সম্পদ পুনর্জ্জীবিত হয়।

সুগন্ধযুক্ত তৈল, আতর ইত্যাদি ছাড়াও ভারতে আরও এক রকমের জিনিষ প্রস্তুত হয় যার নাম হ'ল ধূপকাঠি। এই ধূপকাঠি ভারতের অধিকাংশ গৃহস্থের ঘরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটি সরু কাঠির এক প্রান্তে ধূনার মশলা ও চন্দন, কস্তুরী প্রভৃতির সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করে লাগিয়ে রেখে এই ধূপকাঠি প্রস্তুত করা হয়। হিন্দুদের পূজা পার্ব্বণ ইত্যাদিতে উক্ত ধূপকাঠি প্রচুর ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ধূপকাঠি প্রাচ্যদেশের একটি নিজস্ব সুগন্ধ দ্রব্য; ভারতে ব্যাপকভাবে এর ব্যবসা চলিত আছে।

আধুনিক যুগে ভারতবর্ষেও সিন্থেটিক প্রসেস্ প্রবর্ত্তিত হ'তে চলেছে কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সিন্থেটিক প্রসেসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ঐ 'নির্য্যাস গ্রহণ' পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। নইলে, ভারতের যে

বিরাট সুগন্ধ দ্রব্য সম্পর্কীয় প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তা' অপচয়ে নষ্ট হ'বে। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে, সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য আমরা বিদেশ থেকে বহু টাকার কেমিক্যাল দ্রব্য আমদানী করি। কিন্তু আমরা যদি আমাদের উক্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে পারি ত দেশের টাকা আর বিদেশে বেরিয়ে যায় না। সিন্থেটিক প্রসেস্ আর কিছুই নয়; প্রাকৃতিক সুগন্ধ দ্রব্যকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে যে যে বস্তু পাওয়া যায় তারই কেমিক্যাল নকল মাত্র। ভারতবর্ষে যদি ঐ সিন্থেটিক প্রসেস্ ও প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত করা যায় ত একটি নূতন শিল্প গড়ে উঠতে পারে। কোন ব্যবসায়ী যদি এতদুদ্দেশ্যে কোম্পানী গঠন করেন ও বিভিন্ন কেমিষ্ট ও বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য নেন্ তাহ'লে ভারতের সুগন্ধ শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হ'তে পারে।

* * *

এতক্ষণ ধরে আমরা সুগন্ধ শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছি। উক্ত সুগন্ধ শিল্পের সঙ্গে সাবান শিল্পের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে, কেননা, সাবান সুগন্ধযুক্ত করবার জন্য সুগন্ধ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। সুতরাং আমাদের দেশীয় সুগন্ধ শিল্পের যদি উন্নতি সাধিত হয় তাহ'লে সাবান শিল্পের উপকারের সম্ভাবনা আছে। তা' ছাড়া সাবান কোম্পানী গুলি সুগন্ধ দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা। বিদেশী কেমিক্যাল কিনতে তাদেরও বহু টাকা বেরিয়ে যায়; দেশীয় সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করলে টাকাটা দেশেই খাটতে পায়।

সাবান সুগন্ধযুক্ত করা একটি শক্ত ব্যাপার। বিনা আয়াসে কিংবা জ্ঞানে এ জিনিসটি সম্পন্ন হয় না। সোপ টেক্‌নিক্ সম্পর্কে উত্তম অভিজ্ঞতা থাকলে তবে একাজে কেউ অগ্রণী হ'তে পারেন। বিভিন্ন প্রকার সাবানে কোন্ সুগন্ধ উপযোগী এবং দীর্ঘস্থায়ী তা' বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন। 'ইভাপোরেসন' এর সময় সুগন্ধ নষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং সে সম্পর্কে ব্যবস্থা করা দরকার। যাই হোক্, এসব সোপ টেক্‌নিকের ব্যাপার। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সুগন্ধ শিল্পের সঙ্গে সাবান শিল্পের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং সমস্ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মিলে যদি দেশীয় সুগন্ধ শিল্পের উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করেন তবে ভারতের ব্যবসা জগতে প্রভূত উপকার সাধন হ'তে পারে।

মিথ্যাবাদী সনাক্ত করার অত্যদ্ভুদ্ যন্ত্রাবলী

বিজ্ঞানের উন্নতির রথ অপ্রতিহত বেগে ছুটে চলেছে। এর অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার সমূহের বিবরণ শুনলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। মানুষ তার কল্যাণের জন্য যা চাইছে, বিজ্ঞান যেন ঠিক কল্পতরুর মত তাই প্রদান করছে। আমরা দ্রুত গমনাগমনের জন্য উন্নতধরণের যান চেয়েছিলাম—বিজ্ঞানের কল্যাণে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী যান 'এরোপ্লেন' আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। অন্যস্থানে কি ঘটে ঘরে বসে সেটা উপভোগ করবার আমাদের আগ্রহের সীমা ছিল না, তারই জন্য বিজ্ঞান আমাদের প্রদান করেছে রেডিও। রোগ শয্যায় মানুষের জীবন রক্ষার জন্য আমরা অমোঘ ঔষধের সন্ধান করছিলাম, ডাক্তারী-বিজ্ঞান সেই-সমস্ত ঔষধের জন্ম দিয়েছে। শুধু তাই নয়; মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্য সমূহ উৎপাদন করে প্রকৃতির ওপর খোদকারী চালাচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, বিজ্ঞান আজ আমাদের বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করবার জন্য সে হয়েছে অদৃশ্য সঙ্গী।

আমাদের নিরাপদে রাখবার জন্যও বিজ্ঞানের সাহায্যের অন্ত নেই। বড় বড় ব্যাঙ্ক থেকে যাতে টাকা চুরী না যায় তজ্জন্য সেখানকার "অটোমেটিক্ এ্যালার্ম" বিজ্ঞানেরই অবদান। হাতের ছাপ থেকে অপরাধী নির্ণয় করার যে পন্থা সেও বিজ্ঞানের কল্যাণে। কিন্তু এ-ধার দিয়ে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিস্ময়জনক আবিষ্কার হচ্ছে—মিথ্যাবাদী ধরবার যন্ত্র। এই যন্ত্র যখন আবিষ্কৃত হয়নি তখন পুলিশদের ভয়ানক অসুবিধা ঘটত। কারণ, কে দোষী আর কে নির্দ্দোষী তা বুঝতে না পেরে দোষী ও নির্দ্দোষী উভয়কেই তাদের চালান দিতে হ'ত। কিন্তু বর্ত্তমান যন্ত্রটির সাহায্য নিলে তাদের আর কোন অসুবিধায় পড়তে হবে না। দোষী ব্যক্তির মিথ্যা উক্তি এ যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়বে।

বিজ্ঞান এ-ধার দিয়ে যথেষ্ট উন্নতি করলেও আমাদের কিন্তু এতে যথেষ্ট আশঙ্কিত হবার কারণ আছে, কেননা, আমাদের অন্তর্যামী যে মন তাকেও বিজ্ঞানের দাস করতে কে চায় বলুন? ধরুন, এমন একটা যন্ত্র বেরুলো যা সাক্ষাৎ গণৎকার; আমার মনের গোপন কথাটিও সে বলে দেবে। কে চায় মনকে এরকম যন্ত্রের কাছে ধরা দিতে। আমার যে মন সে একান্ত আমার; আমার ভাববার এবং চিন্তা করবার অধিকারের ওপর কারও হাত নেই, আমি মনে মনে যা খুসী তাই করতে পারি কেউ জানতেও পারবে না;—কিন্তু বিজ্ঞানের কল্যাণে যদি কোন গণৎকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হয় তাহলে আমার ঐ মানসিক

স্বাধীনতা ত সঙ্কুচিত হয়ে গেল! কে চায় ইচ্ছা করে তার ঐ মানসিক স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করতে?

যাক্‌গে সে-কথা। যে যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছি তাতেই আসা যাক্। এই যন্ত্রের দরুণ মিথ্যাবাদীদের ভয়ঙ্কর সায়েস্তা হতে হয়েছে। আর পুলিশ ত এর দ্বারা হাতে স্বর্গ পেয়েছে বলে মনে হয়। পূর্ব্বে তাদের আসামীদের নিকট হতে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য কী পরিশ্রমই না করতে হত, হয়ত আসামীর ওপর যথেষ্ট উৎপীড়নের পর বোঝা গেল যে, এ-ব্যক্তি প্রকৃত আসামী নয়। তখন পুলিসের অবস্থার কথা একবার ভেবে দেখুন। কিংবা হয়ত একটা ঘাগী আসামীকে

পুলিশ গ্রেপ্তার করলে কিন্তু হাজার উৎপীড়নেও তার নিকট হতে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারা গেল না। পুলিশ তাকে আসল আসামী বলে জানলেও প্রমাণাভাবে তাকে চালান দিতে পারলে না। এই রকম ভাবেই প্রকৃত আসামী মুক্তি পেলে। কিন্তু যদি পুলিশের কাছে উক্ত যন্ত্র থাকে ত আসামীর সমস্ত মিথ্যাচরণ তাতে ধরা পড়ে যাবে এবং নিরপরাধীর আব অযথা উৎপীড়িত হবার আশঙ্কা থাকবে না।

এ-রকম একটা যন্ত্রের কথা শুনলে সকলের নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর বিস্ময় বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা মোটেই তেমন আশ্চর্য্যের নয়। এ যদি কোন ম্যাজিক কিংবা ভানুমতীর খেল্ দ্বারা সম্ভাবিত হত তাহলে হয়ত বলা চলত যে, উঃ, কি অসম্ভবই না ব্যাপার! কিন্তু এ ত সেরকম কিছু ধাপ্পাবাজি নয়, অবশ্য একথা আপনারা বলতে পারেন যে, এ হচ্ছে বিজ্ঞানের ম্যাজিক। কিন্তু বিজ্ঞানের ম্যাজিক আর সাধারণ ভানুমতীর খেল্-এর মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে। কোন যাদুকর ম্যাজিকের দোহাই দিয়ে যখন একটা টাকা থেকে চার পাঁচটা টাকা বার করে তখন আসলে একটা টাকা এক টাকাই থাকে, চার পাঁচ টাকা হয়ে যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানের ম্যাজিকে ফক্কিকারী নেই, আসল জিনিসটাই তা লোকের চোখের সামনে মেলে ধরে।

এখন কথা উঠবে যে, বিজ্ঞান কি করে ঐ আশ্চয্য জিনিস সম্ভব করে তোলে? বিজ্ঞানে মনস্তত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব ও ইলেট্রিক যন্ত্রের সাহায্যে ঐরূপ অসম্ভব সম্ভব করে। ব্যাপারটা মোটেই শক্ত নয়। ধরুন, আপনি একটা বিপদে পড়েছেন, কিন্তু মিথ্যা কথা বললে পরে আপনার রেহাই পাবার সম্ভাবনা আছে। অথচ মিথ্যাকথা বলাটাও বিপদজনক। সে ক্ষেত্রে আপনার মনে দুটো ভাবের সংঘর্ষ লাগবে। প্রথমতঃ, বিপদ থেকে রেহাই পাবার জন্য আপনার মন আপনাকে মিথ্যা বলবার তরে উত্তেজিত করবে; দ্বিতীয়তঃ, মিথ্যা কথা বললে আপনাকে বিপদে পড়তে হবে এই ভয়ে আপনার মন আপনাকে মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরত করতে চেষ্টা করবে। ফলে, আপনারা দেহের রক্তসঞ্চালন, নিশ্বাস প্রশ্বাস কিংবা ব্রেণ সিষ্টেমের মধ্যে ক্ষণিকের মত একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হবে স্বাভাবিক অবস্থায় যেটা দেখা যায় না। এমন যদি কোন সূক্ষ্ম যন্ত্র থাকে যাতে করে আপনার ঐ নিশ্বাসপ্রশ্বাস কিংবা রক্তসঞ্চালনের অথবা ব্রেণ-সিষ্টেমের ক্ষণিকের অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে তাহলে আপনি মিথ্যা বলছেন কি'না সেটাও ধরা পড়ে যাবে। যদি আপনি সত্যি কথা বলেন ত আপনার সিষ্টেমের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা দেখা দেবে না এবং যন্ত্রের মধ্যেও কোন কিছু ধরা পড়বে না।

এই হল উক্ত যন্ত্র নির্ম্মাণের সংক্ষিপ্ত থিয়োরী। এ-থিয়োরীটা বোঝা কিছুমাত্র শক্ত নয়, সুতরাং যন্ত্রের ব্যাপার শুনে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। বৈজ্ঞানিক তথ্য ছেড়ে দিলে সাধারণ ভাবেও এ জিনিসটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। আপনি যদি কাকেও জেরা করেন এবং সে যদি মিথ্যা কথা বলতে চেষ্টা করে; তাহলে দেখবেন যে, তার মুখ-চোখের ভাব ক্ষণিকের জন্য পরিবর্ত্তিত হবেই হবে। খুব যদি চতুর লোক হয় এবং সে-যদি প্রাণপণে তার এই ভাব-বৈলক্ষণ্য এড়িয়ে যাবার

চেষ্টা করে তাহ্‌লে সাধারণ লোকের কাছে হয়ত সেটা ধরা পড়ে না, কিন্তু ওস্তাদ লোকেদের নিকট সে-জিনিসটা এড়ানো যায় না।

আপনার বাড়ীর ব্যাপারই ধরুন। আপনার সন্তানদের মধ্যে হয়ত কেউ শিশুসুলভ চাপল্য বশতঃ একটা অপরাধ করে ফেলেছে। কিন্তু অপরাধের বিষয় যখন সে সচেতন হয়, তখন তার এই আশঙ্কা থাকে যে বাপ-মা ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবেন। সেই আশঙ্কাতেই সে সেটা বেমালুম চেপে যাবার চেষ্টা করে এবং আপনি যখন তাকে এসম্পর্কে প্রশ্ন করেন তখন সে মিথ্যা কথা কইতে আরম্ভ করে। এই হ্‌ল সাধারণ মনস্তত্ত্ব। কিন্তু তার ঐ মিথ্যাভাষণের ছাপ তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে , কারণ, মিথ্যাভাষণের প্রচেষ্টার জন্য তার মগজের যে অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় সেটার প্রকাশ বাইরেও দেখা দেয়। আমরা যখন শারীরিক পরিশ্রম করি তখন সেই পরিশ্রমের জন্য আমাদের দেহের লোমকূপ দিয়ে ঘর্ম্ম নির্গত হয়; তেমনি উক্ত বালকের মগজের পরিশ্রমের সময় তার দেহের রক্ত চলাচল কিংবা রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। তজ্জন্যই তার মুখের বহির্ম্মগুলের রং বদলায় কিংবা অপর ভাব-বৈগুণ্য প্রকাশ পায়। এই রকম হ'বার কারণ নিম্নরূপ :—

ধরুন, আপনি উক্ত বালককে জিজ্ঞাসা করলেন যে সে অমুক যায়গায় গিয়েছিল কিনা? উক্ত বালক যদি সত্যি কথা বলে ত কোন কথাই নেই, তার সিষ্টেমের কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হ'বে না। কিন্তু যদি সে মিথ্যা কথা বলে ত তার মনে দু'রকমের ভাবের সংঘর্ষ লাগবে। প্রথমতঃ সে ভাববে যে সে যদি বলে যে, সে অমুক যায়গায় গিয়েছিল তাহ'লে আপনি ভয়ানক শাস্তি দিবেন। দ্বিতীয়তঃ সে ভাববে যে, ঐ শাস্তির হাত হ'তে বাঁচতে গেলে তাকে অন্য রকম কিছু বলতে হ'বে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে, তার মগজে তখন শাস্তির আশঙ্কা এবং সেই শাস্তির হাত হ'তে বাঁচবার জন্য অন্য রকম কিছু বলবার চেষ্টা—এই দু'য়েরই প্রক্রিয়া চলেছে। ঐটাই হ'ল তখন তার মগজের অস্বাভাবিক অবস্থা। ঐ অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য থেকে যা হোক একটা জবাব সে আপনার প্রশ্নের উত্তরে প্রদান করে—ইংরাজীতে এই ব্যাপারটিকেই বলে Synthesis.। এখন, তার দেহে ঐ অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কিনা যে কোন ডাক্তার তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস কিংবা রক্ত চলাচল অথবা রক্তের চাপ বা ঘর্ম্মবিন্দু পরীক্ষা করে বলে দিতে পারে। উক্ত পরীক্ষা যন্ত্রের উন্নত ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রই মিথ্যাবাদীকে সনাক্ত করবার যন্ত্র!

এবার ধরুন যে, আপনি ডাক্তার সেজেছেন এবং পুলিশ মিথ্যাবাদী সনাক্ত করণের জন্য আপনার নিকট আসামীকে ধরে নিয়ে এল। পুলিশ প্রদত্ত রিপোর্টানুযায়ী আপনি তাকে জেরা করতে লাগলেন। আসামী যদি প্রকৃতই আসামী হয় এবং যদি সে সত্যগোপন করতে চেষ্টা না করে তাহ্‌লে সে স্বীকারোক্তি দেবে। কিংবা সে যদি প্রকৃত আসামী না হয় এবং সেজন্য আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয় তাহলে তার সিষ্টেমে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হবে না। কিন্তু আসামী যদি প্রকৃত আসামী হয়ে সত্যগোপন করতে চেষ্টা করে তাহলে তার সিষ্টেমের মধ্যে অস্বাভাবিক

অবস্থা দেখা দেবে এবং যন্ত্রে তা' ধরা পড়বে।

এতক্ষণ আমরা মিথ্যাভাষণ ধরবার যন্ত্র এবং সে যন্ত্র নির্ম্মাণের থিয়োরী সম্পর্কে আলোচনা করেছি। উক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, যন্ত্রনির্ম্মাণের ব্যাপারটা আজকের এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে তেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। এবার আমরা ঐ যন্ত্র সম্বন্ধে ব্যবহারিক ভাবে কিছু আলোচনা করব।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চোর-ডাকাতেরা প্রতি বছর ৩,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড লুটে নেয়। কি বিরাট পরিমাণের অঙ্ক একবার ভাবুন দেখি—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ের ওটা হ'ল এক-চতুর্থাংশ! এরই জন্য আমেরিকায় আজকাল উক্ত যন্ত্রের ব্যবহার ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে। উক্ত যন্ত্র আমেরিকায় একবার কী অসাধ্য সাধন করেছিল, সে-বিষয় নিম্নে বর্ণনা করছি :—

একবার একটা ব্যাঙ্কে টাকা চুরী যায়। কিন্তু চোরকে ঘটনার সময় ধরা যায় না। হঠাৎ বিকালবেলা দু'টো লোককে ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরা ধরলে এবং ব্যাঙ্কের প্রায় সবাই তাদের সনাক্ত করলে, বললে যে, সকালবেলা টাকা চুরীর সময় এদেরই তারা ঘরে ঢুকতে দেখেছিল। লোকদুটি কিন্তু ভয়ঙ্কর ভাবে ঘটনার কথা অস্বীকার করতে লাগল, কিন্তু সবাই তাদের পুলিশে চালান দিলে।

বিচারের প্রহসন চলেছে। ইতিমধ্যে তাদের Scientific Crime Detection Laboratoryর কর্ত্তা ডাঃ কিলার তাঁর চোর ধরবার যন্ত্রদ্বারা তাঁদের পরীক্ষা করে মন্তব্য করলেন যে তাঁরা নির্দ্দোষ। আসামীপক্ষের উকীল এটাকে সাক্ষ্য হিসাবে ধরবার জন্য আদালতকে নিবেদন করলেন কিন্তু ফরিয়াদী পক্ষ আপত্তি করায় সেটা গ্রাহ্য হ'ল না। বিচারে বেচারীরা ভয়ঙ্কর দণ্ড ভোগ করতে যাচ্ছে, এমন সময় আসল চোরেরা ধরা পড়ল এবং তারা স্বীকারোক্তি দিলে যে তারাই ব্যাঙ্কের টাকা সরিয়েছিল। আসল চোরেরা যদি না ধরা পড়ত ত নির্দ্দোষী বেচারীদের দণ্ড ভোগ করতে হ'ত, অথচ বৈজ্ঞানিকের যন্ত্র দ্বারা তারা নির্দ্দোষী বলেই প্রতিপন্ন হয়েছিল।

সেইজন্যই আজকাল প্রায় প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই উক্ত যন্ত্র রাখা হচ্ছে। একবার সিকাগোর একটি ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ হাজার ডলার চুরী যায়; কোম্পানী তার প্রায় ৫৩ জন কর্ম্মচারীকে উক্ত যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করবার পর আসল আসামী ধরা পড়ে এবং তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়।

শুধু তাই নয়, উক্ত পরীক্ষাকার্য্যের সময় ৯ জন কর্ম্মচারী আরও ধরা পড়ে যারা সামান্য পরিমাণ টাকার গোলযোগ করেছিল অথচ যাদের কেউ এপর্য্যন্ত সন্দেহ করতেও পারেনি।

সবাই নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করবে যে উঃ, কি ভয়ঙ্কর যন্ত্র! এর নাম কি? যন্ত্রটির নাম হল পলিগ্রাফ (Polygraph) এবং এর নির্ম্মাণকার্য্যের প্রণালী সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে। মিঃ হেনরী মর্টন্ রবিন্সন্ অপরাধ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ লোক, তিনি ঐ যন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—Most dramatic and satisfactory of instruments now used in getting the confession. উক্ত যন্ত্র দেখতে ঠিক ডাক্তারদের ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষা করবার যন্ত্রের

মত ; আসলে ওটা সেই রকমই যন্ত্র, শুধু ওর সঙ্গে একটা Pen-recorder সংযুক্ত আছে, সেটা গ্রাফের ওপর পরীক্ষার ফল চিহ্নিত করে যায়। উক্ত গ্রাফের ওপর চিহ্ন দেখেই দোষী নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আসামীর কিংবা সন্দেহভাজন ব্যক্তির হাতে উক্ত যন্ত্র লাগানো হয় এবং যন্ত্র প্রয়োগকারী তাকে এক এক করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। উক্ত ব্যক্তি যখন মিথ্যাকথা বলে তখন তার রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা গ্রাফে অঙ্কিত হয়ে থাকে।

আমরা পূর্ব্বে যন্ত্রের থিয়োরী সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি সেইটাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সন্দেহভাজন ব্যক্তির হস্তে উক্ত যন্ত্র লাগিয়ে যখন সাধারণভাবে প্রশ্ন করা যায়—'তুমি ত অমুক যায়গায় চাকরী কর'? তোমার ত এতগুলি ছেলেপুলে? তোমার বাবা ত অমুক সালে মারা গেছেন?—তখন সে এগুলির বেশ চটপট জবাব দেয়। কিন্তু যখন তাকে প্রত্যক্ষভাবে তার অপরাধ সংক্রান্ত প্রশ্ন করা যায়—'বুধবারের রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?

—'হরিবিলাসের সঙ্গে তোমার কতদিনের জানাশোনা?

'—যে লেখা তোমার কাছে পাওয়া গেছে সেটা কার?

তাহলে সে ভেবেচিন্তে, ঢোঁক গিলে, আমতা-আমতা ভাবে হ্যাঁ—না করে জবাব দেবে। এতে তার রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং সেটাই অমনি গ্রাফে উঠে যায়। শুধু তাই নয়, এতে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস এবং নাড়ীর গতিরও পরিবর্ত্তন ঘটে। বাইরে সে যতই স্বাভাবিক ভাব দেখাতে চেষ্টা করুক না, যতই সে তার মনের ভাব চাপুক না কেন, তার রক্তের চাপ কিছুই বরদাস্ত করবে না—তা ঠিক বৃদ্ধি পাবে। এবং তাই দেখেই পুলিশের লোক তাকে আরও জেরা করে স্বীকারোক্তি আদায় করতে সক্ষম হবে।

আমেরিকায় শতকরা ৭৫টি ব্যাপারে আসামীকে গ্রাফের ঐ তারতম্যের কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতেই স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় এবং অপর ২৫টি ব্যাপারে ঐ গ্রাফের তারতম্যের দ্বারা সন্ধান প্রাপ্ত হয়ে জেরা করে স্বীকারোক্তি আদায় করে নেওয়া হয়। পনেরো শত ব্যাপারের মধ্যে উক্ত পলিগ্রাফ পরীক্ষায় একটিতেও অসাফল্য দেখা দেয় নি।

সাইকো-গ্যাল্‌ভানোমিটার (Psycho-galvanometer) ঐ রকম আর একটি মিথ্যাবাদী সনাক্ত করণের যন্ত্র। এর আবিষ্কর্ত্তা হচ্ছেন Fordhem বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাদার ডব্লিউ, জি, সামার্স। ঘর্ম্ম নির্গমনের গ্ল্যাণ্ডগুলি কর্ত্তৃক এতে আসামীর মিথ্যাভাষণ ধরা পড়ে। এর ব্যাপারটা আর কিছুই নয়:—সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে একটি ধাতুদণ্ড ধরতে দেওয়া হয় এবং একটা ড্রাই-ব্যাটারী থেকে খুব সূক্ষ্ম কারেণ্ট তার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তাকে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যদি সে সত্য কথা বলে ত তাহলে কিছুই হবে না। কিন্তু যদি সে মিথ্যাকথা বলে ত স্নায়ুমণ্ডলীর অধিকতর উত্তেজনা বশতঃ ঘর্ম্ম-নির্গমনের গ্ল্যাণ্ডগুলিও উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তজ্জন্য অধিক ঘর্ম্ম নির্গত হয়। এই ঘর্ম্ম তার দেহে প্রবিষ্ট কারেণ্টকে প্রতিহত করে এবং এইটাই গ্যাল্‌ভানোমিটারের কাঁটায় ধরা পড়ে।

ফাদার সামার্স উক্ত যন্ত্র দ্বারা একবার একটি অতি সামান্য ঘটনা পরীক্ষা করেছিলেন। মিঃ রবিন্সন্ নামে একব্যক্তিকে ফাদার সামার্স কতকগুলি তাসের মধ্যে থেকে একখানি তাস মনোনীত করতে বলেন। উক্ত ব্যক্তি তাস মনোনীত করবার পর ফাদার সামার্স তাঁকে যে তাসখানি তিনি মনোনীত করেছিলেন সেইখানি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, ঐখানি তিনি মনোনীত করেছিলেন কি'না? মিঃ রবিন্সন্ মিথ্যাভাষণ দ্বারা সেটা অস্বীকার করেন কিন্তু উক্ত যন্ত্রদ্বারা তাঁর মিথ্যাভাষণ ধরা পড়ে যায়। ফাদার সামার্স তখন মন্তব্য করেন যে সামান্য তাসের ব্যাপারে যে মিথ্যাভাষণ ধরা পড়ে, বড় বড় অপরাধের ক্ষেত্রে তা যে ধরা পড়বে এ আর বিচিত্র কি। উক্ত যন্ত্রের সঙ্গে ফটোতোলার সরঞ্জাম লাগানো থাকলে গ্যাল্ভানোমিটারের রিডিং-এর ফটো পর্য্যন্ত উঠে যায়। তাতে অনুসন্ধান-কারীর অবসব সময়ে গবেষণাব সুবিধা হয়।

মিথ্যাবাদীদের সনাক্ত করণের জন্য আব একটা অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে যাব নাম হ'ল "ট্রুথ সিরাম"। এই আশ্চর্য্যজনক সিরাম যদি সন্দেহজনক ব্যক্তির দেহে ইন্জেক্ট করিয়ে দেওয়া যাব ত সেটা তার মগজে গিয়ে আশ্চর্য্যজনক কাজ করে যাতে করে তাব স্মরণ শক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্শক্তি প্রভৃতি সমস্ত বজায় থাকে কিন্তু মিথ্যাকথা বলবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। সেইরকম অবস্থায় যদি তাকে কোন বিষয়ে জেরা করা যায় ত সে সত্য ঘটনা বিবৃত করতে বাধ্য হবে। এসম্পর্কে একটি চমৎকার ব্যাপার ঘটেছিল। কর্ণেল্ সি, এইচ্, গডার্ড অপরাধ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি; তিনি একবার তাঁর একজন সহচরকে ২০টি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করতে বলেছিলেন। উত্তরদাতা তাই করবার পর তাঁর দেহে উক্ত সিরাম ইন্জেক্ট করে পুনরায় তাঁকে ঐ প্রশ্নগুলির জবাব দিতে বলেন। এবারে দেখা গেল যে, পূর্ব্বেকার জবাবের সঙ্গে বর্ত্তমান জবাবের ১৯টি মিলেছে কিন্তু একটি মিলছে না। খানিকক্ষণ বাদে ইন্জেক্সনের প্রভাব অতিক্রমিত হবার পর তাঁকে যখন এবম্বিধ পার্থক্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হল তিনি বললেন যে, পূর্ব্বে ব্যাপারটি তাঁর মনেই ছিল না, কিন্তু সিরাম ইন্জেক্টেড্ হবার পর সে বিষয়টা তাঁর মনে এসেছে এবং সেইজন্যই প্রথমবাবের জবারের সঙ্গে দ্বিতীয় বারেব জবাব মেলেনি।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে এই সিরামের অদ্ভুত গুণাগুণ বোধগম্য হবে। এই সিরাম রহস্য-উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর কাজ দিচ্ছে। কিন্তু এই সিরাম ব্যবহার করা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, দক্ষ লোকের হাতে না পড়লে অনর্থ সৃষ্টি করতে পারে।

য়্যাস্‌বেস্‌টস্‌ সিমেণ্ট—

অনেক জিনিস জুড়িবার জন্য এমন আঠা বা সিমেণ্টের দরকার, যাহা অধিক উত্তাপেও নষ্ট হয় না। প্রধানতঃ সোডিয়াম সিলিকেটের সহিত (Sodium Silicate) য়্যাস্‌বেস্‌টসের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া এই সিমেণ্ট তৈরী করা যায়। সোডিয়াম সিলিকেটকে আন্দাজমত তরল সলিউসান করিয়া লইতে হয়। তারপর তাহার সহিত য়্যাস্‌বেস্‌টসের সূক্ষ্ম চূর্ণ মিশ্রিত করিলেই সিমেণ্ট তৈয়ারী হইল। এই সিমেণ্ট্‌ জল লাগিয়া নষ্ট হইতে পারে। সেইজন্য ইহার সহিত ক্যালসিয়াম্‌ ক্লোরাইড্‌ সলিউসান মিশাইতে হয়। তাহা হইলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্যাল্‌সিয়াম্‌ সিলিকেট্‌ গঠিত হইয়া যায়। উহা জলে দ্রব হয় না,—অথচ খুব আঁটিয়া থাকে।

চীনামাটীর বাসন-কোসন পেয়ালা ও কাচ নির্ম্মিত নানাবিধ পাত্র আজকাল অনেকেই ব্যবহার করেন। ভাঙ্গিয়া গেলে সকলেই তাহা ফেলিয়া দেন। কিন্তু কখনও কখনও ঐসব চীনামাটীর ও কাচের পাত্রগুলি এমন ভাবে ভাঙ্গে যে, তাহাদিগকে ঠিক দাগে দাগে জুড়িয়া লওয়া যায় এবং জোড়া ঠিক হইলে তাহাতে পুনরায় কাজও চলে। এই সকল জিনিস জুড়িবার আঠা এইরূপ হওয়া চাই, যাহা অধিক উত্তাপে অথবা জলে কিম্বা য়্যাসিডে নষ্ট হইবে না। নিম্নে একটী ফরমুলা দেওয়া হইল। উহাতে এমন আঠা তৈয়ারী হইবে যে তাহা খুব গরমে অথবা জলে-য়্যাসিডে নষ্ট হয় না,—এমন কি খুব জোরাল নাইট্রিক য়্যাসিডেও তাহা ঠিক থাকে।

ফরমুলাটি এই;—

য়্যাসবেস্‌টস (Asbestos)	২ ভাগ
বেরিয়াম সালফেট (Barium Sulphate)	৩ ,,
সোডিয়াম সিলিকেট (Sodium Silicate)	২ ,,

আর একটি ফরমূলা দিতেছি,—

সোডিয়াম সিলিকেট্‌ (Sodium Silicate)	২ ভাগ
মিহি বালুকা	১ ,,
য়্যাস্‌বেস্‌টস্‌ পাউডার (Asbestos Powder)	১ ,,

এই শেযোক্ত ফরমূলাটিতে এমন সিমেণ্ট তৈয়ারী হয় যে তাহা গরম য়্যাসিডেও নষ্ট হয় না। এই দুইটি সিমেণ্ট খুব আঁটিয়া ধরিতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। যদি শীঘ্র শীঘ্র আঁট ধরাইতে চান, তবে সোডিয়াম্‌ সিলিকেটের

পরিবর্ত্তে পটাসিয়াম্ সিলিকেট ব্যবহার করিবেন।

সাধারণ আঠা—

নিম্নলিখিত উপকরণ প্রথমতঃ সংগ্রহ করুন,—

আরবী গঁদ	ওজনে	১০০ ভাগ
ষ্টার্চ্চ (Starch)	"	৭৫ "
সাদা চিনি	"	২১ "
কর্পূর	"	৪ "

একটি পাত্রে আরবী গঁদকে জলে গলাইয়া লউন। আর একটি পাত্রে কিছু জলে ষ্টার্চ্চ মিশ্রিত করুন। উভয় পাত্রের তরল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া তাহাতে চিনি ও কর্পূর ভালরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া মিশ্রিত করুন। তারপর এই পাত্রটিকে ফুটন্ত জলের উপর বসাইয়া গরম করিতে থাকুন। লেইয়ের মত হইয়া আসিলে পাত্‌লা থাকিতেই নামাইবেন। ঠাণ্ডা হইলে উহা আরও ঘন হইয়া আসিবে।

মার্ব্বেল, চীনামাটী, প্যারিস্ প্লাষ্টার, পাথর প্রভৃতির তৈয়ারী জিনিস জুড়িবার জন্য চীনদেশীয় লোকেরা "সিয়ো-লায়ো" নামক একটী উৎকৃষ্ট আঠা তৈয়ারী করে। তাহা শিরীষ আঠার তুল্য। নিম্নে তাহার ফরমুলা দেওয়া হইল,—

গুঁড়া চুণ (পাথুরে চুণে জল দেওয়া) ওজনে	৫৪ ভাগ
ফট্‌কিরি চূর্ণ (ওজনে)	৬ "
টাট্‌কা ও ভাল ছাঁকা রক্ত (ওজনে)	৪০ "

এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ নাড়া চাড়া করিলে ক্রমশঃ লেইয়ের মত হইবে। এই অবস্থায় ইহাকে আঠার মত ব্যবহার করা যায়। জলের মত পাতলা

করিয়া ইহাকে বার্ণিশের মত নানাবিধ জিনিসের উপরে লাগাইলে জলে হাওয়ায় জিনিসটী নষ্ট হয় না। ইহা কার্ড্ বোর্ডের উপর দুই তিন কোট মাগাইলে কার্ড বোর্ড কাঠের মত শক্ত হয়। চীনদেশীয় লোকেরা এই "সিয়ো-লায়ো" মশলা দ্বারা তাহাদেব ঘব বাড়ী পেইন্ট করে এবং যে সকল পিপায় তেল ও চর্ব্বি পুরিয়া চালান দেওয়া হয়, সেই সকল পিপাতে এই মশলা মাখায়।

টিনের কৌটায় লেবেল আঁটিবার আঠা

এই আঠা অতি প্রয়োজনীয়। নানাবিধ শিল্পদ্রব্য টিনেব কৌটায় রাখা হয়; সেই সকল কৌটার উপরে লেবেল লাগান দরকার। এমন আঠা ইহাতে ব্যবহার করিতে হয়, যাহা দীর্ঘকাল ভালরূপে আঁটিয়া থাকে। আঠা শুকাইয়া গেলে এবং তাহাতে জলীয় ভাগেব অভাব হইলেই লেবেল খুলিয়া যায়। কাঁচের শিশি বোতলে যে লেবেল লাগান হয়, তাহার আঠাতে জলীয় ভাগ কম থাকিলেও চলে। কিন্তু টিনেব কৌটায় আঁটিবাব আঠা সর্ব্বদা ভিজা ভিজা থাকা চাই;—না হইলে খুলিয়া যায়। এই আঠাকে ভিজা রাখিতে হইলে তাহার সহিত ক্যালসিয়াম্ ক্লোরাইড অথবা গ্লিসিরিণ মিশাইতে হয়। নিম্নে এই প্রকার আঠার কয়েকটী ফবমুলা দেওয়া হইল,—

(১) ট্রাগাকান্থ (Tragacanth) এক আউন্স
য়্যাকাসিয়া (Acacia) ৪ আউন্স
থাইমল (Thymol) ১৪ গ্রেণ
গ্লিসারিণ (Glycerine) ৪ আউন্স
জল—সমস্ত মশলাটীকে ২ পাইন্ট করিবার উপযোগী।

উপরি উক্ত তালিকায় লিখিত ট্রাগাকান্থ ও য়্যাকাসিয়া এই দুইটী গঁদ জাতীয় জিনিস। প্রথমতঃ এই দুইটী জিনিসকে এক পাইন্ট জলে গলাইয়া ছাঁকিয়া লউন। আর একটী পাত্রে গ্লিসারিণের সহিত থাইমল মিশান। তারপর গঁদ সলিউসানের সহিত এই থাইমল যুক্ত গ্লিসারিণ খুব ঝাঁকিয়া ও নাড়িয়া চাড়িয়া মিশ্রিত করুন। এক্ষণে এই পরিমাণ জল মিশাইবেন যেন, সমস্ত মশলাটা দুই পাইন্ট হয়। বোতলে রাখিয়া দিলে, তলায় তলানি জমিবে, জলটা উপরে আলাদা হইয়া উঠিবে। ব্যবহার করিবার সময় একটু ঝাঁকিয়া নিলেই হয়।

(২) রাইয়েব গুঁড়া (Rye flour) ৮ আউন্স
য়্যাকাসিয়া চূর্ণ ১ আউন্স
গ্লিসারিণ ২ আউন্স
লবঙ্গ তৈল (Oil of cloves) ১৪ ফোঁটা

প্রথমতঃ ৮ আউন্স ঠাণ্ডা জলে রাইয়ের গুঁড়া এবং য়্যাকাসিয়া গঁদ উত্তমরূপে মাড়িয়া মিশাইয়া লউন। তারপর ইহাকে চীজ ক্লথের * দ্বারা ছাঁকিয়া লউন। এক্ষণে এই ছাঁকা জিনিসটীর উপর এক পাইন্ট ফুটন্ত গরম জল ঢালুন এবার প্রয়োজনানুরূপ ঘন না হওয়া পর্য্যন্ত উত্তাপ দিতে থাকুন। কিছু ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে গ্লিসারিণ ও লবঙ্গের তৈল মিশ্রিত করুন।

---

* কলিকাতা হগ মার্কেটে চীজ্ বিক্রয় হয়, অনেকেই দেখিয়াছেন। উহা ছানা জাতীয় জিনিস। বাংলা চলতি কথায় উহাকে পনির বলে। এই চীজের জল ঝরাইয়া উহাকে ডেলার মত করিতে একপ্রকার শক্ত কাপড়ের মধ্য দিয়া উহাকে ছাঁকা হয়। সেই কাপড়কে চীজ ক্লথ (Cheese cloth) বলে।

(৩) রাইয়ের গুঁড়া ৫ ভাগ
ভিনিস তার্পিন ১ ভাগ
তরল শিরীষ প্রচুর পাবিমাণ

প্রথমতঃ একটা পাত্রে ঠাণ্ডা জলে শিরীষ গলাইয়া তৈয়ারী করিয়া রাখুন। আর একটা পাত্রে তার্পিনের সহিত রাইয়ের গুঁড়া মাড়িয়া মিশাইয়া লউন। ইহার সহিত পূর্ব্বে প্রস্তুত শিরীষ প্রচুর পরিমাণে মিশাইয়া লেইয়ের মত করুন। এই আঠা আস্তে আস্তে শুকায়।

(৪) ডেক্‌স্‌ট্রিন্ (Dextrine) ৩ পাউণ্ড
সোহাগা (Borax) ২ আউন্স
গ্লুকোজ (Glucose) ৫ ড্রাম
জল ৩ পাইণ্ট ২ আউন্স

জলে গলাইয়া লউন। তারপর উহার সহিত ডেক্সট্রিন্ ও গ্লুকোজ মিশ্রিত করুন। এক্ষণে উত্তাপ দিতে থাকুন। সমস্তটা গলিয়া গেলেই আঠা তৈয়ারী হইল।

(৫) ডেক্‌স্‌ট্রিন (Dextrine) ২ ভাগ
য়্যাসেটিক য়্যাসিড
(Acetic acid) ১ ,,
জল ৫ ,,
৯৫% য়্যালকহল (মদ্য) ১ ,,

ফুটন্ত জলের উপর পাত্র বসাইয়া ডেক্সট্রিন ও য়্যাসেটিক য়্যাসিড জলে গলাইয়া লউন। তারপর উহার সহিত য়্যালকহল (মদ্য) মিশ্রিত করুন।

গত ৮ই আগষ্ট সৈদাবাদে (মুর্শিদাবাদ) বঙ্গেশ্বরী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা এই ব্রাঞ্চ আফিসের এলেকা ভুক্ত হইবে। মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ রাঘবেন্দ্র ব্যানার্জ্জি উহার উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও জনসাধারণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"স্বদেশী বীমা কোম্পানী" একটি প্রিমিয়াম যুক্ত, দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর পলিসি (Single Premium Fatal Accident Policy) প্রচলিত করিয়াছেন। ইহার উর্দ্ধ প্রিমিয়াম ২৮/০ এবং নিম্ন প্রিমিয়াম ১৫৮/০ বয়স বেশী হইলে প্রিমিয়াম কম দিতে হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইবার দরকার হয় না।

গার্জ্জিয়ান অব্ ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতাস্থিত শাখা আফিস ১নং ম্যাঙ্গো লেনের বৃহৎ বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সুরমা উপত্যকা সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। তখন (গত ১২ই সেপ্টেম্বর) আর্য্য ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে এক চা পার্টিতে অভিনন্দিত করেন। সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতির বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন।

ক্যাল্‌কাটা ইন্‌সিওরেন্সের য়্যাসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলার মিঃ বি আর গুপ্ত এম্ এ, এফ্ সি আই আই বীমা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য গত ১৫ই আগষ্ট ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। লণ্ডনের য়্যাকচুয়ারীশিপ্ পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্পও তাঁহার আছে।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের মাদ্রাজ ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মিঃ এস্ এম চৌধুরী হেড্ আফিসের এজেন্সী বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্থলে মিঃ অনন্ত চারীয়ার মাদ্রাজ ব্রাঞ্চের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে "নরউইচ্ ইউনিয়ান" এবং কলিকাতার ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে কার্য্য করিতেন।

"জাতীয় কল্যাণের" জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এস্ এন ব্যানার্জ্জী কিছুকাল পূর্ব্বে আসানসোলের নিকট মোটর দুর্ঘটনার ফলে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, তিনি পুনরায় সুস্থ হইয়া অফিসের কার্য্যে যোগ দিয়াছেন।

মিঃ শৈলেন্দ্র চন্দ্র বর্ম্মন বি, এ, কিছুকাল যাবৎ 'নিউ ইণ্ডিয়া'তে কার্য্য করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ তাঁহাকে উত্তর বঙ্গের অর্গ্যানাইজার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

মিঃ এইচ এন্ আশার, ভারতইন্‌সুরান্সের বোম্বাই ব্রাঞ্চের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। "ভারত" ইন্‌সুর্যান্সের আসাম শাখার সেক্রেটারী মিঃ এস মজুমদার শিবসাগর জেলায় অর্গ্যানাইজিং কার্য্য করিবার জন্য মিঃ এ সি শর্ম্মাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ শর্ম্মা ইতিপূর্ব্বে বম্বে মিউচুয়্যালের স্পেশ্যাল এজেণ্ট ছিলেন। মিঃ কাদেরমল বি এল, এম্ এল এ, ভারত ইন্‌সুর্যান্সের আসাম আফিসে অর্গ্যানাইজার রূপে
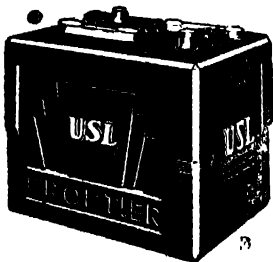
যোগ দিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে 'হিন্দুস্থানে' কার্য্য করিতেন।

আমরা অবগত হইলাম, জাতীয় কল্যাণের ভূতপূর্ব্ব য়্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার মিঃ তেজোময় ঘোষ, সম্প্রতি ইণ্ডিয়া ইকুইটেবিলের এজেন্সী বিভাগেব কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হিন্দু মিউচুয়্যালের উত্তর বঙ্গ অঞ্চলের চীফ অর্গ্যানাইজার মিঃ আর কে সরকার এম এ, ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ার এজেন্সী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ত্রিচীনপলির য়্যাডভোকেট মিঃ জি বঙ্গ স্বামী আয়েঙ্গাব এম্‌ এ এম্‌ এল, ১৯৩৭-৩৮ সালের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ঠাকুব ল-লেকচাবাব" নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি অন্যান্য বিষয়েব সহিত বীমা আইনের ইতিহাস ও নীতি এবং, ভারতে ইহাব বিশেষত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা কবিবেন।

গত ১৬ই আগষ্ট মাদুরা সহবে ওরিয়েণ্ট্যালেব একটী ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে। মাদুরার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ মিঃ এন্‌ চন্দ্রশেখব আয়ার উহাব উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করেন। মাদুরা, রামনাদ ও টিনেভেলী এই তিনটী জেলা উক্ত ব্রাঞ্চ আফিসের এলেকা ভুক্ত হইয়াছে এবং মিঃ এন্‌ সম্পথ আয়েঙ্গাব উহাব ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী হইয়াছেন।

এশিয়া মিউচুয়্যালের চীফ্‌ মেডিকেল অফিসার ডাঃ বি সুব এম্‌, বি; ডি, টি, এম; ডি পি এইচ উচ্চতর শিক্ষালাভেব জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর এবং কর্ম্মচারিগণ গত ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দিয়াছেন।

কাজকারবার বাড়িয়া যাওয়াতে কুষ্টিয়ার নিউ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের হেড আফিস্‌ কুষ্টিয়া হইতে ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

গত ২২শে আগষ্ট নিউ এশিয়াটিকের ঢাকা ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে। তদুপলক্ষে তথায় ঢাকাব বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী মিঃ জে সি সেন অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ানের অন্যতম ডিরেক্টব মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি হুগলী উত্তর পূর্ব্ব গ্রাম্য সাধারণ কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাব প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ইন্‌সুর‍্যান্স এণ্ড ফাইনান্স রিভিউর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ কে কে নন্দী ভাবত ইন্‌সুর‍্যান্সের আশানসোল শাখার ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ ইউ, সি ব্যানার্জ্জি সেই ব্রাঞ্চেব এজেন্সী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিঃ এস্‌ কে ঘোষ বি কম্‌, আজমীড় বম্বে মিউচুয়্যালের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তথায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের অর্গ্যানাইজার

হইয়াছেন। মিঃ আই-বি মুখার্জ্জি আজমীড় হইতে বেরেলীতে হিন্দুস্থানের অর্গ্যানাইজার রূপে বদ্‌লী হইয়াছেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর জেমস্ টেইলর ভারত গবর্ণমেণ্টের ম্যাকটিং ফাইনান্স মেম্বার মিঃ নিক্সনের সহিত পরামর্শ করিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, আগামী ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধন বিল উপস্থিত করা হইবে। নূতন ইনস্যুর‍্যান্স বিল সম্পর্কে কিরূপ ডিপজিটের নিয়ম হইবে; তাহাও তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া লাইফ্ য়্যাস্যুর‍্যান্স্ কোম্পানী লিমিটেড্

একত্রিংশ বার্ষিক রিপোর্ট

১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব

বিগত ২৪শে জুন (১৯৩৭) মাদ্রাজ, শম্ভুদাস ষ্ট্রীটে "ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া লাইফ বিল্ডিং" ভবনে (কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিস) ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া লাইফ য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর একত্রিংশ বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। অনারেবল মিঃ এম্ চিদাম্বরম্ চেটীয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নে তাঁহার অভিভাষণের সার মর্ম্ম দেওয়া হইল ;—

চেয়ারম্যানের বক্তৃতা

আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে কোম্পানীর নূতন কারবার বাড়িয়া ৯০ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। প্রিমিয়াম আয় ১৯ লক্ষ টাকার উপরে গিয়াছে এবং পলিসি হোল্ডার ট্রাষ্ট ফাণ্ডে ৮৫ লক্ষ টাকার অধিক জমিয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের হিসাবে দেখা যায়, ১৯৩১ সালের শেষে কোম্পানীর নূতন কারবারের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকারও কম ছিল,—প্রিমিয়াম আয় ছিল ১০ লক্ষ টাকারও নীচে এবং পলিসি হোল্ডার ট্রাষ্ট ফাণ্ড ৫০ লক্ষ টাকাতেও পৌঁছায় নাই। সুতরাং আপনারা দেখিতেছেন, গত ৫ বৎসরের মধ্যে কোম্পানীর সকল দিকেই বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

যদিও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে কারবারের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি আমি যে আশা করিয়াছিলাম, এক কোটী টাকার উপরে উঠিবে,—তাহা পূর্ণ হয় নাই। তবে ইহার একটি যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে। উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতে আমাদের কোম্পানীর যে সকল নূতন ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে, তাহারা পুরা দমে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং এবৎসরে না হইলেও আগামী বৎসরে যে আমাদের কারবারের পরিমাণ এক কোটী টাকা ছাড়াইয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান অনারেবল্
মিঃ চিদাম্বরম্ চেট্টিয়ার।

অনাদায়ী প্রিমিয়ামের দরুণ পলিসি বাতিল হওয়া কমে নাই,—একথা ঠিক বটে, কিন্তু তাহার প্রতিকারও যে সহজে এবং শীঘ্র হয় না তাহাও ঠিক। বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে এই বাধার সম্মুখীন সকলকেই হইতে হয়। আমাদের কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। পলিসি বাতিল হওয়ার দোষ প্রধানতঃ বীমাকারীদের নিজের। এজেন্টগণও ইহার জন্য দায়ী। বীমার প্রস্তাব সংগ্রহ করিবার সময় তাঁহাদের দেখা উচিত, আর্থিক অবস্থায় কার কতদূর কুলায়, তার অতিরিক্ত পরিমাণ যেন সে বীমা না করে। এজেন্ট এবং অর্গ্যানাইজার গণের মারফতে যদি কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বীমাকারীর সংযোগ সর্ব্বদা থাকে, তবে ইহার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে। অনেক এজেন্ট অধিক পরিমাণে কাজ দেখাইয়া সুনাম পাইবার নিমিত্ত অসদুপায়ে ও নানারকম ফন্দিতে বীমা সংগ্রহ করেন। তাঁহাদের ছলনায় ভুলিয়া বীমাকারী পলিসির প্রকৃত সর্ত্তাদি এবং প্রিমিয়াম দিবার নিয়মাবলী সম্যক অবগত হয় না। এই সকল গলদ ম্যাজিকের মত চক্ষুর পলকে সংশোধন করা অসম্ভব। তবে আমাদের আশার কথা এই যে, ডিরেক্টরগণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর আয় কমিয়া যাওয়াতে, তাহাতে আর টাকা লগ্নী করিবার আগ্রহ কোম্পানীর নাই। বর্ত্তমানে সুদের হার অত্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাদের কোম্পানী যে তৎসত্ত্বেও গড় পড়তায় শতকরা ৫ টাকা সুদ অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে, ইহা বিশেষ সন্তোষ জনক। গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর বাজার দর বাড়িয়া যাওয়াতে, কোম্পানীর হিসাবের খাতায় উহার মূল্যের সহিত প্রভেদ ১৯৩৬ সালের শেষে ৩৸০ লক্ষ টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সিকিউরিটীর রকম পরিবর্ত্তনের দ্বারাও কোম্পানীর ২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে।

এই লগ্নী প্রসঙ্গে আমি জানাইতেছি, কলিকাতার বাড়ী গত বৎসর তৈয়ারী শেষ হইয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভাড়া দিবার যোগ্য সমস্ত ঘরে ভাড়াটে আসিয়াছে। গত ২৫শে জানুয়ারী মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুরের দ্বারা উক্ত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কোম্পানীর কলিকাতা আফিস ঐ বাড়ীর ষষ্ঠতলে প্রতিষ্ঠিত আছে। আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, প্রাসাদপুরী কলিকাতায় আমাদের কোম্পানীর বিল্ডিং এর মত বিরাট, সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক অট্টালিকার সংখ্যা অধিক নাই। আপনারা শুনিয়া আরও সুখী হইবেন, ঐ প্রাসাদ নির্ম্মাণে আমাদের কোম্পানীর যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে তাহার উপর শতকরা ৬ টাকা হিসাবে আয় হইতেছে।

সম্প্রতি কোম্পানী বোম্বাই ও মাদ্রাজে বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য নূতন দুইটি জমি কিনিয়াছেন। মাদ্রাজের বর্ত্তমান বাড়ী, হেড্ অফিসের যোগ্য নহে,—একথা অনেকেই বহুদিন হইতে বলিতেছেন। সেইজন্য মাদ্রাজের কালেক্টরের নিকট হইতে এই নূতন জমিটী ক্রয় করা হইয়াছে। বার্ম্মা শেল কোম্পানীর বৃহৎ আফিস বাড়ীর পাশে এবং আইন কলেজের সম্মুখে এই জমি অবস্থিত। এইখানে কোম্পানীর নূতন হেড্ আফিসের বাড়ী তৈয়ারী

করিবার আয়োজন চলিতেছে। ভারতের প্রধান প্রধান নগরে বৃহৎ বাড়ী তৈয়ারী করা, কেবলমাত্র লগ্নীর দিক দিয়াই যে লাভজনক

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার কলিকাতা ডিভিসনের ম্যানেজার—**মিঃ এম, বি, দত্ত।**

তাহা নহে,—উহা কোম্পানীর গৌরব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া কারবার বাড়াইবার সাহায্য করে। কলিকাতার অভিজ্ঞতায় আমরা ইহা বুঝিতে পারিয়াছি।

হিসাবের সারাংশ

(হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে)

আলোচ্য বৎসরে (১৯৩৬ সাল) ১২৩৮৪৬৭৫ টাকা মূল্যের ৮৬০৬টী বীমার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে (পূর্ব্ব বৎসরের বাকী প্রস্তাব সহ) মোট ৯০০৮১৫০ টাকা মূল্যের ৬৩৮৮টী প্রস্তাবের উপর নূতন পলিসি ইস্যু করা হয়। পূর্ব্ব বৎসরে ১১৯০০০০০ টাকা মূল্যের ৮০০৮টী প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছিল, এবং ৮৫৮৮৫০০ টাকা মূল্যের ৫৯৬০টী প্রস্তাবের উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছিল। এই অঙ্ক হইতে দেখা যায় কোম্পানীর কারবার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪১৯৬৫০ টাকা বাড়িয়াছে। আলোচ্য বৎসরে যে সকল পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে, তাহার বার্ষিক প্রিমিয়াম আয় মোট ৪৯৮৪৯৫ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল, ৪৮৪১৩৩ টাকা।

১৯৩৬ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোম্পানীর হিসাবের খাতায় চলতি বীমার পরিমাণ, বোনাস্ সহ মোট ৩৭৪৫৬৮৫৩ টাকা দেখা যায়। ইহার মধ্যে পুনর্ব্বীমার পরিমাণ ৫৩৬২ টাকা।

প্রিমিয়াম বাবতে কোম্পানীর আয় হইয়াছে ২১৫৬২৬৭ টাকা এবং সুদ, ডিভিডেণ্ড ও বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি বাবতে আয় হইয়াছে ৩৪৫০৮৪ টাকা। সিকিউরিটী বিক্রীর দরুণ আয় হইয়াছে ২৭১৬৩২ টাকা।

প্রধান প্রধান কয়েকটী বিষয়ে ব্যয়ের অঙ্ক নিম্নে দেওয়া হইল,—

পলিসির দাবী বাবত	৫১১৫৩৭ টাকা
সারেণ্ডার ও নগদ বোনাস	১৫০৭৫ ,,
ইনকাম ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্স	৫৩২২ ,,
বাড়ী ও আসবাব পত্রাদির মূল্য হ্রাস	১০৪৫৫ ,,
পরিচালনা খরচ	৬৮৭৬৩৮ ,,

কোম্পানীর তহবিলের হিসাব এইরূপ,—

তহবিলের নাম	বৎসরের আরম্ভে টাকা	বৎসরের শেষে টাকা
জীবনবীমা তহবিল		
সাধারণ তহবিল সহ	৬৩৩৬৮০৯	৭৬৬১৮৮৫
পলিসি হোল্ডাস্		
ট্রাষ্ট ফাণ্ড	৭১৭৪৬৯৮	৮৫৭৩৩৯৩
শেয়ার হোল্ডার্স্		
ডিভিডেণ্ড ফাণ্ড	৪৭১০২	৪০৭২৪
	(সুদসহ)	

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৯১৯৬৮৮৩ টাকা। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নে লিখিত হইল,—

ভারতীয় সম্পত্তি মর্টগেজ	১৪৪৩৯৯৪	টাকা
পলিসি বন্ধকী ঋণ	১২৫৫১৪১	,,
গবর্ণমেন্টের নিকট ডিপজিট্	১৬৪৮৭৩	,,
বিবিধ সিকিউরিটী	৩১১১৭৩৬	,,
কোম্পানীর নিজের বাড়ী সম্পত্তি	৬৬৮৪১৩৩	,,

কোম্পানী অতি সত্বরতার সহিত এবং বীমাকারীদের সুবিধাজনক ভাবে সমস্ত পলিসির দাবী মিটাইয়া থাকেন। তাঁহাদের এই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ২৮৮টী মৃত্যুজনিত দাবী এবং ১২৩টী মেয়াদ শেষ জনিত দাবী উত্থাপিত হয়। কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার সময় হইতে এ যাবৎ মোট ৩০৯৯৪৯৬ টাকা, পলিসির দাবী বাবদ দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার কলিকাতাস্থ শাখার ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ দত্ত এবং তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের কার্য্যদক্ষতার অশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রধানতঃ তাঁহাদের চেষ্টাতেই যে বাংলাদেশে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার প্রসার ও প্রতিপত্তি অচির কাল মধ্যে এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ইহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।
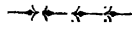
১নং পত্র

মহাশয়,

আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্য" মাসিক পত্রিকায় হস্তপরিচালিত ধান ভানা কল ছোট বড় দুই রকমের সন্ধান পাইলাম। ধান নাড়াই কলেরও চিত্র দেখিলাম। ডাল ও আটা তৈয়ারীর কোন হাণ্ড মেসিন আছে? এবং বলদ দ্বারা চালিত ধান ভানা কল আছে কিনা। উহাদের সচিত্র মূল্য তালিকা থাকিলে ফেরৎ ডাকে পাঠাইয়া সুখী করিবেন। আর সচিত্র মূল্য তালিকা না থাকিলে উপরোক্ত কল গুলির বিস্তারিত বিবরণ ও যথাযথ মূল্যাদি ফেরৎ ডাকে জানাইয়া সুখী করিবেন। উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম। ইতি—

Ekram Ahmad Choudhury
Po. & Vill. Kamdia Dist. Rangpur

১নং পত্রের উত্তর

(ক) হস্ত পরিচালিত ধান ভানা কল গৃহস্থের উপযোগী; অর্থাৎ যাহারা ঢেঁকী ছাটা চাউল খাইতে চান তাঁহাদের পক্ষে বেশ কার্য্যকরী; কিন্তু রোজ দশ সেরের বেশী চাল তৈরী করা কঠিন। ইহা দ্বারা ব্যবসা করা চলে না।

(খ) বলদ চালিত কল দুই একটি দেশী কারখানায় তৈয়ারী হইয়াছিল এবং আমাদের জনৈক গ্রাহক একটি কিনিয়া ছিলেন; কিন্তু তাহার ফল আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই। উহা ব্যবসায়ের উপযোগী নহে; সেইজন্য আর আমরা উহার বিজ্ঞাপন ছাপি না। আপনি ৯।১০ বৎসর পূর্ব্বের ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন দেখিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

(গ) ডাল ভাঙ্গার কল আছে; দাম ৩০৲ টাকা।

(ঘ) আমাদের হস্তচালিত আটা ভাঙ্গা কলের মূল্য ২০৲ টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

২নং পত্র

মহাশয়,

"ব্যবসা বাণিজ্য" আমি সর্ব্বদাই পড়ি, শ্রীহট্টের কোন একটা 'সাপ্তাহিকের' মারফতে। আমি ঐ পত্রিকার সঙ্গে কিছু জড়িত আছি। তাই দু'টা বিষয় লিখিতেছি, আশা করি, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া খবর নিয়া বিস্তারিত বিবরণ জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

Laundry Machine, এবং Condensed Milk এর Plant কোথায় পাওয়া যায়, কত কম দামে কেনা যায়, কারবার করিতে Capital কত লাগে, কি ভাবে চালাইতে হয়, ইত্যাদি খবর ও উপদেশ দিয়া চিরবাধিত করিবেন।

ভবদীয়
শ্রীবিজয় ভূষণ লস্কর চৌধুরী (শ্রীহট্ট)

২নং পত্রের উত্তর

জমাট দুগ্ধ তৈয়ারী সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পুরাতন সেট ২॥০ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া পাঠ করুন,—সমস্তই জানিতে পারিবেন।

Laundry Machine সম্বন্ধে জানিবার নিমিত্ত কলিকাতার Machinery Merchants দের নিকট পত্র লিখুন। তাহাদের অনেকগুলি ফার্ম্মের নাম ঠিকানা এই বৎসরের ব্যবসা ও বাণিজ্যের কয়েক সংখ্যায় বাহির হইয়াছে। Direct Importers দের নিকট চিঠি লিখিলে আপনাকে খুচরা ২।১টি মেসিন দিবে না। তাহা

ছাড়া প্রায় সব Respectable Continental Makers দের এখানে এজেন্ট নিযুক্ত আছে, সুতরাং তাহাদের মারফতে অর্ডার না দিলে মাল দিবে না। ইহাতে অপেনারও অনেক সুবিধা এবং দর ও খরচাও কম পড়িবে।

৩নং পত্র

মহাশয়,

বিগত ১৩৪১ সনে আমি আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম। উক্ত সনের অগ্রহায়ণ মাসে আবর্জ্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান নামীয়, প্রবন্ধে দর্জ্জির দোকানের কাটা কাপড় ও ন্যাকড়া সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আপনার নিকট কিছু জানিতে চাই; আশাকরি যথা সময়ে যথোপযুক্ত সংবাদ ও উপদেশ দানে আমাকে বাধিত করিবেন।

আমি আমার গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে পুরাতন ন্যাকড়া ও দর্জ্জির দোকান হইতে কাটা কাপড় সংগ্রহ করিতে পারি। পয়সা দিয়াই আমাকে এই সকল জিনিষ সংগ্রহ করিতে হইবে। সংগ্রহ করিয়া কোথায় পাঠাইব, কাহারা এই সকল জিনিষ নিয়া থাকে, কি দর দিয়া থাকে, এই সকল কিভাবে ও কি অবস্থায় চালান দেওয়া যায়, এইখানে কি রকম খরচায় সংগ্রহ করিলে আমার মুনাফা হইতে পারে, যেসব কাগজের কল ইহা নিয়া থাকে তাহাদের ঠিকানা ও তাহাদের সহিত আমাকে পরিচিত করাইয়া দিতে পারেন কিনা? সকল বিষয় বিস্তৃত ভাবে আমাকে জানাইবেন।

উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে খবরের কাগজ সংগ্রহ করিলে তাহা আপনি বিক্রি করিয়া দিতে পারেন। যদি কাগজও সংগ্রহ করিতে পারি, কি দরে ইহা বিক্রি করিয়া দিতে পারেন জানাইবেন।

গুলিসূতার কল সম্বন্ধে আপনার পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে উক্ত বিজ্ঞাপন অনুসারে আপনাব নিকট হইতে জানিতে চাই যে আপনাদের বিজ্ঞাপিত কলে যে

সূতা তৈয়ারী হয় তাহা গ্লাসগোর ৯০ নং আলেকজাণ্ডার মার্কা ৯০ নং ৬০ নং তুলনায় দেখিতে ও স্থায়িত্বে কি রকম?—উক্ত আলেকজাণ্ডার গুলিসূতা হইতে পড়তা কি রকম পড়ে, দৈনিক কল চালাইতে খরচা কত, কত গ্রোস প্রত্যহ তৈয়ার হইলে কত মুনাফা থাকে? বিক্রমপুরের মতন জায়গায় একটী কল আনিলে চালাইয়া থাকিতে পারিব কিনা? সকল বিষয় বিস্তৃত ভাবে আমাকে জানাইবেন। চালাইবার পদ্ধতি ও জানাইবেন। বড়বাজারে যে ফেটী সূতা পাওয়া যায় তাহার দর কি কোন দোকানে পাওয়া যায়? কত নম্বর হইতে কত নম্বরের সূতা হয় তাহা জানাইবেন। আশা করি যথাসময়ে আমার পত্রের উত্তর পাব। এতৎসহ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলাম। আর অধিক কি লিখিব। ইতি—

শ্রীউপেন্দ্র লাল সাহা
পোঃ কাজির পাগলা, ঢাকা

৩নং পত্রের উত্তর

আপনি মাত্র ছয় মাসের জন্য অর্দ্ধমূল্য দিয়া আমাদের 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' গ্রাহক হইয়াছিলেন। তারপর আপনাকে চিঠি লেখা সত্বেও টাকা পাঠান নাই, এবং কাগজ নেওয়াও বন্ধ করিয়াছেন।

দরজীর দোকানের ছাঁট কাট এবং গুলি সুতা সম্বন্ধে অনেক বিবরণ ১৩৪২ ও ১৩৪৩ সনের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সালেও তৎসম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা হইতেছে। আপনি আমাদের গ্রাহক থাকিলে, এক্ষণে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইত না। আপনারা সামান্য মূল্য দিয়া আমাদের কাগজখানি কিনিবেন না,—অথচ আমাদের নিকট হইতে এমন সন্ধান চান, যাহাতে আপনি স্বয়ং বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতে পারেন। এমনতর দান খয়রাতিতে আমাদের চলে না। আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য সর্ব্ববিধ পরিশ্রম অকুণ্ঠিত চিত্তে করিয়া থাকি, অপরের জন্য নহে।

৪নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনাদের পত্রিকার গত বৎসর পর্য্যন্ত গ্রাহক ছিলাম। আমি মফঃস্বলে থাকায় আপনাদের ভিঃ পি (এই বৎসরের) ফেরৎ গিয়াছে এবং আমার গাফিলতির দরুণ আর টাকা পাঠান হয় নাই। যাক্ অদ্য আমি সডাক বার্ষিক মূল্য ৫।৶০ m. o. করিয়া পাঠাইলাম দয়া করিয়া এই বৎসরের সমস্ত কাগজগুলি পাঠাইবেন।

আমি আর ১টী বিষয়ের জন্য আপনার নিকট লিখিতেছি আশাকরি সঠিক উত্তরদানে বাধিত করিবেন। গত ১৩৩৪ সালের মাঘ মাসের কাগজে "ছাতার হাতল প্রস্তুত" ব্যবসায়ের একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল এবং তাহাতে উক্ত হাতল প্রস্তুত করার machine এর বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল। আমি উক্ত ছাতার হাতলপ্রস্তুতের machine ১টী কিনিতে চাই—। আপনার কাগজে machine এর যেরূপ বিবরণ বাহির হইয়াছিল সে machineএ কি খুব সন্তোষ জনক কাজ হয়? না ইহা অপেক্ষা উন্নততর কোন machine বাহির হইয়াছে জানাইলে বাধিত হইব। যাহা হউক ছাতার হাতল প্রস্তুতের ১টী up-to-date machine এর দাম কত হইবে এবং আপনারা তাহা আমাকে supply করিতে পারেন কি না জানাইবেন। উক্ত machine কিনিলে উহাতে কিরূপে কাজ করিতে হয় তাহা আপনারা শিখাইয়া দিতে পারিবেন কিনা জানাইবেন। এবং উহা তৈয়ার করা শিখিতে কয় দিন লাগিতে পারে জানাইলে সুখী হইব। আপনাদের উত্তর পাইলে আমি কলিকাতা যাইয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া machine খরিদ করিব। আজকাল হাতল প্রস্তুতের ব্যবসায়ে কিরূপ prospect আছে তাহাও জানাইলে বাধিত হইব। ইতি

শ্রীহীরালাল সেন গুপ্ত
১৭।১ রাধিকা মোহন বসাক লেন, ঢাকা।

৪নং পত্রের উত্তর

ছাতার বাঁট তৈয়ারী করিবার যন্ত্রাদি এমন একটা বৃহৎ ব্যাপার নহে। কুটির শিল্প রূপেই

ইহার চল্‌তি ;—কলিকাতায় আসিয়া আপনি একবার দেখিলে এক সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত শিখিতে পারেন। ছাতার বাঁট যে বাঁশ হইতে তৈয়ারী হয় তাহার মধ্যে প্রথমতঃ উত্তপ্ত বালি পুরিয়া দেওয়া হয়। তারপর তাহাকে একটা গরম লোহার ছাঁচে আস্তে আস্তে চাপিয়া বাঁকাইতে হয়। সেই লোহার ছাঁচ বা বেঁকী যে কোন একজন লোহার মিস্ত্রী বা কামারের দ্বারা তৈয়ারী করা যায়। তারপর বাঁটটীকে ছুরিদ্বারা চাঁচিয়া ছুলিয়া পরিষ্কার করুন ও পালিশ লাগান।

ছাতার বাঁটে অগ্নি শিখার আঁচ লাগাইয়া নক্সার কাজ করিতে হয়। ব্লো-পাইপে ফুঁ দিয়া (যেমন স্যাকরার দোকানে দেখা যায়) অনেকে এই কার্য্য করে। কিন্তু ইহাতে ফুস্ ফুসের পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা। বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে করা যায়।

বাংলাগবর্ণমেণ্টের ডিরেক্টর অব ইন্‌ডাষ্ট্রীজের নিকট চিঠি লিখিলেও এসম্বন্ধে অবগত হইতে পারেন। তাঁহার ঠিকানা,—৭ নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রিট (ন্যাশনাল ইনসুর‍্যান্স বিল্ডিং) কলিকাতা।

আপনার নামে ১৩৪৪ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" ভি পিতে পাঠান হইয়াছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় সেই ভি পি ও পূর্ব্বের মত ফেরৎ আসিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। আপনি নিজে ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু অ-ব্যবসায়ীর মত আপনার ব্যবহার।

৫নং পত্র

মহাশয়;

আপনার পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় মিঃ এ, টি, গাঙ্গুলী সম্পাদিত Indian Soap Journal নামক সাময়িক পত্রের সন্ধান পাইলাম। উক্ত পত্রিকা খানি মাসিক কিনা এবং উহার ঠিকানা ও বার্ষিক মূল্য ব্যবসা ও বাণিজ্যের আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইব। নিবেদন ইতি—

Md. Delowar Hossain
Subscriber's No. 5932

৫নং পত্রের উত্তর

Indian Soap Journal এর ঠিকানা ১০নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা। উহার বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা—আপনার পত্র সম্পাদকের নিকট পাঠাইলাম।
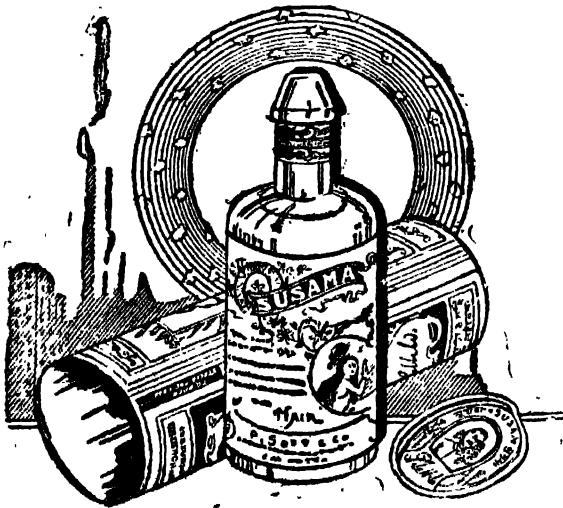
ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৭শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ---১৩৪৪ | ৮ম সংখ্যা

জাপানী প্রতিযোগীতায় ভারতীয় শিল্পের সর্ব্বনাশ।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

বিস্কুট শিল্প

ভারতের বিস্কুট শিল্প কতকটা উন্নতিশীল বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হ'বে না। ভারতীয় কোম্পানীগুলি কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা পুষ্টিকর বিস্কুট উৎপন্ন করছে যা' বিদেশী দ্রব্যের তুলনায় মোটেই নিকৃষ্ট নয়। তাছাড়া, দেশী কোম্পানী গুলি উৎপন্ন বিস্কুটের দাম এমন ধার্য্য করেছে যাতে করে গরীব বড়লোক সবাই কিনতে পারে। এক কথায় বলা যায় যে বিস্কুটের কারবার বেশ ভালই চলছিল, তার একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল ছোট ছোট কারবারী সম্প্রদায়। তারা অস্বাস্থ্যকর উপায়ে এবং বিনা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে বড় বড় কোম্পানীগুলির বিস্কুটের নকল করে বাজারে মাল বিক্রয় করতে সমর্থ হচ্ছিল এবং তাদের যন্ত্রপাতি না থাকার দরুণ ও 'এস্ট্যাব্-লিস্মেন্ট' খরচ নামমাত্র হওয়ার দরুণ তারা বাজারে অপেক্ষাকৃত সস্তায় মাল দিচ্ছিল। এতে বিস্কুট কোম্পানীগুলির ক্ষতি হয়েছে।

এ ছাড়া বিস্কুট কোম্পানীগুলির উন্নতির পক্ষে আর কোন বাধা ছিল না। তাদের কাঁচা মালের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয় না। বিস্কুট তৈরী করতে যে ময়দা, চিনি ও ভেজিটেবল্ তৈলের দরকার তা' ভারতেই পাওয়া যায়। সস্তা মজুরেরও অভাব নেই মোটেই কিন্তু শিক্ষিত বিচক্ষণ শ্রমিক পাওয়া একটু শক্ত।

কিন্তু সম্প্রতি বিস্কুট শিল্পের উন্নতির পথে ভয়ঙ্কর প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে, কারণ, জাপান থেকে এবং কতক পরিমাণে চীন থেকে এদেশে সস্তা বিস্কুট আমদানী হ'তে সুরু হয়েছে। জাপানী প্রতিযোগীতা অন্যান্য শিল্পের যেমন ক্ষতি করেছে, বিস্কুট শিল্পটিকেও তেমনি ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। নিম্নের দরের তারতম্য থেকে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার হ'বে।

	জাপানী মরিনাগা	জাপানী মেইজী	দেশী
১নং টিনমেরী	৭॥ ডজন	—	১১ টাকা
২নং ,,	১৩। ,,	১৩৲ ডজন	১৮ ,,
১নং ক্রিম বিস্কুট	৯৲ ,,	৯৲ ,,	১২॥ ,,
২নং ,,	১৫৲ ,,	১৫৲ ,,	২১॥ ,,

উপরোক্ত দর সমূহ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হ'বে যে জাপান যে দরে বিস্কুট ছাড়ছে তাতে দেশী শিল্পটির থাকা কষ্টকর হ'য়ে পড়ছে। সুতরাং ভারতীয় বিস্কুট শিল্পকে দস্তুরমত প্রোটেক্‌শন্ দেওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় বিস্কুট শিল্পকে যদি যথাযথ প্রোটেক্‌সন্ দেওয়া যায় তাহ'লে তা যে বিদেশীয় অপরাপর শিল্পের সমান পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এবং তা হ'লে দেশের বহু লোক তাতে কাজ পাবে ও কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের পথও সুগম হ'বে।

নিম্নে আমাদের দেশীয় বিস্কুট শিল্প সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য দেওয়া গেল—এগুলি চেম্বারের মেমোরেণ্ডাম থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

বিস্কুট শিল্প ভারতের সমস্ত যায়গায়ই ছড়িয়ে আছে। কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজ প্রদেশে এর বৃহৎ বৃহৎ কারখানা বর্ত্তমান। বিস্কুটের বাজার ভারতের সর্ব্বব্যাপী।

ভারতে ১৯৩৪-৩৫ সালে ৯,৬০,০০০ টাকার বিস্কুট উৎপাদন হয়েছিল; ১৯৩৫-৩৬ সালে তা' ১০,২০,০০০ টাকায় দাঁড়ায়, ১৯৩৬-৩৭ সালে তা' ১১,৭০,০০০ টাকায় ওঠে। ভারতের ২টি কারখানার বাৎসরিক সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন শক্তির পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা।

জাপান থেকে মরিনাগা কোম্পানী ও মেইজী কোম্পানীই প্রধানতঃ বহুল পরিমাণে ভারতে বিস্কুট রপ্তানী করে। ভাবতের বিস্কুট শিল্পে কি পরিমাণ মোট মূলধন খাটছে তা' সঠিক জানা যায় নাই তবে বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত বিস্কুট কোম্পানীতে ১২ লক্ষ টাকার মূলধন নিয়োজিত আছে।

সমগ্র ভারতের বিস্কুট কারখানায় কত সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত আছে তা' উক্ত মেমোরেণ্ডাম থেকে জানা যায় না, তবে পূর্ব্বোলিখিত বাংলার বিস্কুটের কারখানায় ৪ শত থেকে ৫ শত সাধারণ মজুর কাজ করে—

ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক অথবা পাঠকদিগের মধ্যে যদি কাহারও কোনও জিনিষ বেচিবার বা কিনিবার দরকার থাকে, তবে তাহা আমাদিগকে জানাইলে আমরা বিনামূল্যে আমাদের "ব্যবসায়ের সন্ধান" নামক অধ্যায়ে তাহা আমূল প্রকাশ করিব। এজন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোনও চার্জ্জ লইব না। নাম, ধাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং চিঠি পত্রাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন।

সম্পাদক

তারা মাসিক প্রায় সাত হাজার টাকা মজুরী পায়। উক্ত কারখানাতেই সাধারণ শ্রমিক ছাড়া ১০০ থেকে ১৫০ দক্ষ শ্রমিক কাজ করে—মজুরী বাবদ তারা মাসিক প্রায় ৩০০০ টাকা পায়। ওদের ওপরে ইঞ্জিনিয়ার ম্যানেজার ইত্যাদি রূপে ১২ জন তত্ত্বাবধায়ক আছেন—তাঁরা মাসিক ৪ হাজার টাকা মজুরী পেয়ে থাকেন।

উক্ত কারখানায় প্রস্তুত বিস্কুটের পাউণ্ড প্রতি উৎপাদন খরচা পড়ে ৫ আনা থেকে ৬ আনা। অবশ্য এর মধ্যে কারবারের ঝড়তি পড়তি, মূলধনের সুদ এবং লাভ ইত্যাদি ধরা হয় নি। উক্ত কোম্পানীর কারবারের ঝড়তি পড়তির হিসাব শতকরা ১০৲ টাকা ধরা হয়েছে এবং বাৎসরিক লাভ মোট নিযুক্ত মূলধনের শতকরা প্রায় ৫৲ টাকা ধার্য্য হয়েছে।

এদেশে কোন উল্লেখযোগ্য বিস্কুটের কারখানা স্থাপন করতে গেলে ৬ লক্ষ টাকার মূলধন আবশ্যক এবং তার বাৎসরিক উৎপাদন বিস্কুটের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। তবে এটুকু বলা যায় বার্ষিক ৬ থেকে ৮ লক্ষ টাকার বিস্কুট উৎপন্ন হ'তে পারে।

চেম্বারের মতে এদেশের বিস্কুট শিল্পকে রক্ষা করতে গেলে জাপানী বিস্কুটের ওপর শতকরা ৩৩⅓ টাকা শুল্ক ধার্য্য করা আবশ্যক।

ওয়াটার প্রুফ শিল্প

চেম্বার যতদূর অবগত আছেন তাতে তাঁদের হিসাবানুযায়ী ভারতে দু'টি মাত্র ওয়াটার-প্রুফের কারখানা আছে, কিন্তু এ-কারবার সংক্রান্ত তথ্যাদি ও হিসাব ইত্যাদি থেকে মনে হয় যে, ভারতীয় শিল্পকে যদি জাপানী এবং অপরাপর দেশের প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করা যায় তাহ'লে ভারতে আরও কারখানা স্থাপিত হ'বে।

ভারতে যে ওয়াটারপ্রুফ শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা আছে তার কারণ এই যে, এ শিল্প ব্যবহৃত কাঁচা মালের জন্য বিদেশের ততটা মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয় না; আবশ্যক কাঁচামালের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগই এদেশে পাওয়া যায়। ওয়াটারপ্রুফ শিল্পের কাঁচামালের মধ্যে কাঁচা রবার, সুতী কাপড়, কেমিক্যাল ও সলিউসন ইত্যাদি প্রধান। কাঁচা রবার দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, যার রপ্তানী করেও খানিকটা বাঁচে। তাতে করে দেশীয় রবার বিদেশে রপ্তানী মূল্য অপেক্ষা পাউণ্ড প্রতি এক আনা থেকে ছয় পয়সা সস্তায় পাওয়া যেতে পারে। ভারতে কাপড়ের কলের অভাব নেই, তার থেকে মজবুত সুতী কাপড় সস্তায় লাভ করা যায়। কেমিক্যালের মধ্যে চীনেমাটি, বেরাইটস্, ভালকানাইজড ভেজিটেবল অয়েল, প্যারাফিন, আইরণ অক্সাইড, ট্যাল্‌কম্ প্রভৃতি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় এবং সুবিধা দরে কলিকাতার বাজারে পাওয়া যায়। বাদবাকী যে পরিমাণ কেমিক্যাল বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় তার খরচ মোট ব্যয়ের দশভাগের একভাগেরও কম। রবার সল্‌ভেট-ও কলিকাতার বাজারে সুবিধা দরে মেলে, তবে এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এখানে যে সল্‌ভেট অয়েল গ্যালন পিছু এক শিলিং ৭½ পেন্সে বিক্রীত হয়, বিলাতে তার দর এক শিলিং চার পেন্স মাত্র। কিন্তু ভারতে প্রস্তুত অয়েল ভবিষ্যতে সস্তা দরে বিক্রীত হ'তে পারে। তা'ছাড়া

বর্ষাতির জন্য যে প্রচুর পরিমাণ শিং-এর বোতাম ও পেতলের চাকতি দরকার হয়, সেটাও কলিকাতা এবং ঢাকায় কুটির-শিল্প হিসাবে প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

কাঁচামাল ছাড়া কারখানা চালু করতে গেলে যে বৈদ্যুতিক শক্তি কিংবা কয়লার প্রয়োজন হয় তাও কলিকাতায় সুলভে প্রাপ্তব্য। সাধারণ কিংবা দক্ষ যে কোন প্রকারের শ্রমিকই হোক্ না কেন তা' পাবার পক্ষে কিছুমাত্র বাধা নেই।

এসমস্ত সুবিধা ছাড়াও এটা দেখা যাচ্ছে যে, বর্ষাতি ও রবার ক্লথের চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এই চাহিদা পূরণ করেছে বেশীর ভাগ জাপান। ভারতবর্ষের বিভিন্ন হাসপাতাল সমূহে বহুল পরিমাণ রবার ক্লথ ব্যবহৃত হয়। ভারত সরকারের সেণ্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোর্স একাই বৎসরে ২ থেকে ২॥০ লক্ষ টাকার রবার ক্লথ ক্রয় করেন। সৈন্য বিভাগেও কয়েক লক্ষ টাকার রবার ক্লথ দরকার হয়। বস্তুতঃ একা গভর্ণমেণ্টের যে পরিমাণ মাল প্রয়োজন হয় তাতে কয়েকটি মাঝারি কারখানা বেশ চলে যায়। বাংলার একটি কারখানায় বৎসরে ৪ লক্ষ গজের ওপর রবার ক্লথ উৎপন্ন হয়।

কিন্তু এত সুবিধা থাকলে কি হয়, এক্ষেত্রেও সেই জাপানী আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। জাপানের প্রতিযোগিতার জন্য দেশীয় প্রচেষ্টা প্রসারতা লাভ করতে পারছে না। ভারতে ওয়াটার-প্রুফের কারবার আরম্ভ হয়েছে ১৯৩২ সাল থেকে; তখন জাপানী আমদানী মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। সেই কারণেই তখন এ-বস্তুর ওপর যথাযোগ্য শুল্ক স্থাপনের কোন প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ইয়েনের মূল্যহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জাপানী আমদানী ভারতীয় বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা' ভারতীয় শিল্পের ক্ষতি করেছে। এই ত গেল প্রতিযোগিতার দিক। তাছাড়া ভারতীয় কারবার তত বড় নয়, বৃহৎ কারবার হ'লে এর উৎপাদন খরচ কম হ'ত সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতীয় কোম্পানী দুটি কারবার বৃদ্ধি করতে সাহস পাচ্ছে না। যদি গভর্ণমেণ্ট থেকে তারা কোন স্থায়ী প্রোটেকসন্ পায় তাহ'লে তারা তাদের কারবার বাড়াতে পারে। বর্ত্তমান বাজার অনুযায়ী বৎসরের শেষে অনেক মাল তাদের অবিক্রীত থেকে যায়। ভারতীয় উৎপাদন খরচা অপরাপর বিদেশী উৎপাদন খরচার সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় দাঁড়াতে পারে বটে কিন্তু জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কিছুতেই দাঁড়াতে পারে না। বিদেশী রবার ক্লথের ওপর শতকরা ৩০৲ হারে বর্ত্তমানে শুল্ক ধার্য্য আছে; শুধু বৃটিশ দ্রব্যের ওপর আছে শতকরা ২০৲ হারে। কিন্তু ঐ হার জাপানকে কিছুতেই দাবাতে পারছে না, এক্ষেত্রে ইয়েনের যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস হয়েছে সেই পরিমাণ অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করা আবশ্যক।

দেশীয় ওয়াটার প্রুফ শিল্প সম্পর্কে নিয়ে কতকগুলি তথ্য দেওয়া গেল—তথ্যগুলি বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়াকর্স্ লিঃ কর্ত্তৃক চেম্বারকে প্রদত্ত বিবরণী হ'তে সংগৃহীত হয়েছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতায় এবং ত্রিবাঙ্কুরেই ওয়াটার প্রুফের কারখানা আছে। তন্মধ্যে কলিকাতাস্থ বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্ সর্ব্ব রকম রবারের জিনিষ উৎপাদন করছেন। তা' ছাড়া রবারের জুতার কারখানা

কলিকাতা, বোম্বাই, রেঙ্গুন প্রভৃতি বিভিন্ন যায়গায় স্থাপিত হয়েছে। বাংলা, আসাম, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে রবারের দ্রব্য বেশী কাটে।

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্ লিঃ ১৯৩৪-৩৫ সালে ২,০১,০০০ টাকার মাল উৎপাদন করেছিলেন। ১৯৩৫-৩৬ সালে সেই অঙ্ক '২,২৫,০০০ টাকায় দাঁড়ায় এবং '১৯৩৬-৩৭' সালে তা' ২,৯৫,০০০ টাকায় পরিণত হয়। তবে এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, সাধারণ বাজারের চাহিদা ২ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং ইদানীং জাপানী প্রতিযোগিতার দরুণ উৎপাদনের গতি হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু অঙ্কে যে দেখা যাচ্ছে ১৯৩৫-৩৬ এবং ১৯৩৬-৩৭

উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, তার একমাত্র কারণ গভর্ণমেণ্ট অর্ডার। গভর্ণমেণ্ট প্রতি বছর বহু টাকার মালের অর্ডার দেন; বস্তুতঃ এই গভর্ণমেণ্ট অর্ডারের জন্যই উক্ত দু' সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। বর্ত্তমানে উক্ত কোম্পানীর মাল উৎপাদন করবার সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা ১০ লক্ষ টাকার।

ভারতবর্ষ থেকে কোন রবার ক্লথ কিংবা রবারের জিনিষ পত্র বিদেশে রপ্তানী হয় কিনা তার সঠিক হিসাব জানা যায় না, তবে ভারতে কোন কোন দেশ থেকে কি পরিমাণ ওয়াটার প্রুফ আমদানী হয় তার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

সাল	বিলাত হ'তে আমদানী টাকা	অপরাপর দেশ হ'তে আমদানী টাকা	মোট টাকা
১৯৩১-৩২	১,৪৯,৫০৩	৭,৯৩১	১,৫৭,৪৩৪
১৯৩২-৩৩	২,১০,০৮৪	২৮,৯৩২	২,৩৯,০১৬
১৯৩৩-৩৪	১,৩২,৬৮৭	৪৯,৭৯৯	১,৮২,৪৮৬
১৯৩৪-৩৫	১,৩৮,৭১১	১,০১,৮৩০	২,৪০,৫৪১
১৯৩৫-৩৬	৭৭,৬৫৯	১,১২,৪৯২	১,৯০,১৫১
১৯৩৬-৩৭	...	...	১,১৮,০৯৫

(উক্ত অপরাপর দেশের মধ্যে জাপানই প্রধান)

নিম্নে ভারতে আমদানী রবার ক্লথ ইত্যাদির পরিমাণের তালিকা দেওয়া গেল :—

সাল	বৃটিশ দ্রব্য টাকা	অপরাপর দেশীয় দ্রব্য টাকা	মোট টাকা
১৯৩১-৩২	৯,৬৫,৮৪২	১৩,১৬,৩৪৯	২২,৮২,১৯১
১৯৩২-৩৩	৯,৮২,৬৪৬	১২,২২,৬২০	২২,০৫,২৬৬
১৯৩৩-৩৪	১০,৩৫,৯০৫	১২,১২,১৩৮	২২,৪৮,০৪৩
১৯৩৪-৩৫	১১,৬৭,৪৮৭	১৭,০৬,৮৩৫	২৮,৭৪,৩২২
১৯৩৫-৩৬	১০,৯৫,৯৯৮	১৭,৩৬,৮৪৬	২৮,৩২,৮৪৪
১৯৩৬-৩৭	...	...	২৭,৭০,১৪১

(এক্ষেত্রেও অপরাপর দেশের মধ্যে জাপানই প্রধান)

সারা ভারতে ওয়াটার প্রুফ ও রবার ক্লথ ইত্যাদি উৎপাদন কারবারে কি পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত আছে মেমোরেণ্ডামে তার উল্লেখ নেই, তবে বাংলাদেশে বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস লিমিটেডের কারবারে প্রায় তিন লক্ষ টাকার মূলধন নিয়োজিত আছে। সারা ভারতে ওয়াটার প্রুফ ও রবার ক্লথ শিল্পে কত লোক নিযুক্ত আছে মেমোরেণ্ডামে তার হিসাব নেই, কিন্তু বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কসের হিসাব থেকে জানা যায় যে, তাঁদের কারখানায় ৬০ জন সাধারণ শ্রমিক, ২০০ জন দক্ষ শ্রমিক এবং ৪৫জন টেক্‌নিক্যাল ষ্টাফ্ নিযুক্ত আছে। সাময়িক লোকও প্রায়ই নিযুক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রমিকেরা মজুরী বাবদ বৎসরে ৭ হাজার টাকা লাভ করে; দক্ষ শ্রমিকেরা বৎসরে ৩৬ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পায় এবং টেক্‌নিক্যাল ষ্টাফ্ সাড়ে বারো হাজার টাকা মাহিয়ানা বাবদ পেয়ে থাকে (এই টেক্‌নিক্যাল ষ্টাফে বহু সংখ্যক 'টেম্‌পোরারি' লোক নিযুক্ত থাকে)।

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্ এ বিভিন্ন রকমের রবারের দ্রব্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকে। সবচেয়ে কম দরের ওয়াটার প্রুফ এর উৎপাদন খরচা হ'ল ২।০। অবশ্য এর মধ্যে কারবারের বাড়তি পড়তি, মূলধনের সুদ ও লাভের পরিমাণ ধরা হয় নি। বাড়তি পড়তি, সুদ ও লাভের অঙ্ক দফায় প্রতি দ্রব্য পিছু তিন আনা করে ধরা হয়, সুতরাং কারখানার বিক্রয় মূল্য হচ্ছে প্রতি মাল পিছু ২।৶০ আনা। বাজারে আবার সেই জিনিষটা শতকরা ৩০ টাকা উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়।

কিন্তু জাপানী মাল প্রতেকটি পাইকারী দরে কলিকাতার বাজারে ১৷৷০ টাকা করে বিক্রীত হয়—ওরই মধ্যে আবার শত করা ৩০ টাকা হারে ডিউটি ধার্য্য থাকে। বিলাতি কিংবা ইউরোপীয় অনুরূপ দ্রব্যের প্রত্যেকটির পাইকারী মূল্য হচ্ছে ৩৷৷০ টাকা—যথাক্রমে শতকরা ২০ টাকা এবং ৩০ টাকা ডিউটি এরই মধ্যে ধরা আছে,।

সুতরাং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, জাপানী প্রতিযোগিতার কাছে দিশী শিল্প মোটেই দাঁড়াতে পারছে না। দেশী দ্রব্যের যেখানে উৎপাদন খরচা ২।৶০ আনা, জাপানী পাইকারী বিক্রয় মূল্য (ডিউটি সমেত) হচ্ছে ১৷৷০ টাকা। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের উচিত এ শিল্পটিকে রক্ষা করা। ইয়েনের মূল্য যে পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে সেই পরিমাণ অতিরিক্ত ডিউটি স্থাপনই এক্ষেত্রে কার্য্যকরী। ডিউটি ধার্য্য করবার পক্ষে গভর্ণমেণ্টের একমাত্র আপত্তি এই থাকতে পারে যে তাতে গরীব ক্রেতাদের ওপর চাপ পড়বে। কিন্তু রেন-কোট, ওয়াটার প্রুফ ইত্যাদি একটু অবস্থাপন্ন লোকেই কেনে, সুতরাং চাপ পড়বার প্রশ্ন এখানে ওঠেই না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ভারতের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

উৎপাদনের আর একটা দিক হচ্ছে শ্রম শক্তি। এই শ্রম শক্তিটাই হচ্ছে উৎপাদনের আসল সাহায্যকারী। মূলধন না হ'লে চলে কিন্তু শ্রমশক্তি না হ'লে চলে না। অতীতযুগে এমন অনেকদিন কেটে গেছে যখন মূলধনের নামও কেউ শোনে নি, কিন্তু লোক শুধুমাত্র শ্রমের সাহায্যে তার আহার্য্য জুটিয়ে নিয়েছে। সুতরাং শ্রমশক্তি উপেক্ষা করার বস্তু নয়।

অথচ আমাদের দেশে শ্রম শক্তিটাই বেশী রকম উপেক্ষিত হয়ে থাকে। পূর্ব্বেই বলেছি যে এই শ্রমশক্তি থেকেই মূলধনের উৎপত্তি; মূলধন থেকে কখনো শ্রমশক্তি উৎপন্ন হ'তে পারে না, মূলধন শ্রমশক্তি ক্রয় করে মাত্র। এ কথা সকল অর্থনীতিবিদ্‌গণই স্বীকার করেন যে শ্রমিকরা যত সচ্ছল অবস্থায় ভাল ভাবে থাকবে তাদের শ্রমশক্তিও তত কার্য্যকরী এবং ফলপ্রসূ (efficient) হয়ে উঠবে এবং সুদক্ষ কার্য্যকরী শ্রমশক্তির দ্বারাই উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু আমাদের শ্রমিকদের অবস্থা কি? তাদের শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, জীবন ধারণের উপযোগী সংস্থানও সব সময় নেই,—সুতরাং কি করে তারা সুদক্ষ ও পারদর্শী হয়ে উঠবে? আর উৎপাদনের একটা প্রধান অঙ্গই যদি এই রকম অসম্পূর্ণ থাকে তবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে কোন ধার দিয়ে? সেইজন্যই আমাদের শ্রমিকদের গড় পড়তা উৎপাদন ও ইউরোপীয় শ্রমিকদের গড় পড়তা উৎপাদনে এত তফাৎ! কিন্তু আমাদের এই ভারতীয় শ্রমিকই সুদক্ষ হ'লে যে অন্য কোন জাতের শ্রমিকের চেয়ে ছোট নয় একথা আমেরিকার হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী শ্রমিকদের দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

আমরা উৎপাদনের দুটো দিকই আলোচনা করলাম, এবং কেন যে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না সেটাও দেখলাম। দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি না পেলে সাধারণের হাতে মূলধন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। তবুও যাঁদের হাতে যেটুকু আছে সেটুকু দিয়ে যদি সবাই শিল্প ব্যাপারে সাহায্য করেন তবে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি বৃদ্ধি পেতে পারবে। এর দ্বারা তিনি যে দেশকে সাহায্য করলেন তা, নয়, বরং নিজেরই উপকার করলেন, কেননা, দেশে যদি শিল্প বাণিজ্য ভাল চলে ত তাঁর চাকরী বা ব্যবসার কোন ক্ষতি হবে না। নইলে একেও শুকিয়ে মরতে হবে।

এই তথ্যটা বুঝেই ভারত, প্রধানতঃ ও বিশেষভাবে কৃষিপ্রধান দেশ হলেও শিল্পকার্য্যের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। কাপড়ের কল সাবানের কারখানা খনি, চা-ব্যবসা প্রভৃতি এবং অনুরূপ আরও শিল্পকার্য্যে দেশীয় যৌথ কোম্পানীগুলি কর্ত্তৃক ১১১ কোটি টাকা এবং বিদেশী কোম্পানীগুলি কর্ত্তৃক ২৩০০ লক্ষ পাউণ্ড বা ৩৪৫ কোটী খাটানো হয়েছে। অপরাপর বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র শিল্পব্যাপারে ঠিক কত টাকা খাটছে তার কোন সঠিক হিসাব

না পেলেও সেটা যে একটা মোটামুটি অঙ্ক একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

এই যে এত টাকা খাটানো হয়েছে, তার মধ্যে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে বেশীর ভাগ মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে বিদেশীর। এই বিদেশী মূলধনটা আমাদের দেশে খাটানো থাকার দরুণ অনেকগুলি টাকা প্রতি বছর দেশ থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। একে যদি প্রতিরোধ করতে হয় তবে যে যে শিল্প বাণিজ্যে উপরোক্ত বিদেশী মূলধন খাটানো আছে, সেই সেই শিল্প বাণিজ্যগুলি আমাদের করতলগত করতে হবে।

ভারতের মজুরীজীবীর সংখ্যা তার লোক সংখ্যার অনুপাতে কম নয়। সমগ্র ভারতবর্ষে মজুরীজীবীর সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ; তন্মধ্যে তিন কোটি দশ লক্ষ লোক কৃষিসংক্রান্ত কাজে মজুরীজীবী হয়ে দিন কাটায়; আড়াই কোটী লোক অন্যান্য ব্যাপারে মজুরী খেটে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভারতে রীতিমত শিল্পফ্যাক্টরীর সংখ্যা কম, সুতরাং ইংরাজীতে যাকে "অর্গানাইজড্ ইণ্ড্রাস্টিজ" বলে, সেই সমস্ত ব্যাপারে নিযুক্ত মজুরীজীবীর সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৫০ লক্ষ। বাদবাকী অন্যান্য ছোট খাটো শিল্পে নিযুক্ত ষাটলক্ষ মজুরী-জীবীর ওপর সরকারী শ্রমিক আইন প্রযোয্য হতে পারে। শিল্প ব্যাপারের যে রকম ক্রমশঃ অগ্রগতি চলেছে তাতে দিন দিন মজুরীজীবীর সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যদি তা' না হয় তবে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেটা সুলক্ষণ নয়।

আমরা মূলতঃ ভারতের দারিদ্র্য সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই উৎপাদনের আলোচনা করেছি কিন্তু এটা আমাদের সর্ব্বদা পরিষ্কার মনে রাখা উচিত যে শুধুমাত্র উৎপাদনের উন্নতি ঘটিয়েই দেশের কিংবা লোকের দারিদ্র্য নিবারণ করা যায় না। দেশের দারিদ্র্য নিবারণ করতে গেলে সেই উৎপাদিত দ্রব্যের সুযোগ্য বণ্টন-ব্যবস্থাও অবলম্বিত হওয়া উচিত। নইলে কোন ফল হবে না। কথাটা শুনতে প্রথমতঃ আশ্চর্য্যজনক বোধ হয় বটে, কিন্তু কথাটা খাঁটি সত্যি। অনেকে হয়ত বিস্মিত হয়ে বলবেন বাঃ, আমার ভাণ্ডারে জিনিস মজুত, তবুও আমার দারিদ্র্য ঘুচবে না—এ কি রকম কথা? এর জবাবে বলা চলে যে হ্যাঁ, যতক্ষণ না কারও পেটে কোন জিনিস পড়ছে ততক্ষণ তার ক্ষুধা মেটে না, তার ভাঁড়ারে যত খাদ্যই সঞ্চিত থাক্ না কেন। একজন সাধারণ লোক দশ মণ ওজনের কোন পাথর তুলতে যত চেষ্টাই করুক না কেন তাতে ফললাভ হয় না, তবুও চেষ্টার ভাণ্ডারে শক্তি যে মজুত ছিল একথা ত কেউ অস্বীকার করবে না।

জাতির জীবনেও ঠিক ঐ একই কথা খাটে। উৎপাদন দ্বারা নয় জাতির ভাণ্ডারে সম্পদ সঞ্চিত হয়ে রইল, কিন্তু সে-সম্পদ যদি ভোগে না আসে ত জাতির পক্ষে তাহলে তাতে কি সুফল ফলবে? যদি সেটা মুষ্টিমেয় লোক ভোগ করে তবে সবার দারিদ্র্য তাতে ঘুচবে না, সুতরাং দারিদ্র্য থেকেই যাবে। কাজেই এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়, সঙ্গে সঙ্গে সে-বস্তু সবাই ভোগ করতে পারে।

কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, লোকের

দারিদ্র্য দূর করতে গেলে তাদের হাতে ক্রয়-ক্ষমতা আনয়ন করবার ব্যবস্থা করা উচিত, কেননা, লোকের হাতে ক্রয়-ক্ষমতা না থাকলে তারা উৎপাদিত বস্তু ভোগ করতে পারবে না। আর উৎপাদিত বস্তু যদি তারা ভোগ করতে না পায় অর্থাৎ উৎপাদিত বস্তুর যদি সুযোগ্য বণ্টন-ব্যবস্থা না হয় তবে ভারতের লোকের দারিদ্র্যও দূর হবে না। সুতরাং লোকের হাতে ক্রয়-ক্ষমতা আনয়ন করতে গেলেই নানারকম শিল্পব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করতে হবে, কেননা, শিল্পবাণিজ্যের প্রসারতা লাভ ঘটলেই টাকার বাজারও তেজী থাকবে এবং চারধারে টাকাটা ঘুরতে পারবে। এই টাকা চারধারে ঘোরা মানেই হল যে বহুৎ লোকের নিকট হাত ফিরি হওয়া—এইটার ব্যবস্থা করাই আশু প্রয়োজন।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্য যদি না বাড়ে তবে চাষীর হাতে টাকা আসেনা এবং তারা কোনও শিল্পজাত দ্রব্যাদি কিনতে সক্ষম হয় না। বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী কৃষি পাটের বাজার নষ্ট হইয়া যাওয়ায় কৃষকের ক্রয় ক্ষমতা একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ও অসম্ভব কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই সমস্যার পূরণ হইল না। উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিবারও ক্ষমতা থাকা চাই এবং সে জন্য কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্য যথাযোগ্য বজায় রাখা চাই। নচেৎ সমস্যার সমাধান হইবে না।

শ্রমিক সমস্যা

যন্ত্রযুগ যত ভাল ফলই প্রদান করুক, তারও যে গোটা কতক অভিশাপ আছে একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। মানব সভ্যতার বুকের ওপর সেগুলো ঠিক পচা ভট্‌ভটে ক্ষতের মত বিরাজমান। এই ক্ষতস্থানকে যতই আমরা চাপা দিতে চেষ্টা করি না কেন, সমাজে তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে ও পড়বে, ফলে, আমাদের মধ্যে এক মারাত্মক আবিলতা প্রবেশ করছে দেখা যায়। সমাজের যাঁরা লক্ষ্মীমন্ত, যাঁরা ধনীর বরপুত্র, তাঁরা হয়ত নাকে কাপড় দিয়ে এ পঙ্কিল-আবিলতার দুর্গন্ধ থেকে দূরে থাকেন, কিন্তু তাঁরা হয়ত ভুলে যান্ যে বেশী দিন এভাবে থাকা সম্ভব নয়। সমাজদেহ যদি সক্রিয় হয় তবে তার এককোণের চামড়ার এতটুকু ঘা সারা দেহকে বিষিয়ে তুলবে, হাতের অসুখ হয়েছে বলে পায়ের যে কোন আশঙ্কা থাকবে না এমন কোন বিধান নেই। তাই সমাজে যদি কোন আবিলতা এসে থাকে ত সব সম্প্রদায়েরই তা' দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

যন্ত্রযুগ একটা আশীর্ব্বাদ নিয়ে এল, সেটা হচ্ছে জাতীয় সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি; কিন্তু তার থেকে পূর্ব্ব-উল্লিখিত যে অভিশাপ দেখা দিল সেটা হচ্ছে শ্রমিক-সমস্যা। ইউরোপে এই সমস্যা ভয়ঙ্কর ভাবে দেখা দিয়েছে, ধনিক ও শ্রমিকের সঙ্ঘর্ষে। সেখানে এই সমস্যা এত বড় হয়ে দেখা দেবার একমাত্র কারণ হ'ল যে ইউরোপ হচ্ছে যন্ত্রযুগের জন্মদাতা। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক দেশ হ'লেও যন্ত্রযুগের প্রভাবকে দূরে রাখতে পারে নি, তাই এখানেও আজ শ্রমিকসমস্যা রীতিমত ভাবে দেখা দিয়েছে। 'কৃষিপ্রধান দেশ ভারত' এই নজীর দেখিয়ে যাঁরা বলেন যে, এখানে পশ্চিমের সমস্যা দেখা দেবে না, তাঁরা হয়ত সঙ্ঘর্ষের ভীষণতার সঠিক কোন ধারণা করতে পারেন না। ভারত যে কৃষিপ্রধান দেশ এটা স্বীকার্য্য, কিন্তু তাই বলে তার মধ্যে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানাদি নেই, এমন কথা কি বলা যায়? বরং সে ক্রমশঃ শিল্পের প্রসারতাকে অঙ্গীভূত করছে, কেননা, আজকের যুগে শুধুমাত্র কৃষি নিয়ে কেন দেশই বাঁচতে পারে না। কেন পারে না সেটাও ভেবে দেখা উচিত। ভারতে যখন বাহিরের কোনও সংঘাত ছিল না তখন ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ ছিল, তাহার ঘরে ঘরে কৃষি সম্পদের শ্রী, সৌন্দর্য্য এবং প্রাচুর্য্যের ছবি ফুটিয়া থাকিত। গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, ক্ষেত ভরা

শস্য এবং ঘরে ঘরে আনন্দের স্রোত সদাই প্রবাহিত থাকিত। পরিধেয় বস্ত্র এবং অঙ্গাবরণাদির জন্য গ্রামে গ্রামে যে কুটীর শিল্প বিদ্যমান ছিল তাহাতেই তাহাদের লজ্জা নিবারণ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব পূরণ হইত। সে ছিল ভারতের Idyllic যুগ, যখন মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালী ছিল সহজ এবং সরল আর জীবনের লক্ষ্য ছিল পরিপূর্ণ আনন্দ! বর্ত্তমান কালের বিলাসিতা-ময় জটীল জীবনযাত্রা এবং তাহার খোরাক জোগাইবার জন্য অর্থোপার্জ্জনের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষায় ভারতকে তখনও দিক্‌ভ্রান্ত এবং মতিচ্ছন্ন করিয়া দেয় নাই।

সুতরাং ভারতবর্ষে ক্রমশঃ শ্রমিকসমস্যা দেখা দেবে ও দিচ্ছে। এখন এ সমস্যার সম্মুখীন হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য, নইলে আমরা যদি এটিকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাই ত আজকের এই সামান্য অসন্তোষের অনির্ব্বাপিত বহ্নি কালক্রমে একদিন প্রবল হুতাশন প্রজ্বলিত ক'রবে। তখন সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে এ পুড়িয়ে ছারখার করে রীতিমত বিশৃঙ্খল অবস্থা টেনে আনতে পারে। তার চেয়ে পূর্ব্ব হ'তে সাবধান হওয়াই ত বুদ্ধিমানের কাজ!

ধনবাদ ও শ্রমমূল্যের এই যে সম্পর্ক, এ ইউরোপ হতে আমদানী। ইউরোপ-এর শ্রমিকেরা আমাদের দেশের শ্রমিকদের চেয়ে ঢের বেশী মজুরী পায়, তবুও তারা তাতে সন্তুষ্ট নয়। আমাদের দেশের মজুররাও তাদের দেখে সব শিখছে, তারাও বর্ত্তমানের মজুরী হারে আর সন্তুষ্ট নয়।

সমাজতন্ত্রবাদীরা শ্রমিকদের কি মজুরী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাঁদের মতবাদ ব্যক্ত করেন। আমাদের দেশের যাঁরা সে মত অনুমোদন করেন না, তাঁরা এ জিনিসটাকে পাস কাটিয়ে যেতে পারেন না। শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড্-ইউনিয়ন স্থাপন করা গভর্ণমেণ্টের আইনানুমোদিত, সুতরাং শ্রমিক নেতারা এই সকল ইউনিয়নের সাহায্যে শ্রমিকদের মধ্যে নিরন্তর শ্রমিকধর্ম্মী মতবাদ প্রচার করিতেছেন। তাতে শ্রমিকদের নিজ নিজ দাবী সম্পর্কে সচেতন হওয়া স্বাভাবিক। তাদের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই তারা ধর্ম্মঘট চালায়; তা' সে-ধর্ম্মঘট বিফলই হোক্ আর সফলই হোক্। ধর্ম্মঘট চালানো গভর্ণমেণ্টের আইন সঙ্গত, শুধু তাই নয়, সাম্যবাদী অর্থনীতিবিদ্‌গণ ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবিদ্‌গণও ধর্ম্মঘট-এর অধিকার স্বীকার করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আইন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করতে সাহায্য করছে। এক্ষেত্রে মালিকরা যদি সে সম্পর্কে উদাসীন থাকেন ত ধর্ম্মঘট বাড়বে বই কমবে না। সরকারী হিসাবে জানা যায় যে ভারতে প্রতি বছর অনেকগুলি করে ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হয়।

এখন আমাদের দেখা দরকার যে ধর্ম্মঘটের দ্বারা কাজের ক্ষতি হয় কিনা। ক্ষতি যে হয় একথা সবকারী রিপোর্টও স্বীকার করে। এই ক্ষতি উভয়তঃ, মালিকদেরও বটে, শ্রমিকদেরও বটে। সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯৩৩ সালের চেয়ে ১৯৩৪ সালে ধর্ম্মঘটে বেশী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। ১৯৩৪ সালে এপ্রিল-জুন মাসে বোম্বাই-এর কাপড়ের কলগুলির ধর্ম্মঘটে ৯০ হাজার শ্রমিক লিপ্ত ছিল এবং

তাতে অনেকগুলি কাজের দিন নষ্ট হয়েছে। উক্ত বছরে ফেব্রুয়ারী হ'তে মে মাস পর্য্যন্ত সোলাপুরের কাপড়ের কলগুলিতে এবং মে থেকে জুলাই মাস পর্য্যন্ত নাগপুরের এম্প্রেস কটন মিলে যে ধর্ম্মঘট হয়েছিল, তাতেও বহু কাজের ক্ষতি হয়েছে। আমেদাবাদেও ৩৩টি মিল ধর্ম্মঘট দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল যদিও তা' বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। এ ত শুধু গেল কাপড়ের কলের ধর্ম্মঘটের হিসাব। এছাড়া লৌহ শিল্প, পাট শিল্প, জাহাজ শিল্প প্রভৃতি আরও কত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেখানেও প্রতি বছর ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। রেলওয়ে একটি বিরাট কাজের যায়গা, সেখানে অসংখ্য শ্রমিক কাজ করে। শ্রমিকদের যত ইউনিয়ন আছে, তার মধ্যে রেল শ্রমিকদের ইউনিয়ন সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তারাও মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মঘট করে এবং ধর্ম্মঘট করবে বলে ভয় দেখায়।

পূর্ব্বেই বলেছি যে এই ধর্ম্মঘটে ক্ষতি উভয়তঃ। মালিকদের কাজের এতে বহুবিধ ব্যাঘাত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত এর প্রভাবে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম ঘটে। শ্রমিকদের যে ক্ষতি হয় তা' অবর্ণনীয়, তবুও স্বেচ্ছায় তারা এই ক্ষতি স্বীকার করবার জন্যই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়।

কথা উঠবে এই যে ক্ষতি, এ কিসের জন্য? এর সমাধান নিহিত আছে ধনিক শ্রমিক সমস্যার মধ্যে। শ্রমিকেরা বলে যে তারা যা' পায় তাতে তাদের কিছুতে চলে না, সুতরাং মজুরী বেশী করা হোক্। মালিকরা এর জবাবে জানায় যে তোমাদের এক একজনকে যে পরিমাণ মজুরী দেওয়া হয়ে থাকে, শিক্ষিত যুবকের মধ্যে অনেকেই তা' রোজগার করতে পারে না। সুতরাং এর বেশী আশা কোরো না। শ্রমিকরা নাছোড়বান্দা, তারা তবু বলে—আমাদের যা' দাও তাতে আমাদের একলার চলে যেতে পারে বটে, কিন্তু পরিবারবর্গকে খাওয়াই কোত্থেকে? মালিকেরা ক্রূর হাসি হেসে জবাব করে—যেখানে তোদের নিবাস, সেই পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকলে ত এর সিকিও রোজগার করতে পারতিস্ না, তখন পরিবার বর্গকে কী খাওয়াতিস্? যা' এখন মজুরী দিই তার বেশী দিলে আমাদের ব্যবসায় হাত পড়বে, সুতরাং আমাদের এর বেশী কিছু দেওয়া সম্ভব হ'বে না।

উভয় পক্ষের এই বাদানুবাদ থেকে আসল ব্যাপার যে কি তা' ধারণা করা মোটেই শক্ত নয়। শ্রমিকের দাবী হ'ল যে তাদের মজুরী বৃদ্ধি কর, কেননা তা' না হ'লে তাদের পরিবার-বর্গের ভরণ পোষণ সম্ভব নয়। মালিকের যুক্তি হ'ল যে তা' করতে গেলে তাদের ব্যবসায়ে হাত পড়ে। সমাজতন্ত্রবাদী এবং শ্রমিক ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের মত হচ্ছে যে মালিক অন্যায় ভাবে শ্রমিককে শোষণ করে তার লাভের অঙ্ক বাড়াচ্ছে। এই যে মত, এ সারা বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং শ', রাসেল' রঁলাঁ, লাস্কি প্রমুখ মনীষীবৃন্দ এর পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। যাঁরা এর বিরুদ্ধ পক্ষ অর্থাৎ যাঁরা মালিকদের পক্ষ সমর্থন করেন, তর্কের খাতিরে তাঁদের যুক্তিই যদি মেনে নেওয়া যায়; তাহ'লেও এটা অবশ্য স্বীকার্য্য যে শ্রমিকরা যাতে পেট ভরে খেতে পরতে পায় এ ব্যবস্থা মালিকদের করা উচিত। এতে শ্রমিকদের যত না সুবিধা হয়,

মালিকদের সুবিধা তার চেয়ে বেশী হয়, কেননা, এতে মালিকেরা বেশী কাজ পায়।

সমাজতন্ত্রবাদীদের কথা ছেড়ে দিলেও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবিদ্‌গণও বিধান দিয়েছেন যে শ্রমিকদের পেট ভরে খাওয়া দরকার, কেননা, তাহ'লে তাদের কার্য্য ক্ষমতা বেশী হ'বে এবং উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পাবে। একজন অশক্ত শ্রমিক একদিনে যতটা জিনিষ উৎপন্ন করতে পারবে, একজন সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম শ্রমিক সেই সময়ের মধ্যে তার চেয়েও বেশী জিনিষ উৎপন্ন করতে পারবে। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মজুরী বেশী দিলেও মালিক লাভবান হচ্ছে।

এ ছাড়া শ্রমিকের কার্য্যক্ষমতা ও কুশলতা বৃদ্ধি করবার আর একটি উপায় হচ্ছে তাদের শিক্ষা ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা। একজন লোক যদি প্রতিদিন কেবল খেটেই যায় এবং কোন অবসর কিংবা আমোদ না পায় তাহ'লে তার মন ত ক্রমে ক্রমে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়বেই। এরই নিরাকরণ কল্পে ট্রেড্ ইউনিয়নিষ্টরা ছুটী এবং অপরাপর গোটা কতক সুবিধা দাবী করে। শিক্ষা যে মানুষের কর্ম্ম কুশলতা বৃদ্ধি করে এবং নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলে, একথা সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবিদ্‌গণেরই অভিমত।

এবার দেখা যাক্,—উপরি লিখিত সুবিধা গুলি শ্রমিকেরা পায় কিনা? তারা পায় না মোটেই, তাই তারা ধর্ম্মঘট চালায়। অথচ সে সুবিধাগুলি যদি তারা পেত, তাহ'লে মালিকের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেত এবং তাতে মালিক লাভবান হ'তে পারত।

বরঞ্চ শ্রমিকদের (সমস্ত শ্রমিকদের না হ'তে পারে) অবস্থা ভেবে দেখলে যন্ত্র যুগ যে কী অভিশাপই বহন করে আনতে পারে তা' সম্যক্ প্রতীয়মান হ'বে। সরকারী বিবরণীর ১৯৩১ ৩২ সালের হিসাব হ'তে জানা যায় যে সমগ্র ভারতে কল কারখানায় কাজ ক'রে ১৫ লক্ষ ৯৬ হাজার শ্রমিক উপজীবিকার সংস্থান করে, তার মধ্যে বাংলা দেশে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার। নিম্নে বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা দেওয়া গেল :—

	সংখ্যা হাজার সমষ্টিতে	
	সমগ্র ভারত	বাংলা
	হাজার	হাজার
কাপড়ের কল	৪১৭	১৮
ইঞ্জিনীয়ারিং	২২১	৭৭
রাসায়নিক কারখানা	৫৫	১৪
কাঠ, পাথর ও কাঁচের কারখানা	৭	৪
মোট—(অন্যান্য কারখানা সহ)	১,৫৯৬	৪৭৮

এই যে হিসাব, এ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ভারতে সম্মিলিত কারবারের হিসাব' সংক্রান্ত পুস্তক হ'তে সংগৃহীত। সম্মিলিত কারবার ছাড়া অন্যান্য কারবারের হিসাব এতে না থাকাই সমীচীন, সুতরাং আরও বহু শ্রমিক যে ভারতে মজুরী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এটা ধারণা করা চলে। তা' ছাড়া, রেলওয়ে ও ডক প্রভৃতির শ্রমিকদিগকে বোধ হয় উক্ত হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি।

এতগুলি শ্রমিকের জীবনযাত্রার যে চিত্র তা' নক্কর জনক ভাবে ভয়াবহ। তাদের

মধ্যে শিক্ষা নেই, সুরুচি নেই, আছে কেবল ব্যভিচারের বেষ্টনী ও অশ্লীল নগ্নতার তাণ্ডব। তারই প্রতিক্রিয়া সাধারণ লোকের জীবনে ধাক্কা মারে। রাস্তায়, পথে ঘাটে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাদের ঐ কুৎসিত জীবনযাত্রার আবহাওয়া আমাদের মধ্যে বিষ বাষ্প ছড়িয়ে দেয়। তাই বলেছিলাম যে যন্ত্রশিল্পের দরুণ সভ্যতার গাত্রে এক পচা ক্ষত দেখা দিয়েছে, আমাদের তাতে ক্ষতি বড় কম হয় না।

এর থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাদের জীবনযাত্রা উন্নত করা। তা' করতে গেলে তাদের মজুরী যদি ন্যায্যমত বাড়িয়ে দেওয়া না হয় ত কি করে তা' সম্ভব হ'বে? তারা যা পায় তাতে তাদের পরিবারবর্গের পেটে খেতে কুলোয় না, সুতরাং কি করে তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। ইউরোপের শ্রমিকদের জীবন যাত্রার একটা তালিকা এঙ্গেলস প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন যে শ্রমিকদের আয়ের সমস্তটাই খাদ্যে ব্যয়িত হয়, তার চেয়ে বেশী আয়ের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই শিক্ষা ও স্বাচ্ছন্দের জন্য কিছুটা ব্যয় করতে সমর্থ হ'ন। এঙ্গেল্‌সের ঐ তালিকা সমাজ-তন্ত্র ব্যবস্থার বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি-বিদ্ সেলিগম্যানও স্বীকার করে নিয়েছেন। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আয় অপেক্ষাকৃত বাড়াইলেই তবে শিক্ষা ও জীবনযাত্রার উন্নতি হ'তে পারে, নইলে শত বক্তৃতা ও উপদেশে কিছুই হ'বে না।

একজন ইউরোপীয় শ্রমিক আমাদের দেশের শ্রমিক অপেক্ষা ঢের বেশী কর্ম্মকুশলী বা Efficient। এর প্রথম কারণ এই যে সেখানকার জলহাওয়া তাদের ঐ রকম হ'য়ে উঠতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে তাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী এখানকার শ্রমিকদের অপেক্ষা অনেক উন্নত, সুতরাং তারা কার্য্যক্ষম ও কুশলী হ'য়ে উঠবার সুযোগ সুবিধা লাভ করে। আমাদের এখানকার শ্রমিকদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও জীবন বৈচিত্র্য কোনটাই নেই বলে তারা এমন অপটু বা Inefficient।

এখন যাঁরা চিন্তাশীল ব্যক্তি ও সমাজহিতৈষী, তাঁদের উচিত শ্রমিকদের উন্নতিবিধান সম্পর্কে চেষ্টিত হওয়া। শ্রমিকদের মধ্যে যাতে শিক্ষার বিস্তার ঘটে তজ্জন্য প্রত্যেক মালিকেরই মিল এলাকার মধ্যে নৈশবিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করা উচিত। এতে করে তাঁরাও লাভবান হবেন। যেহেতু এর দ্বারা শ্রমিকের কার্য্য কুশলতা বৃদ্ধি হেতু তাঁদের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। শ্রমিকদের মধ্যে যাতে সমবায় ঋণ দান সমিতির সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে মালিকদের দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। সমবায় ঋণ সমিতির অভাবেই শ্রমিকেরা কাবুলী ইত্যাদির নিকট হ'তে ঋণ গ্রহণ করে এবং মজুরী পাবামাত্রই তার প্রায় সমস্তটাই ঐ কাবুলী ইত্যাদি সম্প্রদায় আদায় করে নেয়। সুতরাং তারা সেই ভিখারীর মত লক্ষ্মীছাড়ার জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। শ্রমিকদের মধ্যে নৈতিক অধঃপতনের ব্যাপকতা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। এই নৈতিক অধঃপতনের জন্যই ইউরোপীয় মেটেরিয়ালিষ্টিক্ সভ্যতার নামে আধ্যাত্মিক ভারত ভয় পায়। শ্রমিকদের মধ্যে এই নৈতিক অধঃপতন দূরীভূত করতে গেলে শিক্ষা প্রচার ছাড়া আর কি উপায় আছে! এ ছাড়া ট্রেড ইউনিয়নিষ্টরা

যে সমস্ত সুবিধা দাবী করেন সেগুলি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

এই সমস্ত সুবিধা ইত্যাদি প্রদান করে শ্রমিকদের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করার দায়িত্ব হ'ল সরকারের। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার যে কতখানি দায়িত্বপরায়ণ, একথা একমাত্র তাঁরাই বলতে পারেন। সরকার যদি এবিষয়ে মনোযোগ না দেন ত মালিকদেরই সে-সমস্ত ব্যবস্থা করতে হ'বে। তা' যদি তাঁরা না করেন ত শ্রমিকরা সেই অপটু ও লক্ষ্মীছাড়া থেকেইযাবে। তাতে করে উৎপাদনেরই অসুবিধা বেশী, কেননা, উৎপাদন নির্ভর করে শ্রম ও মূলধনের সমন্বয়ে। কর্ম্মকুশল শ্রম না হলে মূলধন কার্য্যকরী হয় না। অপটু শ্রমিকদের দ্বারা কাজ চালানো যায় বটে, কিন্তু তা' লাভজনক হয় না।

মালিকদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে পারেন যে, তাঁরা শ্রমিকদের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সবাই কি করেছেন? যদিও কেউ কেউ করে থাকেন ত সে-ব্যবস্থা কতটুকু?

একথা সহজেই বলা চলে যে শ্রমিকদের উন্নতি সাধন করা উৎপাদনের শ্রীবৃদ্ধি মানসে প্রয়োজন। এর মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের কোন গন্ধ নেই, কেননা, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবিদ্‌গণও এ ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। গভর্ণমেণ্টও এর উপযোগিতা স্বীকার করে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুবিধা দিয়াছেন। সুতরাং মালিকদের কর্ত্তব্য এধারে সচেষ্ট হওয়া। তা' যদি তাঁরা না করেন ত' ট্রেড ইউনিয়নের সাহায্যে শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধর্ম্মঘট চালাবেই এবং তাতে উভয়তঃ ক্ষতি হ'বে।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভলুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে, তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব।

—সম্পাদক

(রায় বাহাদুর অজিতনাথ দাস জে, পি, এম, আর, এ, এস প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

যেখানে কুলীন জাতি
সেখানে কোন্দল

*

নাও, ঘোড়া, নারী
যখন যাব
তখন তারি

*

চ'লে চল্লিশ বুদ্ধি,
না চলে হতবুদ্ধি

*

রূপেয়া আপনা গাঁট মে,
জরু আপনা হাত মে

যেমন বুনো ওল
তেমনি বাঘা তেঁতুল

*

আরসুলাও যেমন পাখী
দারোগাও তেমনি হাকিম

*

নিজের পানে চায়না শালী
পরকে বলে টেরো গালী

*

শঙ্খ কর চুর, বসন কর দূর
তোড়ত গজমতি হার রে
পিয়া যদি তেজল, কি কাজ মম ভূষণে
যমুনা সলিলে সব ডার রে

যেখানে বাঘের ভয়
সেইখানেই রাত হয়

*

এদিক ও দিক ফিরি
সেখানে এসেই মরি

*

গোয়ালা নিজের দৈ
কখনো টক্ বলে না

*

বকাউল্লা ব'কে যায়
সোনা উল্লা শুনে যায়
করিম উল্লা কিছুই করে না

*

গাধা পিটলে ঘোড়া হয় না
আমের গাছে জাম ধরে না

*

দায়ী মুয়াদ্দী রাজী
কী করে আর সরার ‡ কাজী

*

চোরে গেরস্তয় ভাব হ'ল
চৌকিদারই বেকুব ব'ন্‌ল

*

বাক্যের বেলা বৃহস্পতি
কাজের বেলা নাই খাতির
জাত গেছে সে জাতীর

*

কাজের সময় কাজী
কাজ ফুরোলে পাজী

*

কপালে থাকিলে হাড় †
কি করিবে চাচা সাকিদার ‡

‡ সরার=শাস্ত্রের
† হার=অস্থি
‡ সাকিদার=পরিবেশন কারী

নিতে পারি, খেতে পারি, দিতে পারিনে,
বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারিনে,

দিল্লীকা লাড্ডু
যো খায়া ও ভি পস্তায়া
যো না খায়া ও ভি পস্তায়া

*

শিলাজলে ভেসে যায়
বানরে সঙ্গীত গায়
শুনিলেও না হয় প্রত্যয়

*

শিকেই ছিড়ুক আর বাঁকই ভাঙ্গুক
খোঁড়ার পা,— খানাতেই পড়ে

*

যেখানে বাঘের ভয়
সেইখানেতেই সন্ধ্যা হয়

*

হরে কৃষ্ণ হারালে
কবে খাবে তোমায় বেবালে

*

কারুর কিছু হারিয়েছে
মদন গোপাল পালিয়েছে

*

শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর

*

শালুক খেয়ে দাঁত কাল
লোকে বলে আছ ভাল

*

দুঃখে সুখে যায় দিন
ধার করলেই হয় ঋণ

*

আশায় চাষা বাঁচে

*

ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত
তবু না ছাড়ে আপন জাত

*

সিন্নি ও খাবে ভরাও ডুবাবে

*

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে
তার মাহিনা চৌদ্দশিকে

*

বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দেওয়া

*

বামন বাদল বাণ
দক্ষিণা পেলেই যান

*

না ম'রেই ভূত

*

দিন গেল হেলায় ফেলায়
রাত হ'লে সতীনের জ্বালা

*

ভোগের আগে প্রসাদ

*

ছ্যাচো কোটো মুড়ো মাথা
তবু না ছাড়ে বড়াইএর মাথা

*

কপালে নেইকো ঘি
ঠক্ ঠকালে হবে কি

*

জয়দত্তের বেটা আমি
হরিদত্তের নাতি
আমার দুয়ারে বাঁধা
বড় বড় হাতি

যোগ্য আসি মিলিল যোগ্যে

*

গোদের উপর বিষ ফোড়া

*

তুমি খাও ভাড়ে জল
আমি যাই ঘাটে
দেখিয়া তোমার দুঃখ
মোর বুক ফাটে

*

বোঝার উপর শাকের আটি

*

পীরের কাছে মাম্‌দোবাজী চলে না

*

ধামাধরা

*

বাহাত্তুরে

*

ভিজে বেড়াল

*

গয়লার গাই

*

চোরের উপর রাগ ক'রে
ভূঁয়ে ভাত খাওয়া

*

কানু ছাড়া গীত নাই

*

শিমুল ফুল

*

ধোবার গাধা

*

ঘর নেই দোর বাঁধে
মাগ্ নেই ছেলের জন্য কাঁদে

*

ঝোপ বুঝে কোপ মারা

*

চূড়ার উপর ময়ূর পাখা

*

উঠ্‌লো বাই ত কটক যাই

*

হাটের নেড়া হুজুগ চায়

*

আদায় কাঁচকলায়

*

সাপে নেউলে

*

তেলে জলে মিশ খায় না

*

ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়

*

দৈবং ফলতি সর্ব্বত্র
নচ বিদ্যা নচ পৌরষং

*

ষটকর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ

*

কাণা পুতের নানা রোগ

*

কীর্ত্তি যস্য স জীবতি

*

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা

*

যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়

*

চিল পড়লে কুটো না
নিয়ে উঠে না

*

সমুলেন বিনশ্যতি

*

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা

*

গরু তোরে বেচব ?—
না—এখানেও ঘাসজল,
সেখানেও ঘাস জল

*

অন্ধের কিবা রাত্র কিবা দিন

*

ঢেঁড়স ওলটান

*

কই ত ঠক, না কইত বোবা
খাই ত পেট্‌কো, না খাইত রোগা

*

কনের মা কাঁদে, আর
টাকার পুট্‌লি বাঁধে

*

কুঁজোর ইচ্ছা চিৎহ'য়ে শোয়

*

বাঙ্‌লার মাটীর ভবিষ্যৎ

শ্রীযতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ

আজ কাল অনেকেই বলিতেছেন, বাঙ্‌লার মাটির উৎপাদিকা শক্তি দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে। কথাটা সত্য হইলে মারাত্মক বলিতে হইবে। আমাদের সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি যদি পশ্চিমের মত উষর মূর্ত্তি ধারণ করে তবে বাঙ্‌লার বৈশিষ্ট্য আর কিসে অবশিষ্ট রহিল? সুতরাং গ্রাম্য বৃদ্ধগণ যে বলিতেছেন, বাঙ্‌লার উর্ব্বরতা কমিয়া যাইতেছে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া না দিয়া সত্য কি মিথ্যা গভীর ভাবে চিন্তা করা উচিত। কৃষকেরা বলে, আগে ক্ষেতে যত শস্য উৎপন্ন হইত এখন আর তত হয় না। ভদ্র গৃহস্থ বলে, আগে বাগানে যত ফল পাওয়া যাইত এখন আর তত পাওয়া যায় না। আগে প্রতি বৎসর আম্র, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত হইয়া থাকিত, বর্ত্তমানে অবনত হওয়া ত দূরের কথা, গাছের কোথায় এক আধটা ফল লুকাইয়া থাকে তাহা দেখাই যায় না।

আমি এ বিষয়ে গভীর চিন্তার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বাঙ্‌লার মৃত্তিকা সত্য সত্যই ধীরে ধীরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে একটু উষরতা প্রাপ্ত হইতেছে। কেন এরূপ হইতেছে তাহার আলোচনা নিম্নে করিতেছি।

বর্ত্তমানে তিনটী দ্রব্য বাঙ্‌লার মাটীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, যথা—পোড়া মাটী, পাথর ও কয়লা।

পোড়া মাটী বলিতে সচরাচর ইট্ বোঝায় কিন্তু অন্য অনেক প্রকার পোড়া মাটীও যে থাকিতে পারে তাহা সকলেই জানেন। এখানে শুধু ইটের কথাই বলি। ইটের গুঁড়া—রাবিশ ও সুরকী—বাঙ্‌লার কোথায় গিয়া ঠেকে নাই? সুদূর পল্লীর নিভৃত কন্দরে অন্বেষণ করিলেও একখানা ইট্, কিছু রাবিশ বা সুরকীর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইবে। যত পুরাতন, জীর্ণ বাড়ী ভূমিসাৎ হইতেছে, তাহা হইতে যে স্তূপাকার রাবিশ বাহির হইতেছে, সেই সব রাবিশ যাইতেছে কোথা?—হয় রাস্তায় না হয় নিজ নিজ বাগানে। অনেকে বাড়ী সংস্কার কালে রাবিশ ফেলিবার স্থান না পাইয়া সেইগুলি নিজেদের বাগানে, এমন কি ফলবান্ বৃক্ষের তলায় ছড়াইয়া দিতেছে! আবার যে সব রাবিশ পথে ছড়ান হইতেছে তাহা গাড়ীর চাপে ধূলায় পরিণত হইতেছে—এবং সেই সব ধূলা বাতাসে বা বৃষ্টির সাহায্যে আশে পাশের মাঠে ছড়াইয়া পড়িতেছে। মাঠে ও বাগানে সর্ব্বত্রই যখন পোড়া মাটীর আধিক্য তখন বৃক্ষ বা শস্য

সকল কি প্রকারে আশানুরূপ ফল দান করিবে?

তাহার পর পাথরের কথা। রেল কোম্পানী, বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির দ্বারা আমদানীকৃত লক্ষ লক্ষ মণ প্রস্তর খণ্ড প্রতি দিনই বাঙ্‌লার বুকে আসিয়া চাপ দিতেছে। এই সকল পাথরের টুক্‌রাও ঘর্ষিত হইয়া ধূলায় পরিণত হইতেছে, সেই সব ধূলাও বৃষ্টি বা বাতাসের সাহায্যে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাঙ্‌লার সর্ব্বত্র রেল কোম্পানীর ষ্টেশন বসিতেছে—সেই সব ষ্টেশানে আসিবার জন্য মাঠের বুক চিরিয়া চিরিয়া বড় বড় রাস্তা তৈরী হইতেছে এবং তাহাতে যে রাবিশ ও পাথরের টুক্‌রা ঢালা হইতেছে তাহা অল্পে অল্পে মাঠ সকলকে গিলিয়া খাইতেছে। রস শুষিয়া লইবার ক্ষমতা পাথরের অত্যন্ত অধিক, এই সব পাথরের ধূলা যে গাছের গোড়ায় থাকিবে সেই গাছকে আর রস সংগ্রহ করিতে হইবে না, তাহার দফা রফা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এইবার কয়লার কথা বলি। কয়লা মূল্যবান পদার্থ, ইহাকে কেহ পথে বা বাগানে ছড়াইবেনা বটে কিন্তু ইহার 'দ্বিজ' মূর্ত্তি ছাইএর ত আর কোন মূল্য নাই, ইহা প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট 'দূর ছাই!' এই ছাই গুলিও বাঙ্‌লার মাটীকে দিন দিন কাবু করিয়া দিতেছে। রাবিশের বরঞ্চ কদর বা সার্থকতা আছে কিন্তু ছাইয়ের সার্থকতা আদৌ নাই। কেহ লইবে না, এমন কি রাস্তায় ছাই ফেলিলে 'ফাইন' হইয়া যাইবে। অথচ প্রত্যেক গৃহস্থের উনুন হইতে প্রতিদিন যে কয়লার ছাই বহির্গত হয় তাহার পরিমাণ বড় কম নহে। আজ কাল কয়লার রান্না রেল কোম্পানীর প্রসাদে বাঙ্‌লার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে যেখানে রেলের যোগাযোগ নাই সেখানে আজও কাঠে রান্না হইতেছে সত্য, কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন থাকবে না; অল্প দিনের মধ্যেই বাঙ্‌লার ধনী দরিদ্র প্রতি গৃহস্থকেই কয়লা ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং মাসে মাসে যে স্তূপাকার ছাই হইতেছে এবং পরে আরো হইবে তাহা যাইবে কোথা? তাহা ত উড়িয়া উধাও হইয়া যাইবে না, বাঙ্‌লারই আশে পাশে থাকিয়া বাঙ্‌লার মাটীর সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। এখন রাবিশ বা ছাই বা ইঞ্জিনের পোড়া কয়লার আধিক্য এত হইয়াছে যে এখন যে কোন বড় বড় জলাশয়কে বোজান হইতেছে তাহা ঐ রাবিশ প্রভৃতির সাহায্যে। এই সকল স্থানে ভবিষ্যতে যে বাগান রচনা করিবে সে যে কিরূপ ফল ভোগ করিবে তাহা এখন হইতেই বোঝা যাইতেছে।

যদি ইট্‌ পাথর কয়লার দ্বারা বাঙ্‌লার মাটীর এত অপকার হইতেছে তবে কি উহারা বাঙ্‌লার আপদ? আমি তাহা বলিতেছি না। উহারা ত আপদ নয়ই, পরন্তু বাঙ্‌লার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। সুতরাং উহাদিগকে তাড়াইবার চিন্তা না করিয়াই বাঙ্‌লার মাটীকে আত্মরক্ষার চিন্তা করিতে হইবে। কতকটা আইনের সাহায্য লইয়া এবং কতকটা বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া বাঙ্‌লার মাটী যদি আত্মরক্ষা করিতে পারে তবেই তাহার কবিজন বন্দিত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে নচেৎ তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

আবার সম্প্রতি, আর একটা কারণে বাঙ্‌লার মাটীর উর্ব্বরতা নষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়া আমার মনে হয়। পূর্ব্বে শীতকালে প্রায় প্রতি পল্লীতে পুষ্করিণী খনন, বা সংস্কারের ধূম পড়িয়া যাইত। ইহাতে মাটী কতকটা ওলোট পালোট

হইবার সম্ভাবনা থাকিত। একটা বড় পুকুর কাটিবার সময় যে মাটী ওঠে তাহার দ্বারা অনেকেই পূর্ব্বে উপকৃত হইত। উৎখাত মাটী রাখিবার স্থান না থাকায়, যে ব্যক্তি পুষ্করিণী খনন করিত তাহাকে যে অনুরোধ করিত তাহারই বাগানে সে মাটী ছড়াইয়া দিত। ইহাতে কত বাগানের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইত! এইরূপে প্রতি বৎসর প্রায় প্রতি পল্লীতে গোটা কতক পুকুরের সংস্কার ও দুই একটা পুকুর খননের জন্য বাঙ্‌লার মাটী অনেক পরিমাণে উর্ব্বরতা রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু এখন? টিউব্‌ ওয়েল্‌ বা নলকূপ সে পথ বন্ধ করিয়া দিতেছে। নূতন পুকুর খনন করাত দূরের কথা, কেহ আর পুরাতন পুকুর সংস্কার করিতে চাহিতেছে না। কেন করিবে? পুকুরের দুইটা সার্থকতা—জল ও মাছ। নলকূপে যে জল পাওয়া যায় তাহা পুকুরের জল অপেক্ষা পবিত্র। এবং নদী ও সমুদ্রের মাছ বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে যাইয়া পৌঁছিতেছে—এ অবস্থায় পুকুরের ভালমন্দ কে ভাবিতে চায়? এখন আমাদের মনোভাব এই—পুকুর থাকে থাক্‌, যায় যাক্‌ একটা নলকূপ চাই।

এইরূপে নানাদিক দিয়া বাঙ্‌লার মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যাইতেছে। একে ত কৃষকেরা দারিদ্র্যবশতঃ মাটীকে বিশ্রাম দিতেছে না, তার উপর যদি মাটীর জোর এইরূপে কমিতেই থাকে তবে সোনার বাঙ্‌লা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই লোহার বাঙ্‌লায় পরিণত হইবে। তখন আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমাদিগকে অভিশাপ দিতে থাকিবে। ঐ জন্য এখন হইতেই সাবধান হওয়া প্রয়োজন। বাঙ্‌লার সর্ব্ব প্রধান জমিদার—গভর্ণমেণ্ট, স্বার্থ রক্ষার জন্য এখন হইতে সচেষ্ট না হইলে পরে অনুতাপ করিতে বাধ্য হইবেন।

সাবান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাবান বহু রকমের হয়ে থাকে যথা :—

(১) কার্ড সোপ, ইয়লো সোপ, মেরিন সোপ প্রভৃতি সাধারণ ব্যবহার্য্য সাবান ;

(২) গায়ে মাখা 'ওপেক্' সাবান ও স্বচ্ছ গ্লিসারিন সাবান ;

(৩) কার্বোলিক সোপ প্রভৃতি ডাক্তারী সাবান ;

(৪) কেলিকো প্রিন্টিং, টার্কিস্ রং ছোবানো প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত লোকদের ব্যবহারের জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সোপ ইত্যাদি। এবার উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকার সাবান প্রস্তুত করণ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্।

কার্ড সোপ বা হোয়াইট সোপ প্রস্তুত ক্ষেত্রে শুধু ট্যালো বা অলিভ তৈল মিশ্রিত ট্যালোই চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যদি ভাল রঙের সাবান তৈরী করবার দরকার থাকে, তাহ'লে উক্ত চর্ব্বি ও ক্ষার মিশ্রিত পদার্থকে জলের সঙ্গে ফুটিয়ে গরম অবস্থায় দিন দুই রাখা হয়। লৌহ, এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি যে সমস্ত ময়লা থাকার দরুণ সাবানের রং ময়লা হয় সে সমস্ত পদার্থ এই প্রক্রিয়ায় তলায় জমা পড়ে। সেই অবস্থায় ওপর থেকে সাবান পদার্থকে হাতা ক'রে তুলে নিয়ে ছাঁচে ঢালা হয়। লেস, মোজা পশমী দ্রব্য প্রভৃতি পরিষ্কার ব্যাপারে কার্ড সোপ দরকার লাগে।

ইয়লো সোপের মধ্যে রজন মিশ্রিত থাকে, সেইজন্যই ওর রং ওরূপ ময়লা হয়। চর্ব্বি, ট্যালো বা পাম অয়েলকে খুব করে ফেনিয়ে তারপর তাতে রজনের গুঁড়ো ফেলে দিলে ইয়লো সাবান প্রস্তুত হয়। ইয়লো সাবান প্রস্তুতের নিম্নে একটি ফরমূলা দেওয়া গেল :—

ফ্যাটি এ্যানহাইড্রাইড্স্	শতকরা	৪৬·৯ ভাগ
রজন	"	১৫·৪ "
মিশ্রিত এ্যালকালি	"	৭·১ "
ফ্রি এ্যাল্কালি	"	০·২ "
অপরাপর খনিজ পদার্থ		নামমাত্র
জল	"	৩০.৪
		১০০·০ ভাগ

রঙীন অর্থাৎ Mottled সাবান দু'রকমের হয়ে থাকে, যথা—

(১) কৃত্রিম উপায়ে রঙীনকৃত, যাতে সাবানের সঙ্গে বিশেষ পদার্থ মিশিয়ে রং করতে হয়।

(২) স্বাভাবিক রঙীন সাবান যার উৎপাদন, উপাদান সমূহে ময়লা থাকার দরুণ সম্ভব হয়। কৃত্রিম উপায়ে ধূসর রং করতে গেলে ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড (Manganese Oxide), লাল রং করতে গেলে সীঁদুর প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Mottled soap প্রস্তুতের একটি ফরমুলা দেওয়া গেল :—

ফ্যাটি এ্যান্‌হাইড্রাইডস্	শতকরা	৪৮.৬	ভাগ
মিশ্রিত এ্যাল্‌কালি	,,	৫.২	,,
ফ্রি ,,	,,	.৮	,,
অপরাপর খনিজ পদার্থ	,,	২.৪	,,
জল	,,	৪৫.০	,,
		১০০.০	,,

এইবার গায়ে মাখা সাবান সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। গায়ে মাখা সাবান হরেক রকমের হ'য়ে থাকে এবং বিশেষভাবে দেখতে গেলে বিভিন্ন রকমের মধ্যে গন্ধের পার্থক্য ছাড়া গুণগত পার্থক্য তেমন কিছু নেই। গায়েমাখা সাবানের মধ্যে অস্বচ্ছ সাবানের সংখ্যাই বেশী। এই প্রকার সাবানের প্রস্তুতকরণ নিম্নরূপ :— উৎকৃষ্ট রকমের হোয়াইট কিংবা কার্ডসোপকে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়, তৎপরে সেগুলোকে ইচ্ছামত রঙ্ করবার পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত করে গালানো হয় এবং সর্ব্বশেষে নির্দ্দিষ্ট সুগন্ধি মিশিয়ে গলিত তরল পদার্থকে হাতায় করে তুলে নিয়ে ছাঁচে ফেলে শীতল হ'তে দেওয়া হয়। ছাঁচে যখন কঠিনাকার ধারণ করে তখন তাকে চেঁচে ছুলে ছাপ্ মেরে বিক্রয়ের উপযুক্ত কেক বানানো হয়। এইটাই হল গায়ে মাখা সাবান প্রস্তুতের সাধারণ প্রক্রিয়া। কিন্তু Cold Process, Milling Process প্রভৃতি উন্নতিমূলক প্রক্রিয়ায় আজকাল সাবান উৎপাদিত হচ্ছে।

স্বচ্ছ সাবান প্রস্তুত করতে হলে 'ষ্টক্ সোপ'কে মেথিলেটেড স্পিরিটে ভিজতে দিতে হয়। একটা 'ষ্টিম-জ্যাকেটেড' পাত্রের মধ্যে উক্ত প্রক্রিয়া চলে এবং প্রতি ১০০ পাউণ্ড সাবানে ৪০ পাউণ্ড স্পিরিট লাগে। উক্ত প্রক্রিয়ায় অঙ্গারযুক্ত ক্ষারপদার্থ, মুক্ত চর্ব্বি পদার্থ, কণাযুক্ত কঠিন পদার্থ—প্রকৃতপক্ষে কষ্টিক এ্যাল্‌কালি ছাড়া সমস্ত-দ্রব্যই মেথিলেটেড স্পিরিটে দ্রবীভূত না হয়ে তলায় জমা পড়ে। ওপরে থাকে স্পিরিট ও মাঝখানে থাকে সাবানযুক্ত স্পিরিট সলিউশন। উপরের স্পিরিটটুকুকে পুনরায় কাজে লাগানোর জন্য সেটুকুকে সরিয়ে নিয়ে 'ডিস্‌টিল্' করা হয় এবং মাঝের সাবানযুক্ত স্পিরিট সলিউসানকে ছাঁচে ঢালা হয়ে থাকে। সলিউসান শীতল হ'লে উক্ত ছাঁচ কঠিনাকার ধারণ করে এবং তখন তাকে কেটে, পালিশ করে, ছাপ মেরে কেক বনানো হয়। উক্ত কেকেতে তখনো স্পিরিট থাকে এবং সেইজন্য উহা তেমন স্বচ্ছ আকার ধারণ করে না, কিন্তু কয়েকমাস শুকোবার জন্য রেখে দিলে স্পিরিট ক্রমশঃ উরে যায় ও কেক স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। যদি রং করবার এবং সুগন্ধযুক্ত করবার

দরকার হয় তবে ছাঁচে ঢালবার পূর্ব্বে যথাযোগ্য দ্রব্য সলিউশনের সঙ্গে মিশ্রিত করতে হয়।

এছাড়া, কোল্ড প্রসেস্ অনুযায়ী উৎপন্ন সাবানকে স্পিরিটে না ভিজিয়ে যথাযোগ্য পরিমাণ চিনি, গ্লিসারিন কিংবা পেট্রোলের সহিত মিশ্রিত করেও স্বচ্ছ করা যায়। ক্যাষ্টর অয়েল দ্বারা প্রস্তুত সাবান সমূহ এই ধরণের হয়ে থাকে।

অস্বচ্ছ ও স্বচ্ছ বিভিন্ন প্রকারের কতকগুলি সাবানের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

এ্যামণ্ড সোপ (Almond Soap)—কোল্ড প্রসেস্ অনুযায়ী বাদাম তৈল ও কস্টিক সোডাকে ফেনিয়ে এই সাবান প্রস্তুত হয়।

গ্লিসারিন সোপ—যে কোন উৎকৃষ্ট নরম সাবানের সঙ্গে শতকরা পাঁচ ভাগ গ্লিসারিন মিশিয়ে সংমিশ্রিত দ্রব্যকে গলিয়ে সুগন্ধযুক্ত করলেই এই প্রকার সাবান পাওয়া যায়।

হনি সোপ (Honey Soap)—পূর্ব্বে এই সাবানের সঙ্গে প্রকৃতই মধু মিশ্রিত থাকত কিন্তু বর্ত্তমান উৎপাদন প্রণালীতে মোটেই মধু থাকে না। কার্ড সোপ, পাম্ অয়েল সোপ, অলিভ অয়েল ও সুগন্ধির সংমিশ্রণে এই সাবান প্রস্তুত হয়।

রোজ সোপ—হোয়াইট ট্যালো সোপ কিংবা লার্ড সোপকে সিঁদুর সাহায্যে রং করে গোলাপ নির্য্যাস দিয়ে সুগন্ধযুক্ত ক'রে এই সাবান তৈরী হয়।

মাস্ক, অরেঞ্জ ব্লুজম্, ভায়লেট-ডি-পার্মে, বোকে-ডি-ভায়লেট প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গায়ে মাখা সাবান সমূহ উল্লিখিত প্রক্রিয়া সমূহ অনুযায়ীই প্রস্তুত হয়, তবে প্রত্যেকের বিশেষত্ব অনুসারে বিশেষ বিশেষ পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল সাবানগুলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ ডাক্তারী কেমিক্যাল দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। যথা :—মার্‌কিউরিয়াল্ সোপে করোসিভ্ সাব্‌লিমেট্, হোয়াইট্ প্রিসিপিটেট্ বা পারদের অপরাপর যৌগিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। কর্প্পূরযুক্ত গন্ধক সাবানে কর্প্পূর, নারিকেল তৈল, গন্ধক ও ক্ষার পদার্থ মিশ্রিত হয়। আইওডিন্ সোপে পটাসিয়াম্ আওডাইড বর্ত্তমান আছে। আর্‌সেনিক্যাল্ সোপে খুব সামান্য পরিমাণ হলেও আর্সেনিক বর্ত্তমান। শোষণ কারক সাবানের মধ্যে কার্ব্বোলিক সাবানই প্রধান। সাধারণ সাবানের সঙ্গে কার্ব্বোলিক্ এ্যাসিড প্রভৃতি 'টার্-এ্যাসিড' মিশ্রিত করে এই সাবান প্রস্তুত হয়। ভাল কার্ব্বোলিক্ সাবানে শতকরা ৫ থেকে ৮ ভাগ 'টার এ্যাসিড' বর্ত্তমান থাকে।

অপরাপর বিবিধ সাবানের মধ্যে সিলি-কেটেড সোপ, সাল্‌ফেটেড সোপ, স্যাণ্ড্ সোপ, কোল্ড-ওয়াটার সোপ ও পেট্রোলিয়াম্ সোপ উল্লেখযোগ্য। বালি ও সোডাকে fuse করে সাধারণ সাবানের সঙ্গে সংমিশ্রিত করলে সিলিকেটেড সাবান পাওয়া যায়। সাধারণ সাবানের সঙ্গে সোডিয়াম সালফেট (Glauber's Salt) মিশ্রিত করে সাল্‌ফেটেড সাবান তৈরী হয়। হার্ড সোপ ও সূক্ষ্ম বালিকণার মিশ্রণে স্যাণ্ড সোপ প্রস্তুত হয় এবং যে-সমস্ত লোক নোংরা ও খস্‌খসে কাজে ব্যাপৃত থাকে তাদের এ-সাবান কাজে লাগে। সাধারণ সাবানের সহিত ভ্যাস্‌লিন কিংবা অনুরূপ পেট্রোলিয়াম জাত পদার্থের মিশ্রণে পেট্রোলিয়াম সাবান পাওয়া যায়।

গায়ে মাখা সাবান ভাল কিনা তা'

'টেষ্ট' করবার জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের নৌ-বিভাগ থেকে একরকম পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে। ১ ইঞ্চি পুরু ও ⅞ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটুকরো গোলাকার সাবানের ওপর ১৫ পাউণ্ড ওজনের ভার পাঁচ মিনিট ধরে স্থাপন করলেও সে-সাবান যদি ⅟১৬ ইঞ্চির চেয়ে বেশী সঙ্কুচিত না হয় তবে তা' ভাল সাবান।

সাধারণতঃ দোকানদার এবং ক্রেতাগণ ভাবেন যে সাবান যদি শক্ত ও সুগন্ধযুক্ত হয় এবং তার রং যদি ভাল থাকে তবে সে-সাবান ভাল। কিন্তু কেমিক্যাল প্রসেস্ অনুযায়ী খারাপ উপাদান দিয়েও অন্য বস্তুর সংমিশ্রণে তাকে শক্ত করা যায়। সুতরাং সাবান শক্ত হ'লেও সেটা ভাল কিনা তা' চেনা মুস্কিল। কিন্তু সাবানের রং যদি পরিষ্কার হয় তবে সাধারণতঃ তা' ভালই থাকে। সাবানের মূল্য নির্ভর করে তাতে কিরকমের চর্ব্বি জাতীয় উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে তার ওপর। ট্যালোর দর রজনের চার পাঁচগুণ বেশী সুতরাং ট্যালোর বদলে যদি রজন ভেজাল দিয়ে সাবান প্রস্তুত করা হয় তবে তার দাম যে কম হবে এটা সুনিশ্চিত। সাবানের মধ্যে চক এবং অনুরূপ ধাতব দ্রব্যাদি ভেজাল দেওয়া হয়। সাবানে সাধারণতঃ শতকরা ৬২ ভাগ ট্যালো ও ৩০ ভাগ জল থাকা উচিত। এক রকমের সাবান থাকে জলের সঙ্গে ঘসতে না ঘসতেই প্রচুর ফেনা নির্গত হয়, তাতে কাপড় পরিষ্কার কার্য্য ভাল হয় বটে কিন্তু তার সঙ্গে যদি রজন ভেজাল থাকে ত ট্যালো সোপের মত কাপড় ধবধবে সাদা হয় না।

নারিকেল চাষ ও সাবান-শিল্প

বাংলাদেশে নারিকেল খাবার লোক আছে প্রচুর; নারিকেলের চালানী-ব্যবসা করবারও কারবারী আছে অসংখ্য, কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে নারিকেলের চাষ করবার লোক হচ্ছে মুষ্টিমেয়, অথচ নারিকেল চাষের কারবার একটি লাভজনক কারবার। যাঁরা চাষী, তাঁরা প্রতিবছর নতুন ফসলের জন্ত আয়োজন করেন এবং তাঁদের ঐ আয়োজনের আধিক্য ও পরিশ্রমের ফলেই শস্ত জন্মায়। কিন্তু যাঁদের নারিকেলের বাগান আছে তাঁরা বৎসরান্তে ফল পাড়ানো ছাড়া বাগানের সঙ্গে আর যে সম্পর্ক রাখেন এমন ত মনে হয় না। অথচ নারিকেল্ বাগান জমা রাখার কারবারটাও চাষ কারবারের অন্তর্গত। আমাদের দেশে নারিকেল-বাগানের অধিকারীরা বছরে একবার 'গাছ ছাড়িয়ে দেবার' ব্যবস্থা করেন, তাতেই তাঁদের সকল কর্ত্তব্য শেষ হ'য়ে যায়। মাত্র এইটুকু ব্যবস্থা করেই তাঁরা যে পরিমাণ ফল লাভ করেন তাতেই তাঁরা প্রচুর লাভবান হ'ন। কিন্তু অপরাপর ব্যাপারের চাষের মত তাঁরা যদি জমি তৈয়ারী, সার প্রদান, গাছের যত্ন নেওয়া ইত্যাদি সকল বিষয়ে মনোযোগ দিতেন তাহ'লে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান অপেক্ষা ঐ একই বৃক্ষ থেকে আরও বেশী সংখ্যক ফল পেতে পারতেন এবং আরও বেশী লাভবান হ'তেন। অপরাপর ফসল-চাষের ক্ষেত্রে প্রতিবছর নতুন জমি তৈরী ও চারা রোপণের ব্যাপার লক্ষিত হয়, কিন্তু নারকেল চাষের ক্ষেত্রে নতুন চারা রোপণের প্রচেষ্টা তেমন ভাবে চোখে পড়ে না। অথচ প্রতিবছর অনেকগুলি করে গাছ যে নানা কারণে মরে যায় একথা ঠিক। যাঁদের নারকেল বাগান আছে তাঁরা এ-সমস্ত বিষয় সবিশেষ ভেবে দেখেন না, ফলে যে সমস্ত বাগান আছে সেগুলো সংস্কারের অভাবে নষ্টই হয়, কোনকালে সুন্দর ও ঘন বৃক্ষবহুল হ'য়ে ওঠে না। অথচ বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করলে সেই সমস্ত বাগানেই সোনা ফলত।

নারিকেলের চাষ যে লোকসানের নয় একথা নারকেল ব্যবসায়ী মাত্রই অবগত আছেন। নারকেলের প্রধান ব্যবহার হচ্ছে তৈল উৎপাদনে; ওর ছোবড়া দড়ি ও ম্যাটিং তৈরীর জন্ত বিখ্যাত। ওর পাতা এবং ডালপালা ও লম্বা দেহটা জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত প্রত্যেকটিরই বাজার দর আছে, সুতরাং নারকেলের চাষ করলে ব্যবসায়ীর ক্ষতি হ'বার কোন আশঙ্কা নেই।

এ-সমস্ত ছাড়া নারিকেলের একটি বিশেষ ব্যবহারের জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা। সাবান-শিল্পের প্রসারতার সঙ্গে নারিকেল-চাষের উন্নতি জড়িত আছে, সুতরাং নারিকেল-চাষের

ভবিষ্যৎ মোটেই অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। সাবান উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারকেল তৈল প্রয়োজন হয়; কাজে কাজেই বাজারে সর্ব্ব সময়ে নারকেলের একটা চাহিদা থাকা স্বাভাবিক।

ইউরোপবাসীদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, বাইবেলে সাবান অনুরূপ যে বস্তুর উল্লেখ আছে সেটা গাছের ছাই হ'তে তৈরী। সম্ভবতঃ এ-দ্বারা খার পদার্থেরই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাবানের ব্যবহার বেশী দিনের নয়, ইংলণ্ডের ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সাবান শিল্পের কোন প্রচলন ছিল না। পূর্ব্বে সাবান উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বস্তুই ব্যবহৃত হোক না কেন, বর্ত্তমান উৎপাদনের ক্ষেত্রে তৈল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এসম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞের মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল :—

"Among the raw materials used by the soap boiler the principal fatty bodies are tallow, lard, palm-oil, palm kernel oil, olive oil, cotton-seed oil, sesame oil and cocoanut oil for hard Soaps. এর অর্থ হচ্ছে যে, হার্ড সোপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঁচা মালরূপে ব্যবহৃত তৈল জাতীয় উপাদান সমূহের মধ্যে ট্যালো, চর্ব্বি, পাম্ অয়েল, অলিভ্ অয়েল, তূলা বীজের তৈল, নারিকেল তৈল প্রভৃতি প্রধান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সাবান প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অপরাপর তৈলের মত নারিকেল তৈলও বহুল পরিমাণে কাজে লাগে। বস্তুতঃ সাবান শিল্পের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে নারিকেল তৈলের চাহিদাও খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজে কাজেই একথা বলা যায় যে, নারিকেল চাষীরা কামনা করুক দেশে যেন সাবান-শিল্পের অধিকতর প্রসারতা ঘটে।

সাবান-শিল্পের যে আরও অধিক প্রসারতা ঘটবে সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমাদের দেশ যে এখন কতটা পশ্চাতে পড়ে আছে তা' ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা দূরে থাকুক, দেশের অধিকাংশ লোকই তাদের অন্ন-সংস্থান করতে সমর্থ হয় না। জীবনের প্রতি তাদের নজর নেই, এর কারণ এই যে, জীবনটা যে আবার ভালভাবে কাটানো যায় এ তথ্যটা তারা বোঝেনা। সৌভাগ্য ক্রমে যারা বোঝে তাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে লোকে সাবান কম ব্যবহার করে। তবুও গত কয়েক বছরে সাবানের চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। যে পরিমাণ সাবান আমাদের দেশে আমদানী হ'ত সেটা এক্ষণে, অনেকটা কমে গেছে এবং ফলে দেশীয় সাবান-শিল্পের প্রসারতা ঘটেছে। এই প্রসারতা আরও বিস্তৃত হ'বে, কেননা, আমাদের দেশের সাধারণ লোক অর্থাভাবেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক এতদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি ততটা মনোযোগী ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে তাদের দৃষ্টি একটু একটু করে বদ্‌লাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বদ্‌লাবে। সুতরাং সাবান-শিল্পের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে নারকেল তেলের চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে। কাজে কাজেই নারকেল-চাষীদের এটা ভেবে দেখা দরকার যে, নারকেল চাষের অযত্ন করলে তাদের লোকসানই বেশী, অথচ যার যেটুকু বাগান আছে তাতে যদি বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা হয় ত বর্ত্তমান বাজারে বেশ লাভবান হওয়া যায়।

মোমের ব্যবহার

মোম জিনিসটা ইউরোপীয়দিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত হ'লেও আমাদের দেশে একেবারে অপরিচিত নহে। সেকালের মোমবাতি থেকে আমরা মোম সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করে বসি বটে, কিন্তু মোমের ব্যবহার আমাদের ঐটুকু দরকারের মধ্যেই কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ নেই। সেকালের মোমবাতী বলিলাম এইজন্য যে, পূর্ব্বে পূজাপার্ব্বনাদি উপলক্ষে, উৎসবক্ষেত্রে অথবা দেবমন্দিরে এদেশে মৌ-মোমেরবাতিই প্রচলিত ছিল; কিন্তু প্যারাফিনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মৌচাক হইতে মোমবাতি প্রস্তুত একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে, তাহার স্থানে সাদা ধবধবে প্যারাফিনের বাতিই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। আমাদের এই প্রবন্ধে মৌ-মোমের বিষয়ই আলোচিত হইল।

কোন জিনিসের ছাপ নিতে বা ছাঁচ ইত্যাদি তৈরী করতে মোমের প্রয়োজন একেবারে অপরিহার্য্য। তা' ছাড়া মোম ঔষধ হিসাবেও সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। যাঁদের ভালরকম কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না তাঁরা জানেন, তরল প্যারাফিন্ তাঁদের পক্ষে কি পরিমাণ আরামদায়ক। বিলাসী বাবু কিংবা প্রসাধনপ্রিয় নারীদের নিকটও মার্কোলাইজ্‌ড্ ওয়াক্স বড্ড প্রিয়, কিন্তু ও-জিনিসটিতে যথেষ্ট পরিমাণে মোম বর্ত্তমান। মোমের ব্যবসা যে ভাল চলতে পারে সে-কথা বলাই বাহুল্য। নিম্নে আমরা মোম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশ করলাম।

মোম্ (Wax) নানান্ রকমের হ'য়ে থাকে, যথা:—মৌ-মোম, জাপানী মোম, ব্রেজিলের মোম, চীনে মোম, উদ্ভিজ্জ মোম, প্যারাফিন মোম ও স্পার্ম্মাসেটি (Spermaceti)। এগুলির মধ্যে জাপানী মোম হচ্ছে গ্লিসারাইড জনিত একপ্রকার চর্ব্বি; প্যারাফিন মোম হচ্ছে কেরোসিন হইতে নির্গত হাইড্রো-কারবন্ এবং অন্যান্য মোমগুলি রসায়নগত ভাবে দেখতে গেলে গ্লিসারিন ব্যতীত অপরাপর এ্যাল্‌কোহল্ (alcohol) ও চর্ব্বি মিশ্রিত এ্যাসিডের সংমিশ্রিত পদার্থ।

মৌচাক থেকে মৌ-মোম পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এ হলদে রঙের, কিন্তু সবুজী, পীতাভ ও লালরঙেরও হ'তে পারে। মৌচাক থেকে এই মোম গলিয়ে বার করে নিতে হয় এবং এজাতীয় মোমকে ইয়লো ওয়াক্স বলা হয়। ইয়লো ওয়াক্স দানাযুক্ত কঠিন পদার্থ পূর্ণ ও মধুগন্ধ বিশিষ্ট। এই ইয়লো ওয়াক্সের সঙ্গে একটু ট্যালো বা তারপিন তৈল মিশ্রিত করে

রৌদ্রে-শুষ্ক করলে কিংবা সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড বা পটাসিয়াম বাইওক্রোমেট দ্বারা 'ব্লিচ' করলে হোয়াইট্‌ ওয়াক্স বা ব্লিচ্‌ড্‌ ওয়াক্স পাওয়া যায়। ইয়লো ওয়াক্সের চেয়ে ব্লিচ্‌ড্‌ ওয়াক্স অধিকতর ভঙ্গপ্রবণ। ব্লিচ্‌ড্‌ ওয়াক্সের কোন গন্ধ নেই এবং তার আকৃতি দানাযুক্ত নয়। ফ্রান্স, ইতালী, তুরস্ক, গ্রীস্‌, মিশর ও আফ্রিকার অন্যান্য অংশ, মেক্সিকো, ক্যাল্‌ফার্ণিয়া, ইংলণ্ড ও বৃটিশ উপনিবেশ সমূহে মৌ-মোম উৎপাদিত হয়। ব্যবসাক্ষেত্রে মৌ-মোমের সঙ্গে জল, গন্ধক, জিপসাম, ষ্টার্চ, রজন, জাপানী মোম, ট্যালো, প্যারাফিন প্রভৃতি ভেজাল দেওয়া হয়। এমনও দেখা গেছে যে, শতকরা ৬০ ভাগ প্যারাফিন্‌ ও ৪০ ভাগ রজনকে মিশ্রিত করে তার ওপর পাতলা একটুখানি মৌ-মোম মাখিয়ে দিয়ে সেইটাই বাজারে মৌ-মোম বলে বিক্রয় হচ্ছে। গৃহস্থালী ব্যাপারে পালিসের কাজ ছাড়াও মোমবাতি তৈরী এবং ঢালাই-এর কাজেও মৌ-মোম ব্যবহৃত হয়।

জাপানী মোম প্রধানতঃ জাপান থেকেই আমদানী হয়। প্রকৃতপক্ষে এ-বস্তু সঠিক মোম নয়, এ একপ্রকার উদ্ভিজ্জ চর্ব্বি। জাপানের কয়েকপ্রকার ফল থেকে এ-বস্তু উৎপাদিত হয়। জাপানী মোমের রং কতকটা খড়ের রং-এর মত এবং এ-বস্তু যত পুরাণো হয় তত রংটা হলদে হ'য়ে আসে এবং এর ওপর একপ্রকার গুঁড়ো গুঁড়ো পদার্থের ছাপ পড়ে। এ-বস্তু কঠিন বটে কিন্তু দু'আঙুলের মধ্যে নিয়ে একে টেপা যায়। জাপানী মোমের সঙ্গেও জল এবং ষ্টার্চ ভেজাল দেওয়া হয়। যে-গাছের ফল থেকে এ-জাতীয় মোম তৈরী হয়, চীন, জাপান এবং ক্যালিফর্ণিয়ায় তার চাষ চলে।

চীনে মোমও একপ্রকার গাছ থেকে তৈরী হয়। কোক্কাস্‌ পেলা (Coccus pela) নামক একপ্রকার পোকা উক্ত গাছে এই মোম প্রস্তুত করে। গাছের ডাল থেকে উক্ত মোমকে চেঁচে নিলে তার সঙ্গে অনেক ময়লা মিশ্রিত থাকে, সুতরাং গরম জলের সঙ্গে উক্ত পদার্থটিকে ফুটিয়ে পরিস্কৃত করা হয়ে থাকে। গরম জলে মোম গলে ময়লা থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে অন্য পাত্রে গৃহীত হয় এবং সেখানে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় উক্ত মোম বিক্রয়ের জন্য বাজারে পাঠানো হয়। উক্ত মোমের আকৃতি দানাবাঁধা রকমের এবং এ-বস্তু স্পার্‌মাসেটি (Spermaceti) অপেক্ষা কঠিনতর। ১৮০° ফরান্‌হাইট্‌ তাপে এ-বস্তু গলতে আরম্ভ করে। চীনদেশে এ-বস্তু দিয়েই মোমবাতি প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু ব্যবসাগত সুবিধার জন্য এর সঙ্গে খানিকটা নরম চর্ব্বি মেশানো হয়ে থাকে। চীনে মোম ছাড়াও আরও কতক প্রকারের উদ্ভিজ্জ মোম আছে, তাদের নাম হল Myrtle Wax, Opium Wax, Palm Wax ও Cotton Seed Wax.

আসল প্যারাফিন ওয়াক্স শাদা, ঈষৎ স্বচ্ছ, স্বাদহীন, গন্ধহীন, দানাবাঁধা কঠিন পদার্থ। প্যারাফিন স্কেলকে 'রিফাইন্‌' করে উক্ত মোম পাওয়া যায়। এইখানে প্রশ্ন উঠবে যে প্যারাফিন্‌ স্কেলটি আবার কি জিনিষ? পেট্রোলিয়ম, মেটে পাথর ও লিগনাইটের 'ডিস্‌টিলেশনের' ফলে প্যারাফিন স্কেল পাওয়া যায়।

প্যারাফিন ওয়াক্স প্রাপ্ত হ'বার জন্য প্যারাফিন-স্কেল রিফাইনের বহু রকম প্রক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে একটির বিবরণ এখানে উল্লিখিত

হ'ল।

প্রথমে সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেসিনে স্কেলগুলিকে ফেলে তেল বার করে নেওয়া হয় এবং তৎপরে আরও চাপ দিয়ে নরম প্যারাফিন বহিষ্কৃত করা হয়। মোমের যে হল্‌দে কেক্ পড়ে থাকে তাকে প্রথমে সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিডে গলিয়ে অতঃপর সোডা দ্বারা এ্যাসিড্‌টাকে 'নিউট্রালাইজ' করে পুনবায় সমস্ত বস্তুকে একবার 'প্রেস' দেওয়া হয়। যদি কোন ময়লা থাকে তাকে নিষ্কাশন করবার জন্য ন্যাপথার (Naptha) সঙ্গে উক্ত বস্তু মিশ্রিত করে animal charcoal সাহায্যে 'ফিল্‌টার' করা হ'য়ে থকে। সর্ব্বশেষে ঐ ফিলটার্‌ড্ বস্তুর ওপর বাষ্প নিক্ষেপ করে ন্যাপথা দূরীভুত হয়।

বাজারে দু' রকমের প্যারাফিন ওয়াক্স পাওয়া যায়—

(১) হার্ড ওয়াক্স

(২) সফ্‌ট ওয়াক্স।

প্যারাফিন ওয়াক্সের বাতির আলো খুব পরিষ্কার হয়, এমন কি অপর সকল মোমবস্তুর চেয়ে প্যারাফিন্ ওয়াক্সের বাতির আলোই উজ্জ্বল হয়ে থাকে। স্পার্‌মাসেটি ব্যবহার করলেও আলো প্যারাফিন্ ওয়াক্সের মত অত ধব্‌ধবে সাদা হয় না। কিন্তু বাতি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্যারাফিন্ ওয়াক্স ব্যবহারে একটা অসুবিধা আছে; প্যারাফিন্ ওয়াক্স 'ওর' মেল্টিং টেম্‌পারেচারের নিম্ন তাপেই তুল্‌তুলে নরম হয়ে যায়, সুতরাং উক্ত ওয়াক্সের তৈরী বাতি জাল্‌লেই তা' অল্প সময়ের মধ্যেই বেঁকে পড়ে। সেই জন্যই প্যারিফিন্ ওয়াক্সের দ্বারা বাতি প্রস্তুত করবার সময় তার সঙ্গে একটু ষ্টিয়ারিন কিংবা মৌ-মোম্ মিশ্রিত করে নেওয়া হয়—তাহলে আর বাতির বেঁকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ওজোকারাইট বা ফসিল্-ওয়াক্স নামে প্যারাফিন্ ওয়াক্স গোত্রীয় আর একপ্রকার মোম্ আছে, সেটাও হাইড্রোকারবন্ উপাদানে তৈরী। ক্যাস্পিয়ান হ্রদের ধারে চেল্‌কেন দ্বীপে ও গ্যালিসিয়া প্রদেশে উক্ত বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ফসিল্ ওয়াক্স শক্ত ও বাদামী রংয়ের হয়ে থাকে, তাকে সাল্‌ফিউরিক্ এ্যাসিড কিংবা গরম বাষ্প সাহায্যে পরিষ্কৃত করলে 'সেরাসাইন্' নামে মৌ-মোমের মত একপ্রকার হল্‌দে বস্তু-তৈরী হয়। 'ক্রুড ওজোকারাইট'-কে রিফাইন্ করলে 'হোয়াইট্ ওজোকারাইট্'; 'ওজোকারিন্' ও একপ্রকার নরম মোম্ পাওয়া যায়। উক্ত ওজোকারিন্ পদার্থকে দেখতে ঠিক ভেজলিনের মত। রিফাইন করে উক্ত তিনটি পদার্থ প্রাপ্ত হ'বার পর যে কৃষ্ণবর্ণ-কঠিন-অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকে, তা' ইলেকট্রিক ব্যাপারে কাজে লাগে। ওজোকারাইটের মত দেখতে 'নেফ্‌ট্-গিল্' (Neft-gil) নামে একপ্রকার খনিজ দ্রব্য আছে, তারও প্রাপ্তিস্থান ক্যাস্‌পিয়ান অঞ্চল।

স্পারমাসেটি (Spermaceti) প্রধানতঃ তিমিমাছের মস্তক থেকে আহরিত হয়। তিমিমাছের তেলের মধ্যেও উক্ত বস্তু বর্ত্তমান আছে; ঐ তেল থেকে হাইড্রোলিক্-প্রেসের সাহায্যে এবং নানারকম প্রক্রিয়ায় স্পারমাসেটিকে আলাদা করা হয়ে থাকে। পরে সেটাকে গলিয়ে এবং ক্ষার পদার্থের দ্বারা ফুটিয়ে তা' পরিষ্কৃত হয়। তারপরে তাকে ইচ্ছামত ছাঁচে ফেলে সুবিধামত আকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে। পরিষ্কৃত স্পার্‌মাসেটি শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল, অর্দ্ধস্বচ্ছ প্রায় স্বাদহীন, বর্ণহীন দানাযুক্ত পদার্থ; একে পাউডারে পরিণত করা যায়।

বিলাসিতা বনাম সংযম

আমাদের মধ্যে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে আজকাল দু'টো আদর্শ ভীড় করেছে, একটা হচ্ছে গান্ধীর আদর্শ, বুদ্ধদেবের আদর্শ; আর অপরটা হচ্ছে পাশ্চাত্য আদর্শ, আমাদের দেশে যাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয় ভোগের আদর্শ। এই দুই আদর্শেরই প্রধানতঃ উদ্দেশ্য এক, অর্থাৎ উভয়েই চায় মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু আচার ও প্রণালীব মধ্যে উভয়ের একেবারে আসমান জমীন্ ফারাক্! এই দুই আদর্শ নিয়ে সাময়িক পত্রের ক্রোড়ে বহুবিধ আলোচনা হয়েছে, আমরা আর তার জাবর কাটব না। শুধু আমাদের সামাজিক উন্নতি ও অবনতির ক্ষেত্রে তাদের কি প্রভাব সেটুকু আলোচনা করব।

একথা কারও অবদিত নেই যে, আমাদের হাতে টাকা থাকলেই আমরা নানা রকম জিনিসপত্র কিনি। এই টাকা যখন স্বল্প পরিমাণ থাকে তখন আমরা শুধুমাত্র জীবনধারণের উপযোগী জিনিসপত্র কিনি, তার বেশী আরও কিছু কেনবার ইচ্ছে থাকলেও আমরা কিনতে পারি নে। আর হাতে যদি টাকা কড়ি থাকে ত আমরা জীবন ধারণের উপযোগী জিনিস ছাড়া আরও বেশী কিছু কিনি, সোজা কথায় যাকে বলে আমরা বিলাসিতা করি। অতএব বিলাসিতার একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে সাধারণ ক্ষেত্রে হাতে বেশী টাকা থাকা। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হ'ল নেশার ক্ষেত্র। যে মদ খায় সে ভেবে দেখে না তার হাতে কম টাকা আছে কি বেশী টাকা আছে, সকল ক্ষেত্রেই সে আগে মদ খাবে তাতে তার পরিবারবর্গ ভাত খেতে পাক আর না পাক। যে বেসুড়ে, সে বেশী টাকা কম টাকা গ্রাহ্য করে না, হাতে টাকা থাকলেই সে রেসে যায়, তার ফলে তাদের আহার জুটুক আর নাই জুটুক। অবশ্য এই সব ব্যাপারের মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সে-সব আমাদের আলোচনার বাইরে। এখন এই মদ খাওয়া ও রেস খেলা হ'ল নেশার জিনিস, সুতরাং এখানে বিলাসিতার ঐ প্রাথমিক সূত্রটি খাটে না।

এটা সহজেই বোঝা যায় যে, আমরা যখন জিনিস পত্তর কিনি, তখন দোকানের কাটতি বাড়ে, আব আমরা যখন জিনিসপত্তর কিনতে পারিনে, তখন দোকানে জিনিসপত্তর জমা হ'য়ে থাকে, বাজার মন্দা যায়। পূর্ব্বেই দেখিয়েছি যে, আমাদের কেনাটা নির্ভর করে আমাদের হাতে টাকা থাকার ওপর, যেটাকে ব্যবসায়িক ভাষায় বলা হয় আমাদের ক্রয়-

ক্ষমতা। তাহ'লেই হ'ল কিনা আমাদের ক্রয়-ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজারের মাল-বিক্রয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ব্যবসায়ীরা তাই কামনা করে যে, আমরা খুব বিলাসী হই, অর্থাৎ কিনা তাদের উৎপাদিত কিংবা দোকানের জিনিস খুব বেশী করে কিনি।

এর থেকে একটা সহজ প্রশ্ন আসে যে, বিলাসিতা যদি মাল বিক্রয়ের অনুকূল হয়, তবে সকলেরই বিলাসী হওয়া উচিত। কেননা, বস্ত্র ব্যবসায়ী বলবে যে, বিলাসিতা বাড়লেই তার বেনারসী শাড়ী বেশী করে কাটবে, এসেন্সওয়ালাও জানাবে ওহে বাপু, বেশী করে বিলাসিতা কর, তবেই ত আমি বেশী এসেন্স বিক্রী করে লাভ করব। এই রকম চারধারে 'বিলাসিতা কর' 'বিলাসিতা কর' বলে হৈ হৈ লেগে যাবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে, বিলাসিতার একমাত্র মাপ কাঠি হচ্ছে হাতে টাকা থাকা। তা' না থাকলে যতই হৈ-হৈ হোক্ না কেন, দশ মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। সুতরাং দুনিয়ার ব্যবসা-বাজারকে টিকিয়ে রাখতে গেলে 'বিলাসিতা কর'-ই একমাত্র শ্লোগান নয়, তার সঙ্গে এটাও বলা চাই যে, জনসাধারণের হাতে টাকা আসবার ব্যবস্থা কর।

এখন সমস্যা হচ্ছে যে, হাতে টাকা থাকলেই কি যত কিছু বিলাসিতা করা চলে? অর্থাৎ একজন যদি বড় লোক হয় তাহ'লে সে কি একটা বাড়ী তৈরী করে আবার সেটা ভাঙ্গতে পারে—আবার তৈরী করে আবার ভাঙ্গতে পারে? আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যে কেন, পারেই ত। বাড়ীটাকে যতবার ভাঙ্গা যাবে আর গড়া যাবে, ততবার নতুন নতুন মজুরের চাকরী মিলবে; নতুন নতুন জিনিসপত্র বিক্রয় হ'বে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে এ ধারণা ঠিক নয়, এতে করে বাজে পয়সা নষ্ট হচ্ছে; যে পয়সাটাকে অন্য কিছু ফলপ্রসূ শিল্প-প্রচেষ্টায় কিংবা অপর কিছুতে নিয়োজিত করলে আরও বেশী মজুর চাকরী পেত, আরও বেশী নতুন নতুন জিনিষ-পত্তর বিক্রীত হ'ত। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, বিলাসিতার উদ্দেশ্য হওয়া চাই ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর; হোক না কেন তা' ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কিংবা সামাজিক জীবনে। ঐ লোকটির বাড়ী তৈরী করায় তার নিজের কোন লাভ দেয় নি, সমাজেরও সে ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপার কোন উপকারে আসেনি, অথচ অনর্থক অনেক পয়সা বাজে নষ্ট হয়ে গেছে। তার চেয়ে সে যদি কোন ফ্যাক্টরী নির্ম্মাণ করত, কিংবা কোন বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্য চালাত; অথবা হাস-পাতাল তৈরী করে দিত; তাহলে বহুলোকের ও সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হ'ত। সেইরকম একজন লোক যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাবান এসেন্স মেখে পয়সা ওড়ায়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সিনেমা দেখে ফূর্ত্তি করে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মোটর গাড়ী কিনে টাকা বরবাদ করে—তবে সে বিলাসিতা ফলপ্রসূ কল্যাণকর বিলাসিতা নয়, সে হ'ল নিছক বাজে বিলাসিতা। দুনিয়ায় তার কোন দাম নেই, সমাজের সে কোন উপকারে আসে না।

তাহলেই দেখা গেল যে, সকল রকমের উদ্ভট বিলাসিতাই চলতে পারে না, বিলাসিতা ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর হওয়া চাই।

এইবার আমরা এই বিলাসিতার সঙ্গে প্রবন্ধ আরম্ভের ঐ মতবাদদু'টিকে যাচাই করে দেখি। পাশ্চাত্য আদর্শ হ'ল ভোগের আদর্শ, সুতরাং তা ত স্পষ্টতঃই বিলাসিতা করতে বলে। আর সমাজে বিলাসিতা যে আবশ্যক, একথা সকলেই স্বীকার করবেন, কেননা তা' না হলে এই বিশাল ব্যবসার জগত বাঁচবে কি করে? মানুষ খায় ভাত, রুটি, মাংস; এই তিনটি বস্তুর বাজারই ত দু'নিয়ার সবখানি নয়। সুতরাং আর সব বাজার যদি মাটি হয়ে যায় ত' লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে পড়বে।

গান্ধীর আদর্শ ও বুদ্ধদেবের আদর্শ বলেন যে বিলাসিতা কোরো না। তাঁরা সজ্জন ব্যক্তি, তাঁদের উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু আজকের যুগে ও-আদর্শ টিকবে কেমন করে? মানুষ যখন একবার দশহাতি মিহি কাপড়ের সন্ধান পেয়েছে, তখন তার ছ'হাতি খদ্দর-এ মন উঠবে কেন? বিশেষতঃ আমাদের চারপাশে যখন এত শিল্প-প্রগতি ও যন্ত্র-দেবতার প্রভাব, তখন আমরা তাদের ঠেকিয়ে রাখব কি দিয়ে? আমরা বিলাসিতা করব না বললে ত তারা শুনবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আজকের যুগে বিলাসিতা ত্যাগকরা অসম্ভব। আমরা এই পর্য্যন্ত করতে পারি যে, আমাদের জীবন যাত্রা যেন সরল হয়, আমরা যেন অনর্থক বাজে পয়সা নষ্ট না করি। কিন্তু তার মানে ত এই বোঝায় না যে আমাদের Standard of Living আমরা নামিয়ে ফেলে ছ'হাতি ধুতি পরব, ভাল জামা গায়ে দেব না। আমাদের জীবনে একটু আরাম তৃপ্তির জন্য যে সামান্য বিলাসটুকু প্রয়োজন, তাকে দূরে রাখা যায় না।

এখন তর্কের খাতিরে যদি ধরা যায় যে বিলাসিতা তুলে দেওয়া গেল, তাহলে সমাজের কী অবস্থা হ'বে প্রত্যক্ষ করা যাক্। যদি জনসাধারণের হাতে টাকা না থাকে তবে পূর্ব্বেই যেমন বলেছি যে বিলাসিতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আর যদি টাকা থাকে ত' তাহলেও সে জীবনধারণের উপযোগীর অতিরিক্ত মাল কিনতে পারছে না, কেন না, বিলাসিতা বন্ধ। ব্যাঙ্কেও টাকা রেখে সুদ আদায় করতে পারবে না, কেননা, বিলাসিতা উঠে যাওয়ার দরুণ ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় ব্যাঙ্ক সব পাত্তাড়ি গুটিয়েছে। কল্পনাচক্ষে তখন আর ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্, ডাল্‌হাউসি স্কোয়ার, চৌরঙ্গী, কলেজ ষ্ট্রীট্ থাকবে না, যেহেতু বিলাসিতা উঠে যাওয়ার দরুণ ওদের প্রয়োজনও ফুরোবে। ওদের প্রয়োজন ফুরোলে লোকের আর তখন চাকরী আর ব্যবসা করবার পথ খোলা থাকবে না, অথচ পেটে খেতে হ'বে। এবং তার জন্য চাষ করা ছাড়া উপায় নেই। এখন সকলের চাষ করার জন্য অত জমিই বা কোথায় পাওয়া যাবে, আর সবাই বা তাতে রাজী হবে কেন? সবার কার্য্যক্ষমতা ও মনোবৃত্তি ত সমান নয়।

অতএব আজকের জগতে বাঁচতে গেলে বিলাসিতা চাই, তবে সে বিলাসিতা লাগাম-ছেঁড়া পাগলা বিলাসিতা নয়, তাতে সংযমের বাঁধন থাকা চাই। সে বিলাসিতা যেন ফলপ্রসূ, কল্যাণকর হয়। সেই জন্যই আমাদের আদর্শ গান্ধী বুদ্ধদেবের আদর্শ নয়, পাশ্চাত্যের উৎকট ভোগের আদর্শও নয়; আমাদের লক্ষ্য দু'য়ের মধ্যবর্ত্তী।

খাদ্য সমস্যা

খাদ্যই জীবনধারণের শ্রেষ্ঠতম উপাদান। তাই আর্য্য ঋষিগণ খাদ্যকে জীবনের অমৃত স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন এবং মানবদেহের পঞ্চ কোষের মধ্যে এই অন্নময় কোষকেই অন্যতম কোষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। খাদ্যের অভাব হইলেই শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে ও অবশেষে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। প্রাণিমাত্রেরই আহারের প্রয়োজন। মানুষ যে দিন হইতেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহার এমন খাদ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে যাহাতে তাহার শরীর টিকিতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মানুষের সভ্যতার স্তরে আসিতে যেমন অনেক ধাপ ও অনেক পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া আসিতে হইয়াছে—সেইরূপ তাহার আহারাদিরও অনেক ক্রম বিকাশ হইয়াছে।

প্রথম ছিল যখন মানুষ অসভ্য অবস্থায় —তখন না ছিল তাহার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, না ছিল খাদ্য সুচারুরূপে রন্ধন করিবার শক্তি। তাই পশু শিকার করিয়া তার কাঁচা মাংসেই উদর পূর্ত্তি করিতে হইত; কিন্তু ক্রমেই মানুষ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল— তার আহারেরও তারতম্য ঘটিতে লাগিল অনেক প্রকার। সে এবার নানারূপ কৃষিজাত দ্রব্য জন্মাইতে লাগিল, আগুনের ব্যবহার জানিল এবং আরও উন্নততর প্রণালীতে পাক প্রণালী শিখিল। সঙ্গে সঙ্গে তার খাদ্য সমস্যা জীবনের অন্যান্য অনেক দরকারী জিনিষের মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় সমস্যা হইতে লাগিল। দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে ও বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের তারতম্য অনুসারে ও জল বায়ুর বৈশিষ্ট্যানুসারে এই খাদ্যের রূপ ও প্রকৃতি ভেদ হইতে লাগিল, সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন দেশের খাদ্য এক নয়। আবার যখন জাতিতে জাতিতে সাহচর্য্য হয়—তখন অন্যান্য জিনিষের আদান প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এই খাদ্যেরও কিছু পরিবর্ত্তন হয়—এক জাতি অন্য জাতির খাওয়া দাওয়ার কিছু কিছু চাল চলন গ্রহণ করে।

মানুষের দেহ এমন ভাবে গঠিত যে ইহা রক্ষা করিতে হইলে আহার করিতেই হইবে। আমাদের শরীরের কতগুলি উপাদান প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া ক্ষয় হয়—এই ক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে ভক্ষ্য বস্তু দ্বারা সেই ক্ষয়ের জিনিষগুলি পূরণ করিতে হয়। খাদ্যের মধ্যে সেই সকল রাসায়নিক পদার্থ আছে বলিয়াই আমরা ক্ষয়ের বিষয় টের পাইনা, অতএব কি কি খাদ্য গ্রহণ করিলে ক্ষয় পূরণ করিয়া শরীরের রক্ষা ও পুষ্টি হইতে পারে তাহার জ্ঞান না থাকিলে স্বাস্থ্য ও শরীর সম্বন্ধে নানারূপ কুসংস্কার ও ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইতে হয়।

মানব শরীরের গঠন প্রণালী এমনই রহস্যজনক যে প্রতিমুহূর্ত্তেই এই শরীরের

ভিতরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষগুলির ভাঙ্গাগড়া অনাহত ভাবে চলিতেছে—যাহা নষ্ট ও ক্ষয় হইতেছে, আবার তাহাই নব নব পদার্থের সাহায্যে শরীরে নানারূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষ সৃষ্টি করিতেছে। মানুষের দেহের কয়েকটী উপাদান সম্বন্ধে এ বিষয় আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে।

মানুষের দেহ ধাতব, উপধাতব এবং জৈবিক পদার্থের সংযোগে গঠিত, এবং আমরা যাহা আহার করি তাহার মধ্যেও এমন সকল জিনিষ আছে যাহার মধ্যে এই তিনটী উপাদান নিহিত আছে—কেননা, এই সকল উপাদানের অভাবে শরীর বিকল হইয়া পড়ে। আমাদের চলা ফেরা ও নানারূপ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফলে জীবকোষের ভিতরে যে সকল জীবাণু থাকে তাহার কিছু কিছু মরিয়া যায়। অতএব উপযোগী খাদ্য যখন গ্রহণ করা হয় তখন তাহা চর্ব্বণের সময় মুখের মধ্যে যে লালা দাঁতের গোড়া হইতে নিঃসৃত হয় তাহার সাহায্যে পাকস্থলী, যকৃত এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে পরিভ্রমণ করে এবং তাহার কতকটা অংশ রক্তাকারে জীব কোষের মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার জন্য ক্ষয় প্রাপ্ত জীবাণু-গুলি শরীর হইতে বাহির হইয়া যায় এবং নূতন রক্ত চলাচলের সাহায্যে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন, যে আমাদের শরীরের সমস্ত উপাদানগুলিকে analyse অর্থাৎ বিচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করিলে ৭২ ভাগ অম্লজান, অঙ্গার ১০॥, উদ্‌যান ৯, যবক্ষার জান ৪॥, ক্যালসিয়াম অর্থাৎ চূণ জাতীয় পদার্থ ১·৩, ফস্‌ফরাস্ (দীপক জাতীয় পদার্থ) এবং গন্ধক, লৌহ, লবণ, ক্লোরিণ, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি পদার্থও পাওয়া যায়। এই সমস্ত উপাদানগুলি প্রায়ই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে না—দুই একটি বাদে প্রায়ই একত্রে শরীরের নানা স্থানে থাকিয়া নিজেদের পুষ্টি সাধন করে। ইহার প্রত্যেকটি উপাদানকে আবার বিশ্লেষণ করিলে তাহার ভিতরে অনেক জিনিষ পাওয়া যায়। এই সকলের মিশ্রণেই শরীর টিকিয়া থাকে।

এই মানব দেহের রক্ষা ও পুষ্টি সাধন করিয়া পৃথিবীকে ভোগ করিতে হইলে, বাঁচিতে হইলে আমাদের এমন খাদ্য গ্রহণ করা দরকার, যাহাতে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান গঠন করিতে ও দেহ মন সুস্থ রাখিতে পারা যাইবে। খাদ্যের উপর দেহ মনের স্ফূর্তি, বিকাশ ও সংরক্ষণ নির্ভর করে, ও এই খাদ্যের তারতম্য অনুসারে দেহ মনের গতিও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তাই জার্ম্মান কোন এক বিখ্যাত দার্শনিক স্থির করিয়াছেন যে, মানুষ যাহা খায় সেই সেই খাদ্যাদির দোষ গুণানুসারে বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করে।

সাধারণতঃ আমাদের খাদ্যের ভিতর প্রোটীন বা এমন আমিষ জাতীয় সার অংশ থাকা দরকার যাহাতে শরীরের ভিতর প্রয়োজনানুরূপ তাপ উৎপাদন করিতে পারে, যাহার সাহায্যে ভোজ্য দ্রব্য সহজে পরিপাক হইতে পারে। এই আমিষ জাতীয় খাদ্যই দেহে তেজ ও শক্তি আনয়ন করে এবং শরীরের বিভিন্ন যান্ত্রিক ক্রিয়ার পরিচালন করিতে ক্ষমতা দেয়। দেহ-তন্তু নির্ম্মাণ করিতে এ খাদ্যের দরকার অপরিহার্য্য। মাছ, মাংস, ছানা ও ডাল প্রভৃতি খাদ্যের ভিতর এই প্রোটীন

জাতীয় জিনিষ বর্ত্তমান আছে। তার পরে তৈল জাতীয় খাদ্য হইতে শরীরে চর্ব্বি বৃদ্ধি হয় এবং এই চর্ব্বি জাতীয় জিনিষ ঘৃত, তৈল, মাছ ও মাংসের চর্ব্বিতে পাওয়া যায়। অতঃপর শালি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা দরকার এবং এই প্রকার খাদ্যও শরীরে চর্ব্বি উৎপাদন করিতে বিশেষ সহায়তা করে। চাউল, গম, আলু, চিনি, সুজি প্রভৃতি এইরূপ শালি জাতীয় খাদ্য। লবণ জাতীয় খাদ্য আমাদের অবশ্য গ্রহণীয়—কেননা, ইহার দ্বারাই অস্থিগঠন, পরিপাক কার্য্য সাধন ও শরীর পুষ্টি প্রভৃতি হইয়া থাকে। আমরা যে লবণ খাই তাহা ছাড়াও শাকশব্জী ও ফল মূলের মধ্যে এই জাতীয় খাদ্য বিদ্যমান আছে। জলীয় পদার্থ এবং সাধারণ জল শরীরের পক্ষে একান্ত আবশ্যক—ইহার অভাবে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক ও শরীর পোষণ হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত মাংস পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলী নিস্তেজ হইয়া পড়ে; শরীর শুকাইয়া যায়, দেহের অভ্যন্তরস্থ দূষিত পদার্থ বাহির হইতে পারে না। এই জলীয় পদার্থ আমাদের পানীয় জল ছাড়াও আমাদের অন্যান্য খাদ্যের মধ্যেও কতক পরিমাণে থাকে। ইহা ছাড়াও এমন খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে খাদ্য প্রাণ বা ভাইটামিন বর্ত্তমান—কেননা, ইহার অভাবে জীবনী শক্তি খর্ব্ব হয় এবং নানারূপ ব্যাধি শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বাঙ্গালীদের খাদ্য বিষয় মোটামুটি আলোচনা করা—এতক্ষণ খাদ্যের বিষয় যাহা বলা হইল ইহা সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। এখন বাঙ্গালীর জীবন যাপন প্রণালীর বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া এবং বাংলার আবহাওয়া ও জলবায়ু অনুসারে কিরূপ পথ অবলম্বন করা প্রযোজ্য এবং শিশুদেরও সাধারণতঃ কি ভাবে ও কি কি খাওয়ান উচিত সে বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইবে। মোটামুটি আহারের সম্বন্ধে কয়েকটী জিনিষ জানা দরকার। বাঙ্গালী জীবনে খাওয়ার জন্য বিশেষ কোন নিয়ম পালন করাই হয় না। কতগুলি অভ্যাস, যেমন বাত ও অজীর্ণ রোগে ভুগিলেও অনেকে চা খাইয়া থাকেন, কেহ কেহ স্নান না করিয়াই আহার করিতে বসেন ও আহারান্তে স্নান করেন—এরূপ অভ্যাস অথবা শরীরের উপর অমনোযোগিতা অতীব অহিতকর। কোন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের অব্যবহিত পরে—অথবা হাত, পা, গাত্র ভাল করিয়া পরিষ্কার না করিয়া কখনও ভোজন করিতে বসিতে নাই।

অনেকেই ভাল করিয়া ভুক্তদ্রব্য চিবান না; কোন রকমে তাড়াতাড়ি করিয়া ভোজন শেষ করেন, খাওয়ার সময় বারংবার জল পান করেন, আহারের অব্যবহিত পরেই কোনরূপ বিশ্রাম না করিয়া কোথাও ছুটিতে আরম্ভ করেন—এই সকল অভ্যাস শরীরের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। হোটেল কিম্বা রেস্তোরাঁয় খাওয়া বাঙ্গালীর বিশেষতঃ সহরে বাঙ্গালীর একটী আদব কায়দার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে—এই সকল চার দোকান কিম্বা রেস্তোরাঁগুলি রোগের আকর এবং নানারূপ খারাপ খাদ্য সরবরাহ করিয়া থাকে। প্রত্যহ একই প্রকার খাদ্য গ্রহণ করাও উচিত নয়, আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা দরকার এবং কখনও ভোরে, কখনো এক প্রহরের মধ্যে খাওয়া বিধেয় নয়। পরস্পর বিরোধী খাদ্য অর্থাৎ মাংসের সঙ্গে দুধ, দধির সঙ্গে কলা এবং খিচুরীর সহিত পায়স গ্রহণ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। ভোরে খালি পেটে কিছু জল পান করিলে ভাল হয়—ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে সহায়তা করিয়া থাকে। বাঙ্গালী দেহের পক্ষে মোটামুটী কত পরিমাণ খাদ্য দৈনিক গ্রহণ করা দরকার, তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

বাঙ্গালী যুবকের জন্য—

চাউল—২½ ছটাক, দাল—১ ছটাক, মাছ বা মাংস ৩ ছটাক, আলু ও অন্যান্য তরকারী ৫ ছটাক, আটা—৫ ছটাক, ঘৃত ও তৈল—১ ছটাক; চিনি বা গুড় ½ ছটাক; দধি—২ ছটাক লবণ ¼ ছটাক,

পূর্ণ বয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের জন্য—

চাউল—৩ ছটাক, আটা—৫ ছটাক, দাল—½ ছটাক, মাছ বা মাংস ২½ ছটাক, আলু ২ ছটাক, অন্যান্য তরকারী—২ ছটাক, তৈল বা ঘৃত—½ ছটাক, দুগ্ধ ৮ ছটাক এবং যথা পরিমাণ মসলা।

আমরা সচরাচর যে সকল খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি তাহার পরিপাকের জন্য সাধারণতঃ যতটা সময়ের দরকার তাহার কাল এখানে দেওয়া যাইতেছে—

খাদ্য	পরিপাকের কাল
ভাত	২ ঘণ্টা
দাল	৩ হইতে ৪ ঘণ্টা
কাঁচা ছোলা ও মটর	৩ ঘণ্টা
মুগের যুস	১ ,,
খিচুরী	৪ হইতে ৫ ,,
পলান্ন	৫ ঘণ্টা
পায়সান্ন	৪ ,,
সাগু, বার্লি, এরারুট	১ হইতে ২ ঘণ্টা
মুড়ি	২ ঘণ্টা
খই	১ ,,
পাউরুটী	৩ ,,
রুটী	৩ ,,
লুচি, কচুরি	৩ ,,
মাংস	৪ হইতে ৫ ঘণ্টা
গোলআলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি	৩ ঘণ্টা
ঝিঙ্গে, এঁচোড়, কাঁচকলা পটল, বেগুন প্রভৃতি	৩ ঘণ্টা
মূলা	৩ ,,
ডিম (কাঁচা)	২ ,,
ডিম অর্দ্ধ সিদ্ধ	৩ ,,
ডিম সুসিদ্ধ	৪ ,,
ডালিম	১ ,,
বাদাম পেস্তা	৪ ,,
আম	৩ ,,
আনারস	২ ,,
ঝুনা নারিকেল	৩ ,,
বেল	২ ,,
রোহিত, ইলিশ ও চিংড়ি প্রভৃতি মাছ	৩ ,,
গুড়, সন্দেশ, চিনি প্রভৃতি মিঠাই	৩ ,,

রান্নাঘর ও পাকের জন্য তৈজস পত্রাদির উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। বড়ই দুঃখের কথা, আমরা বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে নিকৃষ্ট ঘরটীকে পাকের ঘরের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি এবং তৈজস পত্রাদি উপযুক্ত রূপে পরিষ্কার করিবার জন্য বিশেষ লক্ষ্য করি না। পাকের ঘরকে পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার—এবং সে ঘরে যাহাতে প্রচুর আলো হাওয়া প্রবেশ করিতে পারে ও নিকটেই ভালরূপ পয়ঃপ্রণালী থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

গৃহের তৈজস পত্রাদি কোনরূপ গোময় কিম্বা অন্যান্য কোন ময়লা জিনিস কি অপরিষ্কার ন্যাতা দিয়া ধোওয়া অত্যন্ত অপকারী। যাহাতে সাবান দিয়া বাসন ও গ্লাস বাটী প্রভৃতি ধোয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কোন জিনিষ আঢাকা কিম্বা কোন ময়লা জিনিষ পাকের ঘরে থাকিলে নানারূপ রোগের বীজাণু ঘরে প্রবেশ করে এবং ইহা ছাড়া পোকা, মাছি প্রভৃতি প্রাণীরাও বহু দূষিত বীজাণু ছড়ায়। উহার প্রকোপ হইতে সকল সময়ই সতর্ক না থাকিলে রোগে আক্রান্ত হওয়া অনিবার্য্য।

শিশুর খাদ্য বিষয় বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর শরীর সম্যক পুষ্টিলাভ করিতে পারিবে না। এইজন্য শিশুদের খাদ্যের প্রতি প্রত্যেক পিতামাতার অত্যধিক পরিমাণ মনোযোগী হইতে হইবে। দুগ্ধই শিশুদের প্রধান খাদ্য। খাঁটী, বীজাণুবিহীন গো দুগ্ধ অথবা ছাগ দুগ্ধ পরিণত শিশুর জন্য অন্ততঃ দিনে একসের দরকার। শিশু একবৎসরে পদার্পণ করিলে কিছু কিছু ভাত অথবা চিঁড়ের মণ্ড খাইতে দেওয়া ভাল, তাহা হইলে অজীর্ণতা কমিয়া যাইবে এবং যকৃতের পীড়া

হইবে না। শিশুও সুস্থ, সবল হইবে। যাহারা মনে করেন যে শিশুকে ভাত খাওয়াইলে চেহারা ও শরীর খারাপ হইয়া যাইবে, তাহারা ভুল করেন। পরিমিত রূপে ভাত খাওয়াইলে শরীর ভালই হইবে। ছোট ছোট মাছ বা মাছের ঝোল, কিছু কিছু শাকশব্জী দেওয়া চলিতে পারে। শিশু যাহাতে দাঁত দিয়া চিবাইয়া খাইতে শিখে তাহার অভ্যাস করাইতে হইবে। ডিমের কুসুম, অল্প অল্প পরিমাণ ফল যথা আঙ্গুর, আপেল, নেসপাতি, বেদানা, কিসমিস্, মনাক্কা, আখরোট, শশা, কলা, পিয়ারা, তরমুজ, আনারস, পেঁপে, আম—জল খাবারের জিনিষ যথা—মুড়ি, মুড়কি, খই, ভিজামুগ, অঙ্কুরিত ছোলা, ছোলা ভিজান, কলাই শুঁটী শিশুদের দেওয়া যাইতে পারে। শিশুদের পক্ষে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে রৌদ্র সেবন, উপকারী। রাত দশটার পর কিম্বা যখন তখন শিশুকে খাওয়ান উচিত নয়। ছোট শিশুদের বয়স ভেদে একটী খাদ্য তালিকা দেওয়া গেল।

বয়স	দুধ	জল	পরিমাণ	সময়ের ব্যবধান
১ সপ্তাহ	১ ভাগ	২ ভাগ	½ ছটাক	৩-৪ ঘণ্টা
১ মাস	২ ,,	৩ ,,	১ ,,	৪ ঘণ্টা
৩ মাস	১ ,,	১ ,,	½ পোয়া	৪ ঘণ্টা
৬ মাস	৩ ,,	১ ,,	১ ,,	৪ ঘণ্টা

তিন বৎসর হইতে পাঁচ বৎসরের শিশুদের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ মোটামুটী এইরূপ—

চাউল ½ ছটাক, ডাল ½ ছটাক, আলু—১ ছটাক, দুধ ৩ পোয়া, কাঁচা ডিম, (কুসুম) ১ টা, গুড় বা চিনি ½ ছটাক, চিড়ে বা মুড়ি ½ এবং অন্যান্য ফল অবস্থা ও বয়স ভেদে উপযুক্ত ভাবে দৈনিক কিছু কিছু দেওয়া ভাল।

আমরা যে সকল বস্তু খাদ্যের জন্য গ্রহণ করি তাহার মধ্যে এমন কতগুলি রাসায়নিক উপাদান আছে। যাহাতে খাদ্য প্রাণ বা খাদ্য বীর্য্য অল্প বিস্তর কিছু না কিছু বিদ্যমান আছে। এই খাদ্য প্রাণের নাম দিয়াছেন বৈজ্ঞানিকেরা 'ভাইটামিন' এবং খাদ্য দ্রব্যেতে বিভিন্ন রকম ভেদে তাহার মধ্যে এই খাদ্য প্রাণ যে ভাবে মিশিয়া আছে তাহার অল্পাধিক তারতম্য অনুসারে কয়েকটী বিভাগ করিয়াছেন। আমরা এই শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী 'ভাইটামিন' বা খাদ্য প্রাণের তালিকা দিতেছি। এই খাদ্য প্রাণের অভাব হইলেই আমাদের নানা ব্যাধি হয়। বর্ত্তমানে যে বেরি বেরি ব্যাপক ভাবে দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ 'ভাইটামিন' যুক্ত খাদ্য গ্রহণের স্বল্পতা।

খাদ্য প্রাণ 'ক'

বৃহৎ জাতীয় মাছে, মাংসে, পক্ষীর ডিমে, যাবতীয় দুধে, দুধের সরে এই খাদ্যপ্রাণ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। টাটকা পালং শাকে, আনারসে, মৎস্য-তৈলে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। টাটকা শাকশব্জী, ফুল কপি, বাঁধা কপি, বিলাতী বেগুন, আলু, পেঁপে, আপেল, চিনাবাদাম, নারিকেল, বেল প্রভৃতিতে কতক পরিমাণে আছে। এই শ্রেণীর খাদ্য প্রাণের অভাব হইলে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়ে, রক্ত কমিয়া যায় এবং দৃষ্টি শক্তির হ্রাস হয়।

খাদ্য প্রাণ 'খ'

ডিমে এবং মাছের ডিমে বেশী দেখা যায়। যাবতীয় দুধে, ঘোলে, ছানায়, ঢেঁকি ছাঁটা চাল, চিঁড়া, দাল, গম, সাগু, বার্লি, রাই, ভুট্টা মকাই প্রভৃতিতে এই শ্রেণীর খাদ্য-প্রাণ

আছে। পালং শাকে ও ঢেঁড়সে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত নানাবিধ শাকশব্জীতে ও ফলে যথা,—টাটকা মটর শুঁটী, অল্পসিদ্ধ আলু, পিয়াজ, লেটুস্, শাক, ফুল কপি, বিলাতী বেগুন, শালগম, নারিকেল, বাদাম, আখরোট, পেঁপে, আপেল, আঙ্গুর, কাগজি ও পাতিলেবু, আনারস, কমলালেবু, এবং বাতাবী লেবুতে এই শ্রেণীর 'ভাইটামিন' লক্ষিত হয়। এই প্রকার খাদ্যপ্রাণের অভাব হইলে পিত্তবিকার, ক্ষুধামান্দ্য, পরিপাকশক্তি হীনতা প্রভৃতি ব্যাধি হয়।

খাদ্যপ্রাণ 'গ'

এই প্রকার খাদ্যপ্রাণ এই সকল খাদ্যে বর্ত্তমান আছে, যথা—পাতি লেবুর রস, কমলালেবুর রস, আনারস, কলা, আপেল, আঙ্গুর, আম, জাম, বেল, তাল শাঁস, বিলাতী বেগুন বাঁধা কপি, লেটুস, শাক, টাটকা মটরশুটি পালং শাক, মূলার খোসা, শালগম, কাঁচা কলা, পেঁয়াজ, মুগ, অল্পসিদ্ধ আলু প্রভৃতি জিনিষে। এই খাদ্য প্রাণের অভাবে দাঁতের রোগ জন্মে।

খাদ্যপ্রাণ 'ঘ'

খাদ্যপ্রাণ 'ঘ' যে যে সকল জিনিষে বিদ্যমান আছে তাহার তালিকা :—

মাছের ও পক্ষীর ডিমে, কড্‌লিভার তৈলে এবং কাঁচা দুধে—এই খাদ্য প্রাণের অভাবে শিশুদের নানারূপ অস্থি জাতীয় পীড়া জন্মে এবং সহজে দাঁত উঠেনা।

খাদ্যপ্রাণ 'ঙ'

এই প্রকার খাদ্যপ্রাণ যে যে জিনিষে আছে তাহার তালিকা—ছোট কচি ছাগমাংস, গম, শাকসব্জী ও মটর দালে।

সাধারণতঃ বাঙ্গালীরা যে সকল জিনিষ আহার করে তাহার মধ্যে কোন কোন খাদ্যের মধ্যে জল জাতীয়, ছানা জাতীয়, মাখন জাতীয়, শর্করা জাতীয় ও লবণ জাতীয় উপাদান কি পরিমাণ বিদ্যমান, তাহার একটি ছোট তালিকা দেওয়া গেল।

খাদ্যের নাম	জলীয় ভাগ	ছানার ভাগ	মাখনের ভাগ	শর্করা	লবণ
চাউল	১২.৫	৭.৫	.৪২	৭৮.৪৯	.৭৬
চিঁড়া	৮.২	৯.২	.১	৭৪.২	৩.৩
খই	×	৫.৭	×	৫০.০	×
দাল	১১.৩	২.৩৫	২.২৯	৫৫.৯	৭.১
দুধ	৮৬.৮৭	৩.৯৭	৪.২৮	৪.৮২	.৬
গোধুম	৫২.৭	৫ ০	.১	৪১.৯	.৩
যাঁতায় ভাঙ্গা আটা	১১.৬০	১২.৮৬	৩.২১	৬৮.৫৮	২.৯৬
রুটী	১৭.৩৩	৯.৪৩	৩.৭১	৬৯.২০	.৩৬
দধি	৮৭.৮৪	৪.৭৭	৩.৫৭	২.৮	.৬২
মাখন	৭.৫	১.০	৯০.৫	×	১.০

খাদ্যের নাম	জলের ভাগ	ছানার ভাগ	মাখন জাতীয় উপাদান	শর্করা জাতীয়	লবণ জাতীয়
ছানা	৫৮·৭২	২১·৬৮	১৬·৮	২৮	১·৬৮
সন্দেশ	২০·২৫	১৮·১৭	১৯·৭৫	৪০.১৮	১·৬৫
হংসডিম্ব	৭০·৫	১৩·৩	১৪·৫	+	১·৩
মুরগীর ডিম	৭৩·৫	১৩·৫	১১·৬	×	১·০
ইলিশ মাছ	৭৬·৩৩	১৪·৮৫	৯·২৩	×	·৯৫
রুই প্রভৃতি মাছ	৭৪·৬০	১৮·৩৫	৯·৫৬	×	·৯৫
গলদা চিংড়ী	৮৩·০৫	১৫·৪৫	·৪৭	×	·৯০
আলু	৭৪·০	২·০	·১৬	২১·০	১·০
অন্যান্য তরকারী গড়ে	৭৮·৪৪	২·০৫	·৩৪	৫·৩৩	·৮১
অঙ্গুর প্রভৃতি ফল	৭৪·৫২	·৫৯	·৩৪	২৪·৩৬	·৫৩

বাঙ্গালীজাতি দিন দিন যেরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের খাদ্যের বিষয় সংক্ষেপে জ্ঞান থাকা দরকার। এবিষয়ের প্রতি উদাসীনতা মারাত্মক হইবে। যে সকল বিষয় বলা হইল তাহা একটু লক্ষ্য ও পালন করিয়া চলিলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য পুনোরুদ্ধারের আশা করা যায়। এ সকল বিষয় সকলের পক্ষেই ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

শ্রীআশুতোষ দাস
১১।৩ বি ডক্টর লেন,
কলিকাতা

বাংলার বাজেট

বাংলা দেশের বাজেট সম্পর্কে আলোচনার অন্ত নেই। গভর্ণমেণ্ট বিরোধী দল, এর নিন্দায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন, গভর্ণমেণ্টের সমর্থক দলও একে নিয়ে ভয়ঙ্কর মশগুল হয়ে পড়েছেন। এই দু'য়ের বাইরে যে দল অর্থাৎ বিরাট জনসাধারণ, তাঁরা বাজেট সম্পর্কে যে উদ্গ্রীব হ'য়ে ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার কারণ হচ্ছে মাননীয় অর্থসচিব মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার বাজেট রচনার ভার গ্রহণ করেছিলেন।

মিঃ সরকার অর্থনীতি সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি; তদুপরি দেশবন্ধুর আমলে সাবেক কালের ব্যবস্থা পরিষদে তিনি ছিলেন গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী ব্যক্তিগণের অন্যতম। বাংলার আর্থিক ব্যাপারে গলদ কোথায় তা' তিনি ভালই বোঝেন। এক সময় যে-সমস্ত দুর্নীতির জন্য গভর্ণমেণ্ট-বিরোধীরূপে তিনি গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা করতেন, আজ গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার হ'য়ে তিনি যে সে-সমস্ত গলদ অনেকখানি দূর করতে সমর্থ হ'বেন, জনসাধারণ সেইটাই আশা করেছিল। সেইজন্যই বাজেট সম্পর্কে একটা বিশেষ আগ্রহের অন্ত ছিল না। যাঁরা গভর্ণমেণ্টের নীতি পছন্দ করেন না, তাঁরাও বাজেটের জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিলেন।

বাজেট প্রকাশিত হ'বার পর সে-সম্পর্কে জনসাধারণের মনোভাব কিরূপ সে বিষয় সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং তার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা এটুকু বলতে পারি যে, বাজেটে কোন অভিনবত্ব নেই। অবশ্য এবারকার বাজেট একহিসাবে অভিনবত্ব সঞ্চার করতে পারে এইজন্য যে, এ বছরে ৩৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হ'বে। কিন্তু উক্ত উদ্বৃত্তের হেতু ব্যয়-সঙ্কোচ নয়, উক্ত উদ্বৃত্তের হেতু আয় বৃদ্ধি। পাটের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত মতে রাজস্বের অনেকখানিই প্রাদেশিক সরকার প্রাপ্ত হবেন; পূর্ব্বে এ-ব্যবস্থা বলবৎ ছিল না। সুতরাং তদ্দ্বারা রীতিমত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পুরাতন ব্যবস্থামতে প্রাদেশিক সরকারের তরফ হতে কেন্দ্রীয় সরকারকে যে-টাকাটা প্রদান করতে হ'ত, নতুন ব্যবস্থায় তার অনেকটা মকুব হয়েছে। কাজে কাজেই এধার দিয়েও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তজ্জন্যই বাজেটে ঐ উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্ছে।

বাজেট যে অভিনব কিছু হয়নি সেকথা অর্থসচিব মিঃ সরকারও স্বীকার করেন। তবে তাঁর কৈফিয়ৎ হচ্ছে যে মাত্র দু'মাসের মধ্যে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। মাননীয় অর্থসচিবের এই সময় সংক্রান্ত যুক্তিটা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়, হয়ত সময় বেশী পেলে তিনি অভিনব বাজেট প্রস্তুত করতে পারতেন। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে সেটা সম্ভব হয় নি।

আজকের বাংলার প্রধান সমস্যা হ'ল বেকার সমস্যা। বেকারদের হাহাকারে বাংলার আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত। বেকাররা শুধু যে বাংলার অধিকাংশ গৃহস্থের শান্তি নষ্ট করছেন তা' নয়, পরন্তু তাদের জন্য বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যেরও ক্ষতি ভয়ঙ্কর হচ্ছে। আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত না হওয়ার দরুণ বেকার সমস্যাও কিছুতেই দূরীভূত হচ্ছে না; এর একমাত্র কারণ হ'ল যে, বাংলা দেশের লোকের মোটেই ক্রয়-ক্ষমতা নেই। আর্থিক দিক দিয়ে এই ক্রয়-ক্ষমতা না থাকা একটা শোচনীয় ব্যাপার। দেশের লোকের হাতে যখন ক্রয়-ক্ষমতা না থাকে কিংবা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখনি জিনিষ পত্তরের দর পড়তে আরম্ভ করে, শিল্প-বাণিজ্য অচল হয় এবং তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বেকার সমস্যা শোচনীয় আকার ধারণ করে।

এর কারণ আছে। ক্রয় ক্ষমতা হ'ল সেই জিনিস যা' মানুষকে কোন জিনিস ক্রয় করতে সামর্থ্য দেয়—এবং উৎসাহ যোগায়। ধরুন, আপনি বেড়াতে বেরিয়েছেন; আপনার পকেট যদি স্বচ্ছল থাকে তবেই আপনি যেতে যেতে হয় দু' পয়সার চানাচুর, নয় ত ছেলেদের জন্য খেলনা কিংবা প্রয়োজনীয় এটা-ওটা-সেটা ক্রয় করেন। নিদেন পক্ষে আপনি খেয়াল খুসী মতে একবার সিনেমায় গিয়েও ঢুকে পড়েন। কিন্তু যদি আপনার পকেট একেবারে খালি থাকে তাহ'লে ঐ সমস্ত দ্রব্য কেনা আপনার পক্ষে সম্ভব হয় না কিংবা উৎসাহ আসে না। আপনার পক্ষে উক্ত 'সম্ভব না হওয়া', কিংবা 'উৎসাহ না আসা'র প্রতিক্রিয়া শুধু আপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, পরন্তু তা' দেশের ব্যবসা-বাজারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কি করে ছড়িয়ে পড়ে সেইটা বুঝতে পারলেই আমরা আসল তথ্যটি বুঝতে পারব।

আপনি যে উক্ত দ্রব্যগুলির কোনটাই কিনলেন না, তার ফলে বিক্রেতাদের মাল কতকটা অবিক্রীত রয়ে গেল। এই রকম আপনার মত বহু ব্যক্তি যাঁদের ক্রয় ক্ষমতা নেই, তাঁরা উক্ত দ্রব্যাবলী কিনতে না পারার দরুণ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ঘরে মাল জমা হয়ে রইল। ফলে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লাভ কম হওয়ার দরুণ তাঁদেরও ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়াতে তাঁরাও অনুরূপ দ্রব্য ইত্যাদি ক্রয় করা বন্ধ করলেন। এরই প্রতিক্রিয়া ধাপে ধাপে সারা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

অর্থনীতির অন্যতম মূলসূত্র হচ্ছে যে, অবস্থান্তর না ঘটলে চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী হ'লে দ্রব্যের দর হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সেই সূত্র অনুসারেই দেশের পণ্য সম্ভারের দর পড়তে আরম্ভ করল, এবং তারই ফলে দেশের যে বিরাট লোক বাহিনী অর্থাৎ কৃষক শ্রমিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়—তাঁদের দুঃখের সীমা রইল না।

আমাদের দেশেও ঐ ব্যাপারই ঘটেছে। জিনিষ পত্রের দর অত্যধিক পড়ে যাওয়ার দরুণই দেশের সমস্ত শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, কোন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফেল পড়েছে, কেউ কেউ বা অসম্ভব রকম লোক ছাঁটাই করছে। এমতাবস্থায় বেকার সমস্যা দূরীভূত হওয়া দূরে থাক, উক্ত সমস্যা আরও প্রবল আকার ধারণ করেছে। আর তারই অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতা আরও হ্রাস পাচ্ছে।

এই যে অবস্থা, এর থেকে বাঁচবার উপায় কি সেইটাই বর্ত্তমানে আলোচ্য বিষয়। ব্যবসা বাণিজ্য মন্দা হওয়ার দরুণ যখন কোন লোকের কাজ থেকে জবাব হয়, তখন শুধু যে সেই লোকটিরই পরিবারবর্গ উপোষ করে তা' নয়, পরন্তু তার ধাক্কা সারা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যে লোকটীর জবাব হ'ল তার ক্রয় ক্ষমতা শূন্য হওয়ার দরুণ তার নিকট হ'তে মুদী টাকা পেলে না, দুধওয়ালা টাকা পেলে না, এবং এরকম আরও অনেকে টাকা পেল না। শুধু তাই নয়, ঐ লোকটি ঐ সমস্ত পাওনাদারের নিকট হ'তে জিনিস কেনাও বন্ধ করলে। তাতে করে উক্ত মুদী, দুধওয়ালা প্রভৃতিরও ক্রয় ক্ষমতা কমে গেল। এই রকম ভাবেই শুধু একটি লোকের নয়, হাজার হাজার লোকের অনুরূপ অবস্থা দেখা দেওয়ায় দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা সাধিত হয়েছে।

উক্ত দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে দু'টি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা দরকার:—

(১) দেশের পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির আয়োজন।

(২) দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা।

প্রথমটি সম্পন্ন করতে গেলে কারও কারও অভিমত এই যে টাকার মূল্য হ্রাস করা দরকার। কয়েক বছর পূর্ব্বে বর্ত্তমান অর্থসচিব মাননীয় সরকার মহাশয় সারা ভারত ব্যাপী টাকার মূল্য হ্রাসের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন। তখন যাঁরা এই আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন বর্ত্তমানে তাঁরাও টাকার মূল্য হ্রাসের স্বপক্ষে মত দিচ্ছেন। তার কারণ হচ্ছে যে, অন্যান্য দেশও তাদের মুদ্রামূল্য হ্রাস করছে, সুতরাং এক্ষেত্রে ভারত যদি না তার টাকার মূল্য হ্রাস করে তাহ'লে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাকে রীতিমত লোকসান খেতে হ'বে। টাকার মূল্য হ্রাসের পক্ষে একটি প্রবল যুক্তি এই যে, এতে করে দেশের পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বর্ত্তমানে যে আর্থিক দুরবস্থা দেখা দিয়েছে তার সমাধানের জন্য অর্থাৎ পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য টাকার মূল্য হ্রাস করা প্রয়োজন।

আমরা 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে'র ১৩৪৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় বিদেশী মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম; তাতে দেখিয়েছি যে ফরাসী মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হ'বে। শুধু ফরাসী দেশ নয়, আরও গুটি কয়েক দেশও তাদের মুদ্রামূল্য কমিয়ে দিয়েছে—তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের দেশের পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করা। বাংলা দেশেরও সে পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় কি? আমাদের দেশের টাকার মূল্য যদি হ্রাস করা যায় তাহ'লে বিদেশের কাছে আমাদের জিনিষ অত্যন্ত সস্তা হ'বে এবং তার ফলেই আমাদের দেশের পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। সেইটাই বর্ত্তমানে কাম্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এখন সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা। আমরা জানি আমাদের এই যে আর্থিক দুরবস্থা দেখা দিয়াছে, তার কারণ হ'ল পণ্য দ্রব্যের অসম্ভবরকম মূল্য হ্রাস প্রাপ্তি। সুতরাং সেই দুরবস্থা যদি দূর করতে হয় ত পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির আয়োজন করা একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দ্বিতীয় কাম্য হচ্ছে দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। কিন্তু আমরা জানি যে, পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে যদি আমরা সমর্থ হই তাহ'লে দেশের লোকের হাতে ক্রয় ক্ষমতা আপনি এসে যাবে। পূর্ব্বেই দেখিয়েছি যে, কোন লোকের পকেটে যদি টাকা থাকে তবেই সে ইচ্ছামত জিনিস পত্তর কিনতে সমর্থ হয়। এই টাকা তাহ'লে কোথা হ'তে আসে? ভারত যে অত্যন্ত কৃষি-প্রধান দেশ এসম্বন্ধে কারও সন্দেহ নেই। সুতরাং কৃষি দ্রব্যের মূল্য যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহ'লে অন্ততঃ ভারতের শতকরা ৮০ জন লোকের হাতে অধিকতর টাকা আসবে। সুতরাং তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। বাকী রইল শতকরা ২০ জন লোক। মোটামুটি হিসাবে তার মধ্যে পড়ে শ্রমিক—চাকুরী জীবী, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, উকীল ও ইঞ্জিনীয়ারের দল। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এই শতকরা ২০ জনের অবস্থা ঐ শতকরা ৮০ জনের ওপর

নির্ভর করে ; অর্থাৎ উক্ত শতকরা ৮০ জন যদি আবশ্যক ক্রয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হ'য়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় তাহ'লে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে উক্ত ২০ জন লোকও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারবে। কি করে তাই দেখুন। যে ব্যবসায়ী, তার বরাত তখনি খোলে যখন তার মাল বেচা কেনা হয়। শতকরা ঐ ৮০ জনের হাতে যদি ক্রয় ক্ষমতা থাকে তাহ'লে তারা নানারকম জিনিষ পত্তর ক্রয় করে, সুতরাং ব্যবসাদারদের তাতে করে কেনা বেচা ভাল হয়। চাকুরী-জীবী ও শ্রমিক যারা, জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি হ'লে তাদের ক্ষতি হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের চাকুরী নষ্ট হ'বার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ ঐ শতকরা ৮০ জনের হাতে ক্রয় ক্ষমতা থাকার দরুণ তারা দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে চালু রাখে। আর চাকুরীজীবী কিংবা শ্রমিকের তখনই উন্নতির আশা থাকে যখন শিল্প বাণিজ্য ভাল ভাবে চালু থাকে। শুধু তাই নয়, এতে করে বর্ত্তমানে যারা কর্ম্মহীন বেকার হ'য়ে বসে রয়েছে, তারাও কাজ পায়। বাকী থাকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের দল। তাদের পেশাও একটা ব্যবসা বিশেষ এবং সে ব্যবসা তখনি ভাল চলে যখন মক্কেল বেশী থাকে। দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবীদের হাতে যখন ক্রয় ক্ষমতা থাকে তখনি ডাক্তার প্রভৃতিদের পসার বাড়ে। ধরুন একজন কৃষকের কথা, তার ঘরে টাকা থাকলে তবে ত সে রোগ হ'লে ডাক্তার দেখায় কিংবা প্রতিবেশীর নামে সদর আদালতে ১নং ঠুকে দেয়।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, আপাততঃ আমরা যদি কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম হই তাহ'লে দেশের জনসাধারণের হাতে ক্রয় ক্ষমতা নানান্ ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা দূরীভূত হয়। এইটেই এখন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনের। একথা কিছুতেই অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য যখন চড়া ছিল তখন কৃষককুল বাড়ী করেছে, গাড়ী চড়েছে, বৌ-এর গায়ের গয়নাও গড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রাণ খুলে তারা তখন দেনাও করেছে এই আশায় যে ফসল বিক্রী করে তা' শোধ দেবে। কিন্তু আজ তাদের অবস্থার শোচনীয় পরিণতির কথা ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। পেটে ভাত নেই, চালে খড় নেই, পরণে কাপড় নেই—দেনার আসল ত দূরের কথা, সুদও যোগাতে পারে না, জমিদারের খাজনাও দিতে পারে না। ক্রয় ক্ষমতার ঘরে তাদের এই শূন্যতা সারা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে অচল করে তুলেছে। সেই জন্যই দেশের আজ এই দুর্দ্দশা।

সুতরাং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। পূর্ব্বেই বলেছি যে, টাকার মূল্য হ্রাস করলে এ জিনিষটা কতকটা সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু মুদ্রাসংক্রান্ত পরিবর্ত্তনের ব্যাপার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। টাকার মূল্য হ্রাস করার প্রচেষ্টা ছাড়াও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির আয়োজনের জন্য প্রাদেশিক সরকারের অপরাপর কর্ত্তব্য আছে। আমরা জানি যে, আমাদের দেশের চাষ পদ্ধতির ক্রটী অনেক, যার জন্য অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে একর পিছু ফসল যথেষ্ট কম হয়। এই ফসল কম হওয়াটা কৃষকের পক্ষে একটা লোকসানের ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ, ফসল

বিক্রয়ের সে রকম সুবিধা না থাকার দরুণ বিক্রয় মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অথচ বিক্রয়কারীরা সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠিত ভাবে যদি ফসল বিক্রয় করতে পারতো তাহ'লে বিক্রয় মূল্য যে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

আমাদের মনে হয় এর জন্য গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে সমবায় পদ্ধতিতে এগ্রিকাল্‌চারাল্‌ ইম্‌প্রুভমেণ্ট এবং মার্কেটিং বোর্ড গঠন করা উচিত। সরকার যদি বলেন যে, তাদের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান আছে তাহ'লে তাকে আরও ব্যাপকভাবে সংগঠিত করা দরকার। নইলে, কলিকাতায় কেন্দ্রীয় অফিস রেখে কেবল খবরের কাগজে বিবরণী প্রকাশ করলে, আর বড় বড় এক্স্‌পার্টদের মোটা মোটা মাইনে গুনলে কৃষকদের তাতে কোন উপকার সাধিত হ'বে না। তাদের হাতে কলমে বুঝিয়ে দেবার জন্য এবং তাদের কার্য্যাবলী প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করবার জন্য লোক চাই। সেই হেতু প্রত্যেক জেলায় কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় স্থাপিত করে প্রতি থানায় শাখা কার্য্যালয় রাখা একান্ত আবশ্যক। শুধু তাই নয়; প্রতি ইউনিয়নে কর্ম্মী থাকা দরকার যিনি হাতে কলমে এবং ছায়া-চিত্র সংযোগে সমস্ত ব্যাপার চাষীদের নিকট পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। এর দ্বারা অনেক লোক চাকরী পেতে পারবে এবং কৃষকদের ফসলের পরিমাণ ও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

এর জন্য খরচ আছে স্বীকার করি, কিন্তু সে খরচ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অত্যাবশ্যক। আপাততঃ যে টাকাটা ঢালা হ'বে, কৃষকদের ফসল বৃদ্ধি পেলে রাজস্ব আকারে সেটা উঠে আসবে। নইলে বর্ত্তমানে একটা ঠাট্‌ বজায় রেখে এবং কর্ম্মচারীদের মোটা মাইনে গুণে যে অফিস বজায় রাখা হয়, তাতে টাকাটা সুফলে আসে না। এক্স্‌পার্টের প্রয়োজন যে নেই, তা' বলিনে, কিন্তু এক্সপার্টরা ত আর গ্রামে গিয়ে চাষীদের সকল ব্যাপার বোঝাতে যাচ্ছেন না। প্রয়োজন বেশী চাষীদের সঙ্গে হাতে কলমে কাজ করবার জন্য কর্ম্মীর, তাঁরাই বক্তৃতা ও প্ররোচনার দ্বারা চাষীদের দৃষ্টি ভঙ্গী বদলে দেবেন। টি সেস্‌ কমিটী গ্রামে গ্রামে প্রচার কার্য্যের দ্বারা যদি চাষীদের চা ধরাতে পারে, তবে গভর্ণমেণ্ট প্রচার কার্য্যের দ্বারা কেন কৃষকদের উন্নতি করতে সক্ষম হ'বে না?

এর জন্য চাষীদের অল্প সুদে মূলধন সাহায্য করা প্রয়োজন। এই টাকার অভাবেই কোন প্রচেষ্টা কার্য্যকরী হয়ে উঠে না। গভর্ণমেণ্ট এই মূলধন জনসাধারণের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। কৃষকদের অবস্থার উন্নতির প্রতি আমরা যে এত জোর দিচ্ছি তার কারণ হচ্ছে যে, কৃষকদের হাতে ক্রয় ক্ষমতা আনয়ন করার ওপরই ব্যবসা বাণিজ্যের বর্ত্তমান মন্দা অবস্থা দূরীভূত হ'বার সম্ভাবনা নিহিত আছে। আজ দেশে এই যে বেকার সমস্যার প্রাবল্য দেখা যাচ্ছে তার কারণই হ'ল ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দা অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানাদি যদি রীতিমত চালু থাক্‌তো তাহলে আজকের এই বেকারেরা তাতে কাজ পেত, এমন হাহাকার করত না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানাদির উন্নতি নির্ভর করে কৃষকদের অবস্থার উন্নতির ওপর। বেকারদের মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) সহুরে বেকার ;

(২) পল্লীগ্রামের বেকার।

শিল্প বাণিজ্য যদি রীতিমত চালু থাকে তাহ'লে সহুরে বেকাররা কাজ পায়। পল্লী-গ্রামের বেকারদের প্রধান জীবীকা হ'ল কৃষিকার্য্যে দিন মজুরী করা কিংবা দালালী অথবা ব্যবসা কার্য্য। কৃষি-শিল্পের উন্নতির দ্বারা যদি কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় তাহ'লে উভয় প্রকার বেকারেরই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। কারণ, কৃষিশিল্প রীতিমত চালু হ'লে যারা কৃষিকার্য্যে দিন মজুরী ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করত তারা কাজ পেয়ে থাকে এবং তার ফলেই শতকরা ৮০ জনের হাতে ক্রয় ক্ষমতা সঞ্চিত হওয়ার দরুণ দেশের শিল্প বাণিজ্য ভাল ভাবে চালু হওয়ায় সহুরে বেকারদের কাজ জুটে যায়।

শুধু মাত্র কৃষিকার্য্যের উন্নতি নয়; আরও নানা রকম শিল্প প্রচেষ্টা আছে যদ্দ্বারা দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাংলার মৎস্য-শিল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" গত কয়েক সংখ্যায় এসম্পর্কে রীতিমত আলোচনা করেছি, তার থেকে এটা সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে বাংলার মৎস্য শিল্পকে যদি ভাল ভাবে পরিচালিত করা যায় ত দেশের একটা প্রকৃত সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, বহু বেকার তাতে কাজ লাভ করবে। দেশের অসংখ্য খাল বিল আজ মজে গিয়ে ম্যালেরিয়ার ডিপো হয়ে রয়েছে, সেগুলি আজ দেশের সম্পদের কারণ না হয়ে বিপদের আবাসস্থল বলে পরিগণিত হচ্ছে। অথচ এমন একদিন ছিল যেদিন ঐ সমস্ত খাল বিল মৎস্যাদিতে পরিপুর্ণ থেকে দেশের লোকের স্বাস্থ্য সংগঠনে সহায়তা করত। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে; আমাদের 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' মৎস্য শিল্প সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করে এবং তার লাভালাভ দেখে দেশের কয়েকটি ব্যবসাত্মক মনোবৃত্তি সম্পন্ন ধনী বাংলার মজা খাল বিল সুসংস্কারে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁদের এ প্রচেষ্টা সুপরিচালিত হ'লে বাংলার সম্পদ যে বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমরা আমাদের উপরোক্ত প্রবন্ধে আরও দেখিয়েছিলাম যে, বঙ্গোপসাগরে যে প্রচুর মৎস্য সম্পদ রয়েছে তাকে কাজে লাগানো দরকার। উক্ত সম্পদকে যদি কাজে লাগানো যায় ত দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হ'বে। ১৯০৭ সালে এসম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট যে অনুসন্ধান কার্য্য চালিয়েছিলেন তার ফল আশাহীন নয়। আমরা সেই অনুসন্ধান কার্য্যের ফলাফল থেকে দেখিয়েছি যে, ইউরোপের সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবসার সঙ্গে তা' প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে। সে সম্পর্কে আমরা মন্তব্য করেছিলাম যে গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত কিংবা গভর্ণমেণ্ট পৃষ্ঠপোষিত কোম্পানীর অবিলম্বে এ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া দরকার।

মৎস্য-শিল্প ছাড়াও এরকম বহু শিল্প প্রচেষ্টা আছে যে-ধারে গভর্ণমেণ্ট মনোযোগ দিলে দেশের কতক লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ইত্যাদিকে কুটির-শিল্প হিসাবে প্রবর্ত্তিত করলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। গভর্ণমেণ্টের ডিরেক্টর অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ এর ডিপার্টমেণ্ট থেকে এবিষয়ে ব্যবস্থা করা হয় বটে কিন্তু তাহা সামান্য এবং কলিকাতার উপকণ্ঠেই সীমাবদ্ধ। তাকে আরও ব্যাপক ভাবে কাজে লাগানো দরকার এবং তা করতে গেলেই প্রতি জেলায় জেলায় অফিস এবং কর্ম্মচারী নিয়োগ করা আবশ্যক। উক্ত কর্ম্মচারিগণ গ্রামবাসীদের মধ্যে নানারকম ছোট খাটো শিল্প ব্যাপার সম্পর্কে আবশ্যকীয় তথ্যাদি বিতরণ করবেন।

আমরা এতক্ষণ ধরে যা' আলোচনা করেছি তার থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'বে যে, বাংলার কৃষিজীবীদের হাতে উপযুক্ত ক্রয় ক্ষমতা আনয়ন করবার ব্যবস্থা না করলে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা নেই। উক্ত কৃষককুলের অধিকাংশই বছরের মধ্যে চাষের কয়েক মাস ছাড়া বাদ বাকী সময় বসেই কাটায়। সেই বাদ বাকী সময়টা তাদের যদি কোন কুটির শিল্পে নিয়োজিত করা যায় ত তাতে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি হতে পারে এই রকম

অবসর সময়ে কুটির-শিল্পে নিয়োজিত থাকার ব্যবস্থা ইউরোপ ও রাশিয়ায় প্রচলিত আছে।

এইবার বাজেটের আলোচনায় আসা যাক্‌। আমরা উপরোক্ত যে সমস্ত ব্যবস্থার উল্লেখ করলাম তার জবাবে গভর্ণমেণ্ট বলতে পারেন যে, বুঝেছি ত সব কিন্তু টাকা কোথায়? কথাটার যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে আমরা মোটেই সন্দেহ করি না কিন্তু টাকা আসবার পথ কোথায় সে-ধারে আমরা সরকারকে অবহিত হতে বলি। আমরা পূর্ব্বে যে বেকারসমস্যা ও ক্রয় ক্ষমতার অভাবের কথা উল্লেখ করেছি সে-জিনিসটা মোটেই উপেক্ষার নয়। মানুষের সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যেমন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন, তেমনি সেই সমাজের মানুষের ভালভাবে জীবনযাত্রার পথ সুগম করবার জন্য গভর্ণমেণ্টের মনোনিবেশের প্রয়োজন। সুতরাং দেশের বেকার সমস্যার সমাধান কল্পে ও লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে গভর্ণমেণ্টের তরফে যে খরচ হবে সেটা অপরিহার্য্য। গভর্ণমেণ্টের পুলিশ রাখতে, সৈন্য পুষতে যে খরচ সেটা যেমন না হ'লে চলে না, তেমনি দেশের লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবার ব্যবস্থার জন্য যে খরচ সেটাও না হলে চলে না। এ জিনিসটা যে-রাষ্ট্র বোঝে না, সে-রাষ্ট্রের অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত নেই এবং সে-রাষ্ট্র আর যাই হোক্‌ না কেন, প্রজাবৎসল নয়।

বাংলা দেশের গভর্ণমেণ্ট বহুদিন থেকে টাকা অভাবের অজুহাত দেখাচ্ছেন কিন্তু ব্যয় সঙ্কোচের প্রতি তাঁরা নজর দিচ্ছেন কই? আমরা উপরে যে সমস্ত সমস্যার উল্লেখ করেছি অর্থাৎ দেশের মধ্যে বেকার সমস্যা, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির সমস্যা প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার মারাত্মক ভাবে বর্ত্তমান রয়েছে, গভর্ণমেণ্ট যদি সেগুলিকে অস্বীকার করতেন তাহলে না হয় বোঝা যেত যে গভর্ণমেণ্টের এধারে নজর না দেওয়ার কারণ রয়েছে। কিন্তু তা' ত নয়, গভর্ণমেণ্ট দেশের অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা সম্পূর্ণ রূপেই স্বীকার করেন অথচ তা দূর করবার জন্য দায়িত্বপূর্ণভাবে আশানুরূপ চেষ্টা করেন না! এ জিনিসটা একটু আশ্চর্য্যের নয় কি?

এটা বলা কিছুমাত্র অযৌক্তিক নয় যে, আয় বৃদ্ধি করবার পথ যদি না খোলা থাকে ত ব্যয় সঙ্কোচের দিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। আমার কোন জিনিস পরিচালনা করতে যদি একশো টাকা খরচ হয় এবং আমি যদি দেখি যে আমার আয়ে তা' সঙ্কুলন হচ্ছে না, তাহলে আমার ব্যয় সঙ্কোচ ছাড়া আর উপায় কি আছে? এ জিনিসটা না বুঝে যে ব্যবস্থা করতে যায় তার দ্বারা সমাজের কোন হিতসাধন ত হয়ই না, বরং সে নিজেও সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হয়। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের সমাজে রোগ, শোক ও অনাহারের অন্ত নেই, সুতরাং সেগুলো নিবারণ করবার চেষ্টা করাই ত আমাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য। নইলে আমরাই যদি নষ্ট হয়ে গেলাম ত আমাদের রক্ষার জন্য সৈন্য-বাহিনী মোতায়েন রেখে কি কাজ দেবে? দেশের লোকের আজ প্রধান সমস্যা হচ্ছে অন্নসমস্যা, পূর্ব্বেই বলেছি যে, সে-সমস্যার সমাধান করতে গেলে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা না করলে আর উপায় নেই। পণ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির অর্থ-নৈতিক কৃত্রিম উপায় যে টাকার মূল্য হ্রাস করা সেটাও পূর্ব্বে

উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত রূপ কৃত্রিম ব্যবস্থা করণের ভার প্রাদেশিক সরকারের হাতে নেই, আছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। কিন্তু উক্ত কৃত্রিম উপায় ছাড়া অনুরূপ ফল পাবার অর্থাৎ দেশের লোকের হাতে টাকা এনে ফেলবার আর একটি উপায় হ'ল উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাকরণ। এ-জিনিসটা প্রাদেশিক সরকারই করতে পারেন। আজ পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাসের জন্য দেশের চাষীদের ও ব্যবসায়ীদের দুরবস্থার অন্ত নেই। তার কারণই হল যে, উৎপাদনমূল্য ও বিক্রয় মূল্য কিংবা ক্রয় মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে যে মার্জিন (margin), পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস প্রাপ্তির জন্য সেটা একেবারে নীচ ধাপে এসে ঠেকেছে। পূর্ব্বে চাষীদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে যেখানে উক্ত মার্জিন একশো টাকা থাকতো; আজ সেখানে কুড়ি টাকা থাকে কিনা সন্দেহ। চাষীদের এই আয় হ্রাসই তাদের দুঃখ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব্বেই বলেছি যে চাষীদের এই আয় হ্রাস শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা' ব্যবসায়ীদের অপরাপর পণ্য দ্রব্যেরও মূল্য হ্রাসের কারণ হয়। ফলে সমাজের প্রত্যেক স্তরেই উপরোক্ত মার্জিনের অঙ্ক কমে যায়।

এর হাত থেকে বাঁচবার উপায় কি? পূর্ব্বের পরিচ্ছেদেই বলেছি যে, এর হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হ'ল উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাকরন। আজ আমাদের লাভের মার্জিন দাঁড়িয়েছে ধরুন ২০ টাকা। কিন্তু আমি যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারি ত সেই মার্জিন ২০ টাকা থেকে নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে। আমার জমিতে বিঘা পিছু গড়ে ধান ফলে ৮ মণ, সেই ৮ মণ আমি দেড় টাকা দরে বিক্রী করে পাই ১২ টাকা মাত্র। খরচ বাদ দিয়ে লাভের মার্জিনে আমার থাকে হয় ত ৯ টাকা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের দ্বারা আমি সেই জমিতে যদি ১৪ মণ ধান ফলাতে পারি তবে তা বিক্রী করে আমার আয় হয় ২১ টাকা। খরচ বাদ দিয়ে আমার লাভের মার্জিনে হয়ত থাকল ১৬ টাকা। উৎপাদন বৃদ্ধি করণ হেতু আমার হাতে এই যে অতিরিক্ত ৭ টাকার ক্রয় ক্ষমতা এল তা' পণ্য দ্রব্যের বাজারে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। ফলে ঐ ধানের দর আর ১৷৷০ টাকা থাকবে না' তা' বৃদ্ধি পাবেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য টাকার মূল্য হ্রাস করা ছাড়াও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করণের দ্বারা সে জিনিষটা সাধিত হ'তে পারে। কাজে কাজেই প্রাদেশিক সরকারগণ যদি কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভর করে বসে না থেকে এধারে মনোনিবেশ করেন ত দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। আমাদের পূর্ব্বোক্ত সকল আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, বাংলার আর্থিক দুর্দ্দশা দূরীকরণ মানসে কৃষকদের পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করাই অন্যতম প্রধান কাজ। তা' করবার জন্যই যে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন এটাও আমরা উল্লেখ করেছি। উক্ত উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারটা সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত করতে গেলে আমাদের প্রস্তাবিত এগ্রিকাল্‌চারাল্ ইম্‌প্রুভমেণ্ট্ বোর্ডের শাখা কার্য্যালয় সমূহ বাংলা দেশের প্রতি থানায় প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। কিন্তু আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মাননীয় অর্থসচিবের বাজেটের মধ্যে উক্ত ব্যবস্থা করণের জন্য কোন ব্যয় দফা সন্নিবেশিত হয় নি।

আমাদের বাজেটের সমালোচনা হ'ল এইটাই। আমরা চাই দেশের কল্যাণ এবং সে কল্যাণ তখনি সাধিত হতে পারে যখন দেশের সকল লোকের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হয়। সেই আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করবার উপায় আমরা উল্লেখ করেছি। গভর্ণমেণ্টের তরফ হ'তে সে পন্থা অনুসরণ করা উচিত ছিল, কিন্তু তাঁরা তা' করেন নি। দেশবাসী এই জন্যই বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের ওপর বিরূপ। দেশের লোকের এধার দিয়ে সুবিধা করবার যথেষ্ট ব্যবস্থা করে বাজেটে যদি পুলিশ বিভাগের, গোয়েন্দা বিভাগের এবং আমলাতান্ত্রিক কর্ম্মচারী বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করা হ'ত তাহ'লে হয়ত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এত আন্দোলন সৃষ্টি হ'ত না। একটা জিনিষ গভর্ণমেণ্টের সব সময় মনে রাখা দরকার। সাধারণ লোকে সহজে পলিটিক্সের দিকে ঘেঁসতে চায় না, তারা সচ্ছলতা প্রাপ্ত হ'লেই সন্তুষ্ট থাকে। সুতরাং প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের প্রধানতম কর্ত্তব্য হ'ল জনসাধারণের এই আর্থিক স্বচ্ছলতার ব্যবস্থা করা। সে ব্যবস্থা যে গভর্ণমেণ্ট করতে অপারগ হয়, সে গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই জনপ্রিয় হ'তে পারে না। জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা যত কমে আসে ততই তারা পলিটিক্সে মেশবার জন্য ব্যগ্র হয় এবং সুযোগ পায়। তারা তখনি বলে যে, তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুর সংস্থান না করে গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত পুলিশ, গোয়েন্দা, আমলাতান্ত্রিক প্রভৃতি বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ করবার কোনই অধিকার নেই।

এই হ'ল জনসাধারণের সমালোচনা! আমাদের সমালোচনার বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। তাতে আমরা গভর্ণমেণ্টের অচল অবস্থা আনবার জন্য কোন ইঙ্গিতই করি নি, কিংবা বাজেটের নিন্দায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবে মশগুল হই নি। কিন্তু আমরা একথা বলতে এতটুকু দ্বিধা করিনা যে, উক্ত বাজেট বাংলার আর্থিক দুরবস্থা দূরীকরণে সাহায্য করবে না। সেই জন্যই আমরা মাননীয় অর্থসচিব মহাশয়কে এবিষয়ে মনোযোগ দিতে বলি। তিনি বিচক্ষণ লোক, এবিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, সাবেক কালের ব্যবস্থা পরিষদে এক সময়ে তাঁর কণ্ঠ থেকেই বাংলার আর্থিক উন্নতির দাবী উত্থাপিত হয়ে ছিল,—সুতরাং জনসাধারণ তাঁর নিকট অনেক কিছু আশা করে।

বর্ত্তমান বাজেটের স্বপক্ষে মাননীয় অর্থ-সচিব মহাশয়ের যা' বলবার আছে তা' আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি এবং একথা বলেছি যে, তাঁর সময় সংক্রান্ত যুক্তিটা উড়িয়ে দেবার নয়। আরও সময় গেলে তিনি হয়ত অভিনব বাজেট প্রস্তুত করতে পারতেন। আমরা যে সমস্ত হিতকর ব্যবস্থার উল্লেখ করেছি, মন্ত্রী-মণ্ডলী বলতে পারেন যে, অর্থাভাবের অজুহাতে সেগুলি করা যাবে না। অপরাপর কংগ্রেসী প্রদেশ কি করছে সে-প্রশ্ন একেবারে না তুলে একথা জোর করেই বলা চলে যে, অর্থাভাবই হোক্ আর যাই হোক্ এইরূপ ব্যবস্থা-গুলি অবলম্বন না করলে চলবে না। প্রত্যেকের বাঁচবার সমান অধিকার আছে; কিন্তু শুধু অধিকার থাকলেই ত হয় না, সে-অধিকার লাভের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্টের কাজ হ'ল সেই সুযোগ জনসাধারণকে প্রদান করা। তা' না হ'লে গভর্ণমেণ্ট রাখার কোন মানে হয় না। আমরা জানি এবং গভর্ণমেণ্টও ভাল ভাবে জানেন যে, বাংলার জনসাধারণের হাতে ক্রয় ক্ষমতা আনয়ন করবার ব্যবস্থা না করলে উপায় নেই। এই ক্রয়ক্ষমতাহীন হওয়ার দরুণই সমাজে আজ ঐ আর্থিক দুর্দ্দশা ও বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে। এটা সবাই জানেন যে, জনসাধারণের অসন্তোষ থেকেই রাষ্ট্র-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বাংলাদেশে এক সময় যে সন্ত্রাসবাদের প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল তার প্রধান কারণও ঐ বেকারসমস্যা। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট এদিকটা কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেন না।

কোন গভর্ণমেণ্টের অর্থাভাব দূর করবার প্রধানতঃ তু'টি উপায় আছে :—

(১) ব্যয়সঙ্কোচ।

(২) নতুন ট্যাক্স ধার্য্য।

(৩) জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি।

এইবার উপরোক্ত উপায়গুলি সম্পর্কে একে একে আলোচনা করা যাক্।

বাংলাদেশ ট্যাক্সের ভারে যে-রকম জর্জ্জরিত হয়ে আছে তাতে আবার ট্যাক্সের নাম করলে জনসাধারণ ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠবে। সুতরাং নূতনভাবে ট্যাক্স স্থাপনের নীতি কেউই সমর্থন করবেন না। তবে যদি এমন ব্যাপার হয় যাতে গরীব ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ওপর কোন চাপ পড়বে না, কেবল ধনীদের সে-ট্যাক্স বহন করতে হবে—তাহলে তাতে তেমন আপত্তি উঠবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইনকামট্যাক্স, উইল প্রোবেটের ফি, কোর্টের ট্যাক্স প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। ডিউটি ধার্য্যের ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে, সুতরাং প্রাদেশিক সরকারের এবিষয়ে কিছু করবার নেই। বাকী থাকে তাহলে সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীনে শিল্প পরিচালনার উপায়টি। এইটাই আপাততঃ একমাত্র পথ যাতে সরকারের আয় বৃদ্ধি ঘটতে পারে। কিন্তু এসম্পর্কে বিতর্কের উদ্ভব হতে পারে; বিতর্কের উদ্ভব হতে পারে এইজন্য যে, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শিল্প পরিচালনার নীতি অনেকেই সমর্থন করেন না। এইখানে সেই সমাজতন্ত্রবাদের প্রশ্ন আসে। সমাজতন্ত্রীরা যখন সরকার কর্ত্তৃক শিল্প পরিচালনার প্রস্তাব করেন তখন—তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে যে,

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে বিরাট লাভের অঙ্ক সেটা যেন ব্যক্তিগতভাবে গৃহীত না হয়ে জাতির তহবিল হিসাবে জনসাধারণের কল্যাণার্থে নিয়োজিত হয়। অ-সমাজতন্ত্রীরা বলেন যে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই ব্যবসার পক্ষে সুবিধাজনক, সুতরাং সরকার কর্ত্তৃক শিল্প-পরিচালনা নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। উভয় মতবাদের বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে এটুকু বলা চলে যে, প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্টই কিছু না কিছু শিল্প পরিচালনা করে থাকেন। আমাদের দেশের রেলওয়ের ব্যাপারটা তার উদাহরণ। সরকার কর্ত্তৃক এই যে কয়েকটি শিল্প-পরিচালনার ব্যাপার, ক্রমশঃ তা' বৃদ্ধি পাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এ-সম্পর্কে বাংলা দেশের ব্যাপারটাই ধরা যাক্। সরকার পক্ষের বক্তব্য যে, বাংলাদেশে প্রজার কল্যাণার্থ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় না এই জন্যই যে রাজকোষে অর্থের অভাব। সরকার পক্ষ এ জিনিসটি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী, ট্রাম কোম্পানী, টেলিফোন কোম্পানী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি কত লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ মারছে। গভর্ণমেণ্ট যদি উক্ত শিল্পগুলি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন ত সেই বিরাট লাভের অঙ্ক তাঁদের অধিকারে আসে। সুতরাং তখন আর অর্থাভাবের অজুহাত দেখানো চলে না। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, উপরোক্ত ব্যাপার একদিনেই সম্পন্ন হয় না—তার জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়।

কাজে কাজে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা দেশের আর্থিক উন্নতির পক্ষে ব্যয় সঙ্কোচ, ধনীদের ওপর ট্যাক্স স্থাপন এবং লাভজনক শিল্প সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন উপায়ই খোলা নেই। আর্থিক দুরবস্থা যেখানে এসে পৌঁছেচে, আমরা মাননীয় অর্থসচিব মহাশয়কে সেধারে অবহিত হ'তে বলি।

বেকার সমস্যা সমাধানের আর একটি দিক

বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থার দিকে যাঁরাই লক্ষ্য রেখেছেন তাঁরাই জানেন যে বাংলায় বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া ত দূরে থাক্ বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ বেকার-সমস্যার সমাধান কল্পে আলোচনার অন্ত নেই। এর এই কারণ হ'তে পারে যে, বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারটা আমাদের কেবল আলোচনায়ই পর্য্যবসিত হয়, কাজে আর কিছুই এগোয় না। কাজে যদি কিছুমাত্র এব্যাপারটা এগুতো তাহ'লে বেকারের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেত না। কাজের মধ্যে আমরা দেখেছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বেকার সমস্যার প্রতি মনোযোগ দেবার জন্য একটি বিভাগ খুলেছেন; তাঁদের এই বিভাগীয় পরিকল্পনা যদি পরিপূর্ণরূপেও সফল হয় তাহ'লে মাত্র ৩৬টি বেকার চাকরী পেতে পারবে। দেশের বিরাট বেকার সমস্যার নিকট যে সমুদ্রে শিশির বিন্দুও নয়!

আমাদের মনে হয় যে, বেকার সমস্যার যে কিছুমাত্র সমাধান হচ্ছে না তার কারণ আমরা বোধ হয় ঠিক আসল ব্যাপারটা ধরতে পারিনি। দু' দশটা কিংবা একশো দুশোকে চাকরী দিলে দেশের বেকার সমস্যার কিছুমাত্র হিল্লে হ'বে না, যতক্ষণ না আমরা উক্ত সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণটাকে ধরতে পারছি। আমাদের দেশের বক্তাগণ বেকার অবস্থা দূরীভূত করবার জন্য শিল্প বাণিজ্যের প্রসারতার কথা বলে থাকেন, কিন্তু শুধুমাত্র শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে বেকরাবস্থা দূরীভূত করা যাবে না। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী দেশে নয় বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যাদি প্রতিষ্ঠিত হ'ল, কিন্তু তারপর? দেশের লোকের যদি আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হয় তবে সেই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যাদি কিনবে কে? আমাদের ত আর স্বাধীন দেশ সমূহের মত শিল্পজাত দ্রব্যাদি কটাইবার colony বা উপনিবেশ নেই। কিম্বা তাহাদের মত ছলে বলে কৌশলে অপর দেশে যাইয়া মাল বেচিবার মত শক্তি ও সামর্থ্য নেই। সেইটাই হ'ল আসল সমস্যা।

আজ দেশের আর্থিক বাজারের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। নানারকম শিল্পব্যাপারে 'ওভার প্রোডাক্‌শন্' হ'য়ে রয়েছে, কিন্তু জিনিস-পত্রের ক্রেতা নেই। এই ক্রেতা না থাকার দরুণ অর্থাৎ দেশের লোকের ক্রয়-ক্ষমতার অভাব হওয়ার দরুণ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ফেল পড়ে। তখন সেই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত লোকদের চাকরী যায়, কাজে কাজেই তারা আবার বেকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, দেশে শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হলেই বেকার

সমস্যার সমাধান হয় না; আসল জিনিস হচ্ছে যে জনসাধারণের অবস্থা সচ্ছল হ'লে, অর্থাৎ তাদের হাতে ক্রয় ক্ষমতা বর্ত্তমান থাকলে তবেই বেকার সমস্যা দূরীভূত হবার সম্ভাবনা থাকে।

আমাদের দেশে যাঁরা বেকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন তাঁদের দৃষ্টি এদিকটায় তেমন ভাবে পড়ে না। অবশ্য আমাদের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে এটা যেন কেউ মনে না করেন যে আমরা নতুন নতুন শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা বিপক্ষে কিংবা উক্ত শিল্প-বাণিজ্য স্থাপনের দ্বারা বেকারদের কিছুমাত্র সাহায্য হয় না এই মত পোষণ করি। আমাদের বক্তব্য এই যে, দেশের লোকের হাতে যদি ক্রয়ক্ষমতা না থাকে ত তাহলে নতুন নতুন শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি স্থাপনের দ্বারা সাময়িকভাবে কোন ফল দেখা দিলেও স্থায়ীভাবে কোন কল্যাণ সাধিত হয় না। এর কারণ আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি।

ক্রয়ক্ষমতা না থাকার দরুণ প্রচলিত শিল্পগুলি ঘা খেতে লাগল, ইতিমধ্যে নতুন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। তাতে বেকারদের

মধ্য হ'তে গুটিকয়েক চাকরী পেলে এবং প্রচলিত বেকারের সংখ্যা কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হল। এই রকম যদি বারে বারে ঘটে তাহলে প্রয়োজনানুরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করলেই যে বেকারের সংখ্যা পুরোপুরিভাবে হ্রাস পাবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রয়-ক্ষমতাহীন সমাজে ব্যাপারটা ঠিক অন্য রকম দাঁড়ায়। সেখানে যেমনি একটি শিল্প স্থাপিত হওয়ার দরুণ কতকগুলি বেকার চাকরী পেলে, তেমনি ক্রয় ক্ষমতা না থাকার দরুণ মাল বেচতে না পারায় পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হ'তে লাগল এবং তার ফলে কতকগুলি লোকের চাকরী গেল। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, একধারে যেমন কতকগুলি বেকার কাজ পাওয়ার জন্য বেকার সংখ্যা হ্রাস পেলে অন্যধারে কতকগুলি লোকের জবাব হওয়ার দরুণ তারা বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে। ফলে স্থায়ীভাবে কোন কল্যাণ সাধিত হওয়া সম্ভব হ'ল না।

এইরকম অবস্থাই আমাদের সমাজে চলেছে, বরং এর চেয়ে শোচনীয় ফলই আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে। উপরোক্ত Conservation of unemployed energy যদি আমাদের সমাজে বজায় থাকত তাহ'লে নয় বুঝতাম যে, একধারে যেমন লোকের চাকরী যাচ্ছে অপরধারে তেমনি লোকে চাকরী পাচ্ছে—এতে করে অবস্থা পূর্ব্বের মতই আছে, খারাপ কিছু হয় নি। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা সেরকম মোটেই নয়, আমাদের কেবল চাকরী যাচ্ছে—চাকরী প্রাপ্তির সংখ্যা একেবারে মুষ্টিমেয়। সুতরাং আমাদের আর্থিক দুরবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় আকার ধারণ করছে। এর কারণ হচ্ছে যে, আমাদের সমাজের ক্রয় ক্ষমতা ত নেই, তা' ছাড়া আমাদের এখানে নিত্য নতুন শিল্প বাণিজ্যও স্থাপিত হয় না, বরং স্থাপিত শিল্প-বাণিজ্য ক্রমশঃ উঠে যায়।

এইরকম ব্যাপার আর কতদিন চলতে পারে? সেইটাই হ'ল প্রশ্ন। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে, ১৯৩১ সাল থেকে সেই যে বাজারের অবস্থা মন্দা হ'তে সুরু হয়েছে, আজ পর্য্যন্ত তার আর কোন শেষ নেই। যে কোন ব্যবসাদারকে (কাগজের বড় বড় ব্যবসায়ী ছাড়া; কারণ কাগজের বাজারে তাঁরা যে কিরকম এক একটি হিট্‌লার-মুসোলিনী তা' পত্রিকাসেবী মাত্রই অবগত আছেন) তার কারবার কি রকম চলছে জিগেস করলেই সে ম্লানহেসে জবাব দেবে—"আর মশাই বলবেন না, বাজার একেবারে মাটি হয়ে গেছে। কেবল লোকসান—কেবল লোকসান।" ব্যবসায়ীদের এই ভাষণের মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। আর ব্যবসা বাণিজ্যের এই মন্দা অবস্থার মূলকারণই হ'ল পণ্য মূল্যের হ্রাস প্রাপ্তি। উক্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাসের কারণই হ'ল দেশের লোকের ক্রয়-ক্ষমতার অভাব। আজ দেশে যে এত বেকারের সংখ্যা-ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার মূলে ঐ একই কারণ বর্ত্তমান। এক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৬টি কেন ৩৬০০ টি লোকের চাকরীর জোগাড় করলেও বেকার সমস্যা সমাধানের কোন উপায় হ'বে না।

পূর্ব্বেই বলেছি যে বেকার সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান করবার উপায় চাকরী প্রদান নয়, স্থায়ীভাবে উক্ত সমস্যার সমাধানের উপায় হ'ল দেশের লোকের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির

ব্যবস্থা করা। দেশের লোকের ক্রয়-ক্ষমতা আমরা যদি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হই তাহ'লে তা' আপনি দেশে শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠাকরণে সহায়তা করবে এবং তাতে বেকার সমস্যার সমাধান ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে। এইটাই হ'ল বর্ত্তমানে আসল কাম্য। এখন কথা উঠবে যে কি উপায়ে দেশের লোকের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে? এটা সর্ব্বজন স্বীকৃত যে লোকের হাতে যখন টাকা থাকে তখন তার ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। লোকের হাতে টাকা তখনি আসে যখন তার আয় বাড়ে। এই আয় বাড়াবার পন্থাটাই হ'ল ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়।

আমরা সকলেই জানি যে, দেশের মধ্যে শতকরা ৮০ জনের ওপর লোক কৃষক কিংবা কৃষি-ব্যবসায়ী। তাদের আয় বৃদ্ধি করতে হ'লে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রয়োজন।

উক্ত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করতে গেলে কৃষি কার্য্যের বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন এবং যৌথ-ভিত্তিতে বহুল পরিমাণ জমি একসঙ্গে আবাদ করার দরকার। তাছাড়া প্রধান প্রধান (Staple crops) কৃষিজাত দ্রব্যের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ এবং মার্কেটিং-এর উত্তম ব্যবস্থা করা দরকার যাতে করে বিক্রয় ব্যাপারে কৃষকেরা প্রতারিত না হয়। এছাড়া টাকার মূল্য হ্রাস করলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

উপরোক্ত ব্যাপার কি করে সম্ভব হয় সেটাই একবার অনুসন্ধান করা যাক্। ধরুন, কোন কৃষকের ৪ বিঘা জমি খাসে আছে এবং ৬ বিঘা জমি সে ভাগে চাষ করে। প্রচলিত ব্যবস্থায় বিঘে পিছু ৮ মণ ধান হওয়ার দরুণ সে খাস জমি থেকে ৩২ মণ এবং ভাগে চাষ থেকে ২৪ মণ ধান পায়। ধানের দর যদি গড়ে মণ পিছু ১৸০ থাকে তাহলে সে ঐ মোট ৫৬ মণ ধান থেকে ৯৮ টাকা পায়। এতে করে চাষের খরচ ইত্যাদি বাদ দিয়ে যা থাকে তাতে তার সংসার চালানো দুরূহ হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক উপায় ও যৌথ পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় তাহ'লে বিঘে পিছু ১২ মণ ধান ফলে। তাতে মোট ৮৪ মণ ধান থেকে সে ধানের পূর্ব্ব মূল্যেই ১৪৭ টাকা পেয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, মার্কেটিং ব্যবস্থার পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিহেতু ধানের দরও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে—সেক্ষেত্রে তার আরও বেশী লাভ হয়ে থাকে। তজ্জন্যই তার ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

দেশের শতকরা ৮০ জনেরও ওপর লোকের যদি উপরোক্ত উপায়ে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করানো সম্ভব হয় তবে তার ফল বড় কম নয়। এর দ্বারা পল্লীগ্রামে যেসমস্ত বেকার থাকে তারা কোন না কোন কাজ পায়, কারণ পল্লীবাসী কৃষকদের হাতে ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ পল্লীগ্রামের ব্যবসাবাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে এবং সেজন্য সেখানে যথেষ্ট লোক নিযোজিত হয়ে থাকে। পল্লীবাসীর ঐ আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রভাব সহরের শিল্প বাণিজ্যের ওপর বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়। দেশের অধিকাংশ লোকের হাতে ক্রয়-ক্ষমতা আসা মানেই হ'ল দেশের সকল প্রকার পণ্য-দ্রব্যের ক্রেতা বৃদ্ধি পাওয়া। তদ্দ্বারা সহরের শিল্পবাণিজ্য সমূহ বেশ ভাল চলে এবং শতগুণে প্রসারতা লাভ করে। তাতে করে বহু বেকার এই সমস্ত যায়গায় কাজ পেয়ে থাকে।

অতএব আমরা এধারে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। দেশের লোকের তাঁরা অবিলম্বে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন। তাহলে বেকার সমস্যা দুরীভূত হ'বার সম্ভাবনা থাকবে।

সঞ্চয় হীনের দশা

বয়স কালে হরেন বাবুর অর্থ সম্পদ, মান সম্ভ্রম, বন্ধুবান্ধব, সভাসদ, চাটুকার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার কথায় লোকে উঠিত বসিত। তিনি বলিলে লোকের চাকরি জুটিয়া যাইত। তিনি অসন্তুষ্ট হইলে কাহারও রক্ষা থাকিত না। ভোগে, বিলাসে, অভিনব খেয়ালে হরেন বাবুকে প্রাচীন বাদশাহী আদর্শের এক আধুনিক উদাহরণ বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। শুনা যায়, তিনি ছুটির সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইলে বাংলা দেশের মাটী ও জল হাওয়া ব্যতীত আর সকল উপকরণই সঙ্গে লইয়া চলিতেন। সুদূর পশ্চিমে, বাংলার একান্ত নিজের তরি তরকারী ও মৎস্য, অথবা যথাযথ ও নির্দ্দিষ্ট জাতীয় চাল, ডাল, তৈল, ঘৃত, চাকর, ঝি, বাসন, আসবাব, সটকা তামাক কিম্বা কোন কিছুর অভাব হইলে হরেন বাবু তাহা বরদাস্ত করিতেন না। কন্যার বিবাহ কিম্বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে হরেন বাবুর ফিরিস্তি জার্ম্মান সমরের হতাহতের তালিকার মতই সুদীর্ঘ ও সর্ব্বগ্রাসী হইত। সে আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কিন্তু এখনও সে কথা লোকে কিম্বদন্তীর মতই আওড়াইতে থাকে।

কিন্তু, এ হেন হরেন বাবু আজ চাকরী অবসানে হৃত-সম্পদ এবং বিগত যৌবন অবস্থায় ছোট আদালতের উকিল মহলের "টাউট"। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন বাদী ফরিয়াদীদের উপযুক্ত উকিল সরবরাহ করিয়া দিনান্তে দুই এক টাকা সংগ্রহ করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া যান। ছোট টিনের চালায় স্বপাকে আহার ও ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করেন। কেন? কারণ, কিছুই নহে —শুধু অর্থাভাব। যৌবনে অগাধ অর্থ সম্পদ অপব্যবহার করিয়া হরেন বাবু আজ নিঃসম্বল। কিছু টাকা যাহা ছিল ভাঁটার মুখে রাতারাতি বড়লোক হইতে গিয়া তথাকথিত ব্যবসায়ে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহার দৌলতে কত লোকের একদিন সুসময়ে গিয়াছে, আজ তাহারই অভাবের দিনে কাহাকেও কোথাও দেখা যায় না।

গল্পটী কিছু অভিনব নহে। সময়ে বার্দ্ধক্যের পুঁজি ঠিক করিয়া না রাখিলে অনেকেরই এই দশা হয়। শুধু মানুষ কেন, জীবজগতে সঞ্চয়ের মূল্য সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য। উদাহরণ, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি। সময় থাকিতে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখা প্রয়োজন।

জীবন-বীমারও সার্থকতা এই কারণেই। যৌবনে, রোজগারের সময়ে, বিন্দু বিন্দু, করিয়া যে অর্থ বীমায় রক্ষিত হয়, অভাবের সময়ে নিজের বা নিজের অবর্ত্তমানে, পরিবারবর্গের নিকট তাহাই প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, শীতল, সরোবরের রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হয়। বীমায় রক্ষিত অর্থ, সকল ভুল, ভ্রান্তি, মোহ, ও অপচয় আশঙ্কার উপরে। জীবিত থাকিলে বীমা বার্দ্ধক্যের সম্বল, মৃত্যু ঘটিলে পরিবারের আশ্রয়। ইহা ব্যতীত পুত্রের শিক্ষা কিম্বা কন্যার বিবাহের জন্যও বিশেষ বীমা করা যায়।

এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত উপদেশ পাইতে হইলে **ভারত ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ**, ভারত ভবন, কলিকাতা, ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। "ভারত" অদ্যাবধি তাহার বীমাকারীদিগকে এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়াছে। চল্লিশ বৎসরের পুরাতন আফিশ। বর্ত্তমানে মোট তহবিল দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। বীমার সর্ত্ত প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা ও লাভজনক। বীমাকারীদের পাওনা শোধ অতিসত্বর ও নির্ঝঞ্ঝাটে করা হয়। বাংলার সর্ব্বত্র এজেন্ট আছে।

য়্যান্টিসেপটিক্‌স্ বা রোগ বীজাণু নাশক

শরীরের কোন স্থানে কাটা, আঁচড়, ফোঁড়া, প্রভৃতি নানা কারণে ক্ষত উৎপন্ন হইলে, দেখা যায়, অনেক সময় শীঘ্র তাহা শুকায় না। তাহাতে পুঁজ, রস প্রভৃতি জন্মিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ যন্ত্রণা দেয়। ইহার জন্য অনেকে মলম, ঘি, এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকারের প্রলেপঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন কোন মলমে ও প্রলেপে অল্প দিনের মধ্যে ঘা সারিয়া যায় এবং লোকে তাহার উপকারিতা শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হয়। এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক রহস্যটী জানা দরকার। বাস্তবিক ঘা শুকাইবার ক্ষমতা শরীরের নিজেরই আছে। কোন প্রকার রোগ-বীজাণু ক্ষত স্থানে না আসিলে ভিতরের সেই শক্তিতে ঘা আপনা আপনি সারিয়া উঠে। রক্তে দোষ জন্মিলে সেই শক্তি কমিয়া যায়। সুতরাং যাহাদের রক্তের জোর আছে, তাহাদের ক্ষত স্থানকে যদি কোন প্রকার য়্যান্টিসেপটিক্ ঔষধের দ্বারা রোগ বীজাণু হইতে রক্ষা করা যায়, তবে শীঘ্রই ক্ষত সারিয়া উঠে। যাহাদের রক্তের জোর কম থাকে তাহাদের ক্ষত সারাইবার জন্য শুধু য়্যান্টিসেপটিক্ ঔষধ দিলে ফল হয় না। রক্তের জোর বাড়াইবার জন্য ঔষধ খাওয়া অথবা ইন্‌জেক্‌সনের আবশ্যক।

অনেক সময় সামান্য একটু আঁচড় কিম্বা কাটা হইতে ঘা বিষাক্ত হইয়া ভীষণ যন্ত্রণা দেয় ও বিপদ ঘটায়। এক্ষেত্রে তখনি একটু টিংচার আইওডিন লাগাইতে হয়, ইহা সকলেই জানেন। ছোট ছেলেমেয়েদের গায়ে অথবা মাথায় খোস্ পাঁচড়া অথবা নানা প্রকার ঘা হইয়া পুঁজ রস গড়ায়। সেস্থলে টিংচার আইওডিন দেওয়া যায় না। টিংচার আইওডিন যখন তখন দিতে হয় না। পুঁজ হইয়া গেলে, আর টিংচার আইওডিন ব্যবহার করা চলে না। ছেলেদের ঐ সব ঘা ঔষধযুক্ত লোসান অথবা আমাদের দেশীয় নিমপাতা সিদ্ধ গরম জলে ধোয়াইয়া তাহাতে য়্যান্টিসেপটিক্ পাউডার ছড়াইয়া দিতে ডাক্তারেরা উপদেশ দেন। ঐ পাউডারগুলিকে ঔষধের দোকানে ডাষ্টিং পাউডার বলে। ইহার দ্বারা ক্ষত স্থানকে রোগ বীজাণু মুক্ত করিয়া রাখিতে পারিলে শীঘ্র শীঘ্র ঘা শুকাইয়া যায়। আমরা নিম্নে এইরূপ কয়েকটি

য়্যান্টিসেপটিক্ পাউডারের ফরমুলা দিতেছি ;—

(১) বোরাক্স্ সোহাগা	৩	আউন্স
শুষ্ক ফটকিরি	৩	„
থাইমল (Thymol)	২২	গ্রেণ
ইউক্যালিপটল (Eucalyptol)	২০	ফোঁটা
মেন্থল (Menthol)	১½	গ্রেণ
ফেনল (Phenol)	১৫	গ্রেণ
গলথেরিয়া তৈল (Oil of gaultheria)	৪	ফোঁটা

এই সকল উপকরণের সহিত একটু কারমাইন(Carmine) মিশাইবেন, যেন সমস্ত ঔষধে একটু পিঙ্ক্ বা গোলাপী রং ধরে।

(২) ফটকিরি চূর্ণ	(ওজনে)	৫০	ভাগ
সোহাগা চূর্ণ	„	৫০	„
দানাদার কারবলিক য়্যাসিড্ (Carbolic acid crystals)	„	৫	„
ইউক্যালিপটাস্ তৈল	„	৫	„
অয়েল অব উইণ্টার গ্রীণ (Oil of Winter green)*	„	৫	„
মেন্থল (Menthol)	„	৫	„

*Oil of winter green এর রাসায়নিক নাম মিথাইল স্যালিসিলেট (Methyl Salicylate) উইণ্টার গ্রীণ নামক পুষ্পের মত ইহার সুগন্ধ।

থাইমল (Thymol)	,,	৫ ,,
(৩) বোরাসিক য়্যাসিড (Boracic Acid)		১০ আউন্স
সোডিয়াম বাই-বোরেট (Sodium bi-borate)		৪ ,,
ফটকিরি		১ ,,
জিঙ্ক্ সাল্‌ফো কারবোনেট্ (Zinc Sulpho Carbonate)		১ ,,
থাইমিক য়্যাসিড (Thymic acid)		১ ড্রাম

এই সকল উপাদান ভালরূপে মিশ্রিত করুন। যদি ঘা ধোয়াইবার জন্য ইহাকে লোসানের মত করিতে হয়, তবে ইহার এক ড্রাম অথবা দুই ড্রাম এক কোয়ার্ট গরম জলে গলাইয়া লউন।

এক্টোগ্যান্

এই নামে একটী ডাষ্টিং পাউডার ঔষধের দোকানে খুব বিক্রয় হয়। ইহা দেখিতে হল্‌দে আভাযুক্ত—সাদা, গন্ধহীন ও নিঃস্বাদ। ইহা জলে গলেনা। জিঙ্ক হাইড্রক্সাইড (Zinc hydroxcide) ও জিঙ্ক ডায়নাইড (Zinc dionide) এই দুইটী দ্রব্যের মিশ্রণে ইহা তৈয়ারী হয়। ইহাতে শতকরা ৮ ভাগ শক্তিশালী অক্সিজেন্ (Active oxygen) * থাকে। কাটা ঘায়ের উপরে ইহার বাহ্য প্রয়োগ হয়। সাইট্রিক (Citric), টার-টারিক (Tartaric) অথবা ট্যানিক (Tannic) য়্যাসিডের সহিত মিশাইয়া ইহাকে ভিজা ড্রেসিং-(moist dressing) রূপে চর্ম্মরোগে ব্যবহার করা হয়। ঐ সকল য়্যাসিডের সহিত মিশ্রিত হইলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। সেই শক্তিশালী অক্সিজেনের (Active oxygen) রোগবীজাণু নাশক ক্ষমতা খুব বেশী। আয়োডাইডের (Iodide) সহিত মিশ্রিত হইলে ইহা হইতে আইয়োডিন বাহির হয়। ডাষ্টিং পাউডার, মলম, অথবা প্রলেপরূপে ইহা ব্যবহার করা যায়।

অনেক সময় এই য়্যাণ্টীসেপটিক বা রোগ বীজাণুনাশক ঔষধ চূর্ণ কিম্বা তরল অবস্থায় ব্যবহার করিতে অসুবিধা হয়। কৌটায় অথবা শিশি বোতলে তাহা রাখিয়া দেওয়া কিম্বা প্রয়োজনমত সঙ্গে লইয়া যাওয়া অসুবিধাজনক। সেই জন্য ইহাকে শক্ত পেন্সিলের আকারে তৈয়ারী করা হয়। তখন উহাকে জামার পকেটেও রাখা যায় এবং চূর্ণ ও লোসানের মত ব্যবহার করিবার সময় অপচয় হইয়া নষ্টও হইতে পারে না। এই **য়্যাণ্টিসেপটিক পেন্সিল** তৈয়ারী করিবার প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল,—

(১)	ট্যানিন	প্রচুর পরিমাণ
	য়্যালকহল (Alcohol)	১ ভাগ
	ঈথার (Ether)	৩ ভাগ

প্রথমতঃ য়্যালকহল ও ঈথার মিশাইয়া লউন। এই মিশ্রিত তরল দ্রব্যের দ্বারা ট্যানিন ভিজাইয়া উহাকে পেন্সিলের আকারে ইচ্ছামত লম্বা ও মোটা করিয়া পাকাইয়া নিন। তারপর ঐ পেন্সিলগুলোর উপরে এক কোট্ কলোডিয়ন (Collodion) মাখাইয়া দিন এবং রূপোলী পাতে (Silver leaf) উহাদিগকে মুড়িয়া লউন। সর্ব্বশেষে এক পাইণ্ট জলে এক ড্রাম জিল্যাটিন্ মৃদু উত্তাপে

* রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনগ্যাস উৎপন্ন হইবার সময় উহা খুব শক্তিশালী থাকে। তখন উহাকে Active oxygen বলে। রোগ বীজাণু নষ্ট করিতে উহার ক্ষমতা খুব বেশী।

গলাইয়া ঐ সলিউসানে উহাদের উপরে এক কোট মাখাইয়া শুকাইয়া লউন। ব্যবহার করিবার সময় উপরের অবরণ একটু চাঁচিয়া ফেলিয়া খোলা মাথাটা একটু কুসুম-কুসুম গরম জলে ডুবাইয়া প্রয়োজনীয় স্থানে ঘষিয়া লাগাইয়া দিন।

কোন স্থান কাটা গিয়া অবিরাম রক্ত পড়িতে থাকিলে তাহা বন্ধ করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রণালীতে ঐ রকম পেন্সিল তৈয়ারী করা যায়,—

(২)	বিশুদ্ধ ফটকিরি (ওজনে)	৪৮০ ভাগ
	সোহাগা (Borax)	২৪ ,,
	জিঙ্ক অক্সাইড (Zinc oxide)	২২ ,,
	থাইমল (Thymol)	৮ ,,
	ফরম্যালিন (Formolin)	৪ ,,

এই সকল উপকরণ একটী পাত্রে লইয়া সেই পাত্রটীকে ফুটন্ত জলের উপরে বসাইবেন। ঐ ফুটন্ত জলের আঁচে সমস্ত মশলাটী গলিয়া মিশিয়া যাইবে। তারপর উহাতে একটু সুগন্ধি এসেন্স মিশাইয়া পেন্সিলের আকারে আন্দাজমত মোটা ও লম্বা ছাঁচে ঢালিয়া জমাইয়া লউন। সরু কাগজের নল তৈয়ারী করিয়া তাহার মধ্যে গলান মশলাটী ঢালিয়া দিতে পারেন। তারপর ঠাণ্ডা হইয়া গেলে উহা যখন জমিয়া যাইবে, তখন বাহিরের কাগজখানি খুলিয়া ফেলুন। তাহা হইলেই সুন্দর পেন্সিল তৈয়ারী হইবে।
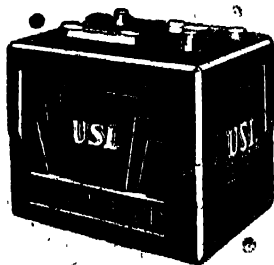
বোর্ণভিলে ক্যাড্‌বেরীর চকোলেটের কারখানা

কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও ধনী সার ডেভিড এজ্‌রার পত্নী লেডি এজ্‌রা সম্প্রতি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি "বোর্ণভিল" নামক স্থানের বিখ্যাত ক্যাডবেরির কোকো এবং চকোলেটের কারখানা দেখিয়া জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ একটি সুন্দর বিবরণী অমৃত-বাজার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বাংলায় তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

"১৯৩৫ সনের শীতকালে কলিকাতা নগরে International Council of women and National Council of women in India র যে Conference হইয়াছিল, তাহাতে যোগ দিবার জন্য মিঃ জর্জ্জ ক্যাড্‌বেরির পত্নী ডেম্ এলিজাবেথ ক্যাডবেরি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে বোর্ণভিল্ দেখিবার জন্য আমার একান্ত আগ্রহ হয়। সেইজন্য লণ্ডনে পৌছিয়াই ঐ বিখ্যাত কারখানা যে সুন্দরী উদ্যান নগরীতে অবস্থিত তাহা দেখিবার জন্য বন্দোবস্ত করি।

বর্ম্মিংহাম হইতে বোর্ণভিল্ সাত মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা একদিন মোটরে করিয়া বোর্ণভিলে উপস্থিত হইলাম। সেখানে ডেম এলিজাবেথ আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কুমারী ফিলিপস্ নাম্নী একটি মহিলার উপর আমাদিগকে সব দেখাইবার ভার দিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে তিনি আমাদিগকে সেখানকার একটি সাঁতারের পুকুর দেখাইলেন। এই পুকুরটি একটি আবৃত স্থানে অবস্থিত। সেখানে প্রতিবৎসর তিন শত বালিকাকে সাঁতার শিখান হয়। কারখানার শ্রমিকদিগের মঙ্গলের জন্য যে সকল চমৎকার বন্দোবস্ত আছে তাহা কুমারী ফিলিপ্সের নিকট হইতে অবগত হইয়া আমরা অশেষ আনন্দিত হইলাম। প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া ১৮ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শ্রমিক বালকবালিকা-

লেডী এজ্‌রা
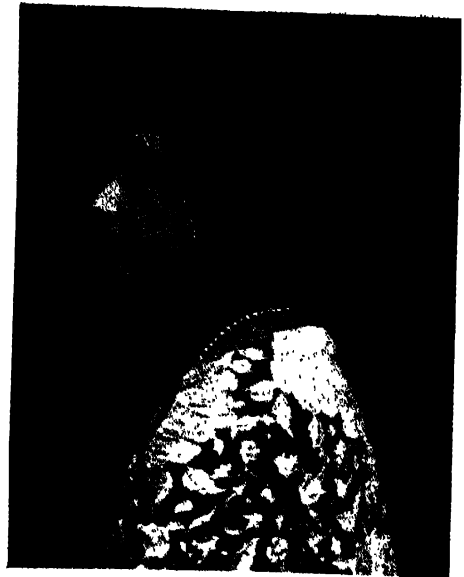
দিগকে Continuation School এ পড়িতে হয়। স্কুলে পড়িবার জন্য তাহাদের

সেদিনকার বেতন কাটা যায় না। শ্রমিক দিগের বিদ্যালয় ডেম এলিজাবেথ ক্যাডবেরীর স্বামী মিঃ জর্জ্জ ক্যাডবেরী স্থাপন করিয়াছিলেন। সমস্ত কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণ ও চিকিৎসার জন্য সর্ব্বপ্রকার আধুনিক বন্দোবস্ত আছে এবং এই কার্য্যের জন্য কয়েক জন ডাক্তার, পাঁচজন ডেন্‌টিষ্ট এবং অনেকগুলি নার্স নিযুক্ত আছেন।

সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তা দিয়া গিয়া আমরা কোকো এবং চকোলেট তৈরির সমস্ত প্রণালী দেখিলাম। এই সকল রাস্তা দিয়া ক্রমাগত ট্রলী যাতায়াত করিতেছিল। চকোলেট কলে তৈরী হয়। কখনো তাহাতে মানুষের হাত লাগেনা। কলে প্রতি মিনিটে একশত টিন কোকো দিয়া ভর্ত্তি হইতেছিল। কোকোর উপাদান রাসায়নিক প্রণালী অনুসারে সব সময় পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। কোকোর শুটি কলে খুব চাপ দিয়া তাহা হইতে তৈল বাহির করিতে দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত আনন্দ বোধ হইয়াছিল। মিল্ক চকোলেট ব্যতীত অন্য সব চকোলেটই এই তৈল দ্বারা প্রস্তুত হয়। Knighton নামক স্থানে ক্যাডবেরী কোম্পানীর বৃহৎ গোশালা ও ডেইরি আছে। সেখানে টাটকা খাঁটি দুগ্ধ দ্বারা কলে মিল্ক চকোলেট প্রস্তুত হয়।

সমস্ত পৃথিবীর ব্যবহারের জন্য কোকো এবং চকোলেট প্রস্তুত ব্যতীত এখানে আরো কয়েকটি জিনিস নির্ম্মিত হয়। যে সকল টিনে

এবং বাক্সে কোকো এবং চকোলেট ভর্ত্তি করা হয়, সেই সব টিন ও বাক্স এখানে তৈরী হয়। টিন ও বাক্সের ঢাকনার উপর যে সব লেবেল লাগান হয় তাহার রঙ্গিন ছবি, পোষ্টার, ছবি প্রভৃতি ছাপিবার জন্য এখানে বৃহৎ ছাপাখানা আছে। ক্যাডবেরীর কারখানায় সবশুদ্ধ নয় হাজার লোক কাজ করে। অর্থাৎ বোর্ণভিল্ হইতে ত্রিশ হইতে চল্লিশ হাজার লোকের অন্নসংস্থান হয়।

শারীরিক এবং শ্রমিকদিগের মানসিক উন্নতির জন্য এখানে যে সকল চমৎকার বন্দোবস্ত আছে তাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এই সকল ব্যবস্থা করিতে যে কত পরিশ্রম ও চিন্তা করিতে হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

শ্রমিকদিগের অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য নানা প্রকার নির্দ্দোষ আমোদের ব্যবস্থা আছে।

কারখানার মধ্যে একটি বৃহৎ বাড়ী আছে, তাহার মধ্যে একটি বড় কনসার্টহল আছে। সেখানে গান বাজনা, নাটকাভিনয় ও বক্তৃতা হয়। কনসার্টহলের অর্গানটি চমৎকার।

শ্রমিকদিগের ব্যবহারের জন্য একটি পাঠাগার ও লাইব্রেরী আছে। লাইব্রেরীতে ১৪ হাজার পুস্তক আছে। পাঠাগারে নানা প্রকার সংবাদপত্র ও মাসিক পত্র রাখা হয়। কারখানার চতুষ্পার্শ্বে যে বিস্তৃত জমি আছে, তথায় শ্রমিকদিগের খেলিবার চমৎকার বন্দোবস্ত আছে। সেই জমিতে ৬৪টি টেনিস কোর্ট, ফুটবল ও ক্রিকেট খেলিবার ব্যবস্থা আছে। সবুজ আচ্ছাদিত মাঠ গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং যত্নের সহিত রক্ষিত হয়।

স্বাস্থ্য লাভের জন্য শ্রমিকগণ ঠিক সময় যাহাতে সমুদ্রের ধারে কিংবা বিদেশ ভ্রমণে সস্তায় যাইতে পারে, কারখানার মালিক তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইহাতে শ্রমিকগণ ও তাহাদের পরিবারের লোকেরা কত উপকৃত হয়।

কারখানার সমস্ত দ্রষ্টব্যস্থান দেখিবার পর বেলা ১২॥ টার সময় ডেম এলিজাবেথ আমাদের লইয়া কারখানার প্রকাণ্ড ভোজনাগারে গমন করিলেন। দেখিলাম তখন সেখানে কয়েক শত বালিকা লাঞ্চ খাইতেছে। তথায় আহারের এমন সুবন্দোবস্ত আছে যে এক ঘণ্টার মধ্যে সাত হাজার লোক আহার শেষ করে। কেহ কেহ ছাদের উপরে আহার করে। শ্রমিকগণ যাহাতে সস্তায় পুষ্টিকর আহার্য্যদ্রব্য পাইতে পারে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা ছয় পেনীতে দুই রকম তরকারী এবং ভেড়া কিংবা গরুর মাংস পায়।

আমাকে এবং আমার সঙ্গীদিগকে ডেম এলিজাবেথ তাঁহার ম্যানর নামক সুন্দর বাড়ীতে লাঞ্চ খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। লাঞ্চের পর আমাদিগকে বোর্ণভিল গ্রামটি দেখাইবার জন্য তিনি বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমরা কোচে চড়িয়া গ্রামটি দেখিলাম।

এই গ্রামের পরিধি পাঁচ মাইল। গ্রামটির পরিকল্পনা, সৌন্দর্য্য ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রমিকদিগের বাসের জন্য সুদৃশ্য বাড়ী গুলি ৬১½ বিঘা জমির উপরে অবস্থিত। প্রত্যেক বাড়ীর সংলগ্ন একখণ্ড জমি আছে। সেই জমিতে প্রত্যেক বাড়ীওয়ালা সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত বাগান করিয়াছে। উদ্যান রচনায় উৎসাহ দিবার জন্য প্রতি বৎসর সুরক্ষিত ও সুদৃশ্য বাগানের জন্য কারখানার মালিক পুরস্কার দিয়া

থাকেন। নানা প্ল্যানে রচিত বিচিত্র ফুল ও ফলে শোভিত উদ্যানগুলি দেখিয়া বুঝিলাম যে অনেকেই এই পুরস্কার পাইয়াছেন।

গ্রামের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য কো-অপারেটিভ প্রণালীতে সম্পাদিত হয়। প্রত্যেক প্রজার ইহাতে শেয়ার আছে। গ্রামের লোকদিগের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা গ্রামেই আছে। গ্রামে দোকান, বাজার এবং বড় বড় পার্ক আছে। শ্রমিকদিগের নৌকা বাইচের জন্য বড় একটি জলাশয় আছে। ইহা লম্বায় ৫০০ ফিট।

শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন্য যেমন উন্মুক্ত স্থানে নানা প্রকার ব্যায়াম চর্চ্চার বন্দোবস্ত আছে তেমনি বাড়ীর ভিতরেও নানা প্রকার খেলা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা আছে। তাহাদের মানসিক উন্নতির জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য নানা প্রকার আয়োজন থাকায় শ্রমিকেরা সুখে ও সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন ক্ষেপণ করিতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

বোর্নভিল গ্রামের ভিতর দিয়া যে প্রধান লেনটি গিয়াছে তাহার দুইধার জাপানের চেরীগাছ দ্বারা শোভিত হইয়াছে। বিলাতে পূর্ব্বে রাস্তার দুইধারে বড় বড় বৃক্ষ রোপিত হইত কিন্তু এক্ষণে নূতন রাস্তার দুই পার্শ্বে ছোট ছোট সাজান গাছই রোপন করা হয়।

সেদিন উদ্যাননগরী বোর্নভিলের শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া সুখী হইয়াছিলাম। কিন্তু অধিকতর মুগ্ধ হইয়াছিলাম এই দেখিয়া যে মানুষের সহৃদয় অন্তর এবং অপরের সুখ দুঃখের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনা কেমন করিয়া মানুষকে সুখী করিতে পারে এবং আনন্দ দান করিতে পারে।

সংশোধিত ইনসিওরেন্স বিলের প্রধান প্রধান ধারা

সেণ্ট্রাল লেজিস্‌লেটিভ্ এ্যাসেম্ব্রী বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইন্‌সিওরেন্স বিলের যে সকল সংশোধক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে আমরা এইখানে তাহার প্রয়োজনীয় এবং প্রধান প্রধান ধারাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

Approved Securities
বা অনুমোদিত লগ্নী

বীমা কোম্পানী সমুহের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৫৫ পারসেণ্ট গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে লগ্নী করিতে হইবে সিলেক্ট কমিটিতে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু এ্যাসেম্ব্রীতে যে সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ছাড়া অন্যান্য Approved securityতেও লগ্নী করা যাইবে। এই Approved securityর সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—ভারতের প্রেসিডেন্সী টাউন সমূহে যে সকল মিউনিসিপ্যালিটি আছে তাহার ডিবেঞ্চার বা অন্য শেয়ারে টাকা লগ্নী করা যাইবে।

বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

বীমা বিভাগের যিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন তাঁহার Actuaryর সার্টিফিকেট থাকা চাই।

রেজিষ্ট্রেশন্ সংক্রান্ত

৩য় ধারাঃ—৩য় ধারার ২য় উপধারায় এই মর্ম্মে আর একটি ধারা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যে, রেজিষ্ট্রেশন্ সংক্রান্ত আবেদন পত্রের সঙ্গে অপরাপর প্রয়োজনীয় তথ্যের সহিত "প্রস্পেক্টাস্" থাকিলে তাহার যথাযথ নকল, প্রিমিয়াম রেটের তালিকা, কমিশন সংক্রান্ত তথ্য, বীমাকারীদের অপরাপর সুবিধার বিষয় এবং ঐসমস্ত রেট, কমিশন ও সুবিধা সমূহ যে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত ও কার্য্যকরী, এই মর্ম্মে "বিশেষজ্ঞ এ্যাক্চুয়ারীর সার্টিফিকেট" দাখিল করিতে হইবে।

৩য় ধারা (এফ্)ঃ—প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বীমা ব্যবসার রেজিষ্ট্রেশন ফি একশত টাকার অধিক হইবে না।

৩-এ ধারা বাতিলঃ—সিলেক্ট কমিটি অভারতীয় কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্কে যে ৩-এ ধারা সংযোজিত করিয়াছিলেন তাহা বাতিল হইয়াছে।

এই ধারার সর্ত্ত ছিল যে কোনও অভারতীয় কোম্পানী জীবন বীমা ব্যতীত অন্যান্য যে কোনও বীমার কাজ করিবেন, তাহার কতকাংশ ভারতীয় কোনও কোম্পানীতে পুনর্বীমা না করিলে তাহাকে রেজিষ্ট্রেশন্ সার্টিফিকেট দেওয়া

হইবে না। সিলেক্ট কমিটির এই উপধারাটি এ্যাসেম্ব্লীতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বীমার সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ

৩-বি ধারা :—জীবনবীমা মূল্যের সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া এই মর্ম্মে এক ধারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, বীমা আইনের ৩য় খণ্ডে বর্ণিত প্রভিডেণ্ড সোসাইটি ছাড়া অপর কোন জীবনবীমা কোম্পানী কোনও পলিসির উপর বার্ষিক ৫০৲ টাকা বা তাহার কম এ্যানুইটি দিতে পারিবে না, কিংবা মোট ৫০০৲ টাকা বা তাহার কম মূল্যের বীমা পত্র বিলি করিতে পারিবে না ; তবে ইহার দ্বারা কোন পলিসিকে 'পেড-আপ' পলিসিতে পরিণত করিতে বা যে কোন পরিমাণের প্রত্যর্পণ মূল্য প্রদান করিতে বাধা সৃষ্ট হইবে না।

বীমা কোম্পানীর নাম সম্পর্কে বিধিনিষেধ

৪র্থ ধারার (৩) উপধারা :—যাহাতে প্রভিডেণ্ড কথাটি নামের সঙ্গে ব্যবহৃত না হয় তজ্জন্য এই মর্ম্মে ৪ ধারার ৩ উপধারা গৃহীত হইয়াছে যে, বীমা আইনের ৩য় খণ্ডে বর্ণিত প্রভিডেণ্ড সোসাইটি ছাড়া অপর কোন কোম্পানী, যাঁহারা এই বীমা আইন পাশ হইবার পর কাজ সুরু করিতেছেন, তাঁহারা প্রভিডেণ্ট কথাটি নামের সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং উক্ত কোম্পানীর মধ্যে যাঁহারা এই আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে হইতেই কাজ
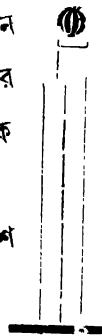
করিতেছেন তাঁহারা এই আইন পাশ হইবার ছয় মাস পরে প্রভিডেণ্ট কোম্পানী নাম লইয়া কাজ করিতে পারিবেন না।

কার্য্যকরী মূলধন

কার্য্যকরী মূলধন (Working Capital) সম্পর্কে ১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পরে গঠিত জীবনবীমা কোম্পানী সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির যে নির্দ্দেশ ছিল তাহা "১৯৩৭ সালের ২৬শে জানুয়ারীর" পরে গঠিত কোম্পানী রূপে সংশোধিত হইয়াছে।

জমার টাকা

জমার টাকা সংক্রান্ত ব্যাপারের ৬ ধারার বহু পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, সংশোধন ও বিলোপ-সাধন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত ধারার (১) ক্লজের মধ্যে জমার পরিমাণ সংক্রান্ত একটি (জে) সাবক্লজ সংযুক্ত হইয়াছে। উক্ত সাবক্লজ মতে দেশীয় জাহাজ বা তৎসংলগ্ন মাল পত্রের বীমাকারী কোম্পানীর জমার টাকার পরিমাণ দশ হাজার বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রচলিত কিংবা ভবিষ্যৎ কোম্পানীগুলির কিস্তি বন্দীতে জমার টাকা প্রদান করিবার যে বিধান ছিল তাহাও বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—৬ ধারার (৩) উপধারা উঠিয়া গিয়াছে এবং (৪) ও (৬) উপধারা যথেষ্ট সংশোধিত হইয়াছে। নিম্নে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করিলাম।

৬ ধারার (৪) উপধারা :—১৯৩৭ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পূর্ব্বে বৃটিশ ভারতে গঠিত কোন বীমা কোম্পানী উক্ত ধারার (১) উপধারার বর্ণিত জমার টাকা সাতটির অনধিক কিস্তিতে প্রদান করিতে পারিবে—তন্মধ্যে ১ম কিস্তি মোট টাকার এক চতুর্থের কম হইবে না এবং তাহা রেজিষ্ট্রেশনের জন্য দরখাস্তের পূর্ব্বে প্রদান করিতে হইবে; ২য় কিস্তি অবশিষ্টাংশ পরিমাণের এক ⅙ ষষ্ঠাংশের কম হইবে না এবং তাহা ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে প্রদান করিতে হইবে; পরবর্ত্তী সকল কিস্তিই ঐ ২য় কিস্তির কম হইলে চলিবে না এবং তাহা প্রত্যেক পরবর্ত্তী বৎসরের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে প্রদান করিতে হইবে।

কিন্তু কেবলমাত্র জীবনবীমা কোম্পানী-গুলির পক্ষে উপরোক্ত আইনের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম আছে। তাহারা জমার টাকা দশের অনধিক কিস্তিতে প্রদান করিতে পারিবেন, তন্মধ্যে, ১ম কিস্তি মোট টাকার এক চতুর্থাংশের কম হইবে না, ২য় কিস্তি অবশিষ্টাংশের এক-নবম ভাগের কম হইবে না এবং তাহা ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে প্রদান করিতে হইবে, এবং পরবর্ত্তী প্রত্যেক কিস্তি ২য় কিস্তির কম হইলে চলিবে না ও তাহা পরবর্ত্তী প্রত্যেক বৎসরের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে অবশ্য প্রদত্ত হইবে।

৬ ধারার (৬) উপধারা :—১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পরে বৃটিশ ভারতে গঠিত কোম্পানীকে তাহার মোট জমার টাকার এক চতুর্থাংশ রেজিষ্ট্রেসনের জন্য আবেদনের পূর্ব্বে প্রদান করিতে হইবে; অবশিষ্টাংশের এক তৃতীয়াংশ কার্য্যারম্ভের পর এক বৎসরের মধ্যে দিতে হইবে, অবশিষ্টাংশের এক তৃতীয় ভাগ কার্য্যারম্ভের পর দুই বৎসরের মধ্যে দিতে হইবে; এবং অবশিষ্টাংশ কার্য্যারম্ভের তিন বৎসরের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে।

এ্যাকচুয়ারীর রিপোর্ট সংক্রান্ত।

১২ ধারার (১) উপধারা :—এমনভাবে

সংশোধিত হইয়াছে যাহাতে দেশী, বিদেশী সকল বীমা কোম্পানীকেই তাদের ভারতীয় কার্য্যের পৃথক ভ্যালুয়েশন্ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

রি-ভ্যালুয়েসন সম্পর্কে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতা।

২১ ধারাঃ—এই ধারাটি সংশোধিত হইয়া এইরূপ দাড়াইয়াছে যে, কোন কোম্পানীর ভ্যালুয়েশন সম্পর্কে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সন্দেহ থাকিলে এবং তিনি পুণ ভ্যালুয়েশনের জন্য নির্দ্দেশ দিলে, উক্ত পুর্ণভ্যালুয়েশন কোম্পানী কর্ত্তৃক নিযুক্ত এবং তাহা, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত এ্যাক্‌চুয়ারীর দ্বারা করিতে হইবে।

রিটার্ণের সারমর্ম্ম

২৪ ধারাঃ—এই ধারার সঙ্গে এই মর্ম্মে এক বিধি সংযুক্ত হইয়াছে যে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট দাখিলিকৃত হিসাব নিকাসের (Returns) 'সঠিক এবং নির্ভুল' (abstract) সারমর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য কোম্পানী প্রকাশ করিতে পারিবে।

সম্পত্তি লগ্নীকরণ সংক্রান্ত।

২৬ ধারাঃ—এই ধারা সংশোধিত হইয়া এইরূপ দাড়াইয়াছে যে,—

(১) বৃটিশ ভারতে গঠিত কিংবা কায্যরত (domiciled) সকল কোম্পানীকেই তাহাদের ৬ ধারা মতে জীবনবীমা সংক্রান্ত জমার টাকা

ছাড়া এবং বীমাকারীকে বীমাপত্রের উপর প্রদত্ত ঋণের টাকা ছাড়া যে সকল বীমার মেয়াদ শেষ হওয়ায় দাবীর টাকা দিবার সময় হইয়াছে তাহা এবং ভারতে মোট বীমার দায়ীত্ব মিটাইবার জন্য যে পরিমাণ টাকা রিজার্ভ রাখার প্রয়োজন, তজ্জন্য কোম্পানীর মোট সম্পত্তির শতকরা ৫৫ ভাগ সব সময়েই নিম্নলিখিত প্রণালীমত লগ্নী করিয়া রাখিতে হইবে:-

উপরোক্ত সম্পত্তির শতকরা ২৫ ভাগ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে, এবং মোট্ সম্পত্তির শতকরা অন্যূন ৩৫ ভাগ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি বা অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটিতে (Approved Securities) কিংবা যুক্তরাজ্যের গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে এবং যুক্তরাজ্য কর্ত্তৃক দায়িত্ব গৃহীত সিকিউরিটিতে লগ্নী রাখিতে হইবে।

ব্যাখ্যা:—উক্ত ধারার বিধি যুক্তরাজ্যে গঠিত বা যুক্তরাজ্যে কার্য্যরত কোম্পানীর উপরও প্রযোজ্য।

(২):—বৃটিশ ভারত কিংবা যুক্তরাজ্য ছাড়া অন্যত্র গঠিত বা কার্য্যরত কোম্পানী সমূহকে সকল সময়েই তাহাদের ৬ ধারা মতে জীবন বীমা সংক্রান্ত জমার টাকা ছাড়া এবং বীমাকারীকে বীমাপত্রের উপর প্রদত্ত ঋণের টাকা ছাড়া যে সকল বীমার মেয়াদ শেষ হওয়ায় দাবীর টাকা দিবার সময় হইয়াছে তাহা এবং ভারতে বিক্রীত মোট বীমার দায়ীত্ব মিটাইবার জন্য যে পরিমাণ টাকা রিজার্ভ সঞ্চিত রাখা প্রয়োজন সে সমুদয় টাকা নিম্নলিখিত প্রণালীমত সব সময়েই লগ্নী করিয়া রাখিতে হইবে:—

কোম্পানীর ভারতে বিক্রীত পলিসি বাবদ মোটসম্পত্তির শতকরা ৩৩⅓ ভাগ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে এবং অবশিষ্টাংশ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, বা অপর অনুমোদিত সিকিউরিটি কিংবা যুক্ত রাজ্যের গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি অথবা উক্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দায়িত্ব গৃহীত সিকিউরিটিতে লগ্নী করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩):—এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময় যে সমস্ত কোম্পানী কাজ আরম্ভ করিয়াছে এবং যাহাদের উপর উক্ত (১) এবং (২) উপধারা প্রযোজ্য, তাহারা আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর চার বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই উপরোক্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্পত্তি উপরোক্ত ধারানুযায়ী লগ্নী করিয়া রাখিতে বাধ্য থাকিবে।

উপরোক্ত টাকা লগ্নী করিবার সময় ও শেষ তারিখ নিম্নের প্রণালীমত ধার্য্য করা হইল:—এক বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই (১) উপধারানুযায়ী নির্দ্ধারিত সিকিউরিটিতে মোট লগ্নীর টাকার সিকি পরিমাণ আবদ্ধ রাখিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধেক টাকা এবং তৃতীয় বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই অন্ততঃ বারো আনা পরিমাণ টাকা লগ্নী করা চাই।

(৪):—উক্ত ধারামতে যে সকল কোম্পানীর উপর (২) উপধারা প্রযোজ্য, তাহাদের সকল সম্পত্তি উক্ত (২) উপধারায় বর্ণিত বীমার দাবী সমূহ মিটাইবার জন্য ট্রাষ্টরূপে রক্ষিত হইবে এই ট্রাষ্টের যাঁহারা ট্রাষ্টী বা অভিভাবক হইবেন তাহাদিগকে ব্রিটীশ ভারতের অধিবাসী হওয়া চাই এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহাদের নীয়োগ অনুমোদিত হওয়া চাই। যে ট্রাষ্ট আইনের দ্বারা এই সকল ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইবেন

তাহা কোম্পানীকে যথারীতি সম্পাদিত করিয়া দিতে হইবে। যে ভাবে এই ট্রাষ্টের টাকা কড়ির বিলি ব্যবস্থা হইবে তাহা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া এই ট্রাষ্টভিডু বিশদভাবে বিবৃত করা থাকিবে। তাহার বাহিরে কেহ কাজ করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা :—বৃটীশ ভারতে সংগঠিত কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্যাপিটালের এক তৃতীয়াংশের মালিক যদি বৃটিশ ভারত বা যুক্তরাজ্যের অধিবাসী ছাড়া অপরকেহ হয় কিংবা উক্ত কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীর (Governing body) এক তৃতীয়াংশ যদি বৃটিশ ভারত বা যুক্তরাজ্যের অধিবাসী ছাড়া অপরকেহ হয় তাঁহা হইলে সেই কোম্পানীর উপরেও উক্ত (২) ও (৪) উপধারা প্রযোজ্য হইবে।

২৬-এ :—এই ধারামতে সকল বীমা কোম্পানীকেই বাধ্যতামূলকভাবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইনসিওরেন্স এর নিকট উক্ত ২৬ ধারামতে তাহাদের সম্পত্তি ঠিক ঠিক গচ্ছিত করা হইয়াছে এই মর্ম্মে ষান্মাসিক বিবরণী দাখিল করিতে হইবে এবং এই বিবরণীর সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোম্পানীর সম্পত্তি ও

হিসাবাদি পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

২৬-বি ঃ—এই ধারামতে কোম্পানীর ডিরেক্টর, ম্যানেজার প্রভৃতিকে ঋণ প্রদান সম্পর্কে বিধি নিষেধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

২৬-সি ঃ—এই ধারামতে, উক্ত ২৬ বা ২৬-বি ধারার বিরুদ্ধ কার্য্য করার ফলে কোম্পানী বা বীমাকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে কোম্পানীর ডিরেক্টর, পরিচালক বা ম্যানেজার প্রভৃতিকে দায়ী করা হইয়াছে।

২৬-ডি ঃ—এই ধারামতে সম্পত্তি সমূহ কি ভাবে রক্ষিত হইবে তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে (অর্থাৎ কোম্পানী হইলে সেই কোম্পানীর নামে; ফার্ম্ম হইলে তাহার অংশীদারদিগের নামে; বা ব্যক্তিগত হইলে মালিকের নিজের নামে রক্ষিত হইবে)

ম্যানেজিং এজেণ্ট সংক্রান্ত

২৭ ঃ—এই ধারার (১) এবং (২) উপধারা এ্যাসেম্ব্লীতে নিম্ন লিখিতভাবে বদলানো হইয়াছে :—

(১) এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কোন বীমা কোম্পানীই কার্য্য পরিচালনার জন্য ম্যানেজিং এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে পারিবে না।

(২) এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কার্য্যরত কোন কোম্পানী তার কার্য্য পরিচালনার জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টস্ নিযুক্ত করিয়া থাকিলে, ১৯১৩ সালের ইণ্ডিয়ান কোম্পানিজ এ্যাক্ট কিংবা উক্ত কোম্পানীর নিয়মাবলী অথবা উক্ত কোম্পানীকৃত কোন চুক্তি ইত্যাদিতে যাহাই থাকুক না কেন, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার তিন বৎসর অন্তে ঐ ম্যানেজিং এজেণ্টগণের পদ অবশ্য লুপ্ত হইবে এবং কেবলমাত্র তাঁহাদের এই অসময়ে পদ বিলুপ্তির জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

(৩) উক্ত তিন বছরের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টগণের পারিশ্রমিক সর্ব্বোচ্চ ২ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্টকৃত এই উপধারাটি ঠিক রাখা হইয়াছে।

এ্যামাল্‌গামেশন্ বা ট্রান্‌স্‌ফার সংক্রান্ত

৩০ ধারা :—এই ধারার সঙ্গে নিম্নবর্ণিত (৪) উপধারাটি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে :—

ইন্‌সিওরেন্স আইন বিধিবদ্ধ হইবার ৩ মাসের মধ্যে যদি কোনও বীমা কোম্পানী (৩) উপধারামতে, আদালতের নিকট তাহাদের কোম্পানী অন্য কোনও কোম্পানীর সহিত ট্রান্‌স্‌ফার বা এ্যামালগামেশনের জন্য কোন আবেদন উপস্থিত করে, তবে আদালত তাঁহার বিবেচনানুযায়ী, যে কোম্পানী এইরূপ ট্রান্সফার বা Amalgamationএর জন্য দরখাস্ত করিবে তাহাকে ৩—৬ ধারামতে রেজিষ্ট্রেশন বা জমার টাকার প্রথম কিস্তি প্রদান বাবদ অনধিক ৯ মাসের জন্য সময় বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারিবেন।

কমিশন, রিবেট ও এজেণ্টগণের লাইসেন্স্ সংক্রান্ত

৩৫, ৩৬ ও ৩৭ ধারার বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল :—

৩৫ ধারার (১) :—কোন কোম্পানী বা ইন্‌সিওরেন্স কার্য্য সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য ৩৭ ধারামতে লাইসেন্স প্রাপ্ত এজেণ্ট নিয়োগ করিয়াছেন এইরূপ কোন ব্যক্তি বীমাআইন বিধিবদ্ধ হইবার ৬ মাস পরে ৩৭ ধারানুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত এজেণ্ট ব্যতীত অপর

কাহাকেও বৃটিশ ভারতে ইন্‌সিওরেন্স কার্য্য সংগ্রহের জন্য কমিশন বা পুরস্কার বা পারিশ্রমিক বাবদ কিছু দিতে বা দেবার চুক্তি করিতে পারিবে না।

(২) কোন কোম্পানী বা ইন্‌সিওরেন্স কার্য্যের জন্য ৩৭ ধারামতে লাইসেন্সড্ এজেন্ট নিযুক্তকারী কোন ব্যক্তি ঐ ৩৭ ধারামতে লাইসেন্স প্রাপ্ত এজেন্টকে কমিশন বা পারিশ্রমিক যে কোন বাবদই হোক না কেন তাহার দ্বারা সংগৃহীত জীবন বীমা কার্য্যের উপর প্রদেয় প্রাথমিক প্রিমিয়ামের শতকরা ৪৫৲ টাকার অধিক বা প্রথম বৎসরেরপরে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের শতকরা ৫৲ টাকার অধিক এবং জীবনবীমা ছাড়া অপরাপর বীমা কার্য্যের উপর প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের শতকরা ৩০৲ টাকার অধিক কমিশন, রেমুনারেশন বা কোন প্রকারের পুরস্কার দিতে বা দিবার চুক্তি করিতে পারিবে না; তবে উক্ত কোম্পানী তাহার কার্য্যের প্রথম ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল মাত্র জীবনবীমার কার্য্যের জন্য এজেন্টদিগকে তাহাদের কাজের উপর প্রাথমিক প্রিমিয়ামের শতকরা ৫৫৲ টাকা এবং পরের প্রিমিয়ামের শতকরা ৬ টাকা হারে পারিশ্রমিক বা কমিশন দিতে পারিবে।

(৩) এই ধারামতে ১৯৩৭ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পূর্ব্বে চুক্তিবদ্ধ কাজের জন্য এজেন্ট-দিগকে বা তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহাদের উত্তরাধিকারীদিগকে কোম্পানীর সহিত তাহাদের পূর্ব্ব চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য গ্রাট্যুইটী বা রিনুয়াল, কমিশন প্রদান করা যাইবে।

৩৬ ধারার (১):—এই ধারামতে কোন কোম্পানী বা ইন্‌সিওরেন্স কার্য্যের জন্য ৩৭ ধারামতে লাইসেন্সড্ এজেন্ট নিযুক্তকারী কোন ব্যক্তি অথবা কোম্পানী কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন এজেন্ট, বৃটিশ ভারতে কোন বীমাকারীকে তাহার জীবন বা সম্পত্তি বীমা করা বা তাহা রিনিউ করার জন্য তাহার কমিশনের সমস্তটা কিংবা আংশিক কোনও রিবেট দিতে পারিবে না কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনরূপে প্রলোভিত করিতে পারিবে না কিংবা উক্ত

ব্যাপারের জন্য পলিসি নির্দ্দিষ্ট প্রিমিয়ামের উপর কোন রিবেট প্রদান করিতে পারিবে না ; এতদ্ব্যতীত বীমাকারী বা তাহা রিনিউকারী কোন ব্যক্তিও কোম্পানীর প্রসপেক্টাসে যদি কোনও রকম রিবেট দিবার কথা উল্লেখ থাকে তবে তাহা ছাড়া অপর কোন রকম রিবেট গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) কোন ইন্‌সিওরেন্স এজেণ্ট বা বীমাকারী ও রিনিউকারী এই ধারার বিধি অমান্য করিলে যথাক্রমে তাহাদের ১০০ টাকা ও ৫০ পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে।

৩৭ ধারার (১) : —কোন ব্যক্তি বীমা-কার্য্য সংগ্রহেচ্ছু হইয়া স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এর নিকট নির্দ্দিষ্ট ফরমে আবেদন ও অনধিক ১৲ টাকা ফি প্রদান করিলে এজেণ্ট নিয়োগ সম্বন্ধে পরে যে সকল উপধারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে তাঁহার পক্ষে এজেণ্ট হইবার কোন বাধা না থাকিলে তিনি তাঁহাকে বীমাকার্য্য সংগ্রাহকরূপ এজেণ্টের অনুমোদিত লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) :—এই ধারামতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি, যে রেজিষ্টার্ড কোম্পানীর পক্ষে সে ইন্‌সিওরেন্স এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছে তাহার জন্য কাজ সংগ্রহের অধিকারী হইবে।

(৩) :—এই ধারামতে বিলিকৃত লাই-সেন্সের মেয়াদ প্রতি বৎসর ৩১শে মার্চ্চ তারিখে শেষ হইবে, কিন্তু লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে বিধি নির্দ্দিষ্ট যদি কোন বাধা না থাকে তবে অনধিক ১৲ টাকার ফি দিলে বছর বছর উহা রিনিউ করা যাইবে।

(৪) :—লাইসেন্স প্রাপ্তির পক্ষে পূর্ব্বোক্ত বাধা গুলির বিষয় নিম্নে বর্ণিত হইল :—

(ক) আবেদনকারী যদি নাবালক হয়েন।

(খ) যথাযোগ্য আদালত কর্ত্তৃক যদি তিনি বিকৃত মস্তিষ্ক সাব্যস্ত হয়েন।

(গ) যথাযোগ্য আদালত কর্ত্তৃক তহবিল তছরূপ, বিশ্বাসভঙ্গ বা প্রতারণার অভিযোগে যদি দোষী সাব্যস্ত হয়েন।

(ঘ) ইন্‌সিওরেন্স সংক্রান্ত কোন মামলা মোকর্দ্দমা অথবা কারবার গুটানো সম্পর্কে (বীমা কোম্পানী Winding up) অথবা বীমা কোম্পানীর কার্য্যাদির কোন অনুসন্ধান ব্যাপারে যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে এজেণ্ট বীমা কোম্পানী কিম্বা বীমাকারীকে ঠকাইবার জন্য জ্ঞানতঃ প্রতারণা, অসাধুতা, মিথ্যা বর্ণনা প্রভৃতি ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত হইলে।

(ঙ) উপরোক্ত দোষমূলক কার্য্যাদি করিলে কিংবা জ্ঞানতঃ বীমা আইনের কোন ধারা অমান্য করিলে আইনতঃ অন্যান্য যে সকল দণ্ড তাহার হইতে পারে তাহা ছাড়া স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির লাইসেন্স যথাক্রমে বাতিল করিবেন বা করিতে পারিবেন।

৩৮-এ :—রিনিউয়াল কমিশন প্রদান সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারাটি সংযুক্ত হইয়াছে :—কোম্পানী এবং ৩৭ ধারামতে লাইসেন্স প্রাপ্ত এজেণ্টদের মধ্যে রিনিউয়াল কমিশন প্রদান বন্ধ সম্পর্কে চুক্তিতে যাহাই

থাকুক না কেন, বৃটিশ ভারতে জীবন বীমা কার্য্যরত কোন কোম্পানী লাইসেন্স প্রাপ্ত এজেন্টকে প্রতারণার ব্যাপার ছাড়া কেবলমাত্র চুক্তি খতমের জন্য রিনিউয়্যাল কমিশন প্রদান বন্ধ করিতে পারিবেনা ; তবে উক্ত এজেন্টের ঐ কোম্পানীতে একাদিক্রমে সর্ব্বতোভাবে এবং অন্য কোম্পানীর সহিত কোনও প্রকার সংস্রব রহিতে অন্যূন দশ বৎসর কার্য্যকরা চাই এবং চুক্তি খতমের পর অপর কোন কোম্পানীর তরফে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কার্য্য করিতে পারিবে না।

তথ্য জানা সম্পর্কে বীমাকারীদের অধিকার।

এসম্পর্কে দুইটী নূতন ধারা সংযোজিত হইয়াছে :—প্রথমটিতে, কোন পলিসি ল্যাপ্স করিলে অর্থাৎ বাতিল হইয়া গেলে তাহার নোটিশ এবং বীমাকারী ইচ্ছা করিলে কত টাকা দিলে তাহা পেড-আপ পলিসিতে পরিণত করা যায় তাহার সংবাদ প্রদান কোম্পানীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হইয়াছে, দ্বিতীয়টিতে, বীমাকারী অনধিক ১৲ টাকা সহ আবেদন করিলে তাহাকে তাহার বীমাপত্র ও ডাক্তারী রিপোর্টের সমুদয় প্রশ্নোত্তরের সহি মোহরের নকল (Certified Copies) দিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

বণ্টন প্রথা (Dividing Principle) সম্পর্কে বিধিনিষেধ।

বণ্টন প্রথা সম্বন্ধে বিধিনিষেধ আরোপিত করিয়া এক ধারা সংযুক্ত হইয়াছে। এই আইনে Dividing Principle এর এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে :—অতঃপর বণ্টন প্রথায় বীমার কাজ লওয়া একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। "The principle that the benefit secured by a policy is not fixed but depend either wholly or partly on the results of a distribution among policies maturing for payment within certain time limits of certain sums."

অর্থাৎ বণ্টন প্রথানুসারে কোনও পলিসির মূল্য বা দাবীর টাকা নির্দ্দিষ্ট করা নাই। কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যাইবে তাহা সেই সময়ে যে সকল বীমার মেয়াদ পূর্ণ হইবে সেই সকল বীমাকারীদিগের মধ্যে হারাহারিভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

কোম্পানীর বিপক্ষে মামলা সম্পর্কে।

এই সম্পর্কে একটি নূতন ধারা সংযোজিত হইয়াছে যে, কোম্পানী বা তাহার ডিরেক্টর বা ম্যানেজার অথবা অপর কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যতীত অপর কেহ মামলা আনয়ন করিতে চাহিলে যে প্রদেশে কোম্পানীর প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত সেই প্রদেশের এডভোকেট জেনাবেলের অনুমোদন লইতে হইবে।

সাময়িক (interim bonus) বোনাস প্রদান

কোম্পানী যাহাতে সাময়িক বোনাস প্রদান করেন তাহার জন্য একটি ধারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

নন্‌-ফরফিচার সংক্রান্ত।

এসম্পর্কে এই মধ্যে একটি ধারা সংযুক্ত হইয়াছে যে, যেখানে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রিমিয়াম প্রদেয়, সেখানে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর ধরিয়া প্রিমিয়াম দিলে পর বীমাকারীর গ্যারান্টিড্ প্রত্যর্পণ মূল্য পাইবার অধিকার জন্মিবে এবং চুক্তিতে যাহাই থাকুক না কেন অতঃপর প্রিমিয়াম প্রদান না করিলেও পলিসি ল্যাপ্স করিবে না। এইরূপ পলিসির paidup বা প্রত্যর্পণ মূল্য যত হইবে সেই পরিমাণ টাকার পলিসি জীবিত থাকিবে

গভর্ণর জেনারেলের আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা

১০১ ধারার (১)ঃ—এই উপধারার সঙ্গে এই মর্ম্মে একটি বিধান জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যে, গভর্ণর জেনারেল ইন্ কাউন্সিল কর্ত্তৃক প্রণীত কোন আইন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সমক্ষে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের জন্য অন্ততঃ এক মাস না থাকিলে তাহা আইন বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

রেহাই (Exemptions) দেওয়ার ক্ষমতা

এতৎসম্পর্কে এক নূতন বিধি সংযোজিত হইয়াছে যে, দেশীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কিংবা কার্য্যরত কোন বীমা কোম্পানীকে নগদ জমা রাখিবার অথবা বাধ্যতামূলক লগ্নী সংক্রান্ত আইনগুলির কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক রেহাই দিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের থাকিবে।

ক্ষমতা হস্তান্তর চলিবে না

বিলের ১০৩ ক্লজে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার সকল ক্ষমতা অথবা আংশিক কোন কোন ক্ষমতা ইন্‌সিওরেন্স বিলের ৩য় খণ্ডে বর্ণিত ক্ষমতানুযায়ী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারীকে প্রভিডেণ্ট সোসাইটীর কার্য্যাদি তদন্ত করিবার জন্য হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন বলিয়া যে বিধান ছিল তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিবিধ

এই মর্ম্মে কয়েকটি নূতন ধারা সংযুক্ত হইয়াছে যে, বীমা আইনের সমুদয় সর্ত্ত পালন

করিলেও প্রত্যেক বীমা কোম্পানী Indian Companies Act এর সমুদয় ধারা কোম্পানী হিসাবে পালন করিতে এবং তজ্জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকিতে বাধ্য থাকিবে। এবং এই আইন দ্বারা রেজেষ্ট্রিকৃত সকল বীমা কোম্পানীই তাঁহাদের দ্বারা বিক্রীত সকল প্রকার বীমা পত্রের নকল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্সিওরেন্সের নিকট জমা রাখিতে বাধ্য থাকিবে। কোন রেজিষ্টার্ড ট্রেড্ ইউনিয়নগুলি বীমা আইনের আমলে আসিবে না।

স্যার এন্ এন্ সরকারের শেষ মন্তব্য

এ্যাসেম্বলীতে বিল্ পাশ হইয়া যাওয়ার পর আইন্ সচিব স্যার এন্ এন্ সরকার সর্ব্বশেষে যে মন্তব্য করেন, তাহার প্রধান কয়েকটি কথা নিম্নে লিখিত হইল,—

ইউরোপীয় বীমা কোম্পানী সমূহকে তাঁহাদের ভারতীয় কারবার জনিত জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ পৃথকভাবে ব্যালান্সসিটে দেখাইতে হইবে এইরূপ নিয়ম হওয়াতে ইউরোপীয় কোম্পানীর পরিচালকগণ আশঙ্কা করিতেছেন যে তাহাদের ভারতীয় পলিসিহোল্ডারগণকে ঐ ভারতীয় লাইফ ফাণ্ড (জীবনবীমা তহবিল) হইতেই বোনাস্ দিতে হইবে, তাঁহাদের এইপ্রকার আশঙ্কা ভিত্তিহীন। যদি ভবিষ্যতে বীমা আইন পুনঃ সংশোধন করিবার সময় এমন কোন প্রস্তাব উপস্থিত হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তাহার বিরোধিতা করিবেন। বিদেশীয় কোম্পানী দিগের পক্ষে তাঁহাদের সমস্ত পলিসিহোল্ডারকে একশ্রেণী ভুক্ত বলিয়া মনে করা এবং তহাদের মোট লাইফ ফাণ্ড হইতে ভারতীয় পলিসিহোল্ডারগণকে বোনাস দিতে কোন বাধা থাকিবেনা। এই প্রকার বোনাস দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে "বাজার-মাটী" করা অথবা অন্যায় প্রতিযোগিতা বলিয়া গণ্য হইবেনা।

প্রাথমিক ডিপজিটের টাকার পরিমাণ একলক্ষ হইতে কমাইয়া ৫০ হাজার টাকা করায় এবং পরবর্ত্তী ডিপজিটের কিস্তির মেয়াদ ৯ বৎসর নির্দ্ধারিত হওয়ায় নবগঠিত কোম্পানীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কোম্পানী পরিচালনা করিবার জন্য মূলধন, (Working Capital), এবং সর্ব্বোচ্চ কমিশনের উপর অতিরিক্ত শতকরা আরও ১০ টাকা দেওয়া সম্বন্ধে আইনে যে ধারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বর্ত্তমানে চলতি কোম্পানী সমূহ তাহার আমলে আসিবে না। পলিসিহোল্ডারদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ডিপজিট্, কোম্পানীরকার্য্য পরিচালনার মূলধন, লাইফ ফাণ্ড এবং টাকা লগ্নী সম্বন্ধে বাধ্যতা-মূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পলিসিহোল্ডারদের টাকা যাহাতে কোম্পানীর পরিচালনায় ব্যয় না হয় তাহার উপায় করা হইয়াছে। পলিসির দাবীর উপর শতকরা ৫৫ টাকা হিসাবে গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে ও অন্যান্য ট্রাষ্ট সিকিউরিটীতে লগ্নীকরার নিয়ম বাধ্যতা-মূলক হইয়াছে। ম্যানেজিং এজেণ্টসগণ যাহাতে অত্যুচ্চবেতননা নিতে পারেন, এবং কোম্পানী যাহাতে একটা ছলছুতা ধরিয়া পলিসির দায় এড়াইতে না পারে, তাহারও উপায় করা হইয়াছে।

ইন্সিওরেন্স বিল সম্বন্ধে আমাদের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য

বাধ্যতামূলক লগ্নী

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় (এসেম্ব্লী) সংশোধিত বীমা আইনের আলোচনায় নির্দ্ধারিত

হইয়াছে যে মজুদ পলিসির দাবীর উপর শতকরা ৫৫ টাকা হিসাবে গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে এবং অন্যান্য যে সকল সিকিরিউটী গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন, তাহাতে লগ্নী করিতে হইবে। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কোন প্রকার মত পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখা যায় না। সুতরাং মনে হয়, কাউন্সিল অব ষ্টেটের এই নির্দ্ধারণই বলবৎ থাকিবে। কোন প্রকার বিশেষ সিকিউরিটীতে টাকা লগ্নী করিতে বীমাকোম্পানীকে বাধ্য করা আমাদের মতের বিরোধী। কিন্তু পলিসি হোল্ডার দিগের দাবী মিটাইবার জন্য যথেষ্ট অর্থ এবং সেই অর্থ যাহাতে সহজ লভ্য এবং সহজ প্রাপ্য হয় সে সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইবার জন্য অন্ততঃ ৩৩⅓% পারসেণ্ট গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে সব সময় লগ্নী রাখার আমরা পক্ষপাতী। গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে টাকা রাখা একদিকে যেমন নিরাপদ অন্যদিকে ইহা সব সময়েই সহজ প্রাপ্য (Easily convertable into liquid Cash) দাবী মিটাইবার পক্ষে অন্যান্য Assets এর সহিত ⅓ অংশ টাকা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে রাখিলেই তাহা যথেষ্ট বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোম্পানীর তহবিল সন্দেহজনক কাজ কারবারে খাটান বন্ধ করিবার নিমিত্ত যে সকল উপায় বর্ত্তমানসংশোধিত বীমা আইনের অন্যান্য ধারায় রহিয়াছে, অথবা ভারতীয় কোম্পানী আইনে (Indian Companies Act) এই সম্বন্ধে যে সকল বিধান আছে, আমাদের মনে হয়, তাহাই যথেষ্ট, ব্যাপক এবং প্রচুর। কোম্পানীর তহবিল কিরূপ সিকিউরিটিতে লগ্নী করা হইল সে সম্বন্ধে ঠিক খবর পাইবার ব্যবস্থাও ঐ সকল আইনের মধ্যে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান সংশোধিত বীমা আইনে ইন্সিওর্যান্স সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আমাদের বিশ্বাস টাকালগ্নী নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আর কোন প্রকার পৃথক এবং অধিকতর কঠোর বিধান করিবার প্রয়োজন নাই। তবে যদি গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই মত পরিবর্ত্তন না করেন, তবে আমরা প্রস্তাব করি গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মঞ্জুরী সিকিউরিটিতে বাধ্যতামূলক লগ্নীর পরিমাণ পলিসির দাবীর উপর শতকরা ৫৫ টাকা হিসাবে না করিয়া শতকরা ৩৩⅓% টাকা হিসাবে ধার্য্যকরা হউক। ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের গত কয়েক বৎসরের রিপোর্ট এবং

বার্ষিক সভায় চেয়ারম্যানগণের বক্তৃতা পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে, টাকা লগ্নী দ্বারা কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি করা কিরূপ কঠিন কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপরে যদি গভর্ণমেণ্ট আরও কড়াকড়ি আইন করেন তবে তাহার ফল বীমা ব্যবসায়ের পক্ষে সর্ব্বনাশকর হইবে। হয়ত অল্প সংখ্যক বড় কোম্পানীর ইহাতে প্রথমতঃ কোন ক্ষতি দেখা যাইবে না, কিন্তু পরিণামে ছোট বড় সকল বীমা কোম্পানীই ইহার কুফলে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

পলিসির দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা

বর্ত্তমান সংশোধিত বীমা আইনের ৩৯ ধারায় এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে কোন পলিসি ইস্যু হইবার দুই বৎসর পরে কোম্পানী তৎসম্বন্ধে আর কোন আপত্তি তুলিতে পারিবেন না এবং বীমাকারী অথবা স্বাস্থ্য পরীক্ষকের মিথ্যা উক্তির অজুহাত দেখাইয়া ঐ পলিসির দায় হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। যে স্থলে বীমাকারী জ্ঞাতসারে কোন গুরুতর বিষয়ে প্রতারণা মূলক মিথ্যা উক্তি করে, কেবলমাত্র সেই স্থলেই কোম্পানী পলিসির দায় সম্বন্ধে আপত্তি তুলিতে পারিবেন।

যদিও পলিসি হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই নিয়ম করা হইয়াছে, কিন্তু একটু বিচার করিলে দেখা যায় পরিণামে ইহাতে তাহাদের ক্ষতিই হইবে। যদি কোন দুষ্টলোক নিজের বয়স অথবা স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাঁড়াইয়া কম প্রিমিয়ামে পলিসি লয়, তবে তাহা অন্যান্য ভাল পলিসি হোল্ডারদের পক্ষে,—অর্থাৎ যাহারা বয়স ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সত্য কথা বলিয়া পলিসি লইয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতি জনক। এতদ্ব্যতীত এক তরফা স্বার্থ বিচার করাও আইনের নীতি হওয়া উচিত নহে। কোম্পানীর স্বার্থ ও পলিসি হোল্ডারদের স্বার্থ বাস্তবিক অভিন্ন। সুতরাং যাহাতে কোম্পানীর ক্ষতি, তাহা পলিসি হোল্ডারদের পক্ষে লাভ জনক হতে পারে না। দুষ্ট লোকদের প্রতারণা হইতে কোম্পানীকে রক্ষা করার ব্যবস্থাও থাকা আবশ্যক। সেইজন্য আমাদের মনে হয় পলিসির দায়িত্ব পাকাপাকিরূপ প্রতিষ্ঠার সময় দুই বৎসর না করিয়া ৫ বৎসর করা উচিত।

নিম্নতম বীমার পরিমাণ

বর্ত্তমান সংশোধিত বীমা আইনে নিয়ম হইয়াছে যে ৫০০ টাকা এবং তাহার কম টাকার উপর কোন পলিসি ইস্যু করা যাইবে না। ভারতবর্ষের মত দেশে,—যেখানে অধিকাংশ লোকের আয় অতি অল্প, এবং যেখানে বীমা করার প্রবৃত্তি সাধারণ লোকের মধ্যে জাগ্রত হয় নাই,—সেখানে ৫০০ টাকার পলিসিও ইস্যুকরা নিষিদ্ধ, এরূপ ব্যবস্থা শুধু বীমা ব্যবসায়ের পক্ষে নহে, জনসাধারণের পক্ষেও] ক্ষতিজনক। ইহার ফলে বর্ত্তমান সময়ে কো-অপারেটিভ নীতিতে যে সকল বীমা কোম্পানী ব্যবসা চালাইতেছেন, তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে। আমরা আশা করি, কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্যগণ এইসব বিবেচনা করিয়া অন্ততঃ ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত নিম্নতম বীমার পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিবেন।

বীমা আইনের সম্বন্ধে আরও যে সকল গুরুতর আপত্তিজনক ধারা রহিয়াছে সে বিষয়ে এবার স্থানাভাব বশতঃ আমরা আলোচনা করিতে পারিলাম না। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলার ইচ্ছা রহিল।

বীমা প্রতারণার মামলা

বিগত ১৯৩৪ সালের প্রথম ভাগে দিশাবাস গ্রাম নিবাসী হাফিজুল্লা নামক এক ব্যক্তি তাহার পুত্র বলিয়া বর্ণিত সিরাজুল্লার নামে সিঙ্গাপুরের গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে দুইটি পলিসিতে ৪৫০০ টাকার জীবন বীমা করে। এবং নিজের নামে ঐ পলিসি দুইটি এসাইন করাইয়া লয়। ১৯৩৫ সালে কোম্পানীর কলিকাতা আফিসে জানান হয় যে, বীমাকারী সিরাজুল্লার কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর প্রমাণ স্বরূপ ডাক্তারের এবং ইউনিয়ান বোর্ডের সার্টিফিকেট দাখিল করা হয়। তদনুসারে কোম্পানী ১৯৩৫ সালের আগষ্ট মাসে পলিসির টাকা যথারীতি সম্পূর্ণ রূপে দিয়া দাবী মিটাইয়া ফেলে। ইহার পরে একখানি বেনামী চিঠি পাইয়া কোম্পানী জানিতে পারে, হাফিজুল্লার সিরাজুল্লা নামে কোন পুত্রই ছিল না এবং বাস্তবিক তাহার কোন পুত্র সন্তানই নাই। সে মিথ্যা নামে কোম্পানীকে প্রতারণা করিয়া টাকা নিয়াছে। অতঃপর কোম্পানীর পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হইলে তদনুসারে পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত করিয়া সম্প্রতি হাফিজুল্লাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বেলুচিস্থানের লারকানা জেলার ওয়ারা গ্রামের নুর মহম্মদ নামে একব্যক্তি আলীগড় কলেজে পড়িত। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য সে বিলাত গমন করে, কিন্তু অর্থাভাবে দুরবস্থায় পড়িয়া সে একটি হোটেলে কাজ লয়। নবাব ইউসফ্ আলী খাঁ সর্দ্দার নামক একজন ধনী লোক এই হোটেলের মালিক ছিলেন। তিনি কোয়েটা ভূমিকম্পে মারা যান। সান্ লাইফে তাঁহার ৩৭৫০০ টাকার জীবন বীমার পলিসি ছিল। নুর মহম্মদ সুবিধা পাইয়া জাল দলিলের সাহায্যে কোম্পানীর নিকট ঐ পলিসির টাকা আদায় করে এবং হোটেলটির দখল পাইবার জন্য লণ্ডনের আদালতে এক মামলা রুজু করে। তাহার প্রতারণা এইখানেই শেষ হয় নাই। সে অতঃপর ঐ সান্ লাইফ কোম্পানীতেই গত ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ১০০০ পাউণ্ডের একখানি জীবনবীমার পলিসি লয়। ইতিমধ্যে সে দেশে ফিরিয়া আসে এবং বিলাতে তাহার এক ভাইর নিকট এই মর্ম্মে এক মিথ্যা টেলিগ্রাফ পাঠায় যে, সর্পাঘাতে নুর মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাইকে দিয়া সান্ লাইফের নিকট পলিসির দরুণ ১০০০ পাউণ্ড দাবী করায়। কিন্তু এত তোড়-জোড় শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিল না। ইতিমধ্যে তাহাকে পূর্ব্বোক্ত হোটেল সম্বন্ধীয় মামলার ব্যাপারে একবার বিলাত যাইতে হইয়াছিল। গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টি এড়াইতে না পারিয়া সে অবশেষে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বীমাকোম্পানীর প্রথম বৎসরের নূতন কাজ সংগ্রহ করিবার খরচ সম্বন্ধে আমেরিক্যান্ বীমাকোম্পানী সমূহের অভিজ্ঞতা

আমাদের পাঠকগণ বীমাবিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত চুনীলাল লাহিড়ীর সহিত বিশেষরূপে পরিচিত। তিনি অনেকবার আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকায় জীবন বীমা সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

আমেরিকার অন্তর্গত যুক্তরাজ্যে যে সকল জীবন বীমা কোম্পানী পরিচালিত হইতেছে তাহারা প্রথম বৎসরের নূতন কাজ সংগ্রহের জন্য যে কমিশন দিয়াছে তাহার একটি হিসাবের তালিকা তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন। আমেরিকার বিশ্বাসযোগ্য নানা বিখ্যাত পুস্তক ও সরকারী বিবরণী হইতে তিনি এই তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কোম্পানীগুলি বহুদিন ধরিয়া বর্ত্তমান আছে: সুতরাং বর্ত্তমান জীবনবীমা আইনে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের খরচের যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত এই সকল কোম্পানী প্রথম বৎসরের কাজ সংগ্রহের জন্য যে কমিশন দিয়া থাকেন তাহা তুলনা করিলে যে দারুণ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তাহা, আশা করি, কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের সদস্যগণ বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন। অল্প কয়েকটি কোম্পানী ব্যতীত, অবশিষ্ট সব ভারতীয় কোম্পানীই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতীয় বীমা আইন প্রথম বৎসরের কাজ সংগ্রহের জন্য খরচের যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন তাহার মধ্যে আমাদের দেশীয় কোম্পানীগুলির কার্য্য করা সম্ভব কিনা তাহাও তাঁহারা বিচার করিয়া দেখিবেন।

আমেরিকায় বীমার ব্যবসা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেখানেও বহু পুরাতন কোম্পানীগুলিরও নূতন কার্য্য সংগ্রহ করিবার জন্য যে পরিমাণ খরচ হয়, আমাদের এই নূতন আইনে খরচের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে তদ্দ্বারা কি আমাদের দেশীয় কোম্পানীগুলি বিদেশী কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগীতা করিতে সমর্থ হইবে? এত কম খরচে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি বিদেশী কোম্পানীর সহিত অন্যায় প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। আইন এরূপভাবে তৈরী হওয়া দরকার যাহাতে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ নিরপত্তা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হয় এবং ক্রমশঃ উন্নতির পথে ধাবিত হয়। কিন্তু কোনো আইন যদি হঠাৎ কোন ব্যবসা সম্বন্ধে অসম্ভব রকম সর্ত্ত সকল নির্দ্ধারণ করিয়া দেয় তবে সেই ব্যবসা কখনো উন্নতি লাভ করিতে পারে না, বরং নানা প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংসের দিকে যায়। পরপৃষ্ঠায় তালিকাটী দেওয়া গেল।

Year of incorporation.	Name of the Country or State under the Laws whereof the companies are incorporated.	Ratio of First year's commission to New Premium.				
		Year 1925	Year 1926	Year 1927	Year 1928	Year 1929
1819	Connecticut	43.3	46.7	42.1	42.6	44.1
1835	Massachusettes	48.5	48.5	19.4	48.5	48.0
1841	New York	19.2	49.5	18.2	46.4	47.3
1843	do	44.6	1·50	44.4	42.0	45.8
1844	Massachusetts	45.8	45.2	15.0	42.4	47.6
1845	New Jersey	44.9	12.5	13.6	14.1	19.1
1846	Connecticut	40.6	11.4	10.8	...	...
1847	*Canada	53.8	56.0	50.2	53.0	52.4
1847	Pennsylvania	17.6	47.3	47.3	48.1	46.1
1848	Maine	46.7	17.8	19.5	50.0	50.9
1848	Vermont	48.7	49.8	47.0	48.9	49.2
1850	New York	47.5	49.2	52.0	51.3	53.1
1851	Massachusetts	14.2	44.5	44.1	39.9	44.0
1851	do	...	42.7	41.2	40.5	40.6
1857	Missouri	73.8	65.8	72.5	71.5	70.4
1857	Wisconsin	48.6	49.1	48.6	47.4	49.4
1859	New York	45.1	44.6	15.2	43.8	43 5
1860	do	48.9	50.5	53.1	50.7	52.9
1860	do	44.7	44.2	44.8	45.9	46.4
1860	Maryland	42.5	41.2	73.7	53.3	48.2
1862	Massachusetts	41.5	43.0	42.1	41.5	40.0
1863	Connecticut	..	41.7	44.5	44.6	42.6
1864	Maryland	42.3	44.0	42.9	...	42.7
1865	Connecticut	..	...	42.1	41.4	43.4
1865	Pennsylvania	...	...	...	42.9	45.7
1866	District of Columbia	43.4	46.7	46.5	45.9	45.8

Year of incorporation.	Name of the Country or State under the Laws whereof the companies are incorporated.	Ratio of First Year's commission to New Premium.				
		Year 1925	Year 1926	Year 1927	Year 1028	Year 929
1867	California	58.7	59.5	59.6	59.5	60.1
1867	Iowa	44.3	45.8	44.0	42.6	...
1868	Illinois	56.4	55.3	55.6	52.5	53.4
1871	*Canada	56.7	63.1	...	...	57.4
1871	Virginia	58.1	55 2	50.5	54.3	59.6
1878	Massachusetts	...	...	...	...	67.4
1878	Pennsylvania	45.5	45.4	46·8	44.5	42.8
1879	Iowa	46.2	44.2	42.7	42.4	47.1
1879	*Canada	53.1	52.6	52.1	44.5	52.6
1880	Minnesota	55.8	56.7	55.1	52.1	53.0
1882	Maryland	50.0	49.9	44.5	42.4	45.7
1884	Illinois	63.5	63.1	60.8	61.9	61.1
1885	District of Columbia	74.6	73.7	80.9	75.4	69.3
1885	Minnesota	57.9	54.1	53.4	53.1	54.5
1886	Iowa	74.1	73.2	73.2	74.6	77.4
1886	New York	43.3	44.3	45.5	45·5	46.1
1887	Nebraska	62.6	62.1	61.6	62.9	61.2
1887	Tennessee	53.9	58 5	50.5	49.9	...
1889	Iowa	62.1	63.9	63.2	66.5	62.1
1890	North Carolina	69.4	68.0	64.1	63.7	63.3
1890	Alabama	...	...	..	45.2	49.1
1891	*Canada	55.1	54.0	53.1	47.0	51.4
1891	Massachusetts	50.7	47.4	72.6	70.4	...
1892	Missouri	54.9	56.7	50.7	52.2	52.6
1893	Minnesota	61.8	63.5	65.7	63.9	64.5
1893	Illinois	66.8	68.5	68.9	68.6	65.4

Year of incorporation.	Name of the Country or State under the Laws whereof the companies are incorporated.	Ratio of First Year's commission to New Premium				
		Year 1925	Year 1926	Year 1927	Year 1928	Year 1929
1894	Iowa	54 3	5[illegible] 1	61.5	59.9	62 4
1994	Indiana	70.4	70 8	71 9	71.7	67.9
1895	Nebraska	81 3	69.7	66 0	71.4	70 2
1895	Missouri	75.5	75 7	74.5	75 3	73.7
1895	Wisconsin	56.7	56.0	52 6	56.7	56.8
1996	* Canada	55 9	55.2	56.6	54.9	55.8
1896	Minnesota	62.4	90.0	85.2	68 8	57 1
1896	Iowa	61.8	60.0	56 6	55.1	58.0
1897	Maryland	67.7	72.0	77.7	73.8	86.0
1897	Nebraska	71.9	70.0	70.0	67 7	66.0
1897 *	Canada	59.7	57.8	52 7	48.2	60.0
1897	Indiana	82.5	79.7	69.1	81.3	81.2
1898	North Carolina	45.7	65.5	65.6	61.7	75.3
1899	Indiana	56.1	58.1	53 5	42.9	45.5
1899	Illinois	63.1	14.8	48.1	...	44.2
1899	Delaware	66.2	64.3	67.0	67.1	71.6
1900	Arkansas	62.2	67.2	64.5	65.8	60.8
1900	* Canada	65.4	64.9	58.5	55.8	54.3
1900	Virgiana	53.4	49.4	49.7	48.8	48.2
1901	Texas	..	87 2	87.1	...	79.4
1902	Ohio	72.1	..	...	...	65.6
1902	Virgiana	76.4	74.0	73.9	74.2	77.5
1903	Iowa	79.0	82.3	73.3	82.5	75.0
1903	Nebraska	92.9	84.3	64 3	55.5	68.2
1903	Pennsylvania	63.3	67.2	66.2	64.7	63.7
1903	Texas	72.1	70.3	71.6	71.2	66.8

Year of in corporation.	Name of the Country or State under the Laws whereof. the companies are incorporated.	Ratio of First Year's commission to New Premium :				
		Year 1925	Year 1926	Year 1927	Year 1928	Year 1929
1903	Tennessee	74.0	71.7	68.6	68.3	64.7
1904	Illinois	51.9	51.8	51.6	50.3	48.7
1904	Nebraska	83.9	89.4	87.9	86.1	75.1
1905	Colorado	65.4	67.0	68.6	65.1	65.6
1905	Indiana	67.6	61.4	54.7	44.4	62.1
1905	do	62.6	64.2	62.3	64.1	68.2
1905	Illinois	..	...	91.9	...	75.3
1905	South Carolina	62.0	58.8	58.8	60.3	53.6
1905	Texas	60.2	59.5	59.2	58.2	57.1
1905	Utah	83.0	74.8	76.6	65.5	60.3
1906	Alabama	82.2	80.5	72.5	64.0	60.9
1906	California	57.7	69.0	67.7	65.6	68.2
1906	California	57.6	56.1	54.5	55.9	55.6
1906	Iowa	74.4	65.5	70.2	71.7	73.9
1906	Indiana	78.9	80.5	79.8	78.3	79.1
1906	Kansas	71.0	64.7	67.5	68.2	78.1
1906	Mississippi	69.8	70.0	69.7	70.9	70.1
1906	Nebraska	67.9	56.2	53.6	60.4	60.6
1906	Nevada	79.8	74.3	77.1	75.6	74.4
1906	Ohio	60.8	61.0	62.0	62.6	50.7
1906	Oregon	52.2	56.4	51.1	50.4	52.8
1906	Pennsylvania	57.8	55.6	56.9	55.6	57.8
1906	South Dakota	72.9	70.9	66.9	68.0	68.9
1906	West Virgiana	80.4	81.1	81.8	81.7	87.0
1906	do	75.9	68.7	72.8	62.9	63.8

Year of incorporation.	Name of the Country or State under the Laws whereo the companies ar incorporated.	Ratio of First Year's commission to New Premium				
		Year 1925	Year 1926	Year 1927	Year 1928	Year 1929
1906	Washington	56.3	55.8	52.3	48.5	52.3
1907	Alabama	58.2	61.5	57.2	65.1	53.7
1907	Delaware	52.6	51.6	60.2	57.2	62.3
1907	Illinois	70.4	71.1	80.8	77.5	73.0
1907	do	62.1	64.4	65.0	69.8	59.7
1907	Michigan	51.7	55.6	55.5	53.9	..
1907	Missouri	63.5	69 7	68.1	68.3	67.9
1907	North Carolina	57.4	58.8	52.9	52.4	51.9
1907	Ohio	67.4	66.0	60.1	59.9	57.9
1907	Tennessee	68.5	51.1	57.0	55.9	...
1908	Kansas	77.3	80.6	80.7	82.7	75.5
1908	Pennsylvania	72.5	69.8	68.5	68.1	65 9
1908	Texas	74.3	77.0	77.1	73.2	73.8
1908	Wisconsin	67.8	62.3	65.4	65.1	55.8
1909	Alabama	...		...	...	73.7
1909	California	50.0	48.5	49.3	50 9	52 4
1909	Illinois	68.9	74.6	73.4	71.6	68.6
1909	Missouri	73.9	67.1	74.4	75.9	79.3
1909	Missouri	73.0	73.2	71.0	70 0	70.0
1909	Oklahoma	81.7	81.5	80.3	81.0	79.3
1909	Ohio	71.5	69.0	69.4	68.2	64.9
1909	Pennsylvania	62.8	55.0	55.4	52 7	53.6
1909	Texas	85.6	65.6	65.6	71.4	72.4
1909	do	67.3	73.9	71.7	72.1	72.4
1909	Wisconsin	68.0	69.7	69.6	68.7	69.6
1909	do	51.9	52.5	56.6	58.3	59.4

Year of incorporation.	Name of the Country or State under the Laws whereof the companies are incorporated.	Ratio of First Year's commission to New Premium				
		Year 1925	Year 1926	Year 1927	Year 1928	Year 1929
1910	Colorado	73.9	76.6	70.2	84.1	85.3
1910	California	75.8	74.9	72.8	74.0	75.4
1910	Indiana	57.0	56.8	66.4	63.2	61.2
1910	do	50.0	57.8	58.6	63.8	67.2
1910	Kansas	58.4	53.4	52.1	70.6	79.8
1910	Montana	74.0	74.3	72.2	73.7	72.2
1910	Michigan	78.7	77.9	67.3	63.0	64.2
1910	Phillipine Islands	74.6	73.0	..	...	...
1910	Pennsylvania	...	44.8	52.0	54.0	61.3
1910	Texas	53.6	52.0	.	65.7	76.8
1910	Washington	68.5	69.0	69.1	68.7	65.7
1910	Wisconsin	63.3	66.6	72.9	67.9	70.3
1911	Colorado	80.2	74.1	89.4	85.5	87.5
1911	California	77.7	80.8	79.2	70.3	70.2
1911	Illinois	71.0	65.8	63.5	61.6	62.6
1911	do	54.9	55.1	56.7	53.0	55.9
1911	Lousiana	57.5	56.8	57.7	56.3	54.8
1912	Alabama	65.0	67.9	70.2	67.5	68.0
1912	Missouri	77.8	80.0	67.4	82.6	82.7
1912	Ohio	66.8	57.6	53.7	50.4	54.2
1913	Kansas	77.7	79.0	87.7	98.1	99.1
1913	Missouri	58.1	55.2	63.2	62.5	81.2
1913	Nebraska	84.9	91.4	82.2	84.0	76.7
1914	Michigan	68.6	68.7	67.5	69.0	69.4
1914	Iowa	68.5	70.7	71.2	71.9	72.5
1914	Michigan	74.6	62.5	60.0	60.4	68.2

Year of Incorporation.	Name of the Country or State under the Laws whereof the companies are incorporated	Ratio of First Year's commission to New Premium.				
		Year 1925	Year 1926	Year 1927	Year 1928	Year 1929
1914	Ohio	73.7	65.4	64.8	72.2	72.4
1914	Texas	74.8	72.4	60.7	71.3	...
1914	Virgiana	57.9	55.8	49.3	54.3	52.8
1915	Kentucky	74.4	69.6	67.4	68.5	61.9
1915	North Dakota	66.1	63.1	46.0	71.8	65.4
1916	Kansas	70.8	89.1	89.6	91.6	87.5
1916	Montana	85.4	74.8	72.2	83.9	84.6
1916	Nebraska	72.7	77.1	81.7	78.4	63.9
1917	Delaware	..	51.1	51.4	63.9	69.9
1917	Iowa	76.8	71.5	62.5	55.8	61.5
1918	Kansas	86.7	85.1	84.8	...	...
1918	Oklahoma	76.4	82.5	78.0	74.5	75.7
1919	Colorado	...	...	...	99.3	95.0
1919	Illinois	66.4	58.4	61.1	56.9	62.6
1919	do	64.2	63.0	67.1	55.9	62.0
1919	Kansas	89.0	...	98.6	74.9	...
1919	do	80.7	73.3	77.8	71.3	83.7
1919	Nebraska	78.3	78.2	77.4	70.6	72.7
1919	South Dakota	..	68.8	62.7	83.1	86.2
1920	Arkansas	78.0	75.3	76.8	70.4	70.8
1920	Colorado	75.0	62.6	85.9	93.8	85.5
1920	Iowa	63.5	64.4	68.6	75.7	72.3
1920	Illinois	88.9	81.2	...	85.1	59.1
1920	Kansas	85.7	85.6	73.9	72.8	78.4
1920	do	66.1	70.3	78.7	75.5	83.6
1620	Kentucky	75.6	57.2	68.6	...	...

Year of In corporation.	Name of the Country or State under the Laws whereof the companies are incorporated.	Ratio of First Year's commission to New Premium.				
		Year 1925	Year 1926	Year 1927	Year 1928	Year 1929
1920	Missouri	66.0	67.5	66.4	68.2	66.3
1920	North Carolina	65.2	62.5	65.8	68.4	68.7
1920	Texas	80.6	80.0	76 7	79.1	78.2
1921	Kansas	82.8	83 5	73.4	85.4	73.9
1921	Minnesota	...	48.9	62.4	56.6	63.8
1921	Nebraska	85.1	54.0	88.2	88.6	85.8
1922	Iowa	62.5	70.1	69.8	61 5	62.9
1922	Missouri	75.9	78.0	78.0	75.7	...
1923	Arkansas	83.8	83.4	74.9	69.1	64.7
1923	Illinois	...	54.8	63.9	66.5	...
1223	Missouri	...	80.7	80.3	...	...
1923	Nebraska	79.2	42.2	85.2	86.9	82.7
1924	Illinois	...	.	...	...	77.6
1924	do	...	54.0	73.9	68.2	66 3
1924	Nebraska	...	...	78.0	76.9	80.1
1924	North Caroilna	...		77.6	68.3	74.0
1924	Texas	63.4	74.2	79.7	78.5	61.9
1924	do	...	65.7	70.6	72.2	74.7
1925	Arkansas	...	86.1	85.4	85.3	88.6
1925	Illinois	...	...	61.8	67.6	65.6
1925	do	..	...	80.1	80.2	78.0
1925	do	..	68.7	65.9	64.3	80.1
1925	Missouri	69.1	...	60.4	...	...
1925	Texas	...	52.6	57.1	59.7	62.1
1925	do	...	80.9	82.6	81.5	81.1
1925	Washington	...	86.1	72.3	...	...

Year of incorporation	Name of the Country or State under the Laws whereof the companies are incorporated.	Ratio of first year's commission to New Premium				
		Year 1925	Year 1926	Year 1927	Year 1928	Year 1929
1926	Arkansas	.	.	.	93.0	
1926	Florida	.	..	73.5	73.5	.
1926	Illinois	...	...	88.8	110.1	.
1926	Kansas	..	...	.	83.1	82.5
1926	do		80.6	89.2	84.4	86.2
1926	Louisiana	..	.	..	..	82.2
1926	Missouri	..	.	50.6	75.2	62.3
1926	do	...		54.5	71.1	72.8
1926	Nebraska	...		...		75.0
1926	do	..	..	73.1	75.8	107.0
1926	do	...	...	77.2	87.1	88.7
1926	do	...	...	72.7	72.3	72.7
1926	Texas	...	71.0	79.9	79.9	80.1
1926	do	...	70.7	78.8	75.1	72.7
1926	Tennessee	.	...	54.2	71.2	64.9
1927	Kansas	...		90.4	71.1	70.0
1927	Michigan		...	...	66.1	69.6
1927	New Jersey	..	...	...	58.0	68.0
1927	Oklahoma	...		66.5	84.8	89.3
1927	Texas	...	...	...	84.7	82.6
1927	do	.	..	...	79.6	78.4
1928	Alabama	...	...	...	61.6	68.5
1928	Illinois	.	...	...	...	75.1
1928	do	...	...	...	72.8	...
1928	Kansas	..	.	.	90.4	89.6
1928	Missouri		...	..	92.5	113.0
1928	Nebraska		...		..	73.0
1928	Texas	...	...	...	79.9	78.4
1928	Utah	...	...	...	...	78.8
1929	Texas		...	...	...	82.7
1929	Colorado	...	...	...	...	101.5

* Canadian basis excludes Single Premium and Annuities.

কলিকাতা কর্পোরেশন

নোটীশ

১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৮- ধারার বিধান মতে এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবগতার্থে বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, রিজার্ভ ট্যাঙ্ক সমূহে ও জল ধরিয়া রাখার চৌবাচ্চা সমূহে যাহাতে মশক জন্মিতে না পারে, তজ্জন্য ৪৭৮ ধারার (চ) প্রকরণ অনুসারে নিম্নলিখিতরূপ উপধারা সমূহ প্রনয়ণ করার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন প্রস্তাব করিয়াছেন :—

১। যে কোন বাড়ীর চৌবাচ্চা ও রিজার্ভ ট্যাঙ্ক—যাহাতে জল সরবরাহ করা হয়, তাহা মশক-নিরোধক হইতে হইবে এবং নিম্নলিখিত সর্ত্তসম্মত হইবে :—

(ক) বেশ খাপ খাইয়া আটকায় এরূপ ঢাকনা করিতে হইবে এবং উহা ওয়াটার ওয়ার্কসের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অনুমোদিত প্যাটার্ণের হইবে এবং মজবুত বোল্ট ও নাট দ্বারা আটকাইয়া রাখিতে হইবে।

(খ) চৌবাচ্চা বা রিজার্ভ ট্যাঙ্কের সহিত সংলগ্ন ওয়ার্ণিং পাইপ বা ওভারফ্লো পাইপ, ওয়াটার ওয়ার্কসের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার কর্ত্তৃক অনুমোদিত নির্দ্দিষ্ট প্যাটার্ণের ধাতু নির্ম্মিত সছিদ্র ক্যাপ দ্বারা ওয়্যার গেজ দ্বারা নহে, সুরক্ষিত হওয়া চাই।

(গ) ওয়াটার ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুত পাক্ক-হোল বা সংযোগকারী পাইপে ব্যবহার করিতে হইবে নতুবা যথাযথভাবে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

(ঘ) চৌবাচ্চার পার্শ্বদেশে বা ছাদে যে ওয়াটার গেজের জন্য ছিদ্র আবশ্যক হইবে, তাহাকে মশক নিরোধক করিয়া রাখিতে হইবে।

২। যে পর্য্যন্ত ওয়াটার ওয়ার্কসের একজিকিউটীভ ইঞ্জিনীয়ার কোন বাড়ীর চৌবাচ্চা ও রিজার্ভ ট্যাঙ্ক সমূহ এই উপধারা সমূহ অনুসারে মশক নিরোধক বলিয়া সার্টিফিকেট না দিবেন, সেই পর্য্যন্ত ঐ বাড়ীতে নূতন জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে না।

৩। পরিদর্শনের সুবিধার্থ প্রত্যেক চৌবাচ্চা ও রিজার্ভ ট্যাঙ্কে কর্পোরেশন কর্ত্তৃক এরূপভাবে নম্বর দেওয়া হইবে, যাহাতে উহা সহজেই চোখে পড়ে।

৪। প্রত্যেক বাড়ীর প্রত্যেক চৌবাচ্চা ও রিজার্ভ ট্যাঙ্ক—যাহাতে জল সরবরাহ করা হয়—তাহা ভালভাবে মেরামত করিয়া রাখিতে হইবে।

৫ (১)। হেল্‌থ অফিসার বা এতৎসম্পর্কে তৎকর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মিউনিসিপ্যাল অফিসার পরীক্ষা করিয়া যদি দেখিতে পান যে ঐরূপ কোন চৌবাচ্চা বা রিজার্ভ ট্যাঙ্ক মশক

নিরোধক নহে বা ১ উপধারার যে কোন সর্ত্তসম্মত নহে বা ৪ উপধারার বিধানসম্মত নহে তবে তিনি লিখিত নোটীশ দ্বারা, যে বাড়ীতে ঐরূপ চৌবাচ্চা বা বিজার্ভ ট্যাঙ্ক পাওয়া গিয়াছে, সেই বাড়ীর মালিককে বা বাসিন্দাকে নিম্ন লিখিতরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিতে পারেন :—

(ক) উহা সরাইয়া ফেলিতে বা

(খ) নোটীশে লিখিত অনুযায়ী রদবদল করিতে।

(২) এই উপধারা অনুসারে নোটিশ জারি করার তারিখ হইতে সাত দিন মধ্যে যদি নোটিশে লিখিত মত কাজ না করা হয়, তবে কর্পোরেশন তৎক্ষণাৎ নিজেই ঐ কাজ করিতে পারিবেন এবং এজন্য খরচের টাকা যাঁহার উপর নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাকে দিতে হইবে।

৬। যদি কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্লাম্বার, কোন বাড়ীতে জল সরবরাহার্থ নূতন বিজার্ভ ট্যাঙ্ক বা চৌবাচ্চা স্থাপন করেন এবং ঐ বিজার্ভ ট্যাঙ্ক বা চৌবাচ্চা ১নং উপধারার বিধানসম্মত না হয়, তবে তাঁহার লাইসেন্স কাটা যাইতে পারে।

৭। যদি কোন প্রেমিসেস, বাড়ী বা কাঁচা বাড়ী একপক্ষ কাল খালি থাকে, তবে উহার মালিক বা বাসিন্দা বা লেসীর তৎক্ষণাৎ এসম্বন্ধে হেলথ অফিসারকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে। ঐরূপ সংবাদ পাওয়া মাত্র হেল্‌থ অফিসার বা এতৎসম্পর্কে তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারী, ঐ প্রেমিসেস, বাড়ী বা কাঁচা বাড়ী দেখিতে যাইবেন বা দেখার জন্য ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং তথায় মশা যাহাতে জন্মিতে না পারে, তজ্জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

৮। যদি কোন বাড়ীর মালিক, বাসিন্দা বা লেসী পূর্ব্বোক্ত ৭নং উপধারার বিধান ভঙ্গ করেন, তবে তাঁহার ২০, টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে এবং প্রথমবার আইন ভঙ্গ করার দরুণ জরিমানা হওয়ার পরও যদি আইন ভঙ্গ চলিতে থাকে, তবে যে পর্য্যন্ত আইন ভঙ্গ চলিবে, সে পর্য্যন্ত প্রত্যহ ৫০, টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

সর্ব্বসাধারণের দেখার জন্য মুদ্রিত উপধারার একখণ্ড আপিসে রাখা হইয়াছে, উহা বিনা খরচায় দেখা যায়। অফিস খোলা থাকিলে যে কোন দিন বেলা ১২টা হইতে ৩টার মধ্যে সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে সেণ্ট্রাল রেকর্ড কীপারের নিকট দুই আনা মূল্যে উহা কিনিতেও পাওয়া যায়।

প্রস্তাবিত উপধারা সম্পর্কে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তবে তাঁহাকে তাহা **১৯৩৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে দাখিল করিতে হইবে ;** ঐ তারিখের পর প্রস্তাবিত উপধারাসমূহ সম্বন্ধে অপরাপর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

জে সি মুখার্জ্জী,
চীফ একজিকিউটিভ অফিসার।
১।১১।১৯৩৭

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী মাদ্রাজে একটি ব্রাঞ্চ আফিস খুলিয়াছেন। মিঃ সম্পদ্ আয়েঙ্গার উক্ত আফিসের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। মাদ্রাজ ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ মিঃ চন্দ্রশেখর আয়ার এই নূতন আফিসের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

এশিয়া মিউচুয়ালের কর্ম্মচারিগণ গত ১২ই সেপ্টেম্বর কোম্পানীর চীফ্ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ বি শূর এম বি, ডি টি এম, ডি পি এইচ্, মহাশয়কে এক সান্ধ্য সম্মেলনে তাঁহার ইংলণ্ড গমন উপলক্ষে বিদায় অভিনন্দন করিয়াছেন। ডাঃ শূর চিকিৎসা বিজ্ঞানে অধিকতর ব্যুৎপন্ন হইবার নিমিত্ত বিলাত যাইতেছেন।

গত ২১শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে এশিয়া মিউচুয়্যালের জীবন বীমা বিভাগ খোলার প্রথম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। মিঃ বি সি চ্যাটার্জ্জি তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মিঃ এস কে রায় বি কম, আজমীরে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটির অর্গ্যানাইজার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে তথায় বম্বে মিউচুয়ালের কার্য্য করিতেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটির মাদ্রাজ ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মিঃ এস এম চৌধুরী সোসাইটির হেড আফিসে বদলী হইয়াছেন। তাঁহার স্থলে মিঃ অনন্ত চারিয়ার মাদ্রাজ ব্রাঞ্চের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিঃ এইচ এন্ ম্যাসার ভারত ইন্সিওরেন্সের বোম্বাই ব্রাঞ্চের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ কাদেরমল বি এল, এম এল এ উক্ত কোম্পানীর অর্গ্যানাইজাররূপে আসাম সাব অফিসে যোগদান করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে হিন্দুস্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এশিয়া মিউচুয়ালের নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীগণ জুলাই মাসের কার্য্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাইয়াছেন

(১) মেসার্স এ কে মিত্র এণ্ড কোং রাণীগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার, রাণীগঞ্জ।

(২) মিঃ এ বি মহম্মদ মনসুর চৌধুরী ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার বরিশাল

(৩) মিঃ দেবেন্দ্রবিজয় সান্যাল (কলিকাতা) এজেন্সী ইনস্পেক্টর

(৪) সন্তোষ কুমার মুখার্জ্জি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার রাণাঘাট

(৫) মিঃ চিত্ততোষ সরকার (কলিকাতা)

(৬) মিঃ সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (পাটনা)

(৭) মিঃ দ্বিজেন্দ্রলাল মুখার্জ্জি (ফরিদপুর)

মিঃ মনমোহন স্বরূপ ভাটনগর সম্প্রতি হিন্দুস্থানের লাহোর ব্রাঞ্চের আম্বালা সাব অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে মেট্রোপলিটানের লাহোর ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী ছিলেন। মিঃ জে সি উবেরয় হিন্দুস্থানের উক্ত আম্বালা সাব অফিসের এজেন্সী সুপারভাইজার হইয়াছেন।

এক কোটি টাকা মূলধন লইয়া বোম্বাই সহরে একটি নূতন ইনসিওরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইতেছে। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ধনীব্যবসায়ী মিঃ হোসেনভাই লালজী ইহার ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন। এই কোম্পানী অগ্নি বীমা, সামুদ্রিক বীমা, ও মোটর বীমার কারবার করিবেন।

ক্যালিডোনিয়ানের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এইচ ই জোনস্ কিছুদিন পূর্ব্বে ছয় মাসের ছুটি লইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছেন। তাঁহার স্থলে কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ জি ডি সাদার সাময়িকভাবে ম্যানেজারের কার্য্য করিতেছেন।

লাইট অব এসিয়ার সেক্রেটারী মিঃ সমরেশ চক্রবর্ত্তী পদত্যাগ করিয়া অব্যবহিত পূর্ব্বেই ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ এ কে ঘোষ অবৈতনিক ভাবে কোম্পানীর কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেছেন। মিঃ চক্রবর্ত্তী পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার এবং স্বদেশী শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে সর্ব্বস্বান্ত মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর কৃতি পুত্র। পরলোকগত ব্যারিষ্টার মিঃ আই বি সেন যখন ক্যালকাটা ইনসিওরেন্সের ডিরেক্টর ছিলেন তখন তিনিই সমরেশ চক্রবর্ত্তীকে ইনসিওরেন্সের কাজে টানিয়া আনেন এবং সেই খানেই তাঁহার হাতে খড়ি হয়। ক্যালকাটা ইনসিওরেন্সে কিছুকাল

কাজ শিক্ষা করিবার পর ভারতগভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান সলিসিটর জেনারেল মিঃ ধীরেন মিত্র তাঁহাকে লাইট অব এশিয়ার সেক্রেটারী করিয়া লইয়া যান এবং সেই হইতে গত কয়েক বৎসর যাবত তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত লাইট অব এশিয়ার নানাদিকে উন্নতি করিয়া সকলের প্রশংসা ভাজন হন। শিক্ষা, দীক্ষা, সততা এবং কার্য্যদক্ষতার গুণে এই উদীয়মান যুবক বীমাজগতে ধীরে ধীরে আপনার আসন রচনা করিয়া লইতেছেন এবং ইতিমধ্যেই বীমা রাজ্যের Magnates দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ, ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স সম্প্রতি তাঁহাকে উচ্চ বেতনে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আনন্দের সহিত মিঃ চক্রবর্ত্তীর Insurance career লক্ষ্য করিতেছি এবং উত্তরোত্তর তাঁহার আরও উন্নতি কামনা করিতেছি।

—•—

কো-অপারেটিভ কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের হেড আফিস গত ১লা অক্টোবর ৮৪।১এ বৌবাজার হইতে ৮নং লায়নস রেঞ্জ কলিকাতা এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে। ২২নং বাংলা বাজার ঢাকা এই ঠিকানাতে গত ১৫শে সেপ্টেম্বর উক্ত ব্যাঙ্কের একটি ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ইহার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন।

—•—

মেসার্স কে, বি, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লক্ষ্ণৌয়ের অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ইন্সিওরান্স কোম্পানীর বঙ্গদেশস্থ চীফ এজেন্টস হইয়াছেন। তাহাদের আফিস ১০২নং ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা এই ঠিকানায় অবস্থিত।

—•—

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সম্প্রতি পাবনাতে ও রাঁচিতে ব্রাঞ্চ আফিস খুলিয়াছেন।

ব্যাঙ্কিং জগতে বাঙ্গালীর নষ্টনাম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দান অপরিসীম। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ধ্বংসস্তূপের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিদেশী এবং বাঙ্গলার বাহিরের ব্যাঙ্ক পরিচালকগণ যখন টিট্‌কারী দিতেছিল, তখন এই বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কই শ্মশানে শিবরাত্রির সলিতার মত প্রদীপটি জ্বালিয়া রাখিয়াছিল এবং নীরবে যে শবসাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিল, তাহারই ফলে বাঙ্গালীর নষ্ট বিশ্বাস পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। গত দশ বৎসরের নীরব প্রচেষ্টা প্রখর ভবিষ্যতদৃষ্টি এবং অসাধারণ সতর্কতা ও সাধুতার ফলে আজ বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বাঙ্গালীর একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং গর্ব্বের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আর সে গভীর অমানিশার মধ্যে প্রদীপ জ্বালাইয়া বসিয়া নাই—সে বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে এক নূতন ঊষা আনয়ন করিয়াছে এবং তাহার দেখা দেখি অনেক প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বাংলার দেউলে এই যে দীপালীর আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে ইহা সার্থক হউক, স্থায়ী হউক, প্রত্যেক বাঙ্গালী ভগবানের নিকট আজ এই প্রার্থনা করুন।

—•—

গত ২৭শে অক্টোবর ৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড (ভবানীপুর) কলিকাতা এই ঠিকানায় ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের একটি ব্রাঞ্চ আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

—•—

লাইট অব এসিয়া ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানীর প্রথম গঠনকারক ও ডিরেক্টার প্রিন্স ভিক্টর

নারায়ণ গত ৩০শে অক্টোবর ইংলণ্ডে মোটর দুর্ঘটনায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে গত ১লা নভেম্বর উক্ত কোম্পানীর আফিস বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

এসিয়া মিউচুয়্যালের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ জে এল সাহা গত পূজার ছুটীর সময় পুরীতে অবস্থানকালে জনৈক সমুদ্রে নিমগ্নমান ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মিঃ আই বি সেন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিস্বরূপ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে য্যাডভাইজরী কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মেসার্স্ ক্রাউন ট্রেডিং কোং নিউ ষ্টেট অব ইণ্ডিয়া ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর বঙ্গদেশীয় চীফ্ এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা ঠিকানায় তাঁহাদের আফিস খোলা হইয়াছে।

হিমালয় য্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর সহিত মিঃ এইচ্ সি ঘোষের আর সংস্রব নাই। নিউ এশিয়াটিকের সুযোগ্য বীমাকর্ম্মী এবং কলিকাতা ব্রাঞ্চের ভূতপূর্ব্ব সহকারী শ্রীযুক্ত প্রাসাদদাস রায় চৌধুরী হিমালয়ের হেড আপিশের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন।

তরুণ ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানীর চীফ্ এজেণ্টস মেসার্স্ ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোম্পানীর অধীনে মিঃ প্রভাতচন্দ্র সিংহ, এজেন্সী ইন্স্পেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন।

কার্য্য বৃদ্ধি হেতু বর্ত্তমান গৃহে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ওয়েলথ্ অব ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আফিস ২নং কমার্শ্যাল বিল্ডিংস, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অর্গ্যানাইজার মিঃ বি এন্ সেন ঐ কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চের এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের পদে উন্নীত হইয়াছেন। মিঃ সেন তাঁহার নূতন কার্য্যে সফলতা লাভ করুন, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক কামনা।

জুপিটার জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চ আফিস ৭নং পোলক ষ্ট্রীট হইতে ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

মিঃ এস্ কে গুহ ভারত ইন্সিওরেন্সের চট্টগ্রাম শাখার এজেন্সী ইন্স্পেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে কার্য্য করিতেন।

গত ১৫ই অক্টোবর হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত মহীশূরে মহীশূর ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ ভেঙ্কটাপ্পার আহ্বানে মিঃ এন সি কেলকার সভার উদ্বোধন করেন। অন্যান্য কতিপয় ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ ও নেতৃস্থানীয় বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

মহীশূর রাজ্যে বীমা সংক্রান্ত কোন পৃথক আইন নাই। সাধারণ কোম্পানী সম্বন্ধীয়

আইনের দ্বারাই বীমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি প্রস্তাব হইয়াছে, মহীশূর রাজ্যে বীমা সম্বন্ধে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আইনের অনুকরণে একটি পৃথক আইন রচিত ও প্রবর্ত্তিত করা হইবে। সেই আইনের পাণ্ডুলিপির প্রস্তুত হইয়াছে।

বোম্বাইর নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর লক্ষ্ণৌ ব্রাঞ্চ গত ১০শে সেপ্টেম্বর যুক্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থকে এক উদ্যান সম্মেলনে অভিনন্দিত করেন। অন্যান্য মন্ত্রীগণ, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সহ প্রায় ৪০০ জন সেই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নিউ এশিয়াটিকের চেয়ারম্যান মিঃ বি এম বিরলা গত ২রা সেপ্টেম্বর ইউরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে উক্ত কোম্পানীর ফিল্ড ওয়াকারগণ তাঁহাকে এক সভায় সম্বর্দ্ধনা করেন। বীমার কাযে ফিল্ড ওয়ার্কারদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হইয়াছিল, তাহার ফলে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার কারবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইজন্য মিঃ বিরলা সেই সভাতে তিন জন শ্রেষ্ঠ ফিল্ড ওয়ার্কারকে মূল্যবান রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্যাদির দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু দিল্লীর ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান হইয়াছেন। পরলোকগত ডাঃ আনসারী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৯৩৬) উক্ত কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছিলেন।

মেট্রোপলিটানের বাঙ্গালোর শাখা অফিসের ম্যানেজার মিঃ এস এন আচার্য্য উক্ত কোম্পানীর মাদ্রাজ ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

সংশোধিত বীমা আইন প্রবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ অনুসারে গত ১লা অক্টোবর হইতে ফাইনান্স সেক্রেটারী মহাশয় কারেন্সী কন্ট্রোলারের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সিকিউরিটী ডিপজিটের টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভ মিঃ পি কে গুহ রামকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ এ ম্যানেজিং ডিরেক্টার হিসাবে যোগদান করিয়াছেন।

মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি এফ-আই-এ ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর এ্যাকচুয়ারীর পদে যোগদান করিয়াছেন।

* * *

গত ২০শে আগষ্ট তারিখে বোম্বাই সহরে বিভিন্ন জীবন বীমা কোম্পানীর চিফ্ মেডিক্যাল অফিসার এবং ডাক্তারদের এক সভায় যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, ওরিয়েণ্টাল্ লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর অবসর প্রাপ্ত চিফ মেডিকাল অফিসার ডাক্তার জে, জে, কাবসেটজি তাহা ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা এই

১। সমস্ত ডাক্তারদের নামই প্রাদেশিক মেডিকাল রেজিষ্টারের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২। যে সকল ডাক্তার অসাধুতার আশ্রয় লন, তাঁহাদের নামে মেডিকাল কাউন্সিলে রিপোর্ট করিতে হইবে।

৩। চিফ্ মেডিকাল অফিসারের সহিত পরামর্শক্রমে অন্যান্য ডাক্তার নিয়োগ করিতে হইবে।

৪। ডাক্তারদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। ডাক্তারদের ফি-এর হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে।

৬। মেডিক্যাল কলেজ ও মেডিক্যাল স্কুল সমূহে জীবন বীমার দিক হইতে বীমাকারীর ডাক্তারী পরীক্ষা সম্বন্ধে বৎসরে অন্ততঃ ৬টি বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৭শ বর্ষ | পৌষ---১৩৪৪ | ৯ম সংখ্যা

জুতা ব্যবসায়ী টমাস বাটার আত্ম-জীবন চরিত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

টলষ্টয়, স্বাতোপ্লাক্, জোলা প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের লেখা পড়িয়া আমি কতকটা কম্যুনিষ্ট এবং পাকাপাকি রকমে সোস্থালিষ্ট হইয়াছিলাম। সুতরাং ক্যাপিট্যালিষ্ট সোসাইটী অর্থাৎ ধনীদের দ্বারা শাসিত এই সমাজের উপর আমার ঘৃণা জন্মিয়াছিল। আমার ধারণা ছিল, কেবল দুষ্টলোকেরাই এইরূপ সমাজে বাস করিতে পারে। এখানে একদিকে অনিচ্ছুক মজুরের দল পেটের দায়ে এবং পিটুনীর ভয়ে কাজ করে, অন্যদিকে ধনীর দল সেই মজুরদের শ্রমলব্ধ অর্থের সারাংশ শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। এই নিদারুণ দৃশ্যই সর্ব্বত্র দেখিতাম। আমার মনে হইত, টলষ্টয় যেমন বর্ণনা করিয়াছেন, স্বাতোপ্লাক যেমন কবিতায় লিখিয়াছেন, জোলা যেমন তাঁহার "টয়েল" (Toil) নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন, সেইরূপ সরল জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আমি উপার্জ্জন করিতে চাহিনা; আমার বসবাসের জন্য যতটুকু জায়গার দরকার তার বেশী জমির মালিক হইবার ইচ্ছা আমার নাই।
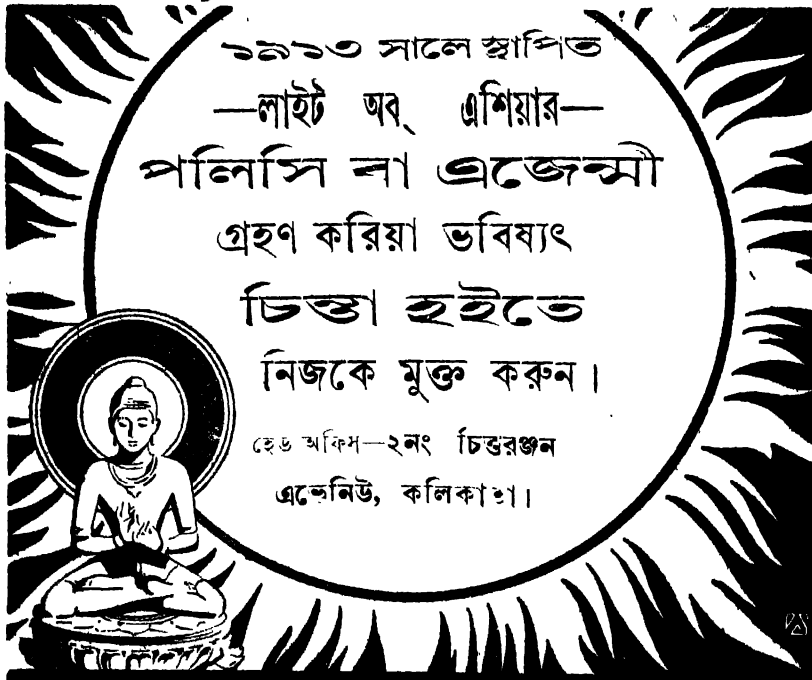
জার্ম্মানী হইতে ফিরিবার সময় রেলগাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া চাহিয়া দেখিলাম, রাইন-নদীর বিশাল উপত্যকাভূমি বিবিধ শস্যক্ষেত্রে সুশোভিত, বহু সমৃদ্ধিশালী নগর, জনপদে সমাকীর্ণ,—কত শিল্প-শালায়, এবং সুদীর্ঘ

রাজপথে অলঙ্কৃত! আমি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় চাহিয়া রহিলাম। রেলগাড়ীর দ্রুত গতির সঙ্গে সেই সকল দৃশ্য পর পর আমার চক্ষুর সম্মুখে মুহূর্ত্তের জন্য উপস্থিত হইয়া আবার চলিয়া যায়। দেখিলাম নাগরিক ও পল্লীবাসীদের সবল সুস্থদেহ সুন্দর পরিচ্ছদে শোভিত;—তাহাদের বাসগৃহসকল উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মিত; বিবিধ পণ্যে পরিপূর্ণ, বৃহৎ বাষ্পীয় তরণী সমূহ নদী পথে চলাচল করিতেছে;—তাহারা দেশ বিদেশের অধিবাসীদের জন্য কত দ্রব্য লইয়া যায়! আমি বুঝিলাম এসমস্তই সেই ষ্টীম ইঞ্জিন এবং যন্ত্রাবলীর কার্য্য,—যাহাকে টলষ্টয়ের উপদেশে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি। হয়ত, ঐ বিরাট্ যন্ত্রপাতি-সমন্বিত কারখানা, মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ উৎপাদন করিয়াছে,—কিন্তু তথাপি সে সব কি সুন্দর! আমার পিতা যে এই রকম ফ্যাক্টরীর চিম্‌নিই একদিন কল্পনা করিয়াছিলেন, সে কথা আমার মনে গাঁথা ছিল;—ভাবিলাম আমার পিতার সেই স্বপ্ন কি সফল হইবে না?

নানা চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে এমনি উষ্ণ মস্তিষ্কে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। যন্ত্রপাতির বিরুদ্ধে আমার যে একটা সংস্কার ছিল, তাহা ক্রমশঃ দূর হইল। আমি ছোট খাট কয়েকটি যন্ত্র আমার কারখানায় বসাইলাম। সেই সকল যন্ত্র হাতেই চালান হইত,—কিন্তু তাহাতে

উৎপাদন কিছু বেশী পাওয়া যাইত। ষ্টীম ইঞ্জিন ক্রয় করিবার উপযোগী অর্থ তখনও আমার ছিল না। যাহা হউক এইভাবে কিছুকাল কারবার চলার পর দেখিলাম, আমর দেনা শোধ হইয়া হাতে কিছু কিছু টাকা জমিতেছে।

কেহ কেহ আমাকে ক্যাপিটালিষ্ট বলিয়া ঠাট্টা করিল;—কেহ বা আমাকে "শ্রমিক শোষণ-কারী" (Slave Driver) আখ্যা দিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই সকল উপহাস ও নিন্দা আমার গা-সহা হইয়া উঠিল। কারণ বাস্তবিক আমি

টমাস বাটা

নিজে জানিতাম যে, আমি ক্যাপিটালিষ্টও নহি,—শ্রমিক শোষণ কারীও নহি; ইহাও বুঝিতাম, ক্যাপিটালিষ্ট ও শ্রমিক শোষণ কারী হইয়াও সত্যভাবে দেশের সেবা ও জনসাধারণের মঙ্গল সাধন করা যায়। আমি এতদিন না বুঝিয়া, না জানিয়া অজ্ঞতা বশতঃ যাহাকে ঘৃণা ও নিন্দা করিয়া আসিতেছি, আজ নিজে তাহাই হইতে চাহিলাম,—কারণ আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম সেই পথেই জন-সেবার সুযোগ রহিয়াছে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আমার কারবারের একটি স্মরণীয় বৎসর। লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্য

হইল, আমার কারখানার ছাদ ভেদ করিয়া তিনটি ষ্টীম ইঞ্জিনের চিম্‌নি ধূম উদ্গীরণ করিতেছে ;—ছোট মুচিশালা বৃহৎ ফ্যাক্টরীতে পরিণত হইয়াছে। বাটা মুচি এখন ফ্যাক্টরীর মালিক! আমার পিতার সুখ—স্বপ্ন সত্য হইল ;—তাঁহার ভবিষ্যৎ আশা পূর্ণ হইল। সেদিন আমার পিতার সঙ্গে যাহারা এই ফ্যাক্টরীর চিম্‌নি প্রসঙ্গে কলহ বিবাদ করিয়াছিল, আজ তাহারা আমার কারখানার দিকে চাহিয়া ঈর্ষায় সেই ধূম নিঃসারী চিম্‌নী অপেক্ষাও অধিক দগ্ধ হইতেছিল।

আমি কিন্তু একটা সংগ্রামে জয়ী হইলাম। একদিকে টলষ্টয়ের সরল জীবন যাত্রার আদর্শ ও সোস্যালিষ্ট্ মতবাদ, অন্যদিকে শিল্প ব্যবসায়ের

উন্নতি এবং প্রসার এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে আমার সদ্‌বুদ্ধির উদয় হইল। উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি বসাইয়া এবং এই সকল যন্ত্রকে পরিচালিত করিবার জন্য ষ্টীম ইঞ্জিন বা ইলেক্‌ট্রিক শক্তির সাহায্য লইয়া আমার জুতা তৈয়ারীর কারবারকে উন্নত স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিলাম। সঙ্কল্প স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ৮ ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট একটি ষ্টীম ইঞ্জিন আসিল,—এবং তার সহযোগী অন্যান্য যন্ত্রপাতিও ক্রয় করা হইল। কারখানার বাড়ীও একটু অদল বদল করিয়া ঠিক পুরাদস্তুর ফ্যাক্টরীর ষ্টাইলে তৈয়ারী করা গেল। তারপর নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব; আমার একের বুদ্ধিতে সে সকল বিষয়ের মীমাংসা হয় না। যদিও বহুদিন হাতে কলমে কাজ করিয়া এবং রুশিয়া, জার্ম্মাণী, ইতালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া আমার কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তথাপি আমি ফ্যাক্টরী পরিচালনা কার্য্যে কেবল মাত্র নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে সাহসী হইলাম না।

সেইজন্য ১৯০৪ খৃষ্টাব্দেই আমি আমার তিনজন মিস্ত্রীর সহিত আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন করি। সেখানে আমি এমন সব ব্যাপার দেখিলাম, যাহাতে একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেলাম। আমেরিকার অধিবাসীদের চাল চলন,—চিন্তা ভাবনা, কাজ কর্ম্ম সবই আশ্চর্য্য রকমের। তাহাদের মধ্যে এ বিচার বিতর্ক কথনই উঠে না,—অমুক কাজ সম্মানজনক, অমুক কাজ অপমানজনক। শ্রমের মর্য্যাদা বলিয়া যে একটা সমস্যা ইউরোপীয় সমাজে রহিয়াছে, বর্ত্তমান আমেরিকাবাসীর দাদা মশাইরা বহুকাল পূর্ব্বে তাহার সমাধান করিয়া গিয়াছেন। সেখানে দেখিলাম, উচ্চ বেতন ভোগী রাজকর্ম্মচারীর অথবা লক্ষপতি ধনীর সন্তানের পক্ষে রাস্তায় খবরের কাগজ ফিরি করিয়া বিক্রয় করাও অসম্মানজনক কাজ নহে। ছয় সাত বৎসরের ছেলেরাও সেখানে পিতার উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীন ভাবে নিজের জীবিকা সংস্থান করে। "খোকারা" সেখানে বাপের চেয়ে বড়। পিতারাও তাহাতে সন্তুষ্ট। সেখানে দেখিলাম, সকলেই জামার আস্তিন গুটাইয়া হাসিমুখে কাজ করিতেছে। সন্তান নিজের উপার্জ্জিত সম্পত্তি নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করে,—পিতা তাহাতে কিছু বলিতে চান না। তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের চাপে পুত্রকে দাবাইয়া রাখেন না। বাল্যকাল হইতে পুত্র নিজেকে পিতার সহিত সমান অধিকার বিশিষ্ট আমেরিকার রাষ্ট্রবাসী বলিয়া মনে করে। সেখানে দেখিলাম, কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বই মহত্বের পরিচায়ক। তুমিও কাজ করিতেছ,—আমিও কাজ করিতেছি, আমাদের মধ্যে কে বড় কে ছোট এই বিচার হইবে,—আমাদের কাজের দ্বারা। কে কত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহার হিসাব করিয়া বড় ছোট বিচার হইবেনা,—কিন্তু কাজের দ্বারা সমাজের ও রাষ্ট্রের হিতসাধন কে কি পরিমাণ করিয়াছি তাহার দ্বারাই বড়-ছোট বিচার হইবে। সেখানে ব্যবসায়ীদের মধ্যে নীচ প্রতিযোগিতা নাই। অর্থ উপার্জ্জনকারীরা একে অন্যকে ঈর্ষ্যা করে না। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার সমব্যবসায়ীর অর্থ লাভ দেখিয়া বরঞ্চ আনন্দিত হয়।

যন্ত্রপাতি, কল-কব্জা অথবা কারখানা

পরিচালনা বিষয়ে আমেরিকাতে নূতনত্ব বেশী কিছু দেখিলাম না। ইউরোপীয় দেশ সমূহে উহা আমি দেখিয়াছি প্রচুর। তবে আমেরিকার মজুরেরা ইউরোপীয় মজুর অপেক্ষা অধিকতর সুদক্ষ। যে কাজ করিতে ইউরোপীয় মজুরের দশ ঘণ্টা সময় লাগে, সেকাজ তাহারা এক ঘণ্টার মধ্যে করিয়া ফেলে। আমি একটা জুতার কারখানায় মজুরের কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কারণ নিজে কাজ না জানিলে অন্যের কাজ তত্ত্বাবধান করা যায় না।

আমাকে অনেক কষ্টে কারখানায় চাকুরী খুঁজিয়া নিতে হয়। সাধারণতঃ মজুরেরা সকাল ৭ টায় ঘুম হইতে উঠিয়া কাজে বাহির হয়। যাহারা চাকুরীর চেষ্টা করে, তাহাদিগকে ভোর ৫ টায় ঘুম হইতে উঠিয়া

বাটা ফ্যাক্টরীর
প্রফুল্লচিত্ত কারীগরগণ।

কারখানার ফটকে ধন্না দিয়া দাঁড়াইতে হয়। আমি যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিতাম. তাঁহার চেষ্টায় একটা ছোট কারখানায় আমার চাকুরী মিলিল। তাহাতেই আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিলাম। কারণ বিনা রোজগারে সেখানে বসিয়া বসিয়া গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া খাইবার মত ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি আমার ছিল না।

কারখানায় প্রবেশ করিয়া আমি ম্যানেজারের সম্মুখে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি জুতা তৈয়ারীর কোন্ কোন্ কাজ জান?" নিজের কর্ম্মপটুতার উপরে আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল। আমি গর্ব্বের সহিত উত্তর করিলাম "আমি জুতা

তৈয়ারীর সকল কাজই সমান জানি এবং ভালরূপে জানি"। ম্যানেজার মহাশয় আমার কথা শুনিয়া মুচ্‌কি হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই। তারপর যখন আমাকে কঠিন পরীক্ষা দিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইল,—এক একটা পরীক্ষায় পাশ করিতে যখন আমাকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইল,—একটা কাজ ভাল ফিনিস্‌ করিয়া উত্‌রাইতে যখন আমাকে পাঁচ বার ম্যানেজারের তিরস্কার শুনিতে হইল,—তখন বুঝিলাম, ম্যানেজারের সেই হাসির অর্থ কি গভীর! প্রতিদিন আমাকে এমনি অন্ততঃ ২০টী পরীক্ষা দিতে হইত।

আমেরিকার কারখানায় কাজ পাওয়া এমনি কঠিন ব্যাপার। আমি কতদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি,—হাতে যাহা কিছু টাকাকড়ি ছিল, তাহা ফুরাইয়া যাইবে এই ভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যতদিন না চাকুরী পাইব, ততদিন অন্নগ্রহণ করিব না,—উপবাসী থাকিব। আমি এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া ছিলাম। তারপর যখন কারখানায় চাকুরী পাইলাম, আমার অবস্থা ফিরিয়া গেল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াছি, দুই হাতে ফোস্কা পড়িয়াছে, ম্যানেজারের তিরস্কার, এবং সহকর্ম্মী আমেরিকান মজুরদের উপহাস শুনিয়াছি;—শুধু দু'বেলা দুই মুঠো অন্নের জন্য নহে,—জুতা তৈয়ারী শিল্পে যথার্থ শিক্ষা লাভের জন্য। আমার জুতা ব্যবসায়ের গোড়া পত্তনের কথা এই।

(সমাপ্ত)

শারদীয় উৎসবের অন্তে

শ্রীরামানুজ কর

শরৎকালে মায়ের আগমনে বাংলাদেশে প্রতিবৎসর আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হয়। বাঙ্গালী যেরূপ আড়ম্বরের সহিত দুর্গাপূজা করে অন্য কোন প্রদেশের হিন্দুরা সেরূপ ভাবে দুর্গাপূজা কি অন্য কোন পূজা করে না। দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর নিজস্ব; পূজা উপলক্ষে বাঙ্গালী আকাতরে অর্থ-ব্যয় করে। যাহার অর্থাভাব সেও ঋণ করিয়া আনন্দে মাতিয়া যায়। এই দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাঙ্গালায় যে কত অর্থ-ব্যয় হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আনন্দোৎসবের দ্বারা কোথায় জাতি উন্নতির পথে উঠিবে, না দিন দিন অধঃপতনের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই দুর্গাপূজায় বাঙ্গালী যে অর্থ ব্যয় করে তাহার অধিকাংশই বিদেশীর হাতে চলিয়া যায়। ফলে বাঙ্গালী নিঃস্ব হইতে বসিয়াছে। এই দুর্গাপূজা উপলক্ষে কোটী কোটী টাকার বস্ত্র বিক্রয় হয়। এই টাকা বোম্বাই, ইংল্যাণ্ড ও জাপানে চলিয়া যায়। বাঙ্গালায় মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া বস্ত্রের ব্যবসা করিয়া কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। * এই পূজা উপলক্ষ্যে

* আমরা লেখকের সহিত একমত নহি। প্রথমতঃ বাংলার বাহিরের লোকেরা বিদেশী বা পরদেশী নহে। অন্ততঃ জাপান ও জার্ম্মাণী প্রভৃতির ন্যায় বিদেশী নহে। বাংলার বাহির হইতে যদি জিনিষ কিনিতে হয় তবে অবাঙ্গালী হইলেও তাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেই কেনা সর্ব্বতোভাবে, বিশেষতঃ জাতীয়তার দিক দিয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় ধুতি ও শাড়ীর চাহিদা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই চাহিদা মিটাইবার জন্য সমগ্র বাংলায় আঙ্গুল গুনিয়া মোটে ৬।৭টী উল্লেখযোগ্য কল আছে। এইরূপ চাহিদা সত্ত্বেও বাংলার ধনীরা যদি কাপড়ের কল স্থাপন করার জন্য মূলধন নিয়োগ না করেন, তবে বাংলার বাহিরের, বিশেষতঃ বোম্বাই, দিল্লী ও কানপুরের মিল মালিকগণ কি চুপ করিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে?—আর বাংলার কাপড়ের বাজারে ইটালী, জাপান ও বিলাতী মিল মালিকগণ একাধিপত্য করিবে?—বাঙ্গালী যদি কল কারখানার সৃষ্টি না করিয়া কেবল সিনেমা, নারীনৃত্য, থিয়েটার, খেলাধূলা, সাঁতার ইত্যাদি নব নব উত্তেজনার মধ্যে "তন্ মন্ ধন্" উৎসর্গ করে তবে বাঙ্গালী যে অচিরাৎ কাঙ্গালী হইয়া দু মুঠা ভাতের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অবাঙ্গালীরা এসে সব লুটে পুটে নিল বলিয়া রোজ ভাটিয়া ও মাড়োয়ারীদের গালাগালি দিয়া পিণ্ড চটকাইলে আসল সমস্যার কোনও মীমাংসা হইবেনা। গায়ের ঝাল্ খানিকটা মিটিতে পারে বটে, কিন্তু উদরান্নের কোনও সংস্থান হইবেনা এবং ভাটিয়া, পার্শী ও মাড়োয়ারীর অভিযানও বন্ধ হইবে না। গালাগালি দিলে মন যদি ঠাণ্ডা হয় তবে দাও, কিন্তু মনে রাখিও hard words break no bones. এসকল উদ্যম উৎসাহশূন্য, ক্লীব, না—মরদদের লক্ষণ;—বাঙ্গালীর মধ্যে যারা মানুষ তারা এই সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পাথর কাটিয়া পথ তৈরী করিয়া লইতেছে। **সম্পাদক**

আমরা বিদেশী জুতা, ছাতা, খেলনা, বাক্সি, টুপি, মোজা প্রভৃতি নানা বিদেশী দ্রব্য কিনিয়া ঘরের পয়সা বিদেশে পাঠাইয়া দিই।

পূজার সময়ে অনেকে বাংলার বাইরে বেড়াইতে যান; তাহাতেও বাঙ্গালীর প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় এবং অবাঙ্গালীরা উপকৃত হয়। দেশব্যাপী আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য ইংলণ্ডে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সেখানকার মাসিক, দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রাদিতে বিলাতের নরনারীরা যাহাতে ফ্রান্স, জার্ম্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ভিয়েনা প্রভৃতি ইউরোপের প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহে বেড়াইতে যাইয়া অজস্র টাকা খরচ করিয়া আসিয়া নিজের দেশকে দরিদ্র এবং বঞ্চিত রাখিয়া পরদেশীকে সমৃদ্ধশালী না করেন, সে জন্য বিপুল প্রপ্যাগ্যাণ্ডা চালাইতেছেন এবং তাহাতে যথেষ্ট সুফল হইতেছে। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস্ ও আয়রল্যাণ্ডের স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে এই সকল ধনীদের টাকা ব্যয়িত হওয়ায় সেখানকার সকল লোকেই আর্থিক সচ্ছলতার মুখ দেখিতে পাইতেছে এবং তাহার ফলে সব রকম ব্যবসাই কিছু না কিছু উপকৃত হইতেছে।

গ্রেট বৃটেন স্বাধীন; বৃটীশ জাতির দেশাত্ম ও জাতীয়তা বোধ আছে। এই জন্য বৃটীশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না। দুর্গা পূজার ন্যায় বিলাতেও বড় দিনের উৎসব হয়। অবশ্য সেখানে প্রতিমা পূজা হয় না; তাহা না হইলেও মহাধূমধামে জাঁকজমকের সহিত সেখানে উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে খেলনা, জুতা, পোষাক, বাক্সি প্রভৃতি নানা দ্রব্য বিক্রয় হয়। হোটেলগুলি লোকে ভর্ত্তি হইয়া যায়। হোটেলে রেস্তঁরায় ভূরি ভোজের বন্দোবস্ত থাকে।

গ্রেট বৃটেনে ৪৬ কোটী ৭৬ লক্ষ ৯৫ হাজার পাউণ্ডের স্বর্ণ ও মুদ্রা বাজারে প্রচলিত ছিল কিন্তু বড় দিনের পূর্ব্ব সপ্তাহে ব্যাঙ্ক হইতে ৮ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড বাহির হয়। বড় দিনের সময় ৭০ লক্ষ পাউণ্ড অতিরিক্ত বাহির হইয়াছিল। গত বড় দিনে গ্রেট বৃটেনে ৩ কোটী পাউণ্ড অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছিল। এই বড় দিন উপলক্ষে ৬ লক্ষ বেকার বেচারারা কাজ পাইয়াছিল। ব্যবসাব উন্নতি হওয়ায় গ্রেট বৃটেনের শ্রমজীবি ও সাধারণ লোক ১৯৩২ সালে যত ব্যয় করিয়াছিল ১৯৩৬ সালে তদপেক্ষা ৪০ কোটী পাউণ্ড এবং ধনবানেরা ৩০ কোটী পাউণ্ড অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াছিল। গ্রেট বৃটেনে লোক সংখ্যা ৫ কোটী; ইহারা মাথা প্রতি ১৪ পাউণ্ড অতিরিক্ত ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বড় দিনের উৎসবে ৩ কোটী পাউণ্ড অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছিল। গত উৎসবে লণ্ডনে বাহির হইতে যত লোক সমাগম হইয়াছিল ১৯২৯ সালের পর আর কোন উৎসবে এত লোক সমাগম হয় নাই। ৫ লক্ষ মোটর গাড়ী দৌড়িয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রমজীবি ও শিল্পজীবিরা অর্থোপার্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছিল; এজন্য তাহারা বড় দিনের আনন্দও উপভোগ করিয়াছিল।

অবস্থাপন্ন লোকেরা এই উৎসব উপলক্ষ্যে প্রচুর দানও করে। গত ১৮৫১ সালে লণ্ডনে ক্যান্সার হাঁসপাতাল স্থাপিত হয়; এই হাঁসপাতালের বিস্তার সাধনের জন্য গত বড়দিন

উপলক্ষ্যে দেড় লক্ষ পাউণ্ড সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। রয়াল নর্দার্ণ হাঁসপাতাল সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ডের জন্য আবেদন করিয়াছিল। জাতীয় শিশুক্লেশ নিবারণী সমিতি গত বৎসর ৪৫ হাজার অসহায় শিশুর তত্ত্বাবধান করিয়াছিল। এই সমিতির সপ্তাহে আড়াই হাজার পাউণ্ড ব্যয় হয়। বড় দিনের সময় এ সমিতিও সাধারণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়। ডাক্তার বার্ণার্ডোর হোমের কর্ত্তৃপক্ষও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

লণ্ডনে বহু দাতব্য সমিতি আছে। বড়দিনের সময় এই সমিতিগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে পর্য্যাপ্ত সাহায্য পায়। গ্রেট বৃটেনের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা সাধ্যমত এই সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিয়া থাকে। বড় দিনের সময় টাকাপয়সা বেশ হাতফেরী হইয়া দেশেই থাকিয়া যায়। এ সময়ে কেহই বেকার বসিয়া থাকেনা। দোকান গুলিতে খুব ভিড় হয়। কুলী, মজুর, কেরাণী, মটরড্রাইভার, ফেরীওয়ালা, ফুলওয়ালা, গাড়ীওয়ালা, প্রভৃতি সকলেই কাজে ব্যস্ত থাকে। সকলেই বেশ রোজগার করে এবং উৎসবে ব্যয়ও করে। বাঙ্গালীর মত নিঃস্ব হয় না। বড় দিনে প্রীতি উপহারের জন্য ডাকঘর হইতে এত চিঠিপত্র বিলি করিতে হয় যে এই সময়ে অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করিতে হয়। লণ্ডন হইতে বাহিরে যাইবার জন্য স্পেশ্যাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করিতে হয়।

এইবার বিলাতের বড়দিনের তুলনায় আমরা আমাদের বড়দিনে অর্থাৎ শারদীয় উৎসবে কি করি তাহা একবার দেখা যাক্। আমরা নিজেদের ভুরি ভোজন, সাজ পোশাক, আমোদ আহ্লাদ, সিনেমা, থিয়েটার, বাইনাচ, খেম্‌টানাচ ইত্যাদিতে অজস্র টাকা খরচ করিয়া নিঃস্ব হই—কিন্তু কোনও হাঁসপাতাল, স্কুল, কলেজ, অনাথাশ্রম ইত্যাদির জন্য দান ধ্যান করিয়া থাকি কি?—গরীব দুঃখীদের স্থায়ী উন্নতিকল্পে এমন কিছু দান করি কি, যাহার ফলে কোনও একটা অনুষ্ঠান মোটা কিছু সাহায্য পায়?—পূজা শেষ হইয়াছে। আজ একবার সকল বাঙ্গালীকে এবিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি।
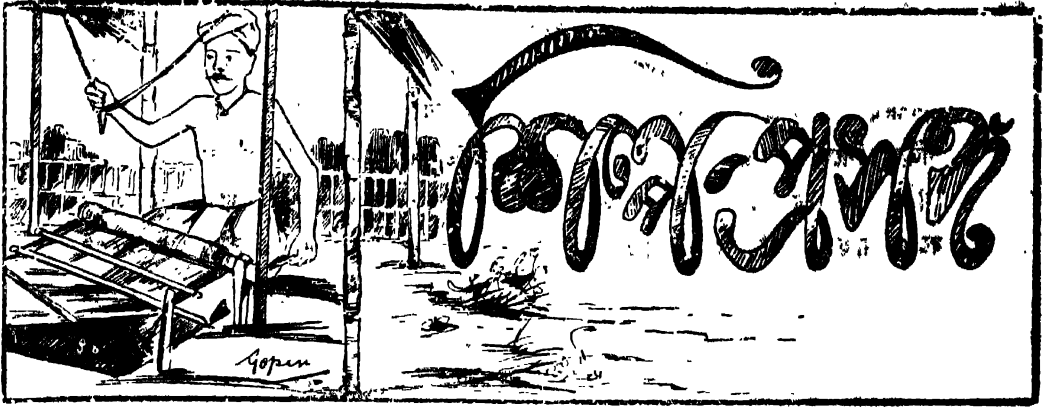
বাংলার কুটীর-শিল্পে ঘি উৎপাদন

বাংলায় ভয়সা ঘির ব্যবহার।

বাংলার ঘি-ব্যবসা ভয়সা ঘির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালীর নিকট গাওয়া ঘি উপাদেয় কিন্তু উহা দুষ্প্রাপ্য। ঘোষদের নিকট অল্প পরিমাণে গাওয়া ঘি ও মাখন পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার মূল্য অধিক; আবার উহাতে অনেক সময়েই ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। বাংলার ঘরে ঘরে রান্নার জন্য প্রায় সর্ব্বতোভাবেই ভয়সা ঘি ব্যবহৃত হয়। বাংলায় মহিষের প্রচলন একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। এই হেতু বাংলায় ভয়সা ঘি মানেই বাংলার বাহির হইতে আমদানি করা ঘি। কলিকাতা হইয়া এই ঘি বাংলার সুদূর গ্রামে গ্রামে বিক্রয়েব জন্য আইসে। এমনি করিয়া বৎসরে অনুমান পৌনে দুই কোটি টাকা বাহির হইয়া যায়। যদি বাংলার প্রয়োজনীয় ঘি বাংলাতেই উৎপন্ন হইত, তবে ঘি বাদে টানা দুধের দ্বারা অন্য জিনিষে মোট তিন চার কোটি টাকার উৎপাদন বাংলায় বাড়িত এবং বাঙ্গালীর শরীর ও শিল্প ইহা দ্বারা পুষ্ট হইত ও বাঙ্গালীর আর্থিক অসচ্ছলতা অপেক্ষাকৃত কম হইত। নানা ভাবে বাংলার প্রায় সমুদায় কুটীব-শিল্প নষ্ট হইয়াছে; ভদ্র ও চাষী বেকার হইয়া পড়িয়াছে, এবং কর্ম্মহীনতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ঘি প্রস্তুতের ও অন্য গব্যের মত এত বড় একটা কৃষির-উপর-নির্ভরশীল-শিল্প কোনও দেশের পক্ষেই উপেক্ষণীয় নহে। বাংলার অবস্থাবিশেষে উহাব প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী।

বাংলার রুচি যখন গাওয়া ঘির দিকে, বাংলা যখন গো-প্রধান দেশ, তখন বাংলায় নিজস্ব গাওয়া ঘি কেন প্রচলিত হইবে না? কেনই বা বাহিরের ভয়সা ঘি আমদানি হইতে থাকিবে? বাংলায় এই অশেষ কল্যাণকর শিল্প প্রবর্ত্তন করা সম্ভব এবং যে সকল অন্তরায় আজ আছে, সে সকল অতিক্রম করিয়া কতকগুলি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলে, ইহা দ্রুত প্রসারিত করা যায়।

বাংলার গ্রামে গ্রামে যে সামান্য সামান্য ঘি উৎপন্ন হয় না তাহা নহে, ভয়সা ঘিও যে বাংলায় একেবারে না হয় তাহা নয়; আবার

বাংলার কতক গাওয়া-ভয়সা-মিশ্রিত ঘি সুবিধা-মত গাওয়া বা ভয়সা ঘি বলিয়া বিক্রীত হয়। কিন্তু ব্যবসায়ে উহার স্থান নগণ্য। ব্যাপক ব্যবসায়ের ঘি মাত্রই ভয়সা ঘি। দৈনিক পত্রিকাগুলিতে বাজার দরের তালিকা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে উহাতে ঘির বাজার দর দেওয়া হয়। একদিনের পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ঘির দর

ভারতী	৫২৲ মণ	খুরজা	৫৩৲ মণ
সিকোয়াবাদ	৫০৲ ,,	শ্রী	৫৮৲ ,,
বুটল	৪৩৷৷০ ,,	বান্দাসাগর	৪৩৲ ,,

—'আনন্দবাজার পত্রিকা'—২২শে জুন, মঙ্গলবার।

যে দর দেওয়া হইয়াছে এ সমস্তই ভয়সা ঘির দর এবং এ সমস্তই বাংলার বাহির হইতে আমদানি করা ঘি। উহা যে ভয়সা ঘি তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় নাই। কেননা সকলেই জানে যে, বাজারের ঘি মাত্রেই ভয়সা ঘি। গাওয়া ঘি হইলেই তাহার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। যেমন বাংলায় রান্নার সম্পর্কে তেল বলিতেই আমরা সরিষার তেল বুঝি, উহার উল্লেখমাত্র নিষ্প্রয়োজন, এও তেমনি।

গাওয়াঘি প্রাপ্তির অন্তরায় ও প্রতিকার।

গাওয়া ঘির দুষ্প্রাপ্যতার একটা হেতু শুনিয়া আসিয়াছিলাম যে উহা ভয়সা ঘির মত বেশী দিন টিকে না এবং টীনে বন্ধ করিয়া রাখিলেও উহার স্বাদ ও গন্ধ অল্পকালেই বিকৃত হয়; কিন্তু কথাটা ঠিক নহে। ভাল ভাবে তৈরী গাওয়া ঘি দীর্ঘদিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। অবশ্য গাওয়া ও ভয়সা উভয়ের সম্বন্ধেই একথা বলা যায় যে, যত টাটকা উহা ব্যবহার করা যায় তত ভাল। কিন্তু গাওয়া ঘি ভয়সা অপেক্ষা সহজে বিকৃত হয়, এ প্রকার পরিচয় আমি পরীক্ষা করিয়া পাই নাই। অবিকৃত নির্ভর করে উৎপাদনের কুশলতায়, জ্বাল দেওয়ায় এবং পাত্রাদির পরিচ্ছন্নতা ও হাওয়া-শূন্যতার উপর।

গাওয়া ঘি বাংলায় ব্যাপক ভাবে উৎপন্ন না হওয়ার আর একটা বহুজ্ঞাত কারণ এই যে, বাংলায় গাইয়ের দুধই দুষ্প্রাপ্য। দুধ পাইতে হইলে, বাংলার গো-বংশ উন্নত করা দরকার। এজন্য পশ্চিমা ষাঁড় আমদানী করার চেষ্টাও চলিতেছে। কিন্তু পশ্চিমা ষাঁড় আমদানী করিয়া যে সঙ্কর জাতের সৃষ্টি হইবে তাহা কয়েক পুরুষ ধরিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। পশ্চিমের ভাল ষাঁড় আনিলেই যে বাংলার গরু ভাল হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য নাও হইতে পারে। কাজেই ষাঁড় আমদানী করা একটা পরীক্ষণীয় পথ মাত্র। সেই পরীক্ষা যদিই বা সফল হয় তবে বাংলার সমস্ত গরুকে ঐ নূতন সঙ্কর জাতিতে পরিণত করা যে বিরাট ব্যাপার, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা বা হাতিয়ার আমাদের হাতে নাই।

বাংলার গো-পালন ও বৃদ্ধির প্রশ্নের সহিত একটা বিষম উদ্বেগের বিষয় রহিয়াছে—বাংলায় গো-খাদ্যের অভাব। এককালে বাংলায় গোচর মাঠ ছিল, যাহা সেটেলমেণ্টের হিসাব পত্রে সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া উল্লিখিত ছিল। মানুষ ও গোসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া তাহাও বিলি হইয়া গিয়াছে বা হইতেছে। গোচর-মাঠ নাই বলিলেই হয়। গোপালনের ইহা এক বিষম অন্তরায়।

যে সকল গরু আছে, খাদ্যাভাবে তাহারা শীর্ণ এবং দুধও নামমাত্র দেয়। ঐ সকল গোচর মাঠ বা ইহার বিকল্পে অনুরূপ জমি দিতে জমিদারদিগকে বাধ্য করিয়া গোচর সৃষ্টি করান এবং তাহার পর গাইয়ের দুধ পাওয়ার যে উপায়, তাহার জন্য হয়ত আমাদিগকে অনির্দ্দিষ্টকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। বাংলায় গরুর জাত খারাপ এবং বাংলায় গোখাদ্য কম, এই সকল অন্তরায় মানিয়া লইয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

কি করিলে বাংলার গো রক্ষা করা যায় এবং বাংলার গরুর দুধ বাড়ান যায়, এই বিষয় চিন্তা করিয়া ও কিছু কিছু পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি যে গো জাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য প্রাথমিক আবশ্যক হইতেছে দুধ বা গব্যের চাহিদা বাড়ান। যে স্থানে চাহিদা বাড়িয়াছে সে স্থানেই ধীরে ধীরে উহা মিটাইবার মত দুধের উৎপাদন বাড়িয়াছে। ইহার প্রমাণ দই, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতির খ্যাতনামা কেন্দ্রগুলি। ঢাকার কোনও অঞ্চলের পাতক্ষীর প্রসিদ্ধ—অনুসন্ধান করিলে দেখিবেন যে, সেই অঞ্চলের গাই অধিক দুধ দেয় এবং সেখানকার লোকের অসচ্ছলতাও কিছু কম। উহার কাছাকাছি স্থানে যেখানে গরুর জাত একই প্রকার এবং গোখাদ্য সমান

দুষ্প্রাপ্য সেখানে দেখিবেন, চাহিদা নাই বলিয়া গাই কম দুধ দেয়। নাটোরের গব্য প্রসিদ্ধ। নাটোরের কাঁচাগোল্লার খ্যাতি সমস্ত উত্তরবঙ্গকে আকৃষ্ট করে। নাটোরের ৮।১০ মাইলের মধ্যের স্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে, উহার প্রাকৃতিক অবস্থা কিছুদূরের অন্য স্থানের সমান হইলেও তুলনায় নাটোরের গাই পুষ্ট ও অধিক দুগ্ধবতী। এইরূপ দেখা যাইবে যে যেখানেই গব্যের চাহিদা আছে, সেই স্থানেই দুধও উৎপন্ন হইতেছে। আমার অভিজ্ঞতা এই যে গরুর দুধ দেওয়ার পরিমাণ সাধারণ ভাবে চাহিদার অনুবর্ত্তন করে। সকল গব্যের চাহিদার মধ্যে ঘির চাহিদাই অধিক ফলপ্রদ; কেন না উহার সাময়িক উঠা পড়া কম। ছানা বা দইয়ের চাহিদা বিবাহ বা পর্ব্বাদি উপলক্ষে বাড়ে কমে। সেই জন্য যাহারা গো পালন করে, তাহারা সকল সময় সমান দাম পায় না। যেখানে বারোমাসের জন্য গোয়ালা গৃহস্থের সহিত দুধের বন্দোবস্ত করিয়া লয়, সেখানে চাহিদার কম বেশী অনুমান করিয়া একটা সস্তাদরে চুক্তি করিয়া লয়। উহাতে দুগ্ধের উত্তেজনা পুরা পাওয়া যায় না। গব্যের ভিতর ঘি সব চাইতে বেশীদিন টিকে। সেইজন্য যেখানে ঘি ব্যবসাই প্রধান, ছানা বা দইয়ের ব্যবসা গৌণ, সেখানে দুধের দাম এক টাকা চড়া থাকে। গৃহস্থের আয় বেশী হয়, গরুর যত্ন

বেশী হয় ও গরু অধিক দুগ্ধবতী হয়।

এমন স্থান কল্পনা করা যাইতে পারে যেখানে গোখাদ্য কিছুই পাওয়া যায় না, যেখানে গরু রাখাই বিড়ম্বনা। এমন কল্পিত স্থানে গব্যের চাহিদা সৃষ্টি করিলেও কোন সাড়া নাও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ যেখানে লোকে চাষ আবাদ করিয়া থাকে, সেই স্থানে গরুও অবশ্যই থাকিতে পারে, নচেৎ চাষ আবাদ সম্ভব হইত না। এবং এইরূপ স্থানে একটানা নির্ভরযোগ্য গব্যের চাহিদা উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুধের উৎপাদন বাড়িতে থাকে। এইরূপ ঘটা স্বাভাবিকও বটে। গৃহস্থ নিজে নিরন্ন; গরুকেও অর্দ্ধাহারে রাখে। গরুর যত্ন কম হয় এবং দুধও কম হয়। যতটুক্ দুধ হয়, যদি গৃহস্থ তাহা বেচিতে চায়, তবে তাহারও নিয়মিত ক্রেতা নাই। একারণ গৃহস্থ গরুর যত্ন কম করে, খাদ্য যোগাইবার জন্য কম ব্যাকুল হয়। কিন্তু যখনই গৃহস্থ দেখে যে, গরুকে ভাল করিয়া খাওয়াইলে দুধ বাড়ে, পয়সাও পাওয়া যায়, তখন নানা ফিকির করিয়া সে গরুকে খাওয়াইবার চেষ্টা করে। দুধ বেচিয়া যে পয়সা পায়, তাহা হইতেও গরুকে খাওয়াইবার জন্য ব্যয় করে, ভাল করিয়া জল, ঘাস ও জাব দেয়। যত্ন করিয়া চরায়। অনেক সময় ছেলেপেলে বা নিজেদের চাইতে দুগ্ধবতী গাইকে বেশী যত্ন করে। উহাতে গোজাতির উন্নতির সোপান প্রস্তুত হয়। গোজাতির যত্নই গোজাতির উন্নতির প্রধান সোপান। গব্যের নির্ভরযোগ্য চাহিদা সেই সোপান প্রস্তুত করে।

অন্য দিক হইতেও এই দৃষ্টি সমর্থনলাভ করে। পূর্ব্বে যেখানে চিনির কল ছিল না, সেখানে লোকে দু'চারখানা ক্ষেতে মাত্র আখ বুনিত। এরূপ স্থানে যখন কেহ চিনির কল বসায়, তখন কলওয়ালা জমি নির্ব্বাচন কালে দেখে যে উহা আখের উপযুক্ত কিনা। যদি অনুকূল হয়, তবে চাষার সহিত পরামর্শ করে না, চুক্তি করে না, সে নিজের বিচারে কল বসাইয়া আখের চাহিদার সৃষ্টি করে এবং চাষার তীক্ষ্ণ স্বার্থবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। আখের চাষে লাভ আছে একথা চাষা যখন জানে তখন চাহিদার মুখে আখ উৎপন্ন করিয়া কলওয়ালার উপর নির্ভর করে। ঠিক তেমনি গব্যের বেলায়। আখ কোথায় হইতে পারে বা না পারে, ইহা লইয়া কত আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু রাজশাহীর গোপালপুরে মিল বাসাইবার পর দেখিতেছি যে চাহিদার চাপে আখ পর্য্যন্ত ধানের মত জলজ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেখানে এক কোমর জলেও আখের ক্ষেত দেখিবেন। যেখানে এক কোমর জল বর্ষায় উঠে, সে ক্ষেতে যে আখ হয়, একথা কয়জন জানিতেন, আর আজই বা কয়জন জানেন। কিন্তু চাহিদা এমন জিনিস যে রাজশাহীর কোন্ জমিতে আখ হইতে পারে, ইহা চাষাকে চেষ্টা করিয়া শিখাইতে হয় নাই। চাহিদাই তাহার আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে ও নূতন পথে প্রবৃত্ত করাইয়াছে।

ঘির চাহিদার স্থিরতা।

গব্যের চাহিদার ভিতর ঘির চাহিদাই শ্রেষ্ঠ একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেননা উহা সাময়িক নয়। কেহ ঘি উৎপাদন করিতে গ্রামে বসিয়া গেলে তিনি জানাইয়া দিতে পারেন যে, যতটা দুধ যেদিন যে যোগাইবে, তাহাই লওয়া হইবে।

গৃহস্থের যেদিন নিজের অধিক প্রয়োজন, সেদিন দুধ কম দিবে তাহাতে ক্ষতি নাই। আজ গ্রামে বিবাহ বা উৎসব, দুধ উদ্বৃত্ত হইবে না, ঘিব্যবসায়ীর তাহাতে অসন্তোষ নাই—সে কাল দুধ পাইবে। গ্রামের যাহা উদ্বৃত্ত, তাহা সে লইবে এবং নিশ্চিতই লইবে। যতটা দুধ উদ্বৃত্ত হউক না কেন, সে কোনও দিন কাহাকেও ফিরাইবে না, এমন আশ্বাস ঘি ব্যবসায়ী যত অকুণ্ঠার সহিত দিতে পারে, ছানা বা দধির ব্যবসায়ী তাহা পারে না। এইজন্য দুধ উৎপাদন প্ররোচিত করিতে ঘি ব্যবসা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ঘির জন্য যে দুধ লওয়া হয়, তাহার মাখন বা ননীই ঘিতে পরিণত হয়, বাকী যে টানা দুধটা পড়িয়া রহিল তাহার কি হইবে? সে ব্যবস্থা ঘিব্যবসায়ীকেই করিতে হইবে। টানা দুধের দই প্রস্তুত করিয়া, ক্ষীর, ছানা, কেজিন বা জমাট দুগ্ধ যাহা হউক কিছু করিয়া উহা ব্যবহার করিয়া দুধের প্রায় অর্দ্ধেক দাম তুলিতে হইবে।

বাংলার গো সম্পদ

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বাংলায় অনুমান যে পৌনে দুই কোটি টাকার ভয়সা ঘি আসে, উহার পরিবর্ত্তে অতটা গাওয়া ঘি বাংলাতেই প্রস্তুত হইতে পারে। বাংলার গাভীকেই ত এই প্রয়োজনীয় দুধ দিতে হইবে। বাংলার প্রয়োজন মিটাইবার মত গাভী আছে কিনা দেখা যাউক। এজন্য বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব—যে কয়টি প্রদেশ হইতে বাংলায় ঘি আমদানি হয়, তাহার সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হইবে।

১৯৩৪-৩৫ সালের গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের হিসাবে নিম্নসংখ্যাগুলি পাওয়া যায়। ঐ হিসাবে গবাদি পশু, এবং ভিন্ন করিয়া গাভী, ষাঁড়, বলদ, বাছুর এবং মহিষের ষাঁড়, বলদ, মহিষী ও বাছুরের সংখ্যা দেখান আছে। উহা হইতে আমি কেবল গাভী ও মহিষীর সংখ্যা লইয়া তুলনা করিতেছি।

এই হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে শতবিঘা কর্ষিত জমির অনুপাতে গাভী ও মহিষী আছে বাংলায় ৩৬, বিহারে ৩৪, যুক্তপ্রদেশে ২৯ ও পাঞ্জাবে ২১। বাংলার অনুপাত সব চাইতে বেশী, অথচ বাংলা সব চাইতে কম দুধ পায়। বিহার ও উড়িষ্যার অবস্থা বাংলার পরেই খারাপ। বিহারের সহিত উড়িষ্যা যুক্ত হওয়ায় এই অবস্থা দেখা যাইতেছে; নচেৎ বিহারের অবস্থা বাংলা হইতে ভাল এবং উড়িষ্যার অবস্থা বাংলা অপেক্ষা খারাপ। বিহারেও গরু-মহিষের যত্ন কম। বিহারে মহিষীর দুধ লওয়া হয় বটে, কিন্তু মাত্র ৩।৪ সের দুধ পাওয়া যায়। তবুও বিহার বাংলায় ঘি পাঠায়। বিহারে মহিষের দুধ হইতে দই প্রস্তুত করিয়া উপরের মাখনটা গালাইয়া ঘি করা হয়। পাঞ্জাবে যত অল্প গাভী, মহিষে যত বেশী দুধ পাওয়া যায়, তত আর কোথাও পাওয়া যায় না। পাঞ্জাবে গরুর জাত ও যত্ন দুইই ভাল। বাড়িতে কোনও কিছু ভাল খাদ্য হইলে লোকে যেমন ছেলেপুলেকে তাহা খাওয়াইতে আগ্রহ করে ও খাওয়াইলে আনন্দ পায়, পাঞ্জাবের গৃহস্থের গরুর জন্য সেই ধরণের একটা আগ্রহ আছে। কিন্তু বাংলায় একপাল দুধশূন্য, শীর্ণ, দুর্ব্বল গাই অযত্নে রাখিয়া আমরা নিজেরাও দুঃখ পাইতেছি, গরুকেও দুঃখ দিতেছি। বাংলায় গরুর সংখ্যা যথেষ্ট আছে। বাংলার জমি অল্প

কোনও দেশ অপেক্ষা কম উর্ব্বর নয়। বাংলার চাষাও অলস নয়। কিন্তু গো সেবা যে কি বস্তু তাহা বাংলার চাষা না জানায় বাংলার অপারগতা ও দুঃখ চলিতেছে।

বাংলার গরুকে যত্ন করিলে দিনে দুইবার দোহন করা যায় এবং দুইবার বিয়ানের পর ৪ সের ও শেষ দিকে এক সের এবং গড়ে ২ সের করিয়া দুধ ধরা যায়। গড়ে এক বিয়ানে দিনে ২ সের হিসাবে ৬ মাস দুধ পাওয়া যাইবে ধরা যায়। বাকী ৬ মাস গরু দুধ দিবে না। তাহা হইলে একটা গাই এক বৎসরে বা এক বিয়ানে ১৮০ দিনে ৴২ সের হিসাবে ৩৬০ সের বা ৯ মণ দুধ দিবে।

বাংলার মোট গরুর মধ্যে ৮২ লক্ষ গাই। ইহাদের মধ্যে যদি তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র দুধ দেয়, তবে দাঁড়ায় ২৭ লক্ষ দুগ্ধবতী গাই। উহারা প্রত্যেকে ৯ মণ করিয়া দুধ দিলে,

	বাংলা	বিহার উড়িষ্যা	যুক্তপ্রদেশ	পাঞ্জাব
যত লক্ষ একর জমি চাষ হয়	১৩৩	২৪১	৩৫৬	২৬৫
যত লক্ষ গাভী আছে	৮২ } ৮৪	৫৭ } ৭৩	৬০ } ১০২	২৬ } ৫৬
যত লক্ষ মহিষী আছে	২	১৬	৪২	৩০
প্রতি একশত কর্ষিত বিঘায় গাভী ও মহিষীর সংখ্যা	৩৬	৩০	২৯	২১

বৎসরে ২৪৩ লক্ষ মণ দুধ দিবে। ইহার অর্দ্ধেকটায় বর্ত্তমান দুধের আবশ্যকতা মিটাইলে, বাকী অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১২০ লক্ষ মণ দুধ উদ্বৃত্ত হয়। ২০ মণ দুধে একমণ ঘি হইতে পারে, সে হিসাবে ১২০ লক্ষ মণ দুধে ৬ লক্ষ মণ ঘি হইবে।

রেল ও ষ্টীমার পথে আমদানির ১৯৩৪-৩৫ সালের গবর্ণমেণ্টের দেওয়া হিসাবে পাওয়া যায় যে বাংলায় ঐ বৎসর ঘি আসিয়াছে ৩৪৪ হাজার মণ। উহা হইতে রপ্তানি ১৪ হাজার মণ বাদে বাংলায় ব্যবহৃত আমদানি ঘির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩০ হাজার মণ। কিন্তু রেল ও ষ্টীমার ব্যতীত মোটর যোগে অনেক ঘি আমদানি হয়। উহার হিসাব নাই। উহা ২০ হাজার মণ ধরিলে ঘির আমদানি সাড়ে তিন লক্ষ মণ হয়। আর এক বৎসর আমরা বাংলার গাই হইতে সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়া ৬ লক্ষ মণ উদ্বৃত্ত ঘি পাইতে পারি। কাজেই বাংলার আমদানি ৩৷৷০ লক্ষ মণ ঘি ঘরেই তৈয়ার করিয়া লওয়ার অন্তরায় কিছু নাই। বাংলার গো-সম্পদ হইতে বাঙ্গালী স্বার্থসিদ্ধি করিতে শিখিলে বর্ত্তমান আমদানি পৌনে দুই কোটী টাকার ঘি ত নিজে উৎপাদন করিতে পারিবেই, বরঞ্চ অন্যত্র আরো অনেক ঘি রপ্তানি করিতে পারিবে।

গড়ে দিনে দুই সের দুধ বাংলার তিন ভাগের এক ভাগ গাই দিবে বলিয়া আমি ধরিয়াছি। কিন্তু যত্ন করিলে অধিকাংশ গাই ইহা অপেক্ষা অধিক দুধ দিবে ইহাই আমার ধারণা। যত্ন করিলে যে দুধ বাড়ে ইহার পরীক্ষা আমি নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে করিয়া দেখিয়াছি। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি

যখন দ্বিতীয়বার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের কয়েদী হইয়াছি, সেই সময় জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলের গোশালা সম্বন্ধে উদ্বেগ বোধ করিতেছিলেন। অনেক গরু ছিল, অথচ দুধ না হওয়ার মত। একটী সাহেব-কয়েদীর হাতে গোশালা ছিল, তাহার কাজে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সন্তুষ্ট হইতে পরিতেছিলেন না। একদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর পাটনী সঙ্কোচের সহিত প্রস্তাব করেন যদি গোশালার ভার আমি লই। আমি আগ্রহের সহিত স্বীকার করি। আমি দেখি গোশালায় মাত্র ৮ সের দুধ হয়, অথচ গোশালে সব মিলিয়া সংখ্যায় গরু আছে ৪০টী। বাছুর মরিয়া যাইত। বৎসর ধরিয়া গাইকে খাওয়াইয়া যত্নকরিয়া দুধ পাওয়ার সময় যখন আসিল, বাছুর মরিয়া যাওয়ায় সে সমস্ত শ্রম ও ব্যয় পণ্ড হইত। বাছুর মরার মত অপরাধ গোশালায় দ্বিতীয় নাই। সেই অপরাধ কেবলই হইত এবং জেলে বাছুর বাঁচিত না, দুধও হইত না। অন্য কারণও ছিল। উহাদের খাদ্যের সংস্কার সাধন করা, ষাঁড়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দেওয়া। সংস্কার করিতে প্রতি পদে জেল আইনের বাধা আসিত। কিন্তু মেজর পাটনী সমস্ত আইনের দায়িত্ব নিজে লইয়া গো-পালনের রাস্তা সাফ করিয়া দেয়। গোশালার উন্নতি আরম্ভ হয়। ফর্ম্ম ও হিসাব পদ্ধতি বদলাইয়া যায়। গোশালার অবস্থান নিম্ন ভূমিতে ছিল,

---
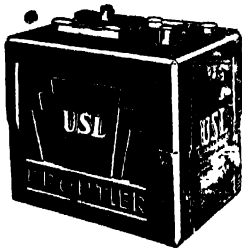
উহার পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা হয়। গো খাদ্যের কন্‌ট্রাক্টরের অন্যায় উপার্জ্জন বন্ধ হয়। কবে কে গর্ভিনী হইয়াছিল, তাহা হইতে প্রসবের আনুমানিক তারিখ স্থির করিয়া প্রসবকালে গরুর যথাযোগ্য যত্ন-লওয়ার ব্যবস্থা হয়। আমি যখন গোশালার ভার লই, তখন দুধের পরিমাণ দৈনিক ৮ সের ছিল। নয় মাস পরে আমি যখন চলিয়া আসি, তখন দুধের পরিমাণ ১০ গুণ হইয়াছে—দিনে দুই মণ দুধ হইত। ইতিমধ্যে ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ ফ্রাওয়াবডিউ দুইবার আসেন; শেষবারে সমাদরের সহিত বলেন যে আমাকে আর মুক্তি দেওয়াই হইবে না, পরক্ষণেই গম্ভীরভাবে বলেন যে আমি যেন আর জেলে ফিরিয়া না আসি। তাহার হাতে কয়েদীকে সময়ের পূর্ব্বে খালাস দেওয়ার যতটা অধিকার ছিল তাহা ব্যবহার করিয়া ৯ মাসেই এক বৎসরের জেল পূর্ণ করিয়া আমাকে খালাস দেন। তাহার কৃতজ্ঞতার কোনও কারণ ছিল না—আমি কয়েদী, কাজ করিয়া গিয়াছি। কৃতজ্ঞতার হেতু আমার দিকেই ছিল—তাহারা যে গো-সেবার অপূর্ব্ব অবকাশ দিয়াছিলেন সে জন্য। বস্তুতঃ গো-সেবার আনন্দের আতিশয্যে জেল আমার নিকট রম্য স্থান হইয়া পড়িয়াছিল।

জেলে যেমন সেবা দ্বারা তৎকালিন দুধের পরিমাণ বাড়াইতে পারিয়াছি, অন্যত্রও তেমনি বিশেষ ফল পাইয়াছি। জেলের গরুগুলি সবই পশ্চিমাজাতের ছিল—অযত্নে খারাপ হইয়াছিল। দেশী গাইয়ের দুধ দৈনিক আধ সের হইতে দুই সের পর্য্যন্ত বাড়াইবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে। আবার এমন গো-বাথান দেখিয়াছি যেখানে পৌষ মাঘ মাসে বাথানের দৈনিক গড় গাইপ্রতি ৪ সের দুধ দাঁড়ায়। জেলে চৌয়ারী নামে একটি গাই আমি থাকা কালে একবারকার বিয়ানে মোট পাঁচ হাজার পাউণ্ড বা ৬০ মণ দুধ দিয়াছে। খাদি প্রতিষ্ঠানের সোদপুর গোশালায় আমরা পশ্চিমা গাই হইতে এক বিয়ানে ৩৮ হইতে ৪৫ মণ দুধ পাইয়া থাকি। সে স্থলে একটা দেশী গাই হইতে আমি এক বিয়ানে মাত্র ৯ মণ দুধ প্রত্যাশা করিতেছি।

ঘি প্রস্তুত—দুধ টানা

দুধ বা দই মন্থন করিয়া ননী বা মাখন বাহির করা যায়। উহা উপযুক্ত তাপে গলাইয়া ঘি হয়। দুধ মন্থন করিয়া বা টানিয়া ঘি প্রস্তুত করা কিছু ক্লেশসাধ্য হইলেও উহাই উৎকৃষ্টতর। সেপারেটর মেশিন ব্যবহার করিলে, সহজেই দুধ হইতে ননী তোলা যায়, কিন্তু সকলের পক্ষে সেপারেটর মেশিন বসান সম্ভব বা যুক্তিযুক্ত হইবে না। হাতে টানার জন্য দুধ একটু গরম করিয়া তাহার পর নদী বা পুকুরের জলে পাত্রটি ভাসাইয়া তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হয়। একটা পরিষ্কার কেরোসিন টীনে ঠাণ্ডা দুধ ঢালিয়া মন্থন দণ্ড দিয়া টানিতে হয়। উহাতে ননী ভাসিয়া উঠে এবং ননী গলাইয়া ঘি প্রস্তুত করা হয়। ননী উঠাইয়া লইলে যে দুধ রহিল উহাই ননীতোলা বা টানা দুধ।

ননী তোলা বা টানা দুধ

টানা দুধ একটী শ্রেষ্ঠ খাদ্য। টানা দুধ সাধারণতঃ একটা অবজ্ঞার পদার্থ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু ঘি প্রস্তুত করিতে হইলে টানা

দুধ ব্যবহার করিতে হইবে এবং উহার যোগ্য মূল্যও দিতে হইবে। টানা দুধ সম্বন্ধে গান্ধীজী সম্প্রতি আমার নিকট হইতে কিছু জানিতে চাহেন; পরে শ্রীযুক্ত মহাদেব দেসাই 'হরিজনে' এ সম্বন্ধে দুইখানি পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন—একখানি ডাক্তার এক্রয়ডের। ডাক্তার এক্রয়েড্ একজন বিশ্ববিখ্যাত শারীরিক পুষ্টিবিজ্ঞান-বিশারদ। অপর পত্রখানি আমার।

'হরিজন, ২৯শে মে ১৯৩৭

টানা দুধ

[ডাক্তার এক্রয়েড্, কুনুর পুষ্টি রিসার্চের ডিরেক্টর এবং শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের নিকট আমি টানা দুধের সুবিধা অসুবিধার বিষয় কতকগুলি প্রশ্ন এবং উহা জনপ্রিয় করার উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উভয়েই তাঁহাদের মত জানাইয়াছেন।—মঃ দেঃ]

ডাক্তার এক্রয়ডের পত্রের মর্ম্ম

"আপনি টানাদুধ ও মাখনের দুধ সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করিয়াছেন। টানাদুধের পুষ্টি মূল্য খুব বেশী কেননা খাঁটি দুধে যাহা আছে এক মাখন ও ভিটামিন 'এ' ছাড়া আর সমস্তই টানাদুধে থাকে। ভাল খাঁটি দুধ টানা দুধের চাইতে ভাল; কেননা উহাতে ভিটামিন 'এ' থাকে। কিন্তু ভারতীয় ছেলেপেলেরা যে খাদ্য খায় তাহাতে ভাত বা বজরাই বেশী থাকে, দুধ বা ডিম বড় থাকে না শাকসব্জীও অল্পই থাকে। তাহাদের স্বাস্থ্য যে টানা দুধ খাওয়াইলে খুবই ভাল হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। টানা দুধের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে উহা খাঁটি দুধ অপেক্ষা সস্তা।

আমরা অনেকগুলি পরীক্ষায় বিদেশী শুষ্ক টানা দুধের ব্যবহার করিয়াছি। যে সকল ছেলেপেলেকে দৈনিক এক আউন্স করিয়া শুষ্ক টানা দুধের গুঁড়া ৩।৪ মাস ধরিয়া খাওয়ান হইয়াছে তাহারা ওজনে ও দৈর্ঘ্যে সেই সকল শিশুর চাইতে বেশী বাড়িয়াছে যাহাদিগকে

টানা দুধ ছাড়া আর সব ঠিক এক রকম খাদ্যই খাওয়ান হইয়াছে। ঐ দুধ যে সবল ছেলেকে খাওয়ান হইয়াছিল তাহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছিল; শুষ্ক টানা দুধের শুকনা গুঁড়া ৮ গুণ জলের সহিত মিশাইয়া তরল দুধ তৈয়ার করা হইয়াছিল।

গুঁড়া দুধ তো তরল দুধ শুখাইয়াই প্রস্তুত। এজন্য গুঁড়া দুধ দিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে টানা তরল দুধ দিয়াও সেই কাজই হইবে। টানা দুধের অপচয় হইতে দেওয়া কদাচ উচিত হইবে না। একটু চেষ্টা দ্বারাই স্কুলের ছাত্রদিগকে উহা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

"স্বাদ সম্বন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে ছেলেদিগকে টানা দুধের গুঁড়ার তৈরী দুধ খাওয়াইতে কোনও কষ্ট হয় নাই। উহারা উহা পছন্দই করে বলিয়া বোধ হয়।

একটা বিশেষ কথা মনে রাখা দরকার যে টানা দুধ শিশুদের একমাত্র খাদ্য হওয়ার যোগ্য নয়, কেননা উহাতে ভিটামিন 'এ' পূর্ণ কোনও খাদ্য যেমন কড্‌লিবর অয়েল দেওয়া উচিত। একেবারে কচি শিশুর চাইতে যাহারা বড় হইয়াছে সেই সকল ছোট ছেলেপুলেকে টানা দুধ দেওয়ায় উপকার হইবে, কেননা তাহাদের খাদ্য শস্যাদি দ্বারাই প্রস্তুত, শাকসব্জী থাকে না—কোনও ছানাজাতীয় জান্তব পদার্থও থাকে না। এই সকল অবস্থায় একেবারে দুধ না দিতে পারার চাইতে টানা দুধ দেওয়া অনেক ভাল; ছেলেপুলের পক্ষে উহার উপকারিতা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইয়াছি।' যাঁহাদের সন্তান সম্ভাবনা, বা প্রসূতি মায়েদের খাদ্যের সহিত টানা দুধ দেওয়া ভাল॥'

লেখকের পত্রের মর্ম্ম

"মাখন ও ভিটামিন 'এ' ছাড়া খাঁটি দুধের অপর সমস্ত পদার্থ টানা দুধে বর্ত্তমান। যদি আমাকে গরম করা দুধের মূল্য নির্দ্দেশ করিতে হয় তবে আমি উহার উপকরণের এই প্রকার মূল্য দিব।

(ক) মাখন ও ভিটামিন 'এ'—আট আনা

(খ) ছানা পদার্থ— পাঁচ আনা

(গ) শর্করা, ধাতব পদার্থ
ও ভিটামিন 'বি'— তিন আনা

যদি খাঁটি দুধকে ষোল আনা ধরা হয় তবে খ ও গ এর সমষ্টি টানা দুধের মূল্য আট আনা ধরা যায়। বস্তুতঃ উহা অপেক্ষাও কম দামে বিক্রয় হয় বলিয়া টানা দুধ গরীবদের পক্ষে একটা মূল্যবান খাদ্য, কেননা মূল্য অধিক বলিয়া খাঁটি দুধ তাহাদের খাওয়াই হয় না।"

টানাদুধ হইতে উৎকৃষ্ট দই হয়, উহা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় যোগ্য। দুধ ব্যবহারের আর এক শ্রেষ্ঠ উপায় উহা জমাট করিয়া বিক্রয় করা। কুটীর আয়োজনেই উহা জমাট করা যায়। উহা হইতে ছানা কাটিয়া বা ক্ষীর করিয়া ননী তোলা ছানা বা ক্ষীর বলিয়াও বিক্রয় করা যায়। যে প্রকারেই হউক উহা হইতে ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইবে। টানা দুধের উপকারিতা ও খাদ্য মূল্য সম্বন্ধে লোকের ঠিক ধারণা হইলে উহার অধিকতর ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। টানা দুধ বা টানা দুধের দই, ছানা ক্ষীর প্রভৃতি যোগ্যমূল্যে না বেচিতে পারিলে ঘি উৎপাদনে বিঘ্ন হইবে।

ভয়সা ও গাওয়া ঘি

খাদ্য হিসাবে ঘি, বিশেষ করিয়া গাওয়া ঘির স্থান খুব উচ্চে। গাওয়া ঘি সহজপাচ্য ইহার তাপ মূল্যও বেশী। ভাল করিয়া গলাইলে ইহাতে দুধের প্রায় সবটা ভিটামিন 'এ' থাকিয়া যায়। ভিটামিন 'এ' পোষণকারী, রোগ প্রতি-শেধক ও সংরক্ষক। ভিটামিন 'এ'র অভাবে শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়। কডলিবর অয়েলে ভিটামিন 'এ' আছে বলিয়া ডাক্তারেরা উহার ব্যবস্থা করেন। গাওয়া ঘি হইতে কতকটা অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। কতজনে কষ্ট করিয়া কড্‌লিবর অয়েলের মত দুর্গন্ধ মাছের তেল খাইয়া থাকেন—কিন্তু তাঁহারা

ভালভাবে তৈরী গাওয়া ঘির উপকারিতার কথা জানেন না। শরীর পোষণের ও অল্প-বয়স্কদিগের বৃদ্ধি ও মায়ের পেটের সন্তানের বৃদ্ধির জন্য গাওয়া ঘির মত উপকারী পদার্থ অল্পই আছে।

কাহারও এপ্রকার বিশ্বাস আছে যে গাওয়া ঘির দ্বারা ভাজার কাজ করিলে জল্‌তি বেশী যাইবে। কিন্তু এই ধারণা ভুল। কাঁচা পাকের ঘি হইলেই জল্‌তি বেশী যাইবে—গাওয়াই হউক। গুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও গাওয়া ঘির দর ভয়সা ঘির কাছাকাছি না হইলে সাধারণের পক্ষে উহা ব্যবহার করা কঠিন। খাদি প্রতিষ্ঠান গাওয়া ঘির উৎপাদন হাতে লওয়ার পূর্ব্বে গাওয়া ঘির নির্দ্দিষ্ট কিছু দর ছিল না। কেননা চাহিদাও তেমন ছিল না। এখন গাওয়া ঘির দর ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। বর্ত্তমানে গাওয়া ঘির দর ভয়সা অপেক্ষা প্রতি সের চার ছয় আনা মাত্র বেশী। কিন্তু চাহিদা

বাড়িলে দুধও বাড়িতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি টানা দুধের দধি বা জমাট দুগ্ধ প্রভৃতি করিয়া লাভজনক ভাবে বিক্রয় করা যায় তবে ক্রমশঃ বাংলার উৎপন্ন গাওয়া ঘি আমদানী করা ভয়সা ঘির সমান অথবা প্রায় সামান্য অধিক দামে বিক্রীত হইতে পারিবে। ঐদিন আসিলে বাংলার সমস্ত ঘি বাংলার গাই হইতেই পাওয়া যাইবে।

ঘি শিল্প প্রসারের প্রভাব

যদি কোনও একটী শিল্পের প্রসার হয় তবে নানাদিক দিয়া অন্যান্য শিল্প উত্তেজনা লাভ করে। বাংলায় যেদিন ভয়সা ঘির পরিবর্ত্তে গাওয়া ঘির প্রচলন সুরু হইবে তখন দিকে দিকে তাহার উৎপাদনের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকিবে। টানা দুধের বিক্রয় বাড়িবে, আবার সেই দই বিক্রয় করিতে কত লোক নিয়োজিত হইবে। দই হইলেই কুমারের গড়া পাত্র চাই। কুমারেরা কাজ পাইবে। নদীপথে বহন করার জন্য হয়ত কিছু নৌকার প্রয়োজন বাড়িবে এবং নৌকা গড়ায় ছুতার কাজ পাইবে। গরুকে অধিক বিচালি দেওয়ার গরজে চাষা ইচ্ছা করিয়া ধানের জমি ধানকেই ফিরাইয়া দিবে। পাট কম বুনিবে। যাহার দাম কেবল দেশ-বিদেশের দর উঠ্‌তি পড়্‌তি খেলার উপর নির্ভর করে, উৎপাদনের সহিত যাহার দরের সম্পূর্ণ যোগ নাই, পাটের মত এমন দ্রব্যের উপর চাষা যত কম নির্ভর করে তত ভাল। দুধের চাহিদা বাড়িলে পাটের চাষ স্বতঃই কমিয়া ধানের চাষ বাড়িবে ও চাষার কল্যাণ হইবে।

কেবল বিচালি নয়, খইলও গরুকে দিতে হইবে। তাহাতে খইলের চাহিদা ক্রমে বাড়িবে। যে কলুরা আজ কেবল কলের তেল কিনিয়া বেচে তাহারা ঘানি চালাইবার উত্তেজনা পাইবে ফলে কলের তৈলের ব্যবহার কমিয়া কিছু ঘানির তেলও চলিতে পারে।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনায় এই উদ্যম পূর্ণ। ডেনমার্কে দুধের ব্যবহার বেশ হইত, কিন্তু যুদ্ধের চাহিদায়, দুধ মাখন হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইতে আরম্ভ করে। উহার ফলে শিশুদের ভিটামিনের অভাব ঘটে, চক্ষু হইতে জলপড়া, চক্ষু বন্ধ হইয়া পাকিয়া নষ্ট হওয়া আরম্ভ হয়। শিশুদের অকাল মৃত্যু হইতে থাকে। তখন ডেনমার্কের গবর্ণমেণ্ট মাখন রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গেই শিশুদের রোগ ও অকাল মৃত্যু বন্ধ হয়।

বাংলায় যদি এই ১২০ লক্ষ মণ দুধ বৎসরে অধিক উৎপন্ন হয় তাহার ফলে বাঙ্গালী জাতি ৪ কোটি টাকা ঘরে রাখিবে ও স্বাস্থ্যশীল ও স্বাবলম্বী হইয়া পড়িবে মস্তিষ্কের অপব্যবহার না করিয়া সদ্ব্যবহার করিবার সামর্থ্য পাইবে। বস্তুতঃ এই ঘি শিল্পের উত্তেজনা দ্বারা বাংলায় নবজীবনের সূত্রপাত হইতে পারে। আমি যাহা আশা করিতেছি তাহা আকাশ কুসুম নয়। খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে কিছু কিছু পরীক্ষা করার পর এই প্রকার আশা পোষণ করিতেছি। খাদি প্রতিষ্ঠান আমাদের এই পরীক্ষার সুযোগ দিয়াছে। এই সংস্থান খাদির ও কুটীর শিল্পের উন্নতির জন্য গঠিত। ইহা ১৮৬৮ সালের ২১ এক্ট অনুসারে দাতব্য সংস্থান (Charitable Trust) বলিয়া রেজেষ্ট্রীকৃত। আজ ১২ বৎসর গ্রাম্যশিল্প সংগঠনের কার্য্য এই সংস্থানের ভিতর দিয়া হইতেছে। এ পর্য্যন্ত

এই সংস্থান হইতে কুটীর শিল্প ও খাদির প্রবোচনার জন্য তিনলক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। কেবল আদর্শ সম্বন্ধে যুক্তি তর্ক না করিয়া কাজ করিয়া দেখান প্রতিষ্ঠানের কাম্য। কয়েকমাস হইতে প্রতিষ্ঠানের গাওয়া ঘি প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় যে সফলতা লাভ করা গিয়াছে তাহা হইতেই এই আশা করা যায় যে সংযোগ হইলে এই পৌনে দুই কোটি টাকার ঘি ও সম পরিমাণ টাকার টানা দুধের উৎপাদন বাংলা করিতে পারে।

দুধ বাড়ান ও ঘি প্রস্তুতের সমস্ত আবশ্যকীয় উপকরণ এমন যে উহা বাংলার সাধারণ গৃহস্থের আয়ত্তের মধ্যে। আসল কথা এই যে বাঙ্গালীর গাওয়া ঘির ব্যবহার প্রচলনের জন্য আগ্রহশীল হইতে হইবে। গাওয়া ও ভয়সা ঘির মূল্য সেরকরা চার-ছয় আনা বেশী হইলেও উহা দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে এবং গোপালনের দিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভেজাল-ঘি সস্তা। ঘি কিনিতে গিয়া ক্রেতার নিশ্চয় হওয়া

আবশ্যক যে ভেজাল জিনিষ তিনি কিনিতেছেন না। কলুর ঘানির প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে সস্তায় ভেজাল জিনিষ নির্ব্বিচারে কেনার ফলে একটা বড় গ্রাম্য শিল্প দিনে দিনে নষ্ট হইতেছে এবং গ্রাম গ্রামান্তরে সহরের কলের তেল ও ভেজাল তেল চলিতেছে। ঘি সম্পর্কেও ভেজালের প্রশ্রয় দিলে—অর্থাৎ সস্তা ঘি কিনিতে চাহিলে এই শিল্প কখনো বাংলায় দাঁড়াইবে না। গন্ধ শূন্য জমাট তেলকে ঘির রং ও গন্ধ দিয়া বেমালুম ঘি বলিয়া চালান হইতেছে। ১৩ই জুলাই তারিখের এক্সচেঞ্জ গেজেট হইতে ঘি-সাবষ্টিটিউটের—(যাহা দোকানদারেরা ঘিতে সাধারণতঃ ভেজাল দিয়া থাকে তাহার) দর উদ্ধৃত করা হইল।

মাখন ও ঘি-সাব্ষ্টিটিউটের দর

ব্র্যাণ্ড	প্রতি ৪০ পাউণ্ড টিনের মূল্য
১ম শ্রেণী	৯৸৴০ হইতে ১০৲
তাজমহল মার্কা	৯৷০ ,, ৯৸৴০
আনার ,,	৯৸০ ,, ৯৸৴০
টাকা ,,	৯৸০ ,, ৯৸৴০
বাটি ,,	৯৸০ ,, ৯৸৴০
কুড়াল ,,	৯৸০ ,, ৯৸৴০
পাতা ,,	৯৸০ ,, ৯৸৴০
অন্যান্য মার্কা	৯৲ ,, ৯৸০

গুদামের দর—কলিকাতায় ফ্রি ডেলিভারী

'এক্সচেঞ্জ গেজেট'—১৩ই জুলাই

খুচ্‌রা দোকানে এই সকল ঘি-সাবষ্টিটিউট ঘির সহিত মিশ্রিত হইয়া অথবা ঘি বলিয়াই চলে। ঘি-সাব্ষ্টিটিউট এক মনের দাম কুড়ি টাকা। কাজেই ঐগুলির দ্বারা ভেজাল-ঘি কুড়ি টাকার উপরে যে কোন দামে বিক্রয় করা যায়। ভয়সা ঘি মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় খাঁটি অবস্থায় আসিয়াও পরে ভেজাল মিশ্রিত হইয়া বাংলার সর্ব্বত্র চলিতেছে। সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাংলায় ভয়সা ঘির আমদানি পৌনে দুই কোটি টাকার হইলেও ভেজাল হওয়ার পর মোট মূল্য অনেক বেশী দাঁড়ায়। গাওয়া ঘি সম্বন্ধে গান্ধীজী ১৯৩৫, ২ রা নভেম্বরের 'হরিজনে' লিখিয়াছেন।

"যাহারা পারে তাহারা ঘি ব্যবহার করিতে ভালবাসে। প্রায় সকল প্রকার মিষ্টান্নেই ঘি থাকে, কিন্তু তবুও হয়ত এই কারণেই ঘিতে সব চাইতে বেশী ভেজাল দেওয়া হয়। বাজারে যত ঘি পাওয়া যায় তাহার খুব বেশী অংশ নিঃসন্দেহ ভেজাল। কতকগুলি ঘি যদি বা অধিকাংশ ঘিই না হউক এমন হানিকর পদার্থ দ্বারা ভেজাল দেওয়া হয় যাহা অমাংসাশী বড় খাইতে পারে না। তেল দ্বারাও ঘি ভেজাল করা হয়।

মগন-বাড়ীতে আমরা কেবল মাত্র গাওয়া ঘি সংগ্রহ করার জন্য নিশ্চয় করিয়াছি। ইহাতে আমাদের অসুবিধা হইয়াছে অনেক, দামও দিতে হইতেছে খুব। মণকরা ১০০৲ টাকা দাম তাহার উপর রেল ভাড়া আমরা দিতেছি।

"ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবসা চালাইতে যে কুশলতার প্রয়োগ করা হয় তাহার অর্দ্ধেক যদি জনসাধারণের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত গোশালা বা খাদ্য দ্রব্যের দোকান চালাইবার জন্য ব্যয়িত হইত তবে সে গুলি স্বাবলম্বী হইতে পারিত।

এই প্রকার অনুষ্ঠানের স্বাবলম্বী হওয়ার পথে একমাত্র বাধা এই যে জনসাধারণ এই সকল অনুষ্ঠানে কুশলতা বা মূলধন নিয়োগ করিতে নারাজ। বড় বড় অন্নসত্র খুলিয়া অলস ভিখারীর সংখ্যা বাড়াইতে ধনীর সহৃদয়তা ব্যয় হইয়া যায়।

বাংলায় খাদি প্রতিষ্ঠান গান্ধীজীর কল্পিত এই কার্য্য হাতে লইয়াছে। বিশুদ্ধ ভেজাল-শূন্য গাওয়া ঘি পাওয়ার দিকে দেশবাসীর সতর্ক সাগ্রহ দৃষ্টি পড়িলে বাংলার আর্থিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যের যে বিপুল উন্নতি হইবে সে বিষয়ে সংশয় নাই। বাংলায় ম্যালেরিয়া নিউমোনিয়া কলেরা ও ক্ষয় রোগের প্রকোপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল এ সকল রোগ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এসকল রোগ ও অন্যান্য ভাবে যত অকালমৃত্যু হয় তাহা কমিয়া গিয়া বাংলা স্বাস্থ্যে শিল্পে আনন্দে পূর্ণ হইতে পারে। বাংলায় পৌনে দুই কোটি টাকার ঘি অন্য প্রদেশ হইতে আনা বন্ধ করিয়া প্রায় চার কোটি টাকা বাংলার কুটীরে বৎসর বৎসর উৎপাদন করা ও তাহার দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ করা ও বেকারত্ব দূর করার মত এত বড় একটা কুটীর শিল্পের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

সতীশ চন্দ্র দাস গুপ্ত
(প্রবাসী হইতে)
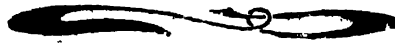
বাংলাদেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা। অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসাকেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি যদি জানিতে পারেন তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা তেতুল, সুপারি গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন- তাহা হইলে অতি সহজেই তিনি নানা স্থানের মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়নও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করিতেছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি সকলে এ বিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। যাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ সঙ্কল্প প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক্ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য পণ্ড না করেন।

মালদহ

খদ্দর

নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ,
ইংরেজ বাজার,

বস্ত্রব্যবসায়ীগণঃ—

১। বান্ধব বস্ত্রালয়, ইংরেজ বাজার
২। ভাগ্যলক্ষ্মী বস্ত্রালয় ঐ
৩। বীণাপাণি বস্ত্রালয় ঐ
৪। আদর্শ বস্ত্রালয় ঐ

রেশমী কাপড়

১। বেঙ্গল কো-অপারেটীভ শিল্প ইউনিয়ন কোং লিঃ। ইংরেজ বাজার
২। বান্ধব বস্ত্রালয় ,,
৩। ভাগ্যলক্ষ্মী বস্ত্রালয় ,,
৪। পঞ্চানন শিল্প ফাক্টরী হাটখোলা

কাগজ

১। ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ইংরেজ বাজার
২। ভূজঙ্গভূষণ কুণ্ডু ,,
৩। জে, সি, দাস ,,

মনোহারী

১। জটিল চন্দ্র দাস ইংরেজ বাজার
২। কৃষ্ণ-ষ্টোর ,,
৩। ললিত মোহন দাস ,,
৪। বি, এন, গুপ্ত হাটরোড্

ফাউণ্টেনপেন

১। এম, এন, দাস ইংরেজ বাজার
২। মাজদিয়া ষ্টোর ,,
৩। জে, সি, দাস ,,

জুতা

১। বান্ধব পাদুকালয় ইংরেজ বাজার
২। অনিল সু ষ্টোর ,,
৩। বেঙ্গল সু ষ্টোর ,,
৪। মালদহ সু ষ্টোর ,,
৫। এস, রমজান হাটখোলা

ছুরী কাঁচি

১। মণীন্দ্রনাথ কর্ম্মকার কুতুবপুর
২। জে, সি, দাস ইংরেজ বাজার

সাইকেল

১। এম, এন, দাস ইংরেজ বাজার
২। ললিত নন্দী ,,
৩। নির্ম্মল দাস ,,
৪। বিজয় সাইকেল ষ্টোর মকদুমপুর
৫। দ্বারকাদাস বেহানী ইংরেজ বাজার

ছাতার কারখানা

১। ঊষা ভাণ্ডার হাটখোলা

ঔষধালয়

১। ইকনমিক ফার্ম্মেসী ইংরেজ বাজার
২। ইংলিশ বাজার ফার্ম্মেসী ,,
৩। ইউনিয়ন মেডিক্যাল ষ্টোর ,,
৪। টি, ডি, দাস এণ্ড কোং হাটখোলা
৫। লিলি মেডিক্যাল ফার্ম্মেসী ইংরেজ বাজার

ইলেক্ট্রিক

১। বেহানী এণ্ড কোং ইংরেজ বাজার
২। ইলেক্ট্রিক হাউস মকদুমপুর

এজেন্সী

১। ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্স এণ্ড ন্যাশন্যাল এজেন্সী সিণ্ডিকেট লিঃ। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মালদহ।

আয়ুর্ব্বেদ

১। ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী ইংরেজ বাজার
২। বরিশাল আয়ুর্ব্বেদীয় ,,
৩। জীবানন্দ ফার্ম্মেসী ,,
৪। কবিরাজ গোস্বামী ,,
৫। আর, এন, পাল মকদুমপুর
৬। রসিক কবিরাজ কুতুবপুর
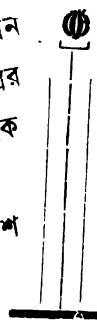
নিলাম খরিদের ব্যবসা

শ্রীরামানুজ কর

আমাদের দেশে বড় বড় সহরেই পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের দালাল আছে। খুচরা দ্রব্য বিক্রয়ের কোন দালাল নাই। কারখানার পরিত্যক্ত অনাবশ্যক দ্রব্য, ভাঙ্গা টুকরা দ্রব্য, গভর্ণমেণ্টের, রেলের, জাহাজের ও কারখানার পরিত্যক্ত দ্রব্য নিলামে বিক্রী হয়। কলিকাতার নিলামকারক ম্যাকেঞ্জী লায়াল কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়া এই সকল দ্রব্য নিলামে বিক্রী করে। এই কোম্পানী প্রত্যহ এক্সচেঞ্জ গেজেট নামক একখানি দৈনিক কাগজ বাহির করে, ইহাতে কোন্ দিন কোথায় কোন্ দ্রব্য নিলামে বিক্রী হইবে তাহার বিজ্ঞাপন থাকে। এই সকল নিলামে পুরাতন কলকব্জা, কাঠ, ড্রাম, চিনি, তামা, পিতল, সিসা, দস্তা, তামা ও পিতলের গুড়া, নিকেল, জার্ম্মান সিলভার, সৈন্যগণের কুচকাওয়াজে ব্যবহৃত টোটা, ম্যাঙ্গানীজ, বালতি, রেলগাড়ীর লোহা, পরিত্যক্ত রেল, কাঠের স্লীপার প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য নিলামে বিক্রী হয়।

সমর বিভাগের দ্রব্যাদি ইছাপুরের কারখানায় নিলাম হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের দ্রব্যাদি জামালপুর ও লিলুয়ার কারখানায় নিলাম হয়। ইষ্ট বেঙ্গল রেলের দ্রব্যাদি নৈহাটী ও সৈদপুরে নিলাম হয়। কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের ও ইলেকৃট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর দ্রব্য কলিকাতায় নিলাম হয়। বিলিমরিয়া ব্রাদাস বেঙ্গল নাগপুর রেলের দ্রব্যাদি খড়্গপুরে নিলামে বিক্রি করে। এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, নাগপুর, করাচী, কোয়েটা, পেশোয়ার, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুনে বহু দ্রব্য এইরূপ নিলামে বিক্রি হয়। বোম্বাই ও পাঞ্জাবের বহু মহাজন এই নিলামের দ্রব্য খরিদ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন ও করিতেছেন। দিল্লীতে নিয়া দরমল রঙ্গীলাল, এলাহাবাদে হাজী খাঁ বাহাদুর, এম. এ বাকী খাঁ ও কোয়েম খাঁ রেলের ও গভর্ণমেণ্টের দ্রব্য নিলামে বিক্রী করে। অন্যান্য রেলের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি তাহাদের স্ব স্ব কারখানায় নিলাম হয়।

এই নিলামের দ্বারা এক বিরাট ব্যবসায় চলিতেছে। এই সকল নিলামে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল বিক্রী হয়। কলিকাতা ও বোম্বাইএর বাজারে এই সকল মাল বিক্রী হয়। এই কারবারের সহিত বাঙ্গালীর কোন সম্বন্ধ নাই। কলিকাতার ঠন্‌ঠনিয়ায় ও স্থকিয়া ষ্ট্রীটে যে লোহা পটি আছে সেই সকল দোকানের অধিকাংশ মাল নিলাম

খরিদা। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ও লোহা পটিতেও এই সকল নিলামের মাল বিক্রী হয়। রেলওয়ের পরিত্যক্ত রেলগুলি পাকা বাড়ীতে কাঠের কড়ির বদলে ব্যবহৃত হয়। প্রধানতঃ হিন্দুস্থানীরাই দল বাঁধিয়া লোহার দ্রব্যাদি নিলামে খরিদ করে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ লোকে কালোয়ার বলিয়া থাকে। বাঙ্গালীর একা নিলাম খরিদ করিবার সামর্থ্য নাই, দল বাঁধিয়া খরিদ করিবারও যোগ্যতা নাই। কত অবাঙ্গালী বাঙ্গালায় আসিয়া এই কারবারে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। আর বাঙ্গালী যুবকেরা সংবাদ পত্রে কেবল চাকরী খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিয়া হয়রান হইতেছে। মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনের একটি চাকরী খালির বিজ্ঞাপন দেখিলে হাজার হাজার যুবক উহার জন্য দরখাস্ত করে।

গত মহাযুদ্ধ কতদিন চলিবে তাহার কোন স্থিরতা না থাকায় ইংরাজ যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছিল; লোহার কল কব্জা, তামা, পিতল, সীসা, দস্তা, বাল্‌তি, বাক্স, তাম্বু, পোষাক, হাড়ি, দড়ি, তার, জাল, পাখা প্রভৃতি দ্রব্য এত সংগ্রহ করিয়াছিল যে সেই সকল দ্রব্য কলিকাতায় আনিয়া মিউনিসন বোর্ড তিন বৎসর ধরিয়া বিক্রয় করে। হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে এক বৃহৎ বাটীতে রীতিমত অফিস বসিয়াছিল। প্রত্যহ বিজ্ঞাপন দিয়া এই সকল দ্রব্য নিলামে বিক্রী হইত। বহু মাড়োয়ারী, ভাটিয়া ও হিন্দুস্থানী এই সকল দ্রব্য নিলামে খরিদ করিয়া প্রচুর লাভ করিয়াছিল। দমদমায় এই সকল মাল আনিয়া মজুত করা হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় মাড়োয়ারী ও ভাটীয়ারা গভর্ণমেণ্টকে মাল যোগাইয়া মোটা লাভ করিয়াছিল, আবার যুদ্ধ শেষে পরিত্যক্ত ও উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি নিলামে খরিদ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া মোটা লাভ করিয়াছিল।

টাটা নগরে টাটা কোম্পানীর লোহার কারখানার লোহার টুকরা দ্রব্যাদি নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর নিলামে বিক্রয় হয়। এক একবারে ৮।১০ হাজার টন বিক্রি হয়। এই সকল দ্রব্য বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বাকীপুর, কানপুর প্রভৃতি নানাস্থানে বিক্রি হয়। ইহাতে তাওয়া, কড়াই, ঝাজরা, ছুরি, কাটারী, কোদাল, কুড়োল কাস্‌তে, শাবল, টাঙ্গি, বর্শা, ফাল, হাতুড়ি, ডাবু, শাঁড়াসী, বঁটি, জাতি, কব্জা হাঁসকল প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ার হয়। টাটা নগরে ইণ্ডিয়ান কেবল্‌ কোম্পানী, তামার তার প্রস্তুত করে। তারের টুকরাগুলি মজুত হইলে তাহারা নিলামে বিক্রী করে। লোহার টুকরা দ্রব্য কলিকাতা হইতে জাপানে রপ্তানী হয়।

বাঙ্গালী হুজুক প্রিয়, হুজুকে মাতোয়ারা। কাজেই ব্যবসায়ে কিভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় সেদিকে কোন দৃষ্টি নাই। অনুসন্ধান করিয়া দেখিবারও অবসর নাই।

আমরা বাঙ্গালী ধনী ও পরিশ্রমী যুবকদিগের সমবায়ে গঠিত এক একটী দলকে এই সকল অর্থোপার্জ্জনের দিকে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিতেছি।

বাঁধাকপির চাষ

আমাদের দেশে শীতকালে বাঁধা কপি একটা প্রিয় খাদ্য। খাদ্য হিসাবে শুধু যে খুব আস্বাদযুক্ত তা নয়, পরন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারীও বটে। বাঁধাকপিতে রক্ত পরিশোধক sulpher বা গন্ধক আছে। তা ছাড়া অনেকগুলি সবুজ পাতা থাকার দরুণ এর মধ্যে প্রচুর ভিটামিন বিদ্যমান। এই বাঁধাকপির চাষ আমাদের দেশে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসেই সুরু হয়, সুতরাং বাঁধাকপির চাষের সম্পর্কে গুটি-কয়েক কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এটা খুবই সত্যি যে, যে-জিনিষটা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য তার আমরা যথেষ্টই চাষ ক'রে থাকি। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করলে যদি অল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে অধিক ফল লাভ হয়, তাহ'লে সেধারে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রতি বছরই বাঁধাকপির চাষ হয়, প্রতিবছরই আমাদের চাষীরা সেই গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করে কিন্তু তাতে আমাদের ফসল অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায় কিনা সেধারে কারও নজর থাকে না। শুধু বাঙ্গালী বাবুরা, যাঁরা সখের বাগান করেন তাঁরা বিভিন্ন নার্সারী ইত্যাদি থেকে চাষের পুস্তিকা আনিয়ে উত্তম বীজ ও উন্নত ধরণের চাষ-প্রণালী অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁদের ত' সেটা ব্যবসাগত চাষ নয়, সখের বাগান করা। যারা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য চাষ করে তাদের বাঁধাকপির উন্নত বীজ ব্যবহার কিম্বা এসম্পর্কে কোন নতুন বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণের দিকে নজর থাকে না। ফলে অধিক পরিমাণ লাভ থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

কিন্তু যদি উত্তম বীজ ব্যবহার করা যায় এবং উন্নত প্রণালী অবলম্বন করা যায় তাহ'লে চাষীরা বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর লাভবান হ'তে পারে। সাধারণ লোকের নিকট সকল বাঁধাকপিই দেখতে একরকমের ব'লে বোধ

হয় (শুধু বড় ছোটর যা তফাৎ), কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাঁধাকপিরও শ্রেণী বিভাগ আছে। এই এক একটি শ্রেণী কোন্ জমিতে এবং কোন্ সময় চাষের উপযোগী সেটা চাষীদের নির্দ্ধারণ করা দরকার। বাজারে সব কপি একই সময়ে আসেনা, কেউবা আসে শীতের প্রারম্ভে, কেউ বা শীতের শেষে। মাঝখানে মাস দুই-আড়াইয়ের ব্যবধান। সুতরাং কোন্ শ্রেণী বা শীতের প্রথমে তৈরী হ'বে এবং কোন্ শ্রেণী বা শীতের শেষে তৈরী হ'বে এবং কোন্‌টার কি রকম চাষ প্রণালী তা' জানা থাকা দরকার। আমাদের দেশের চাষীদের উক্ত জ্ঞানের অভাব আছে বলেই মনে হয়; বাঁধাকপির চাষ তারা করে কিন্তু কপিদের শ্রেণী বিভাগ করে না। অথচ ওদেশে First and Best; Pomeranian, Dwarf Drumhead প্রভৃতি বাঁধাকপির কতকগুলি প্রকার ভেদ আছে।

অধিকাংশ চাষের ক্ষেত্রে একটা জিনিষ দেখা যায় যে, ফসল ক্ষেতের জমিতে লাগাবার পূর্ব্বে একটি ছোট চারাতলায় আগে চারা তৈরী করা হয়। তারপর চারা গুলা একটু বড় এবং সতেজ হবার পর তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে ফসলের ক্ষেতে বসানো হ'য়ে থাকে। আমাদের দেশে এ প্রণালী কতটা সঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হয় তা' বলতে পারি নে। তারপর জমি নির্ব্বাচনও একটা প্রধান সমস্যা। এমন জমি আছে যেটাতে তেমন আশানুরূপ ফসল হ'ল না, আবার এমন জমি দেখা গেল যেটাতে বেশ ভাল ফসল হ'ল। সুতরাং জমির গুণাগুণের ওপরও ফসলের পরিমাণ নির্ভর করে। এ্যাসিড্-যুক্ত জমিতে কখনো বাঁধাকপির চাষ করা

উচিত নয়। অম্লযুক্ত জমি হ'লে প্রতি বর্গ গজ জমির ওপর দু' আউন্স করে শ্লেক্‌ড্ লাইম ছড়িয়ে দিয়ে মাটী নিঙ্‌ড়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বাঁধাকপির যেখানে বীজ পোঁতা হ'বে সে যায়গাটা যেন বেশ রৌদ্রযুক্ত এবং আলোমণ্ডিত হয় অর্থাৎ সে জমিতে যেন বেশ রৌদ্র লাগে এবং জল যেন না জমতে পায়। বেশী জল জমলে স্যাঁতোতে চারার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। জমি তৈরী হবার পর তার ওপর আল্‌তো ভাবে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সেগুলো মাটির ভেতর পুঁতে দিতে হয়। তারপর যাতে না পোকা মাকড়, পাখী ইত্যাদি জমির ক্ষতি করতে পারে তজ্জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতি বর্গ গজ জমিতে অর্দ্ধ আউন্স করে ন্যাফ্‌থলিন্ ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

ঠিকমত যদি জল পায় ত অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই চারা বেরুবে। এখন ঐ চারাগুলির পরিচর্য্যার জন্য যত্ন নিতে হ'বে যাতে কোন আগাছা চারাগুলির আশে পাশে না জন্মাতে পারে। মাঝে মাঝে চারাগুলিতে জল সিঞ্চন করা প্রয়োজন এবং যাতে না পাতার ওপর ধুলো পড়ে সেটা দেখা দরকার।

পাতার ওপর ধুলো জমলে চারাগুলির নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেবার ক্ষতি হয়; অর্থাৎ পাতার গাত্রয় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত (pore) থাকে, ধূলার দ্বারা সেগুলি বুজে যায় এবং সেক্ষেত্রে চারাগুলি বাড়তে পায় না। স্থতরাং সর্ব্বদা জলসিঞ্চন দ্বারা ধূলা ধৌত করে দিতে হ'বে।

বিলাতে বাঁধাকপি চাষের ক্ষেত্রে চারাগুলিকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে আবার নার্সারীতে কয়েক সপ্তাহ রাখা হয়—উক্ত ক্ষেত্রে ৪।৬ ইঞ্চি অন্তর অন্তর চারাগুলি বসাবার নিয়ম। নার্সারীতে চারাগুলি বেশ সতেজ এবং বাড়ন্ত হ'য়ে ওঠে। আমাদের এখানে বাঁধাকপি চাষের ক্ষেত্রে চারাগুলিকে চারাতলা থেকে একেবারে ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে বসানো হ'বে, কি মাঝে নার্সারীতে কয়েক সপ্তাহ রাখা হ'বে সেটা কৃষি-উৎসাহীরা ভেবে দেখবেন।

চারাগুলি একটু বড় হ'লে সেগুলিকে নিয়ে গিয়ে ক্ষেতে বসিয়ে দেওয়াই কর্ত্তব্য। এই সময় চারাগুলিকে একটু বাছাই করা দরকার, নইলে সমস্তগুলিকে নিয়ে গিয়ে বসালে চাষের ক্ষতি হয়। যে সমস্ত চারা গোড়া থেকেই কাণা গোছের, কিংবা সতেজ নয়, অথবা ডাঁটাটা বেঁকে গেছে—তাদের ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে বসালেও চারা বড় হয় না, বরং মরে যায়। স্থতরাং তাদের ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যে সমস্ত চারার পাতা ছুঁচ মতো, তাদের কপিও ভাল হয় না, পক্ষান্তরে যাদের পাতায় অগ্রভাগ গোলাকার সেই সমস্ত কপি খুব ভাল হয়।

কোন জমিতে নিয়ে গিয়ে চারাগুলিকে বসানো হ'বে সেও সমস্যার কথা বটে। অধিক শীতের ঠাণ্ডায় কপির ক্ষতি হয়। চারাগুলিকে নিয়ে গিয়ে গাজরের জমিতে বসানো উচিত নয়। আলুর জমিতে যদি চারাগুলো বসানো যায় ত সবচেয়ে ভাল হয়। জমিতে ৯ ইঞ্চি অন্তর অন্তর এক ফুট ক'রে গর্ত্ত

ক'রে চারাগুলো পুঁতে দিতে হয় এবং প্রতিবর্গ গজ জমি পিছু অর্দ্ধ-বালতী করে সার ঢালতে হয়। তৎপরে মাটির সঙ্গে সেই সার বেশ করে মিশিয়ে দিতে হয়।

উপরে বাঁধাকপির চাষের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কথা সংক্ষেপে বিবৃত হল। আমাদের দেশের চাষীরা যদি এধারে নজর দেয় ত নিশ্চয়ই লাভবান হ'বে।

লুব্রিক্যাণ্ট্ ও পালিশ প্রস্তুতের ফরমুলা

লুব্রিক্যাণ্ট্ (মেসিন্ চালু রাখবার তেল), পালিস, পেষ্ট্ ইত্যাদির বিষয় আজকের এই যন্ত্রযুগে সবাই নিত্য শুনে থাকেন। লুব্রিক্যাণ্ট্ সাধারণতঃ মেসিন্ চালু রাখবার জন্যই ব্যবহৃত হয়, কারণ ইহা যন্ত্রসমূহের ক্ষয় নিবারণ করতে সাহায্য করে। মেসিন যখন চলতে থাকে তখন একটি যন্ত্র আর একটির উপর দিয়ে বারংবার যাতায়াত করে কিংবা একটি চাকার দাঁতের সঙ্গে আর একটী চাকার দাঁত আটুকে অনবরত ঘুরপাক্ খায়। এমতাবস্থায় যদি লুব্রিক্যাণ্ট্ না লাগানো থাকে তাহ'লে অনবরত ঘষ্ড়ানি এবং সংঘর্ষের দরুণ যন্ত্রের ক্ষয় কিংবা ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু যদি লুব্রিক্যাণ্ট্ লাগানো থাকে তাহ'লে এ জিনিষটি আর ঘটতে পারে না। তবে একেবারে ক্ষয় যে হয় না তা নয়, কিন্তু লুব্রিক্যাণ্ট অতিরিক্ত ক্ষয় নিবারণ করে। এই জন্যই লুব্রিক্যাণ্টের এত কদর।

পালিস কিন্তু ঠিক এই জাতীয় কাজ করে না। পালিসের কাজ হল মেসিন কিংবা যন্ত্রগুলিকে ঠিক রাখা যাতে সেগুলিতে মর্চে ইত্যাদি না ধরে। তা' ছাড়া পালিশ মেসিনগুলিকে একপ্রকার উজ্জ্বলতা প্রদান করে। এই পালিসের গুণেই পুরাতন যন্ত্রপাতি নূতনের মত ঝক্ঝকে দেখায়। সেইজন্যই যান্ত্রিক জগতে পালিসের এত আদর।

লুব্রিক্যাণ্ট্ দু'রকমের হয় :—(১) চর্ব্বি জাতীয় ও (২) তৈল জাতীয়। 'মেসিন্ গ্রীজ্' এবং 'মেসিন অয়েল্' বললেই ঐ দুটি পদার্থকে পরিষ্কার বোঝা যায়। উদ্ভিজ্জ এবং খনিজ তৈল, চর্ব্বি, পেট্রোলিয়াম জেলি, আলকাতরার তৈল, রজন-তৈল, তারপিন তৈল, গুঁড়া খনিজ পদার্থ প্রভৃতি বস্তুই হ'চ্ছে লুব্রিক্যাণ্ট প্রস্তুতের উপাদান। পালিশ প্রস্তুতের উপাদান হচ্ছে ওয়াক্স (প্রাকৃতিক এবং সিন্থেটিক উভয়ই) দ্রবনীয় ধাতব সাবান, দ্রবণীয় সাবান, করকরে গুঁড়া (চীনামাটি ইত্যাদি) বার্নিস্ প্রভৃতি।

নিম্নে চর্ব্বি জাতীয় লুব্রিক্যাণ্টের একটি ফরমুলা দেওয়া গেল :—

লার্ড্	১০ ভাগ
বিফ্ ট্যালো	৫ ,,
ক্যাষ্টর ওয়েল	১০০ ,,
	১১৫ ভাগ

তৈলজাতীয় লুব্রিক্যান্ট্ বায়ুস্পর্শে যাতে না ঘন হয়ে যায় সে বিষয়ে নজর রাখ্‌তে হবে। তজ্জন্য তার মধ্যে কোন চর্ব্বিজনিত এ্যাসিড্ না থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং তিল তৈল ব্যবহার না করাই ভাল। সুতরাং যদি উদ্ভিজ্জ তৈল ব্যবহার করতেই হয়, তা'হলে তাকে ভাল করে পরিষ্কৃত করে নেওয়া দরকার। খনিজ তৈল ইত্যাদিতে যদিও চর্ব্বিযুক্ত এসিড্ ইত্যাদি থাকে না; তবুও তাকেও ব্যবহারের পূর্ব্বে 'ফিল্‌টার' করে নেওয়া আবশ্যক।

সময়ে সময়ে রজন, পিচ্, গাটাপার্চ্চা, সিলাজতু, রবাব জাতীয় পদার্থ প্রভৃতি দ্রব্য ঘন লুব্রিক্যান্ট্‌রূপে ব্যবহার ক'রবার জন্য খনিজ তৈল ও তার্পিণ তৈলের মধ্যে দ্রবীভূত করা হয়।

ট্যালো, লার্ড, বাদাম তৈল, রেড়ীর তৈল প্রভৃতি দ্রব্যকে সাবানপদার্থে পরিণত ক'রে কিংবা চর্ব্বি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যকে যথাযোগ্য ভাগে মিশ্রিত ক'রে চর্ব্বিজাতীয় লুব্রিক্যান্ট্ প্রস্তুত হয়।

নিম্নে উহা প্রস্তুতকরণের কতকগুলি হিসাব দেওয়া হ'ল:—

	টা	আ	পা
এক সের মাটন্ ট্যালো	০	৫	০
অর্দ্ধ সের বীফ্ ট্যালো	০	২	০
দশ সের রেড়ীর তেল	৩	০	০

সুতরাং মোট ১১½ সের মালের খরচ পড়ল তিন টাকা সাত আনা। সের পিছু তা'হলে খরচ পড়ল চার আনার উপর।

(২) অপর একটি হিসাব ঃ—

	টা	আ	পা
ট্যালো ১৮ সের	৭	১	০
Rapeseedএর তেল ১২ সের	৫	৮	০
কাপড়কাচা সোডা ২ সের	০	৫	০
জল ৩৬ সের			

মোট ৬৮ সের মালের খরচ পড়ল ১৩ টাকা ১৫ আনা। সুতরাং সের পিছু উৎপাদন খরচ চার আনার কম পড়ল।

(৩) অপর একটি হিসাব ঃ—

ট্যালো	—	২৬০	ভাগ
রেপ্‌বীজের তেল	—	৫৫	,,
সোডা	—	২০	,,
জল	—	৩৪০	,,

খরচ কমাবার জন্য উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় রেপ্‌বীজের তেলের বদলে রেড়ীর তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমে সোডাকে জলের মধ্যে গুলে তারপর সেই মিশ্রিত পদার্থকে কড়ায় করে ট্যালো ও তেলের সঙ্গে ফোটাতে হয়।

(৪) আর একটি হিসাব ঃ—

সস্তা দামের ষ্টিরিন্	—	৫	ভাগ
বাদাম তেল	—	২৫	,,
তিল্ তেল	—	৭০	,,
জল	—	১১০	,,
কস্‌টিক্ পটাশ	—	৯	,,

(৫) আর একটি হিসাব ঃ—

শিলাজতু	—	৩২	ভাগ
কাল পিচ্	—	৮	,,
খনিজ তার্পিণ বা পেট্রোলিয়াম	—	৮	,,
Litharge	—	৮	,,
জল	—	৮০	,,

শিলাজতু ও পিচ্‌কে প্রথমে গলানো হয় এবং পরে পেট্রোলিয়াম মিশ্রিত করে মিশ্রিত পদার্থকে অর্দ্ধ-তরল অবস্থায় দাঁড় করাতে হয়। তারপর Litharge মিশ্রিত ক'রে একটু একটু ক'রে জল ঢেলে সমস্ত দ্রব্যগুলিকে উত্তমরূপে ঘাঁটিতে হয়। পেট্রোলিয়াম পদার্থের কম বেশী মিশ্রণের ওপর দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ভর করে।

তরল লুব্রিক্যাণ্ট্ পদার্থ

আমেরিকায় পেট্রোলিয়ামের ফ্র্যাক্‌সনাল্ (Fractional distillation) দ্বারা তরল লুব্রিকেটিং পদার্থ প্রস্তুত হয় (দৃষ্টান্তস্বরূপ Vulcan oil, Globe oil প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে)। চর্ব্বিজনিত লুব্রিক্যাণ্ট্ অপেক্ষা খনিজ লুব্রিক্যাণ্ট্ অধিক কার্য্যোপযোগী; কেননা তাতে চর্ব্বিযুক্ত এ্যাসিড্ না থাকার দরুণ তা' মেসিনের ধাতব অংশগুলিকে ক্ষয় করতে পারে না।

নিম্নে কতকগুলি তরল লুব্রিক্যাণ্টের ফরমুলা দেওয়া গেল ঃ—

১ম

oleic acid বা olein	—	৯০	ভাগ
পেট্রোলিয়াম্	—	১০	,,

২য়

oleic acid	—	১০০ ভাগ
গ্লিসারিন	—	৫০ ,,

৩য়

oleic acid	—	১০০ ভাগ
guaican oil	—	২০ ,,

৪র্থ

গ্লিসারিন্	—	১০০ ভাগ
পেট্রোলিয়াম্	—	১০ ,,

৫ম

গ্লিসারিন্	—	১০০ ভাগ
অলিভ তেল	—	৫০ ,,

নিম্নলিখিত পদার্থ গুলির সংমিশ্রিত দ্রব্য ও কারখানায় তরল লুব্রিক্যান্ট হিসেবে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে :—

১।	অলিভ তেল	৩ ভাগ
	বাদাম তেল	২ ,,
	রেপ্ বীজের তেল	১ ,,

—✣—

২।	নারিকেল তেল	১ ভাগ
	তিসির তেল	১ ,,
	কেরোসিন তেল	৩ ,,

উক্ত ১নং প্রক্রিয়ার দ্রব্যগুলিকে চর্ব্বিযুক্ত এ্যাসিড হ'তে মুক্ত রাখবার জন্য এ্যাল্‌কোহল্ সাহায্যে পরিশুদ্ধ করতে হয় এবং ২নং প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পদার্থকে ব্যবহারের পূর্ব্বে ফিল্‌টার ক'রে নিতে হয়।

পালিশ

পালিশ পর্য্যায়ে আমরা এখানে জুতার পালিশ, চামড়ার পালিশ, ধাতব দ্রব্যের পালিশ প্রভৃতির আলোচনা করব।

জুতার পালিশের সরঞ্জাম হিসাবে স্বাভাবিক মোম, সেলাক্-রঞ্জন ইত্যাদি, সোহাগা, ভেজলিন, গ্লিসারিন ইত্যাদি, তারপিন ও কেরোসিন তৈল এবং রং করবার জন্য বিভিন্ন পদার্থ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা এখানে ব্যাপক ভাবেই আলোচনা করছি, জুতার পালিশ ও জুতার ক্রীমে প্রভেদ রাখিনি। জুতার পালিশ অর্থে সমস্ত জুতা এবং অপরাপর চামড়ার দ্রব্যকে চক্‌চকে করবার পদার্থকেই আমরা ধরেছি। নিম্নে আমরা জুতার পালিশের কতকগুলি ফরমুলা দিলাম :—

১ম—

মণ্ট্যান্ ওয়াক্স্ (Montan wax)		৩ ভাগ
কারনুবা ওয়াক্স্ (Carnuba wax)		১ ,,
Ceresine		৩ ,,
মৌ-মোম		১ ,,
ষ্টিরিন্		০·৭ ,,
পটাসিয়াম্ কারবনেট্	শতকরা	৫-১০ ,,
ঘন তারপিন তেল		১৫ ,,
কেরোসিন তেল		৫ ,,
Negrosene black (জলীয়)	শতকরা	১০ ,,
জল		১২ ,,

২য়—

I. G. O.		২ ভাগ
মণ্ট্যান্ ওয়াক্স্ (Montan wax)		১ ,,
কারনুবা ওয়াক্স্ (Carnuba wax)		১ ,,
মৌ-মোম		১ ,,
সাবান		০·৫ ,,
বার্নিশ		০·৫ ,,
Negrosene black	শতকরা	৭ ,,

৩য়—

মৌ-মোম্	১৫	,,
Ceresine	৫	,,
কারন্যাবা ওয়াক্স্ (Carnuba wax)	৫	,,
Pot. olein Soap	১০	,,
তারপিন তেল	৪৫	,,
কেরোসিন তেল	৫	,,

আবশ্যকীয় রং করার পদার্থ—যতটুকু প্রয়োজন।

৪র্থ—

কালো মণ্টান্ ওয়াক্স্ (Black Montan wax)	১০	,,
মৌ-মোম্	১	,,
কারন্যাবা ওয়াক্স্	৩	,,
I. G. O.	৩	,,
পটাসিয়াম কারবোনেট্	৪	,,

উপরোক্ত প্রথম ফরমুলায় ষ্টীরিনকে জলে গোলা পটাসিয়াম কারবনেটে ফেনিয়ে দিতে হয়। তারপর মোমগুলি গলিয়ে তার সঙ্গে মিশ্রিত করতে হয়। যদি জল বেশী হয়ে গিয়ে থাকে ত অতিরিক্ত জল বের করে দেবার জন্য সমস্ত পদার্থকে ফোটাতে হ'বে। অতঃপর অল্প উত্তাপের মধ্যে সমস্ত জিনিষটাকে তারপিন ও কেরোসিন তৈলের মধ্যে দ্রবীভূত করতে হয়। যে রংয়ের পালিশ প্রয়োজন সেই রং উপরোক্ত সাবান পদার্থ কিংবা জলের মধ্যে মিশ্রিত করলেই চলবে।

উপরোক্ত দ্বিতীয় ফরমুলায় বার্নিশ ও পেষ্ট-এ মিশুতে হয়। উক্ত পদার্থ পেষ্ট কিংবা ক্রীমের আকার ধারণ করে। Negrosene colour কে সাবানের সঙ্গে কিংবা গলিত মোমের সঙ্গে মিশ্রিত করতে হয়। সমস্ত পদার্থগুলি সাবধানতা সহকারে মিশুতে হ'বে; উত্তাপ যতটা পারা যায় পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।

উপরোক্ত ৩য় ফরমুলায় প্রাপ্ত পদার্থ ক্রীম জাতীয়। সেই মোমকে এলকোহলযুক্ত কস্‌টিক্ পটাশের সঙ্গে ফেনিয়ে নিতে হয়। প্রাপ্ত পদার্থের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হ'লে সেলাক্ কিংবা গঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপরোক্ত ৪র্থ ফরমুলায় মোমগুলিকে প্রথমে গলিয়ে তার সঙ্গে সাবান, কারবনেট্ ও জল একত্রে মিশ্রিত করতে হয়। অতিরিক্ত জল মৃদুভাবে ফুটিয়ে নিষ্কাশন করে দিয়ে উক্ত মিশ্রণকে পেষ্ট—' এ পরিণত করতে হয়। তারপরে কেরোসিন ও তারপিন মিশ্রিত করার নিয়ম। যদি প্রাপ্ত পালিশে দেখা যায় যে, অতিরিক্ত কারবনেট্ পদার্থ বর্ত্তমান রয়েছে তাহ'লে ষ্টিরিণ ও তারপিন সহযোগে তার সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার।

নিম্নে আরও দুইটি ফরমুলার বিবরণ দেওয়া গেল :—

ট্যালো	৪০	ভাগ
ইয়লো ওয়াক্স্	১০	,,
অলিভ তেল	১০	,,
তারপিন তেল	৫	,,
রং	৫	,,

এই ফরমুলানুযায়ী প্রাপ্ত পদার্থে যদিও

পালিশ ভাল হয় না তবুও এ ব্যবহার করলে চামড়া ভাল রাখা যায়।

I. G. O.	৪ ভাগ
পরিষ্কৃত মণ্ট্যান্ ওয়াক্স্ (Montan wax)	৫ ,,
Ceresine wax বা মৌ-মোম্	১ ,,
তারপিন তেল	২৫ ,,

এই ফরমুলানুযায়ী প্রাপ্ত পালিশে সাবান খার বা বার্নিশ কিছুই ব্যবহৃত হয় না। আমাদের দেশে এই পালিশ টিনে করে বিক্রীত হয়। অপরাপর দেশের আবহাওয়ার উপযোগী করবার জন্য ফরমুলায় আবশ্যকীয় অপর দ্রব্য যোগ করা যেতে পারে।

কাল জুতার পালিশের মশলা

নিম্নে কাল জুতার পালিশ তৈরী করবার দু'টী পৃথক ফরমুলা দেওয়া গেল :—

১ম—

গাটাপার্চ্চা	২০ ভাগ
অলিভ বা তিল তেল	৫০ ,,
গঁদ	২০ ,,
জল	১০০০ ,,
সিরাপ	১৫০০ ,,
Negrosene colour	যতখানি প্রয়োজন।

উক্ত তেলের সঙ্গে গাটাপার্চ্চাকে ফুটিয়ে তাতে জলে গোলা গঁদ মিশুতে হয়। মিশ্রিত পদার্থকে উত্তমরূপে ঘেঁটে তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় রঙ্‌যুক্ত সিরাপ মিশ্রিত করতে হয়।

২য়—

Bone black	১০ ভাগ
সিরাপ	১০ ,,
সালফিউরিক এ্যাসিড	৫ ,,

মাছের তেল বা ওলিন্ (Olein) ২০ „
জল ৪ „
কাপড় কাচা সোডা ২ „

উক্ত পালিসকে ঘন কিংবা পাত্‌লা করতে গেলে তেলের পরিমাণের তারতম্য করতে হয়। 'বোন্ ব্ল্যাক্' ও সালফিউরিক্ এসিড্ মিশিয়ে খুব ভাল করে ঘাঁটতে হয়, তা' না হলে ডেলা পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে: জিনিষ যদি ভাল করতে হয় তবে সিরাপের বদলে গ্লিসারিন ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

কাঠের পালিশের মসলা

নিম্নে কাঠের পালিস তৈরী করবার দু'টি ফরমুলা প্রদত্ত হ'ল:—

১ম:—

গাম্ স্যাণ্ডারাক্ (Gum Sandarac) ১২ ভাগ
সেলাক্ (Shellac) ৬ „
গাম্ ম্যাষ্টিক (Gum Mastic) ৬ „
গাম্ এলিমি (Gum Elemi) ৩ „
স্পিরিট ১৫০ „
তারপিণ তেল ৬ „

২য়:—

গাম্ স্যাণ্ডারাক্ (Gum Sandarac) ১৭ ভাগ
গাম্ ম্যাষ্টিক্ (Gum Mastic) ৮½ „
স্পিরিট ২২৭ „
রজন ও তারপিণের মিশ্রণ ৩০ „

ধাতব পালিশ

নিম্নে ধাতুদ্রব্যের পালিশের দু'টি ফরমুলা প্রদত্ত হল:—

১ম:—

Ceresine Wax ৬ ভাগ
Olein ৪৪ „
Flint Chalk ৫০ „

উপরোক্ত মশলা মিশ্রিত দ্রব্য পেষ্ট্ এর মত হয়:—

২য়:—

এ্যামোনিয়াম্ ওলিন (Olein) সোপ্ ৩০ „
বা সোডিয়াম্ কিংবা পটাসিয়াম্ ওলেট্
(Oleate) মিহি চীনে মাটী ২০ „
Double Precipitated Chalk ১৫ „
পাতলা পেট্রোলিয়াম ৫০ „

উপরোক্ত মশলা মিশ্রিত পালিশ তরলাকারের এবং ব্যবহারের পূর্ব্বে ভাল করে নেড়ে নিতে হয়।

জাপানী প্রতিযোগীতায় ভারতীয় শিল্পের সর্ব্বনাশ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

ভারতীয় মোট উৎপাদন পরিমাণ কত তা' সঠিক জানা যায় না, তবে মনে হয় যে ভারতীয় বাৎসরিক উৎপাদন পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা। ভারতের বড় বড় দু'টি কারখানার ১৯৩৬-৩৭ সালের উৎপাদনের পরিমাণ হ'ল যথাক্রমে ৪ লক্ষ টাকা এবং ৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। উক্ত দুটি কোম্পানীর সর্ব্বোর্চ্চ উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ১২ লক্ষ টাকার ও ৯ লক্ষ টাকার।

নিম্নে বিদেশী এনামেল দ্রব্যের আমদানীর একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

	১৯৩৪-৩৫ টাকা	১৯৩৫-৩৬ টাকা	১৯৩৬-৩৭ টাকা
জাপান থেকে	৯,৬৩,৮৯২	১১,০৫,৫২৪	৮,৮৩,৫৪৬
অপরাপর দেশ থেকে	৭,৮৬,৯০৫	৭,৯২,৯৪৫	৫,৯৭,৩৮৫
মোট—	১৭,৫০,৭৯৭	১৮,৯৮,৪৬৯	১৪,৮০,৯৩১

ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে কোন এনামেল দ্রব্য রপ্তানী হয় না, তবে এনামেলের সাইন বোর্ড সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষে এনামেল শিল্পে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার মূলধন লগ্নী আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুটি বড় বড় কোম্পানীতে যথাক্রমে ৪ লক্ষ টাকা এবং ৩ লক্ষ টাকার মূলধন খাটছে।

ভারতের এনামেল শিল্পে মোট কত সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত আছে এবং তারা মোট কি পরিমাণ মজুরী পেয়ে থাকে মেমোরেণ্ডামে তার উল্লেখ নেই। তবে উক্ত দু'টি কোম্পানীতে কত সংখ্যক লোক খাটে এবং তারা কি পরিমাণ মজুরী পায় নিম্নে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

১ম কোম্পানী :—

	নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা	বাৎসরিক মজুরী হাজার টাকা
সাধারণ শ্রমিক	৫০০	৭০
দক্ষ শ্রমিক	১৫০	২৮
তত্ত্বাবধায়ক ষ্টাফ্	১০	১০

২য় কোম্পানী :—

		হাজার টাকা
সাধারণ শ্রমিক	২৫০	৪০
দক্ষ শ্রমিক	৮৫	১৪
তত্ত্বাবধায়ক ষ্টাফ্	১৫	৬

উক্ত ১ম কোম্পানী ২৪ এবং ২৮ সেন্টী-মিটারের কাপ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণী প্রদান করেছেন—১৯৩৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ওদের বিক্রয় মূল্য ছিল ডজন পিছু ২ টাকা। উৎপাদন মূল্য ছিল ১৸৴০ আনা; কারবারের ঝড়্তি পড়তি ও মূলধনের সুদ হিসাবে ডজন পিছু এক আনা ধরা হত। তাহ'লে ঐ সময়ে এক ডজন কাপ বিক্রয় করে কোম্পানীর লাভ থাকত এক আনা মাত্র।

১৯৩৭ সালে জুন মাসে অর্থাৎ ছয় মাস পরে উক্ত কাপের বিক্রয় মূল্য দাঁড়ায় ডজন পিছু ১৸৶০ আনা। ঐ সময়ের উৎপাদন মূল্য হচ্ছে ২।০ আনা। কারবারের ঝড়তি পড়তি শতকরা ২৲ টাকা এবং মূলধনের সুদ হিসাবে শতকরা ১৲ টাকা ধরলে ঐ সময়ে উক্ত কোম্পানীর এক ডজন কাপ বিক্রয় করে লোকসান যায় ছয় আনা। এই লোকসানের একমাত্র কারণ কাঁচা মালের মূল্য বৃদ্ধি হেতু উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়া। অথচ ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা না থাকার দরুণ কোম্পানী দ্রব্যের দর বাড়াতে পারেন নি, বরং অত্যধিক প্রতিযোগীতা হেতু ডজন পিছু দর এক আনা কমাতে বাধ্য হয়েছিলেন। উক্ত কোম্পানী ২৪ থেকে ২৮ সেণ্টিমিটারের ব্যাস বিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদনের দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন, কারণ ঐ আকারের জাপানী দ্রব্যের ওপর শতকরা ১০০৲ টাকা ডিউটি নিয়োজিত আছে; কিন্তু অপরাপর আকারের দ্রব্যের ওপর মাত্র শতকরা ৩০ থেকে ৪০ টাকা ডিউটি নিয়োজিত আছে। সে ক্ষেত্রে কোম্পানীর

পক্ষে প্রতিযোগীতায় দাঁড়ানো মোটেই সম্ভব নয়, বস্তুতঃ যে সমস্ত জাপানী দ্রব্যের ওপর শতকরা ১০০৲ টাকা হারে ডিউটি ধার্য্য নেই, তাদের সঙ্গে দেশী দ্রব্যের প্রতিযোগীতায় দাঁড়ানো কষ্টকর।

উক্ত ব্যাপার সম্পর্কে ২য় কোম্পানী নিম্নরূপ বিবরণ প্রদান করেছেন :—

তারা ২৪, ২৬, ২৮, সেন্টীমিটারের নানা রকম কাপ, থালা বাসন ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। তাদের ডজন পিছু উৎপাদন খরচা পড়ে ১৸৶৫. কারবারের ঝড়তি পড়তির দরুণ ধরা হয় তিন পয়সা এবং ২ টাকায় বিক্রয় করলে ডজন পিছু এক আনা লাভ থাকে। এই লাভ তাদের সম্ভব হয় কেবল মাত্র উক্ত আকারের জাপানী দ্রব্যের ওপর চড়া হারে ডিউটি নিযুক্ত থাকার দরুণ। কিন্তু তাদের ছোট ছোট দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য ভয়ঙ্কর লোকসান খেতে হয়, কেননা, উক্ত দ্রব্যের ওপর চড়া হারে ডিউটি ধার্য্য নেই।

২৷৩ লক্ষ টাকার মূলধন নিয়ে নামলে ভারতে মোটামুটি একটা এনামেল দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করা যায়। উক্ত কারখানায় বাৎসরিক ৭।৮ লক্ষ টাকার মাল উৎপাদিত হ'তে পারে।

নিম্নে ২৪, ২৬ ও ২৮ সেন্টিমিটারের জাপানী দ্রব্যের মূল্য ও অনুরূপ ইউরোপীয় দ্রব্যের মূল্যের একটা তালিকা দেওয়া গেল।

সাল	আমদানী জাপানী দ্রব্যের মূল্য	ইউরোপীয় দ্রব্যের মূল্য
	ডজন	ডজন
জুলাই ১৯৩৪	১৶০	২।০
জানুয়ারী ১৯৩৫	১৵০	২৶০
জুলাই ১৯৩৫	৸৶০	২৲
জানুয়ারী ১৯৩৬	৸৶০	২৲
জুলাই ১৯৩৬	৸৶০	২৲
জানুয়ারী ১৯৩৭	১৵০	২৶০
জুন ১৯৩৭	১৵০	২।০

এনামেল শিল্পে আবশ্যক কাঁচা মালের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ ভারতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কালি, চীনামাটী, Felsper, Indian Quartz প্রভৃতি প্রধান। লোহার থালার মধ্যে টাটা কিছুটা যোগান দেয়।

সব শেষে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, জাপানী দ্রব্যের ওপর আরও ডিউটি ধার্য্য করলে গরীব ক্রেতাদের ওপর চাপ পড়বে কিনা? প্রাথমিক দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই পড়বে। কিন্তু জাপানী দ্রব্যের চেয়ে দেশী দ্রব্য ঢের বেশী টেঁকসই—সুতরাং দর বেশী দিয়ে দেশী দ্রব্য কিনলে আসলে ক্রেতারা লাভবানই হ'বেন।

উপরিলিখিত শুল্কের হার থেকে এ জিনিষটা বেশ পরিষ্কার হ'বে যে, ২০ সেন্টি-মিটারের অধিক ব্যাস বিশিষ্ট থালা বাসন অপেক্ষা ২০ সেন্টীমিটারের কম ব্যাস বিশিষ্ট থালা বাসনের ওপর শুল্কের হার কম। সুতরাং ভারতীয় এনামেল ব্যবসায়ীরা ৫০ সেন্টীমিটারের অধিক ব্যাস বিশিষ্ট থালা বাসনের উৎপাদনের প্রতিই বেশী নজর দিয়াছিলেন। কারণ, ২০ সেন্টিমিটারের কম ব্যাসবিশিষ্ট থালাবাসনের ওপর শুল্ক কম থাকার দরুণ দেশী জিনিস কিছুতেই জাপানী-দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় দাঁড়াতে পারছে না। কাজে কাজেই ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ ২৪ সেন্টিমিটারের

ওপর ব্যাসবিশিষ্ট থালাবাসনের উৎপাদনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়, এবং তাঁদের সে-প্রচেষ্টা কতকটা সফল হয়। যদিও সঠিক হিসাব-নিকাশ কিছু পাওয়া যায় না, তবুও মনে হয় ২৪ সেন্টিমিটারের ওপর ব্যাস-বিশিষ্ট থালাবাসনের আমদানী হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু তাতে কার্য্যতঃ এনামেল শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নি, কেননা, ২৪ সেন্টিমিটারের অধিক ব্যাসবিশিষ্ট থালা-বাসনের উৎপাদনের লাভ দেখে সমস্ত কোম্পানীই সেইধারে মনোনিবেশ করে। ফলে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগীতার দরুণ উক্ত কোম্পানীগণ ভয়ঙ্কর কম দরে, এমন কি উৎপাদন-মূল্যের কমেও মাল ছাড়তে বাধ্য হয়। আবার এধারে জাপানের প্রতিযোগীতা রয়েছে; সেই প্রতিযোগীতার দরুণই ছোট থালাবাসনের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও ভারতীয় কোম্পানীগণ সেধারে মোটেই সুবিধা করতে পারেন নি। তাছাড়া ৩০ সেন্টিমিটারের অধিক ব্যাসবিশিষ্ট থালা বাসনের ব্যবসায়েও তাঁরা দাঁড়াতে পারছিলেন না।

কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ছোট সাইজের থালা বাসন এবং খুব বড় সাইজের থালা বাসনের ওপর বর্ত্তমানে যে হারে শুল্ক নিয়োজিত আছে তা' বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। নইলে, এনামেল শিল্প ক্রমশঃ ধ্বংস হ'য়ে যাবে। তা' ছাড়া মাঝারী আকারের থালা-বাসনের কারবারও বর্ত্তমানে জাপানী প্রতিযোগীতার জন্য মোটেই দাঁড়াতে সক্ষম হ'চ্ছে না। দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'বে। ২৪, ২৬, বা ২৮ সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট বড় জাপানী কাপগুলির বর্ত্তমান বিক্রয় দর হচ্ছে ১৲ টাকা ডজন। কিন্তু অনুরূপ দেশী জিনিসের কেবল উৎপাদন খরচ হচ্ছে ২।০ আনা ডজন। সুতরাং এমতাবস্থায় দেশী শিল্পের দাঁড়ানো যে একেবারে অসম্ভব একথা সবাই বুঝতে পারে। ফলে হয়েছে এই যে, ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন মূল্যের কমে লোকসান দিয়ে মাল বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে।

ঐ ত প্রতিযোগীতার দিকে বিপদের কথা। তা' ছাড়া এনামেল শিল্পের উন্নতির পথে আর একটি অন্তরায় আছে। প্রতি শিল্প ব্যাপারেই কাঁচা মালের প্রয়োজন হয়। এনামেল শিল্পের পক্ষে কাঁচা মালের শতকরা ৭৫ ভাগই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়, মাত্র ২৫ ভাগ দ্রব্য ভারতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিদেশী দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত ডিউটি চাপানো আছে, ফলে দেশী শিল্পের উৎপাদন-খরচ বেশী পড়ে। এনামেল শিল্পে প্রয়োজনীয় প্রধান দু'টি দ্রব্য হচ্ছে সোডা এ্যাস্ ও সোহাগা। কিন্তু ঐ সোডা এ্যাস্ ও সোহাগার ওপর যথাক্রমে শতকরা ৩০৲ টাকা ও ২৫৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য আছে। কিন্তু শুল্কব্যাপারের নানারকমের জটিলতার জন্য কার্য্যতঃ প্রায় শতকরা ৫০৲ টাকা শুল্ক লেগে যায়। সুতরাং এক্ষণে দেশী শিল্পের ওপর একটা ভয়ঙ্কর চাপ পড়ে। শুধু ঐ দু'টি বস্তু নয়, এনামেল-এর থালা বাসনের জন্য যে ইস্পাতের থালা ব্যবহৃত হয় তা' আমদানী করতে গেলেও অত্যধিক মাত্রায় ডিউটি দিয়ে তা' গ্রহণ করতে হয়। এধার দিয়ে দেশীশিল্পের একটা প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। অথচ জাপান যে কাঁচা মাল ক্রয় করে তাতে তার মোটেই এতবেশী খরচা পড়ে না। বস্তুতঃ দেশী ব্যবসায়ীদের চেয়ে জাপান শতকরা

৫০৲ থেকে ৯০৲ টাকা কম দরে কাঁচা মাল ক্রয় করে। সুতরাং চেম্বারের অভিমত হচ্ছে যে, এনামেল শিল্পের জন্য যে-সমস্ত দ্রব্য আমদানী করতে হয়, গভর্ণমেণ্ট যেন সে-সমস্ত দ্রব্যের শুল্কের ওপর একটা রিবেট্ প্রদান করেন। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই রিবেট্ প্রদানে এই আপত্তি যে তাতে করে, তাঁদের শুল্কবিভাগের আয় কমে যাবে, কেননা, সকলেই এনামেল শিল্পের রিবেটের দোহাই দিয়ে শুল্ক ফাঁকী দিতে চেষ্টা করবে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই সোডা এ্যাস্ ও সোহাগার ওপর একটা রিবেট দেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। আর ইস্পাতের থালার ওপর ডিউটি কমাতে তাঁদের কোন আপত্তি থাকতে পারে না এইজন্যই যে, এনামেল শিল্পের জন্য যে ইস্পাতের থালা ব্যবহৃত হয় তা' আর কিছুতে ব্যবহৃত হয় না—সুতরাং এনামেল শিল্পের দোহাই দিয়ে শুল্ক ফাঁকী দেওয়া সম্ভব নয়।

ভারতীয় ও জাপানী ব্যবসায়ীদের উৎপাদন খরচের তুলনা করবার জন্য নিম্নে ভারতীয় ও জাপানী ব্যবসায়ীগণের কাঁচা মালের ক্রয় মূল্যের একটা তালিকা প্রদত্ত হ'ল :—

কাঁচামাল	ভারতীয় ক্রয়মূল্য	জাপানী ক্রয়মূল্য
সোহাগা	১২৲	৪॥০
সোডা এ্যাস্	৬॥০	৩।০
সোডা নাইট্রেট	৬।০	৩॥০
এ্যাণ্টিমনি	৪৮৲	১৮৲
ক্রাওলাইট (Cryolite)	৪৫৲	৩০৲

তা' ছাড়া ইস্পাতের থালার জন্য জাপানকে কোন ডিউটি দিতে হয় না।

সুতরাং চেম্বারের অভিমত হচ্ছে যে, ভারতীয় এনামেল শিল্পকে রক্ষা করতে গেলে (ক) অতিরিক্ত শতকরা ৩০৲ টাকা হারে শুল্ক নিয়োজিত করা প্রয়োজন। কিংবা জন পিছু ছয় আনা এবং তাছাড়া ১১ সেণ্টিমিটার অতিক্রম করলে ২ সেণ্টিমিটার বা তার অংশ পিছু ২ আনা ধার্য্য করতে হ'বে। (খ) অতিরিক্ত শতকরা ৩০৲ টাকা কিংবা ডজন পিছু চৌদ্দ আনা; তাছাড়া ২৮ সেণ্টিমিটার অতিক্রম করলে প্রতি ২ সেণ্টিমিটার বা তার অংশ পিছু তিন আনা শুল্ক ধার্য্য করা উচিত।

নিম্নে এনামেল শিল্প সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য দেওয়া গেল—চেম্বারের মেমোরাণ্ডাম থেকে এগুলি সংগৃহীত হয়েছে :—

এনামেল কারখানার প্রধান কেন্দ্র হ'ল কলিকাতা এবং বোম্বাই। তাছাড়া মাদ্রাজ, লাহোর, অমৃতসহর, আলিগড়, বরোদা প্রভৃতি যায়গায় ছোট ছোট কারখানা আছে। এনামেলের বাজার ভারতের সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে আছে।

সমাপ্ত।

বাংলার কুটিরশিল্প

সতরঞ্চি বয়ন-শিল্প

রংপুর সদর মহকুমার নেশবতগঞ্জ নামক অঞ্চলের অন্তর্গত পার্ব্বতীপুর, পরিজাবাদ, দামোদর ও বড়বাড়ী গ্রামে সতরঞ্চি প্রস্তুত হয়। বয়নকার্য্যে ৮, ৯, ও ১০ নম্বরের সূতা ব্যবহৃত হয়। সূতা স্থানীয় বাজার হইতে ক্রয় করা হয়। বয়নকারীরাই সূতা রং করিয়া থাকে। ইহারা নিজেরাই নীলের চাষ করে। কৃষিই মুসলমান শিল্পীদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। এই কার্য্যে ৩৫ কি ৪০ জন লোক নিয়োজিত আছে। বৎসরে প্রায় ৬,৫০০ পাউণ্ড সূতা ব্যবহৃত এবং ৯,০০০ টাকা মূল্যের সতরঞ্চি প্রস্তুত হয়। ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্ডার অনুসারে সতরঞ্চি তৈয়ার হয়, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় ইহার আর তেমন চাহিদা নাই। অন্যান্য প্রদেশে প্রস্তুত অধিকতর সুলভ মূল্যের সতরঞ্চি আমদানী হওয়ায় এই সতরঞ্চির বিক্রয় ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

রেশম-শিল্প

গাইবান্ধা মহকুমার কারিপুর, সুন্দরগঞ্জ এবং বেল্‌কায় এড়ির কাপড় প্রস্তুত হয়।

চুরুট-শিল্প

সদর মহকুমা—চেংমারি গ্রাম—এই গ্রামে এক ব্যক্তি কৃষিবিভাগের প্রেরিত ডিমন্‌ষ্ট্রেটারের নিকট হইতে চুরুট প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া পরিবারস্থ লোকজনের সাহায্যে চুরুট তৈয়ার করিতেছে। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১৫০০ চুরুট প্রস্তুত হয় এবং এই সকল চুরুট স্থানীয় বাজারেই বিক্রয় হইয়া যায়। এই শিল্প এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই এবং প্রস্তুত চুরুটও উৎকৃষ্ট হয় না। এই শিল্পের উন্নতির জন্য এবং চুরুট বিক্রয়ের ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

পাট-শিল্প

নীলফামারি মহকুমার গৃহস্থপরিবারের অনেক লোকে এই শিল্পের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক। গয়াবাড়ী ও নিদাশে গ্রামে কতিপয় বাড়ীতে পাটের সূতা ও চট প্রস্তুত হয়। চট কম্বলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। শীতকালেই চট অধিক পরিমাণে তৈয়ারী হয় এবং অধিকাংশই বোরাগারী, সাথীবাড়ী এবং নৌতারার হাটে বিক্রয় হয়। বৎসরে ১৫ হাজার হইতে ২০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত চট বিক্রয় হয় এবং ইহাদের মূল্য ও ১৮ হাজার হইতে ২৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অর্ডার দিলে অতি সূক্ষ্ম সূতা দ্বারা প্রস্তুত চটও পাওয়া যায়। সাধারণ চট এক খানার দাম ১৲ টাকা হইতে ১॥০ টাকা পর্য্যন্ত। শিল্পীরা পাটের সূতা বা কাঁচা পাট কিনিয়া চট প্রস্তুত করে এবং তৈয়ারী মাল স্থানীয় হাটে বিক্রয় করে।

হস্তিদন্ত ও শৃঙ্গ-শিল্প

পূর্ব্বে পাচগ্রাম খাণ্ডিকার পাড়ায় (পাঙ্গা) ১৬।১৭ জন কারিকর হস্তিদন্ত, শৃঙ্গ ও কাঠের কারুকার্য্য করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সকল শিল্প মৃতপ্রায়। এখন কেবল তিনজন লোক বৎসরে দুইমাস কাঠের খড়ম এবং শিং এর চুড়ি ও বালা তৈয়ার করে এবং অবশিষ্ট সময়

কৃষিকার্য্য করে। এখন তাহাদের নিকট হস্তিদন্ত নির্ম্মিত সুন্দর জিনিষের নমুনাও পাওয়া যায় না।

পিত্তল-শিল্প

ডোমার থানায় এবং নীলফামারী জলঢাকা থানার অন্তর্গত ঝুনাগাছ চাপমণিতে পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হয়।

চর্ম্ম-শিল্প

রংপুর সহরে প্রায় ৫০ জন চর্ম্মকার পাদুকা প্রস্তুত করে। বৎসরে প্রায় ৭ হাজার জোড়া জুতা প্রস্তুত হয়। চামড়া কলিকাতা হইতে আনা হয়। চর্ম্মকারেরা বিহারের আরা জেলাবাসী।

কাষ্ঠ-শিল্প

সদর মহকুমার অন্তর্গত বাগদুয়ারে কাঠের বাসন প্রস্তুত হয়।

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

পত্র লেখকগণের প্রতি

(যাঁহারা গ্রাহক নহেন)

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাঁহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, অথচ বিনামূল্যে এমন সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন যাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তাঁহাদের মতলব, **"একটি হরিতকীও গুরুদক্ষিণা দিব না,—কিন্তু মন্ত্রটি আদায় করিয়া নিব"।** এই রকমের লেখকদিগকে আমরা জানাইতেছি, ব্যবসায়ীর সন্ধান এবং মাল পত্র বেচা-কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাঁহারা এক একটা মালের জন্য এক এক বারের কেনা বেচায় শ' দু'শ হইতে হাজার বা ততোধিক টাকা দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও

নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্য ৫।৵০ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হইলেই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা মোটা দালালী দিতে অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ, এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,—ন্যাও,—ন্যাও,—ফ্যাল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাঁকতালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,—অথচ তার জন্য একটী পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ, এই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

১৭ বৎসর যাবৎ কার্য্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি, গোড়াতে ফাঁকিবাজীর মতলব, বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে একটা প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য আমাদের অনুরোধ, যাঁহারা সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা **আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।** যাঁহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-শুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান মুফতে দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে এই যে, তাঁহারা যথেষ্ট লাভবান এবং উপকৃত হইয়াছেন, আর আমরা লাভবান হওয়া ত দূরের কথা, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাঁহাদের পেট ভরাইয়াছি। কিন্তু সহের একটা সীমা আছে। এই জন্য অতঃপর গ্রাহক না হইলে কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।

যাঁহারা গ্রাহক আছেন

আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহকগণ আমাদিগকে নানাবিধ ব্যবসায়সংক্রান্ত পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সকল প্রশ্ন করেন তাহার উত্তর ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিনা মূল্যেই প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ঐ সকল পত্রের অধিকাংশই উদ্দেশ্যবিহীন বৃথা প্রশ্নে পরিপূর্ণ। অনেকেই কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান। বাস্তবিক কোন কাজকারবারে হাত দিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। তাঁহাদিগকে জানাইতেছি, আমরা তাঁহাদের জন্য বাজারে ঘুরিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া নানা রকমের সংবাদ সংগ্রহ করি; যদি তাঁহারা সে সকল কোন কাজে না লাগান, তবে আমাদের শুধু শুধু হয়রান এবং অর্থ ব্যয় করান কেন? তাঁহাদের নিকট অনুরোধ, যেন খামকা আমাদিগকে প্রশ্ন না করেন এবং আমাদের নিকট হইতে যে সন্ধান, সংবাদ অথবা পরামর্শ পাইয়া থাকেন তাহা যেন যথার্থ কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া নিজেরাও লাভবান্ হয়েন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিশ্রমকেও সার্থক করেন।

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মারফতে দিতে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, আমরা সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথকভাবে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র জোগাড় করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি **আমাদের যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ৫৲ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন।** গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে এই ফি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদিগের কাগজেই **বিনা মূল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিকে** প্রদান করিব। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক নম্বর পাঠানো চাই।**

১নং পত্র

মহাশয়,

আপনার মাসিক পত্রিকার ১৩৪৪ বাং সনের জন্য আমাকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন। ভিঃ পিঃ ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাইবেন এবং আমার নিম্নলিখিত বিষয় গুলির উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন। আমি আপনার সহিত নিম্নলিখিত জিনিষগুলির ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক; যদি আপনার নিজের দরকার না থাকে তবে কোথায় কাহার সহিত এই ব্যবসা করা চলে তাহাদের ঠিকানা জানাইয়া দিবেন।

১। শটীর মূল যাহা দিয়া শটীর পালো তৈয়ার করা হয়। প্রতি মণ কত।

২। শতমূলী প্রতি মণ ,,

৩। ঝিনুকের খোল বা আবরণ কত

৪। অশোক ছাল ,, ,,

৫। তেঁতুল (পাকা) ,, ,,

৬। মেষের লোম ,, ,,

৭। মানুষের চুল ,, ,,

৮। পাখী মোরগের সুন্দর রঙ্গিন পালক প্রতি সের কত।

৯। নারিকেলের ছোবড়া প্রতি মণ কত।

ইতি নিবেদক
শ্রীআবিদর রহমান
সুপারভাইজার
কো-অপারেটীভ্ সোসাইটী
সুখচাইল পোঃ
ত্রিপুরা

১নং পত্রের উত্তর

আপনি যে সকল জিনিসের কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার বেচা-কেনার কারবার করি না। আপনার পত্রের মর্ম্ম

আমরা এই পুস্তকের "ব্যবসার সন্ধান" নামক অধ্যায়ে প্রকাশ করিলাম। তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িগণ ইচ্ছা হইলে সোজাসুজি আপনার নিকট চিঠি লিখিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত আমরা আপনাকে কয়েকটী সন্ধান দিতে পারি,—

(১) শঠির পালো যাহারা তৈয়ারী করে, তাহাদের ঠিকানা এই,—অমূল্যধন পাল ১১৩। ১১৪ খেংরাপটি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; নির্ম্মল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ ২৫।১।২ গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা ; পি, সি, পাল এণ্ড কোং ১৩নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা ; আর, সি, চক্রবর্ত্তী, ১০৫ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনাথ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, ২নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।

(২) ও (৪) শতমূলী এবং অশোক ছাল কবিরাজ ও ঔষধ প্রস্তুত কারকগণ কিনিতে পারেন। তাহাদের কয়েকটী ঠিকানা এই।—শক্তি ঔষধালয় স্বামীবাগ, ঢাকা। ঢাকা আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী, ঢাকা। কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস্, কল্পতরু প্যালেস, চিত্তরঞ্জন য়্যাভেনিউ কলিকাতা। সি কে সেন এণ্ড কোং লিঃ, ২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ। শ্যামাদাস ঔষধালয় গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৩) বোতাম তৈয়ারীর কারখানায় ঝিনুক বিক্রয় করিতে পারেন তাহাদের কয়েকটী ঠিকানা এই,—B. L. Mitra & Bros. Barapara, Dacca. Bengal Industrial Cottage 40 Kapurinagar Road, Faridabad, Dacca.

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে প্রায় ২০টী কারখানা আছে। সকলে আবার ঝিনুকের বোতাম করে না। সুতরাং আপনার উচিত ঢাকা যাইয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া খদ্দের ঠিক করা। আপনার ত্রিপুরা জিলা হইতে ঢাকা বেশী দূর নহে। তাহা ছাড়া যশোহরের বিখ্যাত Jessore Comb and Celluloid Works সম্প্রতি বোতাম তৈরী করার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে এক নূতন কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

(৫) আচার ও চাটনী প্রস্তুতকারকেরা তেঁতুল কিনিতে পারেন। তাহাদের কয়েকটি ঠিকানা এই,—

Daw Sen & Co. 29, South Road Entally Calcutta. Great Estern Preserving Works, 83/C South Road Entally, Calcutta. Sreekissen Dutta & Co, 33/2 Middle Road Entally, Calcutta. M. L. Burman 6/1 Bala-ram Dey Street, Calcutta.

তাহা ছাড়া খুব বেশী পরিমাণে Shipment করার মত যদি সরবরাহ করিতে পারেন তবে Exporter দের নিকট পাঠাইতে পারেন।

(৬) মেষের লোম আপনি কি পরিমাণ Exporterদের নিকট বেচিতে পারেন ? প্রয়োজন হইলে তাহার সরবরাহ করিতে পারিবেন কিনা জানি না। নাম ঠিকানাও দিতে পারি গ্রাহক হইলে। সামান্য পরিমাণে ইহার বেচাকেনা বাংলা দেশে হয় না। পশমের কারখানা অধিকাংশই পশ্চিমভারতে। বাংলাদেশে ঢাকা, আলীপুর ও ভাগলপুর জেলে মেষের লোমে কম্বল তৈয়ারী হয়। এই সকল স্থানে সেণ্ট্রাল জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট

চিঠি লিখিয়া জানিবেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ফার্ম্মেও চিঠি লিখিতে পারেন।

D. S. Bist & Sons Po. Berinag Dt. Almora. Karim Bux & Elahi Bux Bros. 58/3 Canning Street. Calcutta Musa & Rohamali, Chowkbazar, Darjeeling. Dharamsi Morarjee Wollen Mills. Sudama House, Ballard Estate, Bombay. A. N. Malik & Son, Rowalpindi & Ambala.

(৭) মানুষের চুল,—লম্বা হইলে উহা পরচুলা (থিয়েটার, যাত্রা অথবা সিনেমা অভিনেতাদের সাজের জন্য) তৈয়ারীর কাজে লাগে। চিৎপুর রোডে অনেক দোকানদার আছে উহারা কেনে। ছোট ছাঁটা চুল হইলে উহা তাপসংরক্ষক নানা প্রকার প্যাকিং এর জন্য ব্যবহার হয়।

(৮) মুরগীর পালক গদী তৈয়ারীর জন্য প্রয়োজন। কলিকাতার চাঁদনী ও হগ সাহেবের বাজারে ইহার অনেক খদ্দের আছে। এই সবের জন্য আপনাকে কলিকতায় আসিয়া খদ্দের ঠিক করিতে হইবে। কারণ কুটীর শিল্প হিসাবেই এই সবের চলন বেশী। সুতরাং অনেক খুঁটীনাটী অনুসন্ধান ও কথাবার্ত্তার প্রয়োজন।

(৯) নারিকেলের ছোবড়া দড়ী, কাছি, ম্যাট প্রভৃতি বুনা এবং গদী তৈয়ারীর জন্য দরকার হয়। এতদ্ব্যতীত দড়ি, পা-পোষ, বুরুশ প্রভৃতি জিনিষ তৈয়ারীও এই ছোবড়া হইতে হয়। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য কোন কারখানা নাই। ইহার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখিবেন,—Empire Coir Works Allepy, Travancore: Indian Coir Manufacturing Co. Allepy, Travancore. John D' Cruz's Croi Factory Palluruthi, Cochin. Tillaparamba Coir yarn Works, Calicut, Malabar.

২ নং পত্র

মহাশয়,

আকন্দের পাট ও তুলার এবং ওলট কম্বলের পাটের খরিদ্দার আপনার সন্ধানে কে কে আছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে উপকৃত হইব। আমি তাঁহাদের সঙ্গে সরাসরি পত্র ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। ইতি—

নিবেদক

শ্রীহেমরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়।

(গ্রাহক সংখ্যা ৫৯০৭)

মেকুলি বন্দ চা বাগান।

মনতলা। (শ্রীহট্ট)

২ নং পত্রের উত্তর

আকন্দের পাট অথবা ওলট কম্বলের পাট বলিতে কাঁঠালের আমসত্ব বুঝায়। আপনি বোধহয় আকন্দ গাছের আঁশ ও ওলট কম্বলের আঁশের কথা বলিতেছেন। ইহাদের কোন বাজার বা খরিদদার নেই। ওলট কম্বল কবিরাজী ঔষধ। কবিরাজী ঔষধের গাছ গাছড়া যাহারা বিক্রয় করে তাহারা ওলট কম্বল কিনিবে। আকন্দের তুলার বালিশ তৈয়ারী করিয়া শিশুদিগকে শুইতে দেওয়া হয়। তাহাদের মাথায় সর্দ্দি বসিলে আকন্দের তুলার বালিশে শুইতে দিলে, সর্দ্দি ভাল হইয়া যায়। এই হিসাবে আকন্দের তুলা গৃহস্থগণ

সামান্য পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া থাকেন উহাব বড় বকমের বাজার নাই। আপনার পত্রের মর্ম্ম আমরা এই পুস্তকের ব্যবসায়ের সন্ধান নামক অধ্যায়ে প্রকাশ কবিলাম। যদি কোন খরিদদারের প্রয়োজন থাকে তবে আপনার সঙ্গে সবাসরি পত্র লিখিতে পাবেন।

—*—

৩নং পত্র

মহাশয়,

আপনার স্ববিখ্যাত 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' নামক মাসিক পত্রিকাব মারফৎ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে ইচ্ছুক। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রশ্নগুলিব উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

আমি নিম্নলিখিত বিষযগুলি জানিতে ইচ্ছা করি—

১। যশোহরে তিনটী চিরুণীর কারখানা আছে। ইহাকি সত্য যে তন্মধ্যে কিরণ প্রডাক্টস্ (যশোর) নামক কোম্পানী অ-বাঙ্গালীব কর্ত্তৃত্বাধীনে চলিয়া গিয়াছে ?

২। ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী কি বাঙ্গালীর কর্ত্তৃত্বে ও বাঙ্গালীর মূলধনে পরিচালিত ?

৩। সংযুক্ত প্রদেশে (ইউ, পি) বাঙ্গালীব মূলধনে ও কর্ত্তৃত্বে একটী চিনির কল ও ঔষধের কারখানা পরিচালিত হইতেছে ইহা কি সত্য ?

৪। বোম্বাই অঞ্চলে বাঙ্গালীর কোন কাপড়ের কল আছে কি ?

৫। কলিকাতায় বাঙ্গালীব অর্থে ও পরিচালনায় কয়টী ফিল্ম ষ্টুডিও আছে।

ইতি—

শ্রীবরদা প্রসাদ ঘটক
কলিকাতা

৩নং পত্রের উত্তর

আপনি আমাদের গ্রাহক নহেন। কিম্বা চিঠিতে আপনার ঠিকানাও দেন নাই স্নতরাং আপনার ঠিকুজীও পাইবাব উপায় নাই। আমরা আমাদের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারও প্রশ্নের উত্তর ছাপিনা, তাহা আমাদের কাগজেই লেখা রহিয়াছে, দেখিবেন। যাহা হউক কেবল মাত্র ভদ্রতাব খাতিরে আপনার প্রশ্নের উত্তব দিতেছি।

আপনি কি উদ্দেশ্যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, বুঝিতে পারিলামনা। আপনি ব্যবসায়ী লোক তাহা মনে হয় না। মনে হয় কোন বৈঠকখানার মজলিসে বন্ধুজনের সহিত কথা প্রসঙ্গে যে সকল তর্ক বিতর্ক উঠিয়াছিল, তাহার মীমাংসা করিতে চাহেন, অথবা এমনও হইতে পাবে এই প্রশ্নগুলির উত্তরের দ্বাবা কোনও উদ্দেশ্য লইয়া কয়েকটী বিখ্যাত কোম্পানীর বিরুদ্ধে লোকের মনে ভিত্তিহীন সন্দেহ তুলিবার যাহারা চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া এই প্রশ্ন কবিয়াছেন।

(১) কিরণ প্রডাক্টস্ (যশোহর) নামক কোম্পানী অ-বাঙ্গালীর হাতে গিয়াছে, এ কথা আপনাকে কে বলিল ? ইহা নিশ্চয়ই কোন শত্রু পক্ষের ঈর্ষ্যামূলক রটনা। উক্ত কোম্পানী বাঙ্গালীর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত এবং চিরকাল বাঙ্গালীর দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। কিরণ প্রডাক্টস্ (যশোহর) একটি ব্যক্তিগত কারবার। ইহা লিমিটেড কোম্পানী বা যৌথকারবার নহে। একজন উচ্চশিক্ষিত বি-এল-উপাধিধারী শ্রমশীল যুবকের চেষ্টায় ইহা গঠিত হইয়া আজ বঙ্গদেশে নয়, ভারত-

বর্ষের মধ্যে ইহা বাঙ্গালীর গৌরব স্বরূপ একটী শ্রেষ্ঠ কারখানাতে উন্নীত হইয়াছে। উহার মালিক সম্প্রতি বিহার গবর্ণমেণ্টের ত্রিহুত বোতাম ফ্যাক্টরীর যন্ত্রপাতি কিনিয়া নিজ কারখানায় বসাইয়া শিংএর ও ঝিনুকের বোতাম তৈয়ারীর আয়োজন করিয়াছেন। কিরণ প্রডাক্টস্ অ-বাঙ্গালীর হাতে গিয়াছে, এ নির্জ্জলা মিথ্যা যে রটনা করিয়াছে, তাহার নাম জানিতে পারিলে কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ তাহার উপযুক্ত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

(২) ন্যাশন্যাল্ ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানী বাঙ্গালীর মূলধনে ও বাঙ্গালীর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত কিনা, এ প্রশ্নের অর্থ কি? আপনি কলিকাতায় থাকেন, অথচ ন্যাশন্যাল ইন্সুর‍্যান্সের মত এত বড় একটা বীমা কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের নাম জানেন না,—ইহা আমাদের পক্ষে বিস্ময়ের কথা এবং আপনার পক্ষে লজ্জার বিষয়। যাহা হউক ন্যাশন্যালের ডিরেক্টরগণের নাম এই,—

(১) শ্রীযুক্ত জে চৌধুরী (২) শ্রীযুক্ত জি পি দুতিয়া (৩) শ্রীযুক্ত জে পি দুতিয়া (৪) শ্রীযুক্ত কে এম নায়ক (৫) স্যার হরিশঙ্কর পাল (৬) শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দে। ইহাতেই বুঝিতেছেন, ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত,—না অবাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত। ইহার অংশীদারদের মধ্যে,—যেমন অন্যান্য সকল কোম্পানীর হয়,—বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী দুই-ই রহিয়াছে। ইহা লিমিটেড কোম্পানী,—কোন ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের কর্ত্তৃত্ব এখানে থাকিতে পারে না। এ সম্বন্ধে ৪২ সালের **"বীমা বার্ষিকীতে"** আমরা বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি; তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন ন্যাশন্যাল অ-বাঙ্গালীর কোম্পানী কিনা।

(৩) যুক্তপ্রদেশে বাঙ্গালীর মূলধনে পরিচালিত ঔষধের কারখানা আছে কিন্তু চিনির কল নাই।

(৪) বোম্বাই অঞ্চলে বাঙ্গালীর কাপড়ের কল, এ অসম্ভব কল্পনা আপনার মাথায় কিরূপে আসিল জানিনা। বাঙ্গালীর নিজের দেশে কয়েকটী কাপড়ের কল খানিকটা তৈয়ারী হইয়া পড়িয়া আছে, টাকার অভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। এমন অবস্থায় আবার বোম্বাইতে বাঙ্গালীর কাপড়ের কল? তবে বাঙ্গালী দু'একজন কর্ম্মী বোম্বাই আহমদাবাদে কাপড়ের কলে ম্যানেজার আছেন, এ সংবাদ আমরা জানি।

(৫) কলিকাতায় বাঙ্গালীর অর্থে ও পরিচালনায় সিনেমার ফিল্ম ষ্টুডিও বহু সংখ্যক রহিয়াছে,—কারণ সে দিকে যে সমাজ-ধ্বংসের পথ। যে শিল্প ব্যবসায়ে সম্পদের সৃষ্টি হয়, সমাজ রক্ষা হয়, বাঙ্গালীর প্রতিভা ও পরিশ্রমত তাহাতে নিযুক্ত হয় না। বাবুদের বাগান বাড়ীর অভাব নাই,—প্রলুব্ধ নর-নারী নরকের পথে পা বাড়াইয়াই আছে,—আর বিলাতী মাল মশলা লক্ষ লক্ষ টাকার আসিতেছে,—সুতরাং সিনেমার ষ্টুডিও বাঙ্গালীর পাড়ায় পাড়ায় ঘরের আনাচে-কানাচে গজাইয়া উঠিতেছে।

৪নং পত্র

মহাশয়,

আমি কতকগুলি বিষয় জানিতে ইচ্ছুক; আশা করি যথাযথ সংবাদ ও তথ্য জানাইয়া উপকৃত ও বাধিত করিবেন। নিম্নে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লিখিত হইল।—

১। ছাগল পালন লাভজনক কিনা?

২। ছাগল পালন করিতে হইলে কি কি পন্থা অবলম্বন করা দরকার।

৩। তাহাদের বাসস্থান কি ভাবে নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন।

৪। একটী ঘরে কতটী ছাগল রাখা যাইতে পারে।

৫। ছাগলের পীড়া কয় প্রকার—

৬। পীড়া হইলে কি প্রতিকার বিধেয়—

অমর নাথ রায় লিখিত সরল পোলট্রী পালন বহিতে—ছাগল পালন সম্বন্ধে যাহা লিখা হইয়াছে তাহা পাঠে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। এই সম্পর্কে যদি অন্য কোন গ্রন্থকারের বহি থাকে তাহা হইলে তাহার নাম ঠিকানা জানাইলে বাধিত হইব।

বিনীত—

শ্রীযোগেশ চন্দ্র দত্ত—

পোঃ আঃ কমলগঞ্জ জিলা শ্রীহট্ট—

৪নং পত্রের উত্তর

ছাগল পালন খুব লাভ জনক ব্যবসায়। এসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পুরাতন সেট্ কিনিয়া পড়িয়া দেখিবেন। আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তাহাতে আছে।

পোলট্রী সম্বন্ধে ভাল বাংলা পুস্তক আছে বলিয়া জানিনা। তবে এসম্বন্ধে ইংরাজী পুস্তক অনেক আছে। Messers Thacker Spink & Co. (1933) Ltd. Esplanade East, Calcutta এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে তাহার সন্ধান পাইবেন।

গ্রেট ব্রিটেনের ব্যবসা

শ্রীরামানুজ কর

বাঙ্গালী রাজনীতির ভুয়া চর্চ্চায় ব্যস্ত এবং অর্থোপার্জ্জনে উদাসীন থাকায় বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। অন্য দিকে দলে দলে অবাঙ্গালী বাঙ্গালায় আসিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। বাঙ্গালায় কোন জনহিতকর কাজ করিতে হইলে আমাদিগকে অবাঙ্গালীর সাহায্য প্রার্থী হইতে হয়। আজ বাঙ্গালী অন্নচিন্তায় বিব্রত, পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ। বাঙ্গালার শিল্প বাণিজ্যে যত লোক প্রতিপালিত হয়, ভারতবর্ষের অন্য যে কোন চারিটী প্রদেশে একত্রে তত লোক প্রতিপালিত হয় না। বাঙ্গালায় প্রতিপাল্যের সংখ্যা যত বেশী ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে তত নহে। বাঙ্গালায় অবাঙ্গালীকে বাদ দিলে পোষ্যের হার আরও বেশী হইবে। বাঙ্গালীর মধ্যে দিন দিন অকেজো লোকের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, ভারতবর্ষে আর কোন প্রদেশে সেরূপ বৃদ্ধি হয় নাই। তাহারা স্ব স্ব প্রদেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে মনোনিবেশ করিয়াছে। অনেকে আবার ভাগ্যান্বেষণের জন্য প্রদেশের বাহিরে যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালী জেল খানায় আবদ্ধ। সমগ্র বাঙ্গালাকে জেলখানা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রদেশের বাহিরে বাঙ্গালীর পা বাড়াইবার উপায় নাই। আসাম বিহার ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালী-বিদ্বেষ ক্রমেই প্রবল হইতেছে।

বিহার ও উড়িষ্যার যত লোক বাঙ্গালায় আসিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, তাহার এক দশমাংশ বাঙ্গালীও এই দুই প্রদেশে অর্থোপার্জ্জন করিতে পায় না। ভারতবর্ষে শিল্পবাণিজ্যে বাঙ্গালার পরেই বোম্বাই। যদিও এই প্রদেশের শিল্পবাণিজ্য গুজরাটী, ভাটিয়া ও বোরাদের হাতে, তথাপি ভিন্ন প্রদেশ হইতেও বহু লোক এই প্রদেশে যাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে কেবল বাঙ্গালী এবিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া আছে। বোম্বাই সহরে সিন্ধি ২৫৭০৮, তামিল ১০২৫২, মাড়য়ারী ৭৮৪৬, তেলেগু ১৭১৪২, ইরানী ৭১৫৬, বাঙ্গালী ৪২৯৮, মালয়ালী ২৪৭৭ আরবী ৩০৪৬, পেশয়ারী ৩৫৪০, পাঞ্জাবী ৩৪৫২, বোম্বাই সহরের লোক সংখ্যা ১১ লক্ষ ৬১ হাজার। কলিকাতা, হাওড়া ও সহরতলির লোকসংখ্যা ১৪ লক্ষ ৪৫ হাজার। ইহার মধ্যে হিন্দুস্থানী ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার, উড়িয়া ৪৫ হাজার পাঞ্জাবী ৯৬৫৪ পেশয়ারী ৭৫৬, মাড়য়ারী -৪৮১ তেলেগু ৬ হাজার তামিল ২৭৪৪ নেপালী ৪৭৫২ জন। কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাইএ মাড়য়ারীর সংখ্যা অধিক হইলেও তাহারা ব্যবসায়ে কলিকাতায় যে প্রভাব বিস্তার করিতে

পারিয়াছে বোম্বাইএ তাহার কিছুই পারে নাই। বাঙ্গালাভাষাভাষী লইয়াই বাঙ্গালাদেশ গঠিত, কিন্তু সিন্ধু প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইলেও মারাঠী, গুজরাটী ক্যানারিজ ও হিন্দীভাষা লইয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সী গঠিত।

আমরা সকল বিষয়ই ইংরাজের অনুকরণ করি। বিলাতের নেতারা কেবল রাজনীতি চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করেন না। ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জনেও তাহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্ডউইন ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ তাঁহার নিজের বৃহৎ কারবার আছে। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী বোনাল ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৬ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া গ্লাসগোর লৌহ ব্যবসায়ী উইলিয়ম কিড়াটীন এণ্ড সন্সের কারবারে শিক্ষানবীশরূপে নিযুক্ত হন। এই কারবারে তাঁহার খুল্লতাত কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ২৮ বৎসর বয়সে গ্লাসগোর উইলিয়াম জ্যাক্স এণ্ড কোম্পানীর অংশীদার হন। ৪২ বৎসর বয়সে তিনি পালিয়ামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তখন তিনি ৬ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ৬৪ বৎসর বয়সে তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া ২২ হাজার পাউণ্ড পাইয়াছিলেন। লর্ড বালফুর রাজনীতির আসরে নামিবার পূর্ব্বে কোম্পানীর ডিরেক্টররূপেই সহরে পরিচিত ছিলেন। স্যার জন ব্রুনার জাতিতে সুইস, ধর্ম্মে ইহুদী, ২৪ বৎসর পালিয়ামেণ্টের সদস্য ছিলেন। তিনি খুল্লতাতের সহিত ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কারখানা স্থাপন করেন। পৃথিবীর মধ্যে ইহার রাসায়নিক দ্রব্যের সর্ব্ব বৃহৎ কারখানা। তাঁহার পুত্র লর্ড মেলচেট এই কারবারের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এই কোম্পানী ভারতে রং এর ব্যবসা একচেটিয়া করিয়াছেন।

সংবাদপত্রে দেখিতে পাই বিলাতে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার বসিয়া আছে, কিন্তু আমাদের দেশে কোটী কোটী লোক বেকার রহিয়াছে। এখনও গ্রেট বৃটেনে কারবারে মোটা লাভ

হইতেছে এবং এই সকল কারবারে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইতেছে। নিম্নে কতকগুলি কারবারে ১৯৩৬ সালের আয়ের পরিমাণ দেওয়া হইল।

এসোসিয়েটেড বৃটীশ প্রপার্টি লিঃ মূলধন দশ লক্ষ পাউণ্ড। শতকরা সাড়ে চারি টাকা সুদে ডিবেঞ্চার ২০ লক্ষ পাউণ্ড ১৯৩৪ সালে আয় ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার পাউণ্ড। ১৯৩৫ সালে আয় ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার এবং ১৯৩৬ সালে ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার পাউণ্ড। কোম্পানী বিলাতের বিভিন্ন সহরে ৫৩টি সিনেমা পরিচালন করে।

এন্‌সেনক্রয়ারী লিঃ মদ্য ব্যবসায়ী আয় ৪ লক্ষ ৯৫ হাজার পাউণ্ড। শতকরা ২৫ হারে ডিভিডেণ্ড।

মওরী ও গার্টেন লিঃ মদ্য ব্যবসায়ী আয় ৫৩ লক্ষ ৮৩ হাজার পাউণ্ড। লভ্যাংশ শতকরা ১৪ হারে।

বৃটীশ ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারীং লিঃ অংশীদারগণকে শতকরা ৪ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।

এয়ারেটেড ব্লেড কোম্পানী আয় ২ লক্ষ ৩২ হাজার পাউণ্ড। অংশীদারগণকে শতকরা ৫ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।

কে ও এল টিম্বার লিঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় কাঠের ব্যবসায় মূলধন দেড় লক্ষ পাউণ্ড। আয় ২২॥ হাজার পাউণ্ড।

জর্জ্জ ওয়ার্ড লিঃ জুতার কারখানা, মূলধন ২ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মিঃ জর্জ্জ ওয়ার্ড দু'জন অংশীদার লইয়া এই কারবার খুলেন। ১৯১৮ সালে তিনি অন্য দুইজনের সত্ব খরিদ করেন। গত ডিসেম্বর মাসে ইহা সাধারণ কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে। ১৯২৬ সালে সাড়ে বার হাজার পাউণ্ড লাভ হইয়াছিল। ১৯২৮ সালে লাভ হইয়াছিল ২২ হাজার পাউণ্ড। ১৯৩১ সালে ৩৮ হাজার এবং ১৯৩২ সালে ৬২ হাজার পাউণ্ড লাভ হইয়াছিল।

পীজ এণ্ড পার্টনারস লিঃ ১৮৯৮ সালে গঠিত ডারহেমে ও ইয়র্ক শায়ারে কয়লা খনি, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা ঘুটিং; পিগআয়রণ ও আলকাতরার ব্যবসায়। মূলধন ২৬ লক্ষ ৯১ হাজার পাউণ্ড আয় ১ লক্ষ ৯০ হাজার পাউণ্ড।

ক্যানন আয়রণ ফাউণ্ডার্স আয় ৬৯ হাজার ৬ শত পাউণ্ড। লভ্যাংশ শতকরা ১৫ হারে।

ড্যাভিজ হষ্টেড আয় ৮৬ হাজার পাউণ্ড।

ইলফোর্ড লিঃ আয় ১ লক্ষ ৮ হাজার ৬ শত পাউণ্ড। লভ্যাংশ শতকরা ৭ হারে।

টিমোথী হোয়াইটস এণ্ড টেলার। খুচরা বিক্রয়ের দোকান। গ্রেট বৃটেনে বিভিন্ন সহরে ৮৭৮টি দোকানে ৪ কোটী ৮৬ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮ শত ৭ জনে জিনিস বিক্রয় করিয়াছে। আয় ৩ লক্ষ ২৭ হাজার পাউণ্ড। লভ্যাংশ শতকরা ৩০ হারে। ৪ লক্ষ ২২ হাজার পাউণ্ড রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা আছে। কোম্পানীর অংশীদারের সংখ্যা ২৭ হাজার।

ইন্দ কুপ এণ্ড এললপ লিঃ মদ্য ব্যবসায়ী। আয় ৭ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড। অন্যান্য কারবারে লগ্নী অর্থের আয় ২ লক্ষ ৯৩ হাজার পাউণ্ড। রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা ৯॥ লক্ষ পাউণ্ড। অংশীদারগণকে শতকরা ৩০ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

অর্ন ইলেক্ট্রীক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ মূলধন দেড় লক্ষ পাউণ্ড। আয় ৪৩ হাজার পাউণ্ড। অংশীদারগণ শতকরা ৩৪ হারে লভ্যাংশ পাইয়াছে।

কভেণ্ট গার্ডেন প্রপার্টি লিঃ আয় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭ শত পাউণ্ড। অংশীদারগণ শতকরা ৭॥ হারে লভ্যাংশ পাইয়াছে।

লুপিয়ার্ড ভ্লীইষ্টেট ও গোল্ড মাইনিং লিঃ আয় ১ লক্ষ ৪৬ হাজার পাউণ্ড। অংশীদারগণ শতকরা ৫০ হারে লভ্যাংশ পাইয়াছে।

ডি স্মিথ এণ্ড সন্স আয় ২০ হাজার পাউণ্ড।

উইলুনা গোল্ড কর্পোরেশন আয় ১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড।

হিউয়েট ব্রাদার্স লিঃ মূলধন ৭ লক্ষ পাউণ্ড। শতকরা ১৫ হারে লভ্যাংশ।

ডম্মান লং কোং লিঃ আয় ১২॥ লক্ষ পাউণ্ড। ৩৬ হাজার লোক এই কোম্পানীতে কাজ করে।

রোডেশিয়ান কর্পোরেশন লিঃ আয় ১ লক্ষ ১২ হাজার পাউণ্ড। শতকরা দশ হারে লভ্যাংশ।

বৃটিশ টায়ার এণ্ড রবার কোং লিঃ আয় ২ লক্ষ ৪ হাজার পাউণ্ড লভ্যাংশ শতকরা ৮ হারে।

র‍্যালে সাইকেল হোল্ডিং কোং লিঃ আয় ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার পাউণ্ড। শতকরা ২২॥০ হারে লভ্যাংশ। এই কোম্পানী ১ লক্ষ ৩৭ হাজার পাউণ্ড ইনকাম ট্যাক্স দিয়াছে। ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার পাউণ্ড মৌজুত আছে। রিজার্ভফণ্ডে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড জমা হইয়াছে। গতবৎসরে ৪ লক্ষ সাইকেল বিক্রয় হইয়াছে।

ন্যাশন্যাল বিল্ডিং সোসাইটির মূলধন ১১লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড। সম্পত্তির পরিমাণ ৩কোটী ১৪ লক্ষ ২২ হাজার পাউণ্ড। ১৯৩৫ সালে ৫২ লক্ষ ৬০ হাজার এবং ১৯৩৬ সালে ৭১ লক্ষ ২৬ হাজার পাউণ্ড দাদন দেওয়া হইয়াছে।

কৃষ্ট্যাল ম্যানুফ্যাক্টরিং কোংর আয় ২ লক্ষ ৯১ হাজার পাউণ্ড। লভ্যাংশ শতকরা ২০ হারে।

স্কটল্যাণ্ডের ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের আয় ২ লক্ষ ৭২ হাজার পাউণ্ড। ১৯৩৪-৩৫ সালে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড আয় হইয়াছিল। অংশীদারগণ শতকরা ১৬ হারে লভ্যাংশ পাইয়াছে।

ন্যাশন্যাল প্রভিন্সিয়েল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৮৩৬ সালে স্থাপিত। মূলধন ৬ কোটী পাউণ্ড।

ইউনিয়ন অভ লণ্ডন এণ্ড স্মিথ ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ৩৫ লক্ষ ৭৪ হাজার পাউণ্ড। লণ্ডন সহরে ও গ্রেটবৃটেনের বহু স্থানে এই ব্যাঙ্কের শাখা আছে।

সাউথ আফ্রিকায় ষ্ট্যাণ্ডাড ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ১৫ লক্ষ ৪৮ হাজার পাউণ্ড। আফ্রিকার সর্ব্বত্র এই ব্যাঙ্কের শাখা আছে।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্যাঙ্কের আয় ১৭ লক্ষ ৩১ হাজার পাউণ্ড; শতকরা ৫ হারে লভ্যাংশ। বার্ক্লেজ ব্যাঙ্কের আয় ৪ লক্ষ পাউণ্ড শতকরা ৮ হারে লভ্যাংশ। হংকং শাখা হিঃ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন শতকরা অংশপ্রতি তিন পাউণ্ড লভ্যাংশ দিয়াছে। গত ৩১শে ডিসেম্বরে নিউল্যাণ্ড ব্যাঙ্কে আমানতকারীদের ৪৮ কোটী পাউণ্ড জমা ছিল। ১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ৪১ কোটী এবং ১৯৩৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ৪৩ কোটী পাউণ্ড আমানত ছিল। ইউনিয়ন সিনেমা লিঃ আয় ২ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড শতকরা ১০ লভ্যাংশ। ন্যাশন্যাল অমনিবাস কোম্পানীর আয় ৭০ হাজার পাউণ্ড লভ্যাংশ শতকরা ৮ হারে। বৃটীশ আইলস ও জেনারেল ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টের মূলধন ৭॥০ লক্ষ পাউণ্ড। জে ও জে কোলম্যান লিঃ অংশীদারগণকে

শতকরা ১৩ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। রয়ালডাচ পেট্রোলিয়াম কোং লভ্যাংশ শতকরা ৫ হারে। ত্রিনিদাদ পেট্রেলিয়াম কোম্পানীর মূলধন দশলক্ষ পাউণ্ড। আয় ৭ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড। এই কোম্পানী ৩০ বৎসরের জন্য ২৪ হাজার ৮ শত একর জমি ইজারা লইয়াছে। ডিষ্টিলারিজ লিঃ শতকরা সাড়েসাত হারে অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিয়াছে। গত ১৮৮১ সালে ম্যানচেষ্টার ও বামিংহামে হ্যামারস্লিও হীনান কোম্পানী গঠিত। প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে কারবার আরম্ভ। ইঞ্জিনীয়ারের কারবার ১৯০২ সালে হীনান ও ফ্রউডি নামে সাধারণ কোম্পানী বলিয়া রেজেষ্টারী হয়। মূলধন দেড় লক্ষ পাউণ্ড। গতবৎসর এই কোম্পানীর ২২ হাজার পাউণ্ড লাভ লইয়াছে। বৃটিশ আমেরিকান টুব্যাকো কোম্পানীর আয় ৫৫ লক্ষ ৪১ হাজার পাউণ্ড। পেট্রো ১১ হাজার পাউণ্ড অংশীদারগণকে শতকরা ৮ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। লণ্ডন ও সাউথ আমেরিকা ব্যাঙ্কের আয় ৪লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড। গ্রামোফোন কোম্পানীর বার্ষিক আয় দেড় কোটী টাকা। কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীর বার্ষিক আয় ৭০ লক্ষ টাকা। এঙ্গলোপার্সিয়ানওয়েল কোম্পানীর বার্ষিক আয় ২৬ লক্ষ পাউণ্ড। ফিলিপস্ রবার সোলস লিঃ এর আয় ৭০ হাজার পাউণ্ড। অংশীদারগণ শতকরা ১২৷৷০ হারে লভ্যাংশ পাইয়াছে। রিভার্ডলাণ্ট কোংর ২৮ হাজার পাউণ্ড আয়, লভ্যাংশ শতকরা ১০ হারে।

মাঙ্কোল কোং শতকরা ২৪ এবং নদার্ন কোং ১৬ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। পেনম্যান লিঃ শতকরা ৭৫ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। উইলিয়ামটিমসন লিঃ বুট ও জুতার কারখানা গতসনে আয় ১ লক্ষ ১৬ হাজার পাউণ্ড শতকরা ২৫ হারে লভ্যাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই কোম্পানীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। ১৯৩৪ সালে ৮৪ হাজার এবং ৩৫ সালে ৯৫ হাজার পাউণ্ড লাভ হইয়াছিল। ন্যাশন্যাল প্রভিন্সিয়েল ব্যাঙ্কের ১৭ লক্ষ ৭০ হাজার এবং ডিষ্ট্রিক্ট ব্যাঙ্কের ৪ লক্ষ ৯০ হাজার পাউণ্ড আয় হইয়াছে। ত্রিনিদাদ সুগার ইষ্টেট লিঃ আয় ২১ হাজার পাউণ্ড। ১১৭ হাজার টন ইক্ষু মাড়াই করিয়া ১২ হাজার টন চিনি হইয়াছে।

আমাদের দেশে অনেক ধনীর নাম শুনিতে পাই। খুব আড়ম্বরের সহিত জীবন যাপন করেন। বাড়ীতে ৩।৪ খানা মটরকার, বহু দাস দাসী, প্রকাণ্ড অট্টালিকা, স্বাস্থ্যকর স্থানেও বাড়ী করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পর শুনিতে পাই তিনি বহু টাকার ঋণ রাখিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাহার ঘর বাড়ী দেনার দায়ে নিলাম হইল। অনেক বড় বড় জমিদারের নাম শুনিতে পাই। সরকারের নিকট বারবার খেতাব পাইতেছেন, পরে শুনিতে পাই দেনার দায়ে বিব্রত হইয়া তিনি কোর্ট অভ ওয়ার্ডসের আশ্রয় লইয়াছেন। এদেশের অধিকাংশ নামজাদা ধনবানের এই অবস্থা কিন্তু বিলাতে ধনবানদের অবস্থা সেরূপ নহে। তাঁহারা মৃত্যুকালে কত টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গেলেন, পরে তাহাও প্রকাশ পায়।

[ক্রমশঃ]

সঞ্চয়হীনের দশা

বয়স কালে হরেন বাবুর অর্থ সম্পদ, মান সম্ভ্রম, বন্ধুবান্ধব, সভাসদ, চাটুকার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার কথায় লোকে উঠিত বসিত। তিনি বলিলে লোকের চাকরি জুটিয়া যাইত। তিনি অসন্তুষ্ট হইলে কাহারও রক্ষা থাকিত না। ভোগে, বিলাসে, অভিনব খেয়ালে হরেন বাবুকে প্রাচীন বাদশাহী আদর্শের এক আধুনিক উদাহরণ বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। শুনা যায়, তিনি ছুটির সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইলে বাংলা দেশের মাটী ও জল হাওয়া ব্যতীত আর সকল উপকরণই সঙ্গে লইয়া চলিতেন। সুদূর পশ্চিমে, বাংলার একান্ত নিজের তরি তরকারী ও মৎস্য, অথবা যথাযথ ও নির্দ্দিষ্ট জাতীয় চাল, ডাল, তৈল, ঘৃত, চাকর, ঝি, বাসন, আসবাব, মটকা তামাক কিম্বা কোন কিছুর অভাব হইলে হরেন বাবু তাহা বরদাস্ত করিতেন না। কন্যার বিবাহ কিম্বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে হরেন বাবুর ফিরিস্তি জার্ম্মান সমরের হতাহতের তালিকার মতই সুদীর্ঘ ও সর্ব্বগ্রাসী হইত। সে আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কিন্তু এখনও সে কথা লোকে কিম্বদন্তীর মতই আওড়াইতে থাকে।

কিন্তু, এ হেন হরেন বাবু আজ চাকরী অবসানে হৃত-সম্পদ এবং বিগত যৌবন অবস্থায় ছোট আদালতের উকিল মহলের "টাউট"। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন বাদী ফরিয়াদীদের উপযুক্ত উকিল সরবরাহ করিয়া দিনান্তে দুই এক টাকা সংগ্রহ করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া যান। ছোট টিনের চালায় স্বপাকে আহার ও ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করেন। কেন? কারণ, কিছুই নহে —শুধু অর্থাভাব। যৌবনে অগাধ অর্থ সম্পদ অপব্যবহার করিয়া হরেন বাবু আজ নিঃসম্বল। কিছু টাকা যাহা ছিল ভাঁটার মুখে রাতারাতি বড়লোক হইতে গিয়া তথাকথিত ব্যবসায়ে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহার দৌলতে কত লোকের একদিন সুসময়ে গিয়াছে, আজ তাহারই অভাবের দিনে কাহাকেও কোথাও দেখা যায় না।

গল্পটী কিছু অভিনব নহে। সময়ে বার্দ্ধক্যের পুঁজি ঠিক করিয়া না রাখিলে অনেকেরই এই দশা হয়। শুধু মানুষ কেন, জীবজগতে সঞ্চয়ের মূল্য সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য। উদাহরণ, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি। সময় থাকিতে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখা প্রয়োজন।

জীবন-বীমারও সার্থকতা এই কারণেই। যৌবনে, রোজগারের সময়ে, বিন্দু বিন্দু, করিয়া যে অর্থ বীমায় রক্ষিত হয়, অভাবের সময়ে নিজের বা নিজের অবর্ত্তমানে, পরিবারবর্গের নিকট তাহাই প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, শীতল, সরোবরের রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হয়। বীমায় রক্ষিত অর্থ, সকল ভুল, ভ্রান্তি, মোহ, ও অপচয় আশঙ্কার উপরে। জীবিত থাকিলে বীমা বার্দ্ধক্যের সম্বল, মৃত্যু ঘটিলে পরিবারের আশ্রয়। ইহা ব্যতীত পুত্রের শিক্ষা কিম্বা কন্যার বিবাহের জন্যও বিশেষ বীমা করা যায়।

এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত উপদেশ পাইতে হইলে **ভারত ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ**, ভারত ভবন, কলিকাতা, ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। "ভারত" অদ্যাবধি তাহার বীমাকারীদিগকে এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়াছে। চল্লিশ বৎসরের পুরাতন আফিশ। বর্ত্তমানে মোট তহবিল দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। বীমার সর্ত্ত প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা ও লাভজনক। বীমাকারীদের পাওনা শোধ অতিসত্বর ও নির্ঝঞ্ঝাটে করা হয়। বাংলার সর্ব্বত্র এজেন্ট আছে।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভল্যুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে, তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব। —সম্পাদক

বিনয়ভূষণ সমাজপতি

গ্রাহক নং ১৯৫৩

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সূর্য্য বংশের রাজা
মাথা নোয়ায় না

*

গুণের নাই অন্ত,
কার বাপান্ত

*

পান না তাই খান না

*

তিলক কাটা চিতাবাঘ
চোখবুজে ধরে কাক

*

নাচতে না জানলে
উঠান বাঁকা

*

পাঁঠা চুবুনি

*

কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো

*

ঘরামীর চালে ছন্ নাই

*

আলান না-বোলান না (১)
আমার নাম সোহাগী

*

ঝিকে মেরে বৌকে শিখান

*

১। আসা যাওয়া বা আলাপ পরিচয় নাই।

সুন্দর বনে বাঁদর রাজা

*

পীরিতের পেত্নীও ভাল

*

ঘষে মেজে রূপ আর
ধরে বেঁধে পীরিত হয় না

*

খায়না মদন ঘোরে
চাল্‌তা গাছের গোড়ে

*

যারে না দেখেছি সে বড় সুন্দরী
যার হাতে না খেয়েছি সে বড় রাঁধুনী

*

এতবড় বেটার নাম খোসালে

*

কুকুরের পেটে ঘি হজম হয় না।

*

পাঁঠার নাই মামার বাড়ী

*

পাঁঠার কানে মন্তর দেওয়া

*

বামুনে মন্তর পড়ে
পাঁঠার পো শোনেনা

*

বাঁধিয়া নিলে রাজার বেটাকেও
চোরের ন্যায় দেখায়

*

আসল কথা যদি কই,
ভাঙ্গিয়া পড়ে মাচার দই

*

নিরস্তে পাদপে দেশে
এরণ্ডোপি দ্রুমায়তে

*

নাই দেশে ভেরণ (এরণ্ড) বৃক্ষ

*

সাধে কি বৈরাগী নাচে
চিড়ার ছালা কাঁধে লইয়া

*

কাল নেমীর লঙ্কাভাগ

*

অতি দানে বলি বদ্ধ

*

অতি দর্পে হত লঙ্কা

*

অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী

*

কিঞ্চিৎ লেখনং, বিবাহের কারণং

*

অনুস্বারং দিলেং যদি সংস্কৃত হং,
তবে কেন বড় জামাই খাটের তলায় রং

*

চোরের উপর বাটপাড়ি

*

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে

*

তেল তামাক জল
তিন স্নানের ফল

*

তেল তামাক পিত্তনাশ
যদি কর বারমাস

*

দাঁতে লবণ, মুখে তিতা, নাকে তেল
তার বাড়ী বৈদ্য গেল বা না গেল

*

মার কাছে মামার বাড়ীর খবর

*

আগে জামাই কাঁঠাল খায়না
শেষে জামাই ভোতাও পায় না

*

মরে বামুণ পোড়ে যোগী

*

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে

*

কুমড়ার উপর লাউ কাটা

*

চোরের মন বোচকার দিকে

*

ঠাকুর, ঘরে কে ?
না, আমিত কলা খাইনা

*

ছাল (২) নাই কুত্তার বাঘা নাম

*

হাত থাকলে পাত পড়ে

*

চোরে তাড়ায় গৃহস্থকে

শরীরের নাম মহাশয়
যা সহাও তাই সয়

*

সাধে কি বাবা বলে
গুঁতার চোটে বাবা বলায়

*

মনের অগোচর পাপ নাই

*

কেটি কুত্তার (৪) মজর দাড়ি
ফেন খাইতে যায় বাড়ী বাড়ী

*

বল বল আপন বল
জল জল গঙ্গা জল

*

না পড়ালি পো-তো
সভায় নিয়া থো

*

হাটে না বিকায় লাউ
জামাইরে দাও জাউ

*

রমাই নাপ্তের কামানি
তিন দিন তার পোড়ানী
নিমাই ঢুলীর গোছায় গোছায় মাপ

*

ভক্ত হইয়াছে রামদাসের মায়
মোতে আর গোঁসাইর নাম লয়

*

মরুক জামাই বাঁচুক ঝি
চাঁদে চাঁদে নিকা দি

*

ছেলে বাঁচুক বউ মরুক
বছর বছর বিয়া করুক

*

পথে দেখি কামার
দা গড়ে দে আমার

(২) চামড়　　(৪) মাদীকুকুর

আদরে জুড়াইছে গাও (১)
ঝিমুকটা লইয়া বাড়ী যাও

*

আপন ধরণে বুঝবে ভাই
কৃষাণের গায় বল নাই

*

যার যা কাজ নয়
ধান দাইতে আনে খন্তা

*

কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ
পাকলে করে ট্যাঁস্ ট্যাঁস্

*

ভাঙ্গা পা খাদে পড়ে

*

নিমাই ঢুলীর মরণে
ডাউকটা (২) চিন্‌লিনা ঠোটটার ধরণে (৩)

*

শাক, শিমূল, বলাকা
তিন পাঁচে পনরটী কিল খাইলাম খামাখা

(ক্রমশঃ)

(১) শরীর (২) ডাক পক্ষী (৩) আকৃতি

গ্রেট বৃটেনের ব্যবসা

শ্রীরামানুজ কর

কলিকাতার ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব অংশীদার লর্ড ইন্দকেপ মৃত্যুকালে ২১ লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এণ্ড ইউল কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব অংশীদার স্যার ড্যাভিড ইউল ১০ কোটী টাকার, বামার লরী কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব অংশীদার জন জেমেল ৩৬ লক্ষ টাকার, বার্ড কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব অংশীদার লর্ড কেবল ৩২ লক্ষ টাকার এবং হোয়াইটএওয়ে লেডল কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব অংশীদার এডওয়ার্ড হোয়াইট এওয়ে ৩০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

লর্ড আইভিগ মৃত্যুকালে ৩০ কোটী টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ব্যারন উইলকারী ১০১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। এন ডিউআর কোম্পানী মদ্য ব্যবসায়ী। এই কোম্পানীর প্রধান অংশীদার লর্ড ডিউআর একটী সাধারণ হোটেলে দুটী কুটরীতে সাদাসিদা ভাবে জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু মৃত্যুকালে ৬॥ কোটী টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অন্যতম অংশীদার লর্ড ফটিভিয়টও ৫ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

একশত দশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে জে, পি, ফোর্টস কারবারের পত্তন হয়। তখন ১২ ঘোড়ার একটি ইঞ্জিন লইয়া কাপড় কলের কাজ আরম্ভ হয়। অধ্যবসায়ের গুনে ধীরে ধীরে সমস্ত প্রতিদ্বন্দীকে পরাজিত করিয়া এই কোম্পানী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৯০৫ সালে এই কোম্পানীর মূলধন ৫২ কোটী টাকায় পরিণত হয়। কোম্পানীর বার্ষিক আয় ৪ কোটী টাকা। অন্যতম অংশীদার মেজর এণ্ড মৃত্যুকালে স্কটল্যাণ্ড লিসেষ্টারশায়ারের ভূসম্পত্তি ব্যতীত ৩ কোটী ৬০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অন্যতম অংশীদার পিটার কোট ৪ কোটী টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই পরিবারে ১২ জন কোটীপতি আছেন।

ডোন্যাল্ড স্মিথ ক্যানাডায় যাইয়া হডসন বে কোম্পানীর অধীনে কাজ পাইয়াছিলেন। পরে তিনি ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে স্বদেশে আসিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ৯৩ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি সাত কোটী টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। উইলিয়াম বেয়ার্ড কোম্পানীর উইলিয়ামওয়ের ৩ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকার; ম্যাপিন এণ্ড ওয়েব কোম্পানীর জন ম্যাপিন ১ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা সাইমন কোম্পানীর হিউবার্ট সামুয়েল ১ কোটি ১২ লক্ষ বিস্কুট প্রস্তুতকারক হাণ্টলি এণ্ড পামারের উইলিয়াম পামার ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা;

শন ও পাট ব্যবসায়ীগার উইলিয়াম অজিলভি লিভারপুলের সেবেল কোম্পানীর জর্জ্জ সেবেল এবং ইভানস ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর জন ক্রমটন প্রত্যেকে এক কোটি টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। পিলকিংটন ব্রাদার্সের চেয়ারম্যান উইলিয়াম পিলকিংটন, চার্লস্ ওয়ার্থ কোম্পানীর ডিরেক্টর এলবানী চার্লস্ ওয়ার্থ রং ব্যবসায়ী পুলার এণ্ড সন্সের চেয়ারম্যান স্যার রবার্ট পুলার প্রত্যেকে ৮০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

স্যার জন এলারম্যান জাহাজ ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রথমে কোন হিসাব পরীক্ষকের কেরাণী স্বরূপে জীবন যাপন আরম্ভ করেন। শেষ জীবনে গ্রেট বৃটেনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনে একটি সাধারণ বাড়ীতে বাস করিতেন। বার্ষিক সংসার খরচ ৩০ হাজার টাকায় হইত। তিনি ধন বৃদ্ধির চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকিতেন। কখনও কোন কাজে খরচ করেন নাই। ইম্পিরিয়েল টুব্যাকো (তামাক) কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট স্যার জর্জ্জ উইল মৃত্যুকালে ১৷৷ কোটি টাকা এবং অন্যতম ডিরেক্টর এবং তামাক প্রস্তুতকারক ডবলিউ টী, ড্যাভিজ এণ্ড কোম্পানীর সামুয়েল ড্যাভিজ ৬০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ক্যারেরা কোম্পানীর তামাকের ব্যবসায় মূলধন ১২ লক্ষ পাউণ্ড, বার্ষিক আয়ও ১২ লক্ষ পাউণ্ড। ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান লুভিস সামান্য অবস্থা হইতে অধ্যবসায় গুণে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। জীবদ্দশায় ২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে ৬৷৷ কোটী টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন এবং ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। দাতব্যচিকিৎসালয়ে ১ কোটি ৪৷৷ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

বার্ণহার্ড ব্যারন এই কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছিলেন। শৈশবাবস্থায় তিনি কপর্দ্দকহীন ছিলেন। তিনি জাতিতে ফরাসী, ধর্ম্মে ইহুদী ছিলেন। শৈশবাবস্থায় সিগারেট তৈয়ারীর যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বাল্যে তিনি আমেরিকায় যাইয়া সিগারেট তৈয়ার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আমেরিকার শ্রমিক নেতা মিঃ স্যাম গম্পার সহিত তিনি এক বেঞ্চে বসিয়া কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে লেবার পার্টির নির্ব্বাচনে ৭৫ হাজার টাকা সাহায্য করেন। তিনি মুক্তদার ছিলেন; জীবিতাবস্থায় ৮০ লক্ষ টাকা দান করিয়া ছিলেন। গ্লাসগোর ইঞ্জিনীয়ার স্যার উইলিয়াম এরোল কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান স্যার জন হাণ্টার মৃত্যুকালে ২৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কার্ডিফ ও লণ্ডনের স্যার আব রোপার এণ্ড কোম্পানীর প্রধান অংশীদার সার জে, রোপার মৃত্যুকালে ৮০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

ফ্র্যাঙ্ক পারকিন্সন বাল্যাবস্থায় দরিদ্র ছিলেন। একুশ বৎসর বয়সে তিন শত টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া লীডস্ সহরে ইলেকট্রিক দ্রব্যের দোকান খুলেন। তাঁহার ভ্রাতার সহিত এই কারবার চালাইতেন। প্রথমে কোন কর্ম্মচারী না রাখিয়া তিনি নিজেই জিনিষ বিক্রয় করিতেন। স্বীয় অদম্য অধ্যবসায়ের বলে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হন। বর্ত্তমানে

তিনি ক্রম্পটনপার্কিনানে লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর এই কোম্পানী ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। গ্রেটবৃটেনে এই শ্রেনীর যতগুলি বৃহৎ কারখানা আছে, ইহা তাহাদের অন্যতম। পার্কিনান এখন কোটীপতি। গতবৎসর তিনি লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি দিবার জন্য ৫০ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছেন, এবং গত ডিসেম্বর মাসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তার সাধনের জন্য দুই লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। লর্ডনুফিণ্ড (মিঃ মরিস) ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত মটর ব্যবসায়ী। মটরের কারবারে প্রথমে তাহার কাজ দেখিয়া লোকে তাহাকে পাগল বলিত। কিন্তু তিনি সে কথায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আপন মনে কাজ করিতেন। ১৯১৯-২০ সালে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। মটরগাড়ীর চাহিদা হয় না, অন্যদিকে ব্যাঙ্কে বহু টাকা দেনা। তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীগণকে উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুন করিতে বলিলেন, তাহারা ভাবিল মরিস পাগল হইয়াছে। তিনি ঠাট্টা বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করিয়া জিদ ধরিলেন এবং মডেল গাড়ীর মূল্য দেড় হাজার টাকা হ্রাস করিয়া দিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মিঃ মরিসেরর আনন্দের সীমা নাই। তাঁহার সমস্ত গাড়ী বিক্রয় হওয়ায় তিনি ব্যাঙ্কের দেনা সমস্ত পরিশোধ করিয়া উল্টা ৮০ হাজার পাউণ্ড জমা দিয়াছেন। তাঁহার মটরের কারখানা ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত নিজস্ব ছিল। এইবৎসর তিনি ৬ কোটি টাকা মূলধনে একটি সাধারণ কোম্পানী গঠন করিয়া তাঁহার কারখানা এই কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়াছেন। গ্রেট-বৃটেনে এইটিই সবচেয়ে বড় মটরের কারখানা, ইহার পূর্ব্ববৎসর এই কোম্পানীর ২ কোটী টাকা আয় হইয়াছিল। এই কারখানায় বৎসরে ৮০ হাজার মটরগাড়ী তৈয়ার হয়। লর্ড-নুফিল্ড বর্ত্তমানে ১১টী মটর কারখানার মালিক। ওক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের গবেষনার জন্য তিনি ২০ লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। যে অঞ্চলে অধিবাসীগণের অবস্থা শোচনীয় সেখানে কারখানা খুলিয়া কাজের সংস্থান করিয়া দিবার জন্য তিনি ·০ লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। মরিস মটর লিঃ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ লর্ড এই ট্রাষ্টের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত ৯০ লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। তাঁহার অর্থে অক্স-ফোর্ডে ২ জন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকে বার্ষিক ২ হাজার পাউণ্ড বেতন পাইবেন।

জেরার্ড ফ্রেগসেটলার অনেকগুলি কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে ৮৮॥০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। টমাস কেরেন রিকেট এণ্ড সন্সের গদিতে কেরাণীরূপে জীবিকা আরম্ভ করেন মৃত্যুকালে তিনি এই ফার্ম্মের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি জীবিত বস্থায় ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়া-ছিলেন। কার্পেট ও কম্বল ব্যবসায়ী ফার্থ এণ্ড সন্সের চেয়ারম্যান সার ফ্রীম্যান ফার্থ গত নভেম্বর মাসে মৃত্যুকালে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার পাউণ্ড রাখিয়াগিয়াছেন। বেন ষ্টেধাম ১লক্ষ ৮ হাজার পাউণ্ড রাখিয়া গিয়াছেন। গোয়ালা চার্লস হেলসি মৃত্যুকালে ৩ হাজার পাউণ্ড রাখিয়াগিয়াছেন। বস্ত্র ব্যবসায়ী জন ও হিগিনন্সের চেয়ারম্যান চার্লসে হিগিনস্ মৃত্যু-কালে ১লক্ষ ৬২ হাজার পাউণ্ড রাখিয়া গিয়াছেন। ঔপন্যাসিক জন স্নেথ মৃত্যুকালে ৬৭ হাজার এবং সলিসিটর উইলিয়ম ষ্ট্রাণ্ডিং ৫৪ হাজার পাউণ্ড রাখিয়াগিয়াছেন। কয়েকজন

মহিলাও মৃত্যুকালে প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতী লীলা মিচেল ১লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড, মেরী জোসেফিন ল্যাগী ১ লক্ষ ৯৪ হাজার পাউণ্ড, ইদাব্যাযাজ ৭৪ হাজার, মেরী . বেল ১৭ হাজার, এলিজাবেথ হ্যারিল ১১ হাজার পাউণ্ড রাখিয়া গিয়াছেন। বিধবা মেরী স্ক্যাটন গত নভেম্বর মাসে ৭৬ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে ১ লক্ষ ২৪ হাজার পাউণ্ড রাখিয়া গিয়াছেন। হাঁসপাতাল ও অনাথ আশ্রমে ৫০ হাজার পাউণ্ড দান করিয়া গিয়াছেন। সুসনকস ২৭ হাজার এবং ইদাষ্টেড ১৫ হাজার পাউণ্ড রাখিয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ডে অভিজাত পরিবারের সন্তান আরামে কালাতিপাত করেন না। তাঁহারাও বড় বড় কারবার চালাইতেছেন। এদেশের ধনীর ছেলেরা বিলাসিতায় জীবন যাপন করিয়া দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতেছেন। বাপের পয়সা আছে তাহাই আমোদপ্রমোদে উড়াইতেছেন। সেদেশে ধনী পরিবারের মহিলারাও আরামে কালাতিপাত করেন না। তাঁহারাও ব্যবসায়ে, জনসেবায়, বিদ্যাচেষ্টায়, সংবাদপত্র পরিচালন ও সম্পাদনে কলকারখানায় পুরুষের সাহায্য করেন।

ভাইকাউন্টেস রণ্ডা ৩০টি কোম্পানীর ডিরেক্টর। লর্ড লিউ বেডিয়াম ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান লর্ড ডালডার্টন ইম্পিরিয়েল টুব্যাকো কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছিলেন। লর্ড গ্রীন উড ডর্ম্যানল. কোম্পানীর চেয়ারম্যান। আর্ল রথেস ত্রিনিদাদ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর ডিরেক্টর। ভাইকাউন্ট হিল লণ্ডন রেজিও-ন্যাগ প্রপার্টি লিঃ এর ডিরেক্টর। লর্ড এবার কনওয়ে চ্যান্সারী কোর্টের ব্যারিষ্টার ছিলেন। ব্যবসায়েও তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। লৌহ জাহাজ নির্ম্মাণ ও বালিয়ারীতে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। লর্ড কাউড্রে বন্দরের ঠিকাদার ছিলেন। লর্ড ডিভন পোর্ট চা ব্যবসায়ী ছিলেন। লর্ড ওয়েলবী সাউথ আফ্রিকা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ছিলেন। লর্ড কিনলেয়ার্ড কফে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ছিলেন। লর্ড হ্যামিল্টন এবারকনের ডিউকের পুত্র ছিলেন। তিনি ৪২ বৎসর ধরিয়া একটি রেলওয়ের ডিরেক্টর ও ২১ বৎসর চেয়ারম্যান ছিলেন। (ক্রমশঃ)

মোহিনী মোহনের স্মৃতি সভায় কলিকাতা হইতে আগত ভদ্রমণ্ডলী ঃ—

সম্মুখের লাইনে চেয়ারে উপবিষ্ট ঃ—

শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, স্যার হরিশঙ্কর পাল, সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার এবং মাখন লাল সেন।

দ্বিতীয় লাইনে উপবিষ্ট ঃ—

গিরিজা প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, সুরেশ চন্দ্র মজুমদার, ডাঃ নলিনাক্ষ্য সান্ন্যাল এবং জ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

পশ্চাতে দণ্ডায়মান ঃ— মোহিনী মিলের বিশিষ্ট কর্ম্মচারীগণ।

মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তীর বার্ষিক স্মৃতিসভা।

গত ৭ই নভেম্বর কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিসভা মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে এবার কুষ্টিয়ায় যে সভা হইয়াছিল তাহাকে আর সাধারণ সভা বলা যায় না—এবারকার উদ্যোগ আয়োজন একটা কনফারেন্সের মতই হইয়াছিল। কারণ এবার এই স্মৃতিসভায় পৌরহিত্য করিয়াছিলেন, কলিকাতাস্থ ব্যবসায়ী মহলের অগ্রণী, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র গন্ধবণিক সমাজের মুকুটমণি স্যার হরিশঙ্কর পাল। আর কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়ায় আসিয়াছিলেন ভারতবর্ষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন, আনন্দবাজারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন ও সুরেশচন্দ্র মজুমদার ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু,—স্বদেশীযুগের বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ডাক্তার নলিনাক্ষ্য সান্যাল এবং বাহির হইতে আসিয়াছিলেন আরও অনেকে। তাহাছাড়া কুষ্টিয়ার জনসাধারণ এবং মিলের কারু ও কর্ম্মীবৃন্দকে আনন্দ দিবার জন্য কলিকাতা হইতে কন্সার্ট, যাত্রা, নদের নিমাই কীর্ত্তন প্রভৃতি লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

এবারকার বার্ষিক স্মৃতিসভার আরও একটী বিশেষত্ব ছিল। গত বৈশাখ মাস হইতে পূজার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মোহিনী মিলের শ্রমজীবিগণ প্রায় ছয়মাসকাল ব্যাপিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। তাহার ইতিবৃত্ত ব্যবসা ও বাণিজ্যে ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। পূজার সময় এই দীর্ঘকালব্যাপী ধর্ম্মঘটের অবসান হয়। শ্রমজীবিরা বুঝিতে পারে যে তাহাদের আশা ও আকাঙ্খানুযায়ী নিজেদের পাওনা গণ্ডা আদায় করিয়া লইতে হইলে আগে মিলকে বাঁচাইতে হইবে। গাছ কাটীয়া ফেলিলে যেমন ফলের আশা করা বিড়ম্বনা তেমনি মিলটি ধ্বংস হইলে বেশী মজুরী দূরের কথা পেটের অন্ন জুটিবে কোথা হইতে? কলিকাতা হইতে আগত সকল বক্তাগণই এইভাবের কথা বলিয়াছিলেন। স্যার হরিশঙ্কর পাল যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন আমরা এখানে তাহার সার সঙ্কলন দিলাম।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

আজ আপনারা আমাকে স্বর্গীয় মোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ষোড়শতম মৃত্যু বার্ষিকী সভায় যোগদান করিতে আহ্বান

করিয়া যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আজ বাঙ্গলার এই দুর্দ্দিনে মোহিনী মোহনের ন্যায় পুণ্যশ্লোক কর্ম্মীর কথা স্বতঃই মনে আসে। তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী দানের সুযোগলাভে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া জেলার এলঙ্গি গ্রামে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। পবিত্র পিতৃকুল ও মাতৃকুলের মহান প্রভাব তাঁহার সমগ্র জীবনের
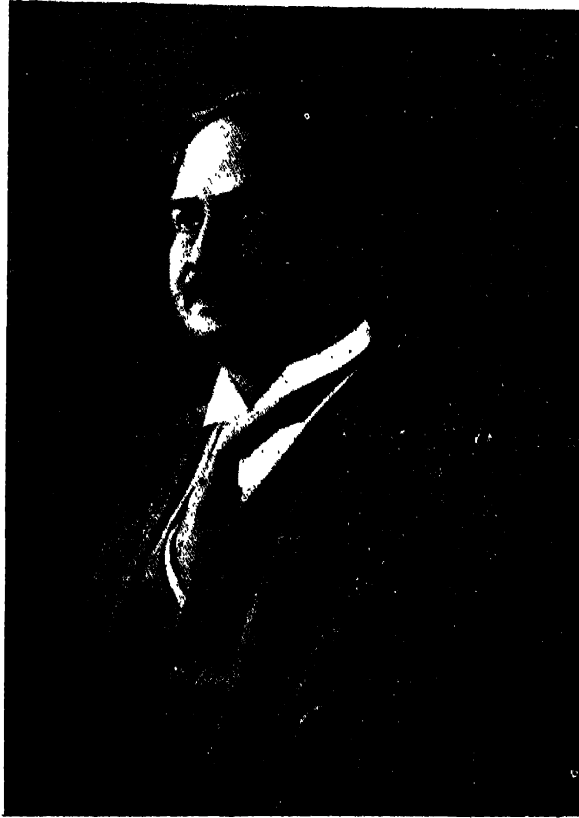
স্যার হরিশঙ্কর পাল, নাইট্

উপর বিস্তারিত হইয়া তাঁহাকে সমাজের ও দেশের একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি হইবার মত শক্তি, সামর্থ্য দান করিয়াছিল।

মোহিনী মোহনের বাল্য জীবন ও পাঠ্য জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি যে কেবল একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মনিষী ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু যে সব গুণের অধিকারী হইলে সংসারে একজন কীর্ত্তিমান পুরুষপ্রধান হইয়া মৃত্যুকালে এক অতি উচ্চ মহান আদর্শ রাখিয়া যাইতে পারেন সে সমস্ত গুণের আভাষ ও পরিচয় সে সময় যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছিল। কবি

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'child is the father of man' এই কথাটী তাঁহার বাল্যে ও কৈশোরের অবস্থায় প্রয়োগের সম্পূর্ণ উপযোগী। সেকালের স্কুলের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষাগুলিতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া নানাবিদ্যার অধিকারী হইয়াছিলেন। প্রথম চাকুরীজীবনে অল্প মাহিনায় নিযুক্ত হইলেও স্বীয় প্রতিভা, জ্ঞান ও কর্ম্মকুশলতার দ্বারা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—এরূপ অসাধারণ উন্নতি তাঁর বহু সদগুণের পরিচায়ক সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ধর্ম্মভীরুতা ও স্বাধীনমতানুবর্ত্তিতা চাকুরীজীবনেও তাঁহাকে তুচ্ছ ধন অথবা ক্ষমতাপ্রিয়তার দাস করিতে পারে নাই। তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতা এবং সত্য ও ন্যায়ের উপাসকেরাই দেশের ও দশের কল্যাণ সাধনে সক্ষম। সর্ব্ববিষয়ে তাঁর ঐকান্তিকতা অতীব প্রশংসনীয় ছিল। 'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না' এই উক্তির সার্থকতা তাঁর দীর্ঘ জীবনে সর্ব্বদাই উপলব্ধি করিতেন এবং সেইজন্যই চটুল ও বাক্‌চাতুর্য্যাশ্রয়ী লোকদের অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, কর্ম্মদক্ষতা ও তীক্ষ্ণমেধার পরিচয় দিয়া তিনি সরকারীকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও তারপর সুদীর্ঘ সাতাইশ বৎসর দেশের কল্যাণচিন্তায় ও হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

জাতীয়তা ও স্বদেশবৎসলতা দ্বারা অনুপ্রাণিত মোহিনীমোহনের চিন্তা দেশবাসীর সেবাকল্পে নিয়োজিত হইল। ক্রমশঃ বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের আন্দোলন ঘনীভূত হওয়াতে চারিদিকে স্বাদেশিকতা প্রচারিত হইতে লাগিল এবং তাঁর প্রখর উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে তিনি বাংলার বস্ত্রশিল্প প্রসারের অতীব প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। একটী কাপড়ের কল সংস্থাপনার পরিকল্পনা ক্রমশঃ আকার ধারণ করিল। এই 'মোহিনী মিল' আজ বাংলার বড় আদরের, বড় গৌরবের জিনিস। আজ বাংলায় কতকগুলি কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকেশ্বরী, বাসন্তী, বঙ্গেশ্বরী, বঙ্গোদয়, বঙ্গলক্ষ্মী, বঙ্গশ্রী, যতীন্দ্রমোহন, প্রফুল্লচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, শ্রীদুর্গা, ইষ্টবেঙ্গল, ত্রিপুরা, কামাখ্যা ইত্যাদি কাপড়ের কল আমাদের লজ্জা নিবারণের চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু যে সময়ে 'মোহিনী মিল' কল্পিত ও স্থাপিত হয় তখন এক বঙ্গলক্ষ্মী ব্যতীত আর কোন মিল ছিল না। বস্ত্রশিল্পে বাংলার এই দুর্দ্দশার ইতিহাস বড়ই করুণ। চিরকাল এরূপ ছিল না। অতি প্রাচীনকাল হইতে বাংলা বয়ন শিল্প ও বস্ত্র ব্যবসায়ের একটী বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এই শিল্প কিরূপে নিষ্পেষিত হইল এবং বাঙ্গালী কিরূপে এই শিল্প বিস্মৃত হইল তাহার উল্লেখ করিতে চাই না। ঢাকার মসলিন যাহা কেবল বাংলা নয়, ভারতবর্ষও নহে সুদূর পাশ্চাত্যেও যথেষ্ট আদরের সহিত গৃহীত হইত, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিবে। সে যাই হোক, আজ বাঙ্গালী জাতি যে শিল্পজগতে মস্তকোত্তলন করিয়া দাঁড়াইয়া আবার সোণার বাংলার নষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে তাহাতে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কি রাষ্ট্রীয়, কি সামাজিক জীবনে আমরা বাঙ্গালীর উন্নতি চাই এবং সে উন্নতি যে সুদূরপরাহত নহে তাহাও বেশ উপলব্ধি হয়। কারণ আমরা ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করিতেছিনা।

অবশ্যই এ কথা মানিতে হইবে যে স্বদেশী আন্দোলনে যখন বঙ্গব্যবচ্ছেদের পর চতুর্দ্দিকে স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য দেশবাসীর আকাঙ্খা ও আগ্রহ দেখা দিল, যখন এই বাংলাই হাড়ে হাড়ে বুঝিল যে বস্ত্রের জন্য কি পরিমাণে তারা পরমুখাপেক্ষী, তখন সেই সুবর্ণ-সুযোগেও বাংলা অপেক্ষা বোম্বাই প্রদেশ বয়ন শিল্পে ও বস্ত্র ব্যবসায়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং তথাকার কাপড়ের কলগুলি প্রসার লাভ করিয়া বাংলাকে বস্ত্র যোগাইতে লাগিল। আজও বাংলার বস্ত্রের চাহিদা মিটাইতেই বাঙ্গালীকে বৎসরে ১৬।১৭ কোটী টাকা খরচ করিতে হয়। দুঃখের বিষয় এই টাকার মধ্যে মাত্র এক কোটি বা কিঞ্চিৎ অধিক এক কোটী টাকার বস্ত্র বাংলাতে উৎপন্ন হয়। যখন এই সব চিন্তা করি তখনি সেই কর্ম্মবীর, দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন মহাপ্রাণ মোহিনীমোহনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁর প্রদর্শিত পথে চলিয়া এখনও ৫০০ তাঁত এবং ২০,০০০ টাকুর আরও ৮০টি কল যদি আমরা স্থাপনা করিতে পারি তবেই বাংলার বস্ত্রের চাহিদা এখানেই মিটাইতে পারা যায়। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শ্রেষ্ঠ খনিজ সম্পদ কয়লার ব্যবসারও উন্নতি জড়িত। আপনারা বোধ হয় জানেন যে এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন পশ্চিম ভারতীয় মিলগুলি নানা কারণে বাংলার কয়লার পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করিয়াছিলেন। যাহার প্রতিক্রিয়া এখানকার খনিগুলির উপর বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছিল। এখানে যতই বয়ন শিল্পের উন্নতি হইবে, অন্য অনেক শিল্পও প্রসার লাভ করিবে। তুলার চাহিদা বাড়িবে এবং তুলা উৎপাদন দ্বারা বাংলার সম্পদ আরও বৃদ্ধি হইবে। বাঙ্গালার প্রয়োজনীয় বস্ত্রের সুতা তৈয়ার করিতে প্রায় ৪ কোটী টাকার তুলার দরকার। বাস্তবিকপক্ষে বলিতে গেলে প্রাদেশিকতা আমি ঘৃণা করি কিন্তু বাংলার বাহিরে অন্য প্রদেশের ব্যবসায়ীগণের দৃষ্টান্ত অনুকরণে আমার বাঙ্গালী ভাইরা যত বেশী কষ্টসহিষ্ণু, সঞ্চয়শীল ও স্বজন বৎসল হয় ততই মঙ্গল।

আজ বাংলার ভূস্বামীসমাজ বিপন্ন কিন্তু যদি এখনও তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারে বিশেষ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, তাঁদের এই দুর্দ্দিনের শেষ হয়। একা, অর্থের অতি প্রাচুর্য্য ব্যতিরেকেও মোহিনীমোহন যদি 'মোহিনী মিলের' স্থাপয়িতা-রূপে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন, ভূস্বামী সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় যে আরও অধিক ফল হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

যে কর্ম্মপ্রেরণা মোহিনী মোহনের সমগ্র জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সেই কর্ম্মপ্রেরণা আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া মোহাচ্ছন্ন আমাদিগকে জাগাইয়া তুলুক, ইহাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি। তাঁর আদর্শ নিয়া আমাদিগকে বিলাসিতা, আলস্য ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মঠ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে হইবে; তবেই বাণিজ্য করিবার শক্তি সঞ্চয় হইবে। মোহিনী মোহনের সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় ছিল এবং ইহাই তাঁর উন্নতির মূল কারণ। ধর্ম্মভীরু হইয়া তাঁর দ্বারা অন্যায় ও অসত্য বিষয়ে লিপ্ত হওয়া অসাধ্য ছিল। তিনি যেমন অন্যায়ের প্রতি কঠোর ভাব পোষণ করিতেন, তেমনি উপযুক্ত বিষয়ে কুসুমের ন্যায় কোমল ছিলেন। হৃদয় তাঁর মহৎ ছিল।

নিউ এশিয়াটিক লাইফ ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানী

১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট

হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

১৯৩৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইল, উহা কোম্পানীর তৃতীয় বৎসর। এই বৎসরে ৪২৭০৭৫০৲টাকা মূল্যের ২৪৭৪টী বীমার প্রস্তাব কোম্পানী পাইয়াছে। তন্মধ্যে ৩০৬৬৭৫০৲ টাকা মূল্যের ১৮১৫টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহাদের সম্পর্কে পলিসি ইস্থকরা হইয়াছে। স্থতরাং দেখা যায়, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কাববারের পরিমাণ শতকরা ২২ টাকা বাড়িয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর আয়ের পরিমাণ হইয়াছে, ২৬৫৮৪৮৲ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবতে ২৪২২৬২৲ টাকা, স্থদ ও ডিভিডেণ্ড বাবতে ৩০৯০৲ টাকা, শেয়ার বিক্রয়ের প্রিমিয়াম ১৮৭৩৭ টাকা, সিকিউরিটী বিক্রয়ের লাভ ১৬২১ এবং অন্যান্য বাবতে ১৩৭ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায়, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আয় বাড়িয়াছে শতকরা ৮০ টাকা।

খরচ হইয়াছে মোট ২৩৫৯২৮ টাকা। তন্মধ্যে পলিসির দাবী শোধ বাবতে ৩৩৭৫৩ টাকা, পরিচালনা খরচ বাবত ১৭৯৪২৭ টাকা, শেয়ার বিক্রীর দালালী ১৮৭৩ টাকা, প্রাথমিক ও গঠন খরচা মোট ৩৭২৬ টাকা এবং আসবাব পত্রের মূল্য হ্রাস দরুণ ৫৬৯ টাকা খরচ হইয়াছে। এই সকল খরচ দিয়া জীবন বীমা তহবিল দাঁড়াইয়াছে ৩০১২৩ টাকা।

কোম্পানীর গঠনকার্য্যেরও বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। ভারতের প্রায় সকল প্রধান প্রধান সহরে ইহার ব্রাঞ্চ ও চীফ এজেন্সী স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহার বোম্বাই আফিসের অধীনে আফ্রিকা ও ফরাসী ভারতেও কোম্পানীর কারবার প্রসারিত হইয়াছে।

কোম্পানীর লগ্নীর পরিমাণ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে এক লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য সিকিউরিটিতে ৩৫৬০০টাকা। হিসাবের খাতায় সিকিউরিটিতে যে মূল্য ধরা হইয়াছে, বাজার দর তাহা অপেক্ষা ৫০০০ টাকা অধিক। কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২১৩৪৭১ টাকা এবারেও ম্যানেজিং এজেণ্টগণ তাঁহাদের পারিশ্রমিক বাবদ্ বেতন ছাড়িয়া দিলেন। কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইতে এযাবৎ তাঁহারা কোন বেতন গ্রহণ করেন নাই। এই তিন বৎসরে তাঁহারা প্রায় ৩৮০০০ টাকা ছাড়িয়া দিলেন।

অনেকের অনুরোধে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ (শতকরা ৫০ টাকা প্রিমিয়ামে) ৫০০০ নূতন শেয়ার বিক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার জন্য এত দরখাস্ত আসিয়াছিল যে, তাঁহারা শতকরা ৪০ খানা দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, কোম্পানী জনসাধারণের মধ্যে কিরূপ বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিয়াছে।

গত ১৯৩২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী করাচীর ইউনাইটেড্ ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট হইতে মহেন্দ্র নাথ পাইন নামক একব্যক্তি জীবন বীমা করিয়া তিন হাজার টাকার একটি পলিসি নেয়। ঐ বৎসর ১লা এপ্রিল তারিখে মহেন্দ্র নাথ সেই পলিসি রাজবালা দাসীর নামে এসাইন করে। ১৯৩৪ সালের ১৪ই জুলাই মহেন্দ্র নাথ পাইনের মৃত্যু হয়। তারপর রাজবালা দাসী কোম্পানীকে যথারীতি মৃত্যুর নোটীশ ও প্রমাণাদি দিয়া পলিসির টাকা দাবী করে। কিন্তু কোম্পানী নানা ছল ছুতা করিয়া টাকা দেয় না। অবশেষে রাজবালা আদালতে নালিশ করে। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ জাষ্টিস্ প্যাংক্রিজের এজলাসে মামলার বিচার হয়। সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া বিচারক খরচ সহ এবং পলিসির বোনাস্ আদি সহ সমস্ত দাবীর টাকা ডিক্রী দিয়াছেন।

এশিয়ান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর একজন অংশীদার মিঃ সি পারেখ, উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ যমুনা দাস মেটা এবং ম্যানেজার মিঃ সি এ ফৌজদারের বিরুদ্ধে বোম্বাইর চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহারা কোম্পানীর য্যাক্চুয়ারীর নিকট হইতে ১৯২১-২৫ সালের জন্য একটা মিথ্যা ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট আদায় করিয়া তদনুসারে লাভের উপর ডিভিডেণ্ড দিয়াছেন। বাস্তবিক সেই ৫ বৎসর কোম্পানীর কোন লাভই হয় নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ নিজেদেরে নির্দ্দোষ বলিতেছেন। আদালতে মামলা চলিতেছে।

অল্ ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি লাইফ এণ্ড এসিওরেন্স কোম্পানী ডিপজিটের সমস্ত টাকা না দেওয়ায় এবং রীতিমত ব্যালেন্স্ সীট্ দাখিল না করায় গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে উক্ত

কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা উত্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাইর চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এই মামলার বিচার চলিতেছে।

রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর কলিকাতা, এই ঠিকানায় অবস্থিত ওরিয়েণ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের দুইজন ডিরেক্টার (বি বি চক্রবর্ত্তী এবং জে এল কুণ্ডু) ও ম্যানেজার ১৯৩৫ সালের ব্যালেন্স সীট্‌ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র যথা সময়ে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল না করায় প্রত্যেকে ৭৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আফিসের সম্মুখে যথারীতি সাইন বোর্ড না রাখার অভিযোগে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আর এক মামলা উত্থাপিত হইয়াছে।

ব্যাঙ্গালোর সহরে গত ৮ মাস যাবৎ একটা বড় রকমের প্রতারণার মামলা চলিতেছিল ;—সম্প্রতি তাহা শেষ হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে তথায় ডনেশান ইউনিয়ন লিঙ্ক (Donation Union Link on Railways) নামে এক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের রেলওয়ের ৫০ হাজারের অধিক কর্ম্মচারী তাহার শেয়ার কিনিয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার ভিতরকার বিরাট জুয়াচুরী ধরা পড়ে; তাহাতে প্রায় এক লক্ষ টাকার তহবিল তছরূপ দেখা যায়। যথা সময়ে পুলিশ তদন্তের পর অডিটার সহ পাঁচ জন আসামী অভিযুক্ত হয়। দীর্ঘকাল মামলা চলিবার পর, বিচারক প্রধান আসামী অডিটার সুবিয়া নাইডুর ৭ বৎসর সশ্রম কারাবাস ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন। জরিমানার টাকা না দিলে আরও ১৮ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আর একজন আসামীর ৫ বৎসর সশ্রম জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা (অনাদায়ে আরও এক বৎসর সশ্রম কারাবাস) হইয়াছে। অন্য তিন জন আসামী খালাস পাইয়াছে।

গত ১৫ই নভেম্বর ইণ্ডিয়ান ইন্‌সুর্যান্স্‌ কোম্পানীর য়্যাসোসিয়েসানের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ ডি পি খৈতান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯৩৭-৩৮ সালের জন্য নিম্ন লিখিত চারিজনকে লইয়া নূতন কমিটী গঠিত হইয়াছে ;—মিঃ ডি পি খৈতান, মিঃ এফ্‌ বি মেইটল্যাণ্ড, মিঃ কে এম্‌ নায়েক, মিঃ এম্‌ এ এ আনসারি।

আমরা অবগত হইলাম, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের য়্যাকচুয়ারী মিঃ এন্‌ এস্‌ মুথুস্বামী এম্‌ এ, বি এল, এ আই এ সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্টের য়্যাকচুয়ারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি এ বৎসর এফ্‌ আই এ পরীক্ষায় প্রথম অংশে পাশ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বে কিছুকাল তিনি ভারত ইন্‌সুর্যান্স কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

মিঃ ভানুপ্রসাদ এ ত্রিবেদী অশোক ইন্‌সুর্যান্স কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আহমদাবাদের ওয়ার্ডেন ইন্‌সুর্যান্স কোম্পানীতে অর্গ্যানাইজারের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন।

লাহোরের লক্ষ্মী ইন্‌সুর্যান্স কোম্পানীর উড়িষ্যার চীফ্‌ এজেণ্ট মিঃ গোদাবরী মিশ্র উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত ১৪ই নভেম্বর ১ নম্বর মিশন রোডে নাগপুর পাইয়োনীয়ার কোম্পানীর প্রশস্ত হলে ভারতীয় সাংবাদিক সংঘের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। শারদীয় অবকাশের পর ভারতীয় সাংবাদিক সংঘের সভ্যদিগের প্রীতি সম্মেলনের ব্যবস্থা অনেকদিন হইতে প্রচলিত আছে। এই গুরুভার সংঘের এক এক জন সভ্য এক এক বৎসর গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবার নাগপুর পাইয়োনীয়ার কোম্পানীর কলিকাতা শাখার সেক্রেটারী মিঃ বি কে গুপ্ত এই সম্মেলনের আয়োজন ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাগৃহ যেমন সংসদের সভ্য, বন্ধু, বান্ধব এবং অতিথি অভ্যাগতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল তেমনি নানারূপ সুস্বাদু খাদ্যের আয়োজন করিয়া মিঃ গুপ্ত সকলকে পরিতোষ সহকারে জলযোগ করাইয়াছিলেন। সভায় বন্দেমাতরং সঙ্গীত গীত হয়। এবারকার সভার বিশেষত্ব ছিল এই যে কলিকাতা কর্পোরেশনের Chief Executive Officer মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জী সাংবাদিক সংঘ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া বিশেষ অতিথিরূপে এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এক চিত্তাকর্ষক এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিশেষ বিশেষ কয়েকটী কথা আমরা এইখানে প্রকাশ করিলাম :—

১। ইউরোপ ভ্রমণ করিতে গেলে ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। জার্ম্মান ভাষা শিখিতে পারিলে মধ্য ইউরোপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আহরণ করা যায়; কিন্তু ফ্রেঞ্চ না জানিলে ইউরোপ ভ্রমণ এক চোখে দেশটা দেখা ছাড়া অন্যান্য সব ব্যাপারে বৃথা হইয়া যায়। হিন্দী জানিলে যেমন এক মান্দ্রাজ ছাড়া ভারতের আর সব প্রদেশেই মোটামুটী একরকম কথাবার্ত্তা চালানো যায় তেমনি ফ্রেঞ্চ জানিলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই সকলের সহিত একরকম কথাবার্ত্তা কওয়া যায়। ফ্রেঞ্চ না জানায় তাঁহাকে যে কত অসুবিধায় পড়িতে

নাগপুর পাইওনীয়ার কোম্পানীর কলিকাতা শাখার সেক্রেটারী
মিঃ বি, কে, গুপ্ত

হইয়াছিল তাহার অনেক হাস্যোদ্দীপক ঘটনা তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন। দোভাষী না পাওয়ায় জায়গা বিশেষে পরস্পরের কথা বুঝিবার এবং বোঝাইবার জন্য desperate চেষ্টা এবং তাহা সত্ত্বেও ধান চাহিতে মান আনার অনেক কৌতুকপ্রদ কাহিনী শোনাইয়া মিঃ মুখার্জ্জী শ্রোতাদের আনন্দ দিয়াছিলেন।

২। জার্ম্মাণীতে হিট্‌লারিজমের ফলে একদিকে জার্ম্মাণী তাহার লুপ্ত ধনসম্পদ মান প্রতিপত্তি সবই একে একে উদ্ধার করিয়া লইয়াছে এবং লইতেছে সত্য, কিন্তু অপর দিকে সেখানে ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং সাধনা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র জাতিটাই যেন মেসিনের মত একটা কল টিপিলেই চলিতেছে এবং থামিতেছে। হিট্‌লারের কথায় দ্বিরুক্তি বা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সমগ্র দেশ উঠিতেছে, বসিতেছে এবং চলিতেছে।

ব্যক্তিত্বের—বিকাশ আর সেখানে নাই। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে জার্ম্মাণীর প্রাণের মধ্য হইতে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে। জার্ম্মাণীর রাস্তা ঘাট, মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা ইত্যাদি খুবই সুন্দর। তাহাদের ব্যবস্থা প্রণালী হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে।

৩। ইংলণ্ডের মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে লণ্ডনের মিউনিসিপ্যাল শাসন প্রণালী দুইটী প্রধান অংশে বিভক্ত। মিউনিসিপ্যাল বরো এবং লণ্ডন সিটি কাউন্সিল। পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন অংশে এই সকল Borough স্থাপিত। মিউনিসিপ্যালিটীর যে সকল দৈনন্দিন কাজ তাহা এই সকল Borough Council দ্বারা সম্পাদিত হয় আর বৃহত্তর কাজগুলি যেমন Water Supply, Lighting, Conservancy, Sewerage, Hospitals, Primary and Secondary Schools—এই সকল বৃহৎ ব্যাপার পরিচালনার ভার City Council এর উপর ন্যস্ত আছে।

এই সকল বিষয়ে মিঃ মুখার্জ্জী অনেক চিত্তাকর্ষক এবং সারগর্ভ সংবাদ দিয়াছিলেন। ফলে এবারকার মিলন চারিদিক দিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছিল। আমরা মিঃ গুপ্তকে এজন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গত ১৬ই নভেম্বর সাতারা নগরীর Western India Life Insurance Co.র কলিকাতাস্থ চীফ এজেণ্টস্ তাঁহাদের কোম্পানীর এজেন্সী ম্যানেজারকে সম্বর্দ্ধনার জন্য ইম্পিরিয়াল রেস্তোঁরাতে এক সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। বীমা রাজ্যের বহু বিশিষ্ট লোক এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। সমাগত অতিথি দিগকে ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। আহারাদির পর Western Indiaর Agency ম্যানেজার কোম্পানীর সূচনা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক বিবরণ প্রদান করেন এবং কেমন করিয়া এই কোম্পানী ধাপে ধাপে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছে তাহা বিবৃত করেন। উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, Agency manager কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া Western Indiaর বিশেষত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় এই সম্মিলনীর উদ্যোক্তাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গত ৮ই ডিসেম্বর ভারতীয় সংবাদ পত্র সেবীদিগের এক বিশেষ অধিবেশনে ডাঃ

বিধান চন্দ্র রায়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। ডাঃ রায় গত কয়েক মাস যাবৎ ইউরোপের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই উপলক্ষে সংবাদপত্র—সেবীগণ তাঁহার নিকট হইতে ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নানা বিষয় জানিবার জন্য এই সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। ভারত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতাস্থ ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী মিঃ অশোক চাটার্জি এই সান্ধ্য সম্মিলনের সমস্ত আয়োজন ও ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ডাঃ রায় তাঁহার ইউরোপের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা হইতে আমরা কয়েকটি বিষয় এখানে তুলিয়া দিলাম।

স্বাধীনতা লাভ করিয়া ইজিপ্টের তিনি যে নূতনরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন সে সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছু বলেন। স্বাধীনতার আস্বাদ পাইলে মানুষের হাব ভাব, আশা আকাঙ্খা, চিন্তা ও চরিত্র যে কি আশ্চর্য্যরূপে বদলাইয়া যায় তাহা বর্ত্তমান ইজিপ্টের চারিদিকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীলনদের উভয় তীরে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্যের যে সকল নূতন নূতন উন্নতিকর অনুষ্ঠান সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই সকল ব্যবস্থা আমাদের দেশে কিরূপে প্রচলন করা যাইতে পারে সে বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। অতঃপর প্যালেষ্টাইনে ইহুদি এবং আরবদিগের মধ্যে বর্ত্তমান সংঘর্ষের মূল কারণ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য তিনি প্রকাশ করেন।

প্যালেষ্টাইনের ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে বাইবেল বর্ণিত যে সকল ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানের কথা আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি সেই সকল স্থান নিজে দেখিয়া আসিয়া ডাক্তার রায় বিশেষ বিবরণ প্রদান করেন। ইতালী হইতে আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের মধ্যদিয়া মোটর যোগে তিনি ভিয়েনায় গমন করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার ভ্রাতৃবধূ মিসেস্ সাধন রায় এবং তাঁহার ভাইঝী মিস্ রেণুরায় বি, এ, ছিলেন। এ অঞ্চলে সাড়ী পরা স্ত্রীলোক কেহ কখনও দেখে নাই। তাই পথিমধ্যে কোনও হোটেলের সম্মুখে তাঁহাদের মোটর থামিলে শত শত গ্রাম্য স্ত্রীলোক ছুটীয়া আসিয়া এই দুইজন ভারতীয় রমণীকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল এবং নানারূপ প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল; ফলে পুলিশের সাহায্যে ভিড় সরাইয়া তবে তাঁহারা পুনরায় মোটরে চড়িতে পারিয়াছিলেন।

জার্ম্মানীতে হিটলারিজমের কুফল সম্বন্ধে মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জী যেরূপ বলিয়াছেন, ডাক্তার রায়ও সেইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। বেলজিয়ামের অষ্টেণ্ড্ প্রভৃতি সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান সকল ইউরোপের,—বিশেষতঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর সৌখীন যুবকযুবতী-দিগের প্রমোদ ক্রীড়ার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি বা অখ্যাতিলাভ করিয়াছে। এখানে সমুদ্রতীরে যুবকযুবতীরা এতকাল ধরিয়া উলঙ্গ অথবা অর্দ্ধ নগ্ন দেহে সূর্য্য কিরণ সম্ভোগ, সমুদ্রে সাঁতার ও নানারূপ খেলাধুলায় মত্ত থাকিত। সম্প্রতি এই সকল সৌখীন সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে ডাক্তার রায় যে উল্টা হাওয়া বহিবার গতি দেখিয়া আসিয়াছেন সে বিষয়ে কিছু বলেন। এই সকল স্থানে, ইংরাজী, লাটিন ও ফ্রেঞ্চভাষায় তিনি নানা প্রাচীর পত্র (Placards) আঁটা দেখিতে পান। তাহার মর্ম্ম এই যে "দুর্নীতি যেমন

মানুষকে নাশ করে তেমনি জাতিরও ধ্বংসের কারণ হয়”। “নৈতিক উন্নতি ব্যতীত জাতীয় উন্নতির আশা সুদূর পরাহত”। “মনে প্রাণে দুর্নীতি পরিহার করিবে”। ইত্যাদি। মিঃ অশোক চ্যাটার্জ্জী অতিথি অভ্যাগতদিগের জন্য প্রচুর ইংরাজীখানা পিনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং নিমন্ত্রিতদিগের আদর আপ্যায়ণ করিয়াছিলেন। ভারত ইন্‌সিওরেন্সের আতিথ্য সংকার একটা জনশ্রুতির মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা অশোক চ্যাটার্জ্জীকে আমাদিগের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতের কলিকাতা শাখার সেক্রেটারী—
মিঃ অশোক চ্যাটার্জ্জী।

ইণ্ডিয়ান সোপ জর্ণালের সুযোগ্য সম্পাদক Hardware merchant মিঃ এ, টি, গাঙ্গুলী 162 Southern Avenueতে অতি রমণীয় এক বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। বাড়ী খানিকে “মর্ম্মর প্রাসাদ” বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নানা রঙ্গের মার্ব্বেল এবং Mosaic work এর সম্মিলনে বাড়ীখানি ছবির মত দেখিতে হইযাছে। এই নব গৃহে প্রবেশের উপলক্ষ্যে আশুবাবু তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে এক সান্ধ্যসম্মেলনে নিমন্ত্রিত এবং ভুরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। আশুবাবুর জীবনের বৈশিষ্ট্য এই যে নিজে গৃহ প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি বিক্রমপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং এইজন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা এই মহাপ্রাণ দরদী বন্ধুর স্বাস্থ্য এবং সৌভাগ্য কামনা করি।

১৯৩৭ সালের ৩০ শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট

আমরা হিন্দুস্থানের ত্রিংশৎ বার্ষিক হিসাব ও রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম ও সমালোচনা প্রকাশিত হইল। হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন বীমার পরিমাণ :—

আলোচ্য বৎসরে ৩৬৮৮৬১৭৫ টাকা মূল্যের ২২১৯০টী নূতন বীমার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ২৮৩৬৩৭৫০ টাকা মূল্যের ১৭৬৪৭ টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহার উপর পলিসি ইস্যুকরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে পুনর্ব্বীমার পরিমাণ ৩৪০০৮৯ টাকা।

মোট বীমার পরিমাণ :—

বৎসরের শেষে চল্‌তি পলিসির মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭৭৫৬১। ইহাদের বীমার পরিমাণ মোট ১২৮৫৪১৯২৪ টাকা। তন্মধ্যে পুনর্ব্বীমার পরিমাণ ৭৩৪৪৯৬ টাকা।

আয় ব্যয় :—

(১) শেয়ার হোল্ডারদের হিসাবে গত বৎসরের জের ৫৯৬ টাকা সহ মোট আয় হইয়াছে ৭২৫৪৭ টাকা। তন্মধ্যে ভূমি সম্পত্তির বিক্রয়ের দরুণ লাভ এবং অন্যান্য বিবিধ আয় মিলাইয়া ৭১৯৫১ টাকা পাওয়া গিয়াছে। খরচ হইয়াছে মোট ৭১২৪৭ টাকা। তন্মধ্যে পরিচালনা খরচ ৪৯৯৭ টাকা। কম্বাইণ্ড্ ফাণ্ড্ ও কম্বাইণ্ড্ পলিসির দাবীর জন্য ৬৬২৫০ টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট ১৩০০ টাকা হাতে আছে।

(২) পলিসি হোল্ডারদের হিসাবে,—মোট আয় হইয়াছে ২৭৩৩০৪৯ টাকা। তন্মধ্যে পলিসি হোল্ডারদের জের তহবিলের পরিমাণ ১৯৮২৭৪৭৭ টাকা; প্রিমিয়াম বাবতে আয় (কম্বাইণ্ড্ পলিসির প্রিমিয়াম ৪৭৩০০ টাকা সহ) মোট ৬২৫৯৯১৭ টাকা। সুদ, বাড়ী ভাড়া প্রভৃতিতে আয় হইয়াছে ১২৪৩০১৪ টাকা। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৪০৩২৪৬২ টাকা; তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই,—পলিসির দাবী বাবত ১৬৪২৮৯৮ টাকা (কম্বাইণ্ড ও সাধারণ)

সারেণ্ডার বাবত	৩৯২২৮১ টাকা
ভ্যালুয়েশন খরচ	১৩৭২৭ টাকা
ইনকম্ ট্যাক্স	৫০৭৭৮ ,,
পরিচালনা খরচ	১৯৩২৭৭৪ ,,

এইসব খরচ বাদে রিজার্ভ ফাণ্ডে এক লক্ষ টাকা এবং পলিসি হোল্ডার ফাণ্ডে ২৩১৯৭৯৪৭ টাকা রাখা হইয়াছে। কম্বাইণ্ড পলিসির দাবী মিটাইবার জন্য অংশীদারদের তহবিল

হিন্দুস্থানের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান

কুমার কার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিক

হইতে ৪৭৩০০ টাকা দেওয়া হয়। এখন হইতে কম্বাইণ্ড পলিসি বাবতে অংশীদারদের স্কন্ধে আর কোন দেনার ভার রহিল না।

সম্পত্তি ও দায় ঃ—

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৬০৬৭৫৭৮ টাকা। তাহার বিস্তারিত হিসাব এই,—

ভূমি সম্পত্তি বন্ধকী ঋণ	৬৭৫৭৯৩৬ টাকা	ভারতবর্ষে অবস্থিত		
পলিসি বন্ধকী ঋণ	২৩৬৮৮৬২ ,,	গৃহ-সম্পত্তির মূল্য	৩৩০০৮৫১	,,
অন্যবিধ	৫৮০১৫ ,,	ভারতবর্ষে অবস্থিত		
লগ্নীর পরিমাণ	৭৩৮৫৮১১ ,,	ভূমি সম্পত্তির মূল্য	২২৫৮৭৫৩	
ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত ঋণ	২৮৮৬৩৭	আসবাব পত্র, যন্ত্রপাতি ও ষ্টক্	১৩২৭১০	

হিন্দুস্থানের ভূতপূর্ব্ব জেনারেল ম্যানেজার

অনারেবল শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার

কম্বাইণ্ড ফাণ্ডের জন্য নির্দ্ধারিত মূলধন	৩৩২০০০ টাকা
অনাদায়ী সুদ, প্রিমিয়াম অগ্রিম দাদন প্রভৃতি	১৮৬১০৯৫ ,,
নগদ জমা	১৩২২৯০৩ ,,

কোম্পানীর দায়ের দিকে প্রধান কয়েকটী এই ;—

য্যাসুর‍্যান্স ও ইন্সুর‍্যান্স ফাণ্ড,—	২৪৩৪৩৯০৩ ,,

গৃহ সম্পত্তির মূল্য হ্রাস, সন্দেহজনক ঋণ, এবং কন্টিঞ্জেন্সীর

দরুণ রিজার্ভ ফাণ্ড মিলাইয়া	৪৬৯৯১০ ,,
অংশীদারের মূলধন	৪৪১৫৯৫ ,,
(কম্বাইণ্ড ও সাধারণ সহ) অন্যান্য দেনা	৮১০৮৬৯ ,,
অংশীদারদের হিসাবে খরচ বাদে জমা	১৩০০ ,,

আলোচ্যবর্ষে সাধারণ পলিসির দরুণ প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে ৬২১২৬১৭ টাকা এবং জীবনবীমা তহবিলের উপর স্বদের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২৪৩০১৫ টাকা। বৎসরের আরম্ভে জীবন বীমা তহবিল ছিল ১৯৮২৭৪৭৭ টাকা; বৎসরের শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩১৯৭৯৪৭ টাকায় উঠিয়াছে। সুতরাং বাড়তির পরিমাণ ৩৩৭০৪৭০ টাকা অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১৮ টাকা।

১৯৩৭ সালের ৩০ শে এপ্রিল পর্য্যন্ত কোম্পানীর পঞ্চবার্ষিক ভ্যালুয়েশনের কাগজ পত্র উহার লণ্ডনস্থিত য়্যাক্‌চুয়ারী তৈয়ারী করিতেছেন। এযাবৎ যতদূর জানা গিয়াছে,—তাহার ফলাফল বিশেষ সন্তোষজনক হইবে, আশা করা যায়।

হিন্দুস্থানের এইবারের হিসাবে একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উহার কম্বাইণ্ড পলিসির দায় একেবারে মিটিয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠার সময় স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ উকীল এই "কম্বাইণ্ড পলিসি" প্রচলিত করিয়াছিলেন। এই "Combined Policy"র সাফল্য এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে বীমা মহলে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় এবং তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট এ্যাক্‌চুয়ারী ইহা বন্ধ করিয়া দিতে বলায় কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে আর কম্বাইণ্ড পলিসি ইস্যু করা হইবে না এবং যেসকল কম্বাইণ্ড পলিসি বর্ত্তমান আছে, তাহার দাবী অংশীদারদের লাভের টাকা হইতে মিটাইতে হইবে। এই উপায়ে হিন্দুস্থান রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু অংশীদারগণ তাঁহাদের লাভের টাকা হইতে বঞ্চিত হইলেন। যাহা হউক, শত্রুপক্ষীয়েরা "হিন্দুস্থান গেল গেল" বলিয়া যে রব তুলিয়াছিল,—তাহাদের সেই ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা হইয়াছে;—তাহারা যে দেশব্যাপী আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অমূলক প্রমাণিত হইয়াছে। হিন্দুস্থানের অংশীদারগণের স্বার্থত্যাগ এবং পরিচালকগণের সুব্যবস্থাই ইহার কারণ। কম্বাইণ্ড পলিসির দায় একটা গুরুভার প্রস্তরের মত হিন্দুস্থানের মস্তকে চাপিয়া ছিল। এইবার তাহা অপসারিত হওয়াতে আমরা আশা করি হিন্দুস্থান অধিকতর দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৭শ বর্ষ | মাঘ---১৩৪৪ | ১০ ম সংখ্যা

অন্যায় ধর্ম্মঘটের কুফল

বাংলাদেশে শ্রমিক অশান্তির অন্ত নেই। এই অশান্তির মূলগত কারণ হচ্ছে যে, শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী মেটানো হয় না। শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবীগুলি যদি ন্যায্য হয় এবং তা' যদি মেটানো না হয়ে থাকে তাহ'লে সে-ব্যাপারটা অন্যায় বলেই পরিগণিত হ'বে। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় শ্রমিক-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, তাতে আমরা সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছি যে, উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য শ্রমিকদের দুরবস্থা দূরীভূত করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বেও বলেছি এবং এখনো বলছি যে, নিজেদের দাবী রক্ষার্থ শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করবার অধিকার আইন-সঙ্গত, কিন্তু সে-ধর্ম্মঘট বিধিসঙ্গতভাবে হওয়া চাই। অর্থাৎ সামান্য কারণে অপরের প্ররোচনায় অন্যায়ভাবে যেন সে-ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হয়, পরন্তু সমস্ত অবস্থা বিশ্লেষণ করে যেন সে-জিনিষটি পরিচালিত হয়। এই সংক্রান্ত বিষয়ে একথাটা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, অর্থশোষণকারী মালিকদের জব্দ করতে গিয়ে আমরা যেন শিল্পটির ক্ষতি করে না বসি। এইটাই হ'ল ধর্ম্মঘটের ক্ষেত্রে আসল কথা।

কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর উল্টোটি ঘটছে। শ্রমিকদের উন্নতির নামে অনেকস্থলে দেশীয় শিল্পোন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। যাঁরা এ-কাজ করেন তাঁরা দেশের শত্রুতা সাধন করবার জন্যই এ-কাজ করেন, এমন কথা আমরা বলিনে, কিন্তু তাঁদের আচরণটা দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে শত্রুতামূলকই হয়ে পড়ে। এর একমাত্র কারণ এই যে, তাঁদের মগজের উত্তেজনা আছে, কিন্তু চিন্তাবৃত্তি নেই। সেই উত্তেজনার বসেই তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের সহজ দিকটাই গ্রহণ করেন,

কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের দায়িত্বের দিকটা গ্রহণ করেন না। এইটারই বিষময় ফল শিল্প বাণিজ্যের ওপর ছড়িয়ে পড়ে।

একথাটা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, শ্রমিকদের উন্নতি তখনি সম্ভব, যখন শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হয়ে থাকে, নইলে শিল্প বাণিজ্যেরই যদি অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়, শ্রমিকরা মজুরী পাবে কোথা থেকে? অতএব যিনিই শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করুন না কেন, তাঁর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে সচেষ্ট হওয়া, কিন্তু আন্দোলনকারীদের মধ্যে এই মনোভাবের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সেইটাই হোল দেশের পক্ষে আশঙ্কার কথা। উত্তেজনার মুখে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তারা শ্রমিকদের উন্নতি ঘটাতে চান, কিন্তু তাতে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ত হয়ই না, বরং তাদের ক্ষতি হয়ে থাকে। আসলে এই ক্ষতির কারণই হ'ল শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে ঘা দেওয়া।

যাঁরা আমাদের দেশে শ্রমিক আন্দোলন করেন, তাঁদের শ্রমিকের প্রতি যে যথেষ্ট দরদ আছে একথাটা মোটেই অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি তাঁদের যে দরদের অভাব আছে, একথাটাও

স্বীকার না করে পারা যায় না। অথচ শিল্প-বাণিজ্য ও শ্রমিকের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—একটির ক্ষতিতে অপরটিরও ক্ষতি হ'য়ে থাকে। এইরকম যখন প্রকৃত অবস্থা তখন শ্রমিক-আন্দোলনকারীরা যে কি করে বৈষম্য মূলক মনোবৃত্তি নিয়ে লোকের হিত করতে চান, সেটা বুঝে ওঠা শক্ত। আমরা আমাদের বক্তব্যকে আরও পরিষ্কাররূপে বোঝাবার জন্যে আবার স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করছি যে আমরা ধর্ম্মঘটের বিরোধী। এই শ্রমিকদের উন্নতির আমরাও পক্ষপাতী, কেননা, এটা আমরা বুঝি যে শ্রমিকদের উন্নতি না হ'লে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। তবে আমরা বরাবর বলে এসেছি এবং এখনো বলছি যে, সে-ধর্ম্মঘট অর্থপিপাসু ধণিকঘাতী হ'তে গিয়ে যেন না শিল্পঘাতী হ'য়ে উঠে। শ্রমিকদের উন্নতি করতে গিয়ে আমরা যেন না কোনক্রমে শিল্পকে ঘা দিই, তাহ'লে শ্রমিকদের উন্নতি সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে শিল্পকে ঘা দেওয়ার অর্থ হ'ল তাকে নষ্ট করা। সমস্ত শিল্প সম্পর্কেই যে আমাদের এই উক্তি প্রযোজ্য তা' আমরা বলছি না, কিন্তু বাংলা দেশের দেশীয় শিল্প সম্পর্কে আমাদের এ উক্তি প্রযোজ্য। আমাদের দেশে অবস্থিত কোন বিদেশী শিল্প কিংবা প্রতিযোগিতাহীন লাভজনক শিল্প যদি নিজেদের মোটা লাভের অঙ্ক বজায় রাখবার জন্য শ্রমিক আন্দোলন ঠেকাতে চায় তখন আমরা তা সমর্থন করব না, কারণ সেখানে কোম্পানী শ্রমিকদের বেশী মজুরী দিতে পারে অথচ দিচ্ছে না। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত ধর্ম্মঘটের দ্বারা শ্রমিকদের মজুরী আদায় করে নেওয়াই একমাত্র পন্থা। কিন্তু যেখানে শিল্পের সেরকম অবস্থা নয়, নানান্ বিপর্য্যয়ের মধ্যে যেখানে শিল্প কোনরকমে টিঁকে রয়েছে, সেখানে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করলে শিল্পকে সর্ব্বনাশের পথে চালিত করা হয়। সেখানে মধ্যস্থতামূলক আপোষ-মীমাংসাই একমাত্র উপায়। কারণ, যে-বিপর্য্যয়ের মধ্যে শিল্পটি কোনরকমে টিঁকে রয়েছে তার ওপর ধর্ম্মঘট-রূপ অতিরিক্ত বিপর্য্যয়কে যদি ডেকে আনা হয় তাহ'লে শিল্পটি টাল সামলাতে না পেরে উঠে যায় এবং তজ্জন্য ধর্ম্মটের যে উদ্দেশ্য শ্রমিকদের সুবিধা আদায় করা সেটাও সম্ভবপর হয় না। সুতরাং সেখানে উভয়ের কল্যাণের জন্য মধ্যস্থতামূলক আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থাই সমীচীন মনে হয়।

এটা যে শুধু আমাদের মত তা' নয়। শ্রমিক রাজত্বের জন্মস্থান রুশিয়াতেও বিপ্লবের পূর্ব্বে এই ব্যবস্থাই অবলম্বিত হত। শিল্পবাণিজ্যের যখন মন্দা অবস্থা থাকত তখন ট্রেডইউনিয়নগুলি কিছুতেই ধর্ম্মঘট ঘোষণা করত না, সকল কিছুই নীরবে সহ্য করে যেত; কেননা তারা জানত যে বর্ত্তমানে ধর্ম্মঘট চালালে মজুরী বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ কোম্পানী দুরবস্থা হেতু তা' দিতে সক্ষম নয়;—দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মঘটের বিপর্য্যয়ের ফলে শিল্পবাণিজ্য যদি ফেল পড়ে ত তাহ'লে যে শ্রমিকদের সুবিধা আদায়ের জন্য ধর্ম্মঘট চালিত হচ্ছে, তাদের সুবিধালাভ ত দূরের কথা জীবিকার্জ্জনের পথই বন্ধ হয়ে যাবে। সেইজন্য তাদের নীতিই ছিল শিল্প-বাণিজ্য যখন ভাল চলবে তখন ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা। কারণ কোম্পানী তখন তাদের দাবী মেটাতে সক্ষম হবে এবং যদি দাবী না মেটায় ত কোম্পানী ধর্ম্মঘটের ফলে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হ'বে। আমাদের দেশের শ্রমিক প্রীতি এবং

শ্রমিক-আন্দোলন রুশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে রুশিয়ার দূরদৃষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয়। সেইজন্যই আমরা বলেছি যে, আমাদের শ্রমিক আন্দোলনকারীদের মগজে উত্তেজনা আছে, কিন্তু চিন্তাবৃত্তি নেই।

চিন্তাবৃত্তি নেই এইজন্যই বলছি যে, শ্রমিক আন্দোলনকারীরা দেশীয় শিল্পের উন্নতির প্রতি সচেষ্ট নন্। অথচ আমরা পূর্ব্বেও বলেছি, এখনো বলছি যে শিল্পের উন্নতি না ঘটলে শ্রমিকদের উন্নতি সম্ভবপর নয়। শিল্পকার্য্য যদি ভালভাবে চলে এবং তাতে যদি উপযুক্ত লাভ হয় তবেই শ্রমিকেরা অধিক মজুরী লাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু আমাদের শ্রমিক আন্দোলনকারীরা দেশীয় শিল্পের কি উপায়ে প্রসারতা লাভ ঘটতে পারে সে-সম্বন্ধে যথাযুক্ত পরামর্শ প্রদান করেন না। তাঁরা ভাঙ্তেই শিখেছেন, কিন্তু গড়তে শেখেন নি। তাঁদের প্রতি একথা বলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে,

আলো নেভানোটাই বড় কৃতিত্ব নয়, আলো জ্বালাটাই বড় কৃতিত্ব।

আমাদের মতে (এবং শ্রমিক হিতৈষী সকলেরই মতে) যাঁরা শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করবেন তাঁদের দেশের শিল্পবাণিজ্যের দৈনন্দিন অবস্থা সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করবার জন্য class war এর জ্ঞান থাকা যেমন তাঁদের দরকার, তেমনি দেশের শিল্প বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কেও তাঁদের অবহিত হতে হবে; নইলে দায়িত্বপূর্ণ আন্দোলন পরিচালনা সম্ভবপর নয়। যাঁরা বিদেশী শ্রমিক আন্দোলনের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে বিদেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি কত সুসংগঠিত। কোন শিল্পে ধর্ম্মঘট চালাতে গেলে সেখানে সেই শিল্প সংক্রান্ত সমস্ত ইউনিয়নের সম্মতিক্রমে সেণ্ট্রাল কাউন্সিলের অধীনে সেই ধর্ম্মঘট পরিচালিত হয়,—কোন আন্দোলনকারীর খাম্‌খেয়ালী মতে সেখানে ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হয় না। এর কারণ হচ্ছে যে, হাজার হাজার শ্রমিকের যেখানে জীবন মরণ সমস্যা সেখানে খামখেয়ালীর বা ছেলেমানুষীর স্থান নেই। আমাদের এখানে কিন্তু ঠিক উল্টোটি দেখতে পাই। শিল্প সম্পর্কে কোন বিবেচনা না করে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপরও কোন গুরুত্ব না রেখে আন্দোলনকারীরা ইচ্ছামত ধর্ম্মঘট সুরু করে দেয় এবং তার ফল ভুগতে হয় শ্রমিকদের। এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সংগ্রামে শ্রমিকরা হেরেছে, জিত্‌তে পারেনি। বারংবার এই জিনিস ঘটার দরুণ আজ শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলনকারীদের ভেবে দেখবার দিন এসেছে যে এরকম পরাজয়ের গ্লানি ও বিষময় ফলের জের আর কতদিন তারা টেনে চলবে? এইরকম গড্ডালিকাস্রোতে ভেসে গিয়ে শ্রমিকদের ও শিল্পবাণিজ্যের কি ক্ষতি করা হয় না?

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের দেশীয় শিল্প সমূহ যে কি ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয়ের মধ্যে টিঁকে রয়েছে তা' শ্রমিক আন্দোলনকারীরা অবগত নন্। যদি অবগত থাকতেন ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যায়-রূপ হলাহলের সৃষ্টি করে তাঁরা দেশীয় শিল্পের শত্রুতা সাধন করতেন না। আমাদের বাংলা দেশের শিল্পের কথাই ধরা যাক। বাংলা দেশের শিল্পের প্রধান শত্রু হ'ল জাপান,—'ব্যবসা ও বাণিজ্যে'র পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে জাপানী প্রতিযোগিতার ঠেলায় পড়ে দেশী শিল্পের কি রকম মরণাপন্ন অবস্থা দাঁড়িয়েছে! দ্বিতীয়তঃ, অপরাপর প্রাদেশিক প্রতিযোগিতাও বাংলা দেশকে বড় বিব্রত করে তুলেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বস্ত্রশিল্পে বোম্বাই এর প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ ইম্পিরিয়াল্ প্রেফারেন্সও বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে রয়েছে। এই সমস্তের সম্মিলিত আক্রমণে বাংলা দেশের শিল্প সমূহ উঠে যাবার দাখিল হয়েছে। যারা কোন রকমে টিকে আছে, তারা নিজেদের উৎপাদন মূল্যের কমেতেও মাল বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে—তাদের হয়ত আশা আছে যে একদিন বাজারের অবস্থা ভাল হ'বে।

এই রকম যখন প্রকৃত অবস্থা তখন শ্রমিক ধর্ম্মঘট দ্বারা শিল্পের গতি প্রতিহত করলে যে বিষময় ফল ফলে তা' বালকের পক্ষে বোঝাও কষ্টকর নয়। যে অধিক মজুরী লাভের জন্য

শ্রমিকদের অযথা ধর্ম্মঘট করতে বাধ্য করা যায়, সেই মজুরী তারা লাভ করবে কোথা থেকে? এটা সকলেই বুঝতে পারে যে মালিকের ব্যবসায়ে যদি লাভ হয় তবেই সে অতিরিক্ত মজুরী দিতে সমর্থ থাকে। কিন্তু যেখানে মালিকের অনবরত লোকসান যাচ্ছে, কিংবা কোন রকমে টিঁকে আছে সেখানে সে অতিরিক্ত মজুরী দিতে মোটেই সক্ষম নয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়েছি যে নানান্ কারণে বাংলা দেশের দেশীয় শিল্পগুলির অবস্থা ভাল নয়; অর্থাৎ যে মজুরী তারা শ্রমিকদের দিয়ে থাকে সেটাই বর্ত্তমান অবস্থায় দিতে পারা তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, সুতরাং অতিরিক্ত মজুরী দেওয়া তাদের সাধ্যাতীত। যদি তা' দিতে হয় ত কারবারকে দু'দিনে লালবাতি জ্বালতে হ'বে। অত্যন্ত দুঃখের এবং লজ্জার কথা এই যে, আমাদের শ্রমিক আন্দোলন-কারীরা দেশীয় শিল্প ব্যাপার সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা হেতু এজিনিষটা বোঝেন না।

আমাদের এবম্প্রকার মন্তব্যে কেউ যেন না মনে করেন যে, আমরা শ্রমিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করি না। আমরা জানি এবং সেটা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করি না যে, শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। মানবতার দিক দিয়ে দেখলে তাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করা দরকার এবং সে পরিবর্ত্তন মজুরী বৃদ্ধির দ্বারাই সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু মানবতা ও ব্যবসার বাজার এক জিনিষ নয়। শ্রম এবং পণ্য কেনা যায় কিন্তু মানবতা ক্রয় বিক্রয়ের বাইরে। ক্রয় বিক্রয়ের যে জিনিষ তা' বাজারের চাহিদা এবং যোগানের উপর নির্ভর করে—মানবতা সে ক্রয় বিক্রয়ের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এমন যদি দিন আসে যখন দেশের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান নেই, সেদিন হয়ত মানবতা সহকারে মজুরী বৃদ্ধি করতে কিছুমাত্র বাঁধবে না। কিন্তু তার পূর্ব্বে বৃথা ধর্ম্মঘট করলে আশানুরূপ ফল ত পাওয়া যাই না, বরং শিল্পের ক্ষতি করা হয়।

কি করেই বা পাওয়া যাবে? ধরুন মানবতার খাতিরেই একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান তার মজুরদের মজুরী বৃদ্ধি করলে, ফলে সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচা বেড়ে গেল। এমতাবস্থায় তাকে পণ্য মূল্যের হারও বৃদ্ধি করতে হ'বে, নইলে পড়তায় তার পোষাবে না। কিন্তু অপর প্রতিযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করে নি, সুতরাং তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের দরও বাড়ে নি। এই অবস্থায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মানবতার পরিপোষক ঐ শিল্পটিকে তার পণ্য দ্রব্যের দর কমাতে হ'বে, নইলে তার মাল অবিক্রীত থেকে যাবে। উভয় ক্ষেত্রেই লোকসান হেতু সে শিল্পকে আর বেশীদিন টিকতে হ'বে না, ফলে ঐ মজুরী বৃদ্ধির জন্যই অতগুলি শ্রমিকের অন্ন চলে যাবে।

এই জিনিষটাই ভাববার আমাদের দেশে লোকাভাব হয়ে পড়েছে। আমরা সবাই গড্ডালিকার স্রোতে ভেসে চলেছি, চিন্তাবৃত্তির দীনতা হেতু আমাদের আয়ের ঘরে কেবল জমা হচ্ছে শূন্যতার অঙ্ক! মানবতার প্রলোভন ধর্ম্মঘটের আলেয়া দিয়া আমাদের মোহগ্রস্ত করেছে এবং সেই মোহের মত্ততার আতিশয্যেই আমরা ভাবতে ভুলে গিয়েছি যে মানবতা ও ব্যবসার বাজার এক জিনিষ নয়!

আমরা মানবতার বিরোধী নই, কিন্তু সে মানবতা যেন ব্যষ্টিগত না হয়ে সমষ্টিগত হয়ে ওঠে। মানবতার খাতিরে একজন সাধু হয়ে উঠলে বর্ত্তমান সমাজের চোরের দল তাকে বেশী ঠকায়,—অপরে খেতে পায় না বলে মানবতার খাতিরে আমি উপোষ করলে তাদের পেটে ভাত গিয়ে হাজির হয় না। দোষ ত মানবতার নয়, দোষ বর্ত্তমান বাজার-সভ্যতার, সামাজিক ব্যবস্থার। পৃথক ধর্ম্মঘট নয়, সমষ্টিগত বিপ্লবের দ্বারাই এ ব্যবস্থাকে বদলাতে হ'বে।

তবে কি মুক্তির পথ নেই? শ্রমিকদের কি ঐ শোচনীয় অবস্থার মধ্যেই দিন কাটাতে হবে? মোটেই তা' নয়, এর থেকেও বেহাই পাবার উপায় আছে, কিন্তু সে উপায় শিল্পঘাতী পৃথক ধর্ম্মঘট দ্বারা উদ্ভাবন করা যায় না। সেজন্য শিল্পপ্রসারী ব্যাপক প্রচেষ্টার দরকার।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি যে, মানবতার খাতিরে ঐ শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি মজুরীবৃদ্ধিকরণহেতু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, কিন্তু তা' না হয়ে যদি সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি একসঙ্গে মজুরী বৃদ্ধি করে তাহ'লে কোন শিল্পকেই ক্ষতিগ্রস্থ হ'তে হয় না। কিন্তু তার পূর্ব্বে সর্ব্বদা একটি জিনিষ মনে রাখতে হবে—সেটি হচ্ছে যে শ্রমিকদেরও উৎপাদন-শক্তির শ্রীবৃদ্ধি প্রয়োজন। নইলে মালিকরা কেন তাদের মজুরী বৃদ্ধি করতে যাবে। এটা ভুললে চলবে না যে, পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় শুধু দেশীয় বাজারের অবস্থার ওপরই নির্ভর করে না, আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতার ওপরও নির্ভর করে। আমাদের মস্ত বড় প্রতিযোগী হচ্ছে জাপান, এই সম্পর্কে সেখানকার শ্রমিকদের মজুরীর হার আলোচনা করাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জাপানী শ্রমিক-

দের মজুরীর হার অত্যন্ত অল্প, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতের চেয়েও অল্প। নিম্নে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

রাজমিস্ত্রী	—	৭'০৭	ইয়েন প্রতি	সপ্তাহে
ছুতারমিস্ত্রী	—	৫'৬০	,,	,,
রংএরমিস্ত্রী	—	৩'২৬	,,	,,
কামার	—	৪'৬৯	,,	,,
কম্পোজিটার	—	৩'৫৭	,,	,,

এ ছাড়া শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারের দলও সেখানে বেশী মাইনে পান্ না। একটি প্রকাণ্ড কাচের কারখানার ম্যানেজার মাত্র ৫০ ইয়ান মাসে পেয়ে থাকেন। একটি বিখ্যাত চামড়ার কারখানার কর্ম্মসচিব মাসে ১৩০ ইয়েন পান, তবুও তিনি আমেরিকা থেকে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে এসেছেন। টেক্‌নিক্যাল্ স্কুলের গ্র্যাজুয়েটগণ লাভ করেন মাত্র ৩০ ইয়েন। এই রকম প্রতি ক্ষেত্রেই সেখানকার মজুরীর হার। সাধারণ শ্রমিকরা অনেকেই দৈনিক কুড়ি সেণ্ট্ (পাঁচ আনা) পায়। এ অবস্থায় জাপানী শিল্পের উৎপাদন খরচা অত্যন্ত কম পড়ে এবং তারা অপরাপর দেশের শিল্পের সঙ্গে তীব্রভাবে প্রতিযোগিতা চালায়। ভারতীয় শিল্প যদি তাদের শ্রমিকদের মজুরীর হার বৃদ্ধি করে তবে জাপানীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কিছুতেই এঁটে উঠবে না, বর্ত্তমানেইত তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অথচ জাপানী শ্রমিকের উৎপাদন শক্তি ভারতীয় শ্রমিকদের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। জাপানের কাপড়ের কলের একজন শ্রমিক এক সঙ্গে দশখানা তাঁত চালাতে পারে, ভারতীয়দের মধ্যে শতকরা একজন তা পারে কি'না সন্দেহ। ভারতীয় শ্রমিক যতক্ষণ না অধিক কার্য্যক্ষম হয়ে উঠছে ততক্ষণ তার মজুরীবৃদ্ধির দাবী সঙ্গত নয়। তারা যদি অধিক কার্য্যক্ষম হয়ে ওঠে এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতাবৃদ্ধি পায়; তাহ'লে তারা আপনাথেকেই বেশী মজুরী পাবার অধিকারী হয়ে উঠবে।

অতএব আমাদের নিবেদন এই যে, যাঁরা শ্রমিক আন্দোলন করেন তাঁরা শ্রমিকদের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করার দিকে মনোনিবেশ করুন এবং মজুরী যদি বৃদ্ধি করতে হয় ত তৎপরে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সকল শিল্প সংক্রান্ত শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী করুন। কোন একটি বিশেষ শিল্পে ধর্ম্মঘট লাগিয়ে তাঁরা যেন খামখেয়ালীর পরিচয় না দেন। দেশে আজ বহু শিক্ষিত বেকার বসে আছে, তাদের যাতে বেকার অবস্থা দূরীভূত হয় তজ্জন্য তাঁরা আন্দোলন স্থরু করুন। নইলে যারা কিছু লাভ করছে, তাদের কাজের ক্ষেত্রে অযথা বিঘ্ন উৎপাদন করে তাঁরা যেন আয়ের পথ বন্ধ করবার চেষ্টা না করেন। আজ শিক্ষিত লোকদের পারিশ্রমকের যে হার দাঁড়িয়েছে, তার চেয়ে শ্রমিকের মজুরীর হার অধিক; স্থতরাং শ্রমিকদের এমতক্ষেত্রে বেশী মজুরীর হার দাবী করলে সমাজে equitable distribution এর ব্যবস্থা হয় না। সেই equitable distribution টাই আজ সবচেয়ে কাম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেধারে তাঁরা মনোযোগ দিয়ে দেশের স্থখ সমৃদ্ধি করতে সহায়তা করুন। নইলে অপ্রয়োজনীয় ও শিল্পঘাতী ধর্ম্মঘটে কোন স্থফল ফলবে না।
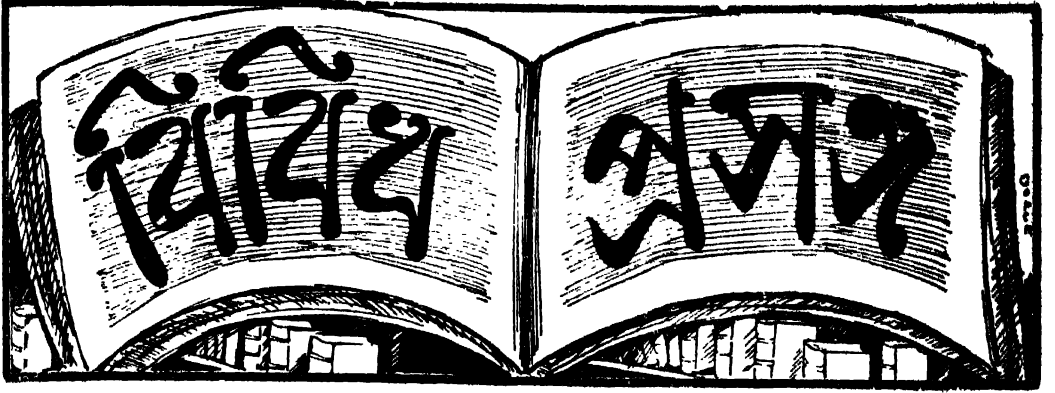
ভারতীয় কয়লা ও চায়ের কারবার

১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩৭ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতের কয়লার খনি হইতে মোট ২০০৬৪ টন কয়লা তোলা হইয়াছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে তোলা হইয়াছিল মোট ২০৮৭৫ টন। তার পূর্ব্বের বৎসর ১৯৩৪-৩৫ সালে ২০৮৪৬ টন তোলা হইয়াছিল। দেখা যায় কয়লা উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে। গত বৎসরে কয়লার খনিতে কতকগুলি ভীষণ দুর্ঘটনা হয়। ইহা উৎপাদন কমিয়া যাইবার একটি প্রধান কারণ। ভারতের চা রপ্তানীও কমিয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে চা রপ্তানী হইয়াছিল ৩২৪৮৩৩ হাজার পাউণ্ড। ১৯৩৫-৩৬ সালে তাহা কমিয়া ৩১২৭০৬ হাজার পাউণ্ড হইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতীয় চা রপ্তানীর পরিমাণ আরও কমিয়া ৩০১৮৬৬ হাজার পাউণ্ডে নামিয়াছে। চায়ের উৎপাদনও এই তিন বৎসরে ক্রমাগত কমিয়া আসিয়াছে। কফি, কোকো প্রভৃতি অন্যান্য পাণীয়ের সহিত প্রতিযোগিতাই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

খনিতে নারী শ্রমিক

ভারতীয় খনি সমূহে নারী শ্রমিক নিয়োগ করার নিয়ম তুলিয়া দিবার জন্য বহুদিন যাবৎ আন্দোলন চলিতেছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে এই মর্ম্মে ভারতীয় আইন সংশোধন করা হইয়াছিল যে, আর খনিতে নারী শ্রমিক নিযুক্ত করা যাইবে না। কিন্তু খনির মালিকেরা আবেদন করাতে সেই আইন এতকাল প্রয়োগ করা হয় নাই। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন যে, এই বৎসর ১লা অক্টোবর হইতে সংশোধিত আইন কার্য্যকরী হইবে। সুতরাং ঐ তারিখ হইতে খনিতে অর্থাৎ মাটীর নীচে কাজ করিবার নিমিত্ত নারী শ্রমিক নিযুক্ত করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু মাটির উপরিভাগে খনি সম্বন্ধীয় অন্যান্য কাজ করিতে নিষেধ নাই।

বাংলায় নূতন জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানী

গত জুলাই মাসে (১৯৩৭) বাংলায় ৩০টী নূতন জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের মোট মূলধনের পরিমাণ ৭৪ লক্ষ ৪০

হাজার টাকা। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হইল ;—

কারবারের পরিচয়	সংখ্যা	মূলধন হাজার টাকা
লগ্নী ও ট্রাষ্ট	৩	৬৫
প্রভিডেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স	১	১০০
মোট গাড়ী সম্বন্ধীয় মাল বহন, বেচা কেনা ও প্রস্তুত করণ	২	৫৪০
যাতায়াত সম্বন্ধীয়	২	৫১০০
ছাপাখানা, পাবলিশিং ও মনোহারী দ্রব্য সম্বন্ধীয়	৩	১১৫
রাসায়নিক দ্রব্য এবং তৎসংক্রান্ত কারবার	৩	২২০
লৌহ, ইস্পাত ও জাহাজ নির্ম্মাণ	১	২০
ইঞ্জীনিয়ারিং	১	১০০
জল, গ্যাস্ ও বিজলী সম্বন্ধীয়		১০০
এজেন্সী	২	১২০
ব্যবসা (Trading) ও শিল্প (Manufacturing)	২	৫২০
গাঁইট বাঁধাই ও পেষাই	১	২০
কয়লার খনি	৩	২৭০
জমি জমা সম্বন্ধীয়	৪	৫০
অপরাপর কোম্পানী	১	১০০

মাৎগুড় বা ঝোলাগুড়ের সার

ইক্ষুরস হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়াতে মাৎগুড় বা ঝোলাগুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা বহুদিন যাবৎ চলিতেছে। এসম্বন্ধে ১৩৪২ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ডাঃ মেঘনাদ সাহার একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মাৎগুড় কিরূপে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে এবং জমিতে সার দিবার জন্য উহা কিরূপে ব্যবহার করা যায়, তৎসম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। গত পাঁচ বৎসর যাবৎ বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতির (Indian Institute of Science) বায়োকেমেষ্ট্রি বিভাগে এই মাৎগুড় সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা হয়। তাহাতে ইহার নানাবিধ প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে জমির সারই প্রধান।

ঝোলাগুড় বলিয়া ইহার প্রয়োগ ও ব্যবহারে কতগুলি অসুবিধা ছিল। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া, সঞ্চয় করিয়া রাখা, বিদেশে চালান করা, জমিতে ছড়াইয়া দেওয়া এই সব কাজে ঝোলা গুড় তরল অবস্থায় ব্যবহার করা সুবিধাজনক নহে। সেইজন্য ইহার সহিত অন্য রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইয়া ইহাকে শুষ্ক কঠিন আকারে পরিণত করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অবস্থায় উহা বায়ুর জলীয় বাষ্প সহযোগে ভিজিয়া উঠে না সুতরাং স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার বা রাখিয়া দেওয়ার কোন অসুবিধা নাই। ইহাকে সহজেই গুঁড়া করিয়া অন্যান্য সারের মত জমিতে ছড়াইয়া দেওয়া যায়।

মাৎগুড়ের সহিত যে সকল রাসায়নিক মশলা মিশাইয়া এই কঠিন আকারের সার তৈয়ারী হয়, সেই সকল মশলার মূল্য বেশী নহে এবং তাহা মিশাইয়া জাল দিবার প্রয়োজনও হয় না। ঐ সকল মশলা মিশাইলে সমস্ত মাৎগুড় আপনা আপনি অল্পক্ষণের মধ্যে খুব গরম হইয়া উঠে। তারপর পুনরায় শীঘ্র শীঘ্র শীতল ও কঠিন হইয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বাজার চল্‌তি অন্যান্য সারের তুলনায় এই মাৎগুড়ের সারের দাম প্রতি টন ১৫ টাকা হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে।

এই আবিষ্কারের বিবরণ ইণ্ডিয়ান সুগার ট্যারিফ বোর্ডকে (Indian Sugar Tariff Board) জানান হইয়াছে।

নারিকেল তৈলের মূল্য বৃদ্ধি

সিংহল ও ভারতবর্ষ এক দেশেরই মত। কিন্তু নারিকেল ও তজ্জাত দ্রব্যের ব্যবসা লইয়া পরস্পর বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। মাদ্রাজ উপকূলে প্রচুর নারিকেলের চাষ হয়। সিংহল, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাং, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ হইতেও বহুসংখ্যক নারিকেল, বহুল পরিমাণ নারিকেলের শুষ্ক শাঁস (বাজার চল্‌তি নাম কোপ্‌রা) নারিকেল তৈল প্রভৃতি ভারতবর্ষে আমদানী হয়। তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় নারিকেল চাষী ব্যবসায়ীরা পারিয়া উঠে না! ইহার ফলে ভারতীয় নারিকেল জাত দ্রব্যের মূল্য একেবারে কমিয়া গিয়াছে। তদুপরি ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্ট ভারত হইতে রপ্তানী নারিকেলের উপর একটি ট্যাক্স আদায় করেন। সেই কারণেও ভারতীয় নারিকেল চাষী ব্যবসায়ীদের বিশেষ ক্ষতি হয়।

বহুদিন যাবৎ ইহার প্রতিকারের জন্য আন্দোলন চলিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কেবল দেশের নারিকেল চাষী ব্যবসায়ীগণ এক কন্‌ফারেন্সে মিলিত হইয়া এই বিষয়ে আলোচনা করেন। মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মিঃ ভি মন্নুস্বামী পিলাই সেই কন্‌ফারেন্সের সভাপতি হইয়াছিলেন। সেই সভাতে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, আমদানী নারিকেল শাঁসের (কোপ্‌রা) উপর প্রতি টনে ১০০ টাকা হিসাবে রক্ষণ শুল্ক ধার্য্য করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক এবং ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক, তাঁহারা যেন রপ্তানী কোপ্‌রার উপর শুল্ক তুলিয়া দেন। তাঁহাদের এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে দেশীয় নারিকেল চাষীদের সুবিধা হইবে বটে, কিন্তু যাঁহারা নারিকেল তৈল অন্যান্য শিল্পের জন্য ব্যবহার করেন, তাঁহারা অসুবিধায় পড়িবেন। কারণ, আমদানী কোপ্‌রার উপর শুল্ক চাপালেই উহার দাম বাড়িবে;—সঙ্গে সঙ্গে নারিকেল তৈলেরও মূল্য বৃদ্ধি হইবে। যদি রক্ষণ শুল্ক নির্দ্ধারণের সহিত দেশীয় ব্যবসায়ীগণ নিজেদের শিল্পোন্নতির চেষ্টা করেন, তবেই নারিকেল তৈলের মূল্য একটা সঙ্গত সীমার মধ্যে থাকিতে পারে। রক্ষণ শুল্কের দ্বারা বিদেশী জিনিষের আমদানী কমাইয়া বা বন্ধ করিয়া নিজেরা ইচ্ছামত দাম চড়াইয়া 'জনসাধারণ খরিদদারের অর্থ শোষণ করিব,' দেশীয় ব্যবসায়ীদের এরূপ মনোবৃত্তি আমরা কখনই সমর্থন করিতে পারি না,—যদিও স্বদেশী শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতিই আমাদের কামনা।

নারিকেল ছোবড়া শিল্পঃ—

বাংলাদেশে নারিকেল একটী প্রয়োজনীয় ফসল। যদিও কেবল মাত্র সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ভূমিতেই ইহার ফলন হয়, তথাপি মোটের উপর ইহার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে।
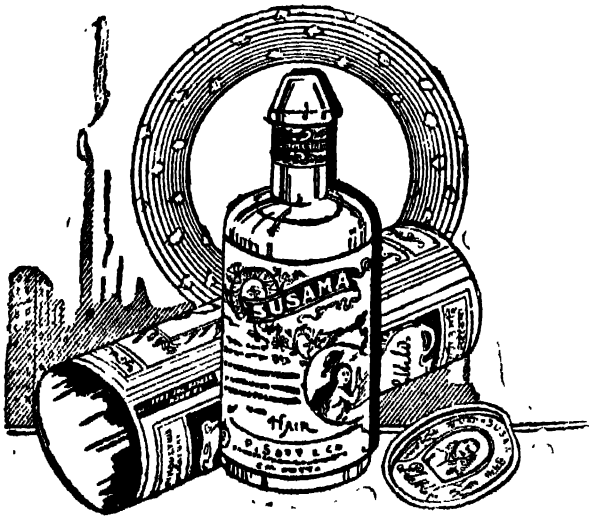
সম্প্রতি নারিকেল ছোবড়া হইতে দড়ি, মাদুর পা-পোষ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখাইবার জন্য বাংলাদেশের নানা স্থানে চেষ্টা হইতেছে। পল্লী গ্রামের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বাংলা গবর্ণমেণ্ট প্রথম কিস্তিতে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে ১৬ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন, সেই টাকা হইতে প্রায় ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই ছোবড়া শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৩৬-৩৭ সালে বাংলায় ৮টী কেন্দ্রে ১১৪ জন ছাত্র এই শিল্প শিক্ষা করিয়াছে। তাহারা কেহ কেহ নিজেই কারখানা খুলিয়াছে, কেহ কেহ অন্যের কারখানায় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। শুনাযায় স্ত্রীলোকেরাও এই শিল্প শিক্ষা করিতে উৎসাহী হইয়াছেন। পটুয়াখালী কেন্দ্রে শিক্ষিতা দুইটী স্ত্রীলোক নানা প্রকার মাদুর তৈয়ারী করিতেছেন এবং তাহা বাজারে বিক্রয়ও হইতেছে। ১৯৩৭ সালের প্রথমভাগে চারিটী শিক্ষা কেন্দ্রের স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বারাসত হইতে বাগের হাট, কোলাঘাট হইতে বাগনান, সন্দীপ হইতে চৌমুহনী এবং ভোলা হইতে পটুয়াখালীতে শিক্ষা কেন্দ্র স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই চারিটী কেন্দ্রে ৫৮ জন ছাত্র শিল্প-শিক্ষা করিতেছে।

বাংলাদেশে এই ছোবড়া শিল্পের সূচনা বিশেষ আশা জনক। আরও বহুপূর্ব্বে এই দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক এখনও যে উৎসাহের সহিত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, যদি তাহা স্থায়ী ও ক্রমশঃ শক্তিশালী হয় তবে বাংলার আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির আর একটী পন্থা উন্মুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। আমরা বাংলাদেশের নারিকেল চাষ ও ছোবড়া শিল্পের বিষয়ে বহুকাল যাবৎ আমাদের এই পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ ও বিবরণ প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। গত আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে ক্রমাগত আমরা লিখিয়াছি।

এতকাল যাবৎ বাংলাদেশে নারিকেল ছোবড়া জ্বালান হইত অথবা গদী তৈয়ারীর জন্য ব্যবহার করা হইত। অনেক স্থলে ছোবড়াকে কোন কাজেই লাগান হইত না, আবর্জ্জনার মত ফেলিয়া দেওয়া হইত। এরূপ একটী প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অপচয়ে বাংলাদেশের আর্থিক সম্পদ হীন হইয়া পড়ে। এক্ষণে ছোবড়া হইতে দড়ি, মাদুর, বুরুশ, পা-পোষ প্রভৃতি তৈয়ারী করা হইলে ছোবড়ার চাহিদা বাড়িবে,—উহা আর কেহ ফেলিয়া দিবে না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নারিকেলের ফলনের পরিমাণও বৃদ্ধি করিতে হইবে। সুতরাং নারিকেল চাষের দিকে এই সময়েই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

বাংলা গবর্ণমেণ্ট পল্লী সংস্কার কার্য্যের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দ্বিতীয় কিস্তিতে ১৮ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন ;—ঐ টাকা হইতে এবারে যদি আরও অন্ততঃ ২৫ হাজার টাকা এই ছোবড়া শিল্পের উন্নতির জন্য পাওয়া যায়, তবে উহাদ্বারা নারিকেল চাষেরও ব্যবস্থা করা উচিত।

ইম্পীরিয়্যাল কেমিক্যাল ইন্‌ডাষ্ট্রীজ

ভারতীয় কলকারখানায় বিবিধ শিল্পের জন্য নানারকমের কেমিক্যাল বা রাসায়নিক মাল-মশলার দরকার। সে সমস্তই বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হয়। ভারতবর্ষে রাসায়নিক মশলা

তৈয়ারীর বড় কারখানা নাই। বাস্তবিক কেমিক্যাল বা রাসায়নিক দ্রব্য এত হাজার রকমের আছে যে, তাহার একএকটী তৈয়ারী করিতেই এক একটী বৃহৎ কোম্পানীর দরকার। 'লাতের ইম্পীরিয়্যাল কেমিক্যাল ইন্‌ডাষ্ট্রীজ .ইরূপ একটী বৃহৎ কোম্পানী। সম্প্রতি প্রস্তাব হইয়াছে, ভারতবর্ষে এই কোম্পানীর একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার নাম হইবে; "ইম্পীরিয়্যাল কেমিক্যাল ইন্‌ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড"। এই কোম্পানী রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারী করিবার জন্য ভারতবর্ষে বড় বড় কারখানা খুলিবার মতলব করিয়াছেন। প্রথমতঃ পাঞ্জাবে সোডা য়্যাশ (Soda Ash) তৈয়ারীর কারখানা এবং বাংলাদেশে ক্লোরিণ (Chlorine) ও কষ্টিক সোডা Caustic Soda তৈয়ারীর করিবার কারখানা স্থাপিত হইবে। ইহাতে অন্যান্য শিল্পের জন্য এই সকল মশলা আরও কমদামে পাওয়া যাইবে, যেমন কাচের জন্য সোডা য়্যাশ এবং ব্লিচিং পাউডারের (Bleaching Powder) জন্য ক্লোরিণ ইত্যাদি।

একটী নূতন শিল্পের প্রয়োজন

রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করণ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়িতেছে, যখন ভারতীয় কাচ শিল্পের জন্য রক্ষণ শুল্কের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট এই বলিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করেন যে, কাচ তৈয়ারী করিবার জন্য ভারতীয় কারখানার মালিকগণকে বিদেশ হইতে সোডা য়্যাশ (Soda Ash) আমদানী করিতে হয়। কাচ শিল্পের জন্য যে সকল কাঁচা মালের দরকার তাহারা শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগই সোডা য়্যাশ।

যদি বিদেশী কাচের উপরে রক্ষণ শুল্ক ধার্য্য হয়, তবে বিদেশীয়েরা ঐ সোডা য়্যাশের দাম বাড়াইয়া দিবে, সুতরাং ভারতীয় কারখানায় সস্তায় কাচ নির্ম্মাণ করা অসম্ভব হইবে। ফলে, রক্ষণ শুল্কের উপকার কিছুই পাওয়া যাইবে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ভারতীয় কাচের কারখানায় বর্ত্তমান সময়ে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০০০ টন সোডা য়্যাশের প্রয়োজন। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর এক কোটী ৩০ লক্ষ টাকার কাচের দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী হয়। এই অবস্থায় ভারতকে যদি কাচ শিল্পে উন্নতি করিতে হয়, তবে বিদেশ হইতে সোডা য়্যাশ ক্রয় বন্ধ করিতে হইবে। তারপর বিদেশী কাচ দ্রব্যের উপর রক্ষণ শুল্ক ধার্য্য করা যাইতে পারে।

সম্প্রতি ইম্পীরিয়্যাল কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড নামে যে বৃহৎ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবার আয়োজন হইয়াছে, তাহারা পাঞ্জাবের ঝেলাম নদীর তীরবর্ত্তী খেওড়া লবণ খনির নিকটে সোডা য়্যাশ তৈয়ারীর প্রথম কারখানা স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। পাঞ্জাবে এই কোম্পানীর আরও কয়েকটী কারখানা খোলা হইবে।

বোম্বাইর বিখ্যাত টাটা সন্স লিমিটেড ও সোডা য়্যাশ তৈয়ারীর কারখানা খুলিবার আয়োজন করিয়াছে। এ সম্বন্ধে উক্ত কোম্পানীর তরফ হইতে গত চারি পাঁচ মাস পর্য্যন্ত লণ্ডনে বিখ্যাত ইউরোপীয় ও আমেরিকান বিশেষজ্ঞ রাসায়নিকদের সঙ্গে নানা পরামর্শ ও আলোচনার ফলে অবশেষে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, খেওড়া লবণ খনির নিকটে জমি বন্দোবস্ত লইয়া সেইখানে সোডা য়্যাশ তৈয়ারীর কারখানা খোলা হইবে। এই বিষয়ে বরোদা সরকার কোম্পানীকে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

ভারতীয় ফল সংরক্ষণের ব্যবসায়

বায়ু চলাচল বন্ধ air tight টিনের কৌটায় পুরিয়া ফল সংরক্ষণ করিবার এক প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে; কারণ উহাতে বাস্তবিক সুপক্ক ফলের আস্বাদ পাওয়া যায় না। সেইজন্য অধিকতর উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুপক্ক ফল সংরক্ষিত করিবার বিবিধ প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হইতেছে। তাহার একটি উপায় ফলগুলিকে খুব ঠাণ্ডাতে রাখা। গুদামজাত করিবার সময় অথবা চালান দিবার সময়,—সর্ব্বদা খুব ঠাণ্ডায় রাখিতে পারিলে ফল নষ্ট হয় না,—ঠিক যেমন তেমন থাকে। এই পদ্ধতির নাম "কোল্ড ষ্টোরেজ'। (Cold Storage).

বাংলার পাট-শিল্প

চারিদিকে একটা রব উঠিয়াছে, "বাংলাব পাট চিরকালের তবে গেল, ইহাব আর কোন আশা নাই।" কয়েক বৎসব পূর্ব্বে যখন জগদ্ব্যাপী আর্থিক সঙ্কটেব সূচনা হয়, সেই সঙ্গে বাংলাব পাটের দবও পবিয়া যায় এবং অনেকেব ধারণা জন্মিয়াগিয়াছে, পাটেব বাজাব নষ্ট হওয়াতেই বাংলাদেশে আর্থিক দুর্গতিব একটা প্রধান কারণ ঘটিয়াছে। তাবপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেলেও যখন পাটেব দব লোকেব আশানুরূপ আব উঠিলনা, এবং উঠিবাব কোন সম্ভাবনাও দেখা গেলনা, তখন সেই ধারণা দৃঢ বদ্ধমূল হইযাছে। পাটের চাষ কমাইয়া দিবাব জন্য, পাটেব পবিবর্ত্তে অন্য ফসল উৎপাদন করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

কোন জিনিস প্রয়োজনের অতিবিক্ত উৎপন্ন হইলে বাজারে তাহার দাম পড়িয়া যায়। সুতরাং পুনরায় বাজার চড়তি করিতে হইলে, ঐ জিনিসের উৎপাদন কমাইতে হয়। এইরূপে চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যবসায় চলে। এই হিসাবে সাময়িক এবং অস্থায়ী ভাবে পাটের চাষ কমান অনুচিত হয় নাই, কিন্তু ইহাতে পাট চাষের উপর লোকের যদি স্থায়ীরূপে একটা অনাদব কিম্বা অবহেলা আসে, তবে তাহা বাংলাদেশের আর্থিক উন্নতিব পক্ষে শুভজনক নহে।

বাংলাদেশ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনও দেশে পাট জন্মায় না। একমাত্র বাংলাদেশই পৃথিবীব সমস্ত প্রয়োজনীয় পাট সরবরাহ করে। অন্যান্য দেশে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে পাট জন্মাইবাব চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। এমন কি কৃষিকার্য্যের যাদুকর আমেবিকাব লোকেরাও এই বিষয়ে বিফল মনোবথ হইয়াছে। অবশেষে পাটেব পরিবর্ত্তে তন্তু বিশিষ্ট অন্য প্রকাব বৃক্ষের চাষ আরম্ভ হয়। শুনা যায়, কোন কোন দেশে পাটের পরিবর্ত্তে ঐরূপ আঁশেব অন্য জিনিসের দ্বারা চট, ব্যাগ, দড়ি সতরঞ্চি প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া থাকে। আমেরিকাতে খুব বড় বড় চালানি কারবারে মাল বোঝাই ও খালাস করিবার জন্য ব্যাগ বা থলে ব্যবহার হয় না। ক্যানাডার প্রেয়ারিজ প্রান্তরে অর্থাৎ তেপান্তর মাঠ সমূহে উৎপন্ন গম, সেখানকার মাঠ হইতে শহরের মুদী দোকানে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে

পথে কখনও থলের মধ্যে প্রবেশ করে না। সেই দেশে মেক্যানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট (mechanical transport) পদ্ধতি, অর্থাৎ যন্ত্রের সাহায্যে মালপত্র বহন করার কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থলের ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে বিদেশে পাটের চাহিদা কম। পাটের বাজার পড়িয়া যাইবার ইহা যে একটী প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু একদিকে ব্যবহার কমিয়াছে বলিয়াই যে পাটের বাজার চিরকালের তরে রসাতলে গেল, তাহা নহে। অন্য দিকে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব, অথবা পাটের নূতন রকমের ব্যবহারও উদ্ভাবিত হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, রাস্তা পাকা করিবার জন্য চট বিছাইয়া তাহার উপর পিচ ঢালিয়া এস্‌ফাল্ট দেওয়া হয়। চটের এই নূতন ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় উহার কাটতি বাড়িয়াছে। স্পেনে ও ইতালীতে এই প্রণালীতে রাস্তাপাকা করা হয়। কলিকাতায় শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সার্কুলার রোডের কিয়দংশ এইরূপে চটের উপরে পীচ ঢালিয়া পাকা করা হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে স্পেনদেশীয় জনৈক চটকলের মালিক কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রাস্তা পাকা করিতে এখানে চট ব্যবহার হয় না দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হন।

যাহা হউক, আমাদের বিশ্বাস, পাটের আরও নূতন নূতন ব্যবহার কৌশল বাহির হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটের চাহিদাও বাড়িবে। সুতরাং বাংলার পক্ষে পাটের চাষে অবহেলা দেখান নিতান্ত ক্ষতিজনক। পুনশ্চ পাটের নূতন ব্যবহার বাঙ্গালীকেই উদ্ভাবন করিতে হইবে। বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের অভাব নাই, যদি বাস্তবিকই বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্য বিষয়ে বাংলার গর্ব্ব করিবার কিছু থাকে, তবে তাহা যথার্থ কার্য্যে নিয়োজিত হওয়া উচিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাট বাংলার একান্ত স্বকীয় ও স্বাভাবিক ফসল হইলেও এখানে পাটের নানাবিধ উদ্ভাবনের জন্য কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক চেষ্টা এযাবৎ হয় নাই। কিরূপে উন্নত ধরণের পাটের ফসল পাওয়া যায়,—উজ্জ্বল-বর্ণযুক্ত, শক্ত ও মিহি আঁশ বিশিষ্ট ভাল পাট কিরূপে জন্মাইতে হয় এ সব বিষয়ে কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার চেষ্টা অথবা সুযোগ কিছুই বাংলা দেশে নাই। অথচ বিলাতের পাটের কলের মালিকেরা ডাণ্ডী সহরে (স্কটল্যাণ্ডে পাটকলের প্রধান স্থান) ঐ সম্বন্ধে বৃহৎ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার নির্ম্মাণ করিয়া বহুকাল যাবৎ নানাপ্রকার গবেষণা চালাইতেছে। যদিও বাংলাদেশের পাট কল সমূহের অধিকাংশই সেই বিলাতী মালিকদের, তথাপি এদেশে পাট তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য লেবরেটরী বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা এযাবৎ কেহ উপলব্ধি করেন নাই।

সম্প্রতি কিছুদিন হইল, ইণ্ডিয়ান জুটমিলস্ য়্যাসোসিয়েসান ১৬ নং ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা এই ঠিকানায় একটী পাট গবেষণাগার (Jute Research Laboratory) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উক্ত য়্যাসোসিয়েসানের চেয়ারম্যান মিঃ এইচ, এইচ, বার্ণ উহার উদ্বোধন করেন। আধুনিক উন্নতধরণের নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, স্যালিনোমিটার (Salinometer) অণুবীক্ষণ, ফটোগ্রাফ্ তুলিবার ব্যবস্থা, সূক্ষ্ম মাপের তুলাদণ্ড

প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহা হউক এতকালপরে যে তবু একটা লেবরেটরী স্থাপিত হইল, ইহাই আমাদের আনন্দের বিষয়। কাজ কতদূর কি হয়, তাহা পরের কথা। তবে পাটের ভবিষ্যৎ যে নিরাশাজনক নহে, তাহা সুনিশ্চিত।

পাট রপ্তানীর হিসাব

নিম্ন লিখিত তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত চারিমাসে বিদেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলার পাট কি পরিমাণ রপ্তানী হইয়াছে, তাহার হিসাব দেওয়া হইল,—

১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে জুলাই—

দেশের নাম	১৯৩৬	১৯৩৭
	টন	টন
জার্ম্মানি	৫০২২৯	৫৮৯৯৮
গ্রেট ব্রিটেন	২৫৩৫৫	৩৩৬৯৪
রুশিয়া	৩৯৯৭	১৭৯
সুইডেন	১৫০৬	১৯৫৬
পোল্যাণ্ড	২৫৬১	২৪৯৩
হল্যাণ্ড	৬০১৩	৩৩৪১
বেলজিয়াম	১৬৯৩৯	১৭৪২০
ফ্রান্স	২৬৩৬১	২৩৪৪২
স্পেন	১৪৬৩৬	×
পর্টুগাল	৯৯৭	৮৯৩
ইতালী	১৩৬১৭	৩৭৩০৫
গ্রীস	৫৭৭	১৪৬৫
হংকং	১৫০৯	১৩১৮
চীন	২৭৬৪	৪৬৮৩
জাপান	১০৬৬১	৬০০৯
মিশর	৭২৪	৮৫২৭
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	২১৩৯০	৪৫৯৪৯
মেক্সিকো	৫৮২	২৯৪
আর্জ্জেন্টিনা	৩১৩৪	৪১৭৬
ব্রাজীল	৫৮৬৪	৭৭৬৩
অপরাপর দেশ সমূহ	৩১৭৬	৩৭০৮
মোট	২১২৭৬৭	২৬৩০৪২

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায়, মোটের উপর পাট রপ্তানী গত বৎসর অপেক্ষা ৫০২৭৫ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং বিদেশে যে পাটের চাহিদা নাই,—অথবা কমিয়াছে, এ কথা সত্য নহে। জার্ম্মাণীতে এবং আমেরিকায় পাটের পরিবর্ত্তে অন্য এক প্রকার আঁশ বিশিষ্ট বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, এ সংবাদ শুনা যায়। অনেকের ধারণা আমেরিকা অথবা জার্ম্মাণী আর ভারতীয় পাট ক্রয় করিবে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে, এই উভয় দেশেই পাট রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য স্পেনে কোন রপ্তানী হয় নাই এবং পর্টুগালেরও রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়াছে। ইতালীতে ও গ্রীসে প্রায় তিন গুণ বাড়িয়াছে। আর্জ্জেন্টিনা হইতে ইউরোপে প্রচুর গম চালান হয়। সেখানে বস্তার প্রয়োজন খুব বেশী। সুতরাং তথায় পাটের চাহিদাও বাড়িতেছে। রুশিয়া ও পোল্যাণ্ডের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে, সেইজন্য তাহারা পাট ক্রয় কমাইতে বাধ্য হইয়াছে।

—•—

পাট চালানীর হিসাব

১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দশ মাসে ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্ব বৎসরের ঐ সময় অপেক্ষা

অধিক পরিমাণ পাট বিদেশে চালান হইয়াছে। নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইল,—

দেশের নাম	১৯৩৬-৩৭ জুলাই এপ্রিল গাঁইট্	১৯৩৫-৩৬ জুলাই এপ্রিল গাঁইট্
গ্রেট বৃটেন	৯৫৩৭০৬	৭৫৫১৯৪
জার্ম্মাণি	৭৯৮৯১০	৭৩৯৩২৫
ফ্রান্স	৩৬৮৯১৯	৩১৭৩২৫
বেলজিয়াম	২৩০১৮৪	১৬৫৭০৫
ইতালী	৫৪২৭৬৬	২১৩০৫৮
হল্যাণ্ড	৪২৮৬৯	৪১১৭২
গ্রীস্	৭৫৭২	৬৩৪৬
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৩৪৬১৭২	৩৪৫৪৮৮
দক্ষিণ আমেরিকা	১২৬৩৩৩	৯৮১২৬
জাপান	৭৫৮৭৯	৬৫৭১৭
চীন	৬৩৩৯৭	৫৫৪৩৭
সুইডেন	৩১৬৮৯	১৯১০০
ইউরোপীয় বন্দর ও অপরাপর বন্দর সমূহ	২৮১৯৬০	২৩৪১২১

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায় রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ১৬ গাঁইট হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাংলার পাট একটা প্রধান কৃষি সম্পদ। দেখা গিয়াছে ইহার সহিত বাংলার আর্থিক উন্নতির খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিছুকাল যাবৎ পাটের বাজার পড়িয়া যাওয়াতে অনেকে পাট সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছেন। গত বৎসর গভর্ণমেণ্ট পাটের চাষ কমাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ফসল কম হইলে বাজার একটু চড়িতে পারে,—এই আশা ছিল। সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং বাংলার পক্ষে এখন অন্য ফসলের চাষে মনোযোগী হওয়া উচিত। আমরা এই প্রকার সিদ্ধান্ত সমর্থন করি না। যাহা প্রাকৃতিক সম্পদ তাহাকে পরিত্যাগ করা মূর্খতার কার্য্য। যাহাতে পাটের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়,—দেশ বিদেশে পাটের চাহিদা বাড়ে,—নূতন কার্য্যে পাটের ব্যবহার কৌশল আবিষ্কৃত হয়, সেই দিকে চেষ্টা করা উচিত। সম্প্রতি কলিকাতায় পাট সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য একটি বৃহৎ লেবরেটরী বা পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই পরীক্ষাগার আরও ৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। তাহা হয় নাই বলিয়াই আজ পাট শিল্পের এই দুর্দ্দশা। আশ্চর্য্যের বিষয়, পাট সম্বন্ধে স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডী সহরে যে সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার বহুকাল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বাংলাদেশে,—যেখানে পাটের জন্মস্থান,—সেখানে আজ পর্য্যন্ত তাহার মত কিছুই হয় নাই। জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টের দোষ দেয়,—কিন্তু এবিষয়ে কংগ্রেস হইতেও চেষ্টা করা যাইত। গঠনমূলক কার্য্যের জন্য খুব চীৎকার করা হয়,—কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে কংগ্রেস পশ্চাৎপদ। টাকার অভাবে নহে,—কেবলমাত্র ইচ্ছার অভাবে এবং নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে এই একান্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এতদিন যাবৎ বাংলাদেশে গড়িয়া উঠে নাই।

রবার ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত প্রণালী

ব্যবসায়ী মাত্রই রবার ষ্ট্যাম্পের বিষয় অবগত আছেন। আধুনিক ব্যবসাক্ষেত্রে রবার ষ্ট্যাম্প শুধু যে একটা প্রয়োজনীয় বস্তু তা' নয়, ওটা একটা ফ্যাসন্। যে ব্যবসায়ী কোম্পানী বা ফার্ম্মের রবার ষ্ট্যাম্প থাকে না, সে-ব্যবসায়ী বা কোম্পানীর বাজারে সম্মান হানি হয়। শুধু তাই নয়, কোম্পানী বা ফার্ম্মের কথা ছেড়ে দিলেও ব্যক্তিগতভাবে অনেকে রবার ষ্ট্যাম্প রেখে থাকেন—এটা প্রয়োজনের জন্যেও বটে, কতকটা ব্যবসাগত ফ্যাসনের জন্যও বটে। ধরুন, একব্যক্তিকে দিনে পঞ্চাশটা করে সই করতে হয় অথচ সইটা তেমন দায়িত্বের নয়, সমস্তটাই 'ফর্ম্মাল্', এমত ক্ষেত্রে ভদ্রলোক রবার ষ্ট্যাম্পের সাহায্য না নিয়ে আর কি করেন বলুন? এই রকম সকল ক্ষেত্রেই। শুধু ব্যাঙ্ক বা কোম্পানীর কথা নয়, সাধারণের হিতার্থে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের কথাই ধরুন:— লাইব্রেরীর পুস্তক মাত্রতেই যে 'পাতা মুড়িবেন্ না' ছাপ দেওয়া থাকে তা' সকলেই লক্ষ্য করেছেন। তা' ছাড়া 'অমুক তারিখ হ'তে বিলি হ'বে', 'অমুক পাতা দেখ', 'বই বিলি বন্ধ' প্রভৃতি লিখিবার জন্যও সাধারণ পাঠাগারে রবার ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয়ে থাকে। দোকান পত্র বা অন্যান্য টাকা লেনদেনের কারবারে "Paid" "To be paid on", "Cashed on" প্রভৃতি মোহরযুক্ত রবার ষ্ট্যাম্পের দরকার হয়। এইরকম আরও কত রকম যে আছে তার ইয়ত্তা নেই।

সুতরাং, এর থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রবার ষ্ট্যাম্প কারবারী জগৎ বা অপরাপর জগতে ভয়ঙ্কর প্রয়োজনের বস্তু। কাজে কাজেই রবার ষ্ট্যাম্পের যে একটা বাজার আছে একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। এ-বাজার চাল-ডাল কিংবা মাছের বাজারের মত নিত্য প্রয়োজনীয় না হ'তে পারে, কিন্তু এ বাজার অপরাপর কারবারী বাজারের মত যে চালু তাতে সন্দেহ নেই। অধিকন্তু এর বাজার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, কেননা, আমাদের দেশটা ক্রমশঃ ব্যবসামুখী হয়ে উঠছে। আর এটাও ঠিক যে দেশটা আরও ব্যবসামুখী হয়ে উঠবে। সুতরাং রবার ষ্ট্যাপের চাহিদা এবং ব্যবহার বাড়বে বই কমবে না।

রবার ষ্ট্যাম্পের চাহিদা থাকবার আরও একটি কারণ এই যে, এ-জিনিসটি একেবারে চিরস্থায়ী নয়। অর্থাৎ একবার এ জিনিসটিকে অধিকার করলে যে এর আর প্রয়োজন হ'বে না এমন কোন কথা নেই, কেননা, রবার ষ্ট্যাম্পও নশ্বর বস্তু। আমরা [illegible]

কিনলে সেটা যেমন কিছুদিন ব্যবহারের পর ছিঁড়ে যায় এবং তারপরে পুনরায় জামাকাপড় কেনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, রবার ষ্ট্যাম্পের বেলায়ও ঠিক তাই। কারবারী মহল কিংবা কোন ব্যক্তি যখন একটা রবার ষ্ট্যাম্প করান্ তখন তাতে তাঁদের জীবন কেটে যায় না, কয়েক বছর গেলেই আবার আর একটা করানোর প্রয়োজন হয়ে পরে। এর কারণ হচ্ছে যে অনবরত ছাপ খেয়ে খেয়ে Stampটা আর তত সূক্ষ্ম থাকে না, সুতরাং তাতে তত স্পষ্ট ছাপ ওঠে না। অবশ্য একটা ষ্ট্যাম্পে যে জীবন কাটে না তা' নয় কিন্তু কারবারী মহল স্থূল ছাপ সত্ত্বেও একটা ষ্ট্যাম্প দিয়ে জীবন কাটানো সঙ্গত মনে করেন না। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, রবার ষ্ট্যাম্পের চাহিদা ঠিক থাকে।

অতএব যদি বলা যায় যে, রবার ষ্ট্যাম্প-এর ব্যবসা একটি চলতি লাভজনক ব্যবসা তাহ'লে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। অবশ্য একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, কলিকাতার মত জনবহুল ও বাণিজ্যবহুল স্থানে বহু রবার ষ্ট্যাম্পের দোকান হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে হয়ত মারাত্মক প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে যাতে করে উক্ত ব্যবসা আর তেমন লাভজনক নেই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, রবার ষ্ট্যাম্পের ব্যবসা চলে না। কলিকাতার মত জনবহুল কিংবা বাণিজ্যবহুল না হলেও কলিকাতা ছাড়া আরও অনেক স্থান আছে যেখানে রবার ষ্ট্যাম্পের দোকান নেই, অথচ রবার ষ্ট্যাম্পের চাহিদা বর্ত্তমান। সেখানকার লোকদের কিংবা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে নিরুপায়ে কলিকাতাতেই অর্ডার দিতে হয়। কিন্তু যদি স্থানীয় দোকান থাকে, তাহ'লে তাঁরা অনায়াসে, স্বেচ্ছায় এবং অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে সেখানে থেকে জিনিস পেতে পারেন। স্থানীয় দোকানগুলিও সহজেই সেখানে বেশ চলে যেতে পারে। অবশ্য রবার ষ্ট্যাম্প ব্যবসায়ীকে এটা প্রথমেই লক্ষ্য করতে হ'বে যে, যেখানে তিনি দোকান করবেন সে-স্থানটি অতীব জনবহুল ও প্রধানতঃ বাণিজ্যবহুল কি'না, অর্থাৎ সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ আফিস-দপ্তর ও লাইব্রেরী স্কুল কলেজ ইত্যাদি অবস্থিত কিনা। তা' যদি না হয়ত দোকান খুলে কোন লাভ নেই। এখানে একথাও বলে রাখা প্রয়োজন যে কলিকাতার রবার ষ্ট্যাম্প ব্যবসায়ীদের মধ্যে এখন প্রতিযোগিতা দেখা দেয় নি যাতে তাঁদের কারবারের ক্ষতি হয়। সুতরাং কলিকাতাতেও আরও কতকগুলি রবার ষ্ট্যাম্পের দোকান খোলা যেতে পারে।

এতক্ষণ আমরা রবার ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজনীয়তা ও তার বাজারের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এর থেকে এটা বোঝা শক্ত নয় যে, রবার ষ্ট্যাম্পের কারবার খুললে দু'পয়সা পাওয়া যেতে পাবে। উপরন্তু এই কারবার খোলা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। রবার ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত প্রণালী অতীব সহজ, এর মধ্যে এমন জটীল ব্যাপার কিছুই নেই। তাছাড়া কেউ যদি রবার ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত শিল্প আরম্ভ করতে চান তাহ'লে তাঁর খুব বেশী মূলধনেরও প্রয়োজন হবে না, সামান্য অল্প কিছু পুঁজিতেই তিনি তা' সুরু করতে পারেন। আমরা এই প্রবন্ধে রবার ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

রবার ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতের যন্ত্রপাতির মধ্যে কয়েক ফাউণ্ট টাইপ, কয়েকটি ছাপবার চেস্ (Chase), খানকতক লেড্ ও একটি ছোট প্রেস্-মেসিন আবশ্যক। সাধারণতঃ ছাপবার চেসের একটু দাম বেশী কিন্তু রবার ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতের জন্য আবশ্যকীয় চেসে বেশী চাপ পরে না, সুতরাং বেশী দামের পেটা লোহার চেসের চাইতে অল্প দামের ঢালাই লোহার চেস্ ব্যবহার করা চলে। কাঠের চেসও ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু তা' টেকসই নয়। যদি একান্তই কেউ কাঠের চেস্ ব্যবহার করতে চান্ তাহ'লে তিনি শাল কিংবা লোহা কাঠের মত শক্ত কাঠের চেসই ব্যবহার করবেন।

সাধারণ লোকের ধারণা আছে যে, রবারের ওপর ছুরি দিয়ে কুঁদে কুঁদে প্রয়োজন

মত রবার ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু এই ধারণার মধ্যে মোটেই সত্যতা নেই। রবার ষ্ট্যাম্প রবারকে খোদাই করে প্রস্তুত হয় না, পরন্তু রবারের ওপর টাইপের ছাপ নিয়ে তা' প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই টাইপ সাজানো কতকটা দক্ষতা ও অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে, অর্থাৎ টাইপ কি করে সাজাতে হয় তা' শিখে নেওয়া দরকার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন—'ধারে বিক্রয় নাই' এই কথাগুলোর ছাপ নিতে হবে,—সুতরাং ছাপাখানায় যেমন করে ধ, আ, এ, র, প্রভৃতি টাইপ পরপর সাজায় সেই রকম ভাবেই টাইপ সাজানো প্রয়োজন। এখন টাইপ-এর কেসে টাইপ ত ঠিক পরপর খোপে সাজানো থাকে না, কোথায় ধ থাকে, কোথায়ই বা আ থাকে সেটা শিখে নিতে হয়। এই শিক্ষা ব্যাপারটা মোটেই শক্ত বা বহুসময় সাপেক্ষ নয়, অল্প সময় ও একটু অভ্যাস মাত্রেই তা' আয়ত্ত হয়ে থাকে।

টাইপগুলি ঠিক পরপর সাজানো হবার পর সেগুলি চেসে আঁটা হয়ে থাকে। সকলেই জানেন যে, ছাপাখানায় টাইপ সাজানো কার্য্যে ভুল থেকে যায় এবং সেইজন্যই প্রুফ্ সংশোধনের প্রয়োজন হয়। রবার ষ্ট্যাম্পের বেলায়ও টাইপ সাজানো কার্য্যে ভুল থাকা সম্ভব এবং চেসে টাইপ আঁটবার পূর্ব্বে যদি ভ্রম সংশোধিত না হয় তাহ'লে পরে বহু অসুবিধায় পরতে হয়, সেইজন্য পূর্ব্বেই ভুল সংশোধন করা প্রয়োজন। রবার ষ্ট্যাম্পের জন্য টাইপ সাজানো কার্য্যের প্রুফ সংশোধন ঠিক ছাপাখানার প্রুফ্ সংশোধনের মত নহে, এতে কিঞ্চিৎ কৌশল অবলম্বিত হয়ে থাকে। সাজানো টাইপগুলির সামনে একখানি আয়না এমনভাবে বেঁকিয়ে ধরা হয় যাতে টাইপগুলি আয়নার ভেতর পরিষ্কারভাবে পড়া যায় এবং যদি কোন ভুল থাকে ত তা' সহজেই ধরা পড়ে ও তা' তৎক্ষণাৎ সংশোধিত হয়ে থাকে। এইরকম ভাবে পূর্ব্বাহ্লে যদি ভুল সংশোধন না করা যায় -ত ছাঁচে ভুল থেকে যাবে এবং সে-ছাঁচ কোন কাজেই আসবে না ও এর দ্বার অনর্থক সময় ও কর্ম্মীদের অপব্যয় ঘটবে।

টাইপ সাজানো ও সংশোধনের পরের কাজই হ'ল টাইপকে ভাল করে চেসে আটা। সাধারণ ছাপাখানায় এ-সম্পর্কে যে পন্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও সেই ভাবেই চলা হয়; অর্থাৎ সাজানো টাইপের চারধারে লেড্ লাগিয়ে দড়ি বেঁধে চেসের মধ্যে রাখা হয় এবং তারপরে দড়ি খুলে নিয়ে টুকরো কাঠ চার পাশে গুঁজে হাতুড়ী ঠুকে চেসের মধ্যে শক্ত করে আটা হয়। এই শক্ত করে আঁটবার কারণই হচ্ছে যাতে না টাইপগুলো লাইন থেকে এধারওধার বেঁকে যায়। তারপর একখানি সমতল কাঠ নিয়ে টাইপের ওপর স্থাপন করে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে দেওয়া হয়, এইরকম করবার উদ্দেশ্য হ'ল সমস্ত টাইপ গুলিকে ঠিক এক লেভেল্ এ আনয়ন করা। কারণ, সব টাইপগুলি যদি এক লেভেলে না থাকে তাহলে ছাপ ভাল উঠবে না।

এই করলেই টাইপ সাজানোর কাজ শেষ হয়ে গেল। এইবার সেই টাইপ থেকে প্লাসটারের ওপর ছাপ গ্রহণের পালা। একটা পাত্রে আন্দাজ ২ আউন্স উৎকৃষ্ট প্লাস্টার অব-প্যারিস ও ১ আউন্স ফ্রেঞ্চ চক্ জলের সঙ্গে গুলতে হয়, সেটা বেশ লেই-লেই মত হ'লেই ছাঁচ তোলবার উপযোগী হয়ে ওঠে। এই রকম ভাবে প্রস্তুত প্লাসটারকে ছাপ তোলবার উপযোগী ফ্রেমে ঢালা হয় যতক্ষণ না সেটা পরিপূর্ণভাবে ভর্তি হয়ে যায়। ফ্রেমের মধ্যে প্লাস্টার কানায় কানায় পরিপূর্ণ হলেই উপরিভাগটা সম্পূর্ণ সমতল আকার ধারণ করে—এই সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যেন কোন খানে ফাঁক, গর্ত্ত কিংবা বুড়বুড়ি না থাকে। প্লাস্টার যদি কোথাও জমে ডেলা পাকিয়ে থাকে তাহ'লেও কাজের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হ'বে। এই রকম ভাবে ফ্রেমটি পরিপূর্ণ হ'লে কয়েক মিনিট অপেক্ষার পর প্লাস্টার ঠিক শক্ত হবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তটিতে ছাপ তোলার নিয়ম। এই ছাপ তোলবার পূর্ব্বে টাইপের ওপর ৪ আউন্স তারপিন ও ২ আউন্স বেনজিন্ মিশ্রিত তৈল পদার্থ একটু করে লাগিয়ে দিতে হয়। শুধু তাই নয়, ফ্রেমে প্লাস্টার ঢালবার পূর্ব্বে ফ্রেমের মধ্যেও ঐ তৈল পদার্থ লাগানো দরকার। এরূপ করলে আর প্লাস্টার টাইপ কিংবা ফ্রেমের গায়ে লেগে থাকে না। পূর্ব্বেই বলেছি যে, প্লাস্টার শক্ত হ'বার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই ফ্রেমটিকে নিয়ে গিয়ে চেসের ওপর চেপে ছাপ নিতে হ'বে। টাইপের ফাঁকে ফাঁকে প্লাস্টার ডুবে যাবে এবং সব যায়গায় ঠিক সমান চাপ পড়লেই ছাঁচ খুব ভাল ওঠে।

দু'তিন মিনিট এই রকম ভাবে রাখবার পর প্লাস্টার যখন শক্ত হয়ে যায় তখন ফ্রেমটিকে চেস্ থেকে খুলে নেওয়া হয় এবং প্লাটসারকে শুকোবার জন্য উনোনের ওপর রাখা হয়, গরমে 'ইভাপোরেসন্ (evaporation খুব দ্রুতগতিতে চলে এবং ৮।১০ মিনিটের মধ্যে প্লাস্টারের সমস্ত জল বাষ্প হয়ে নিঃশেষে উঠে যায়। প্লাস্টার সম্পূর্ণ জলশূন্য হয়েছে কিনা তা' পরীক্ষা করবার এক উপায় আছে। যদি জলশূন্য না হয়ে থাকেত বাষ্প নির্গত হবে এবং একখণ্ড কাঁচ যদি ফ্রেমের ওপর ধরা যায় ত বাষ্প তার ওপর জমা হবে। যদি কাঁচের ওপর কিছু না জমা হয় ত বুঝতে হবে যে প্লাস্টার সম্পূর্ণ জলশূন্য হয়েছে।

যদি ষ্ট্যাম্প খুব বেশী টেক্‌সই কিংবা সুন্দর করতে হয় এবং যদি একই প্লাস্টারের ছাপ থেকে অনেকগুলি ষ্ট্যাম্প তৈরী করতে হয় তাহলে ঐ প্লাস্টারের ওপর সাধারণ গাম্ সেলাক ও মেথিলেটেড্ স্পিরিটের জলীয় সলিউশন্ দ্বারা সোক্ (soak) করিয়ে নিতে হয়। কিন্তু সাধারণ ব্যাপারে এটি সম্পাদিত হয় না। তারপরে ঐ প্লাস্টারের ছাঁচের ওপর আবশ্যকীয় ষ্ট্যাম্পের সাইজের দু'খানি বিশেষ প্রকারের ইণ্ডিয়া রবার কেটে স্থাপন করতে হয়—ঐ রবারের গায়ে সামান্য পরিমাণ ফ্রেঞ্চ চক্ মাখানো প্রয়োজন। তৎপরে সমস্ত বস্তুগুলিকে একটি স্ক্রু প্রেসের মধ্যে স্থাপন করা হয়।

এইবার রবারের 'ভল্‌কানাইজিং'-এর পালা। ঐ স্ক্রু-প্রেস্ ও সমস্ত বস্তুগুলিকে একটি ষ্টোভের ওপর স্থাপন করা হয় এবং উত্তাপ পেয়েই রবার গলতে আরম্ভ করে। উক্ত স্ক্রু প্রেস থাকার দরুণ গলিত রবার ছাঁচের চারধারে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর সমস্তটা শীতল হলে রবারকে ঐ ছাঁচ থেকে আলাদা করে নেওয়া হয় এবং পরে সেটাকে ছেঁটে কেটে রবার ষ্ট্যাম্পের হাতলের ওপর গঁদ বা শিরীষের আটা দিয়ে জুড়ে দিলেই আবশ্যকীয় রবার ষ্ট্যাম্প তৈরী হয়। ব্যবসাদারেরা কাজের সুবিধারের জন্য একটি একটি করে পৃথক্ ছাপ না নিয়ে একসঙ্গে ছ'সাতটার ছাঁচ প্রস্তুত করে এবং একসঙ্গে ছ'সাতটারই ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত হয়। তারপরে সেগুলোকে কেটে আলাদা আলাদা হাতলে জোড়া হয়ে থাকে।

আমরা রবার ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করলাম, এর থেকে পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবেন যে, এ এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়; এবং এই ব্যবসার উপযোগিতা সম্পর্কে আমরা লেখার প্রথমেই আলোচনা করেছি।

বাংলার রেশম শিল্প

খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর থেকে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক সুরু হয় এবং সে সম্পর্ক হিন্দুযুগ এবং মুসলমানযুগে ক্রমাগত বর্দ্ধিত হয়েছিল। বৃটিশযুগে তার চরম বিকাশ ঘটেছে কিন্তু তা' আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। তখনকার দিনে উক্ত বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে প্রধান বস্তু ছিল সিল্ক, মসলিন প্রভৃতি বস্ত্র ও মশলা। বস্তুতঃ, বাংলাদেশ বিলাসিতার উপযোগী বস্ত্রের জন্য চিরকাল বিখ্যাত ছিল। নানান্ ঘটনাবিপর্য্যয়ে ও বাধার মধ্যে তার পূর্ব্ব গৌরব আজ নিঃসন্দেহে অনেকখানি লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েনি। তার পূর্ব্ব-গৌরব লুপ্ত হবার একমাত্র কারণ হল যন্ত্র-প্রতিযোগিতা এবং আমাদের তাঁতীদের বর্ত্তমান প্রগতি সম্পর্কে অনুশীলনীর অভাব। আমাদের যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলে আমরা সহজেই বিশ্ববাজারে স্থান করে নিতে পারতাম সে-সবই আমাদের ছিল ও আছে, শুধু বর্ত্তমান যন্ত্র কৌশল ও ব্যবসা কৌশল আয়ত্তের অভাবে আমরা বিশ্ববাজারে স্থান করা ত দূরে থাক নিজেদের বাজারে পদে পদে হঠে যাচ্ছি। আমাদের তাঁতীদের অবস্থা এবং মস্‌লিন, সিল্ক প্রভৃতি শিল্পের বর্ত্তমান পরিণতি তার সাক্ষ্য দেয়।

কিন্তু মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে বাংলার সিল্ক মসলিন শিল্পের এ অবস্থা ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত পরিব্রাজক Bernier বাংলার সিল্ক শিল্প সম্পর্কে বলেছিলেন—"There is in Bengal such a quantity of cotton and silks, that the kingdom may be called the common store house for these two kinds of merchandise, not of Hindusthan, or the Empire of the Great Mogul only, but of all neighbouring Kingdoms, and even of Europe. The same may be said of silk and silk-stuffs of all stores. It is not possible to conceive the quantity drawn every year from Bengal··· ··· The silks are not, certainly, so fiine as those of Persia, Syria, Sayd and Barut, but they are of a much lower price; and I knew form indisputable authority that if they were well selected and wrought with care, they might be manufactured into most beautiful stuffs" এর তাৎপর্য্য হচ্ছে যে বাংলায় এত সিল্ক পাওয়া যেত যে, তা' শুধু হিন্দুস্থান কিংবা মোগল সাম্রাজ্যের পণ্যদ্রব্য বলে গণ্য হ'ত না, পরন্তু তা' নিকটবর্ত্তী দেশসমূহ, এমনকি ইউরোপের বাণিজ্যদ্রব্য বলে পরিগণিত হত। বাংলার সিল্ক পারশ্য, সিরিয়া প্রভৃতি
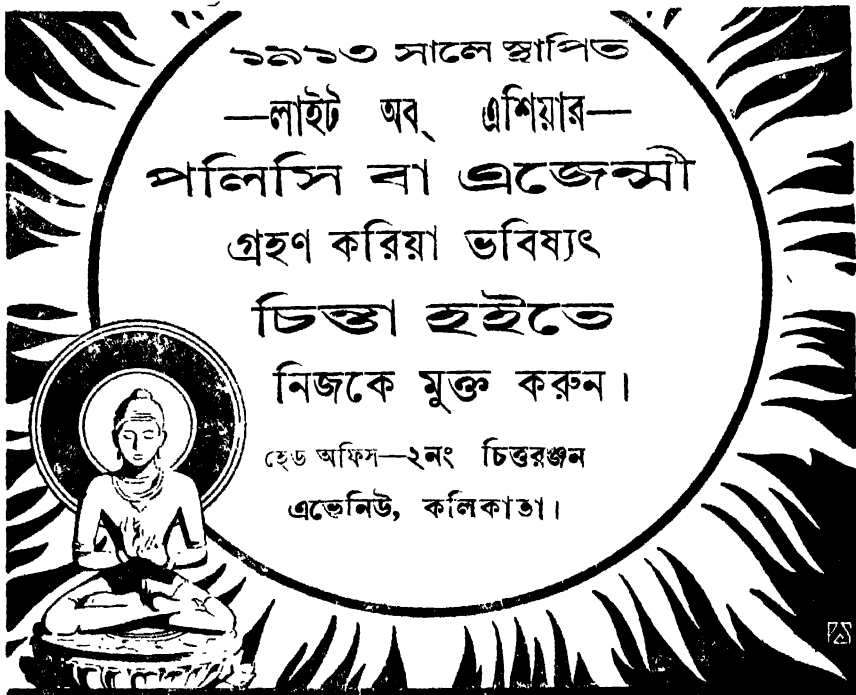
দেশের সিল্কের তুলনায় অত সুন্দর না হলেও তা' অত্যন্ত সস্তা এবং গুটির চাষ যদি ভালভাবে যত্নের সহিত চালানো যায় তাহলে নিঃসন্দেহে তার থেকে সুন্দর সিল্ক উৎপন্ন হতে পারে।

কিন্তু বাংলার রেশম শিল্পের ঐ যে গৌরব তা' বিনষ্ট হ'ল কি করে? পূর্ব্বেই বলেছি যে, যন্ত্র-প্রতিযোগিতা আমাদের তাঁতীদের সর্ব্বনাশ করেছে; তা ছাড়া জাপানী সস্তা সিল্ক বাজার ছেয়ে ফেলায় আমাদের দেশী শিল্পের পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। ১৮৭২ সালের পর থেকে জাপান প্রতিযোগিতা সুরু করে এবং তার পর হতেই দেশী শিল্পের ক্রমে ক্রমে সর্ব্বনাশ সুরু হয়। এতদ্ব্যতীত দেশী সিল্ক বিদেশী সিল্কের তুলনায় অত সুন্দর নয় এর কারণ বিখ্যাত পরিব্রাজক Bernier পূর্ব্বেই উল্লেখ করে বলেছেন যে বাংলার রেশম-ব্যবসায়ীরা গুটির চাষের প্রতি তেমন যত্ন নেন্ না। যদি গুটির চাষের যত্ন নেওয়া হ'ত তাহ'লে দেশী সিল্ককেও বিদেশী সিল্কের তুল্য সুন্দর দেখাত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে আমাদের চাষী কিংবা ব্যবসায়ী কারও চায ব্যবসা সম্বন্ধে তেমন অনুশীলনী নেই।

গুটির চাষের প্রতি যে তেমন যত্ন নেওয়া হয় না এবং বাংলাদেশে রেশমশিল্পের সম্প্রসারণ কল্পে যে গুটির চাষ বাড়ানো হয় না, তার কারণ হচ্ছে গুটি চাষের জমির খাজনার হার অত্যন্ত চড়া। রেশমের দর যখন খুব চড়া ছিল, মালদহ, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি

স্থানের জমিদারগণ বিঘাপিছু ১২৲, ১৪৲, ও এমন কি ১৬৲ টাকা হারে জমির খাজনা আদায় করতেন; কিন্তু ঐ সমস্ত স্থানের ধানজমির খাজনা ছিল বিঘাপিছু ১৷৷৹ বা ২৲ টাকা মাত্র। বর্ত্তমানে গুটির চাষের জমির খাজনা অতখানি চড়া না হ'লেও অপরাপর চাষের জমির তুলনায় অত্যন্ত বেশী। সুতরাং গুটি চাষের উন্নতি কিংবা সম্প্রসারণের দিকে কেউই নজর দেয় না, বরং যাদের গুটির জমি আছে তারা, অপরাপর কৃষিদ্রব্যের চাষে বেশী লাভের আশায় গুটির চাষও ক্রমশঃ ছেড়ে দিচ্ছে। গুটি চাষের একটি মস্ত প্রতিবন্ধক হচ্ছে রোগের উৎপাৎ। এই রোগের আক্রমণের জন্য গুটির দর পড়ে যায় এবং সেই হেতু চাষীরা তাদের উৎপাদন খরচ কমাতে বাধ্য থাকে। সেক্ষেত্রে রেশমের গুণগত উন্নতি কিংবা রেশম শিল্পের লাভ কি করে আশা করা যেতে পারে। তাছাড়া, ব্যাপার এই যে একবার রোগ আক্রমণ করলে সেই জমিতে পরবর্ত্তী চাষেও রোগ দেখা দেয়।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে উৎপন্ন গুটি বিদেশে চালান যেত, এবং সেইজন্য গুটির চাষও বেশী ছিল। কিন্তু দেশীয় গুটির গুণগত নিকৃষ্টতার জন্য এবং বিদেশীরা অন্য পন্থা অবলম্বন করার দরুণ গুটির চালানী কারবার বন্ধ হয়ে গেছে। পূর্ব্বে যে পরিমাণ গুটি বিদেশে চালান যেত সেটা ছিল অতিরিক্ত চাহিদা, তার পয়সাও মিলত ভাল। সেই হেতু চাষীরাও গুটির চাষের প্রতি ঝোঁক দিত। বর্ত্তমানে সেটা বন্ধ হওয়ার দরুণ চাষীরা আর গুটি চাষের প্রতি ততটা, এমনকি মোটেই আগ্রহ দেখায় না এবং তজ্জন্যই গুটিচাষের উন্নতি কিংবা সম্প্রসারণ ঘটে ওঠে না। তাছাড়াও আমাদের রেশম শিল্পের উন্নতি না হওয়ার আরও একটি কারণ হচ্ছে যে আমাদের তাঁতীরা সেই পুরাতন প্রথায় অন্ধ বিশ্বাসী। তারা ভুলেও কখনো বাপ পিতামহের প্রচলিত পন্থা হ'তে এতটুকু বিচ্যুত হয় না। সেইটাই আজ তাদের উন্নতির সহায়ক না হয়ে অবনতির সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব্বেই বলেছি যে, অপরাপর দেশে আজ আর হস্ত দ্বারা সমস্ত শিল্পকার্য্য সাধিত হয় না, পরন্তু যন্ত্র দ্বারা চালিত হয়। কুটীর শিল্পের ক্ষেত্রেও সে সমস্ত দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত যন্ত্র পাতির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে, কেননা, তা না হ'লে যন্ত্র-প্রতিযোগিতার সঙ্গে একটা কল্যাণকর সমন্বয় সাধিত হবে না। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পীরা এখনো ঐ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি—সেইজন্যই দেখি যে আমাদের তাঁতীরা রেশমী সুতা এখনও একটি মান্ধাতার আমলের চরকায় জড়ায় যার দ্বারা আজকের যুগে কাজ চলে না। উক্ত চরকার সুতো আধুনিক তাঁতের উপযুক্ত নয় কিংবা উক্ত চরকার দ্বারা আজকের বাজারের দাবী মেটানো সম্ভব নয়; তবুও আমাদের হতভাগ্য দেশের মোহগ্রস্ত তাঁতীরা সেই পুরাতন চরকার মায়া কাটাতে পারে নি। ফলে এই হয়েছে যে বাংলার বাইরের রেশম শিল্পের কেন্দ্র সমূহে বাংলার সুতা আর ব্যবহৃত হয় না, পরন্তু বিদেশী সুতাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এবং বাংলাদেশ স্থানীয় যায়গাগুলির দাবী ছাড়া বাংলাদেশেরই বৃহত্তর বাজারের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় না।

রেশম শিল্পের এই দুরবস্থার জন্য রেশম-

ব্যবসায়ীরা নিজেদের ত্রুটিকে কোনমতেই দোষ দেয় না, দোষ দেয় অদৃষ্টকে। তারা ভুলেও ভাবেনা যে, তাদের মান্ধাতার আমলের চরকা, অকার্য্যোপযোগী যন্ত্রপাতি, নিকৃষ্ট গুটির প্রভৃতির জন্যই তারা প্রতিযোগিতায় হঠে যাচ্ছে। তা'ছাড়া চাষীদের অবস্থা ভাল না থাকার দরুণ তারা চাষকার্য্যের উন্নতিসাধন করতে পারে না এবং গুটি চাষের উন্নতি না হ'লে রেশম শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। চাষীদের এই অবস্থা ভাল না থাকার দরুণই তারা মহাজনের কবলগ্রস্ত হয় এবং তার ফলেই লাভের অঙ্কে তার শূন্য পবে। গুটি চাষীদের মধ্যে সমবায় পদ্ধতিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন না করলে তারা মহাজনের কবল হ'তে রেহাই পাবে না, ফলে পুরাতন ব্যবস্থারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। বর্ত্তমানে ঐ পুরাতন ব্যবস্থা বজায় থাকার দরুণই আমাদের রেশম শিল্পের শোচনীয় পরিণতি। মাড়োয়ারী মহাজনদের নিকট চাষীরা অভাবের তাড়নায় গিয়ে হাত পাতে এবং মাড়োয়ারীরা সুযোগ বুঝে আগামী ফসলের জন্য দাদন দিয়ে রাখে। সুতরাং ফসল বিক্রয়ের সময় দরদস্তুর কিংবা লাভের ওপর চাষীদের কোন হাত থাকে না। এবং এইজন্য গুটির গুণাগুণের উন্নতিও সাধিত হ'তে পারে না। এছাড়া, পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে রোগ গুটিচাষের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে, সেই রোগের হাত থেকে রেহাই পাবার ব্যবস্থা করা দরকার।

এই রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া খুব বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়; গভর্ণমেণ্টের
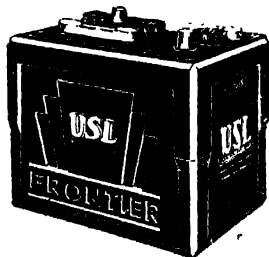
'সেরিকাল্‌চার' (Sericulture) বিভাগ থেকে এর কিছু কিছু ব্যবস্থা হচ্ছে। রোগমুক্ত বীজ বিতরণ করে বেশ সুফল পাওয়া যায়। শুধু দরের দিক দিয়ে এখনো কোন উন্নত অবস্থা দেখা দেয় নি। তবে একটা আশার কথা আছে। পূর্ব্বে অপরাপর কৃষিদ্রব্যের মূল্য যখন চড়া ছিল, তখন গুটিচাষীরা গুটির চাষ ছেড়ে দিয়ে অপর ফসলের চাষের দিকে মনোনিবেশ করত। কিন্তু বর্ত্তমানে অপরাপর কৃষিদ্রব্যের দর ভয়ঙ্কর পড়ে গেছে, সে-তুলনায় গুটির চাষে লাভ আছে। সুতরাং চাষীদের যদি এখন ব্যাপকভাবে গুটির চাষ করতে প্ররোচিত করা যায় ত তারা অসম্মত হ'বে না। তা'ছাড়া চরকা ও তাঁতের উন্নত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের আপাততঃ অন্য দেশের বাজারের প্রতি মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশের বাজারে যে পরিমাণ সিল্ক প্রয়োজন হয়; সেটা সরবরাহের ব্যবস্থা আমরা যেন করতে পারি। তাতে দেশের অনেক টাকা দেশে থেকে যাবে এবং রেশম ব্যবসায়ীদের আর্থিক কল্যাণ সাধিত হ'বে। তদুপরি রেশমশিল্প ভালভাবে চললে বেকারদেরও অন্নসংস্থান ঘটিবে। আমরা দেশবাসী ও গভর্ণমেণ্টের এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

কার্পাস শিল্পে ব্রিটিশ ও ভারতীয় স্বার্থের সংঘাত

ভারতবর্ষে কার্পাস শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী কাপড়ের আমদানী ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়াতে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কলের মালিকগণ তাঁহাদের নষ্ট ব্যবসায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। বিলাতী কাপড়ের উপর শুল্ক তুলিয়া দিতে অথবা কমাইয়া দিতে তাঁহারা ভারতগবর্ণমেণ্টকে অনেক অনুরোধ করেন। ভারতীয়দের পক্ষ হইতে এই কথা বলা হয় যে, বিলাতী কাপড়ের কলে ভারতের তুলা ব্যবহার করা হয় না। সেখানে ইজিপ্ট ও আমেরিকার তুলাই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ভারতবর্ষ বিলাতী কাপড় কিনিবে কেন? এই আপত্তির উত্তরে বিলাতী কাপড়ের কলের মালিকেরা ভারতীয় তুলা ব্যবহার করিতে সম্মত হন। তাহারা বলেন, ভাল কাপড় তৈয়ারী করিবার পক্ষে ভারতীয় তুলা নিকৃষ্ট। তবে ইহাকে ইজিপ্ট বা আমেরিকার উৎকৃষ্ট তুলার সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। যাহা হউক, ভারতীয় স্বার্থের খাতিরে এবং প্রধানতঃ নিজেদেরই স্বার্থ সিদ্ধির মতলবে বিলাতী কাপড়ের কলের মালিকগণ ভারতীয় তুলা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহারা প্রতিবৎসরই এই তুলার হিসাব দেখাইয়া ভারতকে বিলাতী কাপড় কিনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তাহারা বলেন "এই ত আমরা প্রতিবৎসর আমাদের কলে ভারতীয় তুলা বেশী পরিমাণ ব্যবহার করিতেছি, তোমরা এইবার বিলাতী কাপড় সেইরূপ বেশী পরিমাণে ক্রয় কর।" এই বিষয় লইয়া এখন ভারতীয় এবং ব্রিটিশ স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হইয়াছে।

ভারতীয় কেন্দ্রীয় কার্পাস সমিতি,—(Indian central cotton committee) যে হিসাব তৈয়ারী করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় গত ৪ বৎসরে বিলাতে ভারতীয় তুলা রপ্তানীর পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে। নিম্নে তাহার একটা হিসাব দেওয়া হইল;—

ভারতীয় তুলা রপ্তানীর হিসাব

বৎসর আগষ্ট হইতে জুলাই	হাজার গাঁইট। এক গাঁইট = ৪০০ পাউণ্ড (৫ মণ) মোট রপ্তানী	বিলাতে রপ্তানী	বিলাতে শতকরা রপ্তানী
১৯৩২-৩৩	২৮৬৮	২৫৭	৮·৬
১৯৩৩-৩৪	৩২৭০	৩৬৭	১১
১৯৩৪-৩৫	৩১১৫	৩৭৪	১২
১৯৩৫-৩৬	৩৮২৬	৫৩৩	১৩·৯

উপরোক্ত হিসাব হইতে যদিও দেখা যায়, ৪ বৎসরে বিলাতে রপ্তানীর পরিমাণ ২৫৭ হাজার গাঁইট হইতে ৫৩৩ হাজার গাঁইট পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, কিন্তু মোট রপ্তানীর তুলনায় উহা এমন বিশেষ কিছু নহে। মোট রপ্তানীর শতকরা হিসাব ধরিতে গেলেও দেখা যায়, বাড়্তির পরিমাণ ৮·৬ হইতে ১৩·৯ মাত্র। পুনশ্চ এই যে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে, তাহা সমস্তই বিলাতী কলের মালিকদের স্বেচ্ছাকৃত অনুগ্রহের ফল নহে। ভারতীয় তুলা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন উন্নত হইয়াছে; সুতরাং উহা এখন নিজগুণেই বাজার দখল করিতেছে। এই সব বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায়, বিলাতের কলের মালিকেরা যে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ তুলা কিনিয়াছেন, তাহা ভারতীয় স্বার্থের প্রতি অনুরাগ বশতঃ নহে,—নিজেদেরই স্বার্থ সাধনের কৌশল ফলাইবার নিমিত্ত।

এদিকে ল্যাঙ্কাসায়ার ইণ্ডিয়ান কটন কমিটী যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহাতে বিলাতের কলের মালিকদের পক্ষ হইতে বলা হয়, ভারতবর্ষে উন্নত ধরণের ভাল তুলা পাওয়া যায় না। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় তুলা গুণে শ্রেষ্ঠ এবং দামেও সস্তা না হয়, ততদিন তাঁহারা কিরূপে উহা বেশী পরিমাণ কিনিবেন? সুতরাং এই ৪ বৎসরে বিলাতের কলে যে পরিমাণ বেশী তুলা ক্রয় করা হইয়াছে, তাহাকেই যথেষ্ট মনে করা উচিত।

আমরা এই প্রকার তর্ক বিতর্কের কোন প্রয়োজন দেখিতেছিনা। যদি বিলাতী কলের মালিকেরা বেশী পরিমাণ ভারতীয় তুলা ক্রয় করেন, তবে ভারতীয় লোকেরাও অধিক পরিমাণে বিলাতী কাপড় কিনিবে, এমন কোন কথা নয়; ভারতের পক্ষ হইতে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই,—অথবা এমন কোন প্রস্তাব করাও সঙ্গত হইতে পারে না।

ভারতের কার্পাস শিল্পের উন্নতিসাধন, বর্ত্তমান সময়ে একটী প্রধান সমস্যা। ভারতের পক্ষে ইহা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। ভারতীয় কৃষক,—শ্রমিক এবং বুদ্ধিজীবি লোক সকলেরই অর্থোপার্জ্জন ইহার উপর নির্ভর করে। ভারতের জাতীয় উন্নতির মূলভিত্তি এই কার্পাস শিল্পের উপরই প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর বাজারে মাল বিক্রয় করা বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় কাপড়ের কলের মালিকদের লক্ষ্য নহে। ভারতীয় কাপড়ের কলে নিজের অভাব মিটাইবার উপযোগী কাপড়ই এখন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়না। সুতরাং পৃথিবীর বাজারে বিদেশীর সহিত ভারতবর্ষ প্রতিযোগিতা করিতে যাইবে না। এমতাবস্থায় ভারতীয় লোকেরা যদি নিজেদের উন্নতি সাধনের স্বাভাবিক প্রেরণায় বিদেশী বস্ত্র ক্রয় বন্ধ করে অথবা কমাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে বিষয়ে কাহারও কিছু আপত্তি করিবার কারণ থাকিতে পারেনা। ভারতগবর্ণমেণ্টকে স্বার্থই দেখিতে হইবে,—যাহাতে ভারতের স্বার্থহানি হয়, এমন কোন কাজ করা ভারতগবর্ণমেণ্টের পক্ষে অযোগ্য এবং নিন্দনীয়। সুতরাং

ভারতগবর্ণমেণ্টও শুল্কাদি স্থাপন এবং অন্যবিধ নানা উপায়ে ভারতের বস্ত্র শিল্পের উন্নতির সহায়তাই করিবেন। "যদি আমার কাপড় ক্রয় কর, তবে তোমার তুলা কিনিব"—বিদেশীয়দের এমন কোন প্রলোভন সূচক কথায় ভারতবাসী ভুলিবে না। গ্রেট ব্রিটেন যদি ভারতীয় তুলা ক্রয় কবিতে অনিচ্ছুক হয়, তবে ভারতবর্ষকে অন্যত্র তুলা বিক্রয়ের বাজার দেখিতে হইবে, অথবা নিজেদের কলেই নিজেদের তুলা ব্যবহার করিতে হইবে। "তোমরা আমাদের কাপড কিনিতেছ না,—সুতরাং তোমাদের তুলা কিরূপে কিনিব,—কিম্বা তোমাদের সঙ্গে সহযোগিতাই বা কিরূপে করিব"—একথা যখন বিলাতী কাপড়ের কলের মালিকেরা বলেন তখন তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত কাপড় ব্যতীতও অন্যান্য শত প্রকারের পণ্যদ্রব্য ভারতের বাজারে বিক্রয় করিয়া গ্রেট ব্রিটেন অনেক টাকা লাভ করিতেছে। ভারতবর্ষে কাপড়ের কল যতই অধিক স্থাপিত হইতেছে, ততই বিলাতী কাপড়ের আমদানী কমিয়া যাইতেছে,—কিন্তু কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিয়া গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষের নিকট হইতে অনেক টাকা পাইতেছে।

শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিল্‌স্‌ লিমিটেড

গত ১লা অক্টোবর হুগলীজেলার অন্তর্গত কোন্নগরে শ্রীদুর্গা কটন মিলের স্পিনিং বিভাগ খোলা হইয়াছে। তদুপলক্ষে যে উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে উক্ত মিলের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ শরৎ চন্দ্র বসু, বার-য়্যাট-ল এম্. এল. এ সভাপতি হন এবং আচার্য্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্পিনিং গৃহের ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেন। "ব্যবসা ও বাণিজ্য" সম্পাদক শ্রীযুত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এবং বসুমতী সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বাংলায় বস্ত্র শিল্পের উন্নতির জন্য কটন-মিল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শ্রীদুর্গা কটনমিলের পরিচালকগণের আন্তরিক চেষ্টা, প্রভৃতি বিষয়ে কালোচিত বক্তৃতা করেন। বহু গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মিলের পরি-চালনা কার্য্য দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন।

বাংলাদেশে কাপড়ের কল স্থাপন নানা কারণে আনন্দের বিষয়। ইহার মধ্য দিয়া ধননীদের টাকা লগ্নীর সুযোগ, বে-কার যুবকদের চাকুরীর উপায়, জনসাধারণের বস্ত্রাভাব নিবারণ, এবং দেশের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির পথ রহিয়াছে। অন্নের পরেই বস্ত্র মানুষের প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য। বাংলার ৫ কোটী লোকের জন্য জন পিছু গড় পড়তায় ১৬ গজ হিসাবে প্রতি বৎসর ৮০ কোটি গজ কাপড়ের দরকার। এই পরিমাণ কাপড়ের দাম প্রতি গজ ৪ আনা হিসাবে ২০ কোটি টাকা হয়। বাংলাদেশে বর্ত্তমান সময়ে যত কাপড়ের কল চলিতেছে, তাহাতে মাত্র দেড় কোটি টাকার কাপড় তৈয়ারী হয়। অবশিষ্ট ১৮৷৷ কোটি টাকার কাপড়ের জন্য বাংলাদেশের লোক পরমুখাপেক্ষী।

সাধারণতঃ ৫০০ তাঁতের একটি কাপড়ের কলে প্রতি তাঁতে দৈনিক ৫৩ গজ হিসাবে কাপড় তৈয়ারী করিতে পারে। ইহার মূল্য প্রতিগজ চারি আনা ধরিলে বৎসরে হয় ২০ লক্ষ টাকা। সুতরাং দেখা যায়, বাংলায় যে ১৮৷৷০ কোটি টাকার কাপড়ের অভাব, তাহা

পূরণ করিতে আরও অন্ততঃ ৯০টি ঐ ধরণের কাপড়ের কল স্থাপিত করা আবশ্যক। তবেই কাপড়ের জন্য বাঙ্গালীর পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচিবে।

ধনী ব্যক্তিরা কোন কাজকারবারে হাত দিতে ভাবেন,—জিনিষ বিক্রী হইবে কিনা। মাল কাট্‌তি না হইলে ব্যবসায়ে লোকসান। যেস্থলে মাল কাট্‌তি হওয়ার বাধা আছে, সেরূপ কারবারে তাঁহারা টাকা খাটাইতে চাহেন না। মূলধনীদের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কাপড়ের কলে সে ভাবনা নাই। বৎসরে ১৮॥০ কোটি টাকার কাপড়ের চাহিদা এখনও বাংলাদেশে রহিয়াছে। বিদেশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার একটা ভয় আছে বটে,—কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয়তা বোধ এবং স্বদেশ প্রীতি এত জাগ্রত হইয়াছে যে বিদেশীর সঙ্গে

শ্রীদুর্গা কটন মিল

প্রতিযোগিতাকে বাঙ্গালী আর ভয় করে না। বাংলাদেশে বাঙ্গালীর নিজস্ব—বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী, ঢাকেশ্বরী, বাসন্তী, বঙ্গেশ্বরী, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ;— প্রভৃতি মিলে তৈয়ারী কাপড়ের দাম বোম্বাই, বিলাতী, কিংবা জাপানী কাপড় অপেক্ষা বেশী নহে। সাধারণতঃ বিদেশী জিনিষের উপর শতকরা ২০ টাকা শুল্ক চাপান আছে,—সস্তা জাপানী জিনিষের উপর শুল্ক আরও বেশী। সুতরাং ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় বিলাতীও জাপানী কলওয়ালাদেরই অসুবিধা।

বাংলাদেশে কাপড়ের কলের যে সকল সুবিধা আছে, বোম্বাই আমেদাবাদের এমন কি ইংলণ্ড জাপানেরও তাহা নাই। কিন্তু বাঙ্গালী সেই সুযোগ সুবিধা কাজে লাগাইতেছে না। বোম্বাই আহমদাবাদ কয়লার জন্য পর-মুখাপেক্ষী। এতকাল বাংলাদেশের কয়লা

তাহারা ব্যবহার করিত ;—এখন সেইস্থলে তাহারা আফ্রিকার এবং মধ্যভারতের কয়লা কিনিতেছে। বোম্বাই আমেদাবাদের কাপড়ের কলে সমগ্র উৎপাদন খরচার শতকরা ২০ টাকা কয়লাতেই ব্যয় হয়। কিন্তু বাংলাদেশে তাহার অর্দ্ধেকের বেশী লাগে না। কারণ কয়লার খনি বাংলাদেশের নিজস্ব আছে। তুলার জন্য ইংলণ্ডকে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়,—আমেরিকা ও মিশরের তুলা না হইলে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কল চলে না। বাংলা দেশের সে বিষয়ে মারাত্মক অসুবিধা নাই। এখন বাংলাদেশের কলে ভারতীয় তুলা ব্যবহার হয় ;—অবশ্য বিদেশ হইতেও তুলা আসে। কিন্তু বাংলাদেশ ইচ্ছা করিলে সে বিষয়েও স্বাধীন হইতে পারে। আমরা গত শ্রাবণ ভাদ্র মাসের 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছি এবং তাহার পূর্ব্বেও আরও অনেকবার বাংলা দেশে তুলার চাষের

শ্রীদুর্গা মিলের Preparatory Room অর্থাৎ বস্ত্র বয়নের প্রথমাবস্থা

প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ আমাদের এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। "বাংলাদেশে তুলার চাষের জমি নাই,"—"বাংলাদেশে তুলার চাষ হয়না,"—এই সকল মিথ্যা উক্তির মোহ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। ঢাকাই মসলিনের দেশে তুলা জন্মায় না,—ইহা পাগলের প্রলাপ।

বাংলাদেশে কটন্ মিল সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তুলার চাষের প্রসার হইতে থাকিবে। ৫ গজ কাপড় তৈয়ারী করিতে এক পাউণ্ড তুলা লাগে। এই হিসাবে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় ৮০ কোটি গজ কাপড়ের জন্য ২০ লক্ষ মণ তুলার দরকার। প্রতি পাউণ্ড ৪ আনা হিসাবে, এই পরিমাণ তুলার দাম হয়

৪কোটি টাকা। বাংলাদেশে যদি প্রচুর তুলার চাষ হয়, তবে পাটের বাজার নষ্ট হওয়ায় বাংলাদেশের যে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে,—তুলার দরুণ এই ৪ কোটি টাকায় তাহা অনেকটা পরিপূরণ হইবে। কটন্ মিল স্থাপিত না হইলে তুলার চাষে কেহ মনোযোগ দিবে না। তুলা, ও কয়লা,—এই দুইটি প্রধান জিনিস যদি সহজ লভ্য হয়, তবে কাপড়ের কল স্থাপনে মূলধন খাটান নিশ্চয়ই লাভজনক।

তারপর আর একটি কথা। ইংলণ্ডের লোককে ধুতি-সাড়ী তৈয়ারী করিয়া, জাহাজ ভাড়া, শুল্ক ট্যাক্স প্রভৃতি দিয়া বাহিরের বাজারে লইয়া যাইতে হইবে। জাপানেরও সেই অবস্থা। সমুদ্র পাড়ি দিয়া কাপড়ের চালান পাঠাইতে উপযুক্ত রকমে প্যাকিং ও ইন্‌সিওর প্রভৃতির জন্যও অনেক বাজে খরচ হয়। কিন্তু বাংলা দেশের কাপড়ের কলের সেই সকল অতিরিক্ত ব্যয় কিছুই নাই। কাপড়ের গাঁইটের আয়তন কমাইবার জন্য (আয়তন বড় হইলে জাহাজ ভাড়া বেশী লাগে) এবং ওয়াটার টাইট, অর্থাৎ জল-না-ঢুকে এরূপ গাঁইট বাঁধিবার জন্য বিলাতী ও জাপানী কাপড়কে অতিরিক্ত তাপে ও

চাপে পালিশ (ক্যালেণ্ডার,—Calendar) করা হয় এবং খুব বেশী চাপ দিয়া প্যাক্‌ প্রেস করা হয়। ইহার দরুণ কাপড়ের সুতার জোর কমিয়া যায়। সুতরাং কাপড় ট্যাকসই হয় না। যাঁহারা বিলাতী কাপড় সস্তায় কিনেন, তাঁহারাই বুঝেন, সস্তার জিনিসের বাস্তবিক তিন অবস্থা!

আমাদের দেশী মিলের কাপড়ে অতিরিক্ত ক্যালেণ্ডার (পালিশ) করিতে হয় না,—অথবা বেশী চাপে প্যাক্‌ করিবার প্রয়োজনও নাই। সুতরাং তাহার সুতার জোর নষ্ট না হওয়াতে উহা বিলাতী কাপড় অপেক্ষা টাঁকসই এবং উৎকৃষ্ট।

আর্দ্র জলবায়ু বস্ত্র শিল্পের পক্ষে সুবিধা-জনক। কারণ তাহাতে সুতা ভাল হয় এবং তৈয়ারীর সময় বার-বার ছিঁড়িয়া যায় না। অনেক কারখানায় হিউমিডিফায়ার (Humidifier) যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলকে আর্দ্র রাখা

শ্রীদুর্গা মিলের একাংশ

হয়। এই হিসাবে বাংলাদেশের জলবায়ু বস্ত্র শিল্পের বিশেষ অনুকূল। বাংলাদেশ নদীবহুল হওয়াতে কল কারখানার পক্ষে আর একটি বিশেষ সুবিধা। ষ্টীম ইঞ্জিনের জন্য প্রচুর জল পাওয়া যায় বলিয়া নদীতীরবর্ত্তী স্থানই মিল স্থাপনের উপযোগী। এতদ্ব্যতীত নদী ও তাহার শাখা প্রশাখার জলপথে কাঁচামাল ও তৈয়ারী মাল অল্প খরচে একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া সুবিধাজনক। বঙ্গলক্ষ্মী, ঢাকেশ্বরী, মোহিনী, চিত্তরঞ্জন, লক্ষ্মী নারায়ণ, শ্রীদুর্গা, প্রভৃতি কটনমিল নদীতীরে অবস্থিত হওয়ায় তাহাদের পরিচালনায় বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

কাপড় তৈয়ারী হইয়া গুদামেও পড়িয়া থাকিবেনা। তখনি উহা খরিদদারের কাছে

পৌছিবে। আমরা পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, বাংলায় আরও ৯০টি মিলের প্রয়োজন আছে, তাহা কেবল বাংলার নিজের বস্ত্র জোগাইবার জন্য। বিদেশে চালান দিতে হইলে ইহার দ্বিগুণ সংখ্যক মিলের দরকার। এত সুবিধাজনক অবস্থাতেও যদি দেশীকাপড় সস্তা না হয়, তবে তাহা মূলধনীদেরই দোষ বলিতে হইবে। কারণ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হইলে উৎপাদন খরচ কমান যায় না।

এত সুযোগ সুবিধা এবং অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বশতঃ বাংলাদেশে কাপড়ের কল নিদারুণ অর্থাভাবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপি দেখাযায়, একদিকে যেমন জনসাধারণ খরিদদারেরা সস্তায় কাপড় পায়, অন্যদিকে তেমনি অংশীদারেরাও উপযুক্ত ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ পায়। মোহিনী, বঙ্গলক্ষ্মী, ঢাকেশ্বরী প্রভৃতি মিলের হিসাব সেই সাক্ষ্য দিতেছে। বঙ্গলক্ষ্মী কতবড় সংকট হইতে রক্ষা পাইয়া আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই ইতিহাস বাঙ্গালীর বুকের পাজরে গাঁথা। এত দেখিয়া, এত বুঝিয়াও কি বাঙ্গালী মূলধনীরা বলিতে পারেন বাংলা দেশে কাপড়ের কল করিয়া লাভ নাই ?

যে শিল্প ব্যবসায়ে মাল উৎপাদন খরচা কম এবং বাজারে মালের কাটতির ভাবনাও নাই, তাহাতেই মূলধনীরা টাকা খাটাইয়া থাকেন। এই উভয় সুবিধা যে এখন বস্ত্র শিল্পে রহিয়াছে, তাহা আমরা বিশেষরূপে বুঝাইয়াছি। সুতরাং স্বদেশ প্রীতি বা জাতীয়তার ভাব ছাড়িয়া দিয়াও যদি কেবল মাত্র ব্যবসায় বুদ্ধির দিক দিয়া বিচার করা যায়, তবুও বলিতে হয় বাংলার মূলধনীদের টাকা প্রধানতঃ কটন মিলের শেয়ারেই খাটান উচিত। আমরা জানি অনেকে তাহা করিয়াছেন,—আনন্দের সহিত তাঁহাদের নামও করিতে পারি। মিত্র গোষ্ঠীর টাকা বাসন্তী কটন মিলে, চক্রবর্ত্তীদের টাকা মোহিনী মিলে, মৌড়ীগ্রামের রায় বাবুদের টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলে, লাহাদের টাকা বঙ্গেশ্বরীতে, কাগজ ব্যবসায়ী বিখ্যাত ভোলানাথ দত্ত ও প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী নানেদের টাকা শ্রীদুর্গা কটন্ মিলে, বসাকদের টাকা ঢাকেশ্বরীতে খাটিতেছে। কিন্তু ইহাই প্রচুর নহে। অনেক ধনী ব্যক্তি এখনও অগ্রসর হন নাই। তাহাদের মধ্যে এমন লোকও অনেক আছেন যাঁহারা নিজেরাই একটা মিল স্থাপন করিতে পারেন। কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক চিত্তরঞ্জন কটন মিলকে এবং কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপে মূলধনী, ব্যাঙ্ক, ও জনসাধারণ সকলের মধ্যে কটন মিলের শেয়ার ক্রয় বিষয়ে সহযোগিতা থাকা আবশ্যক।

শ্রীদুর্গা কটন মিল প্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে এত কথা বলিবার আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, বাংলাদেশের যে সকল ধনী লোক শিল্প ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে অগ্রসর হন না, তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গুক। এতকাল তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মোহে জমি জমাতেই টাকা খাটাইতেন, —জমিদারীকেই পরম পুরুষার্থ মনে করিতেন। কিন্তু আজকাল সে মোহ কাটিয়া যাইতেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখনও রহিয়াছে বটে, কিন্তু জমিদারীর সে গৌরব আর নাই। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—লোকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেমন প্রবল ভাবে সোস্যালিজম্ এর স্রোত সমাজের

স্তরে স্তরে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আর সাধ্য নাই যে জমিদারদিগকে রক্ষা করিতে পারে।

তারপর কোম্পানীর কাগজের সুদ শতকরা পৌনে তিন টাকায় নামিয়া যাওয়াতে কোম্পানীর কাগজে টাকা লগ্নী করিয়া যে লাভ পাইবার আশা নাই। এই সুদের হার যে শীঘ্র বাড়িবে, তাহার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। বিশেষতঃ ঐ সামান্য সুদের মায়ায় লক্ষ লক্ষ টাকা এমন যায়গায় আটকা পড়িয়া থাকে যে স্থান হইতে দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ের জন্য পাই পয়সাটিও বাহির হয় না। সুতরাং

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের সভাপতিত্বে শ্রীদুর্গা কটন মিলের দ্বারোদ্ঘাটন

সেখানে টাকা রাখিলে কোন লাভ নাই,—"জাতও যায় অথচ পেটও ভরে না।" আমাদের দেশের ধনীলোকেরা এখন ক্রমশঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় শিল্প ব্যবসায়ে টাকা লগ্নী করাই লাভজনক। তাহাতে একদিকে যেমন দেশের শিল্পোন্নতির সহায়তা এবং আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি হয়, তেমনি যাহারা টাকা লগ্নী করেন, সেই সকল ধনী লোকদেরও লাভ হয়। শিল্প ব্যবসায়ের মধ্যে কাপড়ের কলে টাকা খাটান যে লাভ জনক তাহা ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপে দেখানো হইয়াছে।

সেই জন্য আমরা আশা করি শ্রীদুর্গা কটন মিলের শেয়ার কিনিতে বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ হইবে না। কোন নূতন শিল্পে টাকা খাটাইতে অনেকের মনে সন্দেহ ও ভয় জন্মে,—কারণ তাহাতে লাভ হইবে কি লোকসান হইবে,

তাহা জানা নাই। কিন্তু কটন মিল সম্বন্ধে সে কথা উঠিতে পারে না। ইহাতে যে নিশ্চিত লাভ, বাংলাদেশে আজ ৩০ বৎসরের অধিককাল তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এই প্রবন্ধেও আমরা নানা প্রকারে দেখাইয়াছি। বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী, ঢাকেশ্বরী, বঙ্গেশ্বরী প্রভৃতি কটন মিলকে যে বাঙ্গালী সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই বাঙ্গালীই,—জমিদার, কৃষক, ধনী, দরিদ্র, সকলে মিলিয়া শ্রীদুর্গা কটন মিলকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করুক।

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র বস্ত্র বয়ন দেখিতেছেন

শ্রীদুর্গা কটন্ মিলের হেড্ অফিস ১৬৭নং পুরাতন চিনাবাজার কলিকাতা।

ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে কাপড়ের কলের তালিকা

১৯৩৬ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত

৪৭টী কল রেজেষ্টারী হইয়াছে, কিন্তু এখনও যাহারা বস্ত্র উৎপাদন করে নাই তাঁহাদের সংখ্যা এই তালিকায় ধরা হয় নাই:—

যে দেশে অবস্থিত তাহার নাম	কলের সংখ্যা	টাকুর সংখ্যা	তাঁতের সংখ্যা	মজুরের সংখ্যা	যে পরিমাণ তুলা লাগে হন্দর	৩৯২ হন্দরী গাঁইট্
বোম্বাই প্রদেশ	২২৩	৬২৬৭৪৮৫	১৪৫৪৩২	২৪৮৩৯৯	৫৯৯৪৪০৮	১৭১২৬৮৮
রাজপুতানা	৫	৮১০৬৪	১৯১৪	৪১৬৯	১৩৩১৫৪	৫৮০৪৪
বেরার	৪	৬৬৯০৪	১৩৮৯	৪২৬৪	১১৬২০৭	৩৩২০২
মধ্যপ্রদেশ	৮	৩১০৯৩৬	৫৭০৭	১৭৭৬৯	৪০৫৮৮৮	১১৫৯৬৮
হায়দরাবাদ নিজাম রাজ্য	৬	১২৪৭১৬	২১৩৪	৫৭৬৬	১৮৪৯০৫	৫২৮৩০
মধ্য ভারত	১৫	৩৬৭৮৮৪	৯৭১৫	২১৯৫৪	৭৩৮১০৮	২১০৮৮৮
বঙ্গদেশ	২৭	৩৩৩৭০৮	৭৭৯৯	১৮২৭১	৪৪০১৬৭	১২৫৭৬২
পাঞ্জাব	৬	৮৮৭৪২	১৪১৭	২০৯৩	৭৯৫৮৩	২২৭৩৮
দিল্লী প্রদেশ	৭	১২৩৮৫৬	৩৫৫৯	৭৫৩৫	২৫৬৫২৯	৭৩২৯৪
যুক্তপ্রদেশ	২৫	৭৩৪৬০৭	১০৭৮৪	৩০১১৩	১১১৯০৫১	৩১৯৭৪৬
মাদ্রাজ প্রদেশ (কোচীন সহ)	৭৫	১০৯০৯৬৬	৬০৭০	৪৫৩৬৫	১০৮৯৯২৮	৩১১৪০৮
ত্রিবাঙ্কুর	১	১২৩৪৬	৩০০	৪৩০	১১৭৮১	৩৩৬৬
মহীশূর	৬	১৪৬৮০৭	২১০০	৭৮১১	২০০৮০৯	৫৭৩৭৪
পন্দিচেরী	৩	৮৪৫০০	১৭৬২	২৭৫০	৮১৭৭৬	২৩৩১৬
ব্রহ্মদেশ	১	১২০০০	...	১১১৪	৩১৩৬০	৮৯৬০
মোট	৩৭৯	৯৮৫৬৬৫৮	২০০০৬২	৪১৭৮০৩	১০৮৮৩৬৬৩	৩১০৯৬১৮

বীজাণু-নাশক ও পচন নিবারক বিবিধ মশলা প্রস্তুত করণ প্রণালী

১। জৈবিক পদার্থ রক্ষা করিবার উপায়ঃ—

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে, বিশেষতঃ উদ্ভিদ্ বিদ্যা ও প্রাণি বিদ্যা বিষয়ক নানাবিধ পরীক্ষায় জৈবিক পদার্থ সমূহকে,—(যেমন ফুল, পাতা, ত্বক, মুকুল, কাণ্ড প্রভৃতি বৃক্ষের অংশ সমূহ অথবা মাংস, পেশী, শিরা, নাড়ী, অন্ত্র, পাকস্থলী প্রভৃতি প্রাণি দেহের অংশ সমূহ) অটুট অবস্থায় রাখা দরকার, যেন পচিয়া নষ্ট না হয়। ইহার জন্য নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় একটী পেইষ্ট্ অর্থাৎ লেইয়ের মত মশলা তৈয়ারী করা যায়,—

(ক) গমের ময়দা ১৬ আউন্স্
ঠাণ্ডা জল—তরল মাপের ১৬ ,,

গমের ময়দাকে ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়া ভালরূপে ফেটাইয়া, উহার সহিত ৩২ আউন্স (তরল মাপের) ফুটন্ত গরম জল মিশ্রিত করুন। এই গরম ময়দার জলকে একটী পাত্রে রাখিয়া দিন।

(খ) আরবী গঁদ চূর্ণ ২ আউন্স্
ইহাকে ৪ আউন্স্ (তরল মাপের) ফুটন্ত গরম জলে গলাইয়া একটী পৃথক পাত্রে রাখুন।

(গ) আর একটি পাত্রে ২ আউন্স্ ফট্‌কিরি চূর্ণ ৪ আউন্স্ (তরল মাপের) ফুটন্ত গরম জলে গলাইয়া রাখুন।

(ঘ) ২ আউন্স্ লেড্ য্যাসিটেট্ (Lead Acetate) ঐরূপ ৪ আউন্স্ ফুটন্ত গরম জলে গলাইয়া লউন।

(ঙ) কারোসিভ্ সাব্লিমেট্ (Corrosive Sublimate) ১০ গ্রেণ প্রথমতঃ (ক) ও (গ) নামীয় দ্রব্য দুইটিকে গরম অবস্থায় মিশ্রিত করুন এবং অল্প উত্তাপে একটু জ্বাল দিন। এই অবস্থায় নাড়িতে নাড়িতে (গ) নামীয় দ্রব্যটী উহাতে ঢালিয়া দিন এবং খুব নাড়িয়া চাড়িয়া মিশান। তারপর উহার সহিত (ঘ) নামীয় মশলা মিশাইয়া লউন। শেষে (ঙ) নামীয় দ্রব্যটী (করোসিভ্ সাব্লিমেট্ শুষ্ক অবস্থায় উহার সহিত মিশাইয়া লেইয়ের মত করুন। ইহা অতি বিষাক্ত মশলা। সুতরাং ইহাকে সাবধানে রাখিবেন। এবং সাবধানে ব্যবহার করিবেন। ইহাতে সাধারণ লোকের কোন প্রয়োজন নাই। লেবরেটরীতে বৈজ্ঞানিক

শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই ইহা কাজে লাগে। তাঁহারা যে সাবধানে মশলাটি তৈয়ারী ও ব্যবহার করিবেন, তাহা আশা করা যায়।

২। মুখের ভিতরের বীজানু নাশক কুলকুচির মশলাঃ—

নিম্নে দুইটী মশলা তৈয়ারী করিবার প্রণালী লিখিত হইল। এই মশলা দ্বারা কুলকুচি করিয়া মুখ ধুইলে মুখের ভিতরের নানাবিধ পচনকারক বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়।

(ক) থাইমিক য়্যাসিড্ (Thymic acid) ৩১/৪ গ্রেণ
বেনজয়িক য়্যাসিড্ (Benzoic acid) ৪৫ ,,
পিপারমেণ্ট এসেন্স (Essence of peperment) ১০ ফোঁটা
টিংচার ইউক্যালিপটাস্ (Tinc Eucalyptus) ৪১/২ ড্রাম
য়্যালকহল (Alcohol) ৩ আউন্স্

এই সকল জিনিষ একটা গ্লাসে লইয়া তাহাতে এই পরিমাণ জল মিশাইবেন যাহাতে মশলাটী দুধের রং এর মত ঘোলাটে হইয়া উঠে। অথবা উপরোক্ত জিনিসগুলি প্রয়োজন মত অনুপাতে লইয়া মিশাইয়া একটী বড় শিশিতে পুরিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিবেন। প্রতিদিন সকালে বিকালে মুখ ধুইবার সময় একগ্লাস জলে ঐ শিশির মশলাটি এই পরিমাণ মিশাইবেন যাহাতে জলটী ঘোলা হইয়া উঠে। সেই জলে কুলকুচি করিবেন।

(খ) ট্যানিন্ (Tanin) ৩ ড্রাম
মেন্থল (Menthol) ২ "
থাইমল (Thymol) ১৫ গ্রেণ
টিংচার বেনজয়িন (Tinc Benzoin) ৯০ ফোঁটা
য়্যালকহল ৩ আউন্স

এই জিনিসগুলি মিশাইয়া একটা বোতলে পুরিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিবেন। সকালে বিকালে মুখ ধুইবার সময় আধগ্লাস ঈষদুষ্ণ জলে উহার ১০ ফোঁটা মিশাইয়া তাহার দ্বারা কুলকুচি করিবেন।

৩। য়্যাণ্টিসেপ্টিক্ পেইষ্ট্ (Antisceptic Paste)

শরীরের যে সকল স্থান সর্ব্বদা ভিজা-ভিজা থাকে, সেইখানে য়্যাণ্টি-সেপ্টিক্ ড্রেসিং Antiseptic dressing) লাগাইতে অনেক সময় অত্যন্ত অসুবিধা হয়। যেমন, ওষ্ঠের উপরে কোন অস্ত্রোপচার হইলে ঐরূপ ড্রেসিং করা যায় না। সেস্থলে নিম্নলিখিত প্রকারে পেইষ্ট্ বা মলমের মত একটা মশলা তৈয়ারী করিয়া লাগান যায়।

জিঙ্ক্ অক্সাইড্ (Zinc oxide) ৫০ ভাগ
জিঙ্ক্ ক্লোরাইড (Zinc Chloride) ৫ ,,
পরিস্রুত জল (Distilled water) ৫০ ,,

এই জিনিসগুলি মিশাইয়া লেইয়ের মত করিবেন। ক্ষত স্থানকে শুষ্ক করিয়া এই লেইয়ের মত মশলাটী বুরুশ অথবা স্প্যাচুলা (Spatula) দিয়া লাগাইবেন। উহা শুকাইয়া আটকাইয়া থাকিবে। ৫।৬ দিন পরে তুলিয়া ফেলিয়া আবার নূতন মশলা লাগাইবেন। এই মশলাকে উহার আবিষ্কারক নাম সচীন (Socin) পেইষ্ট্ বলে।

৪। য়্যাণ্টি-সেপ্টিক্ ব্রোমিন সলিউসান্ (Antiscepite Bromine Solution) :—

টিংচার আইয়োডিন্ যেমন বীজাণু-নাশক, ব্রোমিন্ সলিউশানও তেমনি য়্যান্টি-সেপ্টিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। উহা নিম্নলিখিত রূপে তৈয়ারী হয়,—

ব্রোমিন (Bromnie)	১ আউন্স্
সোডিয়াম ক্লোরাইড (Sodium Chloride)	৮ ,,
জল	৮ পাইন্ট্

প্রথমে সোডিয়াম ক্লোরাইড্ জলে গলাইয়া লউন। তারপর উহার সহিত ব্রোমিন মিশান। এই মশলা তৈয়ারী করিয়া বোতলে পুরিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিবেন। ব্যবহার করিবার সময় ১৫ ভাগ জলে ১ ভাগ মশলা মিশাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবেন।

৫। ডাক্তারদের রাবারের দস্তানার পরিবর্ত্তে হাতে মাখাইবার মশলা ;—

অস্ত্রোপচারকালে অথবা অন্য প্রকারে কোন বিশেষ বিশেষ রোগী পরীক্ষা করিবার সময় ডাক্তারগণকে হাতে রাবারের দস্তানা পরিতে হয়। রোগীর দেহ হইতে বিষাক্ত কিছু অথবা কোন রোগবীজাণু যাহাতে সংক্রমিত না হয়, সেই জন্যই এই প্রকার সাবধাণতা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। কিন্তু রাবারের দস্তানা হাতে পরিলে, অঙ্গুলী দ্বারা কোন কার্য্য করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ উপরে আবরণ থাকার দরুণ অঙ্গুলী সমূহের স্পর্শশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে রাবারের দস্তানাকে খুব পাতলা করা হয়। তথাপি অঙ্গুলীর স্পর্শশক্তির স্বাভাবিক অবস্থা থাকে না। সেইজন্য নিম্ন লিখিত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত গাটাপার্চ্চা সলিউশান ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজন মত বিভিন্ন প্রকারের কাদো ১০০ ভাগ বেন্জিনের (Benzine) সহিত ৪, ৬ অথবা ৮ ভাগ গাটাপার্চ্চা (Gutta Percha) সলিউশান করিয়া লইতে হয়। বেন্জিনের পরিবর্ত্তে য়্যাসিটোন ও (Acetone) ব্যবহার করা যায়।

প্রথমতঃ সাবান (Spirits of Green Soap) ও গরম জলের দ্বারায় হাত বেশ করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ য়্যালকহলের দ্বারা ৩ মিনিট হাত ধুইতে হয়। তারপর যখন হাত একেবারে ভালরূপে শুষ্ক হইবে, তখন ঐ গাটাপার্চ্চা সলিউশান হাতের উপর ঢালিয়া দিবেন,—বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন যেন নখের কোণে ফাকগুলো ভালরূপে বুজিয়া যায়। আঙ্গুলগুলিকে ছড়াইয়া ফাক ফাক করিয়া হাতখানি হাওয়াতে মেলিয়া রাখুন। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাতের উপরে মাখান মশলাটী শুকাইয়া একটা স্বচ্ছ পাতলা আবরণের মত হইয়া উঠিবে। ইহাই এন্টিসেপ্টিক দস্তানার কাজ করে। ইহা সাবানজলে নষ্ট হয়না এবং এত পাতলা যে, হাতে কিছু লাগান আছে বলিয়াই মনে হয়না। বেনজিনে হাত ধুইলেই ইহা উঠিয়া যায়। অন্য কোন য়্যান্টিসেপ্টিক সলিউশানে এই আবরণ নষ্ট হয় না।

৬। হাঁপানী রোগীর সিগারেট ;—

তামাক-পাতা হইতে প্রস্তুত সিগারেট ধুম পান বাস্তবিক একটী খারাপ নেশা। বিশেষতঃ হাঁপানী ও কাশ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে

ইহা অতিশয় অনিষ্টকারী। তথাপি সঙ্গদোষে যৌবনের কদভ্যাসের ফলে অনেকে কিছুতেই এই নেশাটী ছাড়িতে পারেন না। কাহারও কাহারও এমন অভ্যাস হয় যে একটা কিছুর ধোঁয়া না টানিলে তাহারা আরাম পান না। এই ধোঁয়া টানিবার জিনিসটী যদি ঔষধের মত কাজ করে তবে এক সঙ্গে নেশার আরাম ও ব্যাধির প্রতিকার দুই ই হয়। হাপানী রোগীর জন্য এইরূপ সিগারেট (তামাক পাতার নহে) আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিম্নে তাহা তৈয়ারী করিবার দুইটী ফরমুলা ব্যাখ্যা করা হইল,—

(ক) বেলেডোনা পাতা

(Belladonna leaves)	৫ ভাগ
ষ্ট্র্যামোনিয়াম পাতা (Stramonium leaves)	৫ ,,
ডিজিটেলিস্ পাতা (Digitalis leaves)	৫ ,,
সেইজ্ পাতা (Sage leaves)	৫ ,,
সোরা (Potassium Nitrate)	৭৫ ,,
টিংচার বেন্জইন (Tinc Benzoin	৪০ ,,
ফুটন্ত গরম জল	১০০০ ,,

প্রথমতঃ সমস্ত ৫ কার পাতাগুলিকে জলে ফুটাইয়া তাহার সারাংশ (Entract) বাহির করিয়া ছাঁকিয়া লউন। এই তরল সারাংশে সোরা ও টিংচার বেন্জইন দ্রব্য করুন। তৎপর সুইডিস্ ফিল্টার কাগজ উহাতে ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখুন। ঐ সময় আস্ত কাগজগুলি তুলিয়া শুকাইয়া লউন। তারপর ২১/২×৪ ইঞ্চি সাইজে কাটিয়া সিগারেটের আকারে গোল পাকাইয়া লইলেই হইল। ইহার ধুম পান করিলে হাপানী রোগের উপশম হয়।

(খ) সোডিয়াম্ আর্সেনেট

(Sodium Arseniate)	৩ গ্রেণ
বেলেডোনা এক্সট্র্যাক্ট্ (Extract of Belladonna	৮ গ্রেণ
ষ্ট্র্যামোনিয়াম এক্সট্র্যাক্ট্ (Extract of Stramonium	৮ গ্রেণ

প্রথমতঃ সোডিয়াম্ আর্সেনেট্ একটু জলে গলাইয়া লউন। তারপর ইহার সহিত এক্সট্র্যাক্ট্ দুইটী মিশ্রিত করুন। এই মিশ্রিত মশলায় খুব মিহি ব্লটিং কাগজ ভিজাইয়া উহাকে শুকাইয়া লউন। তারপর সাইজ মত কাটিয়া গোল পাকাইয়া লইলেই সিগারেট তৈয়ারী হইল। ইহার ধুম পানের দ্বারাও হাপানীর উপশম হয়।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক অথবা পাঠকদিগের মধ্যে যদি কাহারও কোনও জিনিষ বেচিবার বা কিনিবার দরকার থাকে, তবে তাহা আমাদিগকে জানাইলে আমরা বিনামুল্যে আমাদের "ব্যবসায়ের সন্ধান" নামক অধ্যায়ে তাহা আমুল প্রকাশ করিব। এজন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোনও চার্জ্জ লইব না। নাম, ধাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং চিঠি পত্রাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন।

সম্পাদক

বন্দীদের মুক্তি ও বেকার সমস্যা

বাংলার ১১০০ রাজবন্দী মুক্তিলাভ করিতেছে ইহা অতি আনন্দের বিষয়, কিন্তু আর একদিকে ইহাতে চিন্তা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ১১০০ যুবক জেলের বাহিরে আসিয়া অথবা অন্তরীন হইতে মুক্তি পাইয়া কি কাজ করিবে,—কিরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিবে,—কিরূপেই বা পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিবে, ইহাই চিন্তার বিষয়। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলাদেশে বেকারসমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কোন সমাধান হয় নাই। তদুপরি আরও ১১০০ যুবক আসিয়া বেকারের দলভুক্ত হইবে, এই আশঙ্কা কেহ কেহ করিতেছেন।

কিন্তু আমরা প্রথমেই বলিয়া রাখি, বন্দীরা মুক্তিলাভ করিয়া বেকার থাকিবে কি উপার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া বাহির করিবে এই আশঙ্কায় তাহাদের মুক্তি কখনই অবাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। তাহারা বেকার থাকুক, কিম্বা না থাকুক,—তাহাদের মুক্তি চাই-ই। বিপদে আপদে তাহাদের চরিত্রের দৃঢ়তা পরীক্ষিত হইয়াছে; দুঃখকষ্টের আঘাতে তাহাদের জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে,—দীর্ঘকাল কারাবাসে তাহাদের স্বার্থত্যাগ, সহিষ্ণুতা, চিত্তের স্থৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিকশিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এরূপ যুবকদিগকে বৎসরের পর বৎসর বন্দী করিয়া রাখা দেশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে।

দেশের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কার্য্যের প্রয়োজন;—বাংলাদেশে সেই কার্য্য করিবার লোকের অভাব। কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। দেশে তুলার চাষ নাই,—কাপড়ের কল অল্প কয়েকটী মাত্র,—পাটের ব্যবসায়েও পাটকলের মালিক বাঙ্গালী নহে,—নারিকেল চাস ও নারিকেল জাত নানারূপ শিল্পের একান্ত অভাব;—লৌহজাত দ্রব্য ও চিনি, উৎপাদনে বাংলাদেশ পশ্চাৎপদ;—কাগজের কল, সিমেণ্টের কারখানা রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা,—এসব বাংলাদেশে বাঙ্গালীর নিজস্ব অতি অল্পই আছে। সাবান, দিয়াশলাই, রবার, বোতাম, পেন্সিল প্রভৃতি শিল্পের অধিকতর প্রসার হওয়া আবশ্যক। মৎস্য, ফল, দুগ্ধজাত দ্রব্য, এইসব ব্যবসায়ের কিছুমাত্র উন্নতি বাংলাদেশে হয় নাই। সুতরাং বাংলার যুবকদের কর্ম্মশক্তিকে এখন অবরুদ্ধ করিয়া রাখা নির্বুদ্ধিতার কার্য্য। বন্দী করিয়া রাখিলে যুবকদের কর্ম্মশক্তি যে শুধু সাময়িক

ভাবে স্থগিত থাকে তাহা নহে,—অনেকস্থলে চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া আমরা বলি, বন্দী যুবকদেরে মুক্তি দিতেই হইবে;—পারিবারিক অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির দিক দিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে মুক্তির জন্য প্রাণান্তকারী অনশন ব্রত অবলম্বিত হইয়াছিল,—যাহার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন,—কাউন্সিলে আলোচনা ও তীব্র বাদানুবাদ,—যাহাতে মন্ত্রিসংসদের আসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে,—সেই একান্ত প্রত্যাশিত মুক্তি যখন সত্যই আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আবার এই নূতন রকমের আশঙ্কা, নূতন রকমের দুর্ভাবনা, একটা অভিনব দুরূহ সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে কেন? তর্কের বিষয় এই যতদিন এই যুবকেরা কারাগারের বাহিরে ছিল, ততদিন কি তাহারা বেকার ছিল না? সুতরাং মুক্ত বন্দীরাই বাংলাদেশের বেকার সমস্যাকে অধিকতর জটিল করিবে এরূপ আশঙ্কা কি যুক্তি সঙ্গত?

এই সকল প্রশ্নের আলোচনায় আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে হয়। প্রথমতঃ আমরা জানি এই সকল বন্দী যুবকদের মধ্যে অনেকে উপার্জ্জনশীল ছিলেন;—তাঁহারা কেহ চাকুরী বা ব্যবসা করিয়া পরিবার বর্গের ভরণপোষণ করিতেন। বন্দী অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে একটা মাসোহারা দিয়াছিলেন। তাহাতে তখন পরিবারবর্গের ভরণপোষণ চলিয়াছে। কিন্তু এখন মুক্ত হইয়া তাঁহারা আর পূর্ব্বের চাকুরী পাইবেন না;—তাঁহাদের পূর্ব্বের ব্যবসায়ও নষ্ট হইয়াছে। এই খানেই সমস্যা গুরুতর। আবার এমন অনেক যুবক আছেন, যাঁহারা বন্দী হইবার পূর্ব্বে স্কুল কলেজের ছাত্র অথবা বেকার ছিলেন। তাঁহাদের মুক্তিতে বেকার সমস্যার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়না। আমরা জানি এই সকল যুবকেরা বন্দী অবস্থায় রীতিমত লেখাপড়া শিখিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ গ্র্যাজুয়েট পর্য্যন্ত হইয়াছেন।

আর এক সমস্যা এই যে, এই সব যুবকদিগকে গবর্নমেণ্ট বিপজ্জনক মনে করেন,—এমন কি মুক্তি দিয়াও তাঁহাদিগকে সতর্ক দৃষ্টিতে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এমন অবস্থায় বন্দীদের পক্ষে নূতন কাজ কর্ম্ম সংগ্রহ করাও কঠিন। কারণ কর্ম্মস্থলে পুলিশের লোক যাইয়া খোঁজ খবর নিলেই মনিব সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং চাকুরী অথবা কাজ কর্ম্ম জোগাড় করিতে সাধারণ বেকার যুবকদিগকে যেরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হয়, বন্দিত্ব হইতে মুক্ত বেকার যুবকদিগকে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং সেই চাকুরী বজায় রাখিতেও তাঁহাদের অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়। অবশ্য কালক্রমে এই বাধা কমিয়া আসিবে। তাঁহারা যখন নিজেদের কর্ম্মদক্ষতা, শ্রমশীলতা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখাইয়া মনিবের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবেন তখন আর এই সকল অসুবিধা থাকিবে না। বন্দীদের স্বার্থত্যাগ, দেশভক্তি, কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং একাগ্রতা সম্বন্ধে অনুপ্রেরণা দেশবাসীর আস্থা

থাকিলে বন্দীদের উপর গবর্ণমেন্টের সন্দেহজনক দৃষ্টি থাকার জন্য তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে সাধারণতঃ সকলের মনেই একটু দ্বিধা জন্মে। ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

অতএব আমরা প্রথমে বেকার সমস্যার কথা না ভাবিয়া মুক্ত রাজবন্দিগণকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছি। তাঁহারা দীর্ঘকাল যে দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছেন,—আজ দেশবাসীর অভিনন্দনে সে সকল দূরীভূত হউক,—তাঁহাদের বিষাদ মলিন আবাস আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠুক। তারপর তাঁহাদের জীবিকা অর্জ্জনের কথা সমগ্র বাংলাদেশের একটা জাতীয় সমস্যা হইবে;—তাঁহাদিগকে চাকুরী দেওয়া অথবা উপযুক্ত কাজ কর্ম্মে নিযুক্ত করা,—বাঙ্গালীর একটা প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। যাঁহারা এতকাল যাবৎ নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিলেন,—যাঁহারা চরিত্রের দৃঢ়তায়, কর্ত্তব্য পালনের সংকল্পে,—এবং স্বার্থত্যাগের গৌরবে বাংলার সুসন্তান বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন,—তাঁহারা বিনা কাজে থাকিয়া সপরিবারে উপবাসে দিন কাটাইবে,—ইহা কখনই হইতে পারে না। স্বদেশবাসিগণকে তাঁহাদের কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

গভর্ণমেণ্ট, বড় বড় ব্যবসায়ী, কলিকাতা কর্পোরেশন, ট্রাম, টেলিফোন, ইলেকট্রিক, গ্যাস ও রেল কোম্পানী সমূহ,—কলকারখানার মালিকগণ,—ইহারাই চাকুরী দিবার কর্ত্তা,—ইহাদের হাতেই জীবিকা অর্জ্জনের উপায় রহিয়াছে। ইহারা যদি সকলেই কেবল ব্যয় সঙ্কোচের দিকেই দৃষ্টি রাখেন,—সকলেই যদি কেবল খরচ কমাইয়া আয় বাড়াইতে চান, তবে শুধু এই রাজবন্দীদের বেকার সমস্যা নহে,—কোন প্রকার বেকার সমস্যারই সমাধান হয় না। ব্যয় সঙ্কোচের একটা সীমা থাকা উচিত। অবশ্য ছোট খাট ব্যবসায়ীদের স্থলে এই সীমা-রেখার বিস্তৃতি বেশী না হইতে পারে;—কিন্তু গভর্ণমেণ্ট, রেলকোম্পানী, মিউনিসিপ্যাল, কর্পোরেশন প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠান জাতীয়-তার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং সমগ্র দেশব্যাপক, তাহাদের স্থলে উক্ত ব্যয় সঙ্কোচের সীমা অধিকতর প্রসারিত থাকা আবশ্যক। এই সীমা নির্দ্ধারণ বেকার সমস্যা সমাধানের একটি প্রধান রহস্য। সেইজন্য বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টার সহিত সারপ্লাস্ বাজেট (Surplus Budget) অথবা রিট্রেঞ্চমেণ্ট্ কমিটি (Retrenchment Committee) দেখিলে আমরা উহাকে একটা গুরুতর অসামঞ্জস্য বলিয়া মনে করি।

বাংলা গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি নানাদিকে নূতন ভাবে কার্য্য বিস্তার করিয়াছেন। পল্লী সংস্কার বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন এবং তাহার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকাও পাওয়া যাইতেছে। কৃষকদের দুঃখ দূর করিবার জন্য ঋণ শালিসী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। আমরা জানি উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে উহাতে নানা প্রকার অন্যায় অবিচার অনুষ্ঠিত হইতেছে। শিক্ষা বিস্তারের জন্যও গভর্ণমেণ্টের শিক্ষক, পরিদর্শক প্রভৃতি কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। এই সকল কার্য্যে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদিগকে নিযুক্ত করিলে উভয় দিকেই মঙ্গল হইবে। আমরা ইহাও জানি

বন্দী অবস্থায় যাহাতে যুবকেরা শিক্ষালাভ করিতে পারে, গভর্ণমেণ্ট তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বন্দীরা অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়েব পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহিরে আসিযাছে। সুতরাং তাহাবা যে কার্য্যের অনুপযুক্ত তাহাও নহে। কোন কোন স্থলে গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে বন্দীদের জন্য কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বহু সংখ্যক যুবক নিযুক্ত হইতে পারে না। ঐরূপ আরও অনেক কারবার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক এবং সে সব যাহাতে স্থায়ী ও ক্রমোন্নতিশীল হয় সে বিষয়ে চেষ্টিত থাকা কর্ত্তব্য।

কেবল মাত্র গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। দেশের লোককেও এবিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। বাংলা দেশে ২৪টি নূতন কটন মিল তৈয়ারী হইতেছে। ইহাদের অনেকেই অর্থাভাবে বিপন্ন;—নির্ম্মাণ কার্য্য অগ্রসর বা সমাধা হইতে পারিতেছে না। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটি মিলও যদি পুরাপুরি গড়িয়া উঠে, তবে বহু সংখ্যক বন্দীর

জীবিকা সংস্থান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বেকার সমস্যাও অনেকটা মিটিয়া যায়। আমরা সেইজন্য দেশের ধনী ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা ঐ সকল কটন মিলের শেয়ার কিনিয়া এবং নানা প্রকারে অর্থ সাহায্য করিয়া উহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। তবেই এই সকল অন্তরীণ মুক্ত বন্দীদের একটা হিল্লে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ইনস্যুর্যান্স কোম্পানী সমূহের কথা মনে হয়। বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে বীমার কারবার দিন দিন অধিকতর প্রসারিত হইতেছে। এই উন্নতিকে স্থায়ী করিতে হইলে কার্য্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ও শক্তিমান কর্ম্মীর সংখ্যাবৃদ্ধি আবশ্যক। ভদ্র যুবকদের পক্ষেই বীমা সংক্রান্ত কার্য্য অধিকতর উপযুক্ত। সাধারণতঃ আফিসের কেরাণীগিরিতে কিংবা কলকারখানায় শ্রমিকের কার্য্যে লোক নিযুক্ত করিবার একটা সীমা থাকে,—যার বেশী লোক নিযুক্ত করা যায় না। কিন্তু বীমা সংগ্রহের এজেন্সী কার্য্যে সেরূপ কোন ধরা বাঁধা সীমা নাই। বাংলা দেশে অথবা সমগ্র ভারতে বীমার কার্য্য প্রসারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে বহু সংখ্যক এজেন্ট বীমা সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। ইহা চাকুরী বা গোলামী নহে,—স্বাধীন ব্যবসা। সুতরাং ইহাতে আত্ম-সম্মানের হানিজনক কিছুই নাই। যাঁহারা আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছিলেন, সেই বন্দীদের পক্ষে চাকুরী অপেক্ষা স্বাধীন ব্যবসাই অধিকতর উপযোগী। ব্যবসায়ে আর্থিক মূলধনের প্রয়োজন। তাহা অনেকে সংগ্রহ করিতে পারেন না বলিয়াই চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু বীমা কোম্পানীর এজেন্সী ব্যবসায়ে আর্থিক মূলধনের দরকার হয় না। কতগুলি বিশেষ গুণ থাকিলেই এই কার্য্য আরম্ভ করা যায় এবং কাজ করিতে করিতে উহাতে ক্রমশঃ শিক্ষালাভ হয়। এই সকল গুণের কথা আমরা আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে"র বীমা বার্ষিকীতে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছি। কিরূপে বীমার কাজ সংগ্রহ করিতে হয়,—কৌশল ও সরলতায় সামঞ্জস্য রাখিয়া, ব্যবসা বুদ্ধির সহিত সাধুতার মিশ্রণ করিয়া কিরূপে এজেন্টগণ বীমার প্রস্তাব সহজে আনিতে পারেন, তৎ-সম্বন্ধে বিশদ ভাবে সেই সকল প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে।

(১৩৪৩ সালের বীমা বার্ষিকী দ্রষ্টব্য)

চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরিয়া, নানা লোকের খোসামুদী করিয়া অনেকে হয়রাণ হইয়া পড়েন। গুণ এবং যোগ্যতা থাকিলেও অনেকের ভাগ্যে চাকুরী জুটেনা। কোন কোন চাকুরীর জন্য মোটা টাকা জামিন রাখিতে হয়। কিন্তু ইনস্যুর্যান্স কোম্পানীর এজেন্সী লইতে খোসামুদী, অনুগ্রহ ভিক্ষা, জামিন, এসব কোন ঝঞ্ঝাট নাই। সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী, দৃঢ় সংকল্প এবং স্থিরমতি ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলেই বীমা কোম্পানীর এজেন্সী কার্য্য লইতে পারেন। তাঁহাদের নিজ পরিশ্রমের উপর তাঁহাদের উপার্জ্জনের পরিমাণ নির্ভর করিবে এবং ভাল বীমার প্রস্তাব সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহার Renewal

কমিশন একটা স্থায়ী আয়-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। যিনি যত কাজ দেখাইতে পারেন, তাঁহার তত বেশী রোজগার হইবে। সুতরাং এস্থলে কাজের ফাঁকি নাই এবং একদিকে অনবরত চাপ ও অন্যদিকে বেতন বৃদ্ধির তাগাদা এই দুই কারণে মনিব চাকরে সাধারণতঃ যে অসদ্ভাব ও মনোমালিন্য ঘটে, ইন্সুর‍্যান্সের এজেন্সী কার্য্যে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। এইসব বিবেচনা করিয়া আমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদিগকে পরামর্শ দিতেছি, তাঁহারা যেন ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর এজেন্সী লওয়ার বিষয়ে ভাবিয়া দেখেন, যাঁহারা যোগ্য এবং প্রয়োজনীয় গুণ সম্পন্ন তাহারা এই কার্য্য গ্রহণ করিলে চাকুরী জীবী কেরাণী অপেক্ষা অধিকতর লাভবান হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশেষে আমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের উদ্দেশ্যে একটী নিবেদন জানাইতেছি। আমরা তাঁহাদিগকে বাংলার সুসন্তান বলিয়া জানি তাঁহাদের স্বার্থ বিসর্জ্জন, স্বদেশভক্তি, দৃঢ়-সঙ্কল্প, আত্ম-সম্মান বোধ, এই সকল সদ্‌গুণকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তাঁহারা তুষানলদহনের মত তিলে তিলে যে দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তাহার মাহাত্ম্য আমরা বুঝিতে পারি। আমাদের নিবেদন, চাকুরীতে অথবা ব্যবসায়ে যেখানেই নিযুক্ত হন,—তাঁহারা যেন আমাদের এই শ্রদ্ধা ও সম্মান ক্ষুন্ন হইবার কারণ না হন। আমাদের অতীতের দুঃখময় ও লজ্জাজনক অভিজ্ঞতা হইতে একথা বলিতেছি আমাদিগকে যেন বলিতে না হয়,—The Problem is not of unemployed but of unemployable youngmen,—কর্ম্মের অভাব নহে, কর্ম্মীর অভাবই প্রধান সমস্যা।

হাবড়া মিউনিসিপালিটী

নোটিশ

১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালের ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত কনট্রাক্ট, কার্য্যসম্পাদন এবং জিনিস সরবরাহের জন্য শীল মোহর যুক্ত, খামের উপরে Annual Store Tender, এই লেখা যুক্ত এবং "চেয়ারম্যান" এই শিরোনামে প্রেরিত টেণ্ডার সমূহ আহ্বান করা যাইতেছে। ১৯৩৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ বেলা ২টা পর্য্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারী এইসকল টেণ্ডার গ্রহণ করিবেন।

প্রত্যেক দফার পার্শ্বে ব্র্যাকেটের মধ্যে যে অঙ্ক লিখিত আছে, তাহা ঐ দফার টেণ্ডারের জন্য ১৯৩৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ বেলা ২টার সময় অথবা তৎপূর্ব্বে কেশিয়ারের নিকট অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

১।	ইয়ার্ডের (yard) প্রয়োজনীয় দ্রব্য	(১০০টাকা)
২।	বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টোর্স্	(১০০ ,,)
৩।	কাঠের তক্তা	(২৫ ,,)
৪।	লুব্রিক্যাণ্ট্ প্রভৃতি	(৫০ ,,)
৫।	পেইণ্ট্ ও ভার্নিস	(৫০ ,,)
৬।	গবাদি পশুর খাদ্য	(২০০ ,,)
৭।	গরু মহিষ ও ঘোড়ার পায়ে নাল বাধান	(৫০ ,,)
৮।	উর্দ্দী	(১০০ ,,)
৯।	বীজাণু নাশক মশলা (ডিস্‌ইন্‌ফেক্টাণ্ট)	(৫০ ,,)
১০।	হার্ডওয়ার	(৫০ ,,)

কন্‌ট্রাক্টের ফরমে লিখিত সর্ত্ত ও নির্দ্দেশ অনুসারে টেণ্ডার দিতে হইবে। ঐ ফরম ষ্টোর-কিপারের আফিসে প্রতিখণ্ড এক টাকা দামে পাওয়া যায়। গো-মহিষাদির পায়ে নাল বাঁধাইবার টেণ্ডার ফরমের মূল্য প্রতি কাপি এক আনা। মিউনিসিপালিটী হইতে ক্রীত ফরমে এবং সিডিউলে লিখিত টেণ্ডার দিতে হইবে। অন্যকোন ফরমে টেণ্ডার দিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ফরমে নির্দ্দিষ্ট মাপের হিসাবে টেণ্ডার না দিলে উহা বিবেচনা করা হইবে না। যে যে স্থলে নমুনা দিবার নির্দ্দেশ রহিয়াছে সেস্থলে টেণ্ডার দিবার শেষ দিনে বা তৎপূর্ব্বে যথারীতি শীলমোহর করিয়া উক্ত নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

যে সকল টেণ্ডারে বিস্তারিত বিবরণ অসম্পূর্ণ, যাহাতে পাকা সর্ত্তের অভাব, অথবা দরের পরিবর্ত্তন কিম্বা স্বাক্ষরের অভাব দেখা যায়, সেই সকল টেণ্ডার বিবেচনা নাও করা যাইতে পারে।

রবিবারে এবং ছুটির দিন ব্যতীত অপরাহ্ণ বেলা ১টা হইতে তিনটার মধ্যে মিউনিসিপলিটির আফিসের ষ্টোর-কিপারের নিকট দরখাস্ত করিলে জিনিস পত্রাদির সম্বন্ধে এবং কনট্রাক্টের সর্ত্তাদির বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে।

কোন টেণ্ডার সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে, অথবা নিম্নতম টেণ্ডার গ্রহণ করিতে কিম্বা কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার কারণ দেখাইতে কমিশনারগণ বাধ্য নহেন।

মিউনিসিপ্যাল আফিস
হাবড়া
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭

জে, সি, দাসগুপ্ত
সেক্রেটারী

বম্বে লাইফ য়্যাস্যুর্যান্স কোম্পানী লিমিটেড্

১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট

আমরা বম্বেলাইফের ১৯৩৬ সালের হিসাব ও রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইল। হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা-পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন বীমা

আলোচ্য বৎসরে মোট ১৬৮৮৮২৫০ টাকা মূল্যের ৮৮০৯টী নূতন বীমার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে এবং ১৩৬০০১৮০ টাকা মূল্যের ৭৫১০টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহাদের উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। এই সকল পলিসির দরুণ প্রিমিয়াম আয় ৭৩০৬৪৩ টাকা।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবতে আয় হইয়াছে মোট ২৬৭৬২৭৪ টাকা। তন্মধ্যে একটীমাত্র প্রিমিয়াম (Single premium) ২০৩৮ টাকা। প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম (পুনর্ব্বীমা বাদে) ৬৩৯২৭৭ টাকা; রিনিউয়্যাল প্রিমিয়াম (পুনর্ব্বীমা বাদে) ২০৩০২২০ টাকা দৈবদুর্ঘটনার প্রিমিয়াম (পুনর্ব্বীমা বাদে) ৪৭৩৬ টাকা। সুদ ও বাড়ী ভাড়া বাবতে (সিকিউরিটীর উপর ইন্‌কমট্যাক্স বাদে) ৩৩৪১৮২ টাকা আদায় হইয়াছে। ট্রান্স্‌ফার ও অন্যান্য ফিস্ হইতে আয় হইয়াছে ২০৫৮ টাকা। লগ্নী বিক্রয়ের দরুণ লাভ হইয়াছে ৭৮৮৪৪ টাকা।

ব্যয়ের তালিকা এই,—

ষোড়শ (১৯৩৫ সালের জন্য) ডিভিডেণ্ড্ বা লভ্যাংশ ১৯৩৬ সালের ২৬শে মে তারিখে দেওয়া হয় ১৬২১২ টাকা

পলিসির দাবী	৫৯২১৮৭ ,,
সারেণ্ডার ও নগদ বোনাস্	৪৪০৯৭ ,,
পরিচালনা খরচ	৯৮৫৪২৫ ,,

অন্যান্য

মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স,
বাড়ী মেরামত, লাভের উপরে
ইনকামট্যাক্স, প্রভিডেণ্ট্ ফাণ্ড,

বাড়ী সম্পত্তির মূল্যহ্রাস,
অনাদায় যোগ্য ও সন্দেহজনক ঋণ
ছাড় বাদ প্রভৃতি,—

মোট— ১৭২৪৫৮ ,,

জীবন বীমা তহবিল

বৎসরের আরম্ভে জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল (রিজার্ভ ফাণ্ড হইতে ১৮৭০৭০ টাকা লইয়া) ৬৯৮৮৫৭১ টাকা। বৎসরের শেষে উপরোক্ত খরচ বাদে জীবনবীমা তহবিলে ৮২৬৯৪৫০ টাকা জমিয়াছে।

মোট চল্‌তি পলিসি

আলোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট চল্‌তি পলিসির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৮২৮৯। ইহাদের মোট বীমার পরিমাণ ৫১৪৩৯১০১ টাকা এবং প্রিমিয়াম আয় ২৬৭১৫৩৬ টাকা।

সম্পত্তি ও দায়

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৯৩৯৭৮৩৫ টাকা। তন্মধ্যে লগ্নীতে ৬০৬৭২৬০ টাকা। প্রথম মর্টগেজ্ ভারতীয় সম্পত্তি ৫০৬১৬৬ টাকা। পলিসি বন্ধকীঋণ ৮২২৩৩৫ টাকা। ভারতীয় বাড়ী-সম্পত্তির মূল্য ৯৭৩৬৬৭ টাকা। বাকী প্রিমিয়াম ২২৩০২৬ টাকা। ব্যাঙ্কে ও নগদ ৫৩৭৪৩৩ টাকা, এই কয়েকটী বিষয় প্রধান। দায়ের ঘরে নিম্নলিখিত বিষয় দেখান হইয়াছে,—

জীবম বীমা ও তহবিল	৮২৬৯৪৫০ টাকা
অংশীদারদের মূলধন	১৩৫১০০ ,,
শেয়ার ইস্যুর উপরে প্রিমিয়াম	৯০৭৫০ ,,
সন্দেহজনক এবং অনাদায় যোগ্য ঋণের জন্য রিজার্ভ	১৫৩০৯ ,,
মূল্যহ্রাস মিটাইবার তহবিল	১৩১৩৩৬ ,,
প্রভিডেণ্ড্ ফাণ্ড্	১২৮৩৯১ ,,
যে সকল উত্থাপিত দাবী এখনও মিটাইবার বাকী	৩৯০৮১৭ ,,
প্রিমিয়াম বাবতে ডিপজিট্	৮০৪৮৯ ,,
দাবীশূন্য ডিভিডেণ্ড্	২৩৮৮ ,,
কমিশান, অডিটারের ফিস্ বিজ্ঞাপন খরচা, ডাক্তারের ফিস্ প্রভৃতি বিবিধ দেনা	১৫৩৮০১ ,,

ব্যালেন্স্ সিট্ প্রকাশিত হইবার পর পলিসির দাবী যাহা মিটাইবার বাকী ছিল, তাহার ১১৪৮১৮ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

চেয়ারম্যানের বক্তৃতার সারাংশ

কোম্পানীর ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ার-ম্যান মিঃ কে এম্ মুন্সী বি এ, এল্ এল্ বি উক্ত ব্যালেন্স সিট্ দাখিল করিবার সময়, অংশীদারগণের ২৯শ বার্ষিক সাধারণ সভায় যে বক্তৃতা করেন, নিম্নে তাহার সারাংশ লিখিত হইল।

কোম্পানীর হিসাব ও রিপোর্ট পাঠ করিলে নিশ্চিত ধারণা জন্মে যে কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ১৯৩৫ সালে কোম্পানীর নূতন বীমার পরিমাণ ছিল ১ কোটী ২৩লক্ষ টাকা, ১৯৩৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। গত ১০ বৎসর ধরিয়া কোম্পানী ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতেছে। আলোচ্য বৎসরে নূতন বীমার পরিমাণ ১৯৩১ সালের নূতন বীমার দ্বিগুণের অধিক এবং ১৯২৬ সালের নূতন বীমার চারিগুণের অধিক হইয়াছে। এই ক্রমোন্নতিকে স্থায়ী করিবার জন্য ডিরেক্টরগণ প্রস্তাব করিয়াছেন, যে সকল স্থানে এখনও বীমার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই, সেই সকল স্থানে কোম্পানীর ব্রাঞ্চ আফিস অথবা এজেন্সী খুলিয়া

অধিকতর দক্ষতার সহিত গঠন কার্য্য চালাইবেন।

প্রিমিয়াম আয় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা বাড়িয়াছে। লগ্নীর উপরে সুদও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪০ হাজার টাকা বেশী পাওয়া গিয়াছে। জীবন বীমা তহবিলের উপর নিট্ সুদ হইয়াছে শতকরা ৪·৫৭ টাকা হিসাবে, পূর্ব্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল শতকরা ৪·৭৮ টাকা। বর্ত্তমানে সাধারণতঃ সকল দিকেই সুদের হার কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং উপযুক্তরূপে তহবিল লগ্নী করা একটী প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া টাকা হইয়াছে খুব সস্তা;—অথচ কোম্পানীর তহবিল ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইহাকে এমন ভাবে খাটাইতে হইবে যেন, আরও বেশী হয় এবং টাকাও মারা যাইবার ভয় না থাকে।

১৯৩৫ সালে মৃত্যু-জনিত দাবীর পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা। আলোচ্য বর্ষে (১৯৩৬ সালে) উহা কমিয়া ৩ লক্ষ ৪৪ হাজারে নামিয়াছে। বীমার প্রস্তাব নির্ব্বাচনে ডিরেক্টর গণ যে বিশেষ বিবেচনা করিয়া থাকেন, ইহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের কোম্পানীর ভ্যালুয়েশনে যে মৃত্যুর হার ধরা হয়, ইহা তদনুরূপ সন্তোষজনকই হইয়াছে।

প্রিমিয়াম আয়ের সহিত পরিচালন খরচের অনুপাত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে শতকরা একটাকা কমিয়া গিয়াছে। এইরূপ অনুপাত নির্দ্ধারণের দ্বারা কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা ঠিক বিচার করা যায় না। কারণ উন্নতিশীল কোম্পানী সমূহের নূতন বীমা সংগ্রহ করিতেই বহুটাকা ব্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং যদি নূতন প্রিমিয়াম আয়ের সহিত মোট প্রিমিয়াম আয়ের অনুপাত ধরা না যায়, তবে হিসাব ঠিক হয় না। জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে।

ব্যালেন্স্-সিট্ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কোম্পানীর সিকিউরিটি-সমূহের যে মূল্য হিসাবে ধরা হইয়াছে, ১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের বাজার দর তদপেক্ষা ৪ লক্ষ এক হাজার টাকা বেশী। ঐ তারিখের পরে সিকিউরিটী-সমূহের মূল্য যাহা কিছু কমিয়া গিয়াছে, তাহা ধরিলেও মোটের উপর বাজার দর হিসাবে লিখিত মূল্য অপেক্ষা প্রায় একলক্ষ ৬২ হাজার টাকা বেশী দেখা যায়।

এখানে কোম্পানীর ত্রৈবার্ষিক অবধারিত ভ্যালুয়েশন (৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৬) কার্য্য চলিতেছে। উহাতে সমগ্র রিজার্ভ ফাণ্ডের ১৮৭০৭১ টাকা জীবনবীমা তহবিলের সঙ্গে যোগ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই টাকার কিছু মাত্র বোনাস অথবা ডিভিডেণ্ড্ দেওয়াতে ব্যয় করা হইবেনা। কোম্পানীর গত তিন বৎসরের লাভের টাকা হইতেই বোনাস্ দেওয়া হইবে।

আমাদের কোম্পানীর দক্ষিণ কানাডা প্রদেশস্থ হেড্ আফিস উদীপিতে এবং উত্তর ভারতে নয়াদিল্লীতে কোম্পানীর নিজস্ব গৃহ নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে। শীঘ্রই উহাতে কোম্পানীর কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হইবে।

অতঃপর চেয়ারম্যান বর্ত্তমান সংশোধিত বীমা আইনের সমালোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করেন।

ইউনিক য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

১৯৩৬ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট

আমরা ইউনিকের ১৯৩৬ সালের হিসাব ও রিপোর্ট পাইয়াছি। নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল;—হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন বীমাঃ—

আলোচ্য বৎসরে মোট ১১৯৫৩৭৫ টাকা মূল্যের ২০৪৬টী নূতন বীমার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে এবং ১৬৩৬৩৭৫ টাকা মূল্যের ১৬৯৪ টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহাদের উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে।

জীবন বীমা তহবিলঃ—

বৎসরের আরম্ভে জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৭৫৫৮৯৩ টাকা। বৎসরের শেষে উহা ৭৮০৭০৫ টাকায় উঠিয়াছে।

আয় ব্যয়ঃ—

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবতে আয় হইয়াছে ২৫৪৮৮৫ টাকা। সুদ এবং অন্যান্য বাবতে ৪১১৭৮ টাকা পাওয়া গিয়াছে। জমি এবং সিকিউরিটীর মূল্য বৃদ্ধির দরুণ আয় হইয়াছে ২০০৪৯২ টাকা।

ব্যয়ের দিকে দেখা যায় পলিসির দাবী বাবত (বোনাস সহ) ১৩১৯১৮ টাকা দেওয়া হইয়াছে। পরিচালনা খরচ হইয়াছে ১৪৭৬০৬ টাকা। আসবাব পত্রের মূল্য হ্রাস, ছাড় বাদ, বাকী প্রিমিয়াম আদায়ের খরচ, ইন্‌কামট্যাক্স, সারেণ্ডার ভ্যালু, প্রভৃতি বাবতে ১২৮৯১৮ টাকা খরচ হইয়াছে। এইসব খরচ বাদে রিজার্ভ ফাণ্ডে ৫৫৩০০ টাকা এবং জীবন বীমা তহবিলে ৭৮০৭০৫ টাকা রহিয়াছে।

সম্পত্তি ও লগ্নী

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১০৯৪০১১ টাকা। তন্মধ্যে ৮৬৫৯৪০ টাকা ঋণদান ও সিকিউরিটী লগ্নীতে খাটিতেছে। ডিপজিট, বাকী প্রিমিয়াম, অনাদায়ী সুদ, ইনভেষ্টমেণ্ট বণ্ড, অগ্রিম দাদন প্রভৃতিতে মিলাইয়া মোট ৩১৯৬৫ টাকা এবং নগদ ১৩৫৮৯ টাকা আছে।

ইনভেষ্টমেণ্ট বণ্ড বিভাগঃ—

এই বিভাগের হিসাবে দেখা যায় বৎসরের আরম্ভে বণ্ড তহবিলে ৩৬১০৫ টাকা ছিল। আলোচ্য বৎসরে রিনিউয়্যাল প্রিমিয়াম আদায় হয় ৩২২৩ টাকা, সুদ আদায় হয় ২০৭২ টাকা।

অন্যান্য আয় ৩৬ টাকা ধরিয়া মোট জমার ঘরে ৪১৪৩৬ টাকা উঠে। ব্যয় হইয়াছে মোট ২২৪৫২ টাকা। তন্মধ্যে দাবী দেওয়া হইয়াছে ১৮০৪৭ টাকা;—সারেণ্ডার ভ্যালু ১৮৮০ টাকা এবং পরিচালনা খরচ ১৭২০ টাকা। বৎসরের শেষে খরচ বাদে ১৮৯৮৪ টাকা জমিয়াছে।

খরচের অনুপাত ঃ—

কোম্পানীর পরিচালনা খরচ অনেক কমান হইয়াছে। প্রিমিয়াম আয়ের সহিত আলোচ্য বৎসরে খরচের অনুপাত তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১৭ টাকা কমিয়াছে। ডিরেক্টরগণ উহা আরও কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং এক্ষণে তাঁহারা রিনিউয়্যাল প্রিমিয়ামের সহিত খরচের অনুপাত শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে এবং প্রথম প্রিমিয়ামের সহিত উহার অনুপাত শতকরা ১০০ টাকা হিসাবে কমাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

জমি ও লগ্নীর বিবরণ ঃ—

কোম্পানী কলিকাতার সহরতলি বেহালাতে ৫০ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া তাহার উন্নতি সাধন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্ট এবং ২৪ পরগণার জেলাকোর্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত চারিজন অভিজ্ঞ মূল্য নিরূপক (ভ্যালুয়ার) উক্ত জমি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহাদের হিসাব মতে জমির যে মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা কোম্পানীর ব্যালেন্স সিটে আয়ের দিকে দেখান হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের শেষভাগে কোম্পানী উক্ত ৫০ বিঘার পাশে আরও ৩৭ বিঘা জমি কিনিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। এই ৮৭ বিঘা বিস্তীর্ণ জমির উন্নতি সাধন হইলে উহা কোম্পানীর পক্ষে প্রচুর লাভজনক হইবে, আশাকরা যায়।

কোম্পানীর তহবিলের অধিকাংশই লগ্নী করা আছে। ব্যক্তিগত জামিন লইয়া এবং সম্পত্তিবন্ধক রাখিয়া কতগুলি ঋণ ম্যানেজিং এজেণ্টগণ নিজেরাই দিয়াছেন। ডিরেক্টারগণ সুদ ও আসল সহ ঋণ আদায় করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে কোম্পানী মর্টগেজ ডিক্রী বাবতে লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। কোম্পানীর ইন্‌ভেষ্ট্‌মেণ্ট্‌ রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ বর্ত্তমানে ৮৯৮০০ টাকা। ডিরেক্টরগণ এই তহবিল আরও বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কোম্পানীর নিকট ম্যানেজিং এজেণ্টগণের যে দেনা আছে, তাহা পরিশোধের নিমিত্ত তাঁহারা প্রতিমাসে অন্যূন ৫০০ টাকা করিয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন।

নূতন শেয়ার ঃ—

কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা দৃঢ়তর করিবার জন্য ভারতীয় কোম্পানী সমূহের সংশোধিত আইনের ১০৫ বি ধারা অনুসারে ডিরেক্টরগণ ৫ লক্ষ টাকার নূতন প্রেফারেন্স শেয়ার (কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উদ্ধার যোগ্য) বিক্রয় করিবার আয়োজন করিতেছেন।

(২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭ সাল)

চেয়ার-ম্যান কুমার কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের অভিভাষণ

গত ২২শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের ত্রিংশৎ বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৩৭ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত সোসাইটীর এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট আলোচিত হয়। তাহার বিবরণ পৌষমাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে সোসাইটীর চেয়ারম্যান কুমার কার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিক মহাশয় যে, অভিভাষণ করেন, নিম্নে তাহার সার-মর্ম্ম প্রদত্ত হইল। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—

"আলোচ্য বৎসরে সোসাইটীর নূতন কারবারের পরিমাণ ২৮৩২ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। দেখা যায় পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা কারবার ৪৮২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং এই বাড়্তি যে সোসাইটীর ক্রমোন্নতির পরিচায়ক তাহা নিঃসন্দেহ।

প্রিমিয়াম বাবতে আয় হইয়াছে ৬২১২৬১৭ টাকা, (কম্বাইণ্ড্ পলিসির প্রিমিয়াম ব্যতীত)। পূর্ব্ব বৎসরে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ৫২৪১০০০ টাকা। সোসাইটী যে সকল নূতন বীমা সংগ্রহ করেন, তাহা যে উত্তম শ্রেণীর প্রস্তাব, তাহা এই দশলক্ষ টাকা প্রিমিয়াম বৃদ্ধিতে বুঝা যায়। লগ্নী টাকা হইতে আয় হইয়াছে ১২৪৩০১৪ টাকা। সুদের বাজার যেমন পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে এই আয়ের পরিমাণও পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা সন্তোষজনকই বলিতে হয়।

আলোচ্য বৎসরে মেয়াদ শেষ জনিত দাবীর পরিমাণ হইয়াছে ৫১২৫৭৭ টাকা এবং তৎসম্পর্কে ১৪৮২৫৩ টাকা বোনাস্ দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় পলিসি হোল্ডারগণ তাঁহাদের পলিসির মূল্যের উপর শতকরা প্রায় ৩০ টাকা পাইয়াছেন। হিন্দুস্থানের পলিসি এই কারণেই জনপ্রিয় এবং মূল্যবান। মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ হইয়াছে ৮৪৪৫০৫ টাকা। (কম্বাইণ্ড্ পলিসির ৫০০ টাকা ব্যতীত)। পূর্ব্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ৮৮২০০০ টাকা। সোসাইটীর কারবার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও যে মৃত্যুজনিত দাবী বেশী হয় নাই, ইহা সোসাইটীর উন্নতির একটি বিশেষ সন্তোষজনক লক্ষণ।

আলোচ্য বৎসরে খরচের অনুপাত

দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৩১'১ টাকা,—পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২'২ টাকা কম। সোসাইটীর কারবার যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, খরচের অনুপাত যদি কিছু বেশী হইত, তাহাতেও নিরাশার কারণ ছিল না। সেস্থলে খরচের অনুপাত যে কমিয়াছে, তাহা সোসাইটীর কর্ম্ম পরিচালনার কৌশলের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। বৎসরের শেষে জীবন বীমা তহবিল ৩৩¾ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ২৩১৯৮০০০ টাকায় উঠিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় সোসাইটীর

হিন্দুস্থানের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান

কুমার কার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিক

আর্থিক অবস্থা অধিকতর সুদৃঢ় হইয়াছে।

এইবার ৪৭০০০ টাকা দেওয়ার পর কম্বাইণ্ড্ পলিসি হোল্ডারদের দায় হইতে অংশীদারগণ মুক্ত হইলেন। সুতরাং এখন তাঁহাদের অবস্থা আশাজনক হইয়াছে। এতকাল তাঁহারা কিছুই ডিভিডেণ্ড্ পান নাই। ভবিষ্যতে তাঁহাদের ডিভিডেণ্ড্ পাওয়ার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।

লগ্নী টাকার উপরে প্রাপ্ত সুদ সম্পর্কে আমাদের সোসাইটীর অবস্থা অন্যান্য কোম্পানী অপেক্ষা অনেক ভাল; একথা আমি গত

বৎসরে বলিয়াছিলাম। সেই সঙ্গে আমাদের সকলকে সাবধান হইবার জন্য ইহাও বলিয়াছিলাম যে, চারিদিকে সুদের হার কমিয়া আসিতেছে,—সুতরাং ভবিষ্যতে সুদ বাবতে সোসাইটীর আয় বেশী হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের সোসাইটীর অনেক টাকা গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে লগ্নী থাকায় এ বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। আলোচ্য বৎসরে মর্টগেজ বাবতে লগ্নী এক লক্ষ টাকা মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু পলিসি লোণের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৩২ লক্ষ টাকা। গবর্ণমেণ্ট-পেপার, পোর্ট-ট্রাষ্ট, মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, এবং ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার প্রভৃতি মূল্যবান সিকিউরিটীতে ৫৮২ লক্ষ টাকা লগ্নী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ টাকা।

বীমা সম্বন্ধীয় নূতন আইন অনুসারে শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের হাতে অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গিয়াছে। আমার আশঙ্কা হয়, ইহার ফলে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের একটা গুরুতর ওলোট-পালোট ঘটিবে। আমাদের সোসাইটী সম্বন্ধে আমার ধারণা, ইহা অনায়াসে এই সঙ্কটজনক অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। নূতন আইনে এইরূপ বিধান হইয়াছে যে, কোম্পানীর মোট তহবিলের শতকরা ৫৫ টাকা গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে অথবা গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী সিকিউরিটীতে লগ্নী করিতে হইবে। যে সকল কোম্পানীর ঐরূপ লগ্নীর পরিমাণ এখনও তদপেক্ষা কম আছে, তাহাদিগকে চারি বৎসরের মধ্যে ঘাটতি পুরাইয়া দিতে হইবে। আমাদের সোসাইটীর ঐরূপ সিকিউরিটীতে লগ্নীর পরিমাণ প্রায় এক কোটী টাকা, বর্ত্তমান সময়ে তহবিলের শতকরা ৪০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আমরা আশা করি আগামী চারিবৎসরের মধ্যে আমাদের ঐ লগ্নীর পরিমাণ অনায়াসে শতকরা ৫৫ টাকায় উঠিবে।

কোম্পানীর ৬ষ্ঠ (পঞ্চম বার্ষিক) ভ্যালুয়েশনের তারিখ পড়িয়াছে ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে। তদনুসারে লণ্ডনের একজন বিখ্যাত য়্যাক্‌চুয়ারীর হাতে কাগজ পত্র সমস্ত দেওয়া হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের প্রথম ভাগেই ভ্যালুয়েশনের ফল বাহির হইবে। যতদূর বুঝা যায়, উহা বিশেষ সন্তোষজনক হইবারই কথা।

আমি বলিতে গৌরব অনুভব করিতেছি যে সোসাইটীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এন্ আর সরকার গবর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। তজ্জন্য ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে দীর্ঘকালের ছুটী দিয়াছেন। তাহার অনুপস্থিতিতে মিঃ এন্ দত্ত সোসাইটীর চীফ্ অফিসার ও সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেছেন। মিঃ এন্ দত্ত ইতিপূর্ব্বে ব্রাঞ্চ্ ম্যানেজার এবং হেড্ অফিসে এজেন্সী ম্যানেজার রূপে দীর্ঘকাল যাবৎ সোসাইটীর কার্য্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

উপসংহারে, আমি আমাদের শেয়ার হোল্ডারগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহারা স্বার্থ ত্যাগ করিয়া এতকাল সোসাইটীর আর্থিক অবস্থাকে সুদৃঢ় রাখিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। এই বৎসর হইতে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ ডিভিডেণ্ড্ পাওয়ার আশা সুনিশ্চিত হইল। সর্ব্বশেষে আমাদের সোসাইটীর পলিসি হোল্ডার এবং কর্ম্মচারিগণকে আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের সহানুভূতি এবং সমর্থনেই হিন্দুস্থানের দৃঢ় ভিত্তি গঠিত।

মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেড্

১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব

আমরা মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স্ কোম্পানীর ষষ্ঠ বার্ষিক (১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের) হিসাব ও রিপোর্ট সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশিত হইল। হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন বীমা :—আলোচ্য বৎসরে ৮৭৭৮৬৫০ টাকা মূল্যের নূতন বীমার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ৭২৮৫৯৭৫ টাকার প্রস্তাব গৃহীত এবং তাহাদের উপরে পলিসি ইস্যু করা হয়। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কারবার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আয়-ব্যয় :—আলোচ্য বৎসরে মোট আয় হইয়াছে ৭৪২৮৮৮ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম (পুনর্ব্বীমা বাদে) বাবদে আয় হইয়াছে ৭১৩৪২১ টাকা। সুদ বাবদে পাওয়া গিয়াছে (ইন্‌কামট্যাক্স্ বাদে) ২৮৯০৮ টাকা এবং অন্যান্য আয় ৫৫৮ টাকা।

খরচ হইয়াছে মোট ৫১৬:৩৩ টাকা। তন্মধ্যে দাবী বাবদে দেওয়া হইয়াছে ১১৬৬৮৫ টাকা এবং সারেণ্ডার ও বোনাস্ বাবদে দেওয়া হইয়াছে ৭০৮ টাকা। পরিচালনা খরচ হইয়াছে ৩৯৪৬৮২ টাকা। লাইব্রেরী পুস্তক এবং অর্গ্যানিজেশান খরচা বাবদ ৪০৫৭ টাকা ছাড়্ দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত খরচ বাদে ৭০০৮৮৮ টাকা জীবনবীমা তহবিলে সঞ্চিত হইয়াছে।

বৎসরের আরম্ভে জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪৭৪১৩৪ টাকা। সুতরাং দেখা যায় এই তহবিল ২২৬৭৫৪ টাকা অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

খরচের অনুপাত :—আলোচ্য বৎসরে খরচের অনুপাত দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৫৩·১ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে এই অনুপাত ছিল শতকরা ৫৬·২ টাকা। সুতরাং ইহা বিশেষ সুলক্ষণ যে, খরচের অনুপাত শতকরা ৩·১ টাকা কমিয়া গিয়াছে।

পলিসির দাবী :—আলোচ্য বৎসরে মৃত্যুজনিত দাবী উঠে ১১৫৬৮৫ টাকা এবং স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার দরুণ দাবী হয় ১০০০ টাকা। ১৯৩৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বৎসরের বাকী দাবী ছিল ৪৭৫৭২ টাকা। মোট ১৬৪২৫৮ টাকা দাবীর ৮২১:০ টাকা আলোচ্য বৎসরের মধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে অবশিষ্ট দাবীর ৩৬৭১০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া বক্রী দাবী ৪৫৪১৭ টাকা দেওয়া হয় নাই।

সম্পত্তি ও দায় :—কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৯২:৬৩৮ টাকা। তন্মধ্যে লগ্নীতে আছে ৬২৭৪৬৭ টাকা। গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ডিপজিট্ পুরা দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১১০:০০ টাকা মূল্যের গভর্ণমেণ্ট প্রমিসরী নোট্ ক্রয় করা হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় কোম্পানীর তহবিলের শতকরা ৩৯ টাকার বেশী গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে লগ্নী করা গিয়াছে। :৫২৮৪০ টাকা উপযুক্ত সিকিউরিটি সহ জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীতে লগ্নী করা আছে। ইহা জীবনবীমা তহবিলের শতকরা ২১ ভাগ মাত্র। এই লগ্নী দ্বারা বর্ত্তমান সময়ের মন্দার বাজারেও কোম্পানী শতকরা ৫ টাকা হিসাবে সুদ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যায়, মেট্রোপলিটানের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। আমরা জনসাধারণকে এই বীমা কোম্পানীর পলিসি লইবার জন্য নির্ভয়ে ও নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

মিঃ এ ডি নাবার ১৯২৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে ৪ বৎসরের জন্য নাগপুর পাইয়োনীয়ার ইনস্যুর‍্যান্স্ কোম্পানীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে তাঁহার কার্য্যকাল আরও ৫ বৎসর বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু কোম্পানী তাঁহাকে ১৯৩৩ সালের ২৪শে মে তারিখে কার্য্য হইতে অপসৃত করেন। এই কারণে মিঃ নাবার কোম্পানীর নিকট শতকরা ৪ টাকা হিসাবে ৪ বৎসরের রিনিউয়্যাল প্রিমিয়াম দাবী করিয়া আদালতে মামলা করেন। বিচারপতি তাঁহার ৬৯৮টাকা দাবী মঞ্জুর করিয়া তদনুপাতিক খরচা সহ মামলা ডিক্রী দিয়াছেন।

—•—

মহম্মদ হানিফ্ নামক এক ব্যক্তি ১৯৩১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে ক্যানাডার সান্-লাইফ্ য়্যাসুর‍্যান্স্ কোম্পানীতে জীবন বীমা করিয়া ৫০০০ টাকার একটী পলিসি গ্রহণ করে এবং প্রথম বার্ষিক প্রিমিয়াম ২৫০ টাকা দেয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রিমিয়াম যথা সময়ে দিতে না পারায় তাহার পলিসি বাতিল হইয়া যায়। কোম্পানীর নিয়মানুসারে তিন মাসের মধ্যে মহম্মদ হানিফ্ তাহার পলিসি পুনরুদ্ধার করে এবং ১৯৩৩ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে রিনিউয়্যাল প্রিমিয়াম দেয়। ঐ বৎসরই ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে মহম্মদ হানিফের মৃত্যু হয়। কিন্তু পলিসির দাবী কোম্পানী না দেওয়াতে তাহার উত্তরাধিকারী আবদুল হাসিব, আবদুল মজিদ্, ফাতিমা বেগম ও হাসিনা বেগম,—ইহারা উক্ত সান্-লাইফ্ য়্যাসুর‍্যান্স্ কোম্পানীর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করে। তদনুসারে বুলন্দ্ সহরের সিবিল জজকোর্টে মামলা চলিতে থাকে। বিবাদী কোম্পানী এই বলিয়া জবাব দেয় যে, যখন মহম্মদ হানিফ্ পলিসি পুনরুদ্ধার করে, তখন তাহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না;—নানা প্রকার ব্যারামে সে ভুগিতেছিল। কোম্পানীর নিকট তাহা গোপন করিয়া মিথ্যা উক্তির সাহায্যে প্রতারণা পূর্ব্বক সে পলিসির পুনরুদ্ধার করিয়াছে। সুতরাং কোম্পানী পলিসির দাবী দিতে বাধ্য নহে।

প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া বিচারপতি মৌলবী সাহ্ওয়ালী আলম্ সাহিব্ এই রায় দিয়াছেন যে, বাদিগণ দাবীর টাকা পাইতে পারে না। বিবাদী কোম্পানীকে মিথ্যা উক্তির দ্বারা প্রতারণা করা হইয়াছে। সুতরাং খরচা সমেত মামলা ডিস্মিস্ হয়।

আশ্বিন মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" মামলা মোকদ্দমা শীর্ষক প্রবন্ধে (৬৮৯ পৃষ্ঠায়) যশোহরের যে বীমা প্রতারণার মামলার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ফজলল করিম নামক একব্যক্তি প্রতারণা পূর্ব্বক জমাদার গায়েন নামক আর একজনের নামে য়্যাসোসিয়েটেড্ ইণ্ডিয়া ইন্‌সুর্যান্স্ কোম্পানী হইতে এক মিথ্যা পলিসি লওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। যশোহরের সদর মহকুমা হাকিমের বিচারে তাহার একদিন সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০টাকা জরিমানা হইয়াছে।

মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত মসলীপত্তনের অন্ধ্র ইন্‌সুর্যান্স্ কোম্পানীর প্রথম ভ্যালুয়েশন (১৯২৯ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪ বৎসরের) হয় ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে। দ্বিতীয় ভ্যালুয়েশন (১৯৩৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪ বৎসরের) হয় ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৯৩৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে কোম্পানীর সেক্রেটারী ইন্‌কামট্যাক্স্ আফিসে যে হিসাব দাখিল করেন তাহাতে তিনি ১৯২৯ সালের ভ্যালুয়েশনের উপর লাভ দেখান। তদনুসারে ইন্‌কামট্যাক্স্ নির্দ্ধারিত হয় ৮২৯৪ টাকা। এই টাকা কোম্পানী দেন। কিন্তু ১৯৩৪ সালে যখন দ্বিতীয় ভ্যালুয়েশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইল, তখন লাভের পরিমাণ অনেক বেশী দেখা যায়। এই লাভের উপর ইন্‌কাম-ট্যাক্স্ দাঁড়ায় ৩৯৭৫৫ টাকা। সুতরাং ইন্‌কামট্যাক্স্ অফিসার বাকী ৩১৪৬১ টাকা কোম্পানীর নিকট দাবী করেন। কোম্পানী তাহা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় আদালতে মামলা উঠে। মাদ্রাজ হাইকোর্টে চীফ্ জষ্টিসের এজলাসে ইহার বিচার হয়। ইন্‌কামট্যাক্স্ সম্বন্ধীয় ২৫নং নিয়মের মধ্যে ইন্‌সুর্যান্স্ কোম্পানীর হিসাব দাখিল করা সম্পর্কে যে "Last preceding Valuation" (শেষ পূর্ব্ববর্ত্তী) কথাটি আছে, তাহার অর্থ লইয়াই তর্ক বিতর্ক উঠে। ইন্‌কামট্যাক্স্ অফিসারের পক্ষ হইতে বলা হয়, যখন ১৯৩৪ সালের ৩০শে জুন কোম্পানী হিসাব দাখিল করিয়াছেন, তখন শেষ পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্যালুয়েশন বলিতে ১৯৩৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪ বৎসরের ভ্যালুয়েশনকেই বুঝাইবে। কিন্তু কোম্পানীর পক্ষ হইতে আপত্তি করা হয় এই বলিয়া যে, উহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্যালুয়েশনের শেষটীকেই বুঝাইবে,—অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত, এই ৪ বৎসরের ভ্যালুয়েশনকে বুঝাইবে। চীফ্ জষ্টিস্ মহোদয় কোম্পানীর পক্ষীয় ব্যাখ্যাটীকেই যুক্তি সঙ্গত মনে করিয়া রায় দিয়াছেন যে ইন্‌কামট্যাক্স্ অফিসার দাবীর টাকা পাইতে পারেন না এবং ২৫০ টাকা মামলার খরচা বাবত কোম্পানীকে দিতে হইবে।

কলিকাতার হ্যাপী ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানী লক্ষ্ণৌতে একটি ব্রাঞ্চ্ আফিস খুলিয়াছেন। মিঃ ডি পি সেগাল তাহার ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারত ইন্‌সিওরেন্সের লক্ষ্ণৌ ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী মিঃ জে এন ডল্লা কোম্পানীর হেড্ আফিসে বদ্‌লী হইয়াছেন।

এশিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ্ য়্যাসুর‍্যান্স্ কোম্পানী করাচীতে একটি ব্রাঞ্চ্ আফিস খুলিয়াছেন। সিন্ধুদেশই এই আফিসের কার্য্যক্ষেত্র হইবে। উদ্বোধন উৎসবে করাচীর ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ জামসেদ্ এন্ আর মেটা পৌরহিত্য করেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ পি সি গুহ ভারত ইন্‌সুর‍্যান্সের ঢাকা ব্রাঞ্চের এজেন্সি ইনস্পেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারত ইন্‌সুর‍্যান্সের এলাহাবাদ ব্রাঞ্চের মিঃ সি আর কৃপলানী উক্ত কোম্পানীর লক্ষ্ণৌ ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ্ এসিওরেন্স্ কোম্পানীর ম্যানেজার ছুটী লইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার মেসার্স্ আলম্‌বরুচা এণ্ড কোম্পানীর মিঃ ই এফ্ আলম্ ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

বোম্বাইর প্রভাত ইন্‌সিওরেন্স্‌ কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ বি বি দত্ত হিমালয় এসিওরেন্স্‌ কোম্পানীর হেড্‌ আফিসের (কলিকাতা) কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন।

ভারত গভর্ণমেণ্টের সলিসিটার জেনারেল মিঃ সুশীল চন্দ্র সেন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় কাউন্সিল অব্‌ ষ্টেটে ইন্‌সুর‍্যান্স্‌ বিল আলোচনার সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। আমরা অবগত হইলাম, তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

ফরওয়ার্ড এসিওরেন্স কোম্পানীর ব্রাঞ্চ্‌ আফিস ময়মনসিংহ হইতে ১০২নং ক্লাইভ্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং পলিসি হোল্ডারগণ ময়মনসিংহ ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়াতে কিংবা কোম্পানীর কলিকাতাস্থিত ব্রাঞ্চ্‌ আফিসে প্রিমিয়ামের টাকা জমা দিতে পারেন।

শান্তিনিকেতন কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল এবং বর্ত্তমানে বাঁকুড়া কলেজের অধ্যাপক মিঃ এন্‌ সি গাঙ্গুলী এম্‌ এ (বার্ম্মিংহাম্‌) দর্শন শাস্ত্রী, প্যালেডিয়াম ইন্‌সুর‍্যান্স্‌ কোম্পানীর অর্গ্যানাইজারের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ একজন সর্ব্বজন পরিচিত এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপককে অর্গ্যানাইজার রূপে পাওয়া প্যালাডিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষদিগের কার্য্যদক্ষতারই পরিচায়ক বলিতে হইবে। বাঁকুড়া, বীরভূম এবং মানভূম,—এই তিনটি জেলায় তিনি কোম্পানীর গঠন কার্য্য চালাইবেন।

লাহোরের সান্‌-লাইট্‌-অব-ইণ্ডিয়া ইন্‌সুর‍্যান্স্‌ কোম্পানী লক্ষ্ণৌতে একটি ব্রাঞ্চ্‌ অফিস খুলিয়াছেন। মিঃ পি এন্‌ নন্দ এম্‌ এ, এল্‌ এল্‌ বি ব্রাঞ্চ্‌ ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত নবেম্বর মাসে জেন্মাইন্‌ ইন্‌সুর‍্যান্স্‌ কোম্পানীর প্রথম ভ্যালুয়েশন হয়। তাহাতে কোম্পানী মেয়াদী বীমায় ১২ টাকা হিসাবে এবং আজীবন বীমায় ১৫ টাকা হিসাবে রিভারসানারী বোনাস্‌ ঘোষণা করিয়াছেন। কোম্পানীর এই সফলতায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

গত ৫ই ডিসেম্বর ইয়ং লাইফ্‌ অফিসেস্‌ লেজিস্‌লেশন কমিটীর সভ্যগণ ইম্পীরিয়াল রেস্তোরাঁতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বৈজনাথ বাজোরিয়া, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ পি এন্‌ ব্যানার্জ্জীকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। তদুপলক্ষে নূতন বীমা আইন সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা হয়। মিঃ এ সি সেন, মিঃ আই বি সেন, মিঃ এন্‌ দত্ত প্রভৃতি বীমা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাঙ্গালোরের মহীশূর ইন্‌সুর‍্যান্স্‌ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জে ডি ডোড়াবীরাপ্পা উহার একটি ব্রাঞ্চ্‌ অফিস স্থাপন করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। বঙ্গদেশ ও আসাম প্রদেশে এই ব্রাঞ্চ্‌ অফিসের কার্য্যক্ষেত্র হইবে।

আর্য্যস্থান ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেড্

১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট।

হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন বীমা

আলোচ্য বৎসরে ১২৮৫৫০০ টাকা মূল্যের ৮৪৫টী নূতন বীমার প্রস্তাব আসিয়াছে। তন্মধ্যে ১০২৬২১০ টাকা মূল্যের ৬৬০টি প্রস্তাব গৃহীত ও তাহাদের উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। গত বৎসর ৯০২৫০০ টাকার পলিসি প্রদত্ত হয়। সুতরাং নূতন কারবারের পরিমাণ শতকরা ১৪ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কোম্পানীর ক্রমোন্নতি নিঃসন্দেহরূপে বুঝা যাইতেছে।

আয়-ব্যয়

কোম্পানীর আয় হইয়াছে মোট ৬৮৭২৪ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবতে আয় ৬০১২৯ টাকা; সুদ ও ডিভিডেণ্ড বাবতে আয় ১০৯৭ টাকা। কণ্ট্রোলারগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ৭৫০০ টাকা পূর্ব্ব বৎসরে প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল ৩৯০১৪ টাকা। সুতরাং দেখা যায় প্রিমিয়াম আয় শতকরা ৫৪ টাকা বাড়িয়াছে।

খরচ হইয়াছে মোট ৪৬৪১৪ টাকা। তন্মধ্যে পলিসির দাবী বাবতে গিয়াছে ৭২১০ টাকা এবং পরিচালনা খরচ হইয়াছে ৩৮৫০০ টাকা। আসবাব পত্রের মূল্য হ্রাস ও প্রাথমিক গঠনব্যয় ছাড়া বাবতে ৭০২ টাকা খরচ ধরা হইয়াছে। সমস্ত খরচ বাদে জীবন বীমা তহবিলে ২৬৪৩৯ টাকা জমিয়াছে।

জীবন বীমা তহবিল

পূর্ব্ববৎসরে জীবনবীমা তহবিলে ৪১২৯ টাকা ছিল। আলোচ্য বৎসরে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৬৪৩৯ টাকায় উঠিয়াছে। এই বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৫৪০ টাকা।

খরচের অনুপাত

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম আয়ের সহিত পরিচালন খরচের অনুপাত কমিয়া শতকরা ৬৪ টাকায় নমিয়াছে।

দাবী

আলোচ্য বৎসরে মৃত্যুজনিত ৭০০০ টাকার এবং য়্যান্যুইটি বা বার্ষিক বৃত্তি বাবতে ২১০ টাকার মোট ৭২১০ টাকার দাবী উত্থিত হয়। তন্মধ্যে ৪০০০ টাকার (মৃত্যুজনিত) দাবী বৎসরের মধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট ৩০০০ টাকা ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে দেওয়া হয়; সেই জন্য উহা ব্যালেন্স সীটে দেনার ঘরে দেখান হইয়াছে।

সাল	খরচের অনুপাত শতকরা
১৯৩৫	৯৬ টাকা
১৯৩৬	৮৬ ,,
১৯৩৭	৬৪ ,,

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায়, খরচের অনুপাত ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহা আরও কমিয়া যাইবে, আশা করা যায়। জীবন বীমা তহবিলের উপর সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৪ টাকার কম হইবে না।

ভ্যালুয়েশনের ফলে ১৯১৯ টাকা সারপ্লাস্ (Surplus) বা বাড়তি দেখা যায়। তন্মধ্যে ৯৮১ টাকা অ-বণ্টিত রাখা হয়। অবশিষ্ট ৯৩৮ টাকা দুই বৎসরের প্রিমিয়াম দেওয়া পলিসি সমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে এক হাজার টাকার পলিসিতে এক বৎসরের জন্য ১০ টাকা হিসাবে রিভার্সানারী বোনাস্ দেওয়া যাইতে পারে।

অল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানী বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভ্যালুয়েশনও খুব কড়াকড়ি রকমে হইয়াছে। সুতরাং এই বোনাস্ সামান্য পরিমাণ হইলেও উহা কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবে। কোম্পানীর এই প্রাথমিক অবস্থায় অংশীদারদিগকে কোন ডিভিডেণ্ড দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

ইহা বিশেষ সুখের বিষয় যে কোম্পানীর কণ্ট্রোলার বা পরিচালকগণ কোম্পানীর উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা এই তিন বৎসর তাঁহাদের পরিশ্রমের জন্য কোন বেতন গ্রহণ করেন নাই;—উপরন্তু কোম্পানীর তহবিলে ৭৫০০ টাকা বিনা সর্ত্তে জমা দিয়াছেন।

সারপ্লাস্ ১৯১৯ টাকা হইতে ৯৩৮ টাকা, ১৩০টি দুই বৎসর চল্‌তি পলিসিতে বণ্টন করা হয়। ঐ সকল পলিসির মূল্য মোট ১৯০৫০০ টাকা। উহাতে প্রতি হাজার টাকার পলিসিতে এক বৎসরের জন্য ১০ টাকা হিসাবে বোনাস্ দেওয়া হয়।

১৯৩৪ সালের ৩০শে জানুয়ারী হইতে ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত হিসাব,—

আয়

প্রিমিয়াম	১২২২৯৮৲
সুদ	৩১৫৯৲
মূল্য বৃদ্ধি	১৬৮০৲
কণ্ট্রোলার দত্ত	৭৫০০৲
বিবিধ	১৲
মোট—	১৩৪৬৩৯৲

ব্যয়

দাবী	৯২১০৲
কমিশন	২৭৫১১৲
পরিচালন	৬৬৯৩৯৲
গঠন খরচ ছাড়	৪.৯৬৲
মূল্য হ্রাস	৩৫২৲
জীবন বীমা তহবিল	২৬৪৩৯৲
মোট—	১৩৪৬৩৯৲

"সাবান"

১১ই শ্রাবণ মঙ্গলবার (১৩৪৪ বাং) তারিখের "আনন্দবাজার পত্রিকায়"—'বাঙলার বেকার সমস্যা ও তাহার প্রতীকারের অপূর্ব্ব ধাপ্পাবাজী' প্রবন্ধে সরকারী শিল্প বিভাগকে আক্রমণ করিয়া, দেড়শত হতভাগা যুবকের ব্যর্থতার কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে। এই দেড়শত যুবকের মাঝে—২৪ জন সাবান শিক্ষার্থীও আছেন। এই ২৫ জন গবর্ণমেণ্টের সাবান শিল্পীর নিকট সাবান তৈয়ারী শিক্ষা করিয়া কেহই নাকি ব্যবসায়ে লাভবান হইতে পারেন নাই। কথাটা যে কেবল মিথ্যা তাহা নহে। গত নবেম্বর (১৯৩৬) মাস হইতে গত মার্চ্চ (১৯৩৭) মাস পর্য্যন্ত, ৪ মাস "সাবান শিক্ষা দেওয়ার" একটা পার্টি "সন্দ্বীপে" থাকিয়া সাবান শিক্ষা দিয়াছেন। এই পার্টিতে সন্দ্বীপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কেহ সাবানের ব্যবসায় এযাবৎ আরম্ভ করেন নাই। আমি ঐ পার্টিতে একজন রেগুলার ছাত্র ছিলাম। আমার বয়স ৭০ বৎসর হইলেও আমি তাঁহাদের শিক্ষা-প্রণালী ও কাজকর্ম্ম যেরূপ মনোযোগের সহিত শিক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি এরূপ বোধ হয় কেহ করেন নাই। শুনিয়াছি আগে ১ মাসে সাবান তৈয়ারী শিক্ষা দেওয়া হইত, তৎপর ২ মাস ক্রমে এখন ৪মাসে পরিণত হইয়াছে। আমি প্রায় আজ ১৪।১৫ বৎসর যাবৎ সাবান প্রস্তুত সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আসিতেছি। ইহার মাঝে ঢাকাই সাবান প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া ৩।৪ বৎসর ব্যবসায়ও করিয়াছি। তাই তাঁহাদের নিকট ভাল করিয়া সাবান তৈয়ারী শিক্ষার্থে তাঁহাদের ছাত্র হইয়াছিলাম। একদিনও বাদ না দিয়া পূর্ণ ৪ মাস তাঁহাদের শিক্ষাকেন্দ্রে যোগ দিয়াছিলাম। বোধ হয় এই কেন্দ্রে আমিই তাঁহাদের একমাত্র রেগুলার ছাত্র ছিলাম। প্রথমতঃ তাঁহাদের নিকট বড় বড় অনেক কথাই শুনিয়াছিলাম। তাঁহারা ঢাকাই, বাগমারী প্রভৃতি দেশী ও জারমেণী, জাপানী প্রভৃতি বিলাতী

নানাবিধ প্রথায় সুলভ ও উৎকৃষ্ট "সাবান" তৈয়ারী শিক্ষা দিবেন। দুঃখের বিষয় জার্ম্মেন-প্রথায় যে সাবান শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা দিয়ে কাপড় কাচাত দূরের কথা হাতে ধরিলেও চাম নষ্ট হইয়া যায়।

তাঁহাদের প্রথম একমাস কেবল তৈলের property (উপাদান) শিক্ষা দিতেই ব্যয়িত হইয়াছিল। যাহা শিক্ষা আমাদের ন্যায় শিক্ষার্থীর আদৌ দরকার করে না। "পুন্নাল তৈল" সন্দ্বীপের একটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহা কাপড় কাচা সাবানের জন্য উৎকৃষ্ট তৈল বলিয়া শিল্প বিভাগ কর্ত্তৃক পরিগৃহিত হইয়াছে এবং এই তৈল দ্বারা ঢাকা প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট লাল সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই তৈলের নাকি "সাপ করিবার ক্ষমতা" (detergent power) অত্যন্ত অধিক। এই তৈলটাই অনেক সময় পর্য্যন্ত শিক্ষা কেন্দ্রে দেখা যায় নাই। সাবান কেবল উৎকৃষ্ট হইলেই হইল না, উহা বাজার চলনসই চাই। তাঁহাদের প্রস্তুতি "গোল্লা" সাবানটা উৎকৃষ্ট হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা প্রস্তুত করিতে যত সময় ও ব্যয় লাগে, সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার গুণ বিশিষ্ট ঢাকাই সাবান প্রস্তুতে "গোল্লা সাবান" তৈয়ারের ও ব্যযের অর্দ্ধেকও প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ যাঁহারা সাবান তৈয়ার শিক্ষাদেন, তাঁহারা কেহই ব্যবসায়ী নহেন। তাঁহারা যেসব হিসাবাদি দেন, তাহা ঠিক হয় না। কাজেই তাঁহাদের সাবান ঢাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাবানের সহিত প্রতিযোগীতায় টিকিতে পারে না। ধরিতে গেলে "আনন্দবাজার পত্রিকায়" যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা মিথ্যা নহে।

তাঁহারা আমাদিগকে সস্তা (Cheap) সাবানের প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন; আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম ঐ সস্তা সাবানের পর্ত্তাই আমাদের প্রস্তুত ঢাকাই সাবানের পর্ত্তার চেয়ে অনেক বেশী পড়ে। তাঁহারা শিখিয়াছেন সাবান তৈয়ার করিতে এবং তাহা শিক্ষা দিতে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যবসায়ের মধ্যে যে একটা "Trade Secret" (ব্যবসায়ের রহস্য) লুক্কাইত আছে, তাহা তাঁহাদের অপরিজ্ঞেয়। তাহাদের গলদ এখানে ১৪।১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমার এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে একটা সস্তা সাবানের ফরমুলা জান্তেম, তাহা সাবান শিল্পের স্থানীয় প্রধান কর্ত্তাকে দিয়েছিলাম পরীক্ষা করিতে, তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—দুই সের উৎকৃষ্ট নারিকেল তৈলে চৌদ্দসের উৎকৃষ্ট কাপড় কাচা সাবান তৈয়ার হইতে পারে। তাহার "ফরমুলা ও প্রস্তুত প্রণালী" সাবান ব্যবসায়ীদের উপকারার্থে "ব্যবসায় ও বাণিজ্য" নামক কাগজে দেওয়া হইল। যাঁহারা সাবানের ব্যবসায় করিতে চান, অথবা যাঁহারা ঐ ব্যবসায় করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহারা আমার সহিত পত্র ব্যবহার করিলে এই ব্যবসায়ের গূঢ় রহস্য (Trade Secret) জানিতে পারিবেন। এই ফরমুলা দ্বারা যদি কোন ব্যবসায়ীর উপকার হয়, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

(সুলভতম কাপড় কাচা সাবান)

প্রস্তুত ব্যয়—৩,-৪, টাকা

উপাদান ;—

১। উৎকৃষ্ট নারিকেল তৈল /২ সের
২। কষ্টিক সোডা /৷৷ ,,
৩। কাপড় কাচা সোডা /১ ,,
৪। সিলিকেট অব সোডা /১ ,,
৫। লবণ সাধারণ /১ ,,
৬। জল (১৬ সের) /১৬ ,,

১। দুই সের নারিকেল তৈল (ভেজাল-হীন ও উৎকৃষ্ট) কড়াইতে করিয়া উনানে বসান। তৈল একটু গরম হইলে তাহাতে আটসের জল ধীরে ধীরে মিশাইয়া আস্তে আস্তে জ্বাল দিতে থাকুন। তৈল ও জল ফুটিয়া উঠিলে নিম্নলিখিত প্রকারে সাবান প্রস্তুত করুন।

২। তৈল ও জল উনানে চাপবার পূর্ব্বে /৮ সের জল সমান তিন ভাগ করিয়া নিয়া একভাগের সহিত /৷৷০ সের কষ্টিক সোডা মিশাইয়া "লাই" করুন। অপর একভাগ জলের সহিত /১ সের কাপড় কাচা সোডা (বাজারের সোডা) মিশান। অবশিষ্ট জল-ভাগ একটা কড়াইয়ে খুব ফুটাইয়া তাহার সহিত সোডা সিলিকেট মিশান। এইরূপে তিনটী পাত্রে সোডাত্রয়ের তিনটী সলিউসন (লাই) প্রস্তুত করিয়া, তাহা শীতল হইলে, তবে সাবান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করুন। অর্থাৎ নারিকেল তৈল জলসহ উনানে চড়ান।

৩। জল ও তৈল গরম হইলে, তাহাতে "কাপড় কাচা সোডার লাই" ধীরে ধীরে মিশান। (২য় দফার নিয়ম অনুসারে যাহা পূর্ব্বেই তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন) এবং আস্তে আস্তে জ্বাল দিতে থাকুন; ১০।১৫ মিনিট জ্বাল দেওয়ার পর, যখন দেখিবেন তৈল, জল, ও সোডা একপ্রকার মিশিয়াছে; তখন কষ্টিক ভিজান-জল (কষ্টিক লাই) সমান তিন ভাগ করিয়া, কড়াইস্থিত তৈল জলাদির সহিত, একভাগ খুব নীচু হইতে ধীরে ধীরে মিশাইয়া দেউন, এবং আস্তে আস্তে জ্বাল দিতে থাকুন, যখন দেখিবেন তৈলজলাদির সহিত কষ্টিক লাই মিশিয়া গিয়াছে, কষ্টিকের কোন প্রকার তীব্রতা অনুভূত হয় না, তখন আর একভাগ কষ্টিক লাই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উহাতে দেউন—এবারও যখন কষ্টিক তৈলের সহিত মিশিয়া যাইবে তখন তৃতীয় ভাগ কষ্টিক লাই উহাতে দিয়া আস্তে জ্বাল দিতে থাকুন—এবং দেখুন কষ্টিক তৈলের সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়াছে কিনা (এবার কিন্তু সামান্য কষ্টিক তৈলের সহি: অমিশ্রিত থাকিবে)। তৎপর উহার সহিত "সিলিকেট সলিউসন" (উষ্ণজলে মিশান সিলিকেট) মিশাইয়া দেন। এবং খুব জোরের সহিত নাড়িতে থাকুন। যখন সাবান নিম্নলিখিতরূপ দেখিবেন, তখন তৎসহ /১ সের সাধারণ লবণ মিশাইয়া খুব নাড়িয়া লবণটা সাবানের সহিত ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া দিয়া ঐ তরল সাবান ফ্রেমে বা খোড়ায় ঢালুন। তৎপর ১০।১২ ঘণ্টা পরে খোড়া বা ফ্রেম হইতে যে সাবান বাহির হইবে দেখিবেন তাহা উৎকৃষ্ট কাপড় কাচা সাবান হইয়াছে। ফ্রেমে ঢালিলে এবং ইহার সহিত রঙ্ ও সেণ্ট দিলে ইহাতে সস্তা গায়ে মাখা সাবানও করা যাইতে পারে।

[শেষাংশ ১১০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মস্তিষ্কের খাদ্য
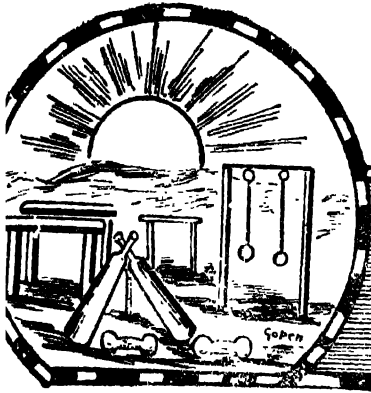
অন্নাহারী বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক এত সবল ও উর্ব্বর কেন ইহা লইয়া বহু গবেষণা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বহুদিন যাবৎ কেহ কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল, মস্তিষ্কের পরিপুষ্টি ফ্যাট্ ও ফস্‌ফরাস দ্বারা হয়, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে আদৌ তাহা নহে, কার্ব্বোহাইড্রেটই মস্তিষ্কের শক্তির প্রধান উৎস; সুতরাং বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক যে সবলতা লাভ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। আর একটা কথা, ইহা ইনসুলিনের উপর মোটেই নির্ভর করে না এবং ঔষধ প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেও মস্তিষ্কের খাদ্য বদলায় না।

১৯২৯ সনে হিমউইচ ও নাহুম নামে দুই ডাক্তার কুকুরের মস্তিষ্ক লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। তাঁহারা মস্তিষ্কের শিরায় ও ধমনীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে শিরার রক্তে ধমনীর রক্ত অপেক্ষা ডেক্‌সট্রোজ ও ল্যাক্‌টিক্ এসিড অনেক কম, তাহার অর্থ এইযে—মস্তিষ্ক ঐ দুইটী পদার্থ গ্রহণ করিতেছে ও অন্য পদার্থগুলি ছাড়িয়া দিতেছে। ইহা সুস্থ ও ডায়াবেটিক্ মস্তিষ্ক উভয়ের বেলাই একরূপ। তাঁহারা আরও দেখাইয়াছেন যে, প্রাণীর শর্করা অক্‌সিডাইজ করিবার ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দিলেও মস্তিষ্ক শর্করাই গ্রহণ করে।

ডাক্তার লোনা প্রাণীকে অজ্ঞান না করিয়া মস্তিষ্কের প্রধান খাদ্য শর্করা ও মাংসপেশীর প্রধান খাদ্য যে ফ্যাট্ তাহা দেখাইয়াছেন।

ডাক্তার হোম্‌স্ প্রাণীর মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে শর্করা যদি ল্যাক্‌টিক্ এ্যাসিডে পরিণত না হয়, তবে মস্তিষ্ক তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি দেখাইয়াছেন মস্তিষ্ক ল্যাক্‌টিক্ এ্যাসিডের জলে রাখিয়া দিলে অক্‌সিডেসন সমান থাকে ও শর্করাজল দিলে অক্‌সিডেসন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু শর্করা যদি

ল্যাক্‌টিক্‌ এ্যাসিডে পরিণত না হয় তবে তাহা সম্ভব হয় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শর্করা ও ল্যাক্‌টিক্‌ এসিডই মস্তিষ্কের প্রধান খাদ্য। ইহা কার্ব্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া সকলে যেন শুধু চিনি খাইতে আরম্ভ না করেন; কারণ আমাদের খাদ্য—প্রোটিন্‌, ফ্যাট, কার্ব্বো-হাইড্রেট, ভিটামিন্‌ ও লবণ। এই সকল খাদ্য হইতে দেহ শক্তি সঞ্চয় করে। এই খাদ্যগুলি গ্রহণের একটা নির্দ্ধারিত পরিমাণ আছে, সেই পরিমাণের কোন গোলযোগ হইলেই শরীরের পরিপুষ্টির হানি হয় ও স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়।

অনিদ্রা

সকলেই বোধহয় জানেন যে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে নিদ্রার একান্ত প্রয়োজন; নিদ্রার অভাবে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট যে কি ভীষণ তাহা যাহারা অনিদ্রায় ভুগিতেছেন তাহারা ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না। অনেক সময় ইহার জন্য আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে দেখা যায়। ক্ষুধার তাড়না অপেক্ষা অনিদ্রা অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক। অবশ্য নিদ্রার প্রয়োজনীয়তা—মানুষের শারীরিক গঠন, জীবনযাত্রার প্রণালী, মেজাজ ও বয়সের উপর নির্ভর করে।

শারীরিক বা মানসিক কষ্টই অনিদ্রার প্রধান কারণ; ইহা ব্যতীত আরও বহু কারণে নিদ্রার অভাব হয়। ইহার চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের ঠিক খাটি কারণটী খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, অন্যথা শুধু ঔষধে কোনও উপকার হয় না, রোগী কোন ঔষধে একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে ও পরে তাহাতে আর কোনও কাজ হয় না। আর এই ঔষধগুলির এইরূপ অপব্যবহারের জন্য অনেক সময় রোগীর এত ক্ষতি হয় যে তাহা শেষে আর পূরণ করা যায় না। এখন যে এত ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার একটি কারণ—শিশুকাল হইতে নিদ্রার অভাব। পিতামাতার এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

(১১০২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পরীক্ষা :—

একটী পাত্রে ঠাণ্ডা জল রাখিয়া ঐ জলের উপর একটা কলাই করা লোহার বাটী ভাসাইয়া রাখুন। এই বাটীর মধ্যে কতটুকু ফুটন্ত সাবান নিন। এই সাবানটুকু ঠাণ্ডা হইলে ইহা দুই আঙ্গুলের মধ্যে লইয়া টিপিয়া দেখুন। টিপিলে যদি সাবান নরম লাগে এবং সাবান হইতে জল বাহির হয়, তবে উহাকে আরো সিদ্ধ করিতে থাকুন। মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিতে করিতে যখন দেখিবেন "সাবান" সাবান বেশ শক্ত বোধ হয়, এবং উহা হইতে তেমন আর জল বাহির হয় না (নামমাত্র হইতে পারে) তখন লবণ মিশ্রিত করিয়া সাবান নামাইবেন ও ফ্রেমবাক্সে বা খোড়ায় ঢালিবেন।

শ্রীঅনঙ্গ মোহন দাস
তারাগঞ্জ দাতব্যচিকিৎসালয়
তারাগঞ্জ বাজার P. O.
(ময়মনসিংহ)

কাহার কতখানি নিদ্রার প্রয়োজন তাহা জানা বিশেষ দরকার। শিশুদের আহার ও নিদ্রা ব্যতীত কোন কাজ নাই। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত—১৪ ঘণ্টা, ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ১২ ঘণ্টা, ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত—১০ ঘণ্টা, যুবক ও প্রৌঢ় দিগের ৬—৮ ঘণ্টা বৃদ্ধদিগের—১০ ঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট।

সুনিদ্রার জন্য কতকগুলি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

(১) নিয়মিত সময়ে শয়ন করা কর্ত্তব্য। শিশুদের—সন্ধ্যা ৬টা, ৮ বৎসর পর্য্যন্ত—৮টা, ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত—৯টা, পূর্ণবয়স্কদের—১০ টায় শয়ন করা উচিত।

(২) শয়নঘর প্রশস্ত হওয়া উচিত। বায়ু চলাচল যাহাতে বন্ধ না হয় সেজন্য জানালাগুলি খুলিয়া রাখা দরকার।

(৩) বিছানা পরিষ্কার ও আরামপ্রদ হওয়া উচিত।

(৪) মাথা ঢাকিয়া শয়ন করা উচিত নয়।

(৫) শয়নের পূর্ব্বে আলো ঢাকিয়া দেওয়া দরকার।

(৬) গোলমালে যাহাতে শিশুদের নিদ্রাভঙ্গ না হয় তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত।

(৭) নিয়মিত স্নান করা ও দাঁত পরিষ্কার রাখা একান্ত প্রয়োজন।

(৮) শয়নের পূর্ব্বে ঠাণ্ডা জলে মাথা ও হাতপা ধোওয়া, দেহ মোছা ও এক গ্লাস জলপান করা কর্ত্তব্য।

এইগুলি করা সত্ত্বেও যদি কোনও উপকার না হয় তবে দলইমলাই ও বৈদ্যুতিক চিকিৎসা দ্বারা অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। দোলনায় শয়ন করিলে অনেক সময় নিদ্রা আসে।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, যদি কাহারও মনকে একটি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সে অতি শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়ে, শ্রুতিমধুর গীতবাদ্য প্রভৃতি দ্বারাও নিদ্রা আনয়ন করা যায়। সম্মোহন বিদ্যা দ্বারাও রোগীর ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি সমূহ অপরের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে হয় ও রোগী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। যদি রোগীর মন হইতে কোনও প্রকারে দুশ্চিন্তা দূর করিতে পারা যায় বা মিথ্যা ঔষধ দিয়া বা বুঝাইয়া হউক—যদি তাহার মনে এরূপ একটি ভাব অঙ্কিত করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় যে তাহার নিদ্রা অবশ্য হইবে, তাহা হইলে তাহার আর অনিদ্রা ভোগ করিতে হয় না, অবশ্য ইহা একদিনে সম্ভব নয়, বহু সময়-সাপেক্ষ। এইরূপে অনেক ব্যক্তি দুরারোগ্য অনিদ্রার হস্ত হইতে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

সর্দ্দি-কাসি

সামান্য সর্দ্দি কাসি হইতে যে ব্রোঙ্কাইটিস্ বা নিউমোনিয়ায় দাঁড়াইতে পারে ও পরে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতেও পারে এ ধারণা অনেকের নাই। ইহাকে অবহেলা করিয়া বাড়িতে দেওয়া অতি অন্যায়।

আর এক কথা, ইহাতে জাতির বহু সময় নষ্ট হয়, কারণ অন্য কোন রোগ এত বেশীবার ও সাধারণ ভাবে হয় না, এইরূপে স্বাস্থ্য ও বহু সময় নষ্ট হওয়ায় জাতির অনেক ক্ষতি হইতেছে, সুতরাং ইহার নিবারণের উপায় করা একান্ত আবশ্যক।

এইজন্য কতকগুলি বিষয় সর্ব্ব সাধারণের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই রোগ সাধারণতঃ ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় দৃষ্ট হয়। ইহা অতি সংক্রামক রোগ ও এক প্রকার বীজাণু ইহার কারণ। এই বীজাণুগুলি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নাক ও গলার ভিতর বাস করে এবং যে কেহ তাহার সংস্পর্শে আসে সেই আক্রান্ত হয়। হাঁচি কিংবা কাসির সহিত বীজাণু-গুলি বায়ুর সহিত মিশিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে অপরের নাকে প্রবিষ্ট হয়, হাত দিয়া নাক ঝাড়িয়া ও তাহা না ধুইয়া অন্য দ্রব্য স্পর্শ করিলে সেখানে বীজাণুগুলি লাগিয়া যায় ও আহারের সংস্পর্শে আসে। সামান্য সর্দ্দি বলিয়া ভ্রুক্ষেপ না করায় অসুস্থ ব্যক্তি এইরূপ অন্যের অনেক ক্ষতি করে।

সুস্থ ও অসুস্থ ব্যক্তি উভয়েরই মঙ্গলের জন্য অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত বাটীর বাহির হওয়া উচিত নয়; ইহাতে তাহার বিশ্রাম ও সেবা সুশ্রূষার খুব সুবিধা হয় ও অন্যেও রক্ষা পায়। চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা খুব ভাল।

কোনও কারণে যদি ইহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে অপরে যাহাতে এ রোগে আক্রান্ত না হয় তাহা প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তির দেখা কর্ত্তব্য। হাঁচিতে কাসিতে হইলে, মুখের উপর কিছু চাপা দিয়া মুখ ফিরাইয়া বা কিছু দূরে গিয়া তাহা করা উচিত। হাত দিয়া নাক ঝাড়িয়া প্রত্যেকবার তাহা ভালরূপে ধুইয়া ফেলা দরকার। থুথু যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নয়। বিশেষতঃ বালক-বালিকাদিগকে অসুস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে দূরে রাখা একান্ত আবশ্যক।

কয়েকটি সাধারণ চিকিৎসার বিষয় সকলের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য—

সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় অল্প গরম লবণজল নাক দিয়া টানিয়া মুখ দিয়া বাহির করা ও কুলকুচি করা উচিত। ইউক্যালিপট্যাস্ তেলের ঘ্রাণ লওয়া খুব উপকারী। দাস্ত পরিষ্কার করা ও দেহ ভালরূপে আবৃত করিয়া রাখা দরকার। মাথা ধরা বেশী থাকিলে পা গরম জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখা উচিত।

বহুমূত্ররোগের চিকিৎসা

বহুমূত্ররোগ ধনবানদের ব্যাধি; দরিদ্রেরা ইহার কবল হইতে একপ্রকার নির্ম্মুক্ত বলিলেই হয়। যাঁহারা একবার এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দেন যে তাঁহাদের অনেক মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, কাজেই এই রোগ তাঁহাদের হওয়া আদৌ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অনেকে আবার ইহাতে গৌরবান্বিতও বোধ করিয়া থাকেন!

তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন না যে তাঁহাদের আহার্য্য দ্রব্যাদির গুণের উপরই এই রোগের হ্রাসবৃদ্ধি হওয়া অনেকাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। নিম্নে দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখানো যাইতেছে, উপযোগী আহার্য্য দ্রব্যাদি ভোজনে এই রোগ কিরূপে উপশম হইতে পারে।

বাবু ললিতকুমার বসুর বয়স ৩৫; তিনি মজঃফরপুরের বসু এণ্ড কোং-র সংশ্লিষ্ট থাকিয়া কণ্ট্রাক্টারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"১৯৩১ সনের নভেম্বর মাসে আমার বহুমূত্র ব্যাধি হয়। এবং দারুণ পিপাসা মিটাইবার জন্য আমাকে বারেবারে প্রচুর জলপান করিতে হয়। আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, আমার শরীরের ওজন অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং, পূর্ব্বোক্ত উপসর্গসমূহ ক্রমাগতই বাড়িতে থাকে; পেটফাঁপা, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি ব্যাধিরও প্রকোপ বাড়িতে থাকে।

১৯৩২ সনের জানুয়ারী মাসে আমি পাটনা মেডিক্যাল কলেজ হইতে মূত্র পরীক্ষা করাই এবং দেখা যায় যে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ১০৩৫ হইয়াছে এবং মূত্রে শর্করার পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া ৫ এ গিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাকে কুঁড়ানির্ম্মিত রুটি এবং মাংস খাইয়া থাকিতে বলা হয়; আলু, চিনি, ভাত প্রভৃতি দ্রব্য যাহাতে আমি একদম স্পর্শ না করি, তাহার জন্য আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়। কিছুকাল এইরূপে থাকার পরেও আমার শারীরিক কোন উন্নতি সাধিত না হওয়ায় আমি মজঃফরপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাসন্তী চরণ সিংহের উপলক্ষানুসারে নিম্নলিখিত উপায়ে শরীরের ক্ষয় পরিপূরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হই। তিনি আমার জন্য যাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, নিম্নে তাহাই বর্ণিত হইতেছে :—

রুটি ও ভাতের পরিবর্ত্তে খোসা-সহ কাঁচকলা সিদ্ধ। সিদ্ধ হইয়া গেলে পর, কলাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কিছু মাখম, লবণ এবং লেবুর রসসহ ভোজন করা। আমি দুইবারে প্রায় ৮ টি কাঁচকলা খাইবার অভ্যাস করিয়াছিলাম।

শাক-সব্জীর মধ্যে পালং শাক, সিম, বাঁধাকপি, মূলা প্রভৃতি আহার করিতাম। এগুলিকে উত্তমরূপে মশলা দিয়া সিদ্ধ করিয়া লওয়াই আমার দস্তুর ছিল।

ডালের মধ্যে তাজা অড়হড়ের ডাল, যাহা কখনো ভাজা হয় নাই, তাহাই সাধারণ ডালের মত রান্না করিয়া খাইতাম।

প্রায় ১২ ছটাক এক বল্কা দুধের দধি প্রস্তুত করিয়া গুড় এবং পাকা কলার সাহায্যে ভোজনক্রিয়া সমাপ্ত করিতাম।

আহার্য্য দ্রব্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে জামির এবং গোড়া লেবুও ব্যবহার করিবার অভ্যাস করিয়াছিলাম।

প্রাতঃকালে জলখাবারের মধ্যে কমলালেবু, পেঁপে, কাঁচা ছোলা প্রভৃতি সম্ভবমত ব্যবহার করিতাম।

আমি মাছ, মাংস, ডিম, গম, ভাত এবং অন্যান্য শস্যাদি আহার করা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। দুইমাস এইরূপ আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া আমার পেট ফাঁপা প্রভৃতি ভোজবাজীর মত অন্তর্হিত হইল, পিপাসা এবং মূত্রের পরিমাণও অনেক কমিয়া গেল; আমিও অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলাম। পূর্ব্বে আমি যে দুর্ব্বলতার জন্য অনেক কষ্ট পাইতেছিলাম, তাহাও আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং আবার আমি পূর্ব্বের ন্যায় চলাফেরা করিতে সমর্থ হইলাম। বাসন্তী বাবু আমাকে বিশেষ ভাবে ডাক্তারী ঔষধ খাওয়া বারণ করিয়া দিয়াছিলেন; আমিও আর খাই নাই

দুইমাস তাঁহার উপদেশানুসারে কাজ করিয়া আমি আজকাল সাধারণ বাঙ্গালীর পথ্যাই আহার করিতেছি। বাসন্তী বাবুর পরামর্শমত দুই একটি খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে এখনও বাছ-

বিচার করিয়া চলিতেছি। আমার চেহারার এতটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে আমার অনেক বন্ধু পূর্ব্বের চেয়ে অনেক স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন।

বাসন্তী বাবু তাঁহাকে পাকা টমাটো, পটল, ভিণ্ডি বা ঢেঁড়স; কচিপাতাসংযুক্ত ছোলা, ঝিঙ্গা, শশা এবং সম্ভ হইলে পেঁয়াজ প্রভৃতিও কচি কচি অবস্থায় আহার করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন।

নিম্নে আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এই ভদ্রলোকের নাম শ্রীবিভাস চন্দ্র মুখার্জ্জী, বয়স ৫৮। তিনি মজঃফরপুরস্থ ঝপহা চিনির আড়তে হেড ক্লার্ক ছিলেন। তিনি প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন; তাঁহার স্বাস্থ্যও অনেক খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তিনি ডাক্তারের পরামর্শমত রুটি ও মাংস খাইতে আরম্ভ করিয়া স্বাস্থ্য আরও নষ্ট করিয়া ফেলেন। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে বাসন্তী বাবু তাঁহাকে উপরোক্ত নিয়মাবলী পালন করিয়া আহার্য্যের তালিকা অদল বদল করিয়া লইবার জন্য উপদেশ দেন। বিভাস বাবু ১৫ দিন পর্য্যন্ত একান্ত নিষ্ঠার সহিত উহা পালন করিয়া শরীরের কিছু উন্নতি সাধন করেন; কিন্তু ভাত কিংবা রুটি না খাইয়া থাকিতে না পারায় তিনি পথ্যের সঙ্গে কিছু ভাত ও কলার বন্দোবস্ত করিয়া লন। বাসন্তী বাবু তখন তাহাকে মাড় না ফেলিয়া দিয়া কুঁড়াসংযুক্ত ভাত খাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। খাদ্যাদির এইরূপ পরিবর্ত্তন এবং অত্রত্যস্থলের অসম্ভব গরম সত্বেও, বিভাস-বাবু বেশ সুস্থ হইয়াছেন; তাঁহার চেহারারও অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সময়ের মধ্যে তিনি কোন প্রকার ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করেন নাই।

উপরোদ্ধৃত দৃষ্টান্তে ইহা স্বতঃই উপলব্ধি হইবে যে মানুষের খাদ্যাখাদ্যের জন্যই সমস্ত ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এমন কি, গুড় এবং চিনি খাওয়া সত্বেও ললিত বাবুর স্বাস্থ্যোন্নতির পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। দেখা যাউক, ইহার কারণ কি।

আমরা সাধারণতঃ যাহা খাইয়া থাকি, তাহার শ্রেণী বিভাগ করিলে দেখা যায় যে শস্য প্রস্তুত আহার্য্য দ্রব্যে এসিডের পরিমাণ খুব বেশী। যবের মধ্যে সব চেয়ে বেশী এসিড আছে; বার্লিও যবের চেয়ে বেশী ভাল নহে। তৎপরে ক্রমবিভাগ অনুসারে, মাংস, গম, ডিম এবং ভাতের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত এসিডযুক্ত খাদ্য সংযোগে দেহের অভ্যন্তরেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া শরীরাভ্যন্তর্গত অ্যালক্যালিনের ভাগ ক্রমাগত হ্রাস করাইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কার্ব্বোনিক এসিডের সৃষ্টি হইয়া শরীরস্থ রক্তও দূষিত হইয়া থাকে; দেহের শোণিত ইহা দূর করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকে, অথচ আমরা তাহার পুষ্টির সমস্ত বন্দোবস্তই নিজ হাতে করিয়া দিই। শরীরের মধ্যে বেশী পরিমাণে অ্যালক্যালিন না থাকিলে, রক্তের কার্ব্বোনিক এসিডের ক্রিয়া হ্রাস করাইবার শক্তি ক্রমাগত কমিতেই থাকে; ইংরাজীতে এই অবস্থাকে "এসিডোসিস্" বলে। যখন দেহ মধ্যে কার্বোনিক এসিড বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ এই এসিডোসিসের ভাবও বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখনই বহুমূত্র, ব্রাইটের পীড়া, বুকের ব্যাধি এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক পীড়াও আসিয়া দেখা দেয়।

[শেষাংশ ১১১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অপর পক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে শাকসব্জীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যালক্যালিন বর্ত্তমান আছে; কমলালেবু, দুধ, জামির প্রভৃতির মধ্যেও ইহা বিদ্যমান। আমরা এসিড সংযুক্ত যে সমস্ত খাদ্যাদি ভোজন করিয়া থাকি, তাহার এসিডের ভাগ যদি অ্যালক্যালিনযুক্ত আহার্য্য দ্রব্যাদি দিয়া হ্রাস করাইবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্ত পীড়া সমূহ সুযোগ বুঝিয়া দেহযন্ত্রকে আক্রমণ করিতে থাকিবে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, গমের আটা, মাছ, মাংস এবং প্রচুর পরিমাণে শাকসব্জী, দুধ, কমলালেবু এবং জামির প্রভৃতি খাইলেই শরীরের অবস্থা বেশ ভালই থাকিবে। দুই আউন্স পরিমাণ মাংস এবং মাছই যথেষ্ট; কিন্তু বাঙ্গালীদের দোষ এই যে খাইতে বসিলে ১২ আউন্স কিংবা তদর্দ্ধ পরিমাণ মাংস ভোজন না করিলে আর তাহাদের পেট ভরেনা। ভাতের মধ্যে বেশী পরিমাণে এসিড বর্ত্তমান নাই; কুঁড়াযুক্ত চাউলে খ-ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। যদি বহুমূত্র রোগীর ভাত না খাইলেই চলেনা, তাঁহাকে আছাঁটা চাউলের ভাত খাইতে পরামর্শ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। রুটী এবং মাংস খাওয়া একেবারে বারণ। রোগীদের পক্ষে বার্লির মধ্যে দুগ্ধ না মিশাইয়া খাওয়া একেবারেই উচিত নহে, এবং বার্লি খাওয়া ঠিক বিষ খাওয়ার মত। বার্লি এবং সাগুর চেয়ে ভাত, ভাতের মাড় এবং দুধ খাওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। অসুখের সময় ভাতপথ্য না করিয়া আমরা আস্তে আস্তে মৃত্যুর দুয়ার খুলিয়া দিতেছি।

যাহারা বহুমূত্র রোগে অনেকদিন ধরিয়া কষ্ট পাইতেছেন এবং নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে উপরোক্ত নিয়মগুলি পালন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

হুকুমচাঁদ লাইফ্ য়্যাস্যুর্যান্স্ লিমিটেড্

ব্যবসা-জগতে যাঁহাদিগকে ইংরাজীতে বিজ্নেস্ ম্যাগনেট্ (Business Magnate) বলে,—যেমন পাশ্চাত্যদেশে আমেরিকার এন্ড্রু কর্নেগী, রক্ফেলার, হেন্‌রী ফোর্ড্, সুইডেনের ক্রুগার (পরলোক গত), জেকো স্লোভাকিয়ার টমাস্ বাটা (পরলোক গত), প্রভৃতি, ভারতেও সেইরূপ বিজ্নেস্ ম্যাগনেটের অভাব নাই। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান স্যার জাম্‌সেদ্‌জী টাটা, স্যার রাজেন্দ্র নাথ, স্যার কৌয়াস্‌জী জাহাঙ্গীর, শেঠ রামকিষণ ডালমিয়া প্রভৃতির সহিত স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

হুকুম চাঁদ লাইফ্ য়্যাস্যুর্যান্স কোম্পানীর সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অথবা জানিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে উহার প্রতিষ্ঠাতা স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদের পরিচয় আবশ্যক। এ বিষয়ে আমাদের নিজ মন্তব্যের পূর্ব্বে আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় কি বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলেন,—

"Few days ago at the invitation of Sir Sarupchand Hukumchand I went to Indore, the capital of His Highness the Holkar and stayed there as his guest. By virtue of his intelligence and genius Sir Sarupchand Hukum chand is one of the biggest mill-owners in India. His jute mill on the bank of the river Hoogly is the largest jute mill in India. Besides the general manager, who is a European, there are highly paid English and Indian officers. In his Electric Steel Works at Ballyganj, steel castings are manufactured by electric melting process. At the end of the great war when the Government of India issued war bonds Sir Sarupchand Hukumchand was the first Indian to subscribe bonds worth one crore of rupees. It will be superfluous to mention about the immense wealth of a man, who could part with such a huge sum from his purse in cash within twentyfour hours,

HUKUMCHAND **Life Assurance Company, Ltd.** * * * * is another concern of Sir Sarupchand Hukumchand. The Board of Directors is formed by taking representatives from different nationalities of the country. Sir Sarupchand Hukumchand is the chairman of the Board. Hukumchand Life Assurance Company though not the biggest life office in India, there is no doubt in the fact that Hukumchand life is a dependable office in all respects."

বঙ্গানুবাদ,—"কিছুদিন পূর্ব্বে স্যার স্বরূপ চাঁদ হুকুমচাঁদের নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া আমি তাঁহার অতিথি স্বরূপ মহারাজা হোলকারের রাজধানী ইন্দোর নগরে অবস্থান করিয়াছিলাম। স্বীয় বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ মিল-ওনার (কলকারখানার মালিক) হইয়াছেন। গঙ্গার ধারে তাঁহার জুটমিল (চট্-কল) ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সেখানে ইউরোপীয় জেনারেল ম্যানেজার ব্যতীত বহু সংখ্যক উচ্চ বেতন-ভোগী ভারতীয় ও ইংরাজ কর্ম্মচারী আছেন। তাঁহার বালীগঞ্জস্থিত ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল্ ওয়ার্কস্ কারখানায় বৈদ্যুতিক-দ্রাবণ পদ্ধতি অনুসারে ইস্পাতের ঢালাই জিনিস তৈয়ারী হইয়া থাকে। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের শেষে ভারতগবর্ণমেণ্ট্ যখন ওয়ার-বণ্ড্ (War-bond) ইস্যু করেন, তখন স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদই সর্ব্বাগ্রে এক কোটী টাকা মূল্যের ওয়ার-বণ্ড্ গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজ তহবিল হইতে এত অধিক টাকা অনায়াসে বাহির করিয়া দিতে পারেন তাঁহার বিপুল সম্পত্তির কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। হুকুমচাঁদ লাইফ্ য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেড্, স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদের আর একটী বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে উপযুক্ত প্রতিনিধিগণকে লইয়া ডিরেক্টার বোর্ড (পরিচালক সংঘ) গঠিত হইয়াছে। স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ উক্ত ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান। হুকুমচাঁদ লাইফ য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানী যদিও দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বীমার কারবার নহে, তথাপি ইহা যে সকল বিষয়ে নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

আচার্য্য স্যার পি, সি, রায়ের এই অভিমতের উপর আর কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদের শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই কয়েকটী কথাতে রহিয়াছে। কিন্তু ধনী ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণ দেখাইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। তাঁহার ধনরাশি কিভাবে ব্যয়িত হইতেছে, তাহাও জানা আবশ্যক। জনসাধারণের উপকারার্থে বিবিধ প্রতিষ্ঠানে স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদের দানের পরিমাণ প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে লেডী চেম্‌স্ ফোর্ড হাসপাতাল, এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অর্থদানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের নানাস্থানে তিনি বহুসংখ্যক বিদ্যালয়, হাসপাতাল, অনাথ নিবাস, ধর্ম্মশালা

বিধবাশ্রম এবং দেবমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার কলকারখানায় এবং কাজ কারবারে অর্দ্ধলক্ষ ব্যক্তি জীবিকা অর্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছে। নিম্নে স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদের দশটী প্রধান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম লিখিত হইল,—

(১) হুকুমচাঁদ মিলস্ ইন্দোর।
(২) রাজকুমার মিলস্; ইন্দোর।
(৩) কল্যাণমল মিলস্; ইন্দোর।
(৪) এষ্টেট্ মিলস্; ইন্দোর।
(৫) হীরা মিলস্; উজ্জয়িনী।
(৬) হুকুমচাঁদ জুট্ মিলস্; নৈহাটী।
(৭) হুকুমচাদ ইলেক্ট্রিক ষ্টীল ওয়ার্কস্; বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
(৮) হুকুমচাদ ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানী, কলিকাতা।
(৯) হুকুমচাঁদ লাইফ য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানী; কলিকাতা।
(১০) স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ জিনিং ফ্যাক্টরী, কানোজ, মধ্যভারত।

এই তালিকা হইতেই বুঝা যায় স্যার স্বরূপচাদ হুকুমচাঁদের ব্যবসার ক্ষেত্র কতদূর প্রসারিত এবং কি পরিমাণ সম্পদশালী।

স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদের মত এইরূপ একজন ধনী এবং ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যে বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা, সহায়ক ও পরিচালক সেই কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা যে সুদৃঢ় এবং পলিসি হোল্ডারদের পক্ষে সেই কোম্পানী যে একান্ত নিরাপদ তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। তথাপি আমরা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য হুকুমচাঁদ লাইফ য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর গঠনের পরিচয় নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিলাম,—

পরিচালক সঙ্ঘ (বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্)

স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ কেটি, সভাপতি।

স্যার মহম্মদ সা-দুল্লা কেটি, এম, এ, বি, এল।
আসাম গভর্ণরের কার্য্যকরী সভার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি।

রায় মাংটুলাল তাপুরিয়া বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত বাবু চম্পালাল জাটিয়া।

শ্রীযুক্ত বাবু শিউকিশন ভট্টর।

শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু, এম, এ, বি এল,
কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র।

কার্য্যাধ্যক্ষ (ম্যানেজিং এজেন্টস)

স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ এণ্ড কোং, কলিকাতা।

কর্ম্মসচিব বা সেক্রেটারী

এ, এন, ব্যানার্জ্জী।

বর্ত্তমান সময়ে জীবনবীমার যতরকম প্রণালী উদ্ভাবন হইয়াছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুফলপ্রদ, সুন্দর ও সহজ উপায়ে জীবনবীমার কার্য্য করিয়া জনসাধারণের উপকার করিবার জন্যই হুকুমচাঁদ লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় মূলধনে ও ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া দেশবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করাই ইহার লক্ষ্য। ইহার কার্য্যপ্রণালী বা পদ্ধতি ও নিয়মাবলী নানা প্রকারের আছে। তাহা যে ভাবে বিধিবদ্ধ করা আছে তাহাতে যাহার যে প্রকার রুচি, অবস্থা, বা প্রবৃত্তি হউক না কেন সকলেরই সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ ইহার প্রিমিয়াম অর্থাৎ চাঁদার হার এত কম যে সকল শ্রেণীর লোকেই ইহা অনায়াসেই দিতে পারেন। বর্ত্তমান প্রণালী সুন্দর হইলেও এই কোম্পানী জনসাধারণের অধিকতর সুবিধাজনক উপায় উদ্ভাবনের জন্য সতত সচেষ্ট। পলিসি অর্থাৎ বীমাপত্র যাহাতে বাজেয়াপ্ত না হয় সে বিষয়ে কোম্পানী বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বীমাকারীগণকে অনেক সুযোগ ও সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

কোম্পানীর চিরস্থায়ীত্বের নিদর্শনস্বরূপ অথবা দীর্ঘজীবন কামনায় ইণ্ডিয়ান ট্রাষ্ট এ্যাক্ট্ অনুযায়ী তাহাদের লাইফ্ ফণ্ডের শতকরা ৬৫৲ টাকা কোম্পানীর কাগজ বা এইরূপ বিশ্বাসী লগ্নিতে সংরক্ষিত থাকে। সুতরাং তহবিল সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।

আমরা আশা করি, জীবন বীমা করণেচ্ছু জনসাধারণ এই কোম্পানীর সুবিধা গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইবেন।

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের জন্য দুইখানি করিয়া **টেণ্ডার** আহ্বান করা যাইতেছে এবং উহার প্রত্যেকখানির জন্য নির্দিষ্ট তারিখে **বেলা ২টা** পর্য্যন্ত **২য় ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার** কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। প্রত্যেক টেণ্ডার দুইখানি করিয়া শীলমোহরাঙ্কিত খামে পুরিয়া তাহার উপর "............জন্য টেণ্ডার" লিখিয়া দিতে হইবে। বিশদ বিবরণাদি ও টেণ্ডার ফরমের জন্য সেনট্রাল রেকর্ড কীপারের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। প্রতি সেটের মূল্য দুই টাকা।

১। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোডে ২৬টী হাই পাওয়ারের ইলেকৃট্রিক্ ল্যাম্প সংস্থাপন।

২। ইলিয়ট রোড এবং রয়েড ষ্ট্রীটে ১৬টী হাই পাওয়ারের ইলেক্‌ট্রিক্ ল্যাম্প সংস্থাপন।

৩। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য পেণ্টস্ ও বার্নিশ সরবরাহ এবং ডেলিভারী দেওয়া।

৪। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য মাইল্ড ষ্টীল সেকসন্স চেকার্ড প্লেটস ইত্যাদি সরবরাহ ও ডেলিভারী দেওয়া।

৫। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য পেট্রোল সরবরাহ ও ডেলিভারী দেওয়া।

৬। ১৯৩৮-৩৯ সালের ফাষ্ট ক্লাস হাড কোক্ ও স্মিথি কোল সরবরাহ।

৭। এস্‌ফাল্টাম পেভিং-এর জন্য ২ হইতে ৩ ইঞ্চি গজ, হার্ড ষ্টোন ব্যাল্যাষ্ট সরবরাহ।

৮। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য ইণ্টালী ওয়ার্কশপে ইণ্ডিয়ান পিগ আয়রণ সরবরাহ।

৯। ১-১-৩৮ হইতে এক বৎসরের জন্য খড় সরবরাহ।

১০। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য হেয়ার ও লেদার বেল্টিংস সরবরাহ।

১১। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য ঘোড়ার সাজের নামদা এবং চামড়ার জিনিষ সরবরাহ করা।

১২। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য পাইপস্ ও ফিটিংস সরবরাহ।

১৩। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য হার্ডওয়ার এবং হাঞ্জনীয়ারিং ষ্টোরস্ সরবরাহ।

১৪। সুবার্ব্বস হেড কাট-এ রিফ্লাক্স গেট অপসারণ।

১৫। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য mother binders সরবরাহ।

১৬। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য প্রিন্টিং ষ্টেশনরী সরবরাহ ও ডেলীভারী দেওয়া।

১৭। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য আফিস ষ্টেশনারী সরবরাহ ও ডেলিভারী দেওয়া।

১৮। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য টাইপ রাইটিং

ও ডুপ্লিকেটিং দ্রব্যাদি সরবরাহ ও ডেলিভারী দেওয়া।

১৯। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য ড্রইংএর দ্রব্যাদি সরবরাহ ও ডেলিভারী দেওয়া।

২০। ৪ ইঞ্চি ও ৬ ইঞ্চি সি-আই পাইপস্ সরবরাহ করা।

১ ও ২নং টেণ্ডারসমূহ ২১-১-৩৮ তারিখে ৩ ও ৪ নং টেণ্ডারসমূহ ২২-১-৩৮ তারিখে, ৫ ৬ ও ৭নং টেণ্ডারসমূহ ২৫-১-৩৮ তারিখে, ৮ ও ৯ নং টেণ্ডারসমূহ ২৬-১-৩৮ তারিখে, ১০ ও ১১নং টেণ্ডারসমূহ ২৭-১-৩৮ তারিখে, ১২ ও ১৩ নং টেণ্ডারসমূহ ২৮-১-৩৮ তারিখে, ১৪ ও ১৫ নং টেণ্ডারসমূহ ২৯-১-৩৮ তারিখে, ১৬ ও ১৭ নং টেণ্ডারসমূহ ১-২-৩৮ তারিখে এবং ১৮, ১৯ ও ২০ নং টেণ্ডারসমূহ ২-২-৩৮ তারিখে খোলা হইবে।

১, ২ ও ১৪নং টেণ্ডারসমূহে যে দর দেওয়া হইবে তৎসমুদয় ২ মাসের জন্য এবং ৩ হইতে ১৩ এবং ১৫ হইতে ২০নং টেণ্ডারসমূহে যে দর দেওয়া হইবে, তৎসমুদয় ৩ মাসের জন্য বলবৎ থাকিবে।

বি, ভি, রামিয়া,

সেক্রেটারী। ৫-১-৩৮

অথ যজমান পুরোহিত সংবাদ

পুরোহিত দিবাকর তর্কচঞ্চু রাজ যক্ষ্মা রোগে শয্যাশায়ী যজমানকে দেখিতে গিয়াছেন; আসল উদ্দেশ্য যজমান ত যায়, এখন শেসকালে যদি কিছু দাঁও মারা যায়!

যজমানের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া খানিক আহা উহু করিয়া শেষে শ্লোক আওড়াইয়া বলিলেন,—

দেখ বাবা! তোমার দশা এখন দেখ্‌ছি— "জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্"

অর্থাৎ কিনা,—"কাশ্যপেয়ং" কিনা কেশে কেশে তোমার চোখ্‌ দুটী "জবাকুসুম সঙ্কাশং" কিনা একেবারে জবাকুসুমের মত লাল হ'য়ে উঠেছে এবং তার জন্যে কিনা "মহাদ্যুতিং" অর্থাৎ কিনা মহা সঙ্কটকাল উপস্থিত হ'য়েছে।

অহো! "ধ্বান্তারিং" অর্থাৎ কিনা এখন স্বয়ং ধন্বন্তরী এলেও আর তোমার রক্ষে নেই বাবা!—

"সর্ব্ব পাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরং"

সমস্ত পাপ থেকে যদি এখন মুক্তি পেতে চাও তবে বাবা শাস্ত্রে যা বলেছে,—তোমার কুল পুরোহিত এই দিবাকর তর্কচঞ্চুকে সব টাকাকড়িগুলি প্রণামী দিয়ে যাও।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৭শ বর্ষ | ফাল্গুন---১৩৪৪ | ১১শ সংখ্যা

বিজলী বাতি প্রস্তুত শিল্প

আধুনিক যুগে একপ লোক অতি বিবল যাঁরা বিজলী বাতিব নাম শোনেন নি। বস্তুতঃ এমন লোক যদি কেউ থাকেন তা’হ’লে তাঁকে আর আমবা সহুবে লোক বলি না। যে-সমস্ত যায়গায় আমরা দেখি যে বিজলী বাতি আব পাখা রয়েছে, ট্রাম চলছে—মোটর দৌড়ুচ্ছে, অধিবাসীরা পাণীয়ের জন্য কলের (পরিষ্কৃত) জল পাচ্ছে,---সে-সমস্ত যায়গাকে আমরা বলি সহর। আর যে সব স্থানে ঐগুলিরই অভাব অনুভূত হয় তাদের আমরা বলি পল্লী। পল্লী সভ্যতা ও সহর সভ্যতার এই যে প্রভেদ ও তারতম্য, এ বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি। বস্তুতঃ সহরকে গ্রামাভিমুখী করে তোলার মত বোকামী আর কিছু নেই—গ্রামকে সহরাভি-মুখী করে তোলাতেই মানবের প্রকৃত কল্যাণ।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, সহরের অধিবাসী মাত্রই বিজলী বাতিব সঙ্গে পরিচিত। অপরাপর শিল্পের মত এই বিজলী বাতি (Electric Bulb) প্রস্তুত করাও একটি প্রকাণ্ড ব্যবসা। আমদানীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে ভারতে ১৯২৯-৩০ সালে ২৬ লক্ষ টাকার বিজলী বাতি কেবলমাত্র গৃহস্থের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল; ১৯৩০-৩১ সালে সে-অঙ্ক পৌঁছয় ৪৭ লক্ষ টাকায়। সহরকে যারা গ্রামাভিমুখী করে তোলবার জন্য তারস্বরে চীৎকার জোড়েন তাঁদের এটা বোঝা উচিত যে তা’ করলে বিজলী বাতি এবং আনুসঙ্গিক অপরাপর শিল্প একেবারে ফেল পড়বে। কিন্তু তা’ না করে গ্রামকে যদি সহরাভিমুখী করে তোলা যায় তাহলে ঐ বিজলী বাতি শিল্পের ৪৭ লক্ষ টাকার অঙ্ক ৪৭ কোটি টাকায় পৌঁছানো বিচিত্র নয়। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে দেশকে·

শিল্প প্রধান করে তুললে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে দেশের জনসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে ওঠে। বিজলী বাতি প্রস্তত শিল্পও একটি প্রকাণ্ড শিল্প, তা' সংরক্ষণ কিংবা প্রসারণের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত।

আমাদের দেশে শিল্প-জাগরণের ইতিহাস বেশী দিনের নয়। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ার দরুণ তার নিজ দেশে উৎপন্ন কাঁচামাল বিদেশে পাঠিয়ে তার বিনিময়ে আবশ্যকীয় "ফিনিস্‌ড-গুড্‌স্‌" বা তৈরী মাল আমদানী করত। কিন্তু অল্পে অল্পে এখানেও নানারকম শিল্প-ফ্যাক্টরী গড়ে উঠেছে এবং উঠছে, কেননা, দেশের মূলধনী সম্প্রদায় দেখেছে যে দেশের

মধ্যে যেখানে বিরাট বিক্রয় বাজার পড়ে রয়েছে সেখানে যদি মূলধন দেশীয় শিল্পোন্নতিতে নিয়োগ করা যায় তাহলে লাভবান হওয়া যাবে। অবশ্য একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানাদির উন্নতিকল্পে দেশের মূলধনী-সম্প্রদায় তেমনভাবে অগ্রসর হননি যেমন ভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, তবুও একথাও মানতে হ'বে যে দেশে ক্রমশঃ শিল্পোন্নতির একটা সাড়া জেগেছে। প্রকৃতি-দত্ত সুবিধা যাদের নেই সে-সব দেশের পক্ষে অপর দেশের ওপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, কিন্তু পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকা কোনখানেই সম্পদের লক্ষণ নয়। ভারতবর্ষে যখন প্রাকৃতিক সমস্ত সুবিধা বর্ত্তমান রয়েছে তখন সে যদি তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার না করে তবে তার পক্ষে নিতান্ত বোকামীর পরিচয় দেওয়া হ'বে। সেইজন্যই দেশে আজ শিল্প প্রসারণের এত সাড়া জেগেছে।

দরিদ্র ভারতবাসীর কুটিরে কুটিরে আজও মৃৎপ্রদীপের দীপমালা শোভা পায়, কেননা, বিজ্ঞানের বাহাদুরীর সেখানে প্রবেশলাভ ঘটেনি। কিন্তু ঐ জরাজীর্ণ কষ্ট লাঞ্ছিত পল্লীসভ্যতার কিনারে কিনারে একপ্রকার অভিজাত সহর-সভ্যতা বিরাজ করে যেখানে বিজ্ঞানের বাহাদুরী লোকের চোখ ধাঁধায়। বিজলীবাতি সেই সহর-সভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিজ্ঞানের নানারকম জয়-গৌরবের মধ্যে বিজলীবাতি অন্যতম। প্রাচ্যের কথা ছেড়ে দিলে ইউরোপের পক্ষে এই বিজলীবাতি-শিল্প মোটেই শিশু শিল্প নয়, তবে বহুদিন পর্য্যন্ত এর কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। এই উন্নতি না হওয়ার কারণ কাঁচ শিল্পীদের সংস্কারবদ্ধতা। সকলেই জানেন যে, বিজলী বাতির অত্যাবশ্যকীয় অংশ হ'ল তার কাঁচের আধার; কিন্তু ইউরোপের কাঁচ শিল্পীরা বহুদিন যাবং নিজেদের পুরাতন যন্ত্রপাতি ছাড়া উন্নতিধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে চাইত না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তারা তাদের ঐ অন্ধ সংস্কার ত্যাগ করে এবং তারপর থেকেই বিজলীবাতির উন্নতিকরণের প্রতি শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকদের নজর পড়ে। পূর্ব্বের অর্থাৎ আবিষ্কারের প্রারম্ভের যে বিজলীবাতি, তার ফিলামেণ্ট্ অর্থাৎ কাঁচের ভেতরকার পাকানো তার পদার্থটি অঙ্গার (Carbon) উপাদানে প্রস্তুত হ'ত। কিন্তু অঙ্গার জনিত ফিলামেণ্ট্ যুক্ত বাতির আলো উজ্জ্বল নয়, ম্যাড়্মেড়ে লালচে ধরণের, কেননা, উক্ত কার্ব্বন ফিলামেণ্ট্ বেশী তাপ সহ্য করতে পারে না। অথচ বেশী তাপে ফিলামেণ্টটি যত উত্তপ্ত হ'বে আলো তত খুলবে। সুতরাং এমন একটি ধাতুর আবিষ্কার প্রয়োজন হ'য়ে পড়ল যা' কার্ব্বনের চেয়েও বেশী ডিগ্রির উত্তাপ সহ্য করতে পারে এবং তার ফলেই Tungsten ধাতু আবিষ্কৃত হয়। এই ধাতু, অঙ্গার যে তাপে গলে তার চেয়ে ঢের বেশী তাপে গলিত হয়, সুতরাং অঙ্গারের চেয়ে অধিক তাপ সহ্য করতে পারে। কাজে কাজেই Tungsten ধাতুর ফিলামেণ্টের আলো অধিক উজ্জ্বল ও শুভ্র হয়।

বিজলী বাতি (Electric Bulb) উৎপাদনে মনোনিবেশ করতে গেলে প্রথমেই লক্ষ্য করা দরকার কি কি উপাদানে তা'

গঠিত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে বিজলী বাতি প্রস্তুতের জন্য একটা কাঁচের আবরণী (Glass Bulb), ধাতুর ফিলামেণ্ট্ এবং ঐ ফিলামেণ্ট্‌কে বাতির ভেতরে যথাস্থানে সংলগ্ন রাখবার জন্য একটি কাঁচের আধার (টেক্‌নিক্যাল ভাষায় তাকে foot বলা হয়), ও বাতির মুখে লাগাবার জন্য পিতল কিংবা তামার ক্যাপের প্রয়োজন। আলো জ্বালবার প্রয়োজন হ'লে সুইচ টিপলেই ইলেক্‌ট্রিক্ কারেণ্ট গিয়ে ঐ কাঁচের ভিতরকার ফিলামেণ্ট্‌কে ভয়ানক উত্তপ্ত করে এবং তার ফলেই ঐ ফিলামেণ্টের তার থেকে আলো বেরোয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে, যখন কার্ব্বন দ্বারা ফিলামেণ্ট্ প্রস্তুত হ'ত তখন আলো লালচে হ'ত, কেননা, কার্ব্বন বেশী উত্তপ্ত হ'তে পারতো না। যে প্রয়োজনীয় উত্তাপে আলো খুব উজ্জ্বল হয়, সে-উত্তাপে কার্ব্বন গলে যায়; কিন্তু Tungsten ধাতুর ফিলামেণ্ট্ ব্যবহার করলে তা' বেশী উত্তাপ সহ্য করতে পারে এবং সেইজন্যই তার আলো খুব উজ্জ্বল হয়। কোন কোন বাতির অভ্যন্তর প্রায় বায়ুশূন্য থাকে, আবার কখনো কখনো এক প্রকার গ্যাস-তার ভেতর ভরে দেওয়া হয়।

বাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে ফিলামেণ্ট্। এই ফিলামেণ্ট Tungsten ধাতুতে প্রস্তুত। উক্ত Tungsten ধাতু একেবারে পরিষ্কার অবস্থায় পাওয়া যায় না, তাকে ধাতুপদার্থ (Ore) হ'তে আলাদা করে নিতে হয়। নানারকম কেমিক্যাল প্রক্রিয়ার দ্বারা উক্ত ore-কে Tungstic

oxide-এ পরিণত করা হয়, তারপর সেই অক্সাইড্‌কে হাইড্রোজেনের আবহাওয়ার মধ্যে ১০০০° সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করলে গুঁড়া Tungsten ধাতু পাওয়া যায়। এই ধূসর রঙের গুঁড়া ধাতু থেকে তার প্রস্তুত করা আশাপ্রদ নয়, সেইজন্য দু'টি ইস্পাতের সরু ছাঁচের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ গুঁড়া রেখে হাইড্রলিক্‌ প্রেসে চাপ দেওয়া হয় এবং তাতে Tungsten ধাতুর ছোট ছোট সরু রড্‌ পাওয়া যায়। হাইড্রোজেনের আবহাওয়ার মধ্যে ১৫০০—১৬০০ এ্যাম্পেয়ারের কারেণ্ট্‌ যদি ঐ রডের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো যায় তবে ঐ গুঁড়াগুলি পরস্পর একেবারে জমাট বেঁধে থাকে। উক্ত প্রকারে প্রাপ্ত ধাতুকে Slug Tungsten বলে এবং ঐ Slug Tungsten কে হাতুড়ি দ্বারা পিটে আরও শক্ত করা হয়। এই হাতুড়ি পেটার ব্যাপারটা আমরা কল্পনা করতেই পারি না—একটি মেসিনের মধ্যে, রোটারী হ্যামার' রয়েছে এবং তা' মিনিটে ৪০০০ থেকে ৫০০০ বার ঘা দিচ্ছে। তারই মধ্যে উত্তপ্ত, সরু Slug Tungsten এর রড্‌কে ঢোকানো হয় আর টেনে নেওয়া হয়—তাতে করে উক্ত রড্‌ যে শুধু শক্ত করে পেটাই হয়ে যায় তা' নয়, পরন্তু তা' লম্বা হয়ে সরু তারে পরিণত হয়ে থাকে।

কিন্তু উক্ত রূপে প্রাপ্ত তার ফিলামেণ্ট্‌ প্রস্তুতের উপযোগী নয়—কারণ তা' ৩০ ফিট লম্বা এবং $\frac{1}{২৫}$ ইঞ্চি ঘন-বেষ্টনীযুক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং তাকে আরও সরু করবার জন্য draw-plate-এর diamonddies-এর ভেতর দিয়ে টানা হয়ে থাকে। যে die গুলির মধ্য দিয়ে টানা হবে সেগুলি পরপর অপেক্ষাকৃত কম ছিদ্রবিশিষ্ট এবং তারটিকে একটির পর একটি die এর মধ্য দিয়ে টানলেই অবশেষে আবশ্যকীয় সরু তার পাওয়া যায়। স্বাভাবিক তাপেও এ ব্যাপার সম্পন্ন হতে পারে কিন্তু draw-plate টিকে উত্তপ্ত করলে কাযের সুবিধা হয়। ৬ ইঞ্চি লম্বা ও $\frac{1}{৪}$ ঘন বেষ্টনীর একটি ছোট রড্‌ থেকে ৪ মাইল লম্বা ফিলামেণ্ট্‌ প্রস্তুতের উপযোগী তার পাওয়া যায়; তা' খুব সরু হয়—তার ঘন পরিধি হচ্ছে ০০০০৬ ইঞ্চি, সুতরাং এর থেকেই বোঝা যায় তা' কত সরু হয়ে থাকে। এই তারকে গ্রাফাইট্‌ এবং সামান্য পরিমাণ অক্সাইড-এর সাহায্যে ব্লু-ব্ল্যাক্‌ রড্‌ কর হয় এবং ইলেক্‌ট্রিক্‌ তাপের সাহায্যে পুড়িয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি যে বিজলী বাতির ফিলামেণ্ট্‌ ছাড়া আর একটি প্রধান অংশ হচ্ছে ফুট্‌ যার মধ্যে ফিলামেণ্ট্‌টি আট্‌কানো থাকে। এই ফুট্‌টি আর কিছুই নয়, একটি কাঁচের অংশ যা ফিলামেণ্ট্‌ এবং অপরাপর বস্তুগুলিকে একসঙ্গে জুড়ে রাখে। একটি বড় কাঁচের নলকে আবশ্যকীয় সাইজ অনুযায়ী দাগ দিয়ে টুক্‌রো করে কাটা হয় এবং সেই টুকরো অংশের একটা মুখ গ্যাস্‌-ফ্লেমের সাহায্যে চওড়া করা হয়। এই কাটা এবং চওড়া করার ব্যাপার সমস্তই মেসিন সাহায্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পরে অপর একটি মেসিনের মধ্যে ঐ টুকরো অংশ, একটু তার (যেটার মধ্য দিয়ে কারেণ্ট প্রবেশ করে) ও আর একটি টুক্‌রো কাঁচের রড্‌ প্রযুক্ত করা হয় এবং সবগুলিকে গ্যাসফ্লেমের সাহায্যে জোড়া হয়। ঐ কারেণ্ট্‌

বহনের তারটি পূর্ব্বে প্ল্যাটিনামের হ'ত কিন্তু প্ল্যাটিনাম বহুমূল্যবান বলিয়া ব্যবসায়ীরা তৎপরিবর্ত্তে অন্য বস্তু ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করে। নিকেল, ইস্পাত ও তামার মিশ্রণে প্রস্তুত একপ্রকার দ্রব্যের তার, এখন প্ল্যাটিনামের বদলে ব্যবহৃত হয়। পরে ঐ ফুটের মধ্যে গ্যাস্ ফ্লেমের সাহায্যে Molybdenum hook সংযুক্ত করা হয় এবং ঐ হুকের মধ্যেই ফিলামেণ্ট্ টিকে আটকানো হয়ে থাকে।

এইবার সমস্ত বস্তুটিকে কাঁচের আধার অর্থাৎ বাল্‌ব সাহায্যে আচ্ছাদিত করবার ব্যাপার। যে তার দিয়ে কারেণ্ট্ প্রবেশ করবে সেই তারটি ফুটের একপ্রান্তে সংলগ্ন থাকে এবং উহার একদিক থাকে ক্যাপের সঙ্গে যুক্ত ও অপর দিক থাকে ফিলামেণ্টের সঙ্গে যুক্ত। তৎপরে ঐ সমুদয় বস্তুটিকে বাল্‌বের মধ্যে 'শীল' করে দেওয়া হয়।

আমরা উপরে বিজলীবাতি উৎপাদনের প্রণালী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি, তার থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে বিজলীবাতি উৎপাদন করা এমন কিছু শক্ত ও জটিল ব্যাপার নয় এবং এর জন্য খুব বেশী মূলধনেরও প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে পূর্ব্বে মোটেই বিজলীবাতি উৎপাদিত হ'ত না, বর্ত্তমানে তা' উৎপাদন করবার কয়েকটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তার উৎপাদন পরিমাণ আমাদের চাহিদার তুলনায় ঢের কম। সুতরাং আমাদের দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ আছে। তবে আমাদের ব্যবসার পক্ষে একটা প্রধান অন্তরায় হচ্ছে জাপানী প্রতিযোগিতা। আমাদের বিজলীবাতি উৎপাদনকারীরাও জাপানী প্রতিযোগিতার জন্য ভয়ঙ্কর ঘা খাচ্ছে—সেদিকে ব্যবসায়ীদের ও গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমাদের এই শিল্পটিকে রক্ষা করে এর প্রসারতা ঘটানো যায় তাহ'লে দেশের বহু লক্ষটাকার সাশ্রয় হয় এবং অনেক বেকার কাজ পায়। এবিষয়ে আমরা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এখানে বিজলীবাতি সম্পর্কে একটা তথ্য জানানো দরকার। সকলেই জানেন যে, বালবের ভেতরটা বায়ুশূন্য থাকতো, কিন্তু তাতে বাতি বেশীদিন টিকতো না। সেইজন্য বৈজ্ঞানিকরা বহু গবেষণার পর বাতির ভিতরে inert gas ভরে দেবার ব্যবস্থা করেছেন, বর্ত্তমানে উন্নত ধরণের বাতিগুলি আর বায়ুশূন্য থাকে না, তারমধ্যে inert gas ভরা থাকে।

আর্থিক সংবাদ

গত ২২ শে নবেম্বর চট্টগ্রামের মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের একটী ব্রাঞ্চ কলিকাতায় ১৫ নং ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটে খোলা হইয়াছে। ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা সেই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং মিসেস্ জে এম্ সেন গুপ্ত উহার উদ্বোধন কার্য্য করেন।

—✣—

গত ১৫ই নবেম্বর ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটী ব্রাঞ্চ আফিস বেলিয়া-ঘাটায় খোলা হইয়াছে। স্বাধীন ত্রিপুরার প্রধান বিচারপতি মিঃ কে সি নাগ সেই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

—✣—

কার্য্য প্রসার হেতু ক্যাল্‌কাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের হেড্ আফিস হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে ক্লাইভ্ রোতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

—✣—

৮৯ নং হ্যারিসন রোড্ কলিকাতা এই ঠিকানায় নোয়াখালী নাথ ব্যাঙ্কের একটী ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের মোট ১২টী ব্রাঞ্চ স্থাপিত হইল।

—✣—

৯নং ঠাকুর বাড়ী রোড্ (কলিকাতা ভবানীপুর) এই ঠিকানায় নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দক্ষিণ কলিকাতা ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে। জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রার মিঃ এন্ কে মজুমদার এম্ এ, জি ডি এ, উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

—✣—

গত ১৯শে নবেম্বর পাবনা সহরে কুমিল্লা ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের একটী ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে। শীতলাইর জমিদার শ্রীযুত যোগেন্দ্র নাথ মৈত্র উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন।

—✣—

গত ৩০শে নবেম্বর পাটনা (মোরাদপুর) বি এন কলেজের সম্মুখে এক প্রশস্ত গৃহে বহুগণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে নোয়াখালি নাথ ব্যাঙ্কের একটী ব্রাঞ্চ আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্যার নারায়ণ অরোরা উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন।

—※—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে ১২ নং ডালহৌসী স্কোয়ারস্থিত ক্যালকাটা পিপল্‌স্ ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রসারের জন্য তাঁহারা আপিস দোতালা হইতে একতলার এক প্রশস্ত গৃহে স্থানান্তরিত করিতেছেন। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ধনী এবং ব্যাঙ্কার মিঃ রমানাথ দাশ ও মিঃ নীলকৃষ্ণ রায় এই ব্যাঙ্কে আসিয়া যোগদান করায় এবং যথাক্রমে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করায় ব্যবসায়ী মহলে পিপল্‌স্ ব্যাঙ্কের নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

গত ১২ই ডিসেম্বর ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক্ গয়াতে একটি ব্রাঞ্চ্ খুলিয়াছেন। বিহার প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী অনারেবল বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ তাহার উদ্বোধন-উৎসবে সভাপতিত্ব করেন।

গত ৮ই ডিসেম্বর সিউড়ীতে (বীরভূম) পাইওনীয়ার ব্যাঙ্কের একটী ব্রাঞ্চ্ খোলা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এ সি দত্ত এম্ এ, বি এল্, এম্ এল্ এ, উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। জেলা জজ্ মিঃ বি কে গুহ আই সি এস্ উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের এজেণ্ট মিঃ এন্ কে চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ব্রাঞ্চ্ আফিস পরিচালিত হইতেছে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম রিজার্ভ্ ব্যাঙ্ক্ য়্যাক্ট্ অনুসারে কলিকাতার নাথ ব্যাঙ্ক্ সম্প্রতি সিডিউল ভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। যাহা পূর্ব্বে নোয়াখালী নাথ ব্যাঙ্ক্ নামে পরিচিত ছিল, তাহারই নাম এখন হইয়াছে নাথ ব্যাঙ্ক্। এই ব্যাঙ্ক্ ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে ক্রমশঃ বৃহৎ ও প্রসারিত হইতেছে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন কলিকাতা আফিসের জন্য নিজস্ব বাড়ী তৈয়ারী করিবার আয়োজন করিতেছেন। এতদুদ্দেশ্যে ৪নং ক্লাইভ্ ঘাট ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি বন্দোবস্ত লওয়া হইয়াছে। বাড়ী নির্ম্মাণের খরচ হইবে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

গত ১৭ই ডিসেম্বর মাননীয় নবাব মশারফ্ হোসেন ১৩নং ক্লাইভ্ রো, কলিকাতা এই ঠিকানায় কমৃবেড্ ব্যাঙ্কের কলিকাতা ব্রাঞ্চ্ আফিসের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন।

গত ১৩ই ডিসেম্বর ১৫০নং রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা এই ঠিকানায় বৃটিশ ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কিং করপোরেশান নামে একটি নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্যার হরিশঙ্কর পাল ইহার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রীযুক্তা মাধুরী গুহ ঠাকুরতা নাম্নী বাঙ্গালী মহিলা কর্ত্তৃক এই ব্যাঙ্কটী গঠিত হয়। ইতিপূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী মহিলা ব্যাঙ্ক্ স্থাপনের উদ্বোধন কার্য্য করেন নাই।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক অথবা পাঠকদিগের মধ্যে যদি কাহারও কোনও জিনিষ বেচিবার বা কিনিবার দরকার থাকে, তবে তাহা আমাদিগকে জানাইলে আমরা বিনামূল্যে আমাদের "ব্যবসায়ের সন্ধান" নামক অধ্যায়ে তাহা আমূল প্রকাশ করিব। এজন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোনও চার্জ্জ লইব না। নাম, ধাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং চিঠি পত্রাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। সম্পাদক
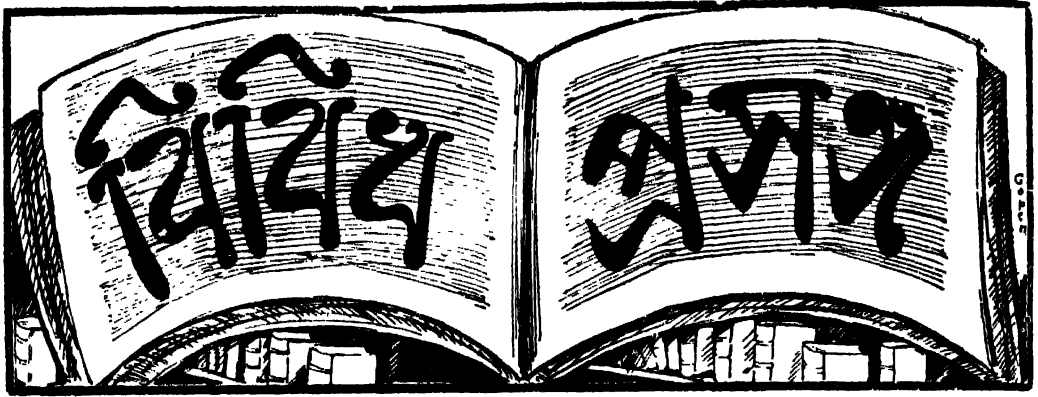
ধানের তুষের নূতন ব্যবহার

জাপানে রেঁয়ন-সূত্র হইতে বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ইহার জন্য প্রতিবৎসর জাপানে তিন লক্ষ টন রেঁয়ন মণ্ড (Rayon Pulp) প্রয়োজন। এই তিন লক্ষ টনের মধ্যে আড়াই লক্ষ টন বিদেশ হইতে জাপানকে আমদানী করিতে হয়। সম্প্রতি একজন জাপানী বৈজ্ঞানিক ধানের তুস হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রেঁয়ন মণ্ড তৈয়ারী করিয়াছেন। জাপানে কোরিয়ায় ও ফরমোজা দ্বীপে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে সেই ধান্য হইতে বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টন তুষ পাওয়া যায়। সুতরাং নূতন প্রক্রিয়ায় তুষ হইতে রেঁয়ন সূত্র তৈয়ারী আরম্ভ হইলে জাপানকে আর বিদেশ হইতে উহা আমদানী করিতে হইবে না। ওসাকা সহরের ইটচুসোজী কাইসা কোম্পানী নাগোয়ার টয়টা কোম্পানীর সহিত মিলিত হইয়া ইহার জন্য একটি বৃহৎ কারখানা খুলিতেছেন।

—✻—

পাট চাষের হিসাব

১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে বাংলাদেশে বিহারে ও আসামে কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং তাহা হইতে কত গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। এক একর তিন বিঘার সমান এবং এক গাঁইটের ওজন ৫ মণ।

আবাদা জমির পরিমাণ

জেলা	১৯৩৬	১৯৩৭
২৪ পরগণা	৫৩০০০ একর	৪৫০০০ একর
নদীয়া	৬৯০০০ ,,	৬৩০০০ ,,
মুর্শিদাবাদ	৩৫০০০ ,,	৫৭৫০০ ,,
বর্দ্ধমান	১৫০০ ,,	১১০০ ,,
মেদিনীপুর	৪০০০ ,,	৩৭০০ ,,
ঢাকা	২৬৪০০০ ,,	২৫৯০০ ,,
খুলনা	২৫০০০ ,,	১৮১০০ ,,
বগুড়া	৮০০০০ ,,	৭৯০০০ ,,
পাবনা	৭৫০ ০ ,,	৭৬১০০ ,,
মালদহ	১[illegible]০০০ ,,	১২৮০০ ,,
বিহার	৪৬৩৬০০ ,,	৪৪৫০০০ ,,
কুচবিহার	২৪৫০০ ,,	৩৪৫০০ ,,
ময়মনসিংহ	৫৮২৭৫০ ,,	৫২৪৫০০ ,,
চট্টগ্রাম	৩০০ ,,	৩০০ ,,
নোয়াখালী	৪৫০০০ ,,	৪২০০০ ,,

ত্রিপুরা রাজ্য	৭১০০	,,	৭৮০০	,,
আসাম	১৫৭৫০০	,,	১২৭৭০০	,,

উৎপন্নের পরিমাণ

২৪ পরগণা	১৭৫০০০ গাঁইট		১৫০০০০ গাঁইট	
নদীয়া	১৮০০০০	,,	১৮১০০০	,,
মুর্শিদাবাদ	১০৫০০০	,,	১৭৫০০০	,,
বর্দ্ধমান	৫০০০	,,	৪০০০	,,
মেদিনীপুর	১১৫০০	,,	৯৫০০	,,
ঢাকা	৯৯৩০০০	,,	৯১০৪০৯	,,
খুলনা	৮০০০০	,,	৬৬২০০	,,
বগুড়া	২৮০০০০	,,	২৩৭০০০	,,
পাবনা	৩০৩৮০০	,,	২৫০৮০০	,,
মালদাহ	৩৬০০০	,,	৩৯৪০০	,,
বিহার	১১০৯৫০০	,,	১২১৪০০	,,
কুচবিহার	৭৭০০০	,,	৭৭৭০০	,,
ময়মনসিংহ	২২১৪৬০৭	,,	১৫৫২৫০০	,,
চট্টগ্রাম	১০০০	,,	৯০০	,,
নোয়াখালী	১৬৭০০০	,,	১৪৭০০০	,,
ত্রিপুরারাজ্য	১৯১০০	,,	১৯০০০	,,
আসাম	৪৬১৭০০	,,	৫৯০৮০০	,,

পাট রপ্তানীর হিসাব

সাল সেপ্টেম্বর মাস	কলিকাতা বন্দর হইতে গাঁইট	চট্টগ্রাম বন্দর হইতে গাঁইট	মোট গাঁইট
১৯৩৫	২০৫৩৯১	৮৭১৯	২১৪১১০
১৯২৬	১৯৯৮৬৪	১৬১৩৯	২১৬০০৩
১৯৩৭	২৪৯৩০৬	২০৬৫৩	২৬৯০৫৯

শ্যাম দেশের উন্নতি

শ্যামদেশ একটা বৃহৎ স্বাধীন হিন্দু রাজ্য। কিন্তু অনেক বিষয়ে ইহার কিছুই উন্নতি হয় নাই। কৃষিজ এবং খনিজ সম্পদ শ্যামদেশে প্রচুর। এখানকার জলবায়ু এবং বৃষ্টিপাত ধান্য উৎপাদনের বিশেষ অনুকূল। শ্যামদেশে বাংলা দেশের মত ধানের চাষ হইয়া থাকে। সেখানকার খনিতে প্রচুর টিন ও লৌহ এবং বনে বহুসংখ্যক রবার বৃক্ষ রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল আর্থিক সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টা তথায় নাই। শ্যামদেশে পথঘাট যানবাহন প্রভৃতিও পুরাতন রকমের,—আধুনিকতার হিসাবে দেশটী এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। গত ১৯৩২ সালে শ্যামদেশে একটা রাষ্ট্র বিপ্লব হয়, তাহাতে তথাকার রাজা সিংহাসন পরিত্যাগ করেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে অনেকটা গণ-তন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই হইতে শ্যামদেশে কিঞ্চিৎ উন্নতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে। এই উন্নতির প্রচেষ্টার মূলে জাপানেরই কার্য্য অধিক রহিয়াছে। যে সকল বিদেশীয় জাতি শ্যামদেশে কৃষি, রেলপথ বিস্তারে, খনিজ উত্তোলন, প্রভৃতি নানাবিধ বৃহৎ কাজ কারবারে টাকা খাটাইতেছে, তাহার মধ্যে জাপানীরা সকলের অগ্রণী। তাহাদের মূলধনে শ্যামদেশে বড় বড় রেল লাইন খোলা হইতেছে,—লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে বিস্তারিত ভাবে ধানের চাষ হইতেছে,—এমন কি শ্যামদেশের জাপানী ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষের বাজারেও চাউল রপ্তানী করিতেছে। জাপানী ধনীব্যক্তিরাই এখন শ্যামদেশের বড় বড় খনির মালিক। কেহ কেহ বলেন ইহার মধ্যে রাষ্ট্রনীতিক গূঢ় রহস্য আছে। তাহাদের বিশ্বাস, মাঞ্চুরিয়া সম্পর্কে জাপান যেরূপ আচরণ করিয়াছে, শ্যামদেশেও জাপানের উদ্দেশ্য সেইরূপ। এবম্বিধ বিরুদ্ধমতের উত্তরে

জাপানের পক্ষ হইতেও অনেক বলিতেছেন যে জাপান সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। কিছু কাল পূর্ব্বে শ্যামদেশে জাপানের ভূতপূর্ব্ব রাজদূত মিঃ ইশুকিচি ইয়াত্তাবে "কনটেম্পরারী জাপান" নামক পত্রে এই সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি শ্যামদেশের উন্নতির সহিত জাপানের প্রচেষ্টার যোগ কতদূর এবং শ্যামদেশের আর্থিক উন্নতিতে জাপানের স্থান কোথায় তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন "কোন কোন পাশ্চাত্য জাতি শ্যামদেশে বড় বড় কারবারে টাকা খাটাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তাহা করিয়াছে। জাপানের উদ্দেশ্য তাহা নহে। শ্যামদেশবাসীরা নিজের চেষ্টায় তাহাদের স্বদেশের উন্নতি করুক ইহাই বাঞ্ছনীয়। আর্থিক উন্নতির প্রয়োজনে শ্যামদেশ যদি জাপানের সাহায্য প্রার্থী হয়, তবে জাপান সেই সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছে। এ বিষয়ে জাপান অন্যান্য বিদেশীয় জাতির সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেও অনিচ্ছুক নহে। শ্যামদেশকে দ্বিতীয় মাঞ্চুরিয়ায় পরিণত করিতে জাপান চাহে না।

শোনা যায়, ক্যালকাটা সিল্ক ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী রেয়ন-তন্তু তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই কোম্পানীর কারখানা খড়দহে অবস্থিত। মেসার্স কেদার নাথ পোদ্দার এণ্ড কোং ইহার ম্যানেজিং এজেন্ট্স্। এই কোম্পানীর কারখানা যদিও জাপানী বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত,—কিন্তু ইহার মূলধন ও পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। আশা করি, বাংলা দেশে এই নূতন শিল্পের প্রসারে আর্থিক সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ঈটা নামক একপ্রকার ঘাস জাতীয় বৃক্ষ জন্মে। ইহা দেখিতে আমাদের দেশীয় শর গাছের মত। উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে ইহার নাম Ochiandra Travancorea. ডেরাডুনে গভর্ণমেণ্টের যে ফরেষ্ট্ রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট্ আছে, তাহার কাগজ মণ্ড বিশেষজ্ঞ (Paper pulp expert) মিঃ এম্ পি ভার্গব সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, এই ঈটা শর গাছ হইতে কাগজের মণ্ড তৈয়ারী হইতে পারে। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বনভূমিতে প্রতি বৎসর ২৫ হাজার টন ঈটা-শর জন্মে। তাহা হইতে ৮।১০ হাজার টন কাগজের মণ্ড পাওয়া যায়। এই পরিমাণ মণ্ডে একটি কাগজের কল চলিতে পারে। লিখিবার কাগজ, ছাপিবার কাগজ, ব্লটিং কাগজ এবং প্যাকিং কাগজ এই ঈটা-শরের মণ্ড হইতে প্রস্তুত করা যায়। মিঃ ভার্গব আরও বলেন, সংবাদ পত্র ছাপিবার উপযুক্ত কাগজও এই মণ্ড হইতে তৈয়ারী করা সম্ভব। কারণ সংবাদ পত্রের কাগজে শতকরা ৭০।৮০ ভাগ মিক্যানিক্যাল পাল্প্ থাকে।

—•—

ভারতের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শেঠ রামকিষেণ ডালমিয়া তাঁহার ডিহ্রীস্থিত বিজ্লী কারখানা হইতে প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ শক্তি সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিকটেই কয়লার খনি থাকাতে এই তড়িৎ উৎপাদনের খরচা খুব কম পড়িবে। এ, সি, অর্থাৎ অল্টারনেটিং কারেণ্ট্ বহুদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ার সুবিধা। সুতরাং ডিহ্রীর এই বিজ্লীর কারখানা হইতে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্থানে তড়িৎ সরবরাহ করা যাইবে। নলকূপের জল তুলিয়া জমিতে সেচ কার্য্যেরও ইহাতে সুবিধা হইবে। বিহারে বক্সাইট্ নামক খনিজ দ্রব্য প্রচুর পাওয়া যায়। ইহা হইতে এলুমিনিয়াম ধাতু প্রস্তুত হয়। এ যাবৎ বিদেশেই ইহা রপ্তানী হইত। সম্প্রতি বাবু নির্ম্মল কুমার জৈন এবং শেঠ রামকিষেণ ডালমিয়া বক্সাইট্ হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারীর একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিতেছেন।

—•—

জেনেভার ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অফিসের ডিরেক্টার মিঃ হ্যারল্ড্ বাট্লারকে বাংলা গভর্ণমেণ্টের অর্থ সচিব মাননীয় মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার তাঁহার "রঞ্জনী" প্রাসাদে এক চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তথায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হয়। গত ১৮ই ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সভ্যগণও তাঁহাকে (গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে) ঐরূপ সম্বর্দ্ধনা করেন।

—•—

ই বি রেলওয়ের সোদপুর ষ্টেশনের নিকট "বিদ্যাসাগর কটন মিলস্" নামে আর একটী নূতন কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। গত ১৪ই নবেম্বর বিহার গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ আবদুল আজিজ উহার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি বলেন, হিন্দু মুসলমানের মিলিত চেষ্টায় ও উদ্যমে এই কল পরিচালিত হইতেছে, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়।

—•—

বিখ্যাত ব্যবসায়ী বিরলাব্রাদার্স শীঘ্রই সম্বলপুরে একটী কাগজের কল স্থাপন করিবেন।

এ বিষয়ে উক্ত কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিতেছেন, যাহাতে বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি কাগজ তৈয়ারীর কাঁচা মাল সম্পাদনে পাওয়া যায়। শুনা যায়, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ প্রস্তাব করিতেছেন যে, ঐ কাগজের কলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক উড়িষ্যাবাসীকে চাকুরী দিতে হইবে।

—:*:—

ভারত জুট্ মিলের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস একটী বৃহৎ ইঞ্জীনিয়ারিং কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এই কোম্পানীর নাম হইয়াছে ইণ্ডিয়া মেশিনারী লিমিটেড্। পার্লস্ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী নামে একটী কারবার শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের পূর্ব্বাবধিই চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে প্রধানতঃ ক্ষুদ্রবৃহৎ নানাবিধ ওজনের কল তৈয়ারী হয়। গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে কোম্পানী সমূহের প্রয়োজনীয় অনেক অর্ডার এই কারখানা হইতে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি এই কোম্পানীর সহিত য়্যাট্লাস্ ওয়েব্রিজ য়্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীকে মিলিত করিয়া শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস ইণ্ডিয়া মেশিনারী লিমিটেড্ নামে নূতন কোম্পানী গঠিত করিয়াছেন। ওজনের যন্ত্রাদি ব্যতীত অন্যান্য কল কব্জাও এই কারখানায় তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।
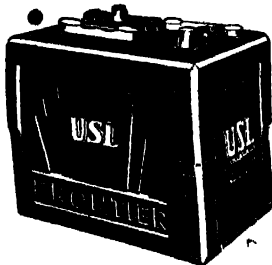
ভারত জুট মিলসের অনেক যন্ত্রপাতি পার্লস্ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর কারখানায় এযাবৎ তৈয়ারী হইয়া আসিতেছে। বৃহদাকারে নূতন কারখানা স্থাপিত হইলে তাহাতে বহু বাঙ্গালীর চাকুরী ও অন্নসংস্থান হইবে। আমরা এই নবোদ্যমের সাফল্য কামনা করি। ইহার ডিরেক্টরগণ সকলেই কৃতীব্যবসায়ী। আশা করি নূতন কোম্পানীর শেয়ার সমস্ত বাঙ্গালীই ক্রয় করিবে।

১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী এই এক বৎসরের মধ্যে কালিম্পং সহরের মধ্য দিয়া—১১৫০৭৩ মণ তিব্বতীয় পশম রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৯৬৯৭৩ মণ। সম্প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকাতে তিব্বতীয় পশমের খুব চাহিদা হইয়াছে। সেই জন্য কালিম্পং সহরে ইহার দাম প্রতিমণ ৩০ টাকা হইতে ৫৫ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়া গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতবর্ষে (ব্রহ্মদেশ সহ) মোট ১২৪৭৪০০ টন চিনি উৎপাদন হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহার পরিমাণ শতকরা ২১ টন বেশী। ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতে বিদেশী চিনির আমদানী হইয়াছিল ২০১২০০ টন। ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহা কমিয়া ২৩১০০ টনে নামিয়াছে। শর্করা শিল্পের এই উন্নতির কারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে জানা যায় যে গত বৎসরে ইক্ষুর ফসল সমগ্র ভারতবর্ষে এত বেশী হইয়াছিল যে আর কখনও এরূপ হয় নাই।

ইণ্টারন্যাশনাল টী কমিটী (International tea committee) ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত পাঁচবৎসর চা এর উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা ভারত গবর্ণমেণ্ট, সিংহল গবর্ণমেণ্ট এবং হল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্ট (পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জন্য) কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়াছে। তদনুসারে ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত মোট রপ্তানীর শতকরা ৯২ ভাগ চা উৎপন্ন করা হইবে। ১৯৩৭-৩৮ সালে নির্দ্ধারিত মোট রপ্তানীর শতকরা ৮৭ ভাগ চা উৎপাদন হইয়াছিল।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘে, শ্রমিকদের কার্য্যকালে রোগের জন্য ক্ষতিপূরণার্থক যে খসড়া আইন গ্রহণ করা হইয়াছে, ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারের নিকট ঐ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রমিকদের গুটিকয়েক বিশেষ রোগের জন্য ক্ষতিপূরণ করা হইয়া থাকে। ১৯২৫ সালে এ বিষয়ে যে আইন প্রবর্ত্তন করা হয় তাহাতে উক্ত কয়েক প্রকার রোগের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হয়। সম্প্রতি যে আইন প্রবর্ত্তনের কথা হইতেছে তাহাতে আরো গুটিকয়েক রোগের বিষয় উল্লেখ ও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান এ্যাক্টে যে সমস্ত রোগের ব্যবস্থা করা হয় নাই, অথচ বর্ত্তমান আইনে যাহার উল্লেখ আছে এমন রোগের মধ্যে Silicosis, Arsenic poisoning, Radium এবং Radio-active বস্তুর এবং X' Ray'র জন্য শরীরে যে সমস্ত রোগের উৎপত্তি হয়, Epitheliomates এবং চর্ম্মের Cancr

ইত্যাদিই প্রধান। এ সমস্ত ব্যাধির মধ্যে Silicosisই সর্ব্বপ্রধান। ইহাকে Tuberculosis এর সঙ্গে গোলমাল করা হইয়া থাকে। বাস্তবিক Silicosis অত্যন্ত বিপজ্জনক রোগ। অন্যান্য দেশে স্বর্ণের খনিতে, এবং চীনা মাটীর বাসন প্রস্তুত, পাথর-খোদাই ইত্যাদি কার্য্যে লিপ্ত শিল্পীদেরই এই রোগ হইয়া থাকে। Radiological apparatus ভিন্ন Silicosis এর সাধারণতঃ বুঝিয়া ব্যবস্থা করা অভিজ্ঞ চিকিৎসক ভিন্ন অপরের দুঃসাধ্য। রেলওয়ে কারখানা ইত্যাদিতে যাহাতে এই রোগ না হইতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা করা সম্ভব। Sandblasting এ যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলবোলা বনাম সিগারেট

দার্শনিক দেশ ভারত; অর্থাৎ আবহমান কাল থেকেই ভারতে দর্শনের চর্চ্চা চলে আসছে; সেইজন্যই বোধ হয় ভারতবাসী অত ধোঁয়ার ভক্ত। হিন্দুস্থানের প্রায় এমন গৃহ নেই যেখানে তামাকের ধূমের সাক্ষাৎ পাওয়া না যায়। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই একটু না একটু তামাকের ভক্ত। যারা কারিগর কিংবা মজুর তাদের এই নেশার ধোঁয়া থেকে বঞ্চিত রাখলে তারা কিছুতেই খাটতে পারে না, তখন তাদের যেন সমস্ত কর্ম্মশক্তি লোপ পায়। কিন্তু সেই সমস্ত কর্ম্মক্লান্ত কারিগর বা মজুরদের যদি নেশার খোরাক যোগানো যায় তাহলে তারা যেন একেবারে পুনর্জীবন লাভ করে—যে লোকটা এইমাত্র একেবারে বসে পড়েছিল সে যেন পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগে যায়।

সভ্যতার উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে এই তামাকু সেবনের পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ঐতিহাসিক যুগের কথা যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে যে সে-যুগের কাব্য উপন্যাসাদির মধ্যে এই তামাকুসেবনের উল্লেখ আছে। সভ্যতার প্রথম স্ফূরণের সময় হয়ত ছিল দা-কাটা তামাকের প্রচলন; তারপরে হিন্দুযুগের গৌরবময় সময়টিতে সেই তামাকই বিলাসোপকরণ রূপে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। তৎপরে এল মুসলমান যুগ; এই মুসলমান যুগে বিলাসিতার একেবারে চরম স্রোত বয়ে গেছে। সেই সময়ে অম্বুরী তামাকের খোস-গন্ধে আমীর—ওমরাহ-সুলতান-বাদসাহদের সভাগৃহ ভরপুর থাকতো। তামাকবস্তুর চরম উন্নতি সেই সময় সাধিত হয়ে গেছে; আজও তার স্মৃতি ভারতীয়েরা ভুলতে পারে না, তাই আজও ঘরে ঘরে আলবোলা বিরাজ করে।

কিন্তু আধুনিক যুগ হচ্ছে বিপ্লবের যুগ, তাই সেই আবর্ত্তনের প্রভাবে পড়ে মানুষের উপভোগের ক্ষেত্র থেকে তামাক নির্ব্বাসিত হ'ল না বটে কিন্তু তার রূপ গেল বদলে। কর্ম্মব্যস্ততার এই দ্রুতগতির যুগে আলবোলার আলসেমির স্থান আর নেই; সিগারেট, চুরুট ও পাইপ-রূপ তামাকের শোভন সংস্করণই তার স্থান অধিকার করেছে। এর একমাত্র কারণ হ'ল বর্ত্তমান যুগের ব্যস্ততা ও যন্ত্রসভ্যতার আধিপত্যের প্রভাব। সময়ের যখন পরিমাপ ছিল অনেক ও মানুষের যখন অবসর ছিল অফুরন্ত, তখন লোকে হেসে, খেলে, এমন কি

ঘুম গড়িয়ে নিয়ে তামাক ফুঁকে কাল কাটিয়েছে ; কিন্তু আজ লোকের সে অবসর কোথায় ? সেইজন্যই হুঁকো ও আল্‌বোলা আজ সাধারণ ব্যবহারের অলকাপুরী থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে পেন্সনভোগীদের রামগিরিরূপ আবাসস্থলে। এমনও দেখা গেছে, যে লোকটা আজীবন সৌখীন সিগারেটের ভক্ত, বৃদ্ধ বয়সের জরাজীর্ণ মুহূর্ত্তটিতে সেই আবার গড়গড়ার ভয়ঙ্কর অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। এর কারণ অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, অবসরের প্রাচুর্য্য ও সঙ্কীর্ণতাই এই তারতম্যের হেতু হয়ে দাঁড়ায়। তামাকপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, গড়গড়া সাজার সরঞ্জামের হেফাজৎ অনেক—কোথায় রে টিকে, কোথায় বা তামাক, কোথায়ই বা আগুণ ? এই সব ঝঞ্ঝাট। রাস্তায়, পথে, ঘাটে, ট্রামে বাসে, সিনেমা থিয়েটারে বা কর্ম্মস্থলে গড়গড়ার সরঞ্জাম নিয়ে বেড়ানো চলে না। অথচ সেই সময় নেশার খোরাক পাওয়া যায় কোথ্‌ থেকে ?

যন্ত্রসভ্যতা এ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে সিগারেট, চুরুট প্রভৃতি আবিষ্কার করে। মানুষ সুবিধার প্রলোভনে তাকে গ্রহণ করেছে। যুগোপযোগী দ্রুতগতি ও অবসর-হীনতা তার নেশার প্রাবল্য ও আল্‌বোলা গড়গড়ার মধ্যিখানে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার সৃষ্টি করেছিল— সিগারেট-চুরুটের আবির্ভাব নিমেষের মধ্যে সে-বাধা ভূমিসাৎ করে দিলে। সেইজন্যই আধুনিক যুগে সিগারেট মানুষের এত প্রিয়। বর্ত্তমান সভ্যতা ও আগামী সভ্যতার সিগারেট হ'ল এক অঙ্গাঙ্গী-জড়িত

উপাদান, এর-চাহিদার বৃদ্ধি ক্রমবর্দ্ধমান।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, গড়গড়া-আল্‌বোলা সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্র থেকে নির্ব্বাসিত হ'লেও পেন্সনভোগীদের রামগিরিতে আশ্রয় পেয়েছে, কেননা, সেখানে অবসর আছে প্রচুর। তবুও যন্ত্রসভ্যতার যত দাপটই থাক্, গড়গড়া আল্‌বোলার রাজত্বের খাসমহল থেকে তামাক সুন্দরীকে কেউ এখনো টলাতে পারেনি। সেই খাসমহল হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাপনকারীদের বৈঠকখানা ও জল্‌সাঘর। বহুদিনের রক্ষিতা বাইজীসুন্দরীর মোহের মত তার মায়া কাটানো চলে না,—অস্তগামী রবিরশ্মির মাদকতার মত তার নিমজ্জিতমান রূপবহ্নি এখনো গতযুগের স্মৃতি নিয়ে টিঁকে রয়েছে। তবুও সে একদিন যাবে, যন্ত্রসভ্যতার হাত এড়ানো চলবে না।

যাক্‌গে সে কথা। সিগারেট শিল্পের প্রসঙ্গে গড়গড়া-আল্‌বোলার এতখানি আলোচনা করবার আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল এই দেখানো যে, আধুনিক যুগের চাপে পড়ে গড়গড়া-আল্‌বোলার বাহুত্ব শেষ হয়ে এসেছে, সিগারেটের দিগ্বিজয় অবশ্যম্ভাবী। যে মানুষ নেশা করেনা তার কথা স্বতন্ত্র, সে ভাল করে কি মন্দ করে সেটা নীতির বিচার্য্য, শিল্পের নয়। শিল্পের দিক দিয়ে বলা চলে যে, যে তামাক খায়, আজ হোক্ কাল হোক্ সে অবস্থার চাপে পড়ে সিগারেট টানতে বাধ্য হ'বে। সিগারেটের বিক্রয়ের ক্রমবর্দ্ধমান হিসাব দেখলেই সে জিনিসটা বোঝা যায়। আমাদের আশেপাশের লোকের মনোবৃত্তি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, সকলেই ক্রমশঃ সিগারেটকেই পছন্দ করছে—এর মূলে তামাকের প্রতি বিরূপতা নেই, সিগারেটের সহজলভ্যতা ও যুগোপযোগী ফ্যাসান-দুরস্তভাই এই জনপ্রিয়ত্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গড়গড়া-আল্‌বোলা বুড়োরাই পছন্দ করে বেশী, তাদের আসরের মধ্যেই এর পরিধি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হ'তে সঙ্কীর্ণতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অবশ্য আমরা অম্বুরী তামাকের খোসগন্ধের বিরোধী নই, আমরা জানি বাদসাহী আসর ও আমীরী জলসাঘরে তা' মানায় ভাল, আমরা আরও জানি যে, গড়গড়ার বিরামহীন টানের নিশ্চিন্ত আরামের স্বর্গসুখের তুলনা হয় না,—কিন্তু বর্ত্তমান জীবনে তার সুযোগ কোথায়? তার চেয়ে সিগারেটের মৌতাত ঢের বেশী সহজলভ্য, পকেটে পকেটে তাকে নিয়ে যেখানে খুসী ঘোরা যায়—তা' আমাদের নিত্য সাথী।

মাদকবর্জ্জন সমিতির পাণ্ডারা আমাদের ওপর যদি এই অভিযোগ আনেন যে, আমরা সিগারেটওয়ালাদের কাছ থেকে ব্রিফ্ খেয়ে সিগারেট প্রচলনের স্বপক্ষে প্রচার কার্য্য চালাচ্ছি তাহ'লে আমরা নাচার। সিগারেট-ওয়ালারা সত্যই যদি আমাদের কিছু ব্রিফ্ দিত তাহ'লে না হয় আমাদের পেটে খেলে পিঠে সইত, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আধখানা পোড়া সিগারেটও আমাদের বরাতে জোটেনি (জুটলেও কোন সুরাহা হোত না, কেননা, মাদকবর্জ্জন সমিতির সভ্যদের মত আমরা সিগারেট স্পর্শও করিনা)। আসলে ব্যাপার হচ্ছে যে, মাদকবর্জ্জন সমিতির হাজার প্রতিবাদ সত্ত্বেও সিগারেট চলবেই, তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমাদের প্রত্যেকেই ছেলেবেলায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

দ্বিতীয় ভাগে পড়ে এসেছি যে মিথ্যা কথা বলা পাপ, তা আমাদের ঠোঁটস্থ, মুখস্থ, কণ্ঠস্থ ও হৃদয়স্থ হয়ে আছে—তবুও ক'টা লোক আর ঐ ম্যাক্সিম মেনে থাকি? আসলে, সত্যের প্রতি আমাদের কোন বিরূপতা নেই, তাকে আমরা সবাই সমান শ্রদ্ধা করে থাকি, কিন্তু দৈনন্দিন দু'চারটে হালকা ধরণের মিথ্যা ভাষণ না ঘটলে আমাদের জীবনযাত্রা যেন অচল হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ হচ্ছে যে, সাধারণ জীবন (আদর্শ জীবন নয়) আর নাট্যলোক মরালিটির তাল ঠোকাঠুকির যায়গা নয়—জীবনটা যদি কেবল নীতিকীর্ত্তনের আখড়া হয়ে দাঁড়ায় তা'হলে তাতে সত্যানুবর্ত্তিতার কঠোরতা থাকতে পারে কিন্তু রস থাকে না। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে দু'চারটে মিথ্যা কথা বলে থাকি সেটা সত্যের বিরুদ্ধতা করবার জন্য বলিনে, পরন্তু জীবনযাত্রার শিকড়ে রস-সিঞ্চনের জন্যই বলি। সত্য ও মিথ্যার যেখানে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধে, সেখানে সত্যকে জয়যুক্ত করে জীবননাট্যে আমরা

আর এক রসের অবতারণা করি, যেটার সময়ে প্রয়োজন আছে কিন্তু সব সময়ে প্রয়োজন নেই। সিগারেটের বেলায়ও ঠিক সেই জিনিসটা প্রযোজ্য। মাদকবর্জ্জন সমিতি যখন সুউদ্দেশ্য নিয়ে প্রচার করেন যে, নেশা করা পাপ, অতএব কেউ সিগারেট খেয়ো না, তখন অতি বড় সিগারেটখোরও তাতে আপত্তি জানায় না। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঐ নিষেধাজ্ঞা 'মিথ্যা কথা বলা পাপ'-এর দশাই প্রাপ্ত হয়। যখন ডাক্তারে বারণ করে তখনই লোকে সিগারেট খাওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে—সেটা নিষেধাজ্ঞার তাগিদে নয়, পূর্ব্বোক্ত সত্য ও মিথ্যার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ক্ষেত্রের মত প্রয়োজনের তাগিদে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সিগারেটকে গ্রেপ্তার করবার উপায় নেই, মাদকবর্জ্জন সমিতির বিরুদ্ধে তার সিডিসন্ প্রচার অবশ্যম্ভাবী। সমিতি যদিও তাকে গ্রেপ্তার করে নীতিবাদের এজলাসে বিচার পূর্ব্বক জেলে পাঠায়, তাহ'লেও মানুষের উপভোগরূপ হাইকোর্ট দরবারের আপীলে তা' খালাস পাবেই পাবে। যদি জনমতের দ্বারা সিগারেটের প্রচার বন্ধ করবার চেষ্টা চলে তাহ'লে এমন অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পাবে যাতে করে গভর্ণমেণ্টকে হয়ত অতিরিক্ত পুলিশের ব্যবস্থা করতে হ'বে। এ যেন ঠিক সেই পশুবলি বন্ধ করবার ব্যাপারের মত। পশুবলি বন্ধ করবার জন্য যখন আন্দোলন চলে তখন আমরা সবাই তাতে মৌখিক সহানুভূতি জানাই, এমন কি আগ্রহাতিশয্য উত্তেজনার বসে দু'একজন বক্তৃতাও করে ফেলি, কিন্তু সত্যই যখন পশুবলি বন্ধ হবার উপক্রম হয় তখন আমরা প্রাণপণ শক্তিতে তাতে বাধা দিই এই বলে যে তাতে আমাদের সুখাদ্য-সঙ্কট উপস্থিত হয়। নইলে, যে-সমস্ত ধর্ম্মপ্রাণ মাড়োয়ারী ও জৈন সম্প্রদায় এই পশুবলি নিবারণের জন্য আন্দোলন করেন, তাঁদের প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষভাব নেই, বরং তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা করি; কিন্তু যখনই তাঁদের কার্য্য দ্বারা আমাদের স্বার্থে প্রত্যক্ষ আঘাত পড়ে তখনই তাঁদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ লেগে যায়। মাদকবর্জ্জন সমিতির সঙ্গে সিগারেটভোগীদের সম্পর্কটাও ঠিক সেই ধরণের। সমিতির সভ্যদের প্রচার কার্য্য ও আদর্শের প্রতি সিগারেটভোগীদের যথেষ্ট সম্মতি আছে, কিন্তু সে-প্রচার কার্য্য ও আদর্শকে ফলপ্রসূ করবার প্রতি সম্মতি নেই। আদর্শ ও কার্য্যের এতবড় বিরোধ বোধ হয় আর কোথায়ও দেখা যায় না। এর কারণই হচ্ছে যে, আমরা নীতির বিরোধী নই, আমরা কার্য্যের বিরোধী। প্রাচীনতার মোহ আমাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে বলে আমরা নীতিকে উড়িয়ে দিতে পারিনে, আবার নবীনতার আবেষ্টনী আমাদের চারপাশে ঘিরে ধরেছে বলে আমরা নীতিটাকে পুরোপুরি মানতেও পারিনে। এই রকমই আমাদের ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থাটা নীতির পক্ষে যতটা আশঙ্কার শিল্পের পক্ষে ততটা আশার। এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থা যদি না থাকতো কিংবা জগৎটা যদি গান্ধীবাদের সংযমের আদর্শে পরিচালিত হ'ত তাহ'লে শিল্পোন্নতির গতি রুদ্ধ হয়ে যেত—শিল্পের পক্ষে সেটা ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন। নীতিবাদের ত্যাগের আদর্শ বড় হতে পারে আদর্শ হিসাবে, কিন্তু ব্যবহারিকভাবে বড় নয়। শিল্পের পক্ষে

ভোগের দুর্নীতি না হোক, ব্যবহারিক নীতিটা চাই-ই চাই ; নইলে জগতে অধিকাংশ শিল্পই ফেল পড়বে।

সিগারেটও একটা শিল্প বিশেষ। এ শুধুমাত্র নিদৃক শিল্প নয়, একেবারে আধুনিক শিল্প। ভারতবর্ষে এ-শিল্পের প্রয়োজন কতখানি আছে তা' জানিনে কিন্তু প্রসারতার সম্ভাবনা আছে বিপুল। অথচ ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এধারটায় তেমনভাবে নজর দেন-নি যেমনভাবে নজর দেওয়া উচিত ছিল। ভারতে দেশী সিগারেট উৎপন্ন হয় সত্য কিন্তু তার কোয়ালিটি যেমন নিকৃষ্ট, পরিমাণও তেমনি কম। ভারতে যে পরিমাণ বিদেশী সিগারেট আমদানী হয় তার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ মাত্র ভারতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। তবুও ভারতীয় সিগারেট সিগারেটখোরদের মন জয় করা ত দূরে থাক কাছেই ঘেঁসতে পাবেনি। এর কারণ হ'ল কোয়ালিটির অপকৃষ্টতা ; অথচ এইটাই যদি দূরীভূত হয় তাহ'লে সিগারেট ব্যবসায়ীরা লাখ লাখ টাকা পিটতে পারে। আমরা এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—পরে আমরা সিগারেট প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করব্।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভল্যুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমুল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে, তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামুল্যে প্রদান করিব। —সম্পাদক

লেখক—
ফণীন্দ্রনাথ দত্ত
ষষ্ঠিতলা লেন, বরাহনগর।

ঠাকুর ঘরে কে রে
আমিত কলা খাই নি

*

কম খাবিত বেশী খা
বেশী খাবিত কম খা

*

যার কাজ তারে সাজে
অন্যের মাথায় লাঠি বাজে

*

হাতী ঘোড়া গেল তল্
মশা বলে কত জল্

*

পেটে খিদে মুখে লাজ
সে কুটুমে কিবা কাজ

*

যদি হয় সুজন
তেঁতুল পাতায় নজন
যদি হয় কুজন
মান্ পাতায় অকুলন

*

যার জন্য চুরি করি
সেই বলে চোর

*

যার বিয়ে তার মনে নাই
পাড়া পড়সির ঘুম কামাই

*

ফেল কড়ি মাখ তেল
তুমি কি আমার পর্

*

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা

*

যেখানেই বাঘের ভয়
সেই খানেই সন্ধ্যা হয়

*

সাধে কি বাবা বলে
গুতোর চোটে বাবা বলে

*

মঙ্গলের ঊষা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা

*

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গায়
এলোমেলো তায় বাতাস বয়
কর্ত্তা বলে চাষার পো বাঁধগে আল
যদি না বর্ষে আজ হবে গো জেন কাল

*

পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে

*

অতি দর্পে হতা লঙ্কা

*

সেদো ভাত খাবি না হাত ধুয়ে ব'সে আছি

*

যার ধন তার ধন নয়
নেপোয় মারে দই

*

নেই কাজ ত খই ভাজ
আছে কাজ ত সকাল সাজ

*

তাল তমাল বাবলা
কি ক'রবে তোমার ছুঁধুমুখী একলা

*

খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে
কাল ক'রলে এঁড়ে গরু কিনে

*

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল শল্য হ'ল রথী
বড্ড কল্লে পেটের পো গোঁফ কামাবে নাতি

*

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট

*

রামের বাণ সহ্য হয়
কিন্তু হনুমানের দাঁত খিচুনি সহ্য হয় না

*

ভীষণ রৌদ্রের তাপ যদি সহ্য হয় রে
তার তাপে বালির তাপ কভু সহ্য নয় রে

*

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল

*

গেঁও যুগী ভিখ্ পায় না

*

ভাবিতে উচিৎ ছিল প্রতিজ্ঞা যখন

*

চিন্তা চিতোরপি গরিয়সী
চিতা দহতি মৃতং, চিন্তা দহতি জীবিতং

*

ঠগ্ বাছতে গাঁ ওজোড়

*

সঙ্গ দোষে স্বভাব নষ্ট

*

অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি

*

বোবার শত্রু নাই

*

মার চেয়ে মাসীর টান
তারে বলে ডান

*

সেই ত মল খসালি
তবে কেন লোক হাসালি

*

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
স্পষ্ট কথায় কষ্ট নাই

*

ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে

*

যতো ধর্ম্ম ততো জয়

*

যেমন দেবা তেমনি দেবী

*

বাঁশ বনে ডোম কাণা

*

পরের মন্দ ক'রতে গেলে
নিজের মন্দ আগে হয়

*

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো

*

মরদ কি বাৎ হাতী কি দাঁত

*

মারিত গণ্ডার
লুটিত ভাণ্ডার

*

ছিল ঢেঁকি হ'লো তুল
কাটতে কাটতে নির্ম্মূল

ভগবানের মার
দুনিয়ার বার

*

বাড়া ভাতে ছাই ফেলা

*

সে বড় কঠিন ঠাঁই
গুরু শিষ্যে দেখা নাই

*

রাই কুড়িয়ে বেল

*

পয়সাগুলির প্রতি যত্ন কর
টাকাগুলির যত্ন তারা আপনি ক'র্ব্বে

*

যেমন কুকুর
তেমনি মুগুর

*

বাগা তেঁতুল বুনো ওল

*

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল

*

ঘর জ্বালান
পর ভোলানে

*

মোটে মা রাঁধেনি
তার তপ্ত আর পান্তা

*

শুধু মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজে না

*

যতক্ষণ শ্বাস
ততক্ষণ আশ

*

ঘর পোড়া গরু
সিন্দুরে মেঘ দেখে ডরায়

*

হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধব
কদম্বে পুণ্ডরীকাক্ষং প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ

*

সাত মণ তেলও পুড়বেনা
রাধাও নাচবে না

*

নাচতে না জানলে উঠানের দোষ

*

যত গর্জ্জে তত বর্ষে না

*

হেগো রুগী মুখে দড়

*

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল

*

চালুনি বলে ছুঁচ তোর পোঁদে কেন ছেঁদা

*

দুষ্ট গরুর চেয়ে
শূন্য গোয়াল ভাল

*

মরা হাতী লাখ টাকা

*

বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া

*

আপনি বাঁচলে বাপের নাম

*

আপনার বেলায় পাঁচ কড়ায় গণ্ডা
পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা

*

গণ্ডায় এ্যাণ্ডা দেওয়া

*

গরীবের কুঁড়ের চেয়ে
ভদ্রলোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল

*

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন

*

আমি ব'কে ব'কে হ'লাম চাম্‌চিকে
উনি ব'সে আছেন যেন শ্রীরাধিকে

*

কয়লা সাদা হয় না ধুলে
স্বভাব কভু যায় না মলে

*

যারে দেখতে নারি
তার চলন বাঁকা

*

যার শিল তারই নোড়া
তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া

*

যার পায়ে ঘা সেবলে ম'রবো
যার পেটে ঘা সেবলে বাঁচবো

*

মা বিয়োল না বিয়োল মাসী
ঝাল খেয়ে ম'লো পাড়াপসি

*

ভাজে উচ্ছে বলে পটল

*

যার সঙ্গে ঘর ক'রিনি
সে বড় ঘরুণী
যার হাতের খাইনি
সে বড় রাঁধুনী

জাতে ভেড়ে খোক্তে ভেড়ে

*

মূলে মাগ্ নাই তার পুত্র শোক

*

উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ

*

পরের মুখে ঝাল খাওয়া

*

না বিইয়ে কানাই এর মা

*

ভাত কাপড়ের নাম নাই
কিল্ মারবার গোঁসাই

*

তেলে জলে মিশ খায় না

*

শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখ্‌লে চেনা যায়

*

মোষের শিং বাঁকা
যোঝবার সময় এক।

*

(ক্রমশঃ)

আখের ছোবড়ার ব্যবহার

(কাগজ ও সিলটেক্স্‌)

চিনির কারখানায় ইক্ষু হইতে রস বাহির করা হইয়া গেলে যে ছোবড়া পড়িয়া থাকে তাহা সাধারণতঃ জ্বালান ছাড়া আর কোন কাজে লাগান হয় না। ইক্ষুরসকে জ্বাল দিয়া ঘনীভূত করিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে সকল কারখানাতেই আখের ছোবড়ার ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, যদি আখের ছোবড়াকে অন্য কোন অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজে লাগান যায়, তবে তাহাতে খুব বেশী লাভ হইতে পারে। এইজন্য অনেকদিন যাবৎ এ বিষয়ে চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি কাগজ ও সিলটেক্স্‌ তৈয়ারীতে আখের ছোবড়ার ব্যবহার উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং কোন কোন দেশে ইহার জন্য বৃহৎ কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল এষ্টেট্‌ লিমিটেড্‌ নামক বৃহৎ কারবার আখের ছোবড়া সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ অনেক গবেষণায় প্রায় দুইলক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন। অবশেষে মিঃ ই, এ, রিটার (E. A. Ritter) নামক একব্যক্তি আখের ছোবড়া হইতে কাগজ তৈয়ারী করিবার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন। তদ্দারা আখের ছোবড়ার দ্বারা সাধারণ কাগজ, খবরের কাগজ ও কার্ডবোর্ড প্রস্তুত করা যাইতে পাবে। এই প্রক্রিয়া পেটেণ্ট্‌ করা হইয়াছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ডার্ব্বান সহরে একটী বৃহৎ কোম্পানী আখের ছোবড়া হইতে কাগজ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করিবার জন্য উমজেনী উপত্যকায় জমি বন্দোবস্ত লইয়াছেন।

মিঃ রিটারের উদ্ভাবিত এই প্রক্রিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও পেটেণ্ট্‌ করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে মিঃ রিটার এক্ষণে জার্ম্মাণীতে গমন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে ঘর বাড়ীর ছাদ ও দেওয়াল তৈয়ারী করিতে অনেকেই সিলটেক্স্‌ নামক একপ্রকার সিট্‌ ব্যবহার করেন। কলিকাতার বাজারে ইহার খুব চলন হইয়াছে। সিলটেক্স্‌ অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। ইহার মধ্য দিয়া শব্দ পরিচালনা হয় না। সেইজন্য পার্টিশন দেওয়াল তৈয়ারী করিতে,—বিশেষতঃ টকী সিনেমার ষ্টুডিও নির্ম্মাণ কার্য্যে এবং ফনোগ্রাফ্‌ রেকর্ড তুলিবার গৃহ তৈয়ারী করিবার জন্য এই সিলটেক্স্‌ ব্যবহার করা হয়। ইহার মধ্য দিয়া শীত কিম্বা উত্তাপও পরিচালিত হয় না। ইহাকে করাতের দ্বারা বেশ পরিষ্কাররূপে

কাটা যায় এবং কাঠের আসবাব পত্রের মত সিলটেক্স্ দ্বারাও নানাবিধ সুন্দর সুন্দর আসবাব পত্র তৈয়ারী করা যায়। ইহাতে উইপোকা ধরে না। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকাতে ঘরবাড়ী তৈয়ারীতে ও আসবাবপত্র নির্ম্মাণে এই সিলটেক্স্ বহুলপরিমাণে ব্যবহার হয়। দামেও ইহা খুব সস্তা।

সিলটেক্স্ তৈয়ারী হয় একমাত্র আমেরিকাতে। উহার ব্যবসায় আমেরিকার এক চেটিয়া। ইহা তৈয়ারীর প্রক্রিয়াটীও গোপন রাখা হইয়াছে; সুতরাং সকলে ইহা জানে না। তবে অনেকে চেষ্টা করিয়া ইহার গুপ্তরহস্য উদ্ধার করিয়াছেন। মিঃ এইচ্ সি আর্ম্মষ্ট্রং নামক একজন ইংরাজ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং বহুকাল আমেরিকায় ছিলেন,—আমেরিকার সঙ্গে তাঁহার নানা বিষয়ে কাজ কারবার আছে। তিনি বাহির করিয়াছেন, আখের ছোবড়ার দ্বারাই সিলটেক্স্ তৈয়ারী হয়। শুধু তাহাই নহে,—তিনি ইংলণ্ডে বহু অর্থব্যয়ে সিলটেক্স্ তৈয়ারীর একটী বৃহৎ কারখানাও খুলিয়াছেন। তাহার জন্য আখের ছোবড়া সংগ্রহ করিতে তিনি ভারতের ব্যবসায়ীদের সহিত চিঠিপত্রে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করেন।

শেঠ রামকিষণ ডালমিয়া ভারতের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধুনা শ্রেষ্ঠ ও সুপরিচিত ব্যক্তি। তাঁহার রোটাস্ ইন্ডাষ্ট্রীজ্ একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান। বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে তাঁহার অনেক চিনির কারখানা আছে। তিনি যখন জানিলেন, মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং সিলটেক্স্ তৈয়ারীর জন্য ভারতীয় চিনির কারখানা হইতে আখের ছোবড়া কিনিতে চান, তখন তিনি মিঃ আর্ম্মষ্ট্রংকে ভারতে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং কিছু কালপূর্ব্বে (১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে) ভারতে আসিয়াছিলেন।

শেঠ ডালমিয়া এবং ভারতের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সহিত মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং এ বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা বলেন। তাঁহাদের আলাপ

রামকিষণ ডালমিয়া।

আলোচনায় স্থির হইয়াছে, রোটাস্ ইন্ডাষ্ট্রীজের মূলস্থান ডেরী অন শোনে সিলটেক্স্ তৈয়ারীর একটা বৃহৎ কারখানা খোলা হইবে। তাহার অর্দ্ধেক হইবে ভারতীয় মূলধন। অবশ্য ধনকুবের শেঠ ডালমিয়া যে সমস্ত মূলধন ভারতবর্ষ হইতেই সংগ্রহ করিতে না পারিতেন তাহা নহে তবে মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং এর সাহায্য যখন একান্ত প্রয়োজন, তখন বিলাতী মূলধন কিছু না হইলে হয়না। যাহা হউক, আমরা আশা করি, শীঘ্রই ভারতে সিলটেক্স্ তৈয়ারী আরম্ভ হইবে।

অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা ডিস্‌পেপসিয়ার গৃহ-চিকিৎসা

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী]

অগ্নির সমতা রক্ষা করাই চিকিৎসকের প্রধান কর্ম্ম। অগ্নি চারি প্রকার,—(১) মন্দাগ্নি, (২) বিষমাগ্নি, (৩) তীক্ষ্ণাগ্নি, (৪) সমাগ্নি। যাহার দ্বারা অতি অল্প আহারও সম্যক পরিপাক হয় না, তাহাকে মন্দাগ্নি বলে। যাহার দ্বারা আহার কখনও সম্যকরূপে পরিপাক হয় আবার কখনও বা হয় না, তাহাকে বিষমাগ্নি বলে। যাহার দ্বারা পরিমিত বা অপরিমিত আহার অনায়াসেই পরিপাক হয়, তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্নি বলে। এই তীক্ষ্ণাগ্নিই অতি প্রবল হইলে তাহাকে ভস্মাগ্নি বলে। যাহাই যতবার আহার করা যাউক না কেন, ভস্মাগ্নি দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই ভুক্তদ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। যাহা দ্বারা পরিমিত আহার যথা সময়ে সম্যকরূপে পরিপাক হয় তাহাকে সমাগ্নি বলে।

কফের আধিক্য মন্দাগ্নির কারণ, এইজন্য মন্দাগ্নিতে কফবিশোধন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। বায়ুর আধিক্য—বিষমাগ্নির কারণ, এজন্য বিষমাগ্নিতে বায়ুর শান্তি আবশ্যক। পিত্তাধিক্য—তীক্ষ্ণাগ্নির কারণ, এজন্য তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্ত প্রশমক কার্য্য করা আবশ্যক।

ক্ষুধামান্দ্য, আহারে অরুচি, মন অপ্রসন্ন যেন কিছুই ভাল লাগিতেছে না, শরীরের জড়তা, দুর্ব্বলতা বোধ—এইগুলি অগ্নিমান্দ্যের পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, অগ্নি মন্দ হইয়া আসিতেছে। এই সময় অগ্নির যাহাতে দীপ্তি হয়, সেইরূপ ক্রিয়া আবশ্যক। এইরূপ অবস্থায় প্রত্যহ যদি ভোজনের পূর্ব্বে—কয়েক টুকরা আদার কুচি ও সৈন্ধব লবণ খাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষুধামান্দ্য দূরীভূত হইয়া থাকে ও আহারে রুচি হইয়া থাকে। অথবা—হরিতকীর গুঁড়া—চারি আনা, শুঁঠের গুঁড়া—দুই আনা, ইক্ষু গুড়—আধ তোলা, সৈন্ধব লবণ —দুই আনা, একত্রে সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। অথবা হরিতকী চূর্ণ সৈন্ধব লবণ, প্রত্যেকটি সমভাগে লইয়া একত্র মিশাইয়া

লইবে ও একটি শিশিতে ভরিয়া রাখিবে। এই মিশ্রিত চূর্ণ এক আনা হইতে দুই আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে সুন্দর ক্ষুধা হইয়া থাকে।

যাঁহাদের আহারের পর বদহজম হয়, তাঁহারা আহারের পর এই চূর্ণ গরম জলসহ সেবন করিলে উপকার পাইবেন। অথবা—সৈন্ধব লবণ ১ তোলা, পিঁপুলমূল চূর্ণ—২ তোলা পিঁপুল চূর্ণ—৩ তোলা, চই চূর্ণ—৪ তোলা, চিতামূল চূর্ণ—৫ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ—৬ তোলা, হরিতকী—৭ তোলা, একত্র মিশাইয়া লইবে ও একটী শিশিতে ভরিয়া রাখিবে। এই মিশ্রিত চূর্ণ এক আনা হইতে দুই আনা মাত্রায় শীতল জলসহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

আহারের পর অম্ল হইলে বা হজম ভাল না হইলে, এই চূর্ণ আহারের পর সেবন করিলে বদহজম বা অম্ল ভাল হইয়া থাকে।

আমাজীর্ণে—যোয়ান ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকটি দুই আনা হাতে রগড়াইয়া জলপান করিলে আমাজীর্ণ ভাল হইয়া থাকে। অথবা—দুই তোলা ডালিমের রস ও আধ তোলা পুরাতন গুড় একত্রে মিশাইয়া সেবনে আমাজীর্ণ ভাল হইয়া থাকে।

ইহাতে না কমিলে—এক তোলা ধনে ও এক তোলা শুঁঠ একত্রে আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ প্রাতঃকালে অর্দ্ধেকটা ও বৈকালে বাকী অর্দ্ধেকটা পান করিলে আমাজীর্ণ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহাতে পেট কামড়ানিও ভাল হইয়া থাকে। অথবা যোয়ান, সৈন্ধবলবণ, হরিতকী, শুঁঠ, প্রত্যেক দ্রব্য পৃথক পৃথক গুঁড়া করিয়া সমান ভাগে লইয়া একত্র মিশাইয়া লইবে ও একটি শিশিতে ভরিয়া রাখিবে। এই চূর্ণ দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় গরম-জলসহ প্রাতঃকালে ও বৈকালে সেবন করিলে আমাজীর্ণ ও আমশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

যাঁহাদের আহারের পর ভালরূপ হজম হয় না পেট ভার হইয়া থাকে, পুনরায় আহারে ইচ্ছা হয় না, তাঁহাদের পক্ষে প্রথম কয়েকদিন—আহারের পর—সৈন্ধব লবণ চারি আনা, যোয়ান দুই আনা একত্র মুখে ফেলিয়া চিবাইয়া খাইলে উপকার হইয়া থাকে অথবা—বিট-লবণ এক আনা মাত্রায় পাতি বা কাগজীলেবুর রস ও জলসহ আহারের পর সেবন করিলে উপকার হইয়া থাকে।

ইহাতে বিশেষ উপকার না হইলে হরীতকী, শুঁঠ, পিঁপুল, ডহর করঞ্জার মূল, বেলশুঁঠ, চিতামূল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে ও মিলিত দ্রব্যের সমভাগ চিনি লইয়া একত্র মিশাইয়া লইবে ও একটী শিশিতে ভরিয়া রাখিবে। এই চূর্ণ দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় আহারের পর গরম জলসহ সেবনে ভুক্তদ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হইয়া থাকে। অথবা—শোধিত হিং—॥৹ তোলা, বচ চূর্ণ—॥৹ তোলা, পিপুল চূর্ণ—১॥৹ তোলা, শুঁট চূর্ণ—২ তোলা, যোয়ান চূর্ণ—২॥৹ তোলা, হরিতকী চূর্ণ—৩ তোলা, চিতামূল চূর্ণ—৩।৹ তোলা, কুড় চূর্ণ—৪ তোলা, এই সকল চূর্ণ একত্র ভাল করিয়া মিশাইয়া লইবে ও একটী শিশিতে ভরিয়া রাখিয়া দিবে। এই চূর্ণ আহারের পর এক আনা হইতে দুই আনা মাত্রায় গরম জলসহ সেবনে ভুক্তদ্রব্য সহজে জীর্ণ হইয়া থাকে।

এইরূপ অবস্থায় ভাস্কর লবণ, অগ্নিমুখ লবণ বা বৃহদগ্নিমুখ চূর্ণ আহারের পর সেবন করিলে সুন্দর ফল দর্শিয়া থাকে।

যাঁহাদের আহারের পর পেট ফাঁপে, পেটে বায়ু হয়, তাঁহাদের পক্ষে প্রথম কয়দিন আহারের পর—মৌরী চারি আনা, যোয়ান দুই আনা, সৈন্ধব লবণ—দুই আনা একত্র চিবাইয়া খাইলে বা জল দিয়া বাটিয়া ডাবের জলসহ গুলিয়া খাইলে উপকার হইয়া থাকে। অথবা—মৌরী বাটা ১ তোলা, বিট লবণ দুই আনা একত্র কাগজী বা পাতি লেবুর রস ও শীতল জলসহ খাইলে উপকার হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায়—আহারের পর শ্বেতচূর্ণ (সাদাচটি) দুই আনা মাত্রায় লেবুর রস ও শীতল জল বা ডাবের জল অথবা কেবল শীতল জলসহ খাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অথবা ভাস্কর লবণ দুই আনা ও শ্বেতচূর্ণ এক আনা একত্র মিশাইয়া ডাবের জলসহ বা শীতল জলসহ খাইলে পেট ফাঁপা, পেটে বায়ু হওয়া, অম্ল, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া থাকে।

যাঁহাদের অরুচি হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে—পুরাতন তেঁতুল ও গুড় জলে গুলিয়া ও তাহার সহিত কিঞ্চিৎ দারুচিনির গুঁড়া মিশাইয়া কেবল কুলকুচি করিলে অরুচি ভাল হইয়া থাকে। অথবা—টক ডালিমের রসে একটু মধু ও বিট্‌লবণ মিশাইয়া কুলকুচা করিলে আহারে রুচি হইয়া থাকে। অথবা—যোয়ান, পুরাতন তেঁতুল, শুঁঠ, অম্লবেতস, ডালিমের রস ও অম্লকুল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক আধতোলা এবং ধনে, সৈন্ধব লবণ, কৃষ্ণজীরা, দারুচিনি ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সিকি তোলা, পিঁপুল ২৫টা, গোলমরিচ ৫০টা ও চিনি ৮ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া লইবে ও একটী শিশিতে ভরিয়া রাখিবে। এই মিশ্রিত চূর্ণ মুখে ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে গিলিয়া খাইবে। ইহাতে আহারে রুচি হইবে ও অজীর্ণের উপকার হইবে। অথবা—তেঁতুল ও যোয়ান চূর্ণ একত্র লেহন করিলে অরুচি দূর হইয়া থাকে।

যাঁহাদের আহারের পর অম্ল হয়, পেট ফাঁপে পেটে বায়ু হয়, তাঁহাদের পক্ষে—শোধিত হিং, শুঠ, পিঁপুল, মরিচ, যোয়ান, সৈন্ধব লবণ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেক দ্রব্য পৃথক পৃথক, চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া সমান ভাগে একত্র মিশাইয়া লইবে ও একটী শিশিতে ভরিয়া রাখিবে। এই চূর্ণ এক আনা হইতে দুই আনা মাত্রায় ভাতের প্রথম গ্রাসে গব্য ঘৃতের সহিত মাখিয়া খাইলে উপকার হইবে।

এই ঔষধ—ভাতের সহিত না খাইয়া যদি প্রাতঃকালে শীতল জলের সহিত সেবন করা যায় ও আহারের পর একটী ডাবের জল খাওয়া যায়, তাহা হইলে সুন্দর ফল হইয়া থাকে।

যেখানে হিং সহ্য হইবেনা, সেখানে ভাস্কর লবণ দুই আনা ও শ্বেতচূর্ণ এক আনা একত্র মিশাইয়া আহারেব পর ডাবের জলসহ সেবনে উপকার হইবে।

যোয়ান বাটিয়া পেটে পুরু করিয়া প্রলেপ দিলে পেট ফাঁপা ও পেট ভার হওয়া দূর হইয়া থাকে। ইহাতে না কমিলে—দেবদারু, বচ, কুড়, শুল্ফ, শোধিত হিং, সৈন্ধব লবণ,

এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁজি দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে পেট ফাঁপা দূরীভূত হইয়া থাকে।

সেঁক—যব ও যবক্ষার চূর্ণ সমভাগে লইয়া ঘোলের সহিত মিশাইয়া উষ্ণ করিয়া বোতলে পুরিয়া সেঁক দিলে পেটবেদনা ও পেটফাঁপা ভাল হইয়া থাকে।

যেখানে ভুক্তবস্তু পরিপাকের পর শূলবেদনা ধরে, সেখানে একটী সুপক্ক নারিকেলের উপরে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে সৈন্ধব লবণ যতটা ধরিতে পারে পূর্ণ করিয়া মৃত্তিকা সংযুক্ত বস্ত্র খণ্ড দ্বারা বেষ্টন করিয়া শুকাইয়া লইয়া ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া লইবে। তাহার পর উহা আগুন হইতে উঠাইয়া মাটিগুলি ফেলিয়া দিয়া নারিকেলের শাঁস ও চূর্ণগুলি বেশ করিয়া মিশাইয়া লইবে ও একটি শিশিতে ভরিয়া রাখিবে। এই চূর্ণ দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় আহারের পর সেবন করিলে উপকার হইয়া থাকে।

এইরূপ অবস্থায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও বৈকালে একটী কাঁচা আমলকী বাটিয়া ঝুনা নারিকেলের জলসহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কাঁচা আমলকী না পাওয়া যাইলে, আমলা (২।৩টী) এক ছটাক জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতে ঐ জল ছাঁকিয়া পান করিলেও সুন্দর ফল দর্শিয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় ধাত্রীলৌহ একবার করিয়া সেবন হিতকর।

যেখানে অজীর্ণ জন্য অধিক মল নিঃসরণ হয় বা যাহা খাওয়া যায়, তাই গোটা গোটা মলের সহিত বাহির হইয়া যায়, সেরূপ স্থলে—ধনে এক তোলা, শুঁট এক তোলা একত্র আধসের জলে মাটীর হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল পান করিলে উপকার হইয়া থাকে। তিন চারি দিন উহা পান করিয়া উপকার না হইলে—ধনে, শুঠ, মুতা, বালা, বেল শুঁঠ, এক একটী দ্রব্য সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে জ্বাল দিয়া আধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথে একটু চিনি মিশাইয়া পান করিলে ভাল হইবে। অথবা—দাড়িম পত্র, জাম পত্র, পাণিফল পত্র, বালা, মুতা, শুঠ, কাঁচড়া পত্র, প্রত্যেকটী সাড়ে সাত আনা ওজনে লইয়া ঐরূপ ভাবে আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে ভাল হইয়া থাকে। অথবা—লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ, সোহাগার খই, ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া আপাং মূলের রসে একদিন মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে ও চিতামূলের রসে একদিন মাড়িয়া রৌদ্রে ঈষৎ শুষ্ক করিয়া দুই রতি পরিমাণ বটী পাকাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে ও একটি শিশিতে ভরিয়া রাখিবে। এই বটী প্রাতঃকালে ও বৈকালে একটী করিয়া শীতল জলসহ বা আতপ চাউল ভিজান জলসহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অথবা জায়ফল চূর্ণ, লবঙ্গ চূর্ণ, সাদা জীরা চূর্ণ, সোহাগার খই, প্রত্যেকটী সমান ভাগে লইয়া একত্র মিশাইয়া লইবে ও একটি শিশিতে ভরিয়া রাখিয়া দিবে। এই চূর্ণ দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় মধু ও চিনিসহ আহারের পর সেবনে ভাল হইয়া থাকে।

এরূপ অবস্থায়—রামবাণ, মহাশঙ্খবটী, অজীর্ণ কণ্টক রস অগ্নিকুমার রস প্রভৃতি ঔষধ একবার করিয়া সেবন হিতকর।

সঞ্চয় হীনের দশা

বয়স কালে হরেন বাবুর অর্থ সম্পদ, মান সম্ভ্রম, বন্ধুবান্ধব, সভাসদ, চাটুকার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার কথায় লোকে উঠিত বসিত। তিনি বলিলে লোকের চাকরি জুটিয়া যাইত। তিনি অসন্তুষ্ট হইলে কাহারও রক্ষা থাকিত না। ভোগে, বিলাসে, অভিনব খেয়ালে হরেন বাবুকে প্রাচীন বাদশাহী আদর্শের এক আধুনিক উদাহরণ বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। শুনা যায়, তিনি ছুটির সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইলে বাংলা দেশের মাটী ও জল হাওয়া ব্যতীত আর সকল উপকরণই সঙ্গে লইয়া চলিতেন। সুদূর পশ্চিমে, বাংলার একান্ত নিজের তরি তরকারী ও মৎস্য, অথবা যথাযথ ও নির্দ্দিষ্ট জাতীয় চাল, ডাল, তৈল, ঘৃত, চাকর, ঝি, বাসন, আসবাব, সটকা তামাক কিম্বা কোন কিছুর অভাব হইলে হরেন বাবু তাহা বরদাস্ত করিতেন না। কন্যার বিবাহ কিম্বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে হরেন বাবুর ফিরিস্তি জার্ম্মান সমরের হতাহতের তালিকার মতই সুদীর্ঘ ও সর্ব্বগ্রাসী হইত। সে আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কিন্তু এখনও সে কথা লোকে কিম্বদন্তীর মতই আওড়াইতে থাকে।

কিন্তু, এ হেন হরেন বাবু আজ চাকরী অবসানে হৃত-সম্পদ এবং বিগত যৌবন অবস্থায় ছোট আদালতের উকিল মহলের "টাউট"। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন বাদী ফরিয়াদীদের উপযুক্ত উকিল সরবরাহ করিয়া দিনান্তে দুই এক টাকা সংগ্রহ করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া যান। ছোট টিনের চালায় স্বপাকে আহার ও ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করেন। কেন? কারণ, কিছুই নহে —শুধু অর্থাভাব। যৌবনে অগাধ অর্থ সম্পদ অপব্যবহার করিয়া হরেন বাবু আজ নিঃসম্বল। কিছু টাকা যাহা ছিল ভাটার মুখে রাতারাতি বড়লোক হইতে গিয়া তথাকথিত ব্যবসায়ে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহার দৌলতে কত লোকের একদিন সুসময়ে গিয়াছে, আজ তাহারই অভাবের দিনে কাহাকেও কোথাও দেখা যায় না।

গল্পটী কিছু অভিনব নহে। সময়ে বার্দ্ধক্যের পুঁজি ঠিক করিয়া না রাখিলে অনেকেরই এই দশা হয়। শুধু মানুষ কেন, জীবজগতে সঞ্চয়ের মূল্য সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য। উদাহরণ, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি। সময় থাকিতে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখা প্রয়োজন।

জীবন-বীমারও সার্থকতা এই কারণেই। যৌবনে, রোজগারের সময়ে, বিন্দু বিন্দু, করিয়া যে অর্থ বীমায় রক্ষিত হয়, অভাবের সময়ে নিজের বা নিজের অবর্ত্তমানে, পরিবারবর্গের নিকট তাহাই প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, শীতল, সরোবরের রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হয়। বীমায় রক্ষিত অর্থ, সকল ভুল, ভ্রান্তি, মোহ, ও অপচয় আশঙ্কার উপরে। জীবিত থাকিলে বীমা বার্দ্ধক্যের সম্বল, মৃত্যু ঘটিলে পরিবারের আশ্রয়। ইহা ব্যতীত পুত্রের শিক্ষা কিম্বা কন্যার বিবাহের জন্যও বিশেষ বীমা করা যায়।

এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত উপদেশ পাইতে হইলে **ভারত ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ**, ভারত ভবন, কলিকাতা, ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। "ভারত" অদ্যাবধি তাহার বীমাকারীদিগকে এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়াছে। চল্লিশ বৎসরের পুরাতন আফিস। বর্ত্তমানে মোট তহবিল দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। বীমার সর্ত্ত প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা ও লাভজনক। বীমাকারীদের পাওনা শোধ অতিসত্বর ও নির্ঝঞ্ঝাটে করা হয়। বাংলার সর্ব্বত্র এজেন্ট আছে।

গ্রেট ব্রটেনের ব্যবসা

শ্রীরামানুজ কর

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

লর্ড রদারমিয়ারের পিতা ব্যারিষ্টার ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত লর্ড নর্থ ক্লিফ, নর্থ ক্লিফ নিউজপেপার লিঃ স্থাপন করেন। এই কোম্পানীর মূলধন ২৫ লক্ষ পাউণ্ড। ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের ডিবেঞ্চার আছে। লর্ড রদারমিয়ার বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর চেয়ারম্যান। তাঁহার পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের অংশ আছে। এই কোম্পানী কতকগুলি সান্ধ্য পত্রিকা প্রকাশ করে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সার লিসেষ্টার হামস্ওয়র্থ ২২ বৎসর পালিয়ামেণ্টের সদস্য ছিলেন। ইনিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লর্ড নর্থক্লিফের সহিত এম্যালগ্যামেটেড প্রেসেরও ডিরেক্টর ছিলেন। গত জানুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যু কালে তিনি ওয়েষ্টার্ণ মর্নিং নিউজ কোম্পানী ও ওয়েষ্টার্ণ টাইমস্, কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছিলেন। লর্ড রদারমিয়ারের সম্পত্তির পরিমাণ ২০ কোটী টাকা। তিনিও সাদাসিদায় জীবন যাপন করেন। একটি হোটেলে ২টী কুঠরী ভাড়া লইয়া বাস করেন। ডেলি মেল ট্রাষ্টের মূলধন ৮লক্ষ পাউণ্ড। লর্ড উপাধিধারী কয়েকজন এই কোম্পানীর ডিরেক্টর আছেন। লর্ড বার্ণহাম ডেলি টেলিগ্রাফের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। লর্ড মাউণ্ট ষ্টিফেন ২টি রেলওয়ের চেয়ারম্যান ছিলেন। আর্ল শ্রুজবেরী উচ্চদরের ব্যবসায়ী ছিলেন।

যে সকল ইংরাজ এদেশে আসিয়া রাজকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহারা ব্যবসায়েও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সরকারী চাকরী হইতে অবসর লইয়া ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। অনেকে আবার চাকরীর মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিয়া এদেশেই ব্যবসায়ে যোগ দান করেন। আর আমাদের বাঙ্গালী বাবুরা ৩০।৩৫ বৎসব সরকারী চাকরী করিয়া অবসর লইবার কালে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য অবেদন করিয়া বিফল হইলে অবসর লইতে বাধ্য হন। তখন চারিদিকে সরিষার ফুল দেখিতে থাকেন। কেহ অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার জন্য আবেদন করেন, কেহবা কোন জমিদারের অধীনে চাকরীর সন্ধান করিতে থাকেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব সচিব সার জর্জ্জ সুষ্টার অবসর লইয়া বিলাতে যাইয়া ইংলিশ স্কাডিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। সার ব্যাসিল ব্ল্যাকেট ইম্পিরিয়েল ও ইণ্টার ন্যাশন্যাল কোম্পানীর চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট লর্ড মেষ্টন

কলিকাতা ইলেকট্রিক্ সাপ্লাই কোম্পানীর চেয়ারম্যান এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী সমিতির ভূতপূর্ব্ব সদস্য সার জেমস্ ডোনাল্ড এই কোম্পানীর ডিরেক্টর। বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব লাট এবং মিশরের ভূতপূর্ব্ব হাই কমিশনার লর্ড লয়েড টমাস কুক্ কোম্পানীর ডিরেক্টর। যুক্তপ্রদেশ ও ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার হারকোর্ট বাটলার পেনিনসুলার ও ওরিয়েণ্ট্যাল ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন; ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রিডিং বিলাতে যাইয়া একটী বৃহৎ কোম্পানীর ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। লর্ড উইলিংডন বিলাতে যাইয়া মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হইয়াছেন। সিভিলিয়ান মিঃ টমসন সরকারী চাকরী ত্যাগ করিয়া বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছেন। মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্রিফিথ সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিয়া চা বাগানে যোগদান করিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ চাকরী ত্যাগ করিয়া ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক হইয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব জিলাম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এসকলী চাকরী ত্যাগ করিয়া বিলাতের ডানলপ কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছেন। বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড সিডেনহাম সাউথ আফ্রিকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ছিলেন। সিভিলিয়ান মিঃ সিম্ ভিকার্স লিমিটেডের সেক্রেটারী এবং যুক্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সারজন হিউয়েট ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর ছিলেন। ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার রেজিন্যাল্ড ক্র্যাডক, সার গডফ্রে ফেল, সারজন মার্ফি বড় বড় কোম্পানীর ডিরেক্টর হইয়াছেন। সার গডফ্রে ক্লার্ক টেলিগ্রাফ কনট্রাক্‌সন কোম্পানীর এবং মিঃ গুবে পেনিনসুলার ওরিয়েণ্ট্যাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হইয়াছিলেন।

বিগত মহাযুদ্ধে ইংরাজ ভারত ও চীন দেশের কাপড়ের বাজারে চাহিদা মত মাল যোগান দিতে না পারায় জাপান ধীরে ধীরে এই বাজার দখল করিয়া বসে। যুদ্ধের পর বহু চেষ্টা করিয়াও ইংরাজ এই দুই দেশের কাপড়ের বাজার দখল করিতে পারে নাই। ইংরাজ জাপানের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে নাই। এদিকে ভারত ও চীনে অনেকগুলি কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। কাজেই ইংরাজ আর সুবিধা করিতে পারিতেছে না। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিলে যদি কোন সুবিধা হয় কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইতেছে না। এখনও কাপড়ের কলে বহু টাকা খাটিতেছে। ল্যাঙ্কাশায়ার কটন কর্পোরেশনের মূলধন ৩৭ লক্ষ ২২ হাজার পাউণ্ড। অংশীদারের সংখ্যা ১২ হাজার। কম্বাইণ্ড ইজিপ্সিয়ান কটন মিলস্ এর অধীনে ৩৫টী কল আছে। টাকুর সংখ্যা ৩২ লক্ষ ৪৭ হাজার। গত বৎসর ৬৬ হাজার এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরে ১ লক্ষ ১৮ হাজার পাউণ্ড ক্ষতি হইয়াছে। যুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে এম্যালগ্যামেটেড কটন মিলস্ গঠিত হয়। ইহার মূলধন ৭২॥ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৫ সালে ১০ হাজার ৮ শত এবং গত বর্ষে ১৪ হাজার ৯ শত পাউণ্ড ক্ষতি হইয়াছে। নিউ কটন মিলস, ১৮৯১ সালে স্থাপিত হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে অবস্থা খুব ভাল ছিল। মূলধন ৩॥ লক্ষ পাউণ্ড। গত ১৯২১ সাল হইতে অংশীদারগণ কোন লভ্যাংশ পায় নাই। এক পাউণ্ড শেয়ারের মূল্য ১১

পেনী হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ৮০ বৎসরের পুরাতন লায়ন লর্ড কোং ১৬॥ লক্ষ টাকা দেনার দায়ে কারবার গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে। এই কোম্পানী ভারতবর্ষে বহু লক্ষ টাকার মাল পাঠাইয়াছিল, কিন্তু বাজার মন্দা পড়ায় ভারতীয় মহাজনগণ মাল না লওয়ায় এত ক্ষতি হয় যে কোম্পানী কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হয়।

বিলাতে কারবার খুলিয়া জনসাধারণকে ফাঁকী দিবার চেষ্টাও হয়, শেষে ধরা পড়িলে জেলে যাইতে বাধ্য হয়। হার্টি কোম্পানীর পতনের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। ক্লারেন্স হার্টি এডমণ্ড ড্যানিয়েল, এলবার্ট ট্যাবোর ও জন ডিক্সর্ণ এই চারিজনে মিলিয়া এক কোম্পানী খুলেন। কোম্পানীর আদায়ী মূলধন ৩১ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড ছিল। ২ কোটি ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড দেনা এবং ১ কোটি ৩৫ পাউণ্ড পাওনা হইয়াছিল। কিন্তু এই পাওনা আদায়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না! দেনাদারগণের কোন জামীন ছিল না। ইহারা সকলেই ধৃত হইয়া জেলে যাইতে বাধ্য হয়। হার্টির বয়স তখন ৪০ বৎসর হইয়াছিল।

গত জুন মাসে ৭৪ বৎসর বয়সে লর্ড কীলস্যান্টের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি পার্লিয়ামেন্টের সদস্য ছিলেন, যুদ্ধের সময় নাইট হইয়াছিলেন, এবং যুদ্ধের পর লর্ড উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনি বৃটিশ সাম্রাজ্য বণিক সঙ্ঘ ও লণ্ডন বণিক সভার প্রেসিডেণ্ট এবং গ্রেট বৃটেনের পোত বিভাগের চেম্বারের চেয়ারম্যান ছিলেন। রয়াল মেল ষ্টীম কোম্পানী এই লর্ডের বিরুদ্ধে অলীক পূর্ব্বাভাস পত্র প্রকাশ করিবার অভিযোগে মামলা রুজু করিয়াছিল। আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় এক বৎসর হাজত বাস হইয়াছিল। হাজতে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী ছিলেন। ইনি উক্ত কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। মিথ্যা বিবরণী প্রকাশ করার জন্য তিনি কারাবন্দী হইয়াছিলেন। ইনি ৪৩টি কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন।

বেল্ট্ পেইণ্ট্ তৈয়ারী করিবার মশলা

কারখানায় নানাবিধ ইঞ্জিন-মেশিন চালাইবার জন্য পুলির সঙ্গে বেল্ট্ জোগান দেওয়া হয়। এই বেল্ট্ যতই আঁট হইয়া পুলির সঙ্গে থাকে ততই উহা আর পুলির উপরে পিছলাইয়া যায় না। সুতরাং মেসিন খুব ভাল চলে এবং একদিকে যেমন শক্তি-ব্যয়, অর্থাৎ Power Consumption কম হয়, অন্যদিকে তেমনি মেসিনের উৎপাদন ক্ষমতাও (Efficiency) বাড়িয়া যায়। কয়েকদিন চলিবার পর নূতন বেল্‌টি ঘর্ষণে ঘর্ষণে কিঞ্চিৎ পালিশ হইয়া গেলে পুলির সহিত উহার তেমন আঁট থাকেনা,—তখন বেল্ট্ পিছলাইবার ব্যাপারটী ঘটে। ইহাকে কারখানার ভাষায় বলে বেল্ট্-স্লিপ (Belt-slip). ইহার প্রতিষেধার্থে বেল্টের ভিতরের দিকে একটা মশলা মাখান হয়। ইহাকে বেল্ট-পেইণ্ট অথবা বেল্ট সিরাপ বলে। ইহা তৈয়ারী করিবার পদ্ধতি নিম্নে লিখিত হইল ;—

(১) ট্যালো (Tallow)	৫০ ভাগ
রেড়ির তৈল (অবিশুদ্ধ)	২০ „
মাছ হইতে প্রস্তুত তৈল (Fish oil)	২০ „
কলোফনি (Colophony)	১০ „

এই সমস্ত উপকরণ অল্প আঁচে একটী পাত্রে গলাইয়া খুব নাড়িয়া মিশাইয়া লউন। তারপর নামাইয়া যতক্ষণ না ঠাণ্ডা হয়, ততক্ষণ নাড়িতে থাকুন। ক্রমশঃ ঘন হইয়া আসিলে টিনে পুরিয়া রাখুন।

(২) প্রথমতঃ একটী উত্তমরূপে বন্ধ লৌহ পাত্রে ১২২ ডিগ্রী ফারেনহাইট্ উত্তাপে (ইহার বেশী যেন উত্তাপ না হয়, সে বিষয়ে সাবধান হইবেন) ২৫০ ভাগ তাপিণ তেলের সহিত ২৫০ ভাগ গাম্ ইলাষ্টিক (Gum Elastic) গলাইয়া লউন এবং উহার সহিত ২০০ ভাগ কলোফণী (Colophny) উত্তমরূপে মিশ্রিত করুন। আর একটু গলাইয়া তাহার সহিত ২০০ ভাগ হলদে মোম্ (Yellow wax) মিশান। ইহার নাম হইল প্রথম মিক্‌শ্চার। আর একটী পাত্রে ৭৫০ ভাগ উত্তপ্ত ট্রেইন তৈলের (Train oil) সহিত ২৫০ ভাগ ট্যালো (Tallow) বা চর্ব্বি গলাইয়া লউন। ইহার সহিত মিক্‌শ্চারটী গরম অবস্থায় খুব নাড়িয়া চাড়িয়া মিশ্রিত

করুন এবং যতক্ষণ না ঠাণ্ডা হয়, ততক্ষণ নাড়িতে থাকুন। তারপর ঠাণ্ডা হইলে টিনে পুরিয়া রাখুন। এই পেইষ্ট্ কার্পাস-সূত্র নির্ম্মিত বেল্টের পক্ষে উপযোগী।

(৩) গাটাপার্চ্চা	৪০ ভাগ
রোজিন্ (Rosin)	১০ ,,
য়্যাস্ফাল্ট (Asphalt)	১৫ ,,
পেট্রোলিয়াম	৬০ ,,

এই সকল উপকরণ একটা কাচ পাত্রে রাখিয়া ফুটন্ত জলের উপর বসাইয়া কয়েক ঘণ্টা যাবৎ গরম করুন;—যতক্ষণ সমস্তটা গলিয়া এবং ভাল রকমে মিশিয়া তরল হইয়া না যায়। তারপর ঠাণ্ডা হইলে উহার সহিত ১৫ ভাগ কারবন-ডাই-সালফাইড্ (Corbon dy sulphide) মিশাইয়া রাখিয়া দিন। মাঝে মাঝে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া লইবেন।

(৪) একটী উত্তপ্তগন্ধপে আবৃত লৌহ পাত্রে ১৫২ ডিগ্রী ফারেণহাইট্ উত্তাপে কুচি-কুচি কাটা দশভাগ কুচুক (Caont-chonc) দশভাগ বিশুদ্ধ তার্পিণ তৈলের সহিত গরম করিয়া গলাইয়া লউন। তারপর উহার সহিত ৮ ভাগ কলোফণী (Colophony) মিশাইয়া খুব নাড়িতে থাকুন। উহা গলিয়া গেলে এক ভাগ হলদে মোম মিশ্রিত করুন। ইহার নাম হইল প্রথম মিক্শ্চার।

আর একটী পাত্রে ৩০ ভাগ মাছ-তৈল (Fish oil) এবং ১০ ভাগ ট্যালো (Tallow) গরম করিয়া গলাইয়া লউন। তারপর ইহার সহিত প্রথম মিক্শ্চার মিশাইয়া খুব নাড়িতে থাকুন,—যতক্ষণ না সমস্তটা ঠাণ্ডা ও ঘন হইয়া না আসে। এই চর্ব্বির মত মশলাটী পুরাতন বেল্টের দুই পিঠে মাখাইলে উহা জোরাল ও ট্যাকসই হয়।

কৃত্রিম এমেরি প্রস্তুত করিবার মশলা

ধাতু দ্রব্যাদি পালিশের কার্য্যে এমেরি পাউডার নানা প্রকারে ব্যবহৃত হয়। এই এমেরি স্বাভাবিক অবস্থায় স্মার্ণা, ন্যাক্সস্ প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। রাসায়নিক বিজ্ঞান হিসাবে এমেরি বাস্তবিক য়্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ভিন্ন আর কিছুই নহে। খনিতে যে স্বাভাবিক এমোর পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। সুতরাং কৃত্রিম এমেরি তৈয়ার করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিম্নে তাহার একটী ফরমুলা দেওয়া গেল;—

বক্সাইট্ (Bouxite)	৭৫৯ ভাগ
কোক্ কয়লা (Coke)	৭০০ ,,
পটাশ, সোডা অথবা লাইম কারবনেট্ (Carbonate of Potash, Soda or lime)	৯৬ ,,

একটী উনুনে উপরি-উক্ত দ্রব্য সমূহ পরতে পরতে সাজাইয়া উত্তাপে গলাইয়া মিশাইয়া লইবেন। ইহা হইতে যে চূর্ণ পাওয়া যাইবে, তাহা স্বাভাবিক এমেরির মতই কার্য্যোপযোগী হয় এবং ইহার খরচও বেশী নহে। কারবনেট্ মশলাটী লাইমের লওয়াই যুক্তি সঙ্গত। কারণ তাহার দাম কম।

ক্ষুর শান দিবার পেইষ্ট্ বা ষ্ট্রপ করিবার মশলা

ক্ষুরে ধার করিবার জন্য ষ্ট্রপে যে পেইষ্ট মশলা ব্যবহার হয়, তাহার প্রধান উপকরণ

রুজ (Rouge) ও এমেরি (Emery) পাউডার। এমেরিকে অতি সূক্ষ্ম চূর্ণরূপে লইতে হয়। লেভিগেটেড্ (Levigated) এমেরি লইলেই ভাল। সাধারণ এমেরি চূর্ণকে জলে গুলিয়া রাখিয়া দিলে, মোটা অংশ তলানিরূপে পাত্রের নীচে জমিবে। মিহি এমেরি উপরের জলের সহিত মিশিয়া থাকিবে। ঐ উপরের জল আস্তে আস্তে পৃথক পাত্রে ঢালিয়া নিতে হয়। তৎপরে উহাকে প্রশস্ত অগভীর থালায় রৌদ্রে রাখিয়া বাষ্পরূপে জলীয় অংশকে উড়াইয়া দিলেই মিহি এমেরি পাওয়া যাইবে। ইহাকেই লেভিগেটেড্ এমেরি বলে।

সাধারণতঃ মিহি এমেরি ও রুজ পাউডার সমপরিমাণে লইয়া চর্ব্বি জাতীয় কোন দ্রব্যের সহিত ভালরূপে মিশাইলেই ষ্ট্রপ্ পেইষ্ট্ তৈয়ারী করা যায়। চর্ব্বিজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে স্পারমাসেটী অয়েন্টমেন্ট্ (Spermaceti ointment), সিউয়েট্ (Suet), অথবা তৈয়ারী লার্ড (Prepared lard) ব্যবহার করা যাইতে পারে। চর্ব্বির পরিবর্ত্তে সাবান জাতীয় দ্রব্য হইলেও চলে। রুজ ও এমেরি পাউডারের সহিত কোক্ চূর্ণ ও দেওয়া যায়। তাহাতে শান খুব ভাল হয়।

আর একটী প্রক্রিয়া এই ;—প্রথমতঃ এক হাজার ভাগ গব্য চর্ব্বি গলাইয়া উহার সহিত ২৫০ ভাগ তৈল মিশ্রিত করুন। যখন ইহা খুব ভালরূপে মিশিয়া যাইবে, তখন উহাতে ১৫০ ভাগ লেভিগেটেড্ এমেরি ১০০ ভাগ টিন-ছাই (Tin-ashes) এবং ৫০ ভাগ আয়রণ অক্সাইড্ মিশাইয়া লউন। ঠাণ্ডা না হওয়া পর্য্যন্ত এই মিশ্রিত মশলাটীকে খুব নাড়া চাড়া করিবেন। নতুবা দ্রব্যগুলি সমানভাবে মিশিবে না। ঠাণ্ডা হইলে উহাকে যথারীতি কৌটায় পুরিয়া রাখিবেন। চামড়ার ষ্ট্রপে এই পেইষ্ট্ অতি অল্প পরিমাণ মাখাইয়া ক্ষুর শান দিলেই খুব তীক্ষ্ণ ধার হইবে।

আর একটী ফরমুলা,—

টিন্-ছাই (Tin-ashes)	২ ভাগ
কলকথার (Colcothar)	২ ,,
রেতিঘষা লোহা চুর, অথবা কামারশালের লোহার আঁইস্	১ ,,
বিশুদ্ধ লিভান্টাইন্ শান পাথরের মিহি চূর্ণ	৭ ,,
গব্য সিউয়েট্ (Beef suet)	৩ ,,

সিউয়েট্ ব্যতীত উপরি উক্ত সমস্ত উপকরণ গুলিকে মিহি চূর্ণ করিয়া গলান সিউয়েটের সহিত ভালরূপে মিশাইয়া লইলেই পেইষ্ট্ প্রস্তুত হইল।

আর একটী ফরমুলার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি,—

কলকথার (Colcothar)	৩ ভাগ
পিউমিস্ ষ্টোন্ (Pumice stone)	৩ ,,
গ্রাফাইট্ (Graphite)	৯ ,,
রক্ত পাথর (Red hematite)	৪ ,,
রেতি ঘষা লোহা চুর	২ ,,

উপরি উক্ত মশলাগুলি খুব মিহি চূর্ণ করিয়া এবং জলে ধুইয়া নিম্নলিখিত মশলাগুলির সহিত মিশাইবেন,—

মোম	৪ ভাগ
সাবান	৪ ,,
চর্ব্বি	৪ ,,
অলিভ্ অয়েল (Olive oil)	৪ ,,

এই শেষোক্ত মশলাগুলির মধ্যে মোম, সাবান ও চর্ব্বিকে প্রথমতঃ গলাইয়া লইবেন। গ্র্যাফটিং ওয়াক্স্ (Grafting wax) নামক একপ্রকার মোম বাজারে চলতি আছে, সেই মোম ব্যবহার করিলেই ভাল হয়। ক্ষুরের যেই দিকটা পালিশ করিবেন সেই দিকে নিম্নলিখিত দুইটী মশলার যে কোন একটী মাখাইয়া লইবেন,—

(১) শান পাথরে (Honing stone) চর্ব্বির (Axli grease) সহিত টিন্-ছাই (Tin ashes খুব মিহিরূপে ঘষিয়া উহা ক্ষুরের উপর মাখাইবেন।

(২) অলিভ্ অয়েলের (Olive oil) সহিত জলে ধৌত গ্র্যাফাইট্ মিশাইয়া উহা ক্ষুরের উপর মাখাইবেন।

উৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন

নিম পাতা চূর্ণ	৷৶০	
চিকি সুপারী	১	সের
বকুল ছাল চূর্ণ	২	তোলা
তামাকের গুল চূর্ণ	১	,,
হরিতকী চূর্ণ	১	,,
মাজুফল চূর্ণ	১	,,
একাঙ্গী	৷০	,,
কর্পূর	।০	,,
ফিটকিরির খৈ	।০	,,
পোড়া তুঁতে	৶০	,,
গোল মরিচ চূর্ণ	।০	,,
চা খড়ি	৮	,,

একত্রে মিশাইয়া বকুল ছালের রস দিয়া মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া শিশিতে রাখিতে হইবে।

ভারতে কেমিক্যাল শিল্পের প্রয়োজনীয়তা

কোন দেশে যখন শিল্প-প্রসারণ ঘটে তখন সেখানে রাসায়নিক দ্রব্যাদির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। তার কারণ হচ্ছে যে, নানা রকম শিল্প ইত্যাদিতে রাসায়নিক দ্রব্য কিয়ৎ পরিমাণে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষতঃ জার্ম্মানীতে এই রাসায়নিক দ্রব্য সমূহ যে কী ভয়ঙ্কর কাজে লাগে তা' ভেবে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। সে-সমস্ত স্থানে প্রাকৃতিক কৃষিজ দ্রব্যের অভাবহেতু তারা রাসায়নিক দ্রব্য হ'তে কৃত্রিম উপায়ে কাঁচামাল প্রস্তুত করে কাজ চালিয়ে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, ঐ রকম কৃত্রিম কাঁচামাল ব্যবহারের দরুণ তাদের উৎপাদন-খরচ এত কম পড়ছে যে, অপর কোন দেশের পক্ষে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালানো সম্ভব নয়।

একটা সামান্য উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার হ'বে। সকলেই জানেন যে আমাদের দেশে এক সময় নীলের চাষ কিরকম প্রচলিত ছিল, বস্তুতঃ বিশ্বের নীলের যোগান আমাদের দেশের চাষের উপর নির্ভর করত; কিন্তু জার্ম্মানীতে কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের নীলচাষ একেবারে ধ্বংস হয়েছে। কেবলমাত্র নীল নয় কৃত্রিম রেশম আবিষ্কৃত হয়ে জগতের রেশম শিল্পকে নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত কৃত্রিম দ্রব্য আবিষ্কারে একটা সুবিধা হয়েছে এই যে, রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ভয়ঙ্কর রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা, ও জাপানে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের বহু কারখানা আছে। আমাদের দেশে কৃত্রিম উপায়ে কোন কাঁচামাল উৎপাদিত হয় না সত্য, কিন্তু আমাদের দেশে সাবান, প্রসাধন দ্রব্যাদি, ওষুধ প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য বড় কম কেমিক্যাল দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয় না। আর সে-সমস্তর অধিকাংশই আমাদের বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। এটা দুঃখের ও লজ্জার কথা।

যদি বোঝা যেত যে, আমাদের দেশে কেমিক্যাল দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কোন উপায় নেই তাহ'লে সেটা স্বতন্ত্র কথা ছিল; কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের দেশে কেমিক্যাল দ্রব্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে, তবে সে উৎপাদন চাহিদানুরূপ নয়—তার আরও প্রসারতা প্রয়োজন। ভারতে বর্ত্তমানে ২।৩ কোটি টাকার কেমিক্যাল দ্রব্যাদি আমদানী হয়ে থাকে, তন্মধ্যে ১ কোটি টাকার ওপর সোডা-কম্পাউণ্ডস্, ১৫ লক্ষ টাকার পটাশিয়াম কম্পাউণ্ড, ১০ লক্ষ টাকার এ্যাসিড্, ৯ লক্ষ টাকার কারবাইড্, ১০ লক্ষ টাকার প্রতিশেধক

দ্রব্য ও ৯ লক্ষ টাকার এ্যামোনিয়া ও সল্টস্ উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত তালিকা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের উক্ত পরিমাণ দ্রব্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আমাদের তদনুরূপ দেশী যোগান মোটেই নেই। যদি ধনী ব্যবসায়ীরা এই কেমিক্যাল দ্রব্যের উৎপাদনের দিকে মনোনিবেশ করেন তাহ'লে তাঁরা যে লাভবান হবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ভারতে বিভিন্ন কেমিক্যাল দ্রব্য কি পরিমাণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায়না। তবে নিম্নলিখিত গড়-পরিমাণ প্রধান প্রধান কেমিক্যাল দ্রব্যভারতে উৎপাদিত হয়ে থাকে :—

সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড	২০,০০০	২২,০০০	টন
হাইড্রোক্লোরিক ,,	৫০০	৬০০	,,
নাইট্রিক্ ,,	৫০০	৬০০	,,
ফস্‌ফোরিক ,,	১৩৫		,,
জিঙ্ক ক্লোরাইড্ (zinc chloride)	৫'৫		,,
এপসম্ সল্ট (Epsom salt)	২,৫০০	৩,০০০	,,
এলাম অব পটাশ (alum of potash)	৮০০	১,০০০	,,
কপেরাস (copperas)	৮০০	১,০০০	,,
কপার সালফেট	১০০		,,
গ্লোবারস সল্ট (glaubers salt)	১,০০০		,,
এ্যালুমিনা ফেরিক (Alumina ferric)	১,০০০		,,
বোন সুপার ফস্‌ফেট্	৩০০		,,
বোন্ মিল্ (Bone meal)	১০০,০০০		,,
Mixed fertilisers	৩,০০০		,,
এলাম (alum)	৬০০		,,
Alumina sulphate pure	৬০		,,
Bituminous paint	১৬০		,,
Red Lead	৭৫০		,,

উপরোক্ত তালিকার পরিমাণ থেকে বোঝা যায় যে, ভারতে কতকটা পরিমাণ কেমিক্যাল দ্রব্য উৎপাদিত হলেও তার চাহিদানুযায়ী কিছুই হয় না; তা' যদি হ'ত তাহ'লে পূর্ব্বোক্ত ২১৩ কোটি টাকার মাল ভারত বছর বছর আমদানী করত না। প্রত্যেক ব্যবসায়ী মাত্রকেই স্বীকার করতে হ'বে যে, কেমিক্যাল দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের পক্ষে ভারতে যথেষ্ট সুযোগ পড়ে রয়েছে, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করবার লোকের অভাব দেখা যাচ্ছে। আজ দেশের ধনী সম্প্রদায়ের যদি এধারে দৃষ্টি পতিত হয় তাহ'লে ভারত যে শুধু ব্যবসার দিকদিয়ে অগ্রগামী হ'বে তা' নয়; পরন্তু আজকের এই দারুণ বেকার সমস্যার যুগে বহু লোকের তাতে অন্ন সংস্থান ঘটবে।

প্রত্যেক দেশেই কেমিক্যাল দ্রব্যের মধ্যে সালফিউরিক এ্যাসিড এবং সোডা কারবোনেট, সোডা বাই কারবোনেট্, কস্‌টিক্ সোডা ও পটাস, এ্যামোনিয়া, এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড্। এ্যামোনিয়াম সালফেট্ প্রভৃতি ক্ষার পদার্থগুলিই বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সত্যি-কথা বলতে কি, কোন দেশের সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিডের উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিমাণই সে-দেশের কেমিক্যাল্ ইণ্ডাষ্ট্রীর উন্নতির সহজ মাপকাঠি। ভারতে প্রতিবছর ২০ হাজার টন সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড্ উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এদেখে মনে হ'তে পারে

যে ভারতে ত যথেষ্ট কেমিক্যাল শিল্পের উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু আসলে তা' নয়; অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের এই সালফিউরিক এ্যাসিডের ব্যবহার একেবারে অকিঞ্চিৎকর! সমগ্র পৃথিবীর বাৎসরিক সালফিউরিক এ্যাসিডের ব্যবহারের পরিমাণ হচ্ছে ১ কোটি টন—এই এক কোটির কাছে ভারতের ২০ হাজার কি গণনার মধ্যে আসতে পারে? হিসেবীর দৃষ্টিতে ভারতের এই সালফিউরিক এ্যাসিডের ব্যবহার দেখলে বলতে হয় যে ভারতের কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি এখনো একেবারে শিশু অবস্থায় রয়েছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে ভারত এখনো সস্তায় সালফিউরিক এ্যাসিড উৎপাদনে সক্ষম হয় নি।

ভারতে সালফিউরিক এ্যাসিড্ উৎপাদিত হয় বিদেশ হ'তে আমদানীকৃত গন্ধক থেকে; তাতে উৎপাদন খরচ বেশী ছাড়া কম পড়ে না। তার চেয়ে যদি ভারতীয় সালফাইড ধাতবদ্রব্য ও পাইরাইট্ থেকে উক্ত এ্যাসিড উৎপাদনে মনোনিবেশ করা যায় তাহলে ভাল ফল ফলবে বলেই মনে হয়। সালফিউরিক এ্যাসিড উৎপাদনের একটি প্রধান সুফল হচ্ছে এই যে, এ-শিল্প একক নয়—বহুর সংমিশ্রন। অর্থাৎ সালফিউরিক এ্যাসিডের বাই-প্রোডাক্ট-গুলিকেও শিল্পের অন্তর্গত বলে ধরতে হয়। এ ব্যাপারটা যেমনি উপকারের তেমনি অপকারেরও; উপকারের সেই সমস্ত দেশের পক্ষে যারা এর বাই-প্রোডাক্টগুলিকে সদ্ব্যবহার করতে শিখেছে, কেননা এতে করে তারা খুব সস্তায় সালফিউরিক এ্যাসিড উৎপাদনে সক্ষম হয়—অপকারের আমাদের মত দেশের পক্ষে, যারা বাই-প্রোডাক্টগুলির এখনো সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে শেখেনি, কেননা তার জন্য অপরাপর দেশের তুলনায় তারা সস্তায় উক্ত এ্যাসিড উৎপাদনে সমর্থ হয় না। সুতরাং আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হ'ল উক্ত বাই প্রোডাক্টগুলির সদ্ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করা। পূর্ব্বেই বলেছি যে, সালফিউরিক এ্যাসিডের উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিমাণই হ'ল দেশের কেমিক্যাল ব্যবসার উন্নতির সহজ মাপকাঠি, কাজে কাজেই এ-দিকটাকে কিছুতেই অবহেলা করা চলবে না।

সালফিউরিক্ এ্যাসিডের পরেই প্রয়োজনের বস্তু হ'ল পূর্ব্বোক্ত খার-পদার্থগুলি। কাচ, কাগজ, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত, রং করণ, ব্লিচিং ইত্যাদি ব্যাপারে ওগুলি ভয়ঙ্কররূপে ব্যবহৃত হয়। এ্যাসিড উৎপাদনের দিকে ভারত অগ্রণী হলেও উক্ত খারবস্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে এদেশ একেবারে পশ্চাদপদ। বহু টাকার খার পদার্থ প্রতি বছর ভারতকে বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। পূর্ব্বে ভারতে খারপদার্থ যে উৎপাদিত হ'ত না তা' নয়, কিন্তু ঐ বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীর নিকট দেশীয় পশ্চাৎপদ প্রস্তুতপন্থা পরাজয় মেনেছে। তবুও উপরোক্ত খারপদার্থ উৎপন্নের জন্য আবশ্যকীয় কাঁচা মালের অভাব এদেশে নেই। লবণ আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং 'ইলেক্‌ট্রোলিসিস্ প্রসেসে' তা' থেকেই কস্টিক্ সোডা উৎপন্ন হতে পারে। ফটকিরি, চূণপাথর, সোহাগা, বেরাইটস্, ম্যাগনেসাইট্, জিপসাম্ প্রভৃতি দ্রব্যের এদেশে অভাব নেই—সে সমস্ত থেকে বহু কেমিক্যাল্ দ্রব্য উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু হ'লে হ'বে কি, পদার্থের অভাব না থাক্ জ্ঞানানুশীলনী ও

ব্যবসাবুদ্ধির অভাব বশতঃই আমাদের দেশে এসব থেকেও কোনও ফল নেই।

আগেই বলেছি যে, বাই-প্রোডাক্টগুলির দিকে নজর না দিলে কেমিক্যাল শিল্পের উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়, আর কেমিক্যাল শিল্পের এমনি মহিমা যে বাই-প্রোডাক্ট ছাড়া ও-বস্তুর অস্তিত্বই নেই। যে দেশের ব্যবসায়ীরা এই বাই-প্রোডাক্টের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করে না, তারা মূল দ্রব্য উৎপন্ন করলেও ব্যবসার প্রতিযোগিতায় টিঁকতে পারে না। কি করেই বা পারবে? বাই-প্রোডাক্ট সদ্ব্যবহারকারী দেশসমূহ যেখানে একটা খরচায় পাঁচটা জিনিস উৎপন্ন করে, অপরাপর দেশ সেই একটা খরচায় মাত্র একটা জিনিস উৎপন্ন করে; ফলে, ব্যবসার দিকদিয়ে শেষোক্তরা প্রথমোক্তদের কাছে পরাজয় মানে। ভারতেরও কতকটা সেই অবস্থাই দাঁড়িয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোক্ কয়লার ব্যবসাই ধরুন। ঐ বস্তুটি থেকে বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে আল্‌কাতরা, এ্যামোনিয়া, বেঞ্জল প্রভৃতি দ্রব্য পাওয়া যায়। আবার একা কোল্‌-টার থেকে বেঞ্জিন, ফেনল্, কার্‌বোলিক্ এ্যাসিড্, ন্যাপথোলিন প্রভৃতি দু'শোরকমের কম্পাউণ্ডস্ মেলে। এগুলির যদি যোগ্য সদ্ব্যবহার না করা যায় ত ব্যবসার দিকদিয়ে কী রকম লোকসান যায় একবার ভেবে দেখুন।

আমাদের উপরোক্ত আলোচনা থেকে কারও সন্দেহ থাকবে না যে, ভারতে কেমিক্যাল শিল্পের প্রসারতার প্রয়োজন এবং সে-প্রসারতার পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ বর্ত্তমান রয়েছে। উক্ত শিল্পের ক্ষেত্রে যে কাঁচামালের প্রয়োজন তা' ভারতেই ছড়ানো আছে এবং তদ্বারা ভারতের চাহিদা মেটানো যেতে পারে।

তা' ছাড়া কৃষিপ্রধান দেশ ভারতে কেমিক্যাল শিল্পের আরও একটি সুবিধা আছে। সকলেই জানেন যে কৃষিকার্য্যে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য এমন সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে যেটা কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে পাওয়া যায়, ইংরেজীতে সে-বস্তুর নাম হ'ল 'ফার্টিলাইজার'। যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করা যায় তবে বিরাট পরিমাণ ফার্টিলাইজার প্রয়োজন হ'বে। আমাদের কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি উন্নতপথে চালিত হ'য়ে যদি সস্তায় ফার্টিলাইজার উৎপন্ন করতে পারে তাহ'লে শিল্প ও কৃষি উভয়েরই পরম কল্যাণ সাধিত হয়। আমরা দেশের ধনী ব্যবসায়ীদের এধারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগের ব্যবহার ও অপব্যবহার

"চুড়ি চাই—খেলনা চাই—পুতুল চাই" বলে নিস্তব্ধ উদাস দুপুরে ফেরীওয়ালা হাঁক পাড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর দিবা মজলিসকারী মহিলা মহলের মধ্যে একটা তীব্র সাড়া পড়ে যায় তাকে ডাকবার। তারপর সেই ফেরীওয়ালার খেলনা বা চুড়ীর ঝাঁপির চারধারে ঘিরে দাঁড়ায় ছোট বড় কুমারী ও সধবার দল—তাদের উদ্দেশ্য নিজেদের আভরণে সজ্জিত করা কিংবা গৃহস্থালীর শোভা বৃদ্ধি। আসলে নারীরা অপরের মনোরঞ্জন করতে অত্যন্ত ভালবাসে, সেটাই তাদের স্বধর্ম; কিন্তু তাদের ঐ স্বধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থাটা যে কতখানি জড়িয়ে আছে খুব কম লোকই সেটা ভেবে থাকেন। ঐ ফেরীওয়ালাকে প্রদত্ত অধিকাংশ পয়সাই যে বিদেশে চলে যায় সেটা কারও খেয়াল থাকে না, থাকলেই বা কি হত, নারীর স্বধর্ম-পালন ত আর তাতে বাধা মানত না।

ওর একমাত্র প্রতিকার সম্ভব যদি আমরা ফেরীওয়ালার ঝাঁপিতে বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্ত্তে দেশী দ্রব্য রাখবার ব্যবস্থা করতে পারি। ঘর-সাজানো আমাদের চিরন্তন স্বভাব, এই আভরণ-অনুরূপ আমাদের বিলাসিতা হ'তে পারে কিন্তু তা' বাবুগিরি নয়। আমাদের নগ্নতা, রুক্ষতা ও কাঠিন্যকে ঢেকে রাখবার জন্যই আমরা আবরণ হিসাবে আভরণের বন্দনা করি, কবিতার ছন্দের মতই তা' মনোহারী হয়ে ওঠে, শৃঙ্খল হয় না। এ-আভরণ শুধু ব্যক্তিগত নয়, পরিবারগত। ঘরবাঁধা যদি মানুষের স্বভাব হয় ত ঘরকে সুন্দর করার প্রচেষ্টাও তার প্রকৃতিগত। যার মধ্যে এর অভাব দেখা যায় তার হাজার নীতিজ্ঞান থাকলেও কলাজ্ঞান থাকে না। মানুষের ঐ কলাজ্ঞান থেকেই তার কাল্‌চার জন্মগ্রহণ করেছে, নইলে নীতিজ্ঞানের কোনই ক্ষমতা নেই কাল্‌চারের রূপ দেয়। সেইজন্যই আর্টের ক্ষেত্রে নীতিবোধ ও কলাবোধের বিরোধ লেগেই আছে; যা' সুনীতিমূলক তা' সব সময় আর্ট হয় না, আবার যা' চূড়ান্ত আর্ট তা' মোটেই নীতিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে না। আমাদের ঐ ফেরীওয়ালার ব্যাপারেও তাই; আমাদের ঘর সাজানো দেশের আর্থিক স্রোতকে বিদেশের সাগরাভিমুখে প্রবাহিত করাচ্ছে ঠিক, অর্থনীতির দিকদিয়ে এটা দুঃখের কথা; কিন্তু রসপিপাসু মন ত' সেকথা শোনে না; উপলব্ধির আনন্দের ত আর ভৌগলিক সীমাবেষ্টনী নেই, তার পরিধি অসীম। সুতরাং বিদেশী জিনিসের পরিবর্ত্তে যতক্ষণ না আমরা দেশী জিনিস যোগান দিতে পারছি ততক্ষণ আর্থিক স্রোত ঘুরবে না।

এর মানে এই নয় যে, প্ররোচনা ও আন্দোলনের কোন সার্থকতা নেই। বস্তুতঃ বাংলাদেশ স্বদেশী আন্দোলনের ফল যেরকম প্রত্যক্ষ করেছে অপর কোন প্রদেশ সে-রকম করেছে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। যে সমস্ত রমণীর দল আজকাল দিবামজলিসের প্রাপ্তাবকাশে ফেরীওয়ালাকে ডেকে সৌখীনতার প্রশ্রয় দেয়, তারাই সেই আন্দোলনের সময় বিনা দ্বিধায় নিজেদের হাতের কাঁচের চুড়ি পটাপট্ করে ভেঙ্গে ফেলেছিল, নিটোল হস্তের সৌন্দর্য্যহানি বা নগ্নতার দীনতা তাদের এতটুকু বাধা দিতে পারে নি। নারী, সে কুরূপাই হোক্ আর সুরূপাই হোক্, সাজসজ্জায় ত্রুটি তার প্রাণে ভয়ঙ্কর লাগে, কিন্তু দেশাত্মবোধের মুখ চেয়ে স্বেচ্ছায় নারীরা তখন সে-কষ্ট বরণ করে নিয়েছিল। তবুও তা' ক'দিন রইল? তাই বল্‌ছিলাম আন্দোলনের সার্থকতা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে-সার্থকতা ক্ষণিকের—চিরস্থায়ী নয়। তার কারণ পূর্ব্বেই বলেছি যে, নীতির সঙ্গে আর্টের সম্পূর্ণ বনিবনাও নেই; দেশাত্মবোধের নীতি সাময়িকভাবে মনকে অধিকার করলেও আর্ট সকল সময় অসার্থক কিংবা অতৃপ্ত থাকতে চায় না, তাই সাময়িক উত্তেজনার পর আন্দোলন যখন ঝিমিয়ে আসে তখন মন আবার সেই বিদেশী জিনিসের দিকে ছুটে যায়।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, এর প্রতিকার সম্ভব, যদি আমরা দেশী ভাল জিনিস উৎপন্ন করতে পারি। আমাদের সবসময় মনে রাখা দরকার যে, জিনিস শুধু দেশী হলেই হয় না, তার কোয়ালিটিও ভাল হওয়া দরকার। গান্ধীবাদের সঙ্গে আধুনিক শিল্পবাদের এইখানেই বিরোধ; রাজনৈতিক দিক দিয়ে গান্ধীবাদকে অনেকে বিপ্লববিরোধী বলে থাকেন; কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গান্ধীবাদ হ'ল বিজ্ঞান বিরোধী। এই শেষোক্ত কারণেই গান্ধীবাদ কখনো দেশের গ্রহণযোগ্য হবে না। ভাল বিলাতী কাপড় যদি বর্জ্জন করতে বলা যায় তবে তার পরিবর্ত্তে দেশে তদনুরূপ দেশী কাপড়ের যোগান থাকা চাই; কিন্তু সেই দেশী কাপড়েরও পরিবর্ত্তে যদি খদ্দর পরিধান করতে ফতোয়া দেওয়া যায় তবে সব লোক তা শুনবে না কিংবা সব লোক শুন্‌লেও সব সময় তা' শুন্‌বে না। অথচ গান্ধীবাদ সেই কথাই বলে—বলে যে সকলের খদ্দর ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু তা' হলে দেশের তিনশতের ওপর কাপড়ের মিলের কী দশা হ'বে? সবাই মোটা কাপড় পরতেই বা চাইবে কেন? বিজ্ঞান যদি আমাদের মিহি ধুতি পরবার সুযোগ দেয় তবে কেন আমরা মোটা খদ্দর পর্‌তে যাব? যন্ত্রের সাহায্যে যদি আমরা দিনে ১০০ খানা কাপড় উৎপাদন করতে পারি তবে হস্ত সাহায্যে কেন আমরা ১০০ দিনে ১ খানা কাপড় উৎপাদন কর্‌ব? এ প্রশ্নের জবাবে গান্ধীবাদের কোন যুক্তি নেই, গোঁড়ামী ও ঐশ্বরিক প্রেরণা আছে প্রচুর—কিন্তু তা' দিয়ে ত বস্তুতঃ জগতের কাজ চলে না। মনে হয় ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ বলেই গান্ধীবাদের মত বিজ্ঞান বিরোধী মতের আজও এখানে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে।

আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয় থেকে একটু সরে গিয়েছি কিন্তু উক্ত আলোচনা এই দেখানোর জন্যই প্রয়োজন ছিল যে, জিনিস শুধু দেশী হলেই হয় না, তার কোয়ালিটিও ভাল হওয়া দরকার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ফ্রি-ট্রেড ও প্রোটেক্‌শনের দ্বন্দ্ব কচকচির মধ্যে দু'পক্ষেরই কতক কতক সত্যভাষণ ছিল। প্রোটেক্‌শনের বিরুদ্ধে একটা যুক্তি এই যে, তা' দ্রব্যের কোয়ালিটির উন্নতিকরণের বাধাস্বরূপ হয়ে থাকে, তবুও প্রোটেক্‌শনের যে প্রয়োজন নেই একথা কোন অর্থনীতিবিদ্‌ই বলবেন না। স্বদেশী আন্দোলনেও শিল্পের একটা প্রোটেকশন বিশেষ দরকার, তবে তফাৎ এই যে এটা রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্ব সম্ভূত নয়—জনগণের মনসম্ভূত। ব্যবহারিক বিধি নিষেধের চেয়ে নৈতিক প্রভাব এর অত্যন্ত বেশী যদিও পূর্ব্বোক্তের মত শেষোক্তের কোন কড়াকড়ি নেই। তবুও ঐ শেষোক্তের ক্ষমতা বড় কম নয়। বিগত স্বদেশী আন্দোলনে বিদেশী বর্জ্জন যে কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল তা' কারও অজানা থাকে নি, কিন্তু সেই বেসরকারী

জনগ্রাহ্য প্রোটেক্সনের সুযোগে কি আমাদের দেশী শিল্পের কোয়ালিটির কোন উন্নতি ঘটেছে? আমাদের গরীব দেশ—তার গরীব অধিবাসীরা শুধুমাত্র দেশাত্মবোধের ভাব-প্রবণতার খাতিরে অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্য দিয়েও দেশী দ্রব্য ক্রয় করেছে কিন্তু তার পরিবর্ত্তে দেশ কিংবা তার অধিবাসীরা লাভবান হয় নি। লাভবান হত যদি দেখতাম যে সেই সুবর্ণ সুযোগে দেশীয় শিল্পের প্রসারতা ঘটেছে কিংবা দেশী দ্রব্যের মূল্যহ্রাস হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে সেরকম কিছু ঘটেনি, শুধুমাত্র গরীব অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একপক্ষের স্বার্থত্যাগেই অপরপক্ষ লাভবান হয় এ আমরা জানি কিন্তু গরীব অধিবাসীদের স্বার্থত্যাগে কি দেশে কলকারখানা বৃদ্ধি হেতু অপর অধিবাসীরা কাজ লাভ করল? সত্যের অপলাপ আমরা করতে চাই নে, স্বীকার করি যে দেশ কিছুটা ইণ্ডাষ্ট্রিলাইজড্ হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে সে আর কতটুকু? জনগণের মনসম্ভূত দেশাত্মবোধের যে আশাতিরিক্ত প্রোটেক্শন শিল্প প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিল্প ব্যবসায়ীরা প্রাপ্ত হয়েছে তাতে কি দেশে অধিকতর শিল্প ছড়িয়ে পড়া উচিত ছিল না? গরীব অধিবাসীদের নিছক স্বার্থত্যাগ কি শুধুমাত্র গুটিকয়েক বড়লোক কারবারীর পেট পুরণের জন্যই ব্যয়িত হয় নি?

তবুও কেউ উপরোক্ত প্রোটেক্শনের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। গরীব অধিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেনেও আবার তারা আগামী স্বদেশী আন্দোলনকেই সমর্থন করবে কিন্তু সেই সুযোগে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কি একটা কর্ত্তব্য নেই? আমাদের দেশে ক্যাপিটালের অভাব আছে একথা কিছুতেই স্বীকার করি না, দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে সে-ক্যাপিটাল মোটেই 'মবিল্' নয়। তা' মাটির নীচে পোতা হয়েছে, সোনাদানা হিসাবে পরিবারস্থ মহিলাদের গায়ের গহনা হয়েছে, কোম্পানীর কাগজে গাদাবন্দী হয়েছে তবুও ভুলেও শিল্পলগ্ন হয় নি। অথচ যদি সত্যকথা বলা যায় ত বলতে হয় গরীব প্রজার নিকট হতে আদায় করেই সে-অর্থ সঞ্চিত হয়েছিল। ইংরাজ যুগের প্রারম্ভে বাংলাদেশের কালচারটা হচ্ছে জমিদারী প্রধান, তা' যত না অভিজাত তার বেশী সামন্ততান্ত্রিক। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশের জমিদারী মনোভাব এক কুখ্যাত অদ্ভুত মনোভাব—তার জমির ওপর স্বত্ব আছে কিন্তু জমির উন্নতির দায়িত্ব নেই। সেইজন্যই তা' সামন্ততান্ত্রিক দরবারী আল্সেমীর জাঁকজমকে পরিবেষ্টিত, এ্যারিষ্টোক্রাসীর নব নব রোমান্সের উন্মাদনায় পরিবর্দ্ধিত নয়। এর যে ব্যতিক্রম নেই তা' নয়—দানবীর সুবোধ মল্লিক আছেন, অভিজাত ঠাকুরপরিবার আছেন, আধুনিক যুগে লাহা বংশ ও ভাগ্যকুলের রায়েরা আছেন, কিন্তু সেটা সব জিনিসের ব্যতিক্রমের মতই অবান্তর। দেশের বিত্তশালী জমিদার সম্প্রদায় টাকা অপরকে ধার দিয়েছেন, জমিতে দাদন করেছেন কিন্তু ভুলেও টাকা কারবারে খাটান নি। এককথায় তাঁরা মহাজন হয়েছেন কিন্তু মহাপুরুষ বা মহাব্যবসায়ী হন্ নি। তাঁদেরই বর্দ্ধিত আবহাওয়ার পরিবেষ্টনীতে মানুষ হয়ে বাঙালী চাকুরে হয়েছে, বুদ্ধিজীবী হয়েছে অথচ ব্যবসায়ী হয় নি।

এই হ'ল আসল অবস্থা। এরই মধ্যিখানে দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার লাগল তখন দেশী দ্রব্যের দর গেল চড়ে— গরীব লোকেরা তাই কিনলে বাধ্য হয়ে। অর্থনীতির নিয়মই হচ্ছে যে, যে-জিনিসের চাহিদা বাড়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঠিক থাকলে তার দর কমে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টেটি ঘটেছিল। বিদেশী সস্তা ভাল জিনিসের পরিবর্ত্তে লোকে খেলো দেশী দ্রব্য কিনতে লাগাল, তবুও শিল্প সম্পর্কীয় লোকেরা দেশী দ্রব্যের কোয়ালিটির উন্নতির দিকে মনোযোগ দিলে না। তারা যে ভাল জানে দেশাত্মবোধের চাপে জনসাধারণ তাদের দ্রব্য কিনবেই কিনবে। তাই তারা স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগের অপব্যবহার করলে।

থাক্‌গে, গতযুগের জন্য আক্ষেপ করে লাভ নেই। আজ দেশে নতুন সাড়া জেগেছে। গান্ধীবাদ ক্রমশঃ তার প্রভাব হারাচ্ছে। জনসাধারণের আদর্শ এখন ত্যাগ নয়, ভোগ। খেলো দেশী জিনিস তারা আর পছন্দ করে না, অথচ দেশী শিল্পের তারা বিরুদ্ধবাদীও নয়। সুতরাং দেশী শিল্পের উন্নতি হওয়ার প্রয়োজন। নইলে, আবার যদি স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগের অপব্যবহার ঘটে ত তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।
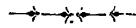
বাংলাদেশে পাঁচবৎসরী ব্যবস্থা

বাংলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি-শিল্প বিভাগের মন্ত্রী, দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য একটা "পাঁচ বৎসরী ব্যবস্থা" প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা সম্প্রতি অর্থ-সচিবের বিবেচনাধীন। এই ব্যবস্থা রচনা করিবার সময় মন্ত্রী মহাশয় প্রথমতঃ বাংলাদেশের বেকার সমস্যা,—দ্বিতীয়তঃ শস্য কর্ত্তনের পর কৃষকদের বিনা কাজে বসিয়া থাকা,—এই দুইটী বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। তিনি এমন কতগুলি শিল্পের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাতে কৃষকেরা ফসল কাটিবার পরেও কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে। ইহার মোটামুটি খসড়া এইরূপ,—

(১) কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহ এবং তাহা প্রচার করিবার ব্যবস্থার উন্নতি, বিশেষতঃ দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসার বিবরণ ও স্থানীয় শিল্প বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহের বন্দোবস্ত।

(২) যাহাতে প্রচুর মাল উৎপাদন হইতে পারে, উৎপন্নদ্রব্য যাহাতে বাজারে বিক্রয় করিবার সুবিধা পাওয়া যায় এবং এই উভয় উদ্দেশ্যে যাহাতে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব না ঘটে তাহার ব্যবস্থা।

(৩) কৃষি, শিল্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-গৃহ স্থাপন,—তাহাতে নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবে বিবিধ পরীক্ষাকার্য্য পরিচালন,—এবং কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(৪) যে সকল শিল্পে প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা আছে,—যাহাদের উন্নতি ও প্রসার হওয়ার সুবিধা রহিয়াছে, এবং যাহাদের জন্য উপযুক্ত লোক ও উপকরণের অভাব নাই, সেই সকল নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার আয়োজন।

(৫) বর্ত্তমানে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প প্রচলিত আছে, তাহাদের উন্নতি সাধন।

(৬) সাধারণভাবে সর্ব্ববিধ শিল্প (টেক্‌নিক্যাল ও ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল) শিক্ষার উন্নতি বিধান।

আজকাল সকল দেশেই এইরূপ এক একটা প্ল্যান্ বা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইয়া

থাকে। রুশিয়ায়, জার্ম্মাণীতে, ইংলণ্ডে, আমেরিকায় সর্ব্বত্রই তিন বৎসর, অথবা পাঁচ বৎসর, কোন কোন স্থলে দশবৎসরকালব্যাপী ব্যবস্থা গঠিত হয়। তদনুসারে কার্য্য করিয়া ঐ সকল দেশ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এ বিষয়ে সোভিয়েট্ রুশিয়াকেই অগ্রণী বলিতে হয়। গত মহাযুদ্ধের পর রুশিয়া যে দুরবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এইরূপ পাঁচবৎসরী ব্যবস্থা অনুসৃত হয়। এখন তাহার সেই দুঃসময় কাটিয়া গিয়াছে। বাংলার মন্ত্রিগণ যে এইরূপ পাঁচবৎসরী ব্যবস্থা তৈয়ারী করিতেছেন, ইহা বিশেষ আশার কথা। কিন্তু রুশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীনদেশের সহিত আমাদের পরাধীন বাংলা দেশের আকাশ পাতাল প্রভেদ। একথাও মনে রাখিতে হইবে। এক একটা প্ল্যানকে পুরাপুরি সফল করিয়া তুলিতে হইলে যে তোড়-জোড় ও মাল মশলা আবশ্যক তাহাও ভুলিলে চলিবেনা। প্ল্যান্ ও প্রোগ্রাম্ যদি সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে পরিণত করা না যায়, তবে তাহার প্রতিক্রিয়ায় দেশ অবনতির পথেই ঢলিয়া পড়িবে।

ভারতের নানাস্থানে শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টা

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি শিল্প সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার উন্নতির প্রচেষ্টা দেখিয়া আমরা বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। নিম্নে তাহার কয়েকটী সংবাদ আমরা প্রকাশ করিলাম। বাংলা গবর্ণমেণ্ট হস্ত-চালিত তাঁতের উন্নতির জন্য সম্প্রতি একদল ছাত্রকে বস্ত্রবয়ন, বস্ত্ররঞ্জন, এবং কাপড়ে রঙ্গীন ছাপ দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার জন্য ছাত্রদিগকে কোন বেতন দিতে হইবে না। তাহাদের শিক্ষা এরূপ ধরণের হইবে যেন তাহারা নিজ হাতে কাজ করিতে পারে এবং স্থানীয় প্রয়োজনও চাহিদা মত নানাপ্রকার বস্ত্র তৈয়ারী করিতে সমর্থ হয়। ১১০. নং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, কলিকাতা এই ঠিকানায় অবস্থিত ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুলে শিক্ষাদান কার্য্য চলিবে এবং পুরাপুরি শিক্ষা করিতে আট মাস সময় লাগিবে।

পুষা সহরের পুরাতন এগ্রিকালচার্য্যাল ইনষ্টিটিউটের গৃহে বিহার কুটীর শিল্পের একটী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। সেইখানে ৫০টী ছাত্রকে বস্ত্র-বয়ন, বস্ত্র রঞ্জন, দর্জ্জির-কাজ, কাষ্ঠ-শিল্প, বেতের-কাজ, পিতল-কাঁসা প্রভৃতি ধাতুশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহাও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে ৩০টী চাষীর ছেলেকে সুতা কাটা; ঝুড়ি তৈয়ারী ও দড়ি পাকান শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রথমতঃ এককালীন ১১ হাজার টাকা দরকার এবং তৎপর ইহার জন্য বার্ষিক ২০ হাজার টাকা খরচ হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ৫ বৎসরের জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে কুটির শিল্প ও পশম শিল্পের উন্নতির জন্য একটা বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে ইহার পরিমাণ ১২৬০০ টাকা এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহার পরিমাণ ১৩৯৪৮ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে পাঁচ বৎসর যাবৎ বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে কুটীর শিল্প এবং পশম শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থ সাহায্য দিতে সম্মত হইয়াছেন। তদনুসারে ১৯৩৬-৩৭ সালের জন্য ১২৬০০ টাকা এবং ১৯৩৭-৩৮ সালের জন্য ১৩৯৪৮ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রাথমিক এককালীন-খরচার জন্য প্রথম বৎসরের অর্থাৎ ১৯৩৬-৩৭ সালের মঞ্জুরী ১২৬০০ টাকা নিয়োগ করিতে ভারত গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য যে কার্য্য পদ্ধতি স্থির করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—

(১) ভাড়া-খরিদ (hire-purchase) নিয়মানুসারে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি এবং কল-কব্জা সরবরাহ করা

(২) উপযুক্ত মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ

(৩) যে সকল নক্সার জিনিস বাজারে সহজে বিক্রয় হয়, সেই সব তৈয়ারী করিবার জন্য পশম-তাঁতীদেরে উপদেশ ও শিক্ষাদান।

(৪) প্রস্তুত প্রণালীর প্রাথমিক ও শেষ কার্য্য সমূহ যাহাতে অন্যত্র বড় কারখানায় করা যায়, তাহার ব্যবস্থা।

(৫) তাঁতিদের নিকট হইতে তাহাদের তৈয়ারী পশমের জিনিস কিনিয়া লইয়া তাহা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত।

এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্থির হইয়াছে যে পশম-তাঁতিদের তৈয়ারী জিনিস সমূহকে শেষ অবস্থায় অল্প খরচে পরিপাটী ও ফিনিস্ করিবার জন্য বোম্বাই উলেন্ মিলের সহিত একটা সুবিধা রকম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই খরচের কিয়দংশ গবর্ণমেণ্ট দিবেন। নক্সা কার্য্যের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের নক্সা শিল্পীর সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। হুবলী ও আমেদ নগরের দুইটি কো-অপারেটিভ্ সমিতির সাহায্যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে লৌহ উৎপাদন

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় লৌহের চাহিদা খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। যাঁহারা লৌহ সম্পর্কিত কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা সকলেই বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারীর প্রয়োজন যতই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, ততই লৌহের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। আজকাল লৌহ উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান বৃটিশ সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় এবং পৃথিবীর মধ্যে নবম। আশা করা যায়, অবিলম্বে ভারতবর্ষ উচ্চতর স্থান অধিকার করিবে। ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষের খনিসমূহ হইতে ২৫ লক্ষ টনের অধিক লৌহ আকরিক (Iron ores) উত্তোলিত হইয়াছে। ইহার মূল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। বিহার প্রদেশের সিংভূম জেলায় এবং কেওঞ্জর ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে ভারতবর্ষের প্রধান লৌহ খনি সমূহ অবস্থিত। ১৯৩৬ সালে উত্তোলিত মোট লৌহের মধ্যে পিগ্-লৌহ (Pig-Iron) হইয়াছে ১৫৪০০০০ টনেরও বেশী। সুতরাং পিগ্-লৌহ রপ্তানীর পরিমাণও বাড়িয়াছে। ১৯৩৫ সালে ৪৭৩০০০ টন পিগ্ লৌহ রপ্তানী হইয়াছিল;—১৯৩৬ সালে সেই রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া ৬০৬০০০ টনে উঠিয়াছে। ভারতীয় পিগ্-লৌহ বেশীর ভাগ জাপানেই রপ্তানী হয়। ১৯৩৫ সালে মোট রপ্তানী পিগ্-লৌহের শতকরা ৭০.৮ ভাগ জাপানে গিয়াছিল। ১৯৩৬ সালের উহার পরিমাণ কমিয়া শতকরা ৬০.৬ ভাগ হয়। কিন্তু ১৯৩৫ সালে জাপান যে পরিমাণ ভারতীয় পিগ্ লৌহ ক্রয় করিয়াছিল, ১৯৩৬ সালে তদপেক্ষা অধিক লৌহ ক্রয় করে এবং এই বাড়্তির পরিমাণ শতকরা প্রায় দশ ভাগ হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ও ভারতীয় পিগ্ লৌহ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৯৩৬ সালে অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু চীন দেশে উহা কমিয়া অর্দ্ধেক দাঁড়াইয়াছে।

বক্সাইট্ খনিজের ব্যবহার

ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে বক্সাইট্ (Bauxite) আকরিক প্রচুর পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রধানতঃ ফট্‌কিরি (Aluminium Sulphate) তৈয়ারী হয়। কেরোসিন তৈল শোধন করিবার জন্যও বক্সাইট্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও কোন প্রয়োজনে বক্সাইট্ ব্যবহার করা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা চলিতেছে। বক্সাইট্ আকরিকের প্রধান উপাদান য়্যালুমিনিয়াম ধাতু। কিন্তু বক্সাইট্ হইতে ঐ য়্যালুমিনিয়াম

নিষ্কাষন করিতে হইলে ক্রায়োলাইট (Cryolite) নামক আর একটি আকরিক প্রস্তর চাই। তাহার অভাবে এতদিন ভারতবর্ষে এলুমিনিয়াম তৈয়ারীর কারখানা করা সম্ভব ছিলনা। সম্প্রতি ভারতবর্ষে ক্রায়োলাইটের খনিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং আশা করা যায়, এক্ষণে বক্সাইট্ হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারীর কার্য্য আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যে কোলাপুর ষ্টেটে একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তথায় প্রচুর পরিমাণে বক্সাইট্ পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরে লোহারদগা জিলাতেও বক্সাইটের খনি আছে। এইস্থান হইতে বক্সাইট্ জাপানে চালান যায়। ভারতবর্ষে এলুমিনিয়াম কারখানা স্থাপিত হইলে, এই চালানী বন্ধ হইবে।

রবার শিল্পের কারখানা

দক্ষিণ ভারতে, সিংহলে, মালয় উপদ্বীপে এবং ব্রহ্মদেশে প্রচুর রবার উৎপন্ন হয়। আসামের জঙ্গলেও রবার গাছ আছে। কিন্তু আসামের জঙ্গলের গাছ হইতে রবার সংগ্রহ করিয়া রীতিমত রবার তৈয়ারী করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ ইঞ্চি এবং উত্তাপ সকল সময়েই অন্ততঃ ৮০ ডিগ্রী (ফারেনহাইট্) থাকে, সেই দেশেই রবার বৃক্ষ জন্মে ; সুতরাং আসামের জলবায়ু রবার চাষের বিশেষ অনুকূল। আমরা এইদিকে আমাদের ধনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আসাম যেমন চা বাগানে পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, —তেমনি রবার চাষেও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। বাংলার যে সকল ধনীব্যক্তি অথবা লিমিটেড্ কোম্পানী আসামে চা-বাগান করিতে উৎসাহের সহিত অর্থ নিয়োগ করেন তাঁহারা যদি রবার চাষ করিতে অগ্রসর হন, তবে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনা, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি হইবে।

১৯৩৫-৩৬ সালে দক্ষিণ ভারতে ও ব্রহ্মদেশে ৯৮০৬৩১ বিঘা ভূমিতে ১৫৬৫০টি রবার বাগান ছিল। কিন্তু সকল বাগানেই চাষ হয় নাই। এই বিস্তীর্ণ ভূমির কেবল মাত্র ৬৮৬৫২৩ বিঘাতে রবারের চাষ হইয়াছিল।

১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতবর্ষে মোট ৮০৬৮১৩ মণ রবার উৎপন্ন হয়। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে (১৯৩৫ ৩৬) উৎপন্ন রবারের পরিমাণ ছিল ৪৬৪৪৫৬ মণ। ব্রহ্মদেশে অধিকতর বিস্তৃতভাবে রবারের চাষ হওয়ায় মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতবর্ষে রবার শিল্পের ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহাতে ভারতীয় মূলধন অতি অল্প ;—নাই বলিলেই হয় ;—ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ীরা কেহ তাহাতে বিশেষরূপে হাত দেন নাই। বিদেশীয়দের বড় বড় কারখানা ভারতবর্ষে স্থাপিত হইতেছে। বাংলাদেশে হুগলী জেলার শাহাগঞ্জ নামক স্থানে বিখ্যাত ডান্‌লপ কোম্পানী একটি বৃহৎ রবারের কারখানা খুলিয়াছেন। বাটা, গুড্ ইয়ার, মিচেলিন, ফায়ারষ্টোন্ প্রভৃতি কোম্পানীরও বড় বড় কারখানা রহিয়াছে। বাঙ্গালীদের কারখানার মধ্যে বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্ উল্লেখযোগ্য ; তৎসম্বন্ধে ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকায় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা আশা করি বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণ এই নূতন শিল্প প্রচেষ্টায় অগ্রসর

হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে রবার নির্ম্মিত এত রকমারি জিনিসের প্রচলন হইতেছে যে, একটি দুইটি অথবা আট দশটি রবারের কারখানায় সে সমস্ত তৈয়ারী করা সম্ভব নহে। ইলেক্‌ট্রিক তারের ইন্‌সুলেসান ও অন্যান্য ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্র নির্ম্মাণ, চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত দ্রব্য, যেমন আইস্‌ব্যাগ, গরম জলের সেক্‌ দিবার ব্যাগ, রোগীর বিছানার সিট্‌, ডাক্তারদের দস্তানা, প্রভৃতি ছেলেদের খেলানা, ফুটবলের ব্লাডার, গাড়ীর টায়ার ও টিউব, ওয়াটার প্রুফ, কাপড়, জুতা, পেন্সিলের দাগতুলিবার ইরেজার, নল,—ইত্যাদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য রবারের দ্বারা তৈয়ারী হইয়া থাকে। ইহার দুই একটি জিনিস তৈয়ারী করিতেই কোন কোন কারখানার সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায়। সুতরাং বাংলাদেশে যে রবার শিল্পের বহু সংখ্যক কারখানা স্থাপিত হইতে পারে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বৈজ্ঞানিক নোটস

মরণাপন্ন রোগীর শ্বাসকার্য্যের সহায়তার জন্য অনেক সময় চিকিৎসকগণকে অক্সিজেন গ্যাস ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু ইহা অতি ব্যয়সাধ্য। সাধারণতঃ অক্সিজেন সরবরাহ করিবার যন্ত্র হইতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে একজন রোগীর জীবন ধারণোপযোগী যে পরিমাণ গ্যাস নির্গত হয় তাহার মূল্য পাঁচ টাকা হয়। এত টাকা খরচ করা দরিদ্র রোগীদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজের বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ গুহ অক্সিজেন প্রস্তুত করিয়া রাখিবার নূতন একপ্রকার যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে পাঁচ টাকার স্থলে মাত্র দুই আনা ব্যয় হইবে। সেই যন্ত্রও বর্ত্তমানে প্রচলিত যন্ত্র অপেক্ষা অর্দ্ধেক মূল্যে পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত গুহ মহাশয়ের এই নূতন উদ্ভাবনের ফলে আমাদের দেশীয় রোগী ও চিকিৎসক, বিশেষতঃ দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। অনেক হস্পিটালেও এখন বহু ব্যয়সাধ্য অক্সিজেন সরবরাহের যন্ত্র রাখা হয় না,—তাহাতে কত রোগীর বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকিতেও জীবনান্ত হইয়া থাকে। আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত গুহ মহাশয়ের উদ্ভাবিত এই যন্ত্র যাহাতে সত্বর সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় তাহার ব্যবস্থা হইবে। অনেক সময়ে এমনও ঘটিয়া থাকে যে, অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি অর্থাভাবে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ফল জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে পারেন না। বাংলাদেশে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শ্রীযুত গুহ মহাশয়ের উদ্ভাবন বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরবজনক,—কিন্তু আর্থিক কারণে যদি তাহার এই প্রয়োজনীয় যন্ত্রটীর নির্ম্মাণ ও প্রচারে বাধা জন্মে, তবে সেই গৌরবের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রে দুরপনেয় লজ্জা ও কলঙ্কেরই আবির্ভাব হইবে, ইহা মনে রাখা উচিত।

—•—

বোষ্টন (আমেরিকা) সহরের জনৈক রসায়ন শাস্ত্রবিৎ (ডাঃ ওয়াল্টার এম্ স্কট্) দীর্ঘকাল যাবৎ তন্তু-জাত দ্রব্যের উপর নানা পরীক্ষা দ্বারা কার্পাস সূত্রকে পশমের মত করিবার উপায় বাহির করিয়াছেন। এ যাবৎ লোকের বিশ্বাস ছিল, কার্পাসের আর কোন উন্নতি করা যায় না। প্রকৃতি উহাকে যেমন

ভাবে গঠিত করিয়াছেন, তাহার কোন পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে। কিন্তু সম্প্রতি ডাঃ স্কটের আবিষ্কারে সে ধারণা ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হইতেছে। যে কপার অক্সাইড্ (Copper oxide) সলিউশানে শতকরা দেড় ভাগের বেশী ক্ষার পদার্থ (Caustic alkali) না থাকে তাহার দ্বারা কার্পাসের উপর রাসায়নিক ক্রিয়া করাইয়া তিনি উহাকে পশমের মত মোলায়েম ও স্থিতিস্থাপক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই প্রক্রিয়ার সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি কার্পাসকে রেয়ন সূত্রের (Rayon fibre) আকারেও পরিণত করিয়াছেন। তিনি আরও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন খুব কড়া সালফিউরিক য়্যাসিডের দ্বারা (By the action of Strong Sulphuric acid) কার্পাসকে লিনেনের মত করা যায় এবং এমন কৌশলও তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাতে কার্পাস সূত্রকে (অন্যান্য গুণ বজায় রাখিয়া) স্বচ্ছ করা সম্ভব। ডাঃ স্কটের আবিষ্কারের বিষয় তন্তুশিল্পব্যবসায়ীরা বিশেষ আগ্রহের সহিত সন্ধান করিতেছেন।

নারিকেলের নূতন ব্যবহার

বর্ত্তমান সময়ে বিমান পথ হইতে বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য পাশ্চাত্য দেশ সমূহে নানা উপায় অবলম্বিত হইতেছে। তন্মধ্যে গ্যাস-মাস্ক (Gas-mask) বা গ্যাস নিবারক মুখোস ব্যবহার একটি প্রধান উপায়। জার্ম্মানী, ইতালী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে গবর্ণমেণ্টের সমরোপকরণ প্রস্তুত বিভাগে এক্ষণে বহু সংখ্যক গ্যাস মুখোস তৈয়ারী হইতেছে এবং জনসাধারণকে তাহা ব্যবহার করিবার কৌশলও শিখান হইতেছে। অনেকেই হয়ত জানেন না, এই গ্যাস-মাস্ক তৈয়ারী করিতে নারিকেলের মালার কয়লা একটি প্রধান উপকরণ। এই কারণে পাশ্চাত্য দেশে নারিকেলের চাহিদা সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য হইতে প্রচুর নারিকেল ইউরোপে রপ্তানী হয়। সেখানকার ব্যবসায়ীরা নারিকেলের এই নূতন ব্যবহার অবগত হইয়া উহার দাম বাড়াইয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষেও গ্যাস-মাস্ক ব্যবহার শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টও সেই গুরুতর প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছেন। সুতরাং নারিকেলের চাহিদা আরও বাড়িবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষেই গ্যাস-মাস্ক তৈয়ারী করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না,—জানিবার কোন উপায়ও নাই। কারণ সামরিক বিভাগের কার্য্যকলাপ সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য। তবে এই পর্য্যন্ত আমরা জানি, ভারতবর্ষের অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী (Ordnance Factory) বা সামরিক কারখানা সমূহে কোন জিনিস তৈয়ারী করিতে হইলে, তিন চারি বৎসর ধরিয়া তার তোড়্জোড়্ অর্থাৎ প্রাথমিক উদ্যম চলিতে থাকে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি গ্যাস-মাস্ক তৈয়ারী করিবার মতলব এখন করিয়া থাকেন, তবে অন্ততঃ তিন বৎসরের পূর্ব্বে যে তাহা কারখানা হইতে বাহির হইবে, এমন কোন সম্ভাবনা নাই। তবে আমাদের ইহাও বিশ্বাস, কয়েক বৎসর-পূর্ব্ব হইতেই গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগী

হইয়াছেন। যাহাহউক, গ্যাস-মাস্ক যদি ভারতীয় কারখানায় তৈয়ারী হয় তবে সেই-খানে নারিকেলের মালা বিক্রয়ের স্ববিধা হইবে। কিন্তু নারিকেল ব্যবসায়ীরা বিদেশে রপ্তানী নারিকেলের যেমন মূল্য পাইবে, ভারতীয় কারখানায় বিক্রীত নারিকেলের সেরূপ মূল্য না পাইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এ প্রসঙ্গে আমাদেব আর একটি কথা আছে। গ্যাস-মাস্ক একটি আত্মরক্ষার যন্ত্র। ইহা পরকে আহত বা নিহত করিবার যন্ত্র নহে।

বন্দুক, পিস্তল, তরবারি, রিভলবার প্রভৃতির মত ইহা অস্ত্রআইনের আমলে আসিতে পারেনা। স্থতরাং গ্যাস-মাস্ক তৈয়ারীর কারবার গবর্ণমেণ্টের অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নহে। প্রাইভেট্ কারখানাতেও যাহাতে উহা তৈয়ারী হইতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। তাহাতে নারিকেল সম্পর্কে একটি নূতন শিল্প দেশের মধ্যে গাড়িয়া উঠিবে।

ভারতীয় ফলের ব্যবসার প্রসার ঃ—

ভারতবর্ষে অসংখ্য প্রকারের ফল উৎপন্ন হয়। সেই সকল ফল একদিকে যেমন সুস্বাদু ও মুখরোচক, অন্যদিকে তেমনি স্বাস্থ্যকর, বলবর্দ্ধক এবং বিবিধ রোগনাশক। কৃত্রিম উপায়ে, বিশেষ পরিশ্রমের সহিত চাষ না করিলেও ভারতবর্ষে ফলের উৎপাদন নিতান্ত কম হয় না। কারণ ইহা ভারতের স্বভাবজাত ফসল। উন্নত প্রণালীতে এবং সার-সহযোগে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বাড়াইয়া চাষ করিলে ভারতে উৎপন্ন ফলের দ্বারা পৃথিবীর বাজার দখল করা যায়। ফল উৎপাদনে অষ্ট্রেলিয়া, কালিফর্ণিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল প্রভৃতি দেশ যেমন পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছে, ভারতবর্ষও সেইরূপ বিখ্যাত হইতে পারে। কিন্তু এ যাবৎ কাহারও চেষ্টা এদিকে দেখা যায় নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন দেখা যায়।

কৃষি সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য যে ইম্পী-রিয়্যাল কাউন্সিল আছে, তাহাতে কোল্ড ষ্টোরেজ (Cold Storage) পদ্ধতি অনুসারে ফল সংরক্ষণের পরীক্ষা হইয়াছে। ইহার কথা আমরা মাঘ মাসেব "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। যে বাক্সের মধ্যে ফল রাখা হয়, তাহার ভিতরকার টেম্পারেচার (Temperature) অর্থাৎ উত্তাপের পরিমাণ খুব কম করিয়া রাখা হয়। ঠাণ্ডাতেই ফলগুলি ভাল থাকে; তবে কোন্ ফলের জন্য কি পরিমাণ ঠাণ্ডার আবশ্যক তাহা পরীক্ষাদ্বারা ঠিক করিতে হয়। যন্ত্রটি এরূপভাবে তৈয়ারী এবং উহা এরূপে পরিচালিত হয় যে, তন্মধ্যস্থিত টেম্পারেচার (Temperature) সর্ব্বদা একভাবে থাকে কখনও কম বেশী হয় না। ইহাকেই কোল্ড ষ্টোরেজ পদ্ধতি বলে।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ৪০ হইতে ৫০ ডিগ্রী (ফারেন হাইট্) টেম্পারেচারে কমলানেবু রাখিলে প্রায় ৭০ দিন পর্য্যন্ত উহা টাটকা অবস্থায় থাকে। বর্ত্তমান সময়ে নাগপুর ও পাঞ্জাবের কমলানেবু বাজারে বেশী দিন চল্‌তি থাকে না। শীঘ্র পচিয়া যায় বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই বাজার একেবারে ভর্‌তি হইয়া উঠে এবং দোকানদারেও ক্ষতির আশঙ্কায় শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত ফল বিক্রয় করিয়া ফেলে। এই কারণে ফলের দাম খুব নামিয়া

যায়। সুতরাং ফল-চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষণে কোল্ড ষ্টোরেজ পদ্ধতিতে যদি কমলা নেবুকে দুইমাস আড়াই মাস টাটকা রাখা যায়, তবে আমের মরশুম আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত চাষীরা অপেক্ষা করিতে পারিবে এবং ফলের বাজারের হঠাৎ উঠ্‌তি-পড়্‌তিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

পোকার আক্রমণ ফলের চাষে একটী প্রধান বাধা। তাহার প্রতিকারের জন্য ইম্পীরিয়াল কাউন্সিল অব্‌ এগ্রিকালচার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। উপযুক্ত সারের ব্যবহার, যুক্ত-প্রদেশে আতাফলের চাষে নূতন রকমে কলম তৈয়ারীর প্রণালী, মাদ্রাজ প্রদেশে রকমারি ব্যানানা (Banana) ও আমের চাষ,—এই সকল বিষয়েও ইম্পীরিয়াল কাউন্সিল মনোযোগী হইয়াছেন। বিহার প্রদেশে দেখা যায়, একবৎসর আমের ফসল ভাল হইলে, তার পরের বৎসর উহা খারাপ হয়। আবার পরবর্ত্তী বৎসরে পুনরায় ভাল ফসল জন্মে। এই প্রকার অবস্থা দূর করিবার জন্য ইম্পীরিয়াল কাউন্সিল অব্‌ এগ্রিকাল্‌চার বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়াছেন। গত তিন বৎসর যাবৎ পাঞ্জাব প্রদেশে ফল ও শাকসব্জীর ব্যবসায়ে সংরক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়ায় টম্যাটো কেচুপ্‌ (Tomato ketchup), লিমন্‌ স্কোয়াস্‌ (Lemon squash), অরেঞ্জ স্কোয়াস্‌ (Orange squash), টিনে ভর্‌তি পিয়ার্স্‌ (Canned Pears) প্রভৃতি ফল ব্যবসায় সম্পর্কিত বিবিধ দ্রব্যের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। এমন কি এই সকল জিনিষ গুণে, স্বাদে ও মূল্যে—সকল বিষয়ে বিদেশ হইতে আমদানী জিনিষের সমকক্ষ হইয়াছে। পুনা সহরে কোল্ড ষ্টোরেজ পদ্ধতি অনুসারে আম্র সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থাও বিশেষ লাভ-জনক হইবে, আশা করা যায়।

ভারতীয় খনিজ সম্পদের হিসাব

১৯৩৬ সালে ভারতে উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যের হিসাব নিম্নে লিখিত হইল,—

কয়লা;—বিভিন্ন খনি হইতে প্রায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ টন কয়লা উঠিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ইহার পরিমাণ শতকরা প্রায় দুই ভাগ কম। এই কয়লার মূল্য ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

খনিজ তৈল;—আসাম, ব্রহ্মদেশ ও পাঞ্জাবের আটক জিলা হইতে মোট ৩৩ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালন খনিজ তৈল উৎপন্ন হইয়াছে। এই (১৯৩৬ সাল) বৎসরের মত এত অধিক পরিমাণ তৈল আর কখনও পাওয়া যায় নাই। আসামের খনি হইতে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ গ্যালন, পঞ্জাবের আটক জিলা হইতে ৪০ লক্ষ গ্যালন এবং অবশিষ্ট সমস্ত ব্রহ্মদেশের খনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

লৌহ;—সিংভূম, কিয়ঞ্ঝড়, ময়ূরভঞ্জ ও বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের খনি হইতে প্রায় ২৫ লক্ষ টন লৌহ-আকরিক উত্তোলিত হইয়াছে। উহার মূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা।

তাম্র;—সিংভূম জেলার ঘাটশীলা নামক স্থানের তাম্রখনিই প্রধান। আলোচ্য বৎসরে ৭২০০ টন তাম্র আকরিক পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ৮০০ টন তাম্র হিসাবে বিক্রয় হয়। অবশিষ্ট অংশ হইতে পিতলের পাত তৈয়ারী হইয়াছে।

স্বর্ণ;—শতকরা ৯৯·৫ ভাগ স্বর্ণ কোলারের খনি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। মানভূম, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, উত্তর সানরাজ্য এবং ব্রহ্মদেশ,—এই সকল স্থানে অবশিষ্ট সামান্য পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মোট ৩৩৩৮৫৬ আউন্স স্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ইহা কম হইলেও স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধির দরুণ ঘাটতি পোষাইয়া গিয়াছে। আলোচ্যবৎসরে ইহার মূল্য দাঁড়াইয়াছে তিন কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও বৎসরে এত অধিক টাকার স্বর্ণ উৎপন্ন হয় নাই।

রৌপ্য;—অধিকাংশ রৌপ্য সানরাজ্য হইতে পাওয়া যায়। আলোচ্যবৎসরে তথা হইতে ৬৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ৬০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য উৎপন্ন হইয়াছে। কোলারের খনি হইতে উত্তোলিত রৌপ্যের পরিমাণ ২৫ হাজার আউন্স এবং উহার মূল্য ৩৪ হাজার টাকা।

ম্যাঙ্গানিজ;—৮ লক্ষ ১৩ হাজার টন ম্যাঙ্গানিজ ধাতু উত্তোলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৬ হাজার টন ভারতের বিভিন্ন লৌহ কারখানায় ব্যবহৃত হয়। ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টন ইংলণ্ডে, জাপানে, ফ্রান্সে, বেলজিয়ামে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হইয়াছে।

অভ্র;—এই বৎসরের আংশিক হিসাবে জানা যায়, আনুমানিক প্রায় ৩২½ লক্ষ টাকা মূল্যের ৮৭ হাজার হন্দর অভ্র উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের মজুত মাল ও আলোচ্য বৎসরের উৎপন্ন মাল হইতে রপ্তানী অভ্রের পরিমাণ একলক্ষ ৭৮ হাজার টন এবং তাহার মূল্য ৯২ লক্ষ টাকা।

জনসাধারণের
বিশ্বাসের
অপূর্ব্ব
নিদর্শন
ভারত ইনসুর‍্যান্স কোম্পানী
১৯৩৭ সালে
দুই কোটী পঁচাত্তর লক্ষ ২,৭৫,০০,০০০
টাকার অধিক মূল্যের নূতন বীমার প্রস্তাব
পাইয়াছে। তন্মধ্যে দুই কোটী পাঁচ লক্ষ
(২,০৫,০০,০০০) টাকার অধিক মূল্যের প্রস্তাব গ্রহণ
করিয়া নূতন বীমার কারবার সম্পূর্ণ করিয়াছে।
এই অল্প সময়ের মধ্যে নূতন পরিচালকবর্গের অধীনে এতদূর
উন্নতি লাভ করিয়া "ভারত" নিজেই নিজের পরিচয় দিতেছে।
ইহার উপরে আর টীকা টিপ্পনী অনাবশ্যক।
ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের অগ্রদূত এই ভারত ইন্সিওরেন্স দ্রুতগতিতে
উন্নতির পথে চলিয়াছে। পরিচালকগণ আশা করেন, অচিরে
"ভারত" এমন সফলতা লাভ করিবে, যাহা এদেশে এযাবৎ দেখা
যায় নাই।
১৯৩৮ সালের বিপুল পরিবর্ত্তন
লক্ষ্য রাখিবেন।
ভারত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
হেড্ আফিস্—ভারত বিল্ডিংস্, লাহোর
জেনারেল ম্যানেজার
পি. ডি. খোস্‌লা এম. এ.
কলিকাতা ব্রাঞ্চের
ম্যানেজার
মিঃ অশোক চ্যাটার্জ্জী বি. এ. (ক্যান্ট্যাব)
ফোন :- -কলিকাতা ২৬৫৬
ঠিকানা :—
"ভারত-ভবন"
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা

শুনা যায়, লাহোরের গুড্ লাক্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী এবং এলাহাবাদের হিন্দুস্থান সিকিউরিটী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী কানপুরের ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত মিলিত হইয়া যাইবে। আরও দুই একটি কোম্পানীও ফ্রি ইণ্ডিয়ার সহিত মিলিত হইবার কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

প্রুডেন্স্যাল এ্যাসিওরেন্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ জে এল ফার্ণাণ্ডেজ্ করাচীর ইণ্ডিয়ান লাইফ এ্যাসিওরেন্স কোম্পানীর বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যাস্থিত চীফ এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

কার্য্য প্রসারিত হওয়ায় পীয়ারলেস্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আফিস ২নং লায়ন্স্ রেঞ্জ হইতে ৮নং এস্প্লেনেড ইষ্ট, কলিকাতা,—এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

ভারত গভর্ণমেণ্টের (বঙ্গদেশস্থ) সলিসিটার মিঃ সুশীল চন্দ্র সেন রেলওয়ে বোর্ডের সলিসিটার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এবং ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর (বঙ্গদেশস্থ) সলিসিটারও তিনিই হইলেন।

অশোক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কর্ম্মচারী মিঃ বি ত্রিবেদী ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। শোনা যায়, মিঃ এম সেন বি, এ, ক্রেসেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চের ম্যানেজারের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর উড়িষ্যাস্থিত চীফ এজেণ্ট মিঃ গোদাবরী মিশ্রকে উড়িষ্যা-গভর্ণমেণ্ট ব্যয় সঙ্কোচ সমিতির (রিট্রেঞ্চমেণ্ট্ কমিটীর) প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করিয়াছেন।

—✻—

মেসার্স্ ইষ্টার্ণ আণ্ডার রাইটার্স্ (২৯।১নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা) হায়দরাবাদ পাইওনীয়ার এ্যসিওরেন্স কোম্পানীর বঙ্গদেশ ও আসামস্থিত চীফ্ এজেণ্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন।

—✻—

দেবাস্ প্রভিডেণ্ট এণ্ড জেনারেল ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটী নামে একটি নূতন বীমা কোম্পানী গত ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিঃ ই আর ব্যাঙ্কটেশন্ এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

—✻—

শ্রীযুক্ত সুভাস চন্দ্র বসু দিল্লীর ট্রপিক্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়াছেন।

—✻—

মিঃ এস্ কৃষ্ণমূর্ত্তি এফ্ আই এ, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার য়্যাকচুয়ারীর কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন।

—✻—

ভারত ইন্‌সিওরেন্সের কলিকাতা ব্রাঞ্চের মিঃ বি এম্ সেন অর্গ্যানাইজারের পদ হইতে য়্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের পদে উন্নীত হইয়াছেন।

—✻—

ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ আই বি সেন, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স্ কর্ত্তৃক ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের য়্যাড্‌ভাইসরি কমিটীর সদস্যরূপে পুনঃ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

—✻—

মিঃ প্রসাদ দাস রায় চৌধুরী—হিমালয় এ্যাসিওরেন্স কোম্পানীর হেড আপিশের প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি নিউ এসিয়াটীকে প্রথমে বেঙ্গল ব্রাঞ্চে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কাজ করেন, পরে দিল্লীর হেড আপিশে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। নিউএসিয়াটীক ছাড়িয়া এক্ষণে তিনি হিমালয়ের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন।

—✻—

মিঃ বি বি দত্তও হিমালয় এ্যাসিওরেন্স্ কোম্পানীর হেড আফিসে (কলিকাতা) এজেন্সী ম্যানেজাররূপে যোগদান করিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে বোম্বাইয়ের প্রভাত এবং লক্ষ্মৌয়ের ইকুইটী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে কার্য্য করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

—✻—

মিঃ এন্ এস্ মথুস্বামী আয়ার এম্ এ, বি এল, এ আই এ, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ইন্‌সিওরেন্স সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলকারখানার শ্রমিকদিগের দুরবস্থা মোচনের জন্য বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট অসুস্থকালীন বীমা (সিক্‌নেস্ ইন্‌সিওরেন্স Sickness Insurance) প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তদুদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে লেবার কমিশনার মিঃ জে এফ্ জেনিংস্ এক খসড়া

প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন। জনসাধারণকে এ বিষয়ে মতামত জানাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

—※—

দিল্লী প্রদেশস্থ বীমা কোম্পানী সমূহের কর্ম্মচারীগণ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক মন্তব্য লিপি প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, নূতন সংশোধিত বীমা আইনে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর আফিসের কেরাণীদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। তাঁহাদের চাকুরীর প্রথম আরম্ভে বেতন মাসিক ৪০ টাকার কম হওয়া উচিত নয়। কোম্পানী যে বোনাস্ অথবা ডিভিডেণ্ড দেয়, কেরাণীরাও তাহার অংশভাগী হইবেন। পুরাণো এবং বেশীদিনের কোন কর্ম্মচারী যদি ব্যয় সঙ্কোচের নিমিত্ত অপসৃত হন, তবে তিনি যত বৎসর কাজ করিয়াছেন, তত মাসের বেতন অতিরিক্ত পাইবেন। প্রত্যেক ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী কর্ম্মচারীদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড রাখিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিবেন। এই সকল ব্যবস্থা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

—※—

অল-ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড এ্যাসিওরেন্স কোম্পানীর কুমারখালী (নদীয়া) আফিসের ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী মিঃ এন্ সি রায় ঐ কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন।

—※—

মেসার্স ক্রাউন ট্রেডিং কোম্পানী সাউথ ইণ্ডিয়া ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর (কোয়াম্বাটুর) পক্ষে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের জন্য চীফ এজেণ্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা, এই ঠিকানায় তাঁহারা আফিস খুলিয়াছেন।

—※—

বোম্বাইর ফরওয়াড এ্যাসিওরেন্স কোম্পানী সম্প্রতি তাঁহাদের ব্রাঞ্চ আফিস ময়মনসিংহ হইতে ১০২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত করিয়াছেন। মিঃ এ এস্ এম অনিসার রহমানের হস্তে এই ব্রাঞ্চ আফিস পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে।

—※—

গত ১লা জানুয়ারী হিমালয় এ্যাসিওরেন্স কোম্পানীর হেড আফিস ৪নং ড্যালহৌসী স্কোয়ার (ষ্টীফেন হাউস্) হইতে ১৫নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, (হিমালয় হাউস্) কোম্পানীর নিজ বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে।
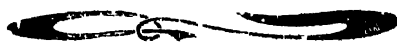
মেজর চার্লস্ উইলিয়াম সেণ্ট জন রলিন্‌সন্ নামক একব্যক্তি ১৯২৫ সালে ইংলণ্ডের লিবার-পুল সহরের রয়াল ইন্‌স্যুর‍্যান্স কোম্পানীতে ৫০ হাজার পাউণ্ডের একখানি পলিসি লইয়া জীবন বীমা করেন। নয় বৎসর পরে ১৯৩৪ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে তিনি আত্মহত্যা করিয়া মারা যান। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্রী মিসেস্ এমিলি বেস্‌ফোর্ড পলিসি চাহিলে, কোম্পানী তাহা দিতে অস্বীকার করেন। পলিসিতে এইরূপ সর্ত্ত ছিল যে, বীমাকরার দুইবৎসর পরে আত্মহত্যা করিলে পলিসির দাবী নষ্ট হয় না। তদনুসারে নিম্ন আদালতের বিচারক মিঃ জাষ্টিস সুইফ্‌ট মিসেস ব্রেস্‌ফোর্ডের পক্ষে ডিক্রী দেন।

—※—

বীমা কোম্পানী লর্ড জাষ্টিস রোমা এবং লর্ড জাষ্টিস স্কটের নিকট আপীল করেন। উহাতে বিচারপতিদ্বয় রায় দিয়াছেন যে, পলিসির সর্ত্ত যাহাই থাকুক না কেন, মেজর রলিনসন্ যখন আত্মহত্যা করিয়াছেন,—সে বীমা করার পর যখনই হউক না কেন,—পলিসির দাবী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মিসেস্ ব্রেস্‌ফোর্ড টাকা পাইতে পারেন না। শেষে কোম্পানীই জয়ী হইলেন।

গত ১৯৩৩ সালে ইউনিয়ন বোর্ডের কেরানী আবদুল হামিদ নামক এক ব্যক্তি নিজে এজেণ্ট হইয়া ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত লাকসাম থানার দিশাবন গ্রামের জব্বর আলীর নামে ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্‌স্যুর‍্যান্স্ কোম্পানীর একটী পলিসি গ্রহণ করে। এই পলিসির নমিনীও আবদুল হামিদ নিজেই হয়। ১৯৩৪ সালে কোম্পানীকে জানান হয় যে, জব্বর আলীর মৃত্যু হইয়াছে। পলিসির সর্ত্ত অনুসারে উহার দাবীর টাকা আবদুল হামিদ কোম্পানীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লয়। পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ পায়, জব্বর আলীর মৃত্যু হইয়াছে ১৯৩১ সালে,—বীমা করিবার দুই বৎসর পূর্ব্বে। প্রবঞ্চনা ও জালিয়াতির অপরাধে আবদুল হামিদের বিচার হয়। সদর মহকুমা হাকিম শ্রীযুক্ত মঙ্গলচন্দ্র আচার্য্য তাহাকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন। অন্য আসামী আবদুল মজিদ মুক্তি পাইয়াছে। এই আবদুল ও আবদুল মজিদ,—ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্‌স্যুর‍্যান্স্ কোম্পানীকে আর একবার প্রতারণা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। সেবারে তাহারা লতিফন্নেসা নাম্নী এক স্ত্রীলোকের ভুয়া নামে ভাগ্যলক্ষ্মীতে জীবন বীমা করে। সন্দেহের সুযোগে তাহারা এই অপরাধ হইতে মুক্তি পায়।

পিপলস্ ব্যাঙ্ক অব্ নর্দ্দান্ ইণ্ডিয়ার ৮ লক্ষ টাকার তহবিল আত্মসাৎ করার অপরাধে মিঃ কে এল গৌবা এম্ এল এ এবং তৎসহিত রূপনারায়ণ, মহম্মদ্দীন, ও নন্দলাল নামক অন্য তিনজন অভিযুক্ত হইয়াছিল। ১৯৩৬ সালের ১৩ই জুলাই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত লিকুই-ডেটার এই মামলা দায়ের করেন। ১৯৩৭ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে আসামীগণ সেসনে

সোপর্দ্দ হয়। লাহোরের স্পেশ্যাল সেসন জজ মিঃ হিল্‌টন অধিকাংশ জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীদিগকে খালাস দিয়াছেন। রায়ে তিনি বলিয়াছেন যে, ডিম্যাণ্ড-ড্রাফ্‌টের কারবার আপত্তিজনক ধরা হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা ব্যাঙ্কের উন্নতি ও লাভের জন্যই করা হইয়াছিল, এবং ব্যাঙ্কের ক্ষতি করা আসামীদের কখনই উদ্দেশ্য ছিল না। মিঃ গৌবা এবং রূপনারায়ণের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই ছিল যে, তাঁহারা ব্যাঙ্কের এক লক্ষ টাকা ময়দার কলের হিসাবে লিখিয়া নিয়াছেন (Transfer Entry). গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই মামলা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

হুগলী সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ৮৩৫০০ টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধে ব্যাঙ্কের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী সত্যদয়াল বসুর চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল; —অনাদায়ে আরও ৪ মাস কারাদণ্ড হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট-জজ-কোর্টে আপীল দায়ের করা হইয়াছিল;—কিন্তু আপীল অগ্রাহ্য হওয়াতে দণ্ডাদেশ বাহাল রহিয়াছে।

ক্যালেণ্ডার কার্ড ও দেওয়াল পঞ্জীর প্রাপ্তি স্বীকার

আমরা নিম্নলিখিত কোম্পানী সমূহের নিকট হইতে ক্যালেণ্ডার কার্ড ও দেওয়াল পঞ্জী পাইয়াছি। এবার একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে এই যে Insurance Life Offices Association এর যাঁরা সভ্য তাঁদের অনেকেই এবার ক্যালেণ্ডার আদি ছাপান নাই। যাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এই সব পাইয়াছি এইখানে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিলাম। স্থানাভাবে এবার আর কাহারও প্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারিলাম না। আগামীতে করিব।

১। বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড রিয়াল প্রপার্টি কোং,
ইংরাজী ও বাংলা তারিখ সমন্বিত বৃহৎ দেওয়াল পঞ্জী।

২। ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী
ইংরাজী ও বাংলা তারিখ সমন্বিত বৃহৎ দেওয়াল পঞ্জী।

৩। কলিকাতা কর্পোরেশন
ঐ মধ্যমাকারের ঐ

৪। প্রবর্ত্তক ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী
ঐ ঐ ঐ

৫। ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স
ঐ সুবৃহৎ ঐ

৬। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক
ইংরাজী ও বাংলা তারিখ সমন্বিত সুবৃহৎ দেওয়াল পঞ্জী।

৭। টীটাগড় পেপার মিল্‌স্
ঐ ঐ ঐ

৮। বীকন্ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী
ঐ ছোট দেওয়াল পঞ্জী

৯। এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোং
দ্বিরঙ্গে রঞ্জিত সুদৃশ্য Date Card

১০। বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক
ঐ ঐ

১১। কলিকাতা কর্পোরেশন
ঐ ঐ
(পশ্চাতে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদিগের নাম আছে)

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

পত্র লেখকগণের প্রতি

(যাঁহারা গ্রাহক নহেন)

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাঁহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, অথচ বিনামূল্যে এমন সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন যাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তাঁহাদের মতলব, **"একটি হরিতকিও গুরুদক্ষিণা দিব না,—কিন্তু মন্ত্রটি আদায় করিয়া নিব"।** এই রকমের লেখকদিগকে আমরা জানাইতেছি, ব্যবসায়ীর সন্ধান এবং মাল পত্র বেচা-কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাঁহারা এক একটা মালের জন্য এক এক বারের কেনা বেচায় শ' দু'শ হইতে হাজার বা ততোধিক টাকা দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও

নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্য ৫।৵০ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হইলেই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা মোটা দালালী দিতে অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ, এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,—ন্যাও,—দ্যাও,—ফ্যাল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাঁকতালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,—অথচ তার জন্য একটী পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ, এই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

১৭ বৎসর যাবৎ কার্য্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি, গোড়াতে ফাঁকিবাজীর মতলব, বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে একটা প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য আমাদের অনুরোধ, যাঁহারা সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা **আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।** যাঁহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-শুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান মুফতে দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে এই যে, তাঁহারা যথেষ্ট লাভবান এবং উপকৃত হইয়াছেন, আর আমরা লাভবান হওয়া ত দূরের কথা, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাঁহাদের পেট ভরাইয়াছি। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে। এই জন্য অতঃপর গ্রাহক না হইলে কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।

যাঁহারা গ্রাহক আছেন

আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহকগণ আমাদিগকে নানাবিধ ব্যবসায়সংক্রান্ত পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সকল প্রশ্ন করেন তাহার উত্তর ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিনা মূল্যেই প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ঐ সকল পত্রের অধিকাংশই উদ্দেশ্যবিহীন বৃথা প্রশ্নে পরিপূর্ণ। অনেকেই কেবলমাত্র কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান। বাস্তবিক কোন কাজকারবারে হাত দিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। তাঁহাদিগকে জানাইতেছি, আমরা তাঁহাদের জন্য বাজারে ঘুরিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া নানা রকমের সংবাদ সংগ্রহ করি; যদি তাঁহারা সে সকল কোন কাজে না লাগান, তবে আমাদের শুধু শুধু হয়রান এবং অর্থ ব্যয় করান কেন? তাঁহাদের নিকট অনুরোধ, যেন খামকা আমাদিগকে প্রশ্ন না করেন এবং আমাদের নিকট হইতে যে সন্ধান, সংবাদ অথবা পরামর্শ পাইয়া থাকেন তাহা যেন যথার্থ কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া নিজেরাও লাভবান্ হয়েন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিশ্রমকেও সার্থক করেন।

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মারফতে দিতে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, আমরা সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথকভাবে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র জোগাড় করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি **আমাদের যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ৫৲ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন।** গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে এই ফি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদিগের কাগজেই **বিনা মূল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিকে** প্রদান করিব। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক নম্বর পাঠানো চাই।**

১নং পত্র

মহাশয়,

কাল কয়েকটী প্রশ্ন লিখিয়া আপনাকে একখানা পত্র দিয়াছিলাম কিন্তু ; ভুলক্রমে তাহাতে গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

প্রশ্নে লিখিত ছিল—

(১) লণ্ঠনের কারখানা ভারতবর্ষে কোথায় আছে।

(২) নূতন কারখানা স্থাপিত করিলে কত মূলধন চাহি এবং তাহার উপযুক্ত জায়গা কোথায়।

১নং পত্রের উত্তর

লণ্ঠন তৈয়ারীর কয়েকটী কারখানার নাম ও ঠিকানা এই,—

(১) Bengal sheet metal Works Ltd. 22, Canning Street, Calcutta.

(২) Kathiawar Industries, Wadhwan City, Kathiawar.

(৩) Oriental metal Industries Ltd. 29, Colootola Street Calcutta. Factory at Agarpara Station E. B. R.

(৪) Thakurdas & Sons, Hyderabad, Sindh.

(৫) C. S. Pochee & Sons, 586, Chirabazar, Girgaum Road, Bombay.

Up-to-date machineries লইয়া নূতন কারখানা স্থাপন করিতে অন্ততঃ এক লক্ষ

টাকা মূলধন চাই। কলিকাতার নিকটে রেল পথের পার্শ্বে কারখানার উপযুক্ত বিস্তীর্ণ জমি অনেক আছে।

গুলিসূতার কল সম্বন্ধে ১৩৪৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত পত্রাবলী শীর্ষক প্রবন্ধে ১নং পত্রের উত্তর দেখিবেন। তাহাতে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে।

২নং পত্র

মহাশয়,

আমি কয়েকটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, আশা করি আগামী মাসে আমার প্রশ্নের উত্তরগুলি পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন। আমি গ্রামোফোনের Agency লইতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমানে কলিকাতায় কয়টা গ্রামোফোনের কোম্পানী রহিয়াছে? কোম্পানীর Agency লইতে হইলে টাকা Deposit দিতে হইবে কিনা; যদি হয় তবে কত টাকা দিতে হইবে? Agentএর শ্রেণী বিভাগ আছে কিনা। যদি Agentএর শ্রেণী বিভাগ থাকে তবে কোন্ শ্রেণীর Agentএর কিরূপ হারে Deposit দিতে হইবে তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন। Agent দিগের কি কি সুবিধা দেওয়া হইবে। এ সম্বন্ধে আপনারা দয়া করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া লিখিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, আমার ম্যাচ্ ও সিগারেটের Agency লইবার বাসনা আছে। ইহারও টাকা Deposit দিবার ব্যবস্থা আছে কিনা জানাইবেন। এবং কোন কোম্পানীর সহিত আমাকে কারবার করিতে হইবে এবং তাঁহারা Agent দিগের কি কি সুবিধা দিবেন লিখিবেন।

নিবেদন ইতি—

মোহাম্মদ আকবর হোসেন
গাড়াবাড়িয়া, হরিণাকুণ্ডু
যশোহর
গ্রাহক নং ৫৯৬৭

২নং পত্রের উত্তর

নিম্নে কয়েকটী গ্রামোফোন কোম্পানী, এবং সিগারেট ও দিয়াশলাই প্রস্তুত কারক কোম্পানীর ঠিকানা দেওয়া হইল। তাহাদের নিকট আমাদের নাম করিয়া চিঠি লিখিলে এজেন্সী সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইবেন,

গ্রামোফোন কোম্পানী,—

(১) M. L. Shaw Ltd. 5/1 Dharamtala Street, Calcutta.

(২) Megaphone Company 77/1 Harrison Road.

(৩) Mullik Brothers 182, Dharamtala Street, Calcntta.

(৪) Gramophone Co, Ltd. 33 Jessore Road, Dum Dum Calcutta.

(৫) Columbia Music mart, Grosvenor House, Calcutta.

(৬) K. C. Dey & Sons 80, Lower Chitpur Road Calcutta.

সিগারেট প্রস্তুত কারক কোম্পানীর ঠিকানা—

(১) Imperial Tobacco Co. of India Ltd. Virginia House, 37 Chowringhee Road, Calcutta.

(২) National tobacco Co, of India Ltd 139, Beliaghata Road, Calcutta.

(৩) Rameswar Tobacco Co, Ltd. 362, Grand Trunk Road Salkia Howrah.

দিয়াশলাই প্রস্তত কারক কোম্পানী :—

(১) Bangiya Diashalai Karyalaya 76, Jessore Road, Calcutta.

(২) Esshavi Match Manufactring Co. 46 47-1-1, Muraripukur Road, Manicktala, Calcutta

(৩) Pioneer Match Eactory, 16 Dum Dum Road Calcutta.

(৪) Heydari Match Co 150 A Beliaghata Main Road, Calcutta.

(৫) Western India Match Co, Ltd Po. Alambazar, 24 Porgs.

কেবলমাত্র কলিকাতাস্থিত প্রধান প্রধান কারখানার নামই লিখিত হইল। কারণ আপনার পক্ষে কলিকাতাস্থ কোম্পানী সমূহের নিকট হইতে এজেন্সী পাইবার চেষ্টা করা সহজ ও সুবিধাজনক হইবে।

—

৩নং পত্র

আমি আপনাদিগের সুবিখ্যাত পত্রিকার ৫৯৫০ নং গ্রাহক। নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় সঠিক জানিবার জন্য, এবং তাহা আমার বিশেষ আবশ্যক হওয়ায়, মহাশয়কে বিরক্ত করিতেছি, আশা করি সেজন্য আমার ক্রটী মার্জ্জনা করিয়া, দয়া পূর্ব্বক উত্তরদানে চিরানু-গৃহীত করিবেন।

১ ম :—"আপনাদিগের পত্রিকায় এবং সাধারণ খবরের কাগজে যে সমুদয় শেয়ার মার্কেটের সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহার নিয়মা-বলী সমূহ এবং কোথায় খরিদ বিক্রয় হয় ইত্যাদি দয়া করিয়া জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

২ য় :—খুব মজবুত ও পাকা ঘর বাড়ী তৈয়ারী করিতে যে যে স্থানে যে সমুদয় মাল

মশলার প্রয়োজন হয় তাহাদের নাম সমুহ এবং সংমিশ্রনের ভাগ সমুহ জানিবাব বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে, জানাইলে অনুগৃহীত হইব। আমি প্রত্যেক বোগের নানা প্রকাব ঔষধেব পরীক্ষিত formulas সংগ্রহ কবিয়া পাঠাইতে পারি, আবশ্যক বোধে যদ্যপি আদেশ কবেন তাহা আনন্দের সহিত পালন করিতে পারি।

বিনয়াবনত।—
শ্রীকালীকিঙ্কর দে
সোনাজোল
জেঃ হুগলী

৩নং পত্রের উত্তব

(১) শেয়াব মার্কেট্ কলিকাতায় বযেল এক্সচেঞ্জ প্লেইস্ নামক স্থানে অবস্থিত। সেখানে বিরাট কাববার চলিতেছে। শেয়াব খরিদ বিক্রী করিবাব বহুসংখ্যক কোম্পানী আছে। এই ব্যবসা করিতে হইলে, অনেক টাকা মুলধনের প্রয়োজন এবং আপনার নিজে আসিয়া দেখা উচিত। এই সম্বন্ধে বিস্তাবিত বিবরণ জানিতে হইলে আমাদের নাম কবিয়া নিম্ন ঠিকানায় চিঠি লিখিবেন,—Bengal Share Dealers Syndicate 3 & 4, Hare Street Calcutta

(২) পাকা ঘববাড়ী প্রভৃতি তৈযাবী করিবার মাল মশলা সম্বন্ধে জানিতে হইলে আপনাকে ভাল ইঞ্জীনিয়ারেব শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। পুস্তক পড়িয়া যদি জানিতে চান, তবে Building Construction বিষয়ে অনেক পুস্তক আছে। তবে ইংরাজী পুস্তকই বেশী, বাংলা ভাষায় পুস্তক খুব কম। ঐ সকল পুস্তকের জন্য কলিকাতার বড় বড় পুস্তকের দোকানে চিঠি লিখিবেন,—অথবা নিজে আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া কিনিবেন। কারণ এই সকল পুস্তকের মূল্য খুব বেশী। তার উপর আবার একখানা পুস্তকে হয়ত চলিবেনা। দুই তিনখানা কিনিতে হইবে। আপনি কলিকাতার নিকটেই আছেন। সুতরাং আমাদেব মনে হয়, আপনার পক্ষে কলিকাতায় আসা অধিক ব্যয়সাধ্য বা অসুবিধাজনক নহে।

বাংলাভাষায় একখানি খুব ভাল পুস্তকের নাম আমরা জানি। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে (২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) তাহা পাইবেন। ঐ পুস্তকে Building Construction সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় জানিতে পারিবেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সএব একখানি পুস্তক তালিকা কিনিলেই উহাতে সেই পুস্তকের নাম পাইবেন।

—•—

৪নং পত্র

মহাশয়,

বিভিন্ন প্রকারেব কুটির শিল্প নির্ম্মাণেব যন্ত্র কোথায় পাওয়া যাইতে পাবে, অনুগ্রহ পুর্ব্বক আমাকে উহাব একটা ঠিকানা দিলে বিশেষ উপকৃত হইব। যদি আপনাবা ঐ গুলি বিক্রয় করেন তবে একখানা ক্যাটেলগ সহ একটি গুলি সুতার কল সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবরণ গুলি আমাকে ফেরৎ ডাকে জানাইয়া বাধিত কবিবেন।

(১) উহাব মুল্য,—কার্য্যকরী শক্তির পরিমাণ অর্থাৎ দৈনিক কত সময় কাজ করিয়া একজন লোক কতটি গুলি তৈয়ার করিতে পাবিবে। যন্ত্র চালনার সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি।

(২) লাভালাভ সম্বন্ধে একটা সাধারণ ইঙ্গিত।

(৩) মাসিক কিস্তি হিসাবে মূল্য লইয়া আমাকে যন্ত্রটি দিতে পারেন কিনা? মাসিক বেতন পাইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট হারে—মূল্য পরিশোধ করিব।

আপনাদেরে কষ্ট দিতেছি বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

বিনীত—
শ্রীযতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
হেড্ মাষ্টার
রামসুন্দর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়
পোঃ বিশ্বনাথ
জিঃ শ্রীহট্ট

—◆—

৪৭ পত্রের উত্তর

কুটীর শিল্পের বিবিধ যন্ত্র সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় আমাদের নাম করিয়া এবং আপনার কোন্ শিল্পের যন্ত্র আবশ্যক তাহা জানাইয়া চিঠি লিখিবেন,—

(১) Oriental Machinery Supplying Agency. Ltd. 20, Lalbazar Street, Calcutta

(২) Berry Bros. 15, Clive Street, Calcutta.

(৩) Industrial Machinery Co. 12, Clive Street, Calcutta.

(৪) Small machineries mfg. Co. 22, R. G. Kar Road, Calcutta.

(৫) W. Leslie & Co 19, Chowringhee Road, Calcutta.

আমাদের গুলি সুতার কলের মূল্য ৮০ টাকা। প্যাকিং খরচা স্বতন্ত্র। আমরা মাসিক কিস্তি হিসাবে কল বিক্রয় করিনা। আমাদের গুলি সুতার কলের বিস্তারিত বিবরণ ১৩৪৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্যে পত্রাবলী শীর্ষক প্রবন্ধে ১ নং পত্রের উত্তরে দেখিবেন।

হাবড়া মিউনিসিপালিটী

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালের ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে নিম্নলিখিত কার্য্য সম্পাদন, কন্‌ট্রাক্ট্‌ ও মাল সরবরাহের জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌, শীলমোহর করা প্রত্যেক দফার দুই খানি করিয়া টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডারের উপরে "Annual Tenders" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে এবং উহা চেয়ারম্যানের নামে পাঠাইতে হইবে। ১৯৩৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত এই মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারী উক্ত টেণ্ডার সমূহ গ্রহণ করিবেন।

প্রত্যেক দফার পাশে যে টাকার পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই টাকা ঐ দফার জিনিস বা কাজের জন্য ১৯৩৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী বেলা দুই ঘটিকা বা তৎপূর্ব্বে কেসিয়ারের নিকট অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

(১) এঞ্জিন-ঘরের দরকারী জিনিস পত্র (Engine room requirements) ২০০ টাকা

(২) ব্লিচিং পাউডার (Bleaching Powder) ২৫০ ,,

(৩) য়্যালুমিনো ফেরিক্‌ য়্যাণ্ড প্রেসিপিট্যান্ট্‌ (Alumino Ferric and precipitant) ১০০০ টাকা

(৪) তেলের বাতি জ্বালন ২০০ ,,

(৫) ২০০ টাকার কম মূল্যের ছোট খাট কাজ ১০০ ,,

(৬) শ্রীরামপুরে হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস্‌ হইতে ছাই সরাইয়া নেওয়া ৫০ ,,

(৭) টিউব্‌ ওয়েল খনন, ও পুনঃ খনন ১০০ ,,

প্রত্যেক টেণ্ডারের সঙ্গে এই মর্ম্মে একখানি কেসিয়ারের সার্টিফিকেট সংলগ্ন করিয়া দিতে হইবে যে, তৎসম্পর্কিত উপরি উক্ত অগ্রিম টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে। টেণ্ডার গৃহীত হইবার পর যদি টেণ্ডারদাতা স্বীয় টেণ্ডার প্রত্যাহার করেন, অথবা টেণ্ডার পুরোপুরি কিম্বা আংশিক গৃহীত হইবার পর যদি টেণ্ডার-দাতা উহার নোটীশ পাইবার দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় চুক্তি নামা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন,—অথবা চুক্তিনামা সম্পাদন করার সময় চুক্তির সর্ত্তপালনের জামিন স্বরূপ টেণ্ডারোক্ত টাকার একদশমাংশ জমা দিতে যদি অস্বীকৃত হন, তবে অগ্রিম জমা দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

এই মিউনিসিপালিটির ষ্টোর বিভাগে প্রত্যেক খানি এক আনা মূল্যে টেণ্ডার-ফরম এবং আট আনা মূল্যে সিডিউল্‌ ফরম পাওয়া যাইবে। মিউনিসিপাল আফিস হইতে ক্রীত নির্দ্দিষ্ট ফরমে ও সিডিউলে প্রত্যেক দফাওয়ারী দুইখানি করিয়া টেণ্ডার দিতে হইবে। অন্য কোন ফরমে লিখিত টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে না। টেণ্ডার ফরমে ও সিডিউলে যে সকল সর্ত্ত ও নিয়মাবলী আছে, তদনুসারে কার্য্য করিতে

হইবে। যে মাপের হিসাব ব্যবহার করার কথা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই মাপের হিসাব টেণ্ডারে উল্লেখ না থাকিলে—উহা গ্রাহ্য হইবে না। যে সকল জিনিস সরবরাহ করা হইবে, কিম্বা যে সকল কার্য্য সম্পাদন করা হইবে, তাহা প্রদত্ত বিবরণানুগত এবং এই মিউনিসিপালিটীতে প্রচলিত বর্ণনানুযায়ী হওয়া আবশ্যক। যে সকল স্থলে নমুনা দিবার কথা, সে সকল স্থলে সরবরাহ করা জিনিস গুণে ও রকমে ঠিক নমুনার মত হওয়া চাই। এই প্রকার নমুনা টেণ্ডার দিবার শেষ তারিখের পূর্ব্বে রীতিমত শীলমোহর করিয়া আফিসে জমা দিতে হইবে।

যে সকল টেণ্ডার বিস্তারিত বিবরণের অভাবহেতু অসম্পূর্ণ, কিম্বা এই বিজ্ঞাপনের সর্ত্তানুসারে লিখিত নহে, অথবা যাহাতে নাম স্বাক্ষর হীন অদল-বদল ও কাটাকুটী থাকে,—সেই সকল টেণ্ডার গ্রাহ্য নাও হইতে পারে।

শনিবার ব্যতীত আফিস্ খোলা থাকার অন্যান্য দিনে বেলা একটা হইতে তিনটার মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আফিসে দরখাস্ত করিলে যে সকল জিনিস সরবরাহ বা যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহার বিবরণ, চুক্তির এবং মালপত্র সরবরাহের সর্ত্ত এবং অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় জানান যাইবে।

এতদ্দ্বারা কমিশনারগণ কোন টেণ্ডার সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিক গ্রহণ করা, অথবা প্রত্যেক দফার কার্য্য একাধিক কন্‌ট্রাক্টরের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া বিষয়ে নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতেছেন। তাঁহাদের যে পরিমাণ জিনিসের দরকার তাহার একটা আন্দাজী মাপ মাত্র সিডিউলে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ঐ সিডিউলোক্ত মাপের শতকরা ২০ ভাগ অতিরিক্ত পরিমাণে জিনিস লইতে পারেন অথবা একেবারে কিছু নাও লইতে পারেন। কমিশনারগণ কোন টেণ্ডার সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে কিম্বা কোন নিম্নতম মূল্যের টেণ্ডার গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন এবং তাহার কোন কারণ দেখাইতেও তাঁহারা বাধ্য নহেন।

এস. কে ব্যানার্জ্জি
ইঞ্জীনীয়ার

প্রতারণার কাহিনী—
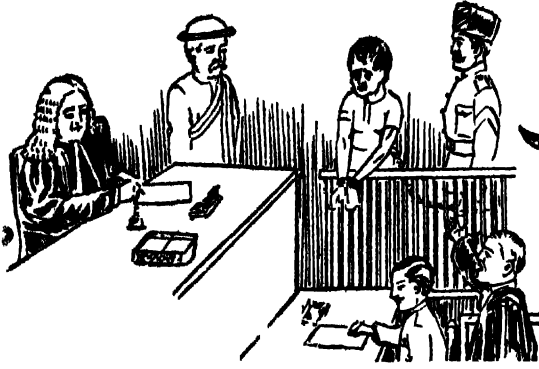
তাবাপুব নামক একজন পার্শী ভূপালের বেগমেব এজেন্ট পবিচয দিয়া কোন বড় দোকানে প্রবেশ করে। পছন্দমত ৩০।৪০ টাকাব জিনিস কিনিয়া সে দোকানদাবকে বলে "আমাব সঙ্গে আপনাদের একজন লোক চলুক, আমি বাড়ীতে যাইয়া তাহাব হাতে দাম দিব। তবে আমাব কাছে একশত টাকাব নোট আছে, উহাব ভাঙ্গানী ব্যালান্স্ টাকাও ঐ লোকটীর নিকট দিন।" দোকানদাব কোন প্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ না করিয়া, লাভেব আশায় জিনিস পত্রগুলি সহ ব্যাল্যান্সেব ৬০।৭০ টাকা একজন কর্ম্মচাবীব হাতে দিয়া ঐ খদ্দেব লোকটীব সঙ্গে পাঠায়।

মোটবগাড়ী পার্কষ্ট্রীটের একটী বৃহৎ বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাবাপুব পার্শী নামিয়া দোকানদারের কর্ম্মচারীটীকে বলে "জিনিসপত্র ও টাকাগুলো দাও, আমি একশত টাকার নোট, এনে দিচ্ছি। তুমি এখানে একটুখানি অপেক্ষা কর।" এই বলিয়া সে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। দোকানদারের কর্ম্মচারীটী দাঁড়াইয়া আছে,—কিন্তু তাবাপুব পার্শীব আব দেখা নেই,—জিনিসপত্র ও টাকা লইয়া সে আর এক দরজা দিয়া বাহিব হইয়া উধাও হইয়াছে।

প্রতাবক তাবাপুর পার্শীব ইহাই ছিল ব্যবসা। অনেক দোকানদারকে সে এমন করিয়া ঠকাইয়াছে। কখনও পাতিয়ালা মহারাজার আস্তাবলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কখনও ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের ম্যানেজার, কখনও বা অন্যকোন রাজা মহারাজাব উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সাজিয়া সে দোকানে প্রবেশ করিত এবং প্রতিবারেই ঐরূপ ৩০।৪০ টাকার জিনিস কিনিয়া একশত টাকার নোটে দাম দিবার প্রস্তাব করিত এবং উহাব ব্যাল্যান্স ও জিনিস সহ দোকানদারের একটী কর্ম্মচারীকে লইয়া আসিত। তারপর সেণ্ট জেবিয়াব কলেজ, ষ্টীফেন হাউস্, গলষ্টন ম্যানসনস্, কার্ণনী ম্যানসন্স প্রভৃতি বড় বড় বাড়ীর সম্মুখে মোটর গাড়ী রাখিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া আর এক দরজা দিয়া অলক্ষ্যে বাহির হইয়া যাইত।

সম্প্রতি তাবাপুর পার্শীর এই জোচ্চুরি ধরা পড়িয়াছে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি ম্যাজ-

ষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্তের বিচারে তাহার একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। সে স্বীকার করিয়াছে, কলিকাতায় সে এইভাবে ১১টী প্রতারণার কার্য্য করিয়াছে।

(২)

জেম্‌স্‌ ষ্টীভেন্‌সন মুর ওরফে পটেক্যান ম্যাক্‌ কয় নামক জনৈক ইউরোপীয় কোন বড় ব্যবসায়ীর আফিশে প্রবেশ করিয়া বলে যে সে তাহার মোটরে করিয়া একটী মহিলাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে লইয়া যাইতেছিল; পথে তাহার মোটর বিগড়াইয়া যায়। এক্ষণে তাহা সরাইবার খরচা সঙ্গে নাই। সে সামান্য কিছু টাকা চায় এবং তাহা পরদিনই ফিরাইয়া দিবে এইরূপ অঙ্গীকার করে। ভদ্রতার খাতিরে ঐ আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ ষ্টীভেনসনকে কিছু টাকা হাওলাত দেন। কিন্তু তারপর আর ষ্টীভেনসনের দেখা নাই। শেষে জানা গেল তাহার ব্যবসাই হইল এই রকম মিথ্যা কথা বলিয়া লোককে প্রতারণা করা।

গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের কর্ম্মচারী সার্জ্জেণ্ট ক্লার্ক অনুসন্ধান করিয়া ষ্টীভেনসনের এই জুচ্চুরি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। তদন্তে প্রকাশ পায়, ষ্টিভেন্‌সন এইরূপে ৩১টী প্রতারণার কার্য্য করিয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের জিম্মায় জেলে রাখা হইয়াছে।

(৩)

সুধীর পাঠক ও জ্ঞানেন্দ্র সাহা নামক দুই ব্যক্তি "অটো সার্কুলেটিং কোম্পানী" নামক একটী কারবার খোলে। তাহারা কোন খদ্দেরের নিকট পাঁচ টাকায় একখানা পলিসি বিক্রয় করে। তার দুইমাস পরে একবৎসর পর্য্যন্ত ঐ পলিসি-হোল্ডারকে মাসিক পাঁচটাকা হিসাবে দিবে,—এই ছিল তাহাদের কারবারের রীতি। এই প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া অনেক লোক এই কোম্পানীর পলিসি খরিদ করে। হাট-খোলা পোষ্ট আফিসের ডাক-পিয়ন বনওয়ারী রাম ঐ প্রকার ৫ টাকা মূল্যের ৩০ খানা পলিসি কিনিয়াছিল। কিন্তু দুইমাস পরে সে কিছুই পাইল না। কোম্পানীর আফিসে যাইয়া দেখে তালা বন্ধ; কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, এই ভাবে তাহারা বহু লোককে প্রতারিত করিয়া টাকা লইয়াছে। বনোয়ারী রাম পুলিশে দরখাস্ত করে। যথারীতি তদন্তের পর প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্তের এজলাসে উক্ত সুধীর পাঠক ও জ্ঞানেন্দ্র সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে।

বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী

বাংলার এবং বাঙ্গালীর আজ বড় দুঃসময়। অতীতে যে সকল বাঙ্গালীর বিরাট ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা, সাধনা, স্বার্থত্যাগ এবং অসাধারণ প্রতিভা বাঙ্গলা দেশ এবং বাঙ্গালীজাতিকে সমগ্র ভারতের শীর্ষস্থানে উঠাইয়াছিল আজ একে একে সেই সকল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাঙ্গলার আকাশ হইতে অস্তহৃত ;—যাহাদিগের শক্তি, সাধনা এবং সিদ্ধির উপর সমগ্র ভারতের শীর্ষদেশে বাঙ্গালীর এই বিজয় মুকুট রচিত হইয়াছিল, আজ কালের প্রবাহে সেই সকল বিরাট স্তম্ভ একে একে খসিয়া পড়িতেছে। বাংলায় আর বিদ্যাসাগর নাই, জগৎগুরু বিবেকানন্দ নাই, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নাই,—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নাই, —সুরেন্দ্রনাথ নাই,--বিপিন চন্দ্র নাই, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নাই,—বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ বসু নাই,—শিক্ষাগুরু হেরম্বচন্দ্র নাই,—অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যবহারজীবি দানবীর রাসবিহারী ঘোষ ও তারক পালিত নাই, -পূতচরিত্র, একনিষ্ঠ দেশ সেবক, নির্ভীক সাংবাদিক কৃষ্ণকুমার নাই—কাব্য বিশারদও নাই—ব্যবসায়ী মহলের মুকুটমণি সার রাজেন্দ্র মুখার্জ্জী নাই—বাংলার আকাশে বাতাসে শুধু "নাই" "নাই" ধ্বনি হাহাকার করিয়া মরিতেছে। যাঁহারা বাংলা দেশকে বড় করিয়াছিলেন—উন্নত, মহান এবং জগতপূজ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন,—যাহার ফলে সমগ্র ভারত গত এক শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশের নেতৃত্ব অবনত মস্তকে ও একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, এবং মহামতি গোখ্‌লে বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য বড়লাটের মন্ত্রণা সভায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—

"My Lord, Conciliate Bengal, for what Bengal thinks to-day the rest of India thinks to-morow.

আজ সেই বাংলা আশাহীন উদ্যমহীন হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আছে। যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের স্থান শূন্য পড়িয়া আছে, আর বাঙ্গালীর প্রাণ হাহাকারে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। প্রদীপ্ত আলোকগুলি একে একে নিভিয়া গিয়াছে,—নূতন আলো আর জ্বলিয়া উঠিতেছে না। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র, স্যার নীলরতন কবি রবীন্দ্রনাথ, ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাংলার এই পঞ্চ প্রদীপের দিকে বাঙ্গালী অপলক নেত্রে চাহিয়া আছে ; কিন্তু আজ জীবন সন্ধ্যায় উপনীত হইয়া সে পঞ্চ প্রদীপও স্তিমিত প্রায়! দেশ অমানিশার অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে ; তাই মদ্র দেশীয় বাক্যবীর সত্যমূর্ত্তি সেদিন চোখ্‌মুখ ঘুরাইয়া বলিতে সাহস পাইয়াছিলেন।

"Bengal has no place in all India politics"

যে মান্দ্রাজকে চিরকাল কংগ্রেসে "Benighted Madras" বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইত সেই মদ্রদেশই—আজ বাংলার দশা দেখিয়া উপহাস করিতে সাহসী হইয়াছে এবং পট্টভী সীতারামিয়া কংগ্রেসের ইতিহাস রচনা করিতে যাইয়া নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় সত্য গোপন এবং অসত্য প্রচার করিয়া কংগ্রেস গঠনে বাঙ্গালীর বিরাট দানের ইতিহাস ন্যাতা দিয়া মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পট্টভীর রচিত কংগ্রেসের এই পটে যে মিথ্যার তুলি ঘসা হইয়াছে তাহাতে পট্টভী সীতা রামিয়ার মুখই মসীমলিন হইয়া গিয়াছে। আমাদের আশা আছে, যে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক হইতে কংগ্রেসের কল্পনা এবং সৃষ্টি—যে বাঙ্গালীর দেশব্যাপী আন্দোলন, অসাধারণ স্বার্থত্যাগ, কারাবরণ এবং আত্মদানের ফলে কংগ্রেস আজ এক বিরাট জাতীয় যজ্ঞে পরিণত হইয়াছে, যাহাদের অস্থি মজ্জা এবং কঙ্কালাবশেষের উপর ভারতের এই জাতীয় সৌধ রচিত হইয়াছে—একদিন তাহারাই কংগ্রেসের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবে। যাক যে কথা বলিতেছিলাম তাই বলি।

বাংলার এই তিমিরাচ্ছন্ন শ্মশানে ধীরে ধীরে দুই একটী আলো জ্বলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমরা আবার আশান্বিত হইতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি সন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রসায়ণ শাস্ত্রবিদ্ মেঘনাদ সাহা, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়, সুভাস চন্দ্র বসু, অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার প্রভৃতি বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর প্রতিভার পরিচয় দিতে সুরু করিয়াছেন এবং রত্নগর্ভা বঙ্গজননীর ক্রোড় যে একেবারে শূন্য হয় নাই তাহার পরিচয় আবার দিকে দিকে পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের কৃতী-সন্তান শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়কে ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা সম্বন্ধে ৩টী বক্তৃতা দিবার জন্য মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

ভারতের এই প্রাচীন শিল্পকলা এবং চিত্র বিদ্যা জগতের নিকট বহুযুগ ধরিয়া অজ্ঞাত, অখ্যাত এবং অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ ইহার সন্ধানও রাখিত না কিম্বা খবরও লইত না। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান ভারতের সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই প্রাচীন ভারতের এই অপূর্ব্ব কলা সম্পদ মহাকালের কুক্ষিগত অতীতের লুপ্ত এবং বিস্মৃতপ্রায় ধনভাণ্ডার হইতে উদ্ধার করিয়া জগতের সম্মুখে বাহির করিতে সুরু করেন।

আমার বেশ মনে আছে, ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসী যখন এলাহাবাদ হইতে বাহির হইত এবং আমি যখন সবে কলেজের ছাত্র, সেই সময় প্রবাসীতে ভারতের প্রাচীন গুহা গহ্বরে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধদেবের ধ্যানস্থ মূর্ত্তি এবং রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত নানা দেব দেবীর ছবি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইতে দেখি। ভারতের মাসিক পত্রাদি তখন ছবিবর্জ্জিত ছিল। সে যুগের যে সকল শ্রেষ্ঠ মাসিক,—ভারতী, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য—ইহার কোন কাগজেই কোন ছবি থাকিত না। আজ মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক কাগজেও যে ছবির ছড়াছড়ি এবং হাটবাজার দেখিতে পাই, ইহার

সর্ব্বপ্রথম অগ্রদূত প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার জীবন ব্যাপী শিক্ষা, সাধনা, অধ্যবসায়, সংযম, নিষ্ঠা এবং চরিত্রের গ্লানিতে মুহ্যমান, ভারতের অতীত গৌরব গাথা উদ্ধার করতঃ এমন এক মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যাহার ফল আজ—
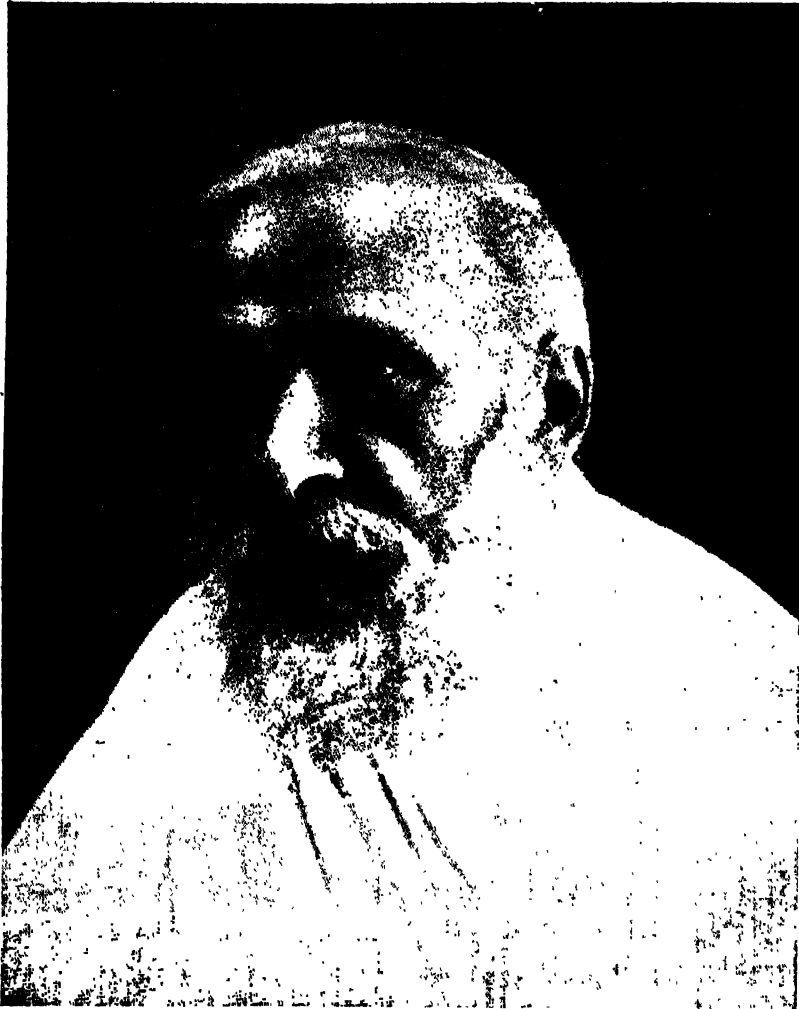
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মধ্যদিয়া যে অফুরন্ত এবং অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেমের ফল্গুধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে তাহার ফলে এবং তাহার প্রভাবেই তিনি সেই সুদূর অতীতে এই অধঃপতিত, পরাধীনতার

"গৌড়জন আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি"—

প্রাচীন ভারতের এই সকল চিত্রকলা যখন মাসের পর মাস প্রবাসীতে বাহির হইয়া সমগ্র

দেশের মধ্যে একটা Idle Curiosity বা বৃথা কৌতুহলের সৃষ্টি করিতেছিল, তখন ছবি সম্পদহীন প্রতিদ্বন্দ্বী মাসিক পত্রগুলি রামানন্দ বাবুর প্রকাশিত এই সকল ছবিকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিত এবং সাহিত্য সম্পাদক পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় তাহার প্রধান নেতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় নির্ভীক কঠোর এবং নিষ্ঠুর সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে আর পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আমরা ছাত্রের দল "সাহিত্যের" সমালোচনা অধ্যায় পড়িবার জন্য প্রতি মাসে অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতাম। সমাজপতি মহাশয়ের সুতীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ সমালোচনার ফলে তদানীন্তন কালের পাঠক মহলে অনেকেই প্রবাসীর এই অপূর্ব্ব জাতীয় প্রচেষ্টার মূল্য এবং মর্য্যাদা দিতে পারেন নাই। আমরাও এই সকল হাত পা নড়ী নড়ী, দীর্ঘাঙ্গী, পটলচেরা চোখ সমন্বিত ছবিগুলি দেখিয়া হাসিয়া লুটাপুটী খাইতাম—তখন ভাবিতেও পারি নাই যে রামানন্দ বাবু এই সব চিত্র উদ্ধার করিয়া আমাদের জাতীয় যজ্ঞের কি অপূর্ব্ব সমিধ সংগ্রহ করিতেছেন।

এইরূপ নিন্দা, বিদ্রূপ এবং ব্যঙ্গের মধ্যদিয়া একদল সমজদার বাহির হইলেন যাঁহারা প্রাচীন ভারতের এই সকল লুপ্ত রত্নের শুধু মর্য্যাদা দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—তাঁহারা Oriental School of Arts বলিয়া একটী দলের সৃষ্টি করিলেন, যাহার গুরু হইতেছেন অদ্বিতীয় শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রভৃতি। আজ হরিপুরের কংগ্রেস মণ্ডপকে জাতীয় শ্রী এবং সৌন্দর্য্যে সুশোভিত করিবার জন্য সমগ্র ভারতের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া এই ওরিয়েণ্ট্যাল আর্টের অন্যতম পূজারী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুরই ডাক্ পড়িয়াছে এবং তিনি আজ মাসাধিক কাল হরিপুরে যাইয়া এই কাজে নিমগ্ন হইয়া আছেন।

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে রামানন্দ বাবুর সুযোগ্য এবং কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়কে এই ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা দিবার জন্য মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তিনি সেখানে যাইয়া তিনটী সারগর্ভ চিন্তাশীল মৌলিক বক্তৃতা দিয়াছেন: অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সলার মিঃ এস, ই, রঙ্গনাথম্ সভাপতি ছিলেন। রাইট্ অনারেবল সার জর্জ্জ ষ্ট্যান্লীর স্থাপিত ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা। পিতা যে বিষয়ের প্রথম সূচনা করেন, সুযোগ্য পুত্র তাহারই অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়া এমন কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন যে বাংলার বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার আমন্ত্রণ আসিয়াছে। পিতার ইহাতে আনন্দ এবং গর্ব্ব অনুভব করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

পিতা,—সর্ব্বত্র জয়মিচ্ছেৎ তু
পুত্রাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ং

আমরাও ইহাতে আনন্দ ও গর্ব্ব বোধ করিতেছি।

আমরা নিম্নে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত স্যার জর্জ্জ ষ্ট্যান্লী বক্তৃতাবলীর প্রথম পর্ব্বে "সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান ও ভারতীয় শিল্পকলা" সম্বন্ধে মিঃ অশোক চ্যাটার্জ্জি যে কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

"সুন্দর-স্বরূপের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের চেষ্টাই শিল্পকলা। মানবের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহার ক্রম বিকাশ হয়। সুন্দর বস্তুর বাহিরে সকল সৌন্দর্য্যের মূলাধারকে পাওয়া সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে অসাধ্য-সাধন নহে। কিন্তু তাই বলিয়া পার্থিব সুন্দর বস্তু সমূহকে হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে, পট, শিলা, বর্ণ, ছেদনী, তুলিকা প্রভৃতি বস্তুর সহিত শিল্পীকে অবিরত সংগ্রাম করিতে হয়। এই সকল প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি যে মূর্ত্তি, ছবি অথবা কাব্য রচনা করেন, তাহা তাঁহার মনের অস্পষ্ট ভাব অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট। কেহ কেহ বলেন, শিল্পী

শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়

ছাড়িয়া সেই সুন্দর স্বরূপে আত্মবিলীন করিবার চেষ্টা মানুষকে সুখ দিতে পারে না। কবিতা, সঙ্গীত, ভঙ্গিমা, ভাস্কর্য্য, চিত্র প্রভৃতি বিবিধ শিল্পকলায় শিল্পীর মনের ভাব আংশিক মাত্র প্রকাশিত হয়। যদি তিনি নিজের মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারিতেন, তবে তাঁহার শিল্পদ্রব্য যে সৌন্দর্য্য সম্পদে অধিকতর সমৃদ্ধ বাহিরে যাহা দেখান, তদপেক্ষা তাঁহার মনের ভিতরকার ছবিই শ্রেষ্ঠ,—কিন্তু একথা অনেক সময়ে অসত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রকৃত শিল্পকলা তিনটী অবস্থার মধ্যদিয়া বিকশিত হয়। প্রথমতঃ শিল্পীর সৃজনী মনোবৃত্তি; সৃষ্টি করিবার প্রবল আকাঙ্খা। আরম্ভে ইহা অস্পষ্ট থাকে, পরে ক্রমশঃ ঘনীভূত

ও সুস্পষ্ট হয়। শিল্পীর অন্তরে এই চাঞ্চল্য আসে ঐশ্বরিক প্রেরণা হইতে। তখন শিল্পী আর স্থির থাকিতে পারে না। তার পরেই দ্বিতীয় অবস্থা মানস-ছবির উদ্ভব হয়। ইহা যখন শিল্পীর ধ্যানে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তখন তৃতীয় অবস্থা আসে। শিল্পের এই অবস্থাতেই বাহিরের বস্তু অবলম্বনে শিল্পীর মানস-ছবি আকার প্রাপ্ত হয়। এই তিনটী অবস্থার কোন একটিকে অন্য দুইটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায় না।

শিল্পের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, মানুষের প্রাণের সহিত উহার সংযোগসূত্র থাকে। ইহার অর্থ ইহা নহে যে শিল্পী মানুষের রুচির চাহিদা মিটাইবার জন্য শিল্প রচনা করিবেন। ঐশ্বরিক প্রেরণায় তাঁহার অন্তরে যে প্রবল আগ্রহ ও চঞ্চলতার উদ্ভব হয়,—শিল্পী স্বয়ং সন্তুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা কিছুতেই থামে না। চিরাগত সংস্কার, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি এবং পারিপার্শিক অবস্থা অনুসারে শিল্পীর সৃষ্ট বাহ্যিক মূর্ত্তী বা ছবির পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু তাহাতে শিল্পীর মনের ভাবটিকে চাপা দিলে চলে না। যে প্রেরণা ও আগ্রহ শিল্প সৃষ্টির মূল কারণ, তাহাকে সর্ব্বোপরি অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। তবেই সত্যিকার শিল্পসৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

ভারতীয় শিল্পীকে যে সকল সংস্কারগত ও রীত্যনুগত কঠোরতার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, পৃথিবীর আর কোনদেশে তাহা নাই। মূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,—আকৃতি ও গঠন—দেহ ভঙ্গিমা—প্রভৃতি সমস্তই শাস্ত্রানুগত হওয়া আবশ্যক। ভারতীয় সকল শিল্পের মূল ভিত্তিই হইতেছে ধর্ম্মভাব। চিত্রে, কাব্যে, মূর্ত্তিতে সেই ধর্ম্মভাবের দ্যোতনা না থাকিলে শিল্প হিসাবে সে সব নিস্ফল; এই কারণেই পাশ্চাত্য সমালোচকগণ ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারেন না—এবং তাহার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তাহাও বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন ভারতীয় শিল্পে রিয়্যালিজ্‌ম্ নাই, উহা ইঙ্গিতসূচক এবং একটা ভাবের প্রতীক মাত্র। যাহাদের উপভোগের নিমিত্ত ভারতীয় শিল্পকলার সৃষ্টি ও বিকাশ হইয়াছে তাহাদের মনোবৃত্তি কিরূপ তাহা এই সমালোচকগণ জানেন না। সেইজন্যই তাঁহারা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। যে সকল শিল্পকলার একটা কাল্পনিক প্রকৃতি আছে, সুতরাং তাহাতে ইঙ্গিত সূচকতা কিঞ্চিত থাকিবেই। বাস্তবিক কোন শিল্পকলাতেই পূর্ণ ইঙ্গিত সূচকতা অথবা পূর্ণ রিয়্যালিজ্‌ম্ নাই।

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ খৈতান

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী, নোটারী পাবলিক এবং ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর **শ্রীযুক্ত দুর্গা প্রসাদ খৈতান** বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে তিনি এক্ষণে নিরাময় হইয়াছেন এবং ধীরে ধীরে বল ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতেছেন।

স্থান হাওড়া ষ্টেশন, Enquiry office এর জানালা ৷

নব্য বাবু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া Enquiry আপিশের বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—মশাই! সাড়ে তিনটের গাড়ী কখন ছাড়্বে শিগ্গীর বলুন ত'

বাবু গম্ভীর ভাবে—আজ্ঞে ঠিক তিনটে তিরিশ মিনিটে—
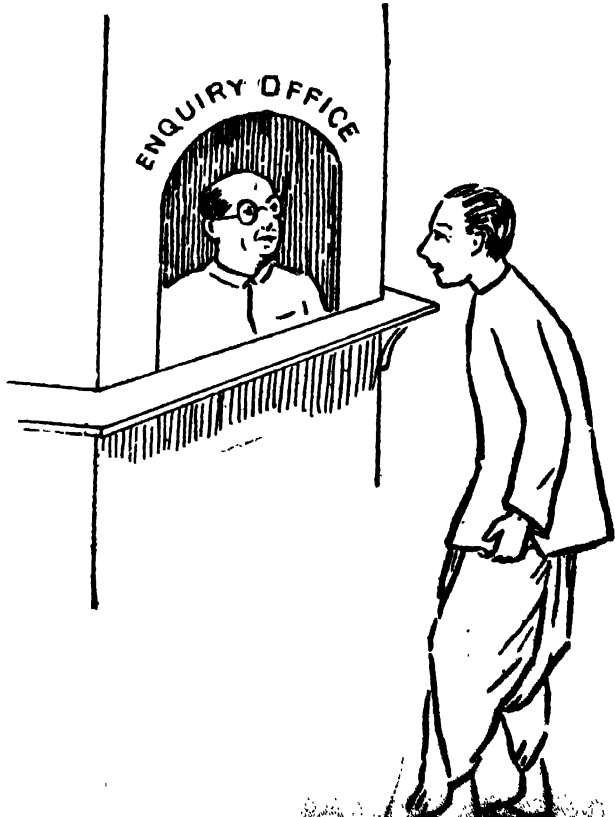
ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৭শ বর্ষ | চৈত্র—১৩৪৪ | ১২শ সংখ্যা

চুরুট শিল্প ও তাহার প্রস্তুত প্রণালী

পূর্ব্বের একটি প্রবন্ধে আমরা চুরুটের মর্য্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তাতে এই দেখিয়েছি যে, সিগারেট প্রায়-সমস্ত বাজার অধিকার করলেও চুরুট ক্রমশঃ পুনর্বায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সুতরাং চুরুট-ব্যবসায়ীদের এ-সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষে চুরুট-ব্যবসা নিতান্ত মন্দ চলেনা, চুরুট প্রস্তুতের অনেকগুলি কারখানাও বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তন্মধ্যে গুটিকয়েক ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে চালিত কারখানা ছাড়া অপরগুলির উৎপাদন তেমন উচ্চাঙ্গের হয় না। এটা দুঃখের কথা! যে যে জিনিস বর্ত্তমান থাকলে কোন শিল্পের উৎপাদন উচ্চাঙ্গের হ'তে পারে, সে-সব জিনিসের আমাদের বিশেষ অভাব নেই; অভাব আছে শুধু আমাদের ব্যবসামুখী মনোবৃত্তির। সেই কারণেই দেশী কারখানার চুরুটের কোয়ালিটি তেমন উচ্চাঙ্গের হয় না। অথচ আমাদের দেশে চুরুটের কাঁচামালের অভাব নেই। সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে বাণিজ্য লক্ষ্মীর কৃপা আমাদের ওপর যেরূপ বর্ষিত হয়েছে তাতে দেশের বাজার ত দূরের কথা, বিদেশের চুরুটের বাজারও আমাদের অধিকার করা উচিত ছিল; কিন্তু উৎপাদনের কোয়ালিটি ভাল না হ'লে সে জিনিসটি কি করে সম্ভব হবে? বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের ব্যবসায়ীরা উৎপাদনের কোয়ালিটির উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করিল না। অথচ উৎপাদনের কোয়ালিটির উন্নতি না ঘটলে কি করে আমরা বিদেশী দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হব বা দেশের বাইরের বাজার অধিকার করব?

আমাদের সিগারেট শিল্পের ক্ষেত্রে যে ত্রুটি লক্ষিত হয়, সিগার-শিল্পের ক্ষেত্রেও ঠিক

সেটাই দেখা দিয়েছে। সিগারেট ব্যবসায়ীরা যেমন তাঁদের নিকৃষ্ট উৎপাদন দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকেন অর্থাৎ বাজারে যখন তাঁদের ঐ নিকৃষ্ট সিগারেটই বিক্রীত হচ্ছে তখন উৎকৃষ্ট সিগারেট উৎপাদনের জন্য হাঙ্গামা করে লাভ নেই এইরূপ মনোভাব দেখান, চুরুট ব্যবসায়ীরাও তদ্রূপ তাঁদের গতানুগতিক উৎপাদন দ্বারাই তৃপ্ত হ'ন। কিন্তু তাঁদের এই আচরণ ব্যবসার মূলনীতির বিরোধী। প্রত্যেক উৎপাদকেরই সব সময় এই লক্ষ্য থাকা উচিত যাতে করে তার উৎপাদনের সীমা ও কোয়ালিটির উন্নতির বৃদ্ধি পায়। এই লক্ষ্য যার না থাকে, তার ব্যবসা কোন রকমে চলে যেতে পারে, কিন্তু কারবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে না।

চুরুট-ব্যবসায়ীদের আমরা এই জিনিসটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমাদের দেশে চুরুট ব্যবসার উন্নতির পথে কোন অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা নেই, সুতরাং আমরা যে এই শিল্পটির বিদেশীদের সমান পর্য্যায়ের উন্নতি ঘটাতে পারব না এমন কথা বলা চলে না। আমাদের ব্যবসায়ীরা যদি প্রকৃত ব্যবসাগত প্রাণ নিয়ে এ-শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তাহ'লে অতি সহজেই সে-জিনিস সম্ভব হতে পারে।

আমাদের দেশে চুরুট সম্পর্কে জ্ঞান অল্প লোকেরই আছে। যাঁরা চুরুটখোর তাঁদের মধ্যে কেউ চুরুট বেশ মোলায়েম বলে চুরুটের তারিফ করেন; আবার কারও কারও চুরুট বেশ কড়া হ'লেই তবেই সেটা ভাল লাগে। চুরুটের ছাই যদি ভাল হয় তবে কেউ বা সেটাকে সেরা চুরুট বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে চুরুট ভাল ভাবে পোড়ে, যার রঙ এবং গঠন ভাল থাকে এবং যে বস্তুর তামাকের কোয়ালিটি উৎকৃষ্ট হয়, সেই চুরুটই সবচেয়ে সেরা। যদি বলা যায় যে চুরুটটি ভালভাবে পোড়ে, তার মানে এই নয় যে চুরুটটিকে ধরাবা মাত্রই তা' অবিলম্বে পুড়ে যায়। চুরুটটি ভাল পোড়ে মানে হচ্ছে যে তা সমান ভাবে চারিধারে পোড়ে, কোথাও কম বা কোথাও বেশী পোড়ে না। কোন কোন চুরুটে এমন দেখা যায়, আগুনের রেখার ধারে একটি পুরু কাল দাগ পড়ে, সেটা কিন্তু ভাল চুরুটের লক্ষণ নয়। উৎকৃষ্ট চুরুটে কখনো ঐ রকম কাল দাগ পড়ে না। ছাই দেখলেও চুরুটের ভাল মন্দ চেনা যায়। ভাল চুরুটের ছাই সাদা হয় এবং তা' সহজে পুড়ে যায় না।

চুরুটের আস্বাদেও চুরুটের ভালমন্দ ধরা যায়। ভাল তামাক পাতা যদি ব্যবহার করা যায় তাহ'লে চুরুটের আস্বাদও ভাল হয়। যে চুরুট খুব কড়া নয় কিংবা খুব মোলায়েম নয়, তাকেই লোকে পছন্দ করে বেশী। শুধু আস্বাদ নয়, চুরুটের খোসবাই দিয়ে খদ্দের আকর্ষণ করবার জন্য উৎপাদনকারীরা চুরুটের তামাক পাতার সঙ্গে এক প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করে। সিগারেটের পক্ষে রংটা যেমন এক প্রধান উপাদান, চুরুটের পক্ষে কিন্তু সেটা ঠিক ততখানি নয়। অর্থাৎ সিগারেটের রঙ ভাল না হইলে সিগারেটের কোয়ালিটি উত্তম হয় না, কিন্তু চুরুটের উৎকৃষ্টতা চুরুটের রঙের উপর ততটা নির্ভরশীল নয়। তবে চুরুটের উপরকার রঙটা যদি ঈষৎ হরিত কিংবা ম্যাড়মেড়ে ধরণের হয়, তাহ'লে সে চুরুট উৎকৃষ্ট হয় না। চুরুটের উপরকার রঙটা যদি ঘোর বাদামী হয়, তবে সে চুরুট চুরুটখোররা বেশী পছন্দ করে। চুরুটের

আকৃতির ত্যবতম্যও তার জনপ্রিয়তার একটি কারণ। খুব ওস্তাদ হাতের বাঁধা চুরুট সবাই পছন্দ করে, কারণ সেটার আকৃতি অর্থাৎ চেহারাটা বেশ সুডোল হয়। নইলে, বাজে চুরুটের মধ্যে কোথাও বা ছেঁড়া কাটা থাকে, নয়ত কোন খানে ঢিবি মত দেখা যায়; ফলে জিনিষটা ঠিক সুডোল হয় না, আব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো থেকে যায়। সে রকম চুরুট সস্তা হলেও চুরুট খোরেরা পছন্দ করে না। চুরুটের পাতার বাঁধন যেন বেশ আঁট হয় অর্থাৎ দু' আঙ্গুলের মধ্যে টিপ্‌লে সেটাকে যেন একটু শক্ত লাগে; কিন্তু শক্ত লাগবে বলে সেটা যেন একেবারে ইঁটের মত কঠিন না হয়।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমাদের দেশী উৎপাদনের কোয়ালিটি উপরোক্ত রকমের হয় না। ভারতবর্ষে উৎপাদিত চুরুটের মধ্যে ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ত্রিচিনা-পোলি, দিন্দিগুল, বাংলাদেশ এবং ব্রহ্মদেশের কারখানায় প্রস্তুত মাল উত্তম কোয়ালিটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং এর থেকে আমরা দু'টি জিনিস দেখতে পাই; প্রথমটি হচ্ছে যে, আমাদের দেশের উৎপাদিত চুরুট ভাল যে হয় না তা' নয়। দ্বিতীয়তঃ, দেশী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কারখানার চুরুট ভাল হয় না, কিন্তু ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কারখানার চুরুট ভাল হয়ে থাকে। এর থেকে এই বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষে ভাল চুরুট উৎপাদনের পক্ষে কোন বাধাই নেই, কেননা, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, ইউরোপীয় পরিচালিত কারখানায় উৎকৃষ্ট চুরুট উৎপাদিত হয়ে থাকে।
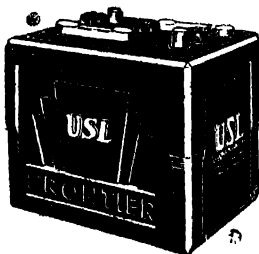
আমাদের দেশী কারখানার দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি এই যে, তারা উচ্চাঙ্গের উৎপাদনের প্রতি ততটা মনোযোগ প্রদর্শন করে না। ফলে, এই হয় যে,—তাদের কারবারের কোন রকম প্রসারতা লাভ ঘটে না। অতএব আমাদের উৎপাদকদের এধারে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

এইবার আমরা চুরুটের তামাক পাতা প্রস্তুতের প্রণালী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। পূর্ব্বেই বলেছি যে, তামাক পাতার গুণাগুণের ওপর চুরুটের গুণাগুণও অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং অপরাপর দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে রকম ভাবে তামাক পাতা প্রস্তুত হয়, আমাদের দেশেও সেই পন্থা অবলম্বন করা উচিত, কারণ আমরা জানি যে তামাকপাতা যদি ভাল হয়, তাহ'লে কারবারের তাতে অনেকখানি উন্নতি সাধিত হয়ে থাকে।

যাঁরা চুরুট খান্ তাঁরা অনায়াসে অতি সহজেই বাজারে চুরুট পেয়ে ভাবেন যে, এ-জিনিসটি প্রস্তুত করতে বিশেষ কোন হাঙ্গামা নেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সে-ধারণা সত্য নয়। ভাল চুরুট উৎপন্ন করতে গেলে অনেক হাঙ্গামা পোহাতে হয়; আমাদের দেশী কারখানার কর্ত্তৃপক্ষেরা সে-হাঙ্গামা পোহাতে চান্ না বলেই দেশী চুরুট ভাল হয় না। সেই হাঙ্গামার প্রধান ব্যাপার হ'ল চুরুটের পাতার চাষের সময় তার সবিশেষ যত্ন নেওয়া। স্বাভাবিকভাবে পাতার চাষের পর চারাগুলিতে কুঁড়ি ধরলে তা' ছেঁটে দিতে হয়,—এর নাম হ'ল প্রথম 'টপিং'। এইটাই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রথম 'টেক্‌নিক্যাল্ অপারেশন্'। এই রকম করলে পাতার তেজ ও বাড় বৃদ্ধি পায়। শুধু কুঁড়ি নয়, চারাগুলির ডগাও একটু ছেঁটে দেওয়া হয়। এই ডগা ছাঁটার ব্যাপারে সবিশেষ যত্ন নেওয়া আবশ্যক, কারণ, এর একটু কমবেশী হয়ে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা; এই ডগা ছাঁটা ব্যাপার ছাড়াও আর একটি বিষয়ের যত্ন নিতে হয়—সেটি হচ্ছে যে পাতার ক্ষেতে যাতে অন্য কোন রকম আগাছা না জন্মায় তার ব্যবস্থা করা। যদি অন্য কোন রকম আগাছা জন্মায় তাহ'লে তা' মাটির রস শোষণ করে এবং তাতে পাতা চাষের ক্ষতি হয়।

ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বে ১২লক্ষ টাকার চুরুট ব্রহ্মদেশ, সিংহল, যাভা, মালয় উপদ্বীপ এবং অন্যান্য বহুস্থানে রপ্তানী হইত। আজ সেই রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া দুই লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় লোকের ব্যবসাবুদ্ধি থাকিলে এই নষ্ট ব্যবসার শুধু পুনরুদ্ধার কেন যথেষ্ট পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে পারে।

তারপরে হ'ল পাতা কাটার ব্যাপার। সেক্ষেত্রেও যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন, কেননা, ঠিকমত কাটা না হ'লে পাতার ক্ষতি হতে পারে। পাতার যত্ন নেওয়া ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা হাঙ্গামার বিষয় হচ্ছে পাতা 'কিওর' করা অর্থাৎ পাতাকে ঠিকভাবে শুকানো। বাদলা বা কুয়াসাচ্ছন্ন দিনে পাতা কাটা নিষিদ্ধ। পাতা শুকোতে দেড় মাস বা দু'মাস সময় লাগে,

অবস্থানুযায়ী তার বেশীও লাগতে পারে। পাতা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে তার ঠিক চুরুটের মত কৃষ্ণাভ হলদে রং হয় এবং তখন তা' আকারেও ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এইখানে একটা সঙ্কটের ব্যাপার এই যে, পাতা বেশী শুষ্ক হলেও ক্ষতিকর, কম শুষ্ক হ'লেও ক্ষতিকর। পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, শতকরা ২২ থেকে ২৬ ভাগ জলীয় বাষ্প পাতায় বর্ত্তমান রাখা সুবিধা জনক, তার কম বেশী হলে পাতার ওপর কাল কাল দাগ পড়ে। অধিকাংশ ব্যবসায়ীরই পাতা কিওর করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা কৃষ্ণাভ হলদে রঙ্ বারকরা এবং সঙ্গে সঙ্গে পাতায় কড়া গন্ধ ধরানো। সেই উদ্দেশ্যে তারা ইচ্ছা মত আবশ্যকের অতিরিক্ত জল ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এর দ্বারা পাতার ক্ষতি সাধিত হয়।

পাতা যখন এরকম নরম অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করলে তা' ভেঙ্গে পড়ে না অর্থাৎ পাতার যখন মড়মড়ে অবস্থা আর থাকে না, তখন তাকে ছাটা হয়। পূর্ণ শুকনো অবস্থায় হস্তক্ষেপ করলে পাতা গুঁড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বলেই এই ব্যবস্থা। এইখানে পাতার শ্রেণীবিভাগ করা হয় অর্থাৎ পাতার গুণানুসারে তাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে

ফেলা হয়। গাছের উপরদিকের পাতাগুলো সাধারণতঃ ভাল এবং দোষমুক্ত হয়ে থাকে, সেইজন্যই সেগুলিকে আলাদা করে রাখা হয়। গাছের মাঝের দিকের পাতাগুলোকেও সেই রকম ভাবে আলাদা করে রাখা হয়। তলার দিকের পাতাগুলো সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত খারাপ হয়, সেগুলোকে Wrapper রূপে অর্থাৎ চুরুটের বাইরের আবরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয় না, সেগুলোকে ভিতরে মোড়াই দেবার জন্যই রাখা হয়।

এই শ্রেণীবিভাগ কার্য্য ব্যবসার দিক দিয়ে অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ এর দ্বারা সকল রকম পাতাই কাজে লাগতে পারে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর দরুণ বিভিন্ন রকম দর পাওয়া যায়। আমেরিকার 'হাভানা' ব্র্যাণ্ড্ তামাক পাতার নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হয়:—

1. Wrappers.
2. Binders.
3. Fillers.
4. Trash or Sand leap.

কিন্তু ফল, আলু, ডিম প্রভৃতির ন্যায় দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে তামাক পাতারও কোনরকম শ্রেণীবিভাগ করা হয় না বলিয়া আমাদের অনেক জিনিস নষ্ট হয়। কিন্তু আমেরিকায় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাতাও নষ্ট হয় না, কাজে লেগে যায়। আমাদের দেশেও যদি ঐ প্রণালী অবলম্বন করা যায় তাহ'লে আমাদের ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন সন্দেহ নেই। এদেশে শুধুমাত্র গুন্টুর জেলায় চুরুটের তামাকপাতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ যত্ন নেওয়া হয়।

চুরুট উৎপাদনের ক্ষেত্রে তামাক পাতার এই শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত প্রয়োজনের, কেননা, এর দ্বারা প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ইত্যাদি চুরুটের তারতম্য রাখতে কোন বেগ পেতে হয় না। চুরুট উৎপাদনকারী ও তামাকপাতা উৎপাদনকারী উভয়েরই এতে সুবিধা, কেননা, উভয় সম্প্রদায়ই এতে লাভবান হ'ন। তাছাড়া বিভিন্ন রকমের পাতার সংমিশ্রণেও নানা প্রকার চুরুট উৎপন্ন হয়, ব্যবসার দিকদিয়ে সেটাও একটা মস্ত সুবিধা। সিগারেটের উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বেশ পরিস্কৃত হ'বে। নানা রকম তামাক মসলার সংমিশ্রণে যেমন বিভিন্ন কোয়ালিটির সিগারেট উৎপাদিত হয়ে থাকে এবং তা' বিভিন্ন চাহিদানুযায়ী মূল্যে বিক্রীত হয়ে থাকে, চুরুট প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও সেই রকম যদি বিভিন্ন মসলার সংমিশ্রণ ঘটানো যায়, তাহ'লে চুরুট উৎপাদনের উন্নতি ঘটবে।

এতক্ষণ চুরুটের মাল-মসলার সম্পর্কে আলোচনা করেছি, এইবার তার প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলব। সকলেই জানেন যে, তামাক পাতাকে পাকিয়ে পাকিয়ে চুরুট প্রস্তুত করা হয়, সিগারেটের মত গুঁড়া মসলা দিয়ে চুরুট উৎপাদিত হয় না। প্রত্যেকটি চুরুটের তামাকপাতা দু'রকমের হয়ে থাকে; এক রকম পাতা দিয়ে ওপরটা ঢাকা থাকে ইংরাজিতে যার নাম হ'ল র‍্যাপার (Wrapper), আর অপর রকম পাতা দিয়ে চুরুটের দেহ ভর্ত্তি হয় ইংরাজীতে যার নাম হ'ল ফিলার (Filler)। ঐ র‍্যাপারের মধ্যে প্রয়োজনমত ফিলার দিয়ে তাকে পেন্সিলের মত গুঁড়িয়ে আঠার দ্বারা র‍্যাপার-এর প্রান্তভাগ জুড়ে দেবার পর কাঁচির সাহায্যে দু'ধার ছেঁটে দিলেই চুরুট তৈরী হয়ে

যায়। এই হ'ল চুরুট প্রস্তুত প্রণালীর সংক্ষিপ্ত কৌশল।

আমাদের দেশে ও আমেরিকায় এই চুরুট প্রস্তুত প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য আছে। আমেরিকায় প্রথমে ফিলারগুলিকে ভিজিয়ে নিয়ে তারপর তাকে হাওয়ায় শুকোতে দেওয়া হয় এবং তৎপরে সুবিধামত তার মাঝখানের বোঁটা ছেঁটে দেওয়া হয়। এই বোঁটা ছাঁটার পাটটা বালিকাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং তৎপরে তা গুণানুসারে শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী গুদামে রেখে দেওয়া হয়। র‍্যাপারগুলির বেলায়ও প্রায় অনুরূপ পন্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে। কারখানায় র‍্যাপার-বিশেষজ্ঞ ম্যানেজার নানারকম র‍্যাপার পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করেন এবং তৎপরে সেই র‍্যাপারের পাতাকে ছাঁটা হয়। ছাঁটাই-এর পর তাকে শুকিয়ে যে রকমের চুরুট প্রয়োজন সেই রকম শ্রেণী-অনুযায়ী ভাগ করা হয়ে থাকে। শ্রেণী অনুযায়ী ভাগ করা হ'লে পর প্রত্যেক কারিগরকে আবশ্যক মত তা' সরবরাহ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফিলারও দেওয়া হয়ে থাকে।

চুরুট প্রস্তুতের জন্য বিশেষ কোন যন্ত্রের প্রয়োজন নেই, একখানি টেবিল, ছুরি বা কাঁচি এবং আঠার পাত্রই হ'ল চুরুট প্রস্তুতের সরঞ্জাম; আমাদের দেশে টেবিলও ব্যবহৃত হয় না, একখানি বোর্ড হ'লেই কাজ চলে যায়। টেবিলের একধারে চুরুটের সাইজ মাপবার জন্য গজের দাগ কাটা থাকে এবং আর একধারে কাটা টুকরো ফেলবার জন্য একটি পকেট থাকে। কারিগর র‍্যাপারের পাতা থেকে চুরুট উপযোগী অংশ কেটে নেয়; তারপর তার মধ্যে আবশ্যকীয় ফিলার পুরে পাকিয়ে আঠা লাগিয়ে র‍্যাপারের গোলা অংশটি জুড়ে দেয়। তারপর গজের দাগে ফেলে প্রয়োজন মত সেটা ছাঁটাই হয়। এই সমস্ত র‍্যাপারটাই হাতে এত চমৎকার ভাবে সম্পন্ন হয় যে মনে হয় বুঝিবা তা' মেসিনে সম্পন্ন হচ্ছে। ভারতবর্ষে কিন্তু যে পন্থা অবলম্বিত হয় তাতে বহুতর ত্রুটি থাকে।

চুরুট শিল্প কুটির শিল্প বিশেষ; আধুনিক যুগে সেইটাই বোধহয় এ-শিল্পের প্রসারতার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃহৎভাবে উৎপাদন হিসাবে এ শিল্প এইজন্যই চলতে পারে না যে, চুরুট বেশী দিন গুদামজাত হ'লে খারাপ হয়ে যায়। অথচ বৃহৎভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মাল গুদামজাত হ'বার সম্ভাবনা আছে। এ শিল্প যে বৃদ্ধি পাচ্ছে না তার আরও একটা কারণ এই যে, সিগারেট বিজ্ঞাপনের জোরে চুরুটের প্রায় সমস্ত বাজার অধিকার করছে, অথচ চুরুট শিল্পের তরফ হ'তে তেমনভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় না। ভারতবর্ষ থেকে পূর্ব্বে ১২ লক্ষ টাকার চুরুট রপ্তানী হ'ত বর্ত্তমানে তা ২ লক্ষ টাকায় নেমেছে। দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও গভর্নমেন্টের এ-সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত।

অন্ন সমস্যায় বৃটেন ও বাংলা

শ্রীরামানুজ কর

বিগত শতাব্দীর মধ্যে ইংরাজ বণিকগণ জিলায় জিলায় নীল কুঠি স্থাপন করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। নীল চাষের জন্য অসহায় দরিদ্র কৃষকগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইত। ইহার জন্য নানাস্থানে হাঙ্গামা হইত। শেষে কৃষকগণ অনন্যোপায় হইয়া নীল চাষ বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হয়। ইংরাজ পাদ্রীগণ নীলকর সাহেবদের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিয়া স্বদেশে আন্দোলন চালাইয়া ছিলেন। যতদিন এই কাজে লাভ ছিল, ততদিন ইংরাজ জোর জুলুমের সহিত কাজ চালাইতে ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু জারমেনীর কৃত্রিম নীলের আমদানী হওয়ায় ইংরাজ নীলের কারবার গুটাইতে বাধ্য হন।

ইংরাজ উদ্যমশীল জাতি, নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারেন না, এজন্য ইংরাজ অর্থোপার্জ্জনের অন্য পন্থা আবিষ্কার করিলেন। বিলাত হইতে কোটী কোটী টাকার কলের কাপড় আমদানী করিয়া সস্তায় বিক্রয় করিয়া এদেশের তাঁতিদের সর্ব্বনাশ করিলেন। অন্যদিকে ধীরে ধীরে বাঙ্গালায় পাট চাষের প্রচলন করিয়া অর্থোপার্জ্জনের অন্য পন্থা আবিষ্কার কবিলেন। বাংলার কৃষক পাট চাষ করিয়া তাহা উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া বিলাতী বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া কিছুদিন বেশ আনন্দ উপভোগ করিল। ইংরাজ পাট ও বস্ত্র ব্যবসায়ে প্রচুর লাভবান হইতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসর অসম্ভবরূপ পাটের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় জমির মূল্যও বৃদ্ধি হইল। মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িল। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতির আয় বৃদ্ধি হইল। বিলাসী সৌখীন দ্রব্যে কৃষক ও মধ্যবিত্তের গৃহ পূর্ণ হইল। পাটের উচ্চমূল্যই থাকিয়া যাইবে এই আশায় হতভাগ্য কৃষক উচ্চহারে ঋণও করিয়া বসিল, ভাবিল পরে উচ্চমূল্যে পাট বিক্রী করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবে। এদিকে পাটচাষ বৃদ্ধির জন্য জমিদারের নিকট হইতে মোটা সেলামী দিয়া অত্যধিক খাজনায় পতিত জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে লাগিল। পাটের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় জমিদারেরও আয় বৃদ্ধি হইল, ফলে বাংলার জমিদারগণ পৈতৃক ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দিলেন। জমিদারীর জলবায়ুতে তাহাদের স্বাস্থ্য হানি হইতে লাগিল। জমিদারী হইতে যে টাকা আসিত তাহাতে সহরের ব্যয় ও স্বাস্থ্যকর স্থানে যাতায়াতের ব্যয় সঙ্কুলন না হওয়ায় জমিদারও ঋণগ্রস্ত হইলেন। ম্যানেজারের হাতে জমিদারীর তত্বাবধানের ভার দিয়া জমিদার

সহরে বাস করিয়া বেশ আমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনে বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জনে ইংরাজ চিন্তিত হইলেন, আয়ের অন্য পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ইউরোপে মহাসমর বাধিলে ইংরাজ ঘর সামলাইতে ব্যস্ত হইলেন। এই সুযোগে জাপান ভারতে বস্ত্র আমদানী করিতে লাগিল। বোম্বাইয়ের ধনী মহাজনগণও কাপড়ের কলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। মহা যুদ্ধের পর ইংরাজ বুঝিতে পারিলেন, ভারতে কাপড়ের বাজার হাত ছাড়া হইয়াছে। এদিকে গভর্ণমেণ্ট অর্থাভাবে বিব্রত হইয়া আমদানী পণ্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসাইতে বাধ্য হইলেন। ইংরাজ বুঝিতে পারিলেন ভারতে কাপড়ের বাজার দখল করিতে চেষ্টা করা বৃথা। ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও মিশর দেশ হইতে ইংলণ্ডে তুলা আমদানী করিতে হয়। সেই তুলায় কাপড় তৈয়ার করিয়া উচ্চ হারে শুল্ক দিয়া ভারতে বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে সেরূপ লাভের সম্ভাবনা নাই। কাজেই ইংরাজ অর্থোপার্জ্জনের অন্য পন্থা আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিলেন।

ভারতে নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইতে লাগিল। ইংরাজ এই সকল কারখানায় কলকব্জা যোগাইয়া লাভবান হইল। কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র আমদানী করিয়া প্রচুর লাভ করিতে লাগিল। মটরের কারখানা খুলিয়া ইংরাজ অর্থাগমের পন্থা উন্মুক্ত করিল। আমেরিকায় মিঃ ফোর্ড মটর কারখানা খুলিয়া অগাধ সম্পত্তির মালিক হইলেন। ইংলণ্ডে মিঃ মরিস (বর্ত্তমানে লর্ড নিউফিল্ড) মটরের কারখানা খুলিয়া কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ৫ পাউণ্ড মাত্র সম্বল লইয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি কমলার কৃপালাভ করিয়াছেন। জীবন সংগ্রামে তাঁহাকে অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হইয়াছে কিন্তু তিনি একমাত্র অধ্যবসায়ের বলে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি ২০ হাজার পাউণ্ডের অতিরিক্ত এক কালীন যে সকল দান করিয়াছেন তাহার সমষ্টি ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড। ২০ হাজার পাউণ্ডের কম যে সকল দান তাহারও ইয়ত্তা নাই। তিনি আটটী মটর কারখানা ও একটী ছাপাখানার মালিক। এই ৯টী কারখানায় ৩০ হাজার লোক কাজ করে। তাঁহার মটর কারখানার কর্ম্মচারীগণকে ২১ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ডের অংশ দান করিয়াছেন। যে সকল কর্ম্মচারী বৎসরে এক হাজার পাউণ্ডের কম বেতন পায়, তাহারা এই লাভের অংশ পাইবে।

লর্ড নিউফিল্ডের নামে প্রত্যহ যে সকল ব্যক্তিগত চিঠি পত্র আসে তাহা খুলিয়া পাঠ করিবার জন্য তিন জন কেরাণী নিযুক্ত আছে। এই সকল চিঠি তাঁহার বাটীর ঠিকানায় আসে। আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রত্যহ পাঁচশতাধিক পত্র আসে। যাহারা আর্থিক সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করে, তাহাদিগকে এ বিষয়ে নিবৃত্ত হইতে লর্ড নিউফিল্ড অনুরোধ করিয়াছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ২০ লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে

গ্রেট বৃটেনে মটরের কাজে ৫০ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইতেছে।

বাঙ্গালী হুজুগপ্রিয় জাতি ; ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন করিয়া গত ৩১ বৎসরেও তাহারা বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারিল না।

এদিকে পাটের মূল্য হ্রাস হওয়ায় বাংলার কৃষক, মহাজন, জমিদার, উকিল, ডাক্তার সকলেরই অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। বাংলায় প্রায় অধিকাংশ বড় বড় জমিদারীগুলি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে।

বড় বড় জমিদারগণ সরকারের হস্তে জমিদারীর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কৃষকগণের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে সকলেই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞ বাঙ্গালী যদি এই দুরবস্থাকে ভগবানের দানরূপে গ্রহণ করিয়া নূতন উদ্যমে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইত তাহা হইলে বাংলার অবস্থা অন্যরূপ হইত।

সাদা চিনির উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য্য হওয়ায় এদেশে চিনির কারখানা স্থাপনের পথ সুগম হইয়াছে। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে পূর্ণ উদ্যমে জিলায় জিলায় চিনির কারখানা স্থাপিত হইতেছে। আর বাংলা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। চেষ্টা করিলে বাংলায় প্রয়োজনীয় চিনি উৎপাদন করা যায়। পাটের চাষ হ্রাস করিয়া বাংলার কৃষকগণ যদি ইক্ষু চাষে মনোনিবেশ করিত তাহা হইলে বাংলার শ্রী আবার ফিরিয়া আসিত। এখন বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে বাংলায় প্রয়োজনীয় চিনি আসিতেছে।

বাংলার ভূমি সুজলা সুফলা স্বর্ণ প্রসবিনী। বাংলার ভূমি সকল প্রকার ফসল উৎপাদনের উপযোগী। অন্যান্য প্রদেশ হইতে কত প্রকার শস্য বাংলায় আমদানী হইতেছে। ইহাতে বাংলা হইতে কোটী কোটী টাকা বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। ডাল, কলাই, লঙ্কা, সরিষা, গম, যব, জিরা, মরিচ, হরিদ্রা, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কুল, লেবু, পেয়ারা, নাসপাতি, বেদানা, গুঙ্গা, ধণ্যা, পস্ত, তৈল, ঘৃত, আম, লিচু প্রভৃতি কত যে আমদানী হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কফি, বিলাতীবেগুন প্রভৃতি শাকসব্জীও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানী হইতেছে। বাংলার কৃষকগণ কিছুদিন পাট চাষ আবাদ করিয়া এই সকল দ্রব্যের চাষ করিলে নিশ্চয়ই লাভবান হইবে।

পূর্ব্বে একমাত্র শ্রীহট্ট হইতে কমলালেবু আমদানী হইত। বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিং কালিম্পং সিকিম ও নাগপুর হইতে কলিকাতায় লেবু আমদানী হইতেছে। অধুনা কলিকাতায় বারমাস লেবু পাওয়া যায়। দার্জ্জিলিং ও শিকিমে লেবুর কারবার পেশয়ারী মুসলমানগণ গ্রাস করিয়াছে। কলিকাতায় ফলের কারবার তাহারা এক-চেটিয়া করিয়াছে। দার্জ্জিলিং জিলা বাংলা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। দার্জ্জিলিংএর পরই শিকিমরাজ্য। অথচ বাঙ্গালী এখানে অর্থোপার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া পাইল না। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বাঙ্গালী দার্জ্জিলিং গমন করে। সেখানে উপার্জ্জিত অথবা পৈতৃক অর্থ ব্যয় করিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে। কেহ কেহ ঋণ করিয়া দার্জ্জিলিং গমন করে। বাংলায় যাহাদের জন্ম সেই হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতিই বাংলায় অন্নচিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। অন্যদিকে অবাঙ্গালী বাংলায় আসিয়া নানাভাবে কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। ভূয়া রাজনীতি চর্চ্চা ও দলাদলি বাঙ্গালীকে অধঃপতনের পথে লইয়া যাইতেছে। বিদেশ হইতে দিয়াশালাই আমদানী বন্ধ হইয়াছে। বোম্বাইএর ধনী মহাজনগণ সুইডেন হইতে অভিজ্ঞ লোক আনাইয়া দিয়াশালাইএর কারখানা খুলিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন।
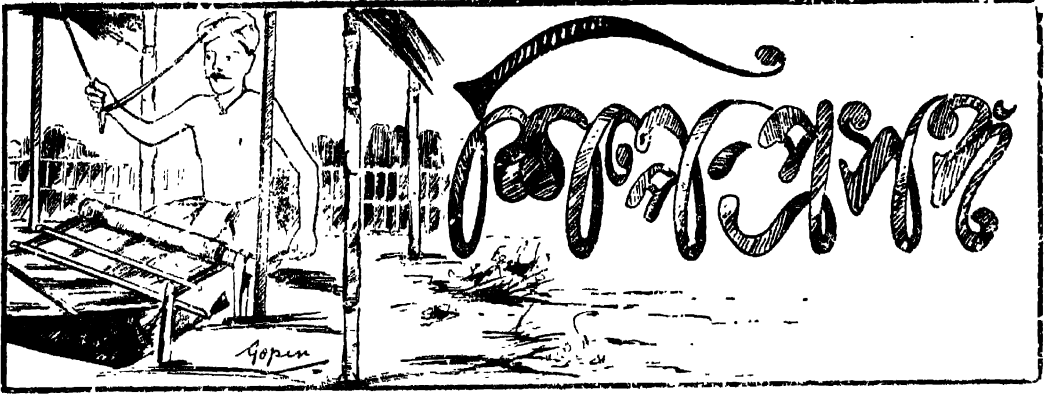
ক্রমশঃ

হস্ত নির্ম্মিত কাগজ শিল্প

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্‌, সি

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে খাদ্য দ্রব্য ব্যতীত মানবের অন্যবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কাপড়ের পরেই কাগজের স্থান দ্বিতীয়। কাপড়ের ন্যায় কাগজও প্রথমে হাতেই তৈয়ারী হইত। কিন্তু উহার ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা মিটাইবার জন্য কলের সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতীত আর কোন উপায় রহিল না। তারপর ক্রমে নানা রকমারি কাগজের প্রয়োজন দেখা দিল,—সংবাদ পত্র ছাপিবার কাগজ, পুস্তকের কাগজ, প্যাকিং কাগজ, ব্লটিং কাগজ, ট্রেসিং কাগজ, ছবি ছাপিবার কাগজ, লিখিবার কাগজ, মলাটের কাগজ, ঘুড়ির কাগজ, রঙ্গীন কাগজ, ফটোগ্রাফির কাগজ, ফিল্টার কাগজ প্রভৃতি বহুপ্রকার কাগজের এত প্রয়োজন হইয়া পড়িল যে, সকল সভ্যদেশেই বড় বড় কাগজের কল স্থাপিত হইল এবং সেই সঙ্গে হাতের তৈয়ারী কাগজের ব্যবহারও কমিয়া আসিল, কিন্তু একেবারে উঠিয়া গেল না। যেমন কাপড়ের কল, চাউলের কল, তেলের কল প্রভৃতি প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁত, ঢেঁকি ও ঘানি চলিতেছে,—তেম্‌নি কলে প্রস্তুত কাগজ খুব চল্‌তি হইলেও হাতের তৈয়ারী কাগজের শিল্প একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, কলের তৈয়ারী কাগজের কতগুলি দোষ আছে,—যাহা হাতের তৈয়ারী কাগজে থাকে না। দুই একটী এখানে উল্লেখ করিতেছি।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নৈহাটী, টিটাগড়, কাঁকনাড়া প্রভৃতি স্থানে যাইয়া সকলেই কাগজের কল দেখিয়া আসিতে পারেন। জল মিশ্রিত পাতলা কাগজের মণ্ড একখানি সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট জালের উপর যায়। এই জাল ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে। কিছুদূর গেলে পর হাওয়ার সাহায্যে মণ্ডের জলীয় অংশ শোষণ করা হয়। তখন মণ্ডস্থিত আঁশগুলি প্রায়-শুষ্ক অবস্থায় গায়ে গায়ে লাগিয়া একটা পাতলা পরদার মত হইয়া যায়। এই পাতলা পরদার মত জিনিসটীকে রোলারের মধ্যদিয়া চালাইয়া আরও শুষ্ক এবং উহার আঁশ-

গুলিকে পরস্পর অধিকতর সম্বদ্ধ করা হয়। তারপর চলন্ত কম্বল বা ফেল্টের উপর দিয়া চালাইয়া এবং ষ্টীম রোলারে জড়াইয়া উহাকে শুকাইয়া লওয়া হয়। সর্ব্বশেষে ক্যালেণ্ডার যন্ত্রে ভারী ষ্টীম রোলারের চাপে উহাকে পালিস ও চক্‌চকে করা হয়।

এই প্রক্রিয়াতে প্রধানতঃ দুইটী দোষ থাকে।

প্রথম,—সূক্ষ্মছিদ্র বিশিষ্ট জালের উপর দিয়া কাগজের মণ্ড চালিত হইবার সময় জালটী কেবলমাত্র একভাবে সম্মুখের দিকে একরেখাক্রমে চলে বলিয়া, মণ্ডস্থিত আঁশগুলি শুধু গায়ে গায়ে সমান্তরালভাবে লাগিয়া থাকে,—কিন্তু ঠিক কাপড় বুননের মত উপর নীচে আড়াআড়ি ভাবে সজ্জিত হয় না। সুতরাং ইহাতে যে কাগজ তৈয়ারী হয়, তাহা খুব শক্ত ও জোরাল হয় না। একখানি কাগজ লইয়া উহা ছিঁড়িয়া পরীক্ষা করিলেই

সকলে দেখিবেন, জালের গতির দিকে আঁশগুলি সমান্তরাল থাকে বলিয়া সেই লম্বালম্বি কাগজখানাকে সহজেই ছেঁড়া যায়। তার এড়োদিকে ছিঁড়িতে একটু জোর লাগে। কিন্তু আঁশগুলি যদি কাপড় বুননের মত হইয়া যায়, তাহা হইলে জালের গতির দিকে ছিঁড়িতেও বেশ জোরের দরকার হয়। কাগজের মণ্ডস্থিত আঁশগুলিকে কাপড় বুননের মত করিতে হইলে জালের সম্মুখগতির সঙ্গে সঙ্গে উহাকে কাঁপাইতে হয়। অবশ্য বর্ত্তমান সময়ে উন্নত ধরণের কাগজের কলে জালেতে ঐ কাঁপুনি বা ঝাঁকানি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তথাপি জালটা খুব বড় বলিয়া কলে উপযুক্ত রকমের কাঁপুনি ঠিক হয় না। সেইজন্য কলের কাগজ সর্ব্বদাই একটু কম-জোর থাকে।

দ্বিতীয়,—শুকাইবার জন্য এবং পালিশ করিবার উদ্দেশ্যে কলের কাগজকে উত্তপ্ত ও ভারী ষ্টীল ইস্পাত নির্ম্মিত রোলার সমূহের মধ্য দিয়া খুব চাপ খাওয়াইয়া চালান হয়। তাহার ফলে কাগজের জোর আরও কমিয়া যায়। ক্যালেণ্ডার বা রোলারের চাপে পালিশ করার ফলে কলের কাপড় যেমন কম-জোর হইয়া যায়, কলের কাগজও তেমনি নরম হইয়া পড়ে। সকলেই জানেন, কলের কাপড় অপেক্ষা হাতের তৈয়ারী তাঁতের কাপড় মজবুত ও বেশী টঁ্যাকসই। কাগজ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে। হাতের তৈয়ারী কাগজ কম জোর হইবার এই দুইটা কারণ ঘটে না।

কাগজী শিল্পীরা হাতে কাগজ তৈয়ারী করিবার সময় জালের ছাঁচে মণ্ড লইয়া উহাকে এমন একটা কাঁপুনী দেয়, যাহাতে আঁশগুলি সমস্ত একেবারে কাপড় বুননের মত হইয়া যায়। এই কাঁপুনী বা ঝাঁকানি কলে দেওয়া সম্ভব নহে। তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। উন্নত ধরণের কাগজের কলে জালটাকে কাঁপাইবার কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই কাঁপুনী সকল প্রকার মণ্ডে একভাবেই চলিতে থাকে। মণ্ডস্থিত আঁশের পরিবর্ত্তন অনুসারে কাঁপুনীর ধরণটাকেও পরিবর্ত্তিত করা কলের সাধ্যায়ত্ত এখনও হয় নাই। তাহা একমাত্র কাগজী মিস্ত্রীরা হাতেই করিতে পারে। তাহাদের এই নৈপুণ্য বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসে।

কাগজী শিল্পীরা মণ্ড হইতে জল শোষণ করিবার জন্য এয়ার পাম্পের (air pump) সাহায্য লয় না। ছাচটী এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে উহাতে আপনা আপনি ভ্যাকুয়াম্ উৎপন্ন হইয়া মণ্ড হইতে জল টানিয়া নেয়। তারপর অতি সাবধানে ছাঁচ হইতে কাগজের পাতলা পরদাটীকে তুলিয়া অল্প রৌদ্রের আঁচে উহাকে শুকান হয়। জল ঝরাইবার জন্য কলের মত উহাকে রোলারের মধ্য দিয়া পিষিয়া লইতে হয় না অথবা শীঘ্র শুকাইবার জন্য ষ্টীমের উত্তাপেও দিতে হয় না। এই কারণে হস্ত নির্ম্মিত কাগজের জোর গোড়াতেই ঠিক বজায় থাকে। বিশেষতঃ ক্যালেণ্ডারে পালিশ করিবার সময় কলের কাগজে যেরূপ চাপ পড়ে, হস্ত নির্ম্মিত কাগজে তাহার সম্ভাবনা নাই। কোন মসৃন শিলা খণ্ড অথবা বৃহৎ আকারের কড়ির পিঠ ঘষিয়া হস্ত নির্ম্মিত কাগজকে পালিশ করা হয়। তাহাতে কাগজ খুব বেশী পালিশ না হইলেও,—লেখা

অথবা ছাপার কাজে কোন অসুবিধা হয় না এবং কাগজের দৃঢ়তাও বজায় থাকে। অবশ্য একথা ঠিক যে হাফ্‌টোন ব্লক্‌ প্রভৃতি সুদৃশ্য ছবি এই প্রকার হস্ত নির্ম্মিত কাগজে ছাপা যায় না। তবে হস্ত নির্ম্মিত কাগজ কলের কাগজ অপেক্ষা যে টঁ্যাকসই ও দৃঢ়তর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইজন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় দলিল পত্র, শেয়ার সার্টিফিকেট, বীমার পলিসি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা এবং নক্সা প্রভৃতির জন্য বর্ত্তমানে এই যন্ত্রযুগেও হস্ত নির্ম্মিত কাগজই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাংলাদেশে কিরূপে এই কুটীর শিল্পের পুনঃ প্রবর্ত্তন করা যায়, আগামী বারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভলুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে, তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব।

—সম্পাদক

বিনয় ভূষণ সমাজপতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিশ্বাসে মিলায় হরি
তর্কে বহুদূর

*

না আঁচালে বিশ্বাস নাই

*

কথায় কথা বাড়ে
ভোজনে বাড়ে পেট

*

ফিন্ ফিন্ বর্ষে তালাও (পুকুর) ভরে

*

কাজে কুড়ে ভোজনে দেড়ে
পাতা পাড়ে মেজে জুড়ে

*

লাথির ঢেঁকী চড়ে ওঠে না

*

হাতী যখন কাদায় পড়ে
চামচিকেতেও লাথি মারে

*

শকুনী যখন আকাশে উড়ে
নজর থাকে তার ভাগাড়ে প'রে

*

মাথা নাই তার মাথা ব্যথা

*

হেলে ধ'রতে পারে না
কেউটে ধ'রতে যায়

*

ছুঁচ হয়ে ঢুক্‌ল
ফাল হ'য়ে বেরুল

*

তেল মাখবে আবা থাবা
চিৎ হোয়ে শোবে বাবা

*

থাল্ দেখে পাত্‌বে পাত্
তবে খাবে যাত্রারদলের ভাত

*

এক মাঘে শীত পালায় না

*

চোরের রাত্রিবাসই লাভ

*

এসা দিন নেহি রহেগা

*

কটা শূদ্র, কাল বামুন, বেঁটে মুসলমান
ঘর জামাই, পুষ্যিপুত্র, এ পাঁচজনাই সমান

*

ঢাকের বাজনা থামলেই মিষ্টি লাগে

*

ঢেঁকী স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে

*

আমে ধান, তেঁতুলে বাণ

*

কত গেল রথা রথী
সেওড়া তলায় চক্রবর্ত্তী

*

নারাণী আবার মেয়ে
তার আবার ঠাকুরঝি

*

ভারিত বিয়ে তার আবার দুপায়ে আলতা

*

হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা

*

আপনার কথাই লাখ্ কাহন্

*

সোজা আঙ্গুলে ঘি বেরোয়না

*

সোনা হারিয়ে আঁচোলে গেরো

*

সাপে নেউলে, আদায় কাঁচকলায়

*

মন বোঝেনা তীর্থ করে
বৃথা কাজে ঘুরে মরে

*

আপনার বেলায় আঁটী শাঁটী
পরের বেলায় দাঁত কপাটী

*

আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি

*

আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ

*

কালে কালে একি হ'ল
পুলি পিঠের ল্যাজ বেরুল

*

কুটুস ক'রে কামড়ায়
বিষের জালায় প্রাণ যায়

*

হাতীর গলায় ঘণ্টা—

*

বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা

*

যা দেখিনি কোন কালে
গোঁফ রেখেচে তোবড়া গালে

*

পারেনা ছাগল তাড়াতে
উঠে আসে ভোর থাকতে

*

তিন হাঁটু যাব, বুদ্ধি নেবে তার

*

এখনও দুধে হাত পড়েনি

*

জামিন হয় দিতে
গাছে ওঠে মরতে

*

যে মুখে বলিলাম আমি চ্যাং মুড়ী কাণী
কেমনে বলিব তারে জয় মা ভবানী

*

প্রাপ্ত মাত্রেন ভক্ষ্যয়েৎ

*

কখন হয়নি ষষ্ঠী পূজা
একেবারে দশ ভুজা

*

রাঁধে ব'লে কি চুল বাঁধে না

*

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বু'ঝেনা
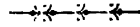
*

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে

*

বাংলার দোকান ও দোকানের কর্ম্মচারী বিষয়ক আইন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে মিঃ হুমায়ুন কবীর এম্ এল্ সি মহাশয় বাংলার দোকান এবং দোকানের কর্ম্মচারী বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি—উপস্থিত করিবেন। দোকানের কর্ম্মচারীদের নানাবিধ অসুবিধা দূর করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

ভূমিকায় বলা হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগে এযাবৎ বিবিধ আইনের সাহায্যে শ্রমিকদের অবস্থার অনেক উন্নতি করা হইয়াছে, কিন্তু দোকানের কর্ম্মচারীদের দিকে কেহই মনযোগ দেন নাই। এবিষয়ে কোন প্রকার আইন কানুন না থাকাতে, দোকানের মালিকগণ সুবিধা পাইয়া অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের উপর দুর্ব্ব্যবহার করেন। ইহার ফলে দোকানের কর্ম্মচারীদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। ইউরোপের লোকেরা এই প্রকার আইনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছেন। তথায় এখন এমন কোন সভ্যদেশ নাই, যেখানে এই আইন প্রচলিত না আছে। সম্প্রতি জাতি সংঘের অন্তর্ভুক্ত ইন্টারন্যাশনাল লেবার আফিসের চেষ্টায় জিব্রাল্টার, মাল্টা, কাইরো, ট্যাঙ্গানিকা এবং ইণ্ডো-চীনেও ঐ আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট জাতি সংঘের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াও এবিষয়ে জাতি সংঘের সিদ্ধান্তের অনুরূপ কার্য্য করেন নাই।

সম্প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, উপযুক্ত আইনের অভাবে দোকানের কর্ম্মচারীদের দুর্দ্দশা চরমসীমায় উঠিয়াছে এবং অতিরিক্ত খাটুনী, দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার ফলে কেবলমাত্র দোকানের কর্ম্মচারীদের মধ্যে নহে, দোকানের মালিকদের মধ্যেও মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃদ্ধ ও অল্পপরিসর স্থানে সারাদিন কাজ করার দরুণ ইহাদের অনেকের মধ্যেই যক্ষ্মা রোগ দেখা যায়। নির্ম্মল বায়ু, ব্যায়াম এবং আনন্দের অভাবে অল্পসময়ের মধ্যে ইহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে অচিরে বহু সহস্র দরিদ্র কর্ম্মচারীর জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিবে।

দোকানের কর্ম্মচারিগণ ব্যবসায়ী ও খরিদ-দারের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্যসংযোগ সূত্র স্বরূপ। নির্ম্মাণকারী শিল্পী ও ব্যবসায়ীর মধ্যেও তাহারা রহিয়াছে। জিনিস পত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে খরিদদারের সঙ্গে তাহারাই কথাবার্ত্তা বলে, সুতরাং বাজারদরের উঠ্তি পড়্তি তাহাদের উপরই নির্ভর করে। ইহা লক্ষ্য করা বিশেষ

আবশ্যক। অন্যান্য দেশে দোকানের কর্ম্মচারী-দের বেতন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরপর একটা নির্দ্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তাহাদের পক্ষে স্বচ্ছল জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে এমন ঘটনার অভাব নাই, যে স্থলে কোন দোকানের কর্ম্মচারী ৩০ বৎসর চাকুরী করিবার পরেও ৩০ টাকার বেশী বেতন পায় না। এমন অনেক হাজার হাজার শিক্ষিত লোক আছেন, যাঁহারা দোকানে মাত্র ১০।১৫ টাকা মাসিক বেতনে চাকুরী করিয়া থাকেন।

এই নূতন বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে কাফিখানা, (অর্থাৎ রেস্তোরাঁ), খাদ্যদ্রব্যের দোকান, ঔষধের দোকান প্রভৃতি ব্যতীত অন্যান্য দোকান রবিবারে বন্ধ রাখিতে হইবে। সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি এই চারিদিন সকাল ৯ টার পূর্ব্বে এবং সন্ধ্যা ৬ টার পরে দোকান খোলা রাখা যাইবে না। শুক্রবারে অপরাহ্ণ বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত দোকান খোলা থাকিবে। আধ-রোজ মুসলমানদের নমাজের জন্য দেওয়া হইবে। শনিবারে সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত দোকান খোলা থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে সকল দিন ছুটী বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, সেই সকল দিনে দোকান বন্ধ রাখিতে হইবে। দুর্গাপূজা, ইদল্‌ফেতর এবং বড়দিন (খ্রীষ্ট্‌মাস) এই তিনটী প্রধান ধর্ম্মোৎসবের পূর্ব্বে দশ দিন যাবৎ বেলা ৯টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত দোকান খোলা থাকিবে। কিন্তু উৎসবের দিন একে-বারে বন্ধ রাখিতে হইবে।

বিলে আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, দোকানের কর্ম্মচারিগণ সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি এই চারিদিন প্রত্যহ ৮ ঘণ্টার বেশী কাজ করিবে না এবং প্রতি সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশী খাটিবে না। তাহারা বিশ্রাম ব্যতীত একটানা ৫ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে পারিবে না। আহারের জন্য তাহাদিগকে এক ঘণ্টার কম ছুটী দেওয়া হইবে না। কর্ম্মচারীরা দোকানঘরে শয়ন করিতে পারিবে না। ১৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক কর্ম্মচারীর বেতন ২০ টাকা; ১৮ হইতে ২১ বৎসর বয়স্ক কর্ম্মচারীর নিম্নতম বেতন ২৫ টাকা এবং তদূর্দ্ধ বয়সের কর্ম্মচারীর নিম্নতম বেতন ৩০ টাকা হইবে।

অসুস্থতার জন্য কর্ম্মচারীরা বৎসরে একমাস অর্দ্ধ বেতনে ছুটী পাইবে এবং পুরা বেতনে ১৫ দিন প্রিভিলেজ ছুটী পাইবে।

এতদ্ব্যতীত কোন দৈব দুর্ঘটনার দরুণ কর্ম্মচারীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও বিলের প্রস্তাবে রহিয়াছে।

আমাদের মন্তব্য

দোকানের কর্ম্মচারীদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা আমরা জানি এবং তাহা দূরীভূত হউক ইহাও আমরা বিশেষভাবে চাই। কিন্তু যাঁহারা লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহাদিগকে সকলদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়; একদিকদর্শী হইলে চলে না। সমাজের এক শ্রেণীর লোকের ভাল করিতে যাইয়া অন্যলোক-দের অসুবিধার সৃষ্টি করা যথার্থই পরহিতৈষণা নহে। সকলকে লইয়াই সমাজ;—সেইজন্য কোন বিশেষ শ্রেণীর লোক ষোল-আনা সুবিধা ভোগ করিবেন, আর তাঁহাদের সুখ সুবিধা দিতে যাইয়া অন্য সকলে নানারূপ অসুবিধায় পড়িবেন তাহা হইতে পারে না।

দোকানের কর্ম্মচারীদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ হুমায়ুন কবীর যে বিলের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমরা এই ভুলটী দেখিতে পাই। দোকান খোলা ও বন্ধ রাখিবার যে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা যদি আইন অনুসারে ধরা বাঁধা হইয়া যায়, তবে আর দোকানদারী করিয়া ব্যবসা করা অথবা দু'পয়সা লাভের উপায় করা কাহারও উপায় থাকিবে না। সুবিধামত দেখিয়া শুনিয়া বাজার করাও লোকের পক্ষে অসাধ্য হইবে। সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি এই চারিদিন বেলা ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত দোকান খোলা রাখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ পুরুষেরাই হাটে, বাজারে এবং দোকানে যাইয়া জিনিষপত্র খরিদ করেন। সুতরাং সকালে এবং সন্ধ্যার পরেই তাঁহাদের দোকানে যাইবার সুবিধা। বেলা ১০টা হইতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত স্কুল, কলেজ, আফিস আদালত প্রভৃতি কার্য্যস্থলে সকলেই থাকেন। একমাত্র গভর্ণমেণ্ট আপিশ ছাড়া আর কোন আফিসই সাধারণতঃ ছয়টার পূর্ব্বে বন্ধ হয় না এবং আফিসের কর্ত্তা হইতে সুরু করিয়া কেরাণী পর্য্যন্ত কেহই ৬টার পূর্ব্বে ছুটী পায় না; সুতরাং কেরাণীগণ বাড়ী ফিরিবার পথে দেখিবেন যে দোকান পাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সকাল বেলা আফিসে যাইবার সময় দেখিবেন, সবেমাত্র দোকান খোলা হইতেছে। সুতরাং সপ্তাহের প্রথম চারিদিন আফিসের কর্ম্মচারী ইস্কুলের মাষ্টার প্রভৃতি চাকুরী-জীবি লোকদের ভাগ্যে দোকান খোলা দেখা ঘটিবেনা।

শুক্রবারে দোকান খোলার সময় প্রস্তাবিত হইযাছে অপরাহ্ন বেলা দুইটা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত, মাত্র চারি ঘণ্টা। আমরা জানি শুক্রবারে মুসলমানদের জন্য সর্ব্বত্র দ্বিপ্রহর বেলাতেই একঘণ্টা ছুটীর ব্যবস্থা আছে। দোকানের কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম

করিলে ক্ষতি ছিলনা। অনেক বড় বড় দোকানের সমস্ত দরজার তালাচাবি খুলিয়া তোড় জোড় করিয়া বসিতে আধঘণ্টা কাটিয়া যায়,—আবার বন্ধ করিবার সময়ও ক্যাস্ মিলাইয়া গোছ-গাছ ও সব শেষ করিতে আধ ঘণ্টার কমে হয় না। সুতরাং শুক্রবারে তিন ঘণ্টার জন্য দোকান খোলা না খোলা সমান কথা হইয়া দাঁড়ায়।

শনিবারে সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত দোকান খোলার সময় প্রস্তাবিত হইলেও কার্য্যতঃ বেচা-কেনা হইবে ৯।১০ ঘণ্টার বেশী নহে। সুতরাং খরিদদার জনসাধারণ বিশেষ কোন সুবিধা পাইবে না। বাংলার প্রধান তিনটী ধর্ম্মোৎসবের পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ দিন পর্য্যন্ত সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত দোকান খোলা রাখার প্রস্তাবেও আমরা কোন সুবিধা দেখিতে পাইনা। ইদলফেতর এবং খ্রীষ্টমাস সম্বন্ধে যাহাই হউক, হিন্দুদের দুর্গাপূজার পূর্ব্ববর্ত্তী দশদিন কিরূপে গণনা করা হইবে, সে বিষয়ে আমাদের খট্‌কা লাগিয়াছে। কারণ দুর্গাপূজা একদিনের উৎসব নহে,—সপ্তমী, অষ্টমী নবমী, এই তিনদিন ব্যাপী উৎসব লইয়াই দুর্গাপূজা। সুতরাং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ দিন কিরূপে নির্ণয় করা যাইবে, আমরা বুঝিতে পারি না। কেবল মাত্র দুর্গাপূজা উপলক্ষে নহে, হিন্দুদের অন্যান্য পূজাপার্ব্বনাদিতেও কাপড় চোপড় এবং নানাবিধ জিনিস পত্র কিনিতে হয়। কারণ বস্ত্রালঙ্কার হিন্দুদের পূজার একটী প্রধান উপচার। এতদ্ব্যতীত জামাইষষ্ঠী ও শ্রাদ্ধ কার্য্যেও বস্ত্রাদি বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন। হিন্দুব্যতীত আর কাহারও এত অধিক সংখ্যক পূজা পার্ব্বণ নাই এবং তাহাতে এত রকমারি জিনিস পত্রেরও দরকার নাই। সুতরাং যদি অধিকক্ষণ দোকান খোলা রাখিয়া তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সুযোগ দিতে হয়, তবে কেবল মাত্র দুর্গাপূজার হিসাব ধরিলেই চলিবে না।

আমরা খরিদদারদের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই সমালোচনা করিলাম। কারণ দোকানের বিক্রয় যদি কমিয়া যায়, এবং কারবার পড়িয়া যাইতে থাকে, তবে তাহাতে কর্ম্মচারী-দেরই স্বার্থ হানি হইবে। তাহাদের প্রথম কার্য্যারম্ভেই মাসিক বেতন ২০ টাকা হওয়ার পক্ষপাতী আমরাও আছি। কিন্তু দোকানের মালিকের কারবার যদি ভাল না চলে, যদি তাহার বেচা-কেনা কমিয়া যায়, তবে সে কোথা হইতে কর্ম্মচারীদের বেতন দিবে? সুতরাং আইন কর্ত্তাকে প্রথমতঃ মালিককে বাঁচাইয়া তারপর কর্ম্মচারীদিগকে বাঁচাইতে হইবে।

দোকানের কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, খাটুনী কমানো স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, উপযুক্ত ছুটীর নিয়ম, এইসব আমরা খুব সমর্থন করি। কিন্তু তার জন্য অকারণে দোকানের বিক্রী কমাইতে হইবে, খরিদ্দারদের অসুবিধায় ফেলিতে হইবে এমন কথা বলিনা। সেইজন্য আমাদের প্রস্তাব এই,—মালিক, কারবারী ও ব্যবসায়ী লোক সুবিধামত দোকান যতক্ষণ ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা খোলা রাখুন। কিন্তু তিনি তাঁহার কোন কর্ম্মচারীকে দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশী খাটাইতে পারিবে না এবং মাসিক ২০ টাকা বেতনের কমে প্রথম কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। তারপর অসুখের সময় পুরা বেতনে ছুটী, বৎসরে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য

প্রিভিলেজ ছুটী, এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য হিতকর ব্যবস্থাও তাঁহাকে করিতে হইবে।

টেলিগ্রাফ আফিস, টেলিফোন একচেঞ্জ, দৈনিক খবরের কাগজ সংক্রান্ত ছাপাখানা, ডেক, মিলস্ ও ফ্যাক্টরী,—প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিষ্ঠান দিনরাত ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে, কিন্তু তাহাদের কর্ম্মচারীদের কাহারও অতিরিক্ত খাটুনী নাই এবং ছুটী প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদি বিবিধ সুযোগ সুবিধাও তাহারা পাইয়া থাকে দোকান সম্বন্ধেও সেরূপ ব্যবস্থা হইবার কোন বাধা আমরা দেখিতে পাই না।

যাহারা ক্রেতা,—তাহারা জনসাধারণ। জীবন যাত্রার বহু প্রকারের জিনিষ ক্রয় করা সম্পর্কে এই জনসাধারণকে কোন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা মুস্কিলও বটে, কিন্তু হিতকরও নহে। কেহ আফিসে রীতিমত বেতন পায় না, কারও অবসর হয় সকাল বেলায়, কেহ সময় পায় বৈকালে, কারো রাত্রি ৯ টার পর ভিন্ন সময় হয় না, তারপর অসুখ-বিসুখ, দূরে অবস্থান প্রভৃতি নানাকারণে ২৪ ঘণ্টা দিনরাতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের সুবিধা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটে। সুতরাং দোকান খোলা রাখিবার সময়টা যত দীর্ঘ হয়, ততই উহা সকলকে সকলদিকে সুবিধা দিতে পারে।

সর্ব্বশেষে আর একটী কথা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। কারখানা ও দোকান, এই দুইটীর মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ। ইহারা পরস্পর নির্ভর-শীল। কারখানায় মাল তৈয়ারী হয়;—আর দোকানে সেই মালের কাটতি। যদি কারখানা চলে ২৪ ঘণ্টা,—আর দোকান খোলা থাকে ৮ ঘণ্টা, তবে অল্প সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত মাল গাদা হইয়া জমিবে, এবং ইহার ফলে ব্যবসা হইবে একেবারে মাটী। শেষে উপকার করিতে যাইয়া হইবে সর্ব্বনাশ। সেই জন্য আমরা বলি, দোকান খোলা রাখিবার স্বাধীনতা নষ্ট না করিয়া কর্ম্মচারীদিগকে উপযুক্ত সুখ সুবিধা দেওয়া হউক। তাহাতে মাল কাটতি হইবার বাধা জন্মিবেনা এবং দোকানের কর্ম্মচারীদের অবস্থারও উন্নতি হইবে।

ডেন্‌মার্কের উন্নতির বিবরণ

(শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্‌, সি,)

ইউরোপের মধ্যে ডেন্‌মার্ক্‌ একটী ক্ষুদ্র দেশ। ইহার আয়তন ১৬ হাজার বর্গমাইল;—ভারতবর্ষের মহীশূর রাজ্যের অর্দ্ধেকের সমান। লোক সংখ্যা ৩৬ লক্ষ ৮০ হাজার। তন্মধ্যে ৮ লক্ষ ৩০ হাজার লোক জী-ল্যাণ্ডে অবস্থিত রাজধানী কোপেন-হেগেন নগরে বাস করে। ডেনমার্কে ৮০টী প্রাদেশিক নগর আছে। তাহাতে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ লোকের বসতি। অবশিষ্ট লোকের বাস পল্লীগ্রামে।

আয়তন ও লোকসংখ্যা হিসাব করিলে ডেনমার্ক্‌ আমাদের বাংলাদেশ অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র তাহা বুঝা যায়। কিন্তু এই ক্ষুদ্রদেশের অধিবাসীরা আধুনিক যুগে সর্ব্ব বিষয়ে সভ্যজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়, আর্থিক সম্পদে, শিল্প বাণিজ্যে, সংগঠন-শক্তিতে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এই ডেনিস্‌ জাতি বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয় অন্য কোন জাতি হইতে কিছুমাত্র হীন নহে। ডেনমার্কের কৃষিকার্য্য, ডেনমার্কের শিল্প প্রতিষ্ঠান, ডেনমার্কের গো-পালন ব্যবস্থা ও দুগ্ধের ব্যবসায়, ডেন্‌মার্কের সমবায় পদ্ধতি,—এই সব দেখিবার জন্য, এবং দেখিয়া শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীর নানাদেশের লোক তীর্থযাত্রীর মত সেখানে প্রতিবৎসর গমন করিয়া থাকে।

ডেনমার্ক স্বাধীন দেশ। ডেনিসেরা স্বাধীন জাতি। আজ নহে,—অতি প্রাচীনকাল হইতে চিরদিন তাহারা স্বাধীন। ইংরাজ জাতির অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে ডেনিসেরা ইংলণ্ড জয় করিয়া তাহার অধীশ্বর হইয়াছিল। যদিও ইতিহাসে তৎকালীন ডেনিসেরা জলদস্যু বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি তাহারা সাহসে, বীরত্বে এবং উদ্যমশীলতায় যে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা হীন ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে কেবলমাত্র দেশ জয় ও রাষ্ট্র বিস্তারেই তাহাদের শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশিত হয় নাই;—শিল্প বাণিজ্যেও তাহারা প্রাচীনকাল হইতে উন্নত ছিল। সমগ্র পৃথিবীর বিশাল বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে তাহারা কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে যখন ইউরোপীয় জাতি-সমূহ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসে, তখন ডেনিসেরাও এদেশে আসিয়াছিল এবং সকলের আগে ভারতে বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন করে। এখন এদেশে তাহাদের অধিকৃত স্থান না থাকিলেও, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ডেনিস্‌দের রাজ্য বিস্তার নিতান্ত কম নহে।

ডেন্‌মার্কের পার্শ্ববর্ত্তী বাল্‌টিক সাগরের অন্তর্গত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ, আইস্‌ল্যাণ্ড এবং গ্রীন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি লইয়া ডেনিস্‌দের বৈদেশিক অধিকারের পরিমাণ তাহাদের স্বদেশের প্রায় ২০ গুণ।

সমগ্র ডেন্‌মার্ক দেশ একটী নিম্ন সম-ভূমি। তথায় পাহাড় পর্ব্বত কিছু নাই। সেখানকার মৃত্তিকাও উর্ব্বরা নহে। সুতরাং কৃষিকার্য্য বিশেষ শ্রমসাধ্য। পশ্চিম উপকূলের অধিকাংশই পতিত জমি ও বালিয়াড়ি। নিকটবর্ত্তী ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের ন্যায় ডেনমার্কে কয়লার খনি নাই অথবা আমেরিকার যুক্তরাজ্য, মেক্সিকো, রুশিয়ার ককাশস্ রাজ্য এবং রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের মত তথায় পেট্রোলিয়ামের খনিও নাই। সুতরাং কলকারখানার এঞ্জিন চালাইবার শক্তি উৎপাদন সেখানে বিশেষ অসুবিধাজনক,—একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। যে সকল দেশে কয়লা ও পেট্রোল নাই, তথায় জলস্রোত অথবা বায়ু প্রবাহের সাহায্যে শক্তি উৎপাদন করা হয়।

নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে জল-শক্তি এবং হল্যাণ্ড-বেলজিয়ামে বায়ু প্রবাহের শক্তির ব্যবহারের দ্বারা কলকারখানা পরিচালন হইয়া থাকে। কিন্তু ডেন্‌মার্কে শক্তি উৎপাদনের জন্য জলস্রোত অথবা বায়ু প্রবাহ ব্যবহার করিবার সুবিধাও নাই। তথায় উত্তাপ উৎপাদনের প্রধান উপকরণ, পীট্ নামক এক প্রকার কয়লা জাতীয় খনিজ। গাছ-গাছড়ার শিকড় ও ডালপালা প্রভৃতি বহুকাল যাবৎ মাটির নীচে চাপে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া পীট্ তৈয়ারী হয়। কয়লার তুলনায় ইহার উত্তাপ উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম। এই পীট্ এবং কাঠ এই দুইটী জিনিসই ডেনমার্কের অধিবাসীরা উত্তাপ উৎপাদনে প্রধানতঃ ব্যবহার করে। কিন্তু কলকারখানার এঞ্জিন চালাইবার শক্তি ইহা হইতে পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সমগ্র ডেন্‌মার্কের জন্য যে পরিমাণ শক্তির আবশ্যক, তাহার শতকরা তিন ভাগ মাত্র পীট্, কাঠ, জল ও বায়ুপ্রবাহ হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

ডেন্‌মার্কে খনিজ দ্রব্য একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। বহুদূর পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে মাটী খুঁড়িয়া দেখা হইয়াছে,—লৌহ অথবা অন্যান্য ধাতুর আকরিক কিছুই পাওয়া যায় না। পটাস্ কিম্বা অন্য কোন প্রকার প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যও নাই। তুলা, তৈলবীজ, রবার, তামাক প্রভৃতি ফসলও ডেন্‌মার্কে জন্মে না। কৃত্রিম উপায়ে জমি প্রস্তুত করিয়া ইহাদের চাষ করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ বর্ত্তমান শিল্প ব্যবসায়ের যুগে জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে হইলে এই সকল কৃষিজাত দ্রব্যের একান্ত প্রয়োজন।

প্রকৃতির সর্ব্ববিধ সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইয়াও ডেনিসগণ একমাত্র স্বকীয় বুদ্ধি ও শ্রমশক্তিতে বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীতে একটী শ্রেষ্ঠ ও সম্পদশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তাহারা স্বাভাবিক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দেশের কাঁচামাল হইতে নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে এবং যে সকল দেশে প্রাকৃতিক শক্তি অধিকতর অনুকূল সেই সকল দেশ হইতে আমদানী অর্দ্ধ-প্রস্তুত নানাবিধ শিল্পদ্রব্য পুরোপুরি ফিনিস্ করিয়া পুনশ্চ বিদেশে চালান দিতেছে। এই সকল কার্য্যে তাহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। কলকারখানা স্থাপন করাই বৈজ্ঞানিক প্রণালী নহে;—অনেক কলকারখানাতেও অ-বৈজ্ঞানিক প্রণালী দেখা যায়;—আবার হাতের কাজেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অভাব থাকে না। বাস্তবিক কলকারখানা না থাকিলেও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি ও শিল্পের যে প্রভূত উন্নতি সাধন করা যায়, ডেন্‌মার্ক তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

ডেন্‌মার্কে প্রাকৃতিক শক্তির আনুকূল্য না থাকিলেও ইহার ভৌগলিক অবস্থান বিশেষ সুবিধাজনক এবং ডেনমার্কের অধিবাসীরা সেই সুবিধা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ইহা ডেন্‌মার্কের উন্নতির আর একটি প্রধান কারণ। ভারতবাসীদের উহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। যে সকল দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সুবিধাজনক, সেই সকল দেশের লোকেরা যদি ঐ সুবিধার সদ্ব্যবহার না করে, তবে তাহাদের অধঃপতন অনিবার্য্য। ভারতবর্ষ তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। ভারতের উত্তর সীমায় হিমালয় পর্ব্বত, এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর প্রভৃতি লইয়া ভাবাবেগে

অনেক কাব্য কবিতা ও মনোরম বাক্যাবলি রচিত হইয়াছে; কিন্তু সেই পর্ব্বত ও সাগর মিলিয়া ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানে যে বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিয়াছে, ভারতবাসীরা তাহার সুযোগ গ্রহণ করে নাই। ভারতের অধঃপতন এবং সম্পদ-হীনতার ইহা একটা প্রধান কারণ। ডেন্‌মার্কে সেই কারণ ঘটে নাই বলিয়াই, ঐ ক্ষুদ্রায়তন দেশ প্রাকৃতিক বাধা সত্ত্বেও উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ইউরোপের মানচিত্রে সকলেই দেখিতে পাইবেন, স্ক্যাণ্ডিনেবিয়া (নরওয়ে-সুইডেন) উপদ্বীপের দক্ষিণে বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগরের মধ্যে ক্ষুদ্র জাঠ্‌ল্যাণ্ড নামক উপদ্বীপটী উত্তর দিকে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। নরওয়ে ও সুইডেনের সংযোগস্থলে যে খাঁজের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই খাঁজের মধ্যে যেন জাঠ্‌ল্যাণ্ড উপদ্বীপটী ঠিক ফিট্ করা; তবে দুই দিকে একটু ফাঁক আছে। নরওয়ের দিকে ফাঁকটির নাম স্কাগারাক্ প্রণালী এবং সুইডেনের দিকে ফাঁকটির নাম কাটেগাট্ প্রণালী। এই জাঠ্-ল্যাণ্ড উপদ্বীপ এবং বাল্টিক সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তস্থিত জী-ল্যাণ্ড, লা-ল্যাণ্ড, ফিউনেন, বরণহলম, রিউগেন প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া ডেন্‌মার্ক দেশটী গঠিত। আটলান্টিক মহাসাগরের সমগ্র আইস্‌ল্যাণ্ড ও ফারো দ্বীপ এবং সুমেরু মহাসাগরের গ্রীনল্যাণ্ড্ দ্বীপের অধিকাংশ ডেন্‌মার্কের অধিকারভুক্ত।

ক্রমশঃ

ফল চাষের ক্রমোন্নতির ইতিহাস

অতি প্রাচীন কাল থেকেই এদেশের লোক শুনে আসছে যে, বঙ্গদেশ সুফলা সুজলা শুধু বঙ্গদেশ কেন, সারা ভারতবর্ষই হচ্ছে সুফলা। সারা পৃথিবীর ফলরাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষেরও একটা স্থান আছে—সেটাও তার বৈশিষ্টের অনুরূপ। ফরাশীদেশের দ্রাক্ষাশোভা, ইরানের আপেল-ন্যাস্‌পাতি ডালিম বেষ্টনী বা আরব-দেশের মরুভুমির খেজুরকুঞ্জ এদেশে মেলে না বটে, কিন্তু এদেশেরও আম জাম কাঁঠাল, কলা, নারিকেল জামরুল আনারসের সৌন্দর্য্য অপর দেশে দৃষ্ট হয় না। তাই বল্‌ছিলাম, ফলসম্পদে ভারতবর্ষের এক বিশিষ্ট স্থান আছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই ফল-সম্পদের উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা এপর্য্যন্ত হয় নি। অথচ পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্টেরই ফল সম্পদ রক্ষা করা একটা বিশেষ কর্ত্তব্য। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে, ফলসম্পদ পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশেই একটি অর্থকরী সম্পদ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। ফলচাষে একটা সুবিধা এই যে, গাছগুলিকে একবার ফলপ্রসূ করার কাল পর্য্যন্ত সার দিয়া, গাছের গোড়ার মাটী উপ্‌ড়াইয়া আল্‌গা করিয়া দিয়া, সময়মত বিশেষতঃ দারুণ গ্রীষ্মে জল দিবার ব্যবস্থা করিয়া, গরুবাছুরের মুখ হইতে বেড়া দিয়া রক্ষা করিয়া একবার সাবালক করিয়া তুলিতে পারিলে আর বিশেষ কোনও খরচ বা হাঙ্গামা নাই এবং চাষীর নিতান্ত দুঃসময়েও ফল অর্থ প্রদান করে।

নিজের পেটের সন্তানও বিগ্‌ড়াইয়া যায় এবং পিতা মাতার বার্দ্ধক্যে হয়ত একটা কপর্দ্দক দিয়াও সাহায্য করে না, কিন্তু সুপুষ্ট ফলবান বৃক্ষগুলি যাবজ্জীবন তাদের গৃহস্বামীকে ফলদান করে সাহায্য করে। সেইজন্যই অপরাপর দেশে ফলের ব্যবসা একটা প্রধান ব্যবসা বলে পরিগণিত হয়, আর এই ব্যবসার মনোপলি বা একাধিপত্য রক্ষা করবার জন্য বিভিন্ন দেশ ভয়ানক সচেষ্ট থাকে। ইতালীর লেবু ও মদ দ্রাক্ষা-প্রস্তুতোপযোগী চাষ-ব্যাপারে ইটালীর প্রায় একাধিপত্য বর্ত্তমান আছে। প্রতি বৎসর সে দেশ থেকে ৩ লক্ষ ১ হাজার টন, ইতালীয় লেবু রপ্তানী হয়। মদের জন্য ফরাসী দেশের দ্রাক্ষা বিশেষ বিখ্যাত। প্রতিবছর সেদেশে ১২৩২০ লক্ষ গ্যালন থেকে ১২৫৪০ লক্ষ গ্যালন মদ উৎপন্ন হয় এবং তার থেকে দেড় কোটি গ্যালন মদ বিদেশে চালান যায়। এই হিসাব থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সেখানে কি বিরাট পরিমাণে দ্রাক্ষা উৎপন্ন হয়ে থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ফলচাষের কাজে খুব পুরাতন না হলেও বিশ্বের বাজারে বেশ স্থান করে নিয়েছে। প্রতি বছর সে দেশ থেকে ২৩৮০ লক্ষ পাউণ্ড পাত্রেভরা ফল, ১৩৯ লক্ষ বাক্স টাট্‌কা ফল ও ৩৬৫৯ পাউণ্ড শুষ্ক ফল রপ্তানী হয়ে থাকে। ফলের বাজারে স্পেন দেশেরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে; সেখান থেকে প্রতি বছর ৯,৩১,০০০ টন কমলালেবু ও দ্রাক্ষা রপ্তানী হয়ে থাকে; তন্মধ্যে যুক্তরাজ্যেই ৩ লক্ষ টন কমলা চালান যায়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যস্থিত ক্যানাডা, সাউথ্ আফ্রিকা, নিউজিলাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশেও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফলের চাষ হয়ে থাকে; সে সমস্ত যায়গা থেকে গ্রেট্ বৃটেনে ফল চালান যায়। প্রতি বছর গ্রেট বৃটেনে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ফল আমদানী হয়ে থাকে। তন্মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ জোগায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরের দেশ। রুশদেশ, পারস্য, আফ্‌গানিস্তান, ইরাক, জাপান

প্রভৃতি রাজ্যও ফল চাষের জন্য অধিকতর যত্ন নিচ্ছে।

পৃথিবীতে পারিপার্শ্বিক দেশসমূহে ফলচাষের জন্য এতটা আগ্রহ পরিলক্ষিত হ'লেও পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমাদের দেশে ফলচাষের উন্নতির জন্য কোন বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো হয় না। আমরা সকলেই জানি যে আমাদের দেশ ফল সম্পদে মোটেই দরিদ্র নয়, কিন্তু সেই ফল সম্পদকে অর্থকরী করবার দিকে আমরা তেমন মনোযোগ দিই নি। ভারতবর্ষে প্রায় ৫০ লক্ষ একর জমিতে ফলের চাষ হয়, কিন্তু তবুও আমরা (১৯৩৩-৩৪ সালের হিসাব মতে) ১৫ লক্ষ টাকার টাট্‌কা ফল, ১৯ লক্ষ টাকার বাদাম ইত্যাদি ফল, ৩৬ লক্ষ টাকার খেঁজুর ও ১০ লক্ষ টাকার টিন বা বোতলে প্যাক্ করা ফল আমদানী করি। এছাড়াও ১৪ লক্ষ টাকার শুক্‌নো ফল আছে।

এই গেল আমাদের আমদানী বাণিজ্যের হিসাব; রপ্তানী বাণিজ্য যে আমাদের নেই তা' নয়, কিন্তু তা-অতীব সামান্য। আমরা মাত্র ৪ লক্ষ টাকার টাট্‌কা ফল বাইরে চালান দিই। শুক্‌নো ফলও যৎসামান্য মাত্র রপ্তানী হয়। রপ্তানীর কথা ছেড়ে দিলেও উপরোক্ত হিসাব থেকে বোঝা যায় যে, ভারতে যে পরিমাণ ফল আবশ্যক হয় তা' যোগান দেওয়া ভারতের সাধ্যাতীত। কিন্তু এটা আশা করা কিছুমাত্র অন্যায় নয় যে, যে পরিমাণ ফল ভারতের আবশ্যক হয় তার কিয়দংশ ভারত যোগান দিতে সক্ষম হবে। ভারতে উত্তরোত্তর ফলের চাহিদা বাড়ছে কিন্তু তদনুপাতে তার ফল চাষের পরিমাণ বাড়ছে না। অথচ এটা বাড়া উচিত ছিল।

পৃথিবীর ফল চাষের প্রক্রিয়ার উন্নতির ইতিহাস যদি অনুধাবন করা যায় তা' হলে দেখা যাবে যে প্রতিক্ষেত্রেই ফল চাষের জন্য রীতিমত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। ফরাসীদেশে উন্নত ধরণের দ্রাক্ষা উৎপাদন করবার জন্য কৃষকেরা দিনের পর দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছে। কি করে জমিতে বেশী ফল পাওয়া যায়, কম খরচায় কি করেই বা ফলের কোয়ালিটির উন্নতি ঘটে তার জন্য রীতিমত গবেষণা চলেছিল। তা' ছাড়া, ফলের বাজার যাতে ঠিক থাকে, দর যাতে ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত হয় তার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকতো এবং ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করতো।

ইতালীদেশে ইতালীয় গভর্ণমেণ্টও ফল সম্পদ রক্ষা কল্পে যথেষ্ট যত্ন নিয়েছিল। লেবুর চাষে "মাল-দেল-সেকো" (Mal-del-Secco) নামে একপ্রকার রোগ দেখা দেয় যা' লেবু চাষের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে; গভর্ণমেণ্ট থেকে সেই রোগ দূরীকরণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছিল। তাছাড়া গরীব চাষীরা চাষের ব্যাপারে যাতে না ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট থেকে তাদের জমির খাজনা কমানো এবং অপরাপর আবশ্যকীয় সুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা হয়েছিল। দেশের রপ্তানী যাতে বৃদ্ধি পায় ও আমদানী যাতে কমে তজ্জন্যও আইন প্রণীত হয়েছিল। জার্ম্মানদেশ শিল্প প্রধান হলেও ফল চাষের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। গাছপালার জীবনরহস্য, তাদের গুঁড়ির ও শিকড়ের পুষ্টিসাধন, উন্নতধরণের ফল প্রসব প্রণালী ইত্যাদির গবেষণা সম্পর্কে জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকরা অত্যন্ত যত্ন নিয়েছিল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও ফল চাষের উন্নতির জন্য যথেষ্ট গবেষণা চালিত হয়েছে। জমিতে জলসেচন, সার প্রদান, গাছ ছাঁটাই ইত্যাদি প্রথার প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটেছে। জোড়-কলম বাঁধা, ক্রশ্ পলিনেশান্ (cross pollination) ইত্যাদি ব্যাপারেরও উন্নতি হয়েছে। তাছাড়া ফল কি প্রকারে রক্ষা করতে হয়, কি রকম ভাবেই বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্যাক্ করতে হয় তারও বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। রাষ্ট্রও আইন প্রণয়ণ দ্বারা ফলরপ্তানীর ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে এবং চাষের ক্ষেত্রে কলের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করণে উৎসাহ প্রদান দ্বারা উৎপাদন খরচা বহুল পরিমাণে হ্রাস করেছে। সরকারী 'ফ্রুট্ ব্যুরো সেক্সন' ও কৃষি বিভাগ দৈনন্দিন নানাবিধ তথ্য সরবরাহের দ্বারা ফল চাষীদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তদুপরি নতুন রকমের ফল চাষকারী ব্যক্তিদিগকে 'পেটেণ্ট' প্রদান পূর্ব্বক চাষীদের অতিমাত্রায় উৎসাহ দিয়েছে।

গ্রীস্‌দেশও ফল চাষের উন্নতি ঘটিয়েছে; সেখান থেকে প্রতিবছর ৮৫,৫০০ টন শুক্‌নো কিস্‌মিস্ ও মনক্কা বিদেশে চালান যায়। জাপানও ফল চাষের ক্ষেত্রে আর পেছিয়ে নেই। পূর্ব্বে সেখানে এসম্পর্কে বিশেষ কোন প্রচেষ্টা সাধিত হ'ত না, কিন্তু অপরাপর দেশের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে জাপানী গভর্ণমেণ্টও সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। এদেশে জাপানী ফলের আমদানী কিছুদিনের মধ্যে কি রকম বেড়েছে তা' শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। ১৯৩০-৩১ সালে জাপানী আপেল আমদানী হয়েছিল মাত্র ৭০৪ টাকার; ১৯৩২-৩৩ সালে তা' ১,০৮,৪৭৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

এইবার বিলাতের ব্যাপার কিছু বলা যাক্। ইংলণ্ডের লোক বেশী মাত্রায় ফল ব্যবহার করে, সুতরাং সে-দেশে অতিমাত্রায় ফল আমদানী হয়ে থাকে। এই আমদানীর পরিমাণ কমানোর জন্য সে দেশের গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সচেষ্ট হয়েছিল, তজ্জন্যই নানাবিধ প্রচেষ্টার দ্বারা সেখানে ফল চাষের উন্নতি ঘটানো হয়। ১৯২৬ সালে ইম্পিরিয়াল্ ইকনমিক্ কমিটি বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ফল চাষের উন্নতি সম্পর্কে সচেষ্ট হ'ন্। সুখাদ্য সম্পর্কীয় আইন ও জাতীয় মার্কা স্থাপন সম্পর্কীয় স্কীম সে দেশের ফল চাষের উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ডের প্রচেষ্টা ফলের বাজার সম্প্রসারণ সম্পর্কে সুব্যবস্থা করেছে। অটোয়া চুক্তির দরুণ সেদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যস্থিত ফল ছাড়া বিদেশী ফলের প্রবেশ লাভ কষ্টকর, কেননা, বৃটিশ সাম্রাজ্যস্থিত ফল সেখানে বিনা শুল্কে ঢোকবার অধিকার পায়—বিদেশী ফলের বেলায় সেটা হয় না। বৃটিশ সাম্রাজ্যস্থিত ইম্পিরিয়াল্ বুরো অব্ হর্টিকালচার ফল চাষের উন্নতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণায়রত ব্যক্তিগণের বর্ত্তমান তালিকা থেকে জানা যায় যে, ফল চাষের প্রত্যেক ব্যাপারেই একজন না একজন গবেষণায় রত আছে। অথচ সেখানে ফল চাষের উন্নতি ও বাজার সংগঠন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সাধিত হয়েছে।

[ক্রমশঃ]

গত ২২শে ডিসেম্বর ১০২।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় কুমিল্লার অভয়া ব্যাঙ্কের একটী ব্রাঞ্চ্ আফিস্ খোলা হইয়াছে।

—※—

মিঃ জে, জে, গান্ধি, টাটা আয়রন য্যাণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানীর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। গত ১লা জানুয়ারি হইতে তিনি উক্ত কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইনিই টাটা কোম্পানীর সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় জেনারেল ম্যানেজার হইলেন।

—※—

গত ১৯৩৭ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে খরচ বাদে নগদ মোট ৯৪০১২০০০ টাকা ছিল। তন্মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ৭২০৭৫০০০ টাকা, ট্রেজারী বা খাজাঞ্চিখানায় ১২১৭৪০০০ টাকা এবং ইংলণ্ডে ষ্টারলিং মুদ্রা বাবদে (১৮ পেন্স্—এক টাকা হিসাবে) ৯৭৬৩০০০ টাকা ছিল।

—※—

জার্ম্মাণীতে লৌহ ও ইস্পাতের পরিমাণ কমিয়া যাওয়াতে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট প্রায় ৮০টী জিনিসের একটী তালিকা বাহির করিয়া আদেশ দিয়াছেন যে, ঐসকল জিনিস লৌহ অথবা ইস্পাতের দ্বারা কেহ তৈয়ারী করিতে পারিবেনা। ইহার পূর্ব্বে গত নভেম্বর (১৯৩৭) মাসে আর এক তালিকা বাহির হইয়াছিল। সুতরাং মোট প্রায় ১২০ অথবা ১৩০ রকমের জিনিস জার্ম্মাণীতে লৌহ ও ইস্পাতের দ্বারা তৈয়ারী করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। লৌহের মত দৃঢ় এবং নানাপ্রকারে উহার সমগুণ বিশিষ্ট কৃত্রিম ধাতু জার্ম্মাণীর বৈজ্ঞানিক শিল্পিগণ তৈয়ারী করিয়াছেন। ঐ তালিকাভুক্ত নিষিদ্ধ জিনিস তৈয়ারী করিতে সেই কৃত্রিম ধাতু ব্যবহৃত হইতেছে।

—※—

গত ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলা-দেশে ১৬টী নূতন জয়েণ্ট্ষ্টক্ কোম্পানী রেজেষ্টারী হইয়াছে। ইহাদের মোট মূলধনের পরিমাণ ৩৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। নিম্নে ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইলঃ—

কোম্পানীর কারবারের বিবরণ ও সংখ্যা	মূলধনের পরিমাণ টাকা
একটী মোটর ট্র্যাক্সন, ড্রিলিং য্যাণ্ড্ ম্যানুফ্যাক্চারিং	১ লক্ষ
দুইটী প্রিণ্টিং পাব্লিশিং য্যাণ্ড্ ষ্টেশনারী	৮০ হাজার
একটী কেমিক্যাল ও তৎসংশ্লিষ্ট কারবার	৪০ হাজার

কোম্পানীর কারবারের বিবরণ ও সংখ্যা	মূলধনের পরিমাণ টাকা
একটী পাব্‌লিক সার্ভিস্ কোম্পানী—অর্থাৎ জল, গ্যাস্, ইলেক্‌ট্রিক এবং টেলিফোন সম্বন্ধীয়	দেড় লক্ষ
একটী বরফ ও সোডা-লেমনেড্ প্রভৃতি সংক্রান্ত	১২ লক্ষ
দুইটী এজেন্সী	দেড় লক্ষ
ছয়টী ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাক্‌চারিং	৬॥০ লক্ষ
একটী এষ্টেট্, জমিজমা ও ঘর বাড়ী সংক্রান্ত	১৫ লক্ষ
একটী হোটেল, থিয়েটার ও আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কিত	২০ হাজার

গত ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দশ দিনে ভারত গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ের আয় হইয়াছে ২৬৭ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে ঠিক এই সময়ে ইহা অপেক্ষা ১৩ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ের আয় হয় ৬৫৯ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা। ১৯৩৬ সালের ঐ সময়ের (১লা এপ্রিল হইতে ১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) আয় অপেক্ষা ৩৫২ লক্ষ টাকা অধিক।

বোম্বাই মিল ওনার্স্ য়্যাসোসিয়েসান কর্তৃক সম্প্রতি যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় ১৯৩৭ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কটন মিলের সংখ্যা ৩৭০। যে সকল কটন মিলে তাঁতের সংখ্যা ৫০ এর কম, সে সকল কটন মিলের নাম ইহার মধ্যে গণনা করা হয় নাই। গত বৎসরে (১৯৩৬) বাংলাদেশে ২৪টী কটন মিল ছিল। এবারে (১৯৩৭) চিত্তরঞ্জন কটন মিল ও শ্রীদুর্গা কটন মিল কার্য্য আরম্ভ করাতে বাংলাদেশে কটন মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৬ হইয়াছে। তৎসহ টাকুর সংখ্যা ১৮৬০০ এবং তাঁতের সংখ্যা ৭০০ বাড়িয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কটনমিল সমূহে মোট টাকুর সংখ্যা ৯৭৩১০০০ এবং তাঁতের সংখ্যা ১৯৭৮১০ হইয়াছে। এবারও দেখা যায়, কটন মিলের কারবারে ভারতবর্ষের ৩৯৮২ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিতেছে।

—⁂—

১৯৩৭ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতবর্ষের সমস্ত কটনমিলে মোট ১৫৪১৫৪০০ মণ (৭৮৪ পাউণ্ড ওজনের ১৫৭৩০০০ খাঁদি) তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কেবল মাত্র দিনের পালায় ৪১৭০০০ লোক কাজ করিয়াছে। রাত্রির পালায় কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ঠিক পাওয়া যায় নাই।

১৯৩৬—৩৭ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, ভারত গভর্ণমেণ্ট্ রেলওয়ে বিভাগের জন্য ৩ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা মূল্যের ভারতীয় জিনিস ক্রয় করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহার পরিমাণ ৭১ লক্ষ টাকা অধিক। সামরিক বিভাগ, বিমানপোত বিভাগ এবং দেশ রক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য বিভাগে এক কোটী ১৯ লক্ষ টাকার দেশী জিনিস কেনা হইয়াছে। ইহার পরিমাণও পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ১৬ লক্ষ টাকা বেশী।

—০—

১৯৩৫—৩৬ সালের গভর্ণমেণ্ট্ রিপোর্ট হইতে জানা যায়,সমগ্র বোম্বাই প্রদেশে ১০৪০১৫৭ গ্যালন দেশীয় মদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে। একমাত্র বোম্বাই সহরে ব্যবহৃত মদ্যের পরিমাণ ২৮৬২৪৯ গ্যালন। এই হিসাবে বোম্বাই সহরে জনপ্রতি ২ পাইন্ট্ মদ্য ব্যবহৃত হয়। বোম্বাই প্রদেশে দেশীয় মদ্য হইতে আবগারী বিভাগের আয় হইয়াছে ১৫৮০৮৪০১ টাকা। দেখা যায়, পল্লীগ্রামের লোক অপেক্ষা সহরবাসীরাই মদ্যপান করে অধিক। এবিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থা অনেক ভাল। ১৯৩৫—৩৬ সালে বাংলাদেশে সকল রকমে আবগারী ট্যাক্স আদায় হইয়া ছিল এক কোটী ১৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এক মাত্র দেশীয় মদ্য হইতেই ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা আয় হইয়াছিল।

ভারতে সুপারীর আমদানী রপ্তানীর বিবরণ

বাংলাদেশে পান খান্ না এমন লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। বস্তুতঃ, এদেশে তাম্বুল-রাগচর্চ্চিত হওয়াটা অতি প্রাচীনকাল থেকেই একটা আভিজাত্যের লক্ষণ বলে পরিগণিত হত। মুসলমানী আমলে পানের সঙ্গে জর্দ্দা, শূর্ত্তি ইত্যাদি খাওয়াটা হামেশাই চলত। বর্ত্তমানে অত্যন্ত গরীব যে, সেও দুবেলা দুটো পান খেয়ে থাকে।

পানের সর্ব্বপ্রধান উপাদান হল সুপারী। ভারতবর্ষে সুপারী অত্যধিক সংখ্যক্ লোক ব্যবহার করে। এমন অনেকে আছেন যাঁরা পান খান্না, কিন্তু নিয়মিত সুপারী খেয়ে থাকেন; সে-হিসাবে দেখতে গেলে পানের চেয়ে সুপারীর ব্যবহার ভারতবর্ষে অনেক বেশী। আমাদের সামাজিক নানা রকম অর্চ্চনাদিতেও পান সুপারী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই গেল সুপারীর ব্যবহারের হিসাব। সুপারীর ব্যবসার হিসাব নিতে গেলে বহু আশ্চর্য্য জিনিষ বহিষ্কৃত হয়ে পড়বে যার খবর সাধারণ লোকে মোটেই রাখেনা। আমরা বাংলা দেশের অধিবাসী, এদেশে বহু সুপারীগাছ আশেপাশে পরিদৃষ্ট হয়, তাদেখে আমাদের ভাবা স্বাভাবিক যে, এদেশে বুঝি সুপারীর অভাব নেই। কিন্তু সাধারণ লোকে শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যে, এদেশে সুপারীর রীতিমত অভাব আছে। আমরা যে সুপারী ব্যবহার করি তার অধিকাংশ বিদেশ থেকে আমদানী হয়—ষ্ট্রেট্ সেটল্মেণ্ট, সিংহল, জাভা, হংকং প্রভৃতি দেশ এদেশে বহুল পরিমাণে সুপারী পাঠায়।

আমাদের দেশ থেকে সুপারী বিদেশে যে চালান যায় না তা' নয়, তবে তার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাজ্য, কেনিয়া, এডেন, ফিজিদ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি এদেশের সুপারী গ্রহণ করে থাকে। প্রধানতঃ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দর হ'তেই দেশীয় সুপারী চালান যায়— উক্ত রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে বাংলাদেশের বিশেষ কোন স্থান নেই।

নিম্নে আমরা এদেশের সুপারীর ধারাবাহিক আমদানী রপ্তানীর একটি তালিকা প্রদান করিলাম :—

আমদানীর হিসাব

বৎসর	পরিমাণ	মূল্য
১৯১৩-১৪	১২৭,৪৬৪,২৪১ পাঃ	৮১৯,০৬৮ পাঃ
১৯১৮-১৯	১৪২,৫২৭,৬৮৩ ,,	১,১৪১,২৬৯ ,,

১৯৩১-৩২	১২৩,৩১৪,২৪০	,,	১,০৮৫,৬২৮	,,
১৯৩২-৩৩	১২৫,১৪৩,০৮৮	,,	৮৯১,৯৮৩	,,
১৯৩৩-৩৪	১৩৩,৭৭৩,৬৯৬	,,	৭৮৪,৪০৮	,,
১৯৩৪-৩৫	১৩৭,৪৮০,৫৬০	,,	৭৬৭,২০১	,,
১৯৩৫-৩৬	১৪৭,৭৭৭,৫০৪	,,	৭১৯,০১৪	,,

রপ্তানীর হিসাব

সাল	পরিমাণ		মূল্য	
১৯১৩-১৪	৪৩৯,৮৮৬	পাউণ্ড	৮,২২৪	পাউণ্ড
১৯১৮-১৯	৩৬২,৪১৯	,,	৮,১১৯	,,
১৯৩১-৩২	২৯৫,১২০	,,	৭,৭১৭	,,
১৯৩২-৩৩	৩৬৭,২৪৮	,,	১১,০০৩	,,
১৯৩৩-৩৪	৩৮২,১৪৪	,,	১০,২৬৪	,,
১৯৩৪-৩৫	৩৯৪,১২৮	,,	১০,৩৫২	,,
১৯৩৫-৩৬	৪২৬,১৬০	,,	৯,৫৫৪	,,

উপরোক্ত তালিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, ১৯৩১-৩২ সালে আমদানীর পরিমাণ না বাড়লেও মূল্য বেড়েছে, কিন্তু তারপর থেকে ক্রমিকভাবে আমদানীর পরিমাণ বাড়লেও মূল্য ক্রমিকভাবে কমেছে। এর থেকে ধারণা করতে পারা যায় যে, স্থপারীর দর কমে গেছে। ঠিক সেই পরিমাণে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়লেও মূল্য কমেছে।

ভারতবর্ষে ঠিক কতখানি জমিতে স্থপারীর চাষ আছে তার কোন সঠিক হিসাব নেই; তবে এটা খুবই সত্য যে ভারতবর্ষে স্থপারীর চাষের যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ৭ লক্ষ ২৯ হাজার পাউণ্ডের ওপর মূল্যের স্থপারী আমদানী হয়েছে, সেই অনুপাতে রপ্তানী হয়েছে মাত্র সাড়ে ন'হাজার পাউণ্ড মূল্যের স্থপারী। স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রপ্তানীর জন্য নয়, নিজেদের দেশে ব্যবহারের জন্যই কি বিরাট আকারে স্থপারীর চাহিদা

রহিয়াছে। আপার আসাম ও লোয়ার আসামে অতি প্রচুর পরিমাণ সুপারী গাছ জন্মে এবং এই সকল গাছের সুপারী আকারে যেমন বড় তাহার ফলনও তেমনি খুব বেশী। আপার আসামে পাহাড় এবং পাহাড়তলীর সমতল ভূমিতে বহু পতিত জমি পড়িয়া আছে এই সকল জমিতে অপর্য্যাপ্ত সুপারীর গাছ লাগানো যায় এবং সুপারীর বাবদ ক্রোর টাকারও উপর আমরা যে বিদেশীর হাতে তুলিয়া দেই তাহা বন্ধ হইতে পারে, তাহাছাড়া আমাদের যে পরিমাণ জমিতে বর্ত্তমানে সুপারীর চাষ হয়, যত্ন নিলে সেই পরিমাণ জমিতেই ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। দক্ষিণ ভারতে প্রত্যেক গাছ পিছু ২৫০ থেকে ৩০০টা সুপারী পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলা দেশে বা ভারতের অন্যান্য স্থানে এতাধিক ফল পাওয়া যায় না। গাছের গোড়ায় উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করে সার দিলে ফলন নিশ্চিত বাড়িবে।

কাজের সন্ধানে emigrate করিয়াছে তাহারা মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের লোক; এই সকল লোকের মধ্যে অনেকই ব্যবসা করে, সুতরাং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা ইহাদের মারফতেই সুপারী চালান দেয়।

সুপারীর ব্যবসায়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এর রপ্তানী বাণিজ্যে বাংলার কোন অংশ নেই; অথচ বোম্বাই ও মাদ্রাজবাসীদের তাতে রীতিমত অংশ আছে। ব্যাপারটা আক্ষেপের এবং বাংলাদেশের পক্ষে লজ্জার কথা সন্দেহ নেই। কলিকাতা ভারতের প্রধান বন্দর এবং বাংলাদেশেও প্রচুর সুপারী জন্মায়, সুতরাং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যদি সুপারীর রপ্তানী বাণিজ্যে কোন প্রকার অংশ গ্রহণ করতে না পেরে থাকে তা'হলে তার পক্ষে সেটা দুর্ব্বলতার লক্ষণ। কাজে কাজেই বাঙালীকে সে-দুর্ব্বলতা কাটিয়ে উঠতে হ'বে। 'বোম্বাইবাসী ও মাদ্রাজবাসী যদি রপ্তানী বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে থাকে ত বাঙালীরা কেন তা' পারবে না?
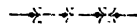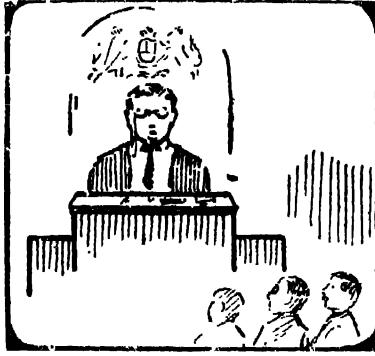
মকিম সর্দ্দার নামক একজন কুলী খুলনা ইলেকট্রিক কোম্পানীতে কার্য্য করিত। বিজ্লী বাতির খুঁটীগুলির মরিচা ছাড়াইয়া তাহাতে পেইন্ট্ বা রং লাগানই ছিল তাহার কাজ। প্রতিমাসে গড়ে ৪দিন করিয়া তাহার কাজ পড়ে। গত ১৯৩৬ সালের ২২ শে জুন সে করোনেশন হলের সম্মুখে একটী খুঁটিতে উঠিয়া রং লাগাইতেছিল,—এমন সময়ে দৈবাৎ খোলা তারে তাহার হস্ত-স্পর্শ হয়। তাহাতে ভীষণ ইলেকট্রিক শক্ লাগিয়া এক রকম তখনি তাহার মৃত্যু ঘটে।

মকিম সর্দ্দারের পিতা কোম্পানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের দাবী আদায়ের নিমিত্ত আদালতে মামলা করে। বঙ্গীয় মজুরদের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কীয় বিচারক (কমিশনার) মিঃ কে জি মর্শহেড্ আদেশ দেন যে মকিম সর্দ্দারের পিতা ও মাতা ৩৫০ টাকা এবং তাহার বিধবা পত্নী ১৫০ টাকা ক্ষতি পূরণ বাবত পাইবে। এই আদেশের বিরুদ্ধে কোম্পানী হাইকোর্টে আপীল করেন। প্রধান বিচারপতি ও মিঃ জাষ্টিস্ মুখার্জীর এজ্লাসে আপীলের শুনানী হয়। তাঁহারা নিম্ন আদালতের রায় বাহাল রাখিয়াছেন এবং আপীলকারী কোম্পানীকে মামলার খরচা দিতে হইবে, এই আদেশ দিয়াছেন। Workmen's Compensation Act এর কবলে পড়িয়া প্রায়ই নানা কারখানার মালিকদিগকে নানারূপ দৈব দুর্ঘটনার জন্য বিস্তর টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়; এই জন্য কারখানার মালিকগণ এইরূপ দুর্ঘটনা জনিত দণ্ডের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে Accident Insurance করিয়া থাকিলে ভারতে Accident Insurance এর কাজ বিদেশী কোম্পানীর ব্যাপকভাবে করিতেছেন। ভারতীয় কোম্পানী ওয়ালার কেবল জীবন বীমা লইয়াই পরস্পরের সহিত মাথা ঠেকাঠুকি করিতেছেন।

—০—

পাইয়োনীয়ার ব্যাঙ্ক্ লিমিটেডের ম্যানেজার মিঃ এস্ বসু কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ আর গুপ্তের এজ্লাসে নিম্নলিখিত অভিযোগ করিয়াছেন;—

সালেভাই বল্লীভাই নামক এক ব্যক্তি কলিকাতার আর্ম্মেনীয়ান ষ্ট্রীটস্থিত মেসার্স আমীজিমুল্লা বদরুদ্দীন নামীয় কারবারের ম্যানেজার। সে

গত অক্টোবর মাসে পাইয়োনীয়ার ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ এস্ বসুর হাতে কতকগুলি বিল্, রেলওয়ে রসিদ এবং তৎসক্রান্ত কাগজপত্র দিয়া বলে যে তাহারা বিলাসপুরের কোন ব্যবসায়ীকে ৭২০০ টাকা মূল্যের জিনিস সরবরাহ করিয়াছে। ব্যাঙ্ক যদি তাহাদিগকে ঐ ৭২০০ টাকা দেন, তবে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। বিলাসপুরের সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কের মারফতে ঐ সকল বিল্ ও রেলওয়ে রসিদের সাহায্যে ব্যাঙ্ক সেই টাকা আদায় করিতে পারেন। তাহার উক্ত প্রস্তাব অনুসারে ব্যাঙ্ক ৭২০০ টাকা তাহাকে দেন, কিন্তু বিলাসপুরের সেই ব্যবসায়ী মাল লইতে অস্বীকার করায় ব্যাঙ্ক টাকা আদায় করিতে পারেন না। অতঃপর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ এস্ বসু বিলাসপুর যাইয়া ঐ মালপত্র সমস্ত কলিকাতায় লইয়া আসেন। মিঃ বসু সংবাদ পাইলেন যে উক্ত সালেভাই বল্লীভাই নামক লোকটী কলিকাতার আরও কোন কোন ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ীকে প্রতারণা করিয়াছে। সেই জন্য তিনি অবিলম্বে বিশেষজ্ঞ লোকের দ্বারা ঐ মালপত্র পরীক্ষা করান। তাহাতে দেখা যায় জিনিসগুলি অতি নিকৃষ্ট ধরণের এবং যেরূপ বর্ণনা চিঠি পত্রে দেওয়া হইয়াছে সেইরূপ নহে।

এই প্রতারণার অপরাধে অভিযুক্ত সালেভাই আদালতে হাজির হইয়া ৫০০০ টাকার জামিনে খালাস আছে। মামলা চলিতেছে।

—০—

রসিক চন্দ্র রায় নামক এক ব্যক্তি "ওরিয়েণ্ট্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের" ম্যানেজার। ইহার কাজ কারবার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একদা গবর্ণমেণ্টের একজন ইন্‌স্পেক্টার ব্যাঙ্কের আফিসে যান এবং শ্রীযুক্ত রসিক চন্দ্র রায়কে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দেখাইতে বলেন। কিন্তু রসিকবাবু ইন্‌স্পেক্টারের চাহিদামতে কয়েকটি হিসাবের খাতা এবং দলিল পত্র দেখাইতে অসমর্থ হন। এই অপরাধে কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্ত শ্রীযুক্ত রসিক চন্দ্র রায়কে (ভারতীয় কোম্পানী সমূহের আইন অনুসারে) ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। জরিমানার টাকা না দিলে এক মাস বিনাশ্রমে জেল খাটিতে হইবে।

গত ডিসেম্বর (১৯৩৭) মাসে 'হিন্দুস্থানের' সেক্রেটারী মিঃ এন্ এন্ দত্ত, ব্রাঞ্চ্ আফিস সমূহের কার্য্য পরিদর্শন উপলক্ষে নাগপুরে উপস্থিত হইলে তথাকার কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে এক সান্ধ্যসম্মেলনে অভিনন্দিত করেন। সে সময়ে সোসাইটীর কার্য্যপরিচালনা সম্বন্ধে সকলের মধ্যে নানাবিধ হিতকর আলোচনা হয়।

—※—

গত মহাযুদ্ধের পর হইতে জার্ম্মানীতে অসুস্থতা বীমা (Sickness insurance) দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। এ যাবৎ প্রায় এক কোটী লোক অসুস্থতা বীমার পলিসি লইয়াছে। সম্প্রতি এই প্রকার বীমাকে আইনের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

—※—

জাপানে প্রায় ৩০টী জীবন বীমা কোম্পানী আছে। তন্মধ্যে পাঁচটী কোম্পানী খুব বড় ;— অন্যান্য কোম্পানীর কারবার ছোট রকমের ;— এত ছোট যে বড় কোম্পানী সমূহের পাশে তাহা একেবারেই মানায় না। বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে এইরূপ অসঙ্গত যোগাযোগ বন্ধ করিবার জন্য জাপান গবর্ণমেণ্ট ঠিক করিয়াছেন, ছোট কোম্পানীগুলিকে বড় বড় কোম্পানীর সহিত মিলাইয়া অল্প সংখ্যক মাঝামাঝি বড় রকমের কোম্পানী গঠন করিতে হইবে।

—※—

গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৩৫ সালে ১৩০টী ভারতীয় বীমা কোম্পানী মোট ৪৫৩৮৩৮০০০ টাকা লগ্নীতে খাটাইয়াছে। তন্মধ্যে ২২৯৩৮৮০০০ টাকা গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে লগ্নী করা হইয়াছে।

—※—

বেরার প্রদেশের অন্তর্গত জালগাঁও নামক সহরে নিউ এশিয়াটিকের একটী নূতন ব্রাঞ্চ, আফিস খোলা হইয়াছে। গত ৬ই জানুয়ারী বেরার কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট মাননীয় মিঃ ব্রজলালজী বিয়ানী উহার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

মিঃ হেমন্ত কুমার সরকার ষ্টালিং ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর চীফ্ এজেণ্ট (বঙ্গ, বিহার ও আসামের জন্য) নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে নিউ এশিয়াটিকের কলিকাতা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার ছিলেন।

এশিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ্ য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর সিন্ধু ও বেলুচিস্থান চীফ্ এজেন্সী ব্রাঞ্চ আফিসে পরিণত হইয়াছে। মিঃ ডি কে জয়সিংহানী বি এ, উক্ত ব্রাঞ্চের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কেপ্টেইন্ এস্ এন্ চৌধুরী অবসর গ্রহণ করাতে লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল জে এল্ সেন, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের চীফ্ মেডিক্যাল অফিসারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত ২০শে জানুয়ারী ভারত ইন্‌সুর‍্যান্সের কলিকাতা ব্রাঞ্চের আফিসে উহার কর্ম্মীদের এক সভা হয়। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মিঃ অশোক চ্যাটার্জ্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মী ইন্‌সুর‍্যান্সের দিল্লী ব্রাঞ্চের আফিস্ চাঁদনী চক্ হইতে উঠিয়া নয়া দিল্লীতে কনট্ প্লেস্ মদনমোহন লাল শ্রীরাম বিল্ডিং ব্লক্ নং K. এই ঠিকানায় গিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ দ্বারকা প্রসাদ মিশ্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে রাজস্থান ভবনে বম্বে লাইফের একটী ব্রাঞ্চ্ আফিস প্রতিষ্ঠার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বেরার প্রদেশ ও খান্দেশ ইহার এলেখাভুক্ত হইবে।

কানপুরের ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানী সম্প্রতি মোটর-দুর্ঘটনা-বীমার কারবার খুলিয়াছেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে কোম্পানী জীবন বীমা বিভাগে আশ্চর্য্য রকমের উন্নতি দেখাইয়াছেন। ইহার খরচের অনুপাত দ্বিতীয় বৎসরেই শতকরা ৩৬০৮ টাকায় নামিয়াছে। বীমার কারবারে এরূপ কম খরচের হার দেখানো বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা কোম্পানী ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন্ কে ভারতীয়কে এজন্য বিশেষ তারিপ্ করিতেছি।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ বি জি খের, বম্বে মিউচুয়্যালের ডিরেক্টার ছিলেন। তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থলে 'বম্বে ক্রনিক্যালে'র সম্পাদক এবং বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা মিঃ এস্ এ ব্রেল্‌ভি উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টার হইয়াছেন। ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে বম্বে মিউচুয়্যালের ডিরেক্টার বোর্ডকেই যথার্থ প্রতিনিধিমূলক বলা যায়। মিঃ ব্রেল্‌ভি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত।

কারবার বাড়িয়া যাওয়ার জন্য স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে পীয়ারলেস্ ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর হেড্ আফিস্ ৩নং লায়ন্সরেঞ্জ হইতে ৮নং এস্‌প্লেনেড্ ইষ্ট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে। সেই কারণে জুয়েল অব্ ইণ্ডিয়া ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর আফিসও স্থানান্তরিত হইয়া ৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় গিয়াছে।

ভারত ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর গৌহাটী ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী মিঃ সুধীর মজুমদারের চেষ্টায় গত ছয় মাসের মধ্যে আসাম হইতে প্রায় ৩॥০ লক্ষ টাকার বীমার প্রস্তাব সংগৃহীত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়া ইকুইটেব্‌লের য়্যাকটিং সেক্রেটারী মিঃ আর এন রায় সম্প্রতি খুলনায় গিয়া কোম্পানীর কারবার অনেকটা প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি একটী প্রাইভেট্ সভায় খুলনার প্রধান প্রধান গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া কোম্পানীর কার্য্য সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় জ্ঞাপন করেন। ইহার ফলে অবিলম্বেই বহু টাকার বীমার প্রস্তাব সংগৃহীত হয়।

ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ইন্‌স্যুর‍্যান্স কোম্পানী সম্প্রতি মাদ্রাজ প্রদেশে উহার কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছে। পদুকোটায় এই কোম্পানীর একটী ব্রাঞ্চ আফিস্ খোলা হইয়াছে। ভেনাস্ ইন্‌স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ পি কে নাগার্জ্জুন এই ব্রাঞ্চ আফিস্ পরিচালনাব ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—※—

মাদ্রাজের ষ্টার-অব্-ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল য়্যাণ্ড জেনারেল য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ এম্ এস্ আর এ গুপ্ত উক্ত কোম্পানীর সংস্রব ছাড়িয়া দিয়াছেন।

—০—

আমরা শুনিলাম, অল-ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর কুমারখালী (নদীয়া) ব্রাঞ্চ আফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ এন্ সি রায় উক্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন।

—※—

হিন্দুস্থানের য়্যাসিষ্টাণ্ট্ সেক্রেটারী মিঃ এস্ সেন এবং চীফ য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট মিঃ এম্ শীল সোসাইটীর লক্ষ্ণৌ ও লাহোর ব্রাঞ্চ পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত তত্তৎ স্থানে গমন করিয়াছিলেন।

—※—

পপুলার ইন্‌স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর বঙ্গদেশীয় প্রতিনিধি মিঃ এস্ সাহা উক্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন।

—※—

গত জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় যে ভারতীয় ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ কনফারেন্স হইয়া গেল, তাহাতে মহীশূরের অধ্যাপক কে বি মাধব ফসল বীমা করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। উক্ত কনফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট প্রোফেসার ফিশার এবং আরও কয়েকজন সদস্য আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

—※—

গত ২২শে জানুয়ারী যুক্ত প্রদেশশের লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট মাননীয় ডাঃ স্যার সীতারাম স্বদেশী বীমা কোম্পানীর আগ্রা হেড আফিস পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে কোম্পানীর সকল বিভাগের কার্য্যাবলী দেখান হয়। তিনি বহুক্ষণ যাবৎ ম্যানেজিং এজেণ্টগণের সহিত নানা কথাবার্ত্তা বলেন। সন্ধ্যার পরে তাঁহাকে ডিনার পার্টিতে সম্বর্দ্ধিত করা হয়।

—※—

ইন্দোরের বিখ্যাত ব্যাঙ্কার ও মিলওনার রাজভূষণ রায় বাহাদুর শেঠ হীরালাল, তিলক ইন্‌স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য হইয়াছেন। রায় বাহাদুর ৩৯ বৎসর বয়স্ক যুবক। সমাজের বিবিধ হিতকর কার্য্য-সাধনে তাঁহার যেমন উৎসাহ, শিকারে এবং খেলাতেও তাঁহার তেমনি সুনাম।

—※—

আমরা অবগত হইলাম, ১৯৩৭ সালে ন্যাশন্যাল ইন্‌স্যুর‍্যান্সের নূতন বীমার পরিমাণ হইয়াছে ১৬৮৬৪০০০ টাকা এবং ঐ বৎসরে বম্বে লাইফের নূতন বীমার পরিমাণ হইয়াছে ১৪০০০০০০ টাকার উপর।

—※—

১৯৩৭ সালে অন্যান্য কয়েকটী প্রধান কোম্পানীর নূতন কারবারের পরিমাণ এই,—বম্বে মিউচুয়্যাল, ২০২০২০০০ টাকা; ভারত ইন্সিওর‍্যান্স ২০৫০০০০০ টাকা; ইণ্ডিয়া ইকুই টেবল্ ৫০,০০০০০ টাকা; নিউ এশিয়াটিক, প্রায় ৩৫০০০০০ টাকা।

—※—

এই তুলনায় নিম্নে কয়েকটী বিদেশী কোম্পানীর নূতন কারবারের (১৯৩৭ সালের) পরিমাণ দেওয়া হইল;—নরউইচ্ ইউনিয়ন, ১১৫০০০০০ পাউণ্ড; সান-লাইফ-অব-ক্যানাডা, (কেবলমাত্র লণ্ডন আফিসের মারফত) ৪৯৭২০০০ পাউণ্ড; ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাইফ য়্যাসুর‍্যান্স ৪৩৪৫২৫৭ পাউণ্ড।

—※—

আমরা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম, এবং সকলেই শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্সিওর‍্যান্স সোসাইটী ১৮ জন রাজবন্দীকে অফিসের কার্য্যে এবং বাহিরের গঠন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। মুক্ত রাজবন্দীরা কর্ম্মহীন অবস্থায় থাকিলে, দেশে বেকার সমস্যা আরও গুরুতর হইয়া উঠিবে, এই আশঙ্কায় পূর্ব্ব হইতেই ইহার প্রতিকারের জন্য নানাদিকে চেষ্টা হইতেছিল। আমরা গত মাঘ মাসে এই সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছিলাম, বীমা কোম্পানীর কার্য্যে রাজবন্দীদের নিযুক্ত হইবার অনেক সুবিধা রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই 'হিন্দুস্থান' যে অগ্রণী হইয়া ১৮ জন রাজবন্দীকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাতে আমাদের ঐ আলোচনা সার্থক ও সফল হইয়াছে। আশা করি অন্যান্য বীমা কোম্পানী (যাঁহারা পারেন) হিন্দুস্থানের সুদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

—※—

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্সিওর‍্যান্স্ সোসাইটীর অফিস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মিঃ বি সি ঘোষ বি এস্ সি ইকন্ (লণ্ডন) বিকম্ (লণ্ডন) বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স কর্তৃক ই বি রেল্ওয়ের য়্যাড্ভাইজরী বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সম্মানিত পদ-প্রাপ্তিতে আমরা মিঃ ঘোষকে অভিনন্দিত করিতেছি।

—※—

বোম্বাইতে লক্ষ্মী ইন্সিওর‍্যান্স্ কোম্পানীর (লাহোর) নিজস্ব নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত সুভাস চন্দ্র বসু সেই বৃহৎ প্রাসাদোপম গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

—※—

১৯৩৬—৩৭ সালের শেষে দেখা যায়, পোষ্টাফিস্ ইন্সিওর‍্যান্স্ তহবিলে ৭ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। ইহার সুদ শতকরা বার্ষিক ৩৷৷০ টাকা।

—※—

হিন্দুস্থানের এজেন্সী বিভাগের প্রধান কর্ম্মী
রায় বাহাদুর উমেশ চাকলাদার পরলোকে

গত ২৭ শে ফেব্রুয়ারী রবিবার ভোরে মৈমনসিংহের অক্লান্তকর্ম্মী জননায়ক রায় বাহাদুর উমেশ চন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। বীমা সংস্পৃষ্ট ব্যক্তি মাত্রই এবং মৈমনসিংহের অধিবাসীবৃন্দ এই মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত হইবেন সন্দেহ নাই।

স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে যে সকল কর্ম্মী বাংলা দেশের বীমা ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন উমেশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৮০ খ্রীঃ মৈমনসিংহের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্য শিক্ষা ঢাকায় এবং কলেজের শিক্ষা কলিকাতাতেই সমাপ্ত হয়। যৌবনে যখন তিনি কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উদ্দীপনায় তিনি অনুপ্রাণিত হন এবং সেই হইতেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ জন্মে। বস্তুতঃ, তিনি সে যুগে একজন প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার তেজোব্যঞ্জক কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত বহু স্বদেশী সভার প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র কাব্য জগতের লোক ছিলেন না, কর্ম্ম জগতেরও লোক ছিলেন। পরলোকগত দেশ প্রাণ কৃষ্ণকুমার মিত্র ও আনন্দ মোহন বসু যখন মৈমনসিংহ সম্মিলনী স্থাপন করেন, তখন তিনি তাঁহার প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। এইরূপে যোগ্য গুরুর অধীনেই তাঁহার জনসেবার জীবন সুরু হয়।

অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত তিনি প্রথমে মৈমনসিংহের সন্নিকটবর্ত্তী ধাল্লা নামক গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার দেশ সেবার স্পৃহা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই এবং সেইজন্যই তিনি দেশ সেবার আরও বিস্তৃত ক্ষেত্র খুঁজিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী তাঁহাকে হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর তরফে বীমাকার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ জানান; তাঁহার সেই অনুরোধ রক্ষার জন্য তিনি প্রথমে উপরি কাজ হিসাবে অবসর সময়ে বীমা কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু পরে এই বীমা কার্য্যে তাঁহার সেবাগতপ্রাণ রীতিমত আকৃষ্ট হয় এবং সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদপুত সদ্যপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থানের জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত সময় নিয়োগ করেন। অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে প্রভূত পরিশ্রমপূর্ব্বক তিনি হিন্দুস্থানের উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন হিন্দুস্থানের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের গুণে তাঁহার যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি ঘটিয়াছিল তাহার তুলনা মিলে না এবং সেই জন্যই তিনি একজন সামান্য বীমাকর্ম্মী হিসাবে জীবন

আরম্ভ করিয়া পরে পূর্ব্ববঙ্গের অর্দ্ধেকেরও বেশী পরিমাণ স্থানে মৈমনসিংহ ও ত্রিপুরার জন্য চীফ্‌ এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির শৈশবাবস্থায় যখন বীমা জিনিসটা এদেশের লোকের নিকট একেবারে অপরিচিত ছিল তখন তিনি এদেশে বীমা তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেন না। কর্ম্ম বহুল জীবন হইলেও তিনি কখনো কল্পনাহীন হ'ন নাই এবং তাঁহার জীবনে বাস্তব ও কল্পনার সমতা রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী হইতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, একাধারে তিনি বাস্তববাদী ও আদর্শবাদী দুইই
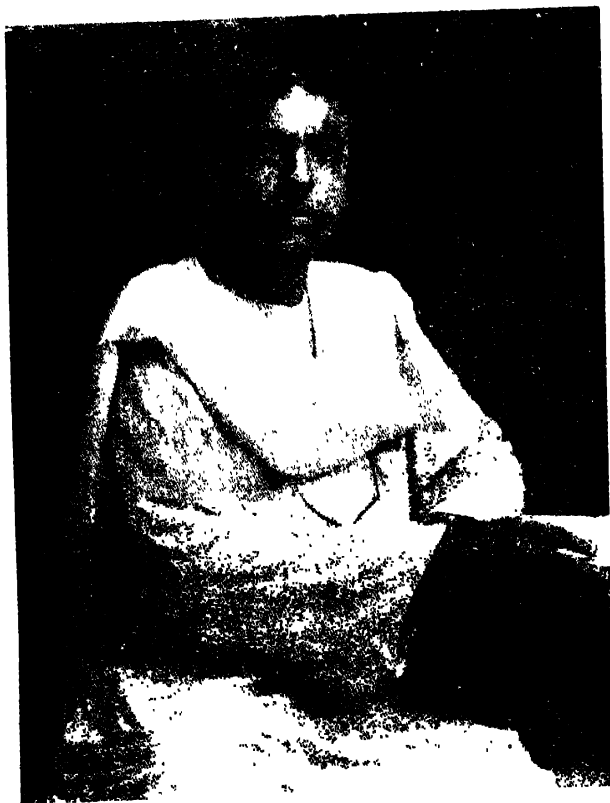
রায় বাহাদুর উমেশ চাকলাদার

ব্যাপারটিকে জনপ্রিয় করিবার জন্য যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন তাহা আজ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

ব্যবহারে নম্র, কর্ত্তব্যে কঠোর, সদাশয়তায় উদার, উমেশচন্দ্রের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগের সীমা ছিল না এবং যিনি একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনি কিছুতেই ছিলেন এবং এই দ্বিবিধ গুণের জন্যই তিনি মৈমনসিংহের প্রত্যেকটি জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি মৈমনসিংহের জেলাবোর্ড্‌ ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্‌ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—ইহা ছাড়া তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদেও উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যকান্ত হাসপাতাল কমিটির

সভ্য, আনন্দমোহন কলেজ কমিটির সভ্য, সেণ্ট্রাল্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ল্যাণ্ড্ মর্টগেজ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, ডিষ্ট্রীক্ট জেলের বেসরকারী পরিদর্শক ডিষ্ট্রীক্ট ওয়ার্ লোন্ কমিটির সম্পাদক, হাসপাতাল দিবস তহবিল কমিটির সম্পাদক, ডিষ্ট্রীক্ট সেলিব্রেশন্ কমিটির সম্পাদক, মহামান্য সম্রাট দম্পতীর প্রাদেশিক সিল্ভার জুবিলী কমিটির সভ্য প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডিষ্ট্রীক্ট সেলিব্রেশন্ কমিটির সম্পাদকরূপে মৈমনসিংহে হাসপাতাল স্থাপনের জন্য তিনি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও হাসপাতাল ইম্প্রুভ্মেণ্ট্ কমিটির সম্পাদকরূপে ষাট হাজার টাকা তুলিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত হাসপাতাল দিবস তহবিলের জন্যও তিনি বহু টাকা আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি মহামান্যা লেডী লিন্লিথ্গো কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত যক্ষা নিবারনী তহবিল কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ই, বি, রেলওয়ের এ্যাড্ভাইসরি কাউন্সিলে তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল্ চেম্বারের তরফে সদস্য ছিলেন। তাঁহার বহুমুখী জনসেবার কর্ম্মধারা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট্ ১৯২৩ সালে তাঁহাকে রায় সাহেব ও ১৯২৮ সালে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসারতার সেই গৌরবময় যুগে পরলোকগত ধুরন্ধর অম্বিকাচরণ উকীলের আপ্রাণ চেষ্টায়, রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোয় ভবনে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ও ময়মনসিংহ গৌরীপুরের স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী উহার কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উমেশ বাবু ইঁহাদের সঙ্গে বীমা-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া হিন্দুস্থানের কর্ম্মী হিসাবে ব্যবসায় জগতে প্রবেশ লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন।

বীমাকর্ম্মীরূপে তাঁহার অসাধারণ কর্ম্ম কুশলতার পরিচয় লাভ করিয়া হিন্দুস্থানের কর্ত্তৃপক্ষ সোসাইটীর নানা প্রয়োজনীয় কাজে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সোসাইটী অচিরেই তাঁহার কর্ম্ম প্রতিভার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের স্পেশাল এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি ময়মনসিংহে ব্যবসার কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পূর্ণোদ্যমে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার সংগৃহীত কার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া সোসাইটীর বাৎসরিক মোট কার্য্যের এক দশমাংশ হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাঁহার এজেন্সি আফিসে সোসাইটীর সমগ্র প্রিমিয়াম আয়ের দশমাংস প্রিমিয়াম সংগৃহীত হইতে থাকে। কর্ম্মীর এই অসামান্য কর্ম্ম সাফল্যে মুগ্ধ হইয়া সোসাইটী তাঁহাকে ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা জেলায় তাঁহাদের একমাত্র চীফ এজেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় হিন্দুস্থান এ যাবত কোটি টাকার অধিক বীমার কাজ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উমেশচন্দ্রের বিধবা পত্নী, পুত্রকন্যা, জামাতাগণ ও পৌহিত্র-দৌহিত্র বর্ত্তমান। তাঁহার মৃত্যুতে বীমা জগতের যে একটি জ্যোতিষ্ক অস্তমিত হইল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। দেশবাসী তাঁহার মৃত্যুতে গভীর দুঃখ অনুভব করিবেন, আমরাও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ডিস্‌ইন্‌ফেক্‌ট্যাণ্ট্‌স্ বা রোগ বীজাণু-নাশক মশলা

আজকাল সাধারণতঃ ফিনাইল ও কার্ব্বলিক য়্যাসিড্ বীজাণু-নাশক মশলা-রূপে ব্যবহৃত হয়। এই দুইটী তরল দ্রব্য। চূর্ণ আকারে ব্লিচিং পাউডারও (Bleaching Powder) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেস্থলে বীজাণু বিনাশ ও স্থান শোধন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ধৌত করিবারও প্রয়োজন আছে, সেস্থলে ফিনাইল, কার্ব্বলিক য়্যাসিড্ প্রভৃতি তরল দ্রব্য ব্যবহার হয়। শোধকদ্রব্য ব্লিচিং পাউডারের মত চূর্ণ হইলে সুবিধা এই যে, উহা কোন স্থানে ছড়াইয়া দিলে কিছু সময় যাবৎ জায়গার উপরে বসিয়া থাকে। কিন্তু সকল স্থলেই ফিনাইল, কার্ব্বলিক য়্যাসিড্ অথবা ব্লিচিং পাউডার কার্য্যকরী হয় না। কারণ একটা জিনিসের সকল রকম বীজাণু নষ্ট করিবার এবং সকল রকম ময়লা শোধন করিবার ক্ষমতা নাই। সেইজন্য নানা প্রকার জিনিস মিশাইয়া ডিস্‌ইন্‌ফেক্‌ট্যাণ্ট্ বা শোধক মশলা তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। এই রকমের মিশ্রিত মশলা বিভিন্ন পেটেণ্ট্ নামে বাজারে চল্‌তি আছে। আমরা নিম্নে ঐরূপ কয়েকটী মশলার ফরমুলা দিলাম ;—

(১) ক্রিয়জোট্ (Creosote) — ৪০ গ্যালন
রোজিন চূর্ণ (Rosin, Powdered) — ৫৬ পাউণ্ড
কষ্টিক সোডা লাই ৩৮° (Caustic Soda Lye 38° Tw.) — ৯ গ্যালন
ফুটন্ত গরম জল — ১২ গ্যালন
মেথিলেটেড্ স্পীরিট (Methylated Spirit) — ১ গ্যালন
কাল ঝোলা গুড় (Black Treacle) — ১৪ পাউণ্ড

প্রথমতঃ রোজিন গলাইয়া তাহার সহিত ক্রিয়জোট্ মিশান। তারপর তাহাতে সোডা লাই ঢালিয়া দিন। আর একটী পৃথক পাত্রে গরম জল ও মেথিলেটেড্ স্পীরিট মিশাইয়া উহা রোজিন ক্রিয়জোট্ ও সোডা লাইয়ের সহিত মিশ্রিত করুন। সর্ব্বশেষে ঝোলা গুড় মিশাইয়া উত্তাপ দিতে থাকুন,—যতক্ষণ না সমস্ত গলিয়া ভালরূপে মিশ্রিত হয়।

(২) গরম জল — ১২০ পাউণ্ড
কষ্টিক্ সোডা লাই, ৩৮° বি (Caustic Soda Lye 38°B) — ১২০ „
রোজিন (Rosin) — ৩০০ „
ক্রিয়জোট্ (Creosote) — ৪৫০ „

প্রথমতঃ ষ্টীমের উত্তাপে জল, সোডা-লাই এবং রোজিনকে গরম করুন, যেন সমস্ত গলিয়া মিশিয়া যায়। তারপর ষ্টীম বন্ধ করিয়া সেই মিশ্রিত দ্রব্যের মধ্যে ক্রিয়জোট্ ঢালিয়া খুব নাড়িয়া চাড়িয়া লউন। এক্ষণে আবার ষ্টীম খুলিয়া গরম করিতে থাকুন,—যে পর্য্যন্ত না সমস্তটা ভালরূপে মিশিয়া যায়। কিন্তু অতিরিক্ত গরম যেন না হয়।

(৩) রোজিন (Rosin) ১ হন্দর
কষ্টিক সোডা লাই ১৮° বি
(Caustic soda Lye 18° B) ১৬ গ্যালন
ব্ল্যাক্ টার অয়েল (Black Tar Oil) আধ গ্যালন
নাইট্রো ন্যাপ্থেলীন
(Nitro Napthalene) ২ পাউণ্ড

প্রথমতঃ আধ গ্যালন আন্দাজ ফুটন্ত গরম জলে নাইট্রো ন্যাপ্থেলীন গলাইয়া লউন এবং একটী পৃথক পাত্রে উহাকে রাখুন। আর একটী পাত্রে রোজিন গলাইয়া তাহার সহিত কষ্টিক লাই মিশান। তারপর উহাতে টার-অয়েল ঢালিয়া খুব নাড়িয়া চাড়িয়া লউন এবং সর্ব্বশেষে পৃথক পাত্রে রক্ষিত নাইট্রো-ন্যাপথেলীন মিশ্রিত করুন।

(৪) কর্পূর (Camphor) ১ আউন্স
কার্ব্বলিক য়্যাসিড (৭৫ পার্সেণ্ট) ১২ ,,
(Carbolic acid ; 75%)
(Aqua Ammonia) ১০ ড্রাম্
নরম নুন্ জল
(Soft salt water) ৮ ড্রাম্

এই সকল মশলা খুব ঝাঁকিয়া মিশাইয়া লইবেন। ব্যবহার করিবার সময় আরও জল ঢালিয়া পাতলা করিয়া লইতে হইবে।

(৫) ভারী টার অয়েল
(Heavy tar oil) ১০ গ্যালন
কষ্টিক সোডা
(Caustic Soda) ৩০ পাউণ্ড

প্রথমতঃ ৫ গ্যালন জলে ৬০০ ডিগ্রী ফারেন্হাইট্ উত্তাপে কষ্টিক সোডা গলাইয়া লউন। তারপর উহার সহিত টার অয়েল মিশান। অল্প আঁচে এই মিশ্রিত তরল দ্রব্যকে গরম করুন। উত্তাপ দিবার সময় হরদম্ নাড়িবেন। যখন ফুটিতে আরম্ভ করিবে, তখন উহার সহিত ২০ পাউণ্ড চর্ব্বি এবং ২০ পাউণ্ড নরম সাবান মিশ্রিত করুন। তারপর আরও উত্তাপ দিতে থাকুন। সাবান ভালরূপে মিশিয়া গেলে ক্রমে ক্রমে জল ঢালিয়া সমস্ত তরল দ্রব্যের পরিমাণ ৪০ গ্যালন করুন। ইহাকে খানিকক্ষণ রাখিয়া দিলে দেখিবেন, পাত্রের নীচে তলানি জমিয়াছে। উপর হইতে পরিষ্কার তরল পদার্থটা আস্তে আস্তে ঢালিয়া লউন। উহাই প্রয়োজনীয় বীজাণু নাশক এবং মলশোধক মশলা।

পেন্সিলের অঙ্কিত ছবিকে স্থায়ী করিবার উপায়

যে কাগজে পেন্সিল দ্বারা চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, সেই কাগজ খানিকে সর্ব্ব প্রথম পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া লইতে হইবে; রগড়ানর আবশ্যক নাই, শুদ্ধ জলে ডুবাইয়া তুলিয়া লইতে হইবে। তাহার পর মাখন তোলা দুগ্ধে ডুবাইয়া লও; তাহার পর সেই কাগজখানিকে ফটকিরির খুব তরল সলিউশনে ডুবাইয়া শুষ্ক করিতে দাও। যখন বেশ শুষ্ক হইবে, তখন ইহার উপর আইসিংগ্লাস

(বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়) গরম জলে গলাইয়া তাহারই খুব শীতল সলিউশন খুব নরম ব্রাস দ্বারা কাগজ খানিকে সমতল দ্রব্যের উপর রাখিয়া তাহার উপর সমানভাবে মাখাইয়া শুখাইয়া লইতে হইবে। এই পেন্সিলের অঙ্কিত চিত্র প্রায় চিরস্থায়ী হইবে।

TRACING PAPER

কোন লেখা বা নক্সা অথবা চিত্রের অবিকল নকল তুলিতে হইলে স্বচ্ছ ট্রেসিং কাগজ খানিকে উক্ত চিত্রের উপর দিয়া তাহার উপর পেন্সিল দিয়া কপি বা নকল করা হয়, এই নকল করার নাম ট্রেসিং করা। এই ট্রেসিং কার্য্যে উক্ত কাগজ ব্যবহার হয় বলিয়া ইহার নাম ট্রেসিং পেপার। ইহার আবশ্যকতা বুঝাইলাম। ইঞ্জিনীয়ার ও ওভারসিয়ার, ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান, এন্‌গ্রেভার নানা প্রভৃতি শ্রেণীর ব্যবসায়ীদিগের নিকট ইহা নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্য; সুতরাং ট্রেসিং কাগজ বিক্রয়ের জন্য ভাবনা নাই। যাহারা ইঞ্জিনীয়ার বা ওভারসিয়ার, তাঁহারা ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেন।

প্রস্তুত প্রণালী

১। সাধারণ ট্রেসিং কাগজ :—

টার্পিণ তৈলে বা অন্য কোন তৈলে একখণ্ড কাগজকে ডুবাইয়া কোনস্থানে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়, শুষ্ক হইলেই এই কাগজে ট্রেস করা চলে।

২। টিসু কাগজ অথবা তদ্রূপ কোন একখণ্ড কাগজকে

কানাডা বাল্‌সম্ ১ আউন্স
আমেরিকান বিশুদ্ধ টারপিন ৪ আউন্স

অগ্নির উত্তাপে বা যে কোন প্রকারে একত্র মিশাইয়া তাহাতে কাগজ ডুবাইয়া লইয়া শুষ্ক করিলেই ট্রেসিং পেপার প্রস্তুত হইয়া গেল। এইরূপ ট্রেসিং পেপারই রাধাবাজার ষ্টেশনারী দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

লেবেলাদির পৃষ্ঠে আঠা বা গঁদ লাগাইবার পদ্ধতি

প্রথমে ১ পাউণ্ড গঁদকে ৩ পাইট আন্দাজ শীতল জলে ভিজাইয়া তাহাতে ১ টেবেল চামচের এক চামচ গ্লিসারিন এবং মধু মিশাইয়া লইতে হইবে। তাহার পর একটা পাতলা ফ্লানেল কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া শিশিতে পুরিতে হইবে। তাহার পর স্পঞ্জ দ্বারা টিকিট ও লেবেলের পশ্চাতে মাখাইয়া শুষ্ক করিতে দিবে। যখন কোন জিনিসে এই লেবেল লাগাইতে হইবে, তখন জল স্পর্শ করিয়া লাগাইলেই আঁটিয়া যাইবে। গ্লিসারিন্ দিলে লেবেলের পশ্চাৎ দিক ফাটিয়া (cracked) যাইবে না, লেবেলে আঠা লাগাইয়া শুষ্ক করিলে লেবেল গুটাইয়া যায়। গ্লিসারিন্ দেওয়া গঁদে তাহা হইতে পারে না। স্পঞ্জ দ্বারায় এই গঁদ লাগানই ঠিক, ব্রুস ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি অনেক দিন এই গঁদ রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাতে ফোটা কতক oil of cloves বা লবঙ্গের তৈল মিশাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে ইহা সহজে জমে না এবং ইহার তেজও কমে না।

PAPER MACHE.
পেপার ম্যাচি

পেপার মেচি দ্রব্যটা কি? কাগজকে গলাইয়া ছাঁকে ঢালিয়া নানা প্রকার মুখস, ফল, ফুল প্রস্তুত করাকে পেপার মেচি বলে। এই রূপ কাগজে প্রস্তুত নানাপ্রকার টী-ট্রে, ফলের ডিস্, রেকাবী, নস্যের বাক্স, মুখোস, ইত্যাদি নানাদ্রব্য বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হইয়া থাকে।

পেপার ম্যাচি প্রস্তুত প্রণালী

সাদা বা ব্রাউন কাগজের কুচী গুলিকে জলে দিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ফেলিতে হইবে, এমন গলাইতে হইবে, যেন ঠিক কর্দ্দমবৎ হইয়া যায়; তাহার পর পাত্র হইতে নামাইয়া চাপ দিয়া জলীয় অংশ যথাসম্ভব বাহির করিয়া দিয়া যখন বেশ ক্রীমের মত অবস্থায় দাঁড়াইবে, তখন শিরিস ও গঁদ (গলান) মিশ্রিত করিয়া পিটাইয়া পিটাইয়া আটাল কাদার মত করিতে হইবে; তাহার পর যে জিনিসের ছাঁচ তুলিতে হইবে তাহা ঈষৎ তৈলাক্ত করিয়া এই কর্দ্দমবৎ দ্রব্য ছাঁচে দিয়া চাপিয়া ছাঁচ তুলিতে হইবে, তাহার পর শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। অতঃপর ইহার উপর রং করিতে হইলে, ব্লাক্ জাপান, লাল, নীল ইত্যাদি যে রং করিতে চান, সেই রংঙ্গের রিপোলিন বা এনামেল রং তুলি দ্বারা মাখাইয়া দিলে এই সকল খেলানার রং স্থায়ী হইবে। পেপার মেচির দ্রব্য লঘু, সুতরাং পড়িলে ভাঙ্গে না। মূল্যও অতিশয় সুলভ। এ দেশেও ইহা একটী উৎকৃষ্ট গার্হস্থ্য শিল্প হইতে পারে। মুখোস, ফল, ফুল, লতা, পাতা নানা প্রকার সাজান (deoration) এই পেপার মেচির প্রস্তুত দ্রব্যে সুসম্পন্ন হইতে পারে; অনেক বেকার এবং অনাথা স্ত্রীলোক এই কর্ম্ম করিতে পারেন।

ফ্লোরিডা ওয়াটার

অয়েল ল্যাভেণ্ডার (ভাল)	৪ আউন্স
,, বারগামট	৪ ,,
,, সিনামন্ বা দারুচিনি তৈল	২ ড্রাম
,, ক্লোভস্ (লবঙ্গ তৈল)	১ ,,
,, নিরোলী (ভাল)	২ ,,
,, মস্ক (ভাল)	৪ গ্রেন্
৯৫ পারসেণ্ট্ কলোন্ স্পিরিট্	১ গ্যালন

১৫ দিন একটা কাচের জারে কর্কবদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার পর ফিল্টারিং ব্লটীং কাগজে ছাঁকিয়া লইয়া শিশিতে পুরিয়া কর্ক ও লেবেল দিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

ব্রাঙ্কো বা ব্রাউন চামড়ার পালিশ

মোম	৪ আউন্স
কার্ডসোপ	২ ,,
তার্পিণ তৈল	৬ ,,
ওকার (গেরিমাটি)	১ ,,
জল	৪ ,,

সমস্ত গুলিকে একত্রে জাল দিয়া দ্রব্য করিবে। তাহার পর অন্যান্য দ্রব্য সকল মিশাইয়া টিনের কৌটা বা প্রশস্ত-মুখ বোতলে ছিপি আঁটিয়া রাখিতে হইবে।

ব্রাউন জুতার ক্রিম

হল্‌দে রঙের মোম	১ পাউণ্ড
রজন	১ আউন্স
ভাল তার্পিণ তৈল	১ পাইণ্ট
হল্‌দে সাবান	১ আউন্স

এনাটো অর্থাৎ লটকান বীজ রং ফলাইবার জন্য যতটুকু দরকার; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া অগ্নির তাপে গলাইবে। যখন বেশ না তরল না-ঘন অবস্থায় আসিবে, তখন শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয়োপযোগী হইবে।

হাঁপানির ঔষধ

২২।২।১৩ তারিখের মেদিনীপুর হিতৈষীতে এই ঔষধের কথা বাহির হয়। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যে কোন কারণেই হাঁপিকাস হউক না কেন, নিম্নলিখিত ব্যবস্থাটী পেটেণ্ট করিয়া চালাইলে লাভবান্ হইবেন। ৭।৮ বৎসরের পুরাতন হাঁপানি রোগীকে এই ঔষধ দেওয়া হয় নাই; ২।৩ বর্ষের রোগীকে এই ঔষধ দিয়া প্রায় সকল স্থানেই আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। ২।৩ জন রোগীর রোগ ভাল হইলেও ৬।৭ মাস পরে সংবাদ দিয়াছেন যে, পুনরায় সেই রোগ হইয়াছে। তাঁহাদের পুনরায় এই ঔষধ দেওয়া হয়, তাহাতে তাঁহাদের ফল ভাল হইয়াছে।

ব্যবস্থা, এই—

টিংচার লোবেলিয়া	২ ড্রাম
স্পিরিট ইথার সলফ	৬ ,,
টিংচার কোনিয়াই	২ ,,

মিক্সচার অ্যামোনায়েসাই (সমষ্টী) ৬ আউন্স একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২ দাগ। দিনে দুইবার সেব্য।

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতির মন্তব্য।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ হুমায়ুন কবীর দোকান সম্বন্ধীয় একটী আইন করিবার যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, এই চৈত্র সংখ্যার ১২২৩ পৃষ্ঠায় আমরা সেই বিষয়ের আলোচনা করিয়া উহার দোষ ক্রটী দেখাইয়াছি। এই বিল্ সম্বন্ধে জনসাধারণের, বিশেষতঃ দোকানের মালিকদের মতামত জানিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট্ নোটীশ জারী করিয়াছেন। তদনুসারে পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি (Publishers Association) যে মন্তব্য পাঠাইয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম দিলাম ;—

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতির এক সভায় দোকান সম্বন্ধীয় প্রস্তাবিত আইনের বিস্তারিত ও বিশদ সমালোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) দেশের সাধারণ অবস্থা যেরূপ, তাহাতে বিলে প্রস্তাবিত ধরণের কোন আইন প্রবর্ত্তিত করা যায় না।

(২) দোকান খোলা রাখিবার সময় কমান যাইতে পারে না এবং কর্ম্মচারীদের হাজিরী, দোকান খোলা ও বন্ধ করা সম্বন্ধে এক রকমের নিয়ম চল্‌তি হইলে কাজ কারবারের গুরুতর ক্ষতি হইবে।

(৩) শুক্রবারে ২ টার পূর্ব্বে দোকান না খুলিবার যে নিয়ম প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহা ন্যায় সঙ্গত নহে। উহা স্বাস্থ্যের এবং ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিজনক। ইহাতে বুঝা যায়, যে সকল দোকান, ব্যাঙ্ক্, পোষ্ট্ আফিস্ এবং মেইল অর্ডার সংক্রান্ত কাজ কারবার করে, তাহাদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিল্ রচয়িতা সাক্ষাৎ ভাবে কিছুই জানেন না।

(৪) পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতির মত আরও অনেক দোকানদারদের য়্যাসোসিয়েশান বা সমিতি রহিয়াছে। ঐ সকল সমিতির সাহায্যে দোকানের মালিকগণ কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগ এবং অসুবিধা দূর করিয়া থাকেন। সুতরাং কর্ম্মচারী ও মালিকদের মধ্যে কোন প্রকার মনোমালিন্যের কারণ ঘটিতে পারে না।

(৫) আইনের দ্বারা কর্ম্মচারীদের বেতন ধরা-বান্ধা করা অসম্ভব, অযৌক্তিক এবং

ভ্রমপূর্ণ। ইহাতে অনভিজ্ঞদের মধ্যে বেকার সমস্যা অধিককতর জটিল, গুরুতর ও শোচনীয় হইয়া উঠিবে এবং যাহারা এখন ভাল বেতন পাইতেছে, তাহাদের গুরুতর অকল্যাণ হইবে।

(৬) আইন সঙ্গত কার্য্য করাইবার জন্য পুলিশকে দোকানের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিশেষ আপত্তি জনক। ইহাতে কাজ কারবার একেবারে ওলোট-পালট্ হইয়া যাইবে এবং দুষ্ট লোকেরা অসাধু পন্থা অবলম্বন করিবার সুযোগ পাইবে।

(৭) কল্পনার প্রভাবে কলকারখানার মুটে মজুরকে দোকানের কর্ম্মচারীদিগের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না। কলের মালিকরা যেমন ক্যাপিট্যালিষ্ট্ (Capitalist) বা মূলধনী, দোকানের মালিকেরা সেই শ্রেণীর লোক নহে। সাধারণ দোকানের মালিকদের স্বল্প আয়ের কথা ভুলিলে চলিবে না।

(৮) দোকানের মালিকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিলে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হাস্যাস্পদ এবং দোকানদারগণের পক্ষে অপমানজনক।

(৯) বাংলাদেশে প্রায় ১৩০০ হাই স্কুল, ২০০০ এম্ ই স্কুল এবং ৩৬০০০ উচ্চ প্রাইমারী ও নিম্ন প্রাইমারী স্কুল আছে। জানুয়ারী মাসের প্রথমেই সকল স্কুলের পড়া আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান সময়ে ডিসেম্বরের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এবং পূর্ণ উদ্যমে দোকানের কাজ চালাইয়াও পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকগণ মার্চ্চ মাসের মধ্য ভাগের পূর্ব্বে সমগ্র বাংলাদেশের পুস্তকের চাহিদা মিটাইতে পারেন না। প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত হইলে স্কুলের ছাত্রগণ বৎসরের ছয়মাস অতীত না হইলে পড়া শুনা আরম্ভ করিতে পারিবে না।

কলিকাতা কিরানা এ্যাসোসিয়েসানের মন্তব্য

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কিরাণা য়্যাসোসিয়েসানের (মশলা ব্যবসায়ী সমিতি) সদস্যগণ এক সভায় সমবেত হইয়া দোকান সম্বন্ধীয় বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ঐ বিল আইনে পরিণত হইলে মশলা ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইবে, এই মর্ম্মে তাঁহারা এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।
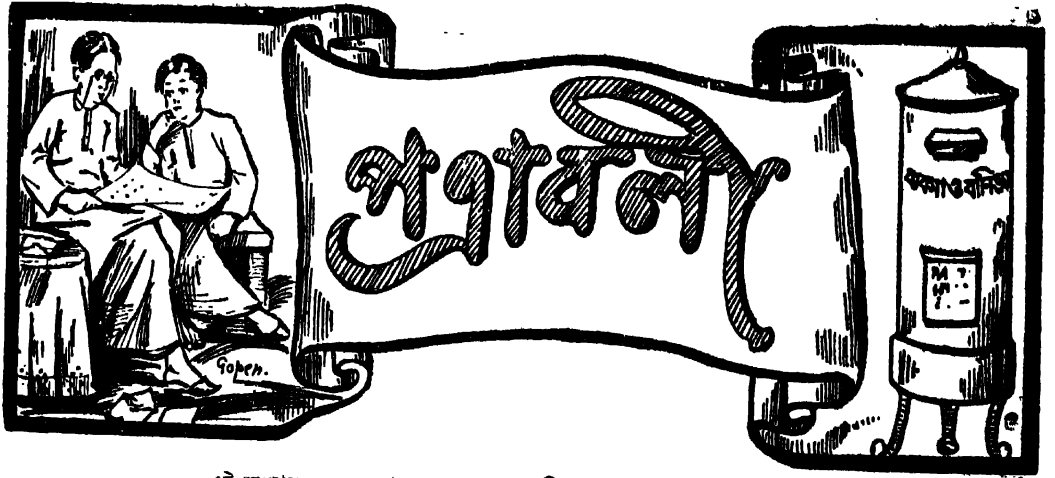
এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুলও থাকিয়া যাইতে পারে।

পত্র লেখকগণের প্রতি
(যাঁহারা গ্রাহক নহেন)

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাঁহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, অথচ বিনামূল্যে এমন সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন যাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তাঁহাদের মতলব, **"একটি হরিতকিও গুরুদক্ষিণা দিব না,—কিন্তু মন্ত্রটি আদায় করিয়া নিব"।** এই রকমের লেখকদিগকে আমরা জানাইতেছি, ব্যবসায়ীর সন্ধান এবং মাল পত্র বেচা-কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাঁহারা এক একটা মালের জন্য এক এক বারের কেনা বেচায় শ' দু'শ হইতে হাজার বা ততোধিক টাকা দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও

নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্য ৫।৵০ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হইলেই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা মোটা দালালী দিতে অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ, এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,"—ফ্যাও,—ছ্যাও,—ফ্যাল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাঁকতালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,—অথচ তার জন্য একটী পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ, এই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

১৭ বৎসর যাবৎ কার্য্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি, গোড়াতে ফাঁকিবাজীর মতলব, বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে একটা প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য আমাদের অনুরোধ, যাঁহারা সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা **আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।** যাঁহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-শুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান মুফতে দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে এই যে, তাঁহারা যথেষ্ট লাভবান এবং উপকৃত হইয়াছেন, আর আমরা লাভবান হওয়া ত দূরের কথা, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাঁহাদের পেট ভরাইয়াছি। কিন্তু সহের একটা সীমা আছে। এই জন্য অতঃপর গ্রাহক না হইলে কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।

যাঁহারা গ্রাহক আছেন

আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহকগণ আমাদিগকে নানাবিধ ব্যবসায় সংক্রান্ত পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সকল প্রশ্ন করেন তাহার উত্তর ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিনা মূল্যেই প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ঐ সকল পত্রের অধিকাংশই উদ্দেশ্যবিহীন বৃথা প্রশ্নে পরিপূর্ণ। অনেকেই কেবলমাত্র কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান। বাস্তবিক কোন কাজকারবারে হাত দিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। তাঁহাদিগকে জানাইতেছি, আমরা তাঁহাদের জন্য বাজারে ঘুরিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া নানা রকমের সংবাদ সংগ্রহ করি; যদি তাঁহারা সে সকল কোন কাজে না লাগান, তবে আমাদের শুধু শুধু হয়রান এবং অর্থ ব্যয় করান কেন? তাঁহাদের নিকট অনুরোধ, যেন খামকা আমাদিগকে প্রশ্ন না করেন এবং আমাদের নিকট হইতে যে সন্ধান, সংবাদ অথবা পরামর্শ পাইয়া থাকেন তাহা যেন যথার্থ কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া নিজেরাও লাভবান্ হয়েন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিশ্রমকেও সার্থক করেন।

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মারফতে দিতে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, আমরা সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথকভাবে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র জোগাড় করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি **আমাদের যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ৫৲ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন।** গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে এই ফি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদিগের কাগজেই **বিনা মূল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিকে** প্রদান করিব। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক নম্বর পাঠানো চাই।**

---

১ নং পত্র

মহাশয়,

আপনার বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "ব্যবসা ও বাণিজ্যে' জানিতে পারিলাম ব্যবসার উপযোগী সামান্য মূলধনে ব্যবসা করিবার কলের বিস্তারিত বিবরণ ও মূল্য ইত্যাদি আপনার নিকট পাওয়া যাইবে তাই বহু আশা করিয়া আপনার নিকট নিম্নে কয়েকটী বিষয় জানার জন্য লিখিলাম।

১। অল্প পরিশ্রমে হস্তে চালিত এমন কোন কল আছে কিনা যদ্দারা—দৈনিক একজন লোকে ৩।৪ মন ডাল ভাঙ্গিতে পারে থাকিলে তাহার মূল্য কত?

২। গরুর দ্বারা চালিত এমন কোন ডাল ভাঙ্গার কল আছে কিনা যদ্দারা—অনায়াসে ৫।৬ মন ডাল দৈনিক ভাঙ্গা যায়—থাকিলে তাহার দাম কত?

৩। ইঞ্জিন দ্বারা চালিত একখানা ছোট কল কত দামে পাওয়া যায় যদ্দারা—একই মেসিনে ডাল ও ছাঁটা যায় এবং শরিষাও চিবান যায়—উক্তরূপ কল বসাইতে সর্ব্ব সমেত কত খরচ পড়িবে এবং দৈনিক কি পরিমাণ—ডাল ও তৈল তৈয়ারী হইবে। উক্ত কল কিস্তিতে পাওয়া যায় কিনা। কিস্তিতে পাওয়া গেলে দাম কত, কয় কিস্তিতে টাকা শোধ করিতে হইবে এবং সর্ত্ত কি ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ জানা দরকার—

Yours faithfully
Kazi Nural Islam
Munsif's Court, Balurghat
Po. Balurghat Dist Dinajpur

---

১ নং পত্রের উত্তর

১। হস্ত-চালিত এরূপ ডাল ভাঙ্গা কল

আছে, যদ্দ্বারা একজন লোক দৈনিক ৩।৪ মণ ডাল ভাঙ্গিতে পারে। উহার মূল্যাদির জন্য আপনি নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীদের নিকট আমাদের নাম করিয়া চিঠি লিখিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন,—

(১) Balmer Lawrie & Co, Ltd. 103, Clive Street, Calcutta. (২) Bery Bros. 15, Clive Street, Calcutta. (৩) Oriental Machinery Supplying Agency Ltd. 20, Lall Bazar Street, Calcutta. (৪) T. E. Thomson & Co Ltd. 9, Esplande, Calcutta. (৯) Marshall Sons & Co. (India) Ltd. 99, Clive Street, Calcutta. (১০) Inter national Trading Co. 13, Clive Street, Calcutta. (১১) Industrial Machinery Co. 14. Clive Street, Calcutta.

২। গরুর দ্বারা চালিত ডাল ভাঙ্গা কল নাই।

৩। ইঞ্জিন দ্বারা চালিত ডাল ভাঙ্গা ও সরিষা চিবান একই মেসিনে কখনও হইতে পারে না। প্রত্যেক কার্য্যের জন্য পৃথক পৃথক মেসিন দরকার। সেই কল মেসিনের জন্য আপনি উপরি উক্ত ফার্ম্মে চিঠি লিখিলে সমস্ত বিবরণ অবগত হইবেন।

---

২ নং পত্র

আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর ব্যবসা ও বাণিজ্যের মারফৎ জানাইলে সুখী হইব।

১। আমাদের এতদঞ্চলে শিমূল তুলা পাওয়া যায়, বর্ত্তমানে বাজারে উহার চাহিদা কিরূপ? ও মণ কি দরে বিক্রী হয়? উহার ব্যবসায়ীদের ঠিকানা।

২। সাবান বা অন্য কোন দ্রব্য প্রস্তুতের ছাঁচ কোন ঠিকানায় পাওয়া যায় এবং উক্ত ছাঁচ নিজ প্রয়োজন মত ফরমাইস্ দিয়া তৈরী করান যায় কি না?

৩। কষ্টিক সোডা ও সিলিকেট অব্ সোডার পাউণ্ড বা সের হিসাবে বর্ত্তমান বাজার দর কি? অনুগ্রহ করিয়া ১৩৩৮ সনের Synopsis এক কপি পাইবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ সমাজপতি

---

২ নং পত্রের উত্তর

১। শিমুল তুলার চাহিদা বাজারে খুব আছে। উহার দর উঠ্তি পড়্তি হয়। বর্ত্তমানে মণ ৫ টাকা হইতে (যদি বীচি ছাড়ান ও খুব ভাল হয়) ১০।১২ টাকা পর্য্যন্ত। আপনার শিমুল তুলা বিক্রয়ের জন্য নিম্নলিখিত ফার্ম্মে আমাদের নাম করিয়া চিঠি লিখিবেন ;—

(১) Calcutta Cotton Factory, 90, Cossipore Road, Calcutta. (২) Cossipure Cotton Ginning Factory. 2, Sugar Works Lane, Cossipure, Calcutta. (৩) Ralli Bros. Cotton Ginning Factory Bandar, Narayangunj, Dacca. (৪) Bhararia Cotton Ginning & Pressing Factory, Dhubri, Assam. ( ) Krishna Cotton Guinnig Mill, Mankachar Assam,

২। কলিকাতার চিৎপুর অঞ্চলে নানা রকম কাঠের ছাঁচ পাওয়া যায়। লোহার ছাঁচ আপনার নির্দ্দেশ অনুসারে যে কোন ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম্ম সরবরাহ অথবা তৈয়ারী করিতে পারে। তাহাদের কয়েকটী ঠিকানা দিয়ে দিলাম ;—

(১) Oriental Machinery Supplying Agency Ltd. 20, Lall Bazar Street, Calcutta. (২) T. E. Thomson & Co. Ltd. 9, Esplanade East, Calcutta. (৩) Industrial Machinery Co. 14, Clive Street, Calcutta. (৪) Bhowani Engineering & Trading Co. 23, Chaulpati Road, Belliaghata, Calcutta. ( ) Small Machineries Manufacturing Co. 22, R. G. Kar Road, Calcutta,

৩। কষ্টিক সোডা (৯৮°,৯৯° কঠিন) প্রতি হন্দর ১০৷৷০ টাকা। কষ্টিক সোডা ফ্লেক্ প্রতি হন্দর ১৩৵০। সিলিকেট্ অব সোডা (১৪০°) প্রতি হন্দর ৪৷৷০ টাকা। সিলিকেট ২ নং প্রতি হন্দর ৪।০ টাকা।

৩ নং পত্র

বিনীত নিবেদন এই,

আমি কলিকাতার "চারগোলা টি কোম্পানী"তে ২ খানা শেয়ার সার্টিফিকেট পাঠাইয়াছিলাম, নাম পরিবর্ত্তন করিতে কিন্তু কোম্পানী অদ্য যাবৎ কোন উত্তরই দিতেছেনা। এই জন্য কাহাকে রিপোর্ট করিতে হইবে দয়া

করিয়া উত্তর দিবেন। এইজন্য Ragistrar of joint stock Co.তে লিখিলে ফল হইবে কি না?

নিবেদক—
শ্রীদ্বারিকা নাথ দে
গ্রাম দুর্গাপুর
পোঃ ভরদ্বাজ হাট
জেঃ চট্টগ্রাম

চারগোলা ভ্যালি এবং চারগোলা টী ফ্যাক্টরী এই দুইটী কোম্পানী আছে। আপনি কোন কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া ছিলেন, তাহার নাম ও ঠিকানা স্পষ্টরূপে জানাইলে, আমরা আপনার অভিযোগের যথাবিহিত প্রতিকার করিতে পারি।

কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব্ য়্যাসোসিয়েসানে যদি এইরূপ নিয়ম থাকে যে ডিরেক্টরগণ ইচ্ছা করিলে শেয়ার-পরিবর্ত্তন মঞ্জুর নাও করিতে পারেন, তাহা হইলে শেয়ারের মূল্য ফেরৎ পাওয়া ছাড়া আপনার আর কোন দাবী থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, আপনি আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক নহেন। সুতরাং আমাদের নিকট হইতে ইহার অধিক আর কিছু প্রত্যাশা করিতে পারেন না। কারণ ব্যবসা ক্ষেত্রের সম্বন্ধ পরস্পর আদান প্রদান। পরামর্শেরও মূল্য আছে, জানিবেন। আমাদের গ্রাহকের জন্য প্রয়োজনীয় খবরাখবর সংগ্রহার্থে শ্রম স্বীকার করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইনা।

৪ নং পত্র

Dear Sir,

আমি একটী Home Printing Machine কিনিতে চাই। যাহার দ্বারা ঘরে বসিয়া অল্লায়াসে ও ব্যয়ে ফুলিশকেপ সাইজের এক পাতা একবারে ছাপাইতে পারা যায়। আমি ব্যবসা বাণিজ্যের গ্রাহক (গ্রাহক নং ৫৯৪০)। আমার অনুরোধ আশাকরি উপেক্ষিত হইবে না। আমার অনুরোধ এই যে ঐরূপ মেসিন কোথায় পাওয়া যায় এবং তাহার বিস্তারিত মূল্য তালিকা যাহাতে পাইতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আমার ঐরূপ কোন Farm এর ঠিকানা জানা থাকিলে আপনাদিগকে বিরক্ত করিতাম না।

নমস্কার জানিবেন—
অধিক আর কি ইতি।
Subodh Ch. Mukherjee.

৪ নং পত্রের উত্তর

আপনি প্রিন্টিং মেসিনের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী ফার্ম্মে আমাদের নাম করিয়া চিঠি লিখিলে সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবেন ;—

(১) Industry office, 22, R. G. Kar Road, Calcutta. (২) Ashutosh Addya & Co. 16, Lower Chitpur Road, Calcutta. (৩) Jahn Dickimson & Co. 6, Clive Row, Calcutta. (৪) Indo Swiss Trading Co. Ltd. 2, Church Lane, Calcutta.

জাপানী সরকারী ব্যবস্থার তুলনায় আমাদের সরকারী ব্যবস্থার অকিঞ্চিৎকরত্ব

অপরকে অন্যায় ভাবে নিন্দা করা পাপ, তদুপরি অহেতুক আত্মনিন্দা আরও পাপ। নিজেদের মধ্যে কোথাও যদি কোন গলদ থাকেত সেটা শোধরাবার চেষ্টা করা উচিত; মিছামিছি ধিক্কার ধ্বনিতে চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকাটা পৌরুষ নয়। আমাদের মধ্যে যে ক্লীবত্ব দেখা যায় সেটা অনেকদিনের পুঞ্জীভূত পাপেরই আত্মপ্রকাশ, তাকে সমবেতভাবে দূরীভূত করবার চেষ্টা করাই জাতীয়তা ও পৌরুষত্বের লক্ষণ। যে বা যাঁরা তা' না করেন, তাঁদের দ্বারা দেশের কোন হিত হওয়া ত দূরের কথা বরং ক্ষতিই হ'য়ে থাকে এবং তাঁদেরই আসল দেশদ্রোহী বলে অভিহিত করা উচিত।

আমরা পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য করলাম এই জন্য যে আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা দেশীয় সমস্ত প্রচেষ্টার ওপরই বীতশ্রদ্ধ। দেশীয় কোন জিনিসের নাম করলেই তাঁরা শুচিবায়ু গ্রস্ত লোকের মত নাক শিঁটকে বলে ওঠেন—'আর বলবেন না মশাই, দেশী জিনিস সব খারাপ। এ জাতের কি আর কখনো উন্নতি আছে।' যাঁরা অবুঝ তাঁদের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্, কিন্তু যাঁরা যুক্তি তর্ক দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চান তাঁরা তাঁদের উপরোক্ত মন্তব্যের বিরুদ্ধে তর্ক করলে হয়ত একটু সদয় হয়ে জানান—'বুঝলুম মশায়, কিন্তু এখনো উন্নতি হ'তে হাজার বছর দেরী।'

এই ত দেশীয় লোকেদের ভাষণ। বিদেশীয় লোকেদের ভাষণ আবার আরও চমৎকার; সাম্রাজ্যবাদের এই সব 'ছিনিক্' সর্ব্ববিষয়েই দোষগ্রাহীগণ ভারতীয় সমস্ত ব্যাপারেই ত্রুটি দেখতে পান্ এবং আমাদের প্রতি পরম স্নেহ ও দরদ বশতঃ বলে ওঠেন যে ভারতীয়রা কোন কাজেরই যোগ্য নয়। তাঁদের অনুরূপ মনোবৃত্তির জন্য বিলাতী পত্রিকায় মাঝে মাঝে এই মর্ম্মে মন্তব্য বেরোয় যে ভারতকে স্বাধীনতা দিলে নিজেরা কামড়াকামড়ি করে অবিলম্বে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সেই জন্যই বৃটিশ পার্লামেণ্ট্ আমাদের প্রতি পরম অনুরাগবশতঃ স্বায়ত্ত শাসন দিচ্ছেন না। এই সমস্ত মন্তব্যের ওপর টীকা টিপ্পনী নিস্প্রয়োজন।

আমরা আমাদের নিজেদের দোষগুণের প্রতি অন্ধ নই—আমরা জানি যে আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি আছে; কিন্তু তাই বলে চেষ্টা করলে আমাদের উন্নতি সম্ভব নয় এমন অদ্ভুত কথা আমরা কোন মতেই উচ্চারণ করতে পারি না। কোন জগতের কখনো উন্নতি সম্ভব নয় এমন অদ্ভুত কথা অতি বড় 'পেসিমিষ্ট্'-ও উচ্চারণ করেন না। চিন্তাশীল স্বদেশী এবং অপক্ষপাত বিদেশী ব্যক্তি মাত্রই অবগত

আছেন যে, সামাজিক, রাষ্ট্রীক এবং শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা পূর্ব্বের চেয়ে উন্নতির পথে অনেকখানিই অগ্রসর হয়েছি এবং আশা রাখি যে আমাদের পরিপূর্ণ উদ্যম ও অধ্যবসায় নিয়ে আমরা একদিন অপরাপর জাতের সমকক্ষ হ'য়ে উঠ্‌বো। এর জন্য হাজার বছর সময়ের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ সময়ই যথেষ্ট।

আমরা যে জোরের সঙ্গে একথা বলতে সাহসী হলাম তার কারণ আমরা চোখের সামনে দেখেছি অপর দু'টি জাত কত অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত উন্নতি করেছে। এই বিংশ শতাব্দীতে রুশিয়ার উদাহরণটা কি সাম্রাজ্যভক্ত নৈরাশ্যবাদী 'সিনিক্‌দের' মুখের মত জবাব নয়? বিপ্লবের পর ১৯২০ থেকে ১৯৩০ এই দশটা বছরের মধ্যে রুশিয়া কি আশ্চর্য্যরকম উন্নতি লাভ করে দেশকে পশ্চাতে ফেলে রাখেনি? অথচ সেই দেশটাই বিপ্লবের পূর্ব্বে প্রায় ভারতের মতই অজ্ঞ ও পশ্চাদপদ ছিল। কই, তার উন্নতির জন্য ত হাজার বছরের প্রয়োজন হয়নি? একটা মজার ব্যাপার এই যে, আমাদের প্রতি বিদেশীরা যে রকম বিরূপ মন্তব্য করে, রুশিয়ার বেলাতেও তারা সেই রকম করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি। তারা অনবরত তারস্বরে ঘোষণা করেছে যে রুশিয়া হচ্ছে একটা খুন-জখমের দেশ, সেখানকার উন্নতির কথা সব অতিশয়োক্তি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী নিন্দুকের দল সাম্যবাদী রুশিয়ার যত নিন্দাই করুক না কেন, সভ্য জগৎ আজ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে রুশিয়ার উন্নতি প্রত্যক্ষ করছে।

পাশ্চাত্য রুশিয়ার কথা ছেড়ে দিয়ে প্রাচ্যের জাপানের কথাই ধরুন। বর্ত্তমান জাপানের জন্ম হয়েছে ১৮৬৮ সাল থেকে; তার পূর্ব্বে জাপান ছিল মানসিক বর্ব্বরতার সীমানার মধ্যে। ১৮৬৮ সালের পূর্ব্বের জাপান ছিল অর্দ্ধ-অসভ্য এবং অসংখ্য জাতি উপজাতি ও শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত, মধ্যযুগীয় ছাপ তার সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত। শাসন ব্যাপারেও প্রবর্ত্তিত ছিল তার সামন্তযুগীয় নীতি, গভর্ণমেণ্ট ছিল অত্যাচারী অর্দ্ধ সামরিক অভিজাতগণের হাতে। রাজা একজন ছিল বটে কিন্তু সে নামে, রাজার পক্ষ থেকে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক রাজত্ব সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালিত হ'ত। জাপানের অধিবাসীরা তখন ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞ; তাদের মধ্যে জাতিগত কোন শৃঙ্খলা ছিলনা, ছিলনা কোন নিয়মানুবর্ত্তিতা। বাইরের জগতের সঙ্গে জাপান ছিল সম্পর্কশূণ্য; মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী ছাড়া কোন বিদেশীর পক্ষে জাপানে প্রবেশের উপায় ছিল না, জাপানীরাও বাইরের জগতের সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখাত না। লালা লাজপৎ রায় জাপানের ঐ অবস্থা সম্পর্কে এক যায়গায় লিখে গেছেন—Japan was as if a closed cell which kept its doors shut and had even no windows or ventilators for light or air from without. The world knew almost nothing about her, nor did she know anything about the world.

সেই জাপান গত ৫০ বছরের মধ্যে একেবারে বদলে গেছে। তার এই আকস্মিক অথচ দ্রুত পরিবর্ত্তন প্রগাঢ় বিস্ময়ের উদ্রেক

করে। প্রাচ্যের ঐ ক্ষুদ্র জাপান যখন রুষযুদ্ধে জয়ী হ'ল, তখন সারা ইউরোপ একেবারে সচকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলে ঐ জাগ্রত শক্তির নব অভ্যুত্থানের দিকে। তারপর থেকে জাপান জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আশাতীতরূপে উন্নতি সাধন করেছে। আজ পৃথিবীতে এমন স্থান নেই যেখানে ক্ষুদ্র জাপানের প্রতীক চিহ্ন দেখতে পাওয়া না যায়। ৫০ বছরের মধ্যে জাপান প্রাচ্যের শিক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে হয়েছে এশিয়ার নব সূর্য্য; তার বিপুল অগ্রগতি আজ সারা বিশ্বের ত্রাসের বস্তু। ব্যবসার ক্ষেত্রে সে আজ সারা জগতকে পরাজিত করেছে।

এই যে বিরাট পরিবর্ত্তন, এ কি করে সম্ভব হ'ল? এ কি একটা ভোজবাজি? মোটেই নয়, এ পৃথিবীতে কোন জিনিসই কারণ ব্যতিরেকে ভোজবাজি দ্বারা সম্ভব হয় না। জাপানের দেশীয় গভর্ণমেণ্টই সে-দেশকে ঐ রকম বিরাট পরিবর্ত্তনের পথে চালিত করেছে। এ সম্পর্কে লালা লাজপৎ রায় চমৎকার বর্ণনা করেছেন, আমরা তাঁর কথাগুলিই তুলে দিলাম:—Japan is a singular example of a democracy being trained by responsibility and trust. It was not a case of first deserve and then desire. It was a case of a father showing his entire confidence in his child and handing him over the reins before he had proved his fitness by the standards set up by western nations. * * * * * * * * Japan has been saved by the trust placed by her monarch in her people and by the ungrudging help given by her Government in initiating all measures that were necessary for her education and development.

পশ্চাৎপদ্ জাত কি করে অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতির পথে চালিত হয় রুশিয়া ও জাপান হ'ল তার উজ্জ্বল নিদর্শন। ঐ দু'টি দেশের ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পেয়েছি যে, সরকারের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই উক্ত প্রকার উন্নতি সম্ভব হয়েছে। বস্তুতঃ, কোন দেশের গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে সে-দেশের উন্নতি সম্ভবপর নয়। যে কোন রাজনৈতিক দল হোক্ না কেন, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে যে দেশের উন্নতি সম্ভবপর নয় এ তথ্যটা সবাই বোঝেন; তবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে রীতিমত পার্থক্য থাকে। আমাদের দেশে যাঁরা মডারেট কিংবা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অথবা লিবারেল (এদেশের এই তিনটি দলের নামগত পার্থক্য ছাড়া মতবাদগত কোন পার্থক্যই নেই) কিংবা ইউরোপের অনুরূপ দল বা লেবার পার্টি অথবা সোসিয়ালিষ্ট—সবাই গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে পার্লামেণ্টারী উপায়ে গভর্ণমেণ্টকে করায়ত্ব রেখে দেশের উন্নতি করবার পক্ষপাতী। কম্যুিউনিষ্টগণও রাষ্ট্রভার করায়ত্ব করবার জন্য ব্যগ্র; তবে তাঁরা পার্লামেণ্টারী উপায়ে মোটেই বিশ্বাস করেন না। রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে কমিউনিষ্টগণ হলেন রিভল্যুসানারী এবং অপরাপর দল হলেন ইভল্যুসানারী কিন্তু, সবারই উদ্দেশ্য হ'ল রাষ্ট্রের সাহায্যে দেশের উন্নতি সাধন করা, কেননা, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে হাজার ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত

প্রচেষ্টায়ও ও-জিনিসটি সম্ভবপর নয়। যে অসাধ্য সাধন করতে হয়ত হাজার বছর লাগে, গভর্ণমেণ্ট যদি সে-কাজে হাত দেন ত পঁচিশ বছরে তা' সম্পন্ন হয়। রুশিয়া ও জাপান হ'ল তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্টকে আমরা তাই এসম্পর্কে অবহিত হ'তে বলি। ভারতবর্ষ পশ্চাৎপদ দেশ, সুতরাং তার উন্নতি সম্ভবপর নয়,—সরকারের এবম্বিধ যুক্তি রুশিয়া ও জাপানের নজীরে একেবারে অগ্রাহ্য। তবুও তাঁরা যদি এবিষয়ে অন্ধ হয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকেন তাহ'লে এসম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকবে না যে ভারতের উন্নতি তাঁদের কাম্য নয়, পরন্তু ভারতের শোষণই তাঁদের কাম্য। আমাদের মনে হয় গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীর বিরাগভাজন হ'তে চান না; তা যদি না চান্ ত রুশিয়া ও জাপানের দৃষ্টান্ত তাঁরাও অনুসরণ করুন।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের নিকট না হয় রুশিয়ার দৃষ্টান্তে বল্‌শেভিকী গন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু জাপানের দৃষ্টান্তের মধ্যেত আর সেরকম কিছু নেই। সুতরাং জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে আমাদের গবর্ণমেণ্টের লাভ বই ক্ষতি হ'বে না। একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, কোন দেশের অপরাপর বিষয়ের উন্নতি সে-দেশের আর্থিক উন্নতির ওপরই নির্ভর করে। দেশের আর্থিক অবস্থা তখনই ভাল থাকে যখন শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হয়। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি নিম্নলিখিত বস্তু ও ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে :—

১। মূলধন

২। সুদক্ষ শ্রমিক

৩। বিক্রয় বাজারের সুব্যবস্থা

৪। মাল প্রেরণ ও আনয়নের সুবিধা

৫। নব নব প্রচেষ্টার উৎসাহ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা।

অতএব প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টেরই উপরোক্ত বিষয় ও ব্যবস্থার প্রতি মনযোগ দেওয়া প্রধানতম কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে ১৮৬৮ সালের পূর্ব্বেকার জাপান ছিল অর্দ্ধঅসভ্য, পশ্চাৎপদ ও বিশৃঙ্খল দেশ। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কাজ হ'ল দেশকে একসূত্রে গ্রথিত করা। সেই উদ্দেশ্যেই বিশৃঙ্খল জাপান ১৮৬৮ সালে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে একত্রীভূত হয়—তখন থেকেই তার আধুনিক যুগের উৎপত্তি।

গবর্ণমেণ্ট সমস্ত খণ্ড খণ্ড দেশটাকে এক সূত্রে গ্রথিত করে দেখলেন যে, দেশের উন্নতির জন্য শিল্প বাণিজ্যের প্রসারতা আবশ্যক, কিন্তু সে-প্রচেষ্টার জন্য যে মূলধন দরকার তা' সরবরাহের কোন আধুনিক প্রতিষ্ঠান নেই। পাশ্চাত্য জগতে ব্যাঙ্ক বলতে যা' বোঝায় তখন জাপানে তা' একটিও ছিল না। অথচ দেশে যে মূলধনের অভাব ছিল তা' নয়, 'সামুরাই' নামে আমাদের দেশের ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় একশ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায় ছিল যারা মহাজনের কারবার করত এবং প্রয়োজনমত গবর্ণমেণ্টকে টাকা ধার দিত। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের প্রথম কাজ হ'লো দেশে আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই গবর্ণমেণ্ট 'সোহসী' (business bureau) নামে এক প্রতিষ্ঠান এবং 'সুসসী' (commercial bureau) নামে অপর এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। প্রথমটির কার্য্য হ'ল—"to take charge of national revenues, to

encourage industries and to promote trade and production by lending money at low rates of interst" ; আর দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য হ'ল—"the development of home and foreign trade and the increase of Government income" (উদ্ধৃতাংশ কাউণ্ট ওকুমা কৃত Fifty years of Japan নামক গ্রন্থ হ'তে গৃহীত)। তা' ছাড়া খাঁটি ব্যাঙ্কিং কার্য্য করবার মানসে গবর্ণমেণ্ট ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স ইতো-কে আমেরিকায় ব্যাঙ্কিং কার্য্য পরিদর্শন ও শিক্ষা মানসে প্রেরণ করেন। প্রিন্স ইতো আমেরিকা থেকে প্রত্যাগমন করে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করাই প্রকৃষ্ট উপায়। তদনুসারে সরকারী নিয়মাধীনে কতকগুলি জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৭৬ ও ১৮৭৯ সালের মধ্যে জাপানে অনুরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৪৮-এ গিয়ে দাঁড়ায় (তাদের সমষ্টিগত মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪ কোটী-ইয়েন)। কিন্তু ব্যাঙ্কিং কার্য্য পরিচালনার সুদক্ষ লোকের অভাবে অর্থ-নৈতিক জগতে নানান্ বিপর্য্যয় দেখা দেয় ; পণ্যমূল্য-সমূহ ভয়ঙ্করভাবে ওঠা নামা করতে থাকে যার ফলে অবস্থা দাঁড়ায়—"Business was depressed, enterprises were suspended, factories were in decay··· and merchants and manufacturers became bankrupt." কাজে কাজেই গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করবার আইন করতে বাধ্য হলেন এবং প্রাইভেট ব্যাঙ্ক স্থাপনে ব্রতী হ'লেন। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে জাপানে প্রাইভেট্ ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৯৬। ১৮৭৯ সালে ইয়োকোহামা স্পেসি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট তার এক-তৃতীয়াংশ মূলধন প্রদান করেন। উক্ত ব্যাঙ্কই জাপানের বর্ত্তমানে প্রধানতম ব্যাঙ্ক এবং জাপানের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তা' যথেষ্ট সহায়তা করেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে উক্ত ব্যাঙ্কের আর্থিক হিসাব নিম্নরূপ ছিল :—

বিক্রীত মূলধন	·৪০ কোটী ৮০ লক্ষ ইয়েন	
আদায়ী মূলধন	৩ কোটী ···	"
রিজার্ভ ফাণ্ড	১ কোটী ২৬ লক্ষ	"

এই ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। কাউণ্ট ওকুমার উক্ত পুস্তকে এসম্পর্কে লেখা আছে—The Government did much towards protecting and encouraging them by lending them capital and by granting them special privilege to issue··· ·······aganist certain reserve funds required to be set aside. শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় কার্য্যকরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব্ জাপান নামে পরে একটি সেণ্ট্রাল্ ব্যাঙ্কও স্থাপন করেছেন। এছাড়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ও এগ্রিকাল্চারাল ব্যাঙ্ক সমূহ স্থাপনেও সরকার যথেষ্ট আনুকূল্য দেখিয়েছেন। গবর্ণমেণ্টের এবম্বিধ কার্য্যের দরুণই না আজ জাপানের এত উন্নতি। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা কি দেখতে পাই ? গবর্ণমেণ্ট কি আমাদের দেশে ব্যাঙ্কিং কার্য্য প্রসারণের জন্য এবং দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করণের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন ? আমাদের দেশে দেশী ব্যাঙ্কগুলি যখন দিনের পর দিন সংগ্রাম করে, গবর্ণমেণ্ট কি তখন তাদের সাহায্যের জন্য এতটুকু অগ্রসর হ'ন ?

[ক্রমশঃ]

ভারতীয় ব্যবসায়ী সংঘের
(Indian Chamber of Commerce)
বার্ষিক অধিবেশন

বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স্ এর দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত চেম্বার ভারতীয়দের একমাত্র সম্মিলিত ব্যবসা-বাণিজ্য-গত প্রতিষ্ঠান; বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স যেমন বাঙ্গালীদিগের প্রতিনিধিস্থানীয় একমাত্র ব্যবসায়ী সংঘ, Indian Chamber of Commerce ও তেমনি কলিকাতাস্থ অবাঙ্গালী ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। এই ব্যবসায়ী সংঘে প্রধানতঃ কলিকাতাস্থ মাড়োয়ারী, গুজরাটী, পার্শী, পাঞ্জাবী বণিক প্রধান গণই কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। সুতরাং উক্ত চেম্বারে যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হয় তাহা নানা কারণে প্রণিধান যোগ্য। উক্ত বার্ষিক অধিবেশনে চেম্বারের বিদায়ী সভাপতি মিঃ এম্, এল, সাহা ও নব-নির্বাচিত সভাপতি মিঃ এ, আর, দালাল যে ভাষণ প্রদান করেছেন তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, দেশের বণিক সংঙ্ঘ প্রধানত: বণিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গঠিত হলেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি তাঁরা মোটেই উদাসীন নন্। এটা তাঁরা ভাল করে জানেন যে, দেশ ও দেশবাসীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির উপরই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে। সেই জন্যই উভয় সভাপতিই আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যবস্থার প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। যে ক্যাপিটাল্ ও লেবারের বিরোধ প্রসঙ্গে এদেশে রীতিমত দ্বন্দ্ব সংঘাত সুরু হয়েছে সে-সম্পর্কে মিঃ দালাল স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন—

"One question which has recently come prominently before the public eye and is exercising the minds of those interested in business and industry is that of labour. I am sure, the wise employer will meet his labour more than half way and anticipate its just demands. If the Capitalistic system is to survive, it must admit labour as an equal partner in the production of wealth and equally entitled to a share of that wealth."

এই স্পষ্ট ভাষণ থেকে বোঝা যায় যে, যে-সমস্ত মালিক শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার

প্রতি উদাসীন থাকেন তাঁরা নিজেদেরই ক্ষতি করেন। বস্তুতঃ, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল্ ও লেবারের একান্ত সমন্বয় দরকার; ওদের বিরোধ ঘটিলে মাল উৎপাদনের রীতিমত বিঘ্ন ঘটায়। ভারতবর্ষে এ জিনিসটা ভেবে দেখবার সময় উপস্থিত হয়েছে।

হচ্ছে একমাত্র রাষ্ট্র; নইলে ব্যক্তিগত বা সামাজিক প্রচেষ্টায় ওজিনিসটি সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষের মত পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে উক্ত প্ল্যানিং-এর রীতিমত প্রয়োজন আছে। এতদিন রাষ্ট্রের উদাসীনতার জন্য আমাদের দেশের উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি সাধিত হ'তে পারেনি,

ইণ্ডিয়ান চেম্বারের বিদায়ী সভাপতি মিঃ এম. এল. শাহা

পূর্ব্বেই বলেছি যে, দেশের লোকের আর্থিক স্বচ্ছলতার উপরই ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করে; সে-আর্থিক স্বচ্ছলতা আসতে পারে যদি দেশ উপযুক্ত অর্থ-নৈতিক প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই অর্থ-নৈতিক প্ল্যানিং অবলম্বন করবার অধিকারী

কিন্তু বর্ত্তমানে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে আশা হয় যে, আমাদের প্রদেশগুলির কথঞ্চিৎ উন্নতি ঘটবে।

কিন্তু দেশের বাণিজ্যের উন্নতি শুধুমাত্র দেশীয় অবস্থার উপর নির্ভর করে না, আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিও দস্তুরমত ইহার ওপর

প্রভাব বিস্তার করে। সেইজন্য আন্তর্জাতিক ব্যাপারগুলির উপরও আমাদের যথাযোগ্য দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কয়েকমাস পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার বাজার বেশ ভালই ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান বিবরণী থেকে জানা যায় যে ব্যবসা বাজারের অবস্থা আবার মন্দার দিকে চলেছে। এর কারণ সম্পর্কে মিঃ সাহা পরিষ্কার বিশ্লেষণ সহকারে উল্লেখ করেছেন,—"

"Whatever opinion experts may offer, my own conclusion is that the situation is bound to remain uncertain and chaotic as long as the political atmosphere in the world and international relations between the major powers do not improve. * * * Many devices like the Exchange control system, clearing agreements, fixing of import and export quotas, tariffs, bilateral trade agreements, manipulation of currencies etc have been resorted to by various nations in order to bring prosperity to their peoples by thus regulating trade and business; but mutual suspicion and greed and the consequent under currents of political strategy and manouvering have foiled all these attempts.

To day the situation appears to be confusing. Not only has international tension increased but terrorism on a mass scale has been let loose upon nations which has created a feeling of utmost uncertainty and insecurity in the world."

এই হ'ল আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির আসল অবস্থা। সেখানে জাতিতে জাতিতে এখন টুঁটি ছেঁড়াছিঁড়ির মহল্লা চলেছে। একটা সুনিশ্চিত যুদ্ধের আশঙ্কায় সবাই যেন একেবারে উৎকণ্ঠিত এবং আতঙ্কিত হয়ে আছে। জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুকু অধিকারের ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নাভিঃশ্বাস উঠেছিল, ইতালী কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক আবিসিনিয়া বিজয়ে তার মৃত্যুঘণ্টা বাজল, সম্প্রতি চীন জাপান যুদ্ধের পর ইউরোপীয় পরিস্থিতি নিরাপদে তাকে কবরস্থ করেছে। সুতরাং এখন আর চক্ষুলজ্জার কোন কারণ নেই, এবং সেইজন্যই ইতালী, জার্ম্মানী ও জাপান কোযে কোমর বেঁধে সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশ্বের ব্যবসা বাণিজ্যের গতি কি করে স্থির থাকবে? যে বৃটিশ সিংহ একদিন তর্জ্জন গর্জ্জন করে সকলকে অভয় প্রদান করত সেই বৃটিশ সিংহ আজ একেবারে কাবু হয়ে ল্যাজ গুটিয়ে বসে আছে, জাপানের পুনঃ পুনঃ চপেটাঘাতেও তার কিছুমাত্র সাড়া নেই। সুতরাং এই রকম যুদ্ধমনোভাবাপন্ন কোন জাতই নিঃসঙ্কোচে তার বাণিজ্যের বাজার বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে না, পরন্তু নিজেদের আভ্যন্তরিক ব্যবসা বাজারকে রক্ষা করবার জন্য নানা রকম 'রেস্ট্রীক্‌সন্' স্থাপন করছে।

এই সমস্তর প্রভাব ভারতবর্ষের উপরও প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে হিন্দুস্থানের গোটাকতক সুবিধা

জনসাধারণের
বিশ্বাসের
অপূর্ব্ব
নিদর্শন
ভারত ইন্‌স্যুর‍্যান্স কোম্পানী
১৯৩৭ সালে
দুই কোটী পঁচাত্তর লক্ষ ২,৭৫,০০,০০০৲ টাকার অধিক মূল্যের নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছে। তন্মধ্যে দুই কোটী পাঁচ লক্ষ (২,০৫,০০,০০০) টাকার অধিক মূল্যের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নূতন বীমার কারবার সম্পূর্ণ করিয়াছে।
এই অল্প সময়ের মধ্যে নূতন পরিচালকবর্গের অধীনে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়া "ভারত" নিজেই নিজের পরিচয় দিতেছে। ইহার উপরে আর টীকা টিপ্পনী অনাবশ্যক।
ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের অগ্রদূত এই ভারত ইন্সিওরেন্স দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে। পরিচালকগণ আশা করেন, অচিরে "ভারত" এমন সফলতা লাভ করিবে, যাহা এদেশে এযাবৎ দেখা যায় নাই।
১৯৩৮ সালের বিপুল পরিবর্ত্তন
লক্ষ্য রাখিবেন।
ভারত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
হেড্ আফিস্—ভারত বিল্ডিংস্, লাহোর
জেনারেল ম্যানেজার
পি. ডি. খোস্‌লা এম. এ.
কলিকাতা ব্রাঞ্চের
ম্যানেজার
মিঃ অশোক চ্যাটার্জ্জী বি. এ (ক্যান্ট্যাব.)
ফোন :—কলিকাতা ২৬৪৬
ঠিকানা :—
"ভারত-ভবন"
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা

আছে। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষ ঐরূপ যুযুৎসু মনোভাবাপন্ন জাতিগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট নয়; দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ সম্পদশালী দেশ হওয়ার দরুণ উপযুক্ত প্ল্যানিং-এর সাহায্যে যদি ইহার সম্পদকে কার্য্যকরী করে তোলা যায় তাহ'লে বিশ্ববাণিজ্যের নিদারুণ মন্দাবস্থাও এর ততটা ক্ষতি করতে পারে না। এ সম্পর্কে মিঃ সাহা মন্তব্য করেছেন—

"Though in the modern world international conditions are bound to affect, in a more or less degree, all countries, fortunately for us we are geographically placed away from the present storm centres, and provided we are able to chalk out a well-conceived and vigorous national plan of industrial activity and economic regeneration, India has very little to fear from a world disturbance. The resources of our Country are so vast and the market so large and promising that the scope for industrial expansion, both large scale and small, is great. It has, however, been an outstanding grievance against the Government—and one often repeated—that they have not followed so far any consistent policy with regard to the economic development of the country. There had been a singular lack of system and well-thought out plan for the exploitation of the vast natural resources which our country possesses."

এই যে ভাষণ, এ যদি কোন কংগ্রেসী দেশ নেতার মুখ থেকে বেরুত তাহ'লে গভর্ণমেণ্ট বলতে পারতেন যে নিছক গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা করার জন্যই গভর্ণমেণ্টের দোষ ক্রটির ঐ রকম প্রচারকার্য্য চালানো হচ্ছে; কিন্তু ঐ ভাষণ বেরিয়েছে বণিক-সম্প্রদায়ের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মুখ দিয়ে যিনি আমাদের দেশের আর্থিক দুরবস্থার ব্যাপার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছেন। বস্তুতঃ, আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্টের কোন সুসংবদ্ধ কর্ম্ম প্রণালীর অভাবেই আমাদের আর্থিক সম্পদের কোন রকম সুব্যবস্থা হয়নি। নইলে, আমরা এখনো কেন এই রকম দারিদ্র্য ভারে প্রপীড়িত হয়ে থাকবো, কেন আমাদের গড়ে দৈনিক আয় ছ'পয়সা দু'আনার বেশী ওঠে না, কি জন্যই বা আমাদের ব্যক্তিগত বা জাতিগত ঋণরাশি অমন বিরাট হয়ে উঠেছে?

সেই জন্যই সর্ব্বপ্রথমে আজ আমাদের একটি সুসংবদ্ধ কর্ম্মপ্রণালী বা ইকনমিক্ প্ল্যানিং-এর প্রয়োজন। যে বাংলাদেশে শতকরা ৭১ জন লোক নিছক কৃষিজীবী, কিন্তু কৃষকদের অত্যধিক ঋণের বোঝাই তাদের সকল প্রকার উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং তাদের ঋণভার লাঘব করবার প্রচেষ্টা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বঙ্গীয় ঋণ লাঘব আইন প্রচলিত হয়েছে বটে কিন্তু সেটাই সম্পূর্ণ নয়। উক্ত

আইনানুযায়ী কৃষকদের যেটা ন্যায্য ঋণ সেটা অবশ্য পরিশোধ করিবার বিধান আছে, কিন্তু কৃষকদের ট্যাঁকে টাকা যোগাবার ব্যবস্থা করণের কোন বিধান নেই। এটা খুব সত্যি কথা যে, কৃষকদের ন্যায্য ঋণ কত সেটা নিষ্পত্তি করে দেওয়াই সবটা নয়, সে-ঋণ পরিশোধ করবার সামর্থ্য যোগানোই আসল কাজ। আজ কৃষকদের এমন দুরবস্থা যে, সারা বছর তাদের পেটে খাবার সংস্থান নেই, প্রতি বছর তাদের নতুন ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়,—একথা সর্বজনবিদিত এমতাবস্থায় পুরাতন ঋণ যত ন্যায্যই হোক্ তা' তারা শুধবে কি করে? কাজে কাজেই তাদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা দরকার। সরকার থেকে কোন কৃষি ঋণ প্রদান সমিতি কিংবা কোন ব্যাঙ্ক যদি কৃষকদের বাৎসরিক কম কিস্তিতে দীর্ঘ মেয়াদে পরিশোধনীয় ঋণ প্রদান করে উন্নত কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা করতে পারে তাহ'লেই কৃষকদের অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি হয়। একথা সত্য যে কৃষকদের হাতে ক্রয় ক্ষমতা না এলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা ভাল হয়ে ওঠে না। সেই জন্যই বণিক সম্প্রদায়ের কৃষকদের অবস্থার উন্নতির প্রতি অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এসম্পর্কে মিঃ সাহা মন্তব্য করেছেন—

"Agriculture is the largest and most important industry of this country and therefore matters pertaining to rural economy deserve our closest attention. For, after all, it is upon the foundation of agriculture and upon the well-being of the cultivator that the prosperity of the country as a whole and of industries in general depends. The indebtedness of our rural population is too well known a fact to dilate upon and the provision of suitable finance and credit to the agriculturist is one of the out-standing problems of rural economy."

ভারতবর্ষের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী গ্যারান্টীতে কৃষকদের ঋণ প্রদান করে এদেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতি করতে পারে। গোঁড়া ব্যাঙ্কিং নীতি অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে ঐরূপ কার্য্যকরণে হয়ত বাধা থাকতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি দেশের উন্নতিকল্পে অর্থ সাহায্য না করে তবে তা' জাতীয় ব্যাঙ্ক হয়ে ওঠে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের এটা ভেবে দেখা কর্ত্তব্য।

বাংলার চাষীদের পক্ষে পাট এক প্রয়োজনীয় ফসল। এই পাট চাষ একসময়ে তাদের প্রচুর বিত্ত এনে দিয়েছিল, আজ সেই পাটের দর পড়ে যাওয়ার দরুণ চাষীদের দুর্দ্দশার সীমা নেই। সুতরাং সেই পাটের দর যাতে বৃদ্ধি পায় সেবিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বাংলার পাট-ব্যবসায়ীদের ইতিমধ্যে এক আশঙ্কার কারণ ঘটেছে, কেননা, বহু দেশ নানারকম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা পাটের ব্যবহার বন্ধ করবার চেষ্টা করছে। এসম্পর্কে মিঃ সাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন—

"I learn from first-hand information that shippers of agricultural produce in Australia are reverting

to the methods of transport in bulk in order to reduce this dependence on imported gunnies. Recently there was also a rumour about an impending legislation in the United States for putting restrictions on the import of manufactured jute articles from India into that country. Dundee too has recently been inordinately vocal in demanding protection against imports from India." আমাদের ব্যবসায়ীদের এসম্পর্কে খরদৃষ্টি রাখা উচিত, নইলে, অতি উৎপাদনের দ্বারা দুর্দ্দশার সীমা থাকবে না।

আমরা উপরে সমস্ত ব্যাপার ব্যাপকভাবে আলোচনা করলাম। এবার মিঃ সাহা যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা অভিভাষণে বলেছেন সে-সম্পর্কে আলোচনা করব।

আলোচ্য বর্ষে ঋণ-নিবারণ সংক্রান্ত আইন, প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত আইন, মজুরী বিষয়ক বিল প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হয়েছে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আইন হচ্ছে বীমাসংক্রান্ত সংশোধিত আইন। উক্ত বিধিব্যবস্থার দ্বারা বীমা জগতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত আইনের স্বপক্ষে বিপক্ষে কোন রকম মন্তব্য প্রকাশ না করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ওর দ্বারা দেশীয় বীমা কোম্পানী সমূহের রীতিমত ক্ষতি হবে।

অটোয়া চুক্তির দ্বারা ভারতের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল, সেইজন্য ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একবাক্যে তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে তা' পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তৎপরিবর্ত্তে নানারকম ইঙ্গবৃটিশ চুক্তির আয়োজনে রত হয়েছেন যেটা ভারতীয়দের স্বার্থ হানিকর।

এই বৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেসন্ নামক বিখ্যাত ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী তাঁদের জাহাজী ব্যবসার প্রসারতা ঘটিয়েছেন। তাঁদের জাহাজ ভারতবর্ষ থেকে জেড্ডায় তীর্থযাত্রী বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জাহাজী ব্যবসা দেশের একটি প্রধান ব্যবসা, কিন্তু এ ব্যবসার বেশীর ভাগই বিদেশীদের করতলগত। মিঃ সাহা মন্তব্য করেছেন যে, ভারত সরকারের এই ব্যবসাটিকে ভারতীয় করণের প্রতি মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। সম্প্রতি করাচীতে মারাত্মক প্রতিযোগিতার ফলে ডেক্‌-প্যাসেঞ্জারের ভাড়া ১৭২৲ টাকা থেকে মাত্র ২০৲ টাকায় নেমে গেছে; এতে যে জাহাজী ব্যবসার মারাত্মক ক্ষতি হবে সেবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ভারতীয়গণ নিশ্চয়ই দাবী করতে পারে যে, দেশের গবর্ণমেণ্ট এব্যবসাটিকে রক্ষা করবার জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করবেন।

কয়লা শিল্পও বাংলার অন্যতম একটি বৃহৎ শিল্প, এই শিল্পে বহুলোক নিযুক্ত থাকে, সুতরাং এর উন্নতি-অবনতির প্রতি আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। বিভিন্ন রেল কোম্পানী-গুলি কয়লা শিল্পের প্রধান খরিদ্দার, কোন কোন রেল কোম্পানীর নিজস্ব খনি আছে। সুতরাং রেল কোম্পানীর হাবভাবের দ্বারা কয়লা শিল্পের ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটতে পারে। সম্প্রতি কয়লা খনি সংক্রান্ত আইনানুযায়ী স্ত্রীলোকদের ভূগর্ভস্থ খনির কাজে নিযুক্ত করা চলবে না, কিন্তু উক্ত আইন রেল কোম্পানীর অধীনস্থ

খনিগুলির প্রতি প্রজোয্য নয়। এতে অপরাপর খনিগুলির ব্যবসায়ে নিশ্চিত ক্ষতি হইবে। মিঃ সাহা তাঁহার অভিভাষণে এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং এই অন্যায় বৈষম্যমূলক ব্যাপারের সমাপ্তির জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

মিঃ সাহা ভারতীয় দিয়াশলাই শিল্পের অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাংলাদেশে দিয়াশলাই-এর অনেকগুলি কারখানা আছে, তন্মধ্যে গুটি কয়েক বিদেশীয় মালিকের দ্বারা পরিচালিত। উক্ত বিদেশীদের অন্যায় প্রতিযোগিতার ফলে অনেকগুলি দেশী কারখানা ফেল পড়েছে। গবর্ণমেণ্টের এধারে অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া ও উক্ত অন্যায় প্রতিযোগিতা বন্ধ করবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত দেশী কারখানা ফেল পড়েছে তারা যাতে পুনরায় পুনর্জ্জীবিত হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত।

সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধার জন্য যে রিজার্ভ সিটের ব্যবস্থা করেছেন মিঃ সাহার অভিভাষণে তা' উল্লিখিত হয়েছে। মিঃ সাহা এরূপ মতও প্রকাশ করেছেন যে, প্রতি সিটের জন্য যে ১৯৷৷০ ইঞ্চি স্থান নির্দিষ্ট আছে তা' প্রয়োজনানুরূপ নয়, তৎপরিবর্ত্তে উহা ৩০ ইঞ্চি করা কর্ত্তব্য। আমরা মিঃ সাহার এই অভিমত সমর্থন করি। মাত্র ১৯৷৷০ ইঞ্চি স্থানের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা যে কাটানো যায় না একথা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ভুক্তভোগী মাত্রই স্বীকার করবেন। কিন্তু এরই সঙ্গে মিঃ সাহা যদি বিভিন্ন স্থানে মাল প্রেরণের সুবিধা অসুবিধার বিষয় আলোচনা করতেন তাহলে সেটা আরও ভাল হ'ত। অত্যধিক মাশুলের হার ব্যবসার ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে, সেবিষয়ে ব্যবসায়ীদের স্বার্থের অনুকূলে একটা যথাযোগ্য সুব্যবস্থা করা দরকার।

বিদেশে প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণের দিকেও মিঃ সাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কেনিয়াতে এক আইন পাশ করবার ব্যবস্থা হচ্ছে যার ফলে কয়েকটি যায়গায় ভারতীয়দের ভূসম্পত্তির ওপর কোনরূপ স্বত্বাধিকার থাকবে না। জাঞ্জিবারে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি কি রকম বৈষম্য মূলক আচরণ করা হয় সে বিষয়ে সবাই অবগত আছেন। ভারতীয় জনমতকে এ সম্পর্কে জাগ্রত করা দরকার।

পরিশেষে মিঃ সাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের চাকরীর জন্য যে "সারভিস্ ব্যুরো" স্থাপন করেছেন তজ্জন্য তাঁদের ধন্যবাদ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় যেটুকু করেছেন তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ অবশ্য প্রাপ্য। কিন্তু আমাদের মনে হয় এসম্পর্কে বিশেষ উল্লসিত হবার কারণ নেই। হাজার হাজার বেকারের মধ্যে কয়েকজনের চাকরী লাভ কিছুই নয়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হতে শিক্ষার প্রধান গলদ দূরীকরণটাই আশা করি।

হাওড়া
মিউনিসিপ্যালিটী
নোটীশ

এতদ্দারা এই মিউনিসিপ্যালিটীর ১৯৩৮—৩৯ সালের ছাপিবার কাজকর্ম্ম করিবার জন্য পৃথক এবং শীলমোহর যুক্ত টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডারে :—

(১) Annual Tender for printing Meeting papers.

(২) Annual Tender for printing Forms, Register etc.

এই দুইটী শিরোনাম দিতে হইবে। আগামী ২১ শে মার্চ্চ (১৯৩৮) সোমবার বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারী টেণ্ডার গ্রহণ করিবেন।

১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালের ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য এই টেণ্ডার।

প্রত্যেক টেণ্ডারের সহিত কেশীয়ার বা খাজাঞ্চির নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক সার্টি-ফিকেট্ দাখিল করিতে হইবে যে, ১৯৩৮ সালের ১৮ই মার্চ্চ বেলা ২ ঘটিকায় কিম্বা তৎপূর্ব্বে নগদ ১০০ টাকা অথবা তাহার সমান মূল্যের কোম্পানীর কাগজ অগ্রিম জমা দেওয়া হইয়াছে। যদি কোন টেণ্ডার দাতা তাঁহার টেণ্ডার গৃহীত হইবার পর টেণ্ডার প্রত্যাহার করেন, অথবা টেণ্ডার গৃহীত হইবার পর দুই সপ্তাহের মধ্যে উপরি উক্ত কার্য্য সম্পাদনের জন্য নিজ ব্যয়ে কৃত চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করিতে এবং টেণ্ডারের টাকার শতকরা দশ ভাগ জমা দিতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে ঐ অগ্রিম জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

যে সকল ফরম, রেজিষ্টার প্রভৃতি ছাপান দরকার তাহার নমুনা এবং বার্ষিক তাহা কি পরিমাণ প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ আফিস খোলা থাকিবার দিন বেলা দুইটা হইতে চারিটার মধ্যে পাওয়া যাইবে।

মিউনিসিপ্যালিটীর টেণ্ডার বিভাগে এক টাকা মূল্যে টেণ্ডার ফরম ও সিডিউল পাওয়া যাইবে। অন্য কোন ফরমে টেণ্ডার দিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

নিম্নতম মূল্যের টেণ্ডার, অথবা কোন বিশেষ টেণ্ডার গ্রহণ করিতে কিম্বা কোন টেণ্ডার গ্রহণ না করিবার কারণ দর্শাইতে কমিশনারগণ বাধ্য নহেন।

টেণ্ডার দাতাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন, তাঁহাদের লিনোটাইপ্ মেসিন আছে কিনা।

মিউনিসিপ্যাল আফিস
হাবড়া
২রা মার্চ্চ, ১৯৩৮

জে, সি, দাসগুপ্ত
সেক্রেটারী

পুস্তক সমালোচনা

Sen's Insurance Manual 1937. (সেনের ইন্সিওরেন্স্ ম্যানুয়াল ১৯৩৭)। ১০ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা হইতে "সেন য়্যাণ্ড্ কোং" কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।॰ টাকা।

বীমা সম্বন্ধে বার্ষিক পুস্তিকার মধ্যে এত দিন যাবৎ টুলীর ভিডিমেকাম্, বোর্ণ্ এবং ষ্টোন্ কক্সের ইয়ার বুক্ এই তিন খানাই প্রধান বলিয়া গণ্য হইত। "সেন য়্যাণ্ড্ কোম্পানীর" ম্যানুয়াল বাহির হওয়ার পর হইতে তাহাদের প্রধানত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে। আমরা দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, যে সেনের ১৯৩৭ সালের ম্যানুয়াল খানিও পূর্ব্বের মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পাঁচটী অধ্যায়ে ৩১৫ পৃষ্ঠার মধ্যে ভারতীয় বীমা ব্যবসা সম্বন্ধে সকল প্রয়োজনীয় বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় কোম্পানী সমূহের তালিকা, মর্ট্যালিটী টেবিল (Mortality Table) আমেরিকার ডাক্তার ও য়্যাক্চুয়ারীদের মতানুসারে মানবদেহের উচ্চতা ও ওজন, রক্তের চাপ ও নাড়ীর চাপ, বর্ত্তমান মূল্য এবং চক্র বৃদ্ধির হিসাব; দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমস্ত বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়াম তালিকা ও বিভিন্ন প্রকার পলিসি এবং নিয়মাবলীর সার মর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বীমা কোম্পানী সমূহের গত তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত হিসাব, ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট, সম্পত্তি ও দায়ীর বিবরণ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সমস্ত কোম্পানীর একটী ক্ষুদ্র ডাইরেক্টরী, অর্থাৎ তাহাদের হেড অফিস্, বোর্ড্ অব্ ডিরেক্টরস্, ম্যানেজিং এজেন্ট, সেক্রেটারী, য়্যাক্চুয়ারী প্রভৃতির নাম লিখিত হইয়াছে। অবশেষে পঞ্চম অধ্যায়ে প্রভিডেন্ট্ ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানী সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

কোন কোন স্থলে আমরা সামান্য দুই একটী ত্রুটী লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু তাহা প্রকাশকদের দোষ নহে। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি, অনেক বীমাকোম্পানী ইয়ার বুক প্রকাশকগণকে হাল্ হিসাব-পত্র ও রিপোর্ট প্রভৃতি পাঠান না। সুতরাং পূর্ব্ব বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই প্রকাশকগণকে লিখিতে হয় এবং প্রকাশিত বিবরণ up-to-dateও হয় না। বীমা কোম্পানী এবং ডাইরেক্টরী প্রকাশকগণের মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে নির্ভুল ইয়ারবুক বাহির করা অসম্ভব।

আলোচ্য পুস্তকখানি বীমাকর্ম্মী, বীমা ব্যবসায়ী এবং বীমা গ্রহণেচ্ছু কিম্বা পলিসি-হোল্ডার জনসাধারণ সকলের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিদেশীয় কোম্পানীর ইন্সিওর‍্যান্স্ ইয়ারবুককে অপসারিত করিয়া সেনের ম্যানুয়াল খানি যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাই পুস্তকের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা সেন য়্যাণ্ড

কোম্পানীকে এজন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

দুধের ব্যবসা

শ্রীযুক্ত নিত্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় M. R. Ag. S. (Lond) F. R. H. S. (Lond.) প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। প্রকাশক শ্রীগোবিন্দ পদ মণ্ডল, নিউ বুক ষ্টল ৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

গ্রন্থকার স্বয়ং একজন কৃতী ও কর্ম্মীলোক। তিনি ইংলণ্ডে দুগ্ধের ব্যবসা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, রুশিয়া, ইতালী প্রভৃতি বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের কৃষিকার্য্য এবং দুগ্ধের কারখানা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা সরল ভাষায় বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দশটী অধ্যায়ের মধ্যে বৎস পালন, গাভী ও বৃষ নির্ব্বাচন, গোশালা নির্ম্মাণ, দুগ্ধের কারখানা ও মাখন তৈয়ারী এই কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধীয় অধ্যায় প্রধান ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে যাঁহারা দুগ্ধের ব্যবসা করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের কারবার উন্নত করিবার জন্য এই পুস্তক পাঠ করিলে অত্যন্ত উপকৃত হইবেন। পুস্তকখানিতে সমস্ত বিষয়ই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে। আদর্শ গো-শালার নক্সা, দুগ্ধের কারখানা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির বিবরণ, নানাবিধ হিসাব ও গণনা, রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলাফল প্রভৃতি বিশদরূপে দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানিতে ২৮ খানি সুন্দর ছবি আছে; প্রত্যেক খানি ছবিই প্রয়োজনীয় এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা সূচক। বাংলা ভাষাতে এইরূপ পুস্তক ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়না। আমাদের দেশে সাধারণ কৃষক ও দুগ্ধ ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। মোটা কাগজে পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই খুব মজবুত ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

(সচিত্র) মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক ভারত-বাণী ভূষণ প্রণীত। ১২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার কলিকাতা হইতে গ্রন্থকারের পুত্র শ্রীযুক্ত অভিরাম মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকের মূল্য লিখিত নাই। "যথাযোগ্য স্নেহাশীর্ব্বাদের সহিত ইহা সাদরে গৃহীত হইলে গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য সফল হইবে"—এই কয়েকটী কথা পুস্তকের মূল্য স্থলে লিখিত আছে।

গ্রন্থকার কলিকাতার একজন লক্ষপতি জমিদার,—সুবর্ণবণিক সমাজের মুকুট স্বরূপ। তাঁহার পক্ষে পুস্তকের এইরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ শোভন এবং সঙ্গতই হইয়াছে। ৩৫৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী বৃহদাকারের এই গ্রন্থখানি বেদব্যাস বিরচিত মহাভারতের একটী বিশদ সমালোচনা। বৃহৎ গ্রন্থাকারে বাংলা ভাষায় মহাভারতের সমালোচনা আর আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। দীর্ঘকাল যাবৎ গভীর গবেষণা পূর্ব্বক গ্রন্থকার ইহাতে মহাভারতের নানাবিধ তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। শিক্ষিত সমাজে এই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর হওয়া উচিত। ধনী জমিদারগণ যে এইরূপ জ্ঞানানুশীলনে আত্ম-নিয়োগ এবং সাহিত্য প্রচারে উৎসাহী হইয়াছেন, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয় এবং দেশের একটা শুভলক্ষণ। গ্রন্থের মধ্যে বহু সংখ্যক সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তার অনেকগুলি চিত্রের পরিকল্পনা গ্রন্থকার স্বয়ং করিয়াছেন। বাংলাদেশের সর্ব্বত্র আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।
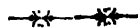
লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩৭ সালের ৩০ শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট

আমরা লক্ষ্মী ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্ট ও ব্যালান্স সীট্ (১৯৩৬ সালের ১লা মে হইতে ১৯৩৭ সালের ৩০ শে এপ্রিল পর্য্যন্ত) সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম দেওয়া হইল। হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা-পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন বীমা

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১৮৪৪৩৬৫০ টাকা মূল্যের ২৫৮৯টী নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরের অবশিষ্ট কয়েকটী সহ মোট ৮২৫৪ টী প্রস্তাবের উপর ১৫১১১৮৫০ টাকার পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। ইহাদের বার্ষিক প্রিমিয়াম ৭৭০৮২৬ টাকা।

আয় ব্যয়

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ হইয়াছে ৩২১৭২৩৯ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবতে আয় ২৮৫২২২১ টাকা; সুদ ডিভিডেণ্ড, বাড়ী ভাড়া বাবতে আয় (ইন্‌কাম্ ট্যাক্স্ বাদে) ৩৬৩৭১৯ টাকা এবং অন্যান্য বিবিধ আয় ১২৯৮ টাকা। খরচ হইয়াছে মোট ১৭১৩৬৮৩ টাকা। তন্মধ্যে পলিসির দাবী বাবত ৫২৮৩৭৩ টাকা, ইণ্টারিম বোনাস্ বাবত ১০৩১৪ টাকা, এবং পরিচালনা খরচা বাবত ১০২২৬৭৩ টাকা, এই কয়েক দফাই প্রধান সমস্ত খরচ বাদে জীবন বীমা তহবিলে ১৩৯২৩৩১ টাকা, ইনভেষ্টমেণ্ট্ রিজার্ভ তহবিলে ১০০০০০ টাকা এবং বিল্ডিং ডিপ্রিসিয়েসান্ রিজার্ভ্ তহবিলে ১১২২৫ টাকা হইয়াছে।

জীবন বীমা তহবিল

পূর্ব্ব বৎসরের (১৯৩৫-৩৬) শেষে জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৬৯৬৪৩৮৩ টাকা। গত ভ্যালুয়েশনের সময় কোম্পানীর য়্যাকচুয়ারীর উপদেশ অনুসারে জেনারেল রিজার্ভ তহবিল হইতে ১১০০০০ টাকা এবং পলিসি হোল্ডার্স্ রিজার্ভ্ তহবিল হইতে ১১৭৯৪০ টাকা আনিয়া এই জীবন বীমা তহবিলের সঙ্গে যোগ করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের শেষে জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৫৮৪৬৫৫ টাকা।

সম্পত্তি ও দায়

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৯৫২৫৯৬৩ টাকা। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী লগ্নী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়,—গবর্ণমেণ্ট ও ষ্টেট্ সিকিউরিটী ৩১৪০৬৬৩ টাকা; ভারতীয় সম্পত্তি মর্টগেজ ২৩৫৮৩৩৬ টাকা;

পণ্ডিত কে, শান্তনম্

রেলওয়ে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ১৫২১২২ টাকা। ঘর বাড়ী (বিল্ডিংস্) সম্পত্তি ১৯৬৮৫৬৩ টাকা। পলিসিবন্ধকী ঋণের পরিমাণ ৪৫৮০২৯ টাকা। কোম্পানীর দায়ের ঘ্বর নিম্নলিখিত কয়েকটী দফা প্রধান;—জীবন বীমা তহবিল ৮৫৮৪৬৭৫ টাকা। আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১০১০০০ টাকা। অন্যান্য তহবিল ১৪১০৬৩ টাকা এবং বিবিধ ডিপজিট্ ১৭৩২৭৫ টাকা।

মোট মজুত বীমা

আলোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট মজুত বীমার পরিমাণ এই,—ভারতের মধ্যে ৫৮৭৬৪৩৮৯ টাকা (বোনাস সহ) মূল্যের ৩২৩৮২ খানি পলিসি এবং ভারতের বাহিরে ২২৪৮৫৬৫ টাকা মূল্যের ৮৫৬ খানি পলিসি।

আমাদের মন্তব্য

উপরি-উক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে, লক্ষ্মী ইন্সুর্যান্স ১৩ বৎসরের মধ্যে তাহার আর্থিক অবস্থা অতিশয় সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছে। স্বদেশভক্ত পরলোকগত লালা লজপত রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই লক্ষ্মী ইন্সুর্যান্স কোম্পানী বাস্তবিকই একটী গৌরবময় জাতীয় সম্পদ্ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

যে সকল বীমাকোম্পানী গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে টাকা লগ্নী করেন, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা নিরাপদ রাখিবার জন্য একটা ইন্ভেষ্ট্মেণ্ট্ রিজার্ভ ফাণ্ড রাখা বিশেষ আবশ্যক। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম এ বৎসর হইতে লক্ষ্মী ইন্সুর্যান্স্ ৯২৪২৫ টাকা লইয়া ঐরূপ একটী তহবিল সৃষ্টি করিয়াছেন। ১১২২৫ টাকা লইয়া বিল্ডিং ডিপ্রিসিয়েসান রিজার্ভ ফাণ্ডেরও পত্তন করা হইয়াছে। কোম্পানীর ভবিষ্যৎ আর্থিক সঙ্কট প্রতিরোধ করিবার জন্য পরিচালকগণের এই কার্য্য বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

শীঘ্র এবং তৎপরতার সহিত দাবীর টাকা মিটাইয়া দেওয়া হয় বলিয়া লক্ষ্মী ইন্সুর্যান্স কোম্পানীর চিরদিনই একটা সুনাম প্রচলিত আছে। এবারেও তাহার কোন ব্যতিক্রম না দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

আলোচ্য বৎসরে পুনর্ব্বীমাবাদে এবং বোনাস্ সহ ৩৮০৬৮৩ টাকা মূল্যের ১৯২টী মৃত্যুজনিত দাবী উত্থাপিত হয়। পূর্ব্ব বৎসরের ১৭২৯৩৫ টাকা দাবী বাকী ছিল। এই উভয় মিলাইয়া মোট যত টাকা হয়, তাহা হইতে ৪৩০৩৫৮ টাকার দাবী মিটান হইয়াছে। অবশিষ্ট থাকে, ১২৩২৬০ টাকা। ইহার পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের বাকী দাবী অপেক্ষা কম। ব্যালেন্স সীট তৈয়ারী হইবার পর ২৫১৭৭ টাকা মূল্যের দাবীর কাগজ পত্র আফিসে আসিয়া পৌছে। তারপরেও রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়া পর্য্যন্ত আরও ১৬৮৯৪ টাকার দাবী মিটান হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ১৫৮০০৪ টাকা মূল্যের ৯৭টী দাবী উত্থাপিত হয়। তন্মধ্যে ৯৬টী পলিসির টাকা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। মেয়াদ শেষের অব্যবহিত পরেই বীমাকারীর মৃত্যু হওয়াতে আর একটী দাবীর টাকা দেওয়া যাইতে পারে নাই। দাবী মিটাইতে লক্ষ্মী ইনসুর‍্যান্সের এই তৎপরতা অনেক বড় কোম্পানীরও অনুকরণীয়।

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি লক্ষ্মী ইনসুর‍্যান্স্ লগ্নী ব্যাপারে খুব সাবধান, ক্রমোন্নতিশীল এবং দৃঢ় ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান। সর্ব্বোপরি ১৩ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৮৬ লক্ষ টাকার জীবন বীমার তহবীল (Life Fund) সৃষ্টি করা অদ্ভুদ এবং অভাবনীয়। বর্ত্তমান বীমা আইনে Life Fund বা জীবন বীমা তহবিল সম্পূর্ণরূপে বীমাকারীদিগের সম্পত্তি। Trust Propertyর ন্যায় ইহার কপর্দ্দকও কাহারও স্পর্শ করার ক্ষমতা নাই। সুতরাং বীমাকারীদিগের নিরাপত্তার দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বীমা জগতে লক্ষ্মীর আসন অচল এবং

মিঃ শচীন বাগ্‌চী

অটল করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত সান্তানমের পরিচালন নৈপুণ্যেই যে কোম্পানী বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। বাংলাদেশে কলিকাতা ব্রাঞ্চের সুযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ শচীন বাগচীও আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং গঠন কুশলতার ফলেই লক্ষ্মী ইনসুর‍্যান্স বাংলাদেশে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতেছে।

সাবান-শিল্প

বিগত ১১ই জানুয়ারী তারিখে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের হলে All India Soap Manufactures Association এর বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সম্পাদক মিঃ এ, টি, গাঙ্গুলি এম, এ, বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। ক্যালকাটা কেমিক্যালের মিঃ বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কসের কেমিষ্ট মিঃ পবিত্রনাথ দাসগুপ্ত, মীরার সত্বাধিকারী মিঃ হরিপদ ভট্টাচার্য্য, হিমানীর মিঃ জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, স্ন্যাস্কোর মিঃ দত্ত প্রমুখ অনেকে উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকেই সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু—সভাপতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সাবান শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটী সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। সভায় যে সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি পড়া হইয়াছিল তাহার সার সঙ্কলন নিম্নে আমরা প্রকাশ করিলাম :—

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবার প্রবৃত্তিটা শুধু স্বাস্থ্যের পক্ষেই কল্যাণকর নয়, ওটা একটা স্বভাব-ধর্ম্ম। স্বাস্থ্যনীতি পালন করা সভ্যতার একটা অঙ্গ বিশেষ। শারীরিক দিক দিয়ে যে জংলী হ'য়ে থাকে, সে-লোকটার মানসিক রুচি হাজার উঁচু দরের হলেও আমরা তাকে সভ্য বলি-নে, বলি অসভ্য জানোয়ার, নোংরা ভূত। সেই জন্যই সভ্যতার ধারা বজায় রাখতে গেলে, শারীরিক স্বাস্থ্যধর্ম্ম একান্তভাবে পালন করতে হয়। যার শারীরিক পরিচ্ছন্নতা নেই তার কালচার নেই ; কালচারহীন মানুষ আধুনিক যুগে ভদ্র সমাজে পরিত্যক্ত। অন্ততঃ মানুষের কিছুটা কাল্চার না থাকলে ভদ্র সমাজে স্থান পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

পূর্ব্বযুগে শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার অন্য উপায় থাকতে পারে, কিন্তু আধুনিক যুগে পরিচ্ছন্নতা-সাধনের ভার নিয়েছে বিজ্ঞান। এরই কল্যাণে মানুষ আজ এমন কতকগুলি জিনিষ উদ্ভাবন করেছে যেগুলি না ব্যবহার করলে সভ্যতার ধারা বজায় রাখা শক্ত হয়ে পড়ে। প্রাচীনপন্থীরা সেই সমস্ত বস্তুর ব্যবহারকে বিলাসিতা বলে গণ্য করেন, কিন্তু তাঁদের সে ধারণা আদৌ সত্য নয়। বিলাসিতা হ'ল সেই জিনিস যা লোকের প্রয়োজনের অতিরিক্তরূপে আচরিত হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কেউ যদি কোন দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহ'লে তাকে মোটেই বিলাসিতা বলা যায় না। উপরোক্ত উদ্ভাবিত দ্রব্যের মধ্যে সাবান অন্যতম—শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে তা অপরিহার্য্য।

অথচ এখনো অনেকের ধারণা আছে যে, গায়ে মাখা সাবান বুঝি বিলাসিতার লক্ষণ। পল্লীগ্রামে এমন অনেক গৃহস্থ দেখেছি, যার কর্ত্তা বাড়ীর মেয়েদের সাবান ব্যবহার করতে দেন না। এই ধারণায় যে, ওটা একটা বিলিতি বিলাসিতা, ম্লেচ্ছ কাণ্ড। শুধু পল্লীগ্রামে নয়, সহরেও অনেক সনাতনী গৃহস্থের বাড়ীতে ঐ রকম আঁটসাঁট কড়াকড়ি আছে। তাঁদের ঐ কূপমণ্ডুক, অন্ধ, ও স্বাস্থ্য বিরোধী মনোবৃত্তি আমরা অতি অবহেলায়ই উপেক্ষা করতে পারতাম, যদি না দেখতাম যে তাঁদের ঐরূপ মিথ্যা সংস্কারের

ফলে দেশীয় শিল্পের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হচ্ছে। কোন শিল্প ভালভাবে চালু হওয়া শুধুমাত্র তার উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে না, তার চাহিদার ওপরই বিশেষভাবে নির্ভর করে। সুতরাং যদি দেখা যায় যে যারা ক্রেতা তাদেরই শিল্পদ্রব্য সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব রয়েছে, তাহ'লে সে শিল্প কি করে চলতে পারে? দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমাদের দেশের লোকের বিলাসিতা সম্পর্কে একটা প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা থাকার দরুণ তারা সাবান প্রভৃতি দ্রব্যের প্রতি এক বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। অথচ এই বিরূপতার কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ নেই। আমার গায়ে যদি ময়লা হয়, ধূলায়-ঘামে একটা চটচটে আটা যদি সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপে লোমকূপগুলি বন্ধ করে রাখে, তাহ'লে শুধু জলের ক্ষমতা নেই যে সে-ময়লা দূর করতে পারে, সুতরাং সাবান একেবারে অপরিহার্য্য। কাজে কাজেই সাবান ব্যবহার করা যে কি করে বিলাসিতা হতে পারে তা' বুঝে ওঠা শক্ত। অথচ সাধারণ লোকের সাবানের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব থাকার দরুণ সাবান-শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সভ্যতার অঙ্গ; সেধার দিয়ে দেখতে গেলে, মাথাপিছু সাবান ব্যবহারের পরিমাণ যদি দেশের লোকের পরিচ্ছন্নতার মাপকাঠি হয়, তাহ'লে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ভারতবর্ষ নিতান্ত পেছিয়ে রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা কথা ভুললে কিছুতেই চলবে না যে, ভারতবর্ষ ভয়ঙ্কর গরীব দেশ, তার অধিবাসীদের অসহায় দারিদ্র্যই তাদের অমন পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। সেইজন্যই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একজন অধিবাসীর বাৎসরিক সাবান ব্যবহারের পরিমাণ হ'ল ২৫ পাউণ্ড। আর একজন ভারতীয়ের সাবান ব্যবহারের পরিমাণ হ'ল ৪ আউন্স! এ যেন ঠিক আকাশ পাতাল তফাৎ।

এই জিনিসটাই সাবান শিল্পের প্রসারতাকে রীতিমত ব্যাহত করেছে। তারওপর মাথাপিছু যে ৪ আউন্স সাবান ব্যবহৃত হয়, তাতেও

Indian Soap Journal এর সম্পাদক এবং কন্‌ফারেন্সের সেক্রেটারী

মিঃ এ, ডি, গাঙ্গুলী এম্, এস্, সি

বিদেশী প্রতিযোগিতা প্রবেশ করেছে। এই বিদেশী প্রতিযোগিতাই আজকে ভয়ঙ্কর আশঙ্কা-জনক। যদিও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আবেদন নিবেদনের ফলে আমদানী দ্রব্যের ওপর কিছুৎ পরিমাণে সংরক্ষণ শুল্ক স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তাতেও দেশীয় শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করা যাচ্ছে না। বিদেশী কোম্পানীরা নানারকম ফন্দী ফিকির করে সে শুল্ককে ফাঁকীদিয়ে সাবান পাঠাচ্ছে;

শুধু তাই নয়, বিদেশী কোম্পানীরা এদেশে কারখানা স্থাপন করে দেশীয় শিল্পের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করেছে। দেশীয় শিল্পের পক্ষে শেষোক্ত ব্যাপারই হচ্ছে সবচেয়ে আশঙ্কার কথা। যে সমস্ত বিদেশী কোম্পানী এদেশে কারখানা স্থাপন করে মাল উৎপাদন করছে তাদের সুবিধা অনেক :—

প্রথমতঃ, তাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ মূলধনের অভাব নেই ;

দ্বিতীয়তঃ, তাদের উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও যন্ত্র-পাতি তাদের অনেকাংশে সাহায্য করে। সুতরাং তারা অতি সহজেই সস্তায় মাল উৎপন্ন করে দেশীয় কোম্পানীগুলির গলা টিপে ধরতে সমর্থ হয়।

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, অপরাপর দেশীয় শিল্পের মধ্যে ভারতের সাবান-শিল্প যথেষ্ট উন্নতিশীল। এ-শিল্প এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, এর আবির্ভাবের মেয়াদ অল্প কয়েকবছর হলেও স্থায়িত্বের গুণে একে আর শিশু বলা চলে না। ভারত আজ দেড় কটি টাকারও ওপর মূল্যের সাবান উৎপাদন করে, তন্মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণই হ'ল কাপড়-কাচা সাবান। ভারতে আজকাল যে সমস্ত গায়ে মাখা সাবান প্রস্তুত হয়, তা' গুণে উৎকৃষ্ট এবং যে কোন বিদেশী উৎকৃষ্ট সাবানের সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে। আমাদের অত্যন্ত গর্ব্বের বিষয় এই যে, আমাদের দেশীয় দু' একটি সাবানের বিদেশের বাজারেও সমাদর আছে। পূর্ব্বে বিদেশ থেকে ভারতে যে পরিমাণ সাবান আমদানী হ'ত, বর্ত্তমানে তা' যথেষ্ট কমে গেছে। ১৯৩২-৩৩ সালের পূর্ব্বে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার বিদেশী সাবান আমদানী হ'ত, কিন্তু ঐ বছরে তা' কমে গিয়ে ৮২ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

কিন্তু এ-সমস্ত ব্যাপার সত্ত্বেও আমাদের সাবান শিল্পের যে পরিমাণ উন্নতি হওয়া উচিত ছিল তা' হয়নি। পূর্ব্বেই বলেছি যে বিদেশী প্রতিযোগিতা আমাদের এ শিল্পের মারাত্মক ক্ষতি করছে, কিন্তু শুধু বিদেশী প্রতিযোগিতা নয়, আভ্যন্তরিক প্রতিযোগিতাও সাবান শিল্পের উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকাটা আশঙ্কার কথা নয়, কিন্তু সে প্রতিযোগিতা যখন সীমা রেখা ছাড়িয়ে যায় তখন তা' আত্মঘাতী হয়ে পড়ে। আমাদের দেশীয় শিল্পের এই শেষোক্ত দশাই ঘটেছে। নিজেদের মধ্যে মারাত্মক প্রতিযোগিতার দরুণ এত সস্তায় মাল ছাড়তে হচ্ছে যে, লাভ প্রায় কিছু থাকছে না। তা'ছাড়া জিনিসের দর কমানোর দরুণ কোয়ালিটিও খারাপ হয়ে যাচ্ছে—এতে ভারতীয় সাবানের সুনাম হানি হ'বার ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা। অবশেষে দেখা যাবে যে, এই রকম হবার দরুণ বিদেশী সাবানই বাজারে বেশী কাটবে। শুধু তাই নয়; এই আভ্যন্তরিক প্রতিযোগিতা এমন মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, জাল-জোচ্চুরি, ট্রেডমার্ক অনুকরণ, লেবেল জালিয়াতি প্রভৃতি নীচতার কাজগুলিও বিভিন্ন কোম্পানী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হচ্ছে; আইনের দ্বারাই হোক্ বা পরস্পর সহযোগিতার দ্বারাই হোক্ এই শঠতা ও জোচ্চুরী অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার।

বিদেশী প্রতিযোগিতা যেখানে প্রবল, সেখানে দেশের শিল্পকে রক্ষামানসে দেশের লোকের স্বদেশী মনোভাব থাকা দরকার।

আমরা উপরে ১৯৩২-৩৩ সালের সাবান আমদানীর যে হিসাব উদ্ধৃত করেছি তা' ১৯৩০ সালের স্বদেশী আন্দোলনেরই ফল, নইলে ও জিনিস সম্ভব হ'ত না। কিন্তু ১৯৩৩ সালের পর থেকে সে-আন্দোলন শিথিল হয়েছে, দেশের লোকের আর সে রকম তীব্র স্বদেশী মনোভাব নেই। কাজে কাজেই আবার ক্রমশঃ বিদেশী আমদানী বৃদ্ধি পাচ্ছে। লোকে এখন আগ্রহসহকারে 'লাক্স' ও 'পামলিভ' সাবান ক্রয় করে থাকে, কিন্তু তাদের এই ক্রয়করণ আমাদের দেশীয় শিল্পের অগ্রগতিকে যে কি পরিমাণ ব্যাহত করে তা' তারা ভেবে দেখে না। আমাদের দেশীয় সাবান যদি গুণে নিকৃষ্ট হ'ত তাহ'লে কিছু বলবার ছিল না, কিন্তু আমাদের দেশীয় দ্রব্য কোন অংশেই বিদেশী সাবান অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। সুতরাং দেশের লোকের দেশীয় সাবান ব্যবহার করা একান্তভাবে কর্ত্তব্য।

ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কসের কেমিষ্ট
মিঃ পবিত্র নাথ দাসগুপ্ত
এম. এস. সি.

পূর্ব্বেই বলেছি যে, আজকালকার যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। ব্যবসা জগতে উৎপাদন যে এত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে শুধু বিজ্ঞানেরই কল্যাণে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার দরুণ নিত্য নতুন নানা রকম কোয়ালিটি আবিষ্কৃত হচ্ছে। সুতরাং বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক একেবারে ঘনিষ্ঠ। সেইজন্যই আমাদের সাবান শিল্পের জন্য একটি আধুনিক যন্ত্রপাতিসম্পন্ন ল্যাবরেটরীর অত্যন্ত প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার না থাকলে কিছুতেই ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সাধন সম্ভব নয়; এসম্পর্কে পরলোকগত বৈজ্ঞানিক লর্ড রাদারফোর্ড বলেছিলেন—"This is in a sense a scientific age, where there is an ever increasing recognition throughout the world of the importance of science to national development. If India is determined to do all she can to raise the standard of life and health of her peoples and to hold her own in the markets of the world, more and more use must be made of the help that Science can give. Science can help her to make the best use of her material resources of all kinds, and to ensure that her industries are run on efficient lines. National research requires national planning." এই গবেষণাগারে কেমিষ্টগণ নানারকম গবেষণা দ্বারা শিল্প দ্রব্যের উন্নতি ঘটাতে চেষ্টা করবেন এবং এই সমস্ত গবেষণাগারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রগণ কাজ পেতে পারবে। কিন্তু বর্ত্তমান

অবস্থায় প্রত্যেকটি সাবান কোম্পানীর জন্য এক একটি ল্যাবরেটরী থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং তাঁরা যদি সকলে মিলে একটি উন্নতিশীল ল্যাবরেটরী স্থাপন করেন, তা'হলে ভাল হয়।

দেশীয় সাবান শিল্পের উন্নতির পথে আর একটি অন্তরায় হচ্ছে, মাল প্রেরণের অসুবিধা। ভারতবর্ষে যাতায়াতের পথ সর্ব্বত্র সুগম নয় এবং রেলে মাল পাঠানোর খরচ এত বেশী যে তাতে ব্যবসার ক্ষতি হয়। আজকাল স্থানে স্থানে মোটর বাসের চলন হয়েছে বটে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট থেকে তার কোন উন্নতির ব্যবস্থা করা হয় না, বরং রেল কোম্পানীর ক্ষতি হচ্ছে বলে মোটর বাস চালানো বন্ধ করবার চেষ্টা করা হয়। সাবান শিল্পের যদি উন্নতি সাধন করতে হয়, তাহ'লে রেলের মাশুল সুবিধাজনকভাবে কমাতে হবে। সাবান ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এ সম্পর্কে রেলকর্ত্তৃপক্ষের নিকট বারবার তাঁদের দাবী জানিয়েছেন। আমরা গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে অবহিত হতে বলি।

সাবান প্রস্তুতের জন্য কস্টিক্ সোডা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রয়োজন, কিন্তু ভারতবর্ষ ওবস্তুটির জন্য একেবারে বিদেশের মুখাপেক্ষী। যদি কখনো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, বিদেশ থেকে অনুরূপ কেমিক্যাল আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তাহ'লে আমাদের সাবান শিল্প একেবারে ফেল পড়বে। মাঝে একবার জাপানী কেমিক্যাল্ আসা স্থগিত ছিল, তাতেই বাজারে সাবানের দর শতকরা ৩০ ভাগ চড়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষে কিন্তু ঐ সমস্ত কেমিক্যাল প্রস্তুত করা অসম্ভব নয়। সুখের বিষয় পাঞ্জাবে 'সোডা এ্যাস্' ও বাংলায় কস্টিক্ সোডা প্রস্তুত করবার চেষ্টা চলেছে। আমরা নিজেদের দেশে যদি সাবানের আবশ্যকীয় কেমিক্যাল দ্রব্য উৎপন্ন করতে পারি, তাহলে সাবানের দর যথেষ্ট পরিমাণে কমে যাবে এবং বিদেশী প্রতিযোগিতা আর তত ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু যতক্ষণ আমাদের বিদেশী কেমিক্যাল দ্রব্য আমদানী করতে হ'বে, ততক্ষণ গভর্ণমেণ্ট যেন ঐ সমস্ত কেমিক্যা'ল দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্কের হার একটু হ্রাস করেন।

সম্প্রতি সাবান কারখানার উপর ফ্যাক্টরী আইনের একটু কড়াকড়ি হয়েছে। কারখানার মালিকদের মতে তাতে নাকি কাজের অসুবিধার সৃষ্টি হ'বে। লেবেল মারা, প্যাক্ করা প্রভৃতি কাজের জন্য পূর্ব্বে অল্পবয়স্কদের নিয়োগ করা যেত, বর্ত্তমানে তা' আর চলবে না। এতে করে মালিকদের খরচা একটু বাড়বে সন্দেহ নেই। আইনের উদ্দেশ্য যাতে না কোনপক্ষের ক্ষতি হয় তারই ব্যবস্থা করা। ছোট ছেলেদের বেশীক্ষণ খাটানো হ'ত বলেই আইনের কড়াকড়ি করা হয়েছে। এবিষয়ে মালিকরা সতর্ক হ'লে আইনের কড়াকড়ি প্রয়োজন হয় না। তবে গভর্ণমেণ্ট আইনের কড়াকড়ির দিকে যেমন নজর দিয়েছেন, তেমনি অটোয়া চুক্তির কুফলের দিকেও নজর দিবেন আশা করি।

আমরা উপরে সাবান শিল্পের সমস্ত ব্যাপার লিপিবদ্ধ করলাম। এর থেকে এটুকু বোঝা যাবে যে, সাবান শিল্পের প্রসারতার এখনো যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। ব্যবসায়ীগণ সেই সমস্ত ক্ষেত্র অধিকার করে, শিল্পের উন্নতি করুন ও বেকার যুবকদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

রেলওয়ে টাইমটেবেল

হাওড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে সকল মেল ট্রেণ এবং প্রধান প্রধান এক্সপ্রেস ট্রেণ যাতায়াত করে তাহাদের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল। সমস্তই কলিকাতার টাইম বলিয়া গণ্য হইবে।

হাওড়া ষ্টেশন

ই, আই, আর :—

	পৌছে		ছাড়ে	
কলিকাতা-দিল্লী-কালকা মেল	সকাল	৮-৭	রাত্রি	৯-১০
বোম্বে মেল	সকাল	৮-৪৯	রাত্রি	৮ ৩৪
কলিকাতা-পাঞ্জাব মেল	সকাল	৭-১০	রাত্রি	৭-৪০
ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল, বোম্বাইয়ের বেলার্ড পীয়ার পর্য্যন্ত (কেবল বৃহস্পতিবার)			রাত্রি	১০-৫
পাঞ্জাব এক্সপ্রেস, মেন লাইন এবং সাহারাণপুর হইয়া	দিবা	২-৫৫	সকাল	১২-৫৫
দিল্লী এক্সপ্রেস, গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া	সন্ধ্যা	৬ ৫৫	বিকাল	৪-৩৪
দেরাদুন এক্সপ্রেস, ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার	সকাল	৬-২০	রাত্রি	১০-২৫
বেনারস মেইন লাইন হইয়া	সকাল	৮-২৫	বৈকাল	৬-৩০
দানাপুর এক্সপ্রেস মেইন লাইন হইয়া	সকাল	৭-৫৫	রাত্রি	৯ ৩০
দানাপুর এক্সপ্রেস সাহেবগঞ্জ লুপ হইয়া	সকাল	৮-৩৯	রাত্রি	৭ ১৪
দিল্লী এক্সপ্রেস মেইন লাইন হইয়া	সন্ধ্যা	৬-৪৫	রাত্রি	১০-৩৯

বি, এন, আর :—

	পৌছে		ছাড়ে	
বম্বে মেল	সকাল	৭-০	রাত্রি	৭-২৪
মাদ্রাজ মেল	সকাল	৭-৫৯	রাত্রি	৮-৫৪
পুরী এক্সপ্রেস	সকাল	৬-৩০	রাত্রি	৮-০
রাচী ফাষ্ট	সকাল	৬-১০	রাত্রি	৯-৪
পুরুলিয়া ফাষ্ট	সকাল	৫-৪৪	রাত্রি	৯-৩০
১৩ ডাউন ও ১৪ আপ হাওড়া নাগপুর	সকাল	৯-০	রাত্রি	৯ ২৪
হাওড়া নাগপুর	সকাল	৫-২৪	রাত্রি	১০-২৪
১১ ডাউন ও ১ আপ হাওড়া নাগপুর	সন্ধ্যা	৫ ৩০	সকাল	৯-
গোমো প্যাসেঞ্জার	রাত্রি	৮-২৪	সকাল	৬-৪৪

শিয়ালদহ ষ্টেশন

ই, বি, আর :—

দার্জ্জিলিং মেল	সকাল	৭-২৪	রাত্রি	৯-০
আসাম মেল	মধ্যাহ্ন	১-১৫	মধ্যাহ্ন	১-৩০
ঢাকা মেল	সকাল	৫-৩৯	রাত্রি	১০-২৪
চট্টগ্রাম মেল	রাত্রি	৮-২৪	সকাল	৭-৩০
বরিশাল এক্সপ্রেস	সকাল	১০-৩৪	বিকাল	৩-৫০
নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস	সকাল	৫-৩৯	রাত্রি	৯-৫৪
সরাজগঞ্জ মেল	সকাল	৭-৩৪	রাত্রি	৮-৫০

ডাকের সময়

কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট অফিসে শেষ কখন চিঠি ডাকে দিলে তাহা পরবর্ত্তী ডাকে যাইবে তাহার সময় তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আকিয়াব, কাউকপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, শিলচর	সকাল	৫-৪৫
আসাম „	„	১১-৩০
শিউড়ী, দুমকা, ভাগলপুর (লুপ লাইন)	বিকাল	৫-০
বোম্বে (ভায়া নাগপুর),	„	৫-১৫
পাঞ্জাব (ই আই আর), রাজপুতনা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ	„	৫-৪৫
বোম্বে (ভায়া জব্বলপুর), গয়া, হাজারীবাগ	„	৬-৩০
দার্জ্জিলিং, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, পূর্ণিয়া, পাবনা এবং উত্তর-বঙ্গ	বিকাল	৬-৪৫
রাঁচি, জামসেদপুর, টাটানগর, চাইবাসা এবং চক্রধরপুর	„	৬-৩০
মাদ্রাজ, কটক, পুরী, বালেশ্বর	„	৬-৩০
পুরুলিয়া, মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া	„	৬-৩০
মধ্য বাংলা, যশোহর এবং খুলনা	„	৭-৩০
মুর্শিদাবাদ, মালদহ, এবং কৃষ্ণনগর	„	৭-৩০
ত্রিপুরা, শিলচর, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট	„	৭ ৩০

আটা ভাঙ্গা কল

বেরী বেরী, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডিস্‌পেপসিয়া ইত্যাদির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আজকাল অনেকে আটা খাইয়া থাকেন। কলিকাতার রাস্তার ধারে যে সকল আটা ভাঙ্গা কল দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে আটার নামে যাহা বিকায়, তাহা অখাদ্য এবং নানা রোগের আকর।

যদি খাঁটি গম পেষা আটা খাইতে চান, তবে হস্ত পরিচালিত আটা পেষাই কল খরিদ করুন।

মূল্য—১০/

মাশুল স্বতন্ত্র
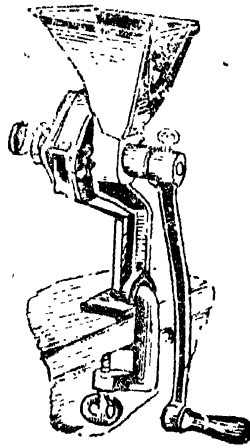
বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ১৫ মিনিটের মধ্যে এক সের আটা ভাঙ্গিতে পারিবে;

দোকানীরা গুঁড়া জিনিসে অতি সহজেই ভেজাল দিতে পারে বলিয়া আটা ময়দার মধ্যে কেওলিন-মাটি, পুরাণো গুদাম পচা চাউল, গম, ডাল ইত্যাদি কলে ফেলিয়া সহজেই গুঁড়াইয়া ভেজাল দিয়া থাকে। কিন্তু নিজেদের ঘরে ঘরে এইরূপ ছোট একটি আটা ভাঙ্গা কল রাখিলে আর কোনও ভয় নাই। বাজার হইতে সুস্বাদু গম আনাইয়া নিজের ছেলেমেয়েদের দ্বারা ভাঙ্গাইয়া আটা খাইয়া দেখুন, স্বাস্থ্য, আনন্দ এবং নবজীবন ফিরিয়া পাইবেন। এক আনার পোষ্টেজ সহ পত্র লিখিলেই "আটা বনাম চাউল" নামক নানা তথ্য পরিপূর্ণ একখানি পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়।

ম্যানেজার—

"ব্যবসা ও বাণিজ্য" আফিস

৯।৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।